বেগম মেরী বিশ্বাস
BanglaBook.org
BanglaBook.org
বিমল মিত্র

বেগম মেরী বিশ্বাস

বিমল মিত্র

বেগম মেরী বিশ্বাস

বিমল মিত্র

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

কলিকাতা ৯

স্বর্গতঃ অগ্রজ ডাঃ বিজয়কুমার মিত্র

স্মরণীয়েষু—

বি শে ষ বি জ্ঞ প্তি

আমার পাঠক-পাঠিকাবর্গের সতর্কতার জন্যে জানাচ্ছি যে, সম্প্রতি সাত-আটটি উপন্যাস 'বিমল মিত্র' নামযুক্ত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। অপরের প্রশংসা যেমন আমার প্রাপ্য হওয়া উচিত নয়, অপরের নিন্দা সম্বন্ধেও সেই কথাই প্রযোজ্য। অথচ প্রায় প্রত্যহই আমাকে সেই দায় বহন করতে হচ্ছে। পাঠক-পাঠিকা-বর্গের প্রতি আমার বিনীত বিজ্ঞপ্তি এই যে, সেগুলো আমার রচনা নয়। একমাত্র 'কড়ি দিয়ে কিনলাম' ছাড়া আমার লেখা প্রত্যেকটি গ্রন্থের প্রথম পৃষ্ঠায় আমার স্বাক্ষর মুদ্রিত আছে।

বিমল মিত্র

কর্নেল ম্যালেসন তাঁর বইতে লিখেছেন— The story of the rise and progress of the British power in India possesses peculiar fascination to all classes of readers. It is a romance sparkling with incidents of the most varied character.

আমার ধারণা এই একটি বিষয় নিয়ে যত বই এদেশে এবং ওদেশে লেখা হয়েছে, তত বই অন্য কোনও বিষয় নিয়ে লেখা হয়নি। সেই গোলাম হোসেনের লেখা সিয়ার-উল-মুতাক্ষরীন থেকে শুরু করে স্যার জর্জ ফরেস্ট। এবং স্যার জর্জ ফরেস্ট থেকে শুরু করে ১৯৬৩ সালে ছাপানো মাইকেল এড্ওয়ার্ডের বই 'ব্যাটল্ অব্ প্ল্যাসী' পর্যন্ত সে এক সুদীর্ঘ তালিকা।

এই বহুশ্রুত আর বহুপঠিত কাহিনীটাই যে কেন এত বছর ধরে আমাকে অনুসরণ করেছে তার সঠিক কারণ বলতে পারবো না। আর শুধু অনুসরণ করাই নয়, মাঝে মাঝে আমার মানসিক শান্তির ব্যাঘাতও ঘটিয়েছে। বার বার এ-গল্পকে ভুলতে চেষ্টা করেছি, এ-গল্পকে মন থেকে মুছে ফেলতেও চেষ্টা করেছি। কিন্তু পারিনি। ১৯৫৬ থেকে ১৯৬৬, কত বছর? দশ বছর। দশ বছরের মধ্যে মাঝখানে একটা পত্রিকায় 'সখী-সংবাদ' নাম দিয়ে এ-কাহিনী লিখতেও শুরু করেছিলাম। এক বছর চলার পর সেটা মাঝপথে বন্ধ করে দিয়ে ভেবেছিলাম মুক্তি পাবো। কিন্তু তবু সে মুক্তি দেয়নি। আজ এতদিনে আমাকে দিয়ে শুরু থেকে নতুন করে লিখিয়ে নিয়ে তবে এ আমাকে পরিত্রাণ দিলে। এখন আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লাম।

এ গল্পের কাছে আমি একটি কারণে বিশেষ কৃতজ্ঞ। সেটি এই যে, মাঝখান থেকে দু'শো বছর আগেকার কিছু লোকের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়ে গেল। বড় ঘনিষ্ঠ পরিচয়। সেই ঘনিষ্ঠতা হওয়ার সুযোগে দেখলাম এই দু'শো বছরে পরিবর্তন যা হয়েছে সেটা বাইরের। আসলে মানুষ সেই মানুষই আছে। দেখলাম জয় আর পরাজয়টা শুধু স্তোকবাক্য! যে জেতে সে জেতে না, যে হারে সেও ঠিক হারে না। ইতিহাসের হার-জিতের সংজ্ঞা উপন্যাসের হার-জিতের সংজ্ঞা থেকে আলাদা। দেখলাম উপন্যাসই সত্য, ইতিহাস মিথ্যে। মিথ্যের বেসাতি করে বলেই ইতিহাস নিয়ে এত বাদানুবাদ। ঐতিহাসিকে ঐতিহাসিকে এত বিরোধ। কিন্তু ঔপন্যাসিক নিরঙ্কুশ নির্বিরোধ নির্বিকার। একমাত্র উপন্যাসই ইতিহাসের মর্মবস্তুর কেন্দ্রে গিয়ে স্বাধিষ্ঠান করতে পারে। ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট্ একদিন লর্ড

ক্লাইভকে 'জালিয়াৎ' আখ্যা দিয়ে তার চরম অপমান করেছিল। ভারতবাসীরাও তাকে 'জালিয়াৎ' আখ্যা দিয়ে ছোট করতে চেয়েছে। ক্লাইভকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে তাকে চরম শাস্তি দিয়ে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট্ ঐতিহাসিকের চোখে নিষ্কলঙ্ক থাকতে চেয়েছে। কিন্তু চোরাই মাল ভোগ করতে তার বাধেনি। ক্লাইভের যা হয় হোক, ভারতবর্ষের অধিবাসীদের যা হয় হোক, ইতিহাস যেন নিষ্কলঙ্ক থাকে।

কিন্তু ট্রুথ? কিন্তু সত্য?

হাজার মনের ভোটের ওপর ভিত্তি করে যে-গ্রন্থ লেখা হয় তারই আর এক নাম হলো ইতিহাস। ঐতিহাসিকের উপাদান সেই সব জীর্ণ রেকর্ড, যা সব সময় সত্যভাষণ করে না। যেমন রাশিয়ার জারের আমলের ইতিহাস স্ট্যালিনের আমলে বাতিল হয়ে যায়, আবার স্ট্যালিনের আমলের ইতিহাস ক্রুশ্চেভের আমলে এসে মিথ্যেয় পরিণত হয়। কিন্তু ঐতিহাসিকের কাছে সেই সব নথি-পত্রের যা মূল্য ঔপন্যাসিকের কাছে তার মূল্য কাণাকড়ি। একমাত্র সত্যের অনুসন্ধানের মধ্যেই ঔপন্যাসিকের সার্থকতা। তাই 'বেগম মেরী বিশ্বাস' ইতিহাস-নির্ভর তো বটেই, কিন্তু তার চেয়েও বেশি সত্য-নির্ভর। ইতি—

বিমল মিত্র

আদিপর্ব

প্রথমে বন্দনা করি দেব গণপতি।
তারপরে বন্দিলাম মাতা বসুমতী॥
পূবেতে বন্দনা করি পূবের দিবাকর।
পশ্চিমেতে বন্দিলাম পাঁচ পয়গম্বর॥
উত্তরেতে হিমালয় বন্দনা করিয়া।
দক্ষিণেতে বন্দিলাম সিন্ধুর দরিয়া॥
সর্বশেষে বন্দিলাম ফিরিঙ্গি কোম্পানী।
কলিযুগে তরাইল পাপী তাপী প্রাণী॥
দেওয়ান গেল ফৌজদার গেল গেল সুবাদার।
কোম্পানীর সাহেব আইল কলির অবতার॥
ধর্ম কর্ম ইষ্টিমন্ত্র হৈল রসাতল।
হরি হরি বলরে ভাই, হরি হরি বল॥

এখানেই শেষ নয়, আরো আছে। কোন্ কালে কোন্ এক নগণ্য গ্রাম্য কবি ছড়া লিখতে গিয়ে সকলকে বন্দনা করে নিজের খ্যাতি অক্ষয় করতে চেয়েছিল। সবটা পাওয়া যায় না। ছেঁড়া-খোড়া তুলোট কাগজ। গোটা-গোটা ভুষো-কালিতে লেখা অক্ষর। পড়বার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু মনটা একেবারে দু'শো তিন শো বছর পেছিয়ে চলে যায়। মনে হয়, যেন চোখের সামনে সব দেখছি।

শুধু যুগ নয়, মানুষগুলোও সব আলাদা। সেই খালি গা, মালকোঁচা বাঁধা কাপড়। কারো হাতে লাঠি, কারো গায়ে চাদর। মাথায় কারো আবার টিকি, নইলে ব্রাহ্মণ বলে আপনাকে চিনতে পারবো কী করে ঠাকুর-মশাই?

আমরা কি আজকের মানুষ নাকি হে? সাতশো বছর আগের আমাদের পরিচয় আমরাই আগে জানতাম না। জানতে পারলাম প্রথম ইবন্ বতুতার বৃত্তান্ত থেকে। খোরাসানবাসীরা এই বাঙলা দেশকে বলতো—দুজাখস্ত্-পুর-ই-নি-আমত্। মানে সুখের নরক। এমন সুখের নরক নাকি সে-যুগে আর ভূ-ভারতে কোথাও ছিল না। চূড়ান্ত সস্তাগন্ডার দেশ। যত ইচ্ছে খাও-দাও, ফূর্তি করো। বেশি পয়সা খরচ নেই। বছরে বাড়িভাড়া মাত্র আট দিরাম, মানে বারো আনা। বাজারে চাল-ডাল-তেল-নুনের সঙ্গে রূপসী মেয়েও বিক্রী হচ্ছে। বেশি দাম পড়বে না। একটা মোহর দিলেই তোমার কেনা বাঁদী হয়ে রইলো। তোমার বাড়িতে এসে তোমার কাজ-কর্ম করবে, তোমার গা-মাথা-পা টিপে দেবে। দরকার হলে তোমার বিছানাতেও শোবে। বড় ধর্মভীরু জাত আমরা। আমাদের ওপর দিয়ে তাই কত রকম ঝড়-ঝাপ্টা গেছে শতাব্দীর পর শতাব্দী।

ইবন্ বতুতা লিখেছেন— I have seen no country in the world where provisions are cheaper than this.

মার্কো পোলো, ভাস্কোডাগামা সবাই বাঙলাদেশ সম্বন্ধে লিখেছে বটে, কিন্তু সশরীরে আসেনি কেউ এখানে। কিন্তু তাদের লেখা পড়ে এখানে একবার যারা

এসেছে তারা আর ফিরে যায়নি। এমন সোনার দেশ কোথায় পাবে শুনি? এখানকার শুয়োরের মাংস খেয়ে পর্তুগীজরা তো আর নড়তেই চায় না। বলে—ভেরি গুড্ হ্যাম্—। এখানকার তাঁতীদের হাতে বোনা কাপড় দেখে বলে—আঃ, ভেরি ফাইন ক্লথ্। বাদশা জাহাঙ্গীর এই কাপড় পরেছে, বেগম নূরজাহানও এই কাপড় পরেছে। এখান থেকে কাপড় চালান গেছে রোমে, প্যারিসে, বার্লিনে। এবার সোরা। কামান দাগতে গেলে বারুদ লাগে। আর সোরা না হলে আবার বারুদ হয় না। সেই সোরা কিনতে এল ফিরিঙ্গী কোম্পানী। ওলন্দাজ, ফরাসী, পর্তুগীজ আর ইংরেজদের দল।

তারা বললে—আমরা এখানে কারবার করতে এসেছি জাঁহাপনা—আমাদের মেহেরবানি করুন—

বাঙলার লাটসাহেব হয়ে এসেছিল বাদশার ছেলে সাহ্ সুজা। সুজার মেয়ের অসুখ। সে আর কিছুতে সারে না। হাকিম হার মেনেছে। কবিরাজও হার মেনেছে। শেষকালে সাহেব ডাক্তারের ডাক পড়লো। ডাক্তার গেব্রিয়াল ব্রাউটনকে ডেকে পাঠানো হলো রাজমহলে। বাদশা সাহ্জাহানের মেয়েকে সারিয়েছে আর বাদশাজাদার মেয়েকে সারাতে পারবে না! তা কি হয়?

তা সেই যে বাদশার মেয়ের রোগ সারলো সেই তখন থেকেই শুরু হলো ফিরিঙ্গী পত্তন। বাঙলা কি আর ছোটখাট দেশ গো? না বাঙালীরাই ছোটখাট জাত। সেই সব অঞ্চলের যত নবাবী আমলা ছিল সকলের কাছে গিয়ে হাজির হলো বাদশাহী ফার্মান। ফার্মানে লেখা হলো—

"জমীদার, চৌধুরী, তালুকদার, মাস্কুদ্দেম, রেকায়া প্রভৃতি

বরাবরেষু—

বাদশার ফার্মান অনুসারে এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, এখন অবধি ইংরাজ কোম্পানী যে সকল পণ্য জলে ও স্থলে আমদানি ও রপ্তানি করিবে তাহার জন্য কোনও প্রকার শুল্কের দাবী যেন কোন ইংরাজ কুঠিতে না করা হয়। ইংরাজেরা রাজ্যের যে কোন স্থানে তাহাদের যে কোন পণ্য লইয়া যাইবে বা দেশীয় পণ্য কিনিয়া আনিবে, তাহার শুল্ক কম হইয়াছে বলিয়া যেন তাহা খুলিয়া দেখা বা বলপূর্বক বাজেয়াপ্ত করা না হয়। তাহারা সকল স্থানে বিনা শুল্কে অবাধে বাণিজ্য করিবে। এতদিন তাহাদের নিকট হইতে বন্দরে জাহাজ নোঙ্গর করিয়া থাকার জন্য যেরূপ মাশুল আদায় করা হইত এখন যেন আর তাহাদিগকে সেরূপ না করা হয়।" ইত্যাদি ইত্যাদি—

অনেক পুরোন কথা, অনেক পুরোন কাহিনী লেখা রয়েছে তুলোট কাগজের পাতায়। বেশ ভারি পুঁথি। অর্ধেকের ওপর পোকায় খাওয়া, ধুলো জমে জমে ময়লা হয়ে নোনা ধরে গেছে। খেরো খাতায় বাঁধানো ছিল পুঁথিখানা। কার লেখা, পুঁথির নাম কী, তা জানবারও উপায় নেই।

আমি জিজ্ঞেস করলাম—এ পুঁথি আপনি কোথায় পেলেন?

বৃদ্ধ ভদ্রলোক। এককালে অবস্থা ভালো ছিল। বিরাট বাড়ি। সরু-সরু পাত্লা-পাত্লা নোনা ধরা ইঁট। এক সঙ্গে পুরো বাড়িটা হয়নি। পুরুষানুক্রমে এক মহলের পর আর এক মহল উঠেছে। একদিকটা নতুন করে মেরামত করা হয়েছে, কিন্তু অন্য দিকের সরিকের হয়তো টাকা নেই তাই সেদিকটা ভেঙে ভেঙে পড়ছে। এক ঘরে রেডিও বাজছে। ইলেক্ট্রিক লাইটের রোশনাই। আবার

ঠিক তার পাশের ঘরটাতেই অন্ধকার ঘুরঘুট্টি। কেরোসিন তেলের হ্যারিকেন জ্বলছে টিম্ টিম্ করে। সেই টিম্ টিমে আলোতেই বাড়ির ছেলেরা মাদুরের ওপর বসে দুলে দুলে নাম্‌তা পড়ছে। বাড়ির একতলার ঘরগুলো রাস্তা থেকেও নিচু। যেদিন গঙ্গায় বান ডাকে সেদিন জল ঢুকে পড়ে বাড়ির একতলায় শোবার ঘরে। সেই জলের সঙ্গে কখনো কখনো সাপও ঢোকে। ভাঙা ইঁটের দেওয়াল থেকে কাঁকড়া বিছে বেরিয়ে পড়ে। তখন আর একতলার ঘরে কারোর থাকা সম্ভব হয় না। বাক্স-প্যাঁটরা বিছানা নিয়ে পাশের কোনো সরিকের ঘরে গিয়ে তাদের আশ্রয় নিতে হয়।

কবে এই বংশের কোন্ আদি পুরুষ এখানে একদিন আস্তানা গেড়েছিলেন। সে হয়তো পলাশীর যুদ্ধের পর কোনো একটা সময়ে। তখন লর্ড ক্লাইভের আমল। লাইব্রেরীর পুরোন পুঁথি ঘেঁটে দেখছি, বাদশা দ্বিতীয় আলমগীরের রাজত্বের চতুর্থ বছরে হিজরী ১১৭০ ৫ই রবি-উল্-শানি, ইংরিজী ১৭৫৭ খৃঃ অব্দের ২০শে ডিসেম্বর, বাঙলা ১১৬৪ সালের পৌষ মাসে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নবাব মীরজাফর খাঁর কাছ থেকে জমীদারস্বরূপ ভেট পান এই ২৪ পরগণা। পরগণা মাগুরা, পরগণা খাসপুর, পরগণা ইক্তিয়ারপুর, পরগণা বারিদহাটি, পরগণা আজিমাবাদ, পরগণা মুড়াগাছা, কিসমত সাহাপুর, পরগণা সাহানগর, কিসমতগড়, পরগণা দক্ষিণ সাগর, আর তারপর পরগণা কলিকাতা। সরকার সাতগাঁর অধীনেই কিস্‌মত পরগণা কলকাতা। ইত্যাদি ইত্যাদি—

এই কিসমত পরগণা খুঁজে বার করা মুশ্‌কিল। এখনকার ম্যাপে এর নিশানা নেই।

বাদশাহ্ আলমগীরের রাজত্বের চতুর্থ বছরে ১৫ই রমজান তারিখে ইংরেজ কোম্পানী আর মীরজাফরের মধ্যে যে সন্ধিপত্র লেখা হলো সেখানে অষ্টম আর নবম ধারায় লেখা আছে—

Article VIII—Within the ditch, which surrounds the borders of Calcutta, are tracts of land, belonging to several zeminders ; besides this I will grant the English Company six hundred yards without the ditch.

Article IX—All the land lying to the south of Calcutta, as far as Culpee, shall be under the zemindary of the English Company, and officers of those parts, shall be under their jurisdiction. The revenue to be paid by them (the Company) in the same manner with other Zeminders.

এ হলো পরোয়ানা।

এতে খুশী হবার লোক নন ক্লাইভ সাহেব। কোম্পানীর সুনাম প্রতিপত্তি হলে তাঁর কী লাভ? ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর লাভের সঙ্গে তাঁর তো কোনো সম্পর্ক নেই। কথাটা জাফর আলি খাঁ বুঝলেন। তাই যখন দিল্লীর বাদশা'র সনদ এল তখন দেখা গেল তাতে আর কোম্পানীর নাম নেই। তাতে ক্লাইভেরই জয়-জয়কার। তখন তাতে আর শুধু শুকনো কর্নেল ক্লাইভ নয়। ক্লাইভের তখন একটা লম্বা-চওড়া পদবী। জব্‌দস্ত-উল্-মুল্‌ক্ নাসেরাদ্দৌলা সবত-জঙ্গ্-বাহাদুর কর্নেল ক্লাইভ। তিনিই তখন দিল্লীর বাদশার সনদ্ পেয়ে ২৪ পরগণার জায়গীরদার জব্‌দস্ত-উল্-মুল্‌ক্ নাসেরাদ্দৌলা সবত-জঙ্গ্-বাহাদুর

কর্নেল ক্লাইভ হয়ে গেছেন।

ভদ্রলোক বললেন—ওসব হিস্ট্রির কচ্‌কচি আমরা শুনতে চাই না মশাই. আমরা চাল-ডাল-মাছ তরকারীর ব্যবস্থা করতে করতেই নাজেহাল, জিনিস-পত্তরের যা দাম বাড়ছে তাইতেই আমরা মরে আছি, ও-সব পড়বার ভাববার শোনবার সময় কোথায় পাই বলুন?

তারপর বললেন—পুঁথিটার মধ্যে কী পেলেন আপনি?

বললাম—একটা অমূল্য জিনিস পেলাম এর মধ্যে। যা এখন পর্যন্ত কোনো ইতিহাসে পাইনি।

—কী রকম?

বললাম—পেলাম বেগম মেরী বিশ্বাসের নাম—

—তিনি কে?

বললাম—এতদিন এই দুশো বছর ধরে আপনাদের বাড়িতে এ পুঁথিটা রয়েছে আর একবার এটা পড়েও দেখেননি? দেখলেই জানতে পারতেন বেগম মেরী বিশ্বাস কে?

সত্যিই ভদ্রলোক আসল সংসারী মানুষ। নাম পশুপতি বিশ্বাস। সারা জীবন মামলা করেছেন, অর্থ উপায় করেছেন, যৌবনে ফুর্তি করেছেন, সন্তানের জন্ম দিয়েছেন আর ভালো ভালো খেয়েছেন আর পরেছেন। সরিকদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাবুয়ানি করেছেন। পাড়ার দশজনের মাথার ওপর মাতব্বরি করেছেন। সাধারণতঃ বাঙলা দেশের সেকালের আরো নিরানব্বুইজন লোক যা করে থাকেন, পশুপতি-বাবুও তাই-ই করেছেন। কোথা থেকে এই বাঙলা দেশ এল, এ দেশ আগে কী ছিল, কী করে এই অজ্ জলাজমি এখনকার বাঙলাদেশে পরিণত হলো সে-সব জানবার আগ্রহ তাঁর কখনো হয়নি। জেনে কোনো লাভ হবে না বলেই আগ্রহ হয়নি। বেশ আছি মশাই, খাচ্ছি-দাচ্ছি, বাত-হাঁপানি-ব্লাড্‌প্রেশার ডায়াবেটিস্ নিয়ে অত সব খবর রাখবার সময় কোথায় আমাদের? জানেন, তিন-তিনটে মেয়ের বিয়ে দিয়েছি তিন-কুড়িং ষাট হাজার টাকা খরচ করে? ক'জন পারে বলুন আজকালকার বাজারে? প্রথম জামাই মেডিকেল ডাক্তার, সাতশো টাকা মাইনে পায় ডি-ভি-সি'তে, সেকেণ্ড জামাই ইঞ্জিনীয়ার...

বাঙলা দেশের ইতিহাস জানার চেয়ে নিজের কীর্তিকাহিনী পরকে জানাবার দিকেই পশুপতিবাবুর আগ্রহটা যেন বেশি। সেকালের পুরোন জমীদার বংশ। মাত্র দুশো বছর আগে পর্যন্তই পশুপতিবাবুদের বংশাবলীর কিছু পরিচয় জানা যায়। কোন্ এক উদ্ধব দাস নাকি এইখানে এই কিস্‌মত পরগণা কলিকাতায় এসে বসবাস শুরু করেন। এখানে এই গঙ্গার ধারে 'কান্তসাগরে' ১৪ বিঘে জমির পত্তনি পেয়ে একটা ছোটখাট বাড়ি করেন। পশুপতিবাবুরা উচ্চরাঢ়ী কায়স্থ। দিল্লীর বাদশার কাছ থেকে উদ্ধব দাস 'খাস বিশ্বাস' উপাধি পেয়েছিলেন। কিন্তু নিজেদের নামের শেষে শুধু দাস পদবী লেখেন। ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলেই ওই বিশ্বাস পদবীটা চালু হয়ে গেছে। কিন্তু বিয়ে-শ্রাদ্ধ-অন্নপ্রাশনে 'খাস-বিশ্বাস' কথাটা এখনো ব্যবহার করতে হয়। ওটা চলে আসছে এ-বংশে।

ভদ্রলোক তখন অধৈর্য হয়ে উঠেছিলেন। জিজ্ঞেস করলেন—বেগম মেরী বিশ্বাস আমাদের কেউ হয় নাকি? কী দেখলেন ওতে?

বললাম—সেইটেই তো খুঁজছি—পাতা তো সব নেই. অর্ধেক ছেঁড়া, পোকায়

খাওয়া—আমার মনে হচ্ছে আপনাদের বাড়িতে যখন এ-পুঁথি পাওয়া গিয়েছে তখন এই পুঁথির লেখকের সঙ্গে আপনাদের নিশ্চয় কিছু যোগাযোগ আছে—

ভদ্রলোক বললেন—সে তো আছেই, কিন্তু বেগম মেরী বিশ্বাসের সঙ্গে আমাদের কী সম্পর্ক থাকতে পারে? বেগম তো মশাই মুসলমান—

আমি বললাম—শুধু মুসলমান কেন, মুসলমান তো বটেই, আবার ক্রিশ্চানও বটে, তার ওপর মনে হচ্ছে হিন্দুও—

তারপর বললাম—আমি এক মাসের জন্যে এটা নিয়ে গিয়েছিলাম, তাই ফেরত নিয়ে এলাম, আপনি যদি একটু সময় দেন তো আরো কিছুদিন রেখে পড়ে দেখতে পারি।

ভদ্রলোকের তাতেও আপত্তি দেখলাম না। বলতে গেলে ভদ্রলোকের কাছে এ-পুঁথির কোনই দাম নেই। পুরোন বাড়ি মেরামত করতে গিয়ে মাটির তলায় আরো অনেক কিছু জঞ্জালের মধ্যে এটা পাওয়া গিয়েছিল। দু'শো বছরের পত্তনি এ'দের। তখন এ অঞ্চল জঙ্গলে ভর্তি ছিল। চোর ডাকাতের ভয়ে তখনকার মানুষে অনেক জিনিসই মাটির তলায় পুঁতে রাখতো। খাস বিশ্বাস পদবী যাঁরা পেয়েছিলেন তাঁরা জায়গীরের সঙ্গে কিছু ধনসম্পত্তিও পেয়েছিলেন। সেই ধন-সম্পত্তি নিয়েই তাঁরা এসেছিলেন এখানে। ধন-সম্পত্তি সে-যুগে লুকিয়ে রাখার জিনিস। কেউ কখনো জানতে পারলে তার আর নিস্তার নেই। উদ্ধব দাস এখানে সেই ধন-সম্পত্তি নিয়েই হয়তো একদিন গড়বন্দী তৈরি করলেন। চক্-মিলান বাড়ি তৈরি করলেন। ভাবলেন খাস-বিশ্বাস বংশ যুগ থেকে যুগান্তর ধরে তাঁর কীর্তি-গাথা প্রচার করবে। কিন্তু আস্তে আস্তে বিবাদ শুরু হলো সরিকদের মধ্যে, ভাগীরথীর জল শুকিয়ে আসতে লাগলো। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্তাব্যক্তিরা দেশের রাজা হয়ে বসলো, কুইন ভিক্টোরিয়া থেকে শুরু করে একাদিক্রমে এক-একজন রাজা এসেছে আর খাস বিশ্বাসদের অবস্থা ক্রমান্বয়ে খারাপ থেকে আরো খারাপের দিকে গেছে।

বাড়িতে এসে পুঁথিখানা পড়তে পড়তে আমার চোখের সামনে থেকে যেন ধীরে ধীরে মহাকালের পর্দাগুলো আস্তে আস্তে সরে যেতে লাগলো। পয়ার ছন্দে লেখা কাব্য। পয়ারের চৌদ্দটি অক্ষর যেন চৌদ্দ হাজার প্রদীপের আলোর প্রাখর্য নিয়ে আমার চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। এই কলকাতা শহর, এই বিংশ শতাব্দী, এই বাড়ি ঘর রাস্তা, এই সভ্যতা, শিক্ষা, ভণ্ডামি, প্রতিযোগিতা আর বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড জয়ের যুগে আমি সশরীরে যেন আর এক যুগে গিয়ে পৌঁছলাম। তখন পিচের রাস্তা হয়নি কোথাও। ইলেক্‌ট্রিক লাইটও হয়নি। মটর, ট্রেন, প্লেন কিছুই হয়নি। শুধু একটা পালকি চলেছে কাল্‌নার মেঠো পথ দিয়ে।

দু'পাশে মাঠ। মধ্যে গরুর গাড়ি যাবার মত খানিকটা রাস্তা।

ওপাশ থেকে বুঝি ধুলো উড়িয়ে কারা আসছিল। ঘোড়ার খুরে রাস্তার ধুলো উঠে আকাশ ছেয়ে ফেলেছে। কাছে আসতেই দেখা গেল নবাবের সেপাই তারা। সেপাইরা পালকি থামিয়ে দিলে।

—কে? ভেতরে কে আছে?

—আজ্ঞে জেনানা!

—কাদের জেনানা?

ষণ্ডা-গুণ্ডা সেপাই দুটো সোজা কথায় ছাড়বার লোক নয়। মেয়েমানুষের নাম শুনলে জিভ দিয়ে নাল পড়ে ওদের। রোদ টা টা করছে চারদিকে। তেষ্টায় ছাতি

ফেটে যাবার জোগাড়। চারজন চারজন আটজন পালকি-বেহারা। পালা করে বয়ে নিয়ে চলেছে। ফেরি ঘাটের কাছে একবার একটু জল-টল খেয়ে নিয়েছিল বেহারারা। ফেরি ঘাটের নৌকোর মাঝিও একবার কান্তকে একলা পেয়ে চুপি চুপি জিজ্ঞেস করেছিল—পাল্‌কিতে ইনি কে কত্তা?

এমনিতে সন্দেহ হবারই কথা। অন্তত একটু কৌতূহল। মানে সঙ্গে তো আর কোনো স্ত্রীলোক নেই। একলা-একলা এই পথেঘাটে এমন রূপসী মেয়েমানুষ দেখলে মানুষের জানতে ইচ্ছে হয় বৈ কি! দিনমানই হোক আর রাত-বিরেতই হোক, মেয়েমানুষ যায় নাকি এমন করে!

কান্ত জবাব দিয়েছিল—আমাদের হাতিয়াগড়ের রাণীবিবি!

কথাটা শুনে বুড়ো মাঝির কোথায় কৌতূহল নিবৃত্তি হবে, তা নয়; চোখ দুটো যেন আরো বড় বড় হয়ে গেল। হাতিয়াগড়ের জমিদার গিন্নীর তো পালকিতে যাবার কথা নয়। গেলে নৌকোতে যাবেন। জমিদারের নিজেরই তো বজরানৌকো আছে। এই ফেরিঘাটেই কতবার বাবুর বজ্‌রা বাঁধা হয়েছে।

—আপনারা?

কান্ত বললে—আমরা নবাব সরকারের লোক—

কথাটা শুনেই বুড়ো মাঝি গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল। লম্বা একটা সেলাম করেছিল সসম্ভ্রমে। সম্ভ্রমে বটে ভয়েও বটে। মুর্শিদাবাদের নিজামত নবাব সরকারের কথা শুনলে কার না ভয় হয়। ভয়েই বোধহয় আর কোন কথা বলেনি বুড়ো মাঝিটা। ঘন ঘন সেলাম করেছিল। দুটো সেপাই সঙ্গে ছিল। আর ছিল আটজন পালকি-বেহারা। আর কান্ত নিজে। এই সব এত লোকের বহর দেখেই মাঝিটার সন্দেহ হয়েছিল। কিন্তু কথাটা শোনবার পর আর বাক্যব্যয় করেনি। পালকিসুদ্ধ নদী-পার করে দিয়ে আর একটা লম্বা সেলাম করেছিল কান্তকে।

তারপর আর কিছু ঘটেনি। এতদূর আসার পর আবার সেই সেপাই।

—কাদের জেনানা?

পালকির ভেতরে যে গুটি-শুটি মেরে চুপ করে বসে ছিল, কথাটা বুঝি তার কানেও গেল। মাথার ঘোমটাটা সে একটু নামিয়ে দিলে। একলা-একলা চুপ করে বসে থাকতে পা ব্যথা হয়ে গিয়েছিল। এতক্ষণ বাইরে থেকে কেবল পালকি-বেহারাদের হুস্‌-হাস্‌ শব্দ ছাড়া আর কিছু ছিল না।

শোনা গেল সঙ্গের লোকটা বলছে—আমাদের হাতিয়াগড়ের রাণীবিবি।

—কোথায় যাবে?

—মুর্শিদাবাদ, চেহেল্‌-সুতুন!

—পাঞ্জা?

বাইরের আর কোনো কথা শোনা গেল না ভেতর থেকে।

হাতিয়াগড়ের জমিদার গিন্নী উদ্‌গ্রীব হয়ে কান পেতে রইলো। কেউ আর কিছু বললে না। সেপাই দুটো বোধহয় পাঞ্জা দেখে খুশী। কেউ আর পালকির দরজা খুলে পরীক্ষা করতেও চাইলে না। তারপর কেবল বেহারাদের হুস্‌-হাস্‌ শব্দ। সারা শরীরটা দুলছে সেই সকাল থেকে। নদীতে যতক্ষণ ছিল ততক্ষণ বেশি কষ্ট হয়নি। নৌকোর ঘরের মধ্যে একা-একা কেটেছে। ওরা বাইরেই ছিল। বাইরেই ওরা খেয়েছে, বাইরেই ঘুমিয়েছে। আর সেপাই দুটো পাহারা দিয়েছে কেবল বসে বসে।

হঠাৎ দরজাটা ফাঁক হয়ে গেল।

সেই লোকটা সসম্ভ্রমে মুখ বাড়িয়ে বললে—এখানে আপনাকে নামতে হবে রাণীবিবি, আমরা কাটোয়ায় পেঁছে গেছি—

সে-কালের কাটোয়া কেমন জায়গা, পুঁথির মধ্যে তার বেশ বর্ণনা আছে। চারিদিকে মাঠ। মাঠের মধ্যে একটা জায়গায় এসে কয়েকটা বট গাছ চারিদিকটা বেশ ছায়াচ্ছন্ন করে রেখেছে। দু'একটা আটচালা। একটা শিবমন্দিরও ছিল। ভাঙাচোরা অবস্থা তার। ঠিক তার পাশেই একটা বাড়ি। পোড়া ইঁটের পাকা বাড়ি। আর পাশেই গঙ্গা।

এককালে এখানে বর্গীরা এসে হাঙ্গামা বাধিয়েছিল। লুঠপাট করে সব শ্মশান করে দিয়ে গিয়েছিল। সে কয়েক বছর আগেকার কথা। এখন কাছাকাছি গ্রামের চিহ্ন নেই। গ্রামের লোক সেই সময়ে এ-গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল আর আসেনি। কয়েকটা বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল বর্গীরা। ক্ষেতের ফসল কেটে নিয়ে গিয়েছিল। গরুছাগল কিছু নিতে বাকি রাখেনি। সে-সব এক দিন গিয়েছে। কান্তর মনে আছে সে-সব দিনের কথা।

সে ছিল বড়-চাতরা।

খুব ছোট তখন সে। ভালো করে মনে পড়ে না সব কথা। এক-একদিন রাত্রে হৈ-হৈ করে গাঁ-ময় চিৎকার উঠতো। 'বর্গী এল' 'বর্গী এল' বলে রব উঠতো। দিদিমা ঘুম ভাঙিয়ে দিত। বলতো—কান্ত ওঠ্ ওঠ্—

বর্ষার রাত। নাজিরদের ডোবাটার পাশ থেকে ঝিঁঝি পোকার ডাক আসছে অনবরত। গোল্পাতার চালের বাতায় দিদিমা বড় বড় কাঁঠাল ঝুলিয়ে রাখতো। যে কাঁঠাল পাকেনি, সেই কাঁঠাল বাতি হলেই গোলামকে দিয়ে দিদিমা গাছ থেকে পাড়িয়ে রাখতো। তারপর চালের বাতায় দড়ির শিকেয় ঝুলিয়ে রাখতো। সেই কাঁঠাল থেকে দু'তিন দিন বাদেই গন্ধ বেরোত। পেকে ভুর-ভুর করতো গন্ধ। গন্ধ পেয়ে হলদে-হলদে বোল্তা এসে জুটতো কোত্থেকে।

তখন কান্ত ছোট। অতদূরে হাত পেঁছুত না। একটা কচার লাঠি দিয়ে কাঁঠালটার গায়ে লাগাতেই তার মধ্যে লাঠিটা ঢুকে যেত, তখন কাঁঠালটা পেকে একেবারে ভুস্ভুসে হয়ে গেছে।

দিদিমা দেখতে পেয়ে বলতো—কে রে? কাঁঠালটা কে খোঁচালে রে? তুই বুঝি?

শুধু কি কাঁঠাল? আম গাছও ছিল কান্তদের। অত আম কে খাবে তখন! খাবার মধ্যে তো কেবল দিদিমা আর সে! তক্তপোষের তলায় পাকা আমগুলো আমপাতার ওপর সাজিয়ে সাজিয়ে রাখতো দিদিমা। রোজ রোজ বেছে বেছে পাকা আমগুলো দিয়ে জলখাবার হতো নাতির। সেই পেটভরা আম খেয়ে দোয়াত কালি-কলম তালপাতা নিয়ে পাঠশালায় যেত কান্ত। স্বরে অ আর স্বরে আ দিয়ে বাঙলা হাতের লেখা মকশো করতে হতো। কাঁধে আঁকুড়ি ক, মুখে বাড়ি খ,...

কিন্তু সেবার সত্যি সত্যিই রাত দুপুরে বর্গীরা এল। নাজিরদের বাড়ির দিকে সকলে দৌড়চ্ছিল। দিদিমা বুড়ো মানুষ, বেশি জোরে হাঁটতে পারে না। চৌধুরীবাবুদের বুড়ো কর্তা বাতের ব্যথায় পঙ্গু হয়ে পড়েছিলেন বিছানায়।

তিনি আর দৌড়তে পারলেন না, ধপাস করে মাটিতে পড়ে মরে গেলেন। চৌধুরী বাড়ির ন'বউ পেছনে ছিল, শ্বশুরকে পড়ে যেতে দেখে ন'বউ থেমে গেল। শাশুড়ি তখন এক নাতির হাত ধরে আর এক নাতিকে কোলে নিয়ে দৌড়চ্ছে।

কর্তাকে পড়ে যেতে দেখে শাশুড়ি গিন্নী বললে,—উনি থাকুন ন'বৌমা, তুমি চলো, পোয়াতি মানুষ তুমি, তুমি আগে নিজের পেরাণ সামলাও—

বুড়োকর্তা সেখানেই পড়ে রইলেন। চৌধুরী বাড়ির বড়কর্তা, মেজ কর্তা, সেজ কর্তা, ন'কর্তা তখন বাড়ির বড় বড় লোহার সিন্দুকগুলো ধরে ধরে সেই ডোবা পুকুরের মধ্যে ডুবোচ্ছে। চৌধুরীবাবুদের অবস্থা ভালো। রুপোর থালা-বাসন ছিল, সোনার বাট ছিল, সমস্ত সেই রাত্তিরে পুকুরের পাঁকের মধ্যে পুঁতে ফেললে। তারপর লাঠি-সড়কি নিয়ে মাথার ওপর ঘোরাতে-ঘোরাতে চার ভাই বেরিয়ে পড়লো।

আর শুধু কি চৌধুরীরা?

বড়-চাতরার যত লোক ছিল সব পালিয়ে বাঁচতো বাড়ি-ঘর ছেড়ে। চাল-ডাল-নুন-তেল ফেলে রেখে শুধু প্রাণ বাঁচাবার তাগিদে গ্রাম-কে-গ্রাম উজাড় হয়ে যেত! কোথায় যেত তার ঠিক নেই। নাজিরদের বাড়িটায় একতলায় মাটির নিচেও ঘর ছিল। নাজিররা সেখানেই লুকিয়ে থাকতো।

দিদিমা বলতো—তুই যেবার হলি সেবারও বর্গী এইছিল, তোকে কোলে নিয়ে তোর মা আর আমি নাজিরদের বাড়ির তলায় গিয়ে লুকোলুম—

খুব ছোটবেলায় দিদিমার কাছে এইসব গল্প শুনতো। শুধু দিদিমা কেন, সে-গল্প বড়-চাতরার সবাই জানতো। ওই পাঠশালার পশ্চিম দিকের কালাচাঁদের মঠ পেরিয়ে যেখানে বিরাট একটা ঝাঁকড়া-মাথা বটগাছ হা হা করে আকাশের দিকে হাত তুলে বোশেখ-জষ্ঠি্য মাসের বিকেল বেলার দিকে তুমুল কাণ্ড করে বসে, তারও ওপাশে রাজবিবির মসজিদ, সেই রাজবিবির মসজিদ ছাড়ালেই সরকারী সড়ক। সেই সড়ক দিয়ে সোজা হেঁটে গেলেই তিন দিনের মধ্যে রাজমহল পৌঁছিয়ে যাবে। নাজিরবাবুদের সর্দার পাইক দফাদার ওই সরকারী সড়ক দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে আসতো। চৌধুরীবাবুরা যখন একবার কাশীধামে গিয়েছিল, তখন ওই পথ ধরেই গিয়েছিল। গিয়ে পাটনার গঙ্গা থেকে নৌকো নিয়েছিল। আর ঠিক ওই রাস্তা বরাবরই বর্গীরা আসতো। একেবারে পঙ্গপালের মত হুড়-মুড় করে এসে ঢুকে পড়তো বড়চাতরায়। ঠিক যখন ক্ষেতের ধান কাটবার সময় হতো, সেই সময়ে কোত্থেকে এসে হাজির হতো আর তারা চলে যাবার পর খাঁ খাঁ করতো সমস্ত বড়-চাতরা।

বড়-চাতরার লোকে কান্নাকাটি করতো গাঁ দেখে। কতবার ঘর-বাড়ি-গোলা-মরাই-ক্ষেত-খামার সমস্ত জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়ে গেছে বর্গীরা।

দিদিমাও কাঁদতো। বলতো—ওই হারামজাদারা তোর বাবাকেও খুন করে ফেলেছিল রে।

ওই সময়েই কী একটা হাঙ্গামায় মা গেল। রইলো শুধু দিদিমা আর সে। দিদিমা বুড়ি মানুষ। কতদিন আর বাঁচবে! তবু যে-ক'দিন বেঁচে ছিল, ততদিন নাতির জন্যে অনেক করে গেছে। নাজিরদের চণ্ডীমণ্ডপে বরদা পণ্ডিতের পাঠশালা ছিল একদিকে, আর একদিকে ছিল সারদা পণ্ডিতের মক্তব। সারদা পণ্ডিত নিজে পড়াতেন না ছাত্রদের, মৌলবী রেখেছিলেন। মৌলবী ফার্সী পড়াতো পড়ুয়াদের।

নাজিরবাবু বলছিলেন—কনে-বউ, তুমি আবার নাতিকে ফার্সী পড়াতে গেলে কেন বলো তো? সংস্কৃত পড়লে কি বিদ্যে হয় না?

দিদিমা বলেছিল—না কর্তাবাবু, তা নয়, নাতি চিরকাল চাষাভুষো হয়ে থাকবে, তা কি ভালো?

—তা ফার্সী শিখে তোমার নাতি নবাব সরকারে নায়েব-নাজিম হবে নাকি?

দিদিমা বলেছিল—নায়েব-নাজিম না হোক, নায়েব-নাজিমের খেদ্‌মদ্‌গার তো হতে পারবে? ফার্সিটা শিখলে তবু সরকারী চাকরি অন্ততঃ একটা তো পাবে!

তা নবাব-সরকারের চাকরিতে আর সে-গুড় ছিল না তখন। নবাব আলীবর্দী খাঁ নিজেই নবাব-সরকারের চাকরিতে ঢুকেছিল বলে নবাব হতে পেরেছিল মুর্শিদাবাদের। ওই মহারাজ রাজবল্লভ, পেশকার হয়ে ঢুকে মহারাজ। ওই রামনারায়ণ, জানকীরামের কাছে সরকারী চাকরি করেছিল বলেই পাটনার দেওয়ানি পেয়ে গিয়েছিল।

দিদিমার আশা ছিল অনেক। আশা ছিল নিজের জামাই তার যে-আশা মেটাতে পারেনি, বাপ-মা-মরা নাতি তাই পারবে। কিন্তু দিদিমা যদি জানতো যে শেষকালে তারই নাতি কি না চাকরি নেবে ইস্ট-ইন্ডিয়া-কোম্পানীর দপ্তরে!

কিন্তু সে-কথা এখন থাক!

কাটোয়ার কাছে আসতেই পালকি-বেহারারা থেমে গেছে। সেই সকালবেলা খেয়া পার হয়ে বেহারারা ছুটতে শুরু করেছে দুটো চিঁড়ে-মুড়কি মুখে দিয়ে। তার পর আর বিরাম নেই।

নিজামত-সরকারের তলব্ পেয়ে কাটোয়ার কোতোয়াল সব ব্যবস্থাই করে রেখেছিল। পালকিটা পৌঁছতেই ফৌজি সেপাই দুটো সামনে এসে খাড়া হলো।

কান্তও তৈরি ছিল। পাশেই পাকাবাড়িটা। কোতোয়ালের লোক সামনেই হাজির ছিল। কান্ত এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলে—ঘর সাফ হয়েছে?

কোতোয়ালের লোক কান্তকে সেলাম করে বললে—হ্যাঁ হুজুর—

—রান্নাবান্নার কী ব্যবস্থা?

—সব তৈরি হচ্ছে হুজুর। বারোজনের রান্নার হুকুম দিয়েছেন কোতোয়াল।

—রান্না করছে কারা? হিন্দু না মুসলমান?

—হুজুর, মুসলমান!

কান্ত একটু অবাক হয়ে গেল। জিজ্ঞেস করলে—কেন? মুসলমান কেন? হাতিয়াগড়ের রানী তো হিন্দু বিবি, মুসলমানের হাতের রান্না খাবেন কেন? হিন্দু রসুই-এর বন্দোবস্ত হয়নি?

—তা জানিনে হুজুর।

কান্ত বললে—ঠিক আছে, ঝিকে ডেকে দাও, রাণীবিবিকে নিয়ে ভেতরে যাক, তারপরে আমি কোতোয়াল সাহেবের সঙ্গে কথা বলছি—

ঝি নয়, বোরখা পরা বাঁদী বেরিয়ে এল রাণীবিবিকে নামিয়ে নিয়ে যেতে। পালকির দরজা ফাঁক হতেই কান্ত দেখলে সলমাচুম্‌কির ওড়না দিয়ে রাণীবিবি মাথায় একটা ঘোমটা দিয়েছিল। পালকি থেকে মাথা নিচু করে বেরোতে গিয়েই ঘোমটাটা খসে গেল মুখ থেকে। আর কান্ত এক পলকে দেখে ফেললে রাণীবিবির মুখখানা। দুপুরের রোদে মুখখানা লাল হয়ে গেছে। ফরসা রং-এর ওপর লাল্‌চে আভা বেরোচ্ছে সারা মুখখানাতে। আর কপালের ঠিক মধ্যিখানে সিঁথির ওপর জ্বল্‌জ্বল্ করছে মেটে সিঁদুর।

ফৌজি সেপাই দুটো সেইদিকে চেয়ে দেখছিল। পালকি-বেহারারাও দেখছিল। সেই তাদের দিকে নজর পড়তেই কান্ত নিজেই যেন কেমন অপরাধী মনে করলে নিজেকে। তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিয়ে মুখখানা খানিকক্ষণের জন্যে অন্ততঃ ভোলবার চেষ্টা করলে।

সারা পুঁথিখানায় এমনি সব বর্ণনা। ধুলো আর নোনা হাওয়া আর পোকার হাত থেকে পুঁথিখানাকে রক্ষে করা যায়নি। বাঙলাদেশের জল-হাওয়াতে মানুষই বলে তাড়াতাড়ি মরে যায়, তায় আবার তুলোট কাগজ।

তুমি আমি এবং আর পাঁচজন যখন দুশো বছর ধরে ইংরেজ রাজত্বে বাস করে সেকালের সব ইতিহাস ভুলে বসে আছি, তখন এমন একখানা পুঁথি কোথায় মাটির তলায় আমাদের চোখের আড়ালে লুকিয়ে পড়েছিল তার হিসেব রাখবার প্রয়োজন বোধ করিনি। একদিন মুর্শিদাবাদ থেকে রাজধানী কলকাতায় চলে এসেছিল, তারপর কলকাতা থেকে দিল্লী। এই দুশো বছরে শুধু যে যুগই বদলেছে তাই নয়, মানুষ বদলেছে, মানুষের মতিগতিও বদলেছে। আর মানুষই বা কেন, ভুগোলও বদলে গেছে। এখন যে গঙ্গা হিমালয় থেকে মুর্শিদাবাদ পর্যন্ত এসে এখানে পদ্মা নাম নিয়েছে, আসলে তা পদ্মাই নয়। আসলে তা ছিল সমুদ্র। সমুদ্র থেকে একদিন দ্বীপ জেগে উঠেছে, নতুন জনপদ যেমন সৃষ্টি করেছে, নতুন নদীও তাতে সৃষ্টি হয়েছে। রামায়ণের যে গঙ্গা সাতটা ধারায় বয়ে গিয়েছিল, তার তিনটে স্রোত পুব দিকে গিয়ে নাম নিয়েছিল হ্লাদিনী, পাবনী আর নলিনী। আর পশ্চিম দিকে যে তিনটে ধারা বয়ে গিয়েছিল, তার নাম সুচক্ষু, সীতা আর সিন্ধু। বাকি স্রোতটা মাঝখান দিয়ে ভগীরথের পেছন-পেছন সমুদ্রে গিয়ে পড়েছিল। এই স্রোতটার নামই গঙ্গা। ইংরেজরা যখন এল তখন গঙ্গার নাম বদলে তার নাম রাখলে কাশিমবাজার নদী। কাশিমবাজার পর্যন্ত কাশিমবাজার নদী, যেখানে ভাগীরথী জলাঙ্গীর সঙ্গে এসে মিশেছে। বাকিটা হলো হুগলী নদী। আর এখন তো সবটাই হুগলী নদী।

এই হুগলী নদীরই কি কম নাম-ডাক! এই নদীটা দিয়েই একদিন নবাবের সেপাইরা বর্গীদের সঙ্গে লড়াই করতে গেছে। এই নদীটা দিয়েই একদিন ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সোরার নৌকো জাহাজ বোঝাই করে বিলেতে মাল পাঠিয়ে দিয়েছে। এই নদীটা দিয়েই একদিন হাতিয়াগড়ের জমীদার মুর্শিদাবাদের সরকারে খাজনা জমা দিতে এসেছে। এই গঙ্গার পাড়ের ওপরেই কিরীটেশ্বরীর মন্দির। মুর্শিদকুলী খাঁর কানুনগো দর্পনারায়ণ এই কিরীটেশ্বরীর মন্দির নতুন করে গড়ে দিয়ে নিজের দেবভক্তি প্রচার করেছিলেন। ঢাকা থেকে ফিরে যতদিন ডাহাপাড়ায় বাস করেছিলেন ততদিন এই মন্দিরের তত্ত্বাবধানের দিকে লক্ষ্য রেখেছিলেন। এইখানেই আছে রাঙামাটি। এখানকার মাটি লাল। হিউ-এন্-সাং তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তে যাকে বলেছেন কর্ণসুবর্ণ, এই রাঙামাটিই সেই কর্ণসুবর্ণ। মহারাজ দাতাকর্ণের অন্নপ্রাশনের সময় বিভীষণ এখানে স্বর্ণবৃষ্টি করেছিলেন, তাই নাকি এর নাম হয়েছিল কর্ণসুবর্ণ। কে জানে! কত রকম গল্প জড়িয়ে আছে এই দেশকে ঘিরে, সব লিখতে গেলে এ-বইও মোটা হয়ে যাবে, তখন আপনারাও

বিরক্ত হয়ে যাবেন, আমারও স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যাবে রাত জেগে লিখে লিখে।

এই যে নলহাটি আজিমগঞ্জ লাইনে সাগরদীঘি নামে একটা ইস্টিশান, ওর পেছনেও একটা গল্প আছে। কিন্তু সে-গল্প থাক। এবার অন্য একটা গল্প বলি। সাগরদীঘি থেকে চার ক্রোশ উত্তর-পূবে একটা গাঁ আছে, তার নাম এক-আনি চাঁদপাড়া। গৌড়ের সিংহাসনে একদিন হোসেন সাহ্ জবরদস্ত নবাব বলে বিখ্যাত হয়েছিলেন। সেই হোসেন সাহের বাবা এই চাঁদপুরে এসে উঠেছিলেন। কিন্তু অবস্থা বৈগুণ্যে চাকরি নেন এক ব্রাহ্মণের কাছে। চৈতন্যচরিতামৃতে ওই ব্রাহ্মণের নাম সুবুদ্ধি রায় বলে লেখা আছে। লোকে সুবুদ্ধি রায়কে চাঁদ রায় বলে ডাকতো। চাঁদপাড়ার কাজী হোসেন সাহের গুণের পরিচয় পেয়ে নিজের মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ে দিলেন। একদিন যে ছিল সুবুদ্ধি রায়ের আশ্রিত, সে-ই আবার একদিন গৌড়ের রাজ-সিংহাসন আলো করে বসলো। কিন্তু সুবুদ্ধি রায়ের কথা হোসেন সাহ্ ভোলেননি। নবাব হয়েই চাঁদপাড়া গ্রামটার স্বত্ব সুবুদ্ধি রায়কে এক আনা খাজনায় দিয়ে দিলেন। তখন থেকেই সেই গ্রামের নাম হয়ে গেল এক-আনি চাঁদপাড়া।

কিন্তু আজ যে রাজা আবার কালই হয়তো সে ফকীর হয়ে যাবে। একদিন সুবুদ্ধি রায়ের ক্ষমতা এমনই বেড়ে উঠলো যে, তখন হোসেন সাহ্ই বা কে জগদীশ্বরই বা কে! সেই সুবুদ্ধি রায়ই একদিন চাবুক মেরে হোসেন সাহের গায়ে দাগ বসিয়ে দিলেন। আর যায় কোথায়! হোসেন সাহ্ কিছু বললেন না, কিন্তু তাঁর বেগম বড় চটে গেলেন।

স্বামীকে বললেন—এত বেয়াদপি কাফেরের?

হোসেন সাহ্ বললেন—তা হোক, একদিন তো রায়-মশাইএর খেয়ে-পরেই মানুষ হয়েছি—

ও-সব যুক্তিতে ভুললেন না বেগম সাহেবা। তিনি বললেন—সুবুদ্ধি রায় যা-ই হোক, ও হলো কাফের, কাফেরকে খুন করলে কোনো গুণাহ্ হয় না—

শেষে বেগমের কথাও রইলো, সুবুদ্ধি রায়ের সম্মানও রইলো। হোসেন সাহ্ একদিন আচমন করতে করতে সুবুদ্ধি রায়ের গায়ে সেই জল ছিটিয়ে দিলেন। সেই জল তাঁর মুখে গিয়ে লাগলো। এর পর সুবুদ্ধি রায় আর সংসারে থাকেননি। সংসার ত্যাগ করে মহাপ্রভুর নামে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন।

এ তো গেল পাঠান আমলের কথা। সেই হোসেন সাহ্ই বা কোথায় তলিয়ে গেল। তার জায়গায় শেষ নবাব এল দায়ুদ খাঁ। পাঠান আমলের ইতি হলো এই দায়ুদ খাঁর আমলেই। মানসিংহ এসে হাজির বাংলার সুবেদার হয়ে। মোগল-পাঠানে লড়াই হলো এই গঙ্গার ধারেই সেরপুর আতাইএ! এই সেরপুর আতাইতেই পাঠানদের হাতীর দল পালিয়ে বাঁচলো। সেই মানসিংহের সঙ্গেই একজন ব্রাহ্মণ বাঙলাদেশে এসেছিলেন। তিনি কান্যকুব্জের লোক, জিঝোতিয়া বংশের ব্রাহ্মণ। মানসিংহের সৈন্য তিনিই পরিচালনা করতেন। তাঁর নাম সবিতা রায়। এই সবিতা রায়ই বর্তমান জেমো রাজবংশের আদিপুরুষ। এই বংশের জয়রাম রায় কপিলেশ্বর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সে মন্দিরও এই গঙ্গার গর্ভেই চলে গেছে।

এ-গঙ্গা নিয়েছেও যেমন অনেক আবার দিয়েছেও অনেক। এই গঙ্গাই ঘসেটি বেগমকে নিয়েছে, আমিনা বেগমকে নিয়েছে। নানীবেগম, ময়মানা বেগমকে

নিয়েছে। লুৎফুন্নিসা বেগমকেও নিয়েছে। আর দিয়েছে এই মরালীকে। এই মরিয়ম বেগমকে। এই বেগম মেরী বিশ্বাসকে। এই যে-বেগম মেরী বিশ্বাসের গল্প এখানে আপনাদের বলতে বসেছি।

তা এই গঙ্গার পাড় ধরেই হাতিয়াগড়ের রাণীবিবির পালকিটা এসে থামলো কাটোয়ার সরাইখানার সামনে। কোতোয়ালের হেফাজতে ছিল এ বাড়িটা। নবাব আলীবর্দী খাঁ একবার বর্গীদের তাড়িয়ে দিয়ে এসে নানীবেগমকে নিয়ে এক রাত্রের জন্যে এখানে উঠেছিলেন। সব রকম বন্দোবস্তই আছে এখানে। দরকার হলে এখানকার খিদ্‌মদ্‌গার গরম জলের ব্যবস্থা করতে পারে স্নানের জন্যে। খাবার বলো খাবার, বিছানা বলো বিছানা, এমন কি তেমন দরকার হলে মদের ব্যবস্থাও করতে পারেন।

কান্তর ঘাড় থেকে যেন বোঝাটা নামলো।

সেপাই দু'জনও ঘাড়ের বন্দুক নামিয়ে গায়ের মুখের ঘাম মুছে নিলে। অনেক দূর পথ হেঁটে এসেছে। তাদের ক্ষিদে পাবার কথা। গাছতলাটায় বসলো গিয়ে দু'জন।

—ও কান্তবাবু! কান্তবাবু—

কান্ত কোতোয়ালের সঙ্গে দেখা করে খাওয়া-দাওয়ার বন্দোবস্তের কথা বলতে যাচ্ছিল। হাতিয়াগড়ের রানী হিন্দুবিবি, মুসলমানের হাতের রান্না কেমন করে খাবে! তাছাড়া, এখানে কতদিন থাকতে হবে, এখান থেকে মুর্শিদাবাদে যাবার আবার কী বন্দোবস্ত করা হয়েছে, তাও জানা দরকার। নবাব সরকারের চাকরির অনেক ল্যাটা। কোথাও কেউ মুখ খুলে কথা বলবে না। সবাই যেন সবাইকে সন্দেহ করে। অথচ যখন ফিরিঙ্গি কোম্পানীতে চাকরি করতো তখন এ-সব ছিল না। বেভারিজ সাহেব লোক ভালো। কান্তকে বাবু বলে ডাকতো। তিন টাকা করে মাইনে দিত সাহেব, কিন্তু মাইনেটা কম হলে কী হবে, সাহেব সেটা পুষিয়ে দিত নানাভাবে। সোরা বেচে বেশি লাভ হলে সেবার বকশিশ দিত। তা বকশিশ না-দিলেও চাকরি না করে উপায় ছিল না কান্তর। বেভারিজ সাহেব চাকরি না দিলে কোথায় থাকতো সে? বাঁচতো কী করে? খেত কী? বড়-চাতরা থেকে সেই যে সেবার প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছিল, তারপরে কি আর সেখানে গিয়ে ওঠা যেত! গাঁ-কে-গাঁ যেন আগুন জেলে পুড়িয়ে দিয়েছিল তারা।

সে এক ভয়ঙ্কর কান্ড!

সেইবারই বেশি করে কান্ডটা হলো।

ওই রাত দুপুরে আবার একদিন হৈ-হৈ রৈ-রৈ চিৎকার উঠলো। বড়-চাতরার তাবৎ লোক ঘুম ভেঙে যে-যেদিকে পারলো ছুটলো। কিন্তু সেবার বোধহয় একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল। নাজিরদের বাড়িটার ওপর তখন ঝাঁপিয়ে পড়েছে বর্গীরা। নাজীররাই বড়-চাতরার বর্ধিষ্ণু লোক। বাড়িতে চিরকাল ধান, চাল, গুড়, নুন মজুত করা থাকে। তা সবাইকার জানা। তাই সেবার আর নাজিররা রেহাই পেলে না। দু'একটা গাদা-বন্দুক বোধহয় ছুঁড়েছিল নাজিরবাবুর দিশি সেপাই। কিন্তু সে আর কতটুকু। কান্তরা যখন ঘুম ভেঙে উঠেছে তখন নাজিরদের বাড়িটা দাউ-দাউ করে জ্বলছে।

সুতরাং পূব দিকে দৌড়োও। পালাও পালাও।

যার যে-দিকে চোখ গেছে সেই দিকেই পালিয়েছে। শেষকালে সেই ঘুরঘুট্টি

অন্ধকারে দৌড়তে দৌড়তে একেবারে সোজা গঙ্গা গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে সাঁতার কাটতে কাটতে একেবারে কলকাতায়। কলকাতায় বেভা সাহেবের সোরার গদীবাড়ি গঙ্গার ঘাটের ওপর। সকাল বেলা সেখানে গিয়েই দাঁড়িয়েছিল কান্ত। আর তো কেউ নেই তখন তার। আর কলকাতাতে কে থাকবে কার, গোটা কয়েক চালা-ঘর, কয়েকটা পাকা বাড়ি। ফিরিঙ্গিদের কোম্পানী তখন সেই জলা-জঙ্গলেই বেশ কায়েম হয়ে উঠেছে।

বেভারিজ সাহেব তখন পাল্কিতে চড়ে গদীবাড়ি দেখতে এসেছে।

জিজ্ঞেস করলে—হু আর ইউ? টুমি কে?

তখন কান্ত ইংরিজী বুলি জানতো না। কিছু ফার্সি পড়েছে সারদা পণ্ডিতের মক্তবে, আর কিছু বাংলা বরদা পণ্ডিতের পাঠশালায়। অথচ আশ্চর্য, শেষকালে সেই কান্তই বেশ গড়-গড় করে সাহেবদের সঙ্গে ইংরেজী বুলি আউড়ে যেত। চাকরিতে টিঁকে থাকলে কান্তর আরো উন্নতি হতো হয়তো। বেভারিজ সাহেবের নেক্-নজরে পড়ে অনেক কিছু করে নিয়েছে। কিন্তু কাল হলো বশীর।

বশীর মিঞা একদিন জিজ্ঞেস করেছিল—কত তলব্ পাস্ তুই এখেনে?

—তিন টাকা।

বশীর মিঞা নবাব-সরকারের লোক। নিজামতের পেয়ারের নোকর। চুড়িদার পায়জামার ওপর চুনোট করা মলমলের পিরান পরে। কাঁধে আবার কল্কার কাজ। বাহারে তেড়ি, পান-জর্দা-কিমাম খেয়ে মুখ লাল করা থাকে সব সময়। তলবের অঙ্ক শুনে হো-হো করে হেসে উঠলো। বললে—দূর। নবাব-নিজামতের খেদ্‌মত্‌গার পর্যন্ত রোজ তিন টাকা আয় করে।

—কীসে আয় করে?

—রিশ্‌শোয়াত্! ঘুষ! তোর নোকরিতে ঘুষ আছে?

কান্ত বললে—না, শুধু বকশিশ দেয় সাহেব—

তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে উঠলো বশীর, ঘুষ না হলে নোকরি করে ফয়দা কী? আমি তো তিনটে বিবি রেখেছি ওই ঘুষের জোরে। তলব তো পাই দশ টাকা। দশ টাকায় তিনটে বিবি পোষা চলে? তুই-ই বল্ না? তিন বিবির নোকর-নোকরানী আছে, বিবিদের বায়নাক্কা কি কম নাকি? সরাবের একটা মোটা খরচা আছে, পান-তামাকু কোন্‌টা নেই? দশ টাকায় চলে কী করে?

কান্তও বশীরের বড়লোকিপনার বহর শুনে হতবাক।

জিজ্ঞেস করলে—তুই দশ টাকায় চালাস্ কী করে?

বশীর মিঞা বললে—ঘুষ নিয়ে—

—তোকে ঘুষ দেয় কেন লোকে?

—ঘুষ না দিলে নবাব-কাছারিতে কারো কাজ হোক দিকিনি দেখি।

—তুই কি কাছারিতে কাজ করিস্?

—আরে না, নিজামতের খাস্ মোহরার আমার ফুফা। আমার ফুফাকে বলে দিলে তোরও নোকরি হয়ে যাবে নিজামতে—! তুই নোকরি নিবি?

—কিন্তু বেভারিজ সাহেব যে আমাকে খুব ভালোবাসে। গদীবাড়ির চাবি যে আমার হাতে থাকে!

বশীর মিঞা কান্তর বোকামি দেখে হাসবে কি কাঁদবে বুঝে উঠতে পারলে না।

—আরে নিজামতের নোকরির কাছে ফিরিঙ্গি সাহেবের নোকরি? ওরা তো

বিলাইত থেকে কারবার করতে এসেছে। সোরা কিনবে সুতো কিনবে আর দরিয়ার ওপারে চালান দেবে। ওদের কোম্পানী যখন উঠে যাবে তখন কী করবি? তখন বেভারিজ সায়েব তোকে খিলাবে? তখন তো ফ্যা-ফ্যা করে নোকরির চেষ্টায় ঘুরে বেড়াবি মুর্শিদাবাদের দফ্‌তরে—! ওরা তো আর হিন্দুস্তানে মৌরসী-পাট্টা নিয়ে জমীন্‌দারী করতে আসেনি—

কান্ত খবরটা শুনে সত্যিই ভয় পেয়ে গিয়েছিল। ফিরিঙ্গি কোম্পানী কারবার গুটিয়ে কালাপানি পাড়ি দিয়ে চলে যাবে?

—তা যাবে না? ওরা তো পয়সা লুঠতে এসেছে, পয়সা না-পেলেই চলে যাবে। পয়সা না পেলে কেউ ঝুট-মুট পড়ে থাকে? আবার যেখানে পয়সা কামাবে সেখানে চলে যাবে। ওদের কী? ওরা বেণের জাত, পয়সা কামিয়ে পাত্‌তাড়ি গুটিয়ে একদিন চলে যাবে। তখন ভোঁ-ভাঁ—মাঝখান থেকে তোর নোকরিটা খতম হয়ে যাবে—

সেই বশীর মিঞার কথাতেই বলতে গেলে কান্ত বেভারিজ সাহেবের চাকরি ছেড়ে দিয়ে এই নিজামত সরকারের চাকরিতে ঢুকেছে।

বশীর মিঞা বলেছিল—মন দিয়ে টিঁকে থাক তুই, এখন নতুন নবাব হয়েছে, আমার ফুফার বড় ইয়ার মনসুর-উল্‌-মুলক্‌ সিরাজ-উ-দ্দৌলা শা কুলি খান্‌ বাহাদুর হেবাত জং আলমগীর—

তা সেই চাকরিতে ঢুকতে-না-ঢুকতে প্রথম হুকুম হয়েছে হাতিয়াগড় থেকে সেখানকার রাণীবিবিকে মুর্শিদাবাদের হারেমে নিয়ে আসতে হবে। এনে কী হবে, কিছুই বলে দেয়নি বশীর মিঞা। নিজামতের হুকুম হচ্ছে হুকুম। দুটো সেপাই দিয়েছে কোতোয়ালি থেকে তার সঙ্গে, পালকি দিয়েছে, পালকি-বেহারা দিয়েছে, নিজামতি পাঞ্জা দিয়েছে।

—ও কান্তবাবু!

সেপাই দুটো গাছতলা থেকে ডাকছিল কান্তকে। কিন্তু তার আগেই সরাইখানার ভেতর থেকে মিহি গলায় আর একটা ডাক এল।

—বাবুজী!

সেই বাঁদীটা। বোরখার মুখের ঢাকনাটা ঈষৎ খুলে তাকে ডাকছে।

কান্ত কাছে গেল। আমাকে ডাকছো নাকি?

—বিবিজী গোসলখানায় গিয়েছিল, খানার কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম, বলছেন বাবুজীকে ডেকে আন্‌!

—আমাকে? কেন?

—তা জানি না হুজুর।

—মুসলমানি খানা খাবেন না বুঝি? তা আমি তো সেই জন্যেই কোতোয়ালীতে যাচ্ছি হিঁদু-খানার বন্দোবস্ত্‌ করতে—

বাঁদী বললে—না, তা নয় হুজুর, বিবিজী মুসলমানি খানা খাবেন আমাকে বলেছেন।

মুসলমানি খানা খাবে? হাতিয়াগড়ের রাণীবিবি হিন্দুর মেয়ে হয়ে মুসলমানের ছোঁয়া খাবে?

—তুমি ঠিক বলছো?

—জী হাঁ—আপনি ভেতরে আসুন, বিবিজী আপনার সঙ্গে একবার মোলাকাত্‌ করবেন—আপনি আসুন—

কান্ত একটু আড়ষ্ট হয়ে উঠলো। তারপর সামলে নিয়ে বললো—আচ্ছা। চলো—

ঠিক এই পর্যন্ত এসেই পাতাটা শেষ। এর পর আর নেই। অনেক খুঁজে খুঁজেও আর পাওয়া গেল না। পুরোন পুঁথি পড়ার এই একটা অসুবিধে। যেখানে ঠিক কৌতূহলটা ঘন হয়ে আসছে সেই জায়গাটাই বেছে বেছে পোকায় কাটে, সেই জায়গাটাই বেছে বেছে হারিয়ে যায়।

হঠাৎ পশুপতিবাবুর একটা চিঠি পেলাম।

তিনি লিখেছেন—বাড়ি মেরামত করতে গিয়ে পুঁথির আরো অনেকগুলো পাতা পাওয়া গিয়েছে, আপনি একবার এসে দেখে যাবেন—

পুরোন পুঁথি নিয়ে যাঁরা গবেষণা করেন তাঁরা জানেন এর মধ্যে অনেক রকম ভেজাল থাকে। একজন চণ্ডীদাস শেষকালে দশজন চণ্ডীদাসে পরিণত হতে পারে। তখনকার দিনে ছাপাখানা ছিল না। একহাজার পাতার একখানা পুঁথি একজন নকলনবীশকে পাঁচটা টাকা আর একখানা বাঁধিপোতা গামছা দিলেই নকল করে দিত। তারপর তার মধ্যে নিজের বিদ্যে বুদ্ধি শিক্ষা অশিক্ষা ঢুকিয়ে দিলে কারোর আর কিছু ধরার উপায় থাকতো না।

কিন্তু এ-পুঁথি অন্যরকম। এ কবি নিজের হাতেই লিখেছেন বলে মনে হলো। এমন কিছু বিখ্যাত কবিও নন। নকলনবীশের হাতের ছোঁয়াচ কোথাও পাওয়া গেল না। আর পশুপতিবাবু নিজেই বলছেন তাঁদের পূর্বপুরুষ উদ্ধব দাস। খাস-বিশ্বাস হলেও দাসই বটে। কিন্তু কবি বিনয়ী। বৈষ্ণব পদকর্তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে উদ্ধব দাসও নিজেকে ভক্ত হরিদাস বলে ঘোষণা করেছেন। দাসানুদাস। তিনি নিজে কিছুই নয়। নিজের জন্যে তিনি কিছুই করেননি। এই জমি, এই সম্পত্তি, এই ভোগ-ঐশ্বর্যবিলাস তার কিছুই তাঁর প্রাপ্য নয়। তিনি এই সংসারে ঈশ্বরের কৃপায় এসেছিলেন আবার একদিন ঈশ্বরের কৃপাতেই বিদায় নেবেন। এ-সংসারে কে কার? এ-সংসারই তো তাঁর লীলাভূমি গো।

আমার খুব আগ্রহ ছিল এই বেগম মেরী বিশ্বাস সম্বন্ধে কিছু জানতে। কে এই মেরী বিশ্বাস। অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙলার ইতিহাসে লর্ড ক্লাইভের সঙ্গে এই বেগমের কীসের সম্পর্ক। এই হাতিয়াগড়ের রাণীবিবিই বা কে? যে-কান্ত ছেলেটি নিজামত্ নবাব-সরকারের হুকুম পেয়ে কোন হিন্দু রাণীবিবিকে নিয়ে কাটোয়ার সরাইখানাতে উঠলো, ও-ই বা কে? উদ্ধব দাসই বা এদের কথা জানলো কী করে? সে এত বড় মহাকাব্য লিখতে গেল কেন? যে-ইতিহাস ছোটবেলা থেকে পাঠ্য-পুস্তকে পড়ে এসেছি এর সঙ্গে তো তা মিলছে না। উদ্ধব দাস এ 'ইতিহাস' কোথায় পেলে?

পড়তে পড়তে অনেক রাত হয়ে এল। তারপর কলকাতার অন্ধকার ঘরের মধ্যে একে একে পৃথিবীর সমস্ত লোক ঘুমিয়ে পড়লো। শুধু আমি একলা জেগে রইলাম, আর জেগে রইলো ইণ্ডিয়ার অষ্টাদশ শতাব্দী। অষ্টাদশ শতাব্দীর সেই থেকে আর্তকণ্ঠের এক করুণ চিৎকার ভেসে উঠলো। সে-কান্না সেদিন শুনতে পায়নি। আলীবর্দীর হারেমের মধ্যে সেই একক-কান্না এত বছর পরে

আবার যেন পুঁথির পাতা বেয়ে আমার কানে এসে পৌঁছলো। কে কাঁদছে? আজকে চারিদিকে যখন সবাই হাসছে, তখন কাঁদছে কে?

কোথাও তো কেউ জেগে নেই। অষ্টাদশ শতাব্দী, ঊনবিংশ শতাব্দী, বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পেরিয়ে এসেও আমরা তো সবাই ঘুমিয়েই পড়েছিলাম। যাঁরা পাহারা দেবার ছিল তাঁরা সবাই তো বিদায় নিয়েছেন। রামমোহন বিদ্যাসাগর রবীন্দ্রনাথ, কেউ নেই পাহারা দেবার। মাঝখানে দু দু'টো বড় যুদ্ধ আমরা পার হয়েছি। দু'শো বছর ব্রিটিশের তাঁবে কাটিয়ে আমাদের মেরুদণ্ড বেঁকে গিয়েছে। আমরা নির্বিঘ্নে অনাচার করছি, অত্যাচার করছি, চুরি করছি, ব্ল্যাকমার্কেট্ করছি, লোক-ঠকানোর কারবারে আমরা বেশ রীতিমত পাকা হয়ে উঠেছি। ঘটনাচক্রে আমাদের দেশ স্বাধীন হয়েছে বটে, কিন্তু আমরা তো স্বাধীন হইনি। দারিদ্র্য আর অভাব আর অনাচার থেকে তো মুক্তি পাইনি! কিন্তু তবু তো আমরা কেউ-ই কাঁদিনি। তবে এমন করে আজ কাঁদছে কে?

অথচ আমরাই এতদিন খদ্দর পরেছি, চরকা কেটেছি, লবণ-সত্যাগ্রহ করেছি। এতদিন মেদিনীপুরে একটার পর একটা বিলিতি ম্যাজিস্ট্রেট-সাহেবদের গুলি করে মেরেছি। রাইটার্স বিল্ডিং-এ ঢুকে সাহেবদের খুন করে ফাঁসি গিয়েছি। পাড়ায়-পাড়ায় লাঠিখেলা কুস্তি-করার আখড়া বানিয়েছি। 'বন্দে মাতরম' শুনলে আমাদের রক্ত নেচে উঠেছে। সে-সব কথা তো স্বাধীন হবার পর আমরা ভুলেই গিয়েছিলাম। ১৯৪৭ সালের পর থেকে আমি আর পশুপতিবাবুরা তো খদ্দরপরা ছেড়েই দিয়েছি। লুকিয়ে লুকিয়ে বিলিতি জিনিষ কিনতে পেলে বর্তে গিয়েছি। লাঠি-খেলা আর কুস্তির আখড়া তুলে দিয়ে সেখানে আমরা সরস্বতীপুজো করি। পুজোর ঠাকুরের সামনে আমরা লাউড্স্পীকার লাগিয়ে সিনেমার সস্তা গান মাইক্রোফোনে বাজাই। আমরা ধুতি ছেড়ে দিয়ে সরু-পা-ওয়ালা প্যাণ্ট পরি। ট্র্যান্জিস্টার-সেট্ কাঁধে ঝুলিয়ে মডার্ন হয়ে ঘুরে বেড়াই। কাঁদবার তো আমাদের সময় নেই! তবে এমন করে আজ কাঁদছে কে?

হঠাৎ নজরে পড়লো বিরাট দমদম্-হাউসের এককোণে বেগম মেরী বিশ্বাস একা জেগে জেগে কাঁদছে।

উদ্ধব দাস তাঁর কাব্যের শেষ সর্গে 'শান্তিপর্বে'র ভেতর বেগম মেরী বিশ্বাসের যে-চিত্র এঁকেছেন তা দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। অষ্টাদশ শতাব্দীর মানুষ আজ এই বিংশ-শতাব্দীর মানুষের মতই সেদিন নিজেদের বুঝতে পারেনি। একদিন হাতিয়াগড়ের রানীবিবিকে পরোয়ানা পাঠিয়ে নবাবের হারেমের মধ্যে এনে পুরেছে। সে ছিল লালসা আর রূপের আকর্ষণ। মেয়েমানুষের দেহ আর অর্থ উপার্জনের কলা-কৌশল আয়ত্ত করাকেই সেদিন চরম মোক্ষ বলে জ্ঞান করেছে সবাই। টাকা চাই। যেমন করে হোক টাকা চাই-ই। জীবন অনিত্য। এই জীবদ্দশাতেই আমার ভোগের চরম পরিতৃপ্তি চাই। বাদশার কাছ থেকে পাওয়া খেতাব চাই। নবাবের পেয়ারের পাত্র হওয়া চাই। তাহলেই বুঝলাম আমার সব চাওয়া-পাওয়া মিটলো। তাহলেই বুঝলাম আমার মোক্ষ লাভ হলো।

ঠিক এই অবস্থায় বেগম মেরী বিশ্বাস কাঁদছে কেন?

মানুষ যা চায় সব তো পেয়েছিল মরিয়ম বেগমসাহেবা। গ্রামের অখ্যাত এক নফরের মেয়ে হয়ে জন্মে একদিন চেহেল্-সুতুনের বেগমসাহেবা হয়েছিল। তারপরে হলো কর্নেল ক্লাইভের প্রিয়পাত্রী। তখন কর্নেল ক্লাইভ মানেই বাঙলা মুলুকের নবাব। তবু কেন সে কাঁদে?

মরিয়ম বেগমসাহেবারা যে কেন কাঁদে তা জানতে হলে উন্ধব দাসের কাব্যের আরো অনেক পাতা ওল্টাতে হবে।

যে-কান্ত একদিন নিজামতের হুকুমত্ পেয়ে হাতিয়াগড়ের হিন্দু রানীবিবিকে এই চেহেল্-সুতুনে নিয়ে এসেছিল তাকে আর তখন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। বশীর মিঞা ছুটোছুটি করছে চারদিকে। সেই কাফের কান্তটা কোথায় গেল?

ওদিকে চারদিকে কড়া পাহারা বসেছে। চেহেল্-সুতুনের ভেতর থেকে কোনো জিনিস না বাইরে বেরিয়ে যায়। মীরজাফর আলি সাহেব কড়া হুকুম দিয়ে দিয়েছে কোতোয়ালীতে। হারেমের ভেতরে খোজা-সর্দার পীরালি খাঁ তীক্ষ্ন নজর রেখেছে বেগমসাহেবাদের ওপর। বাইরে থেকে জাল পাঞ্জা নিয়ে কেউ যেন না ভেতরে ঢুকতে পারে। যদি কেউ ঢুকে পড়ে তো তাকে সোজাসুজি মীরজাফর আলি সাহেবের কাছে নিয়ে যাওয়া হবে। ফিরিঙ্গী-কোম্পানীর কাছ থেকে হুকমত্ এসেছে যতক্ষণ না কর্নেল ক্লাইভ সাহেব নিজে এসে তদন্ত করেন ততক্ষণ একটি জিনিসও কারো সরাবার এক্তিয়ার নেই। এ হুকুমতের নকল বাইরেও পাঠানো হয়েছে। মুৎসুদ্দিয়ান, কানুনগোয়ান, চৌধুরীয়ান, করোরিয়ান, জমিদারান পং নসরৎসাহী ওরফে হাতিয়াগড় সরকার ও পং হোসেন প্রতাপ সরকার সিলেট জায়গীর নবাব সম্সেদ্দোলা সুবে বাঙলা। তোমরা সকলে অবগত হও যে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কর্নেল ক্লাইভ মুর্শিদাবাদে আগত হইতেছেন। উক্ত দিবসে উক্ত মুৎসুদ্দিয়ান, কানুনগোয়ান, চৌধুরীয়ান, করোরিয়ান, জমিদারান, প্রভৃতি সকলে তাঁহার নিকট হাজিরা দিয়া সরকারী হুকুমতের মর্যাদা নির্বাহ করিবা।

মোতালেক মুক্সুবাদ কাজির দেউড়ি,
—জনাব মনসুর আলি মেহের মোহরার॥

এই পরোয়ানা বেরোবার পর থেকেই সবাই উদ্গ্রীব হয়ে বসে আছে। এবার কী হবে! এবার কে নবাব হবে! যে নবাবকে খুন করেছে তার কী হবে! কিন্তু কারো মুখে কোনও কথা নেই। সবাই ভয়ে ভয়ে মুখ বন্ধ করে ঘরের ভেতরে দরজায় হুড়কো এঁটে বসে আছে।

তবু রাস্তাতেও ভিড়ের কমতি নেই। মনসুরগঞ্জ-হাবেলিতে এসে উঠেছে মীরজাফর আলি খাঁ। উঠেছে তার ছেলে মীরণ আলি খাঁ। ফটকের সামনে কড়া পাহারা বসে গেছে। বন্দুক কাঁধে নিয়ে তারা দিন-রাত পাহারা দেয়। জগৎশেঠজী আসে, হাতিয়াগড়ের ছোটমশাই আসে, ডিহিদার রেজা আলি আসে, মেহেদী নেসার আসে। পরামর্শ আর ষড়যন্ত্রের জাল বোনা হয়। কে নবাব হবে, ক্লাইভ সাহেব কাকে নবাব করবে! লোকের কৌতূহলের শেষ নেই!

বহুদিন আগে একদিন একটা পালকি এসে থেমেছিল চেহেল্-সুতুনের ফটকে। নিজামতের চর কান্ত সরকার সেদিন পালকিটাকে চেহেল্-সুতুনের ফটক পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে নিজের আস্তানায় চলে গিয়েছিল। আর কেউ জানতো না সে-ঘটনাটার কথা। বড় গোপনে সে-ব্যাপারটা সমাধা হয়েছিল বশীর মিঞার সঙ্গে। কিন্তু যারা জানতো না তারা একটু কৌতূহলী হয়ে উঠেছিল। নবাবী হারেম। সে বড় তাজ্জব জায়গা। আগে কান্ত সরকারের এ-সম্বন্ধে কোনও ধারণা ছিল না। এত তার অলি-গলি, এত তার কানুন-কিসমত্। দুনিয়ার সমস্ত আইন-কানুনের বাইরে যেন চেহেল্-সুতুন। সেখানে খুন হয়ে গেলেও নবাবের খেদ্মতে তার কোনও আর্জি নেই। অন্ধকারে সেখানে তোমাকে গলা টিপে খুন করে মেরে

ফেললেও কেউ প্রতিকার করবার নেই। সেখানে তুমি যদি একবার যাও তাহলে আর কখনও বাইরে আসবার কথা মুখে আনতে পারবে না। ইন্তেকাল পর্যন্ত তুমি সেখানে বন্দী হয়ে রইলে।

পালকিটা গিয়ে চবুতরার সেই কোণের দিকে দাঁড়ালো।

কান্ত সেই দিকেই সেদিন হাঁ করে তাকিয়ে ছিল। বশীর মিঞার কথাতে যেন তার ঘুম ভাঙলো।

বশীর মিঞা বললে—লে চল্, ওদিকে আর দেখিস নে, নবাবের মালের দিকে নজর দিতে নেই, কেউ জানতে পারলে তোর গর্দান যাবে!

কথাটা কানে গিয়ে বিঁধেছিল খট্ করে।

—কী বললি তুই?

বশীর হেসে উঠলো খিল্ খিল্ করে। চোখ মট্‌কে বললে—নবাবের মাল—

—তার মানে?

কান্তর আপাদ-মস্তক রি-রি করে উঠলো।

—কী বলছিস তুই? ও তো হাতিয়াগড়ের রাণীবিবি! ও তো হিন্দু-বিবি রে—

বশীর মজা পেয়ে গেল। বললে—হিন্দুদের বিবিরাই তো মজাদার মাল্ রে—

কান্তর মনে হলো এক চড়ে বশীর মিঞার মুখখানা ঘুরিয়ে দেয়। এমন জানলে কি আর সে রাণীবিবিকে এমনভাবে এত দূর রাস্তা সঙ্গে করে পাহারা দিয়ে আনতো। বশীর মিঞা হয়তো রসিকতার চোটে ভুলেই গিয়েছিল যে কান্ত হিন্দু। কান্তর দিদিমা মুসলমানদের ছুঁয়ে ফেললে গঙ্গায় স্নান করে ফেলতো। বড়-চাত্‌রার জমিদারবাবুরা ফৌজদারের কাছারিতে নাজিরের চাকরি করতো বটে কিন্তু সেরেস্তার কাজ সেরে বাড়িতে এসে কাপড়-পিরেন সব ছেড়ে ফেলতো। তারপর স্নান করে শুদ্ধ হতো। আর কান্ত আজ নিজামতে চাকরি করতে এসেছে বলে এ-কথাও মুখ বুঁজে সহ্য করতে হলো।

—কিন্তু নবাবের কি মেয়েমানুষের অভাব যে হাতিয়াগড়ের রাণীবিবিকে খুঁজে এনে এখানে চেহেল্-সুতুনে পুরতে হবে?

—অভাব হবে কেন? তুই বড় বেকুবের মত কথা বলিস্! একটা মেয়েমানুষে কি কারো চলে? এই দ্যাখ না, আমার তো তিন-তিনটে আওরাৎ। একটু একঘেয়ে লাগলেই মুখ বদলে নিই। দুনিয়ায় মেয়েমানুষের পয়দা হয়েছে কেন বল্ তো?

—তার মানে?

এ-রকম অদ্ভুত প্রশ্ন কান্তর মাথায় কখনও আসেনি। এ নিয়ে আলোচনা করতেও তার যেন একটু লজ্জা হলো।

বশীর মিঞা বললে—না, তোর জানা দরকার, নবাবদের এত বেগম থাকে কেন! খোদাতালার বেহেস্তে যেমন হুরি-পরী থাকে নবাবদের হারেমেও তেমনি বেগম-বাঁদী থাকে। কেউ আসে খোরাসান থেকে, কেউ কান্দাহার থেকে, কেউ চাঁটগা থেকে, কেউ কালাপানির ওপার থেকে। আমার তলব বাড়লে আমি তো ইয়ার ঠিক করেছি একটা ইহুদী আওরাৎ রাখবো। ইহুদী আওরাৎ দেখেছিস?

কান্তর বিরক্তি লাগছিল। বললে—ও-সব কথা থাক এখন—

সেদিন ওই পর্যন্তই কথা হয়েছিল বশীর মিঞার সঙ্গে। হাতিয়াগড়ের রাণীবিবিকে চেহেল্-সুতুনের ভেতরে পাঠিয়ে দিয়ে সেদিনকার মত কান্তর ছুটি

হয়ে গিয়েছিল। আবার কোনও নতুন হুকুম হলেই বশীর মিঞা তাকে জানাবে বলেছিল। কিন্তু তারপর হুড়মুড় করে সব কী যেন ঘটে গেল। তখন যা কিছু ঘটেছে সব তার চোখের আড়ালে। তখন সে বেগম সেজে বোরখা পরে চেহেল্-সুতুনের ভেতরে লুকিয়ে আছে মরিয়ম বেগম সেজে।

তখন সবাই জানে কান্তই মরিয়ম বেগম। বোরখা পরার পর কেউ আর তাকে চিনতে পারেনি।

মরিয়ম বেগমকে ধরবার জন্যে তখন সমস্ত মুর্শিদাবাদে তোলপাড় পড়ে গেছে। কোথায় মরিয়ম বেগমসাহেবা? মরিয়ম বেগমসাহেবা কোথায়?

মুর্শিদাবাদে এসে পৌঁছেছে কর্নেল ক্লাইভ। জোর হুকুম দিয়েছে মরিয়ম বেগমসাহেবাকে চাই।

অথচ চেহেল্-সুতুনের ভেতরে অন্য সব বেগমসাহেবারা তখন সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। চোখে সুর্মা দিয়েছে। বুকে কাঁচুলি পরেছে। পায়ে পায়জোড়। সবাই সার বেঁধে অপেক্ষা করছে কখন কার ডাক পড়বে আম-দরবার থেকে।

কিন্তু তখনও কাঁদছে কে?

মনে আছে একদিন আবার কান্ত গিয়ে হাজির হয়েছিল বশির মিঞার কাছে।

বশীর মিঞা বলেছিল—আবার তোর কীসের দরকার?

কান্ত বলেছিল—একটা কথা ছিল তোর সঙ্গে। একটু আড়ালে আসবি, চুপি চুপি বলবো—

বশীরের যেন এ-সব কথা শোনবার সময়ও ছিল না। আগ্রহও ছিল না। তার তখন অনেক কাজ। তাড়াতাড়ি বললে—তোর নোকরির কথা আমি কিছু বলতে পারবো না।

—আমি চাকরির কথা বলছি না—

—নোকরির কথা বলছিস না তো কী কথা বলছিস?

চাকরির কথা কান্তর কিছু বলবার ছিলও না। বড়-চাতরা থেকে একদিন যখন চলে এসেছে তখন তার কাছে ফিরিঙ্গী কোম্পানী যা, নবাব-নাজিমও তাই। চাকরিই হয়তো তার কপালে নেই। যেমন অনেক জিনিসই তার কপালে নেই। এখন মুর্শিদাবাদের মসনদে কেউ বসুক আর না-বসুক, তাতে কিছুই আসে যায় না তার।

—কী বলবি জলদি বল্!

—সেই হাতিয়াগড়ের রাণীবিবিকে সেদিন নিয়ে এসেছিলাম, তার কথা বলছি—

—সে তো হারেমে আছে। তার সঙ্গে তোর কীসের দরকার ইয়ার?

—তার সঙ্গে একটু দেখা করতে পারলে ভালো হতো—

—তোর কি মাথা-খারাপ! তুই হারেমের মধ্যে যাবি? খোজা-সর্দার তোর গর্দান রাখবে?

কান্তর মুখখানা আরো করুণ হয়ে উঠলো। বললে—তুই চেষ্টা করলে পারিস, তোর ফুফা মনসুর আলি সাহেব থাকতে কেউ তোকে কিছু বলবে না—তোর হাত দুটো ধরে বলছি ভাই, একটু দয়া কর্ তুই—

হঠাৎ বশীর মিঞার কেমন সন্দেহ হলো।

—কেন বল্ তো? তোর এত টান কেন? তুই কি রাণীবিবিকে দেখেছিস নাকি?

—হ্যাঁ—

—কী করে দেখলি? সেপাই দিয়ে বোরখা পরিয়ে আনবার কথা ছিল, দেখলি কী করে? মুখ দেখেছিস?

—হ্যাঁ।

বশীর মিঞা যেন ক্ষেপে লাল হয়ে উঠলো। এই জন্যেই তো কাফেরদের দিয়ে এই সব কাজ করাতে চায়নি মনসুর আলি সাহেব। নেহাৎ পীড়াপীড়ি করলে বশীরটা, তাই এই কাজের ভার দেওয়া। কোথা থেকে কোন হিন্দুর বাচ্চাকে ধরে এনে কিনা বললে—একে নোক্‌রি দাও—!

বশীর মিঞার তখন সত্যিই অনেক কাজ। মাথা ঘুরে যাবার মত অবস্থা। নবাব মারা যাবার পর থেকে চারদিক থেকে শকুনেরা এসে ওৎ পেতে বসে আছে লুঠের মালে ভাগ বসাবে বলে। মহম্মদী বেগ্‌ নিজে মাল সাবাড় করেছে, সুতরাং তারই যেন পাওনাটা বেশি। ওটা কে না করতে পারতো? নবাবকে ধরে দুটো হাত দড়ি দিয়ে বেঁধে একটা চাকু বুকের ওপর চালিয়ে দিয়েছে। একবার দু'বার তিনবার। একবারেই মামলা ফতে হয়ে গিয়েছিল। তবু সাবধানের মার নেই। হাত দুটো খুনে লাল। ভেবেছিল, মীরণের যখন দোস্ত সে, তখন দোস্তালির হক্‌দার হতে পারবে সে। কিন্তু সে গুড়ে বালি। হক্‌দার এই ক'দিনেই অনেক পয়দা হয়েছে। সবাই মীরজাফর আলি খাঁর দিকে হাঁ করে চেয়ে আছে। সে-ই যেন বেহেস্তের আফ্‌তাব পাইয়ে দেবে!

কান্ত বললে—একটিবার শুধু দেখা করিয়ে দে ভাই বশীর—আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিল রাণীবিবি—

—তোর সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিল? বলছিস কী তুই? তুই রাণীবিবির সঙ্গে কথাও বলেছিস নাকি—?

—হ্যাঁ!

যেন অমার্জনীয় অপরাধ করে ফেলেছে কান্ত এমনি করে তার দিকে চাইলে বশীর।

—তুই যে কথা বলেছিস এটা কেউ জানে? কেউ দেখেছে?

কান্ত বললে—না—

—কেউ দেখেনি তো?

—না, আমি লুকিয়ে দেখা করেছি—

—কিন্তু তুই তো জানিস নবাবের হারেমের বিবিদের সঙ্গে কারো মোলাকাত করার এক্তিয়ার নেই, দেখা করা গুণাহ্‌—

কান্ত বললে—কিন্তু আমাকে যে রাণীবিবি ডেকে পাঠিয়েছিল ভাই—আমার কী দোষ।

—তোকে ডেকে পাঠিয়েছিল? কোথায়? কী জন্যে?

কান্ত বললে—কাটোয়াতে!

—কী কথা বললে রাণীবিবি?

এবার যেন বশীর মিঞাও কান্তকে হিংসে করতে লাগলো। এমন জানলে বশীর মিঞা নিজেই তো হিন্দু-কাফের সেজে গিয়ে রাণীবিবিকে নিয়ে আসতো। কিন্তু ওদিক থেকে হুকুম ছিল, রাণীবিবিকে আনতে পাঠাবার জন্যে যেন নবাব-নিজামত-সরকারের হিন্দু আম্‌লা পাঠানো হয়। নইলে এ-সব কাজের জন্যে কখনো লোকের অভাব হয় নাকি।

—বলবো তোকে সব, আল্লার-কিরে বলছি সব বলবো, কিন্তু তার আগে

আমাকে একবার দেখা করিয়ে দে রাণীবিবির সঙ্গে। হারেমের ভেতরে গিয়ে একবার শুধু বাইরে থেকে একটা কথা বলে আসবো—

—কী কথা?

কান্ত বললে—কাটোয়ার সরাইখানার সামনে একটা পাগলা-লোক এসে সেদিন খুব গান গেয়েছিল, সবাই খুব খুশী তার গান শুনে, রাণীবিবি তার নামটা জানতে চেয়েছিল আমার কাছে। আমি নামটা জেনে এসে আর বলতে পারিনি তাকে। বলবার সুযোগ হয়নি—

—কে সে লোকটা?

—সে একটা পাগ্‌লা-কছমের লোক। কিন্তু খুব মজাদার গান গাইতে পারে ভাই। আমাকে তার নামটা জেনে আসতে বলেছিল রাণীবিবি। নামটা জেনেও এসেছিলাম, কিন্তু রাণীবিবিকে তা বলা হয়নি—সেইটে একবার হারেমের ভেতরে গিয়ে বলে আসবো—একবার শুধু যাবো ভেতরে, আর নামটা রাণীবিবিকে বলেই চলে আসবো—মাইরি বলছি, ভেতরে আমি থাকবো না বেশিক্ষণ—

বশীর মিঞা চুপ করে কী যেন ভাবতে লাগলো।

—এই তোর পায়ে পড়ছি ইয়ার, আজকে একবার দেখা না-করতে পারলে হয়তো জীবনে আর দেখা করা হবে না। অথচ কথা দিয়ে কথা রাখতে পারলুম না বলে মনটায় বড় আফশোষ হচ্ছে ভাই, এ আফশোষ আমার মরণেও যাবে না—

—কিন্তু লোকটা কে? কার নাম জানবার জন্যে রাণীবিবির এত নাফ্‌ড়া?

কান্ত বললে—বলছি তো একটা পাগলা-ছাগলা লোক—

—জাসুস্‌ নয়তো?

—জাসুস্‌? তার মানে?

—ফিরিঙ্গীদের গোয়েন্দা-ফোয়েন্দা নয়তো? ওরা তো চর লাগিয়েছে তামাম মুর্শিদাবাদে—

—আরে না, জাসুস্‌ হতে যাবে কেন? চরই বা হবে কেন?

—তা নাম কী তার?

উদ্ধব দাস!

নামটা শুনে কিছুই বোঝা গেল না। মন্‌সুর আলি মেহের সাহেবের মোহরার-দফ্‌তরে ও-নামের কোনো চর তো নেই। সকলের নামই মুখস্থ করে রেখেছে বশীর মিঞা। উদ্ধব দাস তাহলে হয়তো কোনো বাউল-ফকীর হবে। বাউল-ফকীরদের মুলুক এই বাঙলা মুলুক। সব বাঙালীর বাচ্চাই বাউল-ফকীর ভেতরে ভেতরে। ওরা রাজ্য চায় না, মস্‌নদ চায় না, আওরাত চায় না, দৌলত চায় না, শুধু চায় আল্লাতালার দোয়া। তাজ্জব জাত এই বাঙালীর বাচ্চারা! আল্লাতালার নাম করতে করতে বাদশাহী পর্যন্ত চলে গেলেও এদের খেয়াল থাকে না।

বশীর মিঞা বললে—আচ্ছা চল্‌, খোজা-সর্দারকে বলে ভেতরে নিয়ে যাচ্ছি তোকে, কিন্তু হুঁশিয়ার, বেশিক্ষণ থাকবি না—

কান্ত বললে—না ভাই বশীর, কথা দিচ্ছি বেশিক্ষণ থাকবো না—

তারপর কোণের ফাটকটার কাছে গিয়ে বললে—আয়—

ফাটকের সামনে পাহারা দিচ্ছিল কে একজন। বশীর মিঞা তাকে পাঞ্জা দেখাতেই ভেতরে যেতে দিলে। লম্বা সুড়ঙ্গ মতন রাস্তা। মাথার ওপরে পাত্‌লা ইটের ছাদ। সেটা পেরিয়ে আর একটা ফাটকের কাছে আসতেই আর

একজন মুখোমুখি দাঁড়ালো। বশীর মিঞা বুক ফুলিয়ে এগিয়ে গেল। ভয়ডর কিছু নেই। এই পথ দিয়েই হারেমে যাবার রাস্তা। দু'পাশে ঘুলঘুলির মতন গর্ত। ঘুলঘুলির মধ্যে পায়রা বাসা বেঁধেছে। সামনে দিয়ে কারা আসছে। তারা বাইরে যাবে।

বশীর মিঞা পাহারাদারকে জিজ্ঞেস করলে—পীরালি কোথায় রে?

লোকটা কী যেন বললে। বশীর মিঞা তাকে একপাশে ডেকে কানে-কানে কী বলতে লাগলো। হাত-মুখ নেড়ে দু'জনের কী সব কথাও হলো। দূর থেকে কান্ত কিছুই শুনতে পেলে না। বশীরের ইঙ্গিতে কাছে যেতেই বশীর বললে—দেখিস্ হুঁশিয়ার, ঝট্‌পট্ চলে আসবি, আর তোর কাছে টাকা আছে?

কান্ত বললে—টাকা? কীসের টাকা?

—টাকা লাগবে না? তোকে ঢুকতে দিচ্ছে যে, পীরালিকে ঘুষ না দিলে যে চেয়েই দেখবে না তোর দিকে—

—টাকা তো সঙ্গে নেই, তলব পেয়ে পরে দিতে পারি!

বশীর মিঞা বললে—দূর, নগদ ছাড়া ঘুষ হয় কখনো! ঘুষের কারবার কখনো বাকিতে চলে?

বলে নিজের পিরানের জেব্ থেকে টাকা বার করে লোকটার হাতে দিলে। সঙ্গে সঙ্গে একটা লম্বা সেলাম করলে লোকটা কান্তকে। বললে—চলো,—

লোকটার পেছন-পেছন কান্ত এগিয়ে যেতে লাগলো আর একটা ইট-বাঁধানো রাস্তা দিয়ে।

কিন্তু যতই ভেতরে যেতে লাগলো ততই অবাক হবার পালা কান্তর। ভেতরে তখন বোধহয় খুব গোলমাল চলছে। কারা বোরখা পরে সামনের দিকে আসছিল। লোকটার পেছনে দাঁড়িয়ে কান্ত তাদের পথ করে দিলে। আবার পেছন থেকেও দৌড়তে দৌড়তে দুজন লোক আসছিল। তারা চেঁচাতে লাগলো—ফিরিঙ্গীলোগ আ গয়া।

—কে এসেছে?

—কলকাতা-কুঠির টুপিওয়ালা সাহেবলোগ্!

কথাগুলো যেন বিদ্যুতের মত ক্রিয়া করলো চারদিকে। কোথা থেকে আর এক দল লোক বেরিয়ে আসতে লাগল পিলপিল্ করে। তাদের কথাবার্তা থেকে কিছু বোঝা গেল না।

কিন্তু কান্ত জানতেও পারলে না মুর্শিদাবাদের গঙ্গার এ-পারে তখন মানুষের ভিড়ে তিল কোথাও ধরাবার জায়গা নেই আর। সারা দেশ ঝেঁটিয়ে মানুষ এসেছে ইতিহাসের আর এক মজা দেখতে। এতদিন যারা ঘরের হুড়কো এঁটে মুখে কুলুপ লাগিয়ে বসে ছিল, তারা সবাই গঙ্গার ঘাটে এসে ভিড় জমিয়েছে। এসেছে! ফিরিঙ্গী-কোম্পানীর সাহেবরা এসেছে। আর ভয় নেই। এবার ঘরের মেয়েছেলে নিয়ে নিশ্চিন্তে গেরস্থালি করবো। জোর করে কেউ কল্‌মা পড়াবে না। একসঙ্গে দূর থেকে পালতোলা ক'টা জাহাজ বেশ গম্ভীর চালে এগিয়ে আসতে

লাগলো। মুর্শিদাবাদের মানুষ আনন্দে লাফিয়ে উঠলো সেই দিকে চেয়ে। কাউকে চিনতে পারবার জো নেই। লাল-লাল মুখ সব। গোরা-পল্টন। সব সুদ্ধু গোটা তিরিশেক লোক হবে, তার বেশি নয়।

ক্লাইভ সাহেবের কেমন ভয় করতে লাগলো। সবাই যদি একটা করে ঢিল ছুঁড়ে মারে তাহলেই তো আর তাদের দেখতে হবে না। পাশেই গভর্নর ড্রেক সাহেব। মেজর কিলপ্যাট্রিক, মেজর গ্র্যাণ্ট্, মিস্টার ম্যানিংহাম, অমিয়ট, স্ক্র্যাফটন, ওয়াটসন। আর পেয়ারের মুন্সী নবকৃষ্ণ। আরো অনেকে। সামনের ফৌজীদল আস্তে আস্তে সহরে ঢোকবার চেষ্টা করতে লাগলো। আর সঙ্গে সঙ্গে মুর্শিদাবাদের মানুষ শাঁখ বাজাতে, উলু দিতে লাগলো।

কান্ত দেখে, ক্লাইভ সাহেব পাশে দাঁড়ানো মীরজাফর আলিকে জিজ্ঞেস করলে —ওরা কী বলছে? ওরা কারা? ও কিসের সাউণ্ড?

মীরজাফর বললে—ও কিছু না কর্ণেল, ওরা সবাই হিন্দু, আপনারা আসছেন শুনে ওদের খুবই আনন্দ হয়েছে, আনন্দ হলেই ওরা ওই রকম চিল্লাচিল্লি করে—

তখন সবাই আরো সামনে এগিয়ে এল। আরো জোরে শাঁখ বেজে উঠলো। আরো জোরে উলু দিতে লাগলো মুর্শিদাবাদের মানুষেরা। উ-লু-লু-লু-লু-লু—

সেইখানে সেই নিজামত-হারেমের সামনে দাঁড়িয়েই কান্ত যেন আর এক পৃথিবীতে পৌঁছে গেছে। ছোট বেলা থেকে বড় হওয়ার বৈচিত্র্য দেখতে দেখতে আর অনুভব করতে করতে বিচিত্রতর এক জগতের মধ্যে যেন সে ঢুকে পড়েছে। সেই বড়-চাতরা, সেই চৌধুরীদের চক-মিলান বাড়ি আর সেই বর্গী। সে যেন তার অতীত। সেই অতীতটার ভিতের ওপর তার ভবিষ্যতের সৌধ গড়তে গিয়ে দেখেছিল, কলকাতার বেভারিজ সাহেবের সোরার গদীবাড়িটা বেশ মজবুত করে গেঁথে তুলেছে সে। সেটা যখন ভেঙে গেল, তখন আর নতুন করে গড়বার কিছু ছিল না তার। সেও ওই হাতিয়াগড়। হাতিয়াগড়ের একটা বাড়িতে গিয়ে বিয়ের পিঁড়িতে বসবার স্বপ্নও দেখেছিল সে। কিন্তু ইচ্ছে থাকলেই কি সবকিছু হয়! না সবকিছু থাকলেই ইচ্ছে হয়। আসলে ইচ্ছের সঙ্গে ইচ্ছে-পূরণের কোনো সম্পর্কই নেই।

হাতিয়াগড়ের রাণীবিবি সেই কথাই জিজ্ঞেস করছিল কাটোয়াতে।

—সবই যদি ঠিক ছিল তো বিয়ে হলো না কেন?

কান্ত বলেছিল—আমার যে একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল যেতে—

রাণীবিবি অবাক হয়ে বলেছিলেন—সে কি? মানুষের খেতে দেরি হতে পারে, ঘুমোতে যেতেও দেরি হতে পারে, কিন্তু তা বলে তুমি বিয়ে করতে যেতেই দেরি করে ফেললে? ঘুমিয়ে পড়েছিলে বুঝি?

কান্ত লজ্জায় পড়লো। রাণীবিবি যে তার সঙ্গে এমন কথা বলবেন, তা সে কল্পনাও করতে পারেনি। রাণীবিবির মুখখানা একেবারে খোলা। মানে তার মত অচেনা পুরুষমানুষের সঙ্গে দেখা করতে এতটুকু সঙ্কোচও নেই। আর তাছাড়া রাণীবিবির বয়েসটা যে এত কম হবে, তাও তো ভাবতে পারেনি সে। বেশ জ্বলজ্বলে টাটকা সিঁদুর রয়েছে মাথার সিঁথিতে। সকাল বেলা স্নান করে চুল এলো করে দিয়েছেন পিঠের দিকে। বাঁদীটা বোধহয় তাম্বুল-বিহার দিয়ে পান সেজে দিয়েছিল, তাই চিবোচ্ছে।

আপনার খাওয়ার কোনো অসুবিধে হয়নি তো? আমি কোতোয়ালীতে আপনার খাওয়ার কথা বলতে গিয়েছিলাম। শেষকালে হয়তো গোস্ত-টোস্ত খাইয়ে দেবে, এই ভয় করছিলুম—

—আমি গোস্ত খাই তো!

—সে কি, আপনি গরুর মাংস খান?

হেসে উঠলো রাণীবিবি—মোগলের হাতে যখন পড়েছি, তখন গরুর মাংস খাওয়ালেই বা কী, আর শুয়োরের মাংস খাওয়ালেই বা কী! ও-কথা থাক, তোমার বিয়ের কথাটা বলো—

কান্ত লজ্জায় পড়লো। বললে—কপালে আমার বিয়ে না থাকলে কী হবে!

—দোষটা করলে তুমি নিজে আর নিন্দে করছো কপালের!

—কিন্তু আপনি তো জানেন না, ফিরিঙ্গী কোম্পানীর চাকরি কী জিনিস। কোথায় সেই সুতোনুটি আর কোথায় সেই হাতিয়াগড়। বেভারিজ সাহেবের সোরার নৌকো এল দেরি করে, সেই নৌকোর সব মাল খালাস করে গুদামে পুরে হিসেব না করলে তো ছুটি নেই। তারপরে যে নৌকোয় করে হাতিয়াগড়ে যাবার বন্দোবস্ত করেছিলাম, তা মাঝপথে চড়ায় আটকে গেল—আর বিয়ের লগ্ন ছিল রাত দুপ্রহরের সময়—

—শেষ পর্যন্ত কী হল?

কান্ত বললে—ভেবেছিলাম আমার জন্যে পাত্রীপক্ষ অপেক্ষা করবে, কিন্তু গাঁয়ের লোক তাড়াহুড়া করলে বলে আর একজনকে ধরে এনে তার সঙ্গে সেই লগ্নেই বিয়ে দিয়ে দিয়েছিল পাত্রীর বাপ—

—কোথায় বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছিল?

—হাতিয়াগড়ে। আপনাদেরই জমিদারীতে। আপনি হয়তো তাদের চিনবেন। পাত্রীর বাবার নাম শোভারাম বিশ্বাস—

রাণীবিবি তাদের চিনলেন কিনা কে জানে। সে-সম্বন্ধে আর কিছু বললেন না। একটু পরে জিজ্ঞেস করলেন—সেই দুঃখেই বুঝি ফিরিঙ্গী কোম্পানীর চাকরি ছেড়ে দিয়ে নবাব-সরকারে চাকরি নিলে?

—না, ঠিক তা নয়, ওখানে তিন টাকা তলব পেতাম, এখানে পাবো ছ টাকা।

—শুধু টাকার লোভেই এই চাকরি নিলে না আর কোনো লোভও ছিল?

—আর কী লোভ থাকতে পারে বলুন! জিনিসপত্তরের যা দাম বাড়ছে, তাতে তিন টাকা মাইনেতে আর কুলোচ্ছে না। সেই শায়েস্তা খাঁর আমল কি আর এখন আছে!

—সংসারে তোমার কে-কে আছেন?

—কেউ নেই। শুধু আপনি আর কোপ্‌নি।

বলে কান্তও হাসলো, আর তার সেই হাসিতে রাণীবিবিও হাসলো। একবার কান্তর ইচ্ছে হলো জিজ্ঞেস করে, মুর্শিদাবাদের নবাব-হারেমে কেন যাচ্ছেন রাণীবিবি। কিন্তু কথাটা কেমন করে পাড়বে, সেই ভাবতে গিয়েই আর বলা হলো না। তারপর নিজেই একটা কারণ অনুমান করে নিয়ে বললে—আপনি হয়তো ভাবছেন, আমি এর মধ্যে আছি—

—কীসের মধ্যে?

—এই আপনাকে নবাব-হারেমে নিয়ে যাবার মধ্যে। কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমি এর কিছুই জানিনে। বরং আমি বশীরকে জিজ্ঞেস করেছিলুম—

—বশীর কে?

—নিজামত কাছারিতে মোহরার মনসুর আলি মেহের খাঁ সাহেব আছেন, তাঁর সম্বন্ধীর ছেলে। সে আমার বন্ধু। তাকে অনেকবার জিজ্ঞেস করেছিলুম, কিন্তু সে কিছু বললে না। আমি শুধু হুকুম তামিল করছি। এই পাঞ্জা দিয়েছে আমাকে ওরা। বলেছে, এটা দেখালে রাস্তার সেপাই কি ফৌজদারের লোক কেউ কিছু বলবে না—আপনি হয়তো মনে-মনে আমাকে দুষছেন।

—কেন, তোমাকে দুষতে যাবো কেন?

—জানি না, হয়তো আপনাকে এইরকম করে নিয়ে গিয়ে আপনার কোনো ক্ষতি করছি। সত্যি বলুন তো, আপনি একা-একা সেখানে যাচ্ছেন কেন? আপনার কি কিছু কাজ কাছে?

রাণীবিবি একবার একটু গম্ভীর হয়ে গেল। তারপর আর-একটা পান মুখে পুরে দিয়ে বললে—এ-কথার উত্তর যদি দিই, তা হলে তোমার চাকরিটাই চলে যেতে পারে। আমার কিছু হলে তোমার কিছু যাবে-আসবে না, কিন্তু তোমার চাকরি চলে গেলে তখন কী করবে?

কান্ত এবার রাণীবিবির মুখের দিকে সোজাসুজি চেয়ে দেখলে। যেন কথাগুলোর মানে খোঁজবার চেষ্টা করলে রাণীবিবির মুখ-চোখ-ঠোঁটের মধ্যে।

রাণীবিবি আবার বলতে লাগলেন—দিনকাল খারাপ, এ-সময়ে দুটো টাকা যেখান থেকে পারো জোগাড় করে জমাতে চেষ্টা করো। টাকাটাই এখন সব—আখেরে টাকাই কাজ দেবে!

—কেন? ও-কথা বলছেন কেন?

—দেখছো না, নবাব থেকে শুরু করে সেপাই পর্যন্ত সবাই টাকা টাকা করে মরছে। টাকার জন্যেই তো ফিরিঙ্গীরা সাত-সমুদ্দুর পেরিয়ে এখানে এসেছে। বর্গীরাও তো টাকার জন্যেই আসতো এখানে—

—আপনি বুঝি আমাকে ঠাট্টা করছেন?

—ঠাট্টা করবো কেন? তুমি নিজেই তো টাকার জন্যে একটা মেয়ের জীবন নষ্ট করলে। টাকাটাই কি সব নয়?

কান্ত অবাক হয়ে গেল। —আর আপনি? আপনিও কি তাই টাকার জন্যে মুর্শিদাবাদ যাচ্ছেন?

—আমি কী জন্যে যাচ্ছি, তা তোমাকে বলতে যাবো কেন? আর যার জন্যেই যাই, টাকার জন্যে নিশ্চয়ই নয়। তাছাড়া, মেয়েমানুষরা অত টাকা-টাকা করে না। বিয়ে হলে তুমি বুঝতে পারতে—

কান্ত বললে—কিন্তু আপনি বিশ্বাস করুন, আমার বিয়ে করবার খুবে ইচ্ছে ছিল, ভেবেছিলাম বিয়ে করে বড়-চাতরায় নিয়ে যাবো আমার বৌকে, সেখানকার বাড়িটা সারিয়ে-সুরিয়ে সেখানেই সংসার করবো, ভেবেছিলাম বর্গী আসা যখন বন্ধ হয়েছে, তখন আবার দেশে গিয়ে চাষ-বাস করবো। সত্যি আমার এসব ভাল্যো লাগছে না।

তারপর রাণীবিবির দিকে চেয়ে হঠাৎ কথা বলতে বলতে থেমে গেল। বললে—আপনাকে আমার নিজের এত কথা বলছি বলে আপনি বিরক্ত হচ্ছেন না তো?

—বিরক্ত হবো কেন, বলো না।

বলে হাসলেন রাণীবিবি।

সত্যিই, কান্ত জীবনে এই প্রথম যেন একজন শ্রোতা পেয়েছে। তার অনেক কথা অনেকদিন ধরে বুকের মধ্যে জমে ছিল, শোনবার লোকই কেউ ছিল না। বেভারিজ সাহেবের সোরার গুদামে কেবল মালের হিসেবই রেখেছে সারাদিন ধরে। তারপর গঙ্গার ধারে খড়ের চালাটায় শুতে-না-শুতে এক ঘুমে রাত কাটিয়ে দিয়েছে। কোনো কিছু ভাববার সময়ই ছিল না তখন। কিন্তু এক-একদিন যখন কাল-বোশেখীর ঝড় উঠতো, ঝড়ে সোরার নৌকোগুলো, কোম্পানীর জাহাজগুলো জলের ঢেউ লেগে ওলোট-পালোট করতো, সেইসব রাত্রে নিজেকে বড় নিঃসঙ্গ মনে হতো তার। এক-একদিন বেভারিজ সাহেবও মদ খেয়ে বেসামাল হয়ে পড়তো। তখন সাহেবের মালী কোথা থেকে সাহেবকে মেয়েমানুষ এনে জুগিয়ে দিত। কোথা থেকে তাদের আনতো সে কে জানে! চাকরি বজায় রাখার জন্যে সব কাজই করতে হতো তাকে। তখন মনে হতো তারও পাশে একজন কেউ থাকলে ভালো হতো। তার মুখে গালে চুলে ঠোঁটে হাত দিয়ে আদর করতো সে। তাকে নিয়ে বড়-চাতরার সেই ঘরখানার তলায় সংসার পাততো। কিন্তু তারপর আবার কখন রাত পুইয়ে যেত। গঙ্গার ঘাটে আবার নৌকোয় পাল খাটানো হতো। ভোর বেলাই নৌকোগুলো ছেড়ে দিত বদর-বদর বলে। তখন আর ওসব কিছু মাথায় আসতো না। তখন আবার সোরা, তখন আবার হিসেবের খাতা, তখন আবার মোহর টাকা কড়া-ক্রান্তির গোলক ধাঁধার মধ্যে ডুবে যেত।

তা সেই সময়েই একদিন এক ঘটকমশাই এসে হাজির। হাতে খেরো-বাঁধানো খাতা। সচ্চরিত্র পুরকায়স্থ তার নাম। বেশ ভালো করে কান্তর আপাদমস্তক দেখে নিয়ে, কুলজী-বংশ সব কিছু জেনে নিয়ে বলেছিল—তুমি বিয়ে করবে বাবাজীবন?

আসলে ওই ভাবেই শুরু হয়েছিল সম্বন্ধটা। হাতিয়াগড়ের সৎ-কায়স্থ শোভারাম বিশ্বাস। তাঁর একমাত্র সন্তান। মেয়েটি পাত্রস্থ করতে চান তার বাপ। জমিদারি-সেরেস্তায় কাজ করে সে নিজে। নিজের বাস্তুভিটে আছে হাতিয়াগড়ে। দেবে থোবে ভালো। পৈত্রিক সোনা-দানা কিছু আছে। জামাই-ই সব কিছু পাবে।

কথা বলতে বলতে কান্ত থামলো। বললে—এ-সব কথা আপনার শুনতে হয়তো ভালো লাগছে না—

—না না, বলো! তারপর? পাত্রী কেমন দেখতে?

কান্ত বললে—সে-কথাও জিজ্ঞেস করেছিলুম—

—ঘটকমশাই কী বলেছিলেন? দেখতে খারাপ?

—না, ঘটকমশাই বলেছিলেন পাত্রী খুব সুন্দরী।

—খুব সুন্দরী?

কান্ত বললে—হ্যাঁ, খুব নাকি সুন্দরী, অমন সুন্দরী নাকি দেখা যায় না—

—কার মতন সুন্দরী?

কান্ত বললে—তা জানিনে, আমি তো নিজের চোখে পাত্রী দেখিনি—

—তবু শুনে কেমন মনে হয়েছিল? আমার চেয়েও সুন্দরী?

রাণীবিবি যে কতখানি সুন্দরী তা যেন এতক্ষণ দেখবার সুযোগ পায়নি। তাই ভালো করে আর একবার রাণীবিবির মুখখানা দেখলে। সত্যিই এমন সুন্দরী হয় নাকি কেউ!

কান্ত বললে—আপনি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছেন—

—ওমা, ঠাট্টা করবো কেন? আমার চেয়ে সুন্দরী কেউ হয় না?

কান্ত বললে—আপনার চেয়ে সুন্দরী আবার হয় নাকি? আমি তো জীবনে দেখিনি—

রাণীবিবি এবার আবার একটা পান মুখে পুরলো। বললো—বেশি সুন্দরী হলে কপালে সুখ হয় না, তা জানো তো?

—কেন? আপনার কি সুখ হয়নি?

রাণীবিবি কী একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই হঠাৎ বাইরে যেন কার গানের আওয়াজ হলো। বাইরের গাছতলায় যেখানে সেপাইরা বসে ছিল, সেইখান থেকেই গানের শব্দটা আসছিল। রাণীবিবি মন দিয়ে সেই গানটা শুনতে লাগলো। কান্তও শুনতে লাগলো। গানটা নতুন।

কোথায় শিবে, রাখ জীবে, ত্রৈলক্য-তারিণী।
তোমার চরণ নিলাম শরণ বিপদ-হারিণী॥
আমি মা অতি দীন
আমি মা অতি দীন তনু ক্ষীণ, হলো দশার শেষ
কোন্ দিন মা রবি সুতে ধরবে এসে কেশ॥

লোকে গান শুনছে আর তারিফ করছে। বলছে—বাঃ, বাঃ বলিহারি—বলিহারি—

কে একজন বললে—ও-গান নয় হে, এবার একটা প্রেম-সংগীত গাও তো হে—

লোকটা বললে—একটা খেদের গান গাই শুনুন হুজুর—

—তাই গাও—

আবার গান হতে লাগলো—

আমি রব না ভব-ভবনে—
শুন হে শিব শ্রবণে॥
যে নারী করে নাথ   হৃদিপদ্মে পদাঘাত
তুমি তারি বশীভূত   আমি তা সবো কেমনে॥

রাণীবিবি হঠাৎ যেন গম্ভীর হয়ে গেছে। জিজ্ঞেস করলে—ও কে গাইছে ওখানে?

কান্ত বললে—কী জানি, আপনিও যেখানে আমিও সেখানে—। গানটা থামাতে বলে আসবো?

রাণীবিবি বললে—না, তুমি জেনে এসো তো লোকটা কে, ওর নাম কী?

—কেন, আপনি চেনেন নাকি ওকে?

—তুমি জেনেই এসো না—

কান্ত বাইরে যাচ্ছিল, পেছন থেকে রাণীবিবি আবার মনে করিয়ে দিলেন—নামটা জেনে এসে আমাকে বলবে কিন্তু—

বাইরে তখনো গান হচ্ছে—

পতিবক্ষে পদ হানি   ও হলো না কলঙ্কিনী
মন্দ হলো মন্দাকিনী   ভক্ত হরিদাস ভনে।
আমি রব না ভব-ভবনে।

তখন গানটা আরো জমে উঠেছে। অশ্বত্থ গাছতলাটার নিচেয় বেশ গুছিয়ে বসেছে সেপাইরা। আর মাঝখানে একটা আধবয়েসী লোক হাত-মুখ নেড়ে মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে গান গাইছে। কান্ত সামনে আসতেও যেন লোকটার সেদিকে

ভ্রূক্ষেপ নেই। খানিক পরে গান থামিয়ে লোকটা কান্তর দিকে চাইলো।

—তোমার নাম কী গো?

লোকটা রসিক খুব। বললে—আমি হরির দাস হুজুর, আমার আবার নাম কী! তাঁর নাম গান করেই তো বেঁচে আছি—

—তবু নাম তো একটা আছে, বাপ-মায়ের দেওয়া নাম, আমাদের রাণীবিবি জানতে চাইছেন—

রাণীবিবি!

রাণীবিবির নাম শুনে লোকটার বোধহয় একটু চেতনা হলো। বললে—ভেতরে বুঝি রাণীবিবিকে নিয়ে লীলেখেলা হচ্ছে? তা ভালো, তা ভালো—আমার নাম উদ্ধব দাস; রাণীবিবিকে গিয়ে বোল—

তারপর কথাটা বলেই লোকটা আর একটা গান ধরতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই কোতোয়াল এসে হাজির। কোতোয়ালকে দেখে সেপাই-টেপাই যারা ছিল সবাই সসম্ভ্রমে দাঁড়িয়ে উঠলো।

—তুমি আবার এখানে?

—বন্দেগী হুজুর, আমি হরির দাস, ভক্ত হরিদাস—আমি আর যাবো কোথায় বলুন—অধীনের কি আর যাবার জায়গা আছে?

কথাটা শেষ হবার আগেই কোতোয়াল বললে—ভাগো এখান থেকে, ভাগো—

বলে আর সেদিকে না-চেয়ে সেপাইদের দিকে চাইলে। কান্তকেও একবার দেখলে। তারপর হুকুম হলো তখনই রওনা দিতে হবে মুর্শিদাবাদের দিকে। কোতোয়াল সাহেব গম্ভীর স্বভাবের মানুষ। একেবারে যে-কথা সে-ই কাজ। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে পালকিতে ঘেরাটোপ লাগিয়ে দিয়ে সকলকে রওনা করিয়ে দিয়েছিলেন। আবার পালকি চলতে লাগলো রাণীবিবিকে নিয়ে। রাণীবিবির সঙ্গে আর কথাই হলো না, দেখা তো দূরের কথা। শুধু দূর থেকে ভক্ত হরিদাসের গানের কথাগুলো একটু একটু ভেসে আসছে—

পতিবক্ষে পদ হানি ও হলো না কলঙ্কিনী
মন্দ হলো মন্দাকিনী ভক্ত হরিদাস ভনে।
আমি রব না ভব-ভবনে।

উদ্ধব দাসকে বুঝি ভব-ভবনে রাখাই যায় না। উদ্ধব দাস তাই কেবল এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় ঘুরে বেড়ায়। গান গায় আর ঘুরে বেড়ায়। রাণীবিবির পালকির পেছন-পেছন চলতে চলতে কান্ত তখনো কেবল কথাটা ভাবছিল। খানিকক্ষণের জন্যে দেখা। অনেক কথা জানতে চেয়েছিলেন কান্তর জীবনের। কান্তর কথা বড় মন দিয়ে শুনেছিলেন রাণীবিবি। সকলে কি সকলের কথা শোনে নাকি! বিশেষ করে কান্ত তো তাঁর পর। কান্তর দুঃখের কথা শুনে লাভই বা কি হতো তাঁর! বলেছিলেন—নামটা জেনে এসে আমাকে বলবে। অথচ বলা হলো না। পুরোন সেপাই বদল হয়ে গেছে। এবার কাটোয়ার কোতোয়ালের নতুন সেপাই চলেছে সঙ্গে।

চেহেল্‌-সুতুনের ভেতরে বোরখায় মুখ ঢেকে সব কথাগুলোই মনে পড়ছিল। অথচ এই তো সেদিন। সবে সঙ্গে করে এনেছে রাণীবিবিকে, তারই মধ্যে সমস্ত ওলোট-পালোট হয়ে গেল। তারই মধ্যে লড়াই শুরু হলো, লড়াই শেষও হয়ে গেল। মসনদ্‌ পর্যন্ত বদলি হবো-হবো। কে নবাব হবে কে জানে! এখন তলবটা পেলে হয় শেষ পর্যন্ত! কান্ত সেই অল্প-অল্প আলো-ছায়ার ভেতর দিয়ে রাণীবিবির কথাই ভাবতে লাগলো। কোথায় সেই কাটোয়া আর কোথায় এই মুর্শিদাবাদ। এই পথ দিয়ে কত নবাব কত বেগম ভেতরে এসেছে, আবার ভেতর থেকে বাইরেও গিয়েছে। এই পথ দিয়েই মুর্শিদকুলি খাঁ এসেছে একদিন এইখানে। এইখানে দাঁড়িয়েই রাজবল্লভ সেন ঘসেটি বেগমের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেছে। কাটোয়ায় ভাস্কর পন্ডিতকে খুন করে এইখান দিয়েই আলিবর্দী খাঁ এই হারেমে ঢুকেছে। দেখতে দেখতে কান্তর চোখের সামনে দিদিমার কাছে শোনা গল্পগুলো যেন আবার দেখতে পেল। আবার ঘনিয়ে এল সেই সব রাত, সেই সব দিন, সেই সব কাল। একদিনের মধ্যে সব ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে গেল। মনে হলো এখনো যেন এখানে-ওখানে নবাবের রক্ত লেগে রয়েছে। কোথায় গেল সেই হোসেন কুলী খাঁ, কোথায় গেল সেই আলীবর্দী খাঁ। ইতিহাসের পাখায় চড়ে যেন সবাই আবার ফিরে আসতে লাগলো উড়ে উড়ে। দিদিমা সব জানতো। দিদিমার কথাই যেন সত্যি হলো। যেন পায়ের তলার শব মাড়িয়ে সে ইতিহাসের সিংহদ্বারে এসে দাঁড়িয়েছে আজ। আজ যদি মস্‌নদই নেই, আজ যার জন্যে এখানে রাণীবিবিকে আনা সেই নবাবই যখন নেই, তখন কেন রাণীবিবি এখানে থাকবে? কোথাকার কোন খোরাসান, কান্দাহার, চট্টগ্রাম থেকে আনা বেগমরা যেন এতদিন পরে ইতিহাসের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পেয়েছে। এক সঙ্গে সবাই বুঝি তাই হেসে উঠেছে। মুক্তির হাসি, আনন্দের হাসি, স্বাচ্ছন্দ্যের হাসি। কান্ত সেইখানে বসেই ইতিহাসের অমোঘ বাণী যেন শুনতে লাগলো।

—মরিয়ম বেগম, মরিয়ম বেগম!

বাইরের ডাকে যেন হঠাৎ কান্তর সম্বিত ফিরে এল। কে যেন দরজা ঠেলছে আর ডাকছে—মরিয়ম বেগম, মরিয়ম বেগম—

জেনারেল ক্লাইভ ডাকলে—মুন্সী—

মুন্সীকে সঙ্গেই এনেছিল ক্লাইভ সাহেব। টিকি দোলাতে দোলাতে মুন্সী নবকৃষ্ণ সামনে এসে হাজির।

—হুজুর!

বশীর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল একপাশে। মনসুর আলি মেহেরও দাঁড়িয়ে ছিল। মীরজাফর খাঁ দাঁড়িয়ে ছিল। জামাই মীরকাশিম খাঁও দাঁড়িয়ে ছিল।

ছেলে মীরণ দাঁড়িয়ে ছিল। নিজামত সরকারের আমলা-ওমরাহ সবাই হাজির। সারা মুর্শিদাবাদের লোক আজ শহর-গ্রাম-জনপদ ঝেঁটিয়ে এসে মুর্শিদাবাদের নবাবের আম-দরবারে হাজির। সবাই ভেতরে ঢুকতে পারেনি। সবাইকে ঢুকতে দেওয়া হয়ওনি। এত মানুষ দেখে কর্ণেল সাহেবের লাল চোখ-মুখ আরো লাল হয়ে গেছে। সকাল থেকেই করোরিয়ান, চৌধুরীয়ান, জমিদারানরা হাজির ছিল। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র গোড়া থেকেই সামনে ছিলেন। যা-কিছু নবাবের মালখানার সিন্দুক থেকে পাওয়া গিয়েছে সব জড়ো করে তুলে নিয়েছে ক্লাইভ সাহেব। এত মোহর, এত টাকা, এত হীরে, এত চুণি, এত পান্না, এত কিছু জীবনে দেখেনি সাহেব। প্রথমে সিন্দুকটা খুলতেই চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিল সাহেবের। মুন্সী নবকৃষ্ণ পাশেই ছিল। তারও চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিল। শায়েস্তা খাঁ শুধু নয়। বখ্‌তিয়ার খিলিজির আমল থেকেই এই টাকা জমে-জমে পাহাড় হয়ে উঠেছিল মুর্শিদাবাদের খাজাঞ্চিখানায়। মুর্শিদকুলী খাঁর সময় থেকেই আরো পাকাপাকি রকমের জমা-বন্দোবস্ত হতে শুরু করেছিল। তাঁর বন্দোবস্তের নাম ছিল জমা কাসেল্ তুমারি। সারা বাংলাদেশের টাকা এসে ঢুকতো এই সব সিন্দুকে। এসে পুরুষানুক্রমে জমা হয়েছে এখানে। সে-টাকা দেখে চোখ ঘুরে যাবার মত অবস্থা হলো কর্ণেলের।

মুন্সী নবকৃষ্ণ বললে—এসব আপনার হুজুর—আপনি নিন—

কর্ণেল সাহেব যা নিলে তা নিলে। তারপর নিলে মুন্সী।

—আমি যে সংগে কিছু বাক্স-টাক্স আনিনি।

—আমি সিন্দুক সুদ্ধু আপনাকে দেবো, আপনার নিতে কোনো অসুবিধে হবে না—একেবারে জাহাজে তুলে সুতানুটিতে পাঠিয়ে দেবো আপনার হাবেলীতে—

মাসিক সাত টাকা মাইনের চাকরিতে ঢুকে এখানে এসেছিল ক্লাইভ সাহেব। সঙ্গে সঙ্গে রাজত্ব পাওয়া হয়ে গেল। কিন্তু শুধু রাজত্ব তো দেওয়া যায় না। রাজকন্যা দেওয়ারও নিয়ম আছে এ-দেশে। মীরজাফর খাঁ তাও দিলেন। রাজকন্যা নয়, নবাব-বেগম।

ক্লাইভ মুশকিলে পড়লে। বললে—এদের নিয়ে আমি কী করবো?

—হুজুর, এইটেই যে কানুন। নবাবের যা কিছু আছে সবই আপনার। নবাবের টাকা আপনাকে দিয়েছি, নবাবের এই বেগমদেরও আপনাকে নিতে হবে—

বলে ডাক পড়লো—নূর বেগম—

সমস্ত বন্দোবস্ত আগে থেকেই করা ছিল। হারেমের খোজা-সর্দার পীরালিকে আগে থেকেই হুকুম দেওয়া ছিল। সমস্ত বেগমরা সকাল থেকেই সাজতে-গুজতে শুরু করেছে। চোখে সুর্মা দিয়েছে, বুকে বুটিদার কাঁচুলি পরেছে। ঠোঁটে আলতা মেখেছে। নখে মেহেদী রং লাগিয়েছে, ঘাগরা, চোলি, ওড়নী কিছুই বাদ যায়নি। আজ সবাই হারেম ছেড়ে আর-এক হারেমে গিয়ে উঠবে। এতদিন যাকে মনোরঞ্জন করবার জন্যে তারা জন্মেছিল, সে নেই। এবার অন্য একজনের মনোরঞ্জন করবার জন্যে আবার বেঁচে থাকতে হবে। আবার বিকেল থেকে প্রতিদিন আর একজনের মন ভোলাবার জন্যে তৈরি হতে হবে। সে দিশী-নবাব নয়, সে সাহেব। লাল পল্টনদের গোরা সাহেব। লক্কাবাগের লড়াইতে যে-সাহেব নবাবকে হারিয়ে দিয়েছে।

—জিন্নৎ বেগম!

আজ আর কারোর কোনো অভিযোগ নেই। অবশ্য অভিযোগ ছিলও না

কোনো দিন। নবাব-হারেমে কোনো অভিযোগ থাকতে নেই কারো। খেতে পরতে পেয়েছে একদিন, আবার এবার যেখানে যাবে সেখানেও তারা খেতে পরতে দেবে। আমরা জারিয়া। মানে ক্রীতদাসী। আমাদের আবার জাতকুল কী, আমাদের আবার মান-সম্মান বা কী।

—তক্কী বেগম।

এক-একজনের নাম ডাকা হয় আর সে ওড়নী ঢাকা দিয়ে মাথা নিচু করে এসে দাঁড়ায়। একজনের পর আর একজন। তারপর আর একজন। আম-দরবারের শোভা যেন আজ হাজার গুণ বেড়ে গেছে রূপসীদের জেল্লার জৌলষে! রসুন-চৌকিতে এতক্ষণ মিঞা-কি-মল্লার বাজাচ্ছিল নবাব-নিজামতের বহুদিনের মাইনে করা পুরোন নহবতি বুড়ো ইন্‌সাফ মিঞা। সে এ-রাগ বহুবার আগে বাজিয়েছে। বুড়ো নবাবসাহেব যেবার কাটোয়াতে বর্গী-সর্দার ভাস্কর পণ্ডিতকে খুন করে রাজধানীতে ফিরে এসেছিলেন, সেবারও ইন্‌সাফ মিঞা এই মিঞা-কি-মল্লারই বাজিয়েছিল। যেবার বুড়ো নবাবের নাতি মির্জা মহম্মদের বিয়ে হলো সেবারও একবার বাজিয়েছিল এই মিঞা-কি-মল্লার। বড় কড়া রাগ। তানসেনজীর নিজের মেজাজের তৈরি জিনিস। তানসেনজী বাদ্‌শা আকবর শাহ্‌কে এই মিঞা-কি-মল্লার পেশ করেছিলেন। এ-রাগ যখন-তখন যাকে-তাকে শোনানো যায় না।

তাড়াতাড়ি বশীর মিঞা দৌড়ে এসেছে রসুনচৌকির ওপরে।

—এ কী বাজাচ্ছো মিঞা সায়েব?

—কেন জনাব, এ তো মিঞা-কি-মল্লার!

—না না, গোরা সাহেবরা ও-সব বুঝতে পারবে না। নবাব সাহেব গোসা করছেন—

—নবাব? কোন্ নবাব?

নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলা যে নেই তা যেন জানে না ইন্‌সাফ মিঞা। তা যেন শোনেইনি সে। বচপন থেকে মির্জাকে দেখে এসেছে ইন্‌সাফ মিঞা। মির্জা মহম্মদ সেই ছোটবেলাতেই এই নহবতখানায় উঠে এসে বাঁশির ফুটোতে ফুঁ দিতে চেষ্টা করতো কতবার। কতবার ইন্‌সাফের চোখের আড়াল থেকে বাঁশী চুরি করে পালিয়েছে। সেই মির্জা মহম্মদই বড় হয়ে তোমাদের সিরাজ-উ-দ্দৌলা হলো। তোমরা তার জন্যে না-কাঁদতে পারো, কিন্তু আমি কী করে কান্না থামাই? আমার কি মন কেমনও করতে নেই?

সত্যিই কেউ কাঁদছে না। গোরা সাহেবরা এসেছে বলে মুর্শিদাবাদে যেন মহ্‌ফিল্ শুরু হয়ে গিয়েছে। গোরা সাহেবদের জন্যে খানা-পিনার বন্দোবস্ত হচ্ছে। সরাবের বন্দোবস্ত হয়েছে। মুরগী-মসল্লম্-এর বন্দোবস্ত হয়েছে। পোলাউ-বিরিয়ানির বন্দোবস্ত হয়েছে। ঠিক মির্জা মহম্মদের বিয়ের সময় যা-যা যেমন-যেমন বন্দোবস্ত হয়েছিল, সব ঠিক তেমনি-তেমনি বন্দোবস্ত হয়েছে। আমি মিঞা-কি-মল্লার বাজাবো না তো কি মালগুঞ্জ্ বাজাবো? হোলি বাজাবো? খেমটা বাজাবো?

—গুলসন্ বেগম!

—পেশমন্ বেগম!

—আখ্‌তার বেগম!

মুর্শিদাবাদের গ্রামের মানুষ হাঁ করে চেয়ে দেখছিল। এত বেগম এক সঙ্গে দেখবার কখনো মওকা মেলেনি তাদের। সমস্ত বেগমই আসবে নাকি রে বাবা!

এ তো রূপ নয়, আগুন। আগুনের ডেলা সব দাঁড়িয়ে রয়েছে মেয়েমানুষের চেহারা নিয়ে।

ক্লাইভ সাহেব চুপি-চুপি মুন্সীকে জিজ্ঞেস করলে—এসব ওম্যান্ কোত্থেকে এসেছে মুন্সী?

কেউ এসেছে খোরাসান, কেউ এসেছে কান্দাহার, কেউ এসেছে চট্টগ্রাম থেকে। যেখান থেকে নারী-রত্ন পেয়েছে কুড়িয়ে এনেছিল নবাব।

—সমস্ত নিজের ওআইফ্?

নবকৃষ্ণ মুন্সী বললে—না হুজুর, সব ব্যাড্ওম্যান্, খারাপ মেয়েমানুষ!

—মরিয়ম বেগম!

অবাক কাণ্ড! এবার কেউ এল না।

মন্সুর আলি মেহের আবার ডাকলে—মরিয়ম বেগম—মরিয়ম বেগম—

এ-ওর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলো। এগারজন বেগম এসে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। আর একজন বাকি আছে। সবসুদ্ধু বারোজন বেগম। কিন্তু মরিয়ম বেগম আসছে না কেন? পীরালি তখন হারেমের ভেতরে গরু-খোঁজা শুরু করে দিয়েছে। এ-ঘরে যায়, ও-ঘরে যায়। কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। সাজিয়ে গুছিয়ে তাকেও তো তৈরি করে রেখে দেওয়া হয়েছিল।

বশীর মিঞা দাঁড়াতে পারলে না। কোণের ফটকের কাছে গিয়ে ডাকতে লাগলো—পীরালি, পীরালি—

পীরালির তখন প্রাণ যায়-যায় অবস্থা। মরিয়ম বেগমকে কোনো ঘরে পাওয়া যাচ্ছে না। এই তো সেদিন হাতিয়াগড় থেকে নবাবের জন্যে সেখানকার রাণী-বিবিকে নতুন আমদানী করা হলো। নিয়মমাফিক তার নতুন নামও দেওয়া হলো—মরিয়ম বেগম! এখন কোথায় গেল!

বশীর মিঞা তখনো ডাকছে—পীরালি—

এগারজন বেগম তখন মাথা নিচু করে ওড়নী ঢাকা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আর বাকি বেগম আসছে না। কোথায় গেল মরিয়ম বেগম! জেনারেল সাহেবের কাছে বে-ইজ্জৎ হয়ে যাবে নাকি মীরজাফর আলি খাঁ সাহেব। নবাব-নিজামতের বদনামি হবে নাকি?

রসুনচৌকিতে ছোটে সাগ্রেদ হঠাৎ বলে উঠলো—চাচা—

ছোটে সাগ্রেদ সবে নহবতে ফুঁ দিতে শিখছে। ইন্সাফ মিঞা বাজাতে বাজাতেই তার দিকে চাইলে একবার।

—চাচা, মরিয়ম বেগমকে পাওয়া যাচ্ছে না!

—পাওয়া যাচ্ছে না!

বলে ইন্সাফ মিঞার কী খেয়াল হলো কে জানে, সুরটা সমে এসে থামতেই নহবতের মুখটা একবার আঙুল দিয়ে টিপে নিয়ে তখখুনি আবার বাজাতে আরম্ভ করলো। এবার আর মিঞা-কি-মল্লার নয়, মালকোশ। তবল্চি সুরের মুখ্পাত্টা শুনেই তবলায় একটা চাঁটি কষিয়ে দিলে—বাহ্বা ওস্তাদ—বাহ্বা—

পশুপতিবাবু জিজ্ঞেস করলেন—তারপর মশাই? তারপর?

বললাম—দাঁড়ান একটু সবুর করুন! এই একহাজার পাতার পুঁথি কি এত শিগ্‌গির শেষ করা যায়? আপনার পূর্বপুরুষ উদ্ধব দাস এক মহাকবি ছিলেন মশাই। গল্প বড় মোচড় দিয়ে দিয়ে বলেন। একটুখানি পড়লেই পরের পাতা পড়বার জন্যে মনটা ছট্‌ফট্‌ করে—অথচ আসল ঘুঁটিটা কিছুতেই ছাড়েন না—হাতে রেখে দেন, শেষকালে চালবেন বলে—

সত্যিই উদ্ধব দাস ক'দিন ধরে একেবারে নেশাগ্রস্ত করে রেখে দিলে। দেখতে পাগল-ছাগল মানুষ হলে কী হবে, রসের কারবারে একেবারে রসিকরাজ। রসে টই-টুম্বুর।

পুঁথি যখন পড়া শেষ হলো তখন গভীর রাত। সেই কলকাতার মাঝরাত্রেই যেন সমস্ত অষ্টাদশ শতাব্দীটা চোখের সামনে সশরীরে নেমে এল। সেই হাতিয়াগড়ের রাণীবিবি, সেই কান্ত, সেই সিরাজ-উ-দ্দৌলা, সেই লক্কাবাগের লড়াই, সেই রবার্ট ক্লাইভ, সেই মহারাজ নবকৃষ্ণ মুন্সী, সেই মরিয়ম বেগম—আরো কত অসংখ্য চরিত্র চোখের সামনে সব যেন সজীব হয়ে উঠলো।

পুঁথি শেষ করে 'শান্তিপর্বে' উদ্ধব দাস লিখছেন—

কোম্পানীর রাজ্য হৈল, মোগল হৈল শেষ।
'দমদম্‌-হাউসে' আইল ইংরেজ নরেশ॥
কৃষ্ণভজা বৈষ্ণবেরা আতঙ্কেতে মরে।
ব্রাহ্মণ হৈয়া হিন্দু যত পৈতা ফেলে ডরে॥
হিন্দু ছিল মুসলিম হৈল পরেতে খৃষ্টান।
এমন দেশেতে বল থাকে কার বা মান॥
কোন দেশেতে ঘর বা তোমার কোন্‌ দেশে বা বাড়ি।
মরিয়ম বেগম বলে আমি অভাগিনী নারী॥
পতি থাকতে পতি নাই মোর অনাথিনী অতি।
মনের মানুষ যেখানে থাক আমি তারি সতী॥
তার যদি বা মৃত্যু ঘটে আমি কিসে বাঁচি।
তারে কাছে লৈয়া আইস থাকি কাছাকাছি॥
বেগম মেরী বিশ্বাসের অমৃত কথন।
ভক্ত হরিদাস ভণে, শোনে সর্বজন॥

পশুপতিবাবু জিজ্ঞেস করলেন—তারপর মশাই? তারপর?

বললাম—দাঁড়ান একটু সবুর করুন! এই একহাজার পাতার পুঁথি কি এত শিগ্‌গির শেষ করা যায়? আপনার পূর্বপুরুষ উদ্ধব দাস এক মহাকবি ছিলেন মশাই। গল্প বড় মোচড় দিয়ে দিয়ে বলেন। একটুখানি পড়লেই পরের পাতা পড়বার জন্যে মনটা ছট্‌ফট্‌ করে—অথচ আসল ঘুঁটিটা কিছুতেই ছাড়েন না—হাতে রেখে দেন, শেষকালে চালবেন বলে—

সত্যিই উদ্ধব দাস ক'দিন ধরে একেবারে নেশাগ্রস্ত করে রেখে দিলে। দেখতে পাগল-ছাগল মানুষ হলে কী হবে, রসের কারবারে একেবারে রসিকরাজ। রসে টই-টুম্বুর।

পুঁথি যখন পড়া শেষ হলো তখন গভীর রাত। সেই কলকাতার মাঝরাত্রেই যেন সমস্ত অষ্টাদশ শতাব্দীটা চোখের সামনে সশরীরে নেমে এল। সেই হাতিয়াগড়ের রাণীবিবি, সেই কান্ত, সেই সিরাজ-উ-দ্দৌল্যা, সেই লক্কাবাগের লড়াই, সেই রবার্ট ক্লাইভ, সেই মহারাজ নবকৃষ্ণ মুন্সী, সেই মরিয়ম বেগম—আরো কত অসংখ্য চরিত্র চোখের সামনে সব যেন সজীব হয়ে উঠলো।

পুঁথি শেষ করে 'শান্তিপর্বে' উদ্ধব দাস লিখছেন—

কোম্পানীর রাজ্য হৈল, মোগল হৈল শেষ।
'দমদম্‌-হাউসে' আইল ইংরেজ নরেশ॥
কৃষ্ণভজা বৈষ্ণবেরা আতঙ্কেতে মরে।
ব্রাহ্মণ হৈয়া হিন্দু যত পৈতা ফেলে ডরে॥
হিন্দু ছিল মুসলিম হৈল পরেতে খৃষ্টান।
এমন দেশেতে বল থাকে কার বা মান॥
কোন দেশেতে ঘর বা তোমার কোন্‌ দেশে বা বাড়ি।
মরিয়ম বেগম বলে আমি অভাগিনী নারী॥
পতি থাকতে পতি নাই মোর অনাথিনী অতি।
মনের মানুষ যেখানে থাক আমি তারি সতী॥
তার যদি বা মৃত্যু ঘটে আমি কিসে বাঁচি।
তারে কাছে লৈয়া আইস থাকি কাছাকাছি॥
বেগম মেরী বিশ্বাসের অমৃত কথন।
ভক্ত হরিদাস ভণে, শোনে সর্বজন॥

—তা হোক্, আমি ওর নাম রাখলাম বিন্দুমতী!

শোভারাম বলেছিল—আজ্ঞে ও-নাম আমি উশ্চারণ করতে পারবো না ছোট-মশাই—

—তা উচ্চারণ না করতে পারিস তো বিন্দু বলে ডাকিস!

কী আর করা যাবে, ছোটমশাই-এর দেওয়া নাম তো আর অপছন্দ করা যায় না। তা তাই-ই সই। বিন্দু বিন্দুই সই। বিন্দুবালা দাসীই না-হয় নাম হলো। শোভারাম ভেবেছিল ভারি তো একফোঁটা একটা মা-মরা বুড়ো বয়েসের মেয়ে, তার আবার অত নামের বাহারেরই বা দরকার কী! কিন্তু পরের দিনই ছোটমশাই আবার ডেকে বললেন—ওরে শোভারাম, ও বিন্দুমতী নামটা চলবে না রে তোর মেয়ের—

—কেন হুজুর?

কেন যে বিন্দুমতী নাম চলবে না তা আর খুলে বললেন না ছোটমশাই। রাত্রিবেলাই বড়গিন্নী শুনে বলেছিলেন—সে কি? বিন্দুমতী যে আমার দিদিমার বোনের নাম, নফরের মেয়ের সেই একই নাম দিলে তুমি?

ছোটমশাই বলেছিলেন—তাতে কী হয়েছে? আর সে কি আমার মনে আছে, না কারো মনে থাকে—

বড়মা বলেছিলেন—না না, ছি, ও নাম দিতে পারবে না, ওকে ডেকে তুমি বলে দিও—

তা শেষ পর্যন্ত নাম দেওয়া হলো—মরালী!

বড়গিন্নীকে ডেকে ছোটমশাই জিজ্ঞেস করলেন—মরালী বলে তোমাদের বংশে কারো নাম ছিল না তো?

বড়গিন্নী বললেন—না—

ছোট গিন্নীকেও ডাকা হলো। তিনিও বললেন—না, ও-নামে আমাদের কেউ নেই—

রাজবাড়ির পূর্বপুরুষের কোথাও কোনো কুলে কারো ও-নাম পাওয়া গেল না। রাজবাড়ির বউদের সাতকুলেও ও-নামের কেউ নেই। সুতরাং আর কোনো আপত্তি নেই। শোভারামের মেয়ের ওই নামই বহাল রইলো। সেই মরালী থেকে ক্রমে মরো হলো, তারপর হলো মরি। ভারি তো রাজবাড়ির নফর শোভারাম। ছোটমশাই-এর চানের জল যোগানো আর তেল মাখানো কাজ। আর সন্ধ্যেবেলা ছোটমশাই যখন বৈঠকখানায় বসেন, তখন তাঁর পায়ের কাছে বসে পা-হাত-মাথা-পিঠ টিপে দেওয়া। সেই তারই কি না মেয়ে। তার নাম 'মরালী'ই হোক কি 'মরো'ই হোক, কিংবা 'মরি'ই হোক, তাতে বাঙলা দেশের ইতিহাসের কিছুই হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না। তাতে দিল্লীর বাদশারও কিছু এসে যায় না, নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলারও কিছু এসে যায় না, লর্ড ক্লাইভ কিংবা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কারোরই কিছু এসে যায় না। এমন কি তাতে হাতিয়াগড়ের ছোটমশাই হিরণ্যনারায়ণেরও কিছু আসে যায় না।

কিন্তু ওই মেয়েটাই শেষকালে এক সর্বনেশে কাণ্ড ঘটিয়ে বসলো।

অষ্টাদশ শতাব্দীর সমস্ত প্রচ্ছদপটটাই একদিন ওই মরালী যে বদলে দিয়ে যাবে তা যেন কেউই কল্পনা করতে পারেনি। একটা ইতিহাসের আড়ালে যে আর একটা ইতিহাস সৃষ্টি করে বসবে হাতিয়াগড়ের সেই নগণ্য নফর শোভা-রামের নগণ্যতর মেয়ে মরালীবালা দাসী, তা যেন কারোর মাথাতেই আসেনি।

সচ্চরিত্র পুরকায়স্থ যখন বলেছিলেন নামটা তখন যেন খট্‌কা লেগেছিল প্রথমটায়। এ নাম আবার কেমন নাম। এ নাম আবার কারো থাকে নাকি। নাম হবে সুরবালা, নাম হবে ব্রজবালা, নাম হবে তরঙ্গিনী। যেমন আর পাঁচজনের নাম হয় আর কি। কিন্তু ছোটমশাই হলেন অন্নদাতা, তাঁর দেওয়া নাম তো আর খামোকা বদলানো যায় না। ও মেয়ে আদুরীকে খেয়েছে, মাকে খেয়েছে, ও-মেয়ে যে নিজেকেও একদিন খাবে সে সম্বন্ধে শোভারামের আর কোনো সন্দেহ ছিল না। তাই কখনো 'মরো' বলে ডাকতো, কখনো বা 'মরি'।

কিন্তু বিয়ের দিনেই নতুন করে নামটা উঠলো। পুরুত মশাইকে ওই নামটা উচ্চারণ করতে হবে। সম্প্রদানের সময় কন্যার নামটা দরকার। বর-কনের নাম না হলে বিয়ে হয় কী করে। শুধু নাম নয়—গোত্র, বংশ, কুলুজী সবই দরকার হয়।

সন্ধ্যে পেরিয়ে গেছে তখন। রাত দশটায় লগ্ন। একে একে সবাই জুটেছে। শোভারামের মেয়ের বিয়ে। দশটা নয় পাঁচটা নয়, একটি মাত্র মেয়ে। মেয়ে বল ছেলে বল ওই এক মরালী। শোভারাম সকলের বাড়িতে গিয়ে গলবস্ত্র হয়ে সবাইকে নেমন্তন্ন করে এসেছে। সদ্‌গোপ পাড়া, বামুনপাড়া, কর্মকারপাড়া, মুসলমানপাড়া, সব পাড়ার লোককেই নেমন্তন্ন করা নিয়ম।

শোভারাম বলেছিল—দয়া করে দায় উদ্ধার করবেন হাশেম সাহেব, বুঝতেই তো পারছেন আমার কন্যাদায়—

এ-রকম চলে। হাশেম আলি হাতিয়াগড়ের পুরোন লোক। দায়ুদ খাঁর আমলে বাঙলা দেশে এসেছিলেন তাঁর পূর্বপুরুষরা। তারপর মোগল আমলে সরকারী চাকরি চলে যাবার পর থেকে বংশ-পরম্পরায় ব্যবসা শুরু করেন। সেই থেকে বংশ-পরম্পরায় এঁরা হাতিয়াগড়ে তুলোর ব্যবসা করেন। একেবারে বাঙালী হয়ে গেছেন।

বললেন—যাবো বৈকি শোভারাম, নিশ্চয়ই যাবো—তোমার মেয়ের বিয়েতে যাবো না—

আবার হাশেম সাহেবের বাড়ির কোনো উৎসবেও ওমনি করে শোভারামের বাড়িতে এসে তিনি গলবস্ত্র হয়ে নেমন্তন্ন করে যান। বলেন—এসো কিন্তু ঠিক শোভারাম, বুঝতেই তো পারছো আমার কন্যাদায়—

নিমন্ত্রণ পরস্পর পরস্পরকেই করে। যায়ও। তবে খাওয়াটা চলে না। নিমন্ত্রণে আপত্তি নেই। আপত্তিটা খাওয়ায়। সেই হাশেম সাহেব এসেছিলেন শোভারামের মেয়ের বিয়েতে। শোভারামের খড়ের চালের ঘর। তিনখানা ঘর, সামনে উঠোন, উঠোনটা ঘিরে লোকজনের আপ্যায়নের ব্যবস্থা হয়েছিল। হাশেম সাহেব এসেছিলেন জাব্বা-জোব্বা পরে। যেমন ভাবে আসার রীতি। সকলকে আদাব জানালেন। আয়োজন কেমন হয়েছে জিজ্ঞেস করলেন। ছোটমশাই এসেছেন কিনা তাও জিজ্ঞেস করলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন—বর এসেছে নাকি?

—আজ্ঞে এই এল বলে। সেই অনেক দূর থেকে আসবে কি না, তাই একটু দেরি হচ্ছে—

—বর কোথায় থাকে?

—আজ্ঞে ফিরিঙ্গী-কোম্পানীর দফ্‌তরে চাকরি করে। বিয়ের লগ্ন তো সেই দুই পহরে, তাই একটু দেরি হচ্ছে আর কি—

—ভালো ভালো, বেশ—বলে হাশেম সাহেব সব শুনে গেলেন। মুসলমানপাড়া থেকে আরো কয়েকজন এসেছিলেন তাঁরাও নিয়ম রক্ষা করে গেলেন। উঠোনের

ওপর তখন খাওয়ার হুড়োহুড়ি চলছে। শোভারাম আয়োজন করেছে ভালো। পাকা-ফলার কাঁচা-ফলার দু-রকমের, বন্দোবস্তই করেছে।

পুরকায়স্থ মশাই হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসেছে।

—কী গো সচ্চরিত্র, তোমার বর কোথায়?

—বর আসছে বিশ্বাসমশাই, আপনি কিছু ভাববেন না, বাবাজীর সাহেবের গদীতে মালখালাস করতেই দেরি হয়ে গেল, তাই আমি তড়ি-ঘড়ি চলে এলাম, পাছে আপনি আবার ভাবেন!

—তা বর কার সঙ্গে আসছে?

—নাপিত বেটাকে রেখে এসেছি, নৌকোও তৈরি হয়ে আছে। আমি বাবা-জীবনকে বলে এসেছি দরকার হলে কাজ-কম্ম ফেলে তুমি চলে আসবে। চাকরি তোমার অনেক হতে পারে, বিয়েটা তো আর রোজ রোজ হয় না কারো—

পুরকায়স্থ মশাই এক জায়গায় চুপ করে থাকার মানুষ নয়। আজ যাচ্ছে মুর্শিদাবাদে, তার পর দিনই আবার ঢাকা। আবার তার পরই বর্ধমান। হাতে খাতাপত্র, খালি পা। সোজা রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে যেখানে একটু আশ্রয় মিললো সেখানেই রাতটা কাটিয়ে নিলে। তারপর আবার রওনা। নৌকোর মাঝিদের ডেকে হয়তো তাতেই উঠে পড়লো। তারপর সে-নৌকো যেখানে যাবে সেখানেই গিয়ে ওঠা। এমনি করেই জীবনটা কাটিয়ে দিলে সচ্চরিত্র।

তবু ভয় গেল না শোভারামের। জিজ্ঞেস করলে—বাবাজীবন ঠিক আসবে তো? মেয়ের বিয়ে আমার, বুঝতেই তো পারছো—

সচ্চরিত্র বললে—ঘটকালি করে করে আমার টাক পড়ে গেল বিশ্বাসমশাই, আর আমাকে আপনি শেখাচ্ছেন—

—তাহলে তুমি এগিয়ে যাও সচ্চরিত্র, একটু এগিয়ে গিয়ে দেখ বর আসছে কিনা—

—তাহলে চট্‌পট্‌ খাওয়াটা খেয়ে নিয়ে তারপর না হয় দেখছি! কী আয়োজন হয়েছে?

শোভারাম রেগে গেল। বললে—আগেই তোমার খাওয়া? বিয়ে না হতেই তোমার খাওয়ার দিকে নোলা?

ওদিকে তখন চিঁড়ে দই পড়ে গেছে। হুমড়ি খেয়ে পড়েছে তেলীপাড়ার লোক। সেই দিকে চাইতে চাইতে সচ্চরিত্র খাতা বগলে করে ছাতিমতলার ঢিবির দিকে বেরিয়ে গেল।

চালা-ঘরের ভেতরে তখন পাড়ার মেয়েরা মরালীকে নিয়ে পড়েছে। সকাল-বেলা গায়ে-হলুদ হয়ে গেছে। তখন থেকেই মেয়েদের ভিড়। ছোটবেলা থেকে দেখে এসেছে সবাই। এখন বিয়ের কনে হিসেবে সবাই নতুন করে দেখছে।

—কী গো, কনে কোথায়?

কথাটা কানে যেতেই সবাই পেছন ফিরলো। ওই দুগ্‌গা এসেছে। দুর্গাবালা। ছোটমশাই-এর বড়রানীর ঝি।

নয়ান পিসী বললে—হ্যাঁ গো দুগ্‌গা, এই তোমার আসবার সময় হলো গা?

দুগ্‌গা বললে—আমার কি একটা ঝামেলা দিদি, বড়রানীকে দুধ খাইয়ে এখন এলাম—দুগ্‌গাকে তোমাদের বলতে হবে না, দুগ্‌গা সকালবেলা এসে কনেকে নিয়ে রাজবাড়িতে ছোটমশাইকে দেখিয়ে নিয়ে এসেছে—

—ছোটমশাই মুখ দেখে কী দিলে?

ছোটমশাই একজোড়া কঙ্কণ গড়িয়ে রেখেছিল। বড়মশাই-এর আমলের নফর শোভারাম। তার মেয়ের বিয়েতে ভালো কিছু না দিলে চলে না। ছোটমশাই-এরও এখন আর সে-অবস্থা নেই। নবাব সরকারের খাজনা আরো বেড়ে গেছে। খাল্‌সা সেরেস্তায় কানুনগোর ডাক পড়ে এখন। ছোটমশাই-এর জমিদারি থেকে পুণ্যাহের দিন নবাব-সরকারের লোক যায়। গুণে গুণে মোহর দিয়ে নবাবের পায়ে নজর-পুণ্যাহ দিতে হয়। আর নজরানা কি এক-রকমের। মাথট্ চাই। আলগা খাজনা চাই। বয়খেলাৎ চাই। পোস্তাবন্দী চাই। তারপর আছে প্যাটোয়ারী, কানুনগো, মুন্সী, মুহুরীর পাওনা। নবাব সরকারের খাজনা দিতে গেলে শুধু মুখের কথায় হবে না। নবাবী কেল্লার সামনে আর লালবাগে ভাগীরথীতে পোস্তা বাঁধতে হবে—তার জন্যে পোস্তাবন্দী দাও। নবাবের ছেলের সাদি, নাতির সাদি, নাতনীর সাদি হবে, সব খরচা দিতে হবে জমিদারদের। অথচ বড়মশাই-এর সময়ে আগে শুধু ছিল আব্‌ওয়াব্ খাসনবীশী। খাল্‌সা সেরেস্তার আমীন মুৎসুদ্দি-দের পার্বণীর নাম করে সেটা নেওয়া হতো। তারপর দফায় দফায় বাড়তে লাগলো। শেষে কিছু আর বাদ রইলো না। কত রকমের আবওয়াব্। কত তার দাপট। সরকারী পিল্‌খানার খরচ হিসেবে দাও মাথট্ পিলখানা। হ্যান্ ত্যান্—কত কী!

যখন আদুরী ছিল, যখন বউ ছিল তখন শোভারামের এমন দুরবস্থা ছিল না। তখন গায়ের জোর ছিল। তখন শোভারাম বড়মশাই-এর কোরফা-প্রজা ছিল। কিন্তু তাও সময়মত খাজনা দিতে না-পারায় ইস্তাফাপত্র দিয়ে আসতে হলো সেরেস্তায়। টাকায় তিন-চার গুণ চালের দর। খাজনা দেবো কী দিয়ে। তারপর একদিন কেঁদে গিয়ে পড়লো বড়মশাই-এর কাছে। বড়মশাই-এর মান ছিল খাতির ছিল। প্রজাদের ওপর দয়া-মায়া ছিল। বড়মশাই বললেন—কোরফা ইস্তাফা দিয়ে তুমি খাবে কী শোভারাম?

শোভারাম হাত-জোড় করে বড়মশাই-এর পায়ের কাছে মাথা নিচু করে বলেছিল—হুজুরই আমার মা-বাপ, হুজুরের পায়ের তলাতেই পড়ে থাকবো—

—কাজ-কর্ম কী জানো?

—হুজুর যে-কাজ বলবেন তাই পারবো!

—তা পাইকের কাজ পারবে?

শোভারাম বলেছিল—আজ্ঞে বয়েস হয়েছে, এখন কি আর তেমন দৌড়-ঝাঁপ করতে পারবো?

বড়মশাই বলেছিলেন—আগের দিন হলে তোমার খাজনা মকুব করতে পারতাম শোভারাম, এখন নবাব-সরকার থেকে রোজই চিঠি আসছে মাথট্ দাও, মাথট্ না দিলে জমিদারি থাকবে না, প্যাটোয়ারী আর কানুনগোদের যা অত্যাচার—

বহুদিনের লোক শোভারাম। গড়বন্দী যখন মজবুত ছিল তখন থেকেই শোভারাম আছে হুজুরের কাছে। বাড়ির ভেতরে রানীমাদের কাছেও যাবার অধিকার আছে শোভারামের। কতবার রানীমার কাছে গিয়ে হাত-জোড় করে খাজনা মকুব করে এসেছে। সে মা-রানী আর নেই। এখন আর কার কাছে গিয়ে দাঁড়াবে।

বড়মশাই বলেছিলেন—তোমায় চাকরাণ জমি দেবো, এখন থেকে তুমি আমার ঘরের কাজই করবে, বুড়ো বয়েসে তোমার আর মেহনৎ করতে হবে না—

বড়মশাই-এর পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করতে গিয়ে সেদিন কেঁদে ফেলেছিল শোভারাম। সে বড়মশাই এখন আর নেই। শেষ জীবনে তীর্থে চলে গিয়েছিলেন।

যাবার সময় হাতিয়াগড়ের কাউকে আর অসন্তুষ্ট রেখে যাননি। বড়মশাই-এর তীর্থে যাবার কথাটা রটে যেতেই সবাই এসে হাজির। যার যা চাইবার চেয়ে নিয়ে গেল। বড়মশাই সামনে বসে থাকতেন নামাবলী গায়ে দিয়ে। পাশে জগা খাজাঞ্চী-বাবু টাকার থলি নিয়ে বসে আছে।

—কী রে, কী চাই তোর?

মাধব ঢালী মাথায় তেল-কুচকুচে চুল নিয়ে সামনে এসে দাঁড়ালো। নিচু হয়ে প্রণাম করলো। বললে—কিছু চাইনে আজ্ঞে, বড়মশাইকে পেন্নাম করতে এসেছি—

—ডাকাতি করছিস কেমন?

মাধব ঢালী লজ্জায় মাথা নিচু করলো। বললে—হুজুর, ডাকাতি করবার কি আর জো আছে—

—কেন, কী হলো আবার?

—আজ্ঞে, ডাকাতদের ধরে ধরে একেবারে আস্ত কোতল করছে, গোবিন্দপুরে আমাদের আর ঢোকবার সাহস-বল নেই—

—কেন, গোবিন্দপুরের হোগলা বনেই তো তোদের আড্ডা ছিল। কারা কোতল করছে?

—হুজুর ফিরিঙ্গী কোম্পানী! ও-দিকটায় বন কেটে শহর করতে লেগেছে সব, আমাদের অন্ন গেল আজ্ঞে—

বড়মশাই জগা খাজাঞ্চির দিকে চেয়ে বললেন—জগা, মাধব ঢালীকে পাঁচটা মোহর আর পঞ্চাশটা টাকা দিয়ে দাও তো—

প্রণাম করে চলে যাচ্ছিল মাধব ঢালী। বড়মশাই বললেন—দেখিস মাধব, আমি কাশী চলে যাচ্ছি, ছোটমশাই রইলো তোদের, তোদের হাতেই ছেড়ে দিয়ে গেলাম—

তারপর এল বিশু পরামানিক।

বিশু পরামানিককে কিছু বলতেই হলো না। বড়মশাই বললেন—জগা, বিশুর নামে বিলের ধারের দু বিঘে চাকরাণ জমি লিখে দাও তো, ওর বাপ আমাদের কামিয়েছে, ছেলেকে রেখে গেলাম রে, দেখিস তোরা, বুঝলি—

বিশু পরামানিক চলে গেল।

তারপর এল শোভারাম।

বড়মশাই বললেন—তোর কী চাই রে শোভারাম?

—আজ্ঞে চাইনে কিছু!

বড়মশাই হাসলেন। বললেন—বউ মরে গেছে বলে তুই বিবাগী হয়ে যাবি নাকি? তোর মেয়ে মরালী রয়েছে না? তার বিয়ে দিতে হবে না? কত বয়েস হলো মেয়ের?

—আজ্ঞে, এই গেল চোত-কিস্তির সময়ে সাত বছরে পা দিয়েছে।

—তা হলে? আর দেরি কেন? বিয়ে দিয়ে ফেল? মেয়ে দেখতে কেমন হয়েছে?

—আজ্ঞে, বাপ হয়ে আর কোন মুখে বলবো?

জগা খাজাঞ্চিবাবু পাশ থেকে বললে—আমি দেখেছি বড়মশাই, খুব সুন্দরী—

—তবে তো আর ঘরে রাখা ঠিক নয় রে। এখন নবাবী আমল, এ আমলে টাকাই বলো আর মেয়েমানুষই বলো, লুকিয়ে রাখতে না পারলেই সব বেহাত হয়ে যাবে, তুই বিয়ে দিয়ে ফেল—

শোভারাম বলেছিল—বিয়ে দিতে পারলে আমিও বাঁচি হুজুর, ভালো মতন একটা পাত্তোর যে পাচ্ছিনে—

—তা তোর যেমন অবস্থা তেমনি ঘরে দে, রাজা-মহারাজা খুঁজলে চলবে কেন?

শোভারাম বলেছিল—হুজুর, মেয়ের আমার খুব বুদ্ধি, একটা ভালো বুদ্ধিমান পাত্তোর পেলেই দু হাত এক করে দেবো—

—কী নাম রেখেছিস মেয়ের?

—ছোটমশাই নাম রেখেছেন মরালী। মরালীবালা।

বড়মশাই বলেছিলেন—মা-মরা মেয়ের অত নামের বাহার তো ভালো নয় রে, ওতে যে মেয়ের অকল্যেণ হয়। ওকে মরুণী বলে ডাকিস, তাতে মেয়ে বেঁচে থাকবে, মেয়ের পরমাই বাড়বে—

তা সেই মেয়েরই আজ বিয়ে। বড়মশাই বেঁচে থাকলে আজ আনন্দ করতেন খুব। তীর্থ করতে তিনি সেই যে কাশীধামে চলে গেলেন তারপর বেশিদিন বাঁচলেন না আর। আর চিরকাল কে আর বেঁচে থাকতে এসেছে সংসারে। শোভা-রামও একদিন চলে যাবে। মেয়ের বিয়েটা দিয়ে দিলেই তার কাজ শেষ। তারপর ঝাড়া হাত-পা। কারো আর পরোয়া করবার দরকার নেই।

শোভারামের সেই বিয়ে-বাড়ির হুজুগের মধ্যেই সেইসব দিনের কথা মনে পড়তে লাগলো।

যাবার সাতদিন আগে থেকে হাতিয়াগড়ের হাটের আটচালার নিচে জগা খাজাঞ্চিবাবু থলি ভর্তি টাকাকড়ি নিয়ে বসে থাকতো।

চিৎকার করে বলতো—হুজুরের কাছে কার কী পাওনা আছে, বলো গো তোমরা—

দেনা রেখে তীর্থে যেতে নেই তাই এই ব্যবস্থা। লেখাপড়া না থাক, হাত-চিটে না থাক, নথিপত্র দলিল দস্তাবেজ কিছুই দাখিল করতে হবে না। শুধু মুখ ফুটে চাইলেই জগা খাজাঞ্চি দিয়ে দেবে। কিন্তু একটা লোকও আসতো না টাকা নিতে।

জগা খাজাঞ্চি ডাকতো—ও মোড়লের পো, তোমার কিছু পাওনা আছে নাকি গো?

মোড়লের পো জিভ কাটতো। বলতো—কী যে বলেন খাজাঞ্চিমশাই, মিথ্যে বলে কি নরকে যাবো নাকি?

কেউ কিছু নিতে এল না। এমনি করে একদিন তীর্থে চলে গেলেন বড়মশাই। হুজুগের সঙ্গে সঙ্গে যেন গাঁয়ের হাওয়াও বদলে গেল। এখান থেকে গঙ্গার পথ ধরে বজরা ছেড়ে দিলে। ঘাটের ধারে এসে দাঁড়ালো সবাই। তর্কপঞ্চানন মশাই সংস্কৃতে কী সব বললেন। আশীর্বাদ করলেন। সঙ্গে মা-রানী। তিনিও মাথায় ঘোমটা দিয়ে বজরার ভেতরে গিয়ে বসলেন। সঙ্গে ঝি-চাকর-দরোয়ান গেল অন্য নৌকোতে।

শোভারাম গিয়ে বড়মশাই-এর পায়ে হাত দিলে।

বড়মশাই বললেন—কে রে? শোভারাম বুঝি?

তারপর হাসতে হাসতে বললেন—মরুণীর বিয়ের সময় নেমন্তন্ন করতে ভুলিস নে রে শোভারাম—

শেষদিকে বড়মশাই-এর পা-টেপা থেকে শুরু করে তেল-মাখানো পর্যন্ত সমস্ত করতো শোভারাম। মা-রানী শোভারামের সামনে বেরোতেন। বলতেন—

তোমার মেয়েকে একদিন নিয়ে এসো শোভারাম, দেখবো—

তা মরালীকে দেখে মা-রানীর কী আহ্লাদ!

বললেন—এ যে দুগগো প্রতিমে রে শোভারাম, এই তোর মেয়ে?

—হ্যাঁ, মা-জননী!

তারপর মরালীর দিকে চেয়ে শোভারাম বলেছিল—প্রেণাম কর্ মা-জননীকে, বল্ আশীর্বাদ করো মা যেন তোমার মত পুণ্যবতী হই, ভালো করে প্রেণাম কর, মাথা ঠেকিয়ে প্রেণাম কর—

নিজের মেয়ে হয়নি বলে মা-রানী বড় আদর করেছিলেন মরালীকে।

বলেছিলেন—এ মেয়ে তোর খুব সুলক্ষণা রে, মেয়েকে যত্ন করিস—

যত্ন আর কী করবে শোভারাম! জীব দিয়েছেন যিনি আহার দেবেন তিনিই। মেয়ে নিজেই খুব সেয়ানা হয়ে উঠলো বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে। সাত বছর যখন মরালীর বয়েস, তখন থেকেই সাজবার সখ। পান খেয়ে ঠোঁট লাল করে পাড়ায় পাড়ায় বেড়াতো। রাস্তায় যাকে দেখবে তাকেই ডাকবে। বলবে—ও বিদ্যেধর, বিদ্যেধর—

বুড়ো মানুষ বিদ্যেধর। বড়মশাই-এর বাড়িতে মাটির হাঁড়ি-কুঁড়ি যোগান দেয়। কুমোরপাড়ায় সাত পুরুষের বাস। বাপের বয়েসী মানুষ। ভালো মানুষ গোছের চেহারা। সেও অবাক হয়ে যায়।

মরালী বললে—তুমি অমন করে আমার পানে চাইছ কেন গা?

—ওমা, তোমার দিকে আবার কখন চাইলাম গো দিদি?

মরালী বললে—না, চেও না, মেয়েমানুষের পানে অমন করে তাকাতে নেই—

বিদ্যাধর তো অবাক হয়ে গেল।

মরালী আবার বললে—তোমরা কেমন বেটাছেলে গা, গাঁয়ে আর দেখবার জিনিস নেই, মেয়েছেলের পানে চাওয়া?

শোভারামের কাছে গিয়েও অনেকে বলতো—এ মেয়ে তোমায় জ্বালাবে অনেক, মেয়ের বিয়ে দিয়ে ফেল শিগ্‌গির—

তা বিয়ে ওমনি দেবো বললেই কি দেওয়া যায়। কথায় বলে হাজার এক-কথায় বিয়ে। জাত-কুল-বংশ-স্বভাব সব কিছুই দেখতে হবে তো! বড়মশাই জাত নিয়ে বড় মাথা ঘামাতেন।

বলতেন—তোরা কী জাত রে শোভারাম?

শোভারাম বলতো—আমরা সৎশূদ্র বড়মশাই—

—সৎশূদ্র? সে আবার কী রে?

সিদ্ধান্তবারিধি মশাই পাশেই থাকতেন। তিনি বলতেন—আজ্ঞে সৎশূদ্র কথাটা বড় গোলমেলে বড়মশাই, শাস্ত্রে আছে—

গোপো মালী চ কাংসার তন্দ্রিসাংখিকাঃ।
কুনাল কর্মকারশ্চ নাপিতো নব শায়কাঃ।
তৈলিকো গান্ধিকো বৈদ্য সচ্ছূদ্রাশ্চ প্রকীর্তিতা।
সচ্ছূদ্রানান্ত সর্বেষাং কায়স্থ উত্তম স্মৃতঃ—

বড়মশাই জিজ্ঞেস করতেন—অর্থ?

—ওর অর্থ বড় গোলমেলে বড়মশাই, অর্থাৎ আপনিও যা ও-ও তাই, তবে ওর বাড়িতে ক্রিয়াকর্মে আমরা দক্ষিণে নেবো, কিন্তু সিধা গ্রহণ নিষেধ, তার জন্যে

অর্থমূল্য ধরে দিতে হবে, আর আপনার বাড়িতে সিধাও নেবো, কিন্তু অর্থ-মূল্যের পরিবর্তে স্বর্ণমূল্য! হিন্দুধর্মের ওই তো মজা হুজুর, এখানে অনাচারটি পাবেন না—

—সেই জন্যেই বুঝি তোর মেয়ের পাত্র পাচ্ছিসনে?

শোভারাম বলতো—আজ্ঞে পাত্র পাচ্ছি, সুতোনুটিতে আমাদের স্বঘরের একটি পাত্র পাচ্ছি—আপনি যদি হুকুম করেন...

কথা শেষ হবার আগেই বড়মশাই ক্ষেপে উঠতেন। স্লেচ্ছদের সঙ্গে ওঠা-বসা করে তাদের কি জাত আছে নাকি? স্লেচ্ছদের ছোঁয়া জল খায়, স্লেচ্ছদের কাছে চাকরি করে, তার সঙ্গে শোভারাম মেয়ের বিয়ে দেবে? বরাবর বড়মশাই তাতে বাধা দিয়েছেন। আর পাত্র পেলি না?

তা এখন সেই বড়মশাইও নেই, এদিকে মেয়েরও বয়েস বেড়ে যাচ্ছে। শেষ-কালে মেয়ের সামনে শোভারামের গলা দিয়ে আর ভাত নামতো না। গাঁয়ের লোক শেষকালে শোভারামকে একঘরে করেই ছাড়তো। নেহাত ছোটমশাই ছিলেন বলে এতদিন কেউ ধোপা-নাপিত বন্ধ করেনি। যাক, এতদিনে শোভারামের গলা থেকে কাঁটা নামলো। এখন ভালোয় ভালোয় সম্প্রদানটা হয়ে গেলে হয়।

হঠাৎ দৌড়তে দৌড়তে হরিপদ এসে হাজির।

—দাদা, ওদিকে সব্বনাশ হয়েছে—

—কী সব্বোনাশ রে? বর আসেনি? বরকে দেখলিনে?

হরিপদর মুখের কথা তখন আটকে গেছে। বললে—তুমি একবার ছোটমশাইর কাছে চলো, বিপদ হয়েছে ওদিকে—

—বিপদ? বিপদটা আবার দেখলি কোথায়? বর না এলে যে পাতক হয়ে যাবো রে! বলছিস কী তুই?

হরিপদ ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বললে—সেপাই দেখে আমরা বড্ড ভয় পেয়ে গেছি দাদা! ফৌজদারের সেপাই!

—ফৌজদারের সেপাই!

—হ্যাঁ দাদা, ছোটমশাই-এর বাড়ির নিশেনা চাইলে আমাদের কাছে, ঘোড়া ছুটিয়ে আসছিল!

—তা ফৌজদারের সেপাই ঘোড়া ছুটিয়ে এল তো আমার কী! আমি কি খাতক না উঠবন্দী প্রেজা যে, বাকি খাজনার দায়ে আমায় নিজামতি-কাছারিতে টেনে নিয়ে যাবে! সচ্চরিত্র কোথায় গেল? সে-বেটারই তো যত নষ্টামি! সে বরকে সঙ্গে না-নিয়ে আসে কেন? সে কি নেমন্তন্ন খেতে এসেছে? কোথায় গেল সে?

চেঁচামেচিতে কিছু লোকজন এসে দাঁড়ালো। কী হলো শোভারাম! বর আসছে না? নয়ান পিসীও গোলমাল শুনে এসে হাজির। দুগ্গাও এসে সব শুনলো। গালে হাত দিয়ে বসলো সবাই। সর্বনাশের মাথায় পা। এখন যদি বর সত্যি-সত্যি না-আসে তো কী হবে। শোভারামের জাত-কুল কী করে থাকবে! শোভা-রামের মেয়ের অবস্থাটা কী হবে! এর পর কেউ কি আর তার হাতের ছোঁয়া জল খাবে! কেউ তার মুখদর্শন করবে? আহা গো, বড় সে তার ভাতারের সখ! সেই তোর কপালেই এমন হতে হয়। চারদিকে মরাকান্নার রোল উঠলো। জাত-কুল-জন্ম-ধর্ম-কর্ম সব যে রসাতলে গেল পোড়াকপালীর।

পুরুতমশাইও সব শুনছিলেন। তিনি এবার এগিয়ে এলেন শোভারামের

কাছে। বললেন—কী করবে এখন ভাবো বাবাজী, এ তো সহজ কথা নয়—

শোভারামের তখন আর মাথার ঠিক নেই, বললে—দেখি, সেই সচ্চরিত্র ঘটক-বেটা কোথায় গেল, বেটা নামেই সচ্চরিত্র কেবল—

পুরুতমশাই বললেন—তাকে পরে খুঁজলে চলবে, এখন লগ্ন বয়ে যাচ্ছে। মেয়ের সদ্‌গতি কীসে হবে তাই আগে ভাবো তুমি—গাঁয়ে আর পাত্র নেই?

—নতুন পাত্র এক্ষুনি কোথায় পাই?

—কেন, হরিশ তো রয়েছে, কুমোর পাড়ার হরিশ জোয়ান্দার—

শোভারাম আগুন হয়ে উঠলো—তার সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে দেবো, আপনি বলছেন কী? তার ছ'টা বউ, তা জানেন—

—তা ছটা বউ আছে, না-হয় সাতটাই হবে, সে-সব এখন ভাবলে চলে? আগে জাত, না আগে মান!

—তার চেয়ে আমার মেয়েকে আমি জলে ডুবিয়ে মারবো না! সাতটা নয় পাঁচটা নয়, ওই আমার একটা মাত্তোর মেয়ে। আমি কি জেনেশুনে মেয়েকে মেরে ফেলবো?

—তা হলে তুমি যা ভালো বোঝ তাই করো! তোমার বাড়িতে তাহলে কিন্তু যাগ-যজ্ঞ ক্রিয়া-কলাপ সব আমাদের বন্ধ—আমি তাহলে আসি—

শোভারামের মাথায় তখন বজ্রাঘাত হলেও বুঝি ভালো ছিল। তাড়াতাড়ি পুরুতমশাই-এর সামনে হাতজোড় করে বললে—আপনি আমাকে একটু ভাবতে দিন ঠাকুরমশাই, আমি একবার নিজে গিয়ে দেখি বর আসছে কি না—

পুরুতমশাই বললেন—কিন্তু লগ্ন তো আর তোমার মেয়ের জন্যে বসে থাকবে না বাবাজী—লগ্ন উতরে গেলে যে মহাসর্বনাশ হয়ে যাবে, তার খেয়াল আছে—

—কিন্তু পাত্র তো খুঁজে বার করতে হবে, তাতেও তো সময় লাগে—

পুরুতমশাই বললেন—পাত্রের কি অভাব, ছোটমশাই-এর অতিথিশালায় গিয়ে একবার খোঁজ করে কাউকে ধরে-বেঁধে নিয়ে এসো না—আগে জাতটা তো রক্ষে হোক, তারপরে না-হয় স্বভাব-চরিত্র-বংশ-কুলুজী দেখবে—

হরিপদর মাথায় আসেনি কথাটা। তাড়াতাড়ি বলে উঠলো—তাই যাই দাদা, অতিথিশালাটা একবার দেখে আসি—

বলে আর কারো কথায় কান না-দিয়ে হরিপদ সোজা রাজবাড়ির দিকে ছুটলো।

হাতিয়াগড়ের ছোটমশাই-এর বাড়িতে অতিথিশালা ছিল। বড়মশাই-এর আমলেই নতুন করে অতিথিশালাটা সারিয়ে বড় করা হয়। বাংলাদেশের নানা জায়গা থেকে হাঁটা-পথে যে-সব বাউল-ফকীর-উদাসী-ভবঘুরে লোক হাতিয়াগড়ে আসতো তাদের থাকবার জন্যে সব ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। তারা সিধে পেত। মাথাপিছু ডাল-চাল-কাঁচকলা-নুন-তেল-কাঠ-হাঁড়ি-মশলা সবই বরাদ্দ ছিল।

বড়মশাই-এর জগা খাজাঞ্চিবাবুকে রোজকার হিসেব দিতে হতো। রামেশ্বর সরকার নিজে গিয়ে সামনে বসে হিসেব বুঝিয়ে দিত জগা খাজাঞ্চিবাবুকে।

—আজ ক'জন?

—আজ্ঞে, আজ এককুড়ি দুজন।

—তা এককুড়ি দুজনে আধমণ চাল খেয়ে ফেললে?

বড়মশাই বলতেন—থাক জগা, ও নিয়ে আর তুমি সময় নষ্ট করো না, রামেশ্বর তো মিছে কথা বলছে না।

—আজ্ঞে হুজুর, আধমণ চালে যে পরশুদিন চল্লিশজন লোক ভাত খেয়েছিল।

—তা থাক, দুটো পেটে-খাবে তাও দিতে পারবো না আমি? পেটেই তো খেয়েছে, কোঁচড়ে করে তো বাড়ি নিয়ে যায়নি।

আবার এক-একদিন হয়তো কেউ-ই আসতো না। সেদিন অতিথিশালা খাঁ খাঁ করতো। অতিথিশালার দাসী-মুনিষরা সেদিন কেউ রোদ্দুরে পা ছড়িয়ে কাঁথা সেলাই করতো, কেউ বা চাল-ডাল বাছতে বসতো। বিরাট রাজবাড়ি। এ-মহল থেকে ও-মহলে যেতে গেলে পাড়া-বেড়ানো হয়ে যায়। কিন্তু এক-একদিন যখন অতিথিশালায় ঝগড়া বাধে সেদিন বাড়ির ভেতরে সকলের কানেই যায়। ঝগড়া বাধে অতিথিদের মধ্যেই। কর্তাভজার সঙ্গে হয়তো ঝগড়া বাধে বলরামভজার দলের। কিংবা সাহেব-ধনীদের সঙ্গে আউলচাঁদের দলের ঝগড়া। কত রকম সাধু, কত রকম ধর্ম। ধর্মের বিচার অত সহজ নয়। কর্তাভজারা বলে—'লোকের মধ্যে লোকাচার, সদ্‌গুরুর মধ্যে একাকার।'

লোকে জিজ্ঞেস করতো—আপনি কে গো?

তারা বলতো—আমরা কর্তাভজা বাবা—আমরা হলাম বরাতি—

—বরাতি মানে?

বাউলরা বলতো—ওদের কথা ছেড়ে দাও বাবাজী, ওদের মধ্যে ওইসব আছে, কে গুরু কে বরাতি তাই নিয়ে ওরা মাথা ঘামায়—আমাদের ওসব বালাই নেই—

ও-সব নেই বটে, কিন্তু ঝগড়া যখন বাধে তখন হয়তো একটা সামান্য জিনিস নিয়েই বাধে। একই উঠোনের মধ্যে কেউ আলখাল্লা কেচে শুকোতে দিয়েছে, তা আর পাওয়া যায় না। সামান্য একটা আলখাল্লা। ছেঁড়া তালিমারা জিনিস। কারটা একদিন কে গায়ে দিয়ে ভোর-ভোর অতিথিশালা ছেড়ে চলে গিয়েছে। তখন সেই নিয়েই চিৎকার শুরু হয়ে যায়। গলা ছেড়ে চিৎকার করে—যত বেটা চোর-ছ্যাঁচড়ের আমদানী হয়েছে অতিথিশালায়,—সাধু-সন্নিসীদের আর থাকা যায় না এখেনে—

আর একজন এককোণে এতক্ষণ শুয়েছিল। সে চেঁচিয়ে উঠলো—চোর-ছ্যাঁচড় বলছো কাকে শুনি, আমি চোর—?

—তুমি চুপ করো তো হে, তুমি তো বলরামভজার লোক—

লোকটা আউলচাঁদের দলের। চিৎকার করে ঘুঁষি বাগিয়ে লাফিয়ে আসে—তবে রে শালা—

তারপরে সেই অতিথিশালার মধ্যে যে কাণ্ড শুরু হয় তাতে সকলের জড়ো হবার পালা। হাতাহাতি মারামারি পর্যন্ত গিয়ে ওঠে। কর্তাভজার সঙ্গে বলরাম-ভজার, আউলচাঁদের সঙ্গে সাহেবধনীর ঝগড়া। তখন সকলের ভেতরের মানুষটা বেরিয়ে আসে। এমনিতে কেউ কারো ছোঁয়া খায় না, ছায়া মাড়ায় না। কিন্তু মারামারি হলে তখন আর জ্ঞান-গম্যি থাকে না কারো। তখন জগা খাজাঞ্চিবাবু পর্যন্ত দৌড়ে আসে। বলে—বেরোও এখান থেকে, বেরোও—

একজন বলে—আমি কেন বেরোব, আমি কি জাত ভাঁড়িয়ে বোষ্টম? ও আগে চাঁড়াল ছিল তা জানেন খাজাঞ্চিবাবু? ওর মেসো এখনো ঢাকায় শ্মশান-ঘাটে মড়া পোড়ায়—

—আর তুই বুঝি ভালো জাত? তুই যে পোদ্! পোদ্ থেকে হইছিস্ কর্তা-ভজা? পোদের জল চলে? বলুন তো খাজাঞ্চিবাবু, পোদের জল চলে?

যেদিন উদ্ধব দাস থাকে, সেদিন সবাই তাকে সাক্ষী মানে। বলে—তুমি বলো তো বাবা, তুমি বলো তো, পোদ্ কি ছোট জাত?

—তা চাঁড়ালের থেকে তো ছোট বটে! বলো না উদ্ধব দাস, বলো না—

উদ্ধব দাস শুধু হাসে। অনেক পীড়াপীড়ি করলে বলে—আমার এখন ক্ষিধে পেয়েছে ভাই, এখন ঝগড়া করবার ক্ষেমতা নেই—তোমরা ঝগড়া করো আমি শুনি—

তারপর হঠাৎ গান গেয়ে ওঠে—

হরি কে বুঝে তোমার লীলে।
ভাল প্রেম করিলে।
হইয়ে ভূপতি, কুব্জা যুবতি পাইয়ে শ্রীপতি,
শ্রীমতী রাধারে রহিলে ভুলে।
শ্যাম সেজেছ হে বেশ, ওহে হৃষীকেশ,
রাখালের বেশ এখন কোথা লুকালে।
মাতুল বধিলে প্রতুল করিলে।
গোপ-গোপীকুলে, অকূলে ভাসায়ে দিলে॥

উদ্ধব দাস গান গাইলে সবার ঝগড়া থেমে যায়। উদ্ধব দাসের গানের আদর সর্বত্র। ওই গানের জন্যেই তার খাতির। একটা যন্ত্র নেই, ডুগি-তবলা নেই, এক-তারাও নেই। শুধু-গলায় গান গায় উদ্ধব দাস। উদ্ধব দাস বামুনও নয়, চাঁড়ালও নয়, পোদও নয়। উদ্ধব দাস বলে—আমি কর্তাভজা-বলরামভজা আউল-বাউল-সাহেবধনী কিছুই নই গো—

—তাহলে তুমি কী?

—আজ্ঞে আমি উদ্ধব দাস। হরির দাস—

শুধুই উদ্ধব দাস! অতিথিশালায় এলে কেউ জিজ্ঞেস করলেই ওই নামটা শুধু বলে। কোত্থেকে আসছো, কোথায় যাবে, তারও উত্তর নেই। কোথায় যাবো তা কি কেউ বলতে পারে ঠাকুর? আজকে এখানে এসেছি, কাল বাঁচবো কি না কে বলতে পারে?

এই অতিথিশালাতেই হরিপদর সঙ্গে ভাব হয়ে গিয়েছিল উদ্ধব দাসের। উদ্ধব দাসের না আছে কোনো শখ, না আছে কোনো বিকার। যা দাও তাই খাবে। দুটি খেতে পেলে আর কিছু চায় না। এইখানেই হরিপদ প্রথম দিন এসে ধরেছিল উদ্ধব দাসকে।

বলেছিল—তুমি কে গো?

—আমি উদ্ধব দাস।

হরিপদ বলেছিল—শুধু উদ্ধব দাস বললে চলবে না, তোমার বাড়ি কোথায়, তুমি কী করো—

উদ্ধব দাস রেগে গিয়ে বলেছিল—এই দেখ, তুমি তো আমাকে জ্বালালে হে! যখন যেখানে থাকি সেই-ই আমার বাড়ি, সেই আমার ঘর।

—কী করো তুমি?

—দুনিয়াতে কে কী করে শুনি? করনেওয়ালা তো মাথার ওপর। সে যা করাচ্ছে তাই সবাই করছি। আকবর বাদ্শা যা করে গেছে, তোমার ছোটমশাই যা

করছে, আমিও তাই করছি—খাচ্ছি দাচ্ছি আর ভ্যারেন্ডা ভাজছি—

সেই থেকেই হরিপদ মজা করতো উদ্ধব দাসকে নিয়ে। অতিথিশালায় যারা আসে তাদের মত জ্বালাতন করে না হরিপদকে। দাও খাবো, না-দাও খাবো না। খুশি হয়ে একখানা গান শুনিয়েছিল উদ্ধব দাস। তার পরদিনই হরিপদ এসে বললে—দাসমশাই, তোমাকে চুপি-চুপি একটা কথা বলবো, সেই গানটা একবার গাইতে হবে—

—কী গান?

—ওই যে কালকে গেয়েছিলে? আমাদের দুগ্‌গা তোমার গানটা শুনতে চেয়েছে!

—দুগ্‌গা? দুগ্‌গা কেগো? মা-দুগ্‌গা?

—আরে দূর, আমাদের দুগ্‌গা। আমাদের বড় রানীর পেয়ারের ঝি।

দুগ্‌গার কথা সেই প্রথম শুনলো উদ্ধব দাস। দুগ্‌গা হলো রাজবাড়ির পাট-ঝি। দুগ্‌গা না হলে কোনো কাজই হবে না অন্দরমহলে। বড় রানীর বিয়ের সময় বাপের বাড়ি থেকে নতুন-বৌএর সঙ্গে সঙ্গে এসেছিল। তারপর ছোটমশাই আবার একটা বিয়ে করেছে, কিন্তু সেই ছোট রানীও দুগ্‌গার হাতের মুঠোর মধ্যে।

উদ্ধব দাস বললে—তা সেটা যে রসের গান গো হরিপদ, সে গান মেয়েছেলে শুনবে?

হরিপদ চোখ মটকে বলেছিল—রসের গান বলেই তো শুনবে। তুমি তো জানো না দাসমশাই, দুগ্‌গার বড় রস—

—কী-রকম?

—হ্যাঁ, যা বলছি তাই। ওই রসেই তো একেবারে মজিয়ে দিয়েছে রানীদের। তুমি বিয়ে-থা করোনি ও-সব বুঝবে না—

তা সেইদিন দুপুরবেলাই ব্যবস্থা হয়েছিল গানের। কেউ ছিল না তখন। রান্নাশালার বামুন-ঠাকুর কাজকর্ম সেরে বাইরে গিয়েছে। বেশ করে কড়াইএর ডাল দিয়ে ভাত মেখে পেট ভরে খেয়ে একটু তন্দ্রা মতন এসেছিল, এমন সময় হরিপদ এসে ঠেলা মারলে। বললে—ওঠো দাসমশাই—চলো—

—কোথায় গো?

—চলো, দেরি করো না, ছোট রানী গান শুনবে বলে বসে আছে দরদালানে—

উদ্ধব দাস এমনিতে উদাসী মানুষ কিন্তু কথাটা শুনে ভয় পেয়ে গেল। রসের গান শুনে যদি ছোটমশাই রাগ করে। রসের গান কি যাকে-তাকে শোনানো যায়। রসিক ছাড়া কি রস বোঝে কেউ?

হরিপদ বললে—আরে, রসের গান শুনতেই তো ছোটরানী চায়, ওই তোমার ভক্তি-রসের গান নয়, ছোট রানীর কাঁচা বয়েস এখন, রস করবে না তো কি হরি-নামের মালা জপবে?

—ছোট রানীর কাঁচা বয়েস?

হরিপদ বলেছিল—কাঁচা বয়েস হবে না? ছোটমশাইএর যে দ্বিতীয় পক্ষের বউ—বড় রানীর ছেলে হলো না, তাই তো ছোট রানীকে ঘরে এনে তুলেছে—

—ছোট রানীর ছেলে হয়েছে?

এবার বিরক্ত হয়ে গেল হরিপদ। কথা যদি বলবে তো গান গাইবে কখন দাসমশাই। ততক্ষণে ভেতর-বাড়ি পেরিয়ে রাণীবিবি এসে গেছে। সেই কোথায় অন্দর মহল। একটা মহলের পর আর একটা মহল। এমনি সাতটা মহল পেরিয়ে

তবে অতিথিশালার দোতলার দরদালানে আসতে হয়। সেখানে পঙ্খের কাজ করা ইঁটের জাফরির ফাঁক দিয়ে উঠোনের ভেতরটা সব দেখা যায়। ভেতর থেকে কার গলা শোনা গেল—কই রে হরিপদ, গান করতে বল—

হরিপদ বললে—ওই দুগ্‌গা—আরম্ভ করে দাও গো—ছোট রানী দরদালানে এসে হাজির হয়েছে—

—কোন্ গানটা গাইবো?

—রসের গান, মেয়েছেলেরা রসের গানই চায় যে দাসমশাই—

উদ্ধব দাস আরম্ভ করলে—প্রাণ রে, পীরিতের কথা আর বোল না—

হরিপদ বাহবা দিয়ে উঠলো—বাঃ বাঃ, খাসা—

প্রাণ রে, পীরিতের কথা আর বোল না।
পীরিত করলাম প্রাণ জুড়াতে
বুকে ধরলাম প্রাণনাথে
তাতে আমার বুকের জ্বালা বাড়লো বই কমলো না।
প্রাণ রে পীরিতের কথা আর বোল না।

হরিপদ আর থাকতে পারলো না। চিৎকার করে উঠলো—বা দাসমশাই, বেশ—বেশ—

প্রাণ রে, তুষের আগুনে ছিল ভাল।
আমিও ছিলাম প্রাণও ছিল।
এ যে আমিও গেলাম প্রাণও গেল
সবই হলো ভস্মীভূত, আমার কিছুই রৈল না।
প্রাণ রে, পীরিতের কথা আর বোল না।

হরিপদ আবার বাহবা দিতে যাচ্ছিল, তার আগেই উদ্ধব দাস গান থামিয়ে দিয়েছে। মুখ ফিরিয়ে বললে—গড় হই গো খাজাঞ্চিমশাই—

—কে তুই?

জগা খাজাঞ্চিবাবু এমনিতে এখানে আসে না। কিন্তু হয়তো নির্জন দুপুর-বেলায় গানের শব্দ শুনে ঢুকে পড়েছে।

নটবর বললে—ও উদ্ধব দাস, খাজাঞ্চীমশাই—

খাজাঞ্চিমশাই বললে—ওই সব গান দুপুরবেলা এখানে কে গাইতে বলেছে তোকে, বেরো এখান থেকে, বেরিয়ে যা—কে ঢুকতে দিয়েছে তোকে—

উদ্ধব দাস বললে—অভাজনের নিবেদন শুনুন প্রভু—

শুন ভাই সভাজন, অভাজনের নিবেদন।
একে একে শ্রীরামচন্দ্রের কহি বিবরণ।
দেখ ভাই শ্রীরামচন্দ্র জগৎচন্দ্র কোথা হবেন রাজা।
তাহাতে কৈকেয়ী মাগী দিলেন আচ্ছা সাজা।
পরিয়ে জটা বাকল আর সকল ত্যজি অলঙ্কার।
পাঠাইল অরণ্যেতে চতুর্দশ বৎসর।
রাম নিজ গুণে ভ্রমেণ বনে যথায় তথায়।
সীতা সতী গুণবতী দারুণ কষ্ট পায়।
শুন একদিন দৈবাধীন আসি রাবণেরা...

খাজাঞ্চিবাবু আর থাকতে পারলে না। বললে—ওরে বাবা, এ যে আবার ছড়া কাটে রে—

হরিপদ বললে—আজ্ঞে, কালকে ও আমাদের মান-ভঞ্জনের পালা শুনিয়েছে—

উদ্ধব দাস বললে—আমি মান-ভঞ্জন পালা গাইতে পারি, কালীয়-দমন পালা গাইতে পারি, অধীনের গুণের সীমে নাই প্রভু, আজ্ঞা হয় তো গাই এখন—

খাজাঞ্চিবাবুর তখন অত সময় নেই। বললে—এ কোত্থেকে আমদানি হলো রে হরিপদ?

হরিপদ বললে—আজ্ঞে সেবার সেই এক সন আগে একবার এসেছিল, আবার এসে জুটেছে, গান-টান গায় বলে আর তাড়িয়ে দিইনি, ভারি নির্ঝঞ্ঝাট লোক, দুটো ভাত পেলেই খুশী আর অতিথিশালায় পড়ে থাকে—

তারপর উদ্ধব দাসের দিকে চেয়ে বললে—দাসমশাই, তোমার সেই মাথুরটা শোনাও না একবার খাজাঞ্চিমশাইকে—

উদ্ধব দাসকে আর দু'বার বলতে হয় না। বাঁকা হয়ে দাঁড়িয়ে এক কানে হাত চাপা দিয়ে গায়—

এ যমুনা পারে কে আনিতে পারে
আমরা ব্রজের কুলবালা।

খাজাঞ্চিমশাই চেঁচিয়ে উঠলো—দূর হ, দূর হ—বড় বউরানীর কানে গেলে হয়েছে আর কি—

উদ্ধব দাস বললে—সবই আমার নিজের তৈরি প্রভু—

হরিপদ বললে—হ্যাঁ খাজাঞ্চিবাবু, মুখে মুখে হেঁয়ালী বানায় আবার—

উদ্ধব দাস বলতে লাগলো—বলুন তো প্রভু কী?

সূর্য বংশে জন্ম তার অজ রাজার নাতি।
দশরথ পুত্র বটে নয় সীতাপতি।
রাবণের অরি নয় লক্ষ্মণের জ্যেষ্ঠ।
ভণে কবি উদ্ধব দাস হেঁয়ালীর শ্রেষ্ঠ।

হরিপদ জিজ্ঞেস করলে—বলুন তো খাজাঞ্চিমশাই, এর উত্তর কী হবে?

খাজাঞ্চিমশাই বললে—দূর, এসব ভাববার সময় আছে আমার! তোর দেশ কোথায়?

উদ্ধব দাস ছড়া কেটে উঠলো—

আমার কাজ কি সংসারে হরি।
আমি রাধার দুঃখে গোকুল ছেড়ে হৈলাম দেশান্তরী।

—দেখলেন তো খাজাঞ্চিমশাই, ছড়ার নমুনো দেখলেন তো। গরীব লোক, অতিথিশালায় উঠেছে, থাক না ক'দিন, আপনি যেন আর কিছু বলবেন না—

খাজাঞ্চিবাবু আর কিছু বললে না। ব্যাজার হয়ে চলে গেল। সব রস মাটি। ভেতরে দুগ্‌গাও বোধ হয় ছোট রানীকে নিয়ে অন্দর মহলে চলে গিয়েছে। সেদিক থেকেও আর কোনো সাড়া-শব্দ নেই। আর গান জমবে না।

উদ্ধব দাস বললে—আমিও যাইহে—

—কেন? তুমি আবার যাবে কী করতে?

—নেমন্তন্ন খেতে ইচ্ছে করছে। অনেক দিন নেমন্তন্ন খাইনি—

—তা কী খাবে বলো না; ভোগবাড়িতে বলে দিচ্ছি, রান্না করে দেবে!

উদ্ধব দাস বললে—মুগের ডাল—

—আরে এই সামান্য কথা, তার জন্যে ভাবনা, আজই মুগের ডাল রেঁধে দেবো তোমায়—

উদ্ধব দাস পোঁটলা-পুঁটলি নিয়ে উঠলো। বললে—দূর, তোমাদের মুগের ডাল আর খাচ্ছি আমি, আমি চললুম—

—কী গো? সত্যি সত্যিই যাচ্ছো? কোথায় যাচ্ছো?

—কেষ্টনগরে।

—হঠাৎ কেষ্টনগরে কেন?

—ওই যে মুগের ডালের কথা মনে পড়ে গেল, যাই, কেষ্টনগরের রাজাবাবুদের বাড়ি যাই, অমন মুগের ডাল কোথাও খাইনি গো—

এমনি করে উদ্ধব দাস এই হাতিয়াগড়ের অতিথিশালায় অনেকবার এসেছে গেছে। হরিপদর সঙ্গে হাসিতামাশা করেছে। বাড়ির ছোটরানীকে গানও শুনিয়েছে। যেমন মুগের ডাল খেতে একদিন হঠাৎ কেষ্টনগরে চলে যায়, তেমনি আবার হয়তো কয়েকদিন এখানেই পড়ে থাকে। অতিথিশালায় দুটো ভাত পেলেই খুশী। তাড়িয়ে দিলেও ব্যাজার নেই। আবার হয়তো একদিন পোঁটলা-পুঁটলি নিয়ে কোথায় বেরিয়ে পড়ে। যদি কেউ জিজ্ঞেস করে—কী গো, কোথায় চললে দাসমশাই—

উদ্ধব দাস বলে—গুপ্তিপাড়ায়—

—গুপ্তিপাড়ায় কেন গো?

—গুপ্তিপাড়ায় চড়ক দেখে আসি—

—তা আমাদের পাড়াতেও তো চড়ক হবে, থাকো না—

উদ্ধব দাস বলে—না গো, সেখানে মুল সন্নিসী এবার পিঠে বাণ ফুঁড়বে, পিঠে বাণ ফুঁড়ে চড়ক গাছে উঠে ঘুরপাক খাবে, যেতে বলেছে—

তারপর আবার বহুদিন উদ্ধব দাসের দেখা নেই।

তা উদ্ধব দাস এই রকমই। শোভারামের মেয়ের বিয়েতে অতিথিশালার কথাটা উঠতেই হঠাৎ উদ্ধব দাসের কথাটা মনে পড়লো হরিপদর। রাত তখন অনেক। দাসমশাই তখন হয়তো খেয়েদেয়ে নাক ডাকাচ্ছে।

অতিথিশালার উঠোনের পাশে খালি রোয়াকের ওপর অঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছিল। হরিপদ এসে গায়ে ঠেলা দিলে।

—ও দাসমশাই, ওঠো ওঠো—

ধড়মড় করে উঠে বসেছে উদ্ধব দাস। উঠে বসেই সামনে চেয়ে দেখে দুজন লোক। হাতে মশাল জ্বলছে। প্রথমটায় চিনতে পারেনি। কারা আবার এল বিরক্ত করতে। চোখ দুটো রগড়ে ঠিক করে দেখলে।

—আমি গো দাসমশাই, আমি। আমি হরিপদ, তোমায় নিয়ে যেতে এসেছি।

শোভারাম তখন একদৃষ্টে চেয়ে দেখছে উদ্ধব দাসের দিকে। এই তার জামাই। তার যে একমাত্র মেয়ে। মেয়েকে যে অনেক আদরে মানুষ করেছে শোভারাম। সেই মেয়েকে এই এর হাতে তুলে দেবে শেষকালে!

হরিপদ শোভারামকে সান্ত্বনা দিয়ে বললে—উদ্ধব দাস আমাদের সৎশূদ্দুর, কোনো কিছুতে আটকাবে না দাদা, আমি বলে দিচ্ছি তোমার মেয়ে সুখে থাকবে—

শোভারামের তখন জীবন-মরণ সমস্যা। তার তখন অত ভাববার সময় নেই। বললে—আমি আর ভাবতে পারছিনে হরিপদ, যাতে আমার জাতটা থাকে তাই দেখ—

হরিপদ উদ্ধব দাসের সামনে নিচু হয়ে জিজ্ঞেস করলে—নতুন কাপড় পরতে হবে তোমাকে দাসমশাই, তোমার নতুন কাপড় আছে?

উদ্ধব দাস বললে—নতুন কাপড় কী হবে?

শোভারাম বললে—থাক থাক, আমার কাছে নতুন কাপড় আছে, আমি নতুন কাপড় দেবো'খন—চলো, চলো—

উদ্ধব দাস তবু জিজ্ঞেস করলে—নতুন কাপড় কী হবে তাই বলো না—

হরিপদ বললে—হবে আবার কী ছাই, যা বলছি করো, চলো আমাদের সঙ্গে, আর সময় নেই—

অথচ এই কালই শোভারাম মেয়েকে নিয়ে এখানে এসেছিল। ভোর বেলা তখনো ঘুম থেকে ওঠেননি ছোটমশাই। গোকুল দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করেছিল—কে? শোভারাম? এত সকালে কী করতে?

—এই মরালীর বিয়ে কিনা আজ, তাই নিয়ে এলাম, ছোটমশাইকে প্রেনাম করে যাবে—

মরালীকে শাড়ি পরিয়ে আলতা পরিয়ে সঙ্গে নিয়ে এসেছিল। মরালীরও ভয়-ভয় করছিল। এত বড় বাড়ি। কত গড় কত মহল পেরিয়ে রাজবাড়ির ভেতরে আসতে হয়। গড়জাত্ পেরিয়ে বুড়োশিবের মন্দির। পাশে ঠাকুরবাড়ি। আর তার পাশেই ছোট একটা পুকুর। ভেতরের গড়ের দিকে কেল্লা। এই দুই গড়ের মাঝখানের জমিতে কানুনগো কাছারি। বড় গড় পেরিয়েই সামনের সিংদরজা। সিংদরজার মধ্যে ছোট দরজাটা খুলে লোকজন যাতায়াত করে। তারপরেই উঠোন। উঠোনের উত্তর দিকে একটা দক্ষিণদ্বারী একতলা কোঠা। এই কোঠার সামনে খাঁজকাটা খিলেন দেওয়া বারান্দা। আর উঠোনের দক্ষিণ দিকে একটা মন্দির। মন্দির পেরিয়ে পুব দিকের দেয়ালের মাঝখানে একটা দরজা। এই দরজা পেরিয়ে ভেতরে গেলেই আর একটা উঠোন। সে উঠোনের এক পাশে ভোগ রাঁধবার রান্নাবাড়ি আর একদিকে অতিথিশালা। তারপর পুবের দরজা দিয়ে সামনাসামনি ঢুকলে ভেতরের গড়। এই গড়ের ওপরেই ছোটমশাইএর বসতবাড়ি। বসত-বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়ালে ভেতরের দরজা খোলা দেখা যাবে। সেখান দিয়ে ভেতরবাড়ির লোক আসা-যাওয়া করে। ভেতরের গড়ের মধ্যে বিরাট রাজবাড়ি। এ দিগর থেকে ও-দিগর পর্যন্ত লোক আর জন। মহলের পর মহল। প্রথম মহলের পর বড় বউরানীর মহল পড়বে।

ওধার থেকে কেউ প্রশ্ন করবে—কে?

শোভারাম বলবে—আমি শোভারাম—

তারপর পরের মহলের সীমানায় গিয়ে সিঁড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। সেখানে বাঁধানো চাতাল আছে। পাশেই পুকুর। পুকুরের শান-বাঁধানো ঘাট। এইখানে এই চাতালে বসেই আগে বড়মশাই তেল মাখতে বসতেন। আর খেউরি করতো বিশু পরামাণিক। তারপর পুকুরের মধ্যে অনেকক্ষণ ডুবে ডুবে চান করবার পর গা মুছতেন রোদে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।

কাল সকালেও এইখানে এসে ছোটমশাইকে প্রণাম করেছিল।

মরালীকে চুপি-চুপি বলেছিল—আজকে বড় রানী ছোট রানী সকলকে পেন্নাম করে আসবি জানিস, বলবি—কাল আমার বিয়ে—

এইখান দিয়েই মরালী এই গড়বন্দীর মধ্যে ঢুকেছিল।

শোভারাম বলেছিল—যাও মা যাও, ভেতরে গিয়ে রানীমাদের পেন্নাম করে এসো—

কোথা দিয়ে ঢুকে কোথা দিয়ে ভেতরে গিয়েছিল তা আর মনে নেই। ওই

দুর্গাই প্রথমে দেখতে পেয়েছিল তাকে। ওমা, ওমা, এ যে শোভারামের মেয়ে গো—

চিবুকে ছোঁয়া লাগতেই চোখ খুলে গেল। মরালী দেখলে সামনেই ছোট রানী দাঁড়িয়ে। আর সঙ্গে সঙ্গে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে ফেললে।

—ওমা, গড় করছো কেন আমাকে?

দুর্গা বললে—তা করুক না রানীমা, তোমাকে গড় করবে না তো কাকে করবে! কাল ওর বিয়ে, সুতোনুটি থেকে ওর বর আসছে, আশীর্বাদ করো যেন সতীলক্ষ্মী হয়ে সিঁথির সিঁদুর নিয়ে সোয়ামীর সংসার করে—

—না না, আমাকে গড় করতে হবে না, আমি তো তোমার চেয়ে বড় নই—

মরালী বললে—আমার বাবা যে বলে দিয়েছে—

—তা দিক বলে—তোমার আমার তো সমানই বয়েস, কী বল্ দুগ্গা?

দুর্গা বলেছিল—এই মেয়েকে তো এখন দেখছো এমনি, আগে কী দজ্জাল ছিল মা, রাস্তার লোক দেখলে খেয়ার করতো, বিয়ের জল পড়তে না পড়তেই একেবারে ঠান্ডা হয়ে এসেছে, বিয়ে বলে এমনি জিনিস—

এতক্ষণে ঘরের চারপাশটা দেখে নেবার শক্তি হয়েছে মরালীর। দুটো পালঙ। দুটো হাতি দুপাশ থেকে শুঁড় ঠেকিয়ে আছে মাথার দিকে। বিছানার ওপর দুটো মাথার বালিশ। পাশাপাশি রাখা। ছোটমশাই আর ছোটরানী পাশাপাশি শোয়। মাথার কাছে ফুল ছড়ানো। বাগান থেকে ফুল দিয়ে যায় মালীরা। অনেকক্ষণ ধরে দেখতে লাগলো মরালী। কী সুখই না বড়মানুষের বউদের। দেয়ালে দেয়ালে পট টাঙানো। নল-দময়ন্তী, রাম-সীতা, হর-পার্বতী। আর সাবিত্রী-সত্যবানের পট।

দুর্গা বললে—কী দেখছিস লা মেয়ে, তোরও হবে এমনি, বরের সঙ্গে এমনি পাশাপাশি শুবি, বরের সঙ্গে গপ্‌পো করে কোথা দিয়ে রাত পুইয়ে যাবে টের পাবিনে—

শুনতে শুনতে যেন গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো সমস্ত শরীরে। লজ্জায় মুখ রাঙা হয়ে উঠলো মরালীর।

দুর্গা বলতে লাগলো—বরকে আঁচলে গেরো দিয়ে রাখবি লা, নইলে ফস্‌কে পালিয়ে যাবে, এই বলে রাখলাম মেয়ে, রাতের বেলা সোহাগ করবি, দিনের বেলা শাসন করবি, তবে বেটাছেলে বশে থাকবে—

ছোটরানী ধমক দিলে—তুই চুপ কর দুগ্গা—

দুর্গা বললে—কেন চুপ করবো ছোটরানী, বিয়ের আগে আমরা শিখিয়ে পড়িয়ে না দিলে কে দেবে বলো, মুখপুড়ী যে মাকেও খেয়েছে—

হঠাৎ এই পরিস্থিতিতে মা'র কথা মনে আসতেই যেন ছাঁৎ করে উঠলো বুকটা। এমন করে কেউ তো তাকে শোনায়নি। নয়ান পিসী অনেক কথা বলেছিল। অনেকদিন অনেক উপদেশ দিয়েছে, অনেক ব্রতকথা মুখস্থ করিয়েছে, কিন্তু এ-সব কথা এমন করে তো কেউ বলেনি।

দুর্গা বলতে লাগলো—আমাদের গাঁয়ে, জানো ছোটরানী, এক বেনের মেয়ের সতীনের ঘরে পড়ে কী হলো। মা ছিল না তো, কেউ শিখিয়ে দেয়নি, সোয়ামী সতীনের ঘরে শুতো, আর ছুঁড়ীটা সোনা-দানা পেয়ে খুশী থাকতো। শেষে যখন ছুঁড়ীর বয়েস হলো, জ্ঞান-গম্যি হলো, সতীন-কাঁটা বুঝতে শিখলে, তখন সোয়ামীকে বললে—সতীনের ঘরে তোমাকে এবার থেকে শুতে দেবো না—

ছোটরানী বললে—রাখ্ তোর কেচ্ছা দুগ্গো, বড় বউরানীর ঘরে নিয়ে যা একে—

বলে মরালীর দিকে হাত বাড়িয়ে বললে—এই নাও ভাই, পান খাও—

তারপর দুর্গাই মরালীর হাত ধরে ঘরের বাইরে নিয়ে এল। বললে—চল্, বড় বউরানীকে গড় করে আসবি চল্—

বড় বউরানী! বড় বউরানীর নাম শুনে ঘাবড়ে গিয়েছিল মরালী! সে আবার কে!

—সতীন লো সতীন, ছোট বউরানীর সতীন!

এবার দরজা পেরিয়ে পাশের বারান্দায় যেতে হলো। এ কত বড় বাড়ি। এ-বারান্দা ও-বারান্দা। দূরে বুড়োশিবের মন্দিরটা দেখা যায় জাফরির ফোকর দিয়ে। বড়মশাইএর বাবা বুড়ো শিবের মন্দিরের চুড়োটা সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দিয়েছিলেন ছেলে হবে বলে। এই ছোটমশাই তখন হননি। যেবার বর্গীরা এসে ভাগীরথীর পশ্চিম পারে হানা দিয়েছিল তখন লাঠিয়ালরা পাহারা দিয়েছিল এই মন্দির। কাল যখন মরালী বিয়ের পর বরের সঙ্গে শ্বশুর-বাড়ি যাবে তখন ওই বুড়োশিবের মন্দিরে গিয়ে প্রণাম করে যাবে। এই-ই রীতি। ছোটমশাই-এর যখন বিয়ে হয়েছে তখনো বউ নিয়ে এসে ওই বুড়োশিবের মন্দিরে প্রণাম করে তবে বাড়িতে ঢুকেছে।

দুর্গা বলেছিল—খুব ভালো করে পায়ে মাথা ঠেকিয়ে গড় করবি বড় বউ-রানীকে, বড় কড়া মানুষ, বুঝলি?

মরালী জিজ্ঞেস করলে—আমার ওপর রাগ করবে না তো?

—রাগ করবে কেন? তুই কি তার সতীন যে রাগ করবে তোর ওপর?

—তবে? ছোটরানীর ওপর খুব রাগ নাকি?

দুর্গা বললে—রাগ না পিন্ডী। পীরিত লো পীরিত। ছোটমশাইকে খোসামোদ করতে সতীন আনালে—বললে—দেখ আমি কত সতী। তোর যখন সোয়ামী হবে তখন তুইও বুঝবি, তাই তো তোকে অত শেখালুম পড়ালুম। রোজ ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে বাসিমুখে বলবি—ময়না ময়না ময়না, সতীন যেন হয় না—তাহলে আর সতীন হবে না তোর—

চলতে চলতে মরালী বললে—ছোট বউরানীর বুঝি তাই খুব কষ্ট?

—দূর পাগলী, দেখলিনে, বিছানার ওপর দুটো মাথার বালিশ, ফুলের তোড়া, রাত্তিরবেলা আবার আতর গোলাপ-জল ছিটিয়ে দিই বিছানায়। তারপরে ছোট বউরানীকে যা এনে দিয়েছি তোকেও তাই এনে দেবো, দরকার হলে আমাকে বলিস—

—কী?

—তোর ভাতার যদি তোকে অপগেরাহ্যি করে কি সতীন ঘরে আনে তো তোকেও দেবো—

মরালী আবার জিজ্ঞেস করলে—কী, জিনিসটা কী?

—ছোট বউমাকে তাই এনে দিয়েছি বলেই তো আর সোহাগের সীমে নেই ছোট বউরানীর, ছোটমশাই এক-পা ঘরের বাইরে যায় না, মুখে মুখ দিয়ে পড়ে থাকে দিন রাত। বিছানায় তো দেখলি এক রাশ ফুল, ওই সব হয়েছে আমার জন্যে—

মরালী আবার জিজ্ঞেস করলে—কী করে হলো? কী দিয়েছিলে তুমি?

—সে বলবোখন তোকে, মন্তর আছে তার আর শুধু একটু করে আদা আর আকের গুড় লাগে—যে-মেয়েমানুষ সোয়ামীর কাছে শুতে ভয় পায়, কি যে-সোয়ামী মাগের কাছে শুতে আসে না—

তারপর হঠাৎ থেমে গম্ভীর হয়ে বললে—চুপ কর, বড় বউরানী আসছে—

সত্যি, বড় বউরানীকে দেখে কেমন যেন মনে হলো মরালীর। একটু বয়েস হয়েছে। পুজো করে আসছিলেন বোধহয়। রেশমের শাড়ি। লাল পাড়। বাঁ হাতে পুজোর থালা।

দুর্গা বললে—এই তোমাকে গড় করতে এসেছে বড় বউরানী, শোভারামের মেয়ে, কাল ওর বিয়ে—

শান্ত ঠাণ্ডা গলার স্বর। মাথায় হাত দিলেন মরালীর। বললেন—বেঁচে থাকো মা, স্বামীর সংসারে অচলা হয়ে থাকো—

কেমন যেন জুড়িয়ে গেল সমস্ত শরীরটা। বড় শান্ত সুখী মানুষটা। আবার বললেন—হ্যাঁ রে দুগ্‌গো, ছোট মশাই উঠেছে রে? উঠলে আমার ঘরে একবার ডেকে দিস্ তো—

বলে যেমন আসছিলেন তেমনি আবার চলে গেলেন।

গরান কাঠের খুঁটি আর গোলপাতার ছাউনি দেওয়া ঘরের ভেতর মরালী তখনো চুপ করে বসেছিল। পাটের শাড়িতে ঘেমে নেয়ে চান করে উঠেছিল। কাল সকাল বেলার সেই সব কথাই মনে পড়ছিল। বাইরে লোকজনের গলা শোনা যাচ্ছে। ঘরের মধ্যে এতক্ষণ নয়ান পিসী ছিল, অনন্তদিদি ছিল, পাড়ার সবাই ছিল। তারা সবাই বাইরে চলে গেছে। বর আসেনি। লগ্ন বয়ে যাচ্ছে। বর যদি না আসে তো কী হবে?

হঠাৎ কানে এল—বর এসেছে, বর এসেছে—
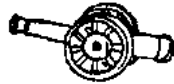
তা বিপদ কি শুধু শোভারামের মেয়ের একলার। বিপদ সকলের। রাজ-বাড়িতে তখন সব অন্ধকার। অতিথিশালার ভেতরে সেদিন তেমন লোক ছিল না। যা দু'একজন এসেছিল তারা দিনমানে-দিনমানে চলে গেছে। রেড়ির তেলের পিদিমটা নিভে গিয়েছিল প্রথম রাত্রেই। কাছারির লোক কিছু কিছু এপাশে-ওপাশে শুয়ে ছিল। তাদের পাশ কাটিয়ে উদ্ধব দাস, হরিপদ আর শোভারাম দরজার কাছ পর্যন্ত এল।

উদ্ধব দাস আবার জিজ্ঞেস করলে—সত্যি বলো না গো, নতুন কাপড় কী হবে?

হরিপদ বললে—হবে আবার কী ছাই, যা বলছি করো—আর সময় নেই—

সেদিন হরিপদ যে কী বিপদেই ফেলেছিল। সন্ধ্যেবেলাও কিছু বলেনি হরিপদ। উদ্ধব দাস নেচেছে, গেয়েছে। কড়াই-এর ডাল দিয়ে ভাত খেয়েছে কলাপাতায়। ছড়া কেটেও শুনিয়েছে।

সেদিনও হরিপদ জিজ্ঞেস করেছিল—নতুন কোনও গান বানিয়েছ নাকি দাসমশাই?

উদ্ধব দাস জিজ্ঞেস করেছিল—কেন, তোমাদের দুগ্‌গা জানে নাকি আমি এইচি?

—তা আর জানে না? তবে আজকে আর গান শুনবে না—

—কেন? আজ কী হলো?

—আজ এ-পাড়ায় আমাদের শোভারামের মেয়ের বিয়ে, সেখানে নেমন্তন্ন খেতে যাবে—

—তা সে তো রাত্তিরে?

তারপর হরিপদ বলেছিল—আচ্ছা দাঁড়াও, দেখি, দুগ্‌গোকে জিজ্ঞেস করে আসি গান শুনবে কি না। আমাকে বলে রেখেছিল, তুমি এলে খবর দিতে। ভারি দেমাক্‌ কিনা দুগ্‌গোর। আগে জিজ্ঞেস না করলে যদি আবার খোয়ার করে—

উদ্ধব দাস বলেছিল—ঝিউড়ির আবার অত খোয়ার কেন গা?

—ওমা, খোয়ার হবে না? ছোট বউরানীর আদর পেয়ে পেয়ে দুগ্‌গোর খোয়ার যদি একবার দেখ তো তুমিই অবাক হয়ে যাবে দাসমশাই—তুমি বোস, আমি দেখে আসি ভেতরে—

এসব বিকেল বেলার ঘটনা। বিকেলও হয়নি ভালো করে। ভেতর বাড়ির প্রথম দরজা পেরিয়ে বড় বউরানীর মহল। তার পাশের বারান্দা দিয়ে গিয়ে তবে ছোট-বউরানীর মহল পড়বে। কেমন যেন ভয়-ভয় করতে লাগলো হরিপদর। পাশে ছোটমশাই-এর খেউরি হবার জলচৌকি। সকাল বেলা সেখানে বসে খেউরি করে বিশু পরামানিক। জলচৌকিটার পাশে দাঁড়ালে ছোট বউরানীর ঘরের বারান্দাটা দেখা যায়। ঘরের দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ। আশেপাশে দুগ্‌গোকে কোথাও দেখতে পাওয়া গেল না। এই সময় ছোট বউরানীর জন্যে খাবার নিতে আসে দুগ্‌গো। রান্নাবাড়িতে গিয়ে খাবার ফরমাজ দিয়ে আসে। যেদিন যা খেতে ইচ্ছে হবে তা আগে থেকে বলে আসতে হয়। বড় আয়েসী মানুষ। ছোট বউরানীর ঘুম বড় গাঢ়। সকালবেলা ছোটমশাই ওঠবার পরও বিছানায় শুয়ে পড়ে থাকে। তখন দুগ্‌গো গিয়ে গা-হাত-পা টিপে দেয়, মাথায় সুড়সুড়ি দেয়। দুগ্‌গো না হলে ছোট বউরানীর চলে না। সন্ধ্যেবেলা হয়তো ঘি দিয়ে চিঁড়ে ভাজা খেতে ইচ্ছে হয়। বাগানের সেরা সেরা আম আসে ছোট বউরানীর জন্যে। ভাঁড়ার ঘরে গিয়ে দুগ্‌গো ঝগড়া করে আদায় করে নিয়ে আসে।

দুর্গা বলে—খেতে পরতে দেবার মালিক যে, তার যদি একটু তোষামোদ করি, তাতে কী এমন অন্যায় করি মা—

তরঙ্গিনী ভাঁড়ারের লোক। বলে—বড় বউরানীর জন্যে আমের আচার করে-ছিলুম তাও নিয়ে গেলি তুই?

দুর্গা বলে—নিজের জন্যে নিইনি গো, নিজের জন্যে নিইনি। খেতে পরতে দেবার মালিকের জন্যেই নিয়েচি। ছোট বউরানীর জন্যে জিনিস নিলে তোমাদের এত চোক্‌ টাটায় কেন গা?

তরঙ্গিনীও কম নয়। বলে—ছোট বউরানী তোর সগ্যে বাতি দেবে না, তোর পরকালের গতি করবে, ভালো করে পা টিপিস্‌ বাপু—

এর পর আর ধৈর্য থাকে না দুর্গার। বলে—আমার সগ্যে কেন বাতি দেবে না, দেবে তোর সগ্যে। তুই বউরানীর খাতির করিস, বুড়ি মেয়েমানুষের পায়ে তেল দিস্‌, মুদ্দোফরাসেও তোর গতি করবে না, কর্ণমুগ্গীর ঘাটে তোকে শ্যাল্‌-কুকুরে খাবে! তুই কবে মরবি লা, আমি ঘাটে বসে দেখবো—

তারপরেই ঝগড়া বেধে যায়। তুমুল ঝগড়া। রান্নাবাড়ি থেকে লোক জড়ো হয় ভাঁড়ারের উঠোনে। সধবা বিধবা কেউ বাকি থাকে না। গালে হাত দিয়ে ক্ষেন্তির

মা বলে—অবাক করলি মা। দুগ্‌গা, তোর না মাসি হয় তরি। তরিকে তুই ওই কথা বললি?

তরঙ্গিনী তখন সত্যিই কাঁদতে শুরু করেছে।

বলে—তোমরা পাঁচজনে দেখ মা, এই অ্যাট্টুকু বয়েসে রাঁড় হলো যখন, তখন আমি এনে ঢোকালুম ওকে চাকরিতে, সেই চাকরিতে ঢুকে বড় বউরানীর সঙ্গে রাজবাড়িতে এল; ভাবলুম ভাতার যায় যাক্, মুখপুড়ি দু'বেলা দু'মুঠো খেতে তো পাবে পেট ভরে। এখন আমার কপাল মা, আমার কপাল—আপন বোন-ঝি আমার, সেও আমায় কি না খোয়ার করে—

এ-সব রাজবাড়ির ভেতরকার ব্যাপার। অন্দর-মহলের ঘটনা। কিন্তু বাইরে কাছারি, কানুনগো-কাছারি, চন্ডীমন্ডপ, খাজাঞ্চিখানাতে অন্য চেহারা। হাতিয়াগড়ের রাজবংশের সে ইতিহাস সবাই জানে। পাঠান আমলের শেষ দফায় সুলেমান কররানীর সময়ে কালাপাহাড়ের অত্যাচারে সমস্ত ভূভাগ যখন জর্জর হয়ে আছে, তখনকার কথা। এক-একজন সর্দার এক-একটা এলাকায় প্রধান হয়ে উঠেছে। কেবল মেদিপুর, চট্টগ্রাম আর এই সুন্দরবনের প্রত্যন্ত প্রদেশ তখনো বিবাদী স্বরূপে স্বাধীন সত্তায় বিরাজ করছে। তখন বাইরে থেকে বার বার অত্যাচার আর আঘাতের ঢেউ এসেছে। কখনো অর্থলোভে, কখনো ভূমির লোভে, কখনো নারীর লোভে সে অত্যাচার দুর্দম আকার নিয়েছে। অত্যাচারের পর অত্যাচারে হয়তো অনেক সময়ে ভূমির অংশ ছেড়ে দিতে হয়েছে, অর্থ দিয়ে অত্যাচারীকে করতে হয়েছে। দেশও পুরোন, এ-দেশের অতীতও পুরোন। সেই সপ্তম-শ শতাব্দী থেকেই মুসলমানদের অত্যাচার শুরু হয়েছে। মহম্মদ বীন কাশিম আর দ্বিতীয় খালিফ ওমরের সময় থেকেই এর সূত্রপাত। তাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল এদেশের মেয়েমানুষ। আরবের মরুভূমির দেশের চোখে এদেশের মেয়েমানুষেরা ছিল স্বপ্ন। তারপর যুগের পর যুগ কেটে গেছে। লুঠতরাজের শেষ হয়নি কোনোদিন। মহম্মদ বীন কাশিম থেকে সবক্তজীন। সবক্তজীন থেকে সুলতান মামুদ পর্যন্ত তার জের চললো। সঙ্গে সঙ্গে মন্দির ভাঙলো, বিগ্রহ ভাঙলো। দেশের ক্ষাত্র-শক্তির আর তখন জাগবার কথা নয়। পুবে বারানসী আর দক্ষিণে সোমনাথ পর্যন্ত অত্যাচারের উত্তাল ঢেউ চললো গড়িয়ে-গড়িয়ে। লুঠের পর লুঠ, রক্তপাতের পর রক্তপাত। কান্নায় ভারি হয়ে উঠলো বাতাস, রক্তে পঙ্কিল হয়ে উঠলো পৃথিবী। সুলতান মামুদ অত্যাচার করতে করতে একদিন নিজের অত্যাচারের বীভৎসতায় নিজেই দু'হাতে নিজের দু'চোখ বুজে ফেললেন। কিন্তু নবাব-বাদ্‌শাদের মেয়েমানুষের লোভ তবু গেল না।

সিং-দরজার সামনেই মাধব ঢালী পাহারা দেয়।

উদ্ধব দাসকে নিয়ে হরিপদ আর শোভারাম সেখানে এসে দাঁড়াতেই অবাক হয়ে গেল। নবাবের ফৌজী সেপাই দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। আর মাধব ঢালীর সঙ্গে কী যেন কথা বলছে।

—কী হলো? এখানে কী?

কথাটা জিজ্ঞেস করেই কিন্তু হরিপদ শিউরে উঠেছে। ছোটমশাইকে খুঁজতে এসেছে ফৌজী সেপাই।

মাধব ঢালী বললে—ছোটমশাই তো এখন শুয়ে পড়েছেন হুজুর—

—তা নায়েব, নায়েব কোথায়? হাতিয়াগড়ের নায়েব-নাজিম?

—আজ্ঞে হুজুর, নায়েবমশাই তো বাড়িতে আছেন।

—কোথায় তার বাড়ি?

—কাছারি-বাড়ির পাশে। ওই দিকে, ওই দিকে সোজা নাক-বরাবর চলে যান হুজুর।

ফৌজী সেপাই দুটো আর বাক্যব্যয় না করে সোজা সেই দিকে চলে গেল।

হরিপদর এতক্ষণে সাহস হলো। জিজ্ঞেস করলে—সেপাই এস্‌ছিল কেন গো মাধব?

মাধব ঢালী ডাকাতি করতো এককালে। বড়মশাই যাবার আগে ওকে এই প্যাহারাদারির চাকরি দিয়ে গিয়েছিলেন। বললে—পরোয়ানা আছে বোধহয়—

—কীসের পরোয়ানা?

—নবাব-নিজামতের পরোয়ানা, আবার কার?

—তা' বলে এত রাত্তিরে?

শোভারাম বাধা দিয়ে বললে—ও-সব নবাবি ব্যাপারের কথা এখন থাক হরিপদ, ওদিকে সময় বয়ে যাচ্ছে, তুই চল্—

বিয়ে-বাড়ির ভেতরে তখনো গোলমাল চলছে। যারা খেতে বসেছে, তারা তখনো কিছু টের পায়নি। সিদ্ধান্তবারিধি মশাই একবার ঘরের মধ্যে এসেছিলেন। কনে দেখে বলেছিলেন—বেশ হয়েছে শোভারাম, তোর মেয়ে সুখে থাক, সতী-লক্ষ্মী হয়ে স্বামীর সংসার আলো করে থাকুক—

শোভারাম বলেছিল—সবই ছোটমশাই-এর দয়াতে হলো ঠাকুরমশাই—

শেষকালে একবার সিদ্ধান্তবারিধি মশাই মরালীর মাথায় হাত দিয়ে কী সব শ্লোক বলে আশীর্বাদও করে গিয়েছিলেন। আয়োজনের ত্রুটি কিছুই হয়নি। বড়-বড় কলাপাতা এসেছিল ছোটমশাই-এর বাগান থেকে। হরিপদ মাছ এনে দিয়েছিল ছোটমশাই-এর পুকুর থেকে। নয়ান পিসী রাঁধতে বসেছে সকাল থেকে। একা মানুষ। পাড়ার সকলেরই পিসী। কাজে-কর্মে শুদ্রদের বাড়ি রাঁধবার সময় তার ডাক পড়বেই। আর শুধু কি রান্না—কনে সাজানো, জামাই-ষষ্ঠীর তত্ত্ব সাজানো সবই তার কাজ।

নয়ান পিসী বলে গিয়েছিল—চুপ করে বসে থাক মেয়ে, আমি অম্বলটা সাঁত্‌লে আসি—

পাড়ার মেয়েরা তখন পাশেই বসেছিল। মরালীর জানা-শোনা সব মেয়েদেরই বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। অনন্তদিদি বলেছিল—বর কী দ্রব্য তা আর জীবনে জানতে পারলুম না—

মরালী জিজ্ঞেস করেছিল—বরের সঙ্গে প্রথমে কী কথা বলবো অনন্তদিদি?

অনন্তদিদি বলেছিল—আমার আবার বর, আমার আবার বিয়ে, সেই বিয়ের পর আর তো দেখিনি বরকে—

অনন্তবালার বিয়ে, সে-এক ঘটনা বটে। বর এল গ্রামে। সবাই করুণাময়ীর ঘাটে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছে অনন্তবালার বর দেখতে। বোশেখ মাসের সকাল। যে-যার ব্রত সেরে সকাল থেকে ঘাটে গিয়ে পৌঁছেছে। যখন বর এল দেখা গেল—কাঁধে পুঁটলি। হাতে খড়ম। নৌকো থেকে বর নামলো।

অনন্তবালার বাবা জগদীশ বাঁড়ুজ্জেমশাই খাতির করে বরকে নামিয়ে নিতে গেলেন।

বর বললে—নৌকোর ভাঁড়াটা মিটিয়ে দিন—

হন্তদন্ত হয়ে জগদীশ বাঁড়ুজ্জে বললেন—কত?

—পাঁচ টাকা।

পাঁচ টাকা শুনেই চমকে গিয়েছেন বাঁড়ুজ্জে মশাই। কুলীন জামাইএর জন্যে গুনে চারশো টাকা আগাম দিতে হয়েছে, আবার পাঁচ টাকা তার ওপর। অথচ জামাইএর নিজেরই নৌকো।

বললেন—নৌকো ভাড়াটা পরে দিলে হবে না বাবাজী?

বর বললে—পরে আর কখন দেবেন। আমি তো আজই চলে যাবো পলাশ-পুরে, সেখানে আর একটি কন্যার পাণি গ্রহণ করে তারপর যাবো ঘুষুটি। সেখানেও একটি কন্যা আছে। বোশেখ মাসে লগনসা'র বাজারে কি আমাদের কোথাও বেশি তিষ্ঠুবার সময় আছে?

সেই পাঁচ টাকাই শুধু নয়, আরো পঞ্চাশটি টাকা চাদরে বেঁধে দানের সামগ্রী ঘড়া থালা পিলসুজ সমস্ত কাঁধে তুলে নিয়ে উঠলো নৌকোতে। নৌকো সারা দিনই ঘাটে দাঁড়িয়েছিল।

বাঁড়ুজ্জে মশাই বলেছিলেন—একটা রাত কন্যার সঙ্গে এক ঘরে বাস করলে হতো না বাবাজী?

অনন্তবালার মা-ও ঘোমটার আড়াল থেকে বলেছিল—অনন্ত আমার বড় আদরের মেয়ে, আমার বড় সাধ ছিল জামাই-মেয়েকে একসঙ্গে দেখে চোখ জুড়োব, তা-ও হলো না—

বলে কাঁদতে লাগলেন তিনি।

বর বললে—থাকলে আরো হাজার টাকা দিতে হবে, এই আমার নিয়ম করে দিয়েছি—

হাজার টাকা! হাজার টাকা দেবার মত অবস্থা নয় বাঁড়ুজ্জেমশাই-এর। সামান্য জমিজমা আর ক'ঘর বামুন কায়েত যজমান। তাদেরই ওপর ভরসা। হাজার টাকা তাঁকে খুঁড়ে ফেললেও আসবে না।

বললেন—এর পর যখন আসবে বাবাজী, তখন না-হয় ধার-কর্জ করে যেমন করে হোক—

বর বললে—তা তো বুঝতেই পারছি, কিন্তু নগদ-ছাড়া কাজ করবো না ঠিক করেছি। বড় ঠকায় সবাই আজকাল। আর তা ছাড়া বোশেখ মাস পড়ে গেছে যে, বড় ক্ষেতি হয়ে যাবে, চারদিক থেকে ডাক আসছে, বয়েসও বাড়ছে, সব কন্যার পাণি গ্রহণ করে উঠতে পারিনে আজকাল—

বলে নৌকোয় উঠে পড়েছিল বর। আর বাক্যব্যয় করেনি—

বাঁড়ুজ্জেমশাই শেষ পর্যন্ত জিজ্ঞেস করেছিলেন—তাহলে আবার কবে আসছো বাবাজী!

বর বলেছিল—পত্র দেবেন রাহা-খরচ দেবেন, সময় করে যদি আসতে পারি দেখবো—

অনন্তবালার পর নন্দরানী। দুই মেয়ে জগদীশ বাঁড়ুজ্জের, নন্দরানীর কপালে বরই জোটেনি। নন্দরানীও এসেছিল মরালীর বিয়েতে। শেষ পর্যন্ত নন্দরানীর বিয়ে হয়েছিল কলাগাছের সঙ্গে। এয়োস্ত্রির মত মাথার সিঁথিতে সিঁদুর দিত। পঁচিশ ছাব্বিশ বছর বয়েস হয়েছে। তবু ছেলেমানুষের মত বাসর জাগতে পারে। ফুলশয্যের রাত্রিতে বর-কনের শোবার ঘরে আড়ি পাতে। পুকুরঘাটে গিয়ে পরের বর নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করে। বর ঠকাতে নন্দরানীর ডাক

পড়ে সব বাড়িতে।

নন্দরানীর নিজের বিয়েতে শুভদৃষ্টিও হয়নি, ফুলশয্যেও হয়নি, বাসর-ঘরও হয়নি। কিন্তু পাড়ার সব বিয়ের বাসর জেগেছে।

নন্দরানীর মা বলতেন—মেয়েমানুষ হয়ে জন্মেছ, সব মুখ বুজে সহ্যি করতে হবে মা তোমাকে—

নন্দরানী কিন্তু মা'র কথা শুনে হাসতো। বলতো—মা যেন কী! দিদির চেয়ে তো আমার কপাল ভালো—। আমার বর তবু আমার বাড়িতেই থাকে, কিন্তু দিদির বর যে আসেই না একেবারে—

তা অনন্তদিদির বর কিন্তু আর একবার এসেছিল। যথারীতি নিজের নৌকো করে পোঁটলাপুঁটলি নিয়ে রাত দেড়-প্রহরের সময় এসে হাজির। জগদীশ বাঁড়ুজ্জে বাড়ির ভেতর থেকে জিজ্ঞেস করেছিলেন—কে?

অনন্তবালার বর বলেছিল—আমি আপনাদের জামাই বাবাজীবন—

কথাটা শুনেই জগদীশ বাঁড়ুজ্জে লাফিয়ে উঠেছিলেন। গিন্নীও উঠেছিলেন। সেই রাত্রে আবার উনুনে আগুন দেওয়া হলো। ভালো চাল আনা হলো বাবুদের মরাই থেকে। সেই অত রাত্রে আবার পাশের ডোবা থেকে বড় বড় কই মাছ ধরা হলো। গাছের কলার কাঁদি থেকে কলা পেড়ে, সরের ঘি, নারকেল নাড়ু, দুধ-ক্ষীর খেতে দেওয়া হলো জামাইকে। জামাইএর জন্যে কাঁঠাল-কাঠের সিন্দুক খুলে বগি থালা, জাম-বাটি, রেকাবি বার করা হলো।

জামাই বাবাজীবন খেতে বসবার আসনে খেতে বসলো কিন্তু ভাতে হাত দিলে না।

বললে—আমি তো খেতে আসিনি, কিছু টাকার দরকারে এসেছিলাম আপনার কাছে—

বাঁড়ুজ্জে মশাই অবাক হয়ে বললেন—টাকা!

অনন্তবালা ততক্ষণে তোরঙ্গ থেকে একখানা পোশাকী পাটশাড়ি বার করে পরে নিয়েছে। খোল্ দিয়ে মুখখানা মেজে চক্‌চকে করে নিয়েছে। মা বিছানা করে দিয়ে গেছে। কনে-জামাই এই প্রথম এক ঘরে শোবে। তাম্বুল দিয়ে পান সেজে ডিবে ভর্তি করে দিলেন। তারপর মেয়ের কাছে গিয়ে চুপি চুপি ফিস্ ফিস্ করে বললেন—এইটে খোঁপায় বেঁধে রাখ—

ছোট একটা ন্যাক্‌ড়ায় বাঁধা পুঁটলির মতন।

—কী এটা?

মা বলেছিল—দুগ্‌গাকে বলেছিলাম কি না, দিয়েছে সে, অচ্ছেন্দা করিসনে—

—কী আছে এতে?

মা বলেছিল—কী জানি মা কী আছে, দুগ্‌গা দিয়েছে, দুগ্‌গাই জানে—বলছিল সাপের গায়ের এঁটুলি আর দাঁড়কাকের রক্ত—

অনন্তবালা বললে—কী হবে এ দিয়ে?

মা রেগে গিয়েছিল—তুই আর জ্বালাস্ নে বাপু, মেয়ের এত বড় বয়েস হলো, এখনো জামাইকে বশ করতে পারলিনে, তোর জন্যে আমার মাথা খুঁড়ে মরতে ইচ্ছে করে মা—

তারপর অনন্তবালা সেজেগুজে বিছানায় বসেই রইলো। জামাই খেয়ে ঘরে শুতে আসবে। কিন্তু গোল বাধলো খাবার আগেই। জামাই বললে—আমি খেতে তো আসিনি, টাকা নিতে এসেচি—

মা আড়াল থেকে বললেন—এত দিন পরে এলে বাবাজী, না খেলে কি চলে? খেয়ে দেয়ে ঘরে একটু বিশ্রাম করো, টাকা তোমায় দেবোই যেমন করে হোক—

কী জানি কী হলো! জামাই খেলে সব কিছু চেটেপুটে। কিন্তু খাওয়ার পর আর ওঠে না আসন ছেড়ে।

বললে—এবার টাকা ছাড়ুন, খাইয়ে-দাইয়ে নিয়ে শেষে টাকা দেবেন না, আমার এ-সব অনেক দেখা আছে—

—তা বাবাজীবন বিশ্রাম তো করবে একটু, অনন্তবালার সঙ্গে একটু দেখাও তো করবে—

জামাই নাছোড়বান্দা। বললে—ও-সব কথা সবাই বলে, শেষে কলা দেখিয়ে দেয়, আমি ও-সব অনেক দেখেছি, কথায় আর ভুলছে না এ শর্মা—

জগদীশ বাঁড়ুজ্জের কিছু টাকা ছিল লুকোন। কাঁঠাল গাছের তলায় বহুদিন আগে লুকিয়ে রেখেছিলেন তিনি। অবরে-সবরে বিপদে-আপদে কাজে লাগতে পারে। সেই অত রাত্রে আবার শাবল নিয়ে গিয়ে খুঁড়ে বার করে আনলেন। পাঁচটি মাত্র টাকা। কাদামাটি মাখানো। জামাইএর হাতে গুঁজে দিয়ে বললেন—যৎসামান্য এই যা ছিল সব তোমায় দিলাম বাবাজীবন, এইটি নিয়ে একটু বিশ্রাম করে যাও শুধু—

জামাই টাকা ক'টি ট্যাঁকে গুঁজে নিলে। কিন্তু বিশ্রাম করতে শোবার ঘরে আর গেল না।

বললে—তবে আর থাকা হলো না আমার, ঘুষুটির চাটুজ্জে মশাইএর বাড়িতেই যাওয়া ভালো ছিল দেখছি—

বলে উঠলো জামাই। তারপর সেই নিজের এঁটো বগি থালা, জামবাটি, রেকাবী সবকিছু পোঁটলায় বেঁধে নিয়ে আবার গিয়ে উঠলো নৌকোতে। অনন্তবালা তখনো সেজেগুজে বসে ছিল বিছানায়। মা ঘরের ভেতর ঢুকে চিৎকার করে উঠলো—তোর মরণ হয় না মুখপুড়ি, তুই মরিসনে কেন, আমি দেখে চোখ জুড়োই, এত ধিঙ্গি বয়েস হলো, জামাই বাড়ি বয়ে এল আর তুই ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে বসে রইলি? জামাইএর পা দু'টো জড়িয়ে ধরতে পারলিনে?

সেদিন অত বকুনি খাওয়ার পরও অনন্তবালা পাথরের মত চুপ করে বসে ছিল।

কিন্তু নন্দরানীর বেলায় আর সে-সব কোনো আয়োজন অনুষ্ঠান করেননি জগদীশ বাঁড়ুজ্জে। আর তখন টাকা-কড়িও ছিল না তাঁর।

নয়ান পিসী পরামর্শ দিয়েছিল—তার চেয়ে নন্দরানীর গাছ-বরে বিয়ে দাও দাদা, মেয়ে এমনিতেও ঘরে থাকবে, ওমনিতেও ঘরে থাকবে, জাত-কুলও বজায় থাকবে—

তা তাই-ই হলো শেষ পর্যন্ত। শুভদিনে পাঁজি দেখে বরণডালা কুলো পিদিম সুপুরি হলুদ আর দুধের সর নিয়ে কলাগাছের তলায় গিয়ে সাত পাক দিলে নন্দরানী। পুরুত মশাই মন্ত্র পড়তে লাগলো।

নয়ান পিসী বললে—এবারে কলাগাছটাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরো—

নন্দরানী তাই-ই করলো।

নয়ান পিসী বললে—এবার এই কড়ি আর সুপুরি নিয়ে শেকড়ের কাছে রাখ, রেখে মনে মনে তিনবার বল্—

কলাগাছ বর,
হলাম স্বয়ম্বর,
কড়ি দিলাম, সুপুরি দিলাম,
দিলাম দুধের সর।
তুমি আমার বর।

এমনি করে একদিন জগদীশ বাঁড়ুজ্জের ছোট মেয়েরও বিয়ে হয়ে গেল। আর শুধু কি নন্দরানী। এ-গাঁয়ের আরো অনেক মেয়েরই এমনি করে বিয়ে হয়ে গিয়েছে। এমনি করেই নন্দরানীর মত বাপের বাড়িতে হাঁড়ি ঠেলে তারা। এমনি করেই বাড়ি বাড়ি বর দেখে বেড়ায়, কারোর বাড়ি জামাই এলে ঘটা করে দেখতে যায়, বরের সঙ্গে ফস্টি-নস্টি করে। বরকে হাসায়, নিজেরাও হেসে গড়িয়ে পড়ে। তারপর একদিন খবর আসে গুপ্তিপাড়া কিংবা বর্ধমান কিংবা পূর্বস্থলী কিংবা বড়-চাপড়ার শ্রীযুক্ত দেবনারায়ণ দেবদর্শন : সময়োচিত নিবেদনমিদং ৩রা বৈশাখ শুক্রবার বেলা আড়াই প্রহরের সময় আমার পিতা লোকান্তর হইয়াছে জ্ঞাত কারণ লিখিলাম, ইতি। আর সঙ্গে সঙ্গে একশো মেয়ের শাঁখা ভাঙে, সিঁদুর মোছে, শাড়ি ছেড়ে থান কাপড় পরে। তাদের সবাই আজ জড়ো হয়েছে মরালীর বিয়েতে। সবাই বাসর জাগবে বলে এসেছে। নয়ান পিসীরও কবে বিয়ে হয়েছিল কে জানে। নিজেও নয়ান পিসী কখনো শ্বশুরবাড়ি যায়নি। পাড়া-প্রতিবেশীর বিয়ে উৎসব অনুষ্ঠানে খেটে খেটে পরিশ্রম করে উপদেশ দিয়েই নয়ান পিসী নিজের জীবনটা কাটিয়ে দিলে।

শোভারাম দৌড়তে দৌড়তে ঘরে এসে ঢুকেছে।

বললে—নয়ান—

ঘরে একলা মরালী বসে ছিল। আর কেউ নেই। মেয়ের দিকে চেয়ে যেন সান্ত্বনা দিয়ে বললে—কিছু ভাবিসনে মা, আর ভাবনা নেই, এবার সব ঠিক হয়ে গেছে।

বলেই আবার বাইরে চলে গেল।

বশীর মিঞার সঙ্গে আবার সেদিন দেখা। সারাদিন সোরার গদীতে বসে কাজ করে করে যখন আর মাথা তোলবার সময় থাকতো না, ঠিক তখনই এক-একদিন বশীর মিঞা এসে হাজির হতো। বেভারিজ সাহেব থাকলে আর বশীর মিঞা ঢুকতো না। কিন্তু একলা দেখলেই ঢুকে পড়তো। চেনা নেই শোনা নেই মানুষটার সঙ্গে। কিন্তু বশীর মিঞা একদিনেই বেশ ভাব করে নিয়েছিল। আর কান্তও ছিল সেইরকম। একটু মিষ্টি কথা শুনলে গলে যেত একেবারে।

—কী খবর ভাইয়া?

কান্ত বলতো—এসো ভাই, এসো, বোসো—

তক্তপোশের ওপর কাটি-মাদুর পাতা থাকতো। সেই জায়গাটা পরিষ্কার করে দিয়ে বসতে বলতো কান্ত। পান দিত, জর্দা আনিয়ে দিত। বন্ধু মানুষ, খাতিরের কোনো কমতি রাখতো না কান্ত। ভারি মজাদার মানুষ ছিল বশীর মিঞা। তেজী জোয়ান ছেলে। মুসলমান জাতে। তা হোক। কিন্তু খবর রাখতো

অনেক, নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াতো, আবার নানান লোকের সঙ্গে মেলামেশা ছিল।

—কী কাজ তোমার এত? সারা বাঙলা মুলুক ঘুরে বেড়াতে হয়?

বশীর মিঞা বলতো—নবাব সরকারের কাজের তো এই মজা ইয়ার। মাঝে মাঝে দিল্লী যাই, মাঝে মাঝে ঢাকা যাই, আবার তারপর হয়তো আগ্রা, ফতেপুর সিক্রি চলে যাই—আমার ফুপা মনসুর আলি সাহেবের নাম শুনেছিস তো?

কান্ত বলেছিল—না; কে সে?

—আরে আমার ফুপা। মীর্জা মহম্মদ সাহেবের ইয়ার।

—মীর্জা মহম্মদ কে?

মীর্জা মহম্মদের নামই শোনেনি কান্ত। অথচ এই দুনিয়ায় বেঁচে আছে। তাজ্জব বাত্ আর কাকে বলে। আরে মীর্জা মহম্মদের নামই তো সিরাজ-উ-দ্দৌলা। কিছুই জানিস না তুই। এত বড় নবাব আর হয়নি যে হিন্দুস্তানে। তুই কাজ করছিস ফিরিঙ্গী কোম্পানীর কাছে। তোর সাহেব নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলার পা চাটে, তা জানিস। এই যে দেখছিস সুতোনুটি, এই যে দেখছিস তোর সোরার গদী, নবাব ইচ্ছে করলে একটা কামান দেগে সব উড়িয়ে দিতে পারে। তোর সায়েবের মুণ্ডু উড়ে যাবে এক-কথায় তা জানিস। তখন তুই তো তুই, তোর বাপজানের বাপজান ড্রেক সায়েব পর্যন্ত কোথায় উড়ে যাবে তার ঠিক নেই। তুই রহিম খাঁর নাম শুনেছিস? জবরদস্ত খাঁর নাম শুনেছিস?

—না—।

—নবাব জাফর মুর্শিদকুলী খাঁর নাম শুনেছিস?

—না।

—আরে তোর মতন বেওকুফ্ তো আমি দেখিনি।

দিনের পর দিন বশীর মিঞার কাছে মোগল বাদশা আর নবাব দেওয়ানদের গল্প শুনে শুনে নিজেকে কেমন ছোট মনে করেছে কান্ত। বশীর মিঞা রাজার জাতের লোক। আর সে ফিরিঙ্গী কোম্পানীর তিন টাকা তলবের ক্রীতদাস। কত বড় বড় লোক সব জন্মেছে মুসলমানদের মধ্যে। এই যে মুর্শিদকুলী খাঁ। ও-ও তো কাফের ছিল আগে। বামুনের ছেলে। খেতে পেত না। ইস্পাহানের হাজীসুফী মেহেরবানি করে খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করেছিল বলেই তো সুবে বেরারের দেওয়ান হাজী আবদুল্লা খোরাসানীর দফ্তরে নোকরি পেল। আমাদের বাদশা তো গুণের কদর করতো—বাদশা আওরঙ্গজেব।

বলে বশীর মিঞা নিজের নাক আর দুটো কান মলে দিল।

বললে—অমন বাদশা আর হিন্দুস্তানে হবে না রে। দীন-দুনিয়ার বাদশা আওরঙ্গজেব বাদশা। জাফর খাঁ সায়েবকে গুণ দেখে নিজের খাস-দরবারে এত্তালা দিলে। দিয়ে তাঁর খেলাত দিলে কারতলব খাঁ। মনসবী দিলে। তোকে তোর কাজ দেখে খেলাত্ দেবে বেভারিজ সায়েব? গুণের কদর করবে ফিরিঙ্গী বাচ্ছা?

এমনি গল্প করতো বশীর মিঞা। তারপর আবার কোথায় চলে যেত। কী কাজ যে করতো বশীর তা কোনো দিন বলেনি। মাঝে মাঝে কান্তকে জিজ্ঞেস করতো—বেভারিজ সায়েবের কাছে কোন্ কোন্ সায়েব আসে, তাদের নাম কী। সোরা বেচে সাহেবের কত মুনাফা থাকে। গঙ্গার কিনারায় কেল্লা বানাচ্ছে কেন ফিরিঙ্গীরা। তাদের মতলব কী!

যা জানতো কান্ত তাই বলতো। কান্ত বলতো—আমি তো ইংরিজী জানি

না তাই সব কথা ওদের বুঝতে পারি না—

—তা এতদিন নোকরি করছিস আর ইংরিজী শিখিসনি? শিখে নে। কী কথা হয় ওদের আমাকে বলবি, তোকে ইনাম পাইয়ে দেবো, বকশিশ পাইয়ে দেবো—ফিরিঙ্গীদের যত খবর দিতে পারবি তার জন্যে তুই টাকা পাবি। কেল্লাতে ফিরিঙ্গীদের কত পল্টন আছে, কত কামান আছে, আমাকে খবরটা দিতে পারিস?

এ-সব কথা শুনতে শুনতে কান্তর কেমন সন্দেহ হতো। বেভারিজ সাহেব তাকে কতবার সাবধান করে দিয়েছিল। কোম্পানীর এলাকায় স্পাই ঘুরে বেড়াচ্ছে। খুব হুঁশিয়ার থাকবে মুন্সী। স্পাই মানে চর। গেরুয়া পরা সন্ন্যাসী দেখলে বুঝবে ওরা মারাঠিদের চর। ওরা মুসলমানদের হঠিয়ে হিন্দু রাজাকে দিল্লীর মসনদে বসাতে চায়। তাদের সঙ্গে বেশি কথা বলবে না। অনেকে বাউল ফকিরের মত গান শোনাবে গদিতে এসে। ভিক্ষে চাইবে। তাদের আমল দেবে না। আর তারপর আছে মুর্শিদাবাদের স্পাই। তারাও কলকাতায় ঢুকে পড়েছে। খুব হুঁশিয়ার থাকবে।

কিন্তু বশীরকে কিছুতে এড়ানো যেত না। বশীর বলতো—তোর ডর কীসের? আমি তো আছি, আমার ফুপা তো আছে—

একদিন রাত্তির-বেলার কথা মনে আছে। অনেকদিন আগেকার কথা। সাহেব সকালবেলা একবার গদিতে আসতো। তারপর মাল-চালান দিয়ে বাড়িতে খেতে চলে যেত। দুপুর বেলা বাড়িতে গিয়ে ঘুমোত। দিবানিদ্রা দেওয়াটা বেভারিজ সাহেবের ছিল স্বভাব। সে-সময়ে সাহেবকে বিরক্ত করা চলবে না। তারপর বিকেল বেলা যখন ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে বেরোত তখন এক-একদিন আসতো। কিন্তু সেদিন রাত্তিরবেলাই পালকি চড়ে এসে হাজির। অত রাত্তিরে সাহেব কখনো আসে না। সাহেবের মুখ গম্ভীর। এসেই কান্তর হাত দিয়ে একটা চিঠি পাঠালে কেল্লাতে। সাহেবের সঙ্গে আরো দু'জন লোক। তারা চুপি চুপি কী সব কথা বলতে লাগলো। কান্ত অনেক চেষ্টা করেও বুঝতে পারলে না।

বাইরে আসতেই পালকী বেহারারা রয়েছে। কান্ত আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলে—হ্যাঁগো, কে এসেছে এখানে? বেভারিজ সাহেবের সঙ্গে কারা এনারা?

—উমিচাঁদ সাহেব! আমরা উমিচাঁদ সাহেবের লোক।

—আর সঙ্গে কে?

লোকগুলো সাদাসিধে মানুষ। বেশি ঘোরপ্যাঁচ বোঝে না। বললে—নারায়ণ সিং—

—নারায়ণ সিং কে?

—আজ্ঞে তা জানিনে, রাজধানী থেকে এয়েচে—

কে নারায়ণ সিং, কে উমিচাঁদ সাহেব, কিছুই জানতো না কান্ত। দিনমানে না এসে এত রাত্তিরেই বা গদীতে এল কেন সাহেব, তাও বুঝতে পারলো না। হঠাৎ যেন সব ওলোট-পালোট হয়ে গেল। ক'দিন আগেই কান্তর কানে এসেছিল নবাব মারা গেছে। সে ছিল ভোর পাঁচটার সময়। তখন গদীতে গেলে ভালো করে ঘুমও ভাঙেনি। সেই খবর শোনার পর থেকেই যেন সাহেবদের রকম-সকম সব বদলে গেল। মনে আছে, বেভারিজ সাহেব ক'দিন গদীতেই আসেনি। একলা কান্তকেই কাজ চালাতে হয়েছে। তারপর ক'দিন যেতে না যেতেই এই কাণ্ড। সাহেবের হুকুম। কান্ত সেই অত রাত্তিরে কেল্লার ফটকে গিয়ে পল্টনের মুখো-

মুখি হয়ে দাঁড়ালো।

—হু কামস্ দেয়ার?

—আমি কান্ত সরকার, বেভারিজ সায়েবের মুন্সী। চিঠি এনেছি ড্রেক সাহেবের জন্যে।

তবু পল্টন বেটা কথায় কান দেয় না। বললে—ল্যাটসাব বারাসত গিয়া—

বোঝা গেল ড্রেক সাহেব কেল্লায় নেই। বারাসতে গিয়েছে কাজে।

ফিরে এসে খবরটা বেভারিজ সাহেবকে দিতেই সাহেব একেবারে রেগে খুন। ড্রেক সাহেব কেল্লায় নেই তা যেন কান্তরই অপরাধ। আরো কিছুক্ষণ কী-সব কথাবার্তা হতে লাগলো তিনজনে অনেকক্ষণ। কান্ত সেই দরজাবন্ধ গদী-বাড়ির সামনে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো। তখন বেশ গরম পড়েছে। এপ্রিল মাস। তারিখটাও মনে আছে কান্তর। ১৩ই রজব। তারপর অনেকক্ষণ কথা বলে আবার তিনজনে পালকী করে যেদিক থেকে এসেছিল, সেই দিকেই চলে গেল।

আর ঠিক তার খানিক পরেই বশীর এসে হাজির। বশীর মিঞাকে সেই সময়ে দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল কান্ত।—তুই, এত রাত্তিরে?

তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকেই বশীর মিঞা দরজায় হুড়কো দিয়ে দিয়েছিল। বললে—কে এসেছিল রে তোর এখানে?

—আমার সায়েব।

—আর দু'জন কে?

—ওদের আমি চিনি না।

—নামও শুনিসনি? পালকী বেহারাদের তুই যে জিজ্ঞেস করলি দেখলুম!

—তুই সব দেখেছিস নাকি?

—সব দেখেছি—আমার কাছে চাপতে কোসিস করিসনি। সচ-বাত্ বলবি, ঝুটা বললে তোর নুকসান হবে বলে রাখছি। যা-যা শুনেছিস সব বিলকুল খোলসা করে বল।

কান্ত বললে—সত্যি বলছি, আমি ওদের চিনি না, শুনলাম একজনের নাম উমিচাঁদ আর একজন নারায়ণ সিং—

নারায়ণ সিং! নামটা শুনেই বশীর মিঞা তিড়িং করে লাফিয়ে উঠলো। শালা হারামীকা বাচ্ছা। বেওকুব, বেত্মিজ, বে-সরম। শালাকে আমি দেখে লেবো। ওর বাপের নাম ভুলিয়ে দেবো তবে আমি মুসলমানের বাচ্ছা। ওর ভাই রামরাম সিং-এর শির কাটিয়ে দেবো। শালা আমাকে চেনে না হিন্দুর বাচ্ছা। তুই কিছু মনে করিসনি হিন্দুর বাচ্ছা বলছি বলে। তুই আমার দোস্ত। তোর সঙ্গে আমার দোস্তালি হয়ে গেছে ইয়ার। কিন্তু ওরা নিমকহারাম। ওই রামরাম সিং—ওই নারায়ণ সিং, ওই ঘসেটি বেগম, ঘসেটি বেগমও নিমকহারাম—শালা মুসলমানের মধ্যেও হারামীর বাচ্ছা আছে অনেক—

বলতে বলতে বশীর মিঞা চিৎকার করে উঠতে যায় আর কি।

কান্ত বললে—ওরে থাম ভাই বশীর, একটু চুপি চুপি কথা বল, কেউ শুনতে পাবে, আমার চাকরি চলে যাবে—

কিন্ত বশীর মিঞা রেগে তখন টং হয়ে গেছে। তার মুখে তখন খই ফুটতে আরম্ভ ক'রছে। যাকে পাচ্ছে তাকে গালাগালি দিচ্ছে। কোথাকার রাজা জানকীরাম, রাজা দুর্লভরাম, রাজবল্লভ, তার ছেলে কৃষ্ণবল্লভ, কারোরই নাম শোনেনি কান্ত। গড়গড় করে সকলের কেচ্ছা-কেলেঙ্কারী বলে গেল বশীর মিঞা। বশীর

মিঞা বললে—নারায়ণ সিংকে আর বেশিদিন বাঁচতে হবে না, দেখে নিস—

—কেন?

—আমার হাতে খুন হয়ে যাবে শালা। আমি আমার ফুপাকে গিয়ে কাল খবরটা দিচ্ছি—

—কিন্তু, নারায়ণ সিং কে? কী করতে এসেছে সাহেবের কাছে?

—ওই শালা উমিচাঁদ এনেছে সঙ্গে করে। ও শালা হলো চর। শালা রাজবল্লভের চর। রাজবল্লভের ছেলে কেষ্টবল্লভ এখেনে ফিরিঙ্গীদের কাছে রয়েছে, তা জানিস তো। এ ওই রাজবল্লভের কান্ড। নবাব মারা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হারামীরা নেমকহরামী শুরু করেছে।

কান্ত এবার আর থাকতে পারলে না। বললে—তুই এখন যা বশীর, সাহেব আবার কোন্ সময়ে এসে পড়বে, তখন আমার চাকরি চলে যাবে—

—যাক্ না তোর নোকরি, আমি তো আছি, বশীর মিঞা থাকতে, বশীর মিঞার ফুপা থাকতে তোর ডর কিসের?

—না ভাই, এবার আমি বিয়ে করছি, এখন আর ছেলেমানুষি করলে চলবে না।

—বিয়ে! সাদি? সাদি করছিস? কোথায়?

—হাতিয়াগড়ে। সব ঠিক হয়ে গেছে, দিন-টিন সমস্ত ঠিক হয়ে গেছে!

—ঠিক করছিস! মরদের কাম করছিস। সাদি করবি, লেড়কা পয়দা করবি, তবে না মরদ! আরে মরদের পয়দাই হয়েছে সাদি করবার জন্যে, আর মর্দানার পয়দা হয়েছে লেড়কা পয়দা করবার জন্যে।—খোদাতালার দেমাগ্ আছে ইয়ার, খোদাতালা অনেক ভেবে ভেবে তবে এই কানুন করেছে দুনিয়ার—

বলতে বলতে বশীর মিঞা সেদিন সেই রাত্রের অন্ধকারের মধ্যেই বেরিয়ে গিয়েছিল। বশীর মিঞা সেদিন চলে যাবার পর থেকেই আরো অনেক কান্ড শুনেছিল কান্ত। ভেতরে ভেতরে যে এত ব্যাপার চলছে তা এতদিন টের পায়নি সে। কোথায় সে বিয়ে করবে, বিয়ে করে বউ নিয়ে বড়-চাতরায় তাদের বাড়িতে গিয়ে উঠবে। পাড়ার বউ-ঝিরা তার বউ দেখতে আসবে, এই সব স্বপ্নই দেখতো সারাদিন। গদি-বাড়ির কাজের ফাঁকেও বউ-এর মুখটা কল্পনা করে নিয়ে চোখ বুজিয়ে ভাবতে ভালো লাগতো। কিন্তু হঠাৎ যেন কোম্পানীর সব সাহেবরা চারদিকে ছুটোছুটি আরম্ভ করে দিলে। ড্রেক সাহেবের শরীর ভালো ছিল না, বালেশ্বরের বন্দরে বেড়াতে গিয়েছিল। তারপরেই কলকাতায় এসে হাজির হয়েছিল কৃষ্ণবল্লভ। ঢাকার রাজবল্লভ সেনের ছেলে। টাকা-কড়ি-গয়না-গাঁটি, বউ-ছেলে-মেয়ে নিয়ে এসে হাজির। সঙ্গে ছিল কাশিমবাজার কুঠির ওয়াটস্ সাহেবের চিঠি। সেই তাকে যদি এখানে সাহেবরা না থাকতে দিত তো কোনো গন্ডগোল হতো না আর।

—কেন?

—আজ্ঞে, কেষ্টবল্লভ যে রাজবল্লভ সেনের ছেলে। রাজবল্লভ সেনকে চেনেন তো? ঢাকার দেওয়ান, আলিবর্দি খাঁর পেয়ারের লোক ছিল। ঘসেটি বেগমের সঙ্গে যে তার খুব ইয়ে—

—ইয়ে মানে?

ষষ্ঠীপদ একটু বেঁকা হাসি হেসে বললে—ইয়ে মানে ইয়ে। আপনি তো কিছুই খবর রাখবেন না, কেবল চাকরি আর ঘুম। দুনিয়ায় কত কী ঘটে যাচ্ছে খবর রাখবেন তো!

ষষ্ঠীপদ কান্তর নিচে চাকরি করতো। কান্ত মালের হিসেব রাখে, আর ষষ্ঠীপদ মালের বস্তা গোনে। কিন্তু খবর রাখে সব। কী করলে চাকরিতে উন্নতি করা যায় তার চেষ্টা ষষ্ঠীপদ করে। ষষ্ঠীপদ বলে—কোম্পানীর চাকরি, এই আছে এই নেই, চিরকাল তো কোম্পানীর চাকরি করলে চলবে না, কোম্পানীও চিরকাল থাকছে না—। যদি নবাব-কাছারিতে চাকরি পেতাম একটা তো আমার কি আর ভাবনা—

তা বিয়ের দিন সচ্চরিত্র পুরকায়স্থ এল। ভোরবেলাই এসে হাজির। সেদিন আবার কাজও খুব। চোখে-মুখে দেখবার সময় নেই কান্তর।

ঘটক মশাই বললে—চলো বাবাজী, আমার সঙ্গে চলো—

কান্ত বললে—এখন যাবো কী করে, এখনো ছুটি পাইনি যে—ক'দিন ধরে আমার সাহেব আসছে না।

—সে কি কথা? সাহেব যদি না আসে তো তোমার বিয়ে বন্ধ হয়ে যাবে? একটি মেয়ের জীবন-মরণ সমস্যা, আর তোমার চাকরিটাই সেখানে বড় হলো?

কান্ত বললে—না, তা বলছি না, আপনি এগোন, আমি নাপিতকে নিয়ে যাচ্ছি। আজ সাহেব আসবার কথা আছে—

—তুমি যাবে তো ঠিক বাবাজী?

কিছুতেই আর ঘটক মশাই-এর সন্দেহ যায় না। কান্ত সমস্ত দেখালে। বিয়ের তোড়-জোড় সমস্ত ঠিক করে রেখে দিয়েছে। গায়ে-হলুদের জন্যে তেল-হলুদ পাঠিয়ে দিয়েছে। সারাদিন উপোস করে আছে আর বিয়ে হবে না মানে। বড়চাতরায় চিঠি পর্যন্ত লিখে দেওয়া হয়েছে। সেখানকার বাড়ি-ঘরদোর পরিষ্কার করা হয়েছে। জঙ্গল কেটে রাস্তা করা হয়েছে। নতুন বউকে নিয়ে যাবে, দেশে দশজনকে বউ দেখাবে। পিতৃ-পুরুষের ভিটে! নতুন-বউ নিয়ে হাতিয়াগড় থেকে সোজা নৌকো করে তো সেখানে গিয়েই উঠতে হবে।

তারপরেই একটা কাণ্ড ঘটলো। ঘটকমশাইকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বিদায় করে দিয়ে ষষ্ঠীপদকে সব মালের হিসেব বুঝিয়ে দিলে। নাপিত তৈরিই ছিল। কান্ত সেজেগুজে নৌকোয় উঠতে যাবে, হঠাৎ বশীর এসে পড়লে।

—কোথায় যাচ্ছিস?

—বিয়ে করতে। আর সময় নেই—

—তা আজকেই বিয়ে করতে চললি? এদিকে যে সব পয়মাল হয়ে গেল রে। তোর নোকরি হয়তো থাকবে না।

—কেন?

তখন সত্যিই আর কথা বলবারই সময় ছিল না। মাঝি-মাল্লারা পাল খাটিয়ে দিয়েছে নৌকোয়। নাপিতও গিয়ে উঠে বসেছে পোঁটলাটা নিয়ে।

বশীর মিঞা বললে—তোর সাহেবদের ওপর নবাব খুব গোসা করেছে। আমাদের কাশিমবাজারে ফিরিঙ্গীদের কুঠির ওয়াটস্ সাহেবকে নবাব ডেকেছিল, ডেকে খুব হল্লা করেছে, বলেছে রাজা রাজবল্লভের ছেলেকে যদি ফিরিঙ্গীরা না ফিরিয়ে দেয় তো কোম্পানীর গুষ্টি তুষ্টি করে ছাড়বে।

কান্ত জিজ্ঞেস করলে—কেন, সাহেবদের কী দোষ?

—দোষ নয়? ফিরিঙ্গীর বাচ্ছারা পঞ্চাশ হাজার টাকা ঘুষ নিয়েছে তার কাছ থেকে, তা জানিস? তোর সাহেবের দোস্ত ওই হল্‌ওয়েল আর ম্যানিংহাম, ওই

দুটো ফিরিঙ্গী।

কান্তর মনে আছে সে-সব কথা। বশীর মিঞাই বলেছিল সব। উমিচাঁদই হচ্ছে নাকি আসল। তার সঙ্গেই সাহেবদের দোস্তালি। নারায়ণ সিংকে সে-ই নিজের বাড়িতে থাকতে দিয়েছিল। কেষ্টবল্লভ যে কলকাতায় এসে ফিরিঙ্গীদের কাছে থাকতে পেয়েছিল তাও রাজা উমিচাঁদের জন্যেই। রাজা উমিচাঁদকে প্রায়ই বেভারিজ সাহেবের কাছে আসতে দেখেছে কান্ত। সব সাহেবই আসতো বেভারিজ সাহেবের বাড়িতে। ওই হল্‌ওয়েল সাহেব, ম্যানিংহাম সাহেব। কিন্তু ভেতরে ভেতরে যে এক কাণ্ড চলেছে তা জানতো না। নবাবের মাসি যে নবাবের শত্রু তাও জানতো না।

—তাহলে কী হবে?

বশীর মিঞা বললে—লড়াই হবে। নবাব যখন একবার রেগে গেছে, তখন আর তো সহজে ঠান্ডা হচ্ছে না, ফিরিঙ্গীদের দরিয়ার ওপারে না-পাঠিয়ে আর ছাড়ছে না! ফিরিঙ্গীরাও বাঁচবে না, ও রাজা রাজবল্লভও বাঁচবে না, ওই ঘসেটি বেগমও বাঁচবে না। মির্জা সাহেবের একবার গোসা হলে তখন আর কারো পরোয়া করবে না—

—তাহলে আমার চাকরির কী হবে?

বশীর মিঞা বললে—আরে নোকরির কথা তুই পরে ভাবিস, আগে তুই বাঁচিস কি না তাই দ্যাখ্। লড়াই হলে তোর কলকাতা থাকবে নাকি? তোর লাটসাহেব ওই ড্রেক সাহেবই বাঁচে কি না তাই আগে ভাব। এ-কলকাতাও থাকবে না, এই ফিরিঙ্গীদের কেল্লাও থাকবে না, এই ফিরিঙ্গী বাচ্ছারাই সব মরে মামদো ভূত হয়ে যাবে। তখন আমার কথা মনে রাখিস, তোকে আমি হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি, বশীর মিঞা কখনো ঝুট বলে না—

বশীর মিঞা চলে যাবার পর কান্ত তাড়াতাড়ি গিয়ে নৌকোয় উঠলো। বদর বদর।

যেমন দেশের ঊর্ধ্বে আর একটা দেশ আছে, তার নাম মহাদেশ, যেমন কালের ঊর্ধ্বে আর একটা কাল আছে তার নাম মহাকাল, তেমনি ইতিহাসের ঊর্ধ্বেও আর একটা ইতিহাস আছে তার নাম মানুষ। মানুষই ইতিহাস। এই মানুষই মহাদেশ সৃষ্টি করেছে, এই মানুষই মহাকাল সৃষ্টি করেছে, এই মানুষই ইতিহাসের সৃষ্টিকর্তা। পৃথিবীর ইতিহাস এই মানুষেরই ইতিহাস। এই মানুষই একদিন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী হয়ে সাত সাগর তের নদী পেরিয়ে নোনা জলে হাবু-ডুবু খেতে খেতে ইণ্ডিয়াতে এসে পৌঁছেছিল, আবার এই মানুষই একদিন আলীবর্দী খাঁ হয়ে তাকে আশ্রয় দিয়েছিল। বলেছিল—তোমরা থাকো এখানে, থেকে কারবার করো। আমাদের শুধু সামান্য কিছু কারবারের মুনাফার অংশ দিও। আর হিন্দুরা মারাঠা দেশ থেকে এসে আমাদের বড় জ্বালাতন করছে, তাদের শায়েস্তা করতে তোমাদের মদত্ চাই। হিন্দুদের সঙ্গে লড়াই করতে করতে আমার সারা জীবনটা কেটে গেছে। আমার টাকা ফুরিয়ে গিয়েছে। তোমরা টাকা দিয়ে বন্দুক দিয়ে কামান দিয়ে আমাকে সাহায্য করো, যাতে আমি আয়েস করে মসনদে বসে

রাজ্য-শাসন করতে পারি। আমরা মোগল, আমরা সেই বারো শো বছর আগে আরব দেশ থেকে বেরিয়েছিলাম জেহাদ করতে, মহম্মদের বাণী প্রচার করতে। সারা পৃথিবী আমরা কবুল করেছি। শেষকালে এখানে এসে এই মারাঠি ডাকাতদের হাতে বুড়িগঙ্গায় ডুবে মরবো নাকি! তোমাদের কাছে আমি মদত্ চেয়েছিলাম, তার বদলে তোমরা আমার লোকসান করেছ। আমার গদি কেড়ে নেবার মতলব করেছ। তোমরা বাগবাজারে পেরিং-পয়েণ্টে কেল্লা বানিয়েছ, কেল-শাল সাহেবের বাগানবাড়ির মধ্যে গড়বন্দী তৈরি করেছ। তাই আমরা তোমাদের ওয়াটস্ সাহেবকে, কলেট্ আর ব্যাটসন ধরে গারদে পুরেছি। তাই আমরা তাদের দিয়ে মুচলেকা লিখিয়ে নিয়েছি—মুচলেকায় লেখা আছে—'প্রজাগণের মধ্যে কেহ রাজদণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য কলিকাতায় পলায়ন করিলে, আদেশ দেওয়া মাত্র তাহাদিগকে নবাবের হস্তে সমর্পণ করিতে হইবে। গত কয়েক বৎসরের বাণিজ্যের দস্তকের হিসাব দিতে হইবে এবং ঐ সকলের অপব্যবহারজনিত রাজকোষের যে-পরিমাণ ক্ষতি হইয়াছে তাহার ক্ষতিপূরণ করিতে হইবে। পেরিং-পয়েণ্টে যে কেল্লা নির্মিত হইয়াছে তাহা ভাঙিয়া ফেলিতে হইবে এবং কলিকাতার হল্‌ওয়েল সাহেবের ক্ষমতা বিশেষ সংকুচিত করিতে হইবে।' ইতি, বিনীত বশংবদ—ওয়াটস্, কলেট্ ও ব্যাটসন।

সচ্চরিত্র ঘটক তখনো ছাতিমতলার ঢিবির ওপর দাঁড়িয়ে দূরের বাঁকটার পানে চেয়ে আছে। নদীটা ওইখানেই বাঁক নিয়েছে। যেন সেই দিকেই একটা টিম্-টিমে আলো নজরে পড়লো। বর-বাবাজী এত দেরি করবে কে জানতো। আজকালকার ছোকরাদের একটা দায়িত্বজ্ঞান বলে কিছু নেই। আগেকার মত ক্ষমতা থাকলে ঘটকমশাই আবার চলে যেত সেই কলকাতায়। একবার হাতিয়াগড় একবার কলকাতা। দেনা-পাওনার কথাবার্তা তো সবই হয়ে গিয়েছিল। আগেকার দিনে এমন ছিল না। আগে গ্রামের মধ্যেই বর, গ্রামের মধ্যেই কনে। আর এখন যদি সন্ধান পাও তো যাও কাটোয়া, যাও পূর্বস্থলী, যাও বর্ধমান। কাঁহা বীরভূম, কাঁহা ঢাকা, সোনারগাঁ, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ। কোনো জায়গায় আর যেতে বাকি নেই সচ্চরিত্রের।

সচ্চরিত্র বলে—আমার নাম সচ্চরিত্র ঘটক, আমি হলাম **ঈশ্বর ইন্দীবর ঘটকের পুত্র, ঈশ্বর কালীবর ঘটকের পৌত্র,** ঈশ্বর সিদ্ধেশ্বর ঘটকের প্রপৌত্র। সমস্ত ঘটককারিকা আমার মুখস্থ গো, আমরা হলাম সাত পুরুষের ঘটক, যদি কলকাতায় কখনো যান হুজুর, আমার নাম করবেন—

লোকে বলে—কলকাতায় কে তোমায় চিনবে?

—আজ্ঞে বড় বড় যজমান সব আমার আছেন সেখানে, নানান জাতের গেরস্থ সব। বাহাত্তুরে কায়েত কৃষ্ণবল্লভ সোম আমার যজমান, মৌলিক কায়েত গোবিন্দ-শরণ দত্ত, কুলীন কায়েত গোবিন্দরাম মিত্তির, শ্রোত্রিয় বামুন কন্দর্প ঘোষাল, কুলীন বামুন মনোহর মুখুজ্জে, সুবর্ণ বণিক শুকদেব মল্লিক, সদ্গোপ আত্মারাম সরকার, তিলি কালীচরণ পাল, কৈবর্ত গৌরহরি হালদার, সব আমার যজমান। শুধু কলকাতা কেন, বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদীয়ায় পর্যন্ত যজমান আছে আমার হুজুর। যাদের কাজ-কর্ম একবার করে দিয়েছি আর কোনো ঘটকের কাজ পছন্দ হয় না তাদের—

এই সচ্চরিত্রর কথাতেই বিশ্বাস করে শোভারাম নিজের মেয়ের সম্বন্ধ করেছিল। সারা মুলুকটাই ঘুরে বেড়াতে সচ্চরিত্র পোঁটলাটি কাঁধে নিয়ে। এ গ্রাম থেকে সে গ্রাম। তারপর দুমাস তিন মাস কোথায় কোথায় কেটে যায় কেউ জানতে পারে না। বাড়ির ছেলে-মেয়ে বউ-এর সঙ্গে হয়তো ছমাস পরে একদিন দেখা হয়। তারপর আবার একদিন বেরিয়ে পড়ে। এমনি রাজমহল থেকে বর্ধমান, বর্ধমান থেকে হুগলী। হুগলী থেকে কলকাতা। কলকাতাই কি ছোট জায়গা নাকি। কায়েতই যে কতরকম এখানে। জেলে-কায়েত, ছুতোর-কায়েত, চাষা কায়েত। পৈতে কি চেহারা দেখে আর কাউকে চেনবার উপায় নেই। একমাথা বাবরি চুল, গাল পর্যন্ত টানা জুলপি, ওপর ঠোঁটে একটুখানি গোঁফ শুধু। মাথায় পাগড়ি, গায়ে জোব্বা আর পায়ে চামড়ার চটি, দেখেই বোঝা যায় কলকাতার নতুন সম্প্রদায়ের লোক।

শোভারাম যেবার প্রথম সচ্চরিত্রর সঙ্গে পাত্র দেখতে এসেছিল, জিজ্ঞেস করেছিল—ওসব কারা ঘটকমশাই?

সচ্চরিত্র বলেছিল,—সাবধান, আস্তে কথা বলুন বিশ্বাস মশাই, কোম্পানীর দালাল ওরা। ওদের অমন কথা বলবেন না, ওদের দোরে লক্ষ্মী বাঁধা, কাঁচা টাকা ওদের হাতে জমেছে, ও আপনার মুর্শিদাবাদও নয়, হাতিয়াগড়ও নয়, আপনি-আজ্ঞে করে কথা বলতে হয় এখেনে—

সচ্চরিত্র বলতো—ও চিৎপুর সিমলে মির্জাপুর আরপুলি কলিঙ্গা বির্জিতলাই বলুন আর ওদিকে বেলগেছে উল্টোডিঙি কামারপাড়া কাঁকুড়গাছি, বাগমারি ট্যাংরাই বলুন, সব আমার এলাকার মধ্যে—

রাস্তার মধ্যে কাউকে দেখলেই ঘটকমশাই ডাকতো—ওগো, ও-মশাই শুনছেন—

—কে গো, আমাকে ডাকছো?

—বলি এখানে বিয়ের যুগ্যি পাত্তোর-টাত্তোর আছে? আমি সচ্চরিত্র ঘটক, আমার পিতা ঈশ্বর ইন্দিবর ঘটক, পিতামহ কালীবর ঘটক, প্রপিতামহ সিদ্ধেশ্বর ঘটক, ঘটক্যালি আমাদের সাতপুরুষের পেশা—

ভদ্রলোক বারকয়েক দেখলেন সচ্চরিত্রর দিকে। দেখে কী ভাবলেন কে জানে। বললেন—ওদিকে দেখুন, এদিকে নেই—

ইন্দিবর ঘটক সচ্চরিত্রকে ছোটবেলাতেই বলে গিয়েছিলেন—এবার আমাদের ধর্ম-কর্ম সব যাবে সচ্চরিত্র—

সচ্চরিত্র তখন ছোট। বুঝতে পারেনি কথাটা। জিজ্ঞেস করেছিল—কেন?

—যাবেই তো! ইদিকে নবাব হলো ম্লেচ্ছ, উদিকে ফিরিঙ্গীরাও হলো ম্লেচ্ছ, জাতজন্ম আর কদিন বাঁচবে? হিন্দু আর কেউ থাকবে না—

তা বটে! কিছুই আর থাকবে না। এ-রকম করে আর জাত-পেশা রাখা চলবে না। হঠাৎ দূর থেকে আলোটা যেন আরো স্পষ্ট হয়ে উঠলো। ছাতিমতলার ঢিবিটা পেরিয়ে একেবারে করুণাময়ীর ঘাট বরাবর গিয়ে হাজির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো সচ্চরিত্র। হ্যাঁ, ঠিক এসেছে। হুমড়ি খেয়ে পড়লো নৌকোর গলুই-এর ওপর। পড়েই কান্তর হাতখানা ধরে ফেলেছে। তুমি আমাকে কী বিপদে ফেলেছিলে বলো দিকিন্ বাবাজী, আমি কাউকে মুখ দেখাতে পারিনে, এদিকে ক্ষিদে পেয়েছে, আর ওদিকে কী কাণ্ড বলো দিকিনি তোমার, ছি ছি ছি, আমি হলাম ঈশ্বর ইন্দীবর ঘটকের পুত্র, ঈশ্বর কালীবর ঘটকের পৌত্র...

কান্ত যেন মুশকিলে পড়লো। বশীর মিঞাই তো আসলে গণ্ডগোল

বাধালে। তার সঙ্গে কথা বলতে গিয়েই তো ভাঁটা এসে গেল নদীতে। চড়ায় আটকে গেল নৌকো।

তাড়াতাড়ি কান্তকে নিয়ে ছুটেছে সচ্চরিত্র। বিয়েবাড়ির সামনে গোলমাল শুনে শোভারামও ছুটে এসেছে। মনটা বড় খারাপ ছিল তার। এত সাধের মেয়ে তার। একেবারে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেললে কান্তকে দেখে।

কান্ত বললে—নদীতে ভাঁটা পড়ে চড়ায় আটকে গিয়েছিল আমার নৌকো,—

গোলমাল শুনে সিদ্ধান্তবারিধিমশাইও এসে পড়েছিলেন। বললেন—তা এখন তো আর উপায় নেই শোভারাম, সম্প্রদান তো হয়ে গেছে—

—তাহলে?

বশীর মিঞাই তো গোল বাধালে। নৌকো আটকে যাবার পর কী করবে বুঝতে পারেনি কান্ত। নাপিত বলেছিল—চলুন বাবু, হাঁটাপথেই যাই, যদি ঘোড়া-টোড়া ভাড়া পাওয়া যায় তো তাই নেওয়া যাবে—

সাহী রাস্তার অবস্থাও ভালো নয়। কোথায় ঘোড়া! হাঁটা পথে হেঁটে গেলেও এক প্রহর লাগবার কথা। কী করবে বুঝতে পারেনি কেউ। শেষে ভাগ্য ভালো, জোয়ার আসতে দেরি হয়নি। সেই নৌকোতেই চারজনে মিলে বৈঠা বাইতে বাইতে এসেছে। ঘেমে নেয়ে একেবারে প্রাণ বেরিয়ে গিয়েছে।

শোভারাম তাড়াতাড়ি ভেতর-বাড়ির দাওয়ার কাছে গিয়ে ডাকলে—নয়ান—

নয়ান পিসী এল। সব শুনে বললে—তা এখন আর কী করবে দাদা, এখন তো আর করবার কিছু নেই—

বলে আবার বাসর-ঘরে গিয়ে ঢুকলো। বললে—ওরে মেয়েরা, তোরা বরকে বিরক্ত করিসনে বাছা, বর এখন একটু ঘুমুবে—

নন্দরানী বললে—তুমি যাও তো এখেন থেকে নয়ানপিসী, বর এখন আমাদের, আমরা যা করাবো তাই করবে—

নয়ান পিসী চলে যেতেই নন্দরানী বললে—আজকের রাত্তিরে বর কি একা মরির, বর আজকে আমাদের সক্কলের, কী ভাই বর, রাজি তো?

উদ্ধব দাস বললে—ঠাকরুণরা যেমন নিবেদন করবেন, তেমনিই হবে—

—ওমা, বর যে দেখছি খুব সেয়ানা রে, বলি হ্যাঁ বর, কনেকে কোলে করতে পারবে তো?

উদ্ধব দাস বললে—কোলে তো আগে করিনি কখনো, ঠাকরুণরা বললে করতে পারি—

—ওলো, বরের কথা শোন্, তা তোমার বুঝি আগে আর বিয়ে হয়নি?

উদ্ধব দাস বলে—না—

নন্দরানী বললে—সকলের সামনে মরিকে কোলে করতে হবে কিন্তু, আমরা সকলে দেখবো—

উদ্ধব দাস বলে উঠলো—তা আপনারা যদি নিবেদন করেন তো আপনাদের কোলে তুলতে পারি—

সবাই হেসে লুটোপুটি খেতে লাগলো। তারাময়ী বললে—ওমা, কী অসভ্য বর ভাই—

তা হোক, কথাটা তারাময়ী বললে বটে, তবু বরকে নিয়ে মেয়ে-মহলের যেন আনন্দ-কৌতূহলের শেষ নেই।

নন্দরানী এগিয়ে এসে বললে—তা আমাকে কোলে করো দিকি ভাই, দেখি

তোমার কত ক্ষমতা—

তারপরেই হঠাৎ ভয় পেয়ে সরে এল। বললে—ওমা, এ বর যে সত্যি সত্যি হাত বাড়ায় গো—না, না, অত রসে কাজ নেই, নে লো তারা, মরিকে ধরে বরের কোলে বসিয়ে দে তো—

মরালী এতক্ষণ ঘোমটায় মুখ ঢেকে চুপ করে বসে ছিল। একজন কানে কানে কাছে গিয়ে কী বললে। বলতেই মরালী কান সরিয়ে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে রইলো।

—ওমা, মরি যে কাঁদছে লো!

সবাই অবাক হয়ে গেল। এমন এক-বিয়েওয়ালা বর পেয়েও মন ভরেনি মেয়ের। বুড়ো হোক, যাই হোক, এ-বরের সঙ্গে তো ঘর করতে পারবে তবু। এ-বরের সঙ্গে এক ঘরে তো শোবে। তবু কান্না! আর আমাদের!

নন্দরানী বুঝিয়ে বললে—আজকের দিনে বরের কোলে বসতে হয় রে, বরের কোলজোড়া রূপ দেখে আমরাও নয়ন সাত্থক করি, আয় ভাই মরি, ছিঃ—

তবু কিছুতে মরালী নড়ে না। পাথরের মতন শক্ত হয়ে বসে রইলো একপাশে।

অনন্তদিদি বললে—রাত পোয়ালে তখন তো আর আমরা কেউ আসবো না রে, আর আসতে চাইলেও তোরা কেউ আসতে দিবি নে, আজকের মত আমরা একটু আনন্দ করে নিই—আমাদের নিজেদের তো সাদ-আহ্লাদ সব ঘুচে গেচে—ছি, কথা শোন্, আজ শুনতে হয়—

কিন্তু টানাটানি করেও কিছু ফল হলো না। সকলকে আঁচড়ে কামড়ে একাকার করে দিলে মরালী। কিছুতেই সে বরের কোলে বসবে না।

এবার নন্দরানী এগিয়ে এল। বললে—তোরা সর দিকি, আমি দেখি—

বলে—কোমরে কাপড় জড়িয়ে মরালীকে টেনে বরের কোলে বসাতে যেতেই এক কাণ্ড ঘটে গেল। নন্দরানীর বুড়ি মা বাইরে থেকে আর্তনাদ করে উঠলো—ওমা, অনন্ত, অনন্ত রে—

সমস্ত ঘরখানা যেন অকস্মাৎ এক নিমেষে স্তব্ধ পাথর হয়ে গেল সে-কান্নার শব্দে। কী হলো। কী হয়েছে! মেয়েরা সবাই এক অজ্ঞাত আতঙ্কে শিউরে উঠেছে।

—কী হয়েছে জ্যাঠাইমা? কে বুঝি জিজ্ঞেস করলে।

—আমার অনন্তর কপাল পুড়েছে মা! অনন্ত যে আমার মাছ না হলে খেতে পারে না গো! ও অনন্ত, অনন্ত রে—

বাসর-ঘর থেকে বেরিয়ে এল অনন্তবালা। সঙ্গে নন্দরানীও বেরিয়ে এল। বেরিয়ে এল তারাময়ী, বেরিয়ে এল সবাই। বাইরে ভিড় হয়ে গেল এক নিমেষে। শোভারাম ছুটে এল। জিজ্ঞেস করলে—কী হয়েছে বামুনদিদি?

নয়ান পিসীও এসে দাঁড়িয়েছিল। বললে—মেয়েকে করুণাময়ীর ঘাটে নিয়ে গিয়ে সিঁদুর-শাঁখা ভেঙে দাও গে, ও আর কেঁদে কী করবে দিদি, কপালের লিখন তো কেউ খণ্ডাতে পারবে না—

ভিড় জমে গেল বাড়ির উঠোনে। বরের সঙ্গে কোনোদিন কথাও হয়নি অনন্তবালার। কথা হওয়া দূরে থাক, ভালো করে দেখেওনি বরকে কোনোদিন। সেই স্বামীর মৃত্যু-সংবাদ শুনে কাতর হওয়া স্বাভাবিক কি অস্বাভাবিক সে-কথাও কারো মনে এল না। স্বামীর মৃত্যু মানে জীবনের সব সাধ-আহ্লাদ থেকে বঞ্চিত হওয়া, পাথর যদি হয়েই থাকে তো সে শোকে না লোকাচারের সংস্কারে, কে জানে?

আর কোনোদিন মাছ খেতে পারবে না অনন্তবালা। আর কোনোদিন শাঁখা-সিঁদুর-শাড়ি পরে পারবে না, এ-ও কি কম ক্ষোভ, কম ক্ষতি! এর পর থেকে এই নয়ান-পিসীর মত পরের বাড়ির উৎসবে-আনন্দে শুধু গতরে খেটে আনন্দ দিতে হবে। অথচ নিজেরই যেন এতদিন আনন্দ করবার কিছু ছিল!

তবু সহানুভূতির কথা শোনালো সবাই। অনন্তবালাকে নিয়ে যখন বামুনদিদি বাড়ি চলে গেল তখন সকলের মুখ দিয়েই শুধু একটা শব্দ বেরোল—আহা!

আর মেয়েরা যে-যেখানে ছিল সবাই সেই "আহা" শব্দের সঙ্গে নিজেদের জীবনের মর্মান্তিক সত্যিটাই প্রকাশ করে দিলে। অথচ এ-ঘটনা এত সত্য, এত স্বাভাবিক, এত সাধারণ যে তার কোনো প্রতিকারই নেই যেন কারো হাতে! নিতান্ত কার্যগতিকেই জামাই যাচ্ছিল নৌকো করে কোন্ দেশে, যাচ্ছিল হয়তো আর কোনো কন্যার পাণিগ্রহণ করতে—পথে ডাকাত পড়ে খুন করে ফেলেছে। ঘটনাটা ঘটেছে কতদিন আগে। তারপরেও কতদিন ধরে অনন্ত শাঁখা-সিঁদুর পরেছে, মাছ খেয়েছে, স্বামীর আসার প্রতীক্ষায় দিন গুনেছে, বছর গুনেছে, এতদিন পরে সে খবর হাতিয়াগড়ে এসে পৌঁছেছে। বাঙলার গ্রামে গ্রামে যত বধূ ছিল সবাই একসঙ্গে অনাথা হয়ে গেল। এর বুঝি কোনো প্রতিকার নেই, কোনো সান্ত্বনাও নেই কোথাও। সেদিনকার উৎসবের মধ্যে হঠাৎ যেন কোনো অশনিপাতে সব নিঃশেষ হয়ে গেল।

সচ্চরিত্র ঘটক এতক্ষণ খাই-খাই করেও খেতে পারেনি। যেন তার খাবার জায়গাও হঠাৎ ফুরিয়ে গিয়েছে। হঠাৎ অন্ধকারের মধ্যে কান্তর সঙ্গে দেখা।

—এ কি বাবাজী, তুমি এখনো আছ? খাওয়া হয়েছে?

কান্ত কিছু উত্তর দিলে না।

সচ্চরিত্র বললে—সে কি, বিয়ে হলো না বলে খেতে কীসের আপত্তি, চলো, আমারও খাওয়া হয়নি—

তারপর নাপিতের দিকে চেয়ে বললে—চলো হে, তুমিই বা কেন মাঝখানে থেকে উপুসী থাকবে, চলো, চলো—

ওদিকে মুর্শিদাবাদেও অনেক রাত হয়েছে। রাত হলেই আজকাল কেমন সব থম্ থম্ করে। এই মহিমাপুর থেকেই শাহীবাগটার সামনের বড় মসজিদটা দেখা যায়। মসজিদের মাথায় সবুজ নিশান ওড়ে। হাওয়ায় দোল খায়, পত্ পত্ করে। তার ওপরে একটা বাতি জ্বলে। বাতির আলোটা আরো অনেক দূর থেকে দেখা যায়। ভাগীরথী দিয়ে যেতে যেতে নৌকোর মাঝিমাল্লারা আলোটা দেখে নিশানা ঠিক করে নেয়। বলে—বড় মসজিদের আলো—

ফতেচাঁদ জগৎশেঠের বাড়ির সামনে লোহার দরজার সামনে বন্দুক নিয়ে বসে পাহারা দেয় ভিখু শেখ।

ভিখু শেখ বলে—মহারাজা ফতেচাঁদ জগৎশেঠকা হাবেলি।

মনিবের গৌরবে গোলামেরও গৌরব বাড়ে। সামনে দিয়ে কেউ গেলে কিছু বলে না। যার-তার সঙ্গে কথা বললে ভিখু শেখের ইজ্জত চলে যায়। শাহী সড়কের পদাতিক মানুষের ওপর তার বড় তাচ্ছিল্য। তাচ্ছিল্য করে বলেই তাদের

সঙ্গে কথা বলে নিজেকে ছোট করে না। বরং একলা চুপচাপ সব দেখে। দুনিয়াদারি দেখতে ভিখু শেখের বেশ লাগে। যখন নবাব মঞ্জিলের নহবতখানায় ইনসাফ মিঞা ভোর বেলা আশাবরীর সুর তোলে তখন ভিখু শেখ মাঝে মাঝে চোখ বুজে দিওয়ানা হয়ে যায়। দুনিয়ার দৌলত, খান্-দান্, জৌলুষ, জম্-জমা, আওরাত, তন্খা, এমন কি বেহেস্তের খোদাতালা পর্যন্ত তার কাছে বরবাদ হয়ে যায়। যেন ইনসাফের নহবতের ফুটোগুলোতে মিছরি মাখানো আছে। ভিখু শেখের মত পাঠানকেও যাদুর মোহে ভুলিয়ে দেয়। আর ঠিক তারপরেই বুঝি হঠাৎ সচেতন হয়ে ওঠে। চোখ দুটো খোলে। বন্দুকটা সামলে নেয়। গোঁফ-জোড়া প্যাকিয়ে নিয়ে সোজা হয়ে বসে। নিজেকে যেন অপরাধী মনে হয় তার। রাজা দৌলতরাম ফতেচাঁদ জগৎশেঠজীর সে খাশ-নৌকর। রাজা দৌলতরাম নামটা তার নিজের দেওয়া। তার মনে পড়ে যায়, তার ওপর নির্ভর করে এত বড় দৌলতরাম আরাম করে ঘুমুচ্ছে। তার একটু গাফিলতিতে সবকিছু লোকসান হয়ে যেতে পারে। মারাঠী ডাকুরা লুঠপাট করে নিতে পারে। চোট্টা ডাকুর তো কম্তি নেই দেশে। দৌলত দৌলত করে তামাম্ দুনিয়া মস্তানা হয়ে গেছে। আরে, হারামী দৌলতের মত খতরনাক্ চিজ্ আছে নাকি আর? দৌলতের জন্যেই তো বেগমের সঙ্গে নবাবের, নবাবের সঙ্গে নবাবজাদার লড়াই চলছে দুনিয়ায়। দৌলত আর আউরত। দুটোই খতরনাক্ চিজ্। ভিখু শেখের চোখের সামনেই এই দুটো জিনিসের পাহাড় জমে আছে। দৌলত ভি দেখেছে, আউরত ভি দেখেছে। ঘসেটি বেগম, আমিনা বেগম, মনি বেগম সবাইকে দেখেছে ভিখু শেখ। ঢাকার দেওয়ান নোয়াজিস মহম্মদ সাহেবকে দেখেছে, পূর্ণিয়ার দেওয়ান সৈয়দ আহম্মদ সাহেবকে দেখেছে। শেঠ মানিকচাঁদ সাহেবকে দেখেছে, ফতেচাঁদ জগৎশেঠজীকে দেখেছে, মহারাজ স্বরূপচাঁদকে দেখেছে, এখনো মহাতাপচাঁদ জগৎশেঠজীকে দেখছে। সবই দৌলত আর আউরত। সেই দৌলত আর আউরতের খাতিরেই সবাই মহারাজার কাছে দরবার করে। কাশ্মীরীরা আসে, মুলতানীরা আসে, পাঠানরা আসে, শিখরা আসে। তাতার, মোগল, ফিরিঙ্গী, ইংরেজ, দিনেমার, আর্মানী সবাই আসে। এসে টাকা চায়, হুণ্ডি কেনে। ভিখু শেখ শেঠজীর ফটকে দাঁড়িয়ে সবাইকে দেখে। সব লক্ষ্য করে। কিন্তু কথা বিশেষ বলে না।

কিন্তু সেদিন হাঁক দিয়ে উঠলো ভিখু শেখ—কৌন্?

বশীর মিঞা বলে—আমি রে বাপু, আমি—

—আমি কৌন্?

—আরে বাবা, আমাকে চিনিস না? মোহরার মনসুর আলি মেহের আমার ফুপা, নবাব-নিজামতের মোহরার—

ভিখু শেখ আজকের লোক নয়। মীর হবিব খাঁ যখন বর্গীর সেপাই নিয়ে শেঠজীর বাড়ি চড়াও হয়েছিল, তখনো এই বন্দুক দিয়ে দশটা মারাঠি ডাকুকে খুন করেছিল। ফতেচাঁদ জগৎশেঠজীর আমলের লোক সে। অত সহজে তাকে দলে টানা যায় না।

বললে—হুকুম নেই—

বশীর মিঞা বললে—আরে হুকুম নেই মানে? তোমার শেঠজীর দোস্ত্ আমাদের নবাব, আমাকে অন্দরে যেতে দেবে না?

তারপর হঠাৎ সোজা কথায় কাজ হবে না দেখে আদর করে বললে—কেন গোসা করছো শেখজী, তুমিও মুসলমান আমিও মুসলমান, এক জাত, এক আল্লা

আমাদের—

—ভাগো নেড়ি কুত্তা!

এর পর আর দাঁড়ানো যায় না। জগৎশেঠজীর হুকুম হয়েছে কাউকেই বিনা পাঞ্জায় ঢুকতে দেওয়া হবে না এই হাবেলিতে! দুনিয়ার হাল-চাল ভালো নয়। দিল্লীর বাদ্‌শা না-থাকারই মত। পাঠান, আফগান, মারাঠী সবাই টাকা লুঠতে বেরিয়েছে। আর জগৎশেঠজীর মত টাকা কার আছে? শাহান্‌শা বাদশা দিল্লীর বাদশার চেয়েও বেশি দৌলত জগৎশেঠজীর। তাই মহিমাপুর-হাবেলির সব ফটকে বন্দুকওয়ালা পাহারাদার বসেছে। কোথাকার কোন্ নবাবের মোহরার তার রিস্তা-দারকে ঢুকতে দেবে জগৎশেঠজীর বাড়িতে! ভিখু শেখ আবার বন্দুকটা খাড়া করে ধরে গোঁফে তা দিতে লাগলো।

—কৌন্?

এবার দুটো পাল্‌কী এগিয়ে আসছিল। সামনে সামনে আসছিল আর এক-জন আদমী। আদমীটা কাছে আসতেই ভিখু শেখ হাতটা ধরে ফেলেছে। ফির দিল্‌লাগি!

বশীর মিঞা এবার বুকটা চিতিয়ে দাঁড়ালো।

—পাঞ্জা?

পাঞ্জাও ফেলে দিলে চিৎ করে ভিখু শেখের চোখের সামনে।

—পালকীতে কে আছে?

—জেনানা!

এবার আর আটকানো যায় না। ফটকটা ফাঁক করে রাস্তা করে দিলে ভিখু শেখ। দিতেই পালকী দুটো ভেতরে গিয়ে ঢুকলো। মহিমাপুরের এই বাড়িতে কত নবাব এসেছে। নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ এসেছে, নবাব সুজাউদ্দীন খাঁ এসেছে, নবাব সরফরাজ খাঁ এসেছে, নবাব আলীবর্দী খাঁ এসেছে। জগৎশেঠজীরা কি নবাবের চেয়ে কিছু ছোট? লড়াই করতে যখন টাকার কমতি পড়বে তখন তো জগৎশেঠজীর কাছেই হাত পাততে হবে। দিল্লীর বাদশার কাছেও যখন খাজনা পাঠাতে হবে তখন তো এই জগৎশেঠজীর কাছেই হুণ্ডি কাটতে হবে। পালকি ভেতরে চলে যাবার পর ভিখু শেখ আবার গোঁফ জোড়া পাকিয়ে নিলে। ভিখু শেখ নিজে পাঠান, আর জগৎশেঠজী জৈন। তা হোক, ভিখু শেখের কাছে ইমান-দারি আগে, তারপর জাত। ভিখু শেখ ইমানদারির জন্যে একবার নিজের জানের ঝুঁকি নিয়েছিল। দরকার হলে আবার নেবে। রাস্তার সামনে একটা ঘেয়ো কুকুর সামনের দিকে আসছিল। ভিখু শেখ বন্দুকটা জমিনের ওপর ঠুকলো—ভাগো, নিকালো—

শালা নেড়ি কুত্তার বাচ্ছা! জগৎশেঠজীর অন্দরে ঘুষতে এসেছে। নবাব সরফ-রাজ খাঁ এই রকম করে একদিন জগৎশেঠজীর হারেমে ঘুষতে চেয়েছিল। তার ফল পেয়েছে নবাব। তোরও সেই দশা হবে। ভাগ্ ভাগ্ নিকাল যা—ভিখু শেখ বন্দুকটা নিয়ে আবার জমিনের ওপর ঠুকে দিলে।

ওদিকে দেউড়ি পেরিয়ে পালকি দুটো গিয়ে থামলো দরদালানের সামনে। পালকির দরজা খুলে ঘোমটা দেওয়া জেনানা নামলো একজন। পেছনের পালকিতেও জেনানা। আর নামলো মোহরার মনসুর আলি মেহের। বশীর মিঞা বুকটা আরো চিতিয়ে দিয়ে সামনে এগিয়ে গেল। জগৎশেঠজীর অন্দরের দরোয়ান গদির দরজা খুলে দিলে। তারপর সকলকে বসতে বলে অন্দরে চলে গেল।

মনসুর আলি সাহেব বশীরকে বললে—তুই বাইরে যা—

বশীর মিঞা দরজার বাইরে এসে একটা বিড়ি ধরালে। তারপর চারদিকে চেয়ে দেখলে কেউ কোথাও নেই। মুর্শিদাবাদ থেকে অনেক দূরে এই মহিমাপুর। সারাদিন খেটে খেটে পরেশান হয়ে গিয়েছিল। তা জাসুসের কাজই এই-রকম। ভেতরে কি কথা হচ্ছে শোনা যাচ্ছে না। ভিখু শেখ তখন নেড়ি কুত্তাটাকে তাড়া করছে। বশীর মিঞা বললে—আহা হা, ওকে তাড়াচ্ছ কেন শেখজী, ও তো কুত্তা ছাড়া আর কিছু নয়—

তারপর ভালো করে ভাব করবার জন্যে জেব থেকে একটা বিড়ি বার করলে—একটা বিড়ি পিও খাঁ সাহেব—

ভিখু শেখ এ-রকম অনেক বশীর মিঞাকে বগলে টিপে মেরে ফেলতে পারে। কিছু বললে না মুখে, বশীরের দিকে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে একবার চাইলে। অর্থাৎ আমি যার-তার নোকর নই ছোকরা, আমি শাহান্শা বাদশা দিল্লীর আলমগীর বাদশার চেয়েও রেইস্ আদমী জগৎশেঠ মহাতাপজীর নোকর! আমি কুত্তাদের সঙ্গে বাত্-চিত্ করি না—

বশীর মিঞা ভয়ে ভয়ে পেছিয়ে এসে বিড়িটাতে লম্বা লম্বা টান দিতে লাগলো।

জগৎশেঠজী ঘরে ঢুকতেই সবাই উঠে দাঁড়িয়ে মাথা নিচু করে আদাব করলে। ততক্ষণে মনসুর আলি ঘরের সব জানালা দরজা বন্ধ করে দিয়ে এসেছে।

—হুজুর, ইনিই সেই হল্ওয়েল সাহেব আর একে তো চেনেনই, মীরজাফর আলি সাহেব।

জেনানার বোরখা খুলেছে তখন দুজনেই। জগৎশেঠজী বসতেই হল্ওয়েল সাহেব বসলো, পাশে বসলো মীরজাফর আলি খাঁ।

জগৎশেঠজী সোজা কথার লোক। ফতেচাঁদজী যতদিন বেঁচে ছিলেন, সব হাতে-কলমে মহাতাপজীকে শিখিয়ে পড়িয়ে দিয়ে গেছেন। মহাতাপজী নিজেও ছিলেন দিল্লীর বাদশার দরবারে। তামাম দুনিয়ায় কোথায় কী ঘটছে তা জগৎ-শেঠজীর জানতে বাকি নেই। দিল্লীর বাদশাই হোক আর তাতারের ক্ষুদে চামড়ার কারবারীই হোক, জগৎশেঠজীর কাছে টাকার জন্যে হাত প্যাততেই হবে। ফতেচাঁদজী রেখে গিয়েছিলেন দশ কোটি টাকা, মহাতাপজী আর স্বরূপচাঁদজী দুই ভাই মিলে তাকে এই ক'দিনেই বাড়িয়ে করেছেন বারো কোটি। টাকার জন্যেই বরাবর ওয়াটস্ সাহেব, কলেট্ সাহেব, হল্ওয়েল সাহেব, ব্যাটসন্ সাহেব সবাই তাঁর কাছে এসেছে হুণ্ডির জন্যে। কিন্তু এবার অন্য কারবার। এবার টাকা নয়, দুনিয়াদারি।

হল্ওয়েল সাহেব বললে—না হুজুর, দুনিয়াদারি নয়—

জগৎশেঠজী বললেন—তা দুনিয়াদারি নয় তো কী? আমার সঙ্গে টেক্কা দিয়ে আপনাদের কাউন্সিল কলকাতায় টাঁকশাল করেছে, আমি খবর পেয়েছি।

হল্ওয়েল ইংরেজ বাচ্ছা। গরম হতে জানলেও নরম হতেও জানে। বললে—আপনি যদি বলেন হুজুর তো মিণ্ট্ আমরা তুলে দেবো, আপনার মিণ্ট্ থেকেই আগেকার মতন আর্কট টাকা ম্যানুফ্যাকচার করে দেবো—! আপনি হুজুর যা যা বলবেন তাই-ই করবো, আমাদের কোম্পানী ইন্ডিয়াতে ব্যবসা করতে এসেছে, পিস্ফুলি ব্যবসা করতে পারলে আমরা তো আর কিছু চাই না—! কিন্তু নবাব আমাদের তাও করতে দেবেন না—

তারপর একটু থেমে আবার বললে—সেই জন্যেই আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি, আমি শুনেছি আপনি হুজুর এ-ব্যাপারে কোম্পানীর কাউন্সিলকে হেল্প করবেন—

মীরজাফর আলি এতক্ষণ চুপ করে ছিল। জগৎশেঠজীর সামনে বহুবার এসেছে আগে আলীবর্দী খাঁর সময়ে। কিন্তু তখনকার কথা আলাদা। হজরত আলির শেষ বংশধর। নবাব আলীবর্দীর সৎ বোনের স্বামী। বড় ভালোবাসতো আলীবর্দী খাঁ তাঁকে। কিন্তু শেষের দিকে চটে গিয়েছিলেন নবাব তার ওপর।

জগৎশেঠজী হঠাৎ বললেন—সরবৎ আনতে বলবো?

হল্ওয়েল সাহেব মাথা নিচু করে সবিনয়ে বললে—আপনার খেয়েই আপনার মেহেরবানীতেই কাউন্সিল এখানে টিঁকে আছে হুজুর—আর আপনাকে তখ্লিপ দেবো না—

মীরজাফর আলিও সুরে সুর মিলিয়ে বললে—হুজুরের অনেক কষ্ট হলো, আর কষ্ট দিতে চাই না—

—কিন্তু আমি আপনাদের কী মদত্ দিতে পারবো?

হল্ওয়েল সাহেব বললে—আপনি শুধু একটু নবাবকে বুঝিয়ে বললেই আমাদের উপকার হবে—

—কী বুঝিয়ে বলবো?

—যেন আমাদের ওপর আর টরচার না হয়, অত্যাচার না হয়!

তারপরে গলাটা একটু নিচু করে বললে—নবাব আমাদের চারিদিকে স্পাই লাগিয়েছেন, আমাদের এখানকার কাশিমবাজার কুঠির ওয়াটস্ কলেট ব্যাট্সনকে ধরে নিয়ে গিয়ে নজরবন্দী করে রেখেছিলেন, তাদের দিয়ে জোর করে বণ্ড লিখিয়ে নিয়েছেন, মুচলেকায় সই করতে হয়েছে তাদের। তাদের জেনানাদের পর্যন্ত ইন্সাল্ট করেছেন—নবাবের অর্ডারে কোম্পানীর কুঠির সব মাল লুঠ করেছে নিজামতের লোকেরা...

বলতে বলতে হল্ওয়েল সাহেব বোধ হয় উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। মীরজাফর বললে—আস্তে সাহেব, আস্তে, অত চেঁচিও না, কেউ শুনতে পাবে—

জগৎশেঠজী বললেন—না, বলুন আপনি। তারপর?

সে ইতিহাস তো একদিনের নয়, এক যুগেরও নয়। ১৭৩০ সালে নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলার জন্ম। তারও আগের কাহিনী সব। তখন এই জগৎশেঠ মহাতাপজীও জন্মাননি। মহারাজ স্বরূপচাঁদও জন্মাননি। তখন থেকেই তো ফিরিঙ্গী কোম্পানীর আমদানি হয়েছে হিন্দুস্থানে। তখন থেকেই বিষনজরে পড়েছিল কোম্পানী। আওরঙজেব মারা যাবার পর থেকে পাঁচজন মাত্র বাদশা হয়েছে। বলতে গেলে দিল্লির মসনদ তখন ফাঁকা। মারাঠারা উঠেছে পশ্চিমে আর শিখরা উঠতে চেষ্টা করছে উত্তরে। এই অবস্থায় আমরা নিশ্চিন্তে কেমন করে ব্যবসা করবো হুজুর।

রাত আরো গভীর হয়ে আসছে। পালকি-বেহারারা বাইরে বসে বসে ঢুলছে। বশীর মিঞা আর থাকতে পারলে না। তার নিজের বিড়ি তখন খতম হয়ে গেছে। বেহারাদের কাছে গিয়ে বললে—ভাইয়া, বিড়ি আছে তোমাদের কাছে?

ভিখু শেখ ধমক দিয়ে উঠলো ফটক থেকে—এই উল্লু, চিল্লাও মাত্—

গদির ভেতরে তখন জগৎশেঠজী বললেন—আপনারা মিথ্যে কথা কেন বললেন নবাবকে?

—কী মিথ্যে কথা?

—আপনারা কেল্লা বানাচ্ছেন কলকাতায়, এ-খবর নবাব পেয়েছিলেন। নবাবের চিঠির উত্তরে আপনাদের ড্রেক সাহেব লিখলেন—গঙ্গার ধারে পোস্তা ভেঙে যাওয়ায় মেরামত করছেন! এটা তো মিথ্যে কথা!

হল্‌ওয়েল সাহেব কী বলতে যাচ্ছিল, জগৎশেঠজী বাধা দিয়ে বললেন—আর কাশিমবাজার কুঠির ওয়াটস্‌ সাহেবের মুচলেকা আপনারা মেনে নিলেন না কেন? আর একটা কথা—

জগৎশেঠজীর কাছে সব খবরই আসে। বোঝা গেল তাঁর জানতে কিছুই বাকি নেই।

—ঢাকার নায়েব রাজা রাজবল্লভের ছেলে কেষ্টবল্লভকে আপনারা কলকাতায় থাকতে দিলেন কেন? তার সঙ্গে অত টাকা-কড়ি ছিল। আপনারা তার কাছ থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা নিয়ে নবাবের সঙ্গে বেইমানি করলেন কেন? রামরাম সিং-এর ছেলে নারাণ সিংকে আপনারা ধরে রাখলেন কেন? তাকে অপমান করলেন কেন? উমিচাঁদ একটা ঠগ, ওকে আপনারা অত আমল দেন কেন? কলকাতার সোরার কারবারী বেভারিজ সাহেবের সঙ্গে উমিচাঁদের অত দোস্তালি কেন?

মীরজাফর এতক্ষণ চুপ করেছিল। বললে—হুজুর, এইসব কথার জবাব দেবার জন্যেই আমরা এসেছি আপনার কাছে—আপনি নবাবের তরফের কথাগুলো শুনেছেন, এবার আমাদের তরফের কথাও শুনুন—

জগৎশেঠজী বললেন—বলুন—আমি যখন জবান দিয়েছি, তখন কাউকেই আমি এ-সব কথা বলবো না—এক আমি ছাড়া কেউই এ-সব জানবে না—

—কী বিড়ি রে? বড় কড়া মাল মালুম হচ্ছে—

ভিখু শেখ বন্দুক নিয়ে এগিয়ে এসেছে—এই কুত্তা, নিকাল্‌ ইঁহাসে—

হঠাৎ বোধ হয় বাইরের রাস্তার দিকে নজর পড়েছে। আর একটা পালকি। ঘন ঘন দম ফেলবার শব্দ কানে আসতেই ভিখু শেখ পেছন ফিরলো। আজ হলো কী! এত পালকি আসছে এখানে।

—পাঞ্জা!

পাঞ্জা দেখালে আর ভিখু শেখের করবার কিছু নেই। পাঞ্জা দেখলে ভিখু শেখ বন্দুকটা জমিন-এর ওপর রেখে খাড়া হয়ে দাঁড়ায়। পালকিটা দেউড়ির ভেতরে ঢুকলো। বশীর মিঞা তাজ্জব হয়ে গিয়েছিল। কোথাকার কে ভেতরে ঢুকছে নির্বিবাদে পাঞ্জা দেখিয়ে। পালকি থেকে পালকির দরজা খুলে কে নামলো একজন। ঢাকাই মসলিনের পিরান গায়ে। চটকদার চেহারা। নেমে সোজা সিঁড়ি দিয়ে দরদালানের দিকে এগিয়ে গেল। বশীর মিঞা কিছু বলতে পারলে না। ভদ্রলোক ভেতরে যেতেই পালকি-বেহারাদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলে—এ কৌন্‌ হ্যায় ভাইয়া? জমীন্‌দার?

ভিখু শেখ ওধার থেকে আবার ধমক দিয়ে উঠলো—এই কুত্তা, ফিন্‌?

জগৎশেঠজীর কাছে খবর গেল। খত্‌টা দেখে বললেন—এখন তো দেখা হবে না। বলে দে, কাল সকালে দেখা করতে—

মীরজাফর জিজ্ঞেস করলে—কে হুজুর, এত রাত্তিরে?

—হাতিয়াগড়ের জমিদার!

মীরজাফর যেন হাতে ঈদের চাঁদ পেয়ে গেল। বললে—হাতিয়াগড়ের জমিদার? ও এলে কোনো লোকসান নেই হুজুর, ওকে আসতে বলুন, হাতিয়া-

গড়ের রাজা আমাদের দলে—

যে লোকটা চিঠি নিয়ে এসেছিল সেও থমকে দাঁড়ালো।

মীরজাফর আবার বলতে লাগলো—শুধু হাতিয়াগড় নয় হুজুর, সবাই আমাদের দলে। নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র, নাটোরের মহারানী, সবাইকে আপনার কাছে নিয়ে আসবো হুজুর। হাতিয়াগড়ের জমিদারের কাছেও যে ফৌজী-সেপাই গিয়ে পরোয়ানা দিয়ে এসেছে—

—কেন?

—হাতিয়াগড়ের রাজার কাছেই আপনি সব শুনতে পাবেন হুজুর। আমি নিজে মুসলমান হয়ে বলছি, নবাবের কাছে হিন্দু মুসলমান খ্রিশ্চান কিছু নেই, তামাম বাঙলা মুলুক নবাবের দুষমন হয়ে গেছে!

জগৎশেঠজী বললেন—যাও, জমিদার সাহেবকে এত্তেলা দাও—

আর সঙ্গে সঙ্গে হাতিয়াগড়ের জমিদার হিরণ্যনারায়ণ রায় ঘরের ভেতরে ঢুকলেন। প্রথমে বুঝতে পারেননি। তারপর মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—আপনারা?

নয়ান পিসি তখন মরালীকে খাওয়াচ্ছিল। সারাদিন বিয়ের ধকল গেছে। উদ্ধব দাস শুভদৃষ্টির সময়েই লক্ষ্য করেছিল।

হরিপদ কানে কানে বলেছিল—একটু কান্নাকাটি করছে বটে, কিন্তু তা করুক, মেয়েমানুষের মন, ও দুদিনেই ঠিক হয়ে যাবে দাসমশাই, ওর জন্যে কিছু ভেবো না—

তারপর শোভারামের দিকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলেছিল—এ তোমার অনেক ভালো হলো শোভারাম, কলকাতার বর আসেনি, এ অনেক ভালো হয়েছে। বড়মশাই শুনলে রাগ করতেন, স্লেচ্ছদের চাকরি, জাত-জন্ম কি আর থাকতো তোমার মেয়ের?

শোভারাম বলেছিল—কিন্তু 'মরি' যে আমার বড় সোহাগী মেয়ে হরিপদ, পাশা খেলে, পান খায়, চুলে গন্ধ তেল দেয়, গান গায়—

হরিপদ বলেছিল—তা পাশা খেলবে। দাসমশাইও তো সৌখীন মানুষ, জানো, রসের গান জানে কত—

শোভারাম বলেছিল—কিন্তু রসের গান শুনলে তো আর পেট ভরবে না। শেষে কি বাঁড়ুজ্জে মশাইএর মেয়ের মত বাপের বাড়িতেই কাটিয়ে দেবে চির-জন্ম, শ্বশুরঘর করবার কপাল হবে না আর—

তারপর শোভারাম হরিপদকে জিজ্ঞেস করেছিল—আচ্ছা, মরি অত কাঁদছিল কেন বলো তো হরিপদ?

—আহা, মেয়েছেলে হয়ে জন্মেছে, কাঁদবে না? মায়ের কথা মনে পড়ছিল হয়তো! বিয়ের দিনে মেয়েছেলে কাঁদবে না তো কি বেটাছেলে কাঁদবে? সেই যে কথায় বলে না, মেয়েছেলের মন যেখানে যেমন! দেখবে দাসমশাইএর কাছে গিয়ে তখন তোমার কাছে আসতেই চাইবে না, দেখে নিও তুমি—

ঠিক এই ঘটনার পরেই কান্ত এসে গিয়েছিল। কতদূর থেকে কেমন করে

হাঁফাতে হাঁফাতে যে এসেছে। ঘেমে নেয়ে চান করে উঠেছে বর। সচ্চরিত্র ঘটক রাস্তা থেকেই চিৎকার করতে করতে আসছিল—বর এসে গেছে। বর এসে গেছে, উলু দাও গো, উলু দাও—

চারদিকে হৈ-হৈ কাণ্ড তখন। লোকজন খেতে বসেছিল উঠোনের মাঝখানে। সিদ্ধান্তবারিধি মশাই তখন সম্প্রদান সেরে গামছা দিয়ে গায়ের ঘাম মুছছেন। সব কথা কানে গিয়েছিল মরালীর। সব দেখা দেখে নিয়েছে। অনন্তদিদির বর দেখে একদিন ঘেন্না হয়েছিল মরালীর। নন্দাদিদির বিয়েও দেখেছিল। আজও অশোক-ষষ্ঠীর দিন নন্দদিদি উপোষ করে কলাগাছের পায়ে তেল-সিঁদুর দিয়ে এসে তবে জল খায়। তাদের পাশাপাশি তার নিজের বরের দিকে চেয়েও যেন কেমন ঘেন্না হলো। হঠাৎ তার দুর্গাদিদির কথা মনে পড়লো। দুগ্যাদি কত ওষুধ-বিষুধ জানে। ছোট বউরানীকে ওষুধ দিয়ে ছোটমশাইকে বশ করে রেখেছে।

চুপি চুপি বললে—পিসী—

নয়ান পিসী বললে—কী রে? কান্না থামলো তোর?

মরালী বললে—দুগ্যাদি আসেনি পিসী?

—হ্যাঁ, কেন রে? ওই তো উঠোনে বসে খাচ্ছে—

—একবার ডেকে দেবে পিসী?

তারপর খাওয়া-দাওয়ার পর দুর্গা এল। বললে—ডাকছিলিস্ নাকি রে মরি আমাকে?

আদর করে মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললে—বেশ ভাতার হয়েছে লো তোর, দেখলুম, বেশ ভাতার।

হঠাৎ মরালীর চোখে জল দেখে বললে—ওমা কাঁদছিস কেন লা? ভাতার বুঝি পছন্দ হয়নি?

মরালী যেন ডুকরে কেঁদে উঠলো। বললে—দুগ্যাদি, তুমি যে সেই আমাকে ওষুধ দেবে বলেছিলে?

—কীসের ওষুধ লা?

মরালী বলে উঠলো—আমি মরবো দুগ্যাদি, আমি বিষ খেয়ে মরবো—

—চুপ কর মুখপুড়ি, চুপ কর—

দুর্গা চারদিকে চেয়ে একবার দেখে নিলে। কেউ শুনতে পেয়েছে কি না কে জানে। নিজের আঁচল দিয়ে মরালীর চোখ দুটো মুছিয়ে দিলে। কোলে টেনে নিয়ে বোঝালে। বললে—মুখপুড়ি, তোর কপালে অনেক দুঃখু আছে, মেয়েমানুষের অত অসৈরন হলে চলে?

মরালী কাঁদতে কাঁদতে বললে—আমায় মরবার একটা ওষুধ দাও দুগ্যাদি, তোমার দুটি পায়ে পড়ি আমি—

দুর্গা কেমন যেন বোবা হয়ে গেল। অনেককে দুর্গা ওষুধ দিয়েছে। থুনকোর ওষুধ দিয়েছে গিরিরানীর মা'কে, বাধকের ওষুধ দিয়েছে বৈরাগীদের বউকে, বশীকরণের ওষুধ দিয়েছে অনন্তবালাকে। আরো কত বউ কত মেয়েছেলে এসেছে তার কাছে। দুর্গার ওষুধ আজ পর্যন্ত কখনো ব্যর্থ হয়নি। জলপড়া, আগুনে পোড়া, নখদর্পণ, বাঘের মুখখিলানি, বাটি চালানো—ওষুধ তো কম জানে না দুর্গা। কিন্তু এমন ওষুধ তো দুর্গার জানা নেই। স্বামীকে যার পছন্দ হয় না বিয়ের রাত্রে, তার প্রতিকার কেমন করে করবে দুর্গা!

—তা হ্যাঁ লো, বর বুঝি তোর পছন্দ হয়নি?

মরালী বললে—আমি গলায় দড়ি দেবো দুগ্যাদি—

দুর্গা বললে—মেয়েমানুষের অত পছন্দর বালাই কেন বল তো মরি? মেয়েমানুষ হয়ে জন্মেছিস, অত অসৈরন হলে চলে?

মরালী বললে—তাহলে কালকে আমার মরা মুখ দেখো তুমি দুগ্যাদি—

দুর্গা যেন কী ভাবলে। বললে—বোস, দাঁড়া দেখি কী করতে পারি—

তারপর একটু ভেবে বললে—তুই এখেন থেকে পালাতে পারবি?

—আমি চুলোয় যেতে পারি দুগ্যাদি, আমাকে তুমি বাঁচাও—

আর তারপরেই সেই রাত্রে যখন বাসর-ঘর থেকে সবাই বাইরে খেতে গেছে, উদ্ধব দাস মরালীর হাতটা চেপে ধরে ছিল। ঠিক তখনই বলা-কওয়া নেই, নিজের হাতটা টেনে নিয়ে খিড়কীর দরজাটা দিয়ে বেরিয়ে এসেছে। দুগ্যাদি বাইরেই দাঁড়িয়ে ছিল। হাত ধরে নিয়ে বললে—চেঁচাসনে, আয়,—সব ব্যবস্থা করে রেখেছি—

মাধব ঢালী পাহারা দিচ্ছিল রাজবাড়ির সদর দরজায়। একমুখ দাঁড়ি-গোঁফ। মাথায় গামছা বেঁধে, সড়কী আর লাঠিটা পাশে পাশে রেখে একটু বুঝি ঢুলছিল। একবার খুট করে শব্দ হতেই বাঘের মত লাফিয়ে উঠেছে।

—কে?

দুর্গা আঁচলের আড়াল দিয়ে মরালীকে নিয়ে আসছিল। বললে—দূর মুখপোড়া, চেঁচাচ্ছে দেখ, তোকে বলে গেলাম না—

তারপর মাধব ঢালীর পাশ দিয়ে যাবার সময় বললে—সরে দাঁড়াতে পারিসনে, মেয়েমানুষের গায়ে ঢলে পড়বি নাকি মুখপোড়া—

তখনো ভেতরের বার-মহলের উঠোনে ঢোকেনি। হঠাৎ মনে হলো যেন ঘোড়ার পায়ের শব্দ কানে এল। দুর্গা মরালীকে আড়াল করে বুড়ো শিবের মন্দিরে এসে দাঁড়ালো। তারপর একবার চারদিকে চেয়ে নিয়ে পা বাড়ালো। অতিথিশালার ভেতরে কেউ আছে কিনা কে জানে। ভোগবাড়ির দিকেও সমস্ত অন্ধকার। দক্ষিণ দিকের দরজাটা খোলা রেখেছিল দুর্গা। সেটা পেরিয়ে ভেতর-বাড়ির ছোট গড়বন্দী। সেখানে তখনো টিম্ টিম্ করে আলো জ্বলছিল।

দুর্গা বললে—আয়, তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে আয়, কেউ দেখে ফেলবে—

মরালী বললে—ও কীসের শব্দ দুগ্যাদি? ছোটমশাই বুঝি?

—দূর, ছোটমশাই তো মহিমাপুর গেছে—

কেন?

দুর্গা বললে—ডিহিদারের পরওয়ানা এসেছে—

—কিসের পরওয়ানা?

—তা জানিনে, তুই চুপ কর, কেউ জানতে পারলে তুইও মরবি আমিও মরবো—

তারপর কয়েকবার ঝন্-ঝন্ করে দরজার হুড়কো খোলার শব্দ হলো। আলো, ফিস্ফিস্ কথা, হাঁক-ডাক, সিঁড়িতে ওঠা-নামা। অন্ধকার সিঁড়ির তলায় একটা ঘরে মরালীকে পুরে দিয়ে দুর্গা বললে—এখানে থাক তুই, আমি দরজায় তালা-চাবি দিয়ে যাচ্ছি, কিচ্ছু ভাবিসনে, আমি এক্ষুনি আবার আসবো—

মেহেদী নেসার খানদানি লোক। তামাম মুর্শিদাবাদে মেহেদী নেসারের নাম জানে না, এমন মানুষ পাবে না। মেহেদী নেসার মানেই খেলাৎ মির্জা মহম্মদ নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলা। যারা নেহাত গরীব মানুষ, তারা নবাব পর্যন্ত পেঁছিতে পারে না। শুধু নবাব কেন, নবাবের কাছারি পর্যন্তও পেঁছিতে পারে না। কারো বাড়িতে চুরি হয়েছে, কারো স্বামীকে কোতোয়াল গ্রেপ্তার করেছে, দারোগা-ই-আদালতে গিয়ে ফরিয়াদ কবুল করতে হবে। কিন্তু তার আগে টাকা দাও। টাকা দিলে তবে তোমার আর্জি পেশ হবে। আর কত টাকা দিতে হবে, তারও আইন কায়েম আছে নিজামত-কাছারিতে।

সেরেস্তায় গেলেও সেই একই নিয়ম। খাসনবীশ থেকে শুরু করে পরগনা-কানুনগো আর পেস্কার মুন্সী মোহরার পর্যন্ত সবাই বাঁ হাতটা পেতেই বসে আছে। বলে—টাকা দাও তবে খালাস দেবো।

লোকে মিনতি করে বলে—জনাব, আগে আর্জিটা তো নেন, তার পরে আপনার পাওনা-গণ্ডা যা লাগে দেবো—

হুজুর-নবীশরা চটে যায়। বলে—পাওনা-গণ্ডা আবার বাকিতে চলে নাকি?

গরীব প্রজারা তবু পীড়াপীড়ি করে, বলে—পরে দেবো হুজুর, পরে দেবো, এবার ক্ষেতের ধান বেচেই আপনার পাওনা-গণ্ডা মিটিয়ে দেবো—

কিন্তু এত ল্যাঠায় দরকার কী! সোজা যদি কোনো রকমে মেহেদী নেসারকে ধরতে পারো তো তুমি যা চাও, তাই পাবে। আকাশের আফতাব থেকে শুরু করে ঈদের চাঁদ পর্যন্ত আদায় করে দিতে পারে মেহেদী নেসার। আর যদি মেহেদী নেসার পর্যন্ত না পেঁছিতে পারো তো সেরেস্তার মুন্সী মোহরার মনসুর আলি মেহের সাহেব পর্যন্ত পেঁছিতে পারলেই চলবে। আর যদি তা-ও না পারো তো বশীর মিঞা আছে। বশীর মিঞার ফুপা মনসুর আলি মেহের। বশীর মিঞা চেষ্টা করলেও তোমার আর্জি হাঁসিল করতে পারে।

আসলে নবাব-নিজামতে কেতাদুরস্তের কোনো কমতি নেই। পাঠানদের সময়ে যা-থাক তা-থাক, কিন্তু মোগল আমলে কানুন-কায়দার সব কিছু আছে। নায়েব সুবাদার আছে, দারোগা-ই-আদালত আছে, সিপাহসালার আজম আছে, খাসনবীশ, হুজুরনবীশ, দারোগা কাছারি, আমীন কাছারি, ফৌজদার, থানাদার, ডিহিদার, কোতোয়াল, কোতোয়াল-ই-দাগ সবই আছে। কিন্তু এ-সব ডিঙিয়েও তুমি আর্জি হাঁসিল করতে পারো, যদি মেহেদী নেসার তোমার সহায় হয়। মেহেদী নেসারের সবচেয়ে বড় গুণ, সে খেলাৎ মীর্জা মহম্মদের ইয়ার। নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলার দোস্ত্।

মেহেদী নেসার খুশী হলে হুকুম তো হুকুম, হাকিমও নড়ে যায়।

সেই মেহেদী নেসারের কাজের মধ্যে কাজ সকাল বেলা নাস্তা করেই মীর্জা মহম্মদের সঙ্গে মোলাকাত করা। আর যতদিন বুড়ো আলীবর্দী বেঁচে ছিল, ততদিন তো মেহেদী নেসারকে কেউ পরোয়া করেনি। কিন্তু এখন? এখন তামাম দুনিয়ার দৌলত মেহেদী নেসারের মুঠোর মধ্যে। এখন মেহেদী নেসারের এক কথায় জমিদারদের নসীব ওঠে আর নামে।

মুর্শিদাবাদের রাস্তায় মেহেদী নেসারের পালকি চলেছে ভিড়ের মধ্যে দিয়ে। বেহারারা হুম-হাম করতে করতে চলেছে। সামনে লোক দেখে হাঁকে—হুঁশিয়ার—

মেহেদী নেসার সারা রাত মহফিল করেছে কাল। ইয়ার-দোস্তদের নিয়ে খানাপিনা করেছে। কিন্তু মহফিল তেমন জমেনি। জুতসই হয়নি নেশাটা। মীর্জার মাথায় যত বদ্ ভাবনা ঢুকেছে। মেহেদী নেসার মীর্জাকে বলেছে—আরে এখন তুই গদি পেয়েছিস, এখন কাকে ডরাবি তুই? ওই ফিরিঙ্গীদের? তুই অত ডর-পোক কেন রে? আমাকে বল, আমি ওই শালা উমিচাঁদকে শায়েস্তা করে দিচ্ছি। ও শালা দুমুখো সাপ। ও তোরও খাবে, ফিরিঙ্গীদেরও খাবে। ওকে আমি এখুনি ঢিট্ করে দিতে পারি। ফুর্তির সময় ও-সব কথা ভাবিসনি, ওতে টাকাও নষ্ট, মহফিলও নষ্ট—

নাচ হয়েছে, পান হয়েছে, সরাব হয়েছে। তবু মীর্জার মন ওঠেনি।

মীর্জা বলেছে—এবার খতম করে দে ইয়ার, ঘুম পাচ্ছে—

—ঘুম পাচ্ছে? সে কী রে? বাঙলা মুলুকের নবাব ঘুমোবে কী রে? তোরই তো দুনিয়া। দিল্লীর বাদশা তো তোর কাছে জবাবদিহি চাইছে না। খাজনা পাঠাতেও বলছে না। আর আলীবর্দী খাঁ কখনো দিল্লীর দরবারে খাজনা পাঠিয়েছে? এখন কি আলমগীর বাদশা আছে দিল্লীর তখত-এ-তৌস্এ যে ভয় পাচ্ছিস?

তবু কিছুতেই জমেনি মহফিল। মীর্জা তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে গেছে। নবাবের আবার অত বেগমের ওপর টান কেন? নবাব তো নবাব সুজাউদ্দিন খাঁ, নবাব তো নবাব সরফরাজ খাঁ। ফুর্তি করতে জানতো, মহফিল করতে জানতো। সে-সব দিনের কথা শুনেছে মেহেদী নেসার। নবাব সুজাউদ্দিন বুড়ো বয়েস পর্যন্ত ফুর্তি করে গেছে নবাবের বাচ্চার মত। হ্যাঁ, জানতো কাকে বলে হর্‌রা। ইরান তুরান থেকে জেনানারা আসতো সুজাউদ্দিনের ফররাবাগে হোলির দিন। নবাব মসনদ ফেলে রেখে হোলি খেলতো সুন্দরীদের সঙ্গে। সঙ্গে থাকতো বেগমরা। দুনিয়ার সেরা সব রূপসী। নবাবী দেখতো দেওয়ানই আলা, দেওয়ান-খালসা-শরিফা আর নায়েব সুবাদাররা। যেদিন নবাবের জন্মদিন পড়তো, সেদিন তুলট হতো। সেদিন ইয়ারবক্সীরা ইনাম পেত, খেলাত পেত, বকশিশ পেত। আর সরফরাজ খাঁ? সরফরাজ খাঁ তো গদী পেয়েই ফররাবাগে হর্‌রা উড়িয়ে দিয়েছিল। নিজের মেয়েমানুষের অসুখ হলে সরফরাজ রোজা রেখে মাথায় কোরান নিয়ে টা-টা রোদের তলায় ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতো। আরে তুই নবাব হয়েছিস কি লড়াই করবার জন্যে? লড়াই-ই যদি করবি তো বাঙলার মসনদ নিয়ে কেন?

হঠাৎ পালকিটা দুলে উঠতেই মেহেদী নেসার চমকে উঠেছে—কে?

পালকি-বেহারারা পালকি থামিয়ে বললে—খোদাবন্দ—

আর দেখতে হলো না। একেবারে চক্-বাজারের মধ্যিখানের রাস্তা। চারিদিকে প্রজাদের ভিড়। একটা কশাইখানার পাশে মস্ত গর্ত। তারই ওপর পায়ে হোঁচট খেয়ে একজন বেহারা পড়ে গেছে। পা ভেঙে গেছে বোধহয়। আর উঠতে পারছে না। পালকিটা আর-একটু দুললেই মেহেদী নেসারের পালকি উল্টে যেত।

—ক্যা হুয়্যা?

—হুজুর, খোদাবন্দ, পা ভেঙে গেছে ওর, উঠতে পারছে না—

উঠতে পারছে না মানে? তাহলে কি পালকি চলবে না? মেহেদী নেসার এই বাজারের ময়লা গলির মধ্যে আটকে পড়ে থাকবে? ওঠ্ উল্লু-কা-পাট্ঠা! ওঠ্—

চল্ জলদি—

লোকটা হাত জোড় করে কাঁদো কাঁদো হয়ে ক্ষমা চাইলো।

মেহেদী নেসার রেগে তখন টং। একে কাল রাতে মহফিল জমেনি, তার ওপর এই ছোটলোকের দিগদারি। চাবুকটা পালকি থেকে নিয়ে এসে পিঠের ওপর সপাং-সপাং করে বসিয়ে দিতে লাগলো।

—সপাং—সপাং—সপাং—

—হুজুর, খোদাবন্দ—

আর কোনো কথা নয়। মেহেদী নেসারের সঙ্গে দিল্লাগি। আবার সপাং সপাং সপাং।

আশেপাশে রাস্তার লোকের অনেক ভিড় জমেছিল। মেহেদী নেসার এক-জনের গর্দানটা খপ্ করে ধরে ফেললে। তারপর জোর করে পালকিতে জুতে দিয়ে বললে—চল, লে চল—

মানুষ নয় তো সব। শুয়োরের বাচ্চা। শুয়োরের বাচ্চার মত রাস্তার ওপর পিলপিল করে পয়দা হচ্ছে সব। রেইস আদমিদের নড়বার জায়গা নেই, রাস্তায় চলবার পর্যন্ত উপায় নেই। রাস্তায় সবাই হাঁ করে মজা দেখতে বেরিয়েছে। নতুন লোকটা মামলার নথি নিয়ে কানুনগো-কাছারিতে এসেছিল দরবার করতে। তিন দিন ধরে হেঁটে হেঁটে সদর-কাছারিতে এসেছিল। হঠাৎ মামলা করা ঘুচে গেল, পালকি বয়ে নিয়ে যেতে হলো।

—নটবর!!

নটবর বেহারাদের সর্দার। মেহেদী নেসারের তলব পেয়েই পালকির দরজার মুখে এসে দাঁড়ালো।

—ও ছুকরিটা কে রে? জানিস?

—কোন্ ছুকরিটা হুজুর?

—ওই যে চৌকের পাশে একটা বাড়ির ঘুলঘুলি দিয়ে এদিকে চেয়ে দেখছিল? খোঁজ নিস্ তো কার মেয়ে! ওর বাপ কী করে?

এ-সব ইঙ্গিত বুঝতে পারে নটবর। বললে—হুজুর, বলেন তো কালকে মতিঝিলে হাজির করবো?

—পারবি?

—বান্দা কী না পারে!

মীর্জা মহম্মদ বড় মুষড়ে পড়েছে ক'দিন। আবার নয়া দাওয়াই দিতে হবে। নবাবজাদাদের এই মুশকিল। গদীতে বসবার পর থেকে কেবল ভাবছে কোথায় কী হচ্ছে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও স্বপ্ন দেখছে, কে বুঝি চাকু মারলো কলিজায়। কোথায় মহম্মদাবাদ, বাঙলা, ঘোড়াঘাট, সোনারগাঁতে কী ঘটছে, অমনি চমকে নড়ে ওঠে। সেই জন্যেই তো মেহেদী নেসার ফুর্তির মধ্যে ডুবিয়ে রাখতে চায় মীর্জাকে। এত ভাবলে মারা যাবি যে! সে-কথা বুঝতো নবাব সুজাউদ্দিন খাঁ, সরফরাজ খাঁ। নবাব আলীবর্দী খাঁ বোঝেনি, তাই জিন্দগী-ভর কেবল লড়াই করতে হয়েছে। লড়াই করতে করতেই জওয়ানি বরবাদ হয়ে গেছে।

বাজার পেরিয়েই গঙ্গা। পালকির দরজার ফাঁক দিয়ে গঙ্গা দেখা যায়। গঙ্গায় নৌকো চলেছে দাঁড় বেয়ে বেয়ে। হঠাৎ একটা নৌকোর দিকে চেয়েই কেমন চমকে উঠলো মেহেদী নেসার সাহেব। চেনা-চেনা যেন নৌকোটা। ছ' দাঁড়ের নৌকো। ময়ূরপঙ্খীর গলুই। তার লাগোয়া ছই-ঢাকা ঘর। তার সামনেই এক-

জন বসে আছে।

—নটবর!

নটবর আবার সামনে এল। মেহেদী নেসার জিজ্ঞেস করলে—ওটা কার বজরা যায় রে নটবর? হাতিয়াগড়ের জমিদার না?

—আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর, আপনি ঠিক বলেছেন।

মেহেদী আবার ভাবতে লাগলো। রাত্রে এসেছে, সকাল বেলা চলে যাচ্ছে। সব ওই জগৎশেঠজীর কাণ্ড! জগৎশেঠজীর কাছে দরবার করতে এসেছিল। বাঙলা মুলুকের যত জমিদার সব জগৎশেঠজীর দলে। সবাই নিমকহারামী করতে চাইছে।

পালকিটা মতিঝিলের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। যথারীতি যারা ফটকে পাহারা দিচ্ছিল তারা হাত তুলে আদাব্ করলো। পালকি আরো ভেতরে চললো। লম্বা ঝিল। ঝিলের শেষে শ্বেতপাথরে বাঁধানো চবুতর। মেহেরুন্নিসা বেগম বানিয়েছিল। জাহাঙ্গীরাবাদের টাকা দিয়ে জলের মত খরচ করেছে মতিঝিল বানাতে, রাজবল্লভ পেছনে আছে। শালারা ভেবেছিল মীর্জা ছেলেমানুষ, কিছু বোঝে না। সামনের সিংফটক দিয়ে ঢুকেই বড় দোতলা কুঠি। মাথার ওপর নহবতখানা। কাল অনেক রাত পর্যন্ত এখানেই মহ্ফিল হয়েছিল মেহেদী নেসারদের। মেহেদী নেসার সিঁড়ি দিয়ে সোজা ওপরে উঠতে লাগলো। বড় ঘরটার মাথায় আলোর ঝাড় ঝুলছে। কালকের মহ্ফিলের সব চিহ্নই সাফ করে ফেলেছে বান্দারা। মেহেদী নেসার সাহেব আবার তাকিয়া-ফরাসের ওপর কাত হয়ে পড়লো। হুজুতেই কাটলো ক'টা দিন।

সামনে দরজার বাইরে পায়ের আওয়াজ হতেই মেহেদী নেসার সাহেব বললে—দে দে, সরবৎ দে—

তারপর ভালো করে দেখে বুঝলে সরবৎ নয়, মনসুর মেহের আলি মোহরার এসে হাজির। সামনে এসে মাথা নিচু করে তিনবার হাত ঠেকালে মাথায়।

—আমাকে ডেকেছেন হুজুর?

—কী খবর পেলি তুই? মীরজাফর সাহেবের হাল-চাল কী? বশীর কোথায়?

বশীর মিঞা বোধহয় আড়ালেই ছিল। তার নাম উঠতেই সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢুকে কুর্নিশ করলে—হুজুর, খবর সব বিলকুল ঠিক হ্যায়। দেওয়ান-ই-আলা মীরজাফর সাহেব...

বাধা দিয়ে মেহেদী নেসার সাহেব বললে—দূর বেল্লিক, মীরজাফরকে আবার দেওয়ান-ই-আলা বলছিস কেন? ও তো বরখাস্ত হয়ে গেছে। এখন কী করছে তাই বল্। কার সঙ্গে শলা-পরামর্শ করছে তাই স্রেফ্ বল্। নজর রাখছিস?

—হ্যাঁ জনাব, রাখছি? মীরজাফর খাঁ সাহেবের বাড়ির সামনে চর রেখেছি, জগৎশেঠজীর বাড়ির সামনে ভি চর রেখেছি। কোলকাতায় বেতারিজ সাহেবের বাড়ির সামনে ভি রেখেছি, উমিচাঁদের বাড়ির সামনেও নজর রাখবার জন্যে চর রেখেছি, আমি খুদ্ নিজে ভি ঘুমছি তামাম বাঙলা মুলুকে—

তারপর একটু থেমে বললে—কিন্তু হুজুর, একঠো বাত্ আছে, ওই ভিখু শেখ শালা বেল্লিকের বাচ্ছা বড় খতরনাক্ আদমি হুজুর, শালা হারামী আমাকে কুত্তির বাচ্ছা বলে গালাগালি দেয়—

—কে ভিখু শেখ? ভিখু শেখ কে?

—আজ্ঞে হুজুর, ওই জগৎশেঠজীর ফটকের সেপাই—

—ওই পাঠানটা?

—জী হাঁ, হুজুর!

—আচ্ছা তুই যা,—

বলে মেহেদী নেসার সাহেব মোহরার মনসুর আলি মেহেরের দিকে চাইলে। তারপর হঠাৎ কী মনে পড়ে গেল। আবার ডাকলে—শোন্ বশীর—

বশীর ঘুরে দাঁড়ালো। মেহেদী নেসার সাহেব বললে—হ্যাঁরে, হাতিয়াগড়ের জমিদার কেন এসেছিল রে মুর্শিদাবাদে? আজ তার বজ্‌রা দেখলুম। মহিমাপুরের দিক থেকে আসছে। জগৎশেঠজীর কাছে গিয়েছিল নাকি শল্লা করতে?

—কই, না হুজুর, আমি তো জগৎশেঠজীর বাড়ির সামনে নজর রাখার ইন্তেজাম করেছি, কেউ তো আসেনি সেখানে—

—কেউ আসেনি?

—না হুজুর,—

—মীরজাফর আলি, হল্‌ওয়েল, ওয়াটস্, ব্যাটসন্, কলেট্, উমিচাঁদ, কি কোনো জমিদার, জায়গীরদার, পাট্টাদার, তালুকদার, —কেউ না?

—আজ্ঞে হুজুর, সে তো আসছে হুণ্ডি কাটতে। তারা তো হামেশা আসছে!

—নিজামতের মহাফেজখানা কি সেরেস্তার কেউ যাচ্ছে?

—না, কেউ যাচ্ছে না হুজুর!

তারপর আসল কথাটা মনে পড়লো এতক্ষণে। ভেতর থেকে মতিঝিলের খিদ্‌মদ্‌গার এক গেলাস ঠান্ডা সরবত এনে দিয়েছিল। তাতে একবার চুমুক দিয়ে বললে—আর সেই হাতিয়াগড়ের রাণীবিবির কী হলো? ডিহিদারের পরওয়ানা পৌঁছে গেছে?

একেবারে ভুলে গিয়েছিল বশীর মিঞা এ-কথাটা। ইস্! লজ্জায় মাথা কাটা গেল বশীর মিঞার। তামাম বাঙলা মুলুকের জাসুসী কাজ একলা বশীর মিঞার মাথার মধ্যে। দুনিয়ার কাজ সব তার ঘাড়ে। ক'টা দিকে দিক্‌দারি করবে সে। সেই কবেকার ব্যাপার। এখনো কোনো বন্দোবস্ত করা হয়নি। তখন বুড়ো নবাব বেঁচে। মীর্জা মহম্মদের সাদির সময় মুর্শিদাবাদের ভিড় ছিল দেখবার মত। জলের মত টাকা উড়িয়েছিলেন আলীবর্দী খাঁ। সারা মুলুক ঝেঁটিয়ে জমিদাররা এসেছিল এখানে। জিন্নতাবাদ, টাঁড়া, ফতেবাদ, মহম্মদাবাদ, বাক্‌লা, পূর্ণিয়া, তাজপুর বাজুহা, হাতিয়াগড়—সব সরকারের জমিদাররা এসে জুটেছিল এখানে। মুর্শিদাবাদের ঘাটে বজরার গাদি লেগে গিয়েছিল। মেহেদী নেসার তখনই প্রথম দেখেছিল হাতিয়াগড়ের রাণীবিবিকে। নয়া জওয়ানী মেয়ে। চোখ দুটো যেন আসমানের জমিন্। মেঘ-মেঘ রোদ-রোদ। বজ্‌রার খিড়কীর ভেতর দেখা। মীর্জাকেও দেখিয়েছিল। বলেছিল—ইয়া আল্লা, ওকে চাই ইয়ার। খোঁজ নাও কে ও! মেহেদী নেসারও সব খোঁজ-খবর নিলে। জানা গেল হাতিয়াগড়ের দোসরা তরফের রাণীবিবি। আগের রানীর বাচ্ছা পয়দা হয়নি বলে দোসরা বিবি ঘরে এনেছে। তা হোক, তাতে মীর্জার ইয়ারের কোনো লাভ-নুকসান নেই। আরে, আওরতের আবার জাত-বিচার কি! যেমন মসনদ্ হলো মসনদ্, তেমনি আওরত্ হলো আওরত্। মসনদ্ কেড়ে নিতে পারলেই নিজের। আলীবর্দী খাঁ মুর্শিদাবাদের মসনদ কেড়ে নিতে পেরেছিল সরফরাজ খাঁকে খুন করে। তাই

তা তার নিজের হয়েছে। মেয়েমানুষও তেমনি। কেড়ে নিতে পারলে আমি তোমার। আবার আমাকে যে কেড়ে নেবে আমি তার হবো। মসনদ মেয়েমানুষ টাকা—এদের তো এই-ই কানুন।

মনসুর আলি মেহের সাহেব তখনো দাঁড়িয়েছিল।

—তুই আবার ঝুট-মুট দাঁড়িয়ে কেন?

—আজ্ঞে, আপনি কিছু ফরমায়েশ করুন—

মেহেদী নেসার বললে—সেরেস্তায় যা-কিছু শুনবি, সব আমাকে বলে যাবি। মোহনলাল দেওয়ান-ই-আলা হয়েছে বলে সকলের বুক জ্বলছে খুব, না?

—আজ্ঞে, না হুজুর।

—হলে বলে যাবি আমাকে। রাজবল্লভটা কাফের বাচ্ছা, ওটাকেও শায়েস্তা করতে হবে। আর ওই বাঁদীর বাচ্ছা, মেহেরুন্নিসা, ঘসেটি বেগম! সকলকে শায়েস্তা করে তবে দেওয়ানী কাবিল করবো। তুই যা—

ততক্ষণে একটু নেশার ঘোর লেগেছে নেসারের মগজে। একটু-একটু করে লাল হয়ে আসছে চোখ। এমনি লাল আরো লালচে হবে। যত বেলা বাড়বে তত মেহেদী নেসার সাহেব রঙিন হয়ে উঠবে। সারা মতিঝিলে তখন রোশনাই জ্বলে উঠবে। মতিঝিল যেন বুঝতে পারে সব। মতিঝিলেরও যেন প্রাণ আছে। এই মতিঝিলে কত রোশনাই হয়েছে একদিন। এখানেই রাজবল্লভ এসে চুপি চুপি বুড়ো নবাবের বড় মেয়ে ঘসেটি বেগমের সঙ্গে রাত কাটিয়েছে। আবার সেই বিছানা থেকেই ঘসেটি বেগম মাঝরাতে উঠে গিয়ে শুয়েছে হুসেন কুলি খাঁর ঘরে। এখানকার প্রতিটি পাথরে যেন আলীবর্দীর পাপের দাগ লেগে আছে। তুমি একদিন তোমার অন্নদাতাকে মেরেছ, তোমার অন্নদাতার একমাত্র ছেলে সরফরাজকে খুন করেছ। তোমার পাপের কি শেষ আছে জাঁহাপনা! তুমি কেবল রাজনীতিই মেনেছ, আর কোনো নীতিই তো মানোনি। তাই চোখের সামনে দেখেছো তোমার মেয়েদের কীর্তি-কেচ্ছা। তারপর আরো কিছুদিন বেঁচে থাকলে আরো দেখে যেতে পারতে! দেখে যেতে পারতে নজর আলির কীর্তি। তখন ঘসেটি বেগমের এই মতিঝিল তোমার নাতির অত্যাচারে থর থর করে কাঁপছে। তোমার বড় আদরের মীর্জা মহম্মদ হুকুম দিয়েছে মতিঝিল লুট করে যা পাবে নিয়ে আসবে। ঘসেটি বেগমের অনেক টাকা, অনেক দৌলত, অনেক ঐশ্বর্য। জাহাঙ্গীরাবাদের সব টাকা নিয়ে এখানকার সিন্দুকে লুকিয়ে রেখেছে। একদিন রাত থাকতে নবাবী ফৌজ গিয়ে সকালবেলা মতিঝিল ঘিরে ফেললে।

তখনো বুঝি ঘসেটি বেগমের ঘুম ভাঙেনি। নবাব-বেগমদের সকাল-সকাল ঘুম ভাঙা যেন অপরাধ। আর সকাল সকাল ঘুম ভাঙবেই বা কেন? কীসের দায়? কিন্তু ঘুম ভেঙেছে নজর আলির। নজর আলি সত্যিই নজর আলি। মেয়েরা তার দিকে একবার নজর দিলে আর চোখ ফেরাতে পারে না। হুসেন কুলি খাঁর চেয়েও সুন্দর দেখতে। চারদিকে নবাবী ফৌজের নিশানা টের পেয়েই ঘুম ভেঙে গেছে। তাড়াতাড়ি পিরেন-পায়জামা সামলে নিয়ে ঘসেটি বেগমকে ডাকতে লাগলো—মেহেরুন্নিসা, মেহেরুন্নিসা—

ঘসেটি ধড়ফড় করে উঠেই সব দেখে শুনে তাজ্জব হয়ে গেছে।

—কী হবে এখন নজর? মীর্জা তো সহজে ছাড়বে না।

ততক্ষণে নবাবী ফৌজ তোপ দাগবার জন্যে তৈরি হয়ে গেছে। মতিঝিলের আমলা-নোকর-নোকরানীরা সবাই ভয় পেয়ে যে-যেদিকে পারে দৌড়চ্ছে।

—মীরজাফরকে খবর দেবো?

নজর আলি বললে—তাকে এত্তেলা দিলে কিছু হবে না, মোহনলালকে হাত করতে হবে। সে-ই তো এখন সেপাহ্‌শালার—

—তা হাত করো না, কত টাকা লাগবে মোহনলালকে হাত করতে?

নজর আলি জিজ্ঞেস করলে—কত টাকা আছে তোমার কাছে এখন?

তা কি মনে আছে না গুণে রেখেছে ঘসেটি বেগম। তাড়াতাড়ি সিন্দুক খোলা হলো। জাহাঙ্গীরাবাদের দেওয়ানী করা টাকা। শুধু টাকাই নয়, সোনা আছে, মুক্তো আছে, হীরে আছে, চুনি পান্না মতি সব আছে ঘসেটি বেগমের। সব তুলে নিলে নজর আলি। টাকাও নিলে গয়নাও নিলে। সব দিতে হবে মোহনলালকে। যে যা চাইবে তাকে তাই দিতে হবে। বারো লাখও হতে পারে পনের লাখও হতে পারে। সেই টাকা নিয়েই সেই ভোর বেলা বেরিয়ে গেল নজর আলি। বললে—আমি ফিরে আসছি মেহেরুন্নিসা বিবি,—তুমি ঘাবড়িও না—

সে নজর আলি তারপর আর আসেনি। ঘসেটি বেগম যাকে পেরেছে দুহাতে টাকা বিলিয়েছে তার মতিঝিল বাঁচাবার জন্যে। কিন্তু মতিঝিল বাঁচেনি। আজও দুপুর বেলা মাঝে মাঝে বোধহয় তাই মতিঝিলের চোখে তন্দ্রা নামে আর তন্দ্রার মধ্যে খাপছাড়া স্বপ্ন দেখে।

—কৌন্‌?

কোথায় যেন একটা গোলমাল উঠলো। মতিঝিলের ঘরগুলোর মধ্যে যেন আর্তনাদ করে উঠলো কেউ! মেহেদী নেসারের তন্দ্রা ভেঙে গেল। কৌন্‌? কে? নজর আলি কি আবার ফিরে এল ফৌজ নিয়ে। দুপুরবেলার মতিঝিলে তো এত আওয়াজ হওয়ার নিয়ম নেই। তবে কি মীর্জার ভাই শওকত জঙ্‌? পূর্ণিয়া থেকে নবাবীর খবর পেয়ে দৌড়ে এসেছে? না কি কাশিমবাজার কুঠির ওয়াটস্‌! ফিরিঙ্গীদের পল্টন নিয়ে সোজা গঙ্গা বেয়ে এসে হাজির হয়েছে মতিঝিলে।

নেশার মধ্যেই উঠে দাঁড়ালো নেসার। মৌতাত এরা জমাতে দেবে না কেউ।

—খোদাবন্দ্‌!

মেহেদী নেসার চোখ তুলে দেখলে, মতিঝিলের সেপাইরা কাকে ধরে এনেছে। সমস্ত শরীর দিয়ে ঝর-ঝর করে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। পেছনে-পেছনে মতিঝিলের নোকর-নোকরানী-বান্দা-খোজা সবাই এসেছে।

—হুজুর, একে খুন করে ফেলেছি।

মেহেদী নেসার চিৎকার করে উঠলো—কে এ? কী করেছিল?

—হুজুর, এর নাম কাশেম আলি। লস্করপুরের তালুকদার! নিজামত্‌ আদালতে পেশকশ্‌ দিতে এসেছিল, চকবাজারের কাছে হুজুর আপনার পাল্কিতে জুতে দিয়েছিলেন, তাদের সঙ্গে-সঙ্গে একেবারে মতিঝিলের অন্দরে ঢুকে পড়েছিল—মনে হচ্ছে মতলব খারাপ। সিঁড়ির নিচে লুকিয়ে ছিল, তাই কোতল্‌ করে দিয়েছি—

—বেশ করেছিস! আচ্ছা করেছিস্‌!

লোকটার দিকে আবার চাইলে মেহেদী নেসার। সারা শরীর থেকে রক্ত ঝরছে। লোকটাকে ধরে জুতে দিয়েছিল পাল্কিতে। একটা কথা পর্যন্ত বলেনি, প্রতিবাদও করেনি তখন। এখন মনে হলো যেন কথা বলতে চাইছে। যে-কথা হুসেন কুলী খাঁ বলতে চেয়েছিল মরবার সময়, সেই কথা বলবার জন্যেই যেন লস্করপুরের তালুকদার কাশেম আলিও নড়ে-চড়ে উঠছে। তামাম বাঙলা

মুলুকের মুখের কথা একা সে-ই মরার আগে বলে যাবে।

—ওরে, নড়ছে যে, কোতল কর, কোতল কর ওকে—এখনো জিন্দা আছে—

আর নিজের চিৎকারে নিজেরই ঘুম ভেঙে গেছে মেহেদী নেসারের। মতিঝিলেরও ঘুম ভেঙে গেছে। চারদিকে লাল চোখ দিয়ে চেয়ে দেখলে মেহেদী নেসার। কেউ কোথাও নেই। এতক্ষণ কেবল স্বপ্ন দেখছিল তবে! মিছিমিছি ভয় পেয়ে গিয়েছিল মেহেদী নেসার। মুর্শিদাবাদের চেহেল্-সুতুন কায়েম হয়ে গেছে, মসনদও কায়েম হয়ে গেছে। ঘসেটি বেগম, মীরজাফর, ওয়াটস্, ফিরিঙ্গী কোম্পানী, শওকত জঙ্, সব খতম। এবার আর কীসের ভয়। কাকে ভয়? মেহেদী নেসার হাঁকলে—সরবৎ—

খিদ্মদ্গার হঠাৎ ঘরে ঢুকেছে—হুজুর, নবাবের তাঞ্জাম এসেছে—

সেদিন সেই হাতিয়াগড়ের অন্ধকার ঘরের চারটে দেওয়ালের মধ্যে গাঁয়ের একটি মেয়েই শুধু পালিয়ে আসেনি। পালিয়ে এসেছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রাণলক্ষ্মীও । মাঠে-ঘাটে একদিন যে-লক্ষ্মী বায়ু হয়ে অগ্নি হয়ে জল হয়ে ঘরে ঘরে ক্ষুধা তৃষ্ণা কামনা বাসনা মিটিয়েছে, পৌষের শিশির হয়ে, বৈশাখের রৌদ্র হয়ে, নীড়ের শান্তি, গৃহকোণের স্নেহ, পিতার আশীর্বাদ, মায়ের বাৎসল্য, স্বামী-স্ত্রীর প্রেম হয়ে শতাব্দীর পর শতাব্দী প্রাণরস জুগিয়েছে, তার বুঝি শেষ হলো। একদিন ধর্মপাল-দেবপালের দেশে যে সূর্য উঠেছিল, বখ্তিয়ারের আবির্ভাবে সেই সূর্যই বুঝি মধ্য আকাশে ভাস্বর হয়ে উঠেছিল তারপর। তখনো মানুষকে ঘর ছেড়ে বেরোতে হয়নি। গৌড়ের সিংহাসনে বাঙলার প্রাণলক্ষ্মী নিরাপদই ছিল সেদিন। পঞ্চাশ বছরের ইলিয়াস-শাহী বাদশা বাঙলার বুকে অচল-অটল হয়ে বসেছিল। হিন্দুদের হিন্দুত্ব বজায় ছিল, তবু গৌড়ীয় সুলতানদের তাতে কিছু এসে যায়নি। গঙ্গা যমুনার মধ্যে সপ্তগ্রামে এসে জাহাজ ভিড়তো। তিন দীনারে দুগ্ধবতী একটা গরু, এক দিরহামে আটটা মুরগী, দুই দিরহামে একটা ভেড়া। দুই দীনারে তিরিশ হাত মসলীন্, আর নগদ একটা মোহর দিলে সুন্দরী একটি মেয়ে-বাঁদী। যারা এখানে এসেছে তারা সস্তার বহর দেখে অবাক হয়ে গেছে। এখানে চাঁদ উঠেছে রাত্রে আর ধানের ক্ষেতে, বাড়ির চালে, আর রাজার প্রাসাদে তা সমান হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। অম্বুবাচীর দিন সিদ্ধান্তবারিধিরা শাস্ত্রের নির্দেশ দিয়েছেন, রোজার দিন নির্দেশ দিয়েছেন মৌলানা-মৌলবীরা। হাঁচি কাশি টিক্টিকি চামচিকে নিয়ে জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ নিষ্পন্ন হয়েছে নির্বিঘ্নে। শোক দুঃখ আনন্দ নিয়ে জীবন এগিয়ে গেছে অব্যাহত। কিন্তু তখনো প্রাণলক্ষ্মী চঞ্চল হয়নি। দোল দুর্গোৎসব চড়কের গাজনে বার বার উজ্জীবিত হয়েছে বাঙলার সেই প্রাণরস।

কিন্তু এবারই প্রথম নিরুদ্দেশ হয়ে গেল সে। সেই মরালী।

বাবুদের পাঁচমহলা গড়বন্দী বাড়িতে সে এসে উঠলো এবার। কেউ জানতে পারলে না। না মাধব ঢালী, না হরিপদ, না গোকুল, না শোভারাম, না উদ্ধব দাস, না কান্ত, না বশীর মিঞা, কেউ নয়। মেহেদী নেসার, মনসুর আলি, হরিপদ, নয়ান পিসি, এমন কি ছোটমশাইও জানতে পারলে না। সবাই তখন ঘুমিয়ে

অজ্ঞান অচৈতন্য।

হঠাৎ শেষ রাত্রের দিকে বড় বউরানী ছোটমশাই-এর ডাকে দরজা খুলে দিলেন।

—কী হলো? তুমি? কখন এলে?

—এই এখুনি। মীরজাফর আলির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ফিরিঙ্গীদের হল্‌ওয়েল সাহেবও ছিল সেখানে।

—জগৎশেঠজী কী বললে?

ছোটমশাই বললেন—সব কথা আমি খুলে বললুম। আমি একলা নয়, মীর-জাফর সাহেবও তো রেগে আছে নবাবের ওপর, ওকেও সরিয়ে দিয়েছে কিনা নিজামত্‌ থেকে। সেই জায়গায় নিজের শালা মোহনলালকে করেছে সিপাহ্‌-শালার—

বড় বউরানী বললেন—সে তো হলো, কিন্তু এদিকে পরওয়ানার কথা কী বললে?

—জগৎশেঠজী সব শুনলেন। তারপর বললেন, এ-সব মেহেদী নেসারের কাণ্ড, নবাবকে বলবো—

বড় বউরানী রেগে গেলেন। বললেন—নবাবকে বললে কী হবে? কিছুছু হবে না, বললে না কেন? যে-নবাব ইয়ারবক্সীদের কথায় চলে তাকে বলে কী লাভ হবে! পরের মেয়েমানুষের দিকে যাদের লোভ তাদের হাতে রাজ্য পড়েছে—আজকেও তো ডিহিদার ফৌজের সেপাই পাঠিয়েছিল—

—কী বললে?

—কী আবার বলবে, সেই পুরোন পরওয়ানা।

—আমি মুর্শিদাবাদে গিয়েছি জানতে পেরেছে নাকি?

বড় বউরানী বললেন—নায়েব মশাই-এর হাতে পরওয়ানা দিয়ে গেছে, মাধব ঢালীকে জিজ্ঞেস করেছিল ছোটমশাই কোথায়—সে বলে দিয়েছে তুমি ঘুমিয়ে পড়েছো, তখন নায়েব মশাইকে গিয়ে পরওয়ানাটা দিয়েছে—

—আমি মুর্শিদাবাদে গিয়েছি তা কেউ জানে না তো?

—না, কে আর জানবে! কেউ জানে না।

—তাহলে এখন কী হবে?

তাহলে কী যে হবে তাই-ই ক'মাস ধরে ভাবছেন ছোটমশাই। আব্‌ওয়াব মাথট্‌ আর নজর—এর সঙ্গেই যা-কিছু সম্পর্ক নবাবের। প্রাসাদের সুখ-সুবিধের দায়িত্ব সব জমিদারদের। নবাবের তা দেখবার দরকার হয় না। দেখবার সময়ও নেই। ডিহিদার, ফৌজদার, পরগণাদার আছে বটে। কিন্তু সে তো শুধু নবাবের স্বার্থ দেখতে। জমিদারদের স্বার্থ দেখতে হবে তাদের নিজেদেরই। এক-একদিন খাতাপত্র সুদ্ধ তলব্‌ করেন খাজাঞ্চিমশাইকে। বলেন—বড়মশাই-এর সময় যেমন সব চলছিল, তেমনি চলা চাই খাজাঞ্চিমশাই—

জগা খাজাঞ্চি বলে—কিন্তু তেমন যে আর চলছে না—এখন যে সব আইন-কানুন বদ্‌লে যাচ্ছে। প্রেজারাও যে সব একটু জো পেলে চলে যাচ্ছে কলকাতায়। সেখানে সব সেপাইএর কাজ দিচ্ছে ফিরিঙ্গীরা—

—তা নবাব-সরকারে নালিশ করেছ? আমাদের উকীল বরদা মজুমদারকে চিঠি লিখে দাও তুমি, কিংবা সুবেদারের কাছে নালিশ পেশ করতে বলো তাঁকে—

খাজাঞ্চি মশাই বলে—তাতে কিছু হবে না—

—আগে হতো আর এখন হবে না কেন?

—শুনেছি লড়াই বাধবে!

—লড়াই!

হাতিয়াগড় থেকে সব খবর প্রথম দিকে পাওয়া যেত না। তারপরে যেবার মুর্শিদাবাদ গেলেন নজর-পুণ্যাহের সময়, সেখানে গিয়েই সব খবর পেলেন। ফরাসীদের সঙ্গে ইংরেজদের ঝগড়ার কথা শুনলেন। মীরজাফরের সঙ্গে নবাবের ঝগড়ার কথা শুনলেন। উমিচাঁদের ব্যাপার শুনলেন। ওয়াটস্ সাহেবকে নিজামতে ধরে নিয়ে এসে অত্যাচারের কথাও শুনলেন। তারপর নিজের পরওয়ানার কথাও জানলেন। ডিহিদারকে দিয়ে মেহেদী নেসারই এই কান্ড করিয়েছে।

ডাকলেন—গোকুল—

গোকুল পেছনেই ছিল। বললেন—যা তো, নায়েব মশাইকে একবার ডেকে নিয়ে আয় তো।

রাত তখন বুঝি পুইয়ে আসছে। বজ্‌রায় সারারাত ভালো ঘুম হয়নি। সমস্ত শরীরটা টন্ টন্ করছে।

ওদিকে অন্ধকার ঘরের মধ্যে রাত্রি তখনো আকাশ-পাতাল ঘুরে বেড়াচ্ছে। ঝনাৎ করে চাবি-তালার শব্দ হতেই দরজা খুলে গেল। দুর্গা বললে—ভয় পেয়েছিলি নাকি মুখপুড়ি? যখন বলেছি তোকে বাঁচাবো তখন কোনো ভয় নেই তোর—ছোট বউরানীকে তাই বললুম—

মরালী জিজ্ঞেস করলে—ছোট বউরানী কী বললে শুনে?

—বললে, দেখিস দুগ্‌গা, যেন সব্বোনাশ না হয়, বড় বউরানী যেন জানতে না পারে। আমি বললাম—আমি ঠিক সামলে নেবো—এই নে, তোর জন্যে ছোট বউরানীর কাছ থেকে শাড়ি চেয়ে নিয়ে এসেছি, চেলি ছেড়ে এইটে পর—খাবি কিছু? খিদে পেয়েছে?

মরালীর তখন সত্যিই চোখে জল এসে গেছে। সত্যি, এমন করে কে তার কথা ভাবে?

দুর্গা আবার বললে—এখুনি তোর বরকে তোর কাছে এই ঘরে এনে দিতে পারি, দেখবি?

মরালী অবাক হয়ে গেল। জিজ্ঞেস করলে—কী করে?

—কিন্নর-সাধন করে। কিন্নরসাধন-মন্তর পড়লে তোর বর এখুনি এসে পড়বে এখানে—

মরালী বললে—না দুগ্‌গাদি, তোমার দুটি পায়ে পড়ি। বরের কাছে আমি আর যাবো না—

দুর্গা বললে—দূর তোর ও-বর কেন রে, সেই বর, সেই কলকাতার বর। দেখবি কিন্নর-সাধন মন্তর পড়লেই সেই বর এসে একেবারে এই ঘরের মধ্যে হাজির হবে, এসেই তোকে প্রাণেশ্বরী বলে জড়িয়ে ধরবে। তখন দুজনে গলাগলি জড়াজড়ি করে শুয়ে থাকবি—

মরালী বললে—কিন্তু আমার বড় ভয় করছে দুগ্‌গাদি, যদি কেউ দেখে ফেলে—

—দেখতে পাবে কেমন করে? এ ঘরে কি কেউ আসে? এ দিক কেউ মাড়ায় না। খিড়কীর পুকুরের দিকে এই ঘর। এখানে চেঁচিয়ে কথা বললেও কেউ টের পাবে না। তোকে আমি এখানে ভাত এনে দেবো, তুই থাকবি খাবি ঘুমোবি—তোর বরও থাকবে তুইও থাকবি—

মরালী কী ভাবতে লাগলো আবার।

দুর্গা বললে—তোর বর তো এখন অতিথ্‌শালায় উঠেছে, এই আমাদের অতিথ্‌শালায়—

—কোন্‌ বর?

—তোর কলকাতার বর লো। তুই রোস একটু, আমি ডেকে আনছি—

—এই ছোটমশাইএর অতিথ্‌শালায়?

—হ্যাঁ লো, হ্যাঁ। এখেনে এসে উঠেছে। ওই বুড়ো ঘটকটা, নাপিত আর তোর বর, দাঁড়া আমি এখুনি ডেকে আনছি—

দুর্গা চলে গেল। যাবার সময় আবার দরজায় তালা লাগিয়ে দিয়ে গেল। মরালীর মনে হলো সব যেন নিস্তব্ধ হয়ে এল চারিদিকে। সব চুপ-চাপ। জানালার পাশে কোথায় বুঝি একটা ঝিঁ-ঝিঁ পোকা শুধু শব্দের করাত দিয়ে বিকট শব্দ করতে করতে সে-অন্ধকার চিরে খান্‌ খান্‌ করে ফেলছে। এই সব অন্ধকার রাতেই মুর্শিদাবাদের নবাবের বিরুদ্ধে যত ষড়যন্ত্র মুখর হয়ে ওঠে। মতিঝিলের ওপর একটা দোদুল্যমান বাতাস বুঝি এইসব রাতেই কেঁপে কেঁপে প্রহর ঘোষণা করে। মেহেদী নেসার, ইবলিশ, মহম্মদ, ইয়ারজান, সফিউল্লা সাহেবরা তখন তাদের কোটর থেকে বেরিয়ে ফণা তুলে ধরে আকাশে। তারা নবাবকে পরামর্শ দেয়—কলকাতা একেবারে সোনায় মোড়া জাঁহাপনা, কলকাতা লুঠ করলে চাঁদি, জহরৎ, আর মোহরের কোনো কিফায়েৎ হবে না—

তারা বলে—জাঁহাপনার চারদিকে দুষমন, ওদিকে জাঁহাপনার মাসতুতো ভাই শওকত জঙ্‌ আর এদিকে ঘসেটি বেগমসাহেবরা আর ফিরিঙ্গীরা, সকলকে ঠাণ্ডা করে মসনদে বসে মহফিল করবেন—

তারা বলে—আর মেয়েমানুষ? জেনানা? তাও আমরা জাঁহাপনাকে জোগাড় করে দেবো। নবাব সরফরাজ খাঁর পনেরো শ' বাঁদী বেগম ছিল, জাঁহাপনারও অভাব হবে না জেনানার, একটা ফৈজি বেগম গেছে যাক্‌, আমরা জাঁহাপনাকে আরো হাজার হাজার ফৈজি বেগম জোগাড় করে দেবো—

নায়েব মশাইএর হাত থেকে তখন পরওয়ানাটা নিয়ে ছোটমশাই পড়ছেন—'বদরগাহ রসুল নেয়ামত উসুল কোনেন্দা বান্দে নবাব মীর্জা মহম্মদ মনসুর-উল্‌-মুল্‌ক সিরাজ-উ-দ্দৌলা শা কুলি খান বাহাদুর, হেবাৎ জং আলমগীর বজন্দিগী তোমার খেয়ের খোবি দারুদ সুরাতে বান্দার খোয়ের খোবি সোদ...'

পড়তে পড়তে যেন হাত কাঁপতে লাগলো ছোটমশাইএর। মনে হলো তিনি যেন আর দাঁড়াতে পারছেন না। মাথাও ঘুরতে লাগলো। পাশে গোকুল ছিল, নায়েব মশাই ছিল। তারা হঠাৎ ছোটমশাইকে ধরে ফেললে।

আর ওদিকে কলকাতার কেল্লার মধ্যে হল্‌ওয়েল সাহেবও রেড়ির তেলের আলোর সামনে কেদারায় বসে ডেস্‌প্যাচে লিখে চলেছে—

"...বাঙালী হিন্দুরা সব আমাদের পক্ষে আছে জানবেন। কলকাতায় এসে তাদের অবস্থাও ভালো করে দিয়েছি আমরা। তারা জানে আমরা তাদের টাকাকড়ি কেড়ে নিই না। দেনার দায়ে তাদের খৃস্টান করি না। কাজ করিয়ে ন্যায্য দাম দিই তাদের। বেগার দিতে হয় না এখানে। শহর তাই অনেক বেড়ে গিয়েছে। কারণ সবাই জানে আমরা শুধু এখানে ব্যবসা-বাণিজ্য করতেই এসেছি। নবাবের মা আমিনা বেগমও আমাদের সঙ্গে মাল বেচা-কেনা করে। উমিচাঁদ আমাদের দলে। নদীয়ার রাজা কিষণচন্দর আমাদের দলে। সম্প্রতি মীরজাফর আলি খাঁকে কম্যাণ্ডার-ইন-চীফের চাকরি থেকে নবাব তাড়িয়ে দিয়েছে। এখন সেও আমাদের

দলে চলে এসেছে। সেদিন আমি ব্যাঙ্কার মহাতাপ জগৎশেঠের বাড়িতে গিয়ে লুকিয়ে দেখা করে এসেছি। সেখানে হাতিয়াগড়ের রাজা হিরণ্যনারায়ণের সঙ্গে দেখা হয়েছে। সেও আমাদের দলে। তার ছোট রানীকে জোর করে নবাব-হারেমে পাঠাবার জন্যে ডিহিদার পরোয়ানা পাঠিয়েছিল। তাই সেও আমাদের দলে যোগ দিতে রাজি হয়েছে। আগে কলকাতায় পাকা-বাড়ি কেউ বানাতো না, পাছে টাকা হয়েছে মনে করে কেউ কুনজর দেয়। এখন কিছু কিছু পাকা-বাড়ি হচ্ছে। নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর আমলে রেভিনিউ আদায় হতো চার হাজার টাকা। এখন বেড়ে সতেরো হাজারে উঠেছে। ট্যাক্স বাবদ আরো নব্বুই হাজার টাকা আয় হচ্ছে। আমরা সইয়ে সইয়ে আদায় করছি। নবাবদের মত জোরজবরদস্তি করি না। আমরা নবাবদের মত কাফেরদের কাছ থেকে বেশি ট্যাক্স নিই না। আমরা মুসলমান হিন্দু দুদলকেই সমান চোখে দেখি। তাই আমাদের ওপর হিন্দুরা খুব খুশী। নবাবের যারা বিশ্বাসী আমীর-ওমরাহ তারাও নবাবের ধ্বংসই চায়। এই বাঙালীদের স্বভাবই এই রকম। এদের কাউকে বিশ্বাস করা যায় না। তাই খুব সাবধানে কাজ করতে হচ্ছে। আমরা এদের বলেছি যে আমরা ব্যবসাদার মানুষ, ব্যবসা করে টাকা-কড়ি পেলেই খুশী, মসনদে কে বসবে তা নিয়ে আমরা মাথা ঘামাই না।—এই বাঙালীরা এত বোকা যে এরা আমাদের সেই কথায় বিশ্বাস করেছে...”

দুর্গা হঠাৎ দৌড়তে দৌড়তে আবার ঘরে ঢুকেছে, ঢুকেই হাঁফাতে লাগলো।

মরালী বললে—কী হলো দুগ্গাদি?

—সর্বোনাশ হয়েছে রে। অতিথশালার দিকে যাচ্ছিলুম তোর বরকে ডাকতে, হঠাৎ এক কাণ্ড হয়ে গেছে—

—কী কাণ্ড?

—ছোটমশাই হঠাৎ মুর্শিদাবাদ থেকে বাড়ি ফিরে নায়েব কাছারির কাছে অজ্ঞান হয়ে গেছে—বড় বউরানী তাই শুনে নিচেয় নেমে আসছে—

তারপর একটু থেমে বললে—তুই বোস্ চুপ করে, আমি আসছি—

বলে দুর্গা আবার দরজা বন্ধ করে বাইরে চলে গেল।
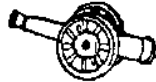
—কী রে, তুই?

মতিঝিল থেকে বেরিয়েই হঠাৎ কান্তর সঙ্গে দেখা। বশীর মিঞা কান্তর চেহারা দেখে অবাক হয়ে গেছে। চেহারা শুকিয়ে একেবারে চামড়া হয়ে গেছে।

—তোর সাদি হয়ে গেছে? সেদিন যে সাদি করতে গেলি?

—না ভাই, আমার দেরি হয়ে গেল যেতে, আর অন্য বরের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিয়েছে তারা। কী করবো আর, সেখান থেকে কলকাতায় গিয়েছিলাম। আমার সে চাকরিও নেই আর। তাই তোর খোঁজেই মুর্শিদাবাদে এলুম।

—ভালো করেছিস। একটা নোকরি খালি আছে। ছ'টাকা তলব। হাতিয়াগড়ে যেতে হবে তোকে।

—হাতিয়াগড়ে? হাতিয়াগড়েই তো বিয়ে করতে গিয়েছিলুম আমি।

—তা হলে আবার যা।

—কী কাজ?

বশীর মিঞা বললে—বলছি তোকে সব। আমার সঙ্গে আয়, সব বলবো—হাতিয়াগড়ের রাণীবিবিকে সঙ্গে করে নিয়ে আসতে হবে তোকে—

সচ্চরিত্র পুরকায়স্থের লজ্জাও নেই। আবার খাতা-পত্র নিয়ে পুটলি ঘাড়ে করে অন্য জায়গায় ঘটকালি করতে যায়। হাঁটতে হাঁটতে যায়, আবার কোথাও কোনো সরাইখানা থাকলে সেখানে রাতটার মতন জিরোয়। আর যেখানে কোনো জমিদার বাড়িতে অতিথিশালা থাকে, সেখানে দিন দুই বিশ্রাম করে আবার বেরিয়ে পড়ে। আজিমাবাদ হয়ে রাজমহল গিয়ে একেবারে সুতী পর্যন্ত চলে যায়। তারপর সেখান থেকে মুর্শিদাবাদ, জলাঙ্গী, অগ্রদ্বীপ হয়ে গঙ্গার ওপারের গাজিপুর পর্যন্ত।

কিংবা বর্ধমান থেকে বীরভূম পর্যন্ত গিয়ে মাঝখানে বক্রেশ্বর হয়ে পুবে কাশিমবাজার। তারপর রামপুর বোয়ালিয়ার দক্ষিণে হাজরাহাট দিয়ে করতোয়ার তীর ঘেঁষে ঘেঁষে সেরপুর মুরচা পর্যন্ত যায়। বর্ধিষ্ণু একটা গ্রাম দেখলেই একটু জিরিয়ে নেয়। একে-ওকে ডেকে জিজ্ঞেস করে—আপনাদের গাঁয়ে ভালো পাত্তোর-টাত্তোর আছে মশাই?

কিন্তু যারা খবরটা পেয়েছে তারা বলে—না বাপু, তোমাকে দিয়ে ঘটকালি করাবো না—

—কেন আজ্ঞে, আমি কী দোষ করলুম?

—দোষ করো নাই? হাতিয়াগড়ের শোভারাম বিশ্বাসের মেয়েটার কী সব্বোনাশ করলে বলো দিকিনি? তার ইহকালও গেল পরকালও গেল—

সচ্চরিত্র বোঝে খবরটা জানাজানি হয়ে গেছে। এ-খবর জানাজানি হতে বেশিদিন লাগে না। এক সরকার থেকে আর এক সরকারে লোক যায়, নৌকো যায়, হাতি যায়। সচ্চরিত্র চলতে চলতে হয়তো একেবারে কেষ্টনগর চলে গেছে। কেষ্টনগরে অতিথিশালা আছে। যজমানও কিছু আছে সেখানে সচ্চরিত্রর। তবু কেষ্টনগরের রাজবাড়িতে খাওয়াটা ভালো দেয়। নবদ্বীপের রাজা। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের খাতিরটা হয় ভালো মতন।

কেষ্টনগরের কাছাকাছি এলেই লোকে ক্ষেপায়। বলে—এই সচ্চরিত্র—

ছেলে-ছোকরার কথায় না ক্ষেপলেই ল্যাঠা চুকে যায়। কিন্তু সচ্চরিত্র ক্ষেপে ওঠে। ক্ষেপে গিয়ে দৌড়োয়। তাদের পেছন পেছন তাড়া করে। বলে—তবে রে হাড়-হাবাতের দল—

কিন্তু ছেলে-ছোকরাদের সঙ্গে পারবে কেন সচ্চরিত্র। তারা দৌড়তে দৌড়তে কোথায় গিয়ে লুকিয়ে পড়ে তখন আর কাউকে দেখতে পাওয়া যায় না। এমনি করেই দিন কেটে যায় সচ্চরিত্রর। এমনি করেই শোভারামের মেয়ের বিয়ের ব্যাপারটা ভুলতে চেষ্টা করে। কেষ্টনগর থেকে শিবনিবাস যায়। শিবনিবাস থেকে মোল্লাহাটি। মোল্লাহাটিতে গিয়ে হয়তো একটা পুকুরের ধারে গাছের ছায়ায় বসে জিরিয়ে নেয়। তারপর পোঁটলাটা মাথায় নিয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে।

সেদিন সচ্চরিত্র একেবারে ধড়মড় করে উঠে পড়েছে। কে? কে যেন ডাকলে আমাকে?

মনে হলো দূরে যেন কার পালকি যাচ্ছে। পালকির দরজাটা খোলা। কেউ ডাকেনি তাকে। পালকির বেহারাদের হুম্-হাম্ শব্দেই হয়তো তন্দ্রাটা ভেঙে গেছে। হয়তো কোনো জমিদার হবে। যাচ্ছে কেষ্টনগর রাজবাড়িতে। ভালো পাত্রের সন্ধান পেলেও পাওয়া যেতে পারে। তাড়াতাড়ি গিয়ে রাস্তার ওপর দাঁড়ালো। কে যায় গো? কে?

পালকি-বেহারারা ঘেমে নেয়ে উঠেছে।

—খুব যে গ্যাদা হয়েছে গো! বলি কে আছে ভেতরে?

তবু কেউ উত্তর দিলে না। সচ্চরিত্রকে চেনে তারা। পাগল-ছাগলের কথায় উত্তর দেয় না। ক্ষিধে পাচ্ছিল খুব। পেটের ভেতর ন্যাড়ি-ভুঁড়িগুলো বাট্না বাটতে শুরু করেছে। পুঁটলিটা নিয়ে আবার হাঁটতে শুরু করলে সচ্চরিত্র। মোল্লাহাটির শ্রীধর বাঁড়ুজ্জে মশাইএর একটা ছেলে ছিল। বহুদিন আগের কথা। ছেলে তখন সবে জন্মেছে। প্রায় ন'বছর হয়ে গেল। সেই পাত্রটির সন্ধানে গেলে হয়। পুঁটলিটা নিয়ে উঠলো সচ্চরিত্র। উঠে আবার পথ চলা। হঠাৎ দূর থেকে আবার দেখা গেল সেই পালকিটা আবার আসছে।

পালকিটা পাশ দিয়ে চলে যাবারই কথা। সচ্চরিত্র রাস্তার একপাশে সরে দাঁড়ালো। কিন্তু অবাক কান্ড, পালকিটা সামনে এসেই থেমে গেছে।

—শিবনিবাসের পথটা কোন্ দিকে কত্তা?

সচ্চরিত্র বললে—কেন বলতে যাবো শুনি? আমার কথার উত্তর দিয়েছিলে তোমরা? আমি ঈশ্বর ইন্দীবর ঘটকের পুত্র, ঈশ্বর কালীবর ঘটকের পৌত্র...

হঠাৎ পালকির ভেতর থেকে একটা মুখ বেরোতেই সচ্চরিত্র একেবারে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে কড়জোড়ে বলে উঠলো—ছোটমশাই আপনি? অধীনকে মার্জনা করবেন হুজুর—

হাতিয়াগড়ের ছোটমশাইএর হয়তো তখন অত কথা শোনবার সময় ছিল না। চেহারাটা কেমন শুক্নো-শুক্নো। গরম কাল। ছোটমশাইকে হাতিয়াগড়ে অনেকবার দেখেছে সচ্চরিত্র। ছোটমশাইএর অতিথিশালাতেও গিয়ে অনেক দিন রাত কাটিয়ে এসেছে। ছোটমশাইএর মত ভালো-মানুষ ক'টা আছে বাঙলা দেশে। শুধু ছোটমশাই কেন, বড়মশাইকেও চিনতো সচ্চরিত্র। রথের সময় পুণ্যাহের সময় নতুন কাপড় দিতেন তিনি। সে-সব দিনের কথা সচ্চরিত্রর মনে আছে।

ছোটমশাই বললেন—শিবনিবাসের রাস্তা জানো তুমি?

—আজ্ঞে, শিবনিবাসের রাস্তা আমি চিনবো না? আমি হলুম ঈশ্বর ইন্দীবর ঘটকের পুত্র, ঈশ্বর কালীবর ঘটকের পৌত্র...

—ও-সব কথা থাক, আমার সময় নেই, শিবনিবাসে যাবার সোজা রাস্তাটা কোন্ দিকে গেলে পড়ে—তুমি গেছো তো ওদিকে!

—আজ্ঞে, এই তো শিবনিবাস থেকেই আসছি আমি ছোটমশাই। ওখেনে মহারাজ কেষ্টচন্দ্র আছেন, তস্য মন্ত্রী কালীপ্রসাদ সিংহ মশাই আছেন, গোপাল ভাঁড় মশাই আছেন, রায় গুণাকর কবিভূষণ ভারতচন্দ্র আছেন। আমি গেলুম, মহারাজ আমাকে পাঁচটি টাকা দিলেন, আমাকে খুব স্নেহ করেন কি না—আর আমি তো যে-সে ঘটক নই ছোটমশাই, ঈশ্বর ইন্দীবর ঘটকের...

ও-সব কথা শোনবার বোধহয় সময় ছিল না ছোটমশাইএর। বেহারাদের ইঙ্গিত করতেই তারা চলতে লাগলো—

সচ্চরিত্র চেঁচিয়ে বলে উঠলো—আজ্ঞে, সোজা নাক-বরাবর গিয়ে বাঁ দিকে

-মোড় নেবেন, সেখানে চুঁয়োডাঙার মধ্যে পড়ে ইছামতীর পাড় ধরে একেবারে...

ছোটমশাই শুনতে পেলেন কি না কে জানে। পালকিটা হন্ হন্ করে চলে গেল। আহা, ছোটমশাইকে ভালো করে পথটা বলে দেওয়া হলো না। সচ্চরিত্রর মাথার মধ্যে সব সময় যেন চরকির পাক চলছে। শোভারামের মেয়ের বিয়ের পর থেকেই জিনিসটা হচ্ছে। আর সে-যুগ নেই। এখন যেন ঘটক দেখলে ঠাট্টা করে সবাই। যেন ঠাট্টার বস্তু সচ্চরিত্র। আমি মরছি পেটের জ্বালায়, আর সবাই ঠাট্টা ধরে নিয়েছে। কুল শীল মিলিয়ে, মেল্-গোত্র যাচাই করে বিবাহ দেওয়া কি যার-তার কাজ কর্তা? আমার পিতা ঈশ্বর ইন্দীবর ঘটক, পিতামহ কালীবর ঘটক...

হঠাৎ পেছন থেকে কে একজন নবাবী নিজামতের লোক একেবারে চেঁচিয়ে উঠেছে—এই পণ্ডিত—পণ্ডিত—

মহা মুশকিলে পড়া গেল। সচ্চরিত্রকেও চেনে না নাকি! আমার পিতা ঈশ্বর ইন্দীবর ঘটক, আমার পিতামহ কালীবর ঘটক...

পরিচয় দিতে দিতেই জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। নবাবী কেতায় প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে।

আমি রে বাবা, আমি! আমি কোথায় যাই তাতে তোমার কীসের দরকার বাপু! তুমি নিজের চাকায় তেল দাও না ভাইসাহেব! আমি পণ্ডিত নই, আমি ঘটক, ঘটককারিকা আমার মুখস্থ—

—চলো, মেহেদী নেসার সাহেব তলব দিয়েছে। চলো—

সচ্চরিত্রর বুকটা ধক্ করে উঠেছে মেহেদী নেসার সাহেবের নাম শুনে। এর পর কেঁচোর মত হয়ে গেল সচ্চরিত্রর মুখখানা। সেপাইটার পেছন পেছন যেতে হলো। মোল্লায় ধরলে মসজিদ পর্যন্ত নিয়ে গিয়ে তবে ছাড়বে। কোথা দিয়ে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে কে জানে। জিজ্ঞেস করবার সাহস পর্যন্ত নেই সচ্চরিত্রর। পুঁটলিটা বগলে করে একেবারে নদীর ধারে নিয়ে গেল। ঘাটে নৌকো বাঁধা। ভেতরে মেহেদী নেসার সাহেব। সঙ্গে ইয়ার-বক্সী সবাই আছে।

নৌকোর সামনে যেতেই সচ্চরিত্র টিপ করে একটা প্রণাম ঠুকে দিলে।

মেহেদী নেসার মদ খেলেও কাজের কথা ভোলে না।

জিজ্ঞেস করলে—হ্যাঁরে পণ্ডিত, সড়ক দিয়ে পালকি করে কাউকে যেতে দেখেছিস্ তুই—

—দেখেছি হুজুর—

মেহেদী নেসার শুধু একলা নয়। ইবলিশ সাহেব, সফিউল্লা সাহেব, ইয়ার-জান্ সাহেব। নবাবের সব সাগ্রেদরা হুল্লোড় করছে ভেতরে।

—বহুত্ আচ্ছা পণ্ডিত, বহুত্ আচ্ছা—

ইবলিশ সাহেব বললে—ওকে একটু দারু দাও নেসার মিঞা, পণ্ডিতের গলাটা শুকিয়ে গিয়েছে ইয়ার—

—দারু খাবি পণ্ডিত? গলা ভিজিয়ে নিবি?

শুধু মদ নয়, ভেতর থেকে মাংস'র গন্ধও আসছে। হো হো করে সবাই হেসে উঠলো কথাটায়। সচ্চরিত্র কাপড়টা দিয়ে নাক চাপা দিলে। গন্ধতে পেটের নাড়ি-ভুঁড়িগুলো পর্যন্ত বমি হয়ে আসছে।

—পালকিতে কে ছিল দেখেছিস?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, জনাব।

—কে?

—হাতিয়াগড়ের ছোটমশাই হুজুর—

বলেই সচ্চরিত্র বুঝলে বলাটা ঠিক হয়নি। ছোটমশাইএর কী ক্ষতি করবে কে জানে!

—কোন্ দিকে গেল?

ততক্ষণে একজন সত্যি সত্যিই গেলাসে মদ ঢেলে টলতে টলতে সামনে নিয়ে এসে মুখে দেয় আর কি। আর একজন মাংসের বাটিটা নিয়ে এসেছে খাওয়াবে বলে।

সচ্চরিত্র তখনো মুখে কাপড় চাপা দিয়ে আছে। কোনো রকমে মুখ ফাঁক করে বললে—ও-সব আমি খাই না হুজুর। আমি হিন্দু হুজুর—

মেহেদী নেসার জিজ্ঞেস করলে—শিগ্‌গির বল্, জমিদার বাচ্ছা কোন্ দিকে গেল—তাহলে গোস্ খাওয়াবো না, না বলতে পারলে তোকে গোস্ খাইয়ে দেবো—

—হুজুর, জমিদারবাবু মোল্লাহাটের দিকে গেল!

—মোল্লাহাট?

—হ্যাঁ হুজুর, মোল্লাহাটের রাস্তা জিজ্ঞেস করলেন আমাকে—আমি তাই রাস্তা বলে দিলুম!

কে জানে, কী সদ্‌বুদ্ধি উদয় হলো সচ্চরিত্রর মনে। ছোটমশাইএর অতিথি-শালায় অনেক দিন আশ্রয় পেয়েছে সচ্চরিত্র। হয়তো শিবনিবাসের নাম করলে কোনো সর্বনাশ হবে ছোটমশাইএর। কে জানে! এ মিথ্যে কথায় কোনো পাপ নেই।

মোল্লাহাটের নাম শুনে যেন খানিকটা নিশ্চিন্ত হলো সবাই। নৌকো আবার মোল্লাহাটের দিকেই ফিরলো। মোল্লাহাটে পৌঁছোতে রাত পুইয়ে ভোর হয়ে যাবে। কিন্তু ইয়ারজান্ ছাড়লে না। বললে—পণ্ডিত উব্‌কার করেছে, তাহলে পণ্ডিতকে একটু দারু খাইয়েই দে ইয়ার, পণ্ডিতের গলা ভিজিয়ে দে—

তারপর সে এক কাণ্ড! তিনজনে মিলেই সচ্চরিত্রকে জাপটে ধরলে। তারপর নাকের কাপড়টা খুলে দিয়ে একজন মুখটা হাঁ করিয়ে মদ ঢেলে দিলে। গলা দিয়ে কিছুতেই ঢোকে না। তারেই ওপর আর একজন মাংস নিয়ে মুখের মধ্যে পুরে দিয়ে বললে—খা পণ্ডিত, খা—খা—

সচ্চরিত্রর মনে হলো মাথাটা যেন তার ঘুরছে। হাত থেকে ঘটক-কারিকার পুঁটলিটা মাটিতে পড়ে গেল। বোধহয় তার তখন আর জ্ঞানই নেই। সেই টা-টা করা রোদ, সেই দুপুর বেলা মাথার ব্রহ্মতালু ভেদ করে যেন প্রাণটা বেরিয়ে আসতে চাইলো বাইরে। সঙ্গে সঙ্গে সবাই হো হো করে পৈশাচিক হাসি হেসে উঠেছে।

হঠাৎ অনেকক্ষণ পরে জ্ঞান হতেই চোখ তুলে দেখলে কে যেন তার মাথায় জল দিচ্ছে। চিনতে পারলে না লোকটাকে। একমুখ পাকা দাড়ি, বেশ বুড়ো মানুষ।

সচ্চরিত্র চোখ চাইতেই লোকটা বললে—এমন গরমে কি বেরোতে হয় বাবা। মাথা ঘুরে পড়ে তো যাবেই—

তবু কথা বলছে না দেখে লোকটা বললে—আমি এখানকার মসজিদের ইমাম সাহেব বাবা, আমার মস্‌জিদে হেঁটে যেতে পারবে?

সচ্চরিত্রর তখনো ভয় যায়নি। বললে—ইমাম সাহেব, ওঁরা কোথায়?

—ওঁরা কারা বাবা?

নাম উচ্চারণ করতেও যেন ভয় হলো সচ্চরিত্রর। পাশেই বমি পড়ে রয়েছে তার। এতক্ষণে গন্ধটা যেন নতুন করে এসে নাকে লাগলো। মনে পড়লো সব ঘটনাগুলো। রাম রাম থুঃ থুঃ—সচ্চরিত্র ছেলেমানুষের মত হাউ-হাউ করে কেঁদে ফেললে। আমার সর্বনাশ হয়েছে ইমাম সাহেব, আমার জাত গেছে—আমার সব গেছে—

বলতে বলতে কান্নায় আর কথা বলতে পারলে না সচ্চরিত্র। ইমাম সাহেব এ-অঞ্চলের বহু পুরোন লোক। এ-সব জিনিস দেখা আছে। নদী থেকে জল তুলে এনে মাথায় দিতে লাগলো। কান্না যেন আর থামতে চায় না। আমার যজমানদের কাছে আমি মুখ দেখাবো কেমন করে ইমাম সাহেব—

শিবের নিবাস বোধহয় শিবনিবাস। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র যখন কোথাও যাবেন একলা যাবেন না। সঙ্গে পারিষদরাও যাবে। লোকে বলতো—মহারাজ তো হারাজ, নদীয়ার মহারাজ—। উদ্ধব দাস কতবার ছড়া কেটেছিল কৃষ্ণচন্দ্রকে য়। একবার ডেকেছিলেন মহারাজ। বলেছিলেন—লোকটাকে একবার আনিস তো আমার কাছে—

উদ্ধব দাস গেয়েছিল—

আমি রবো না ভব-ভবনে!
শুন হে শিব শ্রবণে!
যে-নারী করে নাথ পতিবক্ষে পদাঘাত
তুমি তারি বশীভূত
আমি তা সবো কেমনে!

মহারাজ রসিক লোক। বললেন—তারপর? তারপর? কার লেখা? তোমার?

উদ্ধব দাস বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ মহারাজ, এই অধীনের রচনা। তারপর গাইতে শুরু করলে—

পতি বক্ষে পদ হানি ও হলো না কলঙ্কিনী
মন্দ হলো মন্দাকিনী ভক্ত হরিদাস ভণে।
আমি রবো না ভব-ভবনে।

উদ্ধব দাসের গান শুনে সেবার খুব ভালো লেগেছিল মহারাজার। পাশে ন্ত্রী কালিপ্রসাদ সিং বসেছিলেন। তিনি বললেন—ওর আর একটা গান আছে, শোনাও তো দাস-মশাই—তোমার সেই ছড়াটা?

উদ্ধব দাস বললে—তবে শুনুন আজ্ঞে—শোভার কথা বলি—

বলে উদ্ধব দাস আরম্ভ করলে—

শুন শুন সভাজন অভাজনের নিবেদন।
শোভার কথা সভা মধ্যে করি বিবরণ॥
ঐরাবতের ইন্দ্র শোভা, যোগীর শোভা জটা॥
ব্রাহ্মণের পৈতে শোভা, কপালের শোভা ফোঁটা॥
আহা বেশ বেশ বেশ॥

রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র শুনছিলেন। সভাকবি! তাঁর মুখ দিয়ে হাসি বেরোল। বললেন—বাঃ, বেশ বেশ—

উদ্ধব দাস আবার আরম্ভ করলে—

নিশির শোভা শশী আর নভের শোভা তারা।
ব্রজের শোভা কৃষ্ণচন্দ্র, নদের শোভা গোরা॥
আহা বেশ বেশ বেশ॥

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র খুব খুশী। বললেন—রায়গুণাকর, এ যে তোমাকেও হার মানালে হে—

উদ্ধব দাস আবার গাইতে শুরু করেছে—

যুবতীর পতি শোভা আর
গৃহের শোভা নারী।
উদ্ধবচন্দ্র দাস বলে যাই বলিহারি—
আহা যাই বলিহারী॥
আহা বেশ বেশ বেশ॥

সঙ্গে সঙ্গে যারা শুনছিল সবাই বলে উঠলো—আহা বেশ বেশ বেশ—তারপর?

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র হঠাৎ ডাকলেন—ও গোপালবাবু, গোপালবাবু—

গোপালবাবু এতক্ষণ একপাশে মুখ চুন করে শুনছিলেন। একটা কথাও বলেননি। কৃষ্ণচন্দ্র বললেন—লোকে তোমাকে ভাঁড় বলে গোপালবাবু, কিন্তু উদ্ধব দাস যে তোমাকে হারিয়ে দিলে দেখছি—

উদ্ধব দাসের তখন উৎসাহ বেড়ে গেছে। বললে—তাহলে আমি একটা ছড়া বলবো রাজামশাই—বলুন তো দেখি কী উত্তর হয়—

সূর্যবংশে জন্ম তার অজ রাজার নাতি।
দশরথ পুত্র বটে নয় সীতাপতি॥
রাবণের অরি নয় লক্ষ্মণের জ্যেষ্ঠ।
ভণে কবি উদ্ধব দাস হেঁয়ালীর শ্রেষ্ঠ!

বলুন তো প্রভু, কী?

মহারাজ গোপালবাবুর দিকে চাইলেন। বললেন—বলো গোপালবাবু, দিতে হবে তোমাকে! নইলে তোমার চাকরি থাকবে না আর—

গোপালবাবু ক্ষীণ একটু হাসলেন। বললেন—আজ্ঞে, ভরত—

উদ্ধব দাস বললে—তাহলে আর একটা বলুন দিকি, কেমন বিদ্যে আপনার দেখি—

পিতৃগৃহে লজ্জাবতী থাকে অতিশয়।
কিন্তু পরগৃহে গেলে সে ভাব না রয়॥
মুখেতে করিলে তারে জুড়ায় পরাণ।
সভাস্থলে সবাকার রাখয়ে সম্মান॥
রমণী কুলেতে তার কর্ম ভাল জানে।
কী নাম তাহার প্রভু বল মম স্থানে॥

—কী গোপালবাবু, চুপ করে রইলে কেন, বলো? উত্তর দাও—

মন্ত্রী কালিপ্রসাদ সিংহ বললেন—আমি বলবো? পান—

—তুমি হেরে গেলে গোপালবাবু,—উত্তর দিতে পারলে না—

গোপালবাবু বললেন—তাহলে আমি একটা বলি—উত্তর দাও তো হে—

অলি অলি পাখীগুলি গলি গলি যায়।
সর্ব অঙ্গ ছেড়ে দিয়ে চোখ খুব্‌লে খায়॥

উদ্ধব দাস বললে—প্রভু, এ তো সহজ প্রশ্ন,—ধোঁয়া—

মহারাজ খুব খুশী। বললেন—তুমি একটা চাকরি নেবে উদ্ধব দাস আমার কাছে?

উদ্ধব দাস গান গেয়ে উঠলো—আমি রবো না ভব-ভবনে—

মহারাজ চাকরকে ডাকলেন—ওরে বৈকুণ্ঠ, এই উদ্ধব দাসকে কিছু খেতে দে—কিছু খেতে ইচ্ছে করছে? ক্ষিদে পেয়েছে? কী খাবে?

উদ্ধব দাস বললে—আজ্ঞে, মুগের ডাল—

কালিপ্রসাদ সিংহ হঠাৎ তাড়াতাড়ি কাছে ঘেঁষে এলেন। কানে কানে বললেন—তিনি এসেছেন—

কার আসার কথা শুনেই যেন মহারাজ উঠলেন। অনেক দিন এ-সব ষড়যন্ত্রের মধ্যে ছিলেন না। এ-সব আগে করা গেছে। ক'মাস থেকেই ভালো লাগছিল না কিছু। দিল্লীর বাদশাদের সঙ্গে আপস করে চলতে চলতেই জীবন কেটে গেল। আবার এখন মুর্শিদাবাদের নবাবকে নিয়ে ওরা ঘোঁট পাকিয়ে তুলছে। যেন অনিচ্ছের সঙ্গে বললেন—চলো—আমি আসছি—

বড় বউরানী ছোটমশাইকে ভালো করে সব বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। কী-কী কথা বলতে হবে তাও গুছিয়ে শিখিয়ে দিয়েছিলেন।

বলেছিলেন—তুমি যেন আবার শুধু হাতে এবার ফিরে এসো না—

ছোটমশাই বলেছিলেন—তুমি যে কী বলো! আমি কিছু বলতে পারি না ভেবেছো?

—না, ও-রকম মিউ-মিউ করে কথা বললে চলবে না।

—আমি মিউ-মিউ করে কথা বলি?

—তা বলো না? বললে আজকে এই দশা হয়? এত বড় আস্পর্ধা নবাবের? নবাব হয়েছে বলে কি একেবারে আমাদের মাথা কিনে নিয়েছে? আমি যদি পুরুষ হতুম তো কবে দূর করে দিতুম না গদি থেকে—

ছোটমশাই বলেছিলেন—এ-সব কাজ কি অত তাড়াহুড়ো করলে চলে? সবাই মিলে পরামর্শ করছি, দেখতে পাচ্ছো তো।

—তা নিজের বউকে তাহলে দিয়ে এসো নবাবের হাতে তুলে।

তখনো জানাজানি হয়নি ব্যাপারটা। ছোটমশাই ভেবেছিলেন একদিন সব চাপা পড়ে যাবে। একবার যদি ফিরিঙ্গীরা মাথা চাড়া দেয় তো তখন হয়তো সব ওলোট-পালোট হয়ে যাবে। সেদিন রাত্রে পরওয়ানাটা পড়েই তাই মাথাটা কেমন ঘুরে গিয়েছিল। তারপর থেকেই কী করবেন, কার কাছে যাবেন বুঝতে পারছিলেন না। একবার চিঠি পাঠান মহিমাপুরে। জগা খাজাঞ্চি বুড়ো মানুষ। তাকে দিয়ে সব কাজ হয় না। আর কার কাছেই বা বিশ্বাস করে সব বলা যায়। সে-চিঠি আসার জন্যে হাঁ করে পথের দিকে চেয়ে বসে থাকেন। জগা খাজাঞ্চি

খালি হাতে ফিরে আসে। শেঠজী খবর দেন—সব বন্দোবস্ত হচ্ছে। কিন্তু কতদিন আর তার জন্যে অপেক্ষা করে থাকা যায়।

বউ বড়রানী বলেন—আমি কিন্তু বলে রাখছি, কিছুতেই ছোটকে পাঠাবো না সেখানে—

—তা আমিই কি সাধ করে পাঠাচ্ছি! আমার কি কোনো কষ্ট হয় না?

—কষ্ট? কষ্টটাই তুমি দেখলে আর মান-সম্মানের কথা তো ভাবলে না একবার! তোমার কষ্টটাই তোমার কাছে বড় হলো? মেয়েমানুষ হয়ে জন্মেছি বলে কি এত অপমান সইতে হবে?

ছোটমশাই বলেছিলেন—তুমি এত চেঁচাচ্ছ কেন, শুনতে পাবে যে—

—বেশ করবো চেঁচাবো। হাতিয়াগড়ের রাজবাড়ির মান-সম্মান বলে একটা জিনিস নেই! আমি ওকে খুন করবো তবু ওকে যেতে দেবো না, দেখি ওই মেহেদী নেসার বেটা কী করতে পারে—

—আসলে তো মেহেদী নেসার একলা নয়!

—একলাই হোক আর দোক্‌লাই হোক, আমি কি ভয় করি নাকি কাউকে—? ভেবেছে গদী পেয়েছে বলে যা ইচ্ছে তাই করবে! ভগবান বলে কেউ নেই নাকি ভেবেছে? পরকাল নেই! পরকালে নরকে গিয়ে জবাবদিহি করতে হবে না এর জন্যে!

বড় বউরানী যখন রেগে যান তখন ছোটমশাই-এরও ভয় হয়। চুপ করে থাকেন!

—আজ ওকে নিচ্ছে, কাল আবার গাঁয়ের আর কাউকে চাইবে! তখন কী করবে? তোমার মুখের দিকে না চেয়ে আছে সব লোক? তাদের হিত তুমি দেখবে না?

ছোটমশাই বললেন—দেখ, বাড়ির মধ্যে অমন অনেক চেঁচানো যায়, দেশের অবস্থা তো জানো না, সবাই ভয়ে ভয়ে কাঁপছে—হিন্দু মুসলমান ফিরিঙ্গীরা পর্যন্ত ভয় করে আছে—

তারপর বড় বউরানী কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই ছোটমশাই বললেন—শুনলুম সেদিন লস্করপুরের তালুকদার কাশিম আলি সাহেব নাকি নিজামত-কাছারিতে মকর্দমার তদ্‌বির করতে গিয়েছিল, মেহেদী নেসার তাকে ধরে তার পালকিতে জুতে দিয়েছে—আবার শুনলাম কাকে নাকি ধরে রাস্তায় কোন্ হিন্দুকে জোর করে গরুর মাংস খাইয়ে দিয়েছে—

বড় বউরানী বললেন—তা তো হবেই, জমিদাররা যত হয়েছে ভেড়ার দল—

ছোটমশাই বললেন—তুমি তো বলেই খালাস, কিন্তু জলে বাস করে কি কুমীরের সঙ্গে ঝগড়া করা যায়? তাহলে তো সেই লড়াই বেধে যাবে—

—তা লড়াই করবে! এমন করে গরু-ভেড়ার মত বেঁচে থাকার চেয়ে লড়াই করে মরে যাওয়াও যে ভালো—

—তুমি মেয়েমানুষ, বাড়ির মধ্যে থাকো, লড়াই-এর কী বুঝবে! লড়াই মানেই তো কতকগুলো নিরীহ মানুষ মারা যাবে মাঝখান থেকে—

বড় বউরানী ক্ষেপে গেলেন—তা কয়েক শো মানুষ মারা যাবে বলে লড়াই না করে অন্যায় সহ্য করবে?

ছোটমশাই আর থাকতে পারলেন না। গলাটা একটু উঁচু করে বললেন—অন্যায় সহ্য করার কথা বার বার বলছো কেন মিছিমিছি? আমি কি আমার

কথা বলছি? আমি তো তোমাদের কথা ভেবেই ভয় পাচ্ছি—

—তা আমরা কি মরতে জানিনে ভেবেছো? না আমরা কখনো মরিনি? আমার ঠাকুমা আমার ঠাকুর্দার চিতেয় উঠে পুড়ে মরেনি? মেয়েরা যা পারে তোমরা তা পারো?

ছোটমশাই বললেন—কেন মিছিমিছি তুমি ও-সব কথা তুলছো! এখন কী করা যায় তাই ভাবো—

—ভেবে আমি ঠিক করে ফেলেছি! আমি ছোটকে খুন করবো তবু নবাবের হাতে তুলে দেবো না!

—সেটা তো একটা কথার মত কথা হলো না। যা করা সম্ভব তাই বলো!

—সব সম্ভব! মেয়েমানুষের কাছে কিছুই অসম্ভব নয়!

—রেগে যেও না, রেগে গেলে কোনো সমাধান হয় না—ভালো করে ভেবে-চিন্তে বলো—

বড় বউরানী বললেন—আমি সব দিক ভেবেই বলছি। যেদিন থেকে ডিহিদারের পরওয়ানা এসেছে, সেই দিন থেকেই ভাবছি, আমি মাধব ঢালীকে বলে রেখেছি, এবার ডিহিদারের লোক এলেই আমি আমার কাজ সেরে ফেলবো। তারপর দরকার হলে না-হয় আমিও আত্মঘাতী হবো। যে-দেশে পুরুষ মানুষ নেই, সে-দেশে মরা ছাড়া আমাদের আর কি গতি আছে বলো?

—সত্যি বলছি বড় বউ, এ-সব কথা আমি সমস্ত বুঝিয়ে বলেছি শেঠজীকে—

—শেঠজী কী করবে? তার কীসের ভাবনা? তার টাকার জোর আছে, নবাব বাদশা থেকে শুরু করে পাইক-পেয়াদা পর্যন্ত তার দলে। আমাদের কথা শেঠজীরা বুঝবে কেন?

ছোটমশাই বললেন—না না, শেঠজী বুঝেছে সব। সমস্ত তোড়জোড় হচ্ছে। ওদিকে ফিরিঙ্গীদের সঙ্গে ফরাসডাঙার ফিরিঙ্গীদের লড়াই হচ্ছিল বলে এতদিন কিছু করতে পারেনি—এবার যে মেমসাহেবদের ধরে নবাবের হারেমে পুরে অপমান করেছে, এবার তাদের গায়েও লেগেছে—

-কিন্তু ততদিন তো এখানকার ডিহিদার বসে থাকবে না। সে তো আবার এলো বলে। তখন তাকে কী বলে ঠেকাবে?

ছোটমশাই বললেন—সেই কথাই তো আমি ভাবছি। তাহলে আমি একবার কেষ্টনগরে যাই, বলি গিয়ে মহারাজকে সব খুলে—

বড় বউরানী বললেন—সে তোমার যা-খুশী করোগে যাও, আমি কিছু বলতে না, তার আগে যদি ডিহিদারের লোক আসে তো একটা রক্তারক্তি কাণ্ড াঁধিয়ে তুলবো, তা তোমায় বলে রাখছি—

ছোটমশাই বললেন—কিন্তু সে তুমি তখন যা-ই করো, এখন যেন তুমি কিছু তে যেও না ওকে বড় বউ। তাহলে কেঁদেকেটে এক্সা করবে ও—লোক ানাজানি হয়ে যাবে—

—বলবো না মানে! নিশ্চয় বলবো, আমি এখুনি গিয়ে বলে আসছি—বলে থেকে বড় বউ তাড়াতাড়ি ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গিয়েছিল—

ছোটমশাই পেছন থেকে ডেকেছিলেন—বড় বউ, শোন, শুনে যাও—ও বড় —বড় বউ—

নিজের মহল ছেড়ে বড় বউরানী বারান্দা পেরিয়ে একেবারে সোজা ছোট রানীর মহলে গিয়ে পড়লেন। ক'দিন থেকেই মাথার ঠিক ছিল না। ভালো

করে পুজোতেও মন বসছিল না তাঁর। এত সাধের সংসার তাঁর। কত সাধ করে ছোটকে এনেছিলেন তিনি। নিজের হাতে ছোটকে তুলে দিলেন স্বামীর হাতে। নিজে পছন্দ করে বিয়ে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন—আমার ছেলে হলো না। আমি এসেই হাতিয়াগড়কে নির্বংশ করে গেলাম। তুই এলে তবু যদি আবার হাতিয়াগড় বেঁচে ওঠে! অনেকদিন আগে বজরা করে মহালে যেতে যেতে চাকদহের ঘাটে প্রথম দেখেন ছোটকে। দূর থেকে বজরার জানালা দিয়ে দেখা। ছোট তখন চান্ করতে নেমেছিল ঘাটে। কত আর বয়েস। বউ হয়ে ঘোমটা দিয়ে সংসার করবার বয়েস তখনো হয়নি ছোটর। কিন্তু চোখ জুড়িয়ে গিয়েছিল দেখে। কাঁচা হলুদের মত রং গায়ের। মাথার চুলগুলো পিঠের ওপর এলিয়ে পড়েছে। বদর মিঞা বজরার হাল ধরে ছিল। বড় বউরানী বদর মিঞাকেই পাঠালেন।

বললেন—দেখে এসো তো বদর, ও মেয়েটি কাদের?

চাকদহর শ্রীনিবাস মুখুটির একমাত্র মেয়ে। মা নেই, ভাই নেই, বোন নেই। সংসারে আপন বলতে আর কেউ নেই।

তা না থাক, সেইখানেই ঘাটে বজরা বাঁধা হলো সেদিনকার মত। শ্রীনিবাস মুখুটি মশাইকে বজরায় ডেকে পাঠানো হলো। শ্রীনিবাস মুখুটি প্রথমে বুঝতে পারেননি। পরে বুঝলেন পাত্র হাতিয়াগড়ের রাজা হিরণ্যনারায়ণ রায়। তিনি কেঁদে ফেললেন আনন্দে। আনন্দও হলো, কষ্টও হলো। কুলীন হয়ে অকুলীনের হাতে নিজের মেয়েকে দেবেন। যেন মেয়ের কথা ভেবেই চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে পড়লো।

সেই এতটুকু মেয়ে রাসমণি। সেই এ-বাড়ির ছোট বউরানী। তাকেই আজ ম্লেচ্ছদের হাতে তুলে দিতে হবে। তাড়াতাড়ি ছোটর মহালে দরজায় গিয়ে ঘা দিতে লাগলেন—ছোট, ও ছোট—ওঠ্—ওঠ্—

ঘরের ভেতরে তখন ছোট বউরানী আর মরালী পাশা খেলতে বসেছে। এমন সময় কারো আসবার কথা নয়। দুর্গা গিয়ে ডেকে এনেছিল মরালীকে।

বড় বউরানীর গলা পেয়েই ভয়ে সকলের গলা কাঠ হয়ে গেছে।

—ওমা, বড় বউরানী যে, কী হবে?

দুর্গা তাড়াতাড়ি মরালীকে পালঙ-এর নিচে ঠেলে ঢুকিয়ে দিয়েছে। ভেতরে যা শিগ্‌গির, বড় বউরানী দেখতে পেলে অনথ বাঁধাবে—যা—

বড় বউরানী ভেতরে ঢুকেই একেবারে রণচন্ডী মূর্তি ধরলে।

—মুখপুড়ী, তুই নিজেরও মুখ পোড়ালি আর রায় বংশেরও মুখ পোড়ালি! কেন তুই মরতে গিয়েছিলি মুর্শিদাবাদে?

ছোট বউরানী এমনিতে হাসি-খুশীর মানুষ। কিন্তু বড়দিকে একটু ভয় করে। বড়দিকে দেখেই কেমন চোখ মুখ শুকিয়ে গেল।

বড় বউরানী তখনো বলে চলেছে—এত যদি তোর রূপের দেমাক তা, পর-পুরুষকে সে-রূপ না-দেখালে তোর চলছিল না? পর-পুরুষই তোর কাছে এত মিষ্টি হলো রে? তুই একবার তোর স্বামীর কথা ভাবলি না, আমার কথা ভাবলি না, এই রায়-বংশের কথাও ভাবলি না মুখপুড়ি?

ছোট বউরানীর চোখ দুটো ছল্ ছল্ করে উঠলো।

—এখন আমার বাপের বাড়ির লোকের কাছে মুখ দেখাবো কেমন করে বল্ তো? আমার হাতিয়াগড়ের প্রজাদের কাছে আমি কী কৈফিয়তটা দেবো? আমি সাধ করে তোকে আঁস্তাকুড় থেকে রাজসিংহাসনে বসালুম, তাতেও তোর মন

বসলো না? তোর এত দেমাক?

ছোট বউরানী কাঁদতে কাঁদতে বলে উঠলো—তুমি আমাকে অমন করে বোক না বড়দি, তুমি আমার মায়ের মতন—আমার মা নেই—তুমিই আমার মা...

—তা মায়ের মুখ খুব রাখলি তো ছোট! মায়ের মুখ একেবারে পুড়িয়ে ছাড়লি তুই—এমন মেয়ে নিয়ে এসেছিলুম সতীন করে যে আমার হাড়মাস পর্যন্ত ছাই করে দিলে—! কেন তুই মরতে গিয়েছিলি, বল্‌ মুখপুড়ি বল্‌—

ছোট বউরানী বললে—তুমি তো জানো বড়দি, আমি যেতে চাইনি—

—তুই যেতে চাসনি তো তোকে হাতে দড়ি বেঁধে ধরে নিয়ে গিয়েছিল ছোট-মশাই? কেন, বাড়ির ভেতর ঘরের জানালা-দরজা বন্ধ করে রুপোর পালঙে শুয়েও তোর পীরিত হয় না? এত গরম তোর? তবু যদি বুঝতুম একটা ছেলে বিয়োতে পারতিস—

ছোট বউরানী দু-হাতে নিজের মুখ ঢেকে তখন কাঁদছে।

—আবার কাঁদছে। ভেবেছে কাঁদলে সুরাহা হবে! ছেনালি কান্না রাখ তো তুই। ও-কান্নায় আমি ভুলছিনে!

ছোট বউরানী হঠাৎ ডুকরে উঠলো—কিন্তু আমার কী দোষ বলো তুমি?

—তোর দোষ নয়? কেন তুই নবাবজাদার বিয়েতে মুর্শিদাবাদে গিছলি? আর যদি গেলিই তো কেন নবাবজাদার ইয়ার-বক্সীদের দিকে চোখ তুলে চাইলি? একলা ছোটমশাইতে তোর মন ভরছিল না—?

ছোট বউরানী আর পারলে না। হঠাৎ বড় বউরানীর পায়ের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠলো। বললে—আর অত বোক না বড়দি, আমাকে তুমি তার চেয়ে খুন করে ফেল, আমি আর সহ্য করতে পারছি না—

—তোকে খুন করতে পারলেই তো আমি শান্তি পেতাম, কিন্তু...তা শেষ পর্যন্ত হয়তো তাই-ই...

এতক্ষণ দুর্গা একপাশে দাঁড়িয়ে ছিল চুপ করে। তার দিকে নজর পড়তেই বড় বউরানী ধমক দিলেন—তুই এখেনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কী শুনছিস; অ্যাঁ? তুই যা এখান থেকে—যা—

দুর্গা ঘরের বাইরে চলে গেল। তারপর বড় বউরানীর হঠাৎ পালঙ-এর তলার দিকে নজর পড়লো। বলে উঠলেন—ওখানে কে রে? কে ওখানে? খাটের তলায়?

ওদিকে শিবনিবাসের একটা ঘরের মধ্যে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তখন সব শুনছেন। শুনতে শুনতে মুখটা কঠোর হয়ে এল তাঁর। তারপরে হাতের চিঠিটা নিয়ে আর একবার পড়তে লাগলেন।

'নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ শ্রীল শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র রায়

বরাবরেষু—

বাঙলার নবাবের অত্যাচারে শিক্ষিত, অশিক্ষিত, বিত্তবান, মূর্খ, পণ্ডিত সকলেই স্ব স্ব ঘর-দ্বার ত্যাগ করিয়া পলাইতে উদ্যত। নবাব কাহারো কোনো কথা শুনেন না। এ-বিষয়ে কী কর্তব্য বুঝিতে না পারিয়া আপনাকে আমরা আহ্বান করিতেছি। আপনি সত্বর আসিয়া সুচিন্তিত মতামত দিয়া সহায়তা করিলে বাঙলা দেশ রক্ষা হয়। ইতি—'

নিচে সই করেছেন মীরজাফর, জগৎশেঠ, রাজা দুর্লভরাম, রাজা রামনারায়ণ, রাজা রাজবল্লভ, রাজা কৃষ্ণদাস, রাজা হিরণ্যনারায়ণ।
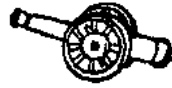
কান্ত কী করবে বুঝতে পারলে না। ষষ্ঠীপদ তাকে যে এমনভাবে ডোবাবে তা সে বুঝতে পারেনি। যতদিন চাকরি করেছে বেভারিজ সাহেবের কাছে, ষষ্ঠীপদ মাথা হেঁট করে সব কাজ করে গেছে। পেটে পেটে তার যে এমন বুদ্ধি তা জানা যায়নি।

সে-রাতটা সেই হাতিয়াগড়েই কাটলো। ওদিকে বিয়েবাড়ির গোলমাল তখন চলছে। রান্নার গন্ধ আসছে নাকে। সচ্চরিত্র নিজেই তিনটে পাতা করে নিয়েছিল। একটা নিজের জন্যে, একটা কান্তর জন্যে, আর একটা নাপিতের জন্যে।

কোথায় যেন একটা ক্ষোভ, একটা লজ্জা, একটা পরাজয়ের কলঙ্ক সারা শরীর আর মনটাকে পিষে থেঁতলে নিঃশেষ করে দিচ্ছিল।

—খেয়ে নাও বাবাজী, খেয়ে নেবে চলো, কলাপাতা পেতে দিয়েছি, বৃহৎ ব্যাপারে কারোর ওপর নির্ভর করলে চলে না, নিজেরাই করে নিতে হয়। এখানে লজ্জা করলে নিজেরাই উপোষ করে মরবো—

সচ্চরিত্র উৎসাহ দিয়ে কান্তকে চাঙ্গা করতে চেয়েছিল খুব। তারও অন্যায় নেই কিছু। সে এ-রকম অনেক বিয়ে দেখেছে, অনেক বিয়ে ভাঙতেও দেখেছে। নাপিতও এ-সব দেখে ঠেকে শিখেছে। বিয়েবাড়িতে খেতে সঙ্কোচ করলে শেষকালে ঠকতে হয়।

—আপনারা খেতে বসুন, আমি খাবোখন, আমার ক্ষিদে নেই—

বিয়ে উপলক্ষে সারাদিনই উপোষ করে ছিল। তবু ক্ষিদের কথা যেন মনেই পড়লো না। সঙ্গে ছোট একটা পোঁটলা ছিল। একটা বাড়তি ধুতি, আর একটা চাদর। সেই পোঁটলাটা নিয়েই সে সেদিন আবার নৌকোর আশায় নদীর ঘাটে এসে দাঁড়ালো। কোথায় এতক্ষণ একটা বাড়ির অন্দর-মহলে তাকে ঘিরে আনন্দের কলগুঞ্জন মুখর হয়ে উঠবে, তা নয়, সেই মাঝরাত্রের নির্জন পাথর-বাঁধানো ঘাটের ওপরেই বুঝি একটুখানি তন্দ্রা এসেছিল। তারপর শেষরাত্রের দিকে ঘুম ভেঙে যেতেই দেখলে, নদীতে একটা নৌকো চলেছে। গহনার নৌকো। তারপর সেই তাদেরই বলে-কয়ে সোজা কলকাতা। কিন্তু সেখানে যখন গিয়ে পোঁছুলো তখন রীতিমতো দেরি হয়ে গেছে। যার নাম বিকেল।

ষষ্ঠীপদ দেখতে পেয়ে হাঁ হাঁ করে উঠলো—হাঁ হাঁ, আপনি ঢুকবেন না কান্তবাবু, সাহেব মানা করে গেছে—

—মানা করে গেছে মানে!

ষষ্ঠীপদ বললে—আপনি কাল যাবার পরেই যে সাহেব রাত্তিরে এসেছিল। সাহেব একলা নয়, সাহেবের সঙ্গে কেল্লা থেকে পল্টনরাও এসেছিল।

—কেন?

—আপনাকে ধরতে।

—ধরতে মানে? আমি কী করেছি?

ষষ্ঠীপদ বললে—তা তো জানিনে। উমিচাঁদ সাহেবের লোক সাহেবকে বলেছে

যে, আপনার কাছে নাকি মুর্শিদাবাদের চর বশীর মিঞা আসে। আপনার কাছ থেকে সব খবর নিয়ে সে মুর্শিদাবাদে পাচার করে।...

কান্ত কেমন অবাক হয়ে গেল। বশীর মিঞা যে চর এ-কথা কে বললে! ভালো করে ভেবে দেখলো, কবে তাকে কী-কথা সে বলেছে। কী-কী জানতে চেয়েছে সে। অনেক সময় ষষ্ঠীপদর সামনেও অনেক কথা হয়েছে তার সঙ্গে। বশীর মিঞা যে এখানে আসে এ-কথা ষষ্ঠীপদ ছাড়া আর কে-ই বা জানে।

—তাহলে আমি কি দেখা করবো গিয়ে সাহেবের সঙ্গে?

—না, তা করবেন না কান্তবাবু। শেষকালে আপনাকে হয়তো কেল্লার ফাটকে পুরে ফেলবে সাহেব। সাহেব বড় রেগে গেছে কিনা। সাহেব আমাকে বলে রেখেছে আপনি এলেই যেন তাকে খবর দিই। তা আমি তেমন নেমকহারাম নই কান্তবাবু। অন্য লোক হলে এত কথা বলতো না, সাহেবকে গিয়ে চুপি চুপি খবরটা দিয়ে আসতো—

—তাহলে আমি এখন কী করি বলো তো ষষ্ঠীপদ?

—আমি আপনার ছোটভাই-এর মত কান্তবাবু, আমি বলছি আপনি এখান থেকে পালিয়ে যান। আপনার ভাবনা কি কান্তবাবু! এ ছোটলোকদের চাকরি কে সাধ করে করে? আমার যদি জানাশোনা থাকতো তো আমি কবে নিজামত-কাছারিতে গিয়ে চাকরি নিতুম! আপনাকে কত খোসামোদ করছে ওরা আর আপনি কিনা হেলায় হারাচ্ছেন! আপনি না নিন, আমাকে একটা চাকরি করে দিন ওখানে—

কান্ত অনেক ভাবলো। কাল থেকে খাওয়া নেই। কাল থেকে ঘুম নেই। মাথা ঝিম ঝিম করতে লাগলো। সত্যিই তো। ষষ্ঠীপদ তো ঠিক কথাই বলেছে। নবাব মারা গেছে! তার পরেই ফিরিঙ্গী সাহেবদের মধ্যে তোড়জোড় শুরু হয়ে গেছে। লড়াই-ই বেধে যাবে হয়তো। তখন কোথায় থাকবে ফিরিঙ্গী-কোম্পানী আর কোথায়ই বা থাকবে তার চাকরি!

—তাহলে আমি আসি ষষ্ঠীপদ।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনি আর দাঁড়াবেন না, আপনি চলে যান। আপনি থাকলে আমার একটু সুবিধে হতো, কিন্তু আমার সুবিধের চেয়ে আপনার সুবিধেটাই বড় বলে মনে করি—আমার নিজের কষ্ট হোক, কিন্তু আপনার ভালো হোক, এই আমি চাই কান্তবাবু—

কান্ত আর দাঁড়ালো না। আর কোনো কথা না বলে সোজা আবার পথে পা বাড়ালো পুঁটলিটা হাতে নিয়ে। মিছিমিছি অনেকগুলো টাকা খরচ হয়ে গেল। বিয়ের গায়ে-হলুদের কিছু জিনিসপত্র কিনতে হয়েছিল। নাপিতকেও রাহা-খরচ দিতে হয়েছিল। বড় চাতরার বাড়িটা পরিষ্কার করবার জন্যেও নায়েব-বাবুদের গোমস্তাকে কিছু টাকা পাঠাতে হয়েছিল। একদিন বহু আগে সব ছেড়ে এখানে এই কলকাতায় এসে আশ্রয় পেয়েছিল, আজকে আবার এখান থেকেও চলে যেতে হলো। সবাই যখন নিজের নিজের দেশ ছেড়ে কলকাতায় এসে নতুন করে বসবাস পত্তন করতে শুরু করছে, তখন কান্তকেই একলা এ-জায়গা ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে। তবু তো মুর্শিদাবাদ রাজধানী! এই জলা-জঙ্গল ভরা কলকাতার থেকে তো সেই মুর্শিদাবাদ ভালো। মুর্শিদাবাদ হলো শহর, আর এ তো গ্রাম। গণ্ডগ্রাম! ভাগ্যে থাকলে হয়তো সেই রাজধানীতে গিয়েই তার ভাগ্য উদয় হবে। কোথায় কবে কেমন করে কার ভাগ্য উদয় হয় কেউ কি বলতে পারে!

আশ্চর্য, কান্ত যদি জানতো একদিন তার এই রাজধানীতে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাংলার ইতিহাস এমন করে বদলে যাবে! যদি জানতো একদিন তার ভাগ্যের সঙ্গে বাংলাদেশের ভাগ্য জড়িয়ে একাকার হয়ে যাবে। যদি জানতো শুধু বাংলাদেশ নয়, সমস্ত ভারতবর্ষের ভাগ্যলক্ষ্মীকে এমন করে পরের হাতে তুলে দেবে!

কান্ত গদি ছেড়ে চলে যাবার পরই বেভারিজ সাহেব এসে হাজির হলো। সহজে বেভারিজ সাহেব কাউকে কিছু বলে না। কারবার করতে এসেছে কালাপানি পেরিয়ে। প্রথমে রাইটার হয়ে এসেছিল। তখন বছর-কুড়ি বয়েস সাহেবের। নিজের দেশে কিছু হলো না। বাপ-মা ছেলের জন্যে ভেবে-ভেবে অস্থির। চাকরি-বাকরি পায় না। এদিকে বেয়াড়া হয়ে যাচ্ছে ছেলের স্বভাব। মেয়েদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে বেড়ায় দিনরাত। শেষকালে একদিন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর জাহাজে উঠে ইন্ডিয়ায় এসে হাজির হলো। যে বেভারিজ সাহেব নিজের দেশে খেতে পেত না ভালো করে, এই সস্তা-গণ্ডার দেশে এসে তার হাতে টাকা এল, মেয়েমানুষ এল। চাকর-বাকর-ঝি-বেহারা নিয়ে একেবারে নবাব-পুত্তুর হয়ে বসলো। গড়গড়ায় তামাক খেতে লাগলো। বারুইপুরের পান খেতে লাগলো। চুলে তেল মাখতে লাগলো। তখন ঘুমোবার সময় দুজন চাকর পায়ে সুড়সুড়ি দিলে তবে বেভারিজ সাহেবের ঘুম আসে। সে ঘুম ভাঙে পরদিন বেলা বারোটায়। একজন তামাক সাজে, একজন জামা পরিয়ে দেয়, একজন আবার জুতো পরিয়ে দেয়। কুড়িটা চাকর না হলে বেভারিজ সাহেবের অসহায় মনে হয় নিজেকে। তারপর খেয়েদেয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমিয়ে বিকেলবেলা পালকি নিয়ে বেরোয়। বেরিয়ে একেবার পেরিন সাহেবের কেল্লায় যায়, তারপর আসে সোরার গদীতে। সাহেব এলেই কান্ত হিসেবপত্র নিয়ে সাহেবের সামনে ধরে। সাহেব একবার দেখে। তারপর যথাস্থানে সই-সাবুদ করে পকেটে টাকা-কড়ি পুরে নিয়ে আবার পালকি করে চলে যায়।

কিন্তু সেদিন ষষ্ঠীপদকে দেখে সাহেব অবাক হয়ে গেল। কান্তবাবু কোথায়? হোয়ের ইজ্ কাণ্টোবাবু?

ষষ্ঠীপদ বললে—আজ্ঞে হুজুর, কান্তবাবু আসবে না—

—হোয়াই? কেন?

—হুজুর, কান্তবাবু তো চাকরি করতে আসেনি এখানে, অন্য কাজে এসেছিল।

—কী কাজ?

—আজ্ঞে হুজুর, এতদিন আপনাকে আমি বলিনি, কান্তবাবু নবাবের স্পাই হুজুর!

—হোয়াট!

বেভারিজ সাহেব যেন ভয় পেয়ে লাফিয়ে উঠেছে কেদারা থেকে। সামনে কেউটে সাপ দেখলেও কেউ এমন করে চমকে ওঠে না। নবাবের স্পাই এতদিন তাঁর গদীতে কাজ করছে আর সাহেব কি না কিছুই জানতো না।

—এতদিন আমাকে বলোনি কেন কিছু?

—হুজুর, আমার কসুর হয়ে গেছে। আমি রোজ দেখতাম কান্তবাবুর কাছে নবাবের লোক আসতো, এসে গুজ-গুজ ফিস-ফিস করতো!

সাহেব বুঝতে পারলে না। জিজ্ঞেস করলে—গুজ-গুজ ফিস-ফিস কী?

—আজ্ঞে, এখানকার কেল্লার সব খবর নিত!

—কে সে? লোকটার নাম কী?

—আজ্ঞে বশীর মিঞা! আসলে কান্তবাবু আপনার কাছ থেকেও মাইনে নিত, আবার নবাব-নিজামতের কাছারি থেকেও মাইনে নিত। দুমুখো সাপ হুজুর। তা ছাড়া আপনার গদির টাকাই কি কম মেরেছে নাকি? আপনি তো কিছু দেখেন না হুজুর, হাজার-হাজার টাকা মেরে নিয়েছে তবিল থেকে—

স্ট্রেঞ্জ! বেভারিজ সাহেবের যেন চোখ খুলে গেল এতদিনে। হল্‌ওয়েল সেদিন বলেছিল বটে যে বাঙালীদের বিশ্বাস করতে নেই!

বলে হিসেবের খাতাটা বার করে খুলে ধরে দেখালে ষষ্ঠীপদ। এই দেখুন, এইখানে একান্ন টাকার খেলাপ লেখা আছে, আর এখানে জমার বেলায় শূন্য। আর এই দেখুন দু'শো তিরাশি টাকা জমা লেখা আছে, আর আয়ের ঘরে জমা করা হয়নি।

বেভারিজ সাহেব দেখলে নজর দিয়ে।

বললে—আগে এ-সব আমাকে বলোনি কেন?

—আজ্ঞে আমি কী করে বলি? মুন্সী হলো কান্তবাবু, আমি তো গোমস্তা মাত্তোর, আমি খাস মুন্সীর বিরুদ্ধে বলবো?

ঠিক আছে। বেভারিজ সাহেব বললে—ঠিক আছে, কান্তবাবুকে আমি ডিস-চার্জ করে দিলাম। তুমিই মুন্সীর কাজ করবে এবার থেকে। মুন্সীর কাজ করতে পারবে তুমি?

ষষ্ঠীপদ হাসলে। সাহেব বুঝলো সে হাসির মানে। জিজ্ঞেস করলে—মুন্সীর কে আছে কলকাতায়?

—আজ্ঞে কান্তবাবু তো বেওয়ারিশ লোক, কে আর থাকবে? সাত কুলেও কেউ নেই—নো-ওয়ান ইন সেভেন কুল—

সাহেব জিজ্ঞেস করলে—কুল? হোয়াট ইজ কুল?

—হুজুর, কুল মানে খাবার কুল নয়—কুল মানে ইয়ে...মানে...

আর বোঝাতে পারলে না ষষ্ঠীপদ। শেষকালে হাত মুখ নেড়ে বললে—সাত কুল মানে সাতপুরুষ, মানে স্যার সেভেনম্যান—

সাহেব বোধহয় কিছুটা বুঝতে পারলে। সেভেন-জেনারেশন। আর বুঝতে চাইলে না বিশদ করে। ষষ্ঠীপদ তবু বোঝাতে লাগলো। মুর্শিদাবাদে পালিয়ে যাবে বলেই কলকাতায় একটা আস্তানা করেনি কান্তবাবু। আপনার এখান থেকে যত টাকা লুঠ করেছে সেই সমস্ত দিয়ে রাজধানীতে দালান-কোঠা বানিয়েছে, বিবি রেখেছে। আসলে খুলে বলি আপনাকে, কান্তবাবু হিন্দু নয় হুজুর। মুসলমান!

—হিন্দু নয়? সাহেব যেন আবার অবাক হয়ে গেল।

—না হুজুর। হিন্দু হলে কি আর অত নেমকহারাম হয় হুজুর? দেখছেন না হুজুর, আমি হিন্দু বলে কত অনেস্ট। আমাদের গড হলো শিব। আমাদের শিবের গাজন হয়, আপনি দেখেছেন তো—চড়কের সময় পিঠে বান ফুঁড়ে কত কষ্ট করতে হয় বলুন তো—

—আর তুমি? তুমি শিব পুজো করো?

—কী বলছেন হুজুর? করবো না? আমি যে ব্রাহ্মণ হুজুর। এই দেখুন—আমার পৈতে দেখুন—

বলে ষষ্ঠীপদ নিজের পৈতেটা বুড়ো আঙুলে আটকে সাহেবের চোখের সামনে ধরলে।

—আমি রোজ গঙ্গা-মাটি দিয়ে এই পৈতে পরিষ্কার করি হুজুর। আপনি এবার থেকে যত চাকর রাখবেন সব এই পৈতে দেখে রাখবেন, আপনার কোনো জিনিস চুরি হবে না। জাতের মধ্যে সবচেয়ে বড় জাত হচ্ছেন হুজুর আপনারা, তারপরেই আমরা, এই ব্রাহ্মণরা। এটি আপনি জেনে রাখবেন হুজুর—

—ঠিক আছে, আজ থেকেই তুমি তাহলে মুন্সীর কাজ করো—

সাহেবের বোধহয় খুব তাড়া ছিল। তাড়াতাড়ি হিসেবের খাতায় সই করে, টাকা-কড়ি পকেটে পুরে উঠছিল। পেছন থেকে ষষ্ঠীপদ এগিয়ে গিয়ে বললে—হুজুর, তাহলে গোমস্তার কাজ কে করবে? আমি তো মুন্সী—

সাহেব বললে—আর একজন খুঁজতে হবে—

—তার চেয়ে হুজুর, একটা কাজ করি, আমার এক ব্রাদার-ইন-ল আছে, সে একেবারে পিওর ব্রাহ্মণ, যাকে বলে হুজুর একেবারে খাঁটি ব্রাহ্মণ, তার পৈতে আমার চেয়েও সাদা, একেবারে সাদা ধপধপ করছে, তাকে রাখবেন? তারও গড শিব—

—অল-রাইট, তাকেই রাখো, কিন্তু ব্রাহ্মণ যেন হয়—

বলে সাহেব তাড়াতাড়ি আবার পালকিতে গিয়ে উঠলো। নইলে ওদিকেও দেরি হয়ে যাবে। সাহেবের সন্ধ্যেবেলা ড্যান্স চাই, ওয়াইন চাই, ওম্যান চাই। এ-সব নিয়ে বেশি সময় নষ্ট করবার সময় থাকে না বেভারিজ সাহেবের।

সাহেব চলে যেতেই ভৈরব গুটি-গুটি ভেতরে ঢুকলো। ষষ্ঠীপদ দেখেই বললে—ঠিক গন্ধ পেয়েছিস তো! তোর চাকরি হয়ে গেল, কাল থেকে এখেনে গোমস্তার কাজ করবি—

—তা মাইনে? মাইনে কত পাবো কত্তা?

—কেন, তোর সঙ্গে তো কথা হয়ে আছে। দু'টাকা মাইনে, তার থেকে এক টাকা আমার। কিন্তু কথার খেলাফি যদি করো বাপু এখন, তাহলে কিন্তু তোমার চাকরি হবে না, তা বলে রাখছি। আর ওই যা বলেছিলুম—যা হাত-সাফাই করবো, তার দশ-ভাগের একভাগ তোমার, বাকিটা সব আমার—রাজি তো? আমি কান্ত-বাবুকেও ওই কথাই বলেছিলুম, তা কান্তবাবু তো রাজি হয়নি, তাই এখন সরে যেতে হলো। আমার সঙ্গে চালাকি করে পারবিনে, তা বলে রাখছি—

তারপর একটু থেমে বললে—আর একটা কথা, তোকে বাপু গলায় একটা পৈতে দিতে হবে—

ভৈরব জিভ কেটেছে।—সে কী হুজুর? আমি যে নমঃশূদ্র—

—নমঃশূদ্র তো কী হয়েছে? আমিও তো [illegible]চ, আমি কী করে পৈতে পরি? এ কি আমার দেশ না তোর দেশ? এখেনে বেটা ম্লেচ্ছদের হাতে মাইনে নিলে জাত যায় না, আর পৈতে নিলেই একেবারে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে? টাকা বড় না জাত বড়? বল্-বল্ তাই আমাকে—

—আজ্ঞে টাকা!

—তবে? তবে যে পৈতে পরতে ভয় পাচ্ছিস? যখন এক কাঁড়ি টাকা নিয়ে দেশে-গাঁয়ে যাবি তখন পৈতেটা ছুঁড়ে ফেলে দিলে কে দেখতে যাচ্ছে? চিরকাল তো আর ফিরিঙ্গী-কোম্পানী থাকবে না, দু'দিনের জন্যে এসেছে, কারবার করছে, আবার একদিন ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাবে। কিন্তু টাকাটা তো আর ফিরিয়ে

নিতে পারবে না। আমাদের টাকা আমাদেরই থেকে যাবে। তখন টাকা দিয়ে তিনটে বামুন খাইয়ে কালীঘাটে পুজো দিলেই প্রাশ্চিত্তির হয়ে যাবে—

কথাটা ভৈরবের তখনো ভালো করে উপলব্ধি হয়নি।

ষষ্ঠীপদ বললে—তিনগাছা ফরসা সুতো নিয়ে গলায় দিয়ে আয়, আজ থেকেই তোর চাকরি হয়ে গেল ধরে নে—আর সাহেব এসে যদি তোর নাম জিজ্ঞেস করে, যেন বলিসনি তোর নাম ভৈরব দাস, বলবি ভৈরব চক্কোত্তি, বুঝলি?

ভৈরব বুঝলো কি বুঝলো না, কে জানে!

অত তখন ভাববার সময় নেই ষষ্ঠীপদর। ভৈরব ঘাড় নেড়ে পৈতে জোগাড় করতে চলে গেল।

বশীর মিঞার ফুপা মনসুর আলি মেহের মোহরারের সঙ্গে কান্তর সেই প্রথম দেখা। বশীর মিঞাই নিজে নিয়ে গেল তার কাছে। এলাহি কান্ড চারদিকে। এর আগে কখনো নিজামত-কাছারি দেখেনি কান্ত। মনটাও খারাপ হয়ে গিয়েছিল তার। এত সৎভাবে চাকরি করেও চাকরি রইলো না তার। সাহেব তাকে ভুল ভাবলে। সাহেব কিনা ভাবলে তার মুন্সী নবাবের নিজামতের চর। স্পাই! কলকাতা থেকে হাতিয়াগড়, হাতিয়াগড় থেকে কলকাতা। আবার কলকাতা থেকে মুর্শিদাবাদ। হাতে একটা বাড়তি টাকাও নেই।

বশীর মিঞা বললে—ফুপা, এই হলো আমার দোস্ত—এর কাছ থেকেই ফিরিঙ্গীদের সব খবর পেতাম—খুব সাচ্চা আদমি, একেই হাতিয়াগড়ে পাঠাচ্ছি—

মনসুর আলি মেহের সাহেব একবার কান্তর আপাদমস্তক দেখে নিলে। সারা বাঙলা-মুলুক চালাতে হয় মনসুর আলিকে। একদিকে মেহেদী নেসার সাহেব, আর একদিকে মীরজাফর আলি, জগৎশেঠ। দু'বজরায় পা দিয়ে চলতে হচ্ছে। বড় ঝকমারির নতিজা হয়েছে কাছারির কাজ।

—কাফের তো?

—হ্যাঁ হ্যাঁ ফুপা, কাফের। হিন্দু কাফের। বেইমানি করবে না।

মনসুর আলি সাহেব কান্তর দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলে—পারবে তো কাজ?

কী কাজ তা-ই জানে না কান্ত, তার আবার পারা-পারির কী আছে! আর সাহেবের গদির মুন্সীগিরি করে এসেছে এতদিন, কোন্ কাজটা না-পারার আছে—

—তুই বলেছিস তো ওকে, কাজটা কী?

বশীর মিঞা বললে—সে আমি সব সমঝিয়ে দেবো, কিন্তু ওকে আমি বলেছি ছ'টাকা তলব দিতে হবে। ইমানদার আদমি যখন, ছ'টাকা তলব দিলে কী আর নুকসান!

এর বেশি আর কথা হলো না মনসুর আলির সামনে। তারপর কাছারির বাইরে বেরিয়ে এসে বশীর মিঞা সব বুঝিয়ে বললে। সব শুনে কান্তর হাত-পা বুকের মধ্যে সেঁধিয়ে এল! আবার সেই হাতিয়াগড়ে যেতে হবে!

—কিন্তু রাণীবিবিকে এখানে কেন আনবে?

—তা জেনে তোর ফয়দা কী? তোকে যা হুকুম করছি তাই-ই কর। কী কাম, কেন করতে হবে, এসব কখনো পুছিস না। জাসুসী কাম এই রকম। আর তোর

তো কিছু ঝক্কি নেই। তুই শুধু সঙ্গে সঙ্গে থাকবি। তোর সঙ্গে টাকা থাকবে, পাঞ্জা থাকবে, ফৌজী সেপাই থাকবে, বাকি কাজ সব ডিহিদারের আদমি আছে, তারা করে রাখবে। তুই গেলেই হাতিয়াগড়ের বাপের বাপও গররাজি হবার সাহস করবে না।

—কিন্তু তুই যাচ্ছিস না কেন?

বশীর মিঞা বললে—আরে মেহেদী নেসার সাহেব যে আমাকে দিয়ে ভরসা করতে পারবে না। আমি যদি মেরে দি? আমি যদি নবাবের মাল লুঠে-পুটে খাই?

—তার মানে?

বশীর মিঞা চটে গেল। বললে—তুই ও-সব বুঝবি না এখন। আরো দিন-কতক কাম কর নিজামতে তখন হাল-চাল বুঝে ফেলবি। আমরা শালারা আমাদের নিজের জাতের ওপরেই ভরসা করি না—হিন্দুদেরও ভরসা করি না, মোসলমানদেরও ভরসা করি না—

—কিন্তু তোদের দলে তাহলে কে আছে?

—মেহেদী নেসার আছে, আর আরো অনেকে আছে—

বলে আর কিছু বলতে চায়নি বশীর মিঞা। কান্তও জিজ্ঞেস করেনি। টাকা নিয়ে পাঞ্জা নিয়ে সোজা হাতিয়াগড়ে এসে পৌঁছেছিল। গরমে টা-টা করছে মাটি। আসবার সময় হাঁটা রাস্তা। রাণীবিবিকে নিয়ে ফেরবার সময় তখন আর হাঁটা পথে ফিরতে হবে না। তখন ডিহিদার বজরা দেবে, পালকি দেবে। কাশিমবাজার থেকে সোজা পশ্চিম দিকে গেলে বক্রেশ্বর, তারপর বক্রেশ্বর থেকে সোজা বর্ধমান। সেখান থেকে হাতিয়াগড় দেড়দিনের পথ।

যখন হাতিয়াগড় পৌঁছুল কান্ত, তখন বেশ বেলা। ডিহিদারের দফ্‌তরে যাবার রাস্তাটা জেনে নিয়েছিল রাস্তার লোকজনদের কাছে। এই ক'দিন আগেই এখানে এসেছিল বিয়ে করতে। আবার এখানেই তাকে আসতে হবে কে জানতো। যার সঙ্গে বিয়ে হয়েছে, তার সঙ্গেই হয়তো শ্বশুর বাড়িতে চলে গেছে সে-বউ। হয়তো এতদিন বৌভাতও হয়ে গেছে। তারপর হয়তো ধুলো পায়ে লগ্ন সারতে মাথায় সিঁদুর পরে ঘোমটা দিয়ে আবার হাতিয়াগড়েই ফিরে এসেছে, কে জানে!

—হ্যাঁ গো, এখানে ডিহিদারের দপ্তর কোন্ পাড়ায় গো?

—আপনি কে?

কেমন যেন সন্দেহভরা দৃষ্টি দিয়ে লোকটা তার দিকে চেয়ে দেখলে। তার আসল উদ্দেশ্যটা লোকে জেনে গেছে নাকি! লোকটারও তাড়া ছিল। সেও আর দাঁড়ালো না। তখনো বেশ বেলা রয়েছে। সোজা চলতে চলতে নদীর ঘাটে এসে দাঁড়ালো। এইখানেই নেমেছিল সেদিন নৌকো থেকে। এইখানেই সেই সেদিনের ঘটকটা দাঁড়িয়েছিল। পুরোন সব কথাগুলো মনে পড়তে লাগলো। সেদিন আর এদিনে কত তফাত। দূরেই মন্দিরটা দেখা যাচ্ছে। বশীর মিঞা বলে দিয়েছিল—বুড়ো শিবের মন্দির ওটা। ওরই পেছনে হাতিয়াগড়ের রাজবাড়ি। কোথাকার কোন্ রাজার বউকে কোন এক নবাবের কাছে পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে। চাকরির এও এক বিড়ম্বনা।

হঠাৎ দূরে যেন একটা ভিড় দেখা গেল।

ওইটেই তো তার সেই শ্বশুর-বাড়ি। ওই বাড়িটার সামনেই তো সে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। কত লোক উঠোনে খেতে বসেছিল। আজ আবার সেই বাড়িটার সামনেই ভিড়ে ভিড়। আজ আবার ওখানে কী হলো।

তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে এগিয়ে গেল কান্ত।

ভিড়ের ঠেলায় ভেতরে কিছু দেখা যায় না। হঠাৎ নজরে পড়লো তার সেই শ্বশুর। শোভারাম বিশ্বাস। চোখ দুটো ছল্-ছল্ করছে। কাঁদো-কাঁদো মুখ। কী হলো আবার এ-বাড়িতে! এখন মেয়ের বিয়ে হয়ে গিয়েছে, এখন তো মুখে হাসি বেরোবার কথা!

—হ্যাঁ গো, এ-বাড়িতে কী হয়েছে?

চাষা-ভুষো লোক একজন। কেন, আপনি জানেন না? আপনি কোন্ গাঁয়ের লোক? হাতিয়াগড়ের সব লোক জেনে গেছে যে! কোন্ সরকার থেকে আসছেন আপনি? সাত-গাঁ, না বাজুহা?

—আমি পরদেশী, কিছু বিপদ-আপদ হয়েছে বুঝি?

লোকটা বললে—ওই যে দেখছেন বুড়োপানা লোক, ওর মেয়ে পালিয়ে গিয়েছে, বিয়ের রাত্তিরে। বাসর ঘর থেকে 'কনে' পালিয়ে গেছে!

মাথায় যেন বজ্রাঘাত হলো কান্তর! কোথায় পালিয়ে গেছে?

—ভগমান জানে! তাই তো দুগ্যা হাত চালাচ্ছে—দেখছেন না?

—দুগ্যা কে?

—রাজবাড়ির ঝি দুগ্যা যে গুণ করতে জানে, নয়ানপিসি মাটিতে হাত পেতে আছে, ওই হাত চলতে আরম্ভ করবে—

সত্যিই দুর্গা তখন বিড় বিড় করে মন্ত্র পড়ছে। পুবপাড়া, দক্ষিণপাড়া, তাঁতি-পাড়া, কৈবর্তপাড়া, মুসলমান পাড়া—সব পাড়ার লোক হাত-চালা দেখতে এসেছে। উঠোন দাওয়া-ঘর ভরে গেছে। দুর্গা একটা নতুন থান শাড়ি পরেছে। পুজো তখন সবে বুঝি আরম্ভ হচ্ছে। চালে হলুদে মেখে সাজালে পুজোর জায়গাটা। তারপর জিজ্ঞেস করলে—কুলকাঠ কই, কুলকাঠ?

শোভারাম কুলকাঠ একগাছা এগিয়ে দিলে সামনের দিকে। সেই কুলকাঠে আগুন জ্বালানো হলো। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো শুকনো কুলকাঠ।

তারপর দুর্গা সেই কুলকাঠের আগুনের ওপর একটু একটু করে চাল ছড়ায় আর মন্তর পড়ে—

আচাল চালম্ ওচাল্ চালম্, চালম্ গোরক্ষনাথ।
পাতালের বাসুকী চালম্, চালম্ পিসির হাত।

নয়ান পিসি এতক্ষণ মাটির ওপর নিজের হাতের পাতাটা উপুড় করে রেখে-ছিল। দুর্গা গুণে গুণে একশো আটবার তার হাতের ওপর আরো কী সব মন্ত্র পড়তে লাগলো। শেষে অবাক কাণ্ড! পিসির হাতখানা আস্তে আস্তে চলতে শুরু করলো। উঠোন পেরিয়ে দাওয়ায় গিয়ে উঠলো হাত। মানুষের ভিড়ও আস্তে আস্তে এগোতে লাগলো। কান্তও এগোল। সামনের ভিড় সরে গেল। ভিড়ের ফাঁক দিয়ে নয়ান পিসিও চলতে লাগলো হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে। আর পেছন-পেছন দুর্গাও চলতে লাগলো সঙ্গে সঙ্গে।

শোভারাম কেমন যেন তখনো বিমর্ষ হয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল। পাশের এক-জনকে জিজ্ঞেস করলে—ও হরিপদ, মাকে আমার পাওয়া যাবে তো?

হরিপদ বললে—তুমি চুপ করো তো, দুগ্যা তোমার মেয়েকে নিয্যাত বার করে দেবে—তুমি চুপ করে দেখ না—

নয়ান পিসির হাত গিয়ে দাওয়া ছাড়িয়ে ঘরের ভেতরে গিয়ে ঢুকলো। ওই ঘরেই মরালীর বাসর-ঘর হয়েছিল বুঝি। তখনো বাসর-ঘরের বালিশ-বিছানা

তেমনি পড়ে আছে। কেউ হাত দেয়নি।

শোভারামের বুকটা বুঝি ঢিপ-ঢিপ করে উঠলো।

কান্ত পাশের লোকটাকে আবার জিজ্ঞেস করলে—যার সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল, সে কোথায় গো? সে এখেনে আছে?

লোকটার এ-কথার উত্তর দেবার সময় নেই তখন। সবাই তখন মজা দেখছে একমনে। কান্তও সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলো। জানালার আড়াল থেকে অনেক মেয়েমানুষ হাত-চালা দেখতে এসেছে। এখানে না এলে তো এ খবর জানতেও পারতো না কান্ত! তবে কি বর পছন্দ হয়নি! তবে কি আত্মঘাতী হলো মনের দুঃখে!

কান্ত দেখলে, নয়ান পিসি বলে সেই বিধবা মেয়েমানুষটা হাত চালিয়ে যেতে যেতে একেবারে খিড়কীর দিকের দরজার কাছে এসে আটকে গেছে।

দুর্গা চিৎকার করে উঠলো—ইদ্‌ পিদ্‌ কুড়ি স্বাহা—

আর নয়ান পিসি সঙ্গে সঙ্গে সেইখানেই দড়াম করে অজ্ঞান হয়ে পড়লো। দাঁতকপাটি লেগে গেল তার।

দুর্গা এবার শোভারামের দিকে চেয়ে বললে—মাথায় জল ঢালো নয়ান পিসির—

কে একজন ঘড়া এনে জল ঢালতে লাগলো নয়ান পিসির মাথায়।

শোভারাম ভয় পেয়ে গেল। জিজ্ঞেস করলে—কী হলো দুগ্যা? পেলে না?

দুর্গা বললে—মেয়েকে তোমার পাওয়া যাবে না শোভারাম—

শোভারামের যেন তখন মাথায় বজ্রাঘাত হলো। পাওয়া যাবে না?

ততক্ষণে দুর্গা সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বললে—না—

—কোথায় গেল?

দুর্গা বললে—দেব-নর-গন্ধর্ব কারো সাধ্যি নেই জানতে পারে!

তবু শোভারামের সন্দেহ গেল না। জিজ্ঞেস করলে—কেন?

দুর্গা বললে—তোমার মেয়ে পুষ্যানক্ষত্রে শ্বেতজয়ন্তীর শেকড় খেয়েছে—তার সন্ধান আর কেউ পাবে না—

কথাটা শুনে শোভারাম হাউ-হাউ করে কেঁদে ফেললে। আশেপাশের লোকজনও এতক্ষণ শুনছিল। তাদেরও মন বুঝি ভারি হয়ে এল। শ্বেতজয়ন্তীর শেকড় তাকে বাসর-ঘরে কে এনে দিতে গেল কে জানে। আর তখন যে পুষ্যানক্ষত্র ছিল তাই বা কার জানার কথা!

শোভারাম কেঁদে পড়লো। বললে—তুমি যেমন করে পারো আমার মেয়েকে বার করে দাও দুগ্যা—

দুর্গা বললে—আমি তো আমি, আমার চোদ্দপুরুষের সাধ্যি নেই তাকে খুঁজে বার করে—ছোটমশাই আজ রাত্তিরে বাড়ি নেই, আমার অনেক কাজ, আমি চলি—

—একটা কিছু ব্যবস্থা করবে না দুগ্যা? আমার যে ওই এক মেয়ে—

—দেখি কী করতে পারি, পরে ভেবে বলবো—

বলে দুর্গা কোমর দুলিয়ে রাজবাড়ির দিকে হন হন করে চলে গেল—

ওদিকে শিবনিবাসের প্রাসাদে গোপালবাবু তখনো উদ্ধব দাসকে নিয়ে মশকরা করছিল। বলছিল—তা বউ তোমার পালালো কেন হে উদ্ধব দাস?

উদ্ধব দাস গান গেয়ে উঠলো। হাত মুখ নেড়ে বললে—

কেন শ্যামা গো তোর পদতলে স্বামী।
তুই সতী হয়ে পতি-পরে করিলি বদনামী॥

পাশের ঘর থেকে উদ্ধব দাসের গানের সুরটা কানে আসতেই মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন। তারপর চিঠি থেকে মুখ তুললেন।

ছোটমশাই অধীর হয়ে একটা কিছু উত্তর শোনবার প্রতীক্ষায় ছিলেন। এবার বললেন—তাহলে আমি এখন কী করি বলুন আপনি?

—একটা উপায় আছে!

—কী উপায়? আমার যে আর সময় নেই। আজ নবাব আমার স্ত্রীর দিকে নজর দিয়েছে, কাল হয়তো আবার আর কারো স্ত্রীর দিকে নজর দেবে, তখন? তা ছাড়া, আমি হয়তো ফিরে গিয়েই দেখবো ডিহিদারের লোক এসে গেছে—

—কী করে জানলেন?

ছোটমশাই বললেন—মুর্শিদাবাদে মীরজাফর আলি সাহেবের কাছে শুনলাম, মেহেদী নেসার নাকি একজন হিন্দুকে ভার দিয়ে দিয়েছে তাকে আনবার জন্যে!

—কেন, হিন্দুকে কেন?

—মুসলমানদের যে মেহেদী নেসার বিশ্বাস করে না। দেখলেন না মীরজাফরকে তাড়িয়ে দিয়ে সেই জায়গায় দেওয়ান-ই-আলা করে দিলে মোহনলালকে—

পাশের ঘরে তখন উদ্ধব দাসের গলা আবার শোনা গেল। উদ্ধব দাস বলছে—এই হেঁয়ালিটার সমাধান করুন তো প্রভু—

ব্যবসায় ছয়গুণ হয় যেই জন।
পুরুষ অপেক্ষা করে দ্বিগুণ ভোজন॥
বুদ্ধিতে যে চারিগুণ অসত্য এ নয়।
রমণেতে আটগুণ জানহ নিশ্চয়॥
পুরুষ অপেক্ষা যারা এত গুণ ধরে।
তত্রাচ জগৎ তারে অবিশ্বাস করে॥

বলুন তো প্রভু, কী?

ডিহিদার সব ব্যবস্থাই করে রেখেছিল। ডিহিদার রেজা আলি দোর্দণ্ড-প্রতাপ লোক। মেহেদী নেসার সাহেবের দূরসম্পর্কের রিস্তাদার। কোথায় কার টাকা হলো, কে কারবার করে দুটো পয়সা উপার্জন করেছে, সেদিকে খবর রাখাই তার আসল কাজ। মেহেদী নেসার মেহেরবানি করলে একদিন রেজা আলি ফৌজদার পর্যন্ত উঠতে পারে। কাগজে-কলমে ফৌজদাররা দিল্লীর বাদশার লোক হলেও, আসলে তো নবাবই সব। তারপর আল্লার দোয়া থাকে তো সুবাদার হতেও আটকাবে না। তখন এক-হাজারি থেকে দশ-হাজারি মনসবদারি পর্যন্ত সব কিছুই রেজা আলির মুঠোর মধ্যে। তখন নবাবও যা, রেজা আলিও তাই। তখন রেজা আলি চেহেল্-সুতুনে নবাবের সামনে গিয়ে কুর্নিশ করে কথা বলবে। তখনকার কথা ভেবেই রেজা আলি নিজের দফ্‌তরে বসে মোচে 'তা' দেয়।

তখনকার কথা ভেবেই রেজা আলি নিজের ঘোড়াটার পিঠে সপাং করে চাবুক কষিয়ে দেয়। বলে—জোর কদম্ ফিরিঙ্গি—

রেজা আলি আদর করে নিজের ঘোড়ার নাম দিয়েছে 'ফিরিঙ্গি'।

সেদিন সন্ধ্যেবেলাও রেজা আলি নিজের এলাকায় টহল দিয়ে ফিরে এসেছে। ফিরে এসেই দফ্তরে একজন কাফেরকে দেখে জিজ্ঞেস করলে—তুমি কে? তুম্ কৌন্?

কান্তর কাছে সবই ছিল। পরিচয় দেবার যা যা সরঞ্জাম, সমস্তই মনসুর আলি মেহের সাহেবের কাছ থেকে জুগিয়েছিল বশীর মিঞা। একটা খৎও দিয়ে দিয়েছিল সঙ্গে। কিছু অসুবিধে হবার কথা নয়। নবাবী নিজামতে সব পাকা কাজ। রেজা আলি সমস্ত দেখলে। ঠিক আছে। মেহেদী নেসার সাহেব এত লোক থাকতে কেন একজন কাফেরকে পাঠিয়েছে, তাও বুঝতে পারলে। মেহেদী নেসার সাহেবের এই এক গলত্। সব কাজে নিজের জাতভাইকে সন্দেহ করবে। কিন্তু রেজা আলির মনে হয়, কাফেরদের এত বিশ্বাস করা ভালো নয়। নবাব আলীবর্দী খাঁ সাহেবেরও এই দোষ ছিল। জগৎশেঠজীকে বড় বেশি বিশ্বাস করেছে। এখন? এখন সেই জগৎশেঠজী যে ফিরিঙ্গীদের সঙ্গে দহরম-মহরম করছে, কারবার চালাচ্ছে!

ঠিক আছে, তুমি তৈরি থাকবে, আমার পালকি তৈরি আছে, বজরা আছে, ভোর রাত্রেই কাম ফতে হয়ে যাবে!

কান্ত তো তৈরিই ছিল। নতুন করে আর কী তৈরি হবে। নবাবী-নোকরিতে যখন যেখানে পাঠাবে, সেখানেই যাবার জন্যে তৈরি হয়ে থাকতে হবে। আজ বলবে ইসলামাবাদ যাও, কালই হয়তো আবার জেলালগড়। আকবর-নগরই হোক আর বক্স-বন্দরই হোক, কিংবা দিল্লীই হোক, কান্ত সব সময়ই তৈরি।

সেই ডিহিদারের দফ্তরের একপাশেই সারাটা রাত এক রকম জেগেই কাটলো তার। শুয়ে শুয়েও কেবল মনে পড়তে লাগলো সেই বিকেল বেলার ঘটনাটা। কোথায় গেল মেয়েটা! আর বিয়ের বাসর থেকে পালালোই বা কেন? মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল নাকি? যার-তার সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল বলে রাগ করে পালিয়েছে? দেব-নর-গন্ধর্ব কেউ টের পাবে না, এই-ই বা কেমন পালানো! পুষ্যানক্ষত্রে শ্বেত-জয়ন্তীর শেকড় খেলে কি কেউ খুঁজে পাবে না? কান্তরও যেন কেমন পালাতে ইচ্ছে করলো। কেউ টের পাবে না, সে বেশ হবে! বেশ পেট চালানোর দায়িত্ব থেকে বেঁচে যাবে। সে এর থেকে অনেক ভালো। কোথাকার কোন্ রাজার রানী, তাকে নিয়ে যাবার দুর্ভোগ থেকে তো অন্তত বাঁচবে!

মনে আছে, তখন অনেক রাত। শেষ রাতের তারাটা তখন ডিহিদারের দফ্তরের জানলা দিয়ে স্পষ্ট উঁকি মারছিল। একজন সেপাই-এর ডাকে কান্ত ধড়মড় করে উঠে পড়লো।

—ভাইয়া, উঠো উঠো, জলদি উঠো—

রেজা আলির কাজ পাকা কাজ। সব বন্দোবস্ত করে রেখে তবে খবর দিয়েছে। দুজন সেপাই, একটা বজরা নদীর ঘাটে তৈরি। সেই রাত্রেতেই কখন যে সব সেপাইরা রাজবাড়িতে গিয়ে পৌঁছেছে, কখন তারা তোড়জোড় করে সব ব্যবস্থা পাকা করে ফেলেছে, কেউ টের পায়নি। হাতিয়াগড়ের প্রজা-পাঠকরা তখন সবাই সারাদিন ক্ষেত-খামারে খেটে ঘুমে অচৈতন্য। তারা জানতেও পারলে না, কোথায় কখন কার কলকাঠিতে অত বড় রাজবাড়ির সাতমহল থেকে কী রাহাজানি হয়ে

গেল। যে হাতিয়াগড়ের বড়মশাই একদিন খাজনা দিয়ে, নবাবের বিপদে-আপদে, অর্থ-ঐশ্বর্য-স্বার্থ দিয়ে বাঙলায় নবাবী মসনদ কায়েম করে দিয়েছিল, তারই প্রাসাদ থেকে আর-এক নবাব তার লজ্জা-সম্মান-সম্ভ্রম সমস্ত অপহরণ করে নিয়ে গেল।

বুড়ো শিবের মন্দিরের তলায় অন্ধকারে গিয়ে দাঁড়ালো কান্ত।

সেপাই দুটো সিং-দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিল। কান্তর দিকে চেয়ে বললে—আরে উধার কাহে, ইধার আও, ডরনা মাত—

ডিহিদার রেজা আলি নিজে তখন সরকার-মশাই-এর সঙ্গে দেখা করতে ভেতরে গেছে। সেখানে দাঁড়িয়েই দুজনে কী কথা হচ্ছে ওদের। রেজা আলির 'ফিরিঙ্গি' দরজার সামনে দু-একবার পা ঠুকলো। তার যেন আর দেরি সইছে না। সেও যেন অস্থির হয়ে উঠেছে মেহেদী নেসারের মত। সেও যেন পা-ঠুকে বলছে—আর দেরি কোর না—নবাবের শান্তির দরকার, নবাবের একটু মহফিলের দরকার। নবাব মসনদে বসে যন্ত্রণায় ছটফট করছে। তার চারদিকে দুষমন। তাড়াতাড়ি তোমার রাণীবিবিকে পাঠিয়ে দাও। নতুন মেয়েমানুষ দিয়ে তাকে আমরা ঠাণ্ডা রাখবো। আমরা তাকে শান্তি দেবো। মনসুর-উল-মুলক্ খেলাৎ মীর্জা মহম্মদ সিরাজ-উ-দ্দৌলা শা কুলি খান বাহাদুর খুশী থাকলে তবেই তো আমরা খুশী থাকবো। আমরা খুশী থাকলে তবেই তো বাঙলা মুলুক খুশী থাকবে। বাঙলা মুলুক খুশী থাকলে দিল্লীর বাদশা শাহানশাও খুশী থাকবে। তখন যত ইচ্ছে ফুর্তি করো, মহফিল করো, আমরা কাউকে কিছু বলবো না।

সেই অন্ধকার রাতে রাজবাড়ির কোথায় বুঝি কোন্ কোণে একবার একটু চাপা মেয়েলি গলার শব্দ হলো। একটা অস্ফুট আর্তনাদ। মহলে-মহলে বুঝি একটা ত্রস্ত পদক্ষেপ। তারপর পালকিটা ঢুকে গেল সিং-দরজার ভেতরের চবুতরে। একটা ফিস-ফিস শব্দ। অস্পষ্ট অনুচ্চারিত একটা দীর্ঘশ্বাস। কাউকে জানাবার দরকার নেই কী দুর্ঘটনা ঘটে গেল। কাল সকালে বাড়ির ভেতরে-বাইরে কেউ যেন টের না পায়। যেমন খাজাঞ্চিখানায় রোজ সকাল বেলায় খাতক-প্রজা-পাইকের ভিড় থাকে, কালও তেমনি ভিড় থাকবে। রোজ সকাল বেলা শোভারাম যেমন ছোটমশাইকে স্নান করাতে আসে, তেমনিই আসবে। ছোটমশাই-এর জলচৌকিটার ধারে দাঁড়িয়ে বুকে-পিঠে-পায়ে সরষের তেল মাখিয়ে দেবে। কাল সকালেও বিশু পরামানিক এসে খেউরি করে দিয়ে যাবে ছোটমশাইকে। কাল সকালেও বড় বউরানী সাজিতে করে ফুল সাজিয়ে বুড়ো শিবের মন্দিরে পুজো করতে যাবেন গলায় আঁচল দিয়ে। কেউ জানবে না, কোথায় কখন কী ব্যতিক্রম হলো। হাতিয়াগড়ের প্রজারা আজ মাঝরাত্রে যেমন ঘুমিয়ে আছে, কাল দিনের প্রখর সূর্যের আলোতেও তেমনি করেই ঘুমিয়ে থাকবে।

অন্ধকারের সুড়ঙ্গ বেয়ে দুটো আলতা-পরা পা আর জাহাঙ্গীরাবাদের জরি-পাড় শাড়ি দিয়ে মোড়া একটি যৌবন পালকির ভেতর এসে ঢুকলো। আর পালকির দরজার দুটো পাল্লা সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে গেল। অন্ধকারের সুড়ঙ্গ বেয়েই আবার সে-যৌবন বেহারাদের কাঁধে চড়ে নিঃশব্দে এগিয়ে চললো আর-এক অন্ধকার সুড়ঙ্গের দিকে। সে-সুড়ঙ্গে পাপ-পুণ্য, ন্যায়-অন্যায়, ধর্ম-অধর্ম সব একাকার হয়ে গেছে। সে-সুড়ঙ্গের ভেতরে ষড়যন্ত্র আর ষড়যন্ত্র। নিঃশব্দ আর্তনাদ করে মাথা কুটে মরলেও কেউ প্রতিকার করবার নেই। সেখানেই তার ভূমি-সমাধি হয়ে

যাবে চিরকালের মত। তাকে আর কেউ চিনবে না, জানবে না। বাইরের পৃথিবীতে তার নাম-ধাম-কুল-গোত্র-পরিচয় চিরকালের মত মুছে গিয়ে নিঃশেষ হয়ে যাবে।

অন্ধকারে কেউ সেদিন শাঁখও বাজালো না, উলুও দিলে না। একদিন যে এ-বাড়িতে বধূ হয়ে এসেছিল, অনেক আচার-অনুষ্ঠানের অনেক মাঙ্গলিক-মন্ত্রের অনুশাসন পালন করে, সে-ই আবার আজ নিঃশব্দে গোপনে সিংদরজা পেরিয়ে উল্টোপথে বাড়ির বাইরে চলে গেল। তাকে বার করে দিয়েই, তাকে দূরে তাড়িয়ে দিয়েই যেন এই হাতিয়াগড়ের রাজবাড়ির পবিত্রতা সুনাম সম্মান বেঁচে গেল। তার ছোঁয়াচ থেকে এ-বাড়ির প্রত্যেকটা পাথর, প্রত্যেকটা ইট, প্রত্যেকটা প্রাণী যেন নিরুপদ্রব হলো।

সেদিন সেই রাত্রের পঞ্চম প্রহরে কোথায় কোন্ গাছের কোটর থেকে একটা তক্ষক হঠাৎ কর্কশ স্বরে ডেকে রাত্রির স্তব্ধতাকে ভেঙেচুরে খান খান করে দিলে। আর সে-ঘটনার সাক্ষী হয়ে রইলো শুধু বুঝি সেই নিস্তব্ধ রাত্রির একটা তক্ষক। আর কেউ নয়। আর যদি কেউ কিছু শুনে থাকো, কিছু দেখে থাকো, কিছু বুঝে থাকো তো সমস্ত ভুলে যাও। এ-ঘটনা যদি কখনো তোমার মুখ দিয়ে উচ্চারিত হয় তো সেদিন বুঝবে, তোমারও চরম সর্বনাশ। সেদিন তোমাকেও এ পৃথিবী থেকে সেই অবধারিত সুড়ঙ্গের অন্ধকারে নির্বাসনদণ্ড ভোগ করতে হবে। তুমিও এই আজকের রাণীবিবির মত নাম-ধাম-গোত্র পরিচয়হীন হয়ে মুর্শিদাবাদের হারেমের মধ্যে নিঃশেষ হয়ে যাবে!

হঠাৎ যেন একটা শব্দে কান্ত চমকে উঠলো।

—চুপ করে খাড়া রইলে কেন বাবুজী, চলো, চলো—

সেপাই দুটোর কথায় যেন এতক্ষণে ঘুম ভাঙলো কান্তর। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়েই যেন এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিল সে। তারপর স্বপ্নের ঘোরেই আবার সকলের পেছন-পেছন চলতে লাগলো। যেখানে বর্তমান মুহূর্ত ইহকালে গিয়ে মিশেছে, যেখানে আজকের বাস্তবতা আগামীকালের ইতিহাস হয়ে উঠেছে, সেই দিকে লক্ষ্য করেই যেন চলতে লাগলো কান্ত। সেই বুড়ো শিবের মন্দির পেরিয়ে ছোটমশাই-এর তরকারির ক্ষেত, তার পাশ দিয়েই রাস্তা। সেই রাস্তা পেরিয়েই ছাতিম-তলার ঢিবি। তারপর জায়গাটা ঢালু হয়ে নেমে গেছে সোজা একেবারে নদীর ঘাটে। সেখানে ডিহিদারের বজরা দাঁড়িয়ে আছে। বজরার পাল খাটিয়ে মাঝি-মাল্লারা তৈরি। রাণীবিবি বজরায় উঠলেই তারা বদর-বদর বলে কাছি খুলে দেবে। আর ইতিহাসের পাখায় ভর করে হাতিয়াগড়ের যৌবন নিরুদ্দেশের দিকে উধাও হয়ে যাবে—

—একটু দাঁড়ান, শাড়িটা আটকে গেছে। ঘাট থেকে বজরায় উঠেই উঠেছিল রাণীবিবি। কিন্তু বজরায় উঠে ছই-ঢাকা ঘরের মধ্যে ঢুকতে গিয়েই জাহাঙ্গীরা-বাদের শাড়ির জরির পাড়টা আটকে গেছে ছই-এর বাঁশের খোঁচায়।

কান্ত তাড়াতাড়ি নিচু হয়ে শাড়িটা খুলে দিলে। সেই অন্ধকারেও নজরে পড়লো সুগোল একটা টুকটুকে ফরসা পায়ের গোছ। আর সেই পায়ের পাতারই চারপাশ ঘিরে টাটকা আলতার রেখা।

রাণীবিবি বোধহয় একটু লজ্জায় পড়ে গিয়েছিল। লজ্জায় মাথার ঘোমটাটা আর একটু টেনে দিয়ে ভেতরে গিয়ে ঢুকে পড়লো। তারপর বজরা ছেড়ে দিলে।

এ-ঘটনার অনেক দিন পরে কান্ত যখন রাণীবিবির জীবনের সঙ্গে ষড়যন্ত্রের জালে আরো জড়িয়ে গিয়েছিল, তখন একদিন বলেছিল—জানো, সেদিন তোমার পা দেখে আমার খুব ভালো লেগেছিল—

—আমার পা?

কথাটা শুনে রাণীবিবি প্রথমটায় অবাক হয়ে গিয়েছিল।

—হ্যাঁ, তোমার পা। তোমার শাড়ির জরির পাড়টা বাঁশের খোঁচায় আটকে যেতেই আমি ধরে ফেলেছিলাম, নইলে দামী শাড়িটা সেদিন ছিঁড়ে যেত—

রাণীবিবি বলেছিল—কিন্তু পা কখন দেখলে তুমি?

—তখনই তো। তোমার শাড়িটা আটকে যেতেই খানিকটা পা বেরিয়ে পড়েছিল, নজরে পড়লো তোমার আলতা-পরা একটা পায়ের পাতা আর গোল পায়ের গোছ, সেদিন এত ভালো লেগেছিল যে কী বলবো...

রাণীবিবি বলেছিল—ছিঃ, ও-কথা বলতে নেই—অমন করে বোল না—

কান্ত বলেছিল—বলতুম না, কিন্তু তখন তো জানতুম না তুমি কে, তোমার আসল পরিচয় কী! তখন জানতুম, হাতিয়াগড়ের রাণীবিবিকেই বুঝি নিয়ে চলেছি আমি! অথচ দেখ, তোমাকে নিয়ে যাবার ভার আর কারোর ওপর পড়তেও তো পারতো, তা না পড়ে কপালের দোষে আমার ওপরই বা সে-ভার পড়লো কেন?

—তা কপালের দোষ বলছো কেন?

—কপালের দোষ নয়? কপালের দোষ না থাকলে কেউ বিয়ে করতে গিয়ে দেরি করে ফেলে? কপালের দোষ না থাকলে কারো নিজের ঠিক-করা বউ-এর সঙ্গে অন্য লোকের বিয়ে হয়ে যায়? কপালের দোষ না থাকলে এত চাকরি থাকতে শেষকালে আমাকে এই চরের চাকরি করতে হয়? আর তাছাড়া কপালের দোষ না থাকলে...

রাণীবিবি বলেছিল—থাক, আর কপালের দোষ দিতে হবে না—আমি অত কপাল-টপাল মানিনে তোমার মত!

কান্ত বলেছিল—তা মানবে কেন? তোমাকে তো আর ভুগতে হয়নি আমার মত! আমার মত কষ্ট পেলে তুমিও কপাল মানতে—

রাণীবিবি বলেছিল—কিন্তু মনে কষ্ট পুষে রেখে মুখে হাসি ফোটানো যে কত শক্ত তা যদি তুমি জানতে গো!

কান্ত তখন সাহস পেয়ে আরো কাছে ঘেঁষে বসেছিল। বলেছিল—সত্যি? তোমারও কষ্ট হয়? সত্যি বলো না, তোমারও কষ্ট হয় তাহলে আমার মত?

রাণীবিবি এবার যেন একটু ভয় পেয়ে গিয়েছিল। বলেছিল—না বাপু, তুমি একটু সরে বোস, আমার ভয় করে, অত বাড়াবাড়ি ভালো নয়, শেষকালে তুমি দেখছি আমার গা ছুঁয়ে ফেলবে—

—ছুঁয়ে ফেললেই বা, তাতে কি খুব অন্যায় হবে?

রাণীবিবি রেগে গিয়েছিল। বলেছিল—আবার ওই সব কথা? আমি বলেছি না ও-সব কথা বললে আর তোমাকে আমার কাছেই আসতে দেব না—

—আচ্ছা আচ্ছা, এই আমি সরে বসলুম! কিন্তু আমি যে কিছুতেই ভুলতে পারি না।

—কী ভুলতে পারো না?

কান্ত বলেছিল—সেদিনের সেই তোমাকে বজরায় করে নিয়ে আসার মুখে

তোমার সেই শাড়ির পাড় আটকে যাওয়া, আর সেই তোমার শাড়িটা খুলে দিতে গিয়ে তোমার সেই পা...

—আবার?

বলে রাণীবিবি খপ্ করে কান্তর মুখখানা নিজের নরম হাত দিয়ে চাপা দিয়ে দিয়েছে।

রেগে গিয়ে বললে—বলেছি না, ও-সব আমার শুনতে ভালো লাগে না, ও-সব কথা আমাকে বলতে নেই, ও-সব কথা আমার শোনাও পাপ,—

কিন্তু কান্ত যেন তখন নিজের শরীরের মধ্যেই হঠাৎ নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে। রাণীবিবি তার মুখটা ছেড়ে দেওয়ার পরও যেন অনেকক্ষণ অভিভূত হয়ে পড়েছিল। তারপর একটু জ্ঞান ফিরে পেয়েই বলেছিল—এই তো তুমি আমার গা ছুঁলে মরালী, আর আমি তোমাকে ছুঁলেই যত দোষ? আমি ছুঁলেই তুমি অশুদ্ধ হয়ে যাবে?

—তা তুমি এই সহজ কথাটাও কেন বোঝ না যে আমার সিঁথিতে সিঁদুর রয়েছে, আমি পরের বউ?

—তা এই এখানেও কি তুমি পরের বউ? এই নবাবের হারেমের মধ্যে? এই মদ, জুয়া, জাল, জোচ্চুরি, রেষারেষি আর বেলেল্লাগিরির মধ্যেও তুমি কি মনে করো তুমি পরের বউ হয়ে নিজেকে বাঁচাতে পারছো?

—খবরদার বলছি, মুখ সামলে কথা বলো!

কান্ত আর পারেনি। চিৎকার করে বলে ফেলেছিল—কিন্তু সেই-ই যদি বাসর ঘর ছেড়ে পালালে তো আর একটু আগে পালাতে পারলে না তুমি? সম্প্রদান হবার আগে পালাতে পারলে না? লগ্ন বয়ে গেলে কি এর চেয়েও বেশি সর্বনাশ হতো? তাহলে কি তোমাকেই আজ সিঁথির সিঁদুর নিয়ে এই পাপ-পুরীর মধ্যে আসতো হতো, না ভদ্রঘরের ছেলে হয়ে আমাকেই এই নবাবের চরের কাজ করে টাকা রোজগার করতে হতো, বলো?

কথাটা যে কত চেঁচিয়ে বলেছিল কান্ত তা তার খেয়াল ছিল না। হারেমের দেয়ালের ইটগুলোরও যে এক একটা করে কান আছে, তাই বোধহয় ভুলে গিয়েছিল সে। নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ থেকে শুরু করে নবাব আলীবর্দী খাঁ পর্যন্ত যত খুন, যত অত্যাচার, যত পাপ, যত কলঙ্ক জমা হয়ে ছিল মাটির তলায়, সেই সমস্ত দিয়েই যেন ইঁট তৈরি করে, সেই ইঁট দিয়ে গেঁথে-গেঁথে তৈরি হয়েছিল এই চেহেল্-সুতুন। প্রত্যেকটা অলিন্দে অলিন্দে, প্রত্যেকটা কোটরে কোটরে, প্রত্যেকটা প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে, প্রত্যেকটা গবাক্ষে-গবাক্ষে কান্তর সেদিনকার হাহাকার যেন প্রতিধ্বনিত হয়ে বার বার নিজের ভাগ্যের পরাজয়ের প্রতিশোধ নিজের হাতেই নিতে চেয়েছিল। আর শব্দটা কানে যেতেই ওদিক থেকে দৌড়ে এসেছিল পীরালি খাঁ। পীরালি খাঁ খোজা সর্দার। ঘরের ভেতরে ঢুকেই...

কিন্তু সে-কথা এখন থাক। পরের কথা পরে বলাই তো ভালো।

সেই অন্ধকারে দক্ষিণের হাওয়ায় বজরায় পাল তুলে দিয়ে তখন মাঝি-মাল্লারাও তন্দ্রায় ঢুলছে। মাথার ওপর চিরকালের একঘেয়ে আকাশটা রোজকার মত তারাফুল ফুটিয়ে নির্জীব নিঃসাড় হয়ে আছে। সেপাই দুটো বন্দুক নিয়ে সামনেই ঘুমে অজ্ঞান অচৈতন্য। ছই-ঢাকা ঘরটার মধ্যে রাণীবিবিও হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে। কে জানে! হয়তো কেন, নিশ্চয়ই ঘুমোচ্ছে! সেদিক থেকে

কোনো সাড়া শব্দ নেই এতটুকু! শুধু কান্ত একলা আকাশ-পাতাল তোলপাড় করে বেড়াচ্ছে। সেইখানে সেই বজরার গলুইতে হেলান দিয়ে বসে বসে নিজের সমস্তটা জীবন পরিক্রমা করছে বার বার। এ কেমন চাকরি তার। এ কেমন পেশা! কাকে ধরে নিয়ে চলেছে সে! কার সম্পত্তি কার হাতে গিয়ে তুলে দেবে। কেন তুলে দেবে? ছ'টা টাকার জন্যে? ছ'টা টাকার এত দাম? ছ'টা টাকার দাম দিয়ে সে আর একজন পুরুষের শান্তি হরণ করবে? আর একজনের অভিশাপ বরণ করবে? আর একজনের সর্বনাশ করে সে তার নিজের খোরাকী রোজগার করবে? কত কথা তার মনে পড়েছিল সেদিন। এক-একবার কল্পনা করতেও ইচ্ছে হচ্ছিল রাণীবিবির মুখখানা। জাহাঙ্গীরাবাদের জরি-পাড় শাড়ির ঘোমটা দিয়ে ঢাকা ছিল সর্বাঙ্গ। শুধু দৈবাৎ একটা পায়ের একটুখানি অংশ নজরে পড়েছিল। তাও এক মুহূর্তের জন্যে। কিন্তু মনে পড়তেই ভাবনাটা মন থেকে দূর করে দিয়েছিল। এ অন্যায়, এ পাপ! রাণীবিবির কথা ভাবাও পাপ। চাকরির জন্যে এ-পাপের যতটুকু অংশীদার হবার দায় তার, তার বেশি দায়িত্ব তার নেই। তার চেয়ে যেন বেশি সে কিছু না ভাবে। মুর্শিদাবাদের নবাবের যা সাজে, কান্তর তা সাজে না।

—বাবুজী, হুঁশিয়ার!

চমকে উঠেছে কান্ত! বুড়ো মাঝিটা এতক্ষণ ঢুলছিল। এবার বুঝি সজাগ হয়েছে। কেন? হুঁশিয়ার কেন?

—বাবুজী, দাঁড়ের ঝপ্-ঝপ্ আওয়াজ শুনতে পাচ্ছেন না! বদরগঞ্জের কাছে এসেছি, এটা ডাকাতের আড্ডা!

কান্ত মাঝির নির্দেশ লক্ষ্য করে দূরের দিকে চেয়ে দেখলে। অনেক অনেক দূরে অন্ধকারের বুক চিরে যেন একটা আলোর বিন্দুর মত কী দেখা গেল। একেবারে নদীর বুক-বরাবর। আলোটা যেন ক্রমেই স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠছে।

সেপাই দুটো তখনো ঘুমোচ্ছে।

কান্ত বললে—ওদের ডেকে দেবো? ওদের কাছে বন্দুক আছে—

কিন্তু ডাকতে হলো না। তারা নিজের থেকেই উঠে পড়লো। এ যেন তারা জানতো। বদরগঞ্জে অনেকবার ডাকাতি হয়েছে। অনেকবার ডাকাতদের সঙ্গে তাদের মুখোমুখি শওয়াল করতে হয়েছে। তারা উঠেই বন্দুক তাগ্ করে তৈরি হয়ে রইলো। দাঁড় ফেলার ঝপ্-ঝপ্ শব্দ ক্রমেই আরো তীক্ষ্ণ হয়ে উঠছে। যেন তাড়াতাড়ি ঝড়ের গতিতে কাছে এগিয়ে আসতে চাইছে।

কান্তর কেমন ভয় করতে লাগলো। যদি সত্যি সত্যিই ডাকাত পড়ে। তাহলে রাণীবিবির কী হবে! রাণীবিবি হয়তো কিছুই টের পাচ্ছে না, অঘোরে ঘুমোচ্ছে!

কান্ত ছই-এর দরজার কাছে গিয়ে ডাকতে লাগলো—শুনছেন—

ভেতর থেকে কোনো সাড়া-শব্দ এল না। হয়তো শুনতে পায়নি। দরজা-জানালা সব বন্ধ করে দিয়ে ভেতরে একলা রয়েছে।

কান্ত এবার দরজায় টোকা দিতে লাগলো—শুনছেন—শুনছেন—আমি কান্ত—শুনছেন—

মুর্শিদাবাদে তখনো মতিঝিল থেকে মীর্জা ফেরেনি। রাত শেষ হয়ে আসছে। চেহেল্-সুতুনের অন্দরমহলে সব আলো নিভে গেছে। কিন্তু নানীবেগমের ঘরে তখনো একটা আলো জ্বলছে টিম্ টিম্ করে।

বাইরে থেকে ডাক এল—বেগমসাহেবা—

সন্ধ্যে থেকেই নানীবেগমের খারাপ লাগছিল। লুৎফাও ঘুমোতে পারে না, নানীবেগমও ঘুমোতে পারে না। চেহেল্-সুতুনের ভেতরে একবার এলে ঘুম না-হওয়া যেন রোগে দাঁড়ায়। ছোট্ট রোগা-রোগা মেয়েটা। তার দিকে চাইলেই নানীবেগমের বুকটা হু-হু করে ওঠে। এমন বউ যেন এখানে মানায় না। নানী-বেগম বউকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে মাঝে-মাঝে। যখনি সব পুরোন কথা মনে পড়ে যায়, তখন আর কাউকে ভালো লাগে না। নিজের পেটের মেয়েরাও তখন যেন বিষ হয়ে ওঠে নানীবেগমের চোখে। মেয়ে নয়তো, সব কাঁটা। এক-একটা কাঁটা হয়ে সব নানীবেগমের বুকে ফুটে আছে। তোরা সব মানুষ না কী? তোদের মান-ইজ্জৎ-সম্মান-মর্যাদা কিছু নেই? তবু নানীবেগমের যদি নিজের ছেলে থাকতো তো আজ ভাবনা! সারা জীবনটাই তো নানীবেগমের কেটে গেছে আলীবর্দী সাহেবের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে। একটা দিনের জন্যে নানীবেগম মনে শান্তি পায়নি। চেহেল্-সুতুনের মধ্যে রাতের পর রাত কেটে যায় সেই সব পুরোন কথা ভাবতে ভাবতে। পাশে কেউ বিশেষ থাকে না। শুধু লুৎফা কাছে আসে। কাছে এসে বসে আর কাঁদে।

নানীবেগম বলে—তুই কেন কাঁদিস মা, তুই কেন মরতে আমার পেছন-পেছন ঘুরিস?

মেয়েটা কথাও বলে না বেশি, কথা বললেই যেন সে কেঁদে ভাসিয়ে দেবে। এখানেই একদিন নাচতে এসেছিল এই মেয়ে এই মুর্শিদাবাদে। সেই মেয়ে যে তার নাত-বউ হবে তা-ই বা কে ভেবেছিল।

নানী বলতো—দেখলি তো এখন নবাবীহারেমে কত সুখ! আমারও এক-এক সময় মনে হয় মা, বোধহয় মুর্শিদাবাদের গরীব প্রজার ঘরে জন্মালে এর চেয়ে অনেক সুখ পেতাম—

লুৎফা সব শোনে। শুনতে শুনতে মাঝে-মাঝে নানীর বুকে মাথা গুঁজে হাউ-হাউ করে কেঁদে ওঠে!

হারেমের ও-পাশে যখন সারেঙ্গী বাজে, ঘুঙুর বাজে, সরাবের হররা চলে, পেশমন বেগম, দুলহান বেগম, বব্বু বেগম সবাই মিলে যখন পাশা খেলে, ঘুঁটি খেলে রাত কাবার করে দেয়, তখন নানীবেগমের ঘরের ভেতর দুটি প্রাণী শুধু প্রহর গোণে। কখন মীর্জা আসবে তার তো ঠিক নেই। গদিতে বসবার পর থেকেই ইয়ার-বক্সীরা নাতিকে আরো ঘিরে রেখে দিয়েছে। নানীবেগমের সঙ্গে দেখা করবারই সময় হয় না তার। একবার যদিই বা আসে, একটুখানির জন্যে এসেই আবার চলে যায়। বলে—আমি আবার আসবো নানী—

—কিন্তু, কী নিয়ে আবার এত ব্যস্ত তুই? তুই কি একদণ্ড শান্তিতে ঘুমোতে পারবিনে?

মীর্জা বলে—কিন্তু সবাই মিলে যে আমার দুষমনি করছে নানী, আমি কী করবো?

—তা তোর নানার কি দুষমন ছিল না? তোর নানা আমার সঙ্গে দেখা করবার ফুরসুত পেত কী করে?

মীর্জা বলতো—সে জমানা আর নেই নানী, তোমার মেয়েরাই আমার সব চেয়ে বড় দুষমন! নিজের ঘরের মধ্যে যার দুষমন, তার শান্তি কী করে হবে? আমার যে ঘরে-বাইরে দুষমন!

কথা বলে আর দাঁড়াতো না মীর্জা। আবার কোথায় বেরিয়ে চলে যেত।

আড়ালে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লুৎফা সব শুনতো। এক ফোঁটা মেয়েটা। পাত্‌লা লিক্‌লিকে চেহারা, তাকে দেখতে পেয়েই নানীবেগম বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরতো। কিছু ভাবিস্‌নে মা, নবাবের বিবি হলে সুখ হতে নেই। নবাবের বেগমদের ওপর খোদাতালার অভিশাপ আছে। সাজাহানাবাদের বেগমদেরও সুখ হয়নি জীবনে। আকবর বাদশা, জাহাঙ্গীর বাদশা, শাহ্‌জাহান বাদশা, ঔরংজেব বাদশা—সকলের বেগমেরই কেঁদে কেঁদে কাটাতে হয়েছে—

—বেগমসাহেবা!

বাঁদী এসে বললে—মেহেদী নেসার সাহেব সেলাম ভেজিয়েছেন—

—ডাক এখেনে, ডেকে আন।

মেহেদী নেসারকে আজ ডেকে পাঠিয়েছিল নানীবেগম। ডেকে না-পাঠালেও মেহেদী নেসার সাহেব নানীবেগমকে সেলাম জানিয়ে যায় মাঝে মাঝে। নবাবের নানী, তাকে হাতে রাখা ভালো। এসে বলে—বন্দেগী বেগমসাহেবা—

এসব বিনয়ের ব্যাপারে মেহেদী নেসারের আবার জুড়ি নেই। কোনো কাজ থাকলেও মেহেদী নেসার আসে, আবার না-থাকলেও আসে। এসে বলে—গোস্তাকি মাফি হয় বেগমসাহেবা। আমি বেগমসাহেবার খিদ্‌মদ্‌গার। বান্দাকে একটু দোয়া করবেন হুজুরাইন। নানান ভাষায়, নানান কায়দায় সেলাম জানাতে মেহেদী নেসার ওস্তাদ! ঘরের ভেতরে পর্দার আড়ালে নানীবেগম থাকে আর বাইরে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে কথা বলে। মাঝখানে দরওয়াজার মধ্যে থাকে নানীবেগমের খাসবাঁদী আর খোজা-সর্দার পীরালি খাঁ। দু'তরফের কথা সে-ই বলে বলে শোনায়।

—জিজ্ঞেস কর মেহেদী নেসার সাহেবকে, কী দরকার।

পীরালি বলে—বেগম সাহেবা জিজ্ঞেস করছেন আপনার কী দরকার—

মেহেদী নেসার মাথা নিচু করে বলে—বলো, দরকার আমার কিছু নেই, শুধু রোজার দিনে বেগমসাহেবার দোয়া নিতে এলাম। বেগমসাহেবার দোয়া না পেলে তো আমি রোজা ভাঙতে পারি না—

তারপর সেই নানীবেগমের দোয়া পাবার পর মেহেদী নেসার সেই মেঝের শ্বেত পাথরের ওপরেই নিজের নাক ছুঁইয়ে কুর্নিশ করতে করতে চলে যায়।

এক-একদিন নানীবেগম বলতো—মীর্জাকে তোমরা একটু শোধরাতে পারো না বাবা, দিনরাত এত মদ খেলে তবিয়ত টিঁকবে কী করে, দেমাক্‌ যে বরবাদ হয়ে যাবে। বয়েস তো বেশি নয়—

মেহেদী নেসার বলতো—না বেগমসাহেবা, আমরা তো বোঝাই তাই ওকে! আমরা তো বলি এখন আপনি মুর্শিদাবাদের নবাব জাঁহাপনা, এখন কি আর আগের মত ছেলেমানুষি করা পোষায়! আমরা তো ওকে বার বার সেই কথাই বলি—

—আমার ওই একটি নাতি বাবা, তোমরা ওর ইয়ার, তোমরা যদি ওকে না

দেখো তো কে দেখবে? আমার সঙ্গে তো দেখাই হয় না মীর্জার, আমার কথা শোনেই না, তোমাদের সঙ্গে মেশে, তোমাদের কথা শুনেই ও চলে। তোমরা একটু সৎ পরামর্শ দিও বাবা ওকে—

—তাই তো দিই বেগমসাহেবা! আমরা ওকে কোরাণ পড়তে বলি—ও তো নানার সামনে বাত্ দিয়েছিল সরাব আর খাবে না। সরাব তো আর ছোঁয়ও না ও। আমরা বলেছি ওকে—কোরাণ পড়লে দেমাক্ ঠিক হয়ে যাবে। এই দেখুন না বেগমসাহেবা, আমার কাছেই তো কোরাণ রয়েছে।

বলে নিজের জোব্বার জেব্ থেকে কোরাণটা বার করে দেখালে। বললে—এই আজকেও ওকে কোরাণ পড়িয়েছি বেগমসাহেবা, এই জায়গাটা অনেক বার করে পড়িয়েছি—লা এলাহি এল্ আল্লা মহম্মদ রসুল আল্লা...

তারপরে যাবার সময় বলতো—তাহলে বান্দা এবার আসছে বেগমসাহেবা—

—আচ্ছা, যাও বাবা তুমি, যাও—

এমনি করেই মেহেদী নেসার এখানে বহুদিন এসেছে, বহুবার বেগমসাহেবার দোয়া নিয়ে চলে গেছে। এবার শেষ রাত্রের দিকে হঠাৎ ডাক পেয়ে মেহেদী নেসার সত্যিই তাজ্জব হয়ে গিয়েছিল। এমন অসময়ে তো নানীবেগম কখনো মেহেদী নেসারকে এত্তেলা দেয় না।

—আমাকে ডেকেছিলেন বেগমসাহেবা?

নানীবেগম ভেতর থেকে উত্তর দিলে—হ্যাঁ, শুনছি আবার নাকি কোন্ জমিদারের বউকে মতিঝিলে আনবার ব্যবস্থা করেছো তোমরা?

মেহেদী নেসার বাইরে দাঁড়িয়ে থর থর করে কাঁপতে লাগলো।

—শুনছি, আমাদের হাতিয়াগড় সরকারের জমিদারের দোসরা তরফের রাণী-বিবিকে আনবার জন্যে এখান থেকে ডিহিদারকে পরওয়ানা পাঠাতে বলা হয়েছে। নাকি লোকও চলে গেছে আনতে? এটা কি সত্যি? জবাব দিচ্ছ না কেন, উত্তর দাও—

—সে কী? হাতিয়াগড়ের রাণীবিবি?

—হ্যাঁ! তাকে এনে তোমরা আমার নাতির মাথা খাবে বলে মতলব করেছো! একজন হিন্দুকে পাঠিয়েছ তাকে আনতে! মীর্জার মন ভোলাবার জন্যে তোমরা সবাই মিলে পরামর্শ করে এই কাজ করেছো! ভেবো না আমি হারেমের ভেতরে থাকি বলে আমার কানে কোনো খবর পেঁাছোয় না। তোমরা তার ইয়ার হয়ে কোথায় সৎ পরামর্শ দেবে, না এই সব করে নবাব-বংশ ছারখার করে দিতে চাও? তোমরা কি চাও মুর্শিদাবাদের গদি আবার অন্য কারো হাতে চলে যাক? আমি তার নানী, আমি বেঁচে থাকতে থাকতেই তোমরা আমার এই সর্বনাশ করে যাবে?

মেহেদী নেসারকে এবার বড় শক্ত পালা অভিনয় করতে হলো।

বললে—আমি আপনার বান্দা বেগমসাহেবা, এ-সব আপনি কী বলছেন, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না! হাতিয়াগড়ের রাণীবিবিকে আনবো আমি?

—তুমি নয়, তোমার দল-বল! ও একই কথা! এমনি করে একদিন সরফরাজের নবাবী গিয়েছে, আমার নাতির নবাবীও তোমরা এমনি করে খোয়াতে চাও? চারদিকে যখন সবাই আমার নাতির বিরুদ্ধে, তখন তোমরাও আমার নাতিকে পথে বসাবে? আর আমাকে বেঁচে থেকে সেই সর্বনাশ দেখে যেতে হবে—এই-ই তোমরা চাও!

মেহেদী নেসার হঠাৎ কোরাণ ছুঁয়ে বললে—এই কোরাণ ছুঁয়ে বলছি বেগম-সাহেবা, আমি এর কিছুই জানি না। আমি আপনাদের নিমক খেয়ে আপনাদেরই

নিমকহারামী করবো, এ কখনো হতে পারে?

—তাহলে আমি যা শুনেছি, সব মিথ্যে!

—ডাহা মিথ্যে কথা বেগমসাহেবা! জলজ্যান্ত মিথ্যে কথা! কে এ-সব আপনাকে বলেছে? আমাদের তো দুষমন আছে চারদিকে, তারাই হয়তো আপনাকে এই সব বলে গিয়েছে।

নানীবেগম বললে—না, আমার কাছে খত্ আছে, আমার কাছে চিঠি আছে, তাতেই সব লেখা আছে—

—কার চিঠি? কে লিখেছে বেগমসাহেবা? নাম কী তার?

—হাতিয়াগড়ের বড়রানী! বেচারা কোনো উপায় না পেয়ে আমাকে চিঠি দিয়েছে!

—দেখি বেগমসাহেবা, চিঠিখানা দেখি। চিঠিখানা জাল কি না দেখি!

—না! এ-চিঠি তোমরা পাবে না। এ যদি সত্যি হয় তো সেদিন তোমাকে এর জবাবদিহি করতে হবে মনে রেখো। একদিন এমনি করে ওই পেশমন বেগমকে এনেছো এখানে, গুলসন বেগমকে এনেছো, তক্কি বেগমকে এনেছো, নুর বেগম, জন্নত বেগম, আরো একগাদা বেগমকে এনেছো—আবার আর একটা বেগমকে আনতে চাও? আবার আর একজনের সর্বনাশ করতে চাও? এততেও তোমাদের আশ মেটেনি? আমার মীর্জাকে না খুন করে কি...

মেহেদী নেসার বললে—নবাবদের তো বেগম থাকেই বেগমসাহেবা, সে তো নতুন কিছু নয়। নবাব সরফরাজ খাঁর পনেরো শো বেগম ছিল—কিন্তু আমাদের কেন দায়ী করছেন তার জন্যে বেগমসাহেবা!

হঠাৎ কথা শেষ হবার আগেই দূর থেকে খোজা বরকত আলির ঘোষণা শোনা গেল—নবাব মনসুর-উল-মুল্‌কে্ শা কুলি খান বাহাদুর মির্জা মহম্মদ সিরাজ-উ-দ্দৌলা হেবাৎ জঙ আলমগীর-র-র-র-র...

কথাটা কানে যেতেই লুৎফুন্নিসা নানীবেগমের কোল থেকে উঠে নিজের মহলের দিকে দৌড়ে পালিয়ে গেল।

—ওই মির্জা আসছে, ওকেই আমি চিঠিটা দেখাচ্ছি, তুমি এখন যাও বাবা এখান থেকে—যাও তুমি—

মেহেদী নেসার আ-ভূমি মাথা ঠেকিয়ে ঠিক আগেকার মতই কুর্নিশ করতে করতে পেছনে হটে অন্য দিক দিয়ে চলে গেল। চলে গিয়ে যেন বাঁচলো সে। হাতিয়াগড়ের বড়রানী খত্ লিখেছে? এত বাড় বেড়েছে কাফেরের বাঁদী?

—শুনছেন!—শুনছেন!

তখন সকাল হয়ে গেছে বেশ! বদরগঞ্জ পেরিয়ে মীরপুরে এসে ডিহিদারের বজরা থামবে। সেখানেই সব ব্যবস্থা করা আছে। পুরোনো সেপাই ছেড়ে দিয়ে নতুন দু'জন সেপাই এসে উঠবে। রাণীবিবির দরজা তখনো খোলেনি। দরজায় ধাক্কা দিতেও সঙ্কোচ হতে লাগলো। রাত্তিরে এক ফোঁটা ঘুম হয়নি কান্তর। কিন্তু রাণীবিবিকে ডাকতেই হবে। কত দরকার থাকতে পারে। মীরপুরের ঘাটে সেখানকার ডিহিদারের লোক খাবারের ব্যবস্থা করবে।

—শুনছেন! আমি কান্ত। শুনছেন!

সত্যিই রাত্তিরে বড় ভয় পেয়ে গিয়েছিল কান্ত। ডাকাতি হয় বদরগঞ্জে এটা জানা কথা। বদরগঞ্জে অনেকবার অনেক বজরা লুঠপাট করে নিয়েছে তারা। আলোটা কাছে আসতেই সেপাই দুটো বন্দুক তাক করে রেখেছিল। নৌকোটা কাছে আসতেই সেদিকের ম্যাঝিরা হাঁক দিলে—কার বজরা?

কান্তদের বুড়ো মাঝি হাঁক দিলে—ডিহিদারের—তোমরা?

—হাতিয়াগড় সরকার!

কথা বলতে-না-বলতেই নৌকোটা তীরের গতিতে এগিয়ে চলে গেল। আটজন মাঝি প্রাণপণে বজরা নিয়ে দাঁড় ফেলতে ফেলতে যাচ্ছে! যাক, তখন যেন একটু হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিল কান্ত। কিন্তু হাতিয়াগড়ের জমিদার যদি জানতে পারতেন, এ-বজরাতেই তাঁর রাণীবিবি আছে!

—শুনছেন! শুনছেন!

মাঝিটা বললে—হুই মীরপুরের বাঁধাঘাট দেখা যাচ্ছে—হুই যে—

এতক্ষণে দরজাটা খোলবার একটা শব্দ হলো—খুট্!

দরজার সামান্য একটু ফাঁক দিয়ে দেখা গেল সেই শাড়িটা। রাত্রের সেই জরি-পাড় জাহাঙ্গীরাবাদের শাড়ির আঁচলটা।

কান্ত সেই আড়াল থেকে দাঁড়িয়েই বললে—আমরা মীরপুরে এসে গেছি, এখানে আমরা নৌকো বাঁধবো। আপনার জল-টল কিছু দরকার থাকলে আমাকে বলতে পারেন। আমি নিজে হিন্দু, আপনার কিছু ভয় করবার নেই—আমার নাম কান্ত সরকার—

আর ওদিকে হাতিয়াগড়ের রাজবাড়িতে তখন সবে ভোর হয়েছে। বড় বউ-রানীর দরজায় টোকা পড়তেই বড় বউরানী উঠে পড়েছেন।

—এ কী, তুমি? তুমি কখন এলে?

—এই তো এখন! মহারাজকে সব বলে এলাম। তার কোনো ভাবনা নেই। মহারাজ এবার নিজে এর সমস্ত ভার নিলেন। আমাকে বললেন—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন রায়মশায়, মীরজাফর যখন আমাদের দলে আছে, তখন আমি এর একটা বিহিত করবোই—

তবু বড় বউরানী কোনো কথা বললেন না।

—মহারাজ আজই মহিমাপুরে গিয়ে জগৎশেঠের সঙ্গে দেখা করবেন বললেন, তারপর সেখান থেকে কালীঘাটে পুজো দেবার নাম করে হল্‌ওয়েল সাহেবের সঙ্গে দেখা করবেন, উমিচাঁদের সঙ্গে দেখা করবেন, ফিরিঙ্গীদের সঙ্গে একটা পাকা বন্দোবস্ত না করে আর ফিরবেন না—আমাকে কথা দিলেন।

তারপর বড় বউরানীর মুখের দিকে চেয়ে বললেন—কী, তুমি কিছু কথা বলছো না যে?

বড় বউরানী তবু কিছু কথা বললেন না।

—কী হলো তোমার, শরীর খারাপ? না, আমার কথায় বিশ্বাস হচ্ছে না! কথা বলো, অমন চুপ করে রইলে কেন? ছোটবউ কোথায়? ছোটবউ কেমন আছে? আমি তো মহারাজের সঙ্গে মহিমাপুরেই যাচ্ছিলুম, কিন্তু তোমাদের একলা ফেলে গেছি ভেবে তাড়াতাড়ি চলে এলুম। ডিহিদারের লোক আর এসেছিল, নাকি?

এতক্ষণে বড় বউরানীর মুখ দিয়ে কথা বেরুলো। বললে—হ্যাঁ!

—তারপর? কী বলে গেল? কোনো হিন্দু এসেছিল সঙ্গে? তুমি কী বললে?

বড় বউরানী যেন পাথর হয়ে গেছে। পাথরের মত শুকনো গলায় বললে—আমি ছোটবউকে খুন করে ফেলেছি—

চেহেল্-সুতুনের ভেতর রাত্রির যে-চেহারা, হাতিয়াগড়ের রাজবাড়ির রাতের চেহারা সে-রকম নয়। মুর্শিদাবাদের হারেমে যখন রাত হয় তখন বাঙলা দেশের সমস্ত ষড়যন্ত্র সেখানে সজাগ হয়ে ওঠে। জাহাঙ্গীরাবাদ থেকে যেদিন মুর্শিদকুলি খাঁ মুর্শিদাবাদে এসে রাজধানী বসালেন সেইদিন থেকেই সেখানে দিন-রাত একাকার হয়ে গেল। ভোরবেলা যখন ইনসাফ মিঞা নহবতে ভৈঁরোর তান ধরে, তার অনেক আগে থেকেই সকলে জেগে ওঠে। কবর থেকে উঠে আসে নবাব-বাদশাদের কঙ্কাল। তারা একে একে এসে আবার এখানে পাদচারণা শুরু করে। এ-মহল থেকে ও-মহলে যায়। তারপর আর-এক মহলে। এক একটা দৃশ্য দেখে আর মুখ ফিরিয়ে নেয় আতঙ্কে। বহু যুগ আগে মোগলদের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে আমরা যা-কিছু শুরু করেছিলাম, এখনো ঠিক তাই। মদের গেলাস মেঝের ওপর গড়াগড়ি চলেছে আর তারই পাশে নেশায় অসাড় হয়ে পড়ে আছে পেশমন বেগম। তার গায়ের ওড়নি আর কোমরের ঘাগরা বেসামাল। আলো নিভোতে ভুলে গেছে তার ইরানী বাঁদী।

হঠাৎ স্বপ্নের ঘোরেই কেউ বা হেসে ওঠে খিল্ খিল্ করে। কেউ বা আবার কেঁদেও ওঠে। হাসি-কান্নার পান্না-মুক্তোর ঝলসানি লেগে ছাদের ঝাড়-লণ্ঠনগুলো পর্যন্ত যেন লজ্জা পায়। খোজা সর্দার পীরালি এক-একদিন নিজেই তদারক করতে বেরোয়। কার ঘরে কে ঢুকেছে, কে জেগে আছে, কে ঘুমোয়নি, কে হাসছে, কে কাঁদছে, সব দেখে বেড়ায়। কারো ঘাগরাটা পরিয়ে দিয়ে বলে—বেগমসাহেবা, রাত হয়েছে, দরওয়াজা বন্ধ করে দিন—

আবার কারো ঘরে যেতেই সেতারের তার ছিঁড়ে বাজনা বন্ধ হয়ে যায়।

—নিদ্ নেই বেগমসাহেবা?

সারা দিন সারা রাত অবসর যেখানে, সেখানে ঘুমিয়ে সময় নষ্ট করে লাভ কি। ঘুমোবার জন্যে তো আল্লা রাত পয়দা করেনি। রাত তো ফুর্তি করবার জন্যে। দুনিয়ার মালিক যাদের অটুট যৌবন দিয়েছে, অফুরন্ত অবসর দিয়েছে, তাদের ঘুমোবার দরকার কী! কিন্তু তবু পীরালি খাঁকে সমীহ করে চলতে হয় সকলের। কার কখন কী দরকার পড়ে কে বলতে পারে। পীরালিই তো চেহেল্-সুতুনের জাগ্রত আল্লা!

পীরালির যারা সাগ্‌রেদ তারা বেগমসাহেবাদের কাছ থেকে মোহর নেয়, টাকা নেয়, তার বদলে তাদের অনেক বে-আইনী কাজ করে দেয়। বাইরের লোককে সুড়ঙ্গ দিয়ে লুকিয়ে ভেতরে আনতে হবে, তাতে বেশি কিছু করতে হবে না। বরকত আলী কি নজর মহম্মদের বাঁ হাতে একটা কিছু গুঁজে দিলেই চলবে। সঙ্গে-সঙ্গে রাত গভীর হয়ে আসবার পরই ঘরের ভেতর এসে হাজির হবে মুর্শিদাবাদের নতুন কোনো উঠতি জওয়ান। সারা রাত এই চেহেল্-সুতুনে কাটিয়ে আবার ভোর হবার আগেই সে নিঃশব্দে সুড়ঙ্গ পথে বাইরে চলে যাবে। হারেমের টিক্‌টিকি আরশোলা

কিংবা মাছিটা পর্যন্ত তা টের পাবে না। এখানে যত কড়াকড়ি তত ফস্কা গেরো। এখানে বসে যদি কেউ বাইরের জগতের সংগে কারবার করতে চায় তো তাতেও কিছু আটকাবে না। এখানে বসেই বেগমসাহেবারা পূর্ণিয়া থেকে সোরা কিনবে, গন্ধক কিনবে, এখান থেকেই সেই কেনার টাকা যাবে। আবার সেই সোরা সেই গন্ধক কলকাতায় বেভারিজ সাহেবের গদিতে বিক্রী হয়ে যাবে। সেই বিক্রীর টাকা আবার যথাস্থান দিয়ে বেগমসাহেবার হাতে এসে পৌঁছবে। নবাবের বাবারও সাধ্যি নেই তা টের পায়। এখান থেকে টাকা যায় জগৎশেঠজীর বাড়িতে সুদে খাটাবার জন্যে, এখান থেকে হীরে-মুক্তো-পান্নার গয়না যায় শেঠবাড়িতে বন্ধক রাখবার জন্যে। সেই বন্ধকী মাল আবার ছাড়ান পেয়ে চলে আসবে সকলের চোখের আড়ালে। জানলে শুধু জানবে পীরালি কি বরকত আলি কি নজর মহম্মদ, কি তাদের মধ্যে কয়েকজন।

কিন্তু সেই পীরালিই যখন আবার নানীবেগমের মহলে আসে তখন সে অন্য মানুষ। তখন তাকে দেখলে আর চেনা যায় না। যদি দেখে নানীবেগম কোরাণ পড়ছে, সকলকে গিয়ে সাবধান করে দেয়। বলে—চিল্লাও মাত্, চিল্লাও মাত্, চিল্লাচিল্লি করো না কেউ—

ও-মহলের সারেঙ্গীর শব্দ এ-মহলে এলে গিয়ে জোর করে থামিয়ে দেয়। বলে—আভি বন্ধ্ কীজিয়ে, বেগমসাহেবা কোরাণ পড়ছে।

বিধবা হবার পর থেকেই নানীবেগমের যেন কোরাণ পড়ার হিড়িক পড়ে গেছে। সারা জীবন নবাবের সংগে কাটিয়ে এসে এখন এই বয়েসে চেহেল্-সুতুনের দুরবস্থা দেখে কোনো প্রতিকার করতে পারে না। নিজের মেয়েরা কী করে, কী ভাবে জীবন কাটায় সব জানতে পারে। জেনেও যখন তার কথা কেউ শোনে না, তখন বোধহয় খোদাতালার দরবারে নিজের আর্জি পেশ করে মনটার মধ্যে শান্তি খোঁজে।

পীরালি বুড়ো হয়ে গেছে এ-সব দেখতে দেখতে। কিন্তু তার কাছে কোরাণও যা, মোহরও তাই। তাকে একটা মোহর দাও সে তোমাকে যা চাইবে তাই-ই দেবে। আবার কোরাণ ছুঁয়েও যদি প্রতিজ্ঞা করে যে তোমার কথা কাউকে বলবে না, একটা মোহর পেলে আবার সেই কথাই সে পাচার করে দেবে তোমার দুষমনের কাছে।

নানীবেগম বলতো— মেহেরুন্নিসার মহলটা দেখছিস্ তো ভালো করে?

—দেখছি বেগমসাহেবা, কড়া নজর রাখছি!

শুধু কড়া নজর রাখা নয়, মীর্জার হুকুম ছিল ঘসেটি বেগমের সংগে কেউ যেন মুলাকাত না করে। সে যে মহলে আছে সেখানে যেন জন-প্রাণীটি না যেতে পারে।

—কেউ আসে না তো তার মহলে?

—না, বেগমসাহেবা!

—দেখিস্, নইলে মীর্জা বড় গোসা করবে!

—না বেগমসাহেবা, আমি কোরাণ ছুঁয়ে বলতে পারি কেউ আসে না সেখানে!

—হুঁ, দেখিস, খুব হুঁশিয়ার।

কিন্তু যখন অনেক রাত হয় তখন রাজা রাজবল্লভ কত দিন পীরালির হাতে মোহর গুঁজে দিয়ে ঘসেটি বেগমের ঘরে ঢুকেছে। দিনের পর দিন এক ঘরে বসে এক ডিবেতে পান খেয়েছে, এক গড়গড়ায় তামাক খেয়েছে, তারপর যখন নেশা হয়েছে এক বিছানায় শুয়ে গড়াগড়ি দিয়েছে। তবু কেউ জানতে পারেনি।

মোহরের এমনই মোহ যে পীরালি মহলের দরজায় জোঁকের মত বসে বসে পাহারা দিয়েছে।

কিন্তু মেহেদী নেসারের কথা আলাদা। তাকে মোহর দিতে হয় না। মেহেদী নেসার চেহেল্-সুতুনে এলেই পীরালি খাঁ সসম্ভ্রমে তাকে আদাব দেয়। বলে—বন্দেগী জনাব—

মেহেদী নেসার সেদিন আবার এল। এসেই পীরালিকে ডাকলে।

—একটা কাজ করতে পারবে পীরালি?

—বান্দা জনাবের কোন্ কাজ করেনি?

—না পীরালি, আগেকার জমানার কথা গুলি মারো, এখন জমানা বদলে গিয়েছে। কেউ যেন জানতে না পারে, নানীবেগমও যেন টের না পায়—

—বলুন জনাব, কেউ জানতে পারবে না। জান্ থাকতে বান্দা কাউকে বলবে না, বলেন তো কোরাণ ছুঁয়ে জবান দিতে পারি—

—না না, তোমাকে আমি চিনি, কোরাণ ছুঁতে হবে না, একজন রাণীবিবি আসবে চেহেল্-সুতুনে, তোমার কোনো নতুন মহল খালি আছে?

পীরালি বললে—জনাব, ক'টা খালি মহল বলুন না, ক'টা রাণীবিবি আনবেন?

—ক'টা নয়, একটা। কাফের রাণীবিবি—

পীরালি বললে—কাফের হোক আর মুসলমান হোক, আমার কাছে জনাব সব বিলকুল সমান—বান্দা তামাম দুনিয়ার নোকর—

—কোন্ মহলটা দেবে তাকে?

—কেন জনাব, কাশিমবাজার কোঠির মেমসাহেবদের যে-মহলে রেখেছিলাম, সেই মহলে রাখবো। ওয়াটস্ মেমসাহেব, কলেট মেমসাহেব সবাই তো ওই মহলেই ছিল জনাব—। মহলটার পেছন দিয়ে গুপ্তি সড়ক আছে, বাইরে যাবার—

—কিন্তু একটা বাত্ আছে, নানীবেগমসাহেবা যেন টের না পায়।

পীরালি এবার জবাব দিতে দেরি করলে। নানীবেগমের কাছ থেকে খবর লুকিয়ে রাখা একটু শক্ত। সব দিকেই যেন নানীবেগমের কড়া নজর। নানীবেগম যে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব খবর জেনে নিতে চায়। কোথায় কে রাত্রে কার ঘরে গিয়ে কী ষড়যন্ত্র করছে, কার কীসের কষ্ট, কার কী অসুখ, কী দুঃখ, কে হারেমের ভেতরে লুকিয়ে লুকিয়ে কোম্পানীর সাহেবদের সঙ্গে কারবার করছে, জগৎ-শেঠজীর কাছ থেকে হুণ্ডি কাটছে, সব নানীবেগমের নখদর্পণে। কোরাণ নিয়ে পড়লে কী হবে, সমস্ত চেহেল্-সুতুনটা যেন নানীবেগমের সংসার। কে বেশি মদ খেয়ে বেহুঁস্ হয়ে আছে, কে গোসা করে উপোস করছে, কে রোজার দিন লুকিয়ে-ছাপিয়ে কী খাচ্ছে, তারও খবর চাই নানীবেগমের!

—কিন্তু এ খবর যদি নানীবেগমসাহেবা জানতে পারে তো তোমার নোকরি থাকবে না পীরালি।

—জনাব খোদাবন্দ্, বান্দা তো নবাবের নিমক খায়, নিমক-হারামী কী করে করবে জনাব?

—তা রাণীবিবি তো নবাবের খেদ্মতের জন্যেই আসছে, তুমি যেমন নবাবের খিদ্মদ্গার, বেগমরাও তো খিদ্মদ্গার ছাড়া আর কিছু নয়!

—তা তো বটেই হুজুর। নবাবের খেদ্মত্ করতেই তো বেগমদের পয়দা হয়েছে। খোজাদেরও পয়দা হয়েছে!

—তাহলে সেই কথাই রইলো!

পীরালি জিজ্ঞেস করলে—রাণীবিবি কবে নাগাইদ্ আসবে হুজুর?

—আর দু'তিন রোজের মধ্যেই এসে যাবে। হাতিয়াগড় থেকে আসতে তার বেশি সময় লাগবে না, তারা সেখান থেকে রওয়ানা করে দিয়েছে। আমি খবর পেয়ে গিয়েছি ডিহিদারের কাছ থেকে —

—তাহলে জনাব এক কাজ করুন। কাফের বিবি তো? মস্‌জিদের ইমাম সাহেবকে দিয়ে শুরুতেই কল্‌মা পড়িয়ে আগে মুসলমান বানিয়ে নিন। নাম ভি বদ্‌লে দিন—নাম দিয়ে দিন মরিয়ম বেগম—

—শোহনআল্লা! তোমার তো খুব বুদ্ধি পীরালি—

—তা না থাকলে এতদিন বান্দার ঘাড়ের ওপর শিরটা আছে কেমন করে জনাব?

—তাহলে নানীবেগম যদি জিজ্ঞেস করে, ও কে, কোথা থেকে এল? তুমি কী জবাব দেবে পীরালি?

—আমি বলবো ও মরিয়ম বেগম, লস্করপুরের তালুকদার কাশিম আলির লেড়কী, বেগম বন্‌বার জন্য নবাবের কাছে দরবার করেছিল—

—বহুত্ আচ্ছা, তাহলে এক কাম করো...

কথাগুলো ফিস্ ফিস্ করেই হচ্ছিল, হঠাৎ দেওয়ালের ওপাশে যেন কার গলার আওয়াজ শোনা গেল—উধার কৌন? পীরালি?

—জী বেগমসাহেবা!

একেবারে খাস্ নানীবেগম! কিন্তু ততক্ষণে মেহেদী নেসার জাফরির থামের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেছে। নানীবেগম সাহেবা সারা রাতই হয়তো কোরাণ পড়ে কাটিয়েছে। তারপর মসজিদে গিয়েছিল নমাজ করতে। এখন ফিরছে।

—কার সঙ্গে বাত-চিত করছিলে পীরালি?

—বরকত আলির সঙ্গে বেগমসাহেবা। আজকে রাত-পাহারা ছিল বরকত-আলির, বেত্‌মিজ্‌টা ঘুমিয়ে পড়েছিল তাই বকাবকি করছিলুম। কেউ পাহারায় গ্যাফিলতি করলে মেজাজ শরিফ থাকে?

মনে হলো নানীবেগম যেন খুশ্ হলো কথাটা শুনে।

—আমার মেহেরুন্নিসা সরবৎ খেয়েছে? গোসা কেটেছে মেয়ের?

—খেয়েছেন বেগমসাহেবা। বড্ড গোসা হয়েছিল, আমি বুঝিয়ে-সুজিয়ে খাইয়ে এসেছি। এখন আরামসে ঘুমোচ্ছে দেখে এসেছি—আপনি কিছু ভাববেন না বেগমসাহেবা।

—আর পেশমন? সেই ছোঁড়াটা আসে না তো আর পেশমনের কাছে?

—তাকে তো কোতল করা হয়ে গেছে বেগমসাহেবা! বাঘের ব্যচ্ছাকে কি জিন্দা রাখতে আছে?

তারপর আরো অনেক খবর নিলে নানীবেগম। গোসল্‌মহলে পানি ঠিক আছে কি না, তাক্কিবেগমের তবিয়ত কেমন আছে, আমিনার গয়না খোয়া গিয়েছিল সেটা সে পেয়েছে কিনা, ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক খবর। তারপর খুশী হয়ে নানী-বেগম চলে গেল। আস্তে আস্তে ভোর হচ্ছে। চেহেল্-সুতুনের বাইরে যখন ভোর হয় তখনো এর ভেতরে গভীর রাত, সেই সময়েই নহবতখানার ওপর থেকে ইনসাফ্ মিঞা ভৈরবীর তান ধরে নহবতে। একেবারে উদারার কোমল রেখাব থেকে মোচড় দিতে দিতে কোমল গান্ধার ছুঁয়েই আবার নেমে যায় উদারার সুরে। তারপর আস্তে আস্তে মুদারার কোমল ধৈবত্‌টা একটু খানি ছুঁয়ে এসেই জমে যায় কোমল গান্ধারে। এইরকম করতে করতে ভোর হয়। গঙ্গার ওপারে কাশিমবাজারের দিক

থেকে সূর্যের আলোটা ঠিকরে এসে পড়ে চেহেল্-সুতুনের মীনারের চূড়ায়। তখন নানীবেগমের কোরাণ পড়া শেষ হয়ে গিয়েছে। তখন আড়ামোড়া খেয়ে ঘুম ভাঙে চেহেল্-সুতুনের।

মেহেদী নেসার বাইরে আসতেই খাস-দরবারের কাছেই নেয়ামত্ দৌড়তে দৌড়তে এসেছে।

—হুজুর, নবাব এত্তেলা দিয়েছে।

সে কি! মেহেদী নেসার অবাক হয়ে গেছে। এত সকালেই মীর্জা মতিঝিলে পৌঁছে গেছে?

—নবাব একলা, না আর কেউ আছে?

—হুজুর, সফিউল্লা সাহেব আছে, ইয়ারজান সাহেব আছে, মোহনলালজী আছে, মীরমদন সাহেব ভি আছে—

নেয়ামত্ মতিঝিলের খিদ্‌মদ্‌গার। সে সবাইকে চেনে। কিন্তু এত সকালে তো মীর্জার আসার কথা নয়। চল্, চল্, জলদি চল্। মীর্জার তলব্ মানে যে খোদাতালার তলব্!

—জনাব্, আর একটা বাত্, মীর বক্সীকে যখন নবাব তলব্ দিয়েছে, তখন মালুম হচ্ছে শায়েদ্ লড়াই হবে!

—লড়াই? মেহেদী নেসার ফুঃ শব্দ করলে মুখ দিয়ে। লড়াই হবে কি রে! এখন সবে হাতিয়াগড়ের রাণীবিবিকে এনে মরিয়ম বেগম বানাচ্ছি, এখন লড়াই করতেই দেবো না মীর্জাকে। এখন লড়াই করবার ফুরসৎ কোথায়?

বলে বাইরে দাঁড়ানো পাল্কির ভেতর উঠে বসলো মেহেদী নেসার। বললে—জল্দি হাঁকা—

ছোটমশাই আসার খবর পেয়েই বিশু পরামানিক এসে সকাল থেকে বসে ছিল। এখানকার ভোর হওয়ারও একটা রীতি আছে। সে মুর্শিদাবাদের চেহেল্-সুতুনের ভোর হওয়া নয়। এখানে সমস্ত শান্ত। বড় পুকুরঘাটের ওপর আম-গাছটার ছায়া আস্তে আস্তে হেলে যায় পশ্চিম দিকে। খোলা মাঠময় রোদ ছড়িয়ে পড়ে রাজবাড়ির ছাদে, দরদালানে, খাজাঞ্চিখানায়, কাছারিবাড়িতে, অতিথিশালার উঠোনে, আর পুকুরঘাটের পাথর-বাঁধানো পৈঁঠের ওপর। বিশু পরামানিক বড়-মশাইকে খেউরি করবার জন্যেও ঠিক ওইখানে এসে বরাবর বসে থাকতো। তারপর গোকুলকে দেখলেই জিজ্ঞেস করতো—ও গোকুল, বড়মশাই উঠেছেন নাকি?

তারপর আসতো শোভারাম। গোকুল সরষের তেলের পাথর-বাটি এনে দিত। গামছা, তেল, দাঁতন যোগান নিয়ে শোভারামের অপেক্ষা করে থাকাই কাজ।

খবর এসে গিয়েছিল ছোটমশাই শেষ রাত্রের দিকে বাড়ি ফিরেছেন। দুজনে বসে আছে তো বসেই আছে ঠায়।

বিশু পরামানিক জিজ্ঞেস করে—কী গো শোভারাম, তোমার মেয়ের কিছু হদিস পেলে?

এ-কথা শুনে শুনে আর এ-কথার জবাব দিয়ে দিয়ে মুখ পচে গেছে শোভা-

রামের। তবু মানুষের যেখানটায় ব্যথা সেইখানেই ঘা দেওয়া যেন মানুষের স্বভাব। কেন বাপু, অন্য কথা বললেই হয়। আর কি কোনো কথা নেই?

যে-ক'দিন ছোটমশাই ছিলেন না সে-ক'দিন বিশু পরামানিকেরও এখানে আসতে হয়নি, শোভারামকেও আসতে হয়নি। কোনো ঝঞ্চাটই ছিল না কোথাও। শোভারাম নিজের ঘরের মধ্যে খিল এ'টে পড়ে থাকতো। সেই মরালী পালিয়ে যাবার পর থেকেই এমনি। শুধু আর একদিন গিয়েছিল দুর্গার কাছে। দুর্গা বলেছিল—না বাপু, মেয়েকে তোমার পাওয়া যাবে না শোভারাম, ও দেবের অসাধ্যি—

শোভারাম বলেছিল—তা জলজ্যান্ত মেয়েটা তো আর আকাশে উড়ে যেতে পারে না তাই বলে?

দুর্গা বলেছিল—কেন পারবে না, তুমি বলো না, তোমাকেই আমি আকাশে উড়িয়ে দিচ্ছি বক্-ভৈরবী মন্তর পড়ে—মন্তরের ওপর তোমার অত অচ্ছেদ্দা বলেই মেয়ে তোমার পালিয়ে গেছে, তা জানো—

—তাহলে মন্তর পড়েই আমার মেয়েকে ফিরিয়ে দে দুগ্যা—আমি যে একদণ্ড সুস্থির থাকতে পারছিনে—

এইরকম করেই বলতো রোজ শোভারাম। আর ঠিক তারপরেই সেই কাণ্ডটা ঘটলো। ছোট বউরানীর সঙ্গে পাশা খেলতে খেলতে হঠাৎ বড় বউরানী একেবারে পালঙের তলা থেকে হাতেনাতে ধরে ফেললে মরালীকে!

—এ কে? কে এখেনে?

ছোট বউরানী তখন বেশ ভয় পেয়ে গিয়েছে। বললে—ওর সঙ্গে আমি পাশা খেলছিলুম বড়দি—

বড় বউরানী ধমক দিয়ে উঠলো—ওলো, তা আমি দেখতে পাচ্ছি, আমি এখনো চোখের মাথা খাইনি, কিন্তু কে এ?

দুর্গা ঘরের ভেতর ঢুকে পড়লো। বললে—ওকে কিছু বলো না বড় বউরানী, আমি ওকে নিয়ে এইচি এখেনে, ও বড় দুঃখী!

—তবু সেই এক কথা! আমি জিজ্ঞেস করছি, এ কে, তার জবাব দিবি তো?

দুর্গা তখন বড় বউরানীর পা দুটো জড়িয়ে ধরেছে। বললে—তুমি কাউকে বলতে পারবে না, বড় বউরানী, ও আমাদের শোভারামের মেয়ে, বিয়ের সময় বর পছন্দ হয়নি বলে পোড়ারমুখী আত্মঘাতী হতে যাচ্ছিল, আমিই ওকে এখানে এনে লুকিয়ে রেখেছি, ও-বেচারির কোনো দোষ নেই—ওর কোনো দোষ নেই—

—তা ওর বাপ যদি টের পায়?

—শোভারামকে আমি বলেছি তার মেয়েকে আর পাওয়া যাবে না, পুষ্যা-নক্ষত্রে শ্বেতজয়ন্তীর শেকড় খেয়ে হাওয়ায় উড়ে গেছে—

—রাখ তোর বুজরুকি! ধমক দিয়ে উঠলো বড় বউরানী।

—বুজরুকি নয়, বড় বউরানী, পুষ্যা-নক্ষত্রে শ্বেতজয়ন্তীর শেকড় খেলে সত্যি সত্যি উড়ে যায়—

—থাম তুই! ওর বর কোথায়?

—বরের কাছে ও যাবে না, বর আসতে দেরি হয়েছিল বলে আমাদের অতিথশালা থেকে একটা পাগলা-ছাগলা মানুষের সঙ্গে ওর বিয়ে দিয়ে দিয়েছে ওর বাপ—এখন বাপের কাছে পাঠালেই ওর বাপ সেই পাগলা বরের কাছে পাঠিয়ে দেবে—

বড় বউরানী কী যেন ভাবলে খানিকক্ষণ। একবার ছোটবউ-এর দিকে তাকালে, আর একবার মরালীর দিকে তাকালে। তারপর বললে—এ যে এ-বাড়িতে লুকিয়ে আছে তা কেউ জানে?

—না বড় বউরানী, মা-কালির দিব্যি, বলছি কেউ জানে না। আমি জানি আর ছোট বউরানী জানে!

—ওর নাম কী?

—মরালী। ছোটমশাই ওই নাম রেখেছিলেন ওর—

তারপর একটু থেমে বড় বউরানী বললেন—তাহলে ওকে তুই আমার মহলে পাঠিয়ে দে, তোকে আসতে হবে না—ও একলা আমার ঘরে আসুক—

বলে বড় বউরানী চলে গেলেন। চলে যেতেই মরালী বড় ভয় পেয়ে গিয়েছিল। বলেছিল—কী হবে দুগ্যাদি?

—কী আর হবে! কচুপোড়া হবে। আমি যতক্ষণ আছি ততক্ষণ তোর ভয় কী?

—আমাকে যদি বরের কাছে পাঠিয়ে দেয়?

—ওমনি পাঠিয়ে দিলেই হলো? আমি উচাটন করবো না? তোর কোনো ভয় নেই, তুই যা—

মরালী তবু নড়ে না। বললে—কিন্তু আমার বড় ভয় করছে যে দুগ্যাদি—

—তবে আয়, উচাটন করে দিই—

বলে মরালীকে হাত ধরে কাছে টেনে আনলে। বললে—তোর মাথার একগাছা চুল দেখি—

মরালী দুর্গার সামনে মাথা নিচু করে দাঁড়ালো। দুর্গা তার মাথা থেকে এক-গাছা চুল ছিঁড়ে নিয়ে তাতে কী সব মন্ত্র পড়তে লাগলো। ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় দংষ্ট্রাকরালায় উদ্ধব দাসৈঃ হন্ হন্ দহ দহ পচ পচ উচ্চাটায় উচ্চাটায় হুঁ ফট্ স্বাহা ঠং ঠঃ। মন্ত্রটা অনেকবার বলতে লাগলো বিড় বিড় করে। তারপর সেই একগাছ চুল পুঁটলি পাকিয়ে তার ওপর একদলা থুতু দিয়ে মাথার খোঁপার মধ্যে বেঁধে দিলে।

বললে—যাঃ, উচাটন করে দিলাম। যে তোর ক্ষেতি করতে যাবে তার সব্বোনাশ নিঘ্যাৎ—যাঃ, চলে যা, কিচ্ছু ভয় নেই—আমি উচাটন করে দিয়েছি, আর কীসের ভয় তোর—

বলে ঠেলে ঠেলে নিয়ে গেল বড় বউরানীর মহলের দিকে। ঘরের ভেতর যেতেই বড় বউরানী ঘরের দরজায় খিল লাগিয়ে দিয়েছে।

তারপর যখন সন্ধে হয়ে এসেছে, পুজোবাড়িতে কাঁসর-ঘণ্টা বেজে উঠেছে তখনো ছোট বউরানীর ভয় যায়নি। তখনো ঘর থেকে বেরোয় না কেউ। দুর্গাও ছিল। ছোট বউরানীর জলখাবার এনে দিলে। ছোট বউরানীকে খাইয়ে-দাইয়ে রোজকার মত পা ধুইয়ে আলতা পরিয়ে চুল বেঁধে দিলে, তখনো বড় বউরানীর মহল থেকে কোনো সাড়া শব্দ নেই।

ছোট বউরানী জিজ্ঞেস করলে—কী হলো রে দুগ্যা, মেয়েটাকে খুন করে ফেললে নাকি বড়দি?

—ক্ষেপেছো তুমি? আমি উচাটন করে দিয়েছি না! দেখো তুমি, 'মরি'র কোনো ক্ষেতি কেউ করতে পারবে না—

—এতক্ষণ ধরে কী করছে ঘরের দরজা বন্ধ করে? যদি ওকে ওর বাপের কাছে পাঠিয়ে দেয়? তুই একবার গিয়ে দেখে আয় না—

দুর্গা যাচ্ছিল, কিন্তু ওদিক থেকে তরঙ্গিনীও আসছিল এদিকে। তরঙ্গিনী বললে—ছোট বউরানীকে একবার ডেকে দে তো দুগ্যা—ডাকছে বড় বউরানী—

সেখানেই সেই দিন সেই বন্ধ ঘরের মধ্যে বাঙলা দেশের সেই মেয়ে এক অমোঘ প্রতিজ্ঞা করে বসলো! এর চেয়ে যে সে-মৃত্যু অনেক ভালো। মৃত্যুর মধ্যেও তো ছোট মৃত্যু আর মহৎ মৃত্যু আছে। যে মৃত্যু মহৎ তার কাছে জীবন তো তুচ্ছ। যে-জীবন শুধু খাওয়া-পরা সাজাগোজার নামান্তর, সে জীবন তো মরালীর কাছে বিড়ম্বনা। মৃত্যুই তো সে কামনা করেছিল, বিষ খেয়েই তো সে জীবনকে আত্মসাৎ করতে চেয়েছিল। তার চেয়ে এ যে অনেক বেশি ভালো হলো। যখন একবার ঘর ছেড়ে বেরিয়েছি, তখন সসাগরা পৃথিবীই তো আমার ঘর। আমি ওই অনন্তদিদি আর রাধারানীদিদির মত সংসার করতে যে চাইনি। চাইনি বলেই তো পালিয়ে এসেছিলাম এখানে। এখানেও আমি এমন থাকতে পারতুম না। একদিন আমাকে এখান থেকেও বেরোতে হতো, এখান থেকেও পালাতে হতো। একদিন আমি এই হাতিয়াগড়ের ছাতিমতলায় ঢিবির ওপর ছুটোছুটি করে খেলে বেড়িয়েছি, এখন না হয় পৃথিবীর ঢিবিটার ওপরেই খেলে বেড়াবো। ওরা আমাকে মদ খাওয়াবে? ওরা আমার গায়ে হাত দেবে? ওরা আমাকে গরুর মাংস খাওয়াবে? খাওয়াক না, ওরা তো তাতে আর আমাকে পাবে না, পাবে আর একজনকে, সে মেয়েটা যতই কলমা পড়ুক, তাতে আমি তো আমিই থেকে যাবো। তবু তো মনে মনে জানবো আমি আর একজনকে বাঁচিয়েছি। আর একজনের সুখের কারণ হয়েছি। একদিন বেহুলা যেমন করে তার স্বামীর শব নিয়ে মহাসাগর পাড়ি দিয়েছিল, আমি না হয় আমার শবটা নিয়ে তেমনি করে মহাজীবন পাড়ি দেবো! যদি নিজের এই শবদেহটাকে বেহুলার মত কোনোদিন বাঁচিয়ে তুলতে পারি, সেদিন তো তবু আমার শব-সাধনা সার্থক হবে!

—তাহলে আমার কাছে কথা দে প্রাণ গেলেও কারো কাছে নিজের নাম বলবিনে?

মরালী বললে—এই তোমার পা ছুঁয়ে দিব্যি গালছি বড় বউরানী, প্রাণ গেলেও আমি তোমাদের কাউকেই দায়ী করবো না, এই তোমার পায়ে মাথা ঠেকিয়ে দিব্যি গালছি—

তারপর ছোট বউরানীর দিকে চেয়ে বড় বউরানী জিজ্ঞেস করলেন—আর তুই?

মরালী বললে—কাক-পক্ষীতেও জানতে পারবে না বড় বউরানী আমি মরালী, সবাই জানবে আমি হাতিয়াগড়ের ছোট বউরানী—

—আর ও? ওই মুখপুড়ী?

ছোট বউরানী তখন আঁচলে চোখ ঢেকে কাঁদছে। দুর্গা বললে—ছোট বউরানীকে আমি দেখবো, ছোট বউরানীকে আমি লুকিয়ে রাখবো মন্তর পড়ে—তুমি কিছু ভেবো না বড় বউরানী—

—আবার তোর ওই বুজরুকী?

—বিশ্বাস করো বড় বউরানী। ছোট বউরানীর গায়ে কারো আঁচড় লাগবে না—আমি উচাটন করবো—

—কিন্তু তার আগে ছোটমশাই এলে কী বলবো তাই বল্—ছোটমশাই হয়তো আজই এসে যাবেন—

—তুমি বলো ছোট বউরানীকে তুমি খুন করে ফেলেছো—

—তার মানে?

—তুমি তাই-ই বলো না, তারপর আমি তো আছি—

—যদি জিজ্ঞেস করেন লাস্ কোথায় গেল?

—বলো নদীতে লাস ভাসিয়ে দিয়েছো!

বড় বউরানী রেগে গেল—তা মাথা-মুণ্ডু যা-হোক একটা কিছু বললেই হলো? নবাব টের পাবে না? নবাবের সাগ্‌রেদরা যদি কাউকে বলে দেয়?

—নবাবের হারেমে একবার গেলে কি আর তাকে কাক-পক্ষীতে দেখতে পায় বউরানী! তখন কি আর তার নাম-ধাম কোথাও লেখা থাকে? তখন যে তার কুলুজী পর্যন্ত ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যায়—তখন কি আর কেউ জানতে পারবে যে ও হাতিয়াগড়ের না লস্করপুরের, কোথাকার?

—কিন্তু ছোটমশাইকে ছেড়ে ও-মুখপুড়ী থাকতে পারবে? ও যে একদিন এক বিছানায় শুতে না পারলে হাঁসফাঁস করে—

—তা কিছুদিন একটু কষ্ট করুক না বউরানী, প্রাণের চেয়ে সে তবু তো ভালো।

—কী রে, তুই ছোটমশাইকে ছেড়ে থাকতে পারবি মুখপুড়ী?

মুখপুড়ী তখন চোখে আঁচল চাপা দিয়ে কাঁদছে।

দুর্গা বললে—সে তুমি আমার ওপর ছেড়ে দাও বড় বউরানী, আমি সামলে রাখবো সব—এ-ছাড়া তো আর গতিই নেই—

তারপর সেই রাজবাড়িতে রাত আরো গভীর হয়ে এল। আমগাছটার কোটরে তক্ষক সাপটা কয়েকবার কট্-কট্-কটাস্ করে ডেকে উঠলো। তারপর রাত যখন আরো গভীর হলো, রাজবাড়ির সদর মহলে ডিহিদারের লোক এল পালকি নিয়ে। বড় বউরানী দুর্গাকে ডাকলেন নিঃশব্দে। দুর্গাও ঘুমোয়নি। ছোট বউরানীকে ডেকে আস্তে আস্তে সিঁড়ির নিচের ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে দরজায় চাবি বন্ধ করে দিয়ে এল।

ছোট বউরানী একবার শুধু জিজ্ঞেস করলে—আমি এখেনে কী করে থাকবো দুগ্যা—

—তুমি থাকো না ছোট বউরানী, আমি তো আছি, আমি থাকতে তোমার ভাবনাটা কী!

—কিন্তু কতদিন থাকতে হবে?

দুর্গা বললে—দেখো না, আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি, তুমি যেন আবার কথা-টথা বোল না, ডিহিদারের সেপাইরা চলে যাক্, তখন আমি আবার আসবো—

—ছোটমশাই যদি আজ এসে আমাকে খোঁজে?

দুর্গা রেগে গেল। বললে—তাহলে তুমি চলো, তোমাকেই আমি ডিহিদারের পালকিতে তুলে দিয়ে আসছি—

—না, না, তুই রাগ করছিস্ কেন দুগ্যা? আমি কি তাই বলেছি?

—তা একটা রাত আর আলাদা কাটাতে পারবে না তুমি? তোমার ভালোর জন্যেই তো এ-সব করছি গো!

ছোট বউরানী বললে—যদি ওই মেয়েটা ধরা পড়ে?

—ধরা পড়বে কেন? তার জন্যে তো আমি দায়িক আছি। আমি তো উচাটন করে দিয়েছি ওকে, দেখলে না ওর মাথার চুল ছিঁড়ে থুতু দিয়ে মন্তর

পড়ে দিয়েছি। দেব-নর-গন্ধর্ব কেউ ওর কিছু করতে পারবে না—

—তা আমাকেও তাই কর-না তুই! আমিও বেঁচে যাই তাহলে?

দুর্গা বললে—তা আমি যা বলবো, তাই করবে তুমি?

—তাই করবো রে, তাই করবো। তুই আমাকে বাঁচা!

দুর্গা বললে—তাহলে তুমি একটু বোস, আমি মরালীকে পালকিতে তুলে দিয়ে আসি—

তারপর সেই অন্ধকারের আড়ালে জাহাঙ্গীরাবাদের জরিপাড় শাড়ি-ঢাকা একটি যৌবন এসে পালকিতে উঠলো। কে উঠলো, কেন উঠলো, তা কেউ জানলো না। মাধব ঢালীর পাহারা দেওয়া কাজ, সে শুধু জানলো ভেতর-বাড়ির রানী-মহল থেকে কেউ উঠে চলে গেল। কে গেল, কেন গেল তা প্রশ্ন করা পাহারাদারের কাজ নয়। রাজা-রানীর ব্যাপারে মাথা ঘামানো তার কাজ নয়। দুর্গা যখন নিজে এসেছে, তখন কৌতূহল প্রকাশ করা তার এক্তিয়ারের বাইরে।

আর ঠিক তার কিছুক্ষণ পরেই আবার ছোটমশাই এসে হাজির।

গোকুলকে দেখেই ব্যাপারটা বুঝে নিয়েছিল মাধব ঢালী। সিং-দরজাটা ফাঁক করে পাশে দাঁড়িয়ে সেলাম করলে।

—সরে দাঁড়া না, দেখছিস্ ছোটমশাই এসেছেন!

ছোটমশাই ভাবতে ভাবতেই আসছিলেন সারা রাস্তা। মাধব ঢালীকে দেখেই আর কৌতূহল চাপতে পারলেন না। জিজ্ঞেস করলেন—কেমন আছিস সব?

—আজ্ঞে, ভালো ছোটমশাই।

—কোনো গণ্ডগোল-টণ্ডগোল ঘটেনি তো?

—আজ্ঞে, গণ্ডগোল হবে কেন? আমি আছি কী করতে?

এর পরে আর দাঁড়ালেন না। গোকুলের পেছন-পেছন ভেতরে ঢুকে গেলেন। আসবার সময় বদরগঞ্জের কাছে ডাকাতের উৎপাতের ভয় ছিল। তাই তাড়াতাড়ি বজরা চালিয়ে আসতে বলেছিলেন। বাড়ির ভেতর ঢুকে যেন নিশ্চিন্তির নিঃশ্বাস ফেললেন একটা। তখনো কেউ জাগেনি। ছোটবউএর মহলের দিকটায় অন্ধকার। ওদিকে পরে গেলেই চলবে। তার আগে বড়বউকে খবরটা দেওয়া দরকার। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র নিজে কালীঘাটে যাচ্ছেন, গিয়ে একটা কিছু ব্যবস্থা করবেন কথা দিয়েছেন।

বড়বউয়ের ঘরের সামনে গিয়ে দরজায় ধাক্কা দিলেন—বড়বউ, বড়বউ—আমি...

ওদিকে কালীঘাটের মন্দিরের ঘাটেও রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের বজ্‌রা এসে ভিড়েছে। এখানে পুজোর ভিড় লেগেই আছে। শুধু কালীঘাটে নয়। মন্দির আরো আছে। সেখানেও লোকেরা পুজো দেয়। রাত যখন গভীর হয়, চিৎপুরের খালটা পেরিয়ে পেরিন সাহেবের বাগানটা ছাড়িয়ে আরো দূরে

অন্ধকারের মধ্যে কারা যেন নিঃশব্দে কালীমন্দিরটায় গিয়ে ঢোকে। অন্ধকারের মধ্যেই তারা হাঁড়িকাঠের সামনে কাকে যেন ধরে নিয়ে আসে। গঙ্গাজল এনে তাকে স্নান করায়। টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করবার উপায় থাকে না তার। চোখ মুখ কান নাক কাপড়ের ফেটি দিয়ে বাঁধা। তারপর যখন সব শেষ হয়ে যায়, সবাই রক্তের ফোঁটা কপালে লাগিয়ে বেরিয়ে পড়ে। চণ্ডালের রক্ত। হাতে থাকে শড়কি বল্লম বর্শা আর রণ-পা। ঘোড়ার চেয়েও জোরে ছুটে চলে তারা সেই রণ-পা দিয়ে। তারপর সকালের সুতোনুটির লোক অবাক হয়ে দেখে কাণ্ডকারখানা। চিত্রেশ্বরী মন্দিরের মধ্যে সকালবেলা পুজো দিতে গিয়ে সাত হাত পেছিয়ে আসে পুরোহিত। নরবলি। নরবলিতে শান্ত হবার বদলে মায়ের জিভ্ আরো লক্ লক্ করে ওঠে। ফিরিঙ্গীদের সেপাই শান্ত্রী আরো তৎপর হয়ে ওঠে। পেরিন সাহেবের বাগানের বাদুড় আর চামচিকেরা আরো কিচ্‌মিচ্ করে ওঠে।

কিন্তু সকাল হলেই আবার অন্য দৃশ্য। সাহেবরা যখন পুজো দিতে আসে তখন বড় জাঁকজমক হয়। সেদিন গণ্ডা-গণ্ডা পাঁঠা বলি হয়। পেসাদের পুষ্পবৃষ্টি লেগে যায়। চিৎপুরে কালীঘাটে পাণ্ডাদের পাড়ায় হাঁক-ডাক পড়ে যায়। এ-পাড়া ও-পাড়া সরগরম হয়ে যায়। চেতলা থেকে গঙ্গা পেরিয়ে সাঁতরে সবাই ও-পারে গিয়ে হাজির হয়।

—কীসের পুজো গো? কীসের পুজো?

সাহেবরা পুজুরিদের ডেকে গণেশ পুজো করে, সরস্বতী পুজো করে। গোবিন্দপুর সুতোনুটির লোক সে-প্রসাদ ভক্তিভরে মাথায় ছুঁইয়ে খায়। বলে—বেঁচে থাকো বাবা কোম্পানীর সাহেব, অক্ষয় পেরমায়ু হোক সাহেব-কোম্পানীর—

কিন্তু এবার আরো জাঁক। এবার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র এসেছেন কেষ্টনগর থেকে মায়ের পুজো দিতে। সঙ্গে সাত-সাতটা বজ্‌রা। এক হাজার পাঁঠা বলি হবে। বহুদিন আগে মহারাজার মানত্ ছিল, তারই উদ্‌যাপন। দান-ধ্যান-দক্ষিণার ছড়াছড়ি হবে। যে যত পারো কুড়িয়ে নাও। সঙ্গে সবাই এসেছে। রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র এসেছেন, গোপাল ভাঁড় মশাই এসেছেন। কিন্তু মহারাজ তবু নিশ্চিন্ত হতে পারছেন না। কালীপ্রসাদ সিংহ তখনো আসেননি। বার বার খবর নিচ্ছেন তাঁর।

বেলা পুইয়ে যখন তিন প্রহর তখন কালীপ্রসাদ সিংহ এলেন। মুর্শিদাবাদ থেকে সোজা নদীপথে এসে হাজির।

মন্ত্রীকে দেখেই আড়ালে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন—কী খবর?

—খবর খুব খারাপ শুনে এলুম। আপনার কথা সব বুঝিয়ে বলে এলুম। বললুম—ইংরেজদের সাহায্যটা বড় কথা নয়, যদি মীরজাফর দলে থাকে সত্যি সত্যি তবেই ভরসা—

—শুনে শেঠজী কী বললেন?

—শেঠজী বললেন, মীরজাফরকে অপমান করেছে নবাব, সে দলে থাকবেই।

—কী অপমান করেছে?

—মীরজাফরকে নবাব হুকুম দিয়েছিল মোহনলালকে দেখলেই সেলাম করতে হবে!

শুনে মহারাজ কী যেন ভাবতে লাগলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন—আর হাতিয়াগড়ের জমিদার? তাঁর সেই খবরটা সত্যি?

—সত্যি বলেই তো শুনলুম। শুনলুম, ডিহিদারের লোক গিয়ে তাঁর

দ্বিতীয়পক্ষের বউকে নাকি নিয়ে এসেছে—

—নিয়ে এসেছে মানে?

—মানে, খবর পেলুম তাদের বজরা নাকি এতক্ষণে কাটোয়ায় পে'ৗছে গেছে—

মহারাজ গম্ভীর হয়ে গেলেন আরো। তারপর একটু চুপ করে থেকে বললেন—তুমি এক কাজ করো, উমিচাঁদকে খবর দাও যে, আমি এখানে এসে গেছি, আর রাজবল্লভ সেনকেও একবার দেখা করতে বলো আমার সঙ্গে—দেখো, খুব সাবধানে যাবে, কেউ যেন টের না পায়—

দু'টো নদী এসে মিশেছে কাটোয়াতে। একদিকে অজয় আর একদিকে গঙ্গা। ডিহিদারের বজরাটা এসে দাঁড়ালো। এখান থেকে পালকিতে যেতে হবে। ডিহিদারের বজরা আবার খালি ফিরে যাবে ডিহিদারের কাছে। এবার আবার নতুন সেপাই, নতুন বন্দুক নিয়ে এসে হাজির হয়েছিল নতুন ডিহিদার।

কিছু কিছু লোক বজ্‌রা থেকে মেয়েমানুষ নামতে দেখে ভিড় করেছিল। ডিহিদারকে দেখে তারা সরে গেল।

তারপর সরাইখানার ভেতরে রাণীবিবি ঢুকে গিয়েছিল। সে এক অস্বস্তিকর অবস্থায় কেটেছে। নদীর ঘাটে, রাস্তায় যে দেখেছে সে-ই কেবল জিজ্ঞেস করেছে—পালকিতে কাদের বউ যাচ্ছে গো?

কান্ত কোনো উত্তর দেয়নি। সেপাইরা, পালকির বেহারারাও কোনো উত্তর দেয়নি। হাতিয়াগড় থেকে বেরিয়ে সমস্তটা রাস্তা ঘুম হয়নি কান্তর। সরাই-খানার একদিকটা জেনানা-মহল, আর একদিকটা মর্দানাদের জন্যে। বোরখাপরা বাঁদীর ব্যবস্থাও করে রেখেছিল কোতোয়াল সাহেব। আগে দেখেছিল শুধু রাণীবিবির একটা পায়ের গোছ। পালকি থেকে নামবার সময় দেখা গোছ। কিন্তু আজ পালকি থেকে নামবার সময় দেখা গেল মুখখানা। পালকি থেকে মাথা নিচু করে নামতে গিয়েই ঘোমটাটা খসে গিয়েছিল মাথা থেকে। কাটোয়ার সেই খাঁ খাঁ দুপুরের রোদে মুখখানা বুঝি আরো লাল হয়ে গেছে।

হঠাৎ বাঁদীটা এসে ডাকতেই কান্ত অবাক হয়ে গিয়েছিল। ধড়মড় করে বসে জিজ্ঞেস করেছিল—আমাকে ডেকেছেন? কেন?

—তা জানিনে হুজুর।

—তুমি ঠিক বলছো?

—জী হাঁ।

তারপরে পেছন-পেছন গিয়ে যেখানে পে'ৗছুলো সেখানে আর কেউ নেই। ঘরের মধ্যে একটা গাল্‌চের ওপর রাণীবিবি একা বসে ছিল। কান্ত দরজার সামনে গিয়ে বললে—আপনি আমায় ডেকেছেন?

রাণীবিবি পানের ডিবেটা হাতে তুলে নিয়ে বললে—হ্যাঁ, কাল রাত্তিরে আমাকে ডাকছিলেন কেন?

কান্ত বললে—ডাকতুম না, আপনি আরাম করে ঘুমোচ্ছিলেন, আমার ডাকতে সত্যিই ইচ্ছে হচ্ছিল না, কিন্তু আমার ভয় হচ্ছিল হয়তো ডাকাত পড়বে, বদর-গঞ্জের কাছে খুব ডাকাতির ভয় কিনা—তাই আপনাকে ডেকেছিলুম—

—ডাকাত? ডাকাতের কথা শুনে রাণীবিবি যেন একটু হাসলেন।

—আপনি হয়তো বিশ্বাস করছেন না, কিন্তু সত্যিই আমি বড় ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম—

—কিন্তু ভয় পেয়েছিলেন কার জন্যে? আমার জন্যে না আপনার জন্যে?

এর উত্তর দিতে গিয়ে কান্ত একটু বিব্রত হয়ে পড়লো। বললে—আপনার জন্যে!

রাণীবিবি হাসতে হাসতেই বললেন—আমার জন্যে? আমার আবার ভয় কী? আমি তো এক ডাকাতের হাতেই যাচ্ছি, তার বদলে না-হয় বদরগঞ্জের ডাকাতের হাতেই যেতাম। আমার কাছে মুর্শিদাবাদের ডাকাতও যা, বদরগঞ্জের ডাকাতও তাই—। বদরগঞ্জের ডাকাতরা কি আর বেশি খারাপ—

কান্ত কথাটার ইঙ্গিত বুঝলো।

বললে—দেখুন, আপনি হয়তো আমাকেও সেই ডাকাতদের দলে ফেলেছেন, কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমি শুধু হুকুম তামিল করতে এসেছি, আমার মাত্র সাত দিনের চাকরি, পেটের দায়ে আমাকে এই চাকরি নিতে হয়েছে—আগে জানলে আমি এ কাজ নিতুমই না, কাল সারা রাত আমি কেবল এই কথাই ভেবেছি—

—কেন? আপনি ঘুমোননি? সারা রাত জেগে ছিলেন?

কান্ত বললে—ঘুম যে এল না, আমি কী করবো? আমার কেবল মনে হচ্ছিল ক'টা টাকার জন্যে আমি হয়তো আপনার সর্বনাশ করছি—

রাণীবিবি পানের ডিবেটা খুলে একটা পান তুলে নিলেন।

কান্ত আবার বললে—ফিরিঙ্গী কোম্পানীর চাকরিটা থাকলে, আমি সত্যি বলছি, এ চাকরিটা নিতুম না। তা ছাড়া আমার তো আর কেউ নেই যে, তার কাছে গিয়ে থাকবো! এক বুড়ি দিদিমা ছিল, বর্গীদের হাতে সে-দিদিমাও মারা গিয়েছে, তাই আমার এ চাকরি নেওয়া ছাড়া কোনো উপায়ই ছিল না—

তারপর একটু থেমে বললে—আমার কথায় যদি বিশ্বাস না হয় তো আর কাউকে জিজ্ঞেস করতে পারেন! বশীর মিঞা সব জানে!

—বশীর মিঞা? সে কে?

—নিজামতের চর, সে-ই তো আমাকে এ চাকরিটা করে দিলে। কিন্তু আপনি মেয়েমানুষ, জিজ্ঞেস করবেনই বা কী করে। নইলে জানতে পারতেন আমার কথা সত্যি কি না। সে সব জানে! তাকে জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারতেন, আমি বেভারিজ সাহেবের সোরার গদিতে মুন্সির কাজ করতাম, তিন টাকা মাইনে পেতাম, আমার নামও জানে সে, আমি মুসলমান নই, হিন্দু। আমরা বড়-চাতরার সরকার, আমার বাবার নাম ঈশ্বর শশধর সরকার, আমার নাম কান্ত সরকার—

—কী নাম?

কান্ত আবার বললে—কান্ত সরকার—

সঙ্গে সঙ্গে রাণীবিবির হাত থেকে পানের ডিবেটা পাথরের মেঝের ওপর পড়ে ঝন্ ঝন্ আওয়াজ করে উঠলো। কান্তর মনে হলো কাছাকাছি কোথাও কেউ তার নামটা শুনে আর্তনাদ করে উঠলো যেন।

সরাইখানার সামনে তখন বেশ ছায়া-ছায়া। সোজা কেষ্টনগর থেকে হাঁটতে হাঁটতে সেদিন উদ্ধব দাস সেখানে এসে হাজির। উদ্ধব দাসের এই-ই নিয়ম।

যখন যেখানে থাকে সেখানেই তার ঘর। গাছতলাই হোক আর একটা বোষ্টমদের আখড়াই হোক, কিংবা রাজবাড়ির অতিথিশালাই হোক, একটা কিছু হলেই হলো। না-হলেও কিছু আসে যায় না। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র একবার বলেছিলেন—উদ্ধব, একটা চাকরি নেবে নাকি হে—

উদ্ধব বলেছিল—চাকরি তো করি আমি মহারাজ—

—তার মানে?

উদ্ধব বলেছিল—আমি আপনার এখানে পড়ে থাকি বলে আপনি কি ভাবেন আমি বেকার? আমি যেখানে যাবো সেখানেই সবাই আমার গান শুনে আমায় ঠাঁই দেবে—

—তা নয়, আমার কাছে চাকরি করলে তোমাকে আর চিরকাল এরকম টো-টো করে ঘুরে বেড়াতে হবে না—এই দেখ না, ভারতচন্দ্রকে রায়গুণাকর উপাধি দিয়েছি, মুলাজোড়ে ছ' শো টাকা আয়ের সম্পত্তি ইজারা দিয়ে দিয়েছি, সে আয়েস করে পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে বসে বিদ্যাসুন্দর লিখেছে, অন্নদামঙ্গল লিখেছে—

উদ্ধব বলেছিল—কিন্তু আমি তো আপনার খোসামোদ করতে পারবো না ভারতচন্দ্রের মত—

—তা ভারতচন্দ্র কি আমায় খোসামোদই করে বলতে চাও?

—না করলে তার চাকরি আছে কী করে? আপনি তো আর মিছিমিছি তাকে তার গুণ দেখে উপাধি দেননি!

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র মজা পেয়ে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন—শুধু গুণের বুঝি কদর নেই?

—আজ্ঞে আপনি নিজেই তা ভালরকম জানেন, দিল্লীর বাদশার খোসামোদ না করলে কি আপনিই মহারাজ হতে পারতেন?

—তুমি তো বড় মুখফোঁড় হে!

—না হুজুর, আমি যার কাছে চাকরি করি, তাকে খোসামোদ করতে হয় না, খোসামোদ না করেই আমি উপাধি পেয়েছি একটা।

—তোমার আবার উপাধি আছে নাকি? তাজ্জব কথা তো! কী উপাধি?

—আজ্ঞে, আমার উপাধি ভক্ত-হরিদাস!

—তোমার মালিক কে?

উদ্ধব দাস এবার গান গেয়ে উঠলো—

> ঐ দেখ শ্যাম-নবঘন উদয় গগনে।
> এলেন আমার জগবন্ধু রথ-আরোহণে॥
> ঐ-পদে রেখেছে মতি, ব্রহ্মা ইন্দ্র পশুপতি।
> ভবভার্যা ভাগীরথীর জন্ম ঐ চরণে॥
> গলে বনফুল হার, শিরে শিখিপুচ্ছ যার,
> দ্বিভুজ মুরলীধর পীতবাস পরণে॥

গান থামিয়ে উদ্ধব দাস বললে—শুনলেন তো প্রভু, আমার মালিক কে? সেইজন্যেই আমি কারো কাছে কিছু চাই না প্রভু, চাইলে চাই মুগের ডাল, কিংবা পান্তা ভাত, কি একদলা নুন—

যেখানে যেত উদ্ধব দাস, সেখানেই এই রকম রসের কথা বলতো। খলু সংসারে কে কাকে কী দিতে পারে গো! তোমরা সবাই খেতাব চাও, মনসবদারী চাও, টাকা চাও, মেয়েমানুষ চাও, আর আমি কিছুই চাই না। চাইলেই দুঃখ, না-চাইলেই

সুখ। আমি কিছুই চাই না, তাই সব পাই। তোমরা সব কিছু চাও বলেই তোমাদের কষ্টের আর শেষ নেই।

মোল্লাহাটির মধুসূদন কর্মকার বলেছিল—তাহলে তুমি বিয়ে করতে গেলে কেন দাস মশাই?

উদ্ধব দাস বলেছিল—মতিভ্রম ভায়া, মতিভ্রম—

—তা তোমার কষ্ট হয় না মাগের জন্যে!

—হয় বৈ কি!

—কী-রকম কষ্ট হয়?

উদ্ধব দাসের তখনি আবার ছড়া পেয়ে যায়। বলে—তবে শোন হে ভায়া—

বিষয়-শূন্য নরবর, বারি-শূন্য সরোবর, বস্ত্র-শূন্য বেশ।
দেবী-শূন্য মণ্ডপ, কৃষ্ণ-শূন্য পাণ্ডব, গঙ্গা-শূন্য দেশ॥
জল-শূন্য ঘট, শিব-শূন্য মঠ, ব্যয়-শূন্য কাণ্ড।
নাড়ী-শূন্য দেহ, নারী-শূন্য গেহ, কর্পূর-শূন্য ভাণ্ড॥
শিকল-শূন্য তালা, ভজন-শূন্য মালা, দৃষ্টি-শূন্য নয়ন।
ভূমি-শূন্য রাজার রাজ্য, বিদ্যা-শূন্য ভট্টাচার্য, নিদ্রা-শূন্য শয়ন॥

ছড়াটা বলেই উদ্ধব দাস হো-হো করে হেসে উঠলো। বললে—দেখলে তো, আমি খোসামোদ করিনে তাই, নইলে আমিও রায়গুণাকর হতে পারতাম গো। আমারও বিদ্যে আছে—

তারপর হঠাৎ পোঁটলাটা বগলে নিয়ে উঠে বললে—যাই গো—অনেক দূর যেতে হবে—

—কোথায় যাবে, এত সকালে?

—যেখানে দু'চোখ যায়। শ্বশুর বাড়ি নেই বলে কি খলু সংসারে যাবার জায়গার অভাব আছে ভায়া?

সেই হাঁটিতে হাঁটিতেই এখানে এসে পড়েছিল উদ্ধব দাস। এই কাটোয়ার সরাইখানার সামনে। তখন সরাইখানার সামনে সেপাই দুটো গাছতলায় খেয়ে-দেয়ে জিরোচ্ছে। বন্দুকটা পাশে রেখে সেপাই দুটো মাটিতে চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়েছে।

উদ্ধব দাসের পেট তখন ক্ষিদেয় চোঁ চোঁ করছে। বললে—কী গো, সেপাই-বাবাজীবন, কার পালকি? কোন্ বিবিজান চলেছে?

সেপাইরা উদ্ধব দাসকে চিনতো। বেশ মানুষ। গান না শুনতে চাইলেও গান গাইবে, কিংবা ছড়া কাটবে, হেঁয়ালি বলবে। খেতে দাও আর না-দাও ভ্রূক্ষেপ নেই। উদ্ধব দাস কাউকে ভ্রূক্ষেপ করে না। তার কাছে রাজা-মহারাজ নবাব-বাদশাও যা, রাস্তার বোষ্টম ভিখিরিও তাই। একেবারে বলা-নেই কওয়া-নেই সটান তাদের মধ্যেই বসে পড়ে বললে—একটা নতুন গান বানিয়েছি—শোন—

বলে আরম্ভ করলে—

আমি রবো না ভব-ভবনে
শুন হে শিব শ্রবণে॥
যে-নারী করে নাথ হৃদিপদ্মে পদাঘাত
তুমি তারি বশীভূত আমি তা সৈবো কেমনে।

একজন সেপাই বলে উঠলো—আরে দাসমশাই যে আবার খেদের গান গাইছে, কেউ বুঝি তোমার বুকে লাথি মেরেছে গো?

আর একজন বললে—তা জানিস না বুঝি, ওর বউ যে বাসরঘর থেকে পালিয়ে গেছে!

—তাই নাকি? তারপর? তারপর?

পতিবক্ষে পদ হানি ও হলো না কলঙ্কিনী
মন্দ হলো মন্দাকিনী ভক্ত হরিদাস ভণে।

গান তখন বেশ জমে উঠেছে। সেপাইরা শুনছে আর হাতে তাল দিচ্ছে। আশেপাশের গাঁয়ের লোকও জুটেছে। পাল্কি-বেহারারাও জুটেছে। কান্ত ঠিক সেই সময়ে এসে হাজির হলো। রাণীবিবির ঘরে এতক্ষণ কথা বলতে বলতেই গানটা কানে গিয়েছিল। গানের সুরটা কানে যেতেই হয়তো রাণীবিবি একটু গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল। বলেছিল—দেখে আসুন তো কে গান গাইছে ওখানে?

—বেড়ে গান বানিয়েছো তো দাস-মশাই! তা তোমার বউ পালালো কেন হে?

কান্তর কানে কথাটা গিয়েছিল। সোজা গিয়ে জিজ্ঞেস করলে—কার বউ পালিয়েছে বললে সেপাইজী?

উদ্ধব দাস হাসতে হাসতে বললে—আমার আজ্ঞে!

সেপাইটা তার আগেই বললে—হুজুর, ও পাগলা-ছাগলা লোক, ও গিয়েছে বিয়ে করতে! তা ওর বউ পালাবে না তো কার বউ পালাবে!

উদ্ধব দাস হাসতে হাসতে বললে—তা পালিয়েছে বেশ করেছে, আমার বউ পালিয়েছে তো তোমাদের কী? বউ না পালালে কি এমন গান বাঁধতে পারতুম?

কান্ত জিজ্ঞেস করলে—কোথায় বিয়ে করতে গিয়েছিলে তুমি?

—আজ্ঞে হাতিয়াগড়ে!

হাতিয়াগড়ের নামটা শুনেই কান্তর বুকটা ধক করে বেজে উঠলো!

—আমি কি বিয়ে করতে গিছলাম বাবাজীবন, আমি গিছলাম রাজবাড়ির অতিথশালায় দুটো খেতে আর হাতিয়াগড়ের ছোটরানী আছেন, তাঁকে দুটো রসের গান শোনাতে!

—হাতিয়াগড়ের ছোটরানী?

কান্ত আরো অবাক হয়ে গিয়েছে। যেন এক মুহূর্তে উদ্ধব দাস কান্তর একান্ত আপন লোক হয়ে গেল। কান্ত এবার আরো কাছে সরে এল। তারপর উঁচু হয়ে সামনে বসে পড়লো। বললে—ছোটরানী বুঝি রসের গান শুনতে ভালবাসে?

—খুব ভালবাসে! রসের গান শুনতে কার না ভালো লাগে আজ্ঞে! আমি রসের গান শুনিয়ে ছিলুম—পীরিতের কথা আর বোল না,—দ্বিতীয় পক্ষের রানী যে! বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা যে, ও কম্মে তো ঢুঁ-ঢুঁ, তাই কেবল রসের গান শুনেই পেট ভরায়—

—তুমি দেখেছো ছোটরানীকে?

—আমি কী করে দেখবো আজ্ঞে, আমি যে অতি দীন-হীন ব্যক্তি—

বলেই হঠাৎ গান গেয়ে উঠলো—

আমি মা অতি দীন, তনু ক্ষীণ, হলো দশার শেষ।
কোন্ দিন মা রবি-সুতে ধরবে এসে কেশ।

কান্ত ততক্ষণে অধীর হয়ে উঠেছে। বললে—তোমার গান থামাও, আমার কথার উত্তর দাও আগে—ছোটরানীকে তুমি দেখেছো?

—দেখিনি, হরিপদর কাছে ছোটরানীর কথা শুনিচি।

—কী শুনেছো?

উদ্ধব দাস সেই সব পুরোন কথা বলে গেল। হরিপদর কাছেই কথাগুলো শোনা। চাকদহর শ্রীনিবাস মুখুটির একমাত্র মেয়ে রাসমণি! ছোটমশাই বজ্‌রায় করে যাচ্ছিলেন। এমন সময় বড় বউরানীর নজর পড়লো ঘাটের দিকে। ঘাটে তখন চান করছিল রাসমণি। মা নেই, ভাই নেই, বোন নেই। সংসারে আপন বলতে আর কেউ নেই। সেই বউ শ্বশুর-বাড়ি এসে পর্যন্ত আর বাপের বাড়ি যেতে পায়নি। বাপ শ্রীনিবাস মুখুটি মেয়ের বিয়ের পরই মারা গিয়েছিল। তারপর সেই যে ছোটরানী হাতিয়াগড়ের রাজবাড়িতে এসে ঢুকলো, আর বেরোতে পারেনি। একবার শুধু কী সখ হয়েছিল, ছোটমশাই-এর সঙ্গে মুর্শিদাবাদে গিয়েছিল নবাবের নাতির বিয়েতে। সেই তখন থেকেই দুর্গা আছে সঙ্গে। দুর্গাই চুল বেঁধে দেয়, দুর্গাই ছোটরানীকে পুতুলের মত দিনরাত সাজাতো-গোজাতো।

দুর্গা ছোটরানীর চুল বাঁধতে বাঁধতে বলতো—কী চুলই হয়েছে তোমার বউ-রানী, যেন মেঘ, মেঘলা চুল তোমার—

পিঠের ওপরের কাপড়টা সরে যেতেই দুর্গা একদিন বললে—ওমা, দেখি দেখি, পিঠে তোমার দাগ কীসের বউরানী?

ছোটরানী খিল্ খিল্ করে হেসে উঠেছিল। বলেছিল—ও আর তোকে দেখতে হবে না, তুই চুল বাঁধ—

—ওমা, এ যে দাঁতের দাগ গো!

ছোট বউরানী হাসছে দেখে দুর্গা বলেছিল—ছোটমশাই কি তোমার পিঠেও দাঁত বসায় নাকি গো?

ছোট বউরানী বলেছিল—তোর ছোটমশাই-এর গুণের ঘাট নেই তো—

দুর্গা বলেছিল—আহা, তুমি আদর চেইছিলে, জন্ম-জন্ম এমন আদর পাও তুমি বউরানী! সোয়ামীর আদর কি যে-সে জিনিস গো, বলে সোয়ামী হেন জিনিস যে হতভাগী পায়নি সে এর কদর কেমন করে বুঝবে বলো—

বউরানী বলেছিল—মোটে ঘুমুতে দেয় না রে তোর ছোটমশাই, এমন বজ্জাতি করে—

—আহা, তা না-ই বা দিলে ঘুমোতে, এয়োতী মানুষ, মেয়েমানুষের আর কী চাই?

—তা ঘুম না হলে মানুষ বাঁচে? তাই তো সকালবেলা গা ম্যাজ্ ম্যাজ্ করে, উঠতে পারিনে বিছানা ছেড়ে—

কান্তর শুনতে খুব ভালো লাগছিল। বললে—তারপর?

—আজ্ঞে, হরিপদর তো কোনো কাজ নেই, আমি অতিথশালায় গেলেই আমার কাছে এসে গল্প করতো। আমি বলতাম—বাড়ির ভেতরের গল্প আমার কাছে কেন করো বলো তো? তা হরিপদ বলতো—দুগ্যা যে আমাকে সব এসে বলে গো, আর শুনে কারো কাছে তো বলা চাই! তা ওই সব শুনতুম আর রসের গান বাঁধতুম! কিন্তু একদিন নিজেই বাঁধা পড়ে গেলুম—

সেপাইরা এ-গল্প আগেই শুনেছিল। কান্ত জিজ্ঞেস করলে—কী রকম?

—সে এক কান্ড প্রভু। একদিন ছোটমশাই-এর নফর শোভারামের মেয়ের বিয়ে। বর আসবার কথা ছিল কলকাতা থেকে, সে বর ঠিক সময়ে আসতে পারেনি।

—কেন? আসতে পারেনি কেন?

উদ্ধব দাস বললে—না এলে যে আমার সর্বনাশ হয় তাই আসতে পারেনি!

আমি ঘুমোচ্ছিলাম অতিথ্শালার দাওয়ায়, সে-ই আমাকে এসে ডেকে নিয়ে গিয়ে সেই মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিলে সেই রাত্তিরে—! কপালের গেরো না থাকলে এমন সর্বনাশ হয় কারো প্রভু?

—তা তুমি তাকে বিয়ে করলে?

—আজ্ঞে, সে প্রভু ওই নামে মাত্তোরই বিয়ে। সম্প্রদানটাই শুধু হলো, তারপর বাসর-ঘরে একপাল মেয়ের মধ্যে বসে আছি, আমাকে প্রভু তাঁরা সবাই বললে কি ন্যা বউকে কোলে করতে—

—তারপর? তুমি কোলে করলে নাকি?

উদ্ধব দাস বললে—আজ্ঞে প্রভু, আমি তখন ভাবছি, কার ভোগ্য জিনিস কে ভোগ করবে! অমন সুন্দর বউ কি বাঁদরের গলায় মানায় প্রভু? আপনিই বলুন?

—তা তুমি কোলে করলে কি না তাই বলো না!

—কোলে করবো কী করে আজ্ঞে, তার আগেই দেখি কি বউ তখন হাপুস নয়নে কাঁদছে গো—

—কাঁদছে? কাঁদছে কেন?

—প্রভুই জানে কেন কাঁদছে। ওই কান্না দেখে কি আর তখন বউকে কোলে করতে কারো ইচ্ছে করে আজ্ঞে? আমারও তো মন বলে একটা পদার্থ আছে! কান্না দেখে আমার বড় মায়া হলো প্রভু! আবার লোভও হলো!

—লোভ হলো কেন?

—আজ্ঞে, লোভ হবে না? আমি কুচ্ছিত হলে কী হবে, আমারও তো কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য আছে! অমন গোলাপ ফুলের মত বউ পাশে বসে কাঁদবে আর আমি চুপ করে দেখবো? আমার বুঝি কান্না আসতে নেই?

উদ্ধব দাস জীবনে কখনো কাঁদে না। কথা বলতে বলতে তারও হয়তো চোখ দুটো ছল্ছল্ করে উঠছিল। হঠাৎ হেসে ফেললে। বললে—আমি তখন মনে মনে ওই গানটা বাঁধলুম আজ্ঞে—আমি রবো না ভব-ভবনে—

—তারপর?

—তারপর প্রভু, ভাবলুম আমাকে পছন্দ হয়নি বউএর। আমাকে তো আজ্ঞে কারোরই পছন্দ হয় না, আমার পছন্দ হবারই কিছু নেই। আবার ভাবলুম হয়তো কলকাতার বরের জন্যে মন-কেমন করছে—

—কেন? কলকাতার বরকে বুঝি ভালো দেখতে?

—আমার চেয়ে সবাইকে ভালো দেখতে প্রভু! আমি কি মানুষ আজ্ঞে, আমার না আছে চাল, না আছে চুলো। আমি মানুষই নই। তাই বউটা পালিয়ে যাবার পরই প্রভু আমি রাস্তায় বেরিয়ে পড়লুম। সোজা কেষ্টনগরে গিয়ে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় গেলুম। শিবনিবাসে নিয়ে গেলেন মহারাজ—বললেন, চাকরি নেবে তুমি উদ্ধব দাস? আমি বললুম—আমার বউ পালিয়ে গেছে, চাকরি আমি কার জন্যে নেবো প্রভু? কার জন্যে দাস-বৃত্তি করবো। সেখানে গিয়ে গোপাল ভাঁড় মশাইকে হেঁয়ালিতে হারিয়ে দিলুম, রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র আমার ছড়ার তারিফ করলেন। আমাকে মহারাজ জিজ্ঞেস করলেন—তুমি কী চাও উদ্ধব! আমি বললুম—মুগের ডাল—

সেপাই দুজন হো হো করে হেসে উঠেছে।

—তুমি মহারাজের কাছে কিনা চাইতে গেলে মুগের ডাল? আর কোনো দামী চিজ্ চাইতে পারলে না দাসমশাই?

উদ্ধব দাস বললে—আমার কাছে সেপাইজী মুগের ডালও যা নবাবের নবাবীও তাই। মুগের ডাল খেয়ে আরাম করে আমি তো তবু ঘুমিয়ে পড়তে পারি, কিন্তু নবাবী? নবাবী পেলে কি কারো ঘুম থাকে আজ্ঞে? বশীর মিঞাকে তো তাই বলেছিলুম—

কান্ত যেন লাফিয়ে উঠেছে—বশীর মিঞাকে তুমি চেনো?

—চিনবো না? আমিও রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াই, বশীর মিঞাও ঘুরে বেড়ায়। আমাকে বশীর মিঞা বললে—তুমি তো হিল্লি-দিল্লি ঘুরে বেড়াও উদ্ধব দাস, চরের চাকরি নেবে? আমি জিজ্ঞেস করলাম—কীসের চাকরি? বশীর বললে—নিজামতের চরের চাকরি! শুনে আমি বললাম—আমি তোর চাকরির মুখে পেচ্ছাব্ করে দিই!

সেপাই দুটো ভয়ে চারদিকে চেয়ে দেখলে। কেউ শুনতে পায়নি তো!

জিজ্ঞেস করলে—হ্যাঁ গো, তুমি বললে ওই কথা?

—তা বলবো না? আমি কি কাউকে ভয় করি নাকি? আমি ভয় করতে যাবো কোন্ দুঃখে শুনি? আমার মাগ আছে, না ছেলে-পুলে আছে যে ভয় করতে যাবো? শেষকালে কোন্‌দিন হুকুম হবে—যাও, মহারাজ কেষ্টচন্দ্রের দ্বিতীয়-পক্ষের বউকে ধরে নিয়ে এসো গে। তখন?

উদ্ধব দাসের কথাগুলো শুনতে শুনতে কান্তর যেন কেমন নিজেকে বড় নিঃসহায় নিঃসম্বল মনে হলো। মনে হলো এই উদ্ধব দাসও হয়তো তার চেয়ে সুখী! এই উদ্ধব দাসও জীবনের সার তত্ত্বটা জেনে গেছে। উদ্ধব দাসের কিছু না থেকেও যেন সে সকলের সব থাকার গৌরবকে ম্লান করে দিয়েছে। যে-চাকরি সে বশীর মিঞার কাছে সেধে নিয়েছে. সেই চাকরিই উদ্ধব দাস লাথি মেরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। উদ্ধব দাসের বাইরের ভাঁড়ামির আড়ালে যেন আর একটা নিরাসক্ত মানুষ বড়-বড় দুটো চোখ নিয়ে পৃথিবীকে দেখতে বেরিয়েছে। উদ্ধব দাসের এই ঘুরে বেড়ানোও যেন তার আর একরকমের দর্শন। সে পৃথিবীকে দেখে দেখে যেন আরো অনেক কিছু জানতে চায়!

উদ্ধব দাসকে আড়ালে ডাকলে কান্ত। আড়ালে ডেকে চুপি চুপি জিজ্ঞেস করলে—একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞেস করতাম উদ্ধব দাস। তুমি ঠিক-ঠিক উত্তর দেবে?

—বলুন প্রভু?

—আমার মনে হচ্ছে, তোমার বউ কোথাও পালায়নি উদ্ধব দাস, নিশ্চয় কোথাও লুকিয়ে আছে। কারোর বাড়িতে কি কোনো আত্মীয়-স্বজনের কাছে। একদিন-না-একদিন সে বেরোবেই। ধরো যদি কখনো তাকে খুঁজে পাও, তখন তুমি তাকে নেবে?

উদ্ধব দাস যেন এতক্ষণে স্পষ্ট করে প্রথম কান্তর দিকে চেয়ে দেখলে।

—কিন্তু আপনি কে প্রভু? আপনি কেন এ-কথা জিজ্ঞেস করছেন?

কান্ত একটু ভেবে বললে—আমার স্বার্থ আছে বলেই জিজ্ঞেস করছি—

—কিন্তু সবাই তো প্রভু আমার বউ পালিয়ে গেছে বলে আমাকে নিয়ে ঠাট্টা মশ্‌করা করে, কেউ তো এমন করে বলেনি কখনো—

—তা না বলুক, তাদের কথা আলাদা! তুমি নেবে কি না তাই বলো! আমি একটা কাজে এখন মুর্শিদাবাদে যাচ্ছি। তারপরেই হাতিয়াগড়ে যাবো, তখন যদি খুঁজে পাই তো তুমি তাকে নেবে?

—কিন্তু আপনি প্রভু কেন আমার জন্যে খামোকা কষ্ট করতে যাবেন? আপনার কীসের দায়? বউ পালিয়ে গেছে বলে তো আমার কোনো কষ্ট হচ্ছে না—

কান্ত বললে—তোমার কষ্ট না হোক, তোমার সেই বউ-এর তো কষ্ট হতে পারে। তার জীবনটা তো চিরকালের মত নষ্ট হয়ে গেল—

—তার জীবন নষ্ট হয়ে গেলে আপনার কীসের দায় প্রভু?

কান্ত একটু ভেবে বললে—দায় আছে বলেই তো বলছি তোমাকে, তোমাদের দু'জনের চেয়ে আমারই যে বেশি দায়?

—কেন? আপনার দায় কেন প্রভু?

হঠাৎ পেছন থেকে ডাক এল—রাণীবিবি আপনাকে এত্তেলা দিয়েছেন বাবুজী!

রাণীবিবি! কান্ত উদ্ধব দাসকে বললে—তুমি এখানে একটু দাঁড়াও দাস-মশাই, আমি এখ্খুনি আসচি—বুঝতেই তো পারছো নিজামতের চাকরি, আমি আসচি এখুনি—

বলে কান্ত সরাইখানার ভেতরে চলে গেল।

বেভারিজ সাহেবের সোরার গদিতে তখন ষষ্ঠীপদ ঘুম থেকে সবে উঠেছে। হিসেবপত্তোরটা ঠিক না রাখলে আখেরে বড় মুশকিল হয়। একবার যদি সাহেবের সন্দেহ হয় তো মুন্সীগিরি ঘুচে যাবে। তিরিশ টাকাকে কী-করে তিন টাকা করতে হয় তার কসরৎ ষষ্ঠীপদ জানে।

ষষ্ঠীপদ মুখে বলে—আমি বাপু ধর্ম করতে এসেছি, ধর্ম করে যাবো! তাতে যদি আমার লোকসান হয় তো হোক! আমার বাপের কাছে আমি একটা জিনিস শিখেছি বাপু যে, অধর্মের পয়সা থাকে না—

সেই অধর্মকেই ধর্ম বানাতে হলে কিন্তু হিসেবটি পাকা রাখা চাই। হিসেবের গোলমালটি করেছ কি তোমার সব নষ্ট!

ভৈরব দাস ওইটে বোঝে না।

ভৈরব বলে—ধর্ম আবার কী কত্তা? পয়সা-কড়ি কামিয়ে গঙ্গা-স্নান করে তবে তো ধম্ম করবো। এটা তো আপনিই শিখিয়ে দিয়েছেন! এটা কি ধর্ম করবার বয়েস?

—দূর হ, দূর হ!

ষষ্ঠীপদ তাড়া দেয় ভৈরবকে। বলে—তুই নরকে যাবি ভৈরব, ডাহা নরকে যাবি—তোর আর মুক্তি নেই রে—

কিন্তু সেদিন এক কাণ্ড ঘটলো। সকাল বেলা ভৈরব আসবার আগেই হিসেবের খাতাগুলো নিয়ে বসেছিল ষষ্ঠীপদ। এমন সময় ভৈরব দৌড়তে দৌড়তে এল। তখনো হাঁফাচ্ছে। বললে—শিগ্গির পালান কত্তা, শিগ্গির পালান—শিগ্গির—বেভারিজ সাহেব পালিয়েছে, কেল্লার সেপাইরাও পালিয়েছে, লাট-সাহেবও পালিয়ে গেছে—আপনি পালান কত্তা, পালান—

সত্যিই ষষ্ঠীপদ প্রথমে বুঝতে পারেনি কথাটা। শুধু ষষ্ঠীপদকে দোষ দিয়েই বা কী হবে, কলকাতার কেউই তখন বুঝতে পারেনি। এমন যে হবে,

এ-যেন সকলের ধারণার বাইরে। গভর্নর ড্রেক, ক্যাপ্টেন গ্র্যান্ট, জেনারেল লিসবন, বেভারিজ সবাই হতবাক্ হয়ে গিয়েছিল। ষষ্ঠীপদ অনেক দিন ধরে মুন্সীগিরির চাকরিটার জন্যে হাঁ করে ছিল। সবে হাতে দুটো মাগনা পয়সা আসতে শুরু করেছিল, এমন সময় এ কী বলে ভৈরব!

—পালাবো কেন? কী দোষটা করলুম?

ভৈরব বললে—না পালালে আমার কী? আমি পালালুম—

বলে ভৈরব নিজের তলপি-তল্পা নিয়ে চলে যাচ্ছিল। ষষ্ঠীপদ সামনে এসে পথ আটকে দাঁড়ালো। বললে—এই প্যলাচ্ছিস যে বড়? আমার পাওনা-গন্ডার কী হবে?

—আপনার আবার পাওনা-গন্ডা কী মুন্সীবাবু, অ্যাদ্দিনের মাইনে নিলুম না, এর মধ্যে আপনার পাওনা-গন্ডাটা হলো কীসের? হাতে কি একটা পয়সা পেইছি আমি?

সেই সোরার গদীর মধ্যে ষষ্ঠীপদ ভৈরবের গলায় গামছা দিয়ে আটকে ধরেছে।

—আজ্ঞে, পাওনা-গন্ডা যা হিসেব হয়, পরে আপনি নেবেন গুনে, এখন তো আগে প্রাণে বাঁচতে দিন।

হঠাৎ এতক্ষণে নজরে পড়লো আধো-অন্ধকারের মধ্যে মাঠের ওপর দিয়ে সব লোক গঙ্গার দিকে দৌড়চ্ছে। কোলে ছেলে, হাতে পোঁটলা, মাথায় ঝুড়ি। কী হলো গো? কী হলো? কোথায় যাওয়া হবে? তাদের তখন আর উত্তর দেবার সময় নেই। একদিন বর্গীদের অত্যাচারে গ্রাম থেকে পালিয়ে এসে এখানে ঘর-বাড়ি বেঁধে বসবাস শুরু করেছিল, আবার এখান থেকেও নবাবের অত্যাচারে পালিয়ে যেতে হচ্ছে। গরীব প্রজাদের কোথাও গিয়েই শান্তি নেই গো, কোনো যুগেই শান্তি নেই—রাজায়-রাজায় লড়াই বাধলেই উলুখড়ের প্রাণ যাবে। উলুখড়েরা এ-দেশ থেকে ও-দেশে প্রাণ বাঁচাতে প্রাণান্ত করবে। আর ষষ্ঠীপদরা সেই সুযোগে ভৈরবদের গলায় গামছা দিয়ে টাকাকড়ি সব শুষে নেবে।

আবার ওদিক থেকে কারা যেন সব হইচই করে চেঁচিয়ে উঠলো।

—ওই শুনুন কত্তা, নবাবের সেপাইরা এসে পড়লো বলে! এখন ছেড়ে দ্যান আমাকে—

ষষ্ঠীপদর কী মনে হলো। বললে—তবে তোর ট্যাঁকে কী আছে দেখি—

—ট্যাঁকে কী থাকবে কত্তা, কানা-কড়িটাও ট্যাঁকে নেই আজ—এই দেখুন—

ভৈরব নিজের ট্যাঁক উপুড় করে দেখালে। ট্যাঁকটা ঝেড়ে দেখেও ষষ্ঠীপদর যেন সন্দেহ গেল না। বললে—তাহলে সেদিন যে তোকে তিনটে টাকা দিলুম, সেটা কোথায় গেল?

—আজ্ঞে, সে তো আমার হক্কের টাকা, সে আমি খরচা করে ফেলেছি।

—এই সাত দিনের মধ্যে তিন টাকা খরচা হয়ে গেল? তুই যে দেখছি বেভারিজ সাহেবের ধাড়ে...

—আজ্ঞে, দেনা ছিল কিছু, তাই শোধ করেছি তিন টাকা।

ততক্ষণে গোলমাল আরো বেড়ে উঠেছে। গঙ্গার ঘাটের দিকে কয়েকটা জাহাজ পাল তুলে দিয়েছে। ফিরিঙ্গী সাহেবরা হুড়মুড় করে উঠছে সবাই তাইতে। দূরে গোবিন্দপুরের দিকেও সবাই দৌড়চ্ছে। ষষ্ঠীপদর হঠাৎ কী মনে হলো। ভৈরবকে একটা লাথি মারলে পা দিয়ে, বললে—যাঃ তোকে ছেড়ে দিলুম—

তারপর মনে পড়লো এ-সময়ে মাথা ঠিক না রাখলে সব গোলমাল হয়ে যায়।

বিপদের দিনে যে মাথা ঠিক রাখতে পারে, সে-ই তো জেতে। তাড়াতাড়ি ষষ্ঠীপদ তহবিলটা ভালো করে দেখলে। সাহেব আগের দিন এসে সব টাকাকড়ি হিসেব করে দিয়ে গিয়েছে। মনে হলো, আর তো কিছুক্ষণ, তারপরেই নবাবের ফৌজি-সেপাই এসে পড়বে। তখন হয়তো দাউ-দাউ করে জ্বলবে এই গদি। ষষ্ঠীপদ আর দাঁড়ালো না। মালকোঁচা মেরে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো। এই-তো সুযোগ। বর্গীদের সময়েও লোকে যখন গাঁ ছেড়ে পালাতো, ষষ্ঠীপদ তখন তাদের সঙ্গে পালাতো না। ছেড়ে ফেলে-যাওয়া ফাঁকা বাড়িগুলোর মধ্যে ঢুকে পড়তো ষষ্ঠীপদ। ঢুকে খুঁজে বেড়াতো কোথায় বাসন-কোসন আছে, কোথায় সোনা-দানা আছে; এমনি করে অনেকবার অনেক জিনিস পেয়েছে ষষ্ঠীপদ। জীবনের শুধু একটা মানেই জানতো সে। টাকা থাকাটাই যে জীবনের একমাত্র থাকা এই চরম জ্ঞানটাই বুঝে নিয়ে ষষ্ঠীপদ রীতিমত জ্ঞানী হয়ে উঠেছিল। তাই আর দেরি করলে না। সেই ভোর-ভোর অন্ধকারেই ষষ্ঠীপদ চকমকি ঠুকে আগুন জ্বালালো। তারপর পেছনের দরজা দিয়ে নিঃশব্দে বাইরে বেরিয়ে এল। সেখান থেকে সোজা একেবারে শেঠের বাগান। শেঠেদের গঙ্গার জল বিক্রি করবার ব্যবসা। বৈষ্ণবচরণ শেঠ শিল-মোহর করা গঙ্গাজল ত্রৈলঙ্গ দেশে মোটা দরে বিক্রি করে অনেক টাকার মালিক হয়েছে। ষষ্ঠীপদ পেছনের খিড়কির দরজার কাছে গিয়ে কান পেতে রইলো। তারপর হঠাৎ চিৎকার করে উঠলো—আল্লা হো আকবর—

ওদিক থেকে পালে-পালে যারা আসছিল তারা যেন একটু থমকে দাঁড়ালো। কিন্তু অন্য এক দিক থেকে তুমুল চিৎকার উঠলো—আল্লা হো আকবর—

শেঠের বাগানের বুড়ো মুন্সী হীরালাল সরকারের আচমকা ঘুমটা ভেঙে গেছে। চাকর-বাকর-বেয়ারা সবাই জেগে উঠেছে। বৈষ্ণব শেঠের এলাহি কারবার। লাখ-লাখ টাকার কারবার করে শেঠেরা শেষকালে ফিরিঙ্গী কোম্পানীর দালালও হয়েছিল।

হীরালাল মুন্সী ষষ্ঠীপদকে দেখে হতবাক্।—আরে তুই? তুই এই অসময়ে কোত্থেকে?

ষষ্ঠীপদ তখন মরিয়া হয়ে উঠেছে—হুজুর, সর্বনাশ হয়ে গেছে। নবাব লড়াই শুরু করে দিয়েছে—সেপাইরা এসে গিয়েছে—ওই শুনুন—

হীরালাল চারদিকে চেয়ে দেখলেন।

—তোদের গদিতে আগুন জ্বলছে না?

—হ্যাঁ হুজুর, সাহেব গদিতে ছিল রাত্তিরে, সেপাইরা সাহেবকে খুন করে গদিতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে, তাই আপনাকেও সাবধান করে দিতে এলাম—

ষষ্ঠীপদ আগে থেকেই হাঁফাচ্ছিল, এবার খবরটা শুনে হীরালাল সরকারেরও থর-থর করে কাঁপতে লাগলো।

—তাই আমি বলতে এলাম আজ্ঞে, যদি কর্তারা কেউ থাকে গদিতে—

—তুই বেঁচে থাক বাবা, খবরটা দিলি ভালো করলি! এখন কী করি? তহবিলে যে অনেক টাকা রয়েছে—

ষষ্ঠীপদ বললে—ওগুলো সঙ্গে করে নিয়ে যান—টাকা কি ফেলে রেখে যেতে আছে? চাকর-বাকরদের বলুন, সিন্দুক খুলে পোঁটলা বেঁধে সঙ্গে নিয়ে যেতে—

—আরে বাবা, সে-যে অনেক টাকা রে, সে-সব নিতে গেলে যে আর প্রাণে বাঁচবো না—ও থাক্, কপালে থাকে তো থাকবে, নয়তো থাকবে না—

বৈষ্ণবচরণ শেঠবাবুরা বহুদিনের তাঁতের কারবারী। ফিরিঙ্গী সাহেবরা

তাঁতীদের, আরমানীদের, হিন্দুদের, শিখদের সকলকে তোয়াজ করে ভেতরের গুপ্ত কথা আদায় করতে চায়। বেছে বেছে এমন মুন্সী রাখে, যারা ফিরিঙ্গীদের দেবতার আসনে বসিয়ে পুজো করবে। এমন লোককে দালালী দেয় যে, বিপদের দিনে ফিরিঙ্গীদের দলে আসবে।

সেদিন শেঠবাবুদের বাগানের গদিবাড়িতেও তাই যখন হীরালাল মুন্সী প্রাণের ভয়ে সবকিছু ছেড়ে পালিয়ে বাঁচলো, তখন গদির সম্পত্তি টাকাকড়ি দেখবার জন্যেও কেউ রইলো না। যে-আগুন বেভারিজ সাহেবের সোরার গদিতে জ্বললো, সে-আগুন বৈষ্ণবচরণ শেঠের গদিতেও লাগলো। নবাব ফৌজ নিয়ে আসবার আগেই সমস্ত কলকাতায় আগুন লেগে গেল। যখন সবাই পালিয়েছে, তখন ষষ্ঠীপদই একলা শেঠবাবুদের গদির ভেতর সিন্দুক ভেঙে কোঁচড় ভর্তি করেছে। ষষ্ঠীপদর কাছে নবাবও যা, ফিরিঙ্গী কোম্পানীও তাই। হিন্দুও যা, মুসলমানও তাই। ষষ্ঠীপদরা শুধু টাকাটাই জানে। টাকাই তো আসল জিনিস রে। তোর টাকা হোক ভৈরব, তখন তোর হাতের ছোঁয়া বামুনরাও খাবে, ম্লেছল-মানও খাবে, ফিরিঙ্গী বেটারাও খাবে।

ষষ্ঠীপদর মনে হলো, সমস্ত কলকাতাটাই যেন সে কিনে নিয়েছে। এত টাকা। এত মোহর, এত সোনা। সোনা দিয়ে আমি কলকাতা মুড়ে দেবো। তখন দেখবো, জগৎশেঠ তুমি বড়লোক, না আমি। তুমি আর আমি তখন এক জাত। কলকাতা ছেড়ে সবাই পালিয়ে গেছে। আমি কলকাতার নবাব আর সিরাজ-উ-দ্দৌলা মুর্শিদাবাদের নবাব। তোমার যদি বেশি টাকা থাকে তো আমাকে কিনে নাও। আর আমার যদি বেশি টাকা থাকে তো আমিও তোমাকে কিনে নেবো কিন্তু। এখন কলকাতার জমিদারির ৫৭৮৬ বিঘে ১৯ কাঠা জমির মালিক আমি। আমি আবার ওই পোড়া কলকাতায় তোমাদের জমি পত্তনি দেবো। ফৌজদারি বালাখানা বানাবো, তারপর...

—ও কত্তা, কত্তা—

হঠাৎ ডাকাডাকিতে ঘুম ভেঙে গেল ষষ্ঠীপদর। চারদিকে একবার চেয়ে দেখলে। এ তো সেই বেভারিজ সাহেবেরই গদিবাড়ি। তাহলে গদিবাড়ির তক্ত-পোষের ওপর ছেঁড়া মাদুরে শুয়ে এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিল নাকি সে। নিজের কোঁচড় দেখলে, নিজের হাত দুটো দেখলে। জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে দেখলে। কী আশ্চর্য, কোথাও তো আগুন দেখা যাচ্ছে না। কলকাতা তো সেই কলকাতাই আছে। তার নিজের ধুতিখানাও তো সেই একই ধুতি।

—ও কত্তা, কত্তা—

দুরতেরিকা! সক্কালবেলা জ্বালাতে এসেছে। কে? কে তুই? তড়াতাড়ি দরজা খুলে ভৈরবকে দেখেই মুখটা বেঁকিয়ে উঠলো ষষ্ঠীপদ!

—ভোর বেলাই তোর মুখটা দেখতে হলো তো! আর সময় পেলি না আসবার! দিনটা একেবারে মাটি, তোর জন্যে দেখছি একটা টাকারও মুখ দেখতে পাবো না আজকে! তোর জ্বালায় কি আমি বনবাসী হবো রে ভৈরব! সক্কাল বেলা তোদের মুখ দেখতে আছে?

ভৈরব অবাক হয়ে গিয়েছিল।

—কেন হুজুর, আমি তো ভৈরব দাস নই আর, ভৈরব চক্কোত্তি—নমঃশূদ্দুর নই কত্তা, বামুন! আমি তো পৈতে পরেছি—

ষষ্ঠীপদ রেগে দড়াম করে দরজাটা বন্ধ করে দিলে। বললে—যা এখন এখান

থেকে, ওদিকে মুখ করে দাঁড়া, আমি ঘাটে গিয়ে আগে গঙ্গাজলে মুখ ধুয়ে আসি, তখন আসিস—

ষষ্ঠীপদর সমস্ত শরীরটা ঘেন্নায় ঘিন-ঘিন করতে লাগলো। ভোর বেলার স্বপ্ন হয়তো সত্যি হতো, কিন্তু বেটার জ্বালায় সব মাটি করে দিলে।

ভেতর থেকেই চেঁচিয়ে বললে—ও-মুখ করে দাঁড়া শিগ্‌গির, দাঁড়িয়েছিস?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, কত্তা—

—দেখিস, যেন আমাকে দেখে ফেলিসনি! তোকে রেখে তো দেখছি আমার মহা বিপদ হলো। আমি এবার বেরোচ্ছি, বুঝলি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, বেরোন, কোনো ভয় নেই কত্তা আপনার—

ষষ্ঠীপদ আবার সাবধান করে দিলে। বললে—আমি গঙ্গায় গিয়ে মুখ ধুয়ে গদিতে ফিরে এলে তখন মুখ ফেরাবি, বুঝলি তো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ কত্তা, বুঝেছি!

ষষ্ঠীপদ মাথা নিচু করে দরজাটা খুলে গঙ্গার ঘাটের দিকে গেল। তারপর ঘাটের সিঁড়ি দিয়ে নেমে দু'হাতের আঁজলা ভরে জল দিয়ে মুখ ধুতে ধুতে বলতে লাগলো—মা, পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গে, রাজা করো মা আমাকে, রাজা করো—

ওদিকে তখন বোধহয় ভোর হচ্ছে। অন্ধকার কেটে আসছে। গঙ্গার নৌকো-গুলোর ভেতরে তখন মাঝিরা জেগে উঠেছে। ফিরিঙ্গী কোম্পানীর দু' একটা হাতী তখন ঘাটের ধারে চরতে বেরিয়েছে। ষষ্ঠীপদ চোখ দু'টো বুজে আবার তখন মন দিয়ে গঙ্গাস্তব করতে লাগলো এক মনে। মা, পতিতোদ্ধারিণী, গঙ্গে...
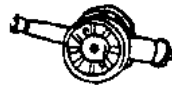
চক্‌বাজারে তখন সন্ধ্যে হয়-হয়। সড়কের দু'ধারের দোকানে-দোকানে রোশনাই। খুশ্‌বু তেল তৈরি করতো সারাফত। সারাফত আলির তিন-পুরুষের খুশ্‌বু তেলের দোকান। গুলাবী আতর মাখানো তুলো কানের ভেতর লাগিয়ে দোকানে আগরবাতি জেবলে দিয়েছে। জেবলে দিয়ে গড়গড়ায় তামাক খাচ্ছে। আগরবাতির ধোঁয়া আর তামাকের ধোঁয়া মিশলে আর একরকম নতুন গন্ধের সৃষ্টি হয়। সেই গন্ধতেই মৌতাতটা জমে সারাফত আলির। হঠাৎ তামাক টানতে টানতে একটা স্বপ্নের ঘোর যেন সারাফতের চোখের ওপর নেমে এল। কেয়াবাত্! কেয়াবাত্! সামনে দিয়ে যেন ঝালরদার পাল্‌কি চলেছে একটা। আর তার ভেতরে যেন এক জরিদার ওড়নি ঢাকা চাঁদ্‌নী চলেছে বাইরে উঁকি দিতে দিতে!

স্বপ্নই বটে! আগরবাতির ধোঁয়ার স্বপ্ন। খুশ্‌বু তেলের স্বপ্ন। আগরাইয়া তামাকুর ধোঁয়ার স্বপ্ন! কেয়াবাত্! কেয়াবাত্!

কিন্তু হঠাৎ নেশাটা কেটে গেছে। স্বপ্ন নয় তো। এ যে চলেছে আস্‌লি ঝালরদার পাল্‌কি, নবাবের ফৌজী সেপাই চলেছে।

সত্যি আস্‌লি চিজ্ কিনা জানতে কৌতূহল হলো সারাফত আলির। একবার চিল্লিয়ে উঠলো—বাদ্‌শা, দেখে আয় তো কৌন্...

বাদশা সারাফত আলির নৌকর। সারাফত আলির কেনা বান্দা। তাকে বেশি

আর বলতে হয় না। সে দৌড়ে রাস্তায় গিয়ে হাজির। একেবারে তাঞ্জামের সামনে। যাকে সামনে পেলে তাকেই জিজ্ঞেস করলে—তাঞ্জাম মে কৌন্ হ্যায় জী?

সেপাইটা বন্দুক ঘাড়ে করে চলছিল। বললে—নয়াবেগম—

নয়াবেগম! কোথায় চলেছে নয়াবেগম এই সাঁঝবেলায়? সন্ধ্যে বেলায় তো বেগমরা রাস্তায় বেরোয় না। কোথায় চলেছে গো নয়াবেগম?

—জাহান্নম!

বোধহয় রাগ করেই কথাটা বলেছিল সেপাইজী! আর তা ছাড়া রাগ তো হবারই কথা! উল্লুকদের কথার জবাব দিতে সেপাইদের ইজ্জতে বাধে!

—কী রে, কী বললে সেপাইজী? কে?

বাদশা বললে—হুজুর নয়াবেগম!

ফিন্ নয়াবেগম! শালা বেগমে বেগমে ভরে গেল চেহেল্-সুতুন! তবু শালার বেগমের কম্‌তি নেই! বড় খত্‌রা হয়ে গেল দুনিয়াটা। ব্যাকোয়াশ্ হয়ে গেল জিন্দিগীটা! মুর্শিদাবাদ আবার ডুববে রে! সঙ্গে আবার কাফের যাচ্ছে একটা! ওটা কে রে? সঙ্গে সঙ্গে ওটা যাচ্ছে কেন রে? আমাদের কান্তবাবু না?

কান্ত এক মনে ভাবতে ভাবতে পালকির পেছন-পেছন যাচ্ছিল। পাশ থেকে সারাফত আলির কথাগুলো কানে এল। এতক্ষণে যেন জ্ঞান ফিরে এল কান্তর। এতক্ষণ যেন খেয়ালই ছিল না কোথায় চলেছে, কোথায় এসে পৌঁছেছে। চক্‌বাজার। এখান থেকেই হাতিয়াগড়ে রওনা হয়েছিল সে। এই সেই সড়ক, এখানে এসেই বশীরের সঙ্গে দেখা করেছিল সে! রাস্তার লোকগুলো পর্যন্ত তাকে আজ আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছে। ওই দেখ নবাবের চর! চর যখন ছিল না, তখনই চর বলে ধরে নিয়েছিল বেভারিজ সাহেব। ষষ্ঠীপদ খুব বাঁচিয়ে দিয়েছে। ষষ্ঠীপদ লোকটা ভালো। বড় সরল। ইচ্ছে করলেই তো তাকে ধরিয়ে দিতে পারতো। সাহেবকে গিয়ে চুপি চুপি খবরটা দিলেই পারতো যে মুন্সীবাবু নিজামতের চর। তখন গোরা-পল্টন এসে কান্তকে ধরে নিয়ে গেলেই বা তার কী বলবার থাকতো।

মাথার মধ্যে সমস্ত অতীতটা তোলপাড় করতে লাগলো কান্তর। সড়কটা উঁচু-নিচু। এখান দিয়ে পালকি যেতে যেতে কতবার বেহারারা পা ভেঙে পড়ে গেছে। দিদিমার সঙ্গে বড় চাতরায় রাস্তায় চলতে চলতে এমনি অন্যমনস্ক হয়ে যেত কান্ত। দিদিমা বলতো—রাস্তার দিকে নজর দিয়ে চল্, পড়ে যাবি যে—

অথচ ভাবনা না করলে চলে! সারাফত আলি হয়তো তাকে দেখতে পেয়েছে। মৌতাতের মৌজে হয়তো ঠিক চিনতে পারেনি। চিনতে না-পারলেই ভালো। চিনতে পারলেই কাল আবার জিজ্ঞেস করতো মিঞা সাহেব—কাল তাঞ্জামে চড়িয়ে কাকে নিয়ে যাচ্ছিলে বাবুসাহেব?

কাটোয়ার সেই উদ্ধব দাসও সেপাইদের জিজ্ঞেস করেছিল—পালকিতে কোন্ বিবিজান যাচ্ছে গো?

সত্যিই বড় অদ্ভুত লোক ওই উদ্ধব দাস। কোনো বিকার নেই কোনো দুঃখ নেই। কেবল ঘোরে। ঘুরে বেড়িয়েই সারা পৃথিবীটা প্রদক্ষিণ করতে চায়। উদ্ধব দাস বলেছিল—আমি মানুষ নই প্রভু, আমি মানুষ নই,—আমার বউ পালাবে না তো কার বউ পালাবে বলুন?

তারপর বোধহয় কী মনে হয়েছিল, বলেছিল—তোমরা হাসছো সেপাই-জীবন, কিন্তু হাসি নয়, খাঁটি কথা বলছি আমি! বউ পালিয়েছে বেশ করেছে। পালিয়ে গিয়ে বেঁচেছে হে! সে-মেয়ের আমার সঙ্গে বনবে কেন গো? সে মেয়ে যে ঠোঁটে আল্‌তা লাগায়, তাম্বুল-বিহার না হলে মুখে পান রোচে না তার, পাশা খেলে—! বাউণ্ডুলে বরের সঙ্গে তার বনবে কেন প্রভু?

কান্ত আর থাকতে পারেনি। জিজ্ঞেস করেছিল—তোমার বউকে কেমন দেখতে ছিল গো?

উদ্ধব দাস কান্তর দিকে চেয়ে হঠাৎ বলেছিল—আজ্ঞে প্রভু, আপনার সঙ্গে মানাতো তার—

সেপাই দুটো খুব হেসে উঠেছিল হো-হো করে—দূর বুড়ো, তুই থাম্—

—আজ্ঞে না সেপাইজী, আমি ঠিক বলছি, এই বাবুর সঙ্গে খুব মানাতো, বাবুও দেখতে সুন্দর, আমার বউও দেখতে সুন্দর, দুজনে মিলে সংসার আলো করে থাকতো—

কী ভেবে উদ্ধব দাস সেদিন কথাগুলো বলেছিল কে জানে! হয়তো রসিকতা করেছিল। কিংবা হয়তো রসিকতা করেনি। হয়তো সে সত্যি কথাই বলেছিল। কিন্তু উদ্ধব দাসের কথাটা এখনো ভুলতে পারেনি কান্ত। পরে একবার মরালীকে বলেছিল। মরালী প্রথমে কিছু উত্তর দেয়নি।

কান্ত বলেছিল—সত্যি বলছি, তুমি বিশ্বাস করো, সত্যি-সত্যিই দাস-মশাই আমাকে সেই কথা বলেছিল—

মরালী তখন মরিয়ম বেগম। বলেছিল—তার কথা থাক্—

কান্ত আর সে-কথা নিয়ে বেশি পীড়াপীড়ি করেনি। শুধু বলেছিল—তার কথা সত্যি হলেই বোধহয় ভালো হতো, না গো?

মরালী বলেছিল—ছিঃ, তোমার মুখে দেখছি কোনো কথাই আটকায় না—

কান্ত বলেছিল—কিন্তু আমি যে কিছুতেই সে-সব কথা ভুলতে পারি না!

—তা ভুলতে চেষ্টাও তো করবে! আমি তো ভুলে গেছি!

—তোমার মতন মন হলে আমিও হয়তো ভুলতে পারতাম। কিন্তু আমার মনের গড়নটাই যে অন্যরকম। তোমার সঙ্গে তাই আমার কিছুই মেলে না দেখছি।

মরালী বলেছিল—মেলেই তো না। মিললে তুমি বিয়ের দিন ঠিক সময়ে এসে হাজির হতে! আমাকেও আর তা হলে এখানে এসে মরিয়ম বেগম হতে হতো না!

কান্ত বলেছিল—তুমি মরিয়ম বেগমই হও আর যে-ই হও, আমার কাছে তুমি কিন্তু সেই মরালীই আছ!

মরালী ভয়ে-ভয়ে চারদিকে চেয়ে বলেছিল—অত চেঁচিও না, শেষকালে কেউ শুনে ফেললে মুশকিল হয়ে যাবে—

মনে আছে, প্রত্যেক দিন কান্ত লুকিয়ে লুকিয়ে গিয়ে হাজির হতো মরালীর কাছে। আর তারপর যখন না এসে উপায় থাকতো না তখন পেছনের সুড়ঙ্গ দিয়ে বাইরে চলে আসতো। বাইরে এসে আবার সেই সরিফত আলির খুশ্বু-তেলের দোকানের পেছনে গিয়ে নিজের আস্তানার মধ্যে চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়তো। সে-সব একদিন গেছে। চক্‌বাজারের ছোট্ট একটা দোকানঘরের মধ্যেই কান্তর জীবন-যৌবন-জীবিকা সব কিছু কেটে গিয়েছিল। কাটোয়ার সরাইখানার সামনে সেদিন উদ্ধব দাসের সঙ্গে পরিচয় না-হয়ে গেলে হয়তো এমন হতো না।

এমন করে ঘনিষ্ঠ হওয়াও যেত না মরালীর সঙ্গে। হয়তো পালকিতে করে রাণীবিবিকে চেহেল্-সুতুনে পৌঁছিয়ে দিয়েই সে এ-কথা ভুলে যেত একেবারে। তার জীবন অন্য দিকে মোড় ফিরতো! কিন্তু উদ্ধব দাসই তার সব বানচাল করে দিলে। উদ্ধব দাসকে দেখে উদ্ধব দাসের সঙ্গে কথা বলেই কান্তর জীবনের গতি অন্য দিকে ঘুরে গেল।

হঠাৎ রাণীবিবির ডাকেই কান্ত আবার ফিরে গিয়েছিল সরাইখানার ভেতরে। রাণীবিবিও তার জন্যে বোধহয় উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছিল। জিজ্ঞেস করলেন—দেখে এলেন? কে ও?

কান্ত বললে—ওর নাম উদ্ধব দাস—অদ্ভুত মানুষ!

—কেন? কী করে জানলেন?

কান্ত বললে—আপনি শুনলে অবাক হয়ে যাবেন, যার সঙ্গে আমার বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছিল, তার সঙ্গেই ওর বিয়ে হয়ে গেছে!

—তারপর? ওর বউ কোথায় গেল?

—সেই জন্যেই তো বলছি অদ্ভুত মানুষ। আমার ও-রকম হলে আমি কিন্তু আত্মহত্যা করতুম। কিন্তু ও বেশ দিব্যি হেসে খেলে গান গেয়ে বেড়াচ্ছে—

—তা ওর বউ কোথায় পালালো?

—তাহলে শুনুন!

কান্ত বলতে লাগলো—তাহলে শুনুন, তাকে আর পাওয়া যাবে না।

—কী করে জানলেন পাওয়া যাবে না?

—আমি যেদিন আপনাকে আনতে হাতিয়াগড়ে গিয়েছিলুম না, সেইদিনই দেখলুম সেই বউকে খোঁজবার জন্যে হাতচালা হচ্ছে। আপনাদের বাড়ির ঝি দুর্গাকে চেনেন আপনি? আপনারই তো ঝি সে? চেনেন?

—খুব চিনি! সে তুক্-তাক্ করে!

—হ্যাঁ, দেখি সেই দুগ্যা নয়ানপিসি বলে একজন বিধবার হাত চালাচ্ছে আর বিড়-বিড় করে মন্তর পড়ছে। কিন্তু সেই মরালীকে আর পাওয়া গেল না—

—মরালী কে?

—যার সঙ্গে আমার বিয়ে হবার কথা হয়েছিল তারই নাম। তা দুগ্যা বললে—সে নাকি পুষ্যানক্ষত্রে শ্বেতজয়ন্তীর শেকড় খেয়েছে, তাকে আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। দেব-নর-গন্ধর্ব কেউ খুঁজে পাবে না। কথাটা দুগ্যা বললে বটে, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে সব বুজরুকি। নিশ্চয়ই সে কোথাও লুকিয়ে আছে—। আপনি কি তুক-তাকে বিশ্বাস করেন?

—কেন করবো না। দুগ্যার দেওয়া মাদুলী পরে কত লোকের রোগ সেরে যেতে দেখেছি।

—কিন্তু তা'বলে অদৃশ্য হয়ে যাবে একেবারে? তাই কখনো হয়? আমি তো উদ্ধব দাসকে বলে এলাম, নিশ্চয়ই সে কোথাও লুকিয়ে আছে, আমি তাকে খুঁজে বার করবো। আপনাকে মুর্শিদাবাদে পৌঁছিয়ে দিয়েই আমি আবার হাতিয়াগড়ে ওর বউকে খুঁজতে যাবো—

—ওর বউ-এর জন্যে আপনার তো দেখছি খুব মাথা-ব্যথা!

কান্ত বললে—আহা, আমি তো বুঝতে পারি বউ পালিয়ে গেলে মানুষের কীরকম কষ্ট হয়! ও অবশ্য মুখে কিছু বলছে না, হেসে হেসে ছড়া বানাচ্ছে

আর গান গাইছে—কিন্তু মনে মনে তো কষ্ট হচ্ছে!

রাণীবিবি বললে—ওর কষ্টর চেয়ে দেখছি আপনার কষ্টটাই যেন বেশি!

—কিন্তু আমার জন্যেই তো ওর বউ পালালো!

—আপনার জন্যে পালিয়েছে কে বললে?

—ওই উদ্ধব দাসই তো বললে। বললে—আমার সঙ্গেই নাকি মরালীকে বেশি মানাতো! ওর মতে ওকে পছন্দ হয়নি বলেই সে পালিয়েছে। আপনি নিজে রাজরানী, আপনি তো সাধারণ মানুষের মনের খবর রাখেন না।

রাণীবিবি বললে—আমি রাজরানী হলেও সাধারণ গরীব ঘরেরই মেয়ে, আমি বুঝি—

—আপনি সাধারণ ঘরের মেয়ে?

—আমি চাক্‌দা'র মুখুটি বংশের মেয়ে। আমাদের বাড়িতে এক-একদিন ভাতই রান্না হতো না—এত গরীব ছিলাম আমরা—

—কেন?

—চাল থাকতো না বলে। বাবা ছিলেন পণ্ডিত মানুষ। এঁরা আমাকে আমার রূপ দেখে পছন্দ করে বউ করে নিয়ে এসেছিলেন। আমি সাধারণ লোকের দুঃখকষ্ট খুব ভালো করেই বুঝি—

কান্ত বললে—অথচ, কাল রাত থেকে আপনার সঙ্গে কথা বলতে আমার খুব ভয় করছিল। ভাবছিলাম হয়তো আপনি আমার মত গরীব লোকদের সঙ্গে কথাই বলবেন না। তাই মাঝিরা যখন কাল রাত্তিরে ডাকাতের ভয় দেখালো তখন আমি আর আপনাকে না ডেকে পারিনি—

তারপর একটু থেমে আবার বললে—আচ্ছা, আর একটা কথা জিজ্ঞেস করছি। কিছু মনে করবেন না—

—বলুন না।

—আপনি কেন মুর্শিদাবাদ যাচ্ছেন? নবাবের ডিহিদার পরওয়ানা দিলে আর আপনিও চললেন? হাতিয়াগড়ের ছোটমশাই কিছু আপত্তি করলেন না? আমি হলে তো আমার স্ত্রীকে কিছুতেই পরের হাতে তুলে দিতে পারতুম না, প্রাণ গেলেও না। সত্যিই কি নবাবকে আপনাদের এত ভয়?

রাণীবিবি একটু হাসলেন। রাণীবিবির হাসিটা খুব ভালো লাগলো কান্তর। রাণীবিবি বললেন—সকলে কি আপনার মত সাহসী?

কান্ত বললে—সাহসের কথা হচ্ছে না, কেউ যদি কাউকে ভালবাসে তাহলে বিপদের দিনে তাকে ছাড়তে পারে? আর আমার কথা ছেড়ে দিন, চাকরির জন্যেই তো আমাকে এই পাপ করতে হচ্ছে—

—পাপ যদি মনে করেন তো এ চাকরি করতে গেলেন কেন?

—আগে কি জানতুম চাকরি নিলে এই পাপ কাজ করতে হবে!

—এখন তো জানলেন, এখন ছেড়ে দিন!

কান্ত বললে—ছাড়তে আমি এখনি পারি! না-হয় উপোসই করবো! কিন্তু আপনার তাতে তো কোনো লাভ হবে না। আমি না হলে অন্য কেউ আপনাকে নিয়ে গিয়ে পুরে দেবে হারেমের ভেতরে। তখন?

—আমার কথা ছেড়ে দিন! আমার যা হবার তা হবেই। আমি সব কিছুর জন্যেই তৈরি—

কান্ত বললে—কিন্তু আমি বলছি আপনাকে, আপনি না এলেই ভালো

করতেন—নাটোরের মহারানী রাণীভবানীর নাম শুনেছেন তো?

—হ্যাঁ!

—তাহলে চুপি চুপি আপনাকে একটা কথা বলি। কাউকে বলবেন না, তাঁর মেয়েকেও একদিন আপনার মতন ডেকে পাঠিয়েছিল নবাব—তা জানেন?

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ, আমাকে চক্‌বাজারের গন্ধ-তেলের দোকানের মালিক সারাফত আলি সব বলেছে! নবাব তো লোক ভালো নয়। তা ছাড়া তার ইয়ার-বক্সী যারা আছে, তারাও খারাপ লোক। সেই রাণীভবানী নবাবের পরোয়ানা পেয়েই এক কাণ্ড করলেন—

—কিন্তু রাণীভবানীর মেয়েকে নবাব দেখলে কী করে?

—নবাব নৌকো করে যাচ্ছিল আর ওদিকে রাণীভবানীর মেয়ে বাড়ির ছাদে দাঁড়িয়ে রোদ্দুরে চুল শুকোচ্ছিল, তখনই নবাবের নজরে পড়ে গেছে। তা তারপর রাণীভবানী করলেন কি, দু'দিন পরেই শ্মশানে একটা খালি চিতা সাজিয়ে তাতে আগুন ধরিয়ে দিলেন। রটিয়ে দিলেন যে তাঁর মেয়ে হঠাৎ অসুখ হয়ে মারা গেছে—আর ওদিকে মেয়েকে এক সাধুর আশ্রমে লুকিয়ে রাখলেন—! আপনিও তো সেই রকম কিছু করতে পারতেন। কেন আপনি আসতে গেলেন এমন করে? ওখানে গেলে আপনার ধর্ম থাকবে না তা বলে রাখছি—আপনি হিন্দু আমিও হিন্দু—আপনাকে বিশ্বাস করে সব কথা বললুম!

তারপর আবার গলা নিচু করে বললে—দেখুন, এখনো সময় আছে, আপনি পালিয়ে যান—

—তার মানে?

—সামনের দিকে আমগাছতলায় সেপাই দুটো উদ্ধব দাসের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিয়েছে। বেহারারাও গা এলিয়ে দিয়েছে সেখানে। আপনি এই পেছনের দরজাটা দিয়ে বেরিয়ে যান না। ওই বাঁদীটা আছে, ওকে কোনো কাজের ছুতো করে কোথা থেকে জল-টল আনতে বলে দিন। সেই ফাঁকে আপনি বেরিয়ে যান এখান থেকে—সামনে গঙ্গা পাবেন, সেই গঙ্গার পাড় ধরে যেদিকে দু'চোখ যায় চলে যান—আর যদি কেউ আপনার দামী শাড়ি দেখে সন্দেহ করে তো একটা না-হয় ময়লা আটপৌরে শাড়ি পরে নিন। সঙ্গে আটপৌরে শাড়ি নেই আপনার?

—কিন্তু তাতে আপনার কিছু ক্ষতি হবে না?

—আমার ক্ষতি হোক্ গে! আপনি তো আগে বাঁচুন! আমি আমার একটা পেট যে-কোনো রকমে হোক চালিয়ে নেবো। তার চেয়ে আপনার ধর্মটাই বড়।

—বড় দেরিতে আপনার জ্ঞান হলো দেখছি।

কান্ত বললে—না, কাল রাত্তিরেই আমার মনে হয়েছিল এ আমি কী করছি। আজ উদ্ধব দাসকে দেখেও এই কথাই আমার মনে হচ্ছিল—এ আমি কী করছি! না, আমি বলছি আপনি পালান—ওই খিড়কীর দরজাটা খুলে চলে যান, আমি বাইরেটা একবার দেখে আসছি—

—কিন্তু আপনি? আপনি কী বলবেন ডিহিদারকে? ডিহিদার যখন আপনাকে জিজ্ঞেস করবে রাণীবিবি কোথায়, কেমন করে পালালো, তখন!

—আমার কথা আমি পরে ভাববো। সে ভাববার অনেক সময় আছে! আপনি আগে যান, আমার কথা আপনাকে ভাবতে হবে না—

রাণীবিবি খানিকক্ষণ কী যেন ভাবতে লাগলেন। তারপর বললেন—তার চেয়ে দুজনে মিলে এক সঙ্গে পালালে কেমন হয়?—আপনিও আমার সঙ্গে চলুন না—আপনি থাকলে অনেক সুবিধে হতো!

কান্ত একটু মনে মনে ভাবতে লাগলো।

—কিন্তু আমাকেই বা আপনি বিশ্বাস করতে পারলেন কী করে? আমিও তো আপনার ক্ষতি করতে পারি!

—কী ক্ষতি? আপনি আমার কী ক্ষতি করবেন?

—না, আমাকে তো আপনি ভালো করে চেনেন না এখনো!

রাণীবিবি বললেন—না, আপনাকে আমি চিনি!

—আমাকে চেনেন আপনি?

—আপনি যে ভোরবেলা নিজের নাম বললেন। আপনার নিজের পরিচয় দিলেন!

কান্ত বললে—সে তো ভারি, সেইটুকুতেই কি একজন মানুষকে চেনা যায়? আর আমি কোথায় নিয়ে যাবো আপনাকে? হাতিয়াগড়ে?

রাণীবিবি বললেন—না, সেখানে গেলে জানাজানি হয়ে যাবে! তাদের সকলের সর্বনাশ হবে!

—তাহলে কোথায় যাবেন?

রাণীবিবি বললেন—অন্য যে কোনো জায়গায়। যেখানে গিয়ে লুকিয়ে থাকতে পারবো!

—কেন? আপনার বাপের বাড়ি নেই? কোনো আত্মীয়স্বজন?

—আমি তো বললুম আমি গরীবের মেয়ে। বিয়ের পরই বাবা মারা গেছেন, আর কেউ কোথাও নেই, এক শ্বশুরবাড়ি ছাড়া!

কান্ত যেন মুশ্‌কিলে পড়লো। রাণীবিবিকে নিয়ে কোথায় যাবে সে। তার নিজেরই কি কোনো জায়গা আছে যাবার! এক আছে বড়চাত্‌রা! কিন্তু সেখানে গেলেও হয়তো নবাবের চর পেছন-পেছন গিয়ে পৌঁছোবে। আর বড়চাতরার লোকরাই যদি জিজ্ঞেস করে—সঙ্গে কে? তখন কী উত্তর দেবে কান্ত। কী পরিচয় দেবে?

হঠাৎ কান্ত একটা কাণ্ড করে বসলো। বললে—দাঁড়ান, আমি বাইরে গিয়ে দেখে আসি ওরা কী করছে এখন—আর খিড়কির দিকটাও দেখে আসি—আপনি ততক্ষণে শাড়িটা বদলে নিন—

বলে কান্ত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

রাজবাড়ি থেকে তখন ফিরছিল শোভারাম। কাজ থাক আর না-থাক শোভারামকে গিয়ে নিয়ম করে হাজরে দিতে হয়। সকাল থেকে তেল-গামছা নিয়ে ছোটমশাই-এর জন্যে বসে থাকতে হয়। তারপর গোকুল হোক কি হরিপদ হোক, কাউকে দেখলেই জিজ্ঞেস করে—হ্যাঁ গো, ছোটমশাই নিচেয় নামবেন না?

সেই সেদিন থেকেই ছোটমশাই-এর অসুখ। কাছারি বাড়িতেও আসেন না। দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়া করে আবার আর একবার যায় রাজবাড়িতে। তখন

দুপুরবেলা ঘুম থেকে একবার ছোটমশাই নিচেয় নামেন। কাছারিবাড়িতে আসেন। খাতাপত্র দেখেন। ক'দিন ধরে তা-ও করছেন না।

পথে দুর্গার সঙ্গে হঠাৎ দেখা। দুর্গাই আগ্ বাড়িয়ে বললে।

বললে—আর ভাবনা নেই গো শোভারাম, তোমার মেয়েকে পাওয়া গিয়েছে—

শোভারাম তো অবাক! এতদিন পরে পাওয়া গেল?

একেবারে দুর্গার মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়ালো। কোথায় পেলে গো? কী করে পেলে?

দুর্গা বললে—বড় কষ্ট করতে হয়েছে গো! তিন-দিন তিন-রাত অষ্টসিন্ধি জপ করলাম। জপ করতে করতে দেবলোক নরলোক গন্ধর্বলোক সব খুঁজে খুঁজে হয়রাণ। শেষকালে গেলাম, দৈত্যলোকে, গিয়ে দেখি ছুঁড়ী ঘাপ্‌টি মেরে বসে আছে। তখন চুলের মুঠি ধরে হিড় হিড় করে টানতে টানতে নিয়ে এলুম। বললুম—চল্ ছুঁড়ি, চল্, তোর বাপ এদিকে কান্নাকাটি করে মরছে, আর তুই এখেনে ঘাপ্‌টি মেরে বসে আছিস। চল্—

কথাগুলো শুনতে শুনতে শোভারাম একেবারে মাটিতে বসে পড়লো। শোভারামের কান্ড দেখে এতদিন সবাই তাকে পাগল বলেছে। পাগল ছাড়া আর কী। মেয়ে পালিয়ে গেছে বলে মানুষ বিবাগী হয়েছে এমন ঘটনা কেউ আগে শোনেনি। আর চলে গেছে তো বেশ করেছে। মেয়ে তো গলার কাঁটা গো। তার বিয়েও দিতে হবে আবার চিরকাল তার ভালো-মন্দও দেখতে হবে।

শোভারাম সেই অবস্থাতেই যেন কেঁদে ফেলবার জোগাড় করলে। জিজ্ঞেস করলে—মরি আমার কেমন আছে দুগ্যা? আমাকে ছেড়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছে তো তার?

—তা কষ্ট হবে না? বাপ বলে কথা! আমি খুব শুনিয়ে দিলুম তাকে,—বললুম—হ্যাঁ লা ছুঁড়ি, তোর বাপ ওদিকে কেঁদে কেঁদে হন্যে হয়ে বেড়াচ্ছে, আর তুই এখেনে ঘাপটি মেরে লুকিয়ে আছিস? তোর আক্কেল তো খুব লা?

—তুমি বললে তাকে এই কথা?

—বলবো না তো কি ভয়ে চুপ করে থাকবো?

শোভারাম বললে—তা তো বটেই, তা জিজ্ঞেস করলে না কেন যে, পুষ্যানক্ষত্রে শ্বেতজয়ন্তীর শেকড় খেতে গেল কেন সে? কেন মরতে ও-বিষ খেতে গিয়েছিল? আমি কী অপরাধটা করেছিলুম?

—জিজ্ঞেস করেছি। আমি ছাড়িনি। মুখপুড়িকে আমি জিজ্ঞেস করেছি—তুই আর খাবার জিনিস পেলিনে? পুষ্যানক্ষত্রে শ্বেতজয়ন্তীর শেকড় কেউ খায় রে?

—তা কী বললে সে?

—কিছুতেই জবাব দেয় না সে-কথার। আমাকে তো চেনে না। আমিও তেমনি মেয়ে। আমি তখন স্তম্ভন আরম্ভ করলুম। আমার কাছে দুধ-অপরাজিতার শেকড় ছিল, তাই মুখে পুরে দিয়ে আচিন্ত্যের পরী-সাধন মন্তরটা জপ করতে লাগলুম। তখন যাবে কোথায়, গড় গড় করে সব বলে ফেললে—

—কী বললে?

—বললে—আমি যা ভেবেছি তাই ঠিক—বর পছন্দ হয়নি!

শোভারাম আরো অবাক হয়ে গেল। বললে—তা বর পছন্দ হয়নি বলে নিজের বাপকে ত্যাগ করে গেল সে? অ্যাদ্দিন যে তাকে খাওয়ালুম পরালুম, মানুষ করলুম, তার কিছু দাম নেই রে? আমার কথাও একবার তার মনে পড়লো না? এই যে আমার খাওয়া নেই দাওয়া নেই ঘুম নেই, সেটাও কিছু নয়?

দুর্গা বললে—আমি তাও বলিছি, আমি ছাড়িনি। বললুম—তুই নিজের বাপকে যে এত কষ্ট দিলি এতে কি তোর ভালো হবে ভেবেছিস? তোর মেয়ে হলে তোকেও যে সে এমনি করে ভোগাবে রে!

—না না দুগ্যা! আমি যেমন ভুগছি, মরি যেন এমন করে না ভোগে। আমাকে ছেড়ে যদি সে সুখী থাকে তো তাও ভালো। এমন কষ্ট যেন কেউ না পায়! তা থাক্‌গে, মরি কোথায় আছে এখন—

দুর্গা বললে—সেই কথাই তো তোমাকে বলছি শোভারাম, মেয়েকে তো তোমার এনেচি, কিন্তু একটা কথা আছে...

—কী কথা?

—দৈত্যলোক থেকে তোমার মেয়েকে তো ছাড়িয়ে আনছি, এমন সময় দৈত্যরাজ ধরলে আমাকে, বললে মরালীকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছিস? আমি বললুম—মহারাজ, এর বাপ কান্নাকাটি করছে, একে একবার দেখতে চায় সে। সে বড় দুঃখী মানুষ। এই মেয়ে ছাড়া তার কেউ নেই। অনেক করে বলতে তবে বোধহয় একটু মায়া হলো বেটার। বললে—নিয়ে যা তার মেয়েকে, কিন্তু খবরদার বলছি, এর বাপ যদি এর মুখের দিকে একবার চেয়ে দেখে তো আবার এখেনে টেনে নিয়ে আসবো—

—তা নিজের মেয়ের দিকে মুখ তুলে চাইতে পারবো না?

—না বাপু না, চাইতেও পারবে না, আর তোমার মেয়েকে যে ফিরে পেয়েছো তাও কাউকে বলতে পারবে না।

শোভারাম কেঁদে ফেললে—ও দুগ্যা, তাহলে আমি বাঁচবো কী নিয়ে?

দুর্গা বললে—তাহলে তুমি নিজেই বাঁচো, মেয়ের কথা আর মুখে এনো না। আমাকে বাপু দৈত্যরাজ পই-পই করে ওই কথা বলে রেখেছে, আমি কী করবো, আমি তবু অনেক কষ্ট করে তোমার মেয়েকে যে খুঁজে বার করতে পেরেছি এই-ই যথেষ্ট! আমি এখন চলি গো, আমার অনেক কাজ ওদিকে...

শোভারাম পেছন পেছন গেল। বললে—তা সে কোথায় আছে তা তো বললে না গো!

—কোথায় আবার, রাজবাড়িতে! রাজবাড়িতেই লুকিয়ে রেখেছি, নইলে তো তোমারই বিপদ, তুমি আবার কোন্‌দিন মেয়েকে দেখে ফেলবে—তখন তোমারও সব্বোনাশ, মরিরও সব্বোনাশ—

—তা তার সঙ্গে একবার কথাও বলতে পারবো না আমি?

দুর্গা বললে—কথা আমি তার সঙ্গে বলিয়ে দেবো, কিন্তু দেখা না-করলেই হলো!

—কখন কথা বলবো?

—সে তোমায় আমি খবর দেবোখ'ন—বলে খর্‌খর করে দুর্গা রাজবাড়ির দিকে চলে গেল। শোভারামও পেছন-পেছন গেল। কিন্তু দুর্গার তখন আর সময় নেই। সেই রাজবাড়ির দেউড়ির সামনে দাঁড়িয়েই খানিকক্ষণ বোবার মতন চার-দিকে চেয়ে রইলো শোভারাম।

জগা খাজাঞ্চি হন্তদন্ত হয়ে আসছিল রাজবাড়ির দিকে। সে শোভারামের দিকে চেয়ে অবাক হয়ে গেল। বললে—কীরে, এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কী করছিস, একলা?

শোভারাম তবু উত্তর দেয় না। সে যেন জগা খাজাঞ্চিকে চিনতেই পারলে না। দেখা হলে জগা খাজাঞ্চিকে বরাবর প্রণাম করে এসেছে আগে। আজ যেন জগা খাজাঞ্চি কে-না-কে!

—কী রে, কথা বলছিস না কেন? কী হলো তোর? ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে দেখছিস কী?

তবু উত্তর দেয় না শোভারাম। সরকারমশাই আসছিল খাতাপত্তোর নিয়ে। সে-ও দাঁড়িয়ে গেল।

—শোভারামের কী হয়েছে বলো তো সরকারমশাই? পাগল হয়ে গেল নাকি?

সরকারমশাইও থমকে দাঁড়ালো। ভালো করে চেয়ে দেখলে শোভারামের দিকে। জিজ্ঞেস করলে—কী রে শোভারাম, কী হয়েছে তোর? অসুখ করেছে?

শোভারাম বিড় বিড় করে বললে—দৈত্যরাজ...

—দৈত্যরাজ? সে আবার কে রে বাবা? কোথায় দৈত্যরাজ? দৈত্যরাজ কী করেছে তোর?

দেখতে দেখতে আরো কয়েকজন লোক জড়ো হয়ে গেল দেউড়ির সামনে। অতিথিশালায় যারা সেদিন এসে জুটেছিল তারাও বাইরে এসে মজা দেখতে লাগলো। হরিপদ, গোকুল তারাও এসে দাঁড়ালো।

শোভারাম তখন হঠাৎ বলে উঠলো—অষ্টসিদ্ধি...

একজন বললে—পাগল বুঝি লোকটা?

আর একজন চিনতে পেরেছে। সে বললে—এ শোভারাম না? সেবার তো এমন ছিল না! এমন হলো কী করে?

—তা পাগলা-কালীর বালা পরিয়ে দেয় না কেন? এর কে আছে গা?

—কে আর থাকবে, কেউই নেই। এক মেয়ে ছিল, সে পালিয়ে যাবার পর থেকেই ওমনি। এবার বেড়েছে দেখছি। আহা—

জগা খাজাঞ্চিবাবু তখন শোভারামের সামনে গিয়ে হাত-মুখ নেড়ে বললে—তুমি বাড়ি যাও শোভারাম, বাড়িতে গিয়ে চুপ-চাপ শুয়ে থাকো গে, বুঝলে?

সরকারমশাই বললে—ইস্, মাথাটা একদম খারাপ হয়ে গেল গো—

গোকুলও দেখছিল সব। সামনে এগিয়ে এসে বললে—ও শোভারাম, শোভারাম—

—অ্যাঁ?

শোভারাম চাইলে গোকুলের মুখের দিকে।

গোকুল জিজ্ঞেস করলে—কী হয়েছে তোমার বলো তো, কী হয়েছে? আমাকে চিনতে পারছো? আমি কে বলো তো?

শোভারাম আবার বিড়-বিড় করে বলে উঠলো—অষ্টসিদ্ধি...

সরকারমশাই বলে উঠলো—এই রে, মাথাটা খেয়েছে একেবারে, যা গোকুল, ওকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আয়—

ভিড়ের মধ্যে এতক্ষণ একজন চুপি চুপি সব শুনছিল। অতিথিশালার লোকজন, গোকুল, হরিপদ, জগা খাজাঞ্চিবাবু, সরকারমশাই সবাই যখন একটার

পর একটা প্রশ্ন করে চলেছে তখন সে লোকটা সকলের দিকে তীক্ষ্ম দৃষ্টি দিয়ে চেয়ে দেখছিল। তারপর যখন গোকুল শোভারামকে নিয়ে তার বাড়ির দিকে পৌঁছিয়ে দিতে গেল তখনো সে-লোকটা সঙ্গে সঙ্গে চলেছে।

গোকুল বলছিল—তুমি একটু মেয়ের কথা ভাবা ছেড়ে দাও দিকিনি—ধরে নাও না মেয়ে তোমার মরে গেছে শোভারাম। চিরটা কাল কি আর সবাই বাঁচে? তোমার নিজের শরীরটার দিকেও তো দেখতে হবে? ধরে নাও না মেয়ে তোমার সুখে আছে, ধরে নাও না মেয়েকে তোমার নবাবের লোক চুরি করে নিয়ে গেছে। চুরি কি হয় না? তা বলে তাই নিয়ে ভেবে ভেবে তুমি নিজের মাথাটা খারাপ করবে?

শোভারাম বললে—দৈত্যরাজ...

—কী ছাই বাজে কথা বলছো? দৈত্যরাজের মাথায় মারি ঝ্যাঁটা! কোথায় দৈত্যরাজ? দৈত্যরাজ তোমার মেয়েকে চুরি করে নিয়ে গেছে, কে বললে? কে বলেছে শুনি? বিশু? হরিপদ? দুগ্যা?

শোভারাম হঠাৎ বলে উঠলো—দুগ্যা...

গোকুল এক ধম্‌কানি দিলে—ধ্যেৎ, দুগ্যা আর বলবার লোক পেলে না, তোমাকে বলতে গেছে। দুগ্যা কি নবাবকে দেখেছে? দুর্গার চোদ্দপুরুষ নবাবকে দেখেছে? আর নবাবের কি মেয়েছেলের অভাব যে তোমার একফোঁটা মেয়েকে চুরি করে নিয়ে যাবে?

শোভারাম আবার দুম করে বলে উঠলো—অষ্টসিদ্ধি...

গোকুল সে-কথায় কান না দিয়ে বাইরে থেকে ডাকলে—ও নয়ানপিসি, পিসি—

ডাকতে ডাকতে দু'জনেই বাড়ির ভেতরে চলে গেল। সঙ্গে অন্য যারা ছিল তারাও সদর পেরিয়ে বাড়ির উঠোনে ঢুকলো।

লোকটা এতক্ষণ সব দেখছিল, শুনছিল, তারপর সবাই যখন ভেতরে গেল, তখন সোজা উল্টোদিকে চলতে লাগলো। তারপর যখন খানিকটা এসে মুসলমান পাড়ায় পা দিয়েছে, তখন আরো জোরে পা চালিয়ে দিয়েছে। তারপর এক দৌড়ে সোজা একেবারে ডিহিদারের দফ্‌তরে গিয়ে হাজির। বাইরে 'ফিরিঙ্গি'কে দেখেই বোঝা গিয়েছিল, রেজা আলি ভেতরে আছে। লোকটা ভেতরে যেতেই রেজা আলি তাকিয়ে দেখলে।

—কী রে জনার্দন, হাঁফাচ্ছিস কেন? কেউ তাড়া করেছে?

জনার্দন বললে—হুজুর, খবর আছে—

—কী খবর? নেসার সাহেবের সঙ্গে মোলাকাত্‌ হলো?

—হয়েছে হুজুর, কিন্তু মুর্শিদাবাদে বড় গোলমাল চলছে। গুজব রটেছে যে ফিরিঙ্গীদের সঙ্গে লড়াই বাধবে।

রেজা আলি জিজ্ঞেস করলে—নবাবের এখন মেজাজ কেমন?

—হুজুর, নবাব তো সকলকে তলব দিয়েছিল মতিঝিলে। মেহেদী নেসার সাহেব, মোহনলালজী, মীরমদনজী, মীরজাফর সাহেব, সবাইকে ডেকে একটা ফয়শালা করবার চেষ্টা করেছে। মীরজাফর সাহেবকে খুব বুঝিয়ে বলেছে নবাব যে, তুমি হচ্ছ আমার পুরোন আত্মীয়, আমার ঘরের লোক, তুমি যদি আমার এই বিপদের দিনে না দেখ তো কে দেখবে? তোমার ওপর ভরসা করেই তো আমি মস্‌নদে বসেছি।

—মীরজাফর সাহেবের সঙ্গে তাহলে নবাবের দোস্তি হয়ে গেছে আবার?

জনার্দন বললে—হুজুর, আমি তো শুনলুম সকলের সামনে নবাব মীরজাফর

সাহেবের হাত ধরে নাকি কেঁদেছে—নাকি কাঁদতে কাঁদতে মীরজাফর সাহেবকে দুই হাত দিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরেছে—

—এত দূর গড়িয়েছে তাহলে?

—হুজুর, নেয়ামত্ তো তাই আমাকে বললে।

—নেয়ামত্ কে?

—আজ্ঞে, মতিঝিলের খিদ্‌মদ্‌গার। তাকে খুব পান-জর্দা কাশীর খুশ্‌বু কিমাম খাইয়ে তো হাত করেছিলাম। খুব করে তোয়াজ করে তাকে জিজ্ঞেস করলুম—ইয়ার, সেদিন মতিঝিলের জমায়েতে কী সব সল্লা হলো বলো আমাকে—ও তো সব আড়ালে লুকিয়ে লুকিয়ে শোনে, মেহেদী নেসার সাহেবকে তো ও-ই চেহেল্-সুতুন থেকে ডেকে এনেছিল। ও বলছিল—মালুম হচ্ছে শায়েদ লড়াই হবে। নবাবের কথায় মীরজাফরের মন টলেছে, নবাবের কান্না দেখে মীরজাফর সাহেব আর চুপ করে থাকতে পারেনি, মীরজাফর সাহেবের চোখ দিয়েও নাকি পানি পড়ছিল—

রেজা আলি কথাটা শুনে নিজের মনেই কী যেন মতলব আঁটতে লাগলো।

জনার্দন হঠাৎ আবার বললে—হুজুর, আর একটা কথা—

বলে আরো কাছে সরে এল।

—আর একটা কথা। কথাটা কারোর সামনে বলতে চাই না হুজুর। হুজুরের নিমক খাই, তাই হুজুরকেই বলছি। হাতিয়াগড়ে এসে দেখি রাজবাড়ির সামনে খুব ভিড়।

—কেন? জানাজানি হয়ে গেছে নাকি?

—সেই কথাই তো বলছি। সেই যে মেয়েটা পালিয়ে গিয়েছিল বিয়ের রাত্তিরে, শুনেছেন তো? সেই যে সেই মরালী? তার বাপ শোভারাম, সেই শোভারামটা হঠাৎ দেখি পাগল হয়ে গেছে, একেবারে বদ্ধ পাগল। এতদিন মেয়েটা পালিয়ে গিয়েছে, তাতে কিছু হয়নি, হঠাৎ এখন অ্যাদ্দিন পরে পাগল হলো কেন? আমার তো হুজুর একটা সন্দেহ হচ্ছে।

—কী?

—হুজুর, আমরা সেদিন রাণীবিবিকে বজ্‌রা করে কাটোয়া পাঠিয়ে দিয়েছি, কিন্তু কাকে পাঠাচ্ছি তা তো পরখ্ করে দেখিনি হুজুর! অন্ধকারে ঘোমটা দিয়ে তাঞ্জামে তোলবার পর দরওয়াজা বন্ধ করে দিয়ে দিলুম। কিন্তু মুখ তো দেখিনি, যদি ভেজাল মাল পাঠিয়ে থাকে দুষমনি করে?

—কে দুষমনি করবে? হাতিয়াগড়ের রাজা? ওটা তো একটা আস্‌লি উজ্‌বুক রে। আর ও তো তখন কোঠিতে ছিল না—কেষ্টনগরে মহারাজের সঙ্গে সল্লা করতে গিয়েছিল—

—কিন্তু বড় রাণীবিবি তো ছিল হুজুর। সে তো দুষমনি করতে পারে? আর ওই ঝিটা! দুগ্যা! ওই দুগ্যামাগীটা হুজুর কুট্‌নী! ও সব পারে। ভেজাল মালকে আসল মাল বলে অনায়াসে চালিয়ে দিতে পারে! নইলে শোভারাম হঠাৎ পাগল হয়ে যাবে কেন, হুজুর, তাই বলুন!

রেজা আলি ডিহিদার মানুষ। হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় কাজ করে না কখনো। অনেক দিন থেকে ডিহিদারি করে আসছে। আগে প্রথম জীবনে মুর্শিদাবাদের নিজামতে আমীন কাছারি ছিল। তারপর নিজের বুদ্ধির কেরামতিতে একদিন দারোগা-কাছারি হয়েছিল। তারপর ধাপে ধাপে হুজুর-নবীস, খাস-নবীস, মস্-

রেফ্, মুস্তোফি হয়ে শেষ পর্যন্ত ডিহিদার। এর পরে যদি ফৌজদার হতে পারে তবেই জিন্দগী খুশ্ হয়ে যাবে রেজা আলির। সেই পথটাই এতদিন খুঁজে পাচ্ছিল না। জনার্দনের কথায় যেন আবার বিদ্যুৎ চম্কে উঠলো মগজের মধ্যে! তোবা! তোবা! এই তো সুযোগ!

—আর হুজুর, এত বড় কান্ড ঘটে গেল, জগা খাজাঞ্চি কি কানুনগো-কাছারির সরকার কিছুই জানতে পারলে না, এতেও আমার বড় সন্দেহ হচ্ছে হুজুর!

—তাহলে এক কাজ কর্ তুই জনার্দন!

—কী কাজ, বলুন হুজুর!

রেজা আলি নিজের ডান হাতের একটা আঙুল দিয়ে নিজের কপালে টোকা মারলে। অর্থাৎ মতলবটা মগজে এবার পাকা হয়ে বসে গেছে। বললে—তুই এক কাজ কর্,—ওই শোভারাম বেটা তো মস্তানা হয়ে গেছে, ঠিক তো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর! আমি নিজের চোখেই তো সেটা দেখে এলুম—

—তাহলে ছোটমশাইএর নকরের কাম করবে কে? ওকে দিয়ে তো আর কাম চলবে না। অন্য নকর তো দরকার। তুই গিয়ে ওর নোক্রিটা নে। আমিও তোর তলব দেবো, রাজবাড়ি থেকেও তলব পাবি। দুনো আয় করবি—আর ভেতরের খবর জেনে নিবি—যা—

জনার্দন ভক্তিতে গদ্গদ হয়ে বার বার মাথা নুইয়ে কুর্নিশ করতে লাগলো রেজা আলিকে—হুজুর, দেখবেন হুজুর গরীবকে, এ গরীব কাফের বটে, কিন্তু হুজুরের নিমক খায়, নিজামতের একটা পাকা নোকরি আমাকে করে দিতে হবে হুজুর। বড় গরীব আমি হুজুর, হুজুর মেহেরবান...

—আচ্ছা, তুই এখন যা, দেখি তুই কেমন কাম হাঁসিল করিস—বলে রেজা আলি আবার মৌচে 'তা' দিতে লাগল। মনে মনে আবার বলতে লাগলো—তোবা! তোবা! এই তো সুযোগ! মেহেদী নেসার সাহেবকে কেরামতি দেখাবার এই-ই তো সুযোগ।

বাঙলার অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধের ইতিহাস বড় বেদনার ইতিহাস। মুর্শিদকুলী খাঁ থেকে শুরু করে, সুজাউদ্দীন, রায়-রায়ান আলমচাঁদ, সরফরাজ খাঁ, আলীবর্দী, হাজী মহম্মদের পর যে-ইতিহাস সে-ইতিহাস নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলা, রাজবল্লভ, জগৎশেঠ, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের ইতিহাস। মীরজাফর, মোহনলাল, ক্লাইভ, ড্রেক, উমিচাঁদ, ম্যানিংহাম, কিলপ্যাট্রিক, ওয়াটস্-এর ইতিহাস। ফরাসী ডাচ্ পর্তুগীজদেরও ইতিহাস। বাংলার ইতিহাসই ভারতবর্ষের ইতিহাস। এই শোভারাম, জনার্দন, ষষ্ঠীপদ, সচ্চরিত্র, কান্ত, উদ্ধব দাস, মেহেদী নেসার, দুর্গা, নয়ানপিসি, নন্দরানীরাই সে ইতিহাস সেদিন কালের খাতার পাতার পর পাতা লিখেছিল। আর উদ্ধব দাস শুধু লিখেছিল 'বেগম মেরী বিশ্বাস'।

আজ থেকে প্রায় দু'শো বছর আগের মানুষ আজকের মতই ভালবেসেছিল, ষড়যন্ত্র করেছিল, খুন করেছিল আর স্বার্থসিদ্ধি করেছিল। সেদিনও দেশের মানুষ এমনি করেই অসহায়ের মত ভাগ্যের হাতে নিজেদের ছেড়ে দিয়ে নিরাপদ মনে করেছিল। যে নবাব সে দেশের কথা ভাবুক, যে মন্ত্রী সে মন্ত্রণা দিক, তোমার আমার কিছু করবার নেই। এসো আমরা সবাই মিলে দুটো পয়সা

উপায়ের চেষ্টা দেখি। তুমি রাজা, তুমি আমাকে জায়গীর দাও, আমাকে খেতে পরতে দাও, আমি তোমাকে নিয়ে 'অন্নদামঙ্গল' মহাকাব্য লিখব। আমি লিখে দেবো—ভবানন্দ মজুমদার দেবীর বরপুত্র। তুমি অন্যায় করো, অত্যাচার করো, উৎপীড়ন করো, তাতে কিছু ক্ষতি নেই। আমি আমার মহাকাব্যে তোমাকে দেবতা করে তুলবো।

তাই উদ্ধব দাস বলতো—আমিও এক কাব্য লিখবো গো, আমিও লিখবো—

মোল্লাহাটের মধুসূদন কর্মকার জিজ্ঞেস করতো—তা তুমিও কি রায়গুণাকর ভারতচন্দোরের মত অন্নদামঙ্গল লিখবে নাকি?

—আজ্ঞে না প্রভু, রায়গুণাকর তো ঘুষ খেয়ে মিথ্যে কথা লিখেছে—

—ঘুষ খেয়ে? তুমি বলছ কি দাসমশাই?

—হ্যাঁ গো, আমি ঠিক বলছি। রায়গুণাকর তো ঘরের ঢেঁকি কুমীর। নইলে প্রতাপাদিত্য গেল, কেদার রায় গেল, চাঁদ রায় গেল, ভবানন্দ মজুমদারকেই বীরস্য বীর তৈরি করলে, রায়গুণাকর!

—তা তুমি কাকে নিয়ে লিখবে?

উদ্ধব দাস বলতো—তাকে তোমরা জানো না, তার নাম বেগম মেরী বিশ্বাস!

—ওমা, সে আবার কে গো?

—সে যখন লিখবো তখন তোমরা দেখতে পাবে।

উদ্ধব দাস হাসতো আর বলতো—সে-সব কী দিন গেছে, তোমরা তো জানো না, এখন তো ফিরিঙ্গী রাজত্ব, এখন তো তোমরা সে সব কথা ভুলে গেছ। কিন্তু আমি ভুলিনি গো! সে ভোলবার নয়—

সত্যিই উদ্ধব দাস কিছুই লিখতে ভোলেনি। যা দেখেছে, যা শুনেছে, সব লিখেছে। কাটোয়ার গঙ্গার ঘাট থেকে অনেক দূর যেতে যেতে হঠাৎ মনে হলো এদিকে গিয়ে আর লাভ কী! ডিহিদারের লোক পালকি নিয়ে আসতেই উদ্ধব দাসকে তাড়িয়ে দিয়েছিল।

—আরে এখানে এ লোকটা কেন? ভাগো ভাগো হিঁয়াসে—

ঠিক আছে! উদ্ধব দাসকে খাতির করলেও যা, তাড়িয়ে দিলেও তাই। নির্বিকার। একদিন আমাকে তাড়িয়ে দিয়ে তোমরা রাজত্ব করছ, আবার একদিন তোমাদের তাড়িয়ে দিয়ে আর-একজনরা রাজত্ব করবে! কেউ এখানে চিরটা কাল রাজত্ব করতে আসেনি। এইটেই যে নিয়ম গো। চিরটা কাল রাজত্ব করবে শুধু সেই একজন। সে-ই মালিক। তা তুই এত বড় ঘুষখোর, সেই আসল মালিককে ছেড়ে দিয়ে ভবানন্দ মজুমদারের গুণ গাইলি?

যশোর নগর ধাম
প্রতাপ আদিত্য নাম
মহারাজ বঙ্গজ কায়স্থ।
নাহি মানে পাতশায়
কেহ নাহি আঁটে তায়
ভয়ে যত ভূপতি দ্বারস্থ।
তার খুড়া মহাশয়
আছিল বসন্ত রায়,
রাজা তারে সবংশে কাটিল।

তার বেটা কচু রায়,
রানী বাঁচাইল তায়,
জাহাঙ্গীরে সে-ই জানাইল।
ক্রোধ হইল পাতশায়
বান্ধিয়া আনিতে তায়
রাজা মানসিংহে পাঠাইলা।
বাইশী লস্কর সঙ্গে
কচু রায় লয়ে বঙ্গে
মানসিংহ বাঙ্গালা আইলা।

কচু লেখা। নিমকহারাম মানসিংহের দাস ভবানন্দকে দেবতা বানিয়ে কী লাভ হলো শুনি তোর? সত্যি কথা লিখলে তোকে উপাধি দেবে না বলে? ছাই, ছাই, উপাধির মুখে ঝ্যাঁটা মারি! আমি কাকে ভয় করি গো? আমার কাউকে ভয় করতে বয়ে গেছে। আমি লিখবো সত্যি কথা। আমি লিখবো আর একখানা অন্নদামঙ্গল।

এমনি করেই পাটুলীর রাস্তা দিয়ে চলছিল উদ্ধব দাস। হঠাৎ সামনে কাকে দেখে থমকে গেল। কে গো তুমি মশাই। তোমাকে চেনা-চেনা ঠেকছে যেন?

উল্টো দিক দিয়ে আর একটা লোকও আসছিল। হাতে কতকগুলি পুঁথি-পত্র। উদ্ধব দাসকে দেখে মুখটা আড়াল করে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল। কী গো? অমন করে আমাকে দেখে পালিয়ে যাচ্ছো কেন?

লোকটা এবার দৌড়তে লাগলো। উদ্ধব দাসও দৌড়তে লাগলো। ধর ধর ওকে। ধর!

চিৎকার শুনে ক্ষেতের কিছু লোক দৌড়ে এসেছে। তারাই ধরে ফেললে লোকটাকে! লোকটা বুড়ো মতন। ধরতেই কেঁদে ফেলেছে একেবারে হাউ-হাউ করে। একেবারে অঝোর ধারায় কান্না।

—আরে, সচ্চরিত্র পুরকায়স্থ না?

চিনতে পেরেছে উদ্ধব দাস। এই সচ্চরিত্রই ঘটকালি করেছিল বিয়েটার।

—আজ্ঞে আমাকে ছুঁয়ে দিলেন? আমার যে জাত গেছে! আমার জাত-কুল-পেশা সব যে গেছে, আমার বউ-ছেলে-মেয়ে সব গেছে—

বলে হাউ-হাউ করে কাঁদতে লাগলো সচ্চরিত্র।

উদ্ধব দাস হেসে উঠলো হো হো করে। বললে—কেন গো? কীসে গেল তোমার জাত, শুনি?

সচ্চরিত্র বললে—আমাকে ম্লেচ্ছ-মাংস খাইয়ে দিয়েছে গো ধরে-বেঁধে। আমি খেতে চাইনি গো, জোর করে আমার মুখে পুরে দিয়েছে...

পাটুলীর যে-লোকগুলো এতক্ষণ শুনছিল তারা কানে আঙুল দিয়ে আস্তে আস্তে সরে পড়বার চেষ্টা করতে লাগলো।

—আমাকে ছেড়ে দাও গো বাবাজী, আমাকে ছেড়ে দাও—

উদ্ধব দাস বললে—তোমার জাত তো বড় ঠুনকো পুরকায়স্থ মশাই, আমি তো যেখানে-সেখানে যা-তা খাই, আমার তো জাত যায়নি। এই তো তোমাকে আবার ছুঁচ্ছি, আমার তো জাত যাচ্ছে না, কই—

—তাহলে আমার কী হবে বাবাজী! আমাকে যে মুর্শিদাবাদের মস্‌জিদের ইমাম সাহেব নিজের বাড়িতে রেখে সারিয়ে তুলেছে, আমি যে সেখানে তিন রাত্তির কাটিয়েছি—সবাই যে সে-কথা জানে। আমার কী হবে?

উন্ধব দাস বললে—কলা হবে, কচু হবে—

—তুমি তো বললে কলা হবে, কিন্তু আমাকে দিয়ে যে কেউ আর ঘটকালি করাবে না, আমি কী খাবো? আমি যে ঈশ্বর কালীবর ঘটকের পৌত্র, ইন্দীবর ঘটকের পুত্র...

উন্ধব দাস বললে—আমাকে কে খাওয়ায়? আমি কার পুত্র? আমি কার পৌত্র?

সচ্চরিত্র পুরকায়স্থ খানিকক্ষণ হাঁ করে চেয়ে রইলো উন্ধব দাসের দিকে। তারপর জিজ্ঞেস করলে—তাহলে গাঁয়ের লোক আমাকে তাড়িয়ে দিলে কেন? সিন্ধান্তবারিধি মশাই আমাকে একঘরে করলেন কেন? আমার বউ-ছেলে-মেয়ে আমাকে বাড়িতে ঢুকতে দিলে না কেন? আমি অপরাধ না করলে কি শুদ্ধ তারা আমাকে ন্যাকাল করলে?

উন্ধব দাস হঠাৎ গান গেয়ে উঠলো—

তারা, আর কি ক্ষতি হবে।
তুমি নেবে যবে, সবই নেবে, প্রাণকে আমার নেবে।
থাকে থাকবে, যায় যাবে, এ-প্রাণ গেলে যাবে।
যদি অভয় পদে মন থাকে তো কাজ কি আমার ভবে॥
তুমি নিজেই যদি আপন তরী ডুবাও ভবার্ণবে।
আমি ডুব দিয়ে জল খাবো তবু, অভয় পদে ডুবে—

সচ্চরিত্র পুরকায়স্থর হাতটা তখনো ধরে আছে উন্ধব দাস। হঠাৎ একটা ঝট্‌কা মেরে সচ্চরিত্র নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নিলে। তারপর এক দৌড়ে দূরে পালিয়ে গেল। চেঁচিয়ে বলতে লাগলো—আমাকে পাগল পেয়েছো বাবাজী, আমি কি পাগল? আমার সংসার-ধর্ম নেই? আমাকে পাগল করতে চাও—

উন্ধব দাস হেসে উঠলো। চেঁচিয়ে উঠলো। বললে—সবাই পাগল গো, সবাই পাগল, এ সংসারে সবাই পাগল, কেউ বিষয়-পাগল, কেউ মেয়েমানুষ-পাগল, কেউ নাম-পাগল। পাগলা বদ্‌নাম শুধু এই পাগল উন্ধব দাসের—

কিন্তু যার উদ্দেশ্যে বলা সে-তখন পাঁই-পাঁই করে দৌড়চ্ছে। উন্ধব দাস হেসে উঠলো খানিকটা সেই দিকে চেয়ে চেয়ে! গান গাইলেই পাগলামি বলে। আসলে সবাই পাগল হয়ে গেল। দেশটা পাগলে ভরে গেল, তবু উন্ধব দাসকেই সবাই পাগল ভাবে। তাজ্জব দেশ প্রভু, তাজ্জব দেশ।

সারা দিন খাওয়া হয়নি উন্ধব দাসের। মাথার ওপর রোদ উঠছে। বড় চড়া রোদ। কাঁধের চাদরটা মাথায় বেঁধে নিয়ে আবার পায়ে হাঁটা দিলে। কিন্তু কিছু দূর যেতেই হঠাৎ আবার কার দপ্‌-দপ্‌ পায়ের শব্দ হলো। পেছন ফিরেই দেখে সচ্চরিত্র আবার সেই দিকেই দৌড়তে দৌড়তে আসছে। একেবারে উর্ধ্বশ্বাসে উন্ধব দাসের দিকেই দৌড়ে আসছে—

উন্ধব দাস একটু থমকে দাঁড়ালো। সচ্চরিত্র কাছাকাছি আসতেই বললে—কী গো, আবার কী হলো?

সচ্চরিত্র সে-কথার উত্তর না দিয়ে পাঁই-পাঁই করে তখনো সামনের দিকেই দৌড়ে আসছে—

—কী হলো গো? আবার ফিরলে কেন?

এবার সচ্চরিত্র উন্ধব দাসকে পাশে রেখে সোজা দৌড়চ্ছে। কথার উত্তর দিলে না। অবাক কাণ্ড! এমন কাণ্ড তো করে না লোকটা! সত্যি সত্যিই পাগল হয়ে

গেল নাকি লোকটা! দেখতে দেখতে দূরে গাছ-পালা-মাঠের ধুলোর মধ্যে সচ্চরিত্র অদৃশ্য হয়ে গেল। সত্যিই অবাক হবার মত ঘটনা। পেছনে তো কেউ তাড়া করছে না। তবে?

হঠাৎ অনেক দূরে মনে হলো যেন আকাশের গায়ে খুব মেঘ করেছে। কেমন হলো? এই দুপুর বেলা কি ঝড় উঠবে নাকি? তাই সচ্চরিত্র পালাচ্ছিল? অনেকক্ষণ দেখতে দেখতে তবে যেন খানিকটা স্পষ্ট হলো। প্রথমে মনে হয়েছিল মেঘ। তা নয়। আসলে হাতীর পাল। হাতীগুলো সার-সার এগিয়ে আসছে। তারপর ঘোড়ার সার। তারপর হাজার-হাজার সেপাই। পাটুলীর জনকয়েক লোক রাস্তায় নেমে দেখতে এসেছিল। তারাও অবাক।

—ও দাসমশাই, দাঁড়িয়ে দেখছো কী? নবাব আসছে, প্যালিয়ে যাও গো—

উদ্ধব দাস জিজ্ঞেস করলে—কেন? পালাবো কেন? কী করেছি আমি?

—ঠিক আছে, বুঝবে মজাটা। নবাব লড়াই করতে যাচ্ছে কলকাতায়—গাঁয়ে যা পাবে সব নেবে, আর কিছু আস্ত রাখবে না৷

সত্যিই তাই। পাটুলীর লোকরা সব গ্রাম ছেড়ে নবাবের রাস্তার উল্টোদিকে একেবারে গঙ্গার ওপারে গিয়ে হাজির। উদ্ধব দাস ঠায় সেখানে দাঁড়িয়ে রইলো। নির্জন জনহীন রাস্তা দিয়ে নবাবের সৈন্যরা এগিয়ে চলেছে। হাতী, ঘোড়া, কামান, বন্দুক, সেপাই সার সার চলেছে। মুর্শিদাবাদ থেকে সেই কোন্ রাত থাকতে বেরিয়েছে। গ্রামের পর গ্রাম পেরিয়ে চলেছে বাঙলাদেশের নবাব। এবার সবাই দেখুক নবাবেরও ক্ষমতা আছে, নবাবেরও সৈন্যসামন্ত আছে। ডাচ, পর্তু-গীজ, ফরাসীরাও একটু শিক্ষা পাক। এ-দেশটা যে নবাবের তার প্রমাণ না দিলে সবাই বড় বেড়ে উঠবে। এই সময়েই সকলকে শিক্ষা দিয়ে দেওয়া ভালো। বুড়ো নবাব আলীবর্দী খাঁ সাহেব যা পারেনি, নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলা তাই পেরে দেখিয়ে দেবে।

আর শুধু পাটুলীই নয়। কলকাতাতেও হুলস্থূল কাণ্ড বেঁধে গেছে। কেল্লার ভেতরে হল্‌ওয়েল সাহেব তখন হোমে আর্জেণ্ট ডেস্‌প্যাচ্ লিখছে৷ এই-ই হয়তো আমাদের শেষ ডেস্‌প্যাচ। আমরা অনেক রকম করে লড়াই ঠেকিয়ে রাখবার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা সম্ভব হলো না। শুনছি নবাব আর্মি নিয়ে কলকাতার দিকে আসছে। এদিকে চীফ স্পাই রাজারাম সিং একটা চিঠি পাঠিয়েছিল উমিচাঁদের কাছে। সে-চিঠি আমরা ধরেছি। সে-চিঠিতে উমি-চাঁদকে কলকাতা ত্যাগ করে প্যালিয়ে যাবার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছিল। উমিচাঁদ লোকটা একটা আস্ত স্কাউণ্ড্রেল। তাকে আমরা অ্যারেস্ট করে ফোর্টে রেখে দিয়েছি। তার প্রপার্টি যাতে কলকাতা থেকে সরিয়ে ফেলতে না পারে সেজন্যেও আমরা কুড়ি জন্ গার্ড বসিয়েছি তার বাড়িতে। উমিচাঁদের চীফ বরকন্দাজ-জমাদার জগমন্ত সিং সে-বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল, পাছে আমাদের হাতে তা পড়ে। বাড়ির জেনানার ভেতরে তেরজন লেডীকে খুন করে ফেলেছিল নিজে হাতে, পাছে আমরা তাদের মলেস্ট করি। শেষকালে নিজেও সে সুইসাইড্ করতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু আমরা তা করতে দিইনি। তাকে ধরে ফেলেছি। ওদিকে রাজা রাজবল্লভের ছেলে কৃষ্ণবল্লভকেও অ্যারেস্ট করে রেখে দিয়েছি। কারণ ইণ্ডিয়ানদের বিশ্বাস নেই। এরা ভয়ানক বিশ্বাসঘাতক লোক। আর বাগবাজারের খালের উল্টোদিকে হুগলী-রিভারের ওপর একটা জাহাজে আঠারোটা কামান সাজিয়ে রেখেছি। দেখি কী হয়। আমরা যুদ্ধ করবোই। এত কষ্ট করে এসে

এখান থেকে আমরা সহজে এখন হটবো না। কেবল মুশকিল হয়েছে একটা। আমাদের সবই দেশী সোলজার। তাদের ওপর ভরসা, আর ম্যাড্রাস থেকে কিছু ইউরোপীয় সোলজার চেয়ে পাঠিয়েছি। আমাদের আর্মিতে বারোজন সোলজার শুধু ইউরোপীয়ান। তাদের সবাইকে পেরিং-পয়েণ্টের পাঁচিল আর ব্রিজ গার্ড দেবার জন্য রাখা হয়েছে। দেখা যাক কী হয়। সবই অনিশ্চিত। যদি আমরা টিঁকে থাকি তো আবার ডেস্‌প্যাচ্‌ পাঠাবো। গড্‌ সেভ্‌ দি কিং।

মুর্শিদাবাদের চক্‌-বাজারেও তখন সব গোলমেলে অবস্থা। সকাল বেলাও কেউ কিছু জানতো না। ভোর রাত্রে কখন কী ঘটেছে, কেউ কিছু জানে না। বেলা হলে তখন জানা গেল। সারাফত আলির খুশ্‌বু তেলের দোকানে মৌতাত তখন বেশ জমে উঠেছে। তামাকের সঙ্গে আফিম মেশালে আর তার সঙ্গে আগর-বাতি জ্বালিয়ে দিলে যা মৌতাত হয় তার মজা সারাফত আলিই জানে!

সন্ধ্যেটা কেটে রাত বাড়লো। তখন সারাফত আলির বেশ ঘোর লেগেছে।

হঠাৎ ডাকলে—বাদ্‌শা—

কান্তও এতদিন ধরে কত রাস্তা হেঁটে সবে একটু বিশ্রাম করবে বলে নিজের আস্তানায় এসে ঢুকেছিল। অন্ধকার ঝুপড়ি ঘর। ঘরের না আছে শ্রী না আছে ছাঁদ। তা হোক, তবু তো একটা আশ্রয়। আজ হয়তো এখানে আসতেই হতো না শেষ পর্যন্ত। কাটোয়ায় রাণীবিবির সঙ্গে পালিয়ে গেলেই হয়তো ভালো হতো। অন্তত রাণীবিবিকে এই অপমানের হাত থেকে তো বাঁচানো যেত। উদ্ধব দাসের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবার পর থেকেই মনটা কেমন বিকল হয়ে গিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত কাটোয়ার ডিহিদার সাহেব এসে যাওয়াতে আর পালিয়ে যাওয়া হয়নি। তারপর থেকে রাণীবিবির সঙ্গে কথাও হয়নি। দেখাই হয়নি তো কথা হবে কী করে। ডিহিদার সাহেব নিজে তাগাদা দিয়ে সেপাই দিয়ে কড়া পাহারা দিতে বলে মুর্শিদাবাদে পাঠিয়ে দিলে।

নিজের ময়লা বিছানার ওপর শুয়েও ভালো করে ঘুম এল না। চক্‌-বাজারে ঢুকেই লড়াই-এর খবরটা শুনেও বেশ খারাপ লেগেছে। বেভারিজ সাহেবের সেই সোরার গদিটার কথাও মনে পড়লো। যদি সে-গদি নবাবের কামানের গোলা লেগে পুড়ে যায়! ক'টাই বা সৈন্য আছে ফিরিঙ্গীদের। নবাবের সঙ্গে কেন ঝগড়া করতে গেল। আহা ষষ্ঠীপদর চাকরিটাও চলে যাবে। কান্ত এখন মুন্সী থাকলে কান্তর চাকরিটাও চলে যেত। শুধু চাকরি নয়, প্রাণটাও হয়তো যেত সেই সঙ্গে সঙ্গে।

—বাবুজী!

বাদ্‌শার গলা।

—কী রে বাদ্‌শা?

—হুজুর, মালিক আপনাকে একদফে এত্তেলা ভেজিয়েছে।

ধড়ফড় করে তাড়াতাড়ি উঠে সারাফত আলির কাছে যেতেই খুশ্‌বুর গন্ধতে কান্তর সমস্ত শরীর অসাড় হয়ে এল।

—সড়ক দিয়ে কোথায় যাচ্ছিলি রে? তাঞ্জামে কোন্‌ বিবি ছিল? নবাব-হারেমের মাল?

সে-কথার উত্তর দিতেও যেন ঘেন্না হতে লাগলো। চরের চাকরি করে বলে সারাফত আলি সাহেবও তাকে যেন তাচ্ছিল্য করতে শুরু করেছে। শুধু বললে—জী, মিঞাসাহেব!

সারাফত আলি বললে—জাহান্নমে যাবি, তা বলে রাখছি, কান্তবাবু। বেশক জাহান্নমে যাবি, দুষমনের লড়াই ফতে হলে ভাবিসনি জিন্দ্‌গী খুশ্‌ হয়ে যাবে, জিন্দ্‌গীর লড়াই ফতে করতে পারিস তো তখন বুঝবো তুই বাহাদুরের বেটা—

আরো কিছু কথা হয়তো বলতো সারাফত আলি সাহেব। কিন্তু নেশার ঝোঁকে তখন চোখ দুটো বুড়োর লাল জবাফুল হয়ে উঠেছে। বেশি কথা বলার হয়তো ক্ষমতাই নেই মিঞা-সাহেবের।

হঠাৎ ও-পাশ থেকে বশীর মিঞার গলা শুনে একটু অবাক হয়ে উঠলো। বশীর মিঞা আবার এত রাত্রে কী জিজ্ঞেস করতে এসেছে। রাণীবিবিকে তো চেহেল্‌-সুতুনের হারেমে পৌঁছিয়েই দিয়েছে। আবার কাউকে আনতে হবে নাকি? একটা কাজ হাঁসিল হতে-না-হতে আবার একটা কাজ?

—কী রে? কী করছিলি? আমি ভাবছিলুম ঘুমিয়ে গেছিস্‌—

—তুই হঠাৎ? আবার কোনো কাজ আছে নাকি?

বশীর মিঞা বললে—না রে, না।—তোর সঙ্গে একটা বাত্‌ আছে, এখানে কেউ নেই তো?

বলে ঘরটার চারদিকে দেখে নিলে। তারপর গলাটা নিচু করে বললে—একটা বাত্‌ বলি তোকে, আজকে যে রাণীবিবিকে এনেছিস্‌, ও আস্‌লি রাণীবিবি তো? না কি দুসরা কাউকে পাঠিয়ে দিয়েছে?

কান্ত অবাক হয়ে গেল। জিজ্ঞেস করলে—কেন?

—তাই তো জিজ্ঞেস করছি তোকে।

কান্ত বললে—কেন? অন্য কোনো রাণীবিবি এসেছে নাকি তার বদলে? অন্য কোনো মেয়ে?

—আরে না, হাতিয়াগড়ের ডিহিদার রেজা আলি শালা বুড়বাক আছে। আমার ফুপাকে খপর পাঠিয়েছে নাকি রাণীবিবির বদলে হাতিয়াগড়ের রাজবাড়ির একটা নফরের ডপ্‌কা মেয়েকে পাঠিয়েছে। শোভারাম না কী তার নাম, তারই নাকি মেয়ে। তুই কিছু জানিস? ফুপা আমাকে গালাগালি করছে। মেহেদী নেসার সাহেব জানলে তো বেত্তমিজি করবে! জানিস্‌ কিছু তুই?

মনে আছে কান্ত সে রাত্রে ঘুমোতে পারেনি। সারাফত আলির খুশ্‌বু তেলের দোকানের পেছন দিকের একটা ছোট ঘরে আস্তানা নিয়েছিল কান্ত। আস্তানাটা নামেই আস্তানা। ওর ভেতরে মানুষ কোনো রকমে থাকতেই শুধু পারে, বেঁচে থাকতে পারে না। কিন্তু সারাফত লোকটা ভালো। একজন গরীব মানুষকে দেখে দয়া করে থাকতে দিয়েছিল শুধু, কিরায়া নিত না। কতকগুলো কাড়ির জার আর মাটির হাড়ি-কলসীর গুদাম ছিল সেটা। সেটাই মালপত্র সরিয়ে কান্তকে থাকবার জন্যে খালি করে দিয়েছিল। সেই অন্ধকার ঘুপসি ঘরের বিছানার ওপর চিৎপাত হয়ে গা এলিয়ে দিয়ে আকাশ-পাতাল শুধু ভাবে

বেড়িয়েছিল। যাকে সে রাণীবিবি ভেবেছিল সেই-ই তাহলে শোভারামের মেয়ে! আশ্চর্য না আশ্চর্য! একবারও যদি জানতে পারতো সে আগে। একবারও যদি কেউ কথাটা বলতো তাকে।

ভোরবেলা বড় মসজিদের আজানের শব্দ শুনেই উঠে পড়লো কান্ত। সময় যেন আর কাটতে চায় না। যেন সূর্য আর উঠবে না চক-বাজারে।

বশীর মিঞা বলেছিল—রেজা আলি শালা ফৌজদার হতে চাইছে, বুঝলি! তাই মেহেদী নেসার সাহেবকে খুসামুদ করতে চাইছে এই করে—

কান্ত বলেছিল—তাহলে কি আসল রাণীবিবিই এসেছে?

—আলবৎ! হাতিয়াগড়ের জমীন্দারের এত বুকের পাটা হবে না যে ঝুটা মাল চালিয়ে দেবে, জমীনদার-বেটা জানে যে নবাবের গোসা হলে তার জমীনদারিই লোপাট হয়ে যাবে।

কান্ত হঠাৎ বললে—কিন্তু ভাই, আমার মনে হচ্ছে হয়তো ডিহিদারের কথাই ঠিক, ওরা বোধ হয় শোভারামের মেয়েকেই পাঠিয়ে দিয়েছে ষড়যন্ত্র করে—

—দূর, দূর—ও-সব রেজা আলির শয়তানি রে! রেজা আলিকে তুই তো চিনিস না। শালা খুব জাঁহাবাজ লোক, কেবল ফৌজদার হতে চাইছে কেরামতি দেখিয়ে—

বশীর মিঞা চলে যাবার পর সমস্ত রাত ধরে কান্ত কেবল ভেবেছিল। ও রাণী-বিবি না মরালী! কে? কাকে সঙ্গে করে এনেছে সে? দুজনের কাউকেই দেখেনি আগে। শোভারামের মেয়ের সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধই হয়েছিল শুধু। সেই পর্যন্ত। ঘটক সচ্চরিত্র পুরকায়স্থর মুখের কথা শুনেই বিয়েটায় রাজি হয়েছিল। শুধু শুনেছিল খুব সৌখীন মেয়ে, ঠোঁটে আলতা লাগায়, দিনরাত তাম্বুল-বিহার দিয়ে পান খায়, পাশা খেলতে ভালবাসে। তার বেশি আর কিছু শোনেনি মরালীর সম্বন্ধে। আর হাতিয়াগড়ের ছোটরানী? তার সম্বন্ধেও যা কিছু শুনেছিল সে-সবই উদ্ধব দাসের কাছ থেকে। খুব নাকি রসিক বউ। উদ্ধব দাসের মুখে রসের গান শুনতে ভালবাসে। তা ছোটরানীও নিশ্চয়ই সুন্দরী। নইলে এক বউ থাকতে আবার বিয়ে করতে গেলেন কেন ছোটমশাই? গরীব-ঘর থেকে কেন আনতে গেলেন আবার একটা বউ? সত্যিই কে ও? কাকে এনেছে সে সঙ্গে করে? রাণীবিবি, না মরালী?

তখনো সারাফত আলির নাক ডাকছে পাশের ঘর থেকে। বড় মসজিদ থেকে আজানের শব্দ কানে আসছে। কান্ত উঠলো বিছানা ছেড়ে। তারপর রাস্তায় বেরোল। কান্তর ধারণা ছিল এ সময়ে চক-বাজারের রাস্তায় এমনিতে কেউ থাকে না। এত ভোরে কেউ ঘুম থেকে ওঠে না। কিন্তু তবু দেখা গেল রাস্তায়-রাস্তায় কোতোয়ালের লোক পাহারা দিচ্ছে। কাল মুর্শিদাবাদে এসেই শুনেছিল, নবাব ফৌজ নিয়ে লড়াই করতে গেছে। মীর বক্সী গেছে, বক্সী আহাদিয়ান গেছে, বক্সী সুবাজাৎরাও সবাই গেছে। জমাদার, হাজারী কেউই বাদ নেই। ফৌজখানা একেবারে ফাঁকা রেখে গেছে। শুধু আছে কোতোয়ালের লোকরা নগরের তদারকিতে। পেছন থেকে যদি কেউ হঠাৎ মুর্শিদাবাদে হামলা করে তার জন্যেই এই কড়া পাহারা।

একটা রাস্তার চৌমাথায় আসতেই ওধার থেকে হাঁকি এল—কৌন্?

—আমি।

আমি বললেও কিছু সুরাহা হলো না। কোতোয়ালের লোক সামনে এগিয়ে

এল। এসে অন্ধকারের মধ্যেই কান্তর মুখখানা ভালো করে পরখ করে দেখলে। তুম কোন?

—আমি কান্ত সরকার। নিজামতের চর—

লোকটা আর কিছু বললে না। শুধু জিজ্ঞেস করলে—কাঁহা যানা হ্যায়?

কান্ত বললে—বশীর মিঞার বাড়িতে, নিজামতের কাজে—

পাঠান নিশ্চয়ই লোকটা। জগৎশেঠজীর মহিমাপুরের বাড়িতে যেমন ভিখু শেখ পাঠান, এও তেমনি। দিল্লী, সাজাহানাবাদ, আগ্রা থেকে সব বেছে বেছে পাঠানদের এনেছে কোতোয়ালের কাজে। এদের গায়েও যেমন জোর, মনেও তেমনি ভয়-ভীত কিছু নেই। হুকুম করলেই বুকের ওপর গুলী করতে পারে নির্বিচারে। এরা বর্গীদের দলেও কাজ করেছে, আবার মোগলদের দলেও আছে। কান্তর মতই টাকা পেলে সকলের নিমক খেতে রাজি।

সদর-কাছারির পাশে মনসুর আলি মেহের সাহেবের আস্তানা। তার বাড়িতেই বশীর থাকে। এত ভোরে সেখানেও হয়তো পাঠান পাহারাদার আছে। হয়তো ঢুকতে দেবে না। এত ভোরে না এলেই ভালো হতো। কিন্তু মনটা কেবল ছটফট করছিল। বশীরের কাছে কথাটা শোনার পর থেকেই মনে হচ্ছিল যদি আর একবার কোনো রকমে রাণীবিবির সঙ্গে দেখা করা যায়। যদি কোনো রকমে একবার চেহেল্-সুতুনের ভেতরে যেতে দেয় বশীর মিঞা। কিন্তু ঢুকতে দেবেই বা কেন? বাইরের লোককে ঢুকতে দেখলে তো খোজারা কোতল করে ফেলবে তাকে। বাইরে থেকে দেখে তো কিছুই বোঝা যায় না। অত বড় প্রাসাদ! মতিঝিল দেখেছে কান্ত, মনসুরগঞ্জ দেখেছে, হীরাঝিলও দেখেছে। কিন্তু চেহেল্-সুতুনের কথাটা ভাবলেই যেন ভয় লাগে। কত মানুষ, কত বেগম, কত রহস্য, কত রোমাঞ্চ জড়িয়ে আছে চেহেল্-সুতুনের সঙ্গে। কত গল্প শুনেছে কান্ত। ভেতরে শুধু মহলের পর মহল। কত ষড়যন্ত্র, কত চোখের জল নিয়ে গড়ে উঠেছে চেহেল্-সুতুন। মুর্শিদ-কুলী খাঁর আমলের বাড়ি। ইঁটের তৈরি। ভেতরে নাকি দরবার ঘর আছে। চল্লিশটা বড় বড় থামের ওপর ছাদটা দাঁড়িয়ে আছে। তারই তলায় দরবার করতেন মুর্শিদকুলী খাঁ। কালো পাথরের বিরাট একটা মসনদ। আকবরনগরের এক মিস্ত্রীর তৈরি, বশীর মিঞা বলেছিল—মুঙ্গেরের নামজাদা কারিগর বোখারার খাজা নজর নিজে তৈরি করেছিল মসনদটা। মুর্শিদকুলী খাঁর সঙ্গে সঙ্গে সব জায়গায় ঘুরেছে সেটা।

—বশীর মিঞা, বশীর মিঞা—

হঠাৎ একটা লাঠি ঠোকার শব্দ হলো পাশে। বাড়িটার চারপাশে ঘুরে ঘুরে পাহারা দিচ্ছিল কে একজন। কান্তর গলা শুনেই অন্ধকার থেকে ভূতের মতন সামনে এসে হাজির হয়েছে। লোকটা কান্তর আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বোধ হয় চিনতে পারলে। বিশেষ কিছু জিজ্ঞেস করলে না। শুধু বললে—মিঞা সাহেব কোঠিতে নেই—

—কোথায় গেছে—কখন দেখা হবে?

এ-প্রশ্নটা অবান্তর। প্রশ্নটা করেই কান্ত নিজের ভুল বুঝতে পারলে। কে কখন কোথায় যাচ্ছে তা জিজ্ঞেস করতে নেই নিজামতের চাকরিতে। কারণ সবাই নিজের-নিজের ধান্ধায় ঘুরছে। আর দিনকাল যা পড়েছে তাতে তো কেউ কাউকে বিশ্বাসই করে না। বিশ্বাস করা উচিতও নয়। কে কার সর্বনাশ করার কথা ভাবছে কে বলতে পারে। সবাই তো নিজের-নিজের উন্নতির কথা ভাবছে। রেজা আলি

ভাবছে কী করে কার সর্বনাশ করে, কাকে তোয়াজ করে ফৌজদার হওয়া যাবে। মীরজাফর ভাবছে কী করে মোহনলালকে খাটো করতে পারবে। উমিচাঁদ ভাবছে কী করে নবাবের বিরুদ্ধে ফিরিঙ্গীদের উস্‌কে দিয়ে তাদের কাছ থেকে বেশি টাকা আদায় করবে। জগৎশেঠজী ভাবছে কী করে নবাবকে জব্দ করা যাবে। মুর্শিদাবাদের রাস্তার লোকগুলো পর্যন্ত সোজা করে কথা বলতে জানে না। সবাই যেন কথা চেপে যায়। অথচ কলকাতা এমন নয়। কেন যে এখানে এল চাকরি করতে! না এলেই ভালো হতো। বড়-চাতরায় গিয়ে নায়েব-নাজিরবাবুদের সেরেস্তায় কাজ নিলেই এর চেয়ে তার অনেক ভালো হতো।

বশীর মিঞা বলেছিল—এ হলো শহর। মুর্শিদাবাদ, এ তো আর তোর কলকাতার মত পাড়া গাঁ নয়—

তা বটে। শহরের লোকগুলোই বোধ হয় এমনি। এ-চাকরিটা ছাড়তে পারলেই হয়তো ভালো হতো। শুধু শুধু একটা পাপ কাজ করতে হলো। অবশ্য পাপটা তার নিজের নয়। কিন্তু যারই হুকুম হোক, এ-পাপের ভাগীদারও তো সে। এ-পাপের কিছু ভাগ তো তার গায়েও লাগবে। রাণীবিবিকে চেহেল্‌-সুতুনের ভেতরে পেঁৗছে দিয়ে আসা এস্তোক মনটা কেমন ভারী হয়ে রয়েছে। কাজটা ভালো করেনি সে। মোটেই ভালো করেনি। রাণীবিবি তো পালিয়েই যেতে চেয়েছিলেন তার সঙ্গে। তাঁকে নিয়ে সেদিন পালিয়ে গেলেই হতো। কথার খেলাপ হতো বটে। কিন্তু তার চেয়ে তো আরো বড় পাপ করলে তাঁকে এখানে নিয়ে এসে। রাণীবিবিই তো পালিয়ে যাবার কথাটা তুলেছিলেন নিজে। কান্তরই শুধু সাহস হয়নি! আর কোতোয়ালের লোকজনও ঠিক সেই সময়ে সেখানে এসে পড়েছিল।

সারা মুর্শিদাবাদ শহরটাই আস্তে আস্তে টহল দিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলো কান্ত। চেহেল্‌-সুতুনের পুব দিকে তোপখানা। সেদিকটায় শুধু যায়নি। আজ পাহারাদাররা ওদিকে কড়া পাহারা লাগিয়েছে। কাউকে ওদিকে যেতে দেখলেই নানান কথা তুলবে। তার পাশেই জাহানকোষা। বিরাট একটা কামান। তার ওপাশে গঙ্গা। গঙ্গার ধারে গিয়ে দাঁড়ালো কান্ত। কিছুই ভালো লাগছে না। মনে হচ্ছিল এখুনি যদি একবার চেহেল্‌-সুতুনের ভেতরে গিয়ে রাণীবিবির সঙ্গে দেখা করে আসতে পারতো। রাত্রে কী খেলে, কী করে কাটালে, সব জানতে ইচ্ছে করছে। হিন্দুর জন্যে কি আর আলাদা রান্নার ব্যবস্থা করেছে! কান্ত থাকলে হয়তো কাটোয়ায় যেমন ব্যবস্থা করেছিল, সেই রকম ব্যবস্থা করতে পারতো। তারপর শুধু কি খাওয়া? হয়তো রাণীবিবিকে বেগমদের মত ঘাগরা-ওড়না পরতে হবে। হয়তো মদ খেতেও দেবে!

কিন্তু রাণীবিবি না হয়ে সত্যি-সত্যি যদি সেই মরালীই হয়, তখন? আর যদি মরালীই হয় তো আসল রাণীবিবি কোথায়? হাতিয়াগড়ের জমিদারের সেই ছোট বউরানী? তাকে কোথায় রেখে দিয়েছে? তাকে তো আর বাড়িতে রাখতে পারবে না। তাহলে সবাই তো জেনে ফেলবে! তাকে তো নাটোরের রানী ভবানীর মত কোনো আশ্রমে কি আখড়ায় লুকিয়ে রাখতে হবে। নইলে ডিহিদার রেজা আলি তো টের পেয়ে যাবে। টের পেয়ে গেলেই আবার ধরে আনবে। তখন তো মরালীকে ছেড়ে দিতে হবে। কিংবা এও হতে পারে, দুজনকেই ধরে রাখবে। দুজনকেই চেহেল্‌-সুতুনে আটকে রাখবে।

হঠাৎ দূরে কোথায় ঘণ্টা বাজতে লাগলো। ঢং ঢং করে দু'বার বাজলো।

কেমন যেন সন্দেহ হলো। তবে কি রাত দুটো বাজলো নাকি! তবে কি ভোর হয়নি? সন্দেহ হতেই আবার নিজের আস্তানার দিকে ফিরলো। নিজের ঝুপড়িতে আসতেই বুঝি শব্দ হয়েছে। শব্দ হতেই পাশের ঘর থেকে বাদ্‌শা চেঁচিয়ে উঠেছে—কৌন্‌?

—আমি, বাদ্‌শা, আমি কান্তবাবু—

—কোথায় গিয়েছিলেন বাবুজী?

—বেড়াতে। আমি ভেবেছিলাম রাত বুঝি কাবার হয়ে গেছে। ঘণ্টা শুনে এখন খেয়াল হলো।

বাদ্‌শা আর কিছু বললে না। কিন্তু খানিক পরে কান্ত আবার ডাকলে—বাদ্‌শা—

—জী!

কান্ত জিজ্ঞেস করলে—আচ্ছা বাদ্‌শা, তুমি চেহেল্‌-সুতুনের অন্দরে কখনো গেছ?

এত রাত্রে এ-প্রশ্ন শুনে বাদ্‌শা বোধহয় অবাকই হয়ে গিয়েছিল। বললে—নেহি জী—নেহি গয়া—কাহে?

—মানে, তুমি কিছু জানো, ভেতরে কেমন করে জীবন কাটায় বেগমরা? মানে যে-সব হিন্দু বেগম ভেতরে যায় তাদের কি গরুর মাংস খেতে দেয়? ঘাগরা-টাগ্‌রা পরিয়ে দেয়? মানে তাদের কি খুব কষ্ট?

বাদ্‌শার বোধহয় তখন খুব ঘুম পাচ্ছিল। কিংবা হয়তো কান্তর প্রশ্নটা বুঝতে পারলে না।

কান্ত এ-ঘর থেকে আবার জিজ্ঞেস করলে—মানে, ধরো হিন্দু সধবাদের জন্যে তো আর আলাদা রান্না করবে না তারা! তাই জিজ্ঞেস করছি। শেষ পর্যন্ত বোধ-হয় মদও খেতে হতে পারে, কী বলো?

কিন্তু ওদিক থেকে বাদ্‌শার আর কোনো উত্তর এল না।

কান্ত আবার জিজ্ঞেস করলে—ঘুমুলে নাকি? ও বাদ্‌শা, ঘুমিয়ে পড়েছো?

কোনো সাড়াশব্দ নেই। আর খানিক পরেই বাদ্‌শার নাক ডাকতে লাগলো। তার পাশের ঘরে নেশার ঘোরে সারাফত আলিরও নাক ডাকছে। দুজনের নাক ডাকার শব্দে যদিই বা কান্তর একটু ঘুম আসার আশা ছিল, সেটুকুও চলে গেল। কান্ত পাশ ফিরে শুয়ে প্রাণপণে ঘুমোবার চেষ্টা করতে লাগলো। প্রাণপণে সব ভুলে যাবার চেষ্টা করতে লাগলো। রাণীবিবির কথা, মরালীর কথা, নিজের দুর্দশার কথা—সমস্ত—সমস্ত—

মেহেদী নেসার সাহেবের বন্দোবস্ত কিন্তু সব পাকা। পীরালি খাঁও পাকা ওস্তাদ। বহুকাল থেকে কাজ করে করে আজ খোজা-সর্দার এমনিতে হয়নি। বেশ কিছু কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে। নবাবের পর নবাব এসেছে, বেগমের পর বেগম এসেছে, তাদের সকলের মেজাজ-মর্জি বুঝে অনেক কষ্টে ঘাড়ের ওপর শিরটা খাড়া রাখতে হয়েছে। নইলে চেহেল্‌-সুতুনে শির খাড়া রাখতে পারা সোজা কথা নয়।

যখন নবাবরা লড়াই করতে যায়, তখনো হারেমের নিয়ম-কানুনের কোনো ইতরবিশেষ হয় না। তখনো ঘড়ির কাঁটায় কাজ চলে। মস্‌জিদে আজান হাঁকে মৌলবী সাহেব। বাঁদীরা ঘুম থেকে উঠে গোসলখানায় গিয়ে মুখ হাত ধুয়ে তৈরি হয়ে নেয়। তখন বেগমদের নাস্তার বন্দোবস্ত করতে হয়। পেছন দিকের ঝিলের জলে ধোবিখানার ধোবারা তখন ঘাগরা-শাড়ি-ওড়নী-কাঁচুলি কাচতে শুরু করে। ইনসাফ মিঞা নহবতে আশোয়ারীর তান ধরে। তারপর যত বেলা বাড়তে শুরু করে ততই সরগরম পড়ে যায় হারেমের ভেতরে। তোষাখানায়, মশালচি-খানায়, বাবুর্চিখানায় হাঁক-ডাক পড়ে যায়। শহর মুর্শিদাবাদের ভেতরই আর এক শহরের ছোট সংস্করণ গড়ে ওঠে তখন। সেখানেও কেনা-বেচা শুরু হয়, লেন-দেন আরম্ভ হয়। সেখানেও দেনা-পাওনা নিয়ে দর-কষাকষি চলে। জীবন, জন্ম, মৃত্যু, অর্থ, ঐশ্বর্য, বিলাসের দরকষাকষি। সেখানেও কেউ হারে কেউ জেতে। কেউ বেচে কেউ কেনে। কেউ জন্মায় কেউ মরে।

নবাবের জন্যে সবাই এখানে বিকেল থেকে সাজতে শুরু করে। দামী ঘাগরা পরে, কানে আতর দেয়, পায়ে ঘুঙুর বাঁধে, মাথায় বেণী ঝোলায়, আর লুকিয়ে লুকিয়ে আরক খায়। চক্‌-বাজারের সারাফত আলির খুশ্‌বু তেলের দোকান থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে আরক কিনে আনে নজর মহম্মদ। সে-আরক খেলে সমস্ত শরীর চাঙ্গা হয়ে ওঠে। মনে হয় বুঝি একেবারে বেহেস্তে চলে গেছি সশরীরে। মনে হয় হারেমের মধ্যে আর বন্দী নই আমি, আমার পাখা গজিয়েছে দুটো, আমি উড়ে চলেছি হুরী-পরীদের মত। তারপর শেষকালে যখন নবাব আর সত্যি-সত্যি আসে না, তখন সেই নেশার ঘোরের মধ্যেই বরকত আলি কি নজর মহম্মদ বাইরের কোনো পেয়ারের লোককে ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়ে চলে যায়। তারপর কোথা দিয়ে রাত কাবার হয়ে যায় তা আর টের পায় না কেউ।

হারেমের বেগমদের জীবন এমনি করেই চলে আসছে বরাবর। সেই মুর্শিদ-কুলী খাঁ থেকে শুরু করে সুজাউদ্দীন, সরফরাজ, আলীবর্দী খাঁ পর্যন্ত একটানা। পুরোন চালেই হারেমের নিয়মকানুন বাঁধা। আলীবর্দী খাঁর সময়ে সে-চাল একটু কমেছিল নানীবেগমের জন্যে। কিন্তু সে আর ক'দিন। লড়াই করতে করতেই সারাটা জীবন কেটে গেছে তাঁর। এবার এসেছে নাতি নবাব মনসুর-উল্‌-মুল্‌ক্‌ শা কুলি খান্‌ বাহাদুর মির্জা মহম্মদ সিরাজ-উ-দ্দৌলা হেবাৎ জং আলমগীর।

সারাফত আলির খুশ্‌বু তেলের দোকানে নজর মহম্মদ কি বরকত আলিরা যখন আরক কিনতে আসে তখন লুকিয়ে লুকিয়ে আসে। বাইরে খুশ্‌বু তেলের কারবার। আড়ালে আরক। সারাফত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করে কী রোগ, কার রোগ। নাম কী রোগীর। ওষুধকেই সারাফত আলি আরক বলে। হকীমের কাছে গেলে বাইরের লোকের কাছে জানাজানি হবে বলে, নজর মহম্মদরা সারাফত আলির দোকানে আসে। লোকে ভাবে খুশ্‌বু তেল কিনতে এসেছে। অনেক রকম আরক আছে সারাফত আলির। সুজাকের আরক, আতশকের আরক। এমন আরক আছে যা একবার খেলে রোজ খেতে ইচ্ছে করে।

নজর মহম্মদরা নতুন বেগমদের সেই আরকই খাওয়াবার চেষ্টা করে। একবার ধরাতে পারলে তখন আর ছাড়বার উপায় নেই। তখন খোজাদের খোশামোদ করতে হয়। কাছে এসে বলে—নজর, আরক ফুরিয়ে গেছে, আর চারটে গুলি এনে দে তুই—

সারাফত জিজ্ঞেস করে—কী হয়েছে বেগমসাহেবার?

—নজর মহম্মদ বলে—কি জানি মিঞাসায়েব, বেগমসাহেবার দেমাগ্ খারাপ হয়ে গেছে, বিড়-বিড় করছে হরবখ্ত্—

—বুঝেছি, মালেফুল্লিয়া-দেমাগী হয়েছে—

—কী করে এমন হলো মিঞা সায়েব?

সারাফত বলে—সওদা ধাতুতে দেমাগ্ ভারী হয়ে গেছে—এই আরকেই আরাম মিলবে—যা—

কী কয়েকটা বড়ি দেয় সারাফত আলি, আর দাম দিয়ে ভেতরে নিয়ে চলে যায় নজর মহম্মদ। তারপর সে-রোগ সারলো-কি সারলো না তার আর কেউ খবর রাখে না।

মরালী যেদিন প্রথম এল তার পর দিন নজর মহম্মদ দোকানে আসতেই সারাফত জিজ্ঞেস করলে—কাল কোন্ বেগম এল রে তাঞ্জামে করে?

নজর মহম্মদ বললে—তুমি কী করে জানলে মিঞাসাহেব?

—আমি সব জানি। আমার খুলিতে যে একটা কাফেরবাবু থাকে। সেই তো সঙ্গে করে নিয়ে এল দেখলুম—

নজর মহম্মদ বললে—লস্করপুরের তালুকদার কাশেম আলির ছোটি লেড়কি। বাপ মরে যাবার পর হারেমের বেগম বনবার শখ হয়েছে—

—কী নাম হলো বেগমসাহেবার?

—মরিয়ম বেগম।

—আরক খাবে না?

নজর মহম্মদ বললে—না মিঞাসায়েব, এখনো নয়া কি না, আরক খেতে শেখেনি, আমি পুছেছিলুম, বললে—না, আরক খাই না—

সারাফত আলি প্যাকা গোঁফ-দাড়ির মধ্যে একটু হাসলো। বললে—প্রথম-প্রথম তো কেউই খায় না, পরে আবার ওই মরিয়ম বেগমই আরকের খাতিরে তোকে খুসামুদ করবে, দেখে নিস্—

কথাটা নজর মহম্মদ জানে। ওই পেশমন বেগম, গুল্সন্ বেগম, কেউই আরক খেতে চায়নি প্রথমে। এখন সবাই সারাফতের আরকের বাঁদী হয়ে গেছে। আরক না হলে বেগমসাহেবাদের রাতই কাটে না। প্রথম-প্রথম মরালী এ-সব কিছুই জানতো না। প্রথম দিন একটু কৌতূহল ছিল, একটু ভয়ও ছিল। কোথায় কী-রকম অবস্থায় কাটাতে হবে, কী করবে, কেমন করে দিন কাটবে কিছুই জানা ছিল না। হাতিয়াগড় একরকম আর মুর্শিদাবাদ আর এক রকম। নিজামত-হারেম, সে আরো নতুন জায়গা। পালকিটা চেহেল্-সুতুনের মধ্যে ঢুকে পড়তেই মনে হলো যেন সবকিছু থেকে সে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। কোথায় এতক্ষণ সে বউ হয়ে বড়চাতরায় যাবে, তা না একেবারে চন্দ্র-সূর্যের চোখের আড়ালে এখানে এসে ঢুকলো। পালকির দরজার ফাঁক দিয়ে বাইরের দিকে দেখবার চেষ্টা করেছিল। যতক্ষণ কাটোয়ার রাস্তায় পালকি চলেছে ততক্ষণ কান্ত পাশে পাশে ছিল। ফাঁক দিয়ে যেটুকু দেখা যায়, চেয়ে চেয়ে দেখছিল। হয়তো রাণীবিবি মনে করে কথা বলতে সাহস করেনি। তাছাড়া ফৌজী-সেপাইরা ছিল সঙ্গে। তারাও কড়া পাহারা দিতে দিতে চলছিল। কেউ যেন না দেখে রাণীবিবির দিকে। অথচ পালিয়ে যাবার কথা শুনেও বেশ খুশী হয়েছিল।

চল্লিশটা থামের নিচে চেহেল্-সুতুনের দরবার। এ-রাস্তাটা সেদিকে নয়। একেবারে কোথা দিয়ে ঢুকে কোন্ সুড়ঙ্গ দিয়ে একটা মসজিদের সামনে এসে

থামলো পালকিটা। তারপর কয়েকজন অচেনা লোক সামনে এসে মাথা নিচু করে কুর্নিশ করলে। পীরালিই ছিল খোজা সর্দার। সে-ই আসল। সে মসজিদের ভেতরে নিয়ে গেল। বুড়ো দাড়িওয়ালা একজন মৌলবীসাহেব বিড়-বিড় করে কি সব উর্দু মন্তর পড়তে লাগলো। মরালীর গায়ে দু'একবার জল ছিটিয়ে দিলে। তারপর পীরালিই নিয়ে গিয়ে একটা ঘরের মধ্যে পৌঁছিয়ে দিয়ে গেল।

তারপর?

তারপর তাকে কী করতে হবে তাও জানা ছিল না। এত বড় চেহেল্-সুতুন, কিন্তু কোথাও কোনো সাড়াশব্দ যেন নেই। সমস্ত বাড়িটা যেন নিঃঝুম হয়ে আছে। ঘরের ভেতর একটা বিছানা। মস্ত বড় বিছানা। পাশেই আতরদান, পান-দান, গোলাপদান সাজানো। একটা আয়না। নিজের চেহারার ছায়া পড়েছে তাতে। এত বড় আয়না ছোটমশাই-এর বাড়িতেও নেই। চৌকির ওপর একটা মস্ত রুপোর পিকদান। দেয়ালে কতকগুলো ছবি। মেঝের ওপর গাল্চে পাতা। পা রাখবার জন্যে বিছানার নিচেয় মখমলের পা-পোষ। একটা খোজা এসে আতরদানে আতর সাজিয়ে দিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে গন্ধে ভুর-ভুর করে উঠলো ঘরখানা। গোলাপ-দানে গোলাপফুল দিয়ে গেল। পানদানে পানের খিলি এলাচ লবঙ্গ ডালচিনি দিয়ে গেল।

—বেগমসাহেবা!

মরালী এতক্ষণ চুপ করে সব দেখছিল। এবার মুখ তুলে চাইলে।

—বেগমসাহেবার খেদ্মতির জন্যে বান্দা হাজির। বেগমসাহেবা যখন মেহের-বানি করে যা হুকুম করবেন, বান্দা সব তামিল করতে তৈয়ার—বলে লোকটা মাথা নিচু করে তিনবার মাথায় ডান হাতটা ঠেকিয়ে কুর্নিশ করলে।

মরালী বললে—আমার কিছু দরকার নেই—

—খানা?

মরালী বললে—না, আমার এখন ক্ষিদে নেই—

—সরাব?

—সরাব কী?

নজর মহম্মদ বললে—যাকে মদ বলে বেগমসাহেবা—

—না।

—তাহলে আরক?

—আরক? আরক আবার কী জিনিস!

নজর মহম্মদ বললে—চক্‌বাজারের সারাফত আলির দোকানের আরক বড় বঢ়িয়া চিজ্ বেগমসাহেবা, খেলে দিল তর্ হয়ে যায়, ভালো নিদ্ ভি আসে, তবিয়ৎ ভি আচ্ছা হয়, হুকুম হয় তো বান্দা এনে দিতে পারে বেগমসাহেবাকে!

মরালী বললে—না—দরকার নেই—

নজর মহম্মদ কিন্তু ছাড়বার পাত্র নয় তবু। বললে—বান্দার নাম নজর মহম্মদ, বেগমসাহেবার জরুরৎ হলে বান্দাকে যখন খুশী এত্তেলা দেবেন, বান্দা হাজির থাকবে—

মরালী বললে—আমার কিছু দরকার নেই—তুমি যাও এখন—

নজর মহম্মদ চলেই যাচ্ছিল হয়তো। কিন্তু মরালী আবার ডাকলে। বললে—রাত্তিরে আমি বাতি নিভিয়ে শোব? কেউ বিরক্ত করতে আসবে না তো? দরজায় খিল দিয়ে দেবো?

—জী হাঁ বেগমসাহেবা। বেগমসাহেবা মজেসে নিদ্ যাবেন, কেউ ঘরে আসবে না—

তারপর কী যে হলো। কৌতূহলটা আর চেপে রাখতে পারলে না মরালী। জিজ্ঞেস করলে—তোমাদের নবাব? নবাব কোথায় তোমাদের?

নজর মহম্মদ বললে—জাঁহাপনা তো লড়াইতে গেছে বেগমসাহেবা, ফিরিঙ্গী দুষমনদের সঙ্গে লড়াই করতে গেছে। লড়াই ফতে করে জাঁহাপনা ফিরে আসবেন—

—কবে লড়াই শেষ হবে?

—আগে লড়াই ফতে হোক বেগমসাহেবা। দু'তিন রোজ লাগবে ফতে হতে। খবর এসেছে কলকাতা শহর পুড়িয়ে দিয়েছে জাঁহাপনা। ফিরিঙ্গী দুষমনদের কলকাতা থেকে তাড়িয়ে কালাপানি পার করে দিয়েছে।

মরালী একটু থেমে বললে—এখানে আর কারো গলা শুনতে পাচ্ছি না, এখানে কি আর কেউ থাকে না? অন্য বেগমরা?

—জী থাকে। পেশমন বেগম আছে, নুর বেগম আছে, তক্কি বেগম আছে, গুলসন্ বেগম আছে, নানীবেগম আছে, সবাই আছে এখানে। এ তো বেগম-মহল বেগমসাহেবা। বেগমসাহেবাকে যে মহলে রেখেছি এটা আলখ্ মহল, এখানে ফিরিঙ্গীদের মেমসাহেবরা ছিল, ওয়াটস্ মেমসাহেব, কলেট মেমসাহেব সবাই এখানে নবাবের হেফাজতে ছিল। এর ওধারে ঘসেটি বেগমসাহেবা আছে—

মরালী জিজ্ঞেস করলে—তা আমাকে আলাদা মহলে রাখলে কেন তোমরা?

—সে খোজা-সর্দার পীরালি খাঁ জানে বেগমসাহেবা। মেহেদী নেসার সাহেবের হুকুম—

—মেহেদী নেসার সাহেব কে?

—আমাদের নবাবের পেয়ারের দোস্ত্।

এর পরে আর কিছু কথা জানবার ছিল না। মরালী কী জিজ্ঞেস করবে বুঝতে পারলে না। নজর মহম্মদও দাঁড়িয়ে ছিল চুপ করে।

—আচ্ছা, তোমাদের এখানে বাইরের লোক এর ভেতরে আসতে পারে? আস-বার নিয়ম আছে?

নজর মহম্মদ জিভ কাটলে। বললে—নেহি বেগমসাহেবা, বাইরের লোক, বাইরের মর্দানা ভেতরে আসা গুণাহ্—এলে কোতল্ হয়ে যায়—

মরালী কথাটা শুনে শিউরে উঠলো। নজর মহম্মদ আরো বললে—শুধু পাঞ্জা থাকলে জেনানারা আর খোজারা আসতে পারে। নানীবেগম খুব কড়া মালিকন্—পীরালি ভি বড়া কড়া খোজা-সর্দার—

কথাগুলো খুব মোলায়েম করে বললে বটে নজর মহম্মদ, কিন্তু মনে হলো যত মোলায়েম করে বললে সে, জিনিসটা তত মোলায়েম নয়।

—আচ্ছা তুমি যাও এখন!

নজর মহম্মদ কুর্নিশ করে চলে গেল। চলে যাবার পরে মরালী আস্তে আস্তে ঘরটা থেকে বেরোল। মস্‌জিদ থেকে বেরোবার পর ঘরে এসে এদের দেওয়া শাড়ি বদলে নিয়েছে। এরা শাড়ি দিয়েছে, ঘাগড়া দিয়েছে, ওড়নী দিয়েছে। বাক্সভর্তি পোশাক-আশাক দিয়েছে। একজন বাঁদী এসে সব গুছিয়ে দিয়ে চলে গেছে। হাতের কাছে একটা ছোট ঘণ্টা রেখে দিয়ে গিয়েছে। বলে গিয়েছে—ওটা বাজালেই নাকি বাঁদীটা আসবে। কিন্তু আর কাউকে তখন ভালো লাগছিল না মরালীর।

ছোটবেলা থেকে কেবল জীবনে বৈচিত্র্য খুঁজতো সে। হাতিয়াগড়ের ছোট গ্রামের মধ্যেই ছাতিমতলার ঢিবিটার ওপর দাঁড়িয়ে দূরের আকাশের দূরত্ব মাপতে চাইতো। নদীর জলে সাঁতার দিয়ে জলের তলায় পৌঁছতে চাইতো। রাস্তার লোকদের অকারণে রূঢ় কথা বলে আঘাত দিয়ে মজা দেখতো। আজ ঘটনাচক্রে একেবারে বৈচিত্র্যের চূড়ায় এসে পৌঁছিয়েছে সে। এ-বৈচিত্র্যের শেষ দেখতে না পেলে যেন তার আর তৃপ্তি হচ্ছে না।

বাইরে টিম্ টিম্ করে একটা আলো জ্বলছে কোণের দিকে। সামনে উঠোনের ওপর জাফরি-কাটা একটা দেয়াল। তার ওদিকে কী আছে দেখা যায় না। মাথার ওপর আকাশটা তারায় তারায় ভরে গিয়েছে। হঠাৎ কোন্ দিক থেকে যেন একটা আর্তনাদের শব্দ কানে এল। কে কাঁদছে এমন করে। যেন অসহ্য যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করছে কেউ। আবার অন্য দিক থেকে যেন গানের আওয়াজও ভেসে এল। উর্দু কি হিন্দুস্থানী গান বোধহয়।

মরালী আরো এগিয়ে গেল। এদিকটা যেন একটু ছাড়া-ছাড়া। আর ওপাশে যেন বেশ অনেক লোকের বাস। কোথাও বেশ মজ্‌লিস বসেছে গানের ফুর্তির আর হল্লার। অস্পষ্ট আওয়াজ বটে। কিন্তু মনে হলো আনন্দের ফোয়ারা চলেছে সেখানে। আবার ওদিক থেকে কান্নাটা বড় বুকফাটা হয়ে কানে এল। কেন এত কান্না? কিসের কান্না? কে কাঁদছে?

পায়ে পায়ে আরো এগিয়ে গিয়েছিল মরালী। হঠাৎ সামনে একটা মূর্তি দেখে ভয়ে চিৎকার করে উঠতে যাচ্ছিল। কিন্তু কাছে আসতেই চেনা গেল। নজর মহম্মদ!

—বেগমসাহেবা!

মরালী থমকে দাঁড়ালো।

—বেগমসাহেবার কিছু দরকার আছে? খানা? সরাব? আরক? পান? সরবৎ?

মরালী জড়সড় হয়ে বললে—না—

—কিছু দরকার থাকলে বান্দাকে এত্তেলা দেবেন বেগমসাহেবা! ঘণ্টা বাজিয়ে দিলেই বান্দা বাঁদী সবাই হাজির হবে—

মরালী আর এগোল না। আস্তে আস্তে পেছিয়ে এসে আবার নিজের ঘরের ভেতরে ঢুকে পড়লো। তারপর বিছানাটার ওপর উপুড় হয়ে পড়ে বালিশে মুখ গুঁজে দিলে। এ কোথায় এল সে! এখানে কি চিরকাল থাকতে হবে? এমনি করেই কি দিন কাটবে, রাত কাটবে। ওই কান্না শুনবে, আর গান শুনবে? এমনি করেই হাসি, গান, ফুর্তি, কান্না আর খানা, সরাব, আরক, পান, সরবৎ নিয়েই তার পৃথিবী চলবে? আর তারপর যখন লড়াই শেষ করে নবাব মুর্শিদাবাদে ফিরবে, তখন?

নজর মহম্মদ ফিরে আসতেই পীরালি খাঁ জিজ্ঞেস করলে—কী রে, কী খবর?

নজর মহম্মদ বললে—বড়ী দিমাগী জেনানা খাঁ সাহেব, বড়ী একরোখ্‌খী ছুক্‌রী। ভয়-ডর বিলকুল নেই—বেগমসাহেবা খাস-মহলের দিকে আসছিল, সামলে নিয়েছি—

—কেন? খাস-মহলের দিকে আসছিল কেন? ঘণ্টা রেখে দিসনি?

—ওই যে বললুম দিমাগী জেনানা। ঘণ্টা রেখে দিয়েছি, তবু বাইরে আসছিল।

খানা ভি খাবে না, সরাব ভি খাবে না, পান ভি খাবে না, আরক ভি খাবে না, সরবৎ ভি খাবে না—

পীরালি খাঁ বললে—সবে নয়া এসেছে, চেহেল্-সতুন দেখে তাজ্জব বনে গেছে আর কি! তা হোক, পোষ মানাতে কোশিস্ কর্,—নইলে নেসার সাহেব গোস্‌সা করবে, খুব হুঁশিয়ার—

নজর মহম্মদ বললে—আলবৎ পোষ মানবে, জরুর পোষ মানবে, দুনিয়ার জেনানাকে পোষ মানালুম, আর এ তো নয়ী ছুক্‌রী খাঁ সাহেব—

বলে নজর মহম্মদ নিজের কাজে চলে গেল।

১৭৫৬ সালের ১৬ই জুন। ষষ্ঠীপদর স্বপ্নটাই শেষপর্যন্ত বুঝি সত্যি হলো। নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলার ফৌজী-সেপাই বাগবাজারের মুখে হুড় হুড় করে ঢুকে পড়েছিল। নবাবের ফৌজ যে এমন করে সত্যি-সত্যিই কলকাতায় এসে পড়বে তা হয়তো কেউ-ই ভাবেনি। পেরিন-পয়েন্ট্ থেকে শুরু করে সমস্ত সুতোনুটি গোবিন্দপুরের লোকই তখন আবার পালাতে শুরু করেছে। একদিন যে-কলকাতা জঙ্গল ছিল, একদিন বর্গীর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে গঙ্গা পেরিয়ে যারা ফিরিঙ্গীদের আওতায় এসে নিরাপদ-নিশ্চিন্তে বসবাস শুরু করেছিল, বাড়িঘর বানিয়ে যে-কলকাতাকে শহর বানিয়ে ফেলেছিল, সেই কলকাতা ছেড়েই আবার তারা গঙ্গা পেরিয়ে প্রাণ বাঁচাবার দায়ে বক্‌স্-বন্দরের দিকে পাড়ি দিলে।

ষষ্ঠীপদ আর বসে থাকতে পারলো না চুপ করে। খানা-খন্দ পেরিয়ে একেবারে সোজা নবাবী-ফৌজের তাঁবুর কাছে গিয়ে হাজির। তখন তিন দিন ধরে কেবল কামান দাগা আর গোলাগুলী চলছে।

—হুজুর।

একেবারে সশরীরে গিয়ে হাজির হলো সেপাইদের সামনে। বুকটা দুর-দুর করে কাঁপছে। কিন্তু টাকা উপায় করতে গেলে এত ভয়-ভীত্ থাকলে চলে না।

—হুজুর, আপনারা এখানে কেন মিছিমিছি কামান দাগছেন, এদিক দিয়ে তো কিছু সুবিধে হবে না হুজুরদের। শহরে ঢোকবার অন্য রাস্তা আছে, বাদামতলা দিয়ে ঢুকলেন না কেন? ডানকান সাহেবের বস্তির দিকটায় পল্টন-ফল্টন কিছুছু নেই—একেবারে ফাঁকা—

—তুমি কে?

—আমি হুজুর বেভারিজ সাহেবের খাস মুন্সী ষষ্ঠীপদ—আমরা বাহাত্তুরে কায়েত—

রাজা মানিকচাঁদের কাছে খবরটা গেল। নবাবের সঙ্গে তখন শলা-পরামর্শ চলছিল ভেতরে। মীরজাফর, মীরমদন, মোহনলাল সবাই মিলে আলোচনা চলছে। নবাব-ফৌজের সামনের দিকের চার হাজার সেপাই, আর চারটে কামান বিকেল তিনটে থেকে রাত পর্যন্ত কেবল গুলি-গোলা ছুঁড়ছে। কিন্তু কিছুই ফল হয়নি। ফিরিঙ্গীরাও সমানে গোলাগুলি ছুঁড়েছে। এর পর কী করা হবে সেই কথাই হচ্ছিল। এমন সময় ষষ্ঠীপদ গিয়ে হাজির।

রাজা মানিকচাঁদ বাইরে এসে লোকটার দিকে চেয়ে দেখলেন ভালো করে।

বললেন—তা তুমি তো ফিরিঙ্গী-কোম্পানীতে চাকরি করো, ওদের তোড়-জোড় কীরকম দেখেছো?

—আজ্ঞে নস্যি নস্যি, কিছুছু নেই, আমার সাহেব তো ভয়ে একেবারে কাপড়-চোপড়ে হয়ে গেছে, আমি লুকিয়ে লুকিয়ে তাই খবরটা আপনাদের দিতে এসেছি হুজুর, আপনি যেন আমার নাম ফাঁস করে দেবেন না, তাহলে হুজুর আমাকে ওরা কেটে দু'খানা করে ফেলবে—

রাজা মানিকচাঁদ বললেন—ঠিক আছে, তোমার কথা সত্যি হলে বকশিশ পাবে—

—হুজুর, তাহলে এক কাজ করুন, আমার ভয় করছে বড়, আমাকে একজন সেপাই দিয়ে একটু নিরাপদ জায়গায় পেঁছিয়ে দিন,—আপনাদের জয় নির্ঘাৎ—

কথাটা বললে বটে, কিন্তু মনে মনে ভয়ও ছিল। কেউ যদি দেখে ফেলে তাহলেই কর্ম ফতে। খানিক দূরে এসেই বললে—সেপাইজী, তুমি এবার যাও, আমি এবার নিজেই ঠিক রাস্তা চিনে নেবো—

রাস্তা চেনার কথাটা বাজে। ও-রকম বলতে হয়। সেপাইটা চলে যেতেই ষষ্ঠীপদ উল্টোপথ ধরলে। কলকাতায় তখন নিশুতি। যে যেখান দিয়ে পারছে গ্রাম ছেড়ে পালাচ্ছে। পালাক, সবাই পালাক। তাতেই ষষ্ঠীপদদের সুবিধে। সেখান থেকে সোজা একেবারে ফিরিঙ্গীদের কেল্লার গেট-এ এসে হাজির।

—স্যার, বেভারিজ সাহেবের সঙ্গে একবার দেখা করতে দেবেন?

—হু আর ইউ? তুমি কে?

কেল্লার গোরা পাহারাদাররা বড় কড়া পাহারা লাগিয়েছে তখন। ষষ্ঠীপদ বললে—আমি স্যার ষষ্ঠীপদ, ব্রাহ্মণ—গরীব বামুনের ছেলে, বেভারিজ সাহেবের সোরার গদির খাস-মুন্সী—বড় বিপদে পড়ে আমার সাহেবকে একটা খবর দিতে এসেছি—

কেল্লার ভেতরে তখন ক্যাপ্টেন ড্রেক, কুটস্, ম্যানিংহ্যাম, হল্‌ওয়েল সবাই সলাপরামর্শ চালাচ্ছে। নবাবের ফৌজী সেপাই কত, তাই নিয়ে গবেষণা হচ্ছে। হোমে ডেসপ্যাচ পাঠিয়ে দিয়েছে হল্‌ওয়েল সাহেব। হয়তো এই-ই শেষ। হয়তো চিরকালের মত ক্যালকাটার কুঠি উঠিয়ে দিতে হবে। শেষ পর্যন্ত ম্যাড্রাসে গিয়েই সেটেল করতে হবে। ঠিক এমন সময় ষষ্ঠীপদ গিয়ে হাজির।

—কী মুন্সী? এত রাত্তিরে তুমি? আমি ভাবলুম, তুমিও পালিয়ে গেছ?

—সে কি হুজুর, আপনার নুন খাই, আপনার সঙ্গে আমি নিমকহারামী করতে পারি কখনো? আপনাকে তো বলেছি হুজুর, আমি খাঁটি বামুন, আমার পৈতে আছে। রোজ গঙ্গামাটি দিয়ে সে-পৈতে পরিষ্কার করি, আমি কি আপনাকে ছেড়ে পালাতে পারি হুজুর কখনো?

—কিন্তু কী খবর? এখন আমরা খুব ব্যস্ত আছি...

ষষ্ঠীপদ বললে—হুজুর, সেই কথাই তো বলতে এসেছি, আমি আমার মামার বাড়ি থেকে আসছিলুম, হঠাৎ পেরিন-পয়েন্টের কাছে দেখি নবাব ফৌজ-টৌজ নিয়ে হাজির, লড়াই করতে এসেছে হুজুরদের সঙ্গে—

—সে আর নতুন কী, সে তো সবাই জানে! ও-সব বাজে কথা শোনবার এখন সময় নেই আমাদের—

—হুজুর, বাজে কথা নয়, আমি যে লুকিয়ে লুকিয়ে ওদের সব দেখে এলুম—

বেভারিজ সাহেব এতক্ষণে যেন একটু সজাগ হলো। বললে—কী দেখলে? ক'হাজার সোলজার আছে কিছু জানতে পারলে? ওদের তোড়জোড় কী রকম দেখলে?

ষষ্ঠীপদ বললে—আজ্ঞে, নস্যি নস্যি—

—নস্যি মানে?

—ওই যা নাকে দেন আপনারা! তামাকের গুঁড়ো—তাই। একেবারে ফাঁকা আওয়াজ, নবাব তো শুনলুম ভয়ে একেবারে কাপড়ে-চোপড়ে হয়ে গেছে। আমি লুকিয়ে-লুকিয়ে তাই খবরটা আপনাকে দিতে এলুম হুজুর—দেখবেন যেন কথাটা ফাঁস না হয় হুজুর, নইলে আমাকে ওরা কেটে একেবারে দু'খানা করে ফেলবে—আমাদের সেই কান্তবাবু, আপনার মুন্সি ছিল, সে নবাবের চরের চাকরি করছে কি না—আমার ওপর তার রাগ আছে—

কান্তর নাম শুনেই বেভারিজ সাহেবের মুখ দিয়ে একটা শব্দ বেরোল—স্কাউণ্ড্রেল—

ষষ্ঠীপদ বললে—শুধু স্কাউণ্ড্রেল নয় হুজুর, আবার রাস্কেল—

বেভারিজ সাহেব কী যেন ভাবতে লাগলো।

ষষ্ঠীপদ বললে—মিছিমিছি ভাববেন না হুজুর, আমি বলছি আপনাদের জয় নির্ঘাত—

সাহেব আর দাঁড়ালো না। কথাটা ক্যাপ্টেন ড্রেককে বলতে হবে। তাড়াতাড়ি ভেতরে চলে গেল। ষষ্ঠীপদও সোজা আবার অন্য পথ ধরলে। অন্ধকার রাত। সব লোকজন পালাচ্ছে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে। ষষ্ঠীপদ একেবারে গঙ্গার ঘাটে গিয়ে হাজির। ঘাটের সিঁড়ি দিয়ে নিচেয় নেমে গঙ্গাজল নিয়ে নিজের মাথায় ছিটোতে লাগলো। মা, লড়াইটা বাঁধিয়ে দাও মা, সব এলোমেলো করে দাও—একবার প্রাণ ভরে লুটপাট করে নিই—তখন মা এই কলকাতার ৫৭৮৬ বিঘে ১৯ কাঠা জমির মালিক হতে পারবো—তখন আর কাউকে পরোয়া করবো না মা তখন আর পরের চাকরি করতে হবে না মা—মা তুমি পতিতোদ্ধারিণী, পতিতকে উদ্ধার করে দাও মা—আমাকে রাজা করো—রাজা করে দাও মা আমাকে—

তখন অল্প-অল্প ভোর হচ্ছে।

হঠাৎ পুব দিক থেকে যেন একটা গুম্ গুম্ শব্দ হতে লাগলো। ষষ্ঠীপদ সেইদিকে কান পেতে রইলো। তাহলে মা তার ইচ্ছে পূর্ণ করেছেন। ওই বাদামতলার দিক দিয়ে, ডানকান সাহেবের বস্তির দিক দিয়ে নবাবী ফৌজ কলকাতায় ঢুকছে! জয় মা কালী! মা, তাহলে পতিতকে উদ্ধার করলে—আমাকে রাজা করলে—

চক্‌বাজারের সারাফত আলির দোকানের ভেতরে তখন সবে কান্ত ঘুম থেকে উঠেছে। হঠাৎ বশীর মিঞা এসে হাজির। বললে—উঠেছিস, তোকে খবরটা দিতে এলুম—আমি এখনি কলকাতা থেকে এলুম—লড়াই ফতে রে—লড়াই ফতে হয়ে গেছে—

সে-কথায় কান্ত বিশেষ কান দিলে না। বললে—তোর বাড়িতে তোকে

খুঁজতে গিয়েছিলুম—

—কেন? আমি তো ছিলুম না, কলকাতায় গিয়েছিলুম—

—সেই জন্যেই তো ভাবনায় পড়েছিলুম খুব।

—কীসের ভাবনা?

কান্ত বললে—তোকে একটা কাজ করতে হবে ভাই, যে করে হোক করতেই হবে, আমাকে একবার রাণীবিবির সঙ্গে হারেমের ভেতরে দেখা করিয়ে দিতেই হবে। তোর পায়ে পড়ি ভাই, দেখা করিয়ে দিতেই হবে, কাল সারারাত ভাই ভেবে ভেবে আমার ঘুম হয়নি।

বশীর মিঞা অবাক হয়ে গেল। বললে—তুই বলছিস্ কী? তুই কি মস্তানা হয়ে গেছিস? দেখছিস শহর এখন মীর বক্সীর তাঁবে। ওদিক থেকে নবাবের ভাইয়া এসে কোন্‌দিন মসনদ্ লুটে নেবার তাল করছে। এখন চেহেল্-সুতুনে কড়া পাহারা বসে গেছে। খবরদার, ও-আবদার করিসনি। তুইও ফাটকে ঝুলবি আমাকেও ফাটকে ঝোলাবি—ও-সব আবদার ছাড় তুই—

কান্ত বললে—তুই একটু চেষ্টা করে দেখ না—

—ওরে বাবা, কেউ যদি জানতে পারে তো আমার জান নিক্‌লে যাবে—

বলে বশীর মিঞা বাইরে চলতে আরম্ভ করলো। বললে—সে জামানা আর নেই রে, নইলে তোকে ঢুকিয়ে দিতুম, এখন নানীবেগম খুব হুঁশিয়ার হয়ে গেছে। পীরালি খাঁ, নজর মহম্মদ, বরকত আলিরা এখন নিজেদের জান নিয়ে পাগল।

—কিন্তু ভেতরে কোনো রকমেই যাওয়ার উপায় নেই? আমি একবার শুধু যাবো, রাণীবিবির সঙ্গে শুধু একটা কথা বলে চলে আসবো—শুধু একবার!

—কেন, রাণীবিবির সঙ্গে তোর কিসের কারবার?

কান্ত বললে—শুধু একটা কথা বলে আসবো রাণীবিবিকে—

—কী কথা?

কান্ত বললে—কাটোয়ার সরাইখানায় আমাকে রাণীবিবি একটা খবর জানতে বলেছিল, সেটা বলা হয়নি আর। কোতোয়াল আর কথা বলতে দেয়নি—

—কী কথা?

—বলেছিল একটা পাগলের নাম জেনে আসতে। পাগলটা গান গাইছিল সরাইখানার সামনে।

বশীর বললে—উদ্ধব দাস? উদ্ধব দাসের কথা বলছিস?

—তুই চিনিস উদ্ধব দাসকে?

—খুব চিনি। আরে, লোকটা বে-কাম লোক। আমি ওকে কাম দিতে চেয়েছিলুম। ও তো দুনিয়া টহল দিয়ে বেড়ায়, বলেছিলুম জাসুসী কাম করতে। তামাম বাঙলা-মুলুকে এখন আমাদের জাসুস দরকার, ঘসেটি বেগম-সাহেবাকে তো পাকড়ে রাখা হয়েছে, কিন্তু তবু দুষমনের তো কমতি নেই—

কান্তর ও-সব কথা শুনতে ভালো লাগছিল না। ছোটবেলা থেকে কান্ত দেখে এসেছে ও-সব দুষমন সকলেরই আছে। টাকা-পয়সা প্রতিষ্ঠা-প্রতিপত্তি থাকলেই দুষমন থাকবে। যত বেশি টাকা থাকবে, তত বেশি দুষমন থাকবে। বড়-চাতরার নায়েব-নাজিমবাবুদের মালখানা পাহারা দিত পাহারাদাররা বন্দুক নিয়ে।

কান্ত হঠাৎ কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বললে—তা হলে দেখা করা হবে না রাণীবিবির সঙ্গে?

—না না, ও-কথা বলিসনি এখন, অন্য কথা বল। তোকে এবার অন্য একটা কাজ দেবো—

—কী কাজ?

—একটা চিঠি দেবো, সেই মহারাজ কিস্টোচন্দরকে গিয়ে দিয়ে আসতে হবে—

—কার চিঠি?

—ও-সব পুছিসনি। তোকে যা কাম দেবো তাই করবি—তা তার দেরি আছে, বখ্‌ত্‌ হলেই বলবো—

বলে বশীর মিঞা চলে গেল। কান্ত অনেকক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে থেকেও কী করবে তার কুল-কিনারা করতে পারলে না। আবার ফিরে এল সারাফত আলির খুশ্‌বু তেলের দোকানে। ক'দিন থেকেই এই দোকানের পেছনে থেকে থেকে কান্ত একটা জিনিস বুঝে নিয়েছিল যে, সারাফত আলির কাছে মুর্শিদাবাদের নানান ধরনের লোক নানান কাজে আসে। সারাফতকে সবাই যেন একটু মান্য-গণ্য করে। মিঞাসাহেবের টাকাও আছে বেশ। আসলে টাকা উপায় করবার জন্যে কারবার করলেও সারাফত আলির যেন অন্য আর-একটা দিকও আছে। সেটা যে কী তা কান্ত এতদিন মিশেও বুঝতে পারেনি। মাঝে-মাঝে বুড়ো কান্তকে ডাকে। জিজ্ঞেস করে—কান্তর সংসারে কে-কে আছে। কেন মুর্শিদাবাদে চাকরি করতে এসেছে। দিনের বেলা যখন নেশা থাকে না মিঞাসাহেবের তখন ভালো-ভালো উপদেশ দেয়। বলে—এ বড় আজব শহর, এখান থেকে ভাগ্‌ তুই কান্তবাবু। নবাব একদিন ডুববেই, মুর্শিদাবাদও একদিন ডুববে, তখন তুইও ডুববি—

কান্ত বসে বসে বুড়োর কথাগুলো শুনতো। দুপুরবেলা যখন খদ্দের থাকতো না দোকানে, চক্‌-বাজারের রাস্তাটা যখন খাঁ খাঁ করতো, তখন বুড়ো নেশা করতো না। ওই শুধু গড়গড়াটা টানতো ভুড়ুক-ভুড়ুক করে। কান্ত থাকবার জন্যে ঘরখানার ভাড়া দিতে চেয়েছিল। কিন্তু বুড়ো নেয়নি। কান্ত জোর করে বুড়োর হাতে কাঁড় গুঁজে দিতে চেয়েছিল। বুড়ো সে কড়ি ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল চক্‌-বাজারের রাস্তায়। বলেছিল—তোর কাছ থেকে আমি কেরায়া নেবো? তুই কি ভেবেছিস আমি রুপিয়ার কাঙাল?

তারপর থেকে আর কেরায়ার কথাও ওঠেনি, কান্তও কেরায়া দেয়নি। কিন্তু মনে হতো কী যেন একটা রহস্য লুকিয়ে আছে সারাফত আলির জীবনের পেছনে। নইলে নিজামতকে অত গালাগালি দেয় কেন দিনরাত। কেন উঠতে বসতে নবাবকে গালমন্দ করে?

কান্ত জিজ্ঞেস করতো—চাকরি না-করলে আমি খাবো কী? বাঁচবো কী করে?

সারাফত আলি বলতো—যারা চাকরি করে না তারা খেতে পায় না? তারা বেঁচে নেই?

—কিন্তু আমার যে কেউ নেই, কিছু নেই মিঞাসায়েব!

বুড়ো বলতো—আমার কে আছে? আমাকে কে খিলাচ্ছে? খিলানোর মালিক যদি খিলায় তো নবাবের চৌদ্দ-পুরুষের সাধ্যি আছে তোকে মারে?

তারপর কান্ত বুঝি আর কৌতূহলটা চেপে রাখতে পারতো না। জিজ্ঞেস করতো—মিঞাসায়েব, আপনি কেন বুড়ো বয়সে এত খাটছেন? এত কারবার করে পরেশান হচ্ছেন? কার জন্যে? আপনার এত টাকা খাবে কে?

এ-কথার উত্তর দিতে বুড়ো বুঝি একটু থতমত খেয়ে থমকে যেত। উত্তর দিতে গিয়েও থেমে যেত। তারপর গড়গড়ার নলটা নিয়ে ভুড়-ভুড় করে টানতে শুরু করতো। আর কোনো কথার জবাব দিত না। অন্য কথা বলতো।

সেদিন দোকানের ভেতরে চুপি-চুপি কার সঙ্গে বুড়োর কথা হচ্ছিল। কান্ত পেছনের ঘর থেকে সব শুনছিল।

মিঞাসাহেব জিজ্ঞেস করলে—কী রে নজর মহম্মদ, বিবিজানের দিমাগ্ কিস্ তরহ্ হ্যায়?

লোকটা বললে—ওইসাহি হ্যায়, বহোত্ রো রহি হ্যায়—খুব কাঁদছে মিঞা-সাহেব—ইলাজ করছি, তবু কিছু আরাম হচ্ছে না—

মিঞাসাহেব বললে—আরাম হবে না—

নজর মহম্মদ বললে—কেঁও মিঞাসাহেব?

সারাফত আলি সাহেব চিৎকার করে উঠলো—মালেখুল্লিয়া দিমাগী কভি আচ্ছা নেহি হোনেওয়ালী, আরাম ভি নেহি হোগা, ঔর ইলাজ ভি কোই নেহি বানানে সেকেঙ্গে, তুমহারা হারেম ভি জাহান্নমমে যানেওয়ালা—যাও, আরক নেহি মিলেগা মেরে পাশ, যাও—নিকাল্ যাও ইঁহাসে—

বুড়ো সারাফত আলি যখন রেগে যায় তখন কাউকেই আর পরোয়া করে না। তখন যাকে-তাকে যা-তা বলতে শুরু করে। নজর মহম্মদও তা জানে। জানে বলেই হয়তো কিছু বললে না। সওদা নিয়ে চলে গেল হাসতে হাসতে।

কথাটা মনে ছিল কান্তর। সেদিন যখন সারাফত আলির নেশা কেটে গেছে, তখন আবার ডেকে পাঠিয়েছে কান্তকে। কান্ত কাছে যেতেই বুড়ো জিজ্ঞেস করলে—কাল তাঞ্জামে কাকে নিয়ে এলি তুই, কান্তবাবু? কোন্ বিবিজানকে?

কান্ত চুপ করে আছে দেখে বুড়ো আবার জিজ্ঞেস করলে—বল্, কাকে নিয়ে এলি? আমি সব জানি। আমার কাছে লুকোসনি। আমি কাউকে বলবো না—

কান্ত বললে—হাতিয়াগড়ের রাণীবিবিকে!

কথাটা শুনেই বিনা নেশাতেই সারাফত আলির চোখ দুটো লাল হয়ে উঠলো—উল্লু-কা-পাট্টা—

কান্ত বুঝলো মিঞাসাহেব রেগে লাল হয়ে গেছে। কথা না বলে মিঞাসাহেব ঘন-ঘন গড়গড়ার নলে খুব টান দিতে লাগলো। তারপর অনেকক্ষণ পরে বললে—কেন নিয়ে এলি?

কান্ত বললে—আমি শুধু হুকুম তামিল করেছি মিঞাসায়েব, আমার কোনো দোষ নেই—

—দোষ নেই? তোরই তো দোষ! কেন তুই হিন্দুর বিবিকে মুসলমানের হারেমে আনলি? চেহেল্-সুতুনে জেনানার ইজ্জৎ থাকবে? তুই তো জাহান্নমে যাবি, তোদের কাফেরদের তো নরক আছে, সেখানে যাবি তুই বেশক্—

কান্ত চুপ করে রইলো। বুড়োও খানিকক্ষণ গড়গড়া টানতে লাগলো একমনে।

কান্ত একবার হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে—আচ্ছা মিঞাসাহেব, ওই যে কাল আপনার কাছে এসেছিল, নজর মহম্মদ নাম, ও কে? ও কি চেহেল্-সুতুনের লোক?

—হ্যাঁ, খোজা নজর মহম্মদ!

—আচ্ছা, ওকে বললে আমাকে একবার চেহেল্-সুতুনে ঢুকিয়ে দিতে পারে না? হাতিয়াগড়ের রাণীবিবির সঙ্গে মুলাকাত করিয়ে দিতে পারে না?

—কেন? মুলাকাত করবি কেন? কী কাম তোর রাণীবিবির সঙ্গে?

কান্ত বললে—রাণীবিবি পালিয়ে যেতে চেয়েছিল রাস্তায়। তখন আমিও ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম, কাটোয়ার ডিহিদারের লোক আসাতে আর পালানো হয়নি। এবার দেখা করে ভাবছি কথাটা তুলবো—

—বিবিকে নিয়ে পালিয়ে যাবি চেহেল্-সুতুন থেকে?

কান্ত বললে—হ্যাঁ মিঞাসাহেব, আমি বুঝতে পেরেছি আমি পাপ করেছি, আমি সে-পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই মিঞাসাহেব, আমার রাত্তিরে ঘুম হচ্ছে না ক'দিন থেকে—

সারাফত আলি এবার মুখ ফিরিয়ে চেয়ে দেখলে কান্তকে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে চেয়ে দেখলে। যেন মনে হলো কান্তকে পরখ করছে একদৃষ্টে।

তারপর বললে—পারবি তুই কান্তবাবু? তোর কলিজার জোর আছে?

কান্ত বললে—পারবো মিঞাসাহেব। রাণীবিবি যদি রাজি থাকে তো আমার সাহসের অভাব হবে না। আমি বলছি, আমি পারবো—

—ঠিক পারবি?

সারাফত আলির যেন সন্দেহ হলো। পারবি তো ঠিক? ভয় করবে না তো তোর?

—হ্যাঁ, বলছি তো পারবো মিঞাসাহেব। নিশ্চয় পারবো!

—চেহেল্-সুতুন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক্ করে দিতে পারবি? ভেঙেচুরে একেবারে গোরস্থান বানিয়ে দিতে পারবি? যেন হাজি আহম্মদের বংশের হাড়টা পর্যন্ত কবরের ভেতরে ভয়ে কেঁপে ওঠে, এমন করে নবাব-হারেমের প্রত্যেকটা ইঁট গুঁড়িয়ে পিষে ফেলতে পারবি? সত্যি বলছিস, তুই পারবি?

বুড়োর গলাটা যেন কেমন করুণ শোনালো বড়।

কান্ত বললে—হ্যাঁ পারবো মিঞাসাহেব! আপনি যদি একটু মদৎ দেন তো নিশ্চয় পারবো—

বুড়ো এবার কান্তকে একহাত দিয়ে একেবারে জড়িয়ে ধরলে। এ-রকম কখনো করে না সারাফত আলি। বুড়োর চোখ দিয়ে এর আগে কখনো জল পড়তেও দেখেনি কান্ত। এ কী হলো বুড়োর!

—আমি পারিনি রে কান্তবাবু! আমি কোশিস্ করেছিলুম, কিন্তু পারিনি। আমার কলিজা ভেঙে দিয়েছে ওরা, আমাকে নেশা ধরিয়েছে ওরা, আমাকে দিওয়ানা করেছে ওরা, তাই আজ আমি আফিং মিশিয়ে তাম্বাকুর ধোঁয়া টানি, আফিং খাই, চরস খাই, ওদের পোড়াতে গিয়ে আমি নিজেই পুড়ে আজ খাক হয়ে গেছি কান্তবাবু...

বলতে বলতে সারাফত আলি সাহেব হঠাৎ মাঝপথে থেমে গেল। হয়তো বুঝতে পেরেছে এত কথা বলা কান্তর সামনে উচিত হয়নি। কিন্তু না, সেই লোকটা আবার এসে হাজির। সেই নজর মহম্মদ! নজর মহম্মদকে দেখেই সারাফত আলি সামলে নিয়েছে নিজেকে। নজর মহম্মদও একজন অচেনা লোককে দেখে একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেছে।

সারাফত আলি কান্তর দিকে চেয়ে বললে—তুই এখন যা কান্তবাবু, আমার খদ্দের এসেছে—

কান্ত চলে যেতেই সারাফত নজর মহম্মদকে খাতির করে দোকানের গদিতে বসালে। তাকিয়া এগিয়ে দিলে। বললে—ইলাজ হলো নজর মিঞা?

নজর মহম্মদ সে-কথার উত্তর না দিয়ে বললে—ও কে মিঞাসাহেব? কাফের

আদমী মালুম হচ্ছে?

সারাফত আলি বললে—তোমার সঙ্গে একটা বাত আছে নজর মিঞা, একটা কাম করতে পারবে আমার? একটা উপকার?

—বলুন মিঞাসাহেব!

—তোমাদের চেহেল্-সুতুনে হাতিয়াগড়ের রাণীবিবি এসেছে না?

নজর মহম্মদ কথাটা শুনেই শিউরে উঠলো। সর্বনাশ! তারপরেই নিজেকে সামলে নিয়ে বললে—হাতিয়াগড়ের রাণীবিবি! কই, না তো মিঞাসাহেব! নই-বেগম যে এসেছে সে তো লস্করপুরের তালুকদারের লেড়কী মরিয়ম বেগম—

—আমার কাছে ঝুট্ বোল না নজর মিঞা, আমার সব মালুম আছে—

নজর মহম্মদ একটু বিব্রত হয়ে পড়লো। সারাফত আলি আবার বলতে লাগলো—আর যার কাছে যা বলো তুমি, আমার সঙ্গে দিল্লাগি করতে যেও না। হাতিয়াগড়ের রাণীবিবিকে যে-আদমী এনেছে সে আমার খুলিতে আছে, আমি সব জানি—

নজর মহম্মদ আর কোনো কথা বলতে পারলে না।

সারাফত আলি বললে—আমার একটা কাম করতে হবে তোমাকে নজর—

—কী কাম?

—আমার আদমীকে চেহেল্-সুতুনের হারেমের অন্দরে নিয়ে যেতে হবে একদফে, রাণীবিবির সঙ্গে তার মুলাকাত্ করিয়ে দিতে হবে—

নজর মহম্মদ ভয় পেয়ে গেল। চারদিকে চেয়ে গলা নিচু করে বললে—এ আপনি কী বলছেন মিঞাসাহেব, আমি কি হারেমের মালিক। মালিক তো নানী-বেগম—

সারাফত আলি বললে—ও-কথা তুমি দুসরা কাউকে বলো নজর, আমাকে বলতে এসো না—আস্লি মালিক কে তা আমি জানি—

—আস্লি মালিক তো পীরালি মিঞাসাহেব!

—তাহলে এতক্ষণ ঝুট্-মুট্ কথা বাড়াচ্ছিলে কেন? আমার এ-কাজটা করতেই হবে। পীরালিই মালিক হোক আর যে-ই মালিক হোক, তুমিই তো সব। নজরানা কত লাগবে বলো?

—কীসের নজরানা?

সারাফত আলি হেসে উঠলো। বললে—ঘুষ, রিশ্শোয়াত্! বেগর-নজরানাতে তো হারেমের খোজারা কিছু করে না, তাই জিজ্ঞেস করছি! কত নেবে তুমি?

নজর লজ্জায় পড়লো। বললে—আপনার কাছে কী নেবো মিঞাসাহেব?

—না, তোমাকে নিতে হবে। তোমার যা মামুলি পাওনা আছে, তা আমি আমার নিজের তবিল থেকে দেবো। এক মোহর?

নজর বললে—সে আপনার যা খুশী দেবেন—

কথাটা শুনেই সারাফত আলি চিৎকার করে ডাকলে—কান্তবাবু, ইধর্ আ—

এতক্ষণ পেছনের ঘরে দাঁড়িয়ে কান্ত সবই শুনছিল। এবার সামনে এসে দাঁড়াতেই সারাফত আলি তাকে দেখিয়ে নজর মহম্মদকে বললে—এই আমার আদ্মী, এ যাবে—

নজর মহম্মদ ভালো করে দেখে নিলে কান্তকে। তারপর বললে—ঠিক আছে মিঞাসাহেব, আপনি যখন বলছেন, তখন ঠিক আছে, লেকিন্ কেউ যেন জানতে না পারে—

সারাফত বললে—কেউ জানবে না, কৌয়া-চিঁড়িয়া ভি জানবে না—

নজর মহম্মদ বললে—তাহলে আমি সাম্‌কা বখ্‌ত্‌ আসবো মিঞাসাহেব, বাবুজীকে মেরে সাথ লিয়ে চলবো—বলে সেলাম করে নজর মহম্মদ চলে গেল।

নজর মহম্মদ চলে যেতেই সারাফত আলি কান্তর দিকে ফিরলো। বললে—তাহলে তৈয়ার থাকবি কান্তবাবু। কিন্তু যা বললুম তা পারবি তো? চেহেল্‌-সুতুন ভেঙে গুঁড়িয়ে পিষে গোরস্থান বানাতে পারবি তো? আমি যা পারিনি তুই তা পারবি তো?

মনে আছে কান্ত সেদিন বুড়োর এই কথাগুলো শুনে বড় অবাক হয়ে গিয়েছিল। চেহেল্‌-সুতুনের ওপর বুড়ো সারাফত আলির কীসের এত রাগ? কেন এত অভিযোগ! কী করেছে বুড়োর চেহেল্‌-সুতুন? কী এমন অপরাধ করেছে যার জন্যে নিজের গাঁটের মোহর খরচ করে কান্তকে হারেমের ভেতরে যাবার ব্যবস্থা করে দিলে?

হাতিয়াগড়ের রাজবাড়িতে জনার্দন আসার পর থেকেই জগা খাজাঞ্চি মশাই বলে দিয়েছিল—দেখ বাপু, তুমি নতুন লোক, তোমাকে বলে রাখাই ভালো, ছোট-মশাইএর মেজাজ বড় কড়া। ভালো করে কাজ করা চাই কিন্তুক্‌, নইলে অন্য লোক দেখবো—

কিন্তু জনার্দনের কাজ-কর্ম দেখে সবাই অবাক। বরাবর শোভারামই এ-কাজ করে এসেছে। সেই গদাই-লস্করি চালে আসতো। তারপরে গোকুল তেল এনে দেবে, গামছা এনে দেবে, শোভারাম তখন ছোটমশাইকে তেল মাখাতে শুরু করবে তারপর সোহাগের মেয়ে মরালী। মেয়ের খেদ্‌মত্‌ করবে, না ছোটমশাই-এর খেদ্‌মত্‌ করবে! মেয়ের জন্যে কাজে মনই ছিল না শোভারামের। তারপর শোভা-রামের নিজের কোর্ফা জমি ছিল। তাতে জন খাটিয়ে বেগুনটা উচ্ছেটা চাষ করতো। তারপর আছে কান্নাকাটি। জগা খাজাঞ্চিবাবুর কাছে এসে প্রায়ই হাত পাততো। বলতো—খাজাঞ্চিবাবু, দুটো টাকা হাওলাত দ্যান্‌, আর পারিনে—

এই রকম হাওলাত নিয়ে-নিয়ে যে কত টাকা বাকি পড়েছিল তার আর হিসেব ছিল না। একদিন জগা খাজাঞ্চিবাবু আর পারলে না। সোজা গিয়ে ছোটমশাইকে বললে—শোভারামের কাছে কাছারির ছ টাকা তের গণ্ডা দামড়ি বকেয়া পাওনা, তাগাদা দিয়ে দিয়েও আর পাচ্ছি না, কী করবো তাই হুকুম দেন—

ছোটমশাইও যেমন। আদর দিয়ে দিয়ে একেবারে মাথায় তুলেছিলেন। বললেন—ওর কি আর দেবার ক্ষমতা আছে খাজাঞ্চিমশাই, ওটা আমার নামেই খয়রাৎ দেখিয়ে দাও খাতায়—

কিন্তু এবার জনার্দন আসতেই জগা খাজাঞ্চিবাবু আগে-ভাগে কথা বলে নিয়েছিল—দেখ বাপু, তোমার আবার শোভারামের মতো সোহাগের মেয়ে-টেয়ে নেই তো?

জনার্দন হাতজোড় করে বলেছিল—না—

—আগে কোথাও কাজ-কাম করেছো?

—আজ্ঞে না, হুজুর।

—দেশ কোথায়?

—ছিন্নাথপুরে।

—শুধু ছিন্নাথপুর বললে আমি কী বুঝবো। কোন্ ছিন্নাথপুর? নদের ছিন্নাথপুর না ঝিনেদে'র ছিন্নাথপুর?

—আজ্ঞে ঝিনেদে'র ছিন্নাথপুর।

জগা খাজাঞ্চিবাবু জনার্দনের নাম-ধাম কুলজী লিখে নিলে খাতায়। যদি তেমন মন দিয়ে কাজ করতে পারো তো তোমাকেও কোর্ফা প্রজা করে নেবো। ছোটমশাইকে তেল মালিশ করে চান করিয়ে দিতে হবে রোজ। তারপর ফাই-ফরমাশটাও খাটতে হবে। ছোটমশাইএর সঙ্গে দরকার পড়লে মহলে যেতে হবে।

সব তাতেই জনার্দন রাজি। যে-কোনো মাইনে, যে-কোনো কাজ, কিছুতেই না বলেনি জনার্দন। ছোটমশাই তখন নিজের মহলে বেরোনই না। শরীরটা খারাপ। নিচে নামাও তাঁর বারণ। কবিরাজ মশাই আসেন, ভেতরে গিয়ে তাঁকে দেখে আসেন, তারপর চলে যান ওষুধ দিয়ে।

একদিন জনার্দন গোকুলকে জিজ্ঞেস করলে—হ্যাঁ গো, কী ব্যামো ছোটমশাই-এর?

গোকুল বললে—বড় ভারি ব্যামো গো, বড় ভারি ব্যামো—

—তা কবিরাজ মশাই কী বলছেন? কদ্দিন লাগবে সারতে?

—তা লাগবে অনেকদিন। এ তো তোর আমার মত গরীবের ব্যামো নয়,—

জনার্দন তবু যেন খুশী হলো না। জিজ্ঞেস করলে—ব্যামোটা হলো কেন হঠাৎ?

গোকুল রেগে উঠলো।—তা মানুষের ব্যামো হবে না? রোগ-ব্যামো না হলে কবিরাজ-বদ্যি-হাকিম কী করতে আছে? তারা কী খাবে?

তা বটে। কথাটা বোধ হয় বুঝলো জনার্দন। কিন্তু বুঝেও সময় পেলেই অকারণ প্রশ্ন করা স্বভাব জনার্দনের।

গোকুল রেগে যায়। বলে—তোর অত কথা জানবার ইচ্ছে কেন বল তো জনার্দন? তোর খেতে পাওয়া নিয়ে কথা। দু'বেলা অতিথশালায় খাবি আর কাজ করবি। আর কাজ না থাকে তো পায়ের ওপর পা দিয়ে আয়েস করে বসে থাকবি। তোর সব কথায় থাকার দরকারটা কী?

জনার্দন বললে—তা যা বলেছো গোকুল, আমার কীসের মাথা-ব্যথা। দু-বেলা দুটো খাবো আর কাজ না থাকে পায়ের ওপর পা তুলে আয়েস করে বসে থাকবো। কী বলো?

কিন্তু তবু চুপ করে থাকতে পারে না জনার্দন। দরকার না থাকলেও কানুনগো-কাছারিতে গিয়ে বসে। এটা ওটা জানতে চায়। জগা খাজাঞ্চির ওপর অগাধ ভক্তি আবার। দেখলেই পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে মাথায় হাত ঠেকায়।

জগা খাজাঞ্চিবাবু বলে—লোকটার দেবদ্বিজে ভক্তি-টক্তি আছে দেখছি, শোভারামের মত নয়—

জনার্দন বলে—শুধু বসে-বসে ভাত গিলছি খাজাঞ্চিমশাই, একটা কিছু কাজ-কাম দেন, আর ভাল্লাগছে না—

—কী কাজ করবি তুই? কী কাজ জানিস?

—আজ্ঞি হুজুর, সব কাজ জানি। জল তুলতে জানি, বাটনা বাটতে জানি। ঘর ঝাড় দিতে জানি, পা টিপে দিতে জানি। জানি সব কাজই খাজাঞ্চিবাবু, ছোট-

মশাই যদ্দিন ব্যামোতে আছেন, তদ্দিন না-হয় অন্য কাজ করি। কাজ না করে-করে যে গায়ে-গতরে ব্যথা হয়ে গেল আমার—

এমন উৎসাহী লোক জগা খাজাঞ্চিবাবু জীবনে দেখেনি আগে। একটু অবাক হয়ে গেল। তারপর বললে—আচ্ছা ঠিক আছে, আমার পা দুটো একটু টিপে দে দিকিনি, দেখি তোর কেমন কেরামতি—

তা সেদিন থেকে সেই কাজই করতে লাগলো জনার্দন। যতদিন ছোটমশাই না নিচেয় নামেন ততদিন জনার্দনকে দিয়ে নিজের পা টিপিয়ে নিতে লাগলো জগা খাজাঞ্চিবাবু। তারপর সময় পেলেই অতিথশালায় গিয়ে ঢোকে। গোকুলের সঙ্গে গল্প জুড়ে দেয়। গোকুলের সঙ্গে বার-বাড়ি পেরিয়ে ভেতর-বাড়ি পর্যন্ত যাবার চেষ্টা করে। ভেতর-বাড়িতে একলা গিয়ে গোকুলের নাম করে এদিক-ওদিক উঁকি মেরে দেখে।

কেউ দেখলে জিজ্ঞেস করে—কে গো তুমি?

—আজ্ঞে আমি জনার্দন!

—তা ভেতর-বাড়িতে কেন?

—আজ্ঞে গোকুলকে ডাকতে যাচ্ছি—

তারপর আর কেউ তেমন আপত্তি করে না। শোভারামও এমনি মাঝে মাঝে ভেতরে যেত। দু-একদিন ভেতরে গিয়ে-গিয়ে রাস্তা-ঘাটও চিনে নিলে। বাড়ির ভেতর বিরাট মহল। এক মহল পেরিয়ে আর এক মহলের সামনে গিয়ে এদিক-ওদিক উঁকি মারে। তারপর পাছে কারো সন্দেহ হয় তাই ডাকে—গোকুল, অ গোকুল—

—কে গা?

তরঙ্গিনী একদিন দেখতে পেয়েছে। নতুন মুখ দেখে ঘোমটা দিয়ে দিয়েছে মাথায়।

—আমি জনার্দন মা, গোকুল আছে ইদিকে?

—না বাবা, গোকুল এ-মহলে তো থাকে না, ও-মহলের ভেতর-দরজায় গিয়ে ডাকো—

এমনি করে ক'দিনের মধ্যেই জনার্দনের বেশ চেনা-শোনা হয়ে গেল সব। অন্ধকারে চোখ বেঁধে ছেড়ে দিলেও বেশ অনায়াসে বেরিয়ে আসতে পারে। দুপুরবেলা যখন সবাই খাওয়া-দাওয়ার পর গা আল্‌গা দিয়েছে, জনার্দন তখনো চুপচাপ থাকে না। রেজা আলির কাছেও মাইনে নিচ্ছে, ছোটমশাই-এর কাছেও মাইনে নিচ্ছে। কিছু কাজ না দেখাতে পারলে রেজা আলি আর কতদিন চাকরিতে রাখবে!

গোকুলকে জিজ্ঞেস করলে—হ্যাঁ গা, তা তোমাদের শোভারাম পাগল হয়ে গেল কেন গা?

গোকুল বলে—মেয়ের শোকে—আর কীসে?

—তা মেয়ে গেল কোথায়?

—মেয়েছেলের চরিত্তিরের কথা কে বলতে পারে বল! ভগমানও বলতে পারে না, আমি তো কোন্ ছার—

তারপরেই হঠাৎ জনার্দন জিজ্ঞেস করে বসে—ছোটমশাইএর বুঝি দুটো বিয়ে গো গোকুল?

গোকুল চাইলে জনার্দনের দিকে। সন্দেহ করলে নাকি!

জনার্দন বলে—কিছু মনে করলে না তো ভাই! শুনিছি কি না যে ছোট-মশাইএর দুটো বিয়ে, তাই জিজ্ঞেস করলুম—

তারপর নিজেই আবার বলে—তা দুটো বিয়েই হোক আর তিনটে বিয়েই হোক, আর ছ'টা বিয়েই হোক, আমরা চাকর-মনিষ্যি, আমাদের ও-সব খোঁজ নিয়ে কী দরকার, বলো না! খেতে পাচ্ছি পেট ভরে, তাই বলে বাপের ভাগ্যি—

তারপর রাত যখন গভীর হয়, যখন সব নিশুতি, তখনো জনার্দন জেগে থাকে। জেগে বসে কানটা খাড়া করে রাখে। কোথায় যেন একটা শব্দ হলো না? কে যেন ফিস্-ফিস্ করে কোথায় কথা বলছে না? কোথায় যেন ঝন্ ঝন্ শব্দে শেকল খুলে গেল! আস্তে আস্তে অতিথশালাটা পেরিয়ে ভেতর-বাড়ির খিলেনের তলা দিয়ে টিপি টিপি পায়ে এগিয়ে গেল। মনে হলো ওদিকের বারান্দায় যেন একটা কার পায়ের শব্দ হচ্ছে। শব্দটা আরো কাছের দিকে আসছে। ভূতের বাড়ি নাকি?

—কে র‍্যা?

একেবারে দুর্গার মুখোমুখি পড়ে গেছে জনার্দন। অন্ধকারে ভালো দেখা যাচ্ছে না। দূরে এককোণে একটা আলো জ্বলছিল। তার আলোটা মুখে এসে পড়তেই একেবারে হাতে-নাতে ধরা পড়ে গেছে। দুর্গা এসেই একেবারে জনার্দনের হাতটা চেপে ধরেছে।

—কে র‍্যা তুই মুখপোড়া?

জনার্দন বলে উঠলো—আমি মা, আমি—

দুর্গা তবু ছাড়বার পাত্রী নয়। আমি কে? আমি-র নাম নেই রে মুখপোড়া? একেবারে ভেতরে এসে ঢুকে পড়েছো? ডাকবো মাধব ঢালীকে?—অ মাধব, মাধব—

দুর্গার চিৎকারে সবাই জেগে উঠেছে। ঝি-চাকর সবাই এসে হাজির। গোকুলও এসে হাজির। দুর্গা তখন চিৎকার করে উঠেছে—ডাক তো গোকুল মাধব ঢালীকে—ডাক তো—

জনার্দনের মুখখানা দেখে গোকুল অবাক। আরে, তুই জনার্দন? তুই এত রাত্তিরে ভেতর-বাড়িতে কী করতে?

জন্যার্দন তখন কেঁদে ফেলেছে একেবারে। কাঁদতে কাঁদতে বললে—আমি অন্ধকারে ঠাওর করতে পারিনি মা, আমাকে ছেড়ে দেন—

গোকুল বললে—ও দুগ্যা, এ যে আমাদের জনার্দন গো—

—তা জনার্দন হোক আর গোবর্ধন হোক, ভেতর-বাড়িতে মেয়ে-মহলে কী করতে আসে হারামজাদা! বড় বউরানীকে ডাকবো?

গোকুল বললে—ছেড়ে দাও দুগ্যা ওকে, ও নতুন লোক, মাঝরাতে ঘুম থেকে উঠে বাইরে গিয়েছিল, আর ফিরে এসে পথ চিনতে পারেনি, ভেতরে ঢুকে পড়েছে—ছেড়ে দাও—

দুর্গা জনার্দনের হাতটা ছেড়ে দিয়ে বললে—যা এখেন থেকে, আর যদি কখনো ভেতর-মহলে ঢুকবি তো তোকে খুন করে ফেলবো হারামজাদা, আমার কাছে ছেনালিপনা করতে এসেছো?

গোকুল বুঝিয়ে-সুঝিয়ে আবার জনার্দনকে বাইরে নিয়ে গেল। ঝি-চাকর আবার যে-যার জায়গায় শুতে চলে গেল। দুর্গা আস্তে আস্তে সিঁড়ির তলার ঘরখানার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। আবার সব নিঃঝুম হয়ে গেছে। সিঁড়ির তলার ঘরখানার কুলুপ খুলে ভেতরে ঢুকতেই ছোট বউরানী কথা বলতে যাচ্ছিল।

দুর্গা ফিস্ ফিস্ করে বললে—চুপ করো বউরানী, চুপ করো—

ছোট বউরানী গলা নামিয়ে জিজ্ঞেস করলে—অত চেঁচাচ্ছিলি কেন রে? কী হয়েছিল?

—শয়তান ঢুকেছে গো বাড়ির মধ্যে!

—শয়তান? কী বলছিস্ তুই?

—হ্যাঁ ছোট বউরানী, পীরের কাছে মামদোবাজী করতে এসেছে। মর মুখপোড়া। দুগ্যাকে এখনো চেনেনি হারামজাদা মিন্সে।

ছোট বউরানী বুঝতে পারছিল না কিছু। বললে—কার কথা বলছিস্ তুই? কে?

দুর্গা বললে—আমি ক'দিন থেকে দেখছি মিন্সেকে, শোভারামের বদ্লা কাজ করতে এসেছে, কেবল ভেতর-বাড়ির দিকে উঁকি-ঝুঁকি মারে। আজ রাত্তিরে একেবারে খালি পেয়ে এ-মহলের ভেতরে ঢুকে পড়েছে—

ছোট বউরানী জিজ্ঞেস করলে—কেন রে? ঢুকে পড়েছে কেন?

—ও নির্ঘাত চর, ডিহিদারের চর। আমার চোখকে ভোলাবে মিন্সে তেমন বাপের জন্মিত নই আমি। আমি মিন্সের চোদ্দপুরুষের মুণ্ডু ঘুরিয়ে দেবো না!

ছোট বউরানী হঠাৎ বললে—ও-কথা থাক্, আর কিছু খবর পেলি তুই? মরালী গিয়ে মুর্শিদাবাদে পৌঁছেছে?

দুর্গা বললে—হ্যাঁ, ভালোয় ভালোয় পৌঁছে গেছে, কেউ টের পায়নি—

—তাহলে আর কদ্দিন এ-রকম ভাবে থাকবো এখানে?

দুর্গা বললে—আর ক'টা দিন, নবাব তো কলকাতায় ফিরিঙ্গীদের সঙ্গে লড়াই করতে গেছে, যদি বেটা সেখানেই ফিরিঙ্গীদের গোলা লেগে মরে যায় তো বুড়ো শিবের মন্দিরে পুজো দেবো বৌরানী, মানত্ করে রেখেছি; তখন আবার তোমাকে ওপরে নিয়ে গিয়ে ছোটমশাই-এর পাশে শুইয়ে দিয়ে আসবো, আর ক'টা দিন সবুর করো না—

—ছোটমশাই আমার কথা বলে না আর?

দুর্গা বললে—বলেন না আবার? তোমার জন্যে দাঁতে একটা কুটো পর্যন্ত কাটছেন না এ ক'দিন। নিচেয় পর্যন্ত নামছেন না। শুনেছেন তো তোমাকে খুন করে ফেলা হয়েছে, সেই কথা শোনার পর থেকেই শয্যাশায়ী—

তারপর একটু থেমে আবার বললে—এদিকে এই নতুন ঝঞ্ঝাটে আবার মাথাটা গরম হয়ে গেছে আমার। এ মিন্সেকে না শায়েস্তা করলে আর চলছে না। দাঁড়াও না, এ-বেটাকে এবার উচাটন করবোই—তুমি দেখে নিও, ঠিক করবো, তেমন বাপের জন্মিত আমি নই, না-যদি করি তো আমার নাম দুগ্যাই নয়—

নবাবের সেপাইরা সেদিন হুড়-হুড় করে কেল্লার মধ্যে ঢুকে পড়েছে। একদিন যে জেনারেল ড্রেককে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ইন্ডিয়ায় পাঠিয়ে নতুন এম্পায়ার গড়বার স্বপ্ন দেখেছিল, সেই জেনারেল তখন গঙ্গায় জাহাজ ভাসিয়ে ভাগীরথীর বুক বেয়ে অনেক দূর চলে গেছে। শুধু ড্রেক নয়, মিস্টার মার্কেট, মিস্টার বেভারিজ মিনুচিন, ক্যাপ্টেন গ্রান্ট সবাই। কেল্লার মধ্যের ফিরিঙ্গীরা, যারা পালাতে পারেনি, তারা কান্না জুড়ে দিয়েছে হাউ-মাউ করে। হল্ওয়েল সাহেব

দৌড়ে গিয়ে হাজির হলো উমিচাঁদের কাছে। হল্‌ওয়েল থর থর করে কাঁপছে। গলায় আওয়াজ বেরোচ্ছে না। এখন কী হবে উমিচাঁদজী?

উমিচাঁদ বললে—দাঁড়াও সাহেব, আমি উপায় করছি—

বলে সেখানে বসেই একটা চিঠি লিখলে নবাবের জেনারেল রাজা মানিকচাঁদের নামে। লিখলে—'ফিরিঙ্গীরা আপনার পায়ে ধরে ক্ষমা চাইতে প্রস্তুত। আপনি যা শাস্তি তাদের দেবেন, তাই-ই তারা মাথা পেতে নেবে। এখনি যুদ্ধ বন্ধ করুন। নইলে আমরা সবাই সদলবলে ধ্বংস হয়ে যাবো।'

চিঠিটা কেল্লার পাঁচিলের বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হলো। অনেকক্ষণ ধরে সবাই উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো। এইবার হয়তো চিঠির উত্তর আসবে। হয়তো এইবার। শেষ পর্যন্ত সে-উত্তর এল সশরীরে। ভোরবেলা সশরীরে হাজির হলো রাজা মানিকচাঁদ, মীরজাফর, মোহনলাল, আর সকলের শেষে সশরীরে এসে হাজির হলেন নবাব। নবাব মনসুর-উল্‌-মুল্‌ক্‌ শা কুলি খান্‌ মির্জা মহম্মদ সিরাজ-উ-দ্দৌলা হেবাৎ জং আলমগীর...

কান্নার রোল পড়ে গেল চারদিকে।

নবাব ফিরিঙ্গী-কেল্লার ভেতরে ঢুকে অবস্থা দেখে অবাক হয়ে গেলেন। এত বড় কেল্লা বানিয়েছে ফিরিঙ্গী বাচ্ছারা। এত তাদের ষড়যন্ত্র!

বললেন—উমিচাঁদ কোথায়? রাজা রাজবল্লভের ছেলে কৃষ্ণবল্লভ!

ভয়ে ভয়ে দুজনে এসে হাজির হলো সামনে। ফিরিঙ্গীদের কেল্লায় তারা বন্দী হয়ে ছিল এ ক'দিন। এবার বোধহয় মুর্শিদাবাদের কেল্লায় তাদের বন্দী করা হবে।

—আর হল্‌ওয়েল? মিস্টার হল্‌ওয়েল কোথায়?

কান্নায় তখন ভারী হয়ে এসেছে কলকাতার বাতাস। অষ্টাদশ শতাব্দীর এক অস্বস্তিকর বিচারশালায় আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নবাবের অনুগ্রহের আশায় মাথা নিচু করে নিঃশব্দে ক্ষমা চাইতে লাগলো। আমাদের ক্ষমা করুন জাঁহাপনা। আমরা অপরাধী। এবার থেকে আপনার আশ্রয়ে থেকে আপনার হুকুম তামিল করে আপনার মসনদের মর্যাদা রাখবো কথা দিলাম।

আর ওদিকে সেইদিন সন্ধেবেলাই সারাফত আলির খুশ্‌বু তেলের দোকানে ঠিক সময়েই এসে হাজির হয়েছে খোজা নজর মহম্মদ। নজর মহম্মদ তার কথা রেখেছে। মোহরের মর্যাদা সে লঙ্ঘন করতে পারেনি।

কান্তও তৈরি ছিল।

কান্তকে দেখে নজর মহম্মদ বললে—চলিয়ে জনাব—চলিয়ে—

রোজ রাত্রে যে-শব্দগুলো চেহেল্‌-সুতুনের ভেতরে তোলপাড় করে বেড়ায়, যে-ভাবনাগুলো হারেমের হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে সারা বাঙলাদেশে ছড়িয়ে পড়ে, তার খবর এ-ক'দিনেই পেয়ে গেছে মরালী। নজর মহম্মদ যতই পাহারা দিক, পীরালি খাঁ যতই তদারকি করুক, মরালীকে আর কেউ আটকে রাখতে পারেনি চারটে দেয়াল আর একটা ছাদের জেলখানায়।

মরালী জেনে গেছে সে হাতিয়াগড়ের রাণীবিবি আর নয় আজ, সে এখন

লস্করপুরের তালুকদার কাশিম আলির লেড়কি মরিয়ম বেগম। তাকে সবাই জিজ্ঞেস করেছে—তুমি কেন মরতে এলে ভাই এখেনে?

মরালী বলেছে—এখানে এলে খুব যে আরাম শুনেছিলুম—

—ছাই, ছাই, ছাই আরাম—নবাবের নিজের মাসী, তার দুর্দশা যদি দেখ—

—ঘসেটি বেগম?

—হ্যাঁ, ওর ডাক নাম মেহেরুন্নিসা, আমাদের এখানে পীরালি খাঁ আছে খোজা সর্দার, সে বলে মতিঝিলের বেগম—

—কেন?

—মতিঝিল তো ঘসেটিবিবিই বানিয়েছিল কিনা। নবাব মতিঝিল থেকে গ্রেফ্‌তার করে এনে এখানে নজরবন্দী করে রেখেছে তাকে। আমাদের কারোর সঙ্গে দেখা করতে দেয় না, আমাদের কারোর সঙ্গে মিশতে দেয় না—ঘসেটিবিবি বড় কষ্টে আছে ভাই—।

মরালী জিজ্ঞেস করে—তুমি বুঝি হিন্দু? তুমি কী করে এখেনে এলে?

গুলসন বেগম বলে—আমি কি ভাই নিজে সাধ করে এসেছি তোমার মত? আমাকে প্যায়দায় টেনে এনেছে। ওই যে মেহেদী নেসার সাহেব, চেনো তো?

—না।

—সে কি, মেহেদী নেসার সাহেবের নামই শোননি? ওই বেটাই তো সব। নবাব শুধু নামে নবাব। নবাবের ইয়ার-বক্সীরাই তো ছারখার করে দেবে সব। আমার ভাই বর আমাকে নিত না—আমি বরকে সেই বিয়ের রাত্তিরে যা একটুখানি দেখেছিলুম, তারপর আর আসেনি আমাদের বাড়িতে, কেবল বাবার কাছে টাকা চাইতো। আমার বাবা টাকা কোথায় পাবে—টাকা তো চাইলেই কেউ দিতে পারে না! বাবা তো পুজোরি বামুন—যজমানরা টাকা দিলে তবে তো বাবা হাতে পাবে—

—তোমরা বামুন নাকি?

অদ্ভুত মেয়ে ওই গুলসন বেগম। বামুনের মেয়ে, কিন্তু চেহারা দেখলে আর চেনাই যায় না। বেশ নাকে বেশর, কানে কণকচূড়, মাথায় মুসলমান মেয়েদের মত জরির ফিতে বাঁধা বেণী, চোখে সুর্মা, ঠোঁটে আর আঙুলের নখে মেহেদী রং বুকে কাঁচুলী, পরনে বুটিদার ঘাগরা। বোঝাই যায় না যে গুলসন বামুনের মেয়ে।

—তারপর পুকুর-ঘাটে একদিন চান করছিলুম ভাই, হঠাৎ কোত্থেকে কে একজন এসে মুখে গামছা পুরে দিয়ে একেবারে চ্যাংদোলা করে তুলে এখানে নিয়ে এল। এসে কল্‌মা পড়িয়ে জাত নিয়ে নিলে। তারপর কোথায় রইলো বাবা, আর কোথায়ই বা রইলো মা, ছোট-ছোট বোনগুলোর জন্যে বড্ড মন-কেমন-করে ভাই—

বলতে বলতে হয়তো গুলসনের বাড়ির কথা মনে পড়ে যায়। চোখ দুটো মুছে নেয় ওড়না দিয়ে। বলে—এই তো জষ্ঠি মাস, জষ্ঠি মাসে আমরা ভাই-বোনরা মিলে আম কুড়োতে যেতুম, সে যে কত আম ভাই, তোমাকে কী বলবো, এক-একটা আম কী মিষ্টি যে কী বলবো। পাথর বাটিতে আম আর কাঁঠালের রস করে সেই খেতাম পান্তা ভাত দিয়ে, এখানে এত কালিয়া-কাবাব-কোপ্তা খাচ্ছি, কিন্তু সে-রকম তার আর পেলাম না।

তারপর বলে—এতদিন রইছি ভাই এখেনে, কিন্তু তবু সে-সব কথা ভুলতে পারিনি। আচ্ছা তুমিই বলো না ভাই, ভাই-বোন-বাপ-মা'র কথা কেউ কখনো ভুলতে পারে—? তাই সেদিন যখন শুনলুম যে আর একজন মেয়ে আসছে এখেনে,

শুনে ভাবলুম, আবার বুঝি কোন মেয়ের কপাল ভাঙলো—। তখন থেকে তোমার সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টা করছি—

—কার কাছে শুনলে আমি আসছি?

গুলসন বললে—এখেনে ভাই কেউ কি কিছু বলে? কেউ কাউকে কিছু বিশ্বাস করে না, সবাই ভাই সবাইকে সন্দেহ করে। নানীবেগম পর্যন্ত...

—নানীবেগম কে?

—ওমা, নানীবেগমকেই চেনো না? নানীবেগমই যে এখানকার বেগমদের মাথা। নবাবের নানী কিনা, তাই তাকে সবাই নানীবেগমসাহেবা বলে ডাকে।

—নবাবের নানী মানে?

—নানী বলে এরা দিদিমাকে। আমরা যাকে বলি দিদিমা, তাকেই এরা বলে নানী। প্রথম-প্রথম ভাই আমিও এদের কথাবার্তা বুঝতে পারতুম না। যা খেতুম গা বমি-বমি করতো। এত ঝাল-গরম-মশলা তেল-ঘি দিয়ে রাঁধে যে মুখে কিচ্ছু রুচতো না। শেষকালে আস্তে আস্তে সব অব্যেস হয়ে গেল। তা তুমি খেতে পারছো?

মরালী বললে—না—

—তা এখন তো পারবেই না, কিন্তু কের্‌মে-কের্‌মে সব সহ্য হয়ে যাবে।

মরালী হঠাৎ বললে—আচ্ছা, এখানে গান গায় কে?

—ওমা, গান তো সব্বাই গায়। গান যে শিখতে হয় আমাদের। তোমাকেও শিখতে হবে। গানের ওস্তাদজী আসে যে গান শেখাবার জন্যে—

—কিন্তু আমি তো গান কখনো গাইনি।

—গান না পারলে বাজনা শেখাবে। সেতার শেখাবে। বীণ্‌ শেখাবে। ওস্তাদজী যে সব বাজনা বাজাতে পারে ভাই। তারপর নাচতে পারলে আরো ভালো হয়—নাচ যদি একবার শিখতে পারো ভাই তো তখন তুমি একেবারে নবাবের পেয়ারের বেগম হয়ে যাবে—তখন আর তোমাকে পায় কে! এখানে তো সব্বাই তাই নবাবের পেয়ারের বেগম হতে চাইছে—

গুলসন বেগমের কথা বেশি বলা স্বভাব। যখন বকে যায় তখন আর রাশ থাকে না মুখের।

মরালী বললে—আর রোজ কাঁদে কে? রাত্তিরে যে প্রায়ই কান্না শুনতে পাই—

—ও পেশমন। ওর কথা আর বোল না—

—কেন? কী হয়েছে ওর? কেন কাঁদে?

—ও ভাই তোমার মতই মুসলমানের মেয়ে। ওরা পাঠানী মুসলমান। ওর এক বিচ্ছিরি রোগ হয়েছে—

রোগের নাম শুনেই মরালী চমকে উঠলো। আহা গো!

—সে বড় বিচ্ছিরি রোগ ভাই। দেখলে তোমারও মায়া হবে। যন্ত্রণা যখন হয় তখন আর চেপে রাখতে পারে না, খুব চেঁচায়—

—তা কবিরাজকে দেখায় না কেন?

—কবিরাজকে দেখায় না ভাই। এরা হেকিমী দাওয়াই এনে দেয়। কিন্তু আমি বলছি ভাই ও-রোগ ওর সারবে না। ও-রোগ একবার হলে আর কারো সারে না।

—রোগটা কী?

গুলসন বলে—এরা বলে সুজাক। এরা বলে মালেখুল্লিয়া দিমাগী। ও সব

মুসলমানী রোগের মাথামুণ্ডু কিছুছু বুঝি নে ভাই। তুমি যদি তাকে দেখ তাহলে তোমারও কান্না পাবে। আমি বলি আসলে ভাই ওরই দোষ!

—কেন?

—দোষ নয়? তোর সকলকে টেক্কা দেবার দরকার কী ছিল? এতগুলো বেগম রয়েছে, তারা আগে না তুই আগে? ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেতে যাওয়ার দরকার কী ছিল শুনি? তা ছাড়া ভাই নবাবের নিজের সাদি করা বউও তো রয়েছে। তার মনে কষ্ট দিলে তোর কি ভালো হয় কখনো? বলো ভাই, তুমিই বলো।

মরালী এ-সব কথা অবাক হয়ে শোনে। এ এক বিচিত্র জগৎ। এ-জগতের খবর এতদিন সে জানতোই না একেবারে। এই জগতের মধ্যে এতগুলো মেয়ে এসে জমা হয়েছে। এদের সুখ-দুঃখ-হাসি-কান্না সমস্তই যেন একজন পুরুষকে কেন্দ্র করে। সেই মানুষটির কাছে কে কেমন করে সকলের চেয়ে প্রিয় হবে সেইটেই এদের একমাত্র সমস্যা। কে গান শুনিয়ে তাকে মুগ্ধ করবে, কে নেচে তাকে নিজের তাঁবে আনবে, তারই প্রতিযোগিতা চলে দিনরাত। গুলসন-এর কাছে সব গল্প শুনে শুনে এই ক'দিনের মধ্যেই মরালীর সব চেহেল্-সুতুনটা যেন দেখা হয়ে গিয়েছিল। সে যেন চোখ বুঁজেই বলে দিতে পারে কোন্ দিকে নানীবেগম থাকে, কী করে। বলে দিতে পারে লুৎফা বেগম-এর রাত কাটে কেমন করে। পেশমন বেগম কেন কাঁদে। বব্বু বেগম কেন অত মন দিয়ে গান শেখে, তক্কি বেগম কেন নাচ শেখে মনপ্রাণ দিয়ে। একদিন এমনি করেই যদি নবাবের নজরে একবার পড়ে যেতে পারে কেউ তো তখন তাকে আর কে পাবে? তখন মতিঝিলের মত তার একটা বাড়ি হবে, তখন তার জন্যে সাজাহানাবাদ থেকে হীরের গয়না আসবে, জয়পুর থেকে সাঁচ্চা মোতির মালা আসবে। তখন রুপোর বদলে সোনার গেলাসে সে সরবৎ খাবে। তখন তার খেদ্মত্ করবে দশটা খোজা, বিশটা বাঁদী। তখন আর তাকে নানীবেগমের ধমক খেতে হবে না, তখন সে পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে হুকুম করবে সবাইকে।

—এই যে তোমার সঙ্গে লুকিয়ে লুকিয়ে গল্প করতে আসি-না, নজর মহম্মদ যদি জানতে পারে তো আমাকে আর আস্ত রাখবে না ভাই, তাই রাত্তির বেলা লুকিয়ে-ছুপিয়ে আসি!

—কেন? আমি কী দোষ করেছি? আমাকে মিশতে দেয় না কেন তোমাদের সঙ্গে?

গুলসন বলে—ও প্রথম-প্রথম আমাদেরও ওই রকম কারো সঙ্গে মিশতে দিত না, পোষ মানাবার চেষ্টা করতো। তা এখেনে পোষ না-মেনে তো উপায়ও নেই ভাই। পোষ না-মেনে করবোই বা কী! আর তো করবারও কিছু নেই আমাদের—সারাজীবন যখন এখেনেই কাটাতে হবে তখন সবকিছু মেনে নেওয়াই ভালো—

—সারাজীবন কাটাতে হবে? সারাজীবন আর কোথাও বেরোতে পারবো না?

গুলসন বলে—না, সেই জন্যেই তো এখেনে এলে সব্বাই নেশা করে—

—তুমিও নেশা করো?

—হ্যাঁ, নেশা না-করলে যে ভাই থাকা যায় না। দম আটকে আসে। আমরা যে বেঁচে আছি এটা যে ভুলতে পারিনে। সেটা ভোলবার জন্যেই তো নেশা করি। তুমিও ভাই দেখো, ঠিক নেশা ধরবে, তুমিও একদিন নেশা না-করে থাকতে পারবে না—আমাদের মত—

—কী নেশা করো?

গুলসন বললে—নেশা কি আর এক-রকমের ভাই। হাজার-রকমের নেশা আছে। আফিম, চরস, কত কী! এক রকম সাপের বিষ আছে...

—সাপের বিষ?

—সে সাপের বিষ খেলে মরবে না, কিন্তু অসাড় হয়ে পড়ে থাকবে দু'দিন। সেটা খেলে খুব আরাম, আমি একবার খেয়েছিলুম—

মরালী জিজ্ঞেস করলে—এ সব নেশার জিনিস কোত্থেকে আসে?

—এ সব খোজারা এনে দেয়। নানীবেগম জানতেও পারে না। জানলে অনাচ্ছিষ্টি করবে। পীরালি খাঁ, নজর মহম্মদ, বরকত আলি ওরা লুকিয়ে লুকিয়ে আমাদের সব যোগায়—

—ওরা কোত্থেকে পায়?

—সে ভারি মজার ব্যাপার। চেহেল্-সুতুনের বাইরে চক্-বাজার বলে নাকি একটা জায়গা আছে, সেখানে সারাফত আলি বলে এক বুড়োর দোকানে ও-গুলো কিনতে পাওয়া যায়। আসলে গন্ধতেলের দোকান, কিন্তু ভেতরে-ভেতরে এই সব বিষ বেচে সে। নজর মহম্মদ তোমাকে আরকের কথা বলেনি?

মরালী বললে—হ্যাঁ, প্রথম দিনেই তো বলেছিল আরক চাই কি না—

—ওই তো! ওর নামই তো বিষ। ওই বিষ খাইয়ে খাইয়েই তো আমাদের পোষ মানায়। নইলে তো কান্নাকাটি করে প্রথম-প্রথম সবাই ভাসিয়ে দেয়। তারপরে যখন নেশাটা ধরে তখন যা বলবে তাই করতে হয়। তাই করতে ভালোও লাগে। প্রথম-প্রথম ভাই আমারও লজ্জা করতো। লজ্জা লাগবে না? তুমিই বলো? সবে গাঁ ছেড়ে এসেছি, গায়ের কাপড় টানাটানি করলে লজ্জা লাগবে না? চেনা-নেই শোনা-নেই অচেনা পর-পুরুষের সামনে খালি-গা হওয়া যায়?

মরালী জিজ্ঞেস করলে—কে? পর-পুরুষ কে?

গুলসন উত্তর দিতে যাচ্ছিল কিন্তু হঠাৎ ওদিকে বোধহয় কার পায়ের শব্দ হলো। শব্দ হতেই গুলসন ফস করে সরে গেছে। যাবার সময় বলে গেল—বোধহয় নজর মহম্মদ আসছে, আমি ভাই পালাই, কাল আসবো—আবার—

অন্ধকারে বাইরে সত্যিই পায়ের শব্দ হয়েছিল। মরালী অতটা টের পায়নি। কিন্তু গুলসনের কান সজাগ।

সে এমন করে পালিয়ে গেল যে, মরালীও যেন হঠাৎ বুঝতে পারলে না কখন পালালো। আর ঠিক তার পরেই নজর মহম্মদ ঘরে ঢুকেছে—কসুর মাফ কীজিয়ে বেগমসাহেবা।

বলে তিনবার কুর্নিশ করলে মাথা নিচু করে করে।

মরালী কোনো উত্তর দিলে না। নজর মহম্মদ নিজেই জিজ্ঞেস করলে বেগম-সাহেবার কিছু তক্‌লিফ হয়েছে কিনা। সরবৎ পান কিমাম জর্দা কিছু দরকার কি না। আরক জরুরৎ আছে কি না। বাঁদী কিছু কসুর করেছে কি না। হাজারো রকমের বাঁধা প্রশ্ন। এ ক'দিন ধরে মরালী দেখে আসছে, এমনি করে কথা বলাই এদের রেওয়াজ। এর উত্তর তারা চায় না, এর উত্তর তারা হয়তো আশাও করে না। এতদিন ধরে এখানে এই একঘেয়ে দিন কাটানোর সময়ে কারো সঙ্গে মরালী কথাও বলেনি। ঘর ছেড়ে বাইরে যাবার চেষ্টাও করেনি। চেষ্টা করলেই কোত্থেকে নজর মহম্মদের আবির্ভাব হয়েছে, আর অন্য কোথাও যেতে মানা করেছে। ভোর-বেলা সূর্য ওঠাটা টের পাওয়া যায় রোদ দেখলে। তারপর কোথাকার কোন্ মসজিদ থেকে আজানের টানা টানা সুর কানে এসেছে। আর কানে এসেছে

নহবতের রাগ-রাগিণী। ছোটমশাই-এর বাড়িতেও আগে নহবত বাজানো হতো। পরে আর হতো না। তারপর একটা বাঁদী আসে। বেশি কথা বলে না বাঁদীটা। হয়তো বোবা। সোজা নিয়ে যায় গোসলখানায়। সে মরালীর গায়ে কী রকম তেল মাখিয়ে দেয়। প্রথম প্রথম লজ্জা করতো মরালীর। কিন্তু বাঁদীটার লজ্জা-সরম কিছু নেই। সে তেলটা মাখিয়ে গা-শরীর-পা সর্বাঙ্গ মালিশ করে দেয়। তারপর গরম জল দিয়ে ঘষে ঘষে গা-হাত-পা পরিষ্কার করে দেয়। তারপর চুলে তেল মাখায়। চুলটা নিয়ে কসরৎ করতেই বেশি সময় লাগে তার। তারপর শরীরটা আগা-পাশ-তলা মুছিয়ে দিয়ে নতুন কাচা পোশাক পরিয়ে দিয়ে ঘরে আনে। চুলটা হাওয়া দিয়ে দিয়ে শুকোয়। তখন আসে নাস্তা। ফল, বাদাম, দুধ, মাখন। ও-সব খেতে ভালো লাগে না মরালীর। এরা মুড়ি-চিঁড়ে দিলে বোধহয় বেশি ভালো লাগতো তার। কিন্তু কে বলে সে সব কথা। তারপর সেই খাওয়ার পরই আসে পান, জর্দা, কিমাম, তাম্বুল-বিহার, এলাচ, লবঙ্গ। তারপর পাশার ছক্‌টা নিয়ে এসে মরালীকে পাশা খেলায় ভুলিয়ে রাখতে চায়। মরালী বলে—না, তুমি যাও এখন, আমি পাশা খেলবো না—

এমনি করেই দিন কাটাতে কাটাতে হঠাৎ একদিন ওই গুলসন মেয়েটা এসে আলাপ করে গিয়েছিল লুকিয়ে লুকিয়ে। তারপর থেকে ফাঁক পেলেই চলে আসে। এসে নানারকম গল্প শোনায়। এই চেহেল্‌-সুতুনের গল্প। এই নবাব আর নবাবজাদীদের গল্প। শুনতে বেশ লাগতো মরালীর। আর হঠাৎ কারো পায়ের শব্দ শুনলেই কোথায় কোন্ সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে সুড়ুৎ করে পালিয়ে যেত।

নজর মহম্মদ চলে যাবার চেষ্টা করছিল। হঠাৎ নহবতখানা থেকে অসময়ে নবৎ বেজে উঠলো।

মরালী অবাক হয়ে গেল। এ সময়ে তো কোনোদিন নবৎ বাজে না। জিজ্ঞেস করলে—নবৎ বাজছে কেন এই অসময়ে?

—খবর এসেছে, জাঁহাপনা কলকাতার লড়াই ফতে করে দিয়েছে। কলকাতার নাম বদলে আলীনগর রাখা হয়েছে, কলকাতায় আগ্‌ লাগিয়ে দিয়েছে জাঁহাপনা। ফিরিঙ্গী লোগ ভি কলকাতার কেল্লা ছেড়ে ভেগে পালিয়েছে।

মরালী জিজ্ঞেস করলে—তাই বুঝি খুব খুশী হয়েছে মুর্শিদাবাদের লোক?

—জী বেগমসাহেবা! মেহেদী নেসার সাহেব হুকুম ভেজিয়েছে আলীনগর থেকে মুর্শিদাবাদের লোককে খবরটা ওয়াকিবহাল করতে!

—ও!

নজর মহম্মদ তবু নড়লো না। খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো তবু।

মরালী জিজ্ঞেস করলে—জাঁহাপনা কি এইবার মুর্শিদাবাদে ফিরে আসছেন?

—জী বেগমসাহেবা! ঔর তিন-রোজের ভেতরেই ফিরে আসছে—

এবার মরালীর বুকটা যেন কেমন কেঁপে উঠলো। এতদিন বেশ ছিল মরালী। কিন্তু এবার? এবার যদি নবাবের সামনে যেতে হুকুম করে? এবার যদি পরীক্ষা দিতে হয় তাকে!

—বেগমসাহেবা, একটা কথা ছিল!

মরালী মুখ তুলে তাকালো।

—একঠো জওয়ান ছোকরা বেগমসাহেবার সঙ্গে মুলাকাত করতে চায়—

—কে সে? আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়? কেন?

—বান্দা তা কিছু জানে না বেগমসাহেবা! তার বড় জরুরী কাম আছে বেগমসাহেবার সঙ্গে।

—আমার সঙ্গে কাজ আছে? আমার সঙ্গে তার কী কাজ থাকতে পারে? কে সে?

—বান্দা তা জানে না বেগমসাহেবা। জওয়ান না-ছোড়বান্দা। বেগমসাহেবার সঙ্গে তার জান-পছান আছে। বেগমসাহেবাকে হাতিয়াগড় থেকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল এখানে।

মরালী নিজেকে সামলে নিলে। মুখে বললে—কে আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল আমি জানি না। কারো সঙ্গে আমার চেনা-জানা নেই। আমি কারো সঙ্গে দেখা করবো না এখন। তুমি তাকে বলে দিও। বলে দিও এখানে পুরুষ-মানুষের আসা-যাওয়ার নিয়ম নেই।

—জী, বেগমসাহেবা। আমি তাহলে তাকে তাই-ই বলে দেবো।

—হ্যাঁ, তাই বলে দিও—

নজর মহম্মদ তবু দাঁড়িয়ে রইলো। ফিরতে গিয়েও তার ফেরা হলো না। রপর সোজা ফিরে দাঁড়িয়ে বললে—বেগমসাহেবা, আপনি যদি তার সঙ্গে লোকাত করতে চান তো কেউ জানতে পারবে না। কোয়া-চিঁড়িয়া ভি টের পাবে আমি খুদ্ এখানে দাঁড়িয়ে পাহারা দেবো, কোনো গুণাহ্ হবে না—

মরালী কী বলবে বুঝতে পারলে না। নজর মহম্মদ কি তাকে পরীক্ষা করছে! শেষকালে যদি কোনো বিপদ হয়। গুলসনকে জিজ্ঞেস করলে ভালো হতো। সে পরামর্শ দিতে পারতো। মরালীর সমস্ত শরীরটা ভয়ে থর থর করে কাঁপতে গলো। এমন যে হবে তা তো ভাবতে পারেনি সে। সে যদি ধরা পড়ে! যদি তল্ হয়ে যায়! মরালীর জন্যে কান্তর যদি কোনো ক্ষতি হয়!

মনের কথাও যেন নজর মহম্মদ বুঝতে পারলে। বললে—কোনো ডর নেহি গমসাহেবা, বান্দা তো জিম্মাদার রইলো—

বলেই চলে যাচ্ছিল। যাবার সময় বললে—বান্দা এখুনি তাকে এত্তেলা ই—

—এখুনি? এত রাত্তিরে?

কিন্তু নজর মহম্মদ ততক্ষণে ঘরের বাইরে অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে। এখুনি তা কান্তকে ডেকে নিয়ে আসবে। এলে কী বলবে মরালী! কী বলে কথা ভ করবে।

লুকিয়ে লুকিয়ে আবার গুলসন এসে হাজির।

—কী বলছিল ভাই নজর তোমাকে? আরক খেতে বলছিল বুঝি? খবরদার, বরদার আরক খেও না যেন ভাই তুমি! ও একেবারে সর্বনেশে বিষ। একবার রেছো কি আর তোমার ছাড়ান-ছোড়ন নেই। কিছুতেই খেও না তুমি। যে খেয়েছে স-ই পস্তাচ্ছে। যদি জোর করে খাওয়াতে আসে তো নানীবেগমকে বলে দেবে, ঝলে? নানীবেগম ওসব পছন্দ করে না মোটে!

মরালী বললে—না, আরক নয়...

—আরক নয় তো কী? পান? পানও খেও না তুমি ওদের হাত থেকে। ানের খিলি নিজে সেজে খাবে, নইলে পানের খিলির ভেতরেও ওইসব বিষ রে দেয় পোষ মানাবার জন্যে!

—না, পানও নয়। আমি বুঝতে পারছি না ভালো করলুম কি মন্দ করলুম।

—কেন? কী, হয়েছে কী?

—নজর মহম্মদ বলছিল কে-একজন নাকি দেখা করতে চায় আমার সঙ্গে তাকে এখানে নিয়ে আসবে। আমি প্রথমে ভয় পেয়ে গিয়েছিলুম। বলেছিলুম-না, আনতে হবে না। কিন্তু আমার কথা শুনলে না, তাকে ডেকে আনতে গেল—

—সর্বনাশ করেছো। লোকটা কে? কী জন্যে দেখা করবে?

—তা জানি না।

—তাহলে এখ্খুনি গিয়ে মানা করে এসো ভাই। তোমাকে বিপদে ফেলবে ওরা ওই রকম করে প্রথম প্রথম পরখ করে নেয়। ওরা দেখে কী রকম চরিত্তিরে মেয়ে তুমি। তুমি যদি একবার বলে দাও হ্যাঁ, তখন পেয়ে বসবে, তখন তোমাকে যা-তা করবে। তুমি এখ্খুনি গিয়ে মানা করে এসো—

মরালী বললে—কিন্তু ও যে চলে গেল—

—তুমি দৌড়ে যাও না! এখনো সময় আছে। যাও—যাও—ও-সব ওদের ছল ওই করে ওরা পোষ মানায়, একবার ওদের হাতের কব্জার মধ্যে পড়ে গেলে তখ তুমি একেবারে মরবে—যাও—

মরালী কী করবে বুঝতে পারলে না। তারপর বেরোল ঘর থেকে। যে-দিকে নজর মহম্মদ গেছে সেই দিক লক্ষ্য করেই বেরোল। তারপর অন্ধকার পেরিয়ে একবার চিৎকার করে ডাকতে চেষ্টা করলে—নজর মহম্মদ—নজর মহম্মদ—

কিন্তু মরালীর গলা দিয়ে এতটুকু শব্দ বেরোল না। তার মনে হলো কে যে তার গলা টিপে ধরেছে। সেই অন্ধকার চেহেল্-সুতুনের ভুল-ভুলাইয়ার মধ্যে দাঁড়িয়ে সে যেন দিশেহারা হয়ে গেল।

কলকাতার অন্ধকার কেল্লার ভেতরে দাঁড়িয়েও, নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলাও যে দিশেহারা হয়ে গেছেন। পেছনে রাজা মানিকচাঁদ, মীরজাফর, তারাও দাঁড়িয়ে হাতে হাত-কড়া বাঁধা হল্ওয়েল সঙ্গে। হল্ওয়েল সাহেব পালাতে পারেনি শেষ পর্যন্ত! ফিরিঙ্গী মেমসাহেবরা ভয়ে গিয়ে লুকিয়ে ছিল একটা গুদাম ঘরের মধ্যে। ওদিকে লুঠ-পাট চলেছে, কেউ পেয়েছে ঘড়ি, কেউ বোতাম। কেউ বগলস্। কিছুই বাদ দেয়নি সেপাইরা। চাপা কান্নার শব্দে সমস্ত কেল্লাটা যেন গুম-গুম করছে। এতদিন যে আক্রোশ বাংলার ইতিহাসের দরজায় মাথা কুটছিল দিন-রাত, তা যেন আজ চৌচির হয়ে ফেটে পড়ে আকাশে-বাতাসে ছড়িয়ে গেল ফিরিঙ্গীদের সাধের কলকাতা তখন পুড়ছে। বির্জিতলা, দর্জিপাড়া, গোবিন্দপুর বাদামতলা থেকে শুরু করে ক্যাপ্টেন পেরিন সাহেবের বাগানের পাশের বারুদ খানাটাও বাদ যায়নি। সেই আগুনের মধ্যে ষষ্ঠীপদ এধার থেকে ওধারে দৌড়চ্ছে উমিচাঁদ সাহেবের বাড়িতেই বেশি টাকা থাকা সম্ভব। সেদিকটাতেই দৌড়ে গেল ষষ্ঠীপদ।

কিন্তু বাড়ির সামনে গিয়ে হতবাক্। উমিচাঁদ সাহেবের দরোয়ান জগমন্ত সিং সেখানে সবকিছু জড়ো করেছে। উমিচাঁদের বাড়ির জিনিসপত্রগুলো এনে এনে ফেলছে সেখানে।

—এ কি, দরোয়ান সাহেব, তুমি? তুমি একলা এ সব কী করছো? কেয়া রতা হ্যায়?

জগমন্ত সিং এ সব দুদিন আগে নিজেই পুড়িয়ে দিয়েছিল। শুধু এই-ই পাড়ায়নি। মালিকের বাড়ির জেনানাদেরও পুড়িয়েছে। আজ আর আগুনে ুড়ে মরবার কেউ নেই। ফিরিঙ্গীসাহেবেরা এতদিন কেল্লার মধ্যে জগমন্ত সিংকে াটক করে রেখেছিল। কৃষ্ণবল্লভ, উমিচাঁদ, জগমন্ত সিং সবাই নজর-বন্দী হয়ে ছল কেল্লায়। কিন্তু যখন সবাই পালিয়ে যাবার তোড়জোড় করছিল, জগমন্ত সংও মালিককে এসে বলেছিল—হুজুর, আপ্ ভি পালিয়ে চলুন—এই-ই ুযোগ—ফিরিঙ্গিলোগ ভাগ্ যা রাহা হ্যায়—

সে রাত্রে সত্যিই কেউ কিছু ঠিক করতে পারেনি কী হবে শেষ পর্যন্ত, সে বস্থায় কী করা উচিত। রাজা রাজবল্লভের ছেলে কৃষ্ণবল্লভ মুখ ভার করে সেছিল। নবাবের হাতে তার নিস্তার নেই তা সে জানতোই। কিন্তু পাঞ্জাবী ানুষ উমিচাঁদ অত সহজে ভেঙে পড়বার লোক নয়। অনেক ঝড়-ঝাপটা তার াথার ওপর দিয়ে গেছে। উমিচাঁদ সাহেব সুদূর পাঞ্জাব থেকে বাঙলা দেশের রম মাটিতে এসে রসের সন্ধান পেয়ে এইটুকু বুঝে নিয়েছে যে, এদেশে নরম য়ে থাকলে সুনাম হয়তো হয়, কিন্তু বড়লোক হওয়া যায় না। বুঝে নিয়েছে খ টাকার মালিক হতে গেলে সম্মান-অপমান-জ্ঞান থাকলে চলে না। আর যারা াকা কামাই করতে চায় তাদের পক্ষে এই-ই উপযুক্ত সময়। এই যখন দেশের াজা বদলায়। দেশের রাজা বদলাবার সময়েই যা কিছু উন্নতি করতে হয় করে াও। এর পর যখন শান্তির সময় আসবে তখন আর ভাগ্য-উন্নতি করবার সুযোগ াওয়া যাবে না।

উমিচাঁদ সাহেব এক ধমক দিয়ে উঠেছিল—যা, তু ভাগ যা ইহাঁসে—

এর পর জগমন্ত সিং আর সময় নষ্ট করেনি। কেল্লায় তখন আর পল্টনদের াহারাও নেই। সোজা পাঁচিল টপ্‌কে একেবারে মালিকের বাড়ির সামনে এসে াজির। আগেই সব কিছু পুড়ে গিয়েছিল। কিন্তু তখনো অনেক কিছু বাকি ছল পুড়তে। জগমন্ত সিং জানতো কোথায় থাকে সাহেবের সিন্দুক, কোথায় কান ঘরের কোন মেঝের তলায় সোনা-রুপো পোঁতা আছে। জগমন্ত সিং সেখানে ুকতে যাচ্ছিল। হঠাৎ বেভারিজ সাহেবের মুন্সীকে দেখে অবাক হয়ে গেল। ুন্সীজী, তুমি?

ষষ্ঠীপদ বললে—আমার নোকরি গেছে দরোয়ানজী, আমি এখন কী করবো?

বলতে বলতে ষষ্ঠীপদ সেই আগুনের মধ্যে দাঁড়িয়েই হাউ হাউ করে কেঁদে ফেললে।

—কাঁদছিস কেন বেল্লিক?

ষষ্ঠীপদ কাঁদতে কাঁদতেই বললে—চাকরি গেলে আমি খাবো কী দরোয়ানজী?

জগমন্ত সিং ষষ্ঠীপদর দিকে চেয়ে ভেঙচি কেটে উঠলো। তুই এখন খাবার থা ভাবছিস উল্লু-কা-পাট্টা? দুনিয়া বরবাদ হয়ে যাচ্ছে, জমানা ভি বদল হয়ে াচ্ছে, এখন কেউ তোর মতন খাওয়া নিয়ে ভাবছে? মরতে পারবি?

ষষ্ঠীপদ চমকে উঠলো। একবার জগমন্ত সিংএর মুখের দিকে চেয়ে দেখলে। াগুনের হল্‌কা লেগে মুখখানা তার যেন বীভৎস হয়ে উঠেছে তখন।

—হ্যাঁ, মরতে পারবো দরোয়ানজী! খুব মরতে পারবো। আর মরেই তো আছি ামি—

—তব্ ইধর্ আ—

বলে সেই বাড়ির মধ্যে ঢুকলো। উমিচাঁদ সাহেবের এত সাধের সাজানো বাড়ি। হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষের সর্বনাশ করা টাকায় জমানো সোনা-রুপো-হীরে ভরা বাড়ির মালখানার ভেতরে ঢুকলো দুজনে। তারপর জগমন্ত সিং মালখানার দরজাটা নিজের ট্যাঁকের চাবি দিয়ে খুলে ফেললে। কী রকম একটা ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ হলো। জগমন্ত এক হ্যাঁচ্কা টানে সিন্দুকের ডালাটাও খুলে ফেললে। খুলে ফেলতেই ষষ্ঠীপদর চোখ দুটোয় ধাঁধা লেগে গেল। এত সোনা, এত রুপো, এত মোহর, এত টাকা! মা মা, পতিতোদ্ধারিণী, তুমি কি আমার মনের কথা শুনেছো তাহলে মা?

—আগ্ জবালাও, আগ্ জবালাও—

বলে কী জগমন্ত সিংটা! ষষ্ঠীপদ হাঁ করে চেয়ে রইলো দরোয়ানজীর দিকে। জগমন্ত সিং সত্যি সত্যিই আগুন জবালিয়ে দিলে সিন্দুকের চারিদিকে। আগুনটা দাউ-দাউ করে জবলে উঠলো।

জগমন্ত সিং বলে—এই আগুনের ভেতর লাফিয়ে পড়—আগে তুই ঝাঁপ দে, তারপর হাম—

ষষ্ঠীপদ কী করবে বুঝতে পারলে না। এমন হবে তা তো ভাবেনি সে। সোনা-রুপো-মোহর-টাকার সঙ্গে একাকার হয়ে যাবার কথা তো সে কল্পনা করেনি। তুমি বাপু প্রভুভক্ত চাকর হতে পারো কিন্তু আমি তো পারবো না এ-কাজ। আমার তো এই সব টাকা চাই। আমি যে বড়লোক হবো গো! তোমার মালিক উমিচাঁদ সাহেবের চেয়েও বড়লোক!

—নে, লাফিয়ে পড় ভেতরে—

ষষ্ঠীপদ আর দেরি করলে না। দুহাতে জগমন্ত সিংকে ধাক্কা দিয়ে সিন্দুকের ভেতর ফেলে দিয়েই ভারি ডালাটা বন্ধ করে দিয়েছে এক মুহূর্তে। থাক্, পুড়ে মরুক ওর ভেতরে। তারপর আগুনটা নিভে গেলেই আবার বার করে নিলে চলবে। তখন সমস্ত সোনা-রুপো-মোহর-টাকার মালিক সে। সেই ষষ্ঠীপদ। ষষ্ঠীপদ আবার মাকে ডাকলে।...

নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলাও তখন কেল্লার মালখানার ভেতরে খোলা সিন্দুকটার সামনে দাঁড়িয়ে। রাজা মানিকচাঁদ, মীরজাফর, মেহেদী নেসার, কৃষ্ণবল্লভ, উমিচাঁদ, সফিউল্লা, ইয়ানজান সবাই পাশে দাঁড়িয়ে আছে।

—আর টাকা? আর টাকা নেই?

হল্ওয়েল সাহেব হাত-বাঁধা অবস্থায় তখন থর-থর করে কাঁপছিল। বললে—আর টাকা নেই জাঁহাপনা, এই-ই সব—

—স্রেফ পঞ্চাশ হাজার টাকা? এতদিনের কারবার তোমাদের, এত আমদানি রপ্তানি, স্রেফ পঞ্চাশ হাজার টাকা তোমাদের মালখানায়?

আর কোনো কথা নয়। রাজা মানিকচাঁদ সামনেই দাঁড়িয়েছিল। নবাব বললেন—হল্ওয়েলকে গ্রেফ্তার করে মুর্শিদাবাদ পাঠিয়ে দাও—আর কৃষ্ণবল্লভ, উমিচাঁদ ওরাও আমার সঙ্গে যাবে...

ষষ্ঠীপদর আর দেরি সহ্য হলো না। সিন্দুকের ডালাটা খুলে ফেললে একটা শাবল দিয়ে। ভেতরের আগুন তখন নিভে গেছে। কিন্তু কালো-কালো জমাট ধোঁয়া শুধু গুমিয়ে গুমিয়ে নিঃশব্দে কুণ্ডলী পাকিয়ে ওপরে ওঠবার চেষ্টা করছে। ষষ্ঠীপদ নাকে কাপড় দিয়ে নিচু হয়ে দেখলে একবার। জগমন্ত সিং তখন বেগম

পোড়া হয়ে পড়ে আছে ভেতরে। মা পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গে, তাহলে আমাকে সত্যি-সত্যিই রাজা করে দিলে মা—সত্যিই রাজা হলুম—

চেহেল্-সুতুনের ভুল-ভুলাইয়ার মধ্যে যদি কোনো রহস্য থাকে তো সে-রহস্য ইতিহাসের। ইতিহাসের অমোঘ নির্দেশেই সেখানে নারী-সুরা আর রোমাঞ্চের আমদানি হয়েছে। তার জন্যে যদি কাউকে দায়ী করতে হয় তো সে মোগল-বাদশা সুলতান আকবর নয়, সুলতান শাহজাহান নয়, সুলতান জাহাঙ্গীর নয়, সুলতান আওরঙজেবও নয়। এমন কী মুর্শিদকুলী খাঁ, সরফরাজ খাঁ, আলীবর্দী খাঁও নয়। নবাব মীর্জা মহম্মদ সিরাজ-উ-দ্দৌলাও নয়। চক-বাজারের সারাফত আলি যতই বলুক, হাতিয়াগড়ের ছোটমশাই যতই কষ্ট পাক, শোভারাম বিশ্বাস যতই পাগল হোক, ইতিহাসের রথ নির্মম নিষ্ঠুর গতিতে এগিয়ে চলবে। তার গতি কেউ থামাতে পারবে না।

১৭৩০ সালে যে ছেলেটির জন্ম হয়েছিল, সে দেখে এসেছে এমনি করেই বাঙলার নবাবিয়ানা চালাতে হয়, এমনি করেই মারাঠাদের সংগে লড়াই করতে হয়। আলীবর্দী খাঁর বড় পেয়ারের নাতি সে। সে জানে লড়াই কাকে বলে, সে জানে মেয়েমানুষকে কেন সৃষ্টি করেছে খোদাতালা, সে জানে নবাব হলে তার দুষমনি করবার লোকের অভাব হয় না। এই ফিরিঙ্গী, এই মীরজাফর, এই জগৎশেঠ, এই মেহেদী নেসার, এদের সকলকে নিয়েই তার চলতে হবে। ক্ষমতা যতদিন থাকবে ততদিন তার বন্ধুও থাকবে, দুষমনও থাকবে। এদের বাদ দিয়ে যে ক্ষমতা চায় সে উজবুক, সে আনাড়ী!

তাই চেহেল্-সুতুনের ভেতরের চেহারাটাও কোনোদিন বদলায়নি। বদলাতোও না। কিন্তু কেন যে বদলালো সেই কাহিনীই বলতে বসেছি।

অন্ধকারে তখনো মরালী আর একবার গলা ছেড়ে ডাকবার চেষ্টা করলে—নজর মহম্মদ, নজর মহম্মদ—

হয় সে স্বপ্ন দেখছে, নয় তো সে বোবা হয়ে গেছে। তখনো নহবতটা বাজছে। নবাব ফিরে আসছে। হয়তো কাল, কিংবা পরশু, কিংবা হয়তো তার পর দিন, তারপর? তার আগে যদি নজর মহম্মদ সত্যিই তাকে নিয়ে আসে।

সামনেই যেন কার পায়ের শব্দ হলো। অস্পষ্ট ঝাপসা আলোয় ভালো দেখা যায় না। তবু নজর মহম্মদ ভুল করেনি চিনতে। নজর মহম্মদরা সাধারণত ইচ্ছে করে কখনো ভুল করে না।

—বেগমসাহেবা!

মরালী যেন নিজের চোখ দুটোকেও বিশ্বাস করতে পারলে না। পেছনেই কান্ত।

মরালী অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলে—তুমি?

কান্তর তখন বোধ হয় বাক্‌রোধ হয়ে গেছে। তার মুখে তখন সব কথা যেন ফুরিয়ে গিয়েছে। খানিকটা ভয়ে, খানিকটা আনন্দে, খানিকটা রোমাঞ্চে, আর খানিকটা হয়তো বা বিস্ময়ে।
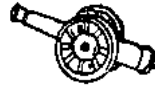
দুর্গা সহজে ছাড়বার পাত্রী নয়। এই যে হাতিয়াগড়ের রাজ-বাড়ি, এর বাইরে তো খাজাঞ্চিবাবু আছে, সরকারবাবু আছে, প্রজা-পাঠক, পাইক-বরকন্দাজ সবই আছে। অতিথিশালার রান্নাবাড়ি, চাকর-ঝি-ঠিকে-লোক, বুড়ো শিবের মন্দিরের পুরুত, যোগানদার, কিছুই বাদ নেই। কিন্তু রাজবাড়ির মধ্যে দুর্গার মাথার ওপরে কেউ নেই। সে-ই সর্বে-সর্বা। দুর্গার কথার ওপর কথা বলার ক্ষমতা কারোরই নেই।

পর দিন সকাল বেলাই সোজা বড় বউরানীর ঘরে গিয়ে হাজির।

—রানীমা!

—ভেতরে আয়—

—খাজাঞ্চিবাবু শোভারামের বদলা যাকে রেখেছে সে সুবিধের লোক নয়। জনার্দন না কী তার নাম, লোকটা সেদিন রাত্তিরে একেবারে ভেতর-বাড়ির মহলের মধ্যে ঢুকে পড়েছিল।

—তা মাধব ঢালীকে বললিনে কেন? কেটে ফেলে নদীতে ভাসিয়ে দিত!

দুর্গা বললে—আমি অত সাহস করিনি রানীমা, এমনিতে সময়টা খারাপ চলছে, তখন বাঁ-নাক দিয়ে নিঃশ্বেস পড়ছিল, আমি তাই সামলে গেলুম। হৈ-চৈ করলে আবার যদি ডিহিদার-মিন্সের কানে যায়! তাই ধমক দিয়ে সাবধান করে দিয়েছি, বলেছি, আর যদি মিন্সেকে এ-দিগরে দেখি তো ঠ্যাং খোঁড়া করে দেবো—

—তা মতলব কী তার? কেন ভেতর-বাড়িতে এসেছিল?

দুর্গা বললে—আমার তো রানীমা সন্দেহ হয় ও ঠিক ডিহিদার-মিন্সের লোক, খবর নিতে পাঠিয়েছে ছোট বউরানীকে ঠিক মুর্শিদাবাদে পাঠিয়েছি কিনা!

—তা শোভারামের মেয়েটা তো ভালোয়-ভালোয় সেখানে পৌঁছে গেছে! তার পরেও আবার এ মিন্সের এত সন্দেহ-বাই কেন?

দুর্গা বললে—কে জানে রানীমা, কার কী মতলব। আমি তো দিনরাত আগ্‌লে-আগ্‌লে রাখছি, কিংবা হয়তো সে-মুখপুড়ী চাপে পড়ে সব বলে দিয়েছে। সে সব হাল-চাল তো সেখানকার আলাদা। যে-তেজী মেয়ে, ভেবেছে এখন তো যা-হবার হয়ে গেছে, এখন আর বললে ক্ষেতিটা কী!

বড় বউরানী বললেন—তাহলে চোখে-চোখে রাখ লোকটাকে, দ্যাখ্ দু' চার দিন কী করে, তারপর আমাকে বলিস, আমি মাধব ঢালীকে বলে দেবো'খন—

দুর্গা বললে—তার দরকার নেই, তার চেয়ে বরং তুমি জগা খাজাঞ্চিবাবুকে ডেকে ওকে ছাড়িয়ে দিতে বলো—

হঠাৎ গোকুল এসে সামনে দাঁড়ালো।

বড় বউরানী গোকুলকে দেখেই বললেন—ছোটমশাই বুঝি ডাকছেন আমাকে? চল, যাচ্ছি—

তারপর যাবার সময় দুর্গার দিকে চেয়ে বললেন—তুই যা ভালো বুঝিস কর, চারদিক বুঝে-সুঝে করবি বাছা, আর কী বলবো—

জনার্দন ততক্ষণ দৌড়তে দৌড়তে একেবারে রেজা আলির বাড়ির সামনে গিয়ে হাজির হয়েছে। রেজা আলির সঙ্গে জনার্দনের রোজকার দেখাশোনা চলে।

রোজই এসে খবর দিয়ে যায় আড়ালে। শুধু হাতিয়াগড়ের রাজবাড়িরই খবর নয়, এ ডিহির সব খবরই রাখতে হয় রেজা আলিকে। কে কোথায় কখন যাচ্ছে, কার কী রকম অবস্থা ফিরছে, কে দালান-কোঠা বানাচ্ছে, কার রিস্তাদার বাড়িতে এল কী উদ্দেশ্য নিয়ে, এ সব খবর না রাখলে ডিহিদারের কাজ চালানো যায় না। নিজামত সরকারকে ওয়াকিবহাল করতে হয় দেশের অবস্থা কেমন। কোথায় কোন্ লোক ষড়যন্ত্র করছে সরকারের বিরুদ্ধে তারও হদিস রাখতে হয় তাকে।

—কী দেখলি জনার্দন?

জনার্দন বললে—হুজুর, কেল্লা ফতে হয়ে গেছে—

—তার মানে?

—মানে ওরাই লুকিয়ে রেখেছে রাণীবিবিকে, হাতে-নাতে ধরা পড়ে গিয়েছে কাল রাত্তিরে। একতলার একটা কুঠুরীতে তাকে লুকিয়ে রেখেছে ওই কুট্‌নী মাগীটা। ও বেটিকে আমি জব্দ করবো তবে ছাড়বো হুজুর! ও হারামজাদী আমার পেছনে লেগেছে কাল থেকে।

—সঙ্গে কাউকে নিবি?

জনার্দন বললে—না হুজুর, মেয়েমানুষের সঙ্গে লড়তে হলে একলাই যথেষ্ট, দু'জন হলে লজ্জার কথা। আপনার শুধু একটু মদৎ চাই হুজুর।

—কী মদৎ?

—সে তো আপনাকে আমি বাত্‌লেছি আজ্ঞে, শুধু নজর রাখবেন গরীবের ওপর। বড় গরীব আমি হুজুর, তিনটে মেয়ের বিয়ে দিয়ে ছিলুম, তিনটেই রাঁড় হয়েছে, এক ফোঁটা জমি-জিরেত নেই যে চাষ-বাস করে খাই। দশ সন আগে হলে এমন করে বলতুম না আজ্ঞে, কিন্তু কী যে বিষ-নজরে পড়ে গেলাম পাট্টাদারের, সব কেড়ে নিলে!

—কেন, পাট্টাদারের বিষ-নজরে পড়লি কেন?

জনার্দন বললে—হুজুরের দেখছি কিছুছু মনে থাকে না, হুজুরকে তো সব খুলে বলেছিলুম। সোমত্ত মেয়েদের তো তা বলে ঘরে আটকে রাখতে পারিনে, পুকুর-ঘাটে যায়, বাগানে ছোলা-মটর ক্ষেতে যায়, কোন্ ফাঁকে দেখে ফেলেছে। তা আমি বাপ হয়ে কি তাতে রাজি হতে পারি হুজুর? তাই গাঁ ছেড়ে পালিয়ে এলুম একদিন। তারপর আমার শ্বশুরবাড়িতে তাদের রেখে এখেনে এলুম কাজের চেষ্টায়, তখন হুজুর দয়া করে এই কাজটা দিলেন—

রেজা আলি গড়গড়া টানতে টানতে বললে—তা কী মদৎ চাস্ তুই বল্ না!

—হুজুর, খুনোখুনি যদি বাধে তো তখন যেন আমার চাকরিটা না চলে যায়—

—খুনোখুনি বাধবে কেন?

—হুজুর, মাধব ঢালীকে দিয়ে দুগ্যা আমাকে কোতল্ করবে বলে শাসিয়েছে যে!

রেজা আলি বললে—ঠিক আছে, যা ভালো বুঝিস তাই কর, চারদিক বুঝে-সুঝে করবি, তারপর যদি ফৌজদার হই তো তোর আর ভাবনা নেই, তুই যা এখন—

জনার্দন আর দাঁড়ালো না সেখানে। কুর্নিশ করে ঘুর-পথে আবার গিয়ে রাজ-বাড়ির দেউড়ি দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়লো। বিশু নাপিত ছোটমশাইকে খেউরি করবার জন্যে তখনো বসে ছিল। জনার্দনকে দেখেই জিজ্ঞেস করলে—কী রে জনার্দন, এত দেরি হলো যে তোর?

জনার্দনের মুখটা শুকিয়ে গেল।—কেন? ছোটমশাই খুঁজছিলেন নাকি, আমাকে?

ছোটমশাই খুঁজুন আর না-খুঁজুন, কিংবা দরকার থাক আর না-থাক, যার যার কাজ সকলের সমস্ত করে যাওয়াই এ বাড়ির নিয়ম। জনার্দন বললে—অনেকদিন মেয়ে তিনটের খবর পাইনি কি না তাই একবার খবর নিতে গিয়েছিলুম বামুন-পাড়ার দিকে। জগদীশ বাঁড়ুজ্যের বেয়াই থাকে কি না জনাইতে—। তা ছোটমশাই আজ নিচেয় নামবেন নাকি?

হঠাৎ অতিথিশালার দিক থেকে কার গান ভেসে এল।

বিশু পরামানিক বললে—ওই এসেছে রে—

—কে গো? কে এসেছে?

তখন গানটা বেশ স্পষ্ট ভেসে আসছে—

আর ভুলালে ভুলবো না গো।
আমি, অভয়পদ সার করেছি
ভয়ে হেলবো দুলবো না গো॥
আশাবায়ুগ্রস্ত হয়ে
মনের কথা খুলবো না গো।
মায়া-পাশে বদ্ধ হয়ে
প্রেমের গাছে ঝুলবো না গো॥
এখন আমি দুধ খেয়েছি
ঘোলে মিশে ঘুলবো না গো॥...

জনার্দন আবার জিজ্ঞেস করলে—ও কে গো? কে গান গাইছে?

—ওই তো পাগলা উদ্ধব দাস!

—উদ্ধব দাস কে?

—উদ্ধব দাসের নাম শোনিসনি? শোভারামের মেয়েকে যে বিয়ে করেছিল রে? অনেক দিন পরে আবার আমাদের অতিথশালায় এয়েচে—আবার জ্বালাবে—

জনার্দন আর দাঁড়ালো না। বললে—দাঁড়াও, অতিথশালায় গিয়ে গানটা শুনে আসি।

বলে উঠে ভেতরের দিকে গেল।

বড় বউরানী ঘরে গিয়ে দেখলেন ছোটমশাই বিছানায় তেমনি করে শুয়ে আছেন। পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। জিজ্ঞেস করলেন—ডাকছিলে নাকি আমাকে?

ছোটমশাই আরো দুর্বল হয়ে গেছেন তখন। জিজ্ঞেস করলেন—তোমার পুজো করা শেষ হয়েছে?

—কেন? তোমার কিছু দরকার?

ছোটমশাই বললেন—না, তা নয়, বেশিক্ষণ একলা থাকতে ভালো লাগে না—তাই—

বড় বউরানী আরো কাছে ঘেঁষে দাঁড়ালেন। বললেন—তোমার ভালোর জন্যেই তো পুজো করি! পুজো কি আমি আমার নিজের জন্যে করি ভেবেছো?

ছোটমশাই কিছু কথা বললেন না। তারপর একটু পরে বললেন—এত পুজো করে কী এমন ভালো হলো আমার?

বড় বউরানী বললেন—নিশ্চয় ভালো হবে, দেখো! তুমি অত ভাবো কেন?

ছোটমশাই বললেন—তা ভাববো না! তুমি বলছো কী? সারা দিন-রাতই তো ভাবি! সমস্ত পুরোন কথাগুলো যে মনে পড়ে যায়!

—একটু চেষ্টা করো, নিশ্চয়ই ভুলতে পারবে!

ছোটমশাই চোখ বুজলেন। এমনি কদিন ধরেই চলছে। সেই কৃষ্ণনগর থেকে আসার পর সেই যে বিছানা নিয়েছেন আর ওঠেননি। হাতিয়াগড়ের সমস্ত প্রজারা কেবল রোজ খবর নিচ্ছে ছোটমশাই কেমন আছে! ছোটমশাই যদি এতদিন ধরে বিছানায় পড়ে থাকে তো জমিদারি চলে কেমন করে। প্রজা-পাঠকদেরই কষ্ট। কত আর্জি, কত আবেদন-নিবেদন পেশ করতে হয় ছোটমশাইএর কাছে। জগা খাজাঞ্চিবাবুর কাছে গেলে তো খেঁকিয়ে ওঠে। বলে—যা যা, খাজনা দিবি নে তার আবার মায়া-দয়া কী রে? সবাই আশা করে আছে কবে ছোটমশাই আবার উঠে হেঁটে কানুনগো-কাছারিতে এসে বসবে। কবে তার পা দুটো ধরে খাজনা মকুব করিয়ে নেবে!

বড় বউরানী রোজই আশা দেন—ভেবো না কিছু, তুমি নিশ্চয়ই ভালো হয়ে যাবে—

ছোটমশাই বলেন—কিন্তু তুমিই তো ভালো হতে দিলে না আমাকে! কেন তুমি আমার এ সর্বনাশ করলে বলো তো? আমি তোমার কী করেছিলুম?

এ সব কথায় বড় বউরানী চুপ করে থাকেন। তারপর অনেকবার একই কথা বলে বলে যখন কোনো সুরাহা হয় না তখন ছোটমশাই চুপ করে যান। শুধু চোখের কোণ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে টপ্‌ টপ্‌ করে। বড় বউরানী নিজের আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দেন চোখ দুটো!

বলেন—দেখ, আমার ওপর রাগ করো না তুমি! আমি যা করেছি তোমার ভালোর জন্যেই করেছি, এ বংশের ভালোর জন্যেই করেছি। এ বংশের বউ হয়ে মুসলমানের হারেমে গিয়ে থাকলে তাতে তোমার আমার ছোট'র কারোরই সম্মান বাড়তো না। তার চেয়ে মরে যাওয়া অনেক ভালো হয়েছে—

ছোটমশাইএর গলাটায় যেন ব্যথা করে আসে। বলেন—তা তুমি মেরে ফেলবে তাই বলে? আর কোনো উপায় ছিল না?

—তা তোমার চেয়ে আমি কি তাকে কম ভালবাসতুম মনে করো? আমার বুঝি মেরে ফেলতে কষ্ট হয়নি? আমি বুঝি তাকে নিজে পছন্দ করে এ বাড়ির বউ করে নিয়ে আসিনি? আমি বুঝি তোমাদের দু'জনের সুখ দেখে সুখ পাইনি? আমি বুঝি চাইনি যে এ বংশের একটা ছেলে হোক। বড়মশাইএর বংশে বাতি দিতে কেউ থাকুক?

অনেকক্ষণ ছোটমশাইএর উত্তর দেবার আর কিছু থাকে না।

বলেন—মরবার সময় সে কিছু বলেনি? কিছু বলে যায়নি তোমাকে?

বড় বউরানী বলেন—তুমি আগে আমার কথার উত্তর দাও যে সম্মান বড় না প্রাণটা বড়?

ছোটমশাই বলেন—তুমি যদি জানতে পারতে আমার বুকের মধ্যে কী তোলপাড়টা চলেছে—

—তা সম্মান কি তার চেয়েও বড় নয়? আর এ তো শুধু তোমার একলার সম্মান নয়, সমস্ত হাতিয়াগড়ের সম্মানের প্রশ্ন যেখানে, সেখানে তুমি নিজের কষ্টটার কথাই ভাবলে?

—কিন্তু ডিহিদারকে তুমি এখন কী বলে জবাবদিহি করবে? মেহেদী নেসার

সাহেবকে কী বলে ঠেকাবে? তারা যদি আবার পরওয়ানা পাঠায়, তখন?

—সে ব্যবস্থা আমি করেছি।

ছোটমশাই উত্তেজিত হয়ে ওঠেন বিছানায় শুয়ে শুয়েই।

বলেন—সে কী? কী ব্যবস্থা করলে?

—সে সব তোমায় ভাবতে হবে না। যে ব্যবস্থা করলে সব কুল রক্ষে হয়, সেই ব্যবস্থাই করেছি—।

—বলো না, কী ব্যবস্থা করলে? আমার যে জানতে বড় ইচ্ছে হচ্ছে। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র আমাকে বার বার বারণ করে দিয়েছিলেন—এমন সর্বনাশ আপনি করবেন না। জগৎশেঠজী, মীরজাফর সাহেব সবাই আমাকে বারণ করেছিল। আমি কিছুতেই কিছু উপায় খুঁজে পাচ্ছিলুম না।

বড় বউরানী বলেন—আমিও কি ভাবিনি মনে করেছো! ভেবে ভেবে আমার রাতে ঘুম হতো না জানো। সেই যেদিন থেকে ডিহিদারের লোক এল পরোয়ানা নিয়ে, আমি একদিনও রাত্তিরে ঘুমোইনি। কেবল ভেবেছি এর কী প্রতিকার! কেবল মন্দিরে গিয়ে ঠাকুরকে ডেকেছি, বলেছি, আমাকে একটা উপায় বলে দাও ঠাকুর! আমার স্বামী, আমার শ্বশুরের বংশ, আমার হাতিয়াগড়ের প্রজাদের সম্মান কেমন করে রক্ষে করবো বলে দাও—!

তারপর একটু থেমে বলেন—তুমি ভাবতে আমি বুঝি কেবল ঠাকুর-পুজো নিয়ে মেতে আছি। কিন্তু আমার যে কী যন্ত্রণা হতো তা যদি তুমি বুঝতে! ছোট'র সামনে গিয়ে মুখোমুখি চাইতে পারতুম না। বুক ফেটে কান্না বেরিয়ে আসতে চাইতো—তবু সংসারের রোজকার কাজ হাসিমুখে করে যেতাম! তখন তুমিও জানতে না আমার বুকের মধ্যে কী আগুন জ্বলছে! তোমাকে তো তখন ডিহিদারের সে চিঠি আমি দেখাইনি। আমি জানতুম তুমি সে চিঠি পড়ে ভেঙে পড়বে—

এর পরে আর ছোটমশাইএর কিছু কথা বলবারও থাকে না। সত্যিই তো বড় বউরানী যা করেছে, তা ছাড়া আর কী উপায়ই বা ছিল। সেই কত পুরুষ আগে থেকে এমনি একটার পর একটা ঝড়-ঝাপ্টা চলে আসছে। বড়মশাইএর কাছে ছোটবেলায় সব শুনেছেন ছোটমশাই। বখ্তিয়ার খিলজীর আমল থেকেই মোগল-পাঠানএর লড়াই শুরু হলো। এই হাতিয়াগড়ই কি সামান্য ছিল তখন? এই হাতিয়াগড়েরই নিজের সৈন্য ছিল সামন্ত ছিল। টোডরমল যখন এলেন আকবর বাদশার সনদ নিয়ে, তিনি পর্যন্ত হাতিয়াগড়কে দলে টানতে পারেননি। তারপরে এল ওমরাহ আজিম খাঁ—আর ওদিক থেকে পাঠান-সর্দার কতলু খাঁ দল-বল নিয়ে হাজির হয়ে তছ্নছ্ করে দিলে সমস্ত বাংলা দেশ। তখনো হাতিয়াগড় মাথা খাড়া করে দাঁড়িয়েছিল। তারপর এলেন মানসিংহ। তিনিই পাঠানদের প্রথম মূলোচ্ছেদ করে দিলেন চিরকালের মত। তারপর এল পর্তুগীজরা। তারা এখানকার নীচজাতের মেয়েদের সঙ্গে থেকে নিজেদের বংশবৃদ্ধি করতে লাগলো হুড়হুড় করে। পর্তুগীজে ছেয়ে গেল দেশ। তাদের অত্যাচারে আর কেউ টিকতে পারে না। বিশেষ করে সমুদ্রের কাছাকাছি গ্রামগুলোতে। যাকে পারে ধরে নিয়ে যায়, ধরে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে দেয় বাইরের সব দেশে। তারপর বাদশা হলেন শাহান শা শাহ্জাহান। সব দেশটা মোগলের হাতে চলে গেল। চট্টগ্রামের নাম হলো ইসলামাবাদ। কিন্তু বাদশার শেষ বয়েসে আবার আরম্ভ হলো লড়াই-মারামারি। সুজা, মীরজুম্লা, সবাই এক-একজন ডাকাত। কেবল বাংলা দেশে এসেছে আর

চাকরি করেছে, লুঠপাট করেছে। তারপর এলেন বাদশা আওরংজেব। হাতিয়াগড়ের অবস্থা সেই সময় থেকেই খারাপ হতে শুরু হয়েছে। সেই আওরংজেবের শিষ্য শায়েস্তা খাঁ এসেও শান্তি দেয়নি কাউকে। হাতিয়াগড়ের গৌরব গেছে, প্রতিষ্ঠা গেছে, মান-সম্ভ্রম সব গেছে। এখন নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলার আমলে এসে হিরণ্যনারায়ণ রায়কে আজ চরম অপমানের ডালা মাথা পেতে নিতে হলো! আজ বড়মশাই থাকলে কী করতেন কে জানে। দিনকাল বদলে গেছে। হয়তো বড়মশাইকেও এই অপমান মাথা পেতেই নিতে হতো। এ অপমানের জ্বালা যেন হাজার চেষ্টা করলেও দূর হবে না। তাই শুধু শুয়ে থাকেন আর ভাবেন। ভেবে ভেবেই কূল-কিনারা হারিয়ে ফেলেন।

হঠাৎ বাইরে গোকুল এসে দাঁড়ালো।

বড় বউরানী এসে জিজ্ঞেস করলেন—কী রে?

—কেষ্টনগর থেকে মহারাজার লোক এসেছে চিঠি নিয়ে, ছোটমশাইএর সঙ্গে দেখা করতে চায়, আমার হাতে চিঠি দেবে না—

—আচ্ছা, ডেকে নিয়ে আয় ভেতরে।

বলে বড় বউরানী বাইরে চলে গেলেন।

বুড়ো মতন মানুষটা। এসেই মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে উবু হয়ে প্রণাম করলে অনেকক্ষণ ধরে। তারপর নিচু গলায় বললে—আমি মহারাজার চিঠি নিয়ে এসেছি হুজুরের নামে। এ চিঠি আপনার হাতে ছাড়া আর কারো হাতে দেবার হুকুম নেই হুজুর—

ছোটমশাই চিঠিটা নিলেন। বললেন—এর উত্তর চাই?

—আজ্ঞে, সে হুকুম নেই আমার ওপর।

—আপনি তাহলে অতিথিশালায় গিয়ে বিশ্রাম করুন। তারপর আমার খাজাঞ্চি-বাবুকে বলবেন, সে আপনার তদারক করবে। যদি এর উত্তর দেবার দরকার থাকে আমি ডেকে পাঠাবো—

লোকটা আবার মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে চলে গেল। গোকুল তাকে সোজা অতিথিশালায় নিয়ে গেল।

ওদিকে অতিথিশালায় বহুদিন পরে আবার উদ্ধব দাস এসেছে। সাড়া পড়ে গেছে। আবার বেশ দু'হাতে তাল দিয়ে দিয়ে গান ধরেছে—

আর ভুলালে ভুলবো না গো!
আমি অভয়পদ সার করেছি
  ভয়ে হেলবো দুলবো না গো।
আশাবায়ুগ্রস্ত হয়ে
  মনের কথা খুলবো না গো।
সুখ দুঃখ সমান ভেবে
  মনের আগুন তুলবো না গো।
মায়া-পাশে বদ্ধ হয়ে
  প্রেমের গাছে ঝুলবো না গো।
এবার আমি দুধ খেয়েছি,
  ঘোলে মিশে ঘুলবো না গো।

—বাহোবা, বাহোবা! বেড়ে গান গাও তো ভাই তুমি? তুমি কে বট?

উদ্ধব দাস গান থামিয়ে হাত জোড় করে বললে—অধীন উদ্ধব দাস প্রভু,

অধীন ভক্ত হরিদাস—তা আপনি কে?

—আমি জনার্দন, শোভারামকে চেনো তো? তুমি যার মেয়েকে বিয়ে করেছিলে, তার বদ্‌লো চাকরি করি এখেনে। শোভারাম তো পাগল হয়ে গেছে, শুনেছো?

উদ্ধব হাসলো। বললে—আমিও তো পাগল প্রভু, খলু সংসারে কে পাগল নয়? আমি পাগল, শোভারাম বিশ্বাস পাগল, সচ্চরিত্র পুরকায়স্থ পাগল, কান্তবাবু পাগল, নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলা পাগল, জগৎশেঠ, উমিচাঁদ, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র পাগল—। কেউ বিষয়-পাগল, কেউ মেয়েমানুষ-পাগল, কেউ ভগবান-পাগল। কেউ আবার নামের পাগল, পাগলে পাগলে খলু-সংসার যে ছেয়ে গেছে প্রভু! বদনাম শুধু আমার আর শোভারামের।

বলে উদ্ধব দাস যেন একটা মস্ত রসিকতা করেছে এমনি করে হেসে উঠলো।

জনার্দন কিন্তু হাসলো না। এতদিনে বোধ হয় কার্যসিদ্ধি হবে বলে মনে হলো। খুব ভাব জমিয়ে উদ্ধব দাসের আরো কাছে সরে বসলো। আশেপাশে চারদিকে চেয়ে দেখলে কাছাকাছি কেউ কোথাও নেই। অতিথিশালায় আর যারা আছে তারা সবাই পুকুরে চান করতে গেছে, কেউ কেউ পুঁটলি মাথায় দিয়ে এক কোণে চিৎপাত হয়ে শুয়ে।

উদ্ধব দাসের দিকে মুখ নিচু করে বললে—একটা কথা তোমায় জিজ্ঞেস করবো দাস মশাই—

উদ্ধব দাস বললে—একটা কথা কেন প্রভু, হাজারটা করুন না, অধীনের কাছে কিছু লুকো-ছাপা নেই। আমার বউ পালিয়ে গেছে কিনা এই কথাটাই তো আমাকে জিজ্ঞেস করবেন প্রভু? প্রভুরা সবাই আমাকে ওই নিয়ে ঠাট্টা করেন। আমি বলি—বউ পালিয়েছে, বেশ করেছে! আমার বউ পালাবে না তো কার বউ পালাবে? নবাবের বউ পালাবে?

জনার্দন আবার চারদিকে চেয়ে নিলে, বললে—অত জোরে কথা বোল না দাসমশাই, সবাই শুনে ফেলবে—

—তা শুনে ফেললেই বা প্রভু, আমার তো কিছু গোপন নাই!

জনার্দন বললে—না দাসমশাই, তোমাকে একটা গোপন খবর দিই। তোমার বউকে ছোটমশাই মুর্শিদাবাদে নবাবের হারেমে পাঠিয়ে দিয়েছে, সেখানে মরিয়ম বেগম হয়ে গেছে তোমার বউ; সে খবর রাখো?

অতিথিশালার ভেতর দিকের দরজার আড়ালে আড়ি পেতে দাঁড়িয়ে সব শুনছিল দুর্গা। আর একটু হলেই হারামজাদা বলে ঝাঁপিয়ে পড়ছিল দুর্গা জনার্দনের ওপর। কিন্তু নিজেকে অনেক কষ্টে সামলে নিলে। আর সঙ্গে সঙ্গে বুড়ো মতন মানুষটাকে নিয়ে সেখানে ঢুকলো গোকুল।

গোকুলও অবাক হয়ে গেছে উদ্ধব দাসকে দেখে। জিজ্ঞেস করলে—কী গো, অনেক দিন পরে যে? তোমার শ্বশুর মেয়ের শোকে পাগল হয়ে গেছে, শুনেছো তো? তা তুমি তো বেশ দিব্যি বহাল-তবিয়তে আছ? তোমার তো দেখছি বিকার নেই?

উদ্ধব দাস কিন্তু সে কথায় কান দিলে না। বুড়ো মানুষটার দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলে—কী গো সরখেল মশাই, আপনি মুহুরির মানুষ, কেষ্টনগরের সেরেস্তা ছেড়ে এখেনে কেন?

সরখেল মশাইও বোধ হয় অবাক হয়ে গিয়েছিল। বললে—আমি তো সরকারী কাজে এসেছি মহারাজের চিঠি নিয়ে, তা তুমি এখেনেও আসো?

উদ্ধব দাস বললে—আমার গতি বায়ুর মত সর্বত্র প্রভু—

—তা কেষ্টনগরে আবার কবে যাচ্ছো? মুগের ডাল খেতে যাবে না?

—মহারাজ কেমন আছেন প্রভু?

জনার্দনের এ-সব কথা ভালো লাগছিল না। আসল কথাটা না বলে দিলে যেন তৃপ্তি হচ্ছিল না তার। উদ্ধব দাসকে আড়ালে ডেকে এনে বললে—তা তোমার বউকে ছোটমশাই যে নিজের বউ বলে চালিয়ে দিয়ে নবাবের কাছে পাঠিয়ে দিলে, তুমি কিছু বলবে না?

উদ্ধব দাস বললে—আমি কী বলবো প্রভু?

—কেন, তুমি নিজামত-কাছারিতে গিয়ে ছোটমশাই-এর নামে নালিশ করতে পারো না?

—আমি প্রভু নালিশ করবো?

—নিশ্চয়ই করবে! তুমি নালিশ করলেই দেখবে ছোটমশাইকে কোতোয়াল নাকে দড়ি দিয়ে নিজামত-কাছারিতে ধরে নিয়ে যাবে! নিজের বউকে না পাঠিয়ে তোমার বউকে পাঠালে, তাতে তুমি কিছু বলবে না?

সরখেল মশাই দূর থেকে ডাকলে—কী গো দাসমশাই, এসো, দুটো গান শুনি তোমার—

জনার্দন বললে—যদি আমার কথা শোন দাসমশাই তো তোমার ভালো হবে, তা বলে দিচ্ছি—

উদ্ধব দাসকে যেন তবু উত্তেজিত করা গেল না। উদ্ধব দাসের যেন বিকার নেই, বিরাগ নেই, বললে—আমি নালিশ করলে কি আমার বউকে আমি ফিরিয়ে পাবো প্রভু? তাকে নিয়ে কি আমি ঘর-সংসার করতে পারবো?

—কেন পারবে না দাসমশাই? তোমার তো অগ্নি-সাক্ষী রেখে বিয়ে করা ই-স্ত্রী!

উদ্ধব দাস বললে—বউ যদি আমার ঘরই করবে তো সে পালিয়ে গেল কেন? ধরে-বেঁধে কি পীরিত হয় প্রভু?

—আলবৎ হয়! যদি ঘর-সংসার না করে তো চুলের মুঠি ধরে তাকে বশে রাখবে! মেয়েমানুষের আবার অত তেজ কেন গো?

উদ্ধব দাস বললে—তাকে অত গাল দিও না গো!

বলেই গান গেয়ে উঠলো—

শ্যামা তো সামান্য নয় গো।
মহাকাল কুন্তল-জাল।
শঙ্কর পদতলে, মগনা রিপুদলে,
তনুরুচি তরুণ তমাল।

উদ্ধব দাস হয়তো আরো অনেকক্ষণ গান গাইতো, কিন্তু জনার্দন থামিয়ে দিলে। বললে—থামো তুমি, পাগলের মত গান গেও না। যদি কিছু টাকা কামাতে চাও তো ডিহিদারের কাছে খবরটা দিয়ে এসো যে তোমার বউকে ছোট-মশাই নাম ভাঁড়িয়ে চেহেল্-সুতুনে পাঠিয়ে দিয়েছে—।

এবার সরখেল মশাই এসে হাজির, বললে—কী গো উদ্ধব বাবাজী, কেষ্টনগরে যাবে আমার সঙ্গে—আমি আজ যাচ্ছি—

উদ্ধব দাস সব তাতেই রাজি। বললে—চলুন, আমার কাছে হাতিয়াগড়ও যা, কেষ্টনগরও তাই—

জনার্দনের আর কথা বলা হলো না। আস্তে আস্তে বেরোল অতিথিশালা থেকে। তারপর পায়ে-পায়ে একেবারে চলতে লাগলো উত্তর দিকে। সেখান থেকে দক্ষিণে। তারপর পূবে, তারপর পশ্চিমে।

দুর্গা এতক্ষণ সব শুনছিল। জনার্দন বেরোতেই সেও বেরোল, পেছন-পেছন চলতে লাগলো। প্রথমে উত্তর দিকে, সেখান থেকে দক্ষিণে। তারপর পূবে। তারপর পশ্চিমে। তারপর যেই ডিহিদারের দফ্তরখানা এসেছে অম্নি টুপ করে সেখানে ঢুকে পড়লো জনার্দন। দুর্গা দূরে থেকে দাঁড়িয়ে সব নজর করে দেখলে। হারামজাদা মিন্‌সে! ভূতের কাছে মাম্‌দোবাজি ফলাতে এসেছে!

বড় বউরানী ছোটমশাই-এর ঘরে ঢুকতেই ছোটমশাই মুখ তুললেন একবার।

—কার চিঠি?

ছোটমশাই বিছানায় শুয়ে শুয়েই চিঠিটা পড়ছিলেন। বার বার পড়েও যেন মানে বুঝতে পারছিলেন না। আবার পড়তে লাগলেন মনে মনে—

শ্রীল শ্রীযুক্ত হিরণ্যনারায়ণ রায়

বরাবরেষু—

অত্র পত্রে সবিশেষ সংবাদ জ্ঞাপনান্তর বাহক মারফৎ বিজ্ঞাপন করিতেছি। লোকপরম্পরায় জ্ঞাত হইলাম আপনার আপন প্রাণাধিকা পত্নীকে লোক-লজ্জা অগ্রাহ্য করতঃ চেহেল্‌-সুতুনে পাঠাইয়া হিন্দুধর্মীয়দের মস্তক অবনত করাইয়া দিয়াছেন। জগৎশেঠজী, মীরজাফর আলি স্যাহেব প্রমুখাৎ যে-সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছি তাহা সবিশেষ বেদনাদায়ক। নবাব সম্প্রতি ফিরিঙ্গীদের সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভ করতঃ উদ্ধত আচরণ করিয়া ধরাকে সরা জ্ঞান করিতেছেন। এমত সময়ে আপনার ন্যায় বিচক্ষণ ব্যক্তির এমন করিয়া স্বমর্যাদার মূলে কুঠারাঘাতকরণ অতীব ঘৃণার্হ। ইহাপেক্ষা আপনার প্রাণাধিকা পত্নীকে হত্যা করা অনেকগুণে শ্রেয় ছিল। আপনি প্রাণভয়ে ভীত পীড়িত হইয়া নিজ-পত্নীর ধর্মনাশে সহায়তা করিয়া সমগ্র হিন্দু-নরপতিকুলে কলঙ্ক লেপন করিয়াছেন। অধিক কি লিখিব। আমাদিগের সমস্ত প্রচেষ্টা এমন ভাবে নষ্ট করিয়া আপনি সকলের ক্ষতিসাধন করিয়াছেন। ইহার প্রতিকার সত্বর আবশ্যক। আশু কর্তব্য সম্বন্ধে স্থির-মস্তিষ্কে বিবেচনা করিবার মানসে আমি যথাবিহিত ব্যবস্থা করিতেছি। আপনার সাক্ষাৎ প্রয়োজন জানিবেন। কবে আসিতে পারিবেন পত্র-বাহকের হস্তে পত্র দ্বারা জ্ঞাত করিবেন। ইতি ভবদীয়—

বড় বউরানী আবার জিজ্ঞেস করলেন—কার চিঠি?

ছোটমশাই বললেন—মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের।

—কী লিখেছেন?

—লিখেছেন আপনি আপনার স্ত্রীকে কেন পাঠালেন চেহেল্‌-সুতুনে? তাকে খুন করতে পারলেন না? আমাকে যেতে লিখেছেন—

বড় বউরানী বললেন—তুমি যাবে নাকি?

—তাই তো ভাবছি। অতিথিশালায় লোক অপেক্ষা করছে—

বড় বউরানী বললেন—তুমি যেন আবার বলে দিও না সব। জিজ্ঞেস করলে বোলো কোনো উপায় না পেয়ে বউকে পাঠিয়ে দিয়েছিলে। বোলো ভয় পেয়েই এমন কাজ করে ফেলেছো, বুঝলে? নইলে সব মাটি হয়ে যাবে—

নজর মহম্মদ কান্তকে পোঁছিয়ে দিয়েই আড়ালে সরে পড়েছিল। কিন্তু মুখোমুখি দাঁড়িয়েও কান্ত বা মরালী কারো মুখেই কোনো কথা ছিল না। ওদিকে নহবতখানায় তখনো ইমন-কল্যাণের রাগিণী মীড়ে-মূর্ছনায় সমস্ত আবহাওয়াটা উদ্দাম করে তুলেছে।

মরালী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অধৈর্য হয়ে উঠেছিল। বললে—আপনি কেন এলেন এখানে? কী করে এলেন? কোন্ সাহসে এলেন?

—ওই নজর মহম্মদকে একটা মোহর দিতে হলো।

—মোহর? মোহর কোথায় পেলেন? কে দিলে?

কান্ত তখনো হাঁফাচ্ছে। কোনো রকমে বললে—সারাফত আলি দিলে। তার অনেক টাকা। তার গন্ধতেলের দোকান আছে চক্‌বাজারে, তার বাড়ির একটা ঘরে আমাকে থাকতে দিয়েছে, আমার কাছে ভাড়া নেয় না।

সারাফত আলির নামটা শুনেই মরালীর মনে পড়লো গুলসনের কথা। লোকটা আরক বেচে বেগমদের জন্যে।

—সে কেন আপনার হয়ে মোহর দিলে?

—তা জানি না। বোধহয় তার রাগ আছে হাজী আহম্মদের বংশের ওপর। সে চায় এই চেহেল্-সুতুন ভেঙে গুঁড়িয়ে পিষে গোরস্থান করে দিতে!

—কিন্তু আপনাকে সে এখানে পাঠালে কেন? নজর মহম্মদকে দিয়েই তো সে-কাজ হতো!

—না, তা হলে তাই-ই করতো সারাফত আলি। আমি সারাফত আলিকে বলেছিলুম আপনার সঙ্গে দেখা করবার ব্যবস্থা করে দেবার জন্যে। আমার খুব দেখা করবার ইচ্ছে হয়েছিল আপনার সঙ্গে।

—কেন?

—আমি এ-ক'দিন ঘুমোতে পারিনি রাত্তিরে। কেবল মনে হয়েছে আমি পাপ করেছি। আমি সে-পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই। ক'টা টাকার জন্য আমি আপনার সর্বনাশ করেছি। আপনার ধর্ম নষ্ট করেছি। আপনি কাটোয়ার সেই সরাইখানাতেই পালিয়ে যেতে চেয়েছিলেন আমার সঙ্গে। শেষ পর্যন্ত ডিহিদারের লোক এসে পড়াতে তা আর হয়ে ওঠেনি। এখন যদি বলেন তো আমি তার ব্যবস্থা করতে পারি। আপনি এখান থেকে পালিয়ে চলুন—

মরালী চমকে উঠলো—এ আপনি বলছেন কী? এখান থেকে কেউ পালাতে পারে?

—পারে, পারে! সারাফত আলির অনেক টাকা আছে, সে সব ব্যবস্থা করে দিতে পারে। আপনি শুধু বলুন যে আপনি রাজি, তাহলে আমি সব বন্দোবস্ত করবো। আপনার কিছু ভাবনা নেই।

মরালী বললে—আপনার কি প্রাণের ভয়ও নেই? জানেন না যে এখানে এসে কেউ দেখে ফেললে সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে কোতল করে ফেলবে!

—তা করুক, আপনাকে উদ্ধার করার পর আমার যা-হয় হোক, তার জন্যে আমি ভাবিনে—

মরালী খানিকক্ষণ কী যেন ভাবলে। তারপর বললে—আমি বলছি আপনি এখান থেকে চলে যান। এখানে আর কখনো আসবেন না এমন করে। এখানকার সব খবর আপনি জানেন না। আমি এ-ক'দিনে সব শুনেছি, এরা মানুষ নয়, পশু। এদের মায়া-দয়া কিছু নেই—

—সেই জন্যেই তো আপনাকে আমি নিয়ে যেতে এসেছি! নবাব ফিরে আসছে, এসেই আপনার ধর্ম নষ্ট করবে। তার আগেই আপনাকে আমি এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে চাই—

মরালী কী যেন ভাবলে। বললে—না, আমি যাবো না—

—কেন? যাবেন না কেন? এখনো তো উপায় আছে?

—না, তবু যাবো না, তাতে হাতিয়াগড়ের ছোটমশাই-এর ক্ষতি হবে! আমি পালিয়ে গেলে তাঁদের ওপর অত্যাচার হবে।

এর পর আর কান্তর কী বলবার থাকতে পারে! তবু কান্ত খানিকক্ষণ ভাবতে লাগলো সেইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।

মরালী বললে—আর দাঁড়িয়ে থাকবেন না আপনি, আমাকেও বিপদে ফেলবেন আপনিও বিপদে পড়বেন, আপনি যান—

কান্ত চলেই আসছিল। এত কষ্ট করে এত চেষ্টা করে এখানে এসেছে অথচ এত তাড়াতাড়ি চলে যেতে ইচ্ছেও করছিল না। বললে—একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞেস করবো?

—কী?

—আমাকে সেই বশীর মিঞা বলছিল আপনি নাকি হাতিয়াগড়ের রাণীবিবি নন, অন্য কেউ!

—অন্য কেউ? হাতিয়াগড়ের রাণীবিবি নই তো কে আমি?

কান্ত বললে—আমার অবিশ্যি বিশ্বাস হয়নি। কিন্তু অবিশ্বাস করতেও ইচ্ছে হচ্ছে না। বশীর মিঞার কথাই যদি সত্যি হয় তাহলে আমার কিন্তু আর আফশোষের শেষ থাকবে না—

—কেন বলুন তো? বশীর মিঞা কী বলেছে?

কান্ত বললে—কে নাকি বশীর মিঞাকে বলেছে আপনি আসলে হাতিয়াগড়ের শোভারাম বিশ্বাস মশাই-এর মেয়ে মরালী, যার সঙ্গে আমারই বিয়ে হবার কথা ছিল। আমি তো তাকে দেখিনি, তাই আমি কিছু বলতে পারলুম না—

—কিন্তু এ আজগুবি খবরটা কে দিলে তাকে?

কান্ত বললে—হাতিয়াগড়ের ডিহিদার এখানে খবর পাঠিয়েছে—আমিও তাকে বলেছি এটা একেবারে আজগুবি খবর—

তারপর একটু থেমে বললে—আচ্ছা, তাহলে আমি চলি—যদি কখনো আপনার কিছু দরকার হয় ওই নজর মহম্মদকে বলবেন, তাহলেই আমি আসবো—আপনার যদি কখনো এখান থেকে চলে যাবারও ইচ্ছে হয়, তাও জানাবেন।

অন্ধকারের আড়ালে কোথায় নজর মহম্মদ দাঁড়িয়ে ছিল। কান্ত চলে যাবার জন্যে পা বাড়াতেই সে সঙ্গ নিলে।

—শুনুন!

মরালী পেছন থেকে অস্ফুট স্বরে আবার ডাকলে।—শুনুন।

কান্ত ফিরতেই মরালী জিজ্ঞেস করলে—আর একটা কথা জানবার ছিল. আপনি কি হাতিয়াগড়ে আর গিয়েছিলেন?

—না, কেন?

—যদি যান তো একটা কাজ করতে পারবেন? যে-মেয়েটা বিয়ের রাত্তিরে পালিয়েছিল তার বাবা শোভারাম বিশ্বাস ছিল আমাদের নফর। তিনি কেমন আছেন একবার দেখে এসে আমায় জানাবেন?

নহবতখানায় ইনসাফ মিঞা ইমন থামিয়ে এবার বেহাগে আলাপ শুরু করলো। কোথায় দূর থেকে আবার নাচের ঘুঙুর বেজে উঠলো। আর হঠাৎ কে যেন বড় করুণ একটা আর্তনাদ করে কান্নায় ফেটে পড়লো। সমস্ত চেহেল্-সুতুন যেন একটা নতুন রোমাঞ্চে রিন্-রিন্ করে উঠলো।

—একবার খবরটা জানাবেন আমায়?

কান্ত অবাক হয়ে গেল অনুরোধটা শুনে। আরো কাছে সরে এল। বললে—তাহলে আমি যা শুনেছি তাই-ই সত্যি? আপনিই কি মরালী?

মরালী ভয়ে দু'পা পিছিয়ে এল। তারপর শিউরে উঠে পেছন দিকে সরে গেল। বললে—না না, আমি মরালী নই, আমি লস্করপুরের তালুকদার কাশিম আলির মেয়ে মরিয়ম বেগম—

বলতে বলতে দৌড়ে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকে পড়লো।

নজর মহম্মদের কথায় কান্তর চমক ভাঙলো। বললে—চলিয়ে জনাব—চলিয়ে—

ঝাঁ-ঝাঁ করছে রোদ। বর্ষা আসার আগে এই সময়টাই বাংলাদেশে টেঁকা দায় হয়ে ওঠে। সারাফত আলির খুশ্‌বু তেলের দোকানের পেছনে তখন আগুনের মত গরম। না আছে একটু হাওয়া, না আছে একটু ঠান্ডা। তবু রাস্তায় চলতে চলতে পুঁটলি থেকে গামছাটা বার করে ঘাড়-মুখ-মাথা মুছে নিয়েছে। বোশেখ মাসে জায়গায় জায়গায় জলসত্র থাকে। জমিদারবাবুদের কাছারি-ঘরের লাগোয়া একটা চালাঘরে বড় ম্যাটির জালা ম্যাটিতে পোঁতা থাকে। রাস্তার লোক জল-তেষ্টা পেলে এসে জল খেতে চাইলেই কাছারির লোক জল দেয়, বাতাসা দেয়। এক মুঠো বাতাসা চিবিয়ে এক ঘটি জল খেয়ে সেখানেই বাঁশের মাচার ওপর বসে জিরিয়ে নেয়। তারপর রোদটা একটু পড়লে আবার হাঁটা দিতে শুরু করে।

এমনিতে একা-একা হাঁটা উচিত নয়। রাস্তায় যেতে যেতে এক-একটা দল গড়ে ওঠে। দলের সঙ্গে চললে বিপদ কম। নইলে কোথায় কখন কী ঘটে বলা যায় না। ঠ্যাঙাড়ে আছে, ঠগীরা আছে। বেশ ভাব-সাব করে তোমার সঙ্গে মিলে-মিশে চলতে লাগলো। একসঙ্গে চিঁড়ে-মুড়ি খেয়ে তোমাকে আপন করে নিলে। তারপর কখন তোমায় খুন করে তোমার টাকা-কড়ি নিয়ে পালিয়ে যাবে তার ঠিক নেই। এ হামেশাই চলছে। তাই অন্ধকার হবার পর রাস্তায় আর কেউ বেরোয় না। দিনমানে-দিনমানে কোথাও অতিথিশালায় উঠে পড়লে আর ভয় নেই। কিংবা কোনো দোকানে।

মোল্লাহাটির মধুসূদন কর্মকারের দোকান এমনি একটা জায়গা। দোকানের লাগোয়া একটা বড় ঘর আছে। সেখানে মধুসূদন রাস্তার লোকদের থাকবার বন্দোবস্ত করে দিয়েছে। লোকে একদিন-দু'দিন থাকে, রান্নাবান্না করে খায়, আর

তারপর যে-যার কাজে চলে যায়। তার বদলে কিছু কাড়ি দিতে হয় মধুসূদনকে। সেইটেই মধুসূদনের আয়।

বশীর মিঞা সব বলে-কয়ে ঠিক করে দিয়েছিল।

বশীর বলেছিল—তোর কিছু ডর নেই, মধুসূদনের ওখানে গিয়ে তুই উঠবি—দোকান থেকে চাল ডাল ফুটিয়ে খাবি, যদি তোকে জিজ্ঞেস করে কোথায় যাবি তুই, তাহলে বলবি নিজামতের নোকরির চেষ্টা করতে মুর্শিদাবাদ যাচ্ছিস—ব্যস্, চুকে গেল ল্যাঠা!

বশীর মিঞা যেমন-যেমন বলেছিল ঠিক তেমন-তেমন করেছিল কান্ত। কোনো অসুবিধে হয়নি। মধুসূদন কর্মকার লোকটা ভালো। মধুসূদন বলেছিল—আমার দোকানে সব্বাই ওঠে আজ্ঞে, এখেনে তো থাকবার ব্যবস্থা নেই আর, আপনার যতদিন ইচ্ছে থাকুন,—

কান্ত মোল্লাহাটিতে এসে ওঠবার পর থেকেই চারদিকে নজর রাখছিল। বশীর মিঞা বলে দিয়েছিল লোকটা বুড়ো মানুষ। কাঁচা-পাকা চুল মাথায়। ছাড়া-ছাড়া দাড়ি আছে মুখে। হাতে একটা থলি আছে। সেই থলিটার ভেতরেই তার গামছা, খড়ম, চকমকি, সব কিছু থাকে। তারই ভেতরে একটা চিঠি আছে। সে-চিঠিটা হাতিয়াগড়ের রাজা লিখছে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকে। লোকটা এসে ওই মোল্লাহাটির মধুসূদনের দোকানে উঠবে। বিকেল নাগাদ আসবে আর ভোর বেলা উঠেই আবার হাঁটা দেবে। রাত্তিরের মধ্যেই সেই চিঠিটা হাত-সাফাই করে এনে দিতে হবে।

—সে-চিঠিতে কী লেখা আছে?

—সে জেনে তোর কী ফায়দা? খত্‌টা আনলেই তোর কাম হাঁসিল হয়ে যাবে—

এর পরে আর কিছু বলবার ছিল না। রাণীবিবির সঙ্গে দেখা করার পর-দিনই মুর্শিদাবাদ থেকে বেরিয়ে পড়তে হয়েছিল। সারাফত আলি ভোর বেলাই ডেকে জিজ্ঞেস করেছিল—কীরে কান্তবাবু, মুলাকাত হলো রাণীবিবির সঙ্গে?

কান্ত বলেছিল—হয়েছে মিঞাসাহেব—

—কাম হলো?

—হ্যাঁ মিঞাসাহেব।

—তাহলে যা বলেছি তা করতে পারবি তো? নবাব সুজাউদ্দীন, নবাব সরফরাজ খাঁর হাড় গুঁড়ো করে দিতে পারবি তো? নবাব আলীবর্দীর চেহেল্-সুতুন ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে সেকবি তো? রাণীবিবিকে রাজি করাতে পারবি তো?

কান্ত বললে—না মিঞাসাহেব, রাণীবিবি পালাতে চাইছে না—

—পালাতে তো চাইবেই না। নবাবী আরাম পেলে কেউ পালাতে চায়? পালালে চলবে না। তুই রোজ যাবি। রোজ-রোজ গিয়ে হাল-চাল দেখবি। যত মোহর লাগবে খুদ্ আমি দেবো। কাউকে পরোয়া করবি না। নজর মহম্মদরা মোহরের বান্দা, মোহর পেলেই ওরা জব্দ। আমি তোর হাতে আরক দেবো, সেই আরক খাইয়ে দিবি সকলকে—

—আরক? কান্ত বুঝতে পারেনি কথাটা।

সারাফত আলি বলেছিল—হ্যাঁ রে কান্তবাবু, আরক। আমার এ খুশ্‌বু-তেল তো বাহারকা ভড়ং, আস্‌লি চিজ্ তো আমার আরক।

—এ আরক খেলে কী হয়?

—এতে সাপকা জহর আছে, বিষ। এ জহর খেলে সব জিন্দ্‌গী বরবাদ হয়ে

যায়। চেহেল্-সতুনে যিত্‌নী বেগম আছে সব-কোইকো হাম আরক পিলায়া। সব বেগমকো জিন্দ্‌গী বরবাদ কর দেঙ্গে। চেহেল্-সতুন মিট্টি মে গিরায়েঙ্গে। কাল ভি যাও চেহেল্-সতুন মে—কাল ভি নজর মহম্মদকো মোহর দেঙ্গে—

কান্ত অবাক হয়ে গিয়েছিল। শুধু কাল কেন, বরাবর যদি যেতে বলে মিঞা-সাহেব তো বরাবরই যাবে।

পরের দিন সকাল বেলা থেকেই আবার তৈরি হয়ে ছিল। নজর মহম্মদ পরের দিনও আসবে। সমস্ত রাতটা সমস্ত দিনটা সেই কথাটা ভেবে ভেবে কাটাবে ভেবেছিল। আবার সন্ধ্যেবেলা হলেই নজর মহম্মদ তাকে ভেতরে নিয়ে যাবে। ভেবেছিল এবার গিয়ে অন্য কথা জিজ্ঞেস করবে। জিজ্ঞেস করবে—আপনি বলুন আপনি কে? আমার সন্দেহ হচ্ছে আপনি রাণীবিবি নন, আপনি উদ্ধব দাসের স্ত্রী মরালী—

সমস্ত দিনটা কান্তর কেমন কল্পনা করতে ভালো লাগলো যে, রাণীবিবি ঠিক আসল রাণীবিবি নয়। রাণীবিবি আসলে মরালী। অথচ মরালী হলেই বা তার লাভটা কী তাও ভেবে পেলে না। বার বার গিয়ে সারাফত আলিকে জিজ্ঞেস করলে—আচ্ছা মিঞাসাহেব, নজর মহম্মদ এসেছিল আজ?

প্রত্যেকবারই সারাফত আলি বলেছিল—নেহি আয়া—

কান্তর মনে কেমন যেন ভয় হয়েছিল। যদি নজর মহম্মদ না আসে আজ?

চক্-বাজারের সামনের রাস্তায় গিয়েও দাঁড়িয়েছিল অনেকক্ষণ। রাস্তায় ভিড়, সেই ভিড়ের মধ্যেই উট চলেছে, নবাবের হাতী চলেছে, কোতোয়াল, সেপাই, তাঞ্জাম চলেছে। কাছারি থেকে দলে-দলে লোক চলেছে। কিন্তু কোথাও নজর মহম্মদের দেখা নেই। হঠাৎ দেখলে বশীর মিঞা আসছে।

বশীর মিঞাকে দেখেই কান্ত ভয় পেয়ে গিয়েছে। আবার যদি কোনো কাজে পাঠায়? সত্যিই যা ভয় করেছিল তাই-ই সত্যি হলো। বশীর মিঞা বললে—তোকেই খুঁজতে এসেছিলুম—তোকে এক-জায়গায় যেতে হবে—

—কোথায়? কখন?

—এখনই গেলে ভালো হয়। মোল্লাহাটিতে।

কান্ত বললে—মোল্লাহাটি কোথায়?

—সে তোকে আমি সব সমঝিয়ে দেবো। মোল্লাহাটিতে মধুসূদন কর্মকারের দুকান আছে। সেখানে গিয়ে তোকে উঠতে হবে—। সেখানে একটা বুড়ো এসে উঠবে, সে যাবে কিস্টোনগরে। মহারাজ কিস্টোচন্দরের কাছারির সেরেস্তার লোক সে। তার সঙ্গে ভাব জমিয়ে একঠো কাম হাঁসিল করতে হবে!

—কী কাজ?

—সব বলবো তোকে। কোনো ডর নেই। তার কাছে একটা খত্ আছে। হাতিয়াগড়ের রাজার লেখা খত্, সেই খত্‌টা হাত-সাফাই করে নিয়ে আসতে হবে!

—সে চিঠিতে কী লেখা আছে?

—তাই তো দেখতে হবে। মনসুর আলি সাহেব জরুরী হুকুম দিয়েছে সেই খত্‌টা এনে দিতে হবে—মেহেদী নেসার সাহেব কলকাত্তা থেকে ফিরে এলেই পেশ করতে হবে তার বরাবর!

কাজটার কথা শুনে মনটা কেমন খারাপ হয়ে গেল কান্তর। হাত-সাফাই মানেই তো চুরি! শেষকালে চুরি করতে হবে চাকরির জন্যে। একবার একটা

মেয়েমানুষ এনে দিয়েছে হারেমে, এবার আর একটা চিঠি চুরি করতে হবে!

কান্ত বললে—ও-কাজ আমি পারবো না ভাই, ও-কাজ আমার দ্বারা হবে না—আমি পরের চিঠি চুরি করতে পারবো না—

বশীর মিঞা যেন কথাটা শুনে আকাশ থেকে পড়লো। বললে—চুরি? চুরি বলছিস্ কেন? দেশের কাম করবি তাকে তুই চুরি বলছিস্? দেশকা সওয়াল ঠিক রাখতে হবে না? দেশের দুষমনদের শায়েস্তা রাখতে চুরি-রাহাজানি-বাটপাড়ি করা কি খারাব কাম? তুই তো নবাবের কাম করছিস! নিজামতের পরওয়ানা আছে তোর কাছে, তোর কীসের ডর?

বশীর মিঞা তাকে অনেকক্ষণ ধরে বোঝালে। দেশের স্বার্থের জন্যে কোনো পাপই পাপ নয়। তুই যে রাণীবিবিকে এনেছিস সেও পাপ-কাজ নয়। নবাবের সেবা কি পাপ? নবাব হলো খোদা। আসলে খোদাতালার চেয়েও বড় হলো নবাব। নবাবের সেবার জন্যে খুন করাকেও পাপ বলে না। দরকার হলে খুনও করতে হতে পারে। নবাব আলীবর্দী খাঁ যে সরফরাজ খাঁকে খুন করে মুর্শিদাবাদের নবাব হয়েছে, সেটা কি পাপ? বাদশা আওরংজেব নিজের ভাইয়াকে খুন করেছে, সে কি পাপ? আসলে রাজার কামে পাপ নেই। তবে হ্যাঁ, আমাদের নিজের কামে পাপ আছে। আমার নিজের মামলার ফয়শ্‌লা করতে যদি আমি বিবিকে খুন করি, সেটা গুণাহ্, লেকন্ নবাবকে খুশী করবার জন্যে যদি আমার বিবিকে নবাবের হারেমে ভেজিয়ে দিই তো তাতে পাপ নেই। যত আদ্‌মি নবাবকে আওরাৎ জুগিয়েছে, সবাই বেহেস্তে যাবে। আমাদের দুনিয়ায় নবাব-বাদশাই তো খোদাতালা রে ইয়ার। নবাব খুশ্ হলেই তো খোদাতালা খুশ্ হয়।

এ-সব কথা কান্ত অনেকবার শুনেছে বশীরের মুখ থেকে। শুনেছে কিন্তু বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয়নি। ছোটবেলা থেকে দিদিমার কাছে অন্য কথা শুনে এসেছে কান্ত। দিদিমা কান্তকে সৎ হতে শিখিয়েছিল, ধার্মিক হতে শিখিয়েছিল। দেবদ্বিজে ভক্তি করতে শিখিয়েছিল। দিদিমা শিখিয়েছিল—ভোর বেলা ঘুম থেকে উঠে সূর্যের দিকে মুখ করে তিনবার প্রণাম করতে। পরের জিনিসের ওপর লোভ করতে বারণ করেছিল। ব্রাহ্মণ দেখলেই প্রণাম করতে শিখিয়েছিল। নিচু জাতের লোকদেরও ঘেন্না করতে বারণ করেছিল! কিন্তু কোথায় গেল সেই দিদিমার শিক্ষা! কলকাতায় বেভারিজ সাহেবের গদিতে চাকরি করতে আসার পর থেকেই যেন সব জিনিস উল্টে-পাল্টে গেল। মুর্শিদাবাদে আসার পর থেকে তার আর কিছুই রইলো না। এখানে সবই যেন উল্টো। চুরি করলেও দোষ নেই যদি তা নবাবের জন্যে করা হয়। মিথ্যে কথা বললেও দোষ নেই যদি তা নবাবের জন্যে বলা হয়।

কান্ত জিজ্ঞেস করেছিল—তাহলে তোরা কা'র দলে? নবাবের দলে না মীরজাফর সাহেবের দলে?

বশীর মিঞা বলেছিল—যে যখন নবাব হবে আমরা তার দলে!

—যদি এখনকার নবাবকে সরিয়ে মীরজাফর আলি সাহেব নবাব হয়, তখন?

বশীর মিঞা মুচ্‌কে হেসে চুপি চুপি বলেছিল—আরে মীরজাফর আলি সাহেবই তো আখেরে নবাব হবে!

—তার মানে?

বশীর মিঞা এক মুহূর্তেই আবার গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল। তারপর

বলেছিল—তুই কাউকে বাত্‌লোসনি। যদি খোদাতালার মর্জি হয় তো দেখবি মস্‌নদ্‌ পাল্‌টে যাবে, মুর্শিদাবাদের সকল্‌ ভি পালটে যাবে। একবার যদি মীরজাফর সাহেব নবাব হয় তো তখন দেখবি আমিই তখন হবো হুজুরনবীস্‌। আর তুই যদি ইমান্‌দারিসে কাম করিস তো তোকেও আমি আমার সেরেস্তায় ভালো কাম দেবো। আর তুই যদি চাস তোকে মীর তোজক্‌ করে দেবো—

—মীর তোজক্‌?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, মীর তোজক্‌। দরবার দেখাশোনা করবি, জোলুস দেখাশোনা করবি। নবাবের কাছাকাছি থাকতে পারবি। মোটা ঘুষ আছে ও-নোকরিতে—

সত্যিই অনেক লোভ দেখিয়েছিল বশীর মিঞা। তবু কান্তর মন টলেনি। সারাফত আলির দোকানে বসে বসে মনটা পড়ে থাকতো চেহেল্‌-সুতুনের ভেতরে। কিছুই জিজ্ঞেস করা হয়নি। কী রকম করে দিন কাটছে, কী খেতে দিচ্ছে।

মোল্লাহাটির রাস্তাতেও কেবল সেই কথাই ভেবেছে সে। আবার কবে দেখা হবে কে জানে। সারাফত আলি আসবার দিন জিজ্ঞেস করেছিল—কীরে, কোথায় চলেছিস্‌ আবার? কোন্‌ বিবিকে আনতে?

কান্ত বলেছিল—বিবি নয় মিঞাসায়েব, এবার অন্য কাম—

—দুত্তোর কাম! কাম তুই ছেড়ে দে!

—কাম ছাড়লে আমি খাবো কী?

—কাম আমি দেবো তোকে। তুই খালি চেহেল্‌-সুতুনে গিয়ে সব বরবাদ্‌ করে দে, আমি তোকে খিলাবো। তোকে টাকা দিতে হবে না। মুফোৎ খিলাবো। তোর অন্য কিছু কাম করতে হবে না—

অদ্ভুত মানুষটা ওই সারাফত আলি! কত বছর ধরে ওই দোকান খুলে বসে আছে নিজের চোখে চেহেল্‌-সুতুনের ধ্বংস দেখবে বলে। রাত্রে নেশার ঘোরেও বোধহয় সারাফত আলি চেহেল্‌-সুতুনের ধ্বংসের স্বপ্ন দেখে।

রাস্তার একটা লোককে দেখে কান্ত জিজ্ঞেস করলে—হ্যাঁ মশাই, মোল্লাহাটির রাস্তাটা কোনদিকে বলতে পারেন?

—মোল্লাহাটি? আমিও তো মোল্লাহাটিতেই যাচ্ছি—

—আজ্ঞে, আমি যাবো মোল্লাহাটির মধুসূদন কর্মকারের দোকানে।

—তা আমি তো ওখানেই যাবো। আজ রাতটা ওখানেই থাকবো! মশাইয়ের নিবাস?

কান্ত বললে—চাক্‌লা বর্ধমান, গ্রাম বড়-চাত্‌রা—

—মশাই কী কর্ম করেন?

কান্ত একটু চম্‌কে উঠলো, তার চাকরি তো বলবার মতন নয়। ভালো করে লোকটার দিকে চেয়ে দেখলে। বশীর মিঞার যেমন-যেমন বর্ণনা তার সঙ্গে হুবহু মিলে যাচ্ছে। মাথায় কাঁচা-পাকা চুল, মুখে কাঁচা-পাকা গোঁফ-দাড়ি। বয়স ষাট-সত্তর। হাতে একটা পোঁটলা।

তার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে কায়দা করে কান্ত প্রশ্ন করলে—মশাই-এর কোথা থেকে আসা হচ্ছে?

ভদ্রলোক বললে—আমি আসছি হাতিয়াগড় থেকে—

হাতিয়াগড় নামটা শুনেই আরো সতর্ক হয়ে উঠলো কান্ত। আশ্চর্য, যার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে এখানে তারই সঙ্গে এমনভাবে রাস্তায় এত সহজে

দেখা হয়ে যাবে ভাবা যায়নি। লোকটা কিন্তু বেশ নিশ্চিন্ত হলো একটা সঙ্গী পেয়ে। বললে—যা দিনকাল পড়েছে মশাই, পথে একা-একা চলাই বিপদ, এই সেদিন একটা লোককে খুন করে ফেলে রেখে গেছে পুঁটিয়ার রাস্তায় দেখলাম—

—আপনাকে বুঝি সব জায়গায়ই ঘুরতে হয়?

ভদ্রলোক বললে—জমিদারি-সেরেস্তার কাজ হলো ঝক্‌মারীর কাজ! ঘুরতে-ঘুরতেই প্রাণ বেরিয়ে যায়। এই তো হাতিয়াগড় থেকে আসছি মোল্লাহাটিতে, এখান থেকে সোজা যাবো কেষ্টনগরে। আবার কেষ্টনগরে একদিন থাকি কি না-থাকি, যেখানে মহারাজের হুকুম হবে যেতে হবে—। আমি না-হলে তো কাজ চলে না মহারাজার—

কান্ত পুঁটলিটার দিকে চেয়ে দেখলে। বেশ পেট-ফোলা পোঁটলা। ওরই ভেতর বোধহয় চিঠিটা আছে। কী বিচ্ছিরি চাকরি। এমন বিশ্বাসী লোককে ঠকাতে হবে! অথচ লোকটা তো কোনো দোষ করেনি!

দেখতে দেখতে মধুসূদনের দোকানটা এসে গেল। ভদ্রলোককে দেখেই দোকানদার দু'হাত জোড় করে অভ্যর্থনা করলে—আসুন সরখেল মশাই, আসুন—কাজটা হলো?

বেশ বর্ধিষ্ণু লোক মধুসূদন কর্মকার। দোকানটা বেশ সাজানো। গোবর দিয়ে পরিপাটি করে নিকোন দাওয়া। চালের বাতা থেকে শিকের ওপর কয়েকটা চালকুমড়ো ঝুলছে।

—সঙ্গে উনি কে?

—উনি আমার পথের সঙ্গী। কান্তবাবু। কান্ত সরকার মশাই। চাক্‌লা বর্ধমানের বড়-চাত্‌রা গ্রামে বাড়ি, উনিও এখেনে একরাত্তির থেকে মুর্শিদাবাদে যাবেন নিজামতের কাছারির কাজে। আজকাল রাস্তায় সৎসঙ্গী পাওয়াই সৌভাগ্যের কথা কর্মকার মশাই। এবার হাতিয়াগড়েও বেশ কাটলো একটা রাত—

মধুসূদন জিজ্ঞেস করলে—কী রকম?

—আমাদের সেই উদ্ধব দাসমশাই নতুন গান বেঁধেছে, শোনালে আমাকে।

—তা তাকে নিয়ে এলেন না কেন সঙ্গে করে?

সরখেল মশাই বললে—দাসমশাই কি আর সেইরকম লোক? আমাকে বললে মুগের ডাল খেতে আসবে কেষ্টনগরে, তারপরে আবার কী মতি হলো, বললে—না, অনেকদিন লস্করপুরে যাইনি, সেখানে রথের মেলায় ভালো আনারস পাওয়া যায়, তাই খেতে যাবো। আর এল না।

সরখেল মশাই-এর সঙ্গে কর্মকার মশাই-এর বেশ ভাব বোঝা গেল। পোঁটলাটা দাওয়ার ওপর নামিয়ে গামছা দিয়ে গায়ের ঘাম মুছতে-মুছতে সরখেল মশাই বললে—দাসমশাই একটা কাণ্ড করে ফেলেছে, শুনেছেন?

—কী কাণ্ড?

—সে এক আজব কাণ্ড। রাজবাড়ির গোকুলের কাছে শুনলুম। হঠাৎ নাকি শোভারাম বিশ্বাসের মেয়েকে বিয়ে করে ফেলেছিল। তা মজার কাণ্ড, বিয়ের রাত্তিরেই বৌ বাসর-ঘর থেকে পালিয়ে গেছে। দাসমশাই আবার হাসতে হাসতে সবিস্তারে বললে সেই ঘটনা।

মধুসূদন কর্মকার বললে—সে তো আমি শুনেছি, আমাকে বলেছে—

—আর সেই গানটা শোনেননি?

—কোন গান?

—বউ-এর শোকে যে-গানটা লিখেছে দাসমশাই—আমার তো মুখস্থ হয়ে গিয়েছে—

শোন হে শিব শ্রবণে।
আমি রবো না ভব-ভবনে॥
যে-নারী করে নাথো
পতি-বক্ষে পদাঘাতো
তুমি তারি বশীভূতো
আমি তা সবো কেমনে॥

আহা বেড়ে গান লিখেছে, কর্মকার মশাই।

মধুসূদন বললে—দাসমশাই আমাকে বলে গেছে তার বউকে নিয়ে একটা কাব্য লিখবে। আপনাদের রায়-গুণাকর যেমন 'অন্নদামঙ্গল' লিখেছেন, ওম্‌নি ওর চেয়েও ভালো কাব্য লিখবে।

সরখেল মশাই হেসে উঠলো—পাগল-ছাগল মানুষ তো, বউ পালিয়ে গেছে তাতে বিকার নেই মনে—

মধুসূদন বললে—মহাপুরুষ মাত্রই তো পাগল—

—তা যা বলেছেন। অমন মন পেলে আমরা বেঁচে যেতুম। এদিকে আর একটা কাণ্ড শুনে এলাম—দাসমশাই'এর শ্বশুর সেই শোভারাম বিশ্বাস মশাই কিন্তু মেয়ের শোকে পাগল হয়ে গেছে!

কান্ত চম্‌কে উঠলো। এতক্ষণ কান্ত কোনো কথা বলেনি। মন দিয়ে দু'জনের কথা শুনছিল। আর সরখেলমশাই-এর পুঁটলিটার দিকে চেয়ে দেখছিল। যে এতখানি বিশ্বাস করেছে তাকে, তার কাছ থেকে চিঠি চুরি করতে হবে? এমন কী জরুরী চিঠি যা চুরি না করলে বশীর মিঞার চলছে না। যে-চিঠি না দেখতে পেলে নবাব-নিজামত লাটে উঠবে! কিন্তু হঠাৎ শোভারামের পাগল হওয়ার কথা কানে যেতেই আর চেপে রাখতে পারলে না। জিজ্ঞেস করলে—শোভারাম বিশ্বাসমশাই পাগল হয়ে গেছেন?

দু'জনেই চাইলে কান্তর দিকে।

—মশাই কি শোভারামকে চেনেন নাকি?

কান্ত বললে—হ্যাঁ, চিনতাম তাকে!

—তাকে কী করে চিনলেন? মশাই-এর কি হাতিয়াগড়ে যাওয়া-আসা আছে?

—হ্যাঁ, বার দু'এক গিয়েছিলাম।

—কী সূত্রে?

—কর্মসূত্রে!

এর পর আর কথা এগোল না। মধুসূদন কর্মকারের চাকর হাত-মুখ ধোবার জল নিয়ে এল। হাত-মুখ ধুতেই ব্যস্ত হয়ে উঠলো সরখেল মশাই। কিন্তু পুঁটলিটা দাওয়ায় রেখে গেল না। সেটা ছাড়তে যেন ভয় হলো সরখেল মশাইএর। সেটাও সঙ্গে নিয়ে সযত্নে পাশে রেখে মুখ-হাত-পা ধুয়ে গামছা দিয়ে মুছে আবার দাওয়ায় এসে বসলো। কান্ত বুঝলো বশীর মিঞা যা বলেছে তার এক-বর্ণও মিথ্যে নয়। নিশ্চয় কোনো গোপনীয় চিঠি আছে ওর মধ্যে। কান্ত কিন্তু নিজের পুঁটলিটা দাওয়ায় রেখে মুখ-হাত ধুতে গেল।
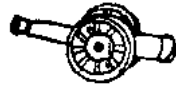
গুলসন মেয়েটা সেদিন এসেই বললে—চলো ভাই, চলো—

মরালীর প্রথমটায় একটু সঙ্কোচ হয়েছিল। যদি নজর মহম্মদরা কিছু বলে! যদি নজর মহম্মদ, কি বরকত আলিদের সর্দার পীরালি খাঁ জানতে পারে! কিন্তু সেই যেদিন কান্ত এসেছিল সেইদিন থেকেই নজর মহম্মদ যেন একটু অন্যরকম ব্যবহার শুরু করেছে। হয়তো এক মোহর ঘুষ পেয়েছে বলে। একটু অন্তরঙ্গ হবার চেষ্টা করেছে। চোখে যে তীক্ষ্ণতা ছিল সেটা যেন একটু কমে এসেছে। আর সে-রকম নজর-বন্দী করে রাখবার চেষ্টা নেই। কিংবা হয়তো নজর রাখে আড়াল থেকে। আড়াল থেকে হয়তো দেখে মরালী কী করছে, কী খাচ্ছে, কার সঙ্গে কথা বলছে। আর বাঁদীটাও অদ্ভুত। যেন মাটির পুতুল। কথা শুনতে পাচ্ছে কি না তাও বোঝা যায় না। তার সঙ্গে যে বসে-বসে একটু আজে-বাজে দুটো কথা বলে সময় কাটাবে তারও উপায় নেই। তার কী নাম তাও কেউ বলে না। ঘাগরা পরা, মাথায় বেণী ঝোলে, চুপি চুপি আসে, দাঁড়িয়ে থাকে, খাওয়ার সময় অপেক্ষা করে। তারপর এঁটো বাসনগুলো নিয়ে চলে যায়। আর বিরক্ত করে না। বাঁদীটা সামনে না-এলেই মরালীর ভালো লাগে।

গুলসন কিন্তু সেই তখনই এসেছিল। সেই কান্ত চলে যাবার পরই।

এসেই বলেছিল—কী হলো? কে এসেছিল? সত্যিই তোমার কোনো জানা-শোনা লোক নাকি ভাই?

তারপর মরালীর মুখের দিকে চেয়ে বলেছিল—এ কি ভাই, তুমি কাঁদছো নাকি?

বলে নিজের ওড়নী দিয়ে মরালীর চোখ-মুখ মুছিয়ে দিয়েছিল।

মরালী বলেছিল—তুমি যাও, শেষকালে কেউ দেখে ফেললে তোমাকেই হয়তো কষ্ট দেবে ওরা। তখন আবার তম্বি করবে!

—হুঁ, তম্বি করবে। তম্বি অম্নি করলেই হলো কি না। প্রথম-প্রথম আমিও তোমার মতন ভয় পেতাম। আমিও তোমার মতন কাঁদতাম! শেষে মরীয়া হয়ে উঠলাম। ভাবলাম জীবনটা যখন নষ্টই হয়ে গেছে তখন কাকে আর ভয় করতে যাবো! আমাকে চোখে-চোখে রাখতো, আরক খেতে দিতে চাইতো! শেষকালে ভাই একদিন আর পারলাম না, আরক খেলাম!

—খেলে?

—হ্যাঁ, এখনো খাই, রোজ খাই। রোজ না-খেলে চলে না। না-খেলে ভাই আমার মাথা ঘোরে, গা বমিবমি করে। এখন একেবারে নেশা ধরে গেছে।

—কিন্তু তুমিই তো বলেছিলে ওতে সাপের বিষ মেশানো থাকে!

—তা থাকুক, সাপের চেয়েও কত বড় বড় জানোয়ারের ছোবল খাচ্ছি, সাপ তো তার কাছে তুচ্ছ! তুমিও ছোবল খাবে। তুমি তো ভাই এখন সবে মাত্তোর এসেছো, কিছুদিন থাকো এখেনে, তখন সব টের পাবে—

বলেই বললে—না না, তোমার ভয় পাবার কিছু নেই, আমি যখন আছি, তখন তোমার কিছুছু ভয় পাবার নেই—আমি তোমাকে ঠিক বাঁচিয়ে দেবো। তুমি কিন্তু ভাই কথা দাও আরক খাবে না তুমি, মোটে আরক ছোঁবে না?

মরালী বললে—তুমি যখন এত বলছো, তখন কেন ও-বিষ খেতে যাবো?

—হ্যাঁ ভাই, খেও না। ও বিষই বটে! সারাফত আলির ওই বিষেরই ব্যবসা। আমরা একবার বিষ খেয়ে ফেলেছি, তাই আর উপায় নেই। এখন মরে গেলেও আর ছাড়তে পারবো না—

মরালী বললে—তাহলে আমি কী করবো বলো তো?

গুলসন বললে—আমি তো তোমাকে বলেছি, আমি যখন আছি, তখন তোমার কোনো ভয় নেই! কিন্তু ও-লোকটা কে? কাকে নজর মহম্মদ ভেতরে নিয়ে এসেছিল? কী মতলব ওর?

মরালী খানিকক্ষণ চুপ করে রইলো। কী জবাব দেবে সে?

—ও বুঝেছি, ওই নজর মহম্মদ ওকে নিয়ে এসেছিল তোমার কাছে, তোমাকে যাচাই করতে, না? এই রকম করেই ওরা যাচাই করে মেয়েদের। একবার যদি ওদের কথায় ভাই ভুলে যাও তো গেলে তুমি!

—কী করবে তাহলে?

—তখন আর তোমার রক্ষে নেই। তখন ওরা দুহাতে টাকা লুটবে। একেবারে দুহাতে টাকা লুটবে। শহর থেকে সব বদমাইস মরদদের এনে তোমার ঘরে ঢুকিয়ে দেবে, তোমার ঘরে তাদের বসাতে হবে, তাদের খাতির করতে হবে—তুমি তখন ইচ্ছে না-করলেও কোনো উপায় থাকবে না।

—তা এতগুলো বেগম নিয়ে নবাবের কী লাভ?

গুলসন বললে—লাভ নয়? আজ এটা, কাল সেটা, এমনি করেই সকলকে চেখে-চেখে বেড়াবে—

—কিন্তু নবাবের সময় কখন? নবাব কি এই চেহেল্-সুতুনের ভেতরে আসে?

গুলসন বললে—নবাবের মাথায় হাজারটা ঝামেলা, নবাবের সময় না-থাকলেই বা, তার ইয়াররা তো আছে! তার ইয়ারদের জ্বালাতেই তো আমরা অস্থির! কাজীর চেয়ে যে প্যায়দার হুমকি বেশি এখেনে!

মরালী বললে—আমি সেই সব ভেবে-ভেবে একেবারে ভয়ে জড়ো-সড়ো হয়ে আছি। আমি তো বাইরে থেকে এসব টের পাইনি। আমি জানতুম এখানে বুঝি তোমরা খুব আরামে থাকো!

—আরাম না ছাই! কত বেগম এখানে গলায় দড়ি দিয়েছে তা জানো?

—ওমা, তাই নাকি?

—তা দেবে না? আমারই তো মাঝে-মাঝে গলায় দড়ি দিতে ইচ্ছে করে। আগেকার এক নবাবের পনেরো শ' বেগম ছিল, তা জানো? পনেরো শ' বেগম আর একজন মাত্তোর নবাব। ভাবো তো ভাই অবস্থাটা কী!

—তা নবাব কী করে সামলাতো অতগুলো বেগমকে?

—সামলাবার কী আছে? ওই যেমন তোমার কাছে বাইরে থেকে লোক নিয়ে এসেছিল নজর মহম্মদ, তেমনি তাদের কাছেও বাইরে থেকে লোক আসতো। ঘেন্নার কথা বলবো কী ভাই, এখেনে এসে পর্যন্ত যে কত কান্ড দেখেছি কী বলবো। এখেনে রোজ আঁতুড় হচ্ছে আর রোজ আঁতুড় উঠছে। এখানকার মেথররা তাই নিয়ে গিয়ে বাইরে ফেলে দিচ্ছে—

—বাইরে কোথায় ফেলে?

—ফেলবার কি আর জায়গার অভাব আছে এদের। কাছেই গঙ্গা রয়েছে, দেয় তাতে ভাসিয়ে। মা-গঙ্গাকে যে কত সহ্য করতে হয়, তা তুমি যদি হিন্দু

হতে তো বুঝতে পারতে! আর কাগ্-চিল-শকুনের কি অভাব আছে শহরে?

মরালীর মুখ দিয়ে ছি-ছি শব্দ বেরিয়ে এল।

বললে—তা হলে আমি কী করবো বলো তো ভাই? আবার যদি ওই লোকটাকে নিয়ে আসে নজর মহম্মদ? আবার যদি আরক খাওয়াতে আসে?

গুলসন একটু চুপ করে রইলো। তারপর বললে—তোমার মরতে ভয় করে?

মরালী বললে—মরতে ভয় করবে না? কী বলছো তুমি? মরতে কার না ভয় করে?

—না, আমি তা বলছিনে! বলছি যদি তোমার সাহস থাকে তো নানীবেগমকে গিয়ে সব বলে দিতে পারো।

—নানীবেগমের কাছে যাবো কী করে?

—সে আমি সব ব্যবস্থা করে দেবো। নজর মহম্মদ, বরকত আলি, পীরালি খাঁ ওরা কেউ জানতে পারবে না, আমি তোমাকে লুকিয়ে-লুকিয়ে নিয়ে যাবো।

—কিন্তু গিয়ে তাকে কী বলবো?

—তুমি বলবে যে খোজারা তোমাকে কেবল আরক খাওয়াতে চেষ্টা করছে, বাইরের লোকদের এনে তোমার ঘরে ঢোকাচ্ছে, এই সব বলবে!

—কিন্তু খোজারা যদি জানতে পারে? তারা আমার ওপর রেগে যাবে না?

—সেই জন্যেই তো বলছিলুম তোমার মরতে ভয় করে?

—কেন? জানতে পারলে আমাকে মেরে ফেলবে নাকি?

—ওমা, তা মারবে না? তুমি তাদের নামে নালিশ করবে আর তারা মুখ বুজে সব সইবে? কত মেয়েকে ওরা ওই রকম মেরে ফেলেছে যে।

—তা কেউ কিছু বলে না ওদের? ওদের ধরে কেউ গারদে পোরে না?

গুলসন বললে—তা হলে তুমি এতক্ষণ ছাই বুঝেছো, ওরাই তো হলো এখানকার সব! ওরাই তো এই সব চালাচ্ছে। ওরা খুশী থাকলে তোমাকে একেবারে নবাবের খাস বেগম করে দিতে পারে। একেবারে লুৎফুন্নিসা বেগমকে হটিয়ে দিয়ে তোমাকে নবাবের কোলে বসিয়ে দিতে পারে। ওদের এত ক্ষেমতা।

মরালী বললে—তাহলে নানীবেগমের কাছে নালিশ করলে তো আমারই ক্ষতি—

—সে ভাই তুমি যা ভালো বোঝ করো! এ হলো সেই শাঁখের করাত—দুদিকেই কাটে। এগোলেও নির্বংশের বেটী, পেছলেও নির্বংশের বেটী। আমাদের হয়েছে তাই, তাই তো আমরা মুখ বুজে সব সহ্য করি আর বিষ খাই। তা যদি বলো তো বিষই খাও—

মরালী বললে—না, তবু একবার নানীবেগমের কাছে গিয়েই দেখি না। গেলে তো আমার গলাটা আর কেটে দেবে না। কেউ না-জানতে পারলেই হলো! তারপর যদি ভালো বুঝি তো বলবো! তা আমি যে এখেনে এসেছি তা জানে তো নানীবেগম?

—কে আর জানাবে! জানে না বলেই তো তোমাকে এখেনে একটেরে লুকিয়ে রেখে দিয়েছে। পাছে নানীবেগম জানতে পারে। নানীবেগম জানতে পারলেই ওদের জিজ্ঞেস করবে কে তুমি, কোত্থেকে এলে, কবে এখানে এলে; হেন-তেন সব কথার জবাবও ওরা দিতে পারবে না—

—তা নানীবেগম কি এখানকার সবাইকে চেনে?

—সবাইকে চেনে। শুধু তোমাকেই এখনো দেখেনি। আগে তো এখেনে

অনেক বেগম ছিল। সব একে-একে দূর হয়েছে। বুড়ী হয়ে গেলে তাদের খোজারা বাইরে তাড়িয়ে দিয়ে আসে। যতদিন জোয়ান বয়েস থাকে তদ্দিনই খাতির। নানীবেগম না-থাকলে আরো কত জোয়ান মেয়ে আসতো।

—এখন ক'জন বেগম আছে?

—তা ভাই গুনে দেখিনি। গোনা যায় না।

তারপর একটু থেমে বললে—তা এখন যাবে তুমি নানীবেগমের কাছে? এখন তো অনেক রাত, এখন গেলে কেউ দেখতে পাবে না, আমি তোমাকে নিয়ে যেতে পারি—

মরালী বললে—কিছু মনে করবে না তো?

—না, মনে আবার করবে কী!

—কিন্তু এখন কি জেগে আছে নানীবেগম?

—রাত্তিরে প্রায় ঘুমোয়ই না নানীবেগম! আর আজ তো জুম্মাবার। জুম্মাবারে সারা দিন কোরাণ পড়ে, মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়ে এসে ঘরে বসে কোরাণ পড়ে খালি। আর পাশে থাকে নবাবের বিবি লুৎফুন্নিসা বেগম—। তোমার কিছ্ছু ভয় নেই। আমি তোমাকে দূর থেকে ঘরটা দেখিয়ে দেবো, তুমি ঢুকে পড়ে কুর্নিশ করবে। তারপর যা-যা জিজ্ঞেস করবে বলবে—

মনে আছে, সেদিনই প্রথম গুলসন এক অদ্ভূত পথ দিয়ে নিয়ে গিয়েছিল মরালীকে। সে-সব পথ সকলে জানে না। গুলসন মেয়েটা এ-মহলের কানাচ দিয়ে ও-মহলের পেছন দিয়ে, কোথা দিয়ে কোথায় নিয়ে চলেছিল তার কিছুই বোঝা যাচ্ছিল না। সব যেন ঝাপ্‌সা। চারদিকে যেন ফিস্‌ফিস্‌ শব্দ। চারদিকে যেন সবাই ফিস্‌ফিস্‌ করে ষড়যন্ত্র করছে। কোথাও কান্না, কোথাও হাসি, কোথাও বিদ্রূপ, কোথাও খোসামোদ। হাসি, কান্না, বিদ্রূপ, খোসামোদ নিয়েই যেন চেহেল্‌-সুতুনের কারবার। চেহেল্‌-সুতুন অনেক দেখেছে, অনেক ভুগেছে, অনেক লজ্জা পেয়েছে, আবার অনেক ভয়ও পেয়েছে। তবু যেন তার দেখা, ভোগা, লজ্জা পাওয়া আর ভয় পাওয়ার তখনো শেষ হয়নি। শেষ পরিচ্ছেদটা দেখবার জন্যেই বুঝি তখন মরালীকে আনতে হয়েছে তার ভেতর। মরালীই বুঝি চেহেল্‌-সুতুনের শেষ পরিচ্ছেদের শেষ জিজ্ঞাসার চিহ্ন।

চলতে চলতে হঠাৎ কোথায় কী একটা শব্দ হলো। সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠেছে গুলসন। গুলসন বললে—শিগ্‌গির এদিকে চলে এস ভাই, পীরালি খাঁ...

বলেই গুলসন পাশের দিকে সরে পড়লো। মরালীও সঙ্গে সঙ্গে পেছনে পেছনে গেল। এত নিঃশব্দে কান্ডটা ঘটলো যে কারো জানবার কথা নয়। মরালী লক্ষ করলে পাশ দিয়ে পীরালি খাঁ চলে গেল, টেরও পেল না কিছু। তারপর সেই আড়ালটা থেকে বেরিয়ে চারদিকে চেয়ে দেখলে। কোথায় গেল গুলসন! ডাকতেও ভরসা হলো না। যদি খোজারা শুনতে পায়। আসবার সময় মরালী নিজের ঘর অন্ধকার করে রেখে এসেছিল। সবাই জানবে মরিয়ম বেগম ঘুমিয়ে পড়েছে। মরালী পাশের একটা সরু গলির মধ্যে ঢুকে পড়লো। গুলসন বোধহয় তারই মধ্যে আছে। কিন্তু গলিটার যেন আর শেষ নেই। গলিটা যতদূর গিয়েছে ততদূর গেল মরালী। সেখানেও যেন শেষ নয় গলিটার। সেদিকেও এগিয়ে যেতে লাগলো মরালী। তারপরেও যেন গলিটা আছে। আরো অনেক দূর গেলেই যেন বেরোবার রাস্তা পাওয়া যাবে। মরালী আরো এগিয়ে চললো। আরো আরো। আরো অনেক দূর। শেষকালে পা ব্যথা করতে লাগলো। এ কোথায়

এসে পড়লো সে। কোনদিকে এর শুরু কোনদিকে এর শেষ! কোথায় এনে ফেললে তাকে গুলসন! একবার ভাবলে গুলসনের নাম ধরে ডাকে। আবার ভয়ও করতে লাগলো। যদি কেউ টের পায়। যদি কেউ জানতে পারে। মরালী সমস্ত রাত ধরে কেবল ছট্‌ফট্‌ করতে লাগলো সেখানে ঘুরে ঘুরে। চিৎকার করবার উপায় নেই, পালাবার উপায় নেই, সাহায্য পাবারও উপায় নেই। সে এক অমানুষিক যন্ত্রণা। সমস্ত হাতিয়াগড়টাই যেন সে ঘুরে ঘুরে হয়রাণ হয়ে গেল। তারপর এক সময় আর পারলে না। সেখানেই বসে পড়লো। তারপর একেবারে সেই ঠান্ডা পাথরের মেঝের ওপরটাতে লুটিয়ে পড়লো। তখন আর তার জ্ঞান নেই...

পরের দিন সকাল বেলা গুলসনই এসে ডাকলে।

মরালী চেয়ে দেখে চিনতে পারলে। বললে—আমি কোথায় আছি ভাই?

গুলসন বললে—আমি তোমাকে বললুম আমার সঙ্গে আসতে, তুমি কোন-দিকে চলে গেলে বুঝতে পারলুম না—ভাবলুম বোধহয় তোমার নিজের ঘরেই গিয়েছো, সেখানেও নেই। আমি তো ভয় পেয়ে গিয়েছিলুম। শেষকালে মনে সন্দেহ হলো। ভাবলাম একবার ভুল-ভুলাইয়াটা দেখে আসি—

—ভুল-ভুলাইয়া?

—ভুল-ভুলাইয়া মানে যাকে আমরা বলি গোলক-ধাঁধা। শেষকালে তুমি ভয় পেয়ে ভুল-ভুলাইয়ার মধ্যে ঢুকে পড়েছিলে! ভাগ্যিস আমি দেখতে পেলাম।

তারপর মরালীকে ধরে তুলে বললে—চলো, চলো, এখনো কেউ কিছু টের পায়নি—কী সব্বোনাশ হতো বল দিকিনি—

বলে মরালীর ঘরে এনে পৌঁছিয়ে দিয়ে গেল চুপি চুপি। বললে—রাত্তিরে আবার আসবো ভাই। আজ ঠিক তৈরি থেকো, নানীবেগমের কাছে নিয়ে যাবো—আমি এখন যাই—বুঝলে—

সমস্ত রাত ঘুম হয়নি মরালীর। আর ঘুমের ঘোরেই কেটে গেল দিনটা। নজর মহম্মদ বোধহয় একবার ঘরে এসেছিল। কিন্তু ঘুমোচ্ছে দেখে কিছু বলেনি। বাঁদীটাও এসে গোসলখানায় নিয়ে যেতে চেয়েছিল। চান করিয়ে চুল বেঁধে দিতে চেয়েছিল। খাবার এনে মাথার কাছে রেখেছিল। মরালী সারাদিন ওঠেনি, চান করেনি, চুল বাঁধেনি, খায়নি। কিছুই করেনি। কেবল নিজের মনেই আকাশ-পাতাল ভেবেছিল। এ কী রকম ভুল-ভুলাইয়া। তার জীবনটার মতই যেন ভুল-ভুলাইয়ার জালে জড়িয়ে পড়েছিল সে। কোথায় হাতিয়াগড় আর কোথায় এই ভুল-ভুলাইয়ার গোলকধাঁধা। একদিনের মধ্যে যেন সমস্ত জীবনটা তার গোলকধাঁধায় জড়িয়ে গেল।

আবার অনেক রাত্রের দিকে চুপি চুপি গুলসন এসে হাজির। বললে—চলো ভাই, আজ যেন আর রাস্তা ভুলে যেও না, আমার হাত ধরে থাকবে—

বলে বেরোতে যাবার মুখেই হঠাৎ চারদিকে একটা তুমুল সোরগোল উঠলো। চেহেল্-সুতুনের বাইরে যেন হাজার-হাজার মানুষের চিৎকার শোনা গেল। নবাব মীর্জা মহম্মদ সিরাজ-উ-দ্দৌলা হেবাৎ জং শা-কুলি-খান বাহাদুর আলমগীর কি ফতে—

আর সঙ্গে সঙ্গে দুম-দাম শব্দে আতস্ বাজি ফুটতে লাগলো। হাউই-বাজি আকাশের গায়ে উঠে গিয়ে ফুলঝুরি ফুটিয়ে তুলতে লাগলো। চেহেল্-সুতুনের ভেতরেও যেন দৌড়োদৌড়ি শুরু হলো। যারা ঘুমিয়ে পড়েছিল তারা জেগে উঠেছে। জেগে উঠে বাইরে এসে আকাশের দিকে চেয়ে দেখতে লাগলো। নহবত-

খানায় ইনসাফ মিঞা মুলতান রাগে সুর ধরলো। ছোট সাগ্‌রেদ ডুগি-তবলায় চাঁটি দিয়ে বলে উঠলো—বহোৎ আচ্ছা মিঞাসাব—বহোৎ আচ্ছা—

চেঁচামেচি শুনেই গুলসন মরালীর হাতটা ছেড়ে দিয়েছে। খানিকক্ষণ কান পেতে রইলো বাইরের দিকে। তারপর বললে—সব্বোনাশ হয়েছে ভাই, নবাব ফিরে এসেছে—তুমি দরজায় খিল দিয়ে শুয়ে পড়ো, আমি যাই এখন—

বলে নিঃশব্দে পাশের গুপ্ত দরজা দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

মধুসূদন কর্মকারের দোকানের পেছন দিকে সরখেল মশাই তখন নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। মোল্লাহাটি নিঃঝুম হয়ে এসেছে। সেই সকালে এসে পর্যন্ত অনেক খাতির করেছে সরখেল মশাই। বলেছে—এ মোল্লাহাটিতে আর কীই বা খাবার জিনিস আছে, একবার দয়া করে যাবেন আমাদের কেষ্টনগরে, এমন সরভাজা খাওয়াবো যে ভুলতে পারবেন না—

সারাদিনই খাবার গল্প করেছে। নিজের হাতে রান্না করেছে। কিন্তু হাতের পুঁটলিটা একবারও হাত-ছাড়া করেনি। বড় সাবধানী মানুষ সরখেল মশাই।

রাত্তির বেলা সরখেল মশাই-এর নাক ডেকে উঠতেই কান্ত আস্তে আস্তে উঠলো। পুঁটলিটাকে বালিশ করেই শুয়েছিল সরখেল মশাই। কিন্তু ঘুমের ঘোরে বালিশ থেকে মাথা সরে গেছে।

কান্ত আস্তে আস্তে পুঁটলিটা টেনে নিয়ে তার ভেতরে হাত পুরে দিলে। ওপরেই ছিল তেল-চিট্‌চিটে গামছাখানা। তার নিচে একটা ফেরো ঘটি। তার নিচে পানের ডিবে। চক্‌মকি পাথর একটা। তার নিচেয় খড়মজোড়া। একে একে সবগুলো বার করলে। বশীর মিঞা বলেছিল চিঠি একটা থাকবেই। হাতিয়াগড়ের রাজার নিজের হাতে লেখা চিঠি। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকে লেখা। জরুরী।

বাইরে কোথায় একটা কুকুর ঘেউ-ঘেউ করে ডেকে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে ভয় পেয়ে সরে আসতে গিয়েই পানের ডিবেটা হাত থেকে পড়ে গিয়ে ঝন-ঝন আওয়াজ করে উঠলো।

কিন্তু না, সরখেল মশাইএর ঘুম বড় গাঢ়। একবার শুধু পাশ ফিরে শুলো। ঘুমের ঘোরে পুঁটলিটার কথা আর মনেও পড়লো না।

কান্তর কেমন মনে হতে লাগলো এ সে করছে কী! চাকরির জন্যে চুরি করতে যাচ্ছে সে! পুঁটলিটার তলার দিকে একটা চিঠি বেশ ভাঁজ করে রাখা। সেখানা নিতে গিয়েও কেমন হাতটা কেঁপে উঠলো তার। কেন সে চিঠিটা চুরি করবে! বশীর বলেছে নবাবের কাজ। নবাব মানেই ভগবান। যে ভগবানকে সে রোজ ডাকে সেই ভগবানই কি নবাব। ভগবান তো কোনো অন্যায় করে না। কিন্তু নবাব কেন অন্যায় করে। কেন হাতিয়াগড়ের রাণীবিবিকে নিজের চেহেল্‌-সুতুনে নিয়ে আসে ভোগের জন্যে! নবাবের রাজত্বে কেন এত অত্যাচার! সারাফত আলি তাহলে কেন হাজি আহম্মদের বংশকে দিনরাত অভিশাপ দেয়!

কিন্তু আবার মনে হলো, নবাব যদি অত্যাচার করে তো তার ফল ভোগ করবে নবাবই। সে কেন অন্যায় করবে। তার অন্যায়ের ফল ভোগ তো তাকেই করতে হবে।

বাইরে কুকুরটা আবার ডেকে উঠলো।

কিন্তু না, এবার সরখেল মশাই আর পাশ ফিরলো না। কান্ত আস্তে আস্তে ভাঁজ করা কাগজটা হাত ঢুকিয়ে নিয়ে নিলে। বাইরের দাওয়ায় মালসায় ঘুঁটের আগুন জ্বলছিল। সেখানে এসে দাঁড়ালো। সামনেই মুর্শিদাবাদের রাস্তাটা সোজা চলে গিয়েছে। এত রাত্রে রাস্তায় বেরোতে ভয় করতে লাগলো। চিঠিটা নিয়ে হাতের মুঠোয় রাখলে। তারপর নিজের পুঁটলিতে পুরলো। আর একটু ভোর হলেই এখান থেকে হাঁটা দিতে হবে। মধুসূদন কর্মকার ওঠবার আগেই।

কিন্তু একটা অদ্ভুত ইচ্ছে সমস্ত মনকে আচ্ছন্ন করে দিলে। চিঠিটার ভেতর কী লিখেছে হাতিয়াগড়ের রাজা! কী এমন লিখেছে যার জন্যে তাকে পাঠাতে হলো এই মোল্লাহাটিতে!

চারদিক নিঃসাড়। কান্ত আগুনের মাল্‌সাটার কাছে এল। তারপর চিঠিটা বার করলে পুঁটলি থেকে। তারপর ভাঁজ খুলে সেই অল্প আলোয় পড়তে লাগলো—

শ্রীল শ্রীযুক্ত নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার

নৃপতিবরেষু—

আপনার পত্রবাহক মারফৎ আপনার পত্রটি পাইলাম। আপনি যে দোষে আমাকে দোষান্বিত করিয়াছেন আমি সে-দোষে দুষ্ট নহি। আমিও আপনার মতই নবাবের পতনাকাঙ্ক্ষী! আপনার মতই আমিও মনে-প্রাণে নবাবের নিপাত কামনা করি। অপিচ আপনার শরণাপন্ন হইয়া আমি আমার এই অভিপ্রায়ই ব্যক্ত করিয়াছিলাম। কিন্তু আপনি ভুল শুনিয়াছেন। আসলে আমি আমার প্রাণাধিকা পত্নীকে নবাবের চেহেল্‌-সুতুনে পাঠাই নাই। বরং তাহাকে হত্যা করাই শ্রেয় মনে করিয়া তাহাই সাধন করিয়াছি। আমার পত্নী আর ইহ-জগতে নাই জানিবেন। হাতিয়াগড়ের মর্যাদা রক্ষার্থে নিজ পত্নীকে হত্যা করা উপযুক্ত কর্ম বিধায় তাহা সাধন করিতে দ্বিধা করি নাই। তবে নবাবের রোষভাজন না-হওনের জন্য কিঞ্চিৎ ছল-চাতুরীর আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছি। আমার নফর শোভারাম বিশ্বাসের বিবাহিতা কন্যাকে তাহার পরিবর্তে পাঠাইয়াছি। এই স্বকৃত পাপের জন্য ঈশ্বর আমাকে ক্ষমা করিবেন কিনা জানি না। তবে যাহা করিয়াছি তাহা স্বীয় দেশের মুখ চাহিয়াই করিয়াছি। যদি ঈশ্বর আমাদিগের সহায় হন তাহা হইলে নবাবের অপরাধের প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়া একদিন এই স্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব প্রতিজ্ঞা করিতে মনস্থ করিলাম। অলমিতি বিস্তরেণ—

ভবদীয়...

চিঠিটা পড়তে পড়তে কান্তর হাতটা থর থর করে কাঁপতে লাগলো। তাহলে সত্যিই সেই রাণীবিবিকে সে আনেনি, মরালীকে সঙ্গে করে এনেছিল সেদিন। তাহলে কাটোয়ার সরাইখানাতে মরালীর সঙ্গেই কথা বলেছিল। চেহেল্‌-সুতুনের ভেতরে গিয়ে তাহলে মরালীর সঙ্গেই দেখা করেছিল। মোল্লাহাটির সেই মধুসূদন কর্মকারের দোকানের দাওয়ায় বসে সেই রাত্রেই যেন নিজের সমস্ত জীবনটা সে পরিক্রমা করে এল!

কান্ত দাঁড়িয়ে উঠলো।

তারপর ঘরের ভেতরে ঢুকে দেখলে সরখেল মশাই তখনো নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। পাশেই তার পুঁটলিটা পড়ে আছে ঠিক তেমনি ভাবে। কান্ত আস্তে আস্তে আবার সব জিনিসগুলি বার করলে। গামছা, পানের ডিবে, চক্‌মকি-পাথর, খড়ম-জোড়া। ভাঁজকরা চিঠিখানা ভেতরে যেমন ছিল তেমনি রেখে দিয়ে সব

জিনিসগুলো আবার একটার পর একটা সাজিয়ে রাখলে। তারপর বাইরের দাওয়ায় এসে বসে তারা-ভরা আকাশটার দিকে চেয়ে রইলো। আমাকে তুমি শাস্তি দিও ভগবান। আমি নবাবের কাজে অবহেলা করলাম, আমি হুকুম তামিল করতে পারলাম না, তার জন্যে তুমি আমাকে মার্জনা করো না। আমি পাপ করলাম, এ চিঠি আমি বশীর মিঞার হাতে তুলে দিতে পারবো না। এর জন্যে যা শাস্তি তুমি আমাকে দেবে সব আমি মাথা পেতে নেবো। অপরাধ হলেও কিন্তু এ আমার অজ্ঞাত অপরাধ। আমার অপরাধের জন্যে মরালীর যেন কোনো ক্ষতি না হয়। মরালীর যেন ধর্ম নষ্ট না হয়। মরালী যেন চেহেল্-সুতুনের কয়েদখানা থেকে সসম্মানে মুক্তি পায়। তাকে তুমি দেখো ভগবান, তাকে তুমি রক্ষে করো।

তারপর সেই নিঃশব্দ নিঃসীম রাত্রির তারা-ভরা আকাশের অদৃশ্য দেবতাকে উদ্দেশ করে কান্ত বার বার দুই হাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে প্রণাম করতে লাগলো। মরালীর যেন কোনো অনিষ্ট না হয় ভগবান, কোনো অনিষ্ট না হয়।

খানিক পরেই আবার এল গুলসন। চারদিকে তখন বেশ ব্যস্ততা। সমস্ত চেহেল্-সুতুনে বেশ সাড়া পড়ে গেছে। সাজ সাজ রব উঠে গেছে মহলে মহলে। নানীবেগমের ঘরেও খবরটা দিয়ে এসেছিল পীরালি খাঁ।

কলকাতার লড়াই ফতেহ্ করে এসেছে নবাব। সঙ্গে এনেছে হল্‌ওয়েল সাহেবকে। উমিচাঁদ, রাজবল্লভ, কৃষ্ণবল্লভ, সবাইকে।

—তাদের কোথায় এনে রেখেছে?

পীরালি বললে—মতিঝিল-এ, বেগমসাহেবা! নেয়ামতের কাছে খবর পেয়েছি—

—চেহেল্-সুতুনে আসবে না মির্জা?

—মালুম নেই বেগমসাহেবা!

কেউ জানে না নবাবের কী মর্জি। খোদাও বলতে পারে না নবাবের কী মতিগতি। কিন্তু তা না বলতে পারুক, তৈরি থাকতেই হবে সকলকে। সকলকে সেজে-গুজে আসর গুলজার করবার জন্যে তৈরি থাকতে হবে। কিংবা হয়তো কারোর ডাক পড়বে। হয় তক্কি বেগম, নয় বব্বু বেগম, নয় গুলসন বেগম। যার ডাক পড়বে সে সেদিন বড় ভাগ্যবতী। তার ভাগ্য এক রাত্রের জন্যে ফিরে যাবে। নবাবকে যদি খুশী করতে পারে, তা সে যে-কোনো ভাবেই হোক, হয় গান শুনিয়ে, নয় বীণ বাজিয়ে, নয় তো বা নেচে, তার হাতে আকাশের চাঁদ নেমে আসতে পারে। সবই নির্ভর করছে নসীবের ওপর। চেহেল্-সুতুনে যখন যার নসীব খুলেছে সে রাতারাতি মুর্শিদাবাদের মসনদ পেয়ে গেছে। আগে একবার পেয়েছিল ফৈজি বেগম। একটা মুঠোর মধ্যে ধরা যেত তার কোমরটা। তার একটা কথায় মুর্শিদাবাদের যে-কোনো মানুষের গর্দান যেত। আলীবর্দীর আমলেও ফৈজির মুখের কথাই ছিল নবাবের মুখের কথা। ফৈজির জন্যে তাঞ্জাম তৈরি থাকবে দিনরাত। সে যেখানে খুশী যাবে, যেখানে খুশী বেড়াবে, তার জন্যে কাউকে কৈফিয়ৎ দেবার পরোয়া ছিল না তার। কিন্তু বড় বাড় বেড়েছিল সে। মুখের ওপর যাকে-তাকে যা-তা বলতো। নবাবের মুখেও একদিন যা-তা বলে বসলো ফৈজি! সেদিন উঠ্‌তি নবাবজাদা সে অপমান আর সহ্য করেনি।

—ওই যে দেখছো উঠোনের ওপাশে ওই ঘরটা—?

মরালী দেখেছিল সেটা। উঠোনের উল্টো দিকে একটা ছোট ঘর। দরজা নেই, জানালা নেই, ঘুলঘুলি নেই, কিছু নেই, চারদিক থেকে ইঁট দিয়ে থরে থরে গাঁথা। দেখলেই মনে হয় যেন চেহেল্-সুতুনের একটা আর্তনাদ ওখানে বোবা হয়ে বন্দী হয়ে রয়েছে। জলে রোদে শীতে সে আর্তনাদ বছরের পর বছরের পরিক্রমায় নির্জীব নিষ্প্রাণ হয়ে পাথরে পরিণত হয়েছে।

—ওই-ই তো ফৈজি! নবাবজাদা রাগ করে একদিন ফৈজিকে ওইখানে রাজ-মিস্ত্রী ডেকে ইঁট দিয়ে চারদিক থেকে গেঁথে দিয়েছিল।

—কেন?

—নবাবের মা-তুলে কথা বলেছিল যে সে। মরালী বললে—তা নবাবের মা'ও ওই রকম নাকি?

গুলসন বললে—সবাই-ই তো ওইরকম। বাদটা কে আছে? নানীবেগমের মেয়েরা কেউ ভালো নয়, জানো। একটা করে রাত কাটাবার লোক কারোর বাকি নেই। জামাইরা সব বাইরে বাইরে ষড়যন্ত্র করে বেড়াচ্ছে, কার কাছ থেকে টাকা মেরে দেওয়া যায় সেই চেষ্টা করছে, আর মেয়েরা বাড়ির ভেতর বসে ওই করছে! বড় জামাই নওয়াজেস্ মহম্মদ সাহেব তো কেবল এই মুর্শিদাবাদেই পড়ে থাকতো শ্বশুরের কাছে, আর মেয়ে পড়ে থাকতো ঢাকায়, সেখানকার দেওয়ানের সঙ্গে তার লটঘটি চলতো—

—কে দেওয়ান?

—ওই যে কেষ্টবল্লভের বাবা রাজা রাজবল্লভ! যাকে কলকাতা থেকে ধরে নিয়ে এসেছে নবাব। সেই বড় মেয়েই তো হলো সবকিছুর মূল। তাকেই তো ধরে রেখেছে এখেনে। কারোর সঙ্গে কথা বলতে দেয় না, ঘরের বাইরে বেরোতে দেয় না,—নবাবজাদী হওয়ার এই তো সুখ!

গুলসন মেয়েটা অনেক রাতে লুকিয়ে লুকিয়ে আসতো আর চুপি চুপি অনেক কথা গল্প করতো! বোধ হয় নেশা করতো। নেশার ঘোরে আর চুপ করে থাকতে পারতো না। মরালীর বিছানায় শুয়ে শুয়ে অন্ধকারে মরালীকেই জড়িয়ে ধরতো। মরালীকে আদর করতো। গালে মুখে ঠোঁটে চুমু খেতো। আদরে আদরে একেবারে ভাসিয়ে দিত মরালীকে। বলতো—তোমায় আদর করছি বলে কিছু যেন মনে কোর না ভাই—

মরালী গুলসনের আদরে আদরে আড়ষ্ট হয়ে উঠতো।

গুলসন বলতো—তুমি যদি বেটাছেলে হতে তো খুব ভালো হতো ভাই, দুজনে বেশ একসঙ্গে এমনি করে জড়াজড়ি করে শুয়ে থাকতুম—

মরালী প্রথম প্রথম লজ্জায় কিছু বলতে পারতো না। নতুন জায়গায় এসেছে, তখনো কারোর সঙ্গে জানাশোনা হয়নি, কেমন যেন ভয়-ভয় করতো কিছু বলতে।

একদিন আর পারলে না, গুলসনকে ঠেলে সরিয়ে দিলে। বললে—তুমি নেশা করেছো, আমার কাছ থেকে চলে যাও—

গুলসন কিছু কথা বললে না। গুম হয়ে মাথা নিচু করে রইলো। তারপর বললে—ঠিক আছে, আমি আর তোমার কাছে আসবো না—আমি চললুম—

অল্প আলোয় মরালী দেখলে গুলসনের চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল পড়ছে। মনে বড় কষ্ট হলো। এমন করে কষ্ট দেওয়া উচিত হয়নি মেয়েটাকে। কাছে গিয়ে বললে—তুমি কেঁদো না ভাই, আমি বুঝতে পারিনি—

গুলসন মরালীর হাতটা ছাড়িয়ে নিলে। তার বোধ হয় তখন চৈতন্য হয়েছে। একেবারে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো। বললে—তুমি ঠিক করেছো ভাই, আমাকে তুমি তাড়িয়ে দিয়ে ভালোই করলে—আমি আর আসবো না তোমার কাছে—কথা দিচ্ছি আর আসবো না—

বলে চলেই যাচ্ছিল। কিন্তু মরালী তবু ছাড়লো না। বললে—কিন্তু তুমি কাঁদছো কেন?

গুলসন বললে—তুমি যদি ভাই আমাদের কষ্টটা জানতে তো আজকে আমাকে এমন করে অপমান করতে পারতে না—তা অপমান করেছো ভালোই করেছো। আমার আগেই জানা উচিত ছিল—তুমি মুসলমান আর আমি হিন্দু মেয়ে—

মরালী বললে—ছি ছি, তুমিও শেষকালে আমাকে ভুল বুঝলে? আমি কি তাই বলেছি—?

গুলসন বললে—না ভাই, আমি ঠিক বুঝতে পারিনি। এই চেহেল্-সুতুনের ভেতরে থেকে থেকে আমি একেবারে পাথর হয়ে গেছি। তাই ভালবাসার কাউকে পেলে একেবারে বত্তে যাই আমরা, কেউ ভালবাসলেও আমরা কিতার্থ হয়ে যাই—কিন্তু তুমি আমায় ঠিক শিক্ষা দিয়েছো, আমি আর এমন কাজ কখ্খনো করবো না—

বলতে বলতে সেই যে ফস্ করে গুলসন চলে গিয়েছিল আর আসেনি। একদিন নানীবেগমের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে দুজনে চলতে গিয়ে ভুল-ভুলাইয়ার মধ্যে আটকে গিয়েছিল মরালী, তারপর নবাব এসে পড়াতে আর কিছুই করা হয়নি। গুলসনও আগেকার মতন রাত্রে আর আসে না। সেই যে সে রাগ করে চলে গেছে আর তার দেখা নেই। কেন সে অমন করে বলতে গেল!

সেদিন রাত্রে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরোল মরালী। কোথায় কোন্ মহলে গুলসন থাকে তা জানে না। তবু যদি তার দেখা পাওয়া যায়, গিয়ে ক্ষমা চেয়ে আসবে তার কাছে। বাইরে সেই রকমই ঝাপ্সা অন্ধকার, কোন্ কোণে টিম টিম করে একটা আলো জ্বলছে। পথ দেখে দেখে চলতে চলতে যদি কোথাও হঠাৎ কাউকে দেখতে পাওয়া যায়, তাকেই জিজ্ঞেস করবে গুলসনের কথা।

এবার চিনতে পারলে মরালী সেই ভুল-ভুলাইয়ার রাস্তাটা। সেটাকে এড়িয়ে আরো ভেতরে চলে গেল। অনেক হাসি, অনেক গান চলেছে কোথাও। মরালী সাবধানে পা ফেলে ফেলে এগিয়ে যেতে লাগলো। চেহেল্-সুতুন তো নয়, এও যেন একটা ছোটখাট হাতিয়াগড়। মাথার ওপর একটা ছাদ। আশেপাশে বারান্দা-ঘর।

একটা ঘরের সামনে এসে চুপ করে দাঁড়ালো মরালী। মনে হলো ভেতরে যেন আলো জ্বলছে। আলো যখন জ্বলছে তখন ভেতরে যে আছে সে নিশ্চয়ই জেগে আছে। মরালী অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে রইলো সেখানে। যদি কেউ জিজ্ঞেস করে সে কে, তাহলে সে কী উত্তর দেবে?

আশেপাশে চারদিকে চেয়ে দেখলে মরালী। বরকত আলি কি নজর মহম্মদরা যদি কেউ দেখতে পায় তাহলে হয়তো বিপদ হতে পারে।

মরালী আস্তে আস্তে দরজায় টোকা মারলে।

ভেতর থেকে মেয়েলি গলায় সাড়া এল—কে?

আর তারপর দরজাটা খুলে গেল। মরালী ভেবেছিল দরজা খুলে হয়তো দেখবে গুলসনকে। কিন্তু এ অন্য আর একজন। যে দরজা খুলে দিলে সে চিনতে পারলে না মরালীকে। একজন বাঁদী।

—আপ কৌন্ ?

মরালী বললে—এ-ঘরে গুলসন বেগম থাকে ?

ততক্ষণে ভেতর থেকে আর একজন বেরিয়ে এসেছে। বড় সুন্দর এর মুখখানা। কিন্তু বড় করুণ এর চেহারা। বেশি গয়নাগাঁটি গায়ে নেই। ফিকে জর্দা রংএর একটা ঘাগরা আর ফিকে সবুজ ওড়নী পরেছে গায়ে।

—তুমি কে ?

কী বলবে মরালী বুঝতে পারলে না। কিন্তু মেয়েটার মুখখানা দেখে মনে হলো একে যেন সব কথা খুলে বলা যায়।

—গুলসন বেগমকে আমি খুঁজতে এসেছিলাম। তার মহলটা কোন্ দিকে ?

মেয়েটি জিজ্ঞেস করলে—তুমি কে ? তুমি কি নয়া এসেছো এখানে ?

মরালী তবু জবাব দিতে পারলে না। মেয়েটি বললে—এসো, ভেতরে এসো তুমি, এত রাত্তিরে তুমি গুলসনকে খুঁজতে বেরিয়েছ কেন ? ডর কী ? ভেতরে এসো—

মরালী ভয়ে-ভয়ে ভেতরে ঢুকলো। সাদা-সিধে একটা বিছানা। মখমলের চকচকে চাদর। পায়ে একজোড়া জরিদার চটি। হাত ধরে নিয়ে গিয়ে বিছানায় বসালো। তারপর বাঁদীটাকে বললে—সিরিনা, তু যা ইহাঁসে—

বাঁদীটা চলে গেল। মেয়েটি আবার জিজ্ঞেস করলে—তোমাকে তো চেহেল্-সুতুনে আগে দেখিনি কখনো, তুমি কি নয়া এসেছো ?

—হ্যাঁ !

—কতদিন এসেছো ?

—অনেক দিন। ঠিক করতে পারছি না কতদিন। মনে হচ্ছে যেন কত বচ্ছর এখানে এসেছি। ঘরের মধ্যেই থাকি কি না দিনরাত !

মেয়েটি গলায় মিষ্টি সুর দিয়ে জিজ্ঞেস করলে—তোমার নাম কী ?

—মরিয়ম বেগম।

—সাকিন ?

—লস্করপুর। সেদিন গুলসনের ওপর খুব রাগ করেছিলুম বলে আর যায়নি আমার মহলে, তাই খুঁজতে বেরিয়েছি। এখানকার খোজারা আমাকে মোটে ঘরের বাইরে বেরোতে দেয় না। গুলসন লুকিয়ে লুকিয়ে আমার মহলে আসতো, কেউ জানতে পারতো না। আজ ক'দিন থেকে মোটে আসছে না সে, তাই রাত্তিরে বেরিয়েছিলাম খুঁজতে—

—কিন্তু গুলসনকে তো এখন মিলবে না !

—মিলবে না ? কেন ?

—সে মতিঝিলে গেছে, সেখানে মহ্ফিল্ হচ্ছে—

গুলসনের কথাটা মনে পড়লো। গুলসন বলেছিল, যার মতিঝিলে ডাক পড়বে সে ভাগ্যবতী ! এক রাত্রেই তার কপাল ফিরে যাবে ! হয়তো শেষ পর্যন্ত গুলসনের কপাল ফিরলো !

—আপনি কে ?

—আমি ? আমার নাম লুৎফুন্নিসা বেগম !

মরালীর মাথায় যেন সঙ্গে সঙ্গে বজ্রাঘাত হলো। নবাবের আসল বেগম। ভয়ে দাঁড়িয়ে উঠলো মরালী। বললে—আমায় মাফ করবেন বেগমসাহেবা, আমি না-জেনে আপনার ঘরে ঢুকে পড়েছি, আমি নতুন মেয়ে, কিছুই জানতুম না—

লুৎফুন্নিসা একটু ম্লান হাসি হাসলো। বললে—বোস, তোমার কোনো গুনাহ্ হয়নি। তুমিও যা আমিও তাই—তুমি বোস—

তবু মরালীর বসতে কেমন সঙ্কোচ হলো। বললে—আপনার কথা গুলসন আমাকে বলেছে, আমরা আপনার বাঁদী,—আপনার সঙ্গে কি আমাদের তুলনা?

লুৎফুন্নিসা বললে—কে বাঁদী আর কে মালকিন্ তা খোদাই জানে ভাই! গুলসন তোমাকে সব ঝুট বাত্ বলেছে! তুমি নতুন এসেছো তাই কিছুই জানো না এখনো, পরে সব জানতে পারবে। তা ছাড়া তুমি কেন আসতে গেলে এখানে? তুমি গলায় দড়ি দিতে পারলে না? যখন তোমাকে এরা এখানে নিয়ে আসছিল তুমি নদীতে ঝাঁপ দিতে পারলে না? জানো, তোমার মত কত বেগম আছে এখানে? জানো, তাদের কী হেনস্থা?

বলতে বলতে লুৎফুন্নিসা একটু থামলো। তারপর আবার বলতে লাগলো—আর তাছাড়া আমিই কি সাধ করে এখেনে এসেছি? আমি কি চেয়েছিলুম এই নবাবের বেগম হতে? আমি গান গাইতে এসেছিলুম এই মুর্শিদাবাদে মুজ্‌রো নিয়ে। আমি দেহ্‌লীর নট্‌নী। গান গাওয়া ছিল আমার পেশা। তারপর খোদার মর্জিতে এখানে এসে পড়েছি, আর বেরোতে পারিনি!

বলে হাসতে লাগলো লুৎফুন্নিসা বেগম ঠিক তেমনি করে।

তারপর বললে—যাক্ গে এসব কথা, তুমি নতুন এসেছো, তোমাকে মিছিমিছি ভয় পাইয়ে দেবো না—তোমার কোনো অসুবিধে হচ্ছে না তো?

মরালী বললে—গুলসন আমাকে বলেছিল নানীবেগমসাহেবার সঙ্গে দেখা করিয়ে দেবে!

—কী জন্যে নানীবেগমের সঙ্গে দেখা করতে চাও?

মরালী বললে—শুনেছি তিনি খুব ভালো লোক—

—গুলসন বলেছে ভালো লোক?

—গুলসন আপনারও খুব প্রশংসা করেছে।

—আমার কথা থাক, তুমি এত রাত্তিরে নানীবেগমের সঙ্গে দেখা করতে চাওই বা কেন? তিনি তো এখন কোরাণ পড়েন—

—তাও শুনেছি! কিন্তু রাত ছাড়া আর কী করেই বা দেখা করবো তাঁর সঙ্গে! দিনের বেলা নজর মহম্মদ যে আমার ঘরে নজর রাখে। কোথাও বেরোতে দেয় না। কারো ঘরে যেতে আমাকে বারণ করেছে। কারো সঙ্গে কথা বলতেও দেয় না। যে বাঁদীটা আসে সেও বোবা, কথা বলতে পারে না। আমি যে এরকম একলা থাকতে থাকতে মারা যাবো শেষকালে!

লুৎফুন্নিসা হাসতে হাসতে বললে—নতুন এসেছো তো, এখন একটু একটু অসুবিধে হবেই, তারপর আস্তে আস্তে সব গা-সওয়া হয়ে যাবে, তখন অন্য বেগমরা যেমন করে দিন কাটায়, তুমিও তেমনি করে দিন কাটাবে—তা নানী-বেগমকে কিছু বলতে হবে?

মরালী বললে—শুধু বলবো, আমি যেন এখানকার সকলের সঙ্গে মিশতে পারি, কথা বলতে পারি—

লুৎফুন্নিসা বললে—আচ্ছা তুমি যাও, আমি নানীবেগমকে তোমার কথা বলবো, তুমি কিছু ভেবো না—তুমি একলা মহলে ফিরে যেতে পারবে তো? সিরিনাকে পাঠাবো তোমার সঙ্গে?

মরালী বললে—না, তার দরকার নেই, আমি যেতে পারবো একলা—

বলে লুৎফুন্নিসা বেগমকে মুসলমানী কায়দায় কুর্নিশ করে ঘরের বাইরে বেরিয়ে এল। এতক্ষণ যেন আড়ষ্ট হয়ে কথা কইছিল মরালী। কিন্তু তবু ভালো লাগলো। এ যেন গুলসনের মত নয়। অত গায়ে পড়ে আলাপ করতেও চাইলে না, আবার গায়ে পড়ে উপকার করতেও আগ্রহ দেখালে না। অথচ আদপ-কায়দার কোনো ত্রুটিও রাখলে না। নবাবের খাস বেগম, নবাব ফিরে এসেছে মুর্শিদাবাদে, তবু তো খাস-বেগমের কাছে একবার দেখাও করতে এল না। আর এত রাতে একা একা জেগেই বা বসে আছে কেন? কার জন্যে বসে আছে? এই খাস-বেগম থাকতে নবাব কেন গুলসনকে ডেকে পাঠিয়েছে মতিঝিলে? গুলসনের কি আজ এক রাত্রেই ভাগ্য ফিরে যাবে?

—বেগমসাহেবা!

পেছন থেকে ডাক শুনে মরালী মুখ ফেরালো। সেই বাঁদীটা। সিন্নিনা।

—বেগমসাহেবাকে এত্তেলা দিয়েছেন!

মরালী আবার লুৎফুন্নিসার ঘরে ফিরে গেল। বেগমসাহেবা বললে—একটা কথা শোন—

মরালী অবাক হয়ে গেছে। আবার কী জরুরী কথা বলবে তাকে!

—আর একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। তুমি বহেন্ নয়া এসেছো, রাত্তিরে এখানে দরওয়াজা বন্ধ করে শোবে।

মরালী বললে—তা তো শুই-ই!

—এখানকার কোনো বেগমও যদি দরওয়াজা খুলতে বলে তো খুলো না, জানো। কোনো বেগমকেও তোমার ঘরে রাত্তিরে শুতে দিও না। এখানকার বেগমরাও ভালো নয়, বিশ্বাস করে কোনো কথাই কাউকে বোল না। এখানকার ইঁটেরও কান আছে। এখানকার বেগমরা পুরুষদের চেয়েও খারাপ! যাও—

মরালী হতবাক্ হয়ে গেল কথাগুলো শুনে। তারপর যেমন এসেছিল তেমনি আবার ঘর থেকে বেরিয়ে এল। তারপর রাস্তা চিনে চিনে নিজের মহলের কাছে আসতেই দেখলে নজর মহম্মদ ঘরের সামনের রোয়াকের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। নজর মহম্মদকে দেখেই বুকটা ছাঁত্ করে উঠলো। যদি বকে!

কিন্তু না, কিছুই বললে না!

মরালী নিঃশব্দে নিজের ঘরে ঢুকতে গিয়েই যেন সাপ দেখে এক হাত পিছিয়ে এল। বেশ ফরসা টক্‌টকে গায়ের রং, ছোট একটু দাড়ি, গোঁফ জোড়া পাকিয়ে দু'পাশে ছুঁচলো করে দেওয়া। চোস্ত-পাজামা, মেরজাই পরা একজন লোক যেন এতক্ষণ মরালীর জন্যেই তার ঘরের ভেতরে অপেক্ষা করছিল।

মরালী ঘরে ঢুকতেই লোকটা সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়িয়ে মাথা নিচু করে কুর্নিশ করলে!

—বন্দেগী বেগমসাহেবা!

মরালী নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইলো। ভয়ে বুকটা তার থরথর করে কাঁপছে তখন।

—আমাকে চিনতে পারছেন না বেগমসাহেবা! মীর্জাপুরে সাদির সময় বেগমসাহেবাকে হাতিয়াগড়ের বজরার জানালাতে দেখেছিলাম। এমন খুবসুরৎ শকল জিন্দগীতে কখনো দেখিনি, তাই ভেবেছিলাম বুনোফুলের গুলাব কি হাতিয়াগড়ের মরুভূমিতে মানায়! তাই তো ডিহিদারকে দিয়ে পরোয়ানা ভেজিয়ে চেহেল্-সুতুনে নিয়ে এসেছি রাণীবিবিকে!

বলে লোকটা একটা বিজয়োল্লাসের চাপা হাসি হেসে উঠলো!

মরালী তখনো কী করবে বুঝতে পারছে না। বুঝতে পারছে না কে এ লোকটা! বাইরের অন্ধকারে নজর মহম্মদ তখনো দাঁড়িয়ে আছে। লোকটা কি রাত্তিরে তার ঘরেই থাকতে চায় নাকি!

—হাতিয়াগড়ের জমিন্‌দার সাহাবের তবিয়ত্‌ কেমন আছে বেগমসাহেবা? খ্যয়রিয়ত্‌ তো?

মরালীর মনে হলো এক থাপ্পড় কষে দেয় লোকটার গালের ওপর। কিন্তু ভয়ও করতে লাগলো। লোকটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তখন একমনে দেখছে মরালীকে। যেন যাচাই করে নিচ্ছে। হয়তো সন্দেহ হচ্ছে ঠিক রাণীবিবি না অন্য কেউ। কিংবা হয়তো ভাবছে অনেকদিন আগে নবাবের বিয়ের সময় দূরে থেকে দেখা মুখটার সঙ্গে এ-মুখের মিল আছে কি না!

—বেগমসাহেবা বসুন না!

মরালীর মনে হলো আরো কাছে থেকে দেখতে চায় তাকে! তবু মরালী বসলো না।

লোকটা এবার নিজেই দাঁড়িয়ে উঠলো।

—বেগমসাহেবা না বসলে বান্দা তো বসে থাকতে পারে না।

কিন্তু দাঁড়িয়ে উঠে সোজা হয়ে ঠিক দাঁড়াতেও পারলে না। টলতে লাগলো। হয়তো মাতাল। মরালীর নাকে একটা কড়া গন্ধ এসে লাগলো। চারদিকে এত আতর, পান-জর্দা, খুশ্‌বু তেলের গন্ধ, তবু যেন মদের গন্ধটা সকলকে ছাপিয়ে উঠে নাকে এসে লাগলো।

—বেগমসাহেবা বুঝি টহল্‌ দিতে বেরিয়েছিলেন! এত রাতে টহল্‌ দিলে নিদ কখন যাবেন বেগমসাহেবা!

হঠাৎ বলা-নেই-কওয়া-নেই নজর মহম্মদ ঘরে ঢুকে পড়লো—খোদাবন্দ্‌, নানীবেগম—

নানীবেগমের নাম শুনেই লোকটা যেন জ্ঞান ফিরে পেল। চমকে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। তারপর চোখের পলক্‌ ফেলতে-না-ফেলতে ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। আর ঠিক তার পরেই এসে ঢুকলো লুৎফুন্নিসা বেগম। সঙ্গে আর একজন। এই-ই বোধহয় নানীবেগম।

—মহলে কে এসেছিল বহেন্‌?

মরালী ঘটনার আকস্মিকতায় এমনিতেই হতবাক্‌ হয়ে গিয়েছিল। এবার আরো বাক্‌রোধ হয়ে এল তার।

নানীবেগম মাথায় হাত দিয়ে আদর করতে করতে বললে—বেটি!

বড় আদরের সুর গলায় বেজে উঠলো নানীবেগমের। মরালীর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো।

—কব্‌ আয়ি বেটি!

বেশ বয়েস হয়েছে। মরালীর মনে হলো যেন ঠিক তার ঠাকুমার মত। ঠাকুমাকে দেখেনি কখনো। খুব ছোটবেলায় আবছা-আবছা মনে পড়তো। নয়ান-পিসিও কখনো যেন এমন করে আদর করেনি। নয়ানপিসি চুল বেঁধে দিয়েছে। সাজিমাটি দিয়ে গা ঘষে মেজে দিয়েছে। কিন্তু নানীবেগমকে নয়ানপিসির চেয়েও দেখতে আরো সুন্দর। সাদা পাতলা পোশাক।

—ইহাঁ কিঁউ আয়ি বিটি? কৌন্‌ লায়া? কে তোমাকে নিয়ে এল এখানে মা?

মরালী নানীবেগমের বুকের মধ্যে মাথা গুঁজে দিয়ে অঝোরে হাউ-হাউ করে কাঁদতে লাগলো। নানীবেগমও মরালীকে দুই হাতে নিজের বুকের মধ্যে টেনে নিলে।

মেহেদী নেসার বাইরের নহবতখানার নিচে দাঁড়িয়ে যেন একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লে। তাঞ্জাম তৈরিই ছিল। নজর মহম্মদকে কাছে ডেকে বললে—খুব হুঁশিয়ার নজর মহম্মদ, বড়ি খুবসুরৎ জেনানা—লেক্‌ন্—

নজর মহম্মদ হুকুম শোনবার অপেক্ষায় মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে ছিল।

—লেক্‌ন্, নাচা গানা সব শেখাতে হবে। একদম্ আনাড়ী জেনানা, ভালো করে আদব-কায়দা এখনো শেখেনি, আমীর-ওমরাহদের কেমন করে কুর্নিশ করতে হয় তাই-ই জানে না এখনো। ওস্তাদজীকে হুকুম দিয়ে দেবে খুব জল্‌দি তালিম্ দিতে। মীর্জাকে খুশ্ করতে হবে তো—বনের চিঁড়িয়াকে পিঁজ্‌রায় পুরলে কী হবে, তাকে তো বুলি শেখাতে হবে—

বলে তাড়াতাড়ি তাঞ্জামে উঠে পড়লো নেসার সাহেব।

মেহেদী নেসার চলে যেতেই পীরালি খাঁ আড়াল থেকে বেরিয়ে এল। চল্‌তি তাঞ্জামটা ফটক দিয়ে বেরিয়ে যেতেই নজর মহম্মদ মুখ ফিরিয়ে বললে—সর্দার, শালা হারামীর বাচ্চা—

পীরালি গম্ভীর মানুষ। বললে—নানীবেগমকে খবর দিলে কে? তুই?

নজর মহম্মদ বললে—জী সর্দার—নেসার সাহেব কাছারিতে আমার নামে নালিশ পেশ করেছে সর্দার, আমি নাকি বাইরের জওয়ানদের চেহেল্-সুতুনের অন্দরে ঢোকাই মোহর নিয়ে। আমি নাকি ঘুষ নিই। তাই নানীবেগমকে খবর দিয়ে দিলুম, খবর দিয়ে শালাকে বে-ইজ্জৎ করে দিলুম। খোজাদের সঙ্গে বেত্তমিজি করতে এসেছে।

আরো সব কত কী কথা রাগের মাথায় বলতে লাগলো নজর মহম্মদ। কলকাতার লড়াই ফতে করে এসে মাথা গরম হয়ে গেছে আমীর-ওমরাহদের। মাথা গরম করবে বাইরে গরম করো। চেহেল্-সুতুনের বাইরে। মতিঝিলে নেয়ামত্‌কে পেটো। চেহেল্-সুতুন তোমার এক্তিয়ারে নয়। এখানে আমি খোজা সর্দার পীরালির নৌকর। পীরালি খাঁ হুকুম করলে আমি তা মাথা পেতে তামিল করবো। এতদিন এত নবাব এসেছে গেছে। এতদিন এত বেগম এসেছে গেছে, কেউ খোজাদের এক্তিয়ারে কখনো হাত দেয়নি। তুমি যে-ই হও, আমি খোজা। আমি তোমার চেহেল্-সুতুন মর্জি হলে ভেঙে গুঁড়িয়ে ফেলতে পারি, আবার বানাতেও পারি। কোন্ ফাঁক দিয়ে তোমার নুকসান করবো তুমি জানতেও পারবে না। তোমার বনের চিঁড়িয়া আমার মর্জি হলে আমি আসমানে উড়িয়ে দিতে পারি। আমার মর্জি আমি মোহর নিই, তাতে তোমার কী? তুমি ঘুষ নাও না? জমিদার তালুকদার ডিহিদার ফৌজদার তাদের কাছ থেকে তুমি রিশ্-শোয়াত্ নাও না? হাজারী মনসব্‌দার বানাতে তুমি ঘুষ নাও না? কেয়া সর্দার, ঠিক বাত বলিনি?

পীরালি খাঁ বললে—বেশ করেছিস—

নজর মহম্মদের তখনো গোসা যায়নি। বললে—আমি মেহেদী নেসার সাহেবের দুষমনি ভাঙবো সর্দার, আমাদের এক্তিয়ারে হাত দিয়েছে, আমি শালাকে রেহাই দেবো না—

পীরালি খাঁ ঠাণ্ডা মাথায় জিজ্ঞেস করলে—মতিঝিলে আজ কাকে পাঠালি?

নজর মহম্মদ বললে—গুলসন বেগমকে, বেচারী বহোত্‌ রোজ ধরে আমার খুসামোদ করছিল, কেবল বলছিল, আমাকে একবার নবাবের সামনে পাঠিয়ে দাও নজর! তা দিলুম আজ পাঠিয়ে। যদি গুলসনের নসীব ফেরে তো ফিরুক না, আমার কী!

—বেশ করেছিস!

তারপর নজর মহম্মদ হঠাৎ নিচু গলা করে পীরালিকে বললে—সর্দার, আর একটা খবর, জুবেদার বাচ্ছা হবে!

পীরালীর চোখ দুটো গোল হয়ে উঠলো।

—কোন্‌ জুবেদা?

—মরিয়ম বেগমের বাঁদীটা!

—কে করলে? কোন্‌ বেল্লিক?

নজর মহম্মদ বললে—তালাস পাচ্ছি না।

—ওকে পুছেছিস?

—ও কী বলবে? ও তো বোবা! কোন্‌ উল্লু-কি-পাঠ্‌ঠা বেইমানি করে গেছে!

—তাহলে লট্‌কে দে ওকে!

—দেবো লট্‌কে?

—আলবৎ দিবি! নানীবেগম যদি কিছু বলে তো বলিস্‌, পীরালি খাঁর হুকুম। আমাকে এত্তেলা দিলে যা বলবার আমি বলবো—

বলে পীরালি খাঁ নিজের কাজে চলে গেল।

ওদিকে তখন সারা রাত মহ্‌ফিল্‌ চলেছে মতিঝিলে। কলকাতার লড়াই ফতেহ্‌ করে এসে নবাবী ফৌজের লোকরা শহরে এসে ফূর্তির ফোয়ারা ছুটিয়েছে। কলকাতা থেকে যা পেরেছে লুঠপাট করে এনেছে। কেউ লুঠেছে চাঁদি, কেউ লুঠেছে মেয়েমানুষ, কেউ লুঠেছে ফিরিঙ্গীদের জামা, জুতো। যে কিছু পায়নি, সেও একটা বগলেস কি একটা পালকের কলম নিয়ে এসেছে। কলকাতার কেল্লায় মানিকচাঁদকে একলা রেখে নবাব হল্‌ওয়েলকে গ্রেফতার করে নিয়ে এসেছে মুর্শিদাবাদে। আর আছে কৃষ্ণবল্লভ, আর উমিচাঁদ। উমিচাঁদের বাড়িটাও লুঠপাট করতে গিয়েছিল নবাবী ফৌজের লোকেরা। কোটি-কোটি টাকার মালিক উমিচাঁদ সাহেব। কিন্তু গিয়ে দেখলে, কেউ বাড়িটাতে আগেই আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল। বাড়ির ভেতরে একটা সিন্দুক ছিল। তার ভেতরে মোহর সোনা চাঁদি কেউ আগেই সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। তার পাশেই উমিচাঁদের সেপাই জগমন্ত সিং-এর পোড়া দেহটা পড়ে আছে। আগাগোড়া পুড়ে একেবারে ছাই হয়ে গেছে। চেনা যায়নি তাকে।

আগে ফূর্তি হোক, আগে মহ্‌ফিল্‌ হোক, তারপরে বিচার হবে হল্‌-ওয়েলের। ফিরিঙ্গীরা জাহাজ নিয়ে একেবারে ফলতার মোহানায় গিয়ে পালিয়ে বেঁচেছে। মেহেদী নেসার, ইয়ারজান, সফিউল্লা, তারা সবাই নবাবকে বুঝিয়েছে এ-রাতটায় আর কোনো কাজ নয়, শুধু মহ্‌ফিল! নজর মহম্মদকে হুকুম

করেছিল মেহেদী নেসার যে, চেহেল্-সুতুন থেকে ভালো বাঈজী পাঠিয়ে দিতে হবে মতিঝিলে। যে ভালো নাচতে পারবে, গাইতে পারবে, নবাবের দিল খুশ করতে পারবে—

তারপরে সেখান থেকে এসেছিল গুলসন বেগম।

তা গুলসন নেচেছে ভালো। এককালে হিন্দু মেয়ে ছিল বটে। কিন্তু চেহেল্-সুতুনে এসে আচ্ছা ওস্তাদের হাতে পড়ে নাচ-গান সব রপ্ত করে নিয়েছে। গুলসন একাই মহ্ফিল্ মশগুল করে দিয়েছে। মতিঝিল-এর মেঝের ওপর সাদা কিংখাবের চাদর পেতে দেওয়া হয়েছিল। চাদরের নিচেয় আবীর ছড়ানো ছিল। চাদরের ওপর নেচে নেচে পায়ের ঘা দিয়ে দিয়ে একটা আস্ত ফোটা পদ্মফুল এঁকে ফেলেছিল গুলসন। তারপর সেই আবীরের লালে-লাল কিংখাবের চাদরের ওপর মেহেদী নেসার একটা মোহর ফেলে দিয়েছিল। গুলসনের কেরামতি আছে বলতে হবে। নাচতে নাচতে কোমর বেঁকিয়ে ঠোঁট দিয়ে কামড়ে সেই মোহর তুলে নিয়ে নবাবের কপালের ওপর রেখে দিয়েছিল।

ভারি খুশী নবাব মীর্জা মহম্মদ!

অনেকদিন পরে নবাবের মুখে হাসি ফুটতে দেখে মেহেদী নেসারের মুখেও হাসি আর ধরেনি। নবাবের খুশীর জন্যেই তো মহ্ফিল। নবাব খুশী থাকলেই তো হিন্দুস্থান খুশী রইলো। নবাব খুশী থাকলেই তো খোদাতালা খুশী থাকলো। আসলে দিন-দুনিয়ার নবাবই তো দিন-দুনিয়ার খোদাতালা!

—শোহনাল্লা, শোহনাল্লা—

শেষপর্যন্ত যখন নেয়ামত আলি সরাবের ভাঁড়ার খুলে উজাড় করে দিয়েছিল তখন কে-ই বা নবাব আর কে-ই বা বান্দা। তখন কে-ই বা বেগম আর কে-ই বা জারিয়া। তখন মতিঝিলের মহ্ফিলের ফুর্তির ফোয়ারায় নবাব-বান্দা-বাঁদী-বেগম সব একাকার হয়ে যায়!

কিন্তু বশীর মিঞা শেষ পর্যন্ত সবটা দেখতে পায়নি। এ-সব মহ্ফিলের মধ্যে বশীর মিঞার মত ছুটকো লোকদের থাকবার এক্তিয়ার নেই। লুকিয়ে-লুকিয়ে নেয়ামতকে তোয়াজ করে যতটুকু ফাঁকি দিয়ে ভোগ করে নেওয়া যায় সেইটুকুই ফায়দা। জাফরির ফাঁক দিয়ে নবাব-আমীর-ওমরাহদের কেচ্ছা-কেলেঙ্কারী বশীর মিঞা বরাবর এমনি করেই ফাঁকি দিয়ে দেখে এসেছে। দুটো বিবি আছে বশীরের। কিন্তু দুটো বিবিই বশীরের কাছে পুরোন হয়ে এসেছে। আর নতুন বিবি রাখবার হিম্মৎ নেই। আজকাল বিবি পোষবার খরচা বেড়ে গেছে। বিবিদের খাঁই বেড়ে গেছে। বিবিরা একটু সুবিধে পেলেই বড়-বড় আমীর-ওমরাহ্ পাকড়াতে চায়। একটু খুবসুরৎ বিবি হলেই আমীর-ওমরাহদের নজর পড়ে যায় তার ওপর। আর, একবার নজর পড়লে আর তাদের ঘরে পুরে রাখা দায়। সবাই চায় চেহেল্-সুতুনে গিয়ে বেগম বনতে। একবার বেগম হতে পারলে আখের ভালো হয়ে যাবে। নসিবে থাকলে নবাবের নজরে পড়ে যেতেও পারে। তখন হিন্দুস্থানের বাদশাই বা কে আর সে-ই বা কে! তখন হিন্দুস্থানের মসনদে বসে খোদাতালাকেও শায়েস্তা করতে চাইবে!

যাহোক, সেটা আসল কথা নয়। আসল কথা বশীর মিঞা ভেবেছিল মতিঝিল-এর মহ্ফিলে হাতিয়াগড়ের রাণীবিবির ডাক পড়বে। নতুন আমদানী বেগম। হয়তো মেহেদী নেসার সাহেব তাকেই এত্তেলা দেবে। তাই একবার দেখবার ইচ্ছে হয়েছিল নতুন আমদানীটা কেমন!

নেয়ামতকেও খোশামোদ করে অনেক কষ্টে ভজিয়ে রেখেছিল। বলেছিল—থোড়া মুঝে ভি দারু পিলাও নেয়ামত ভইয়া—আমিই তো রাণীবিবিকে হাতিয়াগড় থেকে আনাবার ইন্তেজাম করেছি। আমিও থোড়া দেখবো নতুন আমদানীটা ক্যায়সী চিজ—

কিন্তু গুলসন বেগম আসাতে মনটা একটু ভেঙে গিয়েছিল বশীর মিঞার। এত কোশিস করেও কোনো নাফা হলো না। বরবাদ হয়ে গেল খোসামোদী। শেষ পর্যন্ত যখন ফুর্তির ফিকির টুটে গেল তখন যে কেচ্ছা-কেলেঙ্কারী একটু ভালো করে নজর করে দেখবে তারও উপায় রাখলে না নেয়ামত আলি। তাড়াতাড়ি এসে হাঁকিয়ে দিলে। বললে—ভেগে যা এখান থেকে, ভেগে যা—

বশীর মিঞা একটু রেগে গিয়েছিল। সবে মহ্ফিল্ জমেছে এখনি ভেগে যেতে বলছে?

—তাহলে দারু দিলি কেন? দারু পিয়ে তবিয়ৎ গরম হয়ে গেল, এখন ভাগা যায়?

—তুই ভাগ এখন, আমি বাত্ শুনতে চাই না, নেসার সাহেব এখন বে-সামাল হয়ে পড়বে—

—সে তো ভালোই, আমি তো তাই দেখতে এসেছি!

—দূর বেল্লিক, যদি নবাব ভি বে-সামাল হয়ে পড়ে?

—তাও দেখবো!

—দূর বেত্তমিজ্! কেউ জানতে পারলে আমার নৌকরি খতম হয়ে যাবে যে—ভেগে যা—ভেগে যা—

শেষকালে একেবারে জোর করে তাড়িয়ে দিয়েছিল নেয়ামত মতিঝিল থেকে। মতিঝিলের ত্রিসীমানায় আর থাকতে দেয়নি বশীরকে। সেই যে মেজাজটা তিরিক্ষি হয়ে গিয়েছিল তা আর ঠাণ্ডা হলো না। সারা রাত ঘুমই হলো না। ভোর বেলাই উঠে পড়েছিল। আর ঠিক সেই সময়েই কান্ত এসে ডেকেছে।

—কী রে, এত সকালে? কখন এলি মোল্লাহাটি থেকে?

কান্ত বললে—এই তো সোজা সেখান থেকে আসছি।

—তা সরখেলের সঙ্গে দেখা হলো? চিঠি পেলি?

কান্ত একটু দ্বিধা করতে লাগলো।

বশীর আবার জিজ্ঞেস করলে—চিঠি পাসনি?

কান্ত বললে—না—

—না মানে? ডিহিদার কি ঝুট-খবর পাঠিয়েছে? সে যে জানিয়েছে হাতিয়াগড়ের রাজা মহারাজার সেরেস্তার লোকের হাতে চিঠি পাঠিয়েছে? তুই উজবুক না কী? তার সঙ্গে মুলাকাত হলো তোর, আর চিঠিটা সরাতে পারলি না? আমি আমার ফুপাকে কী জবাব দেবো? তুই কোনো কম্মের নয়, একটা আস্ত পাঁঠা—

কান্ত অনেকক্ষণ পরে বললে—আমি এ-চাকরি করতে পারবো না ভাই—সেই কথা তোর কাছে বলতে এসেছি—

সেদিন কান্তর কথাটা শুনে হতবাক্ হয়ে গিয়েছিল বশীর মিঞা! দুনিয়ায় এমন আহাম্মক কেউ আছে নাকি যে নিজামতি নৌকরি ছেড়ে দিতে চায়। সারা হিন্দুস্থান থেকে লোক এসে ভিড় করে মুর্শিদাবাদের দরবারে। এমন দেশ কোথায় পাবে হিন্দুস্থানে? এমন সস্তা-গণ্ডার দেশ? তবু সব নিমকহারামের

বাচ্ছা, নিজামতের নোকরি করবে আর নিজামতকেই গালাগালি দেবে!

কান্ত বললে—না ভাই, এ-নোকরিতে মনে শান্তি পাচ্ছি না—

—শান্তি? টাকা থাকলেই তো শান্তি বাপ্-বাপ্ করে আসবে! তুই তলব পাচ্ছিস না? আরামসে আছিস, তলব পাচ্ছিস্ আর ঘুরে-ঘুরে বেড়াচ্ছিস। আজ হাতিয়াগড় কাল মোল্লাহাটি পরশু কেষ্টনগর। কত দেশে বেড়াতে পাচ্ছিস—তা তোর তকলিফটা কী? কী কষ্ট হচ্ছে তোর?

কান্ত বললে—আমার আর ভালো লাগছে না ভাই—

—কাম করতে তো ভালো লাগবেই না। বেশ নবাবের মত পায়ের ওপর পা তুলে আরাম করবার নোকরি কে তোকে দেবে? আর নোকরি করবি না তো খাবি কী?

সে কথাটা সত্যি বটে! কিন্তু এ-কাজ ছাড়া কি আর কোনো রকমের চাকরি নেই? নিজামতে কি সবাই এই চরের চাকরি করছে? সেরেস্তার চাকরি নেই? কাছারির চাকরি নেই? খাল্সা-দেওয়ানজির দফ্তরে চাকরি নেই? তার জন্যেই ঠিক বেছে বেছে কেবল এই চাকরি?

—আচ্ছা, ঠিক আছে, এখন তুই ঘরে যা, আরাম করগে যা। এখন তোর মাথা গরম আছে, পরে বাত বলবো তোর সঙ্গে। তুই এই সহজ কামটা করতে পারলি না, আর তুই করবি খাল্সা-দেওয়ানজির দফ্তরের কাম? সে-কাম তো আরো কড়া রে—সেখানে কেবল দফ্তরে বসে বসে হিসেব লিখতে হবে—সে যে আরো শক্ত কাম—

সেদিন তখন আর বেশিক্ষণ কথা হলো না। মোল্লাহাটির মধুসূদন কর্মকারের দোকান থেকে ভোর বেলাই বেরিয়ে এসেছিল কান্ত। বেশ ভোর। শেষ রাতই বলা যায়। বড় বিশ্বাস করেছিল তাকে সরখেল মশাই। আহা, চাল-ডাল কিনে নিজের হাতে রান্না করে খাইয়েছিল। তার কাছ থেকে চিঠি চুরি করতে কেমন যেন মায়া হয়েছিল কান্তর। বিশেষ করে চিঠিটা পড়বার পর আর সেটা নিতে সাহস হয়নি। চিঠিটা দেখবার পর যদি মরালীর ওপর অত্যাচার আরো বেড়ে যায়। যদি সবাই জানতে পারে হাতিয়াগড়ের রাজা নিজের রাণীবিবিকে না-পাঠিয়ে তার বদলে তার নফরের মেয়েকে পাঠিয়েছে, তাহলে তো দুজনেরই ক্ষতি হবে। শোভারাম বিশ্বাস মশাইকেও গিয়ে ডিহিদারের লোক জিজ্ঞেস করবে, তোমার মেয়ে কোথায় বলো! হাতিয়াগড়ের রাজাসাহেবকে গিয়েও বলবে তোমার বউরানী কোথায় বলো! তার চেয়ে যা হয়ে গেছে তা গেছে। নতুন করে আবার কেন সে তাদের বিপদ ডেকে আনে।

সমস্ত রাস্তাটাই সে ভেবেছে কেবল। মোল্লাহাটি থেকে বেরিয়ে নৌকো করতে হয়েছে। গহনার নৌকো। নৌকোর মাঝিটা ছিল বুড়ো। এক ফাঁকে জিজ্ঞেস করেছিল—কলকাতার খবর কিছু রাখেন নাকি বাবু?

—কলকাতার কীসের খবর?

মাঝি বলেছিল—শুনলাম নাকি আমাদের নবাবের সঙ্গে ফিরিঙ্গীদের লড়াই হয়েছিল?

—হ্যাঁ শুনেছি, হয়েছিল। তা তোমরা কোথায় শুনলে?

কান্ত মাঝির মুখের দিকে চাইলে। একটু দাড়ি রয়েছে। আধ ঘণ্টা অন্তর-অন্তর নামাজ পড়ে কেবল। মাটির হাঁড়িতে রাখা পান্ত ভাত একটু নুন লঙ্কা দিয়ে খেয়ে সারা দিন-রাত নৌকো চালায়। বুড়ো মাঝি আর তার জোয়ান ছেলে।

ওরা জলের মানুষ, জলের ওপরেই সারা জীবন কাটিয়ে দেয় ওরা। কিন্তু ডাঙার খবরের ওপর আগ্রহ আছে। আজ এখানে কাল ওখানে করে করে দু' মাস এক বছর পরে একদিন হয়তো নিজের দেশে গিয়ে হাজির হয়। বিবির জন্যে জাহাঙ্গীরাবাদের শাড়ি কিংবা মেয়ের জন্যে বহরমপুরের খাড়ু কিনে নিয়ে যায়। একদিন কি দু'দিন বাড়িতে থেকেই আবার পাড়ি দেয় নদীতে। যখন ফরাসডাঙায় যায় তখন সেখানকার খবর শোনে। তারপর যখন আবার কলকাতায় যায় তখন সেখানকার খবর শোনে। আবার যখন মুর্শিদাবাদে আসে তখন শোনে নবাবের খবর। এই রকম করেই এক দেশ থেকে আর-এক দেশে খবর আনা-নেওয়া করে।

এদের কাছে থেকে কান্তর একবার মনে হয়েছিল, এদের সঙ্গে জলে-জলে ভেসে বেড়ালে কেমন হয়। কোনো আর ভাবনা থাকে না তাহলে। ফিরিঙ্গীদের চাকরিও তার টিঁকলো না, নবাবের চাকরিও তার টিঁকবে না। তার চেয়ে এই-ই ভালো।

মাঝির কথায় কিন্তু কান্ত অবাক হয়ে গিয়েছিল। মাঝিটা বলেছিল—ডাঙায় যেমন বাঘ আছে বাবু, জলেও তেমনি কুমীর আছে, কোথাও স্বস্তি নেই গো বাবু, কোথাও শান্তি নেই—

বশীর মিঞার সঙ্গে দেখা করে সোজা সারাফত আলির খুশ্‌বু তেলের দোকানে এসে পড়লো। বাদ্‌শা সকাল-সকালই উঠেছে। বাদ্‌শা দেখতে পেয়েছে। বললে—কোথায় ছিলেন কান্তবাবু?

—কেন? কেউ খুঁজছিল নাকি আমাকে?

—আবার কে খুঁজবে? মালিক খুঁজছিল! আমাকে পুছছিল—কান্তবাবু কোন্‌ রোজ আসবে—

—এখন মিঞাসায়েব উঠেছেন?

—না বাবু, এখন তো মালিকের মাঝ-রাত!

সকাল বেলার দিকে চক্‌-বাজার ঠাণ্ডা থাকে। দোকান-পাট দেরি করে খোলে। তখন গঙ্গা থেকে ভারিরা বাঁকে করে হাঁড়ি ভর্তি জল দিয়ে যায় বাড়িতে বাড়িতে। মুরগীগুলো ভোর থেকে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। কিন্তু যত বেলা বাড়ে তত কাজকর্ম বাড়তে থাকে। তখন কাছারিতে আসতে শুরু করে ভিন-দেশী মানুষ। মামলার তদবিরে কাজির কাছারিতে এসে ধর্না দেয়। কাছারির কাজেও আসে, আবার রাজধানীর দোকান-পসরা থেকে মাল-পত্র গস্ত করে নিয়ে যায়। ভালো শাঁখা কেনে, চক্‌-বাজারের কামারের দোকান থেকে ভালো হাতা-খুন্তি কেনে। কিন্তু রাত্তির বেলাতেই চক-বাজারের আসল শোভা। তখন নবাবের হাতীর দল রাস্তা কাঁপিয়ে চান করে ফেরে গঙ্গা থেকে। তখন চেহেল্‌-সুতুন থেকে দু'একটা তাঞ্জাম বেরোয়। তখন গণৎকাররা রাস্তার ধারে পাঁজি-পুঁথি-খড়ি নিয়ে বসে যায় ভাগ্যগণনা করতে। তখন সারাফত আলি দোকানের সামনে গিয়ে বসে। আগরবাতি জেবলে দেয়, গড়গড়ার মাথায় কলকে বসিয়ে দিয়ে যায় বাদ্‌শা, তখন ভুড়ুক ভুড়ুক করে ধোঁয়া ছাড়ে সারাফত আলি। তখন আফিমের মৌতাত জমে ওঠে।

নজর মহম্মদ এ-ক'দিন রোজ এসেছে। এত বড় যে একটা লড়াই হয়ে গেল ফিরিঙ্গীদের সঙ্গে, তাতে মুর্শিদাবাদের কিছুই ইতর-বিশেষ হয়নি। দোকানের কেনা-বেচা, খদ্দেরের আনাগোনায় কোনো তফাৎ-ফারাক হয়নি। নজর মহম্মদ যেমন আগেও আসতো তেমনিই রোজ এসেছে। লড়াই হচ্ছে, সে তো নবাবের

সঙ্গে ফিরিঙ্গীদের, তাতে তোমার আমার কী? একদিন এসে বলেছিল—সেই বাবু কোথায় গেল মিঞাসাহেব?

বোধহয় মোহরের মোহ লেগে গিয়েছিল নজর মহম্মদের।

মিঞাসাহেব বলেছিল—সে বাবু বাইরের কামে গেছে—। তা চেহেল্-সুতুনের খবর কী নজর মহম্মদ?

—খবর মিঞাসাহেব খুব জবর!

—ক্যায়সা?

নজর মহম্মদ গলাটা নিচু করে বললে—জুবেদার লেড়কা হবে—

—তোবা! তোবা! সারাফত আলি জিভ্ আর তালু দিয়ে একটা অদ্ভুত শব্দ করলে। অর্থাৎ হায়-হায়—

—পীরালি খাঁকে বলেছি। পীরালি বলেছে লট্‌কে দিতে—দেবো লট্‌কে—

সারাফত আলির লাল চোখ দুটো আরো লাল হয়ে উঠলো আতঙ্কে। বললে—সাঁচ-সাঁচ লট্‌কে দিবি?

—হরগিজ্ লট্‌কে দেবো। বেগমদের শায়েস্তা করতে জুবেদাকে না লট্‌কালে আর চলছে না মিঞাসাহেব! কাল তো গুলসন বেগমকে পাঠিয়েছিলাম মতিঝিল-এ। আমার কী! যদি নবাবকে খুশ্ করে নিজের নসীব ফিরিয়ে নিতে পারে তো নিক্ না। কাল তো খুব মহ্‌ফিল্ হয়েছে সারি রাত। মেহেদী নেসার সাহেব, ইয়ারজান সাহেব, সফিউল্লা সাহেব একেবারে বুজ্‌দিল হয়ে ফুর্তি করেছে। গুলসন খুব নেচেছে, খুব ইনাম পেয়েছে নেসার সাহেবের কাছ থেকে। বড় খুশী হয়েছে বেগমসাহেবা।

সারাফত আলি মৌতাতের মধ্যেও কান পেতে শুনছিল। জিজ্ঞেস করলে—তারপর?

—তারপর মিঞাসাহেব, রাত তখন অনেক, মেহেদী নেসার সাহেব আমার চেহেল্-সুতুনে এসে হাজির। বললে, মতিঝিলে মহ্‌ফিল্ হবে, হাতিয়াগড়ের রাণীবিবিকে দেখবো! আমি নেসার সাহেবকে নিয়ে মরিয়ম বেগমের ঘরে গেলুম। দেখি ঘর ফাঁকা, কেউ নেই। মেহেদী নেসার সাহেব ঘরে বসে রইলো—

—মরিয়ম বেগম কাঁহা চলি গয়ি?

—মিঞাসাহেব, মরিয়ম বিবি গিয়েছিল লুৎফুন্নিসা বেগমসাহেবার কাছে। আমি সব নজর রেখেছিলাম, কিন্তু নেসার সাহেবকে কিছু বলিনি। কিন্তু ওই মেহেদী নেসার শালা আমার নামে কাছারিতে নালিশ পেশ করেছে—আমি নাকি ঘুষ নিয়ে বাইরের আদমিকে চেহেল্-সুতুনের ভেতরে নিয়ে যাই। আমি ভাবতুম, দেখি নেসার সাহেব কী করে! যেই মরিয়ম বেগম ঘরে এসেছে, নেসার সাহেব হেসে হেসে বাত্ বলতে শুরু করেছে। আমি লুকিয়ে-লুকিয়ে লুৎফুন্নিসা বেগম-সাহেবাকে গিয়ে খবর দিয়ে এসেছি যে, নেসার সাহেব মরিয়ম বিবির ঘরে ঘুষেছে। খবর দিতেই লুৎফুন্নিসা বেগমসাহেবা একেবারে নানীবেগমকে নিয়ে বরাবর এসে হাজির। একেবারে হাতে-নাতে ধরে ফেলেছে নেসার সাহেবকে।

—তারপর?

মৌতাতের মধ্যেও সারাফত আলির টন্‌টনে কৌতূহল জেগে উঠলো—ঠিক কিয়া! উস্‌কা বাদ? তারপর?

—তারপর নেসার সাহেব নানীবেগমকে দেখেই ঘর থেকে ছুটে ভেগে গেল। বাইরে সাহেবের তাঞ্জাম দাঁড়িয়ে ছিল। তাতে ওঠবার আগে আমাকে বলে গেল,

রাণীবিবিকে মতিঝিলে আজ পাঠাতে হবে না, অন্য কাউকে পাঠিয়ে দে। বনের চিঁড়িয়াকে পহেলে নাচা-গানা শিখ্‌লাতে হবে, তবে তো বুলি বলবে! আমি শুনে মনে মনে হাসলুম মিঞাসাহেব। ভাবলুম আমিও খোজা নজর মহম্মদ, আমি তোমার মত বহোত্‌ আমীর-ওমরাহ্‌ দেখেছি, আমার নামে নালিশ পেশ করা! তা মিঞাসাহেব, আমিও একটা মতলব ঠিক করেছি—

—কী? ক্যা মতলব?

—ঠিক করেছি, আমিও নানীবেগমের দরবারে নালিশ পেশ করবো নেসার সাহেবের নামে!

—কী নালিশ?

—বলবো মরিয়ম বেগম লস্করপুরের তালুকদার কাশিম আলির লেড়কী নয়, ও হাতিয়াগড়ের জমিদারের দোসরা তরফের বিবি—ছোটি রাণীবিবি—

সারাফত আলি অবাক হয়ে গেল। জিজ্ঞেস করলে—এখনো নানীবেগমের মালুম হয়নি যে ও রাণীবিবি—

—না মিঞাসাহেব, আভি তক্‌ মালুম নেহি। সব-কুছ নেসার সাহেবের বদমাসি। নানীবেগমের কাছে কোরাণ ছুঁয়ে কসম্‌ খেয়েছে নেসার সাহেব যে ও হাতিয়াগড়ের রাণীবিবি নয়। হাতিয়াগড়ের বড়ি রাণীবিবি যে নানীবেগমের কাছে চিঠি লিখেছিল—

—তা তুই এক কাম কর নজর।

সারাফত আলি গড়গড়ার নলে দু'বার দম টেনে ধোঁয়া ছেড়ে বললে—তুই এক কাম কর, সকলকে আমার আরক পিলিয়ে দে। আরো বেশি করে আরক পিলিয়ে দে। ওই নানীবেগম, লুৎফুন্নিসা বেগম, কাউকে ভি ছাড়িসনি। চেহেল্‌-সুতুন ভেঙে গুঁড়িয়ে দে, গোরস্তান বানিয়ে দে—

নজর মহম্মদ বললে—নেহি মিঞাসাহেব, এ কভি নেহি হো সক্‌তা। চেহেল্‌-সুতুন চলে গেলে আমরা কী খাবো মিঞাসাহেব, নোকরি কে দেবে? আমরা কোথায় যাবো?

সারাফত আলি বললে—তোরা মরে যাবি, আমরা ভি মরে যাবো, নবাব, বাদ্‌শা, আমীর-ওমরা সবাই মরে যাবে, আবার নয়া দুনিয়া বন্‌বে চেহেল্‌-সুতুনের গোরস্থানের ওপর—

—আপনার বড় গোসা মিঞাসাহেব চেহেল্‌-সুতুনের ওপর!

—না রে নজর, নয়া দুনিয়া হলে ইনসানের ভালো হবে, তাই জন্যেই তো বলছি। চেহেল্‌-সুতুন থাকলে ইনসানের ভালো হবে না। সারা হিন্দুস্থানটাকে আজ বাদ্‌শা চেহেল্‌-সুতুন বানিয়ে ফেলেছে। চক্‌-বাজারের মানুষরা মরে যাচ্ছে রে নজর। খেতে পাচ্ছে না গরীব লোকেরা, দু'মুঠো ভিক্ষে দিলে তাদের কোনো ফায়দা হবে না, তাতে কেবল ফকির ভিখিরির দল বেড়ে যাবে রে নজর—আসলি ফায়দা হবে না হিন্দুস্থানের—

নজর মহম্মদ এত কথা বুঝতে পারে না। সে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো সারাফত আলির মুখের দিকে। তার কাছে এসব আজব কথা। চেহেল্‌-সুতুনের ভেতরে সে বরাবর দেখে এসেছে স্বচ্ছলতা। সে দেখেছে টাকা-মোহর আর মেয়েমানুষের ছড়াছড়ি। দারিদ্র্য কাকে বলে তা তাকে দেখতে হয়নি কখনো। বুড়ো মিঞাসাহেবের কথা শুনে সে যেন ঘাবড়ে গেল।

—এ কী আজব বাত্‌ বলছেন মিঞাসাহেব? নয়া-দুনিয়া কী করে বন্‌বে?

নবাব তো দুনিয়ার মালিক, নবাব তো খোদাতালা—

সারাফত আলি হেসে উঠলো দাঁত বার করে। বললে—খোদাতালা হলো ফিরিঙ্গীরা—

—ফিরিঙ্গীরা?

—হ্যাঁ রে, ফিরিঙ্গীরা। খোদাতালাই ফিরিঙ্গী বাচ্ছাদের পাঠিয়ে দিয়েছে হিন্দুস্থানে চেহেল্-সুতুন ভাঙবে বলে, দুনিয়া থেকে এই চেহেল্-সুতুন বিলকুল বরবাদ করবে বলে।

বলে সারাফত আলি আরো জোরে হাসতে লাগলো।

পেছনের ঘরের মেঝের ওপর কান্ত শুয়ে শুয়ে সব শুনছিল। সারা-রাত মাঝিদের সঙ্গে গল্প-গাছা করেছে, অনেকখানি রাস্তা হেঁটেছে, তারপর বশীর মিঞার কাছে গিয়ে দেখা করেছে। আর তারপর খাওয়া-দাওয়া করে ঘুমিয়ে পড়েছিল। আসলে মনটাই ভালো ছিল না তার। তন্দ্রার মধ্যে মনে হচ্ছিল কার গলা যেন শুনতে পাচ্ছে। আস্তে আস্তে তন্দ্রাটা কেটে যেতেই স্পষ্ট শুনতে পাওয়া গেল সারাফত আলির গলা। বোধহয় খদ্দেরের সঙ্গে কথা বলছে মিঞাসাহেব। কিন্তু তারপরেই বুঝতে পারলে খদ্দের আর কেউ নয়, নজর মহম্মদ। বুঝতে পেরেই উঠে বসলো। বুঝলো, মরালীকে নিয়েই কথা হচ্ছে। মরালীকে মেহেদী নেসার সাহেব দেখতে এসেছিল। তারপর নানীবেগম আসাতে বেঁচে গেছে সে।

তারপর আরো কথা শোনবার জন্যে কান পেতে রইলো।

নজর মহম্মদ বললে—চেহেল্-সুতুন কখনো বরবাদ হতে পারে মিঞাসাহেব?

সারাফত আলি বললে—চেহেল্-সুতুন তো চেহেল্-সুতুন, হিন্দুস্থানের বাদ্শা ভি বরবাদ হতে পারে—। তোরাই তো বাদ্শাকে বাদ্শা বানিয়েছিস, তোরাই ফিন্ মর্জি হলে বাদ্শাকে হটিয়ে দিতে পারিস! যে বাদ্শা চেহেল্-সুতুন বানায় সে-বাদ্শাকে তোরা কেন রেখেছিস্? তাকে হটিয়ে দে। না হটাতে পারিস তো বাদ্শার চেহেল্-সুতুন হটিয়ে দে!

নজর মহম্মদ আর বোধহয় শুনতে পারলে না। তার বোধহয় ভয়-ভয় করতে লাগলো। হিন্দুস্থানের মোগল-পাঠান নবাব-বাদ্শার নিমক খেয়ে-খেয়ে যার হাড়-মাংস সমস্ত কিছু বেড়ে উঠেছে, তার এসব কথা শুনলে তো ভয় করবেই।

—আমি তাহলে আসি মিঞাসাহেব, আদাব—

আর সঙ্গে সঙ্গে কান্ত এসে হাজির হয়েছে সামনে।

—আরে কান্তবাবু? তুই কখন লৌট এলি?

নজর মহম্মদও ফিরতে গিয়ে কান্তকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়লো। এই বাবুজীকে চেহেল্-সুতুনে নিয়ে গেলেই একটা মোহর দেবে সারাফত আলি। এক ফুঁ দিয়ে এক-মোহরের মালিক হওয়া যাবে। অত সহজে এ-বাবুজীকে এড়ানো যায় না।

—আজ ভি চেহেল্-সুতুন যায়েঙ্গে জনাব?

সারাফত আলি জিজ্ঞেস করলে—কখন এলি রে তুই কান্তবাবু? আমার তো মালুম পড়েনি—

কান্ত সে-কথার উত্তর না-দিয়ে বললে—আমি আর ও-নোকরি করবো না মিঞাসাহেব। আমার আর ভালো লাগছে না। আমার আর ভালো লাগছে না ও-নোকরি করতে!

—তা না-করিস ছেড়ে দে। আমি তো তোকে বলেই দিয়েছি আমি তোকে

খিলাবো। লেক্‌ন্‌ চেহেল্‌-সতুন পে যানে হোগা, ওই যা তোকে বলেছি সব করতে হবে!

নজর মহম্মদ আবার জিজ্ঞেস করলে—আজ ভি যাইয়ে গা জনাব?

সারাফত আলি বললে—হ্যাঁ রে বাবা, যাবে, যাবে! তোকেও তো বলেছি মোহর মিলে গা—

কথা আদায় করে নিয়ে নজর মহম্মদ চলে যাচ্ছিল। হঠাৎ রাস্তার দিকে একটা হই-হই হল্লা উঠলো। চক্‌-বাজারের সমস্ত লোক হই-হই করে ভিড় করে উঠলো কাকে ঘিরে। ক্যা হুয়া? কী হয়েছে? সকলের মুখেই এক কথা। চক-বাজারের দোকানদাররা পর্যন্ত ছুটে গিয়ে হাজির হলো রাস্তার মধ্যে। একটা বুড়ো মানুষ মাথায় করে সরাব নিয়ে যাচ্ছিল। মাটির হাঁড়িতে সরাব ছিল। পাশ দিয়ে নবাবের হাতীর দল পিলখানায় যাচ্ছিল, ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছে বুড়োকে। জায়গাটা গন্ধে ভুর-ভুর করছে একেবারে।

কান্ত কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। চারদিকে মানুষের ভিড়। ভেতর দিকে ঢোকা দায়।

—কী হয়েছে লোকটার?

—আরে মশাই, মিঞাসাহেব আর একটু হলে হাতীর পায়ের তলায় চাপা পড়তো। খোদা বাঁচিয়ে দিয়েছে—

—লোকটা কে?

—ইব্রাহিম খাঁ।

—কে ইব্রাহিম খাঁ?

—আরে ইব্রাহিম খাঁকে চেনেন না জনাব? মতিঝিল-এ সরাবখানায় কাম করে। সত্তর বছরের বুড়ো মিঞাসাহেব!

ততক্ষণে অন্য লোকেরা বেশ মজা পেয়ে গিয়েছে। খাঁটি সরাব। নবাব-নবাবজাদাদের খাবার জন্যে সরাবখানায় নিয়ে যাচ্ছিল। খুব দামী মাল। চক-বাজারের ভাঁটিখানায় যে-সরাব বিক্রি হয় এ তা নয়। এর অনেক কিম্মৎ। রাস্তায় পড়ে গিয়ে সরাব চারদিকে ছত্রাকার হয়ে গিয়েছিল। ভাঙা হাঁড়ির টুকরোর মধ্যে যেটুকু এখানে ওখানে পড়েছিল তাই নিয়েই কাড়াকাড়ি পড়ে গিয়েছিল তখন। হাঁড়ির কানাগুলো যারা পেয়েছে তারা তা চেটে খাচ্ছে। আহা, খাসা মাল। খাস্‌ খোরাসান্‌ ইস্তানবুল থেকে আমদানী! বেগম-বাদ্‌শা-নব্যবদের জন্যে বাছাই করা আঙুরের রস দিয়ে বানানো। বঢ়িয়া চিজ্‌। লোকে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে মাটির ওপর। তখনো যদি কিছু পড়ে থাকে তলানি। কিন্তু ইব্রাহিম খাঁ তখনো কাতরাচ্ছে। সে দিকে কারো নজর নেই।

নজর মহম্মদও দেখছিল। বললে—খুদ দারু পিয়েছে—

হাতীর দল যেমন যাচ্ছিল তেমনি সোজা চলে গেছে পিলখানায়। নবাবের হাতী। ফিরিঙ্গীদের সঙ্গে লড়াই ফতেহ্‌ করে এসেছে, কে মরলো কে বেঁচে রইলো তা দেখবার দায় নেই তাদের। নবাবের নিজামতে মানুষের চেয়ে হাতীর কদর বেশি। মানুষ মরে মরুক, কিন্তু একটা হাতীর অনেক দাম।

হঠাৎ হৈ-হৈ করে কোতোয়ালের লোক এসে হাজির। ভিড় হটাও ভিড় হটাও। লাঠি উঁচিয়ে তাড়া করতে শুরু করেছে তারা। বড়ে-আদমি লোকদের তাঞ্জামের রাস্তা ছাড়ো। নবাব-বাদশাদের ঘোড়া যেতে পারবে না, হাতী যেতে পারবে না, পালকি যেতে পারবে না। হটো, হারামজাদ—

কোতোয়ালের লোকদের এরা ভারি ভয় করে। ঊর্ধ্বশ্বাসে যে যেদিকে পারলে দৌড়তে লাগলো। নজর মহম্মদ এক ফাঁকে কান্তর হাতটা ধরলে। বললে—চলিয়ে জনাব—ইধার আইয়ে, এবার মারপিট শুরু হবে—

কিন্তু ইব্রাহিম খাঁ তখনো কাতরাচ্ছে। তার দিকে কেউ দেখছে না।

কান্ত কাছে গিয়ে ইব্রাহিম খাঁর মুখখানা নিচু হয়ে দেখলে। তারপর পেছন থেকে তার পিঠেও একটা লাঠির চোট এসে পড়লো।

নজর মহম্মদ দূর থেকে দেখছিল। সেখান থেকেই হাঁকলে—ইধার আইয়ে বাবুজী, ভাগ যাইয়ে—

কান্তর মনে হলো পিঠটা যেন তার ভেঙে গেছে। কিন্তু ইব্রাহিম খাঁর চোটটা বোধ হয় আরো বেশি। সে তখনো কাতরাচ্ছে।

কান্ত নিচু হয়ে জিজ্ঞেস করলে—হাঁটতে পারবে খাঁ-সাহেব। হেঁটে যেতে পারবে?

ইব্রাহিম খাঁ উত্তর দিতে পারলে না। কান্ত আর দেরি করলে না। কোতোয়ালের সেপাইরা তখন পাগলের মত যাকে সামনে পাচ্ছে তাকেই পিটছে।

কান্ত তাড়াতাড়ি ইব্রাহিমকে পাঁজা-কোলা করে তুললো। সত্তর বছরের বুড়ো হলে কী হবে, একেবারে ফাঁপা। শুকনো ক'খানা হাড় শুধু শরীরে, আর কিছু নেই। কোনোরকমে তুলে নিয়েই সারাফত আলির দোকানে এসে নামিয়ে দিলে।

বললে—মিঞাসাহেব, এখনো মরেনি লোকটা, একটু জল দেবো মুখে—যদি বেঁচে যায়—

বাদ্‌শা এল। কান্ত বললে—একটু জল আনো তো—

সারাফত আলি মুখে কিছু বললে না। কিন্তু মুখের ভাব দেখে মনে হলো খুশী হয়নি। নবাব নিজামতের কোনো লোকের ওপরই সে খুশী নয়। জিজ্ঞেস করলে—এ কৌন হ্যায়?

কান্ত বললে—শুনলাম, মতিঝিলে সরাবখানায় খিদ্‌মদ্‌গারের কাজ করে ইব্রাহিম খাঁ—

সারাফত আলি কিছু বললে না। শুধু জোরে শব্দ করে গড়গড়ার নলে তাম্বাকুর ধোঁয়া টানতে লাগলো।
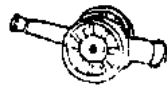
বখ্‌তিয়ার খিলিজির পর থেকে নবাব আলীবর্দী খাঁ পর্যন্ত ইতিহাসের একটা গতিপথ আছে। সে-গতিপথে অনেক অত্যাচার অনাচার অবিচার ঘটলেও মুর্শিদকুলি খাঁর পর থেকে দেশে একটা শৃঙ্খলা আনবার চেষ্টা হয়েছিল। সে চেষ্টার খানিকটা এসেছে মোগল-পাঠানদের নিজেদের লড়াই-মারামারি থেকে। আর খানিকটা এসেছিল দেশের মানুষের আত্মরক্ষার তাগিদ থেকে।

হয়তো এই-ই নিয়ম। হয়তো এমনিই হয়ে থাকে।

হয়তো অন্ধকারের পাশেই আলো থাকে। অত্যাচারের পাশেই থাকে ন্যায়-বিচার। একদিকে ইতিহাস যখন অত্যাচারের কলঙ্কে পঙ্কিল হয়ে উঠেছে, তখনই আর একদিকে উদয় হয়েছে তথাগত বুদ্ধদেবের, চৈতন্যদেবের, আর শঙ্করাচার্যের। কিন্তু মুর্শিদকুলি খাঁর চেহেল্‌-সুতুনের মধ্যে তখনো সেই প্রাগৈতিহাসিক

অন্ধকার। তার এপাশেও আলো নেই, ওপাশেও হতাশা। ওর ভেতরে দিন-রাত, ধর্ম-অধর্ম, পাপ-পুণ্য, সংস্কার-কুসংস্কার সব একাকার। ওখানে তখন পৃথিবী তার আদিম অবয়ব নিয়ে নিশ্চল দারুভূত হয়ে আছে। বুদ্ধদেবের নির্বাণ-মন্ত্র ওখানে পৌঁছতে পারেনি, চৈতন্যদেবের আচণ্ডালপ্রীতি কোনো রেখাপাত করেনি, শঙ্করাচার্যের ব্রাহ্মণ্য বাণী ওদের কাছে গিয়ে বোবা হয়ে গেছে।

তাই যেদিন বোবা জুবেদার শরীরটা নিয়ে চেহেল্-সুতুনের ভেতরে টানা-হ্যাঁচড়া চললো সেদিন কারো কাছে সে-ঘটনা নতুন মনে হয়নি। এ আর এমন কী! এ তো সহজ! এ তো স্বাভাবিক। আদিযুগ থেকে তো এমনিই হয়ে আসছে। আবার অনন্তকাল ধরেও এমনিই চলবে! ও নিয়ে অত বিচলিত হচ্ছ কেন? যে-বাচ্ছার বাপের ঠিক নেই, সেই বাচ্ছাকে যে পেটে ধরেছে তার শাস্তি হবে না? তার শাস্তি যদি না হয় তো চেহেল্-সুতুন যে অনাসৃষ্টিতে ভরে যাবে!

চেহেল্-সুতুনের চবুতরের আরো পুবে যেখানে ধোবিখানা, সেই দিকটাতে সকাল থেকেই ছুতোর মিস্ত্রীদের কাজ চলছিল। একটা উঁচু লম্বা কাঠের কাঠগড়া। দুপাশে দুটো কাঠের খুঁটি। তার মাথায় শক্ত দুটো হাতল। ওদিকটায় বেশি কেউ যায় না। রাতের বেলায় জায়গাটা খাঁ খাঁ করে। লাল প্যাথরে বাঁধানো জায়গাটার ওপর দিনের বেলা কিছু ঘাগরা-ওড়নী-কাঁচুলি কেচে শুকোতে দেয় ধোপারা। যখন তাও দেয় না তখন খিলেনের ভেতর থেকে পোষা পায়রার ঝাঁক এসে ওইখানে বসে পাখা চুলকোয়। পেখম তোলে। চানা খায়। কিন্তু সেদিন সকাল থেকেই যেন চাপা-চাপা কানা-ঘুষো চলেছে। চেহেল্-সুতুনের মহলে-মহলে ফিস্-ফিস্ গুজ-গুজ।

—কে? কাকে লটকাবে বললি?

বাঁদীরা বেগমদের কাছে খবরটা দিয়ে তারিফ পাবার আশা করে।

—ওমা, তাই নাকি? বোবা মাগীর পেটে-পেটে এত? কে করলে রে? মানুষটা কে?

সবাই যেন বেশ খুশী-খুশী। সবাই-ই ডুবে ডুবে জল খায়, তবু যে-ধরা পড়েছে তার ওপরেই যেন সকলের বিষ-নজর। নাগর তো আমাদের ঘরেও আসে বাছা, ঘরে এসে রাত কাটায়, কিন্তু এমন করে ধরা তো পড়ি না। কতদিন ন্যাকড়া জড়ানো রক্ত-মাখানো ডেলাটা চেহেল্-সুতুনের পাঁচিল ডিঙিয়ে বাইরে চুপি চুপি ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। ভোরবেলা কাক-চিল-শকুনির ভিড় হবার আগে পর্যন্ত কেউ-ই টের পায়নি। আর টের পেলেও পীরালি খাঁর হাতে কিছু গুঁজে দিলেই সব ধামা-চাপা পড়ে গেছে। কেউ জানতে পারেনি কোন্ বেগমের ঘর থেকে তা ফেলা হয়েছে, আর কে-ই বা দায়ী!

—বেগমসাহেবা, চলো চলো, দেখবে চলো জুবেদাকে ধরে এনেছে—

ও-ও তো একটা কাজ। সারা দিন-রাত খেয়েদেয়ে ঘুমিয়েও তো সময় কাটে না কারো। কত আরক খাবে, কত রাত জাগবে, কত গান গাইবে, কত নাচ নাচবে! তবু যে ওদের সময় ফুরোতে চায় না। তক্কি বেগম জাফরিটার আড়ালে গিয়ে দেখছে। বুব্বু বেগম গিয়ে দেখছে, গুলসন বেগম গিয়ে দেখছে। সবাই জড়ো হয়েছে আড়ালে। সবাই লুকিয়ে লুকিয়ে দেখবে। জাফরির ফাঁক দিয়ে বাইরের সব জিনিস স্পষ্ট দেখা যাবে, কিন্তু বাইরের লোক ভেতরের কিছুই দেখতে পাবে না।

পীরালি খাঁ তদারকি করছিল কাঠগড়ার কাজে। ওদিক থেকে চারজন খোজা

জুবেদাকে ধরে নিয়ে এল হিড়-হিড় করে। বাঁদীটার কাপড় জামা কাঁচুলি সব খুলে নিয়েছে। উদোম চেহারা একেবারে। আহা, আসতে কী চায়। কথাও বলতে পারে না, চেঁচিয়ে কাঁদতেও পারে না; শুধু গলা দিয়ে এক-রকম গোঁ-গোঁ আওয়াজ বেরোচ্ছে। আর নজর মহম্মদ, বরকত আলি ওরা চাবুক নিয়ে শাসাচ্ছে—

টানতে টানতে হিঁচড়োতে হিঁচড়োতে একেবারে সোজা কাঠগড়াটার সামনে নিয়ে এল। তারপর একজন ধরলে জুবেদার পা দুটো, আর একজন ঘাড়টা। ধরে ঝুলিয়ে দিলে। পা দু'টো ওপরের হাতলের সঙ্গে বেঁধে মাটির দিকে মাথাটা ঝুলিয়ে দিলে।

সমস্ত চেহেল্-সুতুনের যেন আনন্দে একেবারে দম বন্ধ হয়ে পড়বার অবস্থা।

তারপর নিচেয় গর্ত করে, হাত দুটো মাটিতে পুঁতে জম্পেশ করে কাঠের খুঁটির সঙ্গে দড়ি দিয়ে বেঁধে দিলে। যেন হাত না নাড়তে পারে।

ভয়ে আতঙ্কে বোবা বাঁদীটা গোঁ গোঁ করে গোঙাতে লাগলো প্রাণপণ!

বেশ চলছিল সব। চারদিকে বেশ মজা দেখবার ভিড় জমেছিল। এমনি করেই পাপীর শাস্তি হয়ে থাকে চেহেল্-সুতুনে। পাপের ভাঁড়ারের মধ্যে পাপীকে প্রশ্রয় দেওয়ার রীতি নেই। তাই এমনি করেই পাপীর শাস্তি চিরকাল ধরে এখানে চলে আসছে। যেদিন থেকে পৃথিবীতে সূর্যোদয় শুরু হয়েছে সেই দিন থেকেই এই রেওয়াজ। জাফরির ফাঁক দিয়ে যারা এ-দৃশ্য দেখছে, তাদের কাছে এ কিছু নতুন নয়। এমনি করে তিন দিন ধরে ঝুলিয়ে রাখা হবে জুবেদাকে। এক কণা রুটি দেওয়া হবে না, এক ফোঁটা জল দেওয়া হবে না, এক মুঠো করুণাও কেউ দেবে না। তিন দিন পরেও যদি জুবেদা বেঁচে থাকে তো তখন...

হয়তো এমনি করেই আরো অনেকক্ষণ ধরে মজা দেখতো চেহেল্-সুতুনের মানুষরা।

কিন্তু হঠাৎ একটা কাণ্ড ঘটলো।

ওদিক থেকে পাগলের মত ছুটতে-ছুটতে এসেছে মরিয়ম বেগমসাহেবা।

পীরালি খাঁ দেখতে পেয়েই ইঙ্গিত করলে নজর মহম্মদকে। আর নজর মহম্মদও ইঙ্গিতটা বুঝলো। বোঝবার সঙ্গে সঙ্গে মরিয়ম বেগমসাহেবার পথ আটকে দাঁড়িয়েছে।

—আমার বাঁদী। আমার বাঁদীকে তোমরা ও কী করছো? ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও ওকে—

মরালীর চিৎকারটা আর্তনাদ হয়ে যেন সমস্ত চেহেল্-সুতুনটা একেবারে কাঁপিয়ে তুললো। সকলের মনে হলো যেন এতদিন পরে বোবা চেহেল্-সুতুনটারও মুখে কথা ফুটলো। মরিয়ম বেগম যেন চেহেল্-সুতুনের সকলের হয়ে এই প্রথম এক প্রবল প্রতিবাদ পেশ করলো।

জাফরির ফাঁকে তক্কি বেগম পাশের বাঁদীকে জিজ্ঞেস করলে—উও কৌন্?

বাঁদী বললে—কোই নয়ী বেগমসাহেবা হোগী—

বব্বু বেগমও অবাক হয়ে গেছে। আগে কখনো মরিয়ম বেগমকে দেখেনি। সেও জিজ্ঞেস করলে তার বাঁদীকে—উও কৌন্?

জাফরির ফাঁকে ফাঁকে যত বেগমসাহেবা ছিল, সকলের মুখেই ওই একই জিজ্ঞাসা। উও কৌন্? এত সাহস তো এতদিন কারোর হয়নি। এর আগেও কত বেগমসাহেবার কত বাঁদীর ঠিক এমনি করেই শাস্তি হয়েছে, কিন্তু আগে তো কই এমন করে কেউ প্রতিবাদ করতে ঝাঁপিয়ে পড়েনি এখানে!

কাঠগড়ার ওপর তখনো উলঙ্গ বাঁদীটার পাপী দেহ ঝুলছে আর মুখ দিয়ে গোঁ গোঁ শব্দ করে গোঙাচ্ছে।

—খোল, ওকে খুলে দাও, ওর পায়ের দড়ি খুলে দাও—ও মরে যাবে যে—

পীরালি খাঁ নজর মহম্মদকে আর একবার চোখ টিপে ইঙ্গিত করলে। নজর মহম্মদও আর দেরি করলে না। মরালী কাঠগড়ার ওপর উঠে নিজেই বাঁদীটার পায়ের দড়ি খুলে দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই নজর মহম্মদ মরিয়ম বেগমসাহেবার একটা হাত ধরে ফেলেছে।

মরালী এক-ঝটকায় সঙ্গে সঙ্গে নজর মহম্মদের হাতটা ছাড়িয়ে নিয়েছে।

—তোমরা ভেবেছো কী? বোবা মেয়েমানুষ পেয়ে ভেবেছো যা খুশী তাই করবে? সরে যাও এখান থেকে, সরে যাও—

এবার নজর মহম্মদের সঙ্গে বরকত আলিও এল মরিয়ম বেগমকে সামলাতে।

মরালী এবার যেন একেবারে ফেটে চৌচির হয়ে গেল।

—নানীবেগমসাহেবা—নানীবেগমসাহেবা—

চেহেল্-সুতুন যেন তোলপাড় হয়ে যাবে মরিয়ম বেগমের চিৎকারে। নজর মহম্মদ তাড়াতাড়ি এসে মরালীর মুখটা চাপা দিয়ে দিয়েছে। কিন্তু হাতিয়াগড়ের শোভারাম বিশ্বাসের মেয়ে অমন অনেক নজর মহম্মদকে দেখেছে। একদিন মরালীর ভয়ে সমস্ত হাতিয়াগড়ের মানুষ কাঁপতো। সেই মরালীকে অত সহজে কাবু করা সম্ভব নয়। মরালী নজর মহম্মদের হাতটা দাঁত দিয়ে জোরে কামড়ে ধরলে। কামড়াতেই নজর মহম্মদ 'গিয়া' 'গিয়া' বলে চেঁচিয়ে উঠে হাত ছেড়ে দিয়েছে।

এবার পীরালি খাঁ আর দেরি করলে না। নিজেই এগিয়ে এসে মরিয়ম বেগমকে ধরতে গেল।

কিন্তু তার আগেই নানীবেগম এসে হাজির হয়েছে। সঙ্গে লুৎফুন্নিসা বেগম।

নানীবেগম শান্ত গলায় ডাকলে—পীরালি খাঁ—

পীরালি সঙ্গে সঙ্গে নানীবেগমের দিকে মুখ করে তিনবার কুর্নিশ করে মাথা নিচু করে দাঁড়ালো।

—মরিয়ম বেগমসাহেবাকো ছোড় দো—

—বেগমসাহেবা, জুবেদাকে কাঠগড়ায় লটকে দিয়েছি, নেসার সাহেবের হুকুমে—মরিয়ম বেগমসাহেবা বাধা দিচ্ছে—

মরালী দৌড়ে নানীবেগমের কাছে এসে দাঁড়ালো।

বললে—ও যে মরে যাবে নানীবেগমসাহেবা, ও মেয়েমানুষ বলে কি ওর এত হেনস্থা, ওকে কেউ দেখবে না—ওকে ছেড়ে দিতে বলুন না আপনি—

নানীবেগম মরালীর দিকে চাইলে। তারপর শান্ত গলায় বললে—তুমি মা ওদের ব্যাপারে কেন মাথা ঘামাচ্ছ? ওদের কাজ ওরা করুক, ওতে বাধা দিতে নেই—

—কিন্তু ও যে বোবা! ও যে কথা বলতে পারে না!

—কিন্তু যা নিয়ম তা তো মানবেই ওরা। ওদের কাজ ওরা করবেই!

মরালী বললে—নানীবেগমসাহেবা, আপনি আমার মায়ের মতন, আপনি জুবেদারও মায়ের মতন, আপনার চোখের সামনে এত বড় অন্যায়টা ঘটবে আর আপনি কিছু বলবেন না ওদের? নিয়মটাই বড় হবে আপনার কাছে? মায়া-দয়াটা

কিছু নয়? আপনার নিজের পেটের মেয়ের বেলায় যদি ওমনি হতো, তাহলে? আপনি তা চোখ দিয়ে দেখতে পারতেন?

নানীবেগম প্রথমে কিছু বললে না। তারপর বললে—তুমি মা নতুন এসেছো এখানে, তাই অত বিচলিত হয়ে উঠেছো, আর কিছুদিন থাকলেই সব বুঝতে পারবে—

মরালী বললে—সে যখন বুঝতে পারবো তখন বুঝবো, এখন ওকে ছেড়ে দিতে বলুন আপনি—ও গোঁ গোঁ করছে, ও নির্ঘাৎ মরে যাবে, আর বাঁচবে না—

নানীবেগম শান্ত গলায় বললে—তুমি মা ও-সব কথা ভেবো না, তুমি এখান থেকে চলে যাও, আমিও চলে যাচ্ছি, চেহেল্-সুতুনের নিয়ম ওরা মানবেই, ও কেউ ঠেকাতে পারবে না—

—কিন্তু তাহলে আপনি আছেন কী করতে? আপনি তাহলে কোরাণ পড়েন কী করতে? কোরাণে কি এই সব কথা লেখা আছে?

এবার লুৎফুন্নিসা বেগম এগিয়ে এল। বললে—বহেন, এ চেহেল্-সুতুন, এখানে দুনিয়াদারির কানুন খাটবে না—তুমি কেঁদো না বহেন, রোও মাত—

বলে মরালীর চোখের জল নিজের ওড়নী দিয়ে মুছিয়ে দিতে লাগলো।

ওদিকে বুঝি নজর মহম্মদ নেসার সাহেবকে কখন গিয়ে খবর দিয়ে এসেছিল। হঠাৎ এরই মধ্যিখানে মেহেদী নেসার সাহেব আসতেই সব আবহাওয়া যেন থমথমে হয়ে এল। শুধু ঝুলে থাকা উলঙ্গ বাঁদীটার গলা থেকে বেরোন গোঁ গোঁ শব্দ ছাড়া আর সব কিছু নিস্তব্ধ!

—বেগমসাহেবা!

নানীবেগম নেসার সাহেবের দিকে চেয়ে রইলো।

মেহেদী নেসার তেমনি মাথা নিচু করে বললে—বেগমসাহেবা, নবাব মীর্জা মহম্মদ মরিয়ম বেগমসাহেবাকে মতিঝিলে এত্তেলা দিয়েছে—

কথাটা শেষ হবার আগেই মরালী চিৎকার করে উঠলো—আমি মতিঝিলে যাবো না নানীবেগমসাহেবা, আমি মতিঝিলে যাবো না—

নেসার সাহেব বললে—নবাবের হুকুম যে এটা মরিয়ম বেগমসাহেবা!

—আমি যাবো না, আমি কিছুতেই যাবো না মতিঝিলে—বলে মরালী হঠাৎ নানীবেগমকে গিয়ে জড়িয়ে ধরলে প্রাণপণে। আর কিছুতেই ছাড়তে চায় না। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য!

বললে—আপনার পায়ে পড়ি নানীবেগমসাহেবা, আমি আপনার মেয়ের মতন—

—কিন্তু মীর্জা যে তোমাকে ডেকেছে মা, না গেলে সে যে গোসা করবে! সে যে খুব রাগী মানুষ! মরিয়ম বেগমের নাম করে যখন ডেকেছে, তখন না-গেলে নবাবের অপমান হয়। না মা মরিয়ম, তোমার কোনো ডর নেই, আমি বলছি তুমি যাও—

হঠাৎ মরালী নানীবেগমের মুখের ওপর মুখ রেখে বললে—কিন্তু মা, আমি তো মরিয়ম বেগম নই—

—মরিয়ম বেগম নও? লস্করপুরের তালুকদার কাশিম আলির লেড়কী নও—

মরালী বললে—না মা, আমি হাতিয়াগড়ের জমিদারের ছোট বউ, আমি আজ সত্যি কথাই বলি, আমি হাতিয়াগড়ের রাণীবিবি!

কথাটা বলবার সঙ্গে সঙ্গে যেন সারা চেহেল্‌-সুতুনে বিদ্যুৎ চমকে গেল। নানীবেগম অবাক হয়ে মেহেদী নেসার সাহেবের দিকে চেয়ে বললে—হাতিয়াগড়ের রাণীবিবি!

কিন্তু মেহেদী নেসার তখন সেখান থেকে নিঃশব্দে সরে গেছে। নানীবেগমের হঠাৎ মনে পড়লো বহুদিন আগে হাতিয়াগড়ের বড় রাণীবিবি তাকে লুকিয়ে লুকিয়ে একটা খত্‌ লিখেছিল। তখন নেসার বলেছিল সে-সব মিথ্যে কথা। শেষকালে সেই খত্‌টার কথাই সত্যি হলো?

নানীবেগম মরালীকে বুকের মধ্যে আরো জোরে জড়িয়ে ধরলে।

লুৎফুন্নিসা বেগমও তখন মরালীকে সান্ত্বনা দিতে লাগলো—বহেন, তোমার কোনো ডর নেই, তুমি কে'দো না বহেন—

ওদিকে কাঠগড়ার ওপরে বোবা জুবেদা তখনো গোঁ গোঁ করে গোঙাচ্ছে, আর তার মুখ দিয়ে গল্‌ গল্‌ করে সাদা সাদা ফেণা বেরোচ্ছে।

সারাফত আলির খুশ্‌বু তেলের দোকানেও তখন সকাল হয়েছে। ইব্রাহিম খাঁকে সারা রাত হাওয়া করেছে কান্ত। বুড়ো মানুষ। কিন্তু টাকার জন্যে সরাবের হাঁড়া বয়ে নিয়ে যেতে হয় ভাটিখানা থেকে। ইস্তানবুল খোরাসান, দিল্লী থেকে কিম্মৎদার দারু মুর্শিদাবাদের ঘাটে আসে নৌকায় করে। সেই হাঁড়া বয়ে বয়ে নিয়ে যেতে হয় মাথায় করে। বয়ে নিয়ে গিয়ে মতিঝিলের সরাবখানায় রাখতে হয়। মতিঝিলের ঠাণ্ডা ঘরের ভেতর সেই সরাব জমা হয় নবাবের জন্যে। মহ্‌ফিলের দিন সবাই সেই সরাব খায়। শুধু নবাব সরাব খায় না। কিন্তু নবাব না খেলেও সাগ্‌রেদরা খায়, নবাবের ইয়াররা খায়। মেহেদী নেসার, ইয়ারজান, সফিউল্লা সাহেব খায়!

—তা তোমার তো খুব মেহনত্‌ হয়। তুমি কত তলব পাও খাঁ সাহেব?

ইব্রাহিম খাঁ সারা রাত ঘুমিয়ে তখন একটু সেরে উঠেছিল। বললে—তিন টাকা জনাব!

তিন টাকা মাত্তর! কিন্তু দিনের আলোয় ইব্রাহিম খাঁর মুখের দিকে চেয়ে কান্ত আরো নিচু হয়ে কী যেন দেখতে লাগলো। বড় চেনা-চেনা লাগলো যেন মুখখানা।

ইব্রাহিম খাঁও দেখলে কান্তকে। কান্তকে যেন এতক্ষণে চিনতে পারলে।

কান্তও বললে—আচ্ছা খাঁ সাহেব, তোমাকে যেন কোথায় দেখেছি দেখেছি মনে হচ্ছে বলো তো?

ইব্রাহিম খাঁ হঠাৎ বলা-কওয়া-নেই তেড়ে-ফুড়ে উঠে বসলো।

—উঠছো কেন? শুয়ে থাকো, শোও—শোও—

কিন্তু তখন আর কে তার কথা শোনে। বুড়ো উঠে একেবারে পালাবার জন্যে বাইরে চলে যায় আর কি! কান্তও বুড়োর কাণ্ড দেখে অবাক হয়ে গেল। এমন হঠাৎ উঠে পড়বার কী হলো!

কিন্তু দরজার কাছে আসতেই দিনের আলোয় মুখখানা দেখে স্পষ্ট চিনতে পারলে কান্ত।

—আরে, তুমি সেই সচ্চরিত্র পুরকায়স্থ মশাই না?

বুড়ো হঠাৎ নিজের মুখখানা দু হাতে ঢেকে ছুটে পালাবার চেষ্টা করতে লাগলো। বলতে লাগলো—না না, আমি ইব্রাহিম খাঁ, আমি ইব্রাহিম খাঁ—

কিন্তু পালাবার আগেই কান্ত পুরকায়স্থ মশাইএর হাতখানা জোরে ধরে ফেলেছে। ধরে ফেলতেই পুরকায়স্থমশাই একেবারে ছেলেমানুষের মত হাউ-হাউ করে কেঁদে ফেললে।

সচ্চরিত্র পুরকায়স্থকে দেখে কান্ত সত্যিই অবাক হয়ে গিয়েছিল। সেই বুড়ো মানুষটার যে এমন দশা হবে তা কল্পনাও করতে পারেনি। তার সংসার গেছে, বউ-ছেলেমেয়ে গেছে। গাঁয়ের লোকও তাকে দূর-দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছে। শুধু তাই নয়, তার ব্যবসাও গেছে। কতদিন লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়িয়েছে। না-খেয়ে দিন কাটিয়েছে, ছেলেমেয়েগুলোর জন্যে মন কেমন করেছে। রাতের অন্ধকারে গ্রামে গিয়ে তাদের দেখতে চেয়েছে। কিন্তু লোকের ভয়ে আবার চলে এসেছে সেখান থেকে। তারপর এখানে এসে মতিঝিলের নেয়ামত খাঁকে ধরে এই চাকরি পেয়েছে। বুড়ো বয়েসে এই খাটুনির চাকরি করবার ক্ষমতাও নেই শরীরে, অথচ না করেও উপায় নেই। দুটো খেতে তো হবে।

কান্ত জিজ্ঞেস করলে—তা তোমাকে কী কী কাজ করতে হয়?

সচ্চরিত্র বললে—বাবাজী, কাজের কি আর অন্ত আছে? মদের গন্ধে আমার বমি আসে, কিন্তু নাকে কাপড় দিয়ে সেই মদের মধ্যেই কাটাতে হয়। মদের জাহাজ এলে সেই মদ মাথায় করে বয়ে আনতে হয়, ভাঁটিখানায় রাখতে হয়, রেখে আবার তদারকি করতে হয়। আবার মদের টান পড়লে খবর দিতে হয় যোগানের জন্যে—অপ্‌চো-নষ্ট হলে আমাকেই আবার তার জবাবদিহি করতে হয়—

মতিঝিলের পুরোন যারা খিদ্‌মদ্‌গার তাদের সবাইকে মেহেদী নেসার সাহেব তাড়িয়ে দিয়ে বরখাস্ত করে দিয়েছে। ঘসেটি বেগমের সঙেগ সঙেগ তাদেরও আর জায়গা নেই মতিঝিলে। বড় সাধ করে ঘসেটি বেগম তৈরি করেছিল মতিঝিল। একদিন তার আশা ছিল মুর্শিদাবাদের মসনদ তারই দখলে যাবে। মীর্জার ভাই একরামউদ্দৌলাকে নবাব করার স্বপ্ন দেখতো ঘসেটি। কিন্তু তাও চলে গেল। নিজের পেটে ছেলে হলো না বলে মীর্জার ভাইকে পুষ্যি নিয়েছিল। কিন্তু সে-ও মারা গেল। স্বামীও চলে গেল। তাতেও নবাবজাদীর তত দুঃখ ছিল না। দেওয়ান রাজবল্লভ ছিল ডান হাত। হুসেনকুলিও ছিল ঘসেটির আর একজন সাগ্‌রেদ। শেষ পর্যন্ত ছিল নজর আলি।

—নবাবজাদীদের কেলেঙ্কারী কান্ড তুমি তো জানো নিশ্চয়ই বাবাজী! শুনেছও তো কিছু কিছু—

কান্ত বললে—কিছু কিছু শুনেছি, সমস্ত জানি না—

—ও না-জানাই ভালো বাবাজী। সাধে কি আর এ চাকরি করতে ভাল্লাগে না। ও-সব রাজা-বাদ্‌শার কেচ্ছা-কিত্তি এখন দেখে দেখে আমার চোখ পচে যাচ্ছে—

—এখনো দেখছেন নাকি আপনি? এখনো হয়?

—তা হবে না? এই কালই তো হলো বাবাজী। চেহেল্‌-সুতুন থেকে গুলসন বলে এক বেগমকে নাচতে নিয়ে গেছলো মতিঝিলে। আমি তো ভেতরে যেতে পারিনে, আমার যাবার হুকুমই নেই। আমি সমস্ত রাত ধরে জেগেছি। আমি হলাম মদের ভাঁড়ারি, আমার তো ঘুমোলে চলে না। ভেতরে ঘুঙুরের

শব্দ শুনছি আর মাতালদের চেঁচানি শুনছি আমার ভাঁড়ারে বসে বসে—চোখ দুটো ঘুমে ঢুলে আসছে, কখন তলব পড়ে তার তো ঠিক নেই। হঠাৎ বশীর মিঞা...

বশীর মিঞার নাম শুনেই কান্ত চমকে উঠলো।

—বশীর মিঞাকেও আপনি চেনেন নাকি?

—বশীর মিঞাকে চিনবো না? ওর পিসেমশাই হলো মেহের আলি মনসুর সাহেব। মেহেদী নেসার সাহেবের আসল সাগ্‌রেদ বাবাজী! আমাকে এসে চুপি চুপি বললে—আমাকে একটু দারু পিলাও ইব্রাহিম! তা আমি বুড়ো মানুষ, আমি হলাম চাকরস্য চাকর। আমি আর কী করবো, আমি ঢালতে যাচ্ছিলুম, হঠাৎ নেয়ামত খাঁ এসে হাজির, দেখতে পেয়েই আমাকে যা-নয়-তাই বলে মুখ খারাপ করে গালাগাল দিতে লাগলো—

—আর বশীর মিঞা?

—বশীর মিঞা তো ততক্ষণে সেখান থেকে চম্পট দিয়েছে। ওদিকে তখন নেশার তুফান উঠেছে মতিঝিলের ভেতরে। মেহেদী নেসার সাহেবের আবার নেশা হলে কান্ডজ্ঞান থাকে না কিনা। অথচ আজ যে আমার এই দুর্দশা এ সব তো ওই নেসার সাহেবের জন্যেই। ওই ইয়ারজান, সফিউল্লা সাহেব, ওরাই তো আমার মুখে ম্লেচ্ছ-মাংস পুরে দিয়েছিল, নইলে কি আর আজ আমার জাত যায়! নইলে কি আর আজ আমাকে মতিঝিলের ভাঁটিখানায় খিদ্‌মদ্‌গারের কাজ করতে হয়? নইলে কি বাবাজী আমি আজ লজ্জায় মুখ ঢেকে বেড়াই? তা তুমি এখানে কী করতে? আর বিয়ে-থা করেছো নাকি?

কান্ত মন দিয়ে সব শুনছিল। বললে—না।

—তা আর কী করেই বা করবে? আর আমি থাকলে না-হয় একবার চেষ্টা করে দেখতুম! ওদিকে খবর শুনেছো তো? সেই পাগলটা, যার সঙ্গে শোভারাম বিশ্বাস মশাই-এর মেয়ের বিয়ে জোর করে দিয়ে দিলে, সেও তো সংসার করতে পারলে না। সেই মেয়েও শুনছি পালিয়েছে বাড়ি থেকে! অথচ তোমার সঙ্গে বিয়েটা হলে এমন ঝঞ্ঝাটও হতো না। তোমরা দুটিতে সুখী হতে, আমাকেও আর এই ইব্রাহিম খাঁ হতে হতো না।

কান্ত হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে—আচ্ছা, আপনাদের মতিঝিলে কোনো চাকরি খালি আছে?

—চাকরি? কেন? তোমার সেই সাহেব-কোম্পানির সোরার গদীর চাকরির কী হলো? সেটা নেই? লড়াই-এর সময় বুঝি গদি-ফদি ফেলে সাহেবরা পালিয়েছে? নিজামতের চাকরিতে এই একটা সুবিধে বাবাজী, জাত থাকে না বটে, কিন্তু চাকরিটা পাকা! এ সহজে যায় না কারো—

—আমাকে একটা চাকরি দিতে পারেন আপনি, আপনাদের মতিঝিলে?

—তা এখন তুমি কী করছো?

—কিছুই করছি না, সে না-করারই মত, একটা চাকরি খুঁজছি—যে-কোনো চাকরি, ঘোরাঘুরির চাকরি না। বসে বসে খাতালেখার কি হিসেব-পত্তোর দেখা-শোনার কাজ পেলেই ভালো হয়।

সচ্চরিত্র বললে—আমি নেয়ামত মিঞাকে বলে তোমায় জানাবো। নেয়ামত নেসার সাহেবের খুব পেয়ারের লোক! তা তোমায় কোথায় পাবো? কোথায় তোমায় খবর দেবো?

কান্ত বললে—এই এখানেই পাবেন আমাকে, এই সারাফত আলির খুশ্‌বু তেলের দোকানের পেছনেই আমি থাকি—

সচ্চরিত্র বললে—তা তুমি যেন আবার কাউকে বলে দিও না বাবাজী যে, আমাকে তুমি দেখেছো। কাউকে বোল না। আমি লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াই, বড় লজ্জা করে বাবাজী। আমি যে ঈশ্বর কালীবর ঘটকের পৌত্র, ঈশ্বর ইন্দীবর ঘটকের পুত্র, ও-সব কথা ভুলতেই চেষ্টা করি! মনে রেখে তো কোনো লাভ নেই, কী বলো বাবাজী? মনে করলেই কেবল কষ্ট—

তারপর একটু থেমে বলতে লাগলো—যাই বাবাজী, মরে তো যেতামই, তুমি তবু তুলে এনে সেবা করলে বলে একটু গতরে শক্তি পেলুম। কবে এমনি করেই বেঘোরে প্রাণটা যাবে। বাপ-পিতেমো'র নামও কেউ করবে না—মরে গেলে পিণ্ডি দিতেও কেউ থাকবে না—

বাইরে তখনো কেউ জাগেনি। সারাফত আলির তখনো জাগবার সময় হয়নি। চেহেল্-সুতুনের নহবতখানায় তখন ইনসাফ মিঞা টোড়িতে সুর ধরেছে।

সচ্চরিত্র সেই দিকে চোখ পড়তেই বললে—সুর তো বেশ মিঠে সুরই বাজাচ্ছে মিঞাসাহেব, কিন্তু ভেতরে-ভেতরে যে ছুঁচোর কেত্তন চলেছে তা তো বাইরের লোক কেউ টের পাচ্ছে না। কাল তো চেহেল্-সুতুনের মধ্যে তুমুল কাণ্ড হয়ে গেছে বাবাজী!

কান্ত উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলো। বললে—চেহেল্-সুতুনের ভেতরেও আপনি যান না কি?

—না, ভেতরে আর কী করে যাবো! কিন্তু চেহেল্-সুতুনের খবর তো মতি-ঝিলেও ভেসে ভেসে আসে।

—কী হয়েছে কাল? বলুন না!

—নেয়ামত মিঞার কাছে শুনছিলাম কাণ্ডটা! নজর মহম্মদ হঠাৎ দিনের বেলা এসে নেসার সাহেবকে ডেকে নিয়ে গেল দেখে আমি নেয়ামতকে জিজ্ঞেস করলাম ব্যাপারটা কী! শুনে তো আমার চোখ কপালে উঠলো বাবাজী। পাপের কি আর্ শেষ আছে চেহেল্-সুতুনে! আহা!

কান্ত আবার বললে—কী হয়েছে তাই বলুন না!

সচ্চরিত্র বললে—তোমরা বিয়ে-থা করোনি, ওসব তোমাদের না-শোনাই ভালো বাবাজী। মরিয়ম বেগম বলে একজন নতুন বেগমসাহেবা এসেছিল চেহেল্-সুতুনে। মরিয়ম বেগম হচ্ছে গিয়ে লস্করপুরের তালুকদার কাশিম আলির মেয়ে। লস্করপুরের তালুকদার কাশিম আলিকে একদিন ওই নেসার সাহেবই চর লাগিয়ে খুন করেছে, তা কেউ জানে না। তারপর তার তালুকদারিও গেছে, সবই গেছে, কিন্তু একটা মেয়ে ছিল, সেই মেয়ের নামই হলো গিয়ে মরিয়ম বেগম। নেসার সাহেবের লোক তাকে ধরে নিয়ে এসে পুরেছিল চেহেল্-সুতুনে। ওসব ওই বশীর মিঞাটার কাজ। শুনলাম, নাকি কোন্ হিন্দু ছোঁড়াকে দিয়ে তাকে এখানে আনিয়েছিল। আজকাল টাকা পেলে কারো কিছু করতে তো আটকায় না! টাকার জন্যে আজকাল লোকে মানুষই বলে খুন করে ফেলছে—টাকার এমনই গুণ বাবাজী—

—তা তারপর কী হলো বলুন।

সচ্চরিত্র বললে—আমার তো সব শোনা কথা বাবাজী, ঠিক-ঠিক বলতে পারিনে। আমি তো নিজের চোখে দেখিনি কিছু। শুনলাম কাল নাকি একজন

বাঁদীকে ধরে খোজারা খুব শাস্তি দিচ্ছিল—সে নাকি অন্তঃসত্ত্বা ছিল—তার নাম জুবেদা, ওই মরিয়ম বেগমেরই বাঁদী!

—কী শাস্তি দিচ্ছিল?

—তাকে একেবারে ন্যাংটো করে পা দুটো ওপরে বেঁধে মাটিতে হাত দুটো পুঁতে দিয়ে ঝুলিয়ে রেখে দিয়েছিল। বাঁদীটা আবার বোবা, মুখে কথা বলতে পারে না। তাই না জানতে পেরে মরিয়ম বেগম একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল খোজাদের ওপর! খোজারা হলো চেহেল্‌-সুতুনের কর্তা। নানীবেগমই বলো আর লুৎফুন্নিসা বেগমই বলো, ওরা তো আসল মালিক নয়। আসল মালিক হলো খোজারা! তাদের কাজে বাধা দেওয়া! সে একেবারে হৈ-চৈ কান্ড চেহেল্‌-সুতুনের ভেতরে। নানীবেগম চীৎকার শুনে নিজে দৌড়ে এসেছে। নজর মহম্মদ করেছে কি, মতিঝিলে এসে নেসার সাহেবকে ডেকে নিয়ে গেছে। কিন্তু মজাটা কি হলো জানো বাবাজী—মরিয়ম বেগম সেইখানে সকলের সামনে ফাঁস করে দিয়েছে যে, সে আসলে লস্করপুরের তালুকদার কাশেম আলির মেয়ে নয়, তার আসল পরিচয়টা বলে দিয়েছে। আসল পরিচয়টা বলে দিতেই নেসার সাহেবের মুখ চুন! নেসার সাহেব আর সেখানে দাঁড়ায়নি, সোজা মুখে চুনকালি মেখে পালিয়ে চলে এসেছে মতিঝিলে। এসে ঢোঁক-ঢোঁক করে কেবল মদ গিলেছে আর নেয়ামতকে গালাগাল দিয়েছে—

কান্ত শুনতে শুনতে শিউরে উঠলো। জিজ্ঞেস করলে—মরিয়ম বেগমের আসল পরিচয়টা কী বলেছে?

—আরে, আসলে নাকি ও লস্করপুরের তালুকদারের মেয়েই নয়—

—মেয়ে নয় তো কে ও? কী বললে?

—আরে, ও হলো গিয়ে সেই হাতিয়াগড়ের ছোটমশাই ছিল, যেখানে তোমার বিয়ের সম্বন্ধ করেছিলাম গো, ও নাকি সেই ছোটমশাই-এর দ্বিতীয়পক্ষের বউ রাণীবিবি! হারামজাদারা কি না তাকে নিয়ে এসে চেহেল্‌-সুতুনে পুরেছে। ছি ছি ছি, ওদের কি কোনোকালে ভালো হবে বাবাজী! নরকেও ওদের ঠাঁই হবে না, এই তোমাকে বলে রাখলাম। যাই বাবাজী, আজকে এখন গিয়ে আমাকে আবার নমাজ পড়তে হবে—

কান্ত তবু ছাড়লে না। বললে—তারপর কী হলো বলুন!

—তারপর আর কী হবে। তারপর নানীবেগম মরিয়ম বেগমকে ধরে নিজের ঘরে নিয়ে চলে গেল। চেহেল্‌-সুতুনের সব বেগমরা জানতো একরকম, এখন সব দোষটা নেসার সাহেবের ঘাড়ে এসে পড়লো। তাই তো রেগে গিয়ে হাঁড়া-হাঁড়া মদ গিলেছে। তারপর শুনলুম জুবেদাকে নাকি ছেড়ে দিয়েছে, হাত-পায়ের বাঁধন খুলে দিতে হুকুম করেছে নানীবেগম। খোজাদের অপমানের একশেষ। এর পর কি আর তারা ছেড়ে কথা বলবে বলতে চাও?

—সে কথা থাক, হাতিয়াগড়ের রাণীবিবির কী হলো বলুন? তার কোনো ক্ষতি হয়নি তো?

—এখন কী ক্ষতি হবে! কিন্তু খোজারা কি এ অপমানের পর আর ছেড়ে কথা বলবে ভেবেছো? তারা তো মুশকিলে ফেলবেই! এর আগেও তো কত বাঁদীকে ঝুলিয়ে রেখে তিন দিন তিন রাত ধরে না-খাইয়ে-খাইয়ে ওই রকম করে মেরে ফেলেছে ওরা, তাতে তো কারোর কিছু আপত্তি ওঠেনি! তোমার এমন কী সতীপণা করবার দরকার পড়েছিল শুনি? তুমি বাছা, যখন একবার

চেহেল্-সতুনে ঢুকেছো তখন জাত-জন্ম তো সবই খুইয়েছ আমার মতন, তার ওপর আবার সতীপণা দেখাতে গেলে কেন? কী বলো, আমি কিছু অন্যায় বলেছি বাবাজী?

কান্ত কী আর বলবে! কথাগুলো শুনতে শুনতে যেন পাথর হয়ে গিয়েছিল।

সচ্চরিত্র বলতে লাগলো—এই যে আমি, আমার কথাই ধরো না, আমি তো অতবড় নামজাদা ঘটক বংশের সন্তান, আমার পিতা হলেন ঈশ্বর ইন্দীবর ঘটক, আমার পিতামহ ঈশ্বর কালীবর ঘটক, সে-সব কথা কি আমি এখন মনে রেখেছি? সে-কথা আমি কাউকে বলি? বরং পাছে কেউ চিনতে পারে বলে আমি লুকিয়ে লুকিয়ে থাকি, এই দাড়ি রেখেছি। এখন কি আর ঘটকালি করি আমি কারো? না করবো? সে-সব কথা আমি ভুলেই গেছি বাবাজী। আমি গাঁয়ে গেলে গাঁয়ের লোক আমায় তাড়িয়ে দেয়, আমার গায়ে থুতু দেয়। তা তো দেবেই! দেবে না? কী বলো তুমি? তারা তো অন্যায় কিছু করে না। তা আমি কি তাতে আপত্তি করছি? আপত্তি করবো কার কাছে বাবাজী? কে আমার আপত্তি শুনছে? যেমন যুগ পড়েছে, তার সঙ্গে মানিয়ে নিয়েই চলতে হবে তো? তাই বাবাজী, আমি ভাঁটিখানায় বসে চুপ করে নাকে কাপড়চাপা দিয়ে কাজ করি, আর তিন-সন্ধ্যে নমাজ পড়ি। কী আর করবো বলো? আমার নিজের মনে তো কোনো পাপ নেই। তবে শুধু ওই ম্লেচ্ছ-মাংসটা এখনো খেতে পারিনি বাবাজী। ওটা খেতে কেমন যেন গা-বমি-বমি করে এখনো—এমনি করেই যে-কদিন বেঁচে থাকি, কাটিয়ে দিতে পারলেই বিদেয় নেবো! কিন্তু এও তোমাকে বলে রাখলাম বাবাজী, দিনকাল বড় খারাপ পড়েছে, খুব সাবধানে থাকবে!

—তাহলে আমার একটা চাকরির কিছু চেষ্টা করবেন?

সচ্চরিত্র বললে—আমার যদি পরামর্শ নাও তো বলি, এ-জায়গায় তুমি চাকরি কোর না বাবাজী। তাহলে আমার মত তোমারও ইহকাল-পরকাল দুই-ই যাবে!

—না ঘটকমশাই, সে যা-হয় হবে, আপনি আমার একটা চাকরি দেখুন। নিজামতের চাকরিই আমায় করতে হবে।

—কেন বাপু? নিজামতের চাকরির ওপর তোমার লোভ কেন এত? এর থেকে জমিদারি সেরেস্তার চাকরি একটা কোথাও জুটিয়ে নিলেই পারো। তাতে আয় কম হলেও ধর্মটা থাকে।

কান্ত বললে—সে আপনি বুঝবেন না ঠিক, মতিঝিলের চাকরি হলেই আমার ভালো হয়।

—কেন?

সচ্চরিত্র পুরকায়স্থ বুঝতে পারলে না কান্ত বাবাজীর এত আগ্রহ কেন মতিঝিলের চাকরির ওপর।

তারপর বললে—ঠিক আছে, এখন যাই বাবাজী, আমার নমাজের দেরি হয়ে গেল—

সারাফত আলির দোকানের সামনে তখনো লোকজনের চলাচল শুরু হয়নি। সচ্চরিত্র পুরকায়স্থ মশাই একা সেই রাস্তায় নেমে হন-হন করে এগিয়ে চললো। মাটির হাঁড়াটা ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে, সব মদ রাস্তার ধুলোর ওপর পড়ে নষ্ট হয়ে গেছে। একটু-একটু খোঁড়াচ্ছে যেন। কান্তর মনে হলো হাতীর পায়ের

তলায় চাপা পড়লে আর বাঁচতো না লোকটা।

আস্তে আস্তে সচ্চরিত্র অনেক দূরে অদৃশ্য হয়ে যাবার পরও কান্ত সেইখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো। এই তো একটু দূরে চেহেল্-সুতুন। সেই তারই ভেতরে এখন হয়তো ভীষণ তোলপাড় চলছে। কেন বলতে গেল মরালী নিজের পরিচয়টা? মিথ্যে করে হোক, সত্যি করে হোক, কারো নাম বলবার দরকারটা কী ছিল? যদি এখন হাতিয়াগড়ে খবর যায়! যদি খোঁজ পড়ে রাণীবিবিকে তারা না-পাঠিয়ে মরালীকে পাঠিয়েছে, তাহলে? অথচ, কেউ জানতে না-পারলে হয়তো একদিন পালিয়ে যেতে পারতো চেহেল্-সুতুন থেকে।

মনে হলো এখনি যদি একবার গিয়ে সাবধান করে দিয়ে আসতে পারতো মরালীকে।

হঠাৎ পেছনে আওয়াজ হতেই কান্ত ফিরে দেখলে। সারাফত আলি সাহেব জেগে উঠে দোকানে এসেছে।

—কী রে কান্তবাবু, সে-লোকটা কেমন আছে? সেই ইব্রাহিম খাঁ? বেটা মরেছে না জিন্দা আছে?

কান্ত বললে—মতিঝিলে চলে গেছে।

—তাহলে জিন্দা আছে? দারু পিয়ে পিয়ে কলিজায় ওদের কড়া পড়ে গেছে, ওরা কখনো মরে? ঝুট-মুট তুই কালকে চেহেল্-সুতুনে গেলি না। নজর মহম্মদ এসে রাত্তিরে ডেকে-ডেকে ফিরে গেল।

কান্ত জিজ্ঞেস করলে—আজ নজর মহম্মদ আসবে?

সারাফত আলি বললে—ক্যা মালুম, ও-লোককা মর্জি! আজ এলে যাবি তুই?

—হ্যাঁ মিঞাসাহেব, আজকে যাবোই। কালকে ইব্রাহিম খাঁর কাছে যা শুনলুম তাতে খুব ভয় পেয়ে গিয়েছি—কালকে ন্যাকি রাণীবিবি নিজের আসল পরিচয় সকলের সামনে বলে দিয়েছে। সব জানাজানি হয়ে গিয়েছে। নেসার সাহেবকে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছে নানীবেগম, খোজা সর্দার পীরালি খাঁ খুব চটে গেছে রাণীবিবির ওপর। এখন কী হবে বুঝতে পারছি না! এখন যদি কিছু সর্বনাশ হয়!

সারাফত আলি বললে—কুছ নেই হোগা! মোহর পেলেই সব ফয়সালা হয়ে যাবে। এক মোহরে কাম না হয় দো মোহর দেঙ্গে, দো মোহরে কাম না হলে তিন মোহর দেঙ্গে। মোহর দিলে সব জব্দ। সবাই খুশী। হিন্দুস্থানের বাদ্শা ভি মোহর পেলে সব ভুলে যায়, তো নজর মহম্মদ। নজর মহম্মদের বাপ পর্যন্ত মোহর পেলে কবর থেকে হাত বাড়াবে। তুই কিছু ভাবিসনি কান্তবাবু।

রাস্তায় কে যেন গান গাইতে গাইতে যাচ্ছিল। গানের সুরটা কানে আসতেই কান্ত সচেতন হয়ে উঠেছে। উদ্ধব দাস না!

আমি রবো না ভব-ভবনে
শুন হে শিব শ্রবণে!

কান্ত এক লাফে রাস্তায় নামলো। তারপর চিৎকার করে ডাকতে লাগলো—দাসমশাই, ও দাসমশাই—

উদ্ধব দাস পাগলা-কছমের লোক। যেন শুনতেই পায়নি। বেশ গলা ছেড়ে গান গাইতে গাইতে চলেছে। কান্ত দৌড়িয়ে কাছে যেতেই উদ্ধব দাস পেছন ফিরলো।

কান্ত বললে—তোমাকেই তো আমি খুঁজছিলাম দাসমশাই—

কিন্তু কথাটা বলেই কেমন যেন সন্দেহ হলো। জিজ্ঞেস করলে—আপনি উদ্ধব দাস না?

—উদ্ধব দাস?

লোকটাও অবাক হয়ে গেছে। বেশ আপন মনেই গান গাইতে গাইতে আসছিল। হঠাৎ অচেনা লোকের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কেমন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। বললে—আমি উদ্ধব দাস কেন হতে যাবো বাবা, আমি তো পরমেশ্বর দাস।

—কিন্তু এ-গান তো উদ্ধব দাসেরই বাঁধা। উদ্ধব দাসই তো এ-গান গায়।

লোকটা বললে—তা হতে পারে বাবা, গানটা একদিন এক মাঝির গলায় শুনেছিলাম, তাই মুখস্থ করে নিয়েছি। ভণিতাতে তো ভক্ত হরিদাসের নাম আছে।

কান্ত মনে মনে হতাশ হয়ে গেল। উদ্ধব দাসের সঙ্গে এখন দেখা হলে খুব ভালো হতো। উদ্ধব দাসকে দেখা হলে বলা যেত যে তারই বউ চেহেল্-সুতুনে আছে। তার বড় বিপদ! অথচ আশ্চর্য! যার বউ, যে বিয়ে করলো তার মাথাব্যথা নেই, সে কেমন আরামে গান গেয়ে গেয়ে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে, আর কোথাকার কে কান্ত, তাই নিয়ে তার দুশ্চিন্তার অন্ত নেই। সে কেন ভাবছে এত! মরালীর কী হলো না হলো তা নিয়ে তার এত দুশ্চিন্তা কেন? মরালী তার কে? তার সঙ্গে তো তার কোনো সম্পর্ক নেই!

তারপর মনে হলো—সে ভাববে না তো কে ভাববে! কে আর জানে আসল খবরটা। আসলে মরালীকে এই চেহেল্-সুতুনে নিয়ে আসার জন্যে সে নিজেই তো দায়ী। কান্ত নিজেই তো এনে এখানে এই পাপের রাজ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছে তাকে।

যে লোকটা গান গাইছিল, সে আবার গান গাইতে গাইতে চলে গেল। কান্ত আবার সারাফত আলির দোকানের দিকে ফিরে এল।

চেহেল্-সুতুনের ইতিহাসে যা কখনো হয়নি, সেদিন যেন তাই-ই হয়েছিল। সেদিনকার চেহেল্-সুতুনের নিয়মকানুনে যেন হঠাৎ ভাঁটা পড়লো। অনেক দিন পরে যখন অনেক কিছু বদলে গিয়েছিল, মুর্শিদাবাদের ওপর দিয়ে অনেক ঝড় বয়ে গিয়েছিল—তখনকার দিনের কথা আর কারোর মনে থাক আর না থাক, কান্তও তখন নেই, আর মরালী তো মেরী বিশ্বাস হয়ে গেছে—সেই সময়কার সব কাহিনী একে একে সংগ্রহ করে রেখে গেছে উদ্ধব দাস। সমস্ত কিছু পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে লিখে গেছে পুঁথির পাতায়। মুর্শিদাবাদ, কাশিমবাজার, কলকাতা, পলাশী, সমস্ত যেন উদ্ধব দাস নিজের চোখে দেখেছে। লর্ড ক্লাইভের বাগান-বাড়িটাও তার লেখায় বাদ পড়েনি। বিরাট বিরাট থামওয়ালা বাড়িটা। তার চারপাশে চল্লিশ বিঘে বাগান। সেই বাগানের মধ্যে বসে থাকতো ক্লাইভ সাহেব। আর সেইখানে তখন থাকতো মরালী। বেগম মেরী বিশ্বাস। শেষ জীবনে মরালীর সঙ্গে অনেকবার দেখা হয়েছে উদ্ধব দাসের। চাকর-বাকর-আয়া-

খানসামারা মরালীকে মেরী বেগম বলে ডাকতো। মেরী বেগমের সঙ্গেই দেখা করতে যেত উদ্ধব দাস।

মরালী বলতো—আমার মরিয়ম বেগম হওয়াটাও যেমন, মেরী বেগম হওয়াটাও ঠিক তেমনি। ও দুটোই মিথ্যে—

বলতে বলতে যখন সেইদিনকার কথাগুলো তার মনে পড়তো তখন আর বলতে পারতো না মেরী বেগম। কথা বন্ধ হয়ে আসতো মুখে। নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলা, জগৎশেঠ, মীরজাফর, মীরন সকলের সমস্ত কিছু নিজের চোখে দেখে দেখে তখন যেন মেরী বেগম পাথর হয়ে গিয়েছিল। আর উদ্ধব দাস সামনে বসে বসে শুধু শুনতো সব।

মানুষের মনের অন্তস্তলে কোথায় বুঝি এক অদৃশ্য অন্তর্লোক আছে। সেখানকার সন্ধান সে সব সময় নিজেও রাখে না। রাখবার চেষ্টাও করে না। কিংবা খবর রাখবার চেষ্টা করাই হয়তো পন্ডশ্রম। কিংবা হয়তো সেইটুকুই তার একান্ত গোপন সম্পদ। সেই সম্পদটুকু গোপনে পুষে রেখেই সে বুঝি তৃপ্তি পায়। তুমি আমার স্বামী হলেও তোমার প্রবেশ সেখানে নিষেধ। সেখানকার খবর কেউ যেন না জানতে পারে। আমি যতদিন বাঁচবো ততদিন সেটুকু আমার। আর কারোর নয়। আমার অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ দিয়ে তাকে আমি আমার অন্তরে লালন করবো। সে তুমি হাজার প্রশ্ন করলেও আমি বলবো না। কান্তর কথা আমাকে জিজ্ঞেস কোর না তুমি।

কিন্তু উদ্ধব দাসের অদ্ভুত ক্ষমতা। সেই একান্ত গোপন খবরটুকুও সে বুঝি কেমন করে জেনে ফেলেছিল। 'বেগম মেরী বিশ্বাসে'র পাতায় পাতায় তা-ই সে সবিস্তারে লিখে রেখে গেছে। কবে একদিন কান্ত কেমন করে নিজের অগোচরে অন্তরের অনুরাগটুকু দিয়ে উদ্ধব দাস আর মেরী বেগমের অস্তিত্ব নিরাপদ করে গিয়েছিল তাও উদ্ধব দাস লিখতে বাকি রাখেনি। বাঙলার ইতিহাসের এক অনিবার্য সন্ধিক্ষণে মরালীকে ঢুকতে হয়েছিল মুর্শিদাবাদের চেহেল্-সুতুনে, আর ভাগ্যবিধাতার এক অমোঘ নির্দেশে কান্তকেই আবার সেই দুর্ঘটনার সাক্ষী থাকতে হয়েছিল। আর উদ্ধব দাস? উদ্ধব দাসই বা এত জায়গা থাকতে সেদিন সেই রাত্রে হাতিয়াগড়ের রাজবাড়ির অতিথিশালায় গিয়ে হাজির হবে কেন? হয়তো সে হাজির না থাকলে এই পলাশীর যুদ্ধও হতো না, হয়তো বাঙলার ইতিহাসের পাতাগুলো অন্যরকম করে লেখা হতো। হয়তো ক্লাইভ সাহেবকেও শেষ জীবনে নিজের জীবনটা নিজের হাতে নিতে হতো না। হয়তো সেখানে হাজির না থাকলে নানীবেগম সুখী হতো, লুৎফুন্নিসা বেগমও সুখী হতো। মরালী, কান্ত, উদ্ধব দাস, মীরজাফর, সবাই জীবনটা সুখেই কাটিয়ে দিতে পারতো।

কিন্তু হয়তো তা হবার নয়।

হবার নয় বলেই আজ এত বছর পরে তাদের নিয়ে 'বেগম মেরী বিশ্বাস' লিখতে বসেছি।

কিন্তু সেদিনকার কাহিনী কেমন করে বলবো বুঝতে পারছি না। এই দুশো বছর পরে আমি কি বর্ণনা করতে পারবো সেদিনকার মরালীর মনের অবস্থা?

মতিঝিলের দরবার-ঘরের ভেতরে তখন সকলের বিচার শেষ হয়ে গেছে। হয়তো সেটা সুবিচারই। কিংবা হয়তো অবিচার। রাজবল্লভ, উমিচাঁদ, তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ফিরিঙ্গীরা যখন লড়াইতে হেরেই গেছে তখন আর তা নিয়ে জল ঘোলা করে লাভ কী। হল্‌ওয়েল সাহেব মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে ক্ষমা চেয়েছে।

তার বিচারই শুধু তখনো বাকি ছিল।

আগের দিন রাত্রে গুলসন বেগমের নাচ হয়েছে সারা রাত। মেহেদী নেসার, ইয়ারজান, সফিউল্লা সাহেব, তাদের তখনো নেশা কাটেনি বোধহয়। কিন্তু নবাব যে এত ভোরে উঠে সকলকে ডাকাডাকি করবে তা কেউ বুঝতে পারেনি।

নেয়ামত ছুটতে ছুটতে এসেছে।

—জনাব, নবাব এত্তেলা দিয়েছে।

মতিঝিলের দরবার ততক্ষণে জমজমাট। সত্যিই নবাবের যেন ক্লান্তি নেই। যে-মীর্জার সঙ্গে তারা একদিন ইয়ার্কি করেছে, আড্ডা দিয়েছে, ফুর্তি করেছে, মহ্‌ফিল্ জমিয়েছে, সেই মীর্জাই যখন আবার লড়াই করতে যায়, যখন দরবার বসায়, তখন যেন আবার সে অন্য মানুষ। তখন যেন আর চেনা যায় না সেই মীর্জাকে। তখন যেন সে সত্যিই নবাব। তখন যেন সে মুর্শিদাবাদের খোদা-তালা। মীর্জার সামনে দাঁড়িয়ে তখন মেহেদী নেসারও থর-থর করে কাঁপে। যে মীরজাফর আড়ালে এত কিছু বলে বেড়ায়, সামনে এসে কিছু বলবার আর সাহস থাকে না তার। নবাব গোলাম হোসেন খাঁ বাহাদুর এতদিনের লোক, আলীবর্দী খাঁর আমলের পুরোন নিজামতি দারোগা আর আরজ্‌বেগী, তাকে পর্যন্ত মক্কায় যাবার নাম করে দেশ ছেড়ে পালাতে হয়েছিল নবাবের ভয়ে।

মেহেদী নেসার সাহেবরা যখন দরবারে এসে হাজির হলো তখন হল্‌ওয়েল সাহেবের দুটো হাতে হাতকড়া। হাতকড়া বাঁধা অবস্থায় নবাবের সামনে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে সাহেব।

রাজা দুর্লভরাম একপাশে। তার ওপাশে মীরজাফর সাহেব। সমস্ত আবহাওয়াটাই যেন ভ্রূকুটি-কুটিল। মেহেদী নেসার সাহেব মীরজাফর খাঁর দিকে চেয়ে দেখলে। বড় শান্ত সুখী মানুষটা। বাইরে থেকে দেখলে কিছু বোঝবার উপায় নেই।

বশীর মিঞা গুটি-গুটি পায়ে মেহেদী নেসার সাহেবের পেছনে এসে দাঁড়ালো। দাঁড়িয়ে চুপি চুপি হাতে একটা চিঠি দিয়ে আবার বাইরে চলে গেল।

নেসার সাহেব চিঠিটা পড়ে আস্তে আস্তে কুর্নিশ করে চিঠিটা নবাবের হাতে দিলে।

চিঠিটা পড়তে-পড়তে মীর্জার চোখ দুটো কেমন জ্বলে উঠলো তাও লক্ষ্য করলে নেসার সাহেব।

নবাব জিজ্ঞেস করলে—এ খত্ কোত্থেকে এল?

—জাঁহাপনা, আমার দফ্‌তরের লোক আদায় করে এনেছে—

আর সঙ্গে সঙ্গে যেন বোমা ফেটে উঠলো মতিঝিলের দরবার-ঘরে। বুঝিতো বোমা ফাটলেও এত চমকাতো না কেউ। আলীবর্দী খাঁর আমলে যে-মীর্জাকে মীরজাফর দেখেছে এ যেন সে মীর্জা নয়।

এ-মীর্জা এ-রকম গলার আওয়াজ কোথায় পেল! যাকে সবাই আড্ডাবাজ, ফুর্তিবাজ বলে জেনে এসেছে এতদিন, সে বুঝি একটা লড়াই জিতে এসেই একেবারে খাঁটি নবাবিআনা শিখে ফেলেছে।

পাঙ্খাওয়ালা পেছনে দাঁড়িয়ে বিরাট পাখা চালাচ্ছিল, হঠাৎ ভয় পেয়ে তার হাত থেকে পাখাটা পড়ে গেছে।

—মীরজাফর আলি সাহেব!

১৭৩০ সালে যে-মীর্জার জন্ম, তার বয়েস সবে ছাব্বিশ পেরিয়েছে। অথচ

তারই সামনে পাকা ঝুনো-ঝানু সব আমীরওমরা ভয়ে স্থির হয়ে রয়েছে স্থাণুর মত।

মীরজাফর আলি সাহেব এক-পা এগিয়ে এসে মাথা নিচু করে কুর্নিশ করলে।

—আপনি এ-চিঠি লিখেছেন?

বহু-শতাব্দী আগে মোগল-বংশ হিন্দুস্থান দখল করে নিয়েছিল। ততদিনে সে-দখল কায়েমী হয়েও গিয়েছিল। কিন্তু রাজনীতি বোধহয় চিরকালই বে-কায়েম। রাজনীতির অভিধানে কায়েমী বলে কোনো শব্দ নেই। মসনদ আজ আছে, কাল নেই। কিন্তু নবাব আলীবর্দী খাঁর পাশে থেকে থেকে কবে যে মীর্জা সে-কথা শিখে নিয়ে রপ্ত করে ফেলেছিল তা বোধহয় তার ঘনিষ্ঠ ইয়ার মেহেদী নেসাররাও জানতো না। তাই সেদিন সেই মতিঝিলের দরবারের মধ্যে নবাব মীর্জা মহম্মদের গলা শুনে তারা চমকে গিয়েছিল।

—আমার ভাইকে আপনি বিদ্রোহ করবার জন্যে এই চিঠি লিখেছেন? এ তো দেখছি আপনারই হাতের লেখা। দেখুন, আপনার হাতের লেখা আপনি চিনতে পারেন কি না, আপনি নিজেই পড়ে দেখুন—

মীরজাফর আলি সাহেব চিঠিটা নিজের হাতে নিলে। তারপর আবার সেখানা ফিরিয়ে দিলে মীর্জার হাতে।

—কী দেখলেন?

মীরজাফর আলি সাহেব কোনো উত্তর দিলে না।

—তাহলে কি বুঝবো আপনিও আমাকে ভুল বুঝলেন? আপনি জানেন যে, আমার বল-ভরসা বলতে যা কিছু সব আপনারা। সেই আপনিই কিনা আমার শত্রুতা করবার জন্যে তৈরি? আমি যে নতুন সিংহাসন পেয়ে সুস্থির হয়ে সব-কিছুর সুব্যবস্থা করবো, তাও আপনারা আমাকে করতে সময় দেবেন না? ফিরিঙ্গীদের আমি বুঝতে পারি। তারা হিন্দুস্তানে এসেছে ব্যবসা করে টাকা উপায় করতে। কিন্তু আপনারা? আপনারা যে আমার আত্মীয়! আপনাদের যে আমি সবচেয়ে বিশ্বাস করি। আপনারাই যদি এমন করে বিশ্বাসঘাতকতা করেন তো আমি দাঁড়াবো কোথায়? কার মুখের দিকে চেয়ে আমি রাজ্য চালাবো?

তবু মীরজাফর আলি সাহেব চুপ!

—আমি জানি আমার আড়ালে লোকে আমার নামে কী বলে! আমার নিজের দোষ নেই এ-কথা আমি বলছি না। আমার নিজের দোষটাও আমি জানি, আমার কী ভালো তাও জানি! কিন্তু আপনারা? আপনাকেই আমি জিজ্ঞেস করছি, আমার কি কোনো গুণই নেই? এমন কোনো সদ্‌গুণ নেই যার জন্যে আমি আপনাদের সহানুভূতি পেতে পারি? আপনাদের ভালবাসা পেতে পারি? আপনারা কি সত্যিই চান আমার বদলে অন্য কেউ এই মসনদে বসলে দেশের মঙ্গল হবে? আপনারা মুখ ফুটে বলুন সে-কথা! আমি স্বেচ্ছায় মসনদ ছেড়ে চলে যাবো। যদি বোঝেন আমার মাসতুতো ভাই শওকত্ জঙ্ এলেই দেশের ভালো হবে, তাহলে তাই-ই বলুন, তাহলে আমি তাকেই ডেকে এনে আমার জায়গায় বসিয়ে দেবো। আর যদি বোঝেন ঘসেটি বেগম এলেই দেশের ভালো হবে তো তাতেও আমি গররাজি নই। আমি এখ্খুনি আমার মাসিকে চেহেল্-সুতুনের বন্দীদশা থেকে মুক্তি দিয়ে দিচ্ছি—

মীরজাফর সাহেব তখনো চুপ করে আছে।

—লোকে বলে আমি নাকি দেশ শাসনের কিছুই জানি না। আমি স্বীকার

করছি দেশ-শাসনের আমি কিছুই জানি না। কিন্তু আমি তো সবে দেশের ভার মাথায় তুলে নিয়েছি। আমাকে প্রথমে জানতে সময় দিন, বুঝতে অবসর দিন, তবে তো শিখতে পারবো। তার পরেও যদি দেখেন আমি কিছুই জানি না, তখন আমাকে না-হয় সরিয়ে দেবেন। সরিয়ে দিয়ে যাকে খুশী আমার সিংহাসনে বসাবেন। আমি খুশী মনে আপনাদের কাছে বিদায় নিয়ে চলে যাবো। আর কখনো মুর্শিদাবাদে আসবো না, প্রতিজ্ঞা করে যাবো—

তখনো মীরজাফর আলি সাহেব চুপ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কিছু কথা বলেনি।

—এই যে এই পাষন্ড হল্‌ওয়েল দাঁড়িয়ে আছে, যদি মনে করেন এরাই দেশের ভালো করবে তো এদের হাতেই না-হয় এই মুর্শিদাবাদের মসনদ তুলে দিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু যদি মনে করেন যে, এরা দেশের দুষমন, এরা কারবার করবার নাম করে এখানে আমাদের ভাইতে-ভাইতে লড়াই লাগিয়ে দিয়ে নিজেরা এই মসনদ কেড়ে নেবার মতলব করছে, তবে তাদের শায়েস্তা করা কি এতই অন্যায়? যে তাদের শায়েস্তা করবে, তাকে কি আপনারা কুশাসক বলবেন? বলবেন কি সে দেশ শাসন করতে জানে না?

তারপর একটু থেমে আবার বলতে লাগলেন—স্বীকার করছি আমার বয়েস কম, অভিজ্ঞতা কম, জ্ঞানও কম, কিন্তু আপনি আমার ডান হাত, আপনার তো অনেক বয়েস, আপনার তো অনেক অভিজ্ঞতা, আপনার তো অনেক জ্ঞান; আপনি সহায় থাকতে আমি দেশ-শাসন করতে পারবো না-ই বা কেন? যদি না পারি সে তো আপনারও লজ্জা! আপনারও কলঙ্ক! লোকে আপনাকেই দোষ দেবে, বলবে যে আপনার মত অভিজ্ঞ আত্মীয় থাকতেও কম-বয়েসী নবাবকে আপনি কিছু সাহায্য করেননি। কী হলো, আপনি কথা বলছেন না কেন, উত্তর দিন?

মীরজাফর আলি সাহেব যেন বিব্রত বোধ করতে লাগলো।

পাংখাওয়ালা আরো জোরে জোরে পাখা নাড়ছে। মেহেদী নেসার, ইয়ারজান, সফিউল্লা, রাজা দুর্লভরাম সবাই পাথরের মূর্তির মত নবাবের রায় শোনবার জন্যে কান পেতে রয়েছে।

—উত্তর দিন, কেন আপনি এ-চিঠি লিখতে গেলেন?

ওদিকে একটা তাঞ্জাম দুলতে দুলতে এসে ঢুকলো মতিঝিলের ফটকে। ঝালরদার, সোনা-চাঁদির ঝকমকে তাঞ্জাম। এ-তাঞ্জাম দেখলেই চিনতে পারে মতিঝিলের ফটকের পাহারাদার। এটা নানীবেগমের নিজস্ব তাঞ্জাম। কুর্নিশ করে পাহারাদার তাঞ্জাম ভেতরে পৌঁছিয়ে দিয়ে এল। সামনে ঝিল্‌। সেই ঝিল্‌ পেরিয়ে এসে তাঞ্জামটা সোজা ভেতরে চবুতরে ঢুকে গেল।

—ও যদি আপনার হাতের সই হয় তো আপনি বলুন, ও-চিঠি কেন লিখতে গেলেন?

মতিঝিলের বাঁদী এসে তাঞ্জামের ঝালর তুলে ধরলো। তাঞ্জাম থেকে নামলো নানীবেগম। আর তার পেছন-পেছন আর একজন বেগম নামলো। তাঁকে এর আগে বাঁদী কখনো দেখেনি। দুজনেই তাঞ্জাম থেকে নেমে আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগলো।

—আমার কথার উত্তর দেবেন না আপনি? উত্তর দিন!

ইব্রাহিম খাঁ সরাবখানার মধ্যে অন্ধকারে চুপ করে বসে ছিল। হাতীর চোট খাবার পর সেদিন কিছু বিশেষ বোঝা যায়নি। কিন্তু পরদিন থেকেই গায়ে-গতরে একেবারে ব্যথা হয়ে টন্‌ টন্‌ করছিল।

—ও চিঠি জাল!

তাঞ্জামটা নজরে পড়েছিল ইব্রাহিম খাঁর। সিঁড়ির নিচেয় মতিঝিলের সরাবখানা। ঘুলঘুলিটা দিয়ে ওদিকটা দেখা যায়। হঠাৎ নজরে পড়লো দু'জন বেগম নামলো তাঞ্জাম থেকে। নানীবেগমের তাঞ্জাম দেখলেই সবাই চিনতে পারে। নানীবেগমকে অনেকবার দেখেছে ইব্রাহিম খাঁ। কিন্তু পাশের বেগমকে দেখেই চমকে উঠলো সচ্চরিত্র পুরকায়স্থ। যেন খুব চেনা-চেনা মুখ। কোথায় যেন দেখেছে, কোথায় যেন বড় কাছ থেকে দেখেছে। কিন্তু কিছুতেই মনে করতে পারলে না। তারপর হঠাৎ মনে পড়ে গেল। হাতিয়াগড়ের নফর শোভারাম বিশ্বাস মশাই-এর মেয়ে সেই মরালী না?

—জাল? আপনি প্রমাণ করতে পারেন, এ জাল চিঠি?

নেয়ামত খাঁ তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকলো। নবাবের সামনে এসে তিনবার কুর্নিশ করে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বললে—জাঁহাপনা, নানীবেগম!

নানীবেগম! এখানে! মতিঝিলে! এই অসময়ে! নবাব মীর্জা মহম্মদ যেন কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন। মেহেদী নেসারের কানেও কথাটা গিয়েছিল। সেও কেমন যেন শুকিয়ে গেল কথাটা শুনে। মীরজাফর আলি সাহেব, হল্‌ওয়েল, রাজা দুর্লভরাম, ইয়ারজান, সফিউল্লা, মোহনলাল সবাই একটু নড়ে দাঁড়ালো এতক্ষণ পরে।

সরাবখানার অন্ধকারে সচ্চরিত্র পুরকায়স্থ তখনো আকাশ-পাতাল ঘুরে বেড়াচ্ছিল। শোভারাম বিশ্বাস মশাই-এর মেয়ে তো নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিল বিয়ের পর। আবার এখানে এল কেমন করে?

নবাব মীর্জা মহম্মদ মসনদ থেকে উঠে দাঁড়িয়ে পাশের ঘরের দিকে গেলেন। যাবার সময় বলে গেলেন—আপনারা বসুন। আমি আসছি—

চেহেল্‌-সুতুনের ভেতরেও বোধহয় তখন তোলপাড় শুরু হয়ে গিয়েছিল। সকলেই অবাক হয়ে গিয়েছিল নানীবেগমের হুকুম শুনে। লুৎফুন্নিসার ঘরে গিয়ে নানীবেগম বলেছিল—আমি মতিঝিলে যাচ্ছি বহু—

এমন সাধারণত হয় না। নানীবেগমকে যারা জানে তারা শুধু তাকে এতদিন কোরাণ হাতে নিয়ে থাকতেই দেখেছে।

—আমি গিয়ে মীর্জাকে জিজ্ঞেস করবো এই রাণীবিবিকে কে এখানে আনতে হুকুম দিয়েছে, মীর্জা নিজে না মেহেদী নেসার—

মরালী চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল। সমস্ত চেহেল্‌-সুতুন আজ তাকে চিনে ফেলেছে। এতদিন এখানে এসেছে, কিন্তু কেবল নিজের ঘরের মধ্যেই কাটিয়েছে সারা দিনরাত। তাকে কেউ চিনতো না, কেউ জানতো না এক গুলসন ছাড়া। মরালী ভেবেছিল এমনি করেই চারটে দেয়ালের মধ্যে বুঝি তার জীবন কেটে যাবে। সবাই তাকে মরিয়ম বেগম বলেই জানবে। তারপর একদিন সবার অগোচরে চেহেল্‌-সুতুনের বাইরে খোশবাগের কবরখানায় চারজন লোক তাকে কাঁধে করে বয়ে নিয়ে গিয়ে কবর দিয়ে দেবে। কিন্তু তা হলো না। সব জানাজানি হয়ে গেল। জুবেদার ওই অবস্থা দেখে আর চেপে রাখতে পারেনি সে নিজেকে।

একেবারে সকলের মুখোমুখি হয়ে নিজের পরিচয় সকলকে জানিয়ে দিয়েছে।

নানীবেগম প্রথমে অনেক সান্ত্বনা দিয়েছিল—তোমার কিছু ডর নেহি বেটি, তুমি আমার কাছে কিছু চেপে রেখো না, বলো, তোমার কী হয়েছে?

মরালী বলেছিল—আমি অনেক দিন ধরে আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছিলাম মা, আমার অনেক কথা বলবার ছিল—কিন্তু কেউ আপনার সঙ্গে আমাকে দেখা করতে দিত না—

—কে দেখা করতে দিত না?

—ওই আপনার খোজা নজর মহম্মদরা। একদিন গুলসন বেগমের সঙ্গে আপনার কাছে লুকিয়ে লুকিয়ে আসছিলাম, তারপর ভয় পেয়ে ভুল-ভুলাইয় মধ্যে ঢুকে পড়ে হারিয়ে গিয়েছিলাম—

—তারপর?

—তারপর সেদিন রাত্তিরে লুৎফুন্নিসা বেগমসাহেবার ঘরে ভুল করে ঢুকে পড়েছিলাম, ভেবেছিলাম, ওইটেই বুঝি গুলসন বেগমের ঘর। সেখান থেকে নিজের ঘরে গিয়ে দেখি মেহেদী নেসার সাহেব আমার ঘরে বসে আছে, আর তারপরই নজর মহম্মদ আপনাকে গিয়ে খবর দিতেই আপনি এলেন, আপনি এসে আমাকে মেহেদী নেসার সাহেবের হাত থেকে বাঁচালেন। সেদিন আপনি আমায় আদর করলেন, আমার নাম জিজ্ঞেস করলেন, আমি বললাম আমার নাম মরিয়ম বেগম। তখন আমি ভয়ে আপনাকে সত্যি কথা বলতে পারিনি মা—

—হাতিয়াগড় থেকে এখানে তোমায় কে আনলে?

মরালী এক দণ্ড চুপ করে ভেবে নিলে। তারপর বললে—এখান থেকে পরোয়ানা গিয়েছিল হাতিয়াগড়ের ছোটমশাই-এর নামে—

নানীবেগম বললে—সে আমি জানি, তোমার বড় সতীন আমাকে চিঠি লিখেছিল—

—চিঠিতে কী লিখেছিল?

নানীবেগম বললেন—তুমি যা বললে মা, সে-ও ওই কথাই লিখেছিল, আমি মেহেদী নেসারকে ডেকে জিজ্ঞেস করেছিলাম চিঠিটার কথা সত্যি কিনা।

—কী বললে মেহেদী নেসার সাহেব?

নানীবেগম বললে—ও-সব কথা তোমার শুনে দরকার নেই মা! এই মুর্শিদাবাদে কেউ সত্যি কথা বলে না, কাকে বিশ্বাস করবো? মীর্জা, আমার নাতি, তারও সময় নেই আমার সঙ্গে কথা বলার, সেও নানান হাঙ্গামায় জড়িয়ে পড়েছে—তাকেই বা দোষ দিই কী করে, সবাই মিলে তাকে নাজেহাল করে দিচ্ছে—

—কেন? মরালী উদ্‌গ্রীব হয়ে জিজ্ঞেস করলে—কেন মা? কে নাজেহাল করছে?

নানীবেগম বললে—সে তুমি বুঝবে না মা, না বোঝাই ভালো তোমাদের। আমি কিছু কিছু বুঝি, এক এক সময় আমিই তো ভাবতাম নবাবের বেগম হওয়ার চাইতে গরীবের ঘরের বউ হওয়া এর চেয়ে অনেক ভালো! তা সে-সব কথা থাক, আমার সঙ্গে তুমি এক জায়গায় যাবে?

—নিশ্চয়ই যাবো। কোথায় মা?

—মতিঝিলে। মীর্জার কাছে!

নামটা শুনেই মরালী ভয় পেয়ে গিয়েছিল প্রথমে। নবাব! নবাব সিরাজ-উদ্দৌলা! যার মহ্‌ফিলের আসরে গুলসন নাচতে গিয়েছিল। যেখানে গেলে ভাগ্য ফিরে যায় এক রাত্রের মধ্যে। যেখানে যেতে পারার জন্যে নজর মহম্মদকে ঘুষ

দেয় বেগমরা। সেই মীর্জা মহম্মদ। মরালীর সমস্ত গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছিল। সেই মতিঝিলে নানীবেগমসাহেবা তাকে নিজে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে!

—ভয় পেও না মা, ভয় কীসের? আমি তো তোমার সঙ্গে থাকবো! আর লোকে মীর্জার সম্বন্ধে নানান কথা বলে বটে, কিন্তু আমি তো মা আমার মীর্জাকে চিনি। এই এতটুকু বেলা থেকে মা, ওই নাতি আমার কাছে মানুষ হয়েছে। আমিনা, ওর মা তো দেখতোও না। শুধু কি এখানে, আমি যেখানে গিয়েছি সেখানেই সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছি, ওর নানা যেদিন নবাবী পেয়েছিল সেইদিনই ও জন্মায়। ও আমার খুব পয়া নাতি মা! ওর কত বুদ্ধি, ওর কত বিদ্যে, তা তোমরা কেউ জানো না। ওর ইয়ারবক্সীরা ওকে খারাপ পরামর্শ দিয়ে দিয়ে ওই রকম করে দিয়েছে, নইলে ও ভয় করবার মত ছেলেই নয়—তোমরা ওকে ভুল বুঝো না মা। আর তা ছাড়া আমি তো থাকছি সঙ্গে—

তারপর মরালীকে নিয়ে সোজা লুৎফুন্নিসার ঘরে গিয়ে ঢুকেছিল।

ক'দিন আগেই মরালী এই ঘরে একলা একলা এসেছিল। এই সেই নবাবের ঘর। মরালী আবার চেয়ে দেখলে চারদিকে। সেই বাঁদীটা আবার দরজা খুলে দিয়ে নানীবেগমকে কুর্নিশ করলে। কী চমৎকার দেখতে! তাকে দেখে একটু হাসলো লুৎফুন্নিসা বেগম। যেন আত্মীয়তা পাতিয়ে ফেলেছে একদিনেই।

নানীবেগম বললে—আমি যাচ্ছি আমার এই বৌটিকে নিয়ে মীর্জার কাছে—

লুৎফুন্নিসা বললে—কিন্তু কেন যাচ্ছ তুমি নানীজী! যদি এখন তাঁর মেজাজ খারাপ থাকে? যদি তোমার সঙ্গে দেখা না করে?

—আমার সঙ্গে দেখা করবে না মীর্জা? আমার মীর্জাকে আমি চিনি না?

লুৎফুন্নিসা বললে—না নানীজী, আমি শুনেছি তাঁর মেজাজ ভালো নেই, কলকাতা থেকে ফিরিঙ্গীদের ধরে নিয়ে এসেছে, তার দরবার হচ্ছে সেখানে—

—তা হলোই বা। তা বলে সে তার নানীর সঙ্গে দেখা করবে না?

—কিন্তু নানীজী, তুমি কী বলবে সেখানে গিয়ে?

—আমি বলবো, এই রাণীবিবিকে হাতিয়াগড় থেকে কেন নিয়ে আসা হয়েছে, তার কৈফিয়ত চাইবো মীর্জার কাছে।

—কিন্তু নানীজী, এ কি এই প্রথম? এর আগেও তো কতবার এরকম হয়েছে, কত লেড়কী এখানে এসেছে, তার বেলায় তো তুমি কিছু বলোনি। তারাও তো এই বহেন্‌জীর মত কষ্ট পেয়েছে।

—তাদের কথা আলাদা।

—কেন? আলাদা কেন? তারা কি মানুষ নয়? তাদেরও কি স্বামী, বাপ, মা কেউ নেই? তারা কি এখানে এসে কেঁদে কেঁদে রাত কাটায়নি? তুমি তাদের জন্যে কী করেছো?

নানীবেগম কী যেন ভাবলে একবার। তারপর বললে, তুই যা বলেছিস সব সত্যি বহু, কিন্তু তখন তো আমি একলা ছিলাম না মা। তখন যে নানা-নবাব ছিলেন মাথার ওপর, তার কথার ওপর তো আমি কথা বলতে পারতাম না। এখন যত দিন যাচ্ছে, তত যে বাড়ছে—এর তো একটা বিহিত করা দরকার—

—দেখো, তুমি যদি পারো, আমি কিছু জানি না।

নানীবেগম বললে—আমিনা কোথায় রে? আমিনাকে একবার বলে যাই—

বলে মরালীকে নিয়ে আবার বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। তারপর চলতে চলতে অন্য এক মহলে চলে গেলেন। মরালীও সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছিল। চারদিকে চেয়ে

চেয়ে অবাক হয়ে যাচ্ছিল মরালী। এও যেন একটা শহর। শহরের রাস্তার দু'পাশে বাড়ি-ঘর-দোর। সামনে পেছনে যারা আসছে যাচ্ছে তারা নানীবেগমকে দেখে সবাই ভয়ে-ভক্তিতে নিচু হয়ে কুর্নিশ করছে। আর মরালীর মুখখানাকে দেখছে। মরিয়ম বেগমকে সবাই চিনতে পারছে। কাল যে কান্ড করে বসেছে মরালী, তারপর তাকে চিনতে আর কারো বাকি নেই।

—আমিনা?

নানীবেগম ঘরের মধ্যে ঢুকলো। এই আমিনা বেগম! নবাব-বেগমদের অনেক কথা বাইরের লোক জানে। মরালীও জানতো। যেন সব স্বপ্নের জগৎ। হাতিয়াগড়ের মানুষরা এই আমিনা, ঘসেটি, সবাইকার কাহিনী জানতো। হোসেনকুলী খাঁর কথা জানতো। নবাব আলীবর্দী খাঁর বড় আদরের মেয়ে এই আমিনা। মরালীর চোখ দুটো জুড়িয়ে গেল!

আমিনা বেগমও অনেকক্ষণ ধরে দেখলে মরালীকে। তারই পেটের ছেলে মীর্জা মহম্মদ এই মেয়েকে হাতিয়াগড় থেকে এখানে নিয়ে এসেছে।

—তুই যাবি আমার সঙ্গে?

আমিনা বেগম বললে—আমি যাবো না মা, মিছিমিছি অপমান করে তাড়িয়ে দেবে। তাকে তুমি চেনো না—

নানীবেগম বললে—অবাক করলি তুই আমাকে, মীর্জাকে আমি চিনবো না তো তুই চিনবি? তাকে তুই মানুষ করেছিস না আমি করেছি?

আমিনা জ্বলে উঠলো—মানুষ করলেই বা, আমাকে কি মীর্জা মা বলে মনে করে? তা যদি করতো তাহলে সেবারই আমার কথা শুনতো—

—কোন্‌বার?

—কেন? আমি বারণ করিনি ফিরিঙ্গীদের সঙ্গে লড়াই করতে? আমার কথা শুনেছে সে? সে তো তুমি জানো। আমি নিজে মতিঝিলে গিয়ে ওকে বললাম—তুমি হলে নবাব, বাংলার নবাব, তুমি কেন ওদের সঙ্গে লড়াই করে নিজেকে ছোট করবে? ওরা বেনের জাত, ওদের সঙ্গে লড়াই করলে ওদেরই সম্মান দেওয়া হবে! তা শুনেছে মীর্জা আমার কথা? আমাকে উত্তরে কী বললে জানো? আমি ফিরিঙ্গীদের সঙ্গে আফিমের কারবার করি বলে নাকি আমি তাদের দিকে টেনে কথা বলছি—শোন কথা!

তারপর একটু থেমে বললে—তা কারবার করলেই আমার দোষ হয়ে গেল? আমার সঙ্গে তো তাদের কেবল টাকার সম্পর্ক! আমি আফিম বেচি সোরা বেচি, তারা কেনে; আমি টাকা পেলেই সম্পর্ক চুকে গেল—

মরালীর মনে হলো যার মা এমন, তাকে কেমন দেখতে কে জানে! অথচ তাকে সবাই ভয় করে কেন? বাইরে থেকে যা কিছু সে শুনেছিল কিছুই তো সে রকম নয়।

—আমি যদি গিয়ে বলি, এই বেগমকে এর বাড়ি পাঠিয়ে দাও তো আমাকেই হয়তো শাসাবে, বলবে আমি হয়তো কিছু টাকা নিয়েছি এর কাছ থেকে, নইলে এর জন্যে এত টেনে বলছি কেন? আর আমার কথা না-শুনে ফিরিঙ্গীদের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে কী লাভটা হলো? কত টাকা পেলে ও? কিছু তো টাকা পায়নি। টাকা পায়নি বলেই তো ফিরিঙ্গী সাহেব হলওয়েলকে ধরে নিয়ে এসেছে—যদি তাকে...

—কাকে ধরে নিয়ে এসেছে?

—তুমি শোনোনি কিছু? হলওয়েল সাহেবকে। এখানে মতিঝিলে হাত-কড়া দিয়ে বেঁধে এনে যাচ্ছে-তাই করে অপমান করছে। ইয়ার-বক্সীরা বলেছে ওকে চাপ দিলেই নাকি লাখ লাখ টাকা বেরোবে ফিরিঙ্গীদের খাজাঞ্চিখানা থেকে—

নানীবেগম আর দাঁড়ালো না। বললে—তাহলে আমি একলাই এই মেয়েকে নিয়ে যাই—

তারপর ঘরের বাইরে এসে কোন্ রাস্তা দিয়ে বেঁকে কোন্ রাস্তায় বেরোল তার কিছুই বোঝা গেল না। চবুতরের কাছে নানীবেগমের তাঞ্জাম দাঁড়িয়ে ছিল। তাতেই গিয়ে বসলো। মরালীকেও নিয়ে সামনে বসালো। তারপর চলতে চলতে একেবারে চেহেল্-সুতুনের বাইরে এসে পড়লো তাঞ্জাম। চেহেল্-সুতুনের ভেতরে আসার পর, আবার এই প্রথম বাইরে যাওয়া। সমস্ত রাস্তা দুজনেই চুপচাপ। নানীবেগমের মুখের দিকে চেয়ে দেখলে মরালী। যেন খুব ভাবছে একমনে। যেন বড় উদ্বিগ্ন।

সকালবেলা চক্-বাজারের রাস্তায় তেমন ভিড় থাকে না। তবু তাঞ্জাম দেখে যে ক'জন লোক ছিল তাদের সরিয়ে দিলে কোতোয়ালের লোক। তাঞ্জাম যাতা হ্যায় খেয়াল নেহি? নানীবেগমকা তাঞ্জাম। মুর্শিদাবাদের লোক রাস্তা করে দিলে তাঞ্জামের। তারপর দেখলে সে তাঞ্জামটা গিয়ে ঢুকলো মতিঝিলের ভেতরে।

মরালীও পেছন পেছন চলছিল। মতিঝিলের শ্বেতপাথরের চবুতরে নেমে নানীবেগম আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগলো। এবার মরালী চলতে লাগলো পাশাপাশি। দূর থেকে কানে গেল যেন কার ভারি গলার আওয়াজ। যেন ভারি গলায় কে কাকে বকছে। নবাব নাকি! নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলা! নানী-বেগমের মীর্জা মহম্মদ!

মাথার ওপরে ঝাড়-লণ্ঠন ঝুলছে। সারা দেয়ালে পঙ্খের কাজ। পায়ের তলায় শ্বেত পাথর। যদি বকে তাকে নবাব! নবাবের হুকুম না-মানার জন্যে যদি নানী-বেগমকেও বকুনি দেয়, কেন মরিয়ম বেগমকে পাঠাওনি তুমি?

হঠাৎ নানীবেগম বললে—তুই এই ঘরে দাঁড়া বেটি, আমি পাশের ঘরে গিয়ে মীর্জাকে ডেকে পাঠাচ্ছি, মীর্জা এখন দরবারে বসেছে—

মরালী একলাই দাঁড়িয়ে রইলো। মতিঝিলের নামই মরালী শুনে এসেছে এতদিন, দেখলে এই প্রথম। এখানেই গুলসন এসেছিল। এখানে আসবার জন্যেই সব বেগমরা পাগল। এখানে একবার এলে এক রাত্রেই ভাগ্য ফিরিয়ে নেওয়া যায়। সেই মতিঝিলের মধ্যে এসেই আজ দাঁড়িয়েছে সে। দেয়ালে দেয়ালে পাখাওয়ালা পরীদের মূর্তি। তাদের হাত বাড়িয়ে দিয়ে ধরতে চাইছে পুরুষমানুষরা। এরাও ছাড়বে না, ওরাও ধরা দেবে না। কোথাও আবার দুটো হাঁস গলা জড়াজড়ি করে জলের ওপর ভাসছে। পাশের ঘরে চলে গেছে নানীবেগমসাহেবা। অলিন্দের দিকে পা বাড়ালো মরালী। কাঠের জাফরি দিয়ে ঢাকা অলিন্দ। জাফরির ফাঁক দিয়ে বাইরে দেখা যায়। মরালী বাইরের দিকে চাইলে। বিরাট ঝিল। ঝিলের ওপর হাজার হাজার পদ্ম ফুটে রয়েছে। ক'টা বক একমনে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে জলের দিকে চেয়ে। টিপ্ করছে মাছ ধরবে বলে।

হঠাৎ পাশের দিকে নজর পড়তেই মনে হলো কে যেন উঁকি দিয়ে তাকে দেখছে। একটা বীভৎস মুখ, একমুখ দাড়ি।

মরালী চোখ ফিরিয়ে নেবার চেষ্টা করলে। কিন্তু খানিক পরে আবার চোখ দুটো ফেরাতেই সমস্ত শরীর যেন আতঙ্কে শিউরে উঠলো। মুখটা যেন দাঁত

বার করে হাসলো। তার দিকে এগিয়ে আসতে চেষ্টা করলে। আর মরালীর মনে হলো বীভৎস মূর্তিটা যেন গ্রাস করতে আসছে। মরালী আর চেপে রাখতে পারলে না। হঠাৎ ভয় পেয়ে আর্তনাদ করে উঠলো—আঁ-আঁ-আঁ আঁ আঁ—

সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো কারা যেন পাশের ঘর থেকে দৌড়ে আসছে। অনেক-গুলো পায়ের আওয়াজ। সিঁড়ি দিয়ে দুমদাম শব্দ করে যেন কারা দৌড়ে দৌড়ে নীচে নামতে লাগলো। তার পরে আর তার জ্ঞান নেই।

সারাফত আলির দোকানে আগের দিন সন্ধ্যেবেলা কান্ত কেবল ছটফট করেছে। নজর মহম্মদের মুখখানাই কেবল দেখবার চেষ্টা করেছে। সন্ধ্যেবেলা মুর্শিদাবাদের চক-বাজারে কোথা থেকে এত লোক জমা হয় কে জানে। কাজই বা কীসের তাও কান্ত বুঝতে পারে না। হয়তো সারাদিন কাজকর্ম করে সন্ধ্যেবেলা ফুর্তি করতে বেরোয়। তখন গণৎকাররা ছক পেতে বসে রাস্তার মোড়ে। বসে মানুষের ভাগ্যকে কখনো আকাশে ওঠায়, কখনো পাতালে নামায়। বেলফুলের মালা নিয়ে ফিরি করতে বেরোয় মালীরা। ওদিক থেকে হাতীর দল গঙ্গায় চান করে সার সার ফেরে পিলখানার দিকে। তখনই ইব্রাহিম খাঁ মদের হাঁড়া মাথায় নিয়ে মতিঝিলের দিকে যায়।

সেদিনও হাতীগুলো যাচ্ছিল। ইব্রাহিম খাঁ কিন্তু গেল না। আগের দিন হাতীর ধাক্কায় পড়ে গিয়ে হয়তো গায়ে-গতরে ব্যথা হয়ে পড়ে আছে ঘরে। বেলফুলের ফেরিওয়ালাও চলেছে। দোকানের ভেতরে সারাফত আলি তখন আগরবাতি জেবলে দিয়ে আফিমের নেশায় জোরে-জোরে গড়গড়ার ধোঁয়া টেনে দোকানঘর অন্ধকার করে দিয়েছে। ঠিক এই সময়েই রোজ নজর মহম্মদ আসে। এসে গল্প করে। মিঞাসাহেবের সঙ্গে দাঁড়িয়ে চেহেল্-সুতুনের বেগম-মহলের খবরাখবর দেয়। তারপর এক ফাঁকে আরকের পাত্রটা কাপড়ের খুঁটের ভেতরে লুকিয়ে নিয়ে চলে যায়। সেদিনও যথাসময়ে আসার কথা। গরজটা নজর মহম্মদেরও যেমন, কান্তরও তেমনি। নজর মহম্মদ বিনা-নজরানাতে চেহেল্-সুতুনে নিয়ে যাবে না, সুতরাং কান্তকে নিয়ে গেলে তার লাভও কম নয়।

সারাফত আলি নেশার ঝোঁকেও কান্তকে দেখতে পেয়েছে—কী রে কান্তবাবু, নজর এল—?

কান্ত বললে—না মিঞাসায়েব, এখনো তো তার পাত্তা নেই—

—আসবে, আসবে, আনেই পড়েগা, না এসে যাবে কোথায়?

কান্তরও মনে হয়েছিল নজর মহম্মদ আসতে দেরি করছে কেন? আজ যে কান্তর একটু তাড়াতাড়ি যাওয়া দরকার। মরালী কেন তার পরিচয়টা দিতে গেল! কেন অমন সর্বনাশ করতে গেল নিজের। নিজেরও সর্বনাশ, পরেরও সর্বনাশ! এখনই যদি কোনো রকমে একবার চেহেল্-সুতুন থেকে জোর করে নিয়ে আসা যায়, তাহলেই হয়তো সব দিক থেকেই রক্ষে পাবে মরালী।

—আচ্ছা মিঞাসাহেব, আজ যদি নজর মহম্মদ আর না আসে?

সারাফত বললে—না আসে তো না আসবে! লেকিন্ উসকো আনেই পড়েগা!

—কিন্তু আজ আসবে না? আজ যে আমার জরুরী দরকার ছিল।

—আজ না এলে কাল আসবে। মেরে পাশ আনেই পড়েগা উস্‌কো!

—কিন্তু আজই যে আমার দরকার!

—কেন? আজই তোর দরকার কেন?

কান্ত বললে—ওই যে ইব্রাহিম খাঁ, কালকে যে লোকটা হাতীর ধাক্কা লেগে পড়ে গিয়েছিল, তার কাছে যে চেহেল্‌-স্‌তুনের ভেতরের কান্ড শ্‌নল্‌ম কি না, এলাহী কান্ড নাকি ঘটে গেছে চেহেল্‌-স্‌তুনে—

—দ্‌র, ও-রকম কান্ড চেহেল্‌-স্‌তুনে হামেশা হচ্ছে! ও চেহেল্‌-স্‌তুনকা মাম্‌লী বাত্‌!

—না মিঞাসাহেব, রাণীবিবি একটা দার্‌ন কান্ড করে বসেছে নাকি!

—কী কান্ড?

—নিজের আসল পরিচয়টা সক্কলকে বলে দিয়েছে রাণীবিবি। এতদিন মরিয়ম বেগম বলে সবাই জানতো রাণীবিবিকে, এখন জেনে ফেলেছে, ও হচ্ছে হাতিয়াগড়ের জমিদারের দ্বিতীয় পক্ষের বউ! সেই জন্যেই তো আমার ভয় হচ্ছে খ্‌ব!

—কেন, তোর ভয় কীসের? মরিয়ম বেগম হলেও যা, রাণীবিবি হলেও তাই। ও একই বাত্‌! বাঁদী ভি বাঁদী, বেগম ভি বাঁদী। বেগমরাও আমার আরক খায়, তোর রাণীবিবিও আমার আরক খায়—

কান্ত রেগে গেল। বললে—না মিঞাসাহেব, রাণীবিবি কিছ্‌তেই তোমার আরক খায় না।

—আজ খায় না কাল খাবে। পহেলে তো কেউ খায় না, পরে খায়। আমার আরক খেলে পহেলে তো আরাম মাল্‌ম দেয়, তারপর নেশা পাকড়ে যায়, তখন মরিয়ম বেগম, বব্ব্‌ বেগম, গ্‌লসন বেগম, তক্কি বেগম, ঘসেটি বেগম, আমিনা বেগম, সব গোলমাল হয়ে এক-কাট্টা হয়ে যায়—

সারাফত আলি যখন কথা বলে তখন আর থামতে চায় না। তখন হাজি আহম্মদের একেবারে কুল্‌জি ধরে টান দেয়। কোথায় যেন একটা বোবা অভিযোগের অশান্তি মনের মধ্যে দিনরাত ঘ্‌রপাক খায়, তাই একট্‌ ফ্‌টো পেলেই একেবারে হ্‌ড়-হ্‌ড় করে বেরিয়ে পড়ে।

বলে—মরিয়ম বেগমই হোক আর হাতিয়াগড়ের রাণীবিবিই হোক, আমার আরক ওদের পিলিয়ে দে,—ও সব বিলকুল সাফ হয়ে যাক—

এ-সব কথা কান্তর অনেক শোনা আছে। ব্‌ড়োর বকবকানি বেশি ভালো লাগে না। অথচ না-শ্‌নলেও চলে না। ব্‌ড়ো বড় ভালো মান্‌ষ। থাকতে দেয়, খেতে দেয়, ঘর ভাড়া নেয় না। এত হিন্দ্‌ আছে ম্‌র্শিদাবাদে, তাদের ক'জন এমন করে করবে তার জন্যে। আবার লজ্জাও করে। মাগনা তার জন্যে এ কেন করে সারাফত আলি! নিশ্চয়ই কোনো ঘা খেয়েছে। এমন ঘা যা ব্‌ড়ো বয়েস পর্যন্ত ভুলতে পারে না। বাদ্‌শাকে একবার জিজ্ঞেস করেছিল কান্ত—আচ্ছা বাদ্‌শা, মিঞাসাহেবের এত রাগ কেন বলো তো চেহেল্‌-স্‌তুনের ওপর? তুমি কিছ্‌ জানো?

বাদ্‌শা বলেছিল—না জনাব, আমি সে বলতে পারবো না—

কান্ত বলেছিল—আমার জন্যে এত মোহর কেন খরচ করছে? চেহেল্‌-স্‌তুন থাকলো কি গেল তাতে মিঞাসাহেবের কী আসে যায়?

—ও জনাব আমার জন্যে ভি খরচা করেছিল মিঞাসাহেব! আমি ভি চেহেল্‌-

সুতুনে গিয়েছি কতবার। আমাকে ভি মিঞাসাহেব চেহেল্-সুতুন ভেঙে গুঁড়িয়ে গোরস্থান বানিয়ে দিতে বলেছিল! আমি পারিনি—

—নজর মহম্মদই তোমাকে নিয়ে গিয়েছিল?

—জী জনাব!

—তুমি গিয়ে কার সঙ্গে দেখা করতে?

বাদ্শার চোখ-কান-মুখ লাল হয়ে উঠেছিল কথা বলতে বলতে। চেহেল্-সুতুনের কথা মনে পড়তেই যেন অনেক লজ্জাকর স্মৃতি মনে উদয় হয়েছিল।

কান্ত তবু ছাড়েনি, জিজ্ঞেস করেছিল—সত্যি, বলো না, তুমি যেতে কী করতে?

বাদ্শা কুড়ি-বাইশ বছরের জোয়ান ছেলে। বললে—বেগমরা সব তাগড়া-তাগড়া, আমি ওদের সঙ্গে লড়তে পারবো কেন বাবুজী? রাতের পর রাত গিয়ে গিয়ে আমার তবিয়ত খারাপ হয়ে গেল, আমার তাগদ্ চলে গেল—

—কেন, তাগদ্ চলে গেল কেন?

—সে আপনাকে কবুল করতে পারবো না জনাব, জোয়ান লেড়কা চেহেল্-সুতুনে গেলে তার তাগদ্ ফুরিয়ে যায়, তাগড়া তাগড়া বেগম লোগ্ তাকে বরবাদ করে দেয়—

বলে মিটি-মিটি হাসতে লাগলো বাদ্শা।

এর পরে বাদ্শার কথার মানে বুঝতে আর দেরি হয়নি। সেখান থেকে চলে গিয়েছিল কান্ত! কেমন যেন সন্দেহ হতে লাগলো তার। তবে কি সারাফত আলি সেই জন্যেই তাকে পাঠাচ্ছে চেহেল্-সুতুনে!

যখন রাত আরো গভীর হলো তখনো নজর মহম্মদের দেখা নেই। আর দেখা হলো না মরালীর সঙ্গে। তখন সারাফত আলির আর কথা বলবার ক্ষমতা থাকে না। আফিমের মৌতাত তখন তার মাথার ঘিলুতে গিয়ে ঠেকে। তখন আর ভালো-মন্দ জ্ঞান থাকে না তার। তখন চেহেল্-সুতুনের ওপরেও রাগ থাকে না। তখন সারাফত আলি নিজেকে নিয়েই বুঁদ হয়ে থাকে। ভাবনা-চিন্তা করবার ক্ষমতাটুকু পর্যন্ত তার লোপ পেয়ে যায়।

অনেক রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিল কান্ত। নিজের ঘুপচি ঘরের মধ্যে শুয়ে-শুয়েও নজর মহম্মদের কথা ভেবেছিল। তারপর ভোর বেলা ঘুম থেকে উঠেই মনে পড়লো বশীর মিঞার কথা। বশীর মিঞার সঙ্গে তার পর থেকে আর দেখা হয়নি, হয়তো সে ব্যস্ত আছে খুব। নবাব ফিরে এসেছে মুর্শিদাবাদে। চারদিকে সব থম-থমে ভাব। নবাব ফিরে আসার সঙ্গে-সঙ্গেই মুর্শিদাবাদের চেহারা যেন আবার বদলে গিয়েছে।

ভোর বেলা বিছানা থেকে উঠেই সে বশীর মিঞার বাড়ির দিকে যাবার জন্যে বেরিয়েছিল। যদি বশীর মিঞা তাকে আবার কোনো একটা কাজ দেয় তো আবার তাকে এই অবস্থাতেই বাইরে যেতে হবে। হয় মোল্লাহাটি নয় তো কেষ্টনগর, নয় তো অন্য কোথাও। সারা বাঙলাদেশময় বশীর মিঞার জাল পাতা আছে।

রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে বশীর মিঞার বাড়ির সামনেও এসে দাঁড়ালো। একবার ডাকতেও ইচ্ছে হলো তার। কিন্তু আবার মনে হলো তাকে ডেকেই বা কী হবে। তারপর আবার সেই রাস্তা দিয়েই সোজা চলতে লাগলো। একেবারে সোজা মহিমাপুরের দিকে। ওদিকে জগৎশেঠ সাহেবের বাড়ি। বিরাট বাড়ি। সামনে বিরাট বাগান। ফটকের সামনে পাঠান পাহারাদার ভিখু শেখ দাঁড়িয়ে

থাকে যমদূতের মত। ভিখু শেখকে দেখলেই কান্তর ভয় করে।

তারপর এক জায়গায় গিয়ে কান্ত আবার ফিরলো।

আবার কোথায় যাবে! কী করে সময়টা কাটাবে? সময় কাটাতেই অনেক সময় কান্ত বিব্রত হয়ে পড়ে। সন্ধ্যের আগে আর নজর মহম্মদ আসছে না। যখন সারাফত আলি আবার আগরবাতি জ্বালিয়ে গড়গড়ার নল মুখে দিয়ে তামাকের ধোঁয়া টানবে, সেই-ই নজর মহম্মদের আসার সময়। হঠাৎ কোতোয়ালের লোক তাড়া করতে লাগলো—হটো হটো, হট্ যাও—

রাস্তার একপাশে সরে এল কান্ত। একটা রুপোলী ঝালরদার পালকি চলেছে রাস্তা দিয়ে। সামনে পথ করতে করতে চলেছে নবাবের এক জোড়া হাতী। হাতী দুটোর শুঁড়ের মাথায় ঝালর ঢাকা। ওপর থেকে শুঁড়ের ডগা পর্যন্ত নক্সা-কাটা।

—হটো হটো, হট্ যাও—

পাশের একটা লোককে জিজ্ঞেস করাতে সে বললে—নানীবেগমের পালকি। কান্ত আরো ভালো করে পালকিটার দিকে চেয়ে দেখলে। মরালীকে যে-পালকিটা করে সে এখানে নিয়ে এসেছিল সেটাতে এমন ঝালর দেওয়া ছিল না। এটা আরো দামী। পালকিটার গায়ে কাঠের ওপর নক্সা আঁকা।

—সকাল বেলা নানীবেগম কোথায় যাচ্ছে?

—মতিঝিলে। বোধহয় নবাবের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে।

মতিঝিলের কথাটা শুনেই সেই ইব্রাহিম খাঁর কথা মনে পড়লো। সেই সচ্চরিত্র পুরকায়স্থ। কী অদ্ভুত নাম রেখেছিল তার বাপ-মা। কান্ত মতিঝিলের দিকেই পা বাড়ালো। তার সঙ্গে দেখা করলে হয়। পালকিটা হু-হু করে সামনের দিকে এগিয়ে চোখের আড়ালে চলে গেল। কান্তও সেই দিকে পা বাড়ালো।

যখন মতিঝিলের ফটকের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে তখন পালকিটার আর দেখা পাওয়া গেল না—সেখানা কোথায় ভেতরে চলে গেছে। হাতী দুটো শুধু ঝিলের ধারে ঘাসের ওপর চরে বেড়াচ্ছে।

—ইব্রাহিম খাঁ ভেতরে আছে ভাই?

—ইব্রাহিম খাঁ?

—হ্যাঁ, তোমাদের এই মতিঝিলের সরাবখানার খিদ্মদ্গার। এই খুব বুড়ো মতন, প্রায় সত্তর বছর বয়েস, মুখময় কাঁচা-পাকা দাড়ি। তার সঙ্গে একবার দরকার ছিল আমার, দেখা হবে এখন?

পাহারাদার লোকটা বোধহয় ভালো। সংসারে যেমন এক-একজন ভালো মানুষ থাকে, তেমনি।

কান্ত আবার বললে—আমার বিশেষ জানাশোনা মানুষ, ভেতরে যাবার নিয়ম হয়তো নেই, না গো!

তারপর একটু থেমে নিজেই আবার বললে—তা আমাকে যদি ভেতরে যেতে দিতে আপত্তি থাকে তো তাকেই একবার ডেকে দাও না, দেখাটা করে কথা বলে চলে যাই—

পাহারাদার লোকটা বললে—যাইয়ে, অন্দর মে যাইয়ে—লেক্ন্...

বলে যে-কথাটা বললে তার অর্থ এই দাঁড়ায় যে নানীবেগম ভেতরে গেছে, নবাবেরও দরবার চলেছে, এ-সময়ে যেন বেশিক্ষণ ভেতরে না থাকে। দেখা করেই যেন বাবুজী চলে আসে।

কান্ত বললে—না না, আমি বেশিক্ষণ থাকবো না, আমার কাজ এক-দণ্ডেই মিটে যাবে, সামান্য একটুখানি শুধু দেখা করা—

তারপর জিজ্ঞেস করলে—কিন্তু কোন্ দিক দিয়ে আমি যাবো? আমি তো সরাবখানাটা ঠিক চিনি না—

লোকটা নিজেই একজনকে ডেকে শেষ পর্যন্ত সুব্যবস্থা করে দিলে। সত্যি, নিজামতের লোকরা সবাই-ই কিছু খারাপ নয়। কিছু কিছু ভালো লোক এখানে আছে বইকি! ভালো লোক না থাকলে কবে একদিন এদের নিজামতি চলে যেত। ভালো লোক আছে বলেই তো নবাবিআনা চলছে এতকাল ধরে। লোকটার ভালো হোক। কান্ত নিজের মনে মনেই বললে, লোকটার ভালো হোক। ভালো লোকদের ভালো হলেই তো আনন্দ হয়। পৃথিবীর খারাপ লোকদের ভালো হতে দেখলেই কান্তর বড় মন-খারাপ হয়ে যায়। ষষ্ঠীপদ ভালো লোক, তার ভালো হোক। বশীর মিঞা ভালো লোক, তার ভালো হোক। আসলে সারাফত আলিও ভালো লোক, তারও ভালো হোক। আর মরালী! মরালীও তো ভালো। মরালীও তো কোনো দোষ করেনি, তারও ভালো হোক। বর পছন্দ না-হওয়াতে পালিয়ে গিয়েছিল বলে কি আর সে রাতারাতি খারাপ মেয়ে হয়ে গেল? তা নয়। আসলে খারাপ-ভালো বিচার করাই শক্ত। মরালী যদি জোর-জবরদস্তিতে আরক খেতে বাধ্য হয়, কেউ যদি সাপের বিষ জোর করে তার গলায় ঢুকিয়ে দেয়, তাতেই কি সে খারাপ হয়ে যাবে? আর, বাদ্শা যা বলছিল, তাও যদি মরালীর ভাগ্যে ঘটে, তাতেই বা কী দোষ মরালীর! কী আশ্চর্য, বাদ্শা বলে কিনা সে রাত কাটাতো চেহেল্-সুতুনের ভেতরে। রাত কাটিয়ে চেহারা খারাপ হয়ে গেল বলেই আর যায় না। তাহলে কান্তকেও কি সেই জন্যেই চেহেল্-সুতুনে পাঠাচ্ছে সারাফত আলি। যাতে নেশা লাগে, লেগে শরীর খারাপ হয়?

—আরে বাবাজী, তুমি?

একেবারে সচ্চরিত্র পুরকায়স্থর মুখোমুখি দাঁড়াতেই কান্ত যেন আবার পৃথিবীতে ফিরে এল। সিঁড়ির নিচেয় অন্ধকার একটা ঘর। চারদিকে কড়ির জালা। সারাফত আলির দোকানে যেমন খুশ্বু তেল থাকে, তেমনি থরে থরে সাজানো। বেশ মিষ্টি-মিষ্টি কড়া-কড়া গন্ধ ঘরটার মধ্যে। যে-লোকটা কান্তকে পেঁছিয়ে দিয়ে গিয়েছিল সে তখন চলে গেছে।

কান্ত বললে—এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম, তাই আপনার কথা মনে পড়লো। কেমন আছেন এখন?

সচ্চরিত্র পুরকায়স্থ কান্তকে দেখেই উত্তেজনায় লাফিয়ে উঠেছে—এই তোমার কথাই ভাবছিলাম বাবাজী, তোমাকে সেই বলেছিলাম না শোভারাম বিশ্বাস মশাই-এর কন্যার কথা? সেই যার সঙ্গে তোমার বিবাহের প্রস্তাব করেছিলাম?

কান্ত উদ্‌গ্রীব হয়ে বলে উঠলো—হ্যাঁ হ্যাঁ, সে তো বলেছিলেন, তা তার কী হয়েছে?

—সে তো নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিল বিবাহের রাত্রে, সে তো তোমাকে বলেছি—হঠাৎ সেই কন্যাকে আজ এখানে দেখলাম।

—এখানে?

—হ্যাঁ, এখানে। এই এখুনি নানীবেগমসাহেবার সঙ্গে এই মতিঝিলে তাঞ্জাম থেকে নামলো। এই এখখুনি। নেমে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেল তুমি আসবার একটু আগে! সেই কথাই বসে বসে ভাবছিলাম, ভাবছিলাম শোভারাম বিশ্বাস

মশাই-এর কন্যা এখানে এল কেমন করে, এমন সময়ে বাবাজী—

কান্ত জিজ্ঞেস করলে—আপনি ঠিক দেখেছেন?

—তা বাবাজী, আমি এই সত্তর বছর বয়েস পর্যন্ত এত কন্যার বিবাহ দিয়েছি, আমার ভুল হবে?

—কিন্তু এখানে কী করতে এল সে?

—তা কে জানে বাবাজী, আমিও তো তাই অবাক হয়ে ভাবছি, এখানে এই মতিঝিলে সে-কন্যা এল কেমন করে!

—কিন্তু আমার তো বিশ্বাস হচ্ছে না ঘটক মশাই।

—না বাবাজী, তোমাকে আমি দেখাতে পারি। এই সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠলেই দেখা যায়। আমি তোমাকে প্রমাণ দিতে পারি! অথচ শোভারাম বিশ্বাস মশাই ওদিকে পাগলের মত ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন মেয়ে-মেয়ে করে! খবরটা তাকে একবার দেবো ভাবছি!

কান্ত বললে—না, ঘটক মশাই, বাপকে আর এ-কথাটা বলবেন না, বড় মনোকষ্ট পাবেন। আপনি কাউকে বলবেন না। আমি শুধু ভাবছি আপনি ভুল দেখেননি তো? অন্য কাউকে দেখেননি তো?

—তবে তুমি আমার সঙ্গে ওপরে চলো, আমি তোমায় চাক্ষুষ দেখিয়ে দিচ্ছি। চলো চলো আমার সঙ্গে—

জোর করে পুরকায়স্থ মশাই কান্তকে ওপরে নিয়ে চললো। বললে—একটু আস্তে আস্তে এসো বাবাজী, ওপরে আবার নবাবের দরবার বসেছে—কলকাতা থেকে সব ফিরিঙ্গী ধরে এনে বিচার করছে নবাব। সেই জন্যেই তো এই দিক্‌কার সিঁড়ি দিয়ে নিয়ে এলাম তোমাকে—চুপি চুপি তোমায় দেখিয়ে দিয়ে আবার নেমে যাবো, কেউ দেখতে পাবে না, এসো, পা টিপে টিপে এসো—

এই-ই প্রথম ভেতরে ঢুকলো কান্ত। এই মতিঝিলের ভেতরে। এলাহি ব্যাপার দেখে অবাক হয়ে গেল। চেহেল্‌-সুতুন দেখেছে খানিকটা, কিন্তু এ যেন অন্যরকম। এ যেন সত্যিই রাজপ্রাসাদ। দিল্লী কখনো দেখেনি কান্ত, শুধু দিল্লীর বাদ্‌শার কেল্লার গল্প শুনেছে। এ সত্যিই দেখবার মত। কিন্তু এখানেই বা এল কেন মরালী! কেউ নিয়ে এল, না নিজে থেকে এল?

—ওই দেখ বাবাজী! ওই দেখ—

একটা বিরাট ঘর। চারদিকের জাফরি ঢাকা বাইরের সিঁড়ির কোণ থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখা। খুব ভালো স্পষ্ট দেখা যায় না। তবু কান্ত পুরকায়স্থ মশাই-এর পেছন থেকে দেখতে চেষ্টা করলে।

—কই? কোথায়?

—ওই যে, ওই ঘুলঘুলিটার দিকে মুখ করে বাইরের দিকে চেয়ে আছে। মুখটা এদিকে ফেরালেই চিনতে পারবে বাবাজী! আর চিনতেই বা পারবে কী করে তুমি? তুমি তো বিশ্বাস মশাই-এর মেয়েকে দেখনি। শুভদৃষ্টি হবার আগেই তো সব ভণ্ডুল হয়ে গেল—ওই ওইটিই হচ্ছে বিশ্বাস মশাই-এর মেয়ে, ওরই সঙ্গে তোমার বিয়ের সম্বন্ধ করেছিলাম বাবাজী, তা তোমারও কপালে নেই, আমারও দুঃসময় পড়লো তখন থেকে—

হঠাৎ মরালী এই দিকে মুখটা ফিরিয়েছে। আর পুরকায়স্থমশাইকে দেখতে পেয়েছে। যেন ভয় পেয়েছে দেখে। পুরকায়স্থমশাই বোধহয় একটু সাহস করে এগিয়ে যেতে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে মরালী আর্তনাদ করে উঠেছে সারা

মতিঝিল কাঁপিয়ে।

আর ওদিক থেকে যেন কাদের দৌড়ে আসার শব্দ শোনা গেল। দুম-দাম করে শব্দ হচ্ছে। কান্ত ভয় পেয়ে গেল। যদি এখন কেউ তাদের এখানে দেখে ফেলে!

পুরকায়স্থমশাইও ভয় পেয়ে গেছে। বললে—শিগ্‌গির নেমে এসো বাবাজী, কী সব্বোনাশ—

বলে নিজেই আগে আগে সিঁড়ি দিয়ে নিচেয় নেমে গেল।

নানীবেগম পাশের ঘর থেকে দৌড়ে এসেছে। পেছনে-পেছনে নবাব।

নানীবেগম মরালীর মুখের কাছে মুখ নামিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—ক্যা হুয়া বিটি? ক্যা হুয়া?

মরালীর তখন আর কথা বলবার মত অবস্থা নয়। নবাবও মরালীকে দেখলেন ভালো করে। জিজ্ঞেস করলেন—এ কৌন্, নানীজী?

নানীবেগম বললেন—এই তো হাতিয়াগড়ের রাণীবিবি!

—হাতিয়াগড়ের রাণীবিবি? এখানে কেন? এখানে কী করতে এসেছে?

নানীবেগম বললেন—আমি চেহেল্-সুতুন থেকে সঙ্গে করে এনেছি—

—চেহেল্-সুতুনে রাণীবিবি কেন এসেছে? কী করতে?

নানীবেগম বললে—সে-জবাব কি আমি দেবো? চেহেল্-সুতুনের ম্যালিক কি আমি? যেদিন থেকে তোর নানাজী মারা গেছে, সেদিন থেকেই তো আমি সব দেখা-শোনা করা ছেড়ে দিয়েছি। আমি তো সেদিন থেকে আমার কোরাণ নিয়েই থাকতুম, কিন্তু হঠাৎ নজরে পড়লো এই বেটিকে। সবাই একে মরিয়ম বেগম বলে জানতো এতদিন—

—মরিয়ম বেগম? সে কে?

—তুই যদি কিছুই না-জানিস মীর্জা, তাহলে কেন এদের কষ্ট দিতে চেহেল্-সুতুনে আনিস? কোথা থেকে সব ধরে-ধরে আনিস এদের আর এদিকে আমার যে প্রাণ বেরিয়ে যায়!

মীর্জা বললে—কিন্তু আমি কাঁদিক দেখবো নানীজী, আমি তোমার চেহেল্-সুতুন দেখবো, না মুর্শিদাবাদ দেখবো, না তামাম বাঙলা মুলুক দেখবো! চারদিকে যে আমার শত্রু ঘিরে রয়েছে! কেউ যে আমায় এক দন্ডের জন্যে শান্তি দিচ্ছে না। কাকে বিশ্বাস করবো আমি? কাকে বিশ্বাস করে সব কাজের ভার দেবো বলতে পারো? যেদিন থেকে মসনদে বসেছি সেদিন থেকেই তোমার মেয়েরা তোমার আত্মীয়রা আমাকে বিপদে ফেলতে চাইছে। তার ওপরে আছে ফিরিঙ্গীরা, তার ওপরে আছে শওকত্ জঙ্—

নানীবেগম মুখ তুললেন।

—কেন? সে বেচারি তোর কী করেছে?

—তুমি তো কারোর দোষ দেখতে পাও না। কিন্তু তাকে ক্ষেপিয়ে তোলবার লোকের তো অভাব নেই!

—কে ক্ষেপাচ্ছে তাকে? কারা তারা?

—তোমাকে সব কথা বলা যায় না নানীজী, সব কথা তুমি বিশ্বাসও করবে না। কিন্তু তুমি বলতে পারো কে শত্রু নয় আমার? তোমার জাফর আলি থেকে শুরু করে জগৎশেঠ পর্যন্ত কে শত্রুতা করছে না? কার নাম করবো তোমার কাছে! আমি কি একদিনের জন্যেও একটু শান্তি পাবো না? আমি কার কাছে

কী এমন অপরাধ করেছি যে সবাই আমার শত্রুতা করবে? তুমি একজনের নাম করো যে আমার ভালো চায়, যে আমার শুভাকাঙ্ক্ষী, আমার ভালো হলে যে আনন্দ পায়—

—কেউ পায় না?

—কে, তার নাম করো!

—কেন, আমি তোর ভালো চাই না?

মীর্জা হঠাৎ নানীবেগমকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরলে। বললে—নানীজী, তুমি তো আমাকে মানুষ করেছো নানীজী! তুমি কেন এ-কথা বলছো?

বলে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে রইলো নানীজীকে। কিছুতেই আর ছাড়তে চায় না মীর্জা।

নানীবেগম বললে—ওরে, ছাড় ছাড় আমাকে, ছেড়ে দে—

—বলো আগে, তুমি ও-কথা আর বলবে না?

হঠাৎ নেয়ামত ঘরের ভেতর ঢুকে কুর্নিশ করে দাঁড়ালো।

—কী খবর?

—জাঁহাপনা, কলকাতার রাজা মানিকচাঁদের কাছ থেকে লোক এসেছে খত্ নিয়ে, জাঁহাপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়!

জাঁহাপনা, জাঁহাপনা, জাঁহাপনা! শুনতে শুনতে মীর্জার কান যেন পচে যাবার অবস্থা হয়েছে।

নানীবেগম মীর্জার মুখের দিকে চেয়ে দেখলে। মুখখানা যেন হঠাৎ অন্য-রকম হয়ে গেল। এ যেন অন্য মীর্জা। বহুদিন আগে যখন নানীবেগম বালেশ্বরে ছিলেন তখন নবাব আলীবর্দী খাঁকেও এক-একদিন তিনি এই রকম চিনতে পারতেন না। রাত্রে কতদিন ঘুম ভেঙে গিয়ে দেখেছেন, নবাব ঘরের মধ্যে পায়চারি করছেন আর মুখে বিড় বিড় করছেন। আজ মীর্জারও যেন সেই অবস্থা।

নানীবেগম বললেন—তুই ভেতরে যা মীর্জা, তোর অনেক কাজ, আমি আসি—

মরালীর তখন বোধহয় একটু জ্ঞান ফিরে এসেছে। চোখের পাতা একটু খুলেছে।

—এই বেগমসাহেবাকে কী করে নিয়ে যাবে তুমি?

—সে তোকে ভাবতে হবে না। তুই নিজের কাজ করগে যা—

—তাহলে তুমি খবর দিয়ে দিও নানীজী, আজ রাত্তিরে আমি চেহেল্-সুতুনে যাবো।

বলে মীর্জা চলে গেল। নানীবেগম মরালীকে জিজ্ঞেস করলে—এখন তবিয়ত কেমন লাগছে বেটি?

মরালী কোনো কথা বলতে পারলে না। ফ্যাল্-ফ্যাল্ করে তাকিয়ে রইলো শুধু।

নানীবেগম জিজ্ঞেস করলে—হঠাৎ কী হয়েছিল? অত চেঁচিয়ে উঠেছিলি কেন মা? কী হয়েছিল বল্ তো?

মরালী বললে—আমার মনে হলো কারা যেন ঘরের ভেতর ঢুকে আমাকে ধরতে আসছিল—যেন আমার দিকে চেয়ে চেয়ে দাঁত বার করে হাসছিল—

—দূর পাগলী মেয়ে! এই মতিঝিলে কে তোকে ধরতে আসবে? এখানে

কার এত সাহস হবে? নিশ্চয়ই ভুল দেখেছিস্ তুই! স্বপ্ন দেখেছিস জেগে জেগে—

তারপর একজন বাঁদীকে ডেকে মরালীকে ধরতে বললেন। মরালীর দিকে চেয়ে বললেন—চল, চেহেল্-সুতুনে গিয়ে হেকিম-সাহেবকে ডেকে পাঠাবো, সব ঠিক হয়ে যাবে, চল, মীর্জাকে তোর কথা সব বলেছি, এখন দরবার চলছে, আজ রাত্তিরে মীর্জা চেহেল্-সুতুনে আসবে, চল—

তাঞ্জাম তৈরিই ছিল। নানীবেগম আর বাঁদীটা দুজনে মিলে মরালীকে ধরে তাঞ্জামের ভেতরে তুলে দিলে। তাঞ্জামটা আবার মতিঝিল পেরিয়ে রাস্তায় এসে পড়লো। আবার আগেকার মতন একজোড়া ঝালর-ঢাকা হাতী আগে আগে চলতে লাগলো।

সন্ধ্যে বেলা নজর মহম্মদ দোকানে আসতেই সারাফত আলি বললে—কী রে নজর, কাল এলি না তুই, বাবুজী তোর জন্যে রাত পর্যন্ত রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পরেশান হয়ে গেল—

নজর মহম্মদ বললে—কাল মিঞাসাহেব, চেহেল্-সুতুনে গোলমাল হয়ে গিয়েছিল সব—

—কী রকম?

—ভেবেছিলুম আমি সব ফাঁস করে দেবো মিঞাসাহেব, মেহেদী নেসার সাহেব আমার নামে কাছারিতে নালিশ পেশ করেছে, ও হারামীর বাচ্ছাকে আমি এবার দেখে নেবো। কিন্তু আমাকে শালা কিছুই করতে হলো না। মরিয়ম বেগমসাহেবা খুদ্ নিজেই সব ফাঁস করে দিয়েছে নানীবেগমসাহেবার কাছে। নানীবেগম আজ রাণীবিবিকে নিয়ে মতিঝিলে গিয়েছিল।

কান্তও কথাটা কানে যেতেই ভেতর থেকে বাইরে এসে দাঁড়ালো।

—নানীবেগম নবাবকে সব ফাঁস করে দিয়েছে!

কান্ত আর থাকতে পারলে না। বললে—তারপর?

নজর মহম্মদ সারাফত আলির দিকে চেয়েই বলতে লাগলো—মিঞাসাহেব, নবাবের কি ফুরসুৎ আছে সব কথা শোনবার। দরবার আছে, লড়াই আছে, জেনানা আছে, একলা কত কাম করবে নবাব! হল্‌ওয়েল সাহেবকে পাক্‌ড়ে এনেছিল কলকাতা থেকে, তাকে ভি ছেড়ে দিল—

—কাহে?

—নানীবেগম নবাবকে বললে ছেড়ে দিতে। জাফর আলি সাহেবকে খুব ধমক দিয়েছে নবাব। ভাইতে-ভাইতে লড়াই লাগিয়ে দেবার মতলব করছে তো? নানী-বেগম জাফর আলি সাহেবকেও খুব ধমক দিয়েছে। নবাবের নোকরি হারামের নোকরি মিঞাসাহেব। চারদিকে কেবল দুষমনি। শালা দুষমন তাড়াতে-তাড়াতে রাতে নিদ ভি নেই নবাবের চোখে। অত ফুর্তিবাজ নবাব একেবারে হয়রান হয়ে গেছে মস্‌নদে বসে।

সারাফত আলি বললে—তা আজ বাবুজীকে চেহেল্-সুতুনে নিয়ে যাচ্ছিস তো তুই?

নজর মহম্মদ ভয়ে আঁতকে উঠলো—ইয়া আল্লা, আজ তো জান নিকলে যাবে আমাদের।

—কেন?

—নবাব খুদ্ নিজে চেহেল্-সুতুনে আসবে রাত্তিরে, রাত্তিরে চেহেল্-সুতুনে ঘুমোবে। হাতিয়াগড়ের রাণীবিবির সঙ্গে মুলাকাত করে সব বাত্-চিত্ শুনবে, মেহেদী নেসার সাহেব যত ঝুট বাত্ বলেছে, তার সব ফয়সালা হবে, আজ বাবুজীকে চেহেল্-সুতুনে নিয়ে গেলে আমাদের জান চলে যাবে মিঞাসাহেব—

কান্ত চুপ করে সব শুনছিল। বললে—রাণীবিবির সঙ্গে নবাব দেখা করবে!

—হাঁ জনাব, হাঁ। সব ফয়সালা হবে যে আজ। হুকুম হয়ে গেছে চেহেল্-সুতুনে। এই তো আজ জলদি লৌট যাচ্ছি, আজ কাজে গাফিলি করলে আমার জান চলে যাবে।

বলে আর দাঁড়ালো না নজর মহম্মদ।

কান্ত অধীর হয়ে উঠেছিল। বললে—রাণীবিবি দেখা করতে রাজি হয়েছে? রাণীবিবি আপত্তি করেনি?

কিন্তু নজর মহম্মদের কানে সে-কথা পোঁছুল না। নজর মহম্মদ তখন হন্-হন্ করে বরাবর সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে চক্-বাজারের রাস্তা দিয়ে।

মতিঝিলের নবাব শুধু মতিঝিলের নবাবই নয়, বাংলা বিহার ওড়িষ্যারও নবাব। যার একটা হুকুমে মুর্শিদাবাদের চেহেল্-সুতুনের ইঁটগুলো পর্যন্ত ভয়ে থর থর করে কাঁপে, যার একটা কথায় হাতিয়াগড়ের রাজা দ্বিতীয় পক্ষের বউকে সুড় সুড় করে চেহেল্-সুতুনে প্যাঠিয়ে দেয়, সে মানুষটাকে সেই-ই প্রথম দেখলো মরালী। যেমন আর পাঁচজন মানুষ, ঠিক তেমনি। তেমনি মুখ-চোখ-কান-কপাল সব কিছু। গলার আওয়াজটাও আর পাঁচজন মানুষের মতন। এই মানুষটাই ইচ্ছে করলে নাকি যে-কোনো লোকের ভাগ্য ফিরিয়ে দিতে পারে। এই মানুষটার কাছে যাবার জন্যেই গুলসন বেগম থেকে শুরু করে সব বেগম উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকে। এই মানুষটাই বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার সকলের ভাগ্যবিধাতা। ভাবতেও অবাক লাগে।

নবাবের সব কথা কানে যায়নি ভালো করে। কিন্তু যেটুকু গিয়েছিল সেইটুকুতেই বড় মায়া হয়েছিল মরালীর মানুষটার জন্যে! সত্যি, কেউ কি নেই যে নবাবের ভালো দেখে! এমন কেউ কি নেই যে নবাবের ভালো চায়?

নানীবেগম আসবার সময় জিজ্ঞেস করেছিল—তুই অত ভয় পেয়েছিলি কেন বেটি? অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলি কেন? কী হয়েছিল তোর? মীর্জাকে তোর এত ভয়?

মরালী সে কথার উত্তর না দিয়ে বলেছিল—নবাবের বুঝি অনেক শত্রু নানীজী?

নানীবেগম বলেছিল—বেচারাকে সবাই মিলে বড় নাজেহাল করে দিচ্ছে মা, সাধে কি আর দুঃখু হয় আমার মীর্জার জন্যে! সবাই ওর দুষমন মা, সবাই ওর দুষমন!

—কেন? কীসের জন্যে শত্রুতা করে তারা? কী করেছে নবাব?

—দুষমনির কি কোনো কারণ থাকে মা! ও এক-একজনের কপালে লেখা

থাকে। তারা দুষমন নিয়েই জন্মায়, তারা লোকের ভালো করুক মন্দ করুক, তাদের দুষমন থাকবেই—

—কারণ না থাকলেও শত্রুতা করবে?

—তা করে না? মীর্জা তো আমার কোনো দোষ করেনি, তবু কেন আমার নিজের পেটের মেয়ে তাকে দেখতে পারে না? ওর নানারও ওই রকম ছিল মা, সারা জীবন তাঁকে জ্বলতে হয়েছে! তাই তো বলি, বড় হওয়াই পাপ। কারোর বড় হওয়া লোকে ভালো চোখে দেখে না। তাই তো তোকে বলেছিলাম, নবাবের চেয়ে নবাবের প্রজারা অনেক সুখে আছে। তারা তবু রাত্তিরে আরাম করে ঘুমোতে পারে, শাক-ভাত যাহোক দুটো পেট ভরে খেয়ে শান্তি পায়। মীর্জার আমার খেয়েও সুখ নেই, ঘুমিয়েও সুখ নেই। এই যে আমার সঙ্গে আজ কতদিন পরে দেখা হলো, কত কথা বলবার ছিল, কিন্তু কোথা থেকে হঠাৎ মানিকচাঁদের চিঠি এল আর সব বন্ধ হয়ে গেল। এখন দেখি, আজ র‍্যাত্তিরে যদি আসে তো তোর একটা হিল্লে করে দেবো মীর্জাকে বলে—

—আমার আবার কী হিল্লে করবে নানীজী?

—তোকে যদি হাতিয়াগড়ে ফেরত পাঠাবার জন্যে মীর্জার মত করাতে পারি!

—আমাকে ফেরত পাঠাবেন?

মরালী চমকে উঠলো।

—কেন? ফেরত পাঠালে তুই যাবি না? তোর কি চেহেল্-সুতুনে থাকতে ভালো লাগছে? ফেরত পাঠালে তোর সোয়ামী তোকে নেবে না?

মরালী বললে—না।

নানীবেগম আবার জিজ্ঞেস করলে—সত্যিই নেবে না?

মরালী আবার বললে—না। আমি মুসলমানের হাতে খেয়েছি, আমার জাত গেছে, এর পর কেউ কাউকে ঘরে নেয় না।

—তা কী করবি বল্? মীর্জাকে আমি কী বলবো?

মরালী বললে—আমি এখানেই থাকবো!

নানীবেগম আরো অবাক হয়ে গেল। বললে—তুই থাকতে পারবি? কষ্ট হবে না থাকতে? তুই তো নজর মহম্মদ, পীরালি খাঁ, বরকত আলি ওদের দেখেছিস, ওদের মন জুগিয়ে চলতে পারবি?

মরালী হঠাৎ বললে—আমি আপনার কাছে থাকবো নানীজী!

নানীবেগম হেসে ফেললে। বললে—দূর পাগলি, আমি আর ক'দিন! আমি তো আর বেশি দিন বাঁচবো না। আমি মরে গেলে তুই কী করবি! কে তখন দেখবে তোকে?

মরালী বললে—ছোটবেলায় তো আমার মা-ও মারা গিয়েছিল, তখন কে আমায় দেখেছিল?

এর পর নানীবেগম আর কোনো কথা বলেনি। মরালীও আর কোনো ক বলেনি। কেমন যেন সেইদিনই দুজনের মন জানাজানি হয়ে গিয়েছিল। সেদিন থেকে আর কোথাও যেতে মরালীকে কেউ বাধা দেয়নি। সেই দিন থেকেই মরালী চেহেল্-সুতুনের ভেতরে এ-মহল থেকে ও-মহলে ঘুরে বেড়িয়েছে। সেই তখন থেকেই মনে হয়েছিল, যে লোকটার এত শত্রু তাকে একটু শান্তি দিতে হবে! আর তারপরে যখন সেই ক্লাইভ সাহেব এসেছিল ওর জীবনে, তখনো সেই মানুষটার কথা ভুলতে পারেনি।

ক্লাইভ সাহেব মরালীকে মেরী বলে ডাকতো। কোথাকার কোন্ সাত সাগর তের নদী পারের দেশ। সেখান থেকে এসেছিল এখানে চাকরি করতে। সামান্য চাকরি। সাহেব এক একদিন চুপ করে বসে থাকতো বাগানে। আবার এক একদিন প্রাণ ভরে গল্প করে যেত। ফরসা টক্ টক্ করছে গায়ের রং। কত লড়াই করেছে কত জায়গায়। কতবার আত্মহত্যা করতে গেছে।

মরালী জিজ্ঞেস করতো—কেন গো, আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলে কেন তুমি?

সাহেব বলতো—এখনো মাঝে মাঝে মরে যেতে ইচ্ছে করে আমার, তা জানো মেরী?

—কেন? তোমার এত কষ্ট কীসের?

তখন সাহেবের প্রচুর টাকা। তখন রবার্ট ক্লাইভও যা, দিল্লীর বাদ্‌শাও তাই। মরালীর অবাক লাগতো সাহেবের কথা শুনে। মনে পড়তো মুর্শিদাবাদের নবাবের কথা। মুর্শিদাবাদের নবাবেরও ঘুম আসতো না রাত্রে। ক্লাইভ সাহেবও ঘুমোতো না।

মরালী জিজ্ঞেস করতো—সত্যি বলো না সাহেব, তোমার কীসের কষ্ট?

সাহেব বলতো—সে কি তুমি বুঝতে পারবে? সবাই আমার শত্রু—এমন কেউ নেই যে আমার ভালো চায়, যে আমার ওয়েল-উইশার, এমন কেউ নেই আমার ভালো হলে যে আনন্দ পায়—

মরালী বলতো—কেন, মেজর কিল্‌প্যাট্রিক সাহেব, ওয়াটসন্ সাহেব, তোমার কোম্পানীর বড় সাহেবরা—

সাহেব বলতো—কেউ না, কেউ না, কেউ না—

সাহেব 'না' বলতো আর মাথা নাড়তো। যেন যন্ত্রণায় সাহেবের বুক ভেঙে যেত কথা বলতে বলতে। যে মানুষটা দুবার আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল, দুবারই বেঁচে গিয়েছিল। সাহেবের কথাগুলো শুনতে শুনতে মরালীর নানীবেগমের কথা মনে পড়তো। নানীবেগম বলেছিল—দুষমনির কি কোনো কারণ থাকে মা, ও এক-একজনের কপালে লেখা থাকে। তারা দুষমন নিয়েই জন্মায়। তারা ভালোই করুক আর মন্দই করুক, তাদের দুষমন থাকবেই—

কিন্তু এ সব কথা এখন থাক্।

উদ্ধব দাস তার কাব্যে এ সব কথা অনেক পরে লিখেছে, আমি আগে থেকেই শেষের কথাগুলো বলে ফেলছি। মরালী কি তখন নবাবকে ভালো করে চিনেছে না ক্লাইভ সাহেবকেই চিনেছে! একজনের বয়েস ছিল তখন মাত্র ছাব্বিশ বছর। ছাব্বিশ বছরেই নবাবি পেয়ে সে মানুষটা যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করছে। আর একজনের বয়েস ছিল তখন মাত্র একত্রিশ। সেই একত্রিশ বছর বয়েসেই দেশ-ঘর-সমাজ ছেড়ে এসে হাজির হয়েছিল এই জল-কাদা-মশা-মাছির দেশে।

নানীবেগম বলতো—আমি তো সেই জন্যেই কোরাণ নিয়ে থাকি মা, দিনরাত, খোদার কাছে দিনরাত দোয়া চাই, খোদাতালাকে কেবল বলি, মীর্জা যেন আমার শান্তি পায় খোদা, মীর্জা যেন আমার দুদন্ড ঘুমোতে পারে, মীর্জা যেন ভালো থাকে—

সেদিন সকাল থেকেই তোড়জোড় শুরু হয়ে গিয়েছিল চেহেল্-সুতুনের ভেতরে। নবাব মতিঝিল থেকে চেহেল্-সুতুনে আসছে। সব বেগমই আতর-কুঙ্কুম-পেশোয়াজ-পায়জোড় নিয়ে ব্যস্ত। গুলসন্ সেদিন আর লুকিয়ে লুকিয়ে এল না। একেবারে সোজা দিনের আলোতেই এসে ঘরে ঢুকলো।

বললে—তুমি নাকি ভাই মতিঝিলে গিয়েছিলে?

মরালী বললে—তুমি কোত্থেকে শুনলে?

—এমনি শুনলাম। নবাব তোমাকে কী বললে? তোমাকে দেখে হেসেছে?

মরালী বললে—হ্যাঁ—

—তবে আর কী, ভাই। তবে তো তুমি মেরে দিয়েছো!

মরালী বললে—কেন, তুমিও তো কাল মতিঝিলে গিয়ে নেচে অনেক মোহর পেয়েছো শুনলাম, তোমারও তো ভাগ্য ভালো!

গুলসন বললে—কিন্তু, তার জন্যে কত খরচ করতে হয়েছে, তা জানো! ওই নজর মহম্মদকে কত ঘুষ দিয়েছি, কত খোসামোদ করেছি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত মজুরি পোষাবে কি না কে জানে ভাই!

—কেন?

—সকলের চক্ষুশূল হয়ে গেছি যে ভাই! সবাই আমার দিকে টেরিয়ে টেরিয়ে চাইছে। যেন আমি সকলের বাড়া ভাতে ছাই দিয়েছি। অথচ, তুমি তো ভাই জানো, আমি কারো মন্দ চাইনে। আমি চাই সকলের ভালো হোক! অথচ তোমরা যে ভাই কত টাকা রোজগার করছো, তার জন্যে তো আমি কিছুছু বলি না—

মরালী অবাক হয়ে গেল। বললে—টাকা? বেগমরা টাকা রোজগার করছে? সে কি?

—ওমা, টাকা রোজগার করছে না? সবাই তো কারবার করে। তুমি কি ভাবছো কেবল সবাই চুপ করে বসে থাকে?

—কীসের কারবার করে সবাই?

—কত রকমের কারবার করে। কারবার কি একটা? সোরা কেনা-বেচা করে, আফিং কেনা-বেচা করে, রেশম কেনা-বেচা করে। ওই যে নবাবের মা, আমিনা বেগম, ওর কি কম টাকা মনে করেছো? বিধবা হয়ে এস্তোক এখেনে এসেছে, সেই থেকে লাখ-লাখ টাকা আয় করেছে কলকাতার ফিরিঙ্গীদের সঙ্গে কারবার করে। আর ওই বব্বু বেগম! ওরা সবাই লাখ-লাখ টাকার মালিক! আমি তো তাতে কিছুছু বলিনি কোনোদিন। আমি ভাবতুম যদি কোনো দিন কিছু টাকা পাই তো আমিও কারবারে খাটাবো সে-টাকা! কিছু সোরা কিনে ফিরিঙ্গীদের বেচবো। এই ধরো পাঁচ-কুড়ি টাকার মাল বেচলে ন'কুড়ি টাকা ঘরে আসে, তা মন্দ কী! সেই জন্যেই তো ভাই নজর মহম্মদকে অত খোসামোদ করে মতিঝিলে গিয়েছিলাম—

—তা এবার কারবার করবে তো?

—ওমা, সে গুড়ে বালি ভাই। সেই যে কথায় আছে না, অভাগা যেদিকে চায় সাগর শুকিয়ে যায়। আমার হয়েছে তাই। ফিরিঙ্গীদের সঙ্গে লড়াই হবার পর থেকে তো সকলের কারবার বন্ধ!

—কেন?

—তা মাল কে কিনবে যে কারবার করবে? ফিরিঙ্গীরাই তো মাল কিনতো। তারা যখন নেই তখন কে আর কিনবে? কাশিমবাজার কুঠি তো ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে নবাব। কলকাতায় উমিচাঁদ সাহেব বলে একজন মহাজন ছিল, তাকেও তো নবাব শায়েস্তা করে দিয়েছে। বেভারিজ সাহেব বলে একজন ফিরিঙ্গী ছিল, সেও তো গদি-টদি গুটিয়ে পগার-পারে চলে গেছে! কিনবেটা কে?

তারপর একটু থেমে বললে—সেই জন্যেই তো সবাই নবাবের ওপর চটে গেছে!

নবাবের মা পই-পই করে ছেলেকে বারণ করেছিল লড়াই করতে। লড়াইতে নবাব জিতলে কী হবে, বেগমদের খুব লোকসান হলো তো। টাকা আমদানি বন্ধ হলো তো। ছেলের ওপর রাগ হবে না মায়ের? এখানে একজন বড় শেঠ আছে তার নাম ভাই জগৎশেঠ, সেও তো শুনেছি রেগে গেছে ওই জন্যে। তা রাগ হবে না, তুমিই বলো!

তারপর হঠাৎ গলাটা নিচু করে বললে—বললে তো অনেক কথাই বলতে হয় ভাই, বলি না বলে তাই। কিন্তু জানি তো সব! আমার ওপর চোখ টাটালে আমিও একদিন রাগের মাথায় সব বলে দেবো—

—কী বলবে?

—তবে তোমাকে চুপি চুপি বলি। কাউকে যেন বলো না ভাই। এখেনে চক্-বাজারে সারাফত আলি বলে একজন পাঠানের দোকান আছে। সে তো বলেছি তোমাকে। বাইরে খুশবু তেলের দোকান। কিন্তু তার মতলব খুব খারাপ ভাই, জানো। সে তো আরক বেচে। সে-আরক আমরা খাইও, কিন্তু আসল ব্যাপারটা আলাদা।

—কী রকম?

—এখন বুড়ো থুথুড়ো হয়ে গেছে। কিন্তু শুনেছি যখন জোয়ান বয়েস ছিল তখন থাকতো দিল্লীতে। সেখেনে নবাব আলীবর্দীর দাদা হাজী-আহম্মদ ওর বউকে ফুস্‌লে নিয়ে আসে। খুব সুন্দরী বউ। সেই বউ ফুস্‌লে নিয়ে আসার পর থেকেই হাজী-আহম্মদের ভাগ্য ফিরলো। তার আপন ভাই আলীবর্দী খাঁ, নিজের অন্নদাতা সুজাউদ্দীনের ছেলে নবাব সরফরাজ খাঁকে খুন করে এই মুর্শিদাবাদের নবাব হলো, আর সারাফত আলির অবস্থা তার পর থেকেই খারাপ হতে শুরু করলো। সেই সময় থেকে বুড়ো এইখেনে এসে দোকান খুলেছে, আর কেবল হাজি আহম্মদের বংশ ধ্বংস করবার চেষ্টা করছে—

—হাজি আহম্মদের বংশ মানে?

—সেটা আর বুঝলে না! নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলা তো হাজি আহম্মদেরই নাতি হলো। নবাব আলীবর্দী খাঁর তো নিজের ছেলে হয়নি। তিন মেয়ের সঙ্গে দাদার তিন ছেলের বিয়ে দিয়ে দিয়েছিল। আমাদের নবাব তো হাজি আহম্মদেরই ছোট ছেলের ছেলে—তাকেই তো আলীবর্দী খাঁ পুষ্যিপুত্তুর নিয়েছিল—

তারপর গুলসন কথা বলতে বলতে যেন একটু দম নিতে লাগলো।

মরালী বললে—তারপর?

—তারপর এখেনে এসে বুড়ো সারাফত আলি ওই দোকান করেছে। আর খোজাদের ঘুষ দিয়ে দিয়ে আরক বেচছে! আর শুধু কি আরক? খোজাদের ঘুষ দিয়ে দিয়ে আর কী করে জানো ভাই?

মরালী জিজ্ঞেস করলে—কী?

—নজর মহম্মদ তোমার কাছে এসে কিছু বলে না?

—কী বলবে?

—বাইরে থেকে জোয়ান-জোয়ান ছোকরা আনবার কথা। তা আর কিছুদিন থাকো না, তখন দেখবে তোমাকেও ঠিক বলবে! আগে সারাফত আলি এখেনে একটা ছেলেকে পাঠাতো, সে ভাই কী চমৎকার দেখতে তোমাকে কী বলবো। তার নাম রশীদ। যেমন স্বাস্থ্য, তেমনি গড়ন। একেবারে কন্দর্পের মত চেহারা ভাই, কিন্তু স্বাস্থ্য ভালো হলে কী হবে, এতগুলো তাগড়া-তাগড়া বেগম, এদের

সকলের সঙ্গে সে একলা যুঝতে পারবে কেন? তা এখেনে এলেই সবাই মিলে তাকে ছেঁকে ধরতো। সন্ধ্যে বেলা আসতো আর ভোর হবার আগে কেউ ছাড়তো না। একেবারে ছিঁড়ে খেত তাকে। অমন স্বাস্থ্য ভাই, দু'দিনে শুকিয়ে হাড়-স্যার হয়ে গেল! তারপর আর সে আসতো না। তখন পাঠাতো আর একটা ছেলেকে, তার নাম কেশর। সেও যেন ভাই একেবারে রাজপুত্তুরের মতন দেখতে! কোত্থেকে যে ভাই সারাফত আলি অমন বাছা-বাছা ছেলেদের আমদানি করতো কে জানে! এমনি করে এক-একজনকে সারাফত আলি চেহেল্-সুতুনে পাঠিয়েছে আর দু'দিন পরেই তারা শুকিয়ে একেবারে আম্‌সি হয়ে গেছে। এদানি একটা পাঠান ছেলে আসতো, তার নাম বাদ্‌শা। ক'দিন ধরে খুব এল, সব বেগমদের ঘরে রাত কাটাতে লাগলো পালা করে। কিন্তু একদিন সে-ও আর এল না, তার আসা বন্ধ হয়ে গেল। এখন আবার অন্য একজনকে ধরেছে—

—আবার আর একজন? এখানে রোজ রাত্তিরে আসে?

—আমি এখনো দেখিনি তাকে। নজর মহম্মদ তো আমাকে ক'দিন ধরে খুব খোশামোদ করছে। রোজই বলে—গুলসন বিবি, একজন খুবসুরত্ জোওয়ান লেড়কা আছে, তাকে আনবো?

মরালী জিজ্ঞেস করলে—কে সে?

—ওই সারাফত মিন্‌সের লোক, আর কে! এবার নাকি হিন্দু, আর মুসলমান নয়—রোজ খোশামোদ করছে। আনতে পারলে তো সারাফত আলির কাছ থেকে মোহর পাবে কি না—

—কেন?

—সারাফত আলি তো ওই লোভ দেখিয়েই ছেলেগুলোকে এখেনে পাঠায়। বেটা হাজি আহম্মদের বংশ ধ্বংস করতে চায়। আর খোজারাও সেই টাকায় সোরা, আফিম, রেশম, এইসবের কারবার করে। খোজাগুলোর কি কম টাকা আছে নাকি ভেবেছো? তা এবার আমি জিজ্ঞেস করলাম—এ কে? একে কেমন দেখতে? নজর মহম্মদ বললে—খুব খুবসুরত্ দেখতে গুলসন বিবি। একেবারে তাজা জোয়ান। এ হিন্দু-বাচ্চা। এর নাম কান্তবাবু—

মরালী আকাশ থেকে পড়লো—কান্তবাবু? কান্ত কী? পদবী কী?

—কান্ত সরকার...

কিন্তু কথাটা পুরো শেষ হবার আগেই আরো কয়েকজন এসে হাজির। বব্বু বেগম, তক্কি বেগম, পেশমন বেগম, সবাই এসে ঢুকে পড়েছে মরালীর ঘরে। সবাই খবর পেয়ে গেছে নবাব চেহেল্-সুতুনে আসছে মরিয়ম বেগমের সঙ্গে দেখা করতে। সবাই হিংসে করছে আজ তাকে। সবাই দেখতে এসেছে নবাব চেহেল্-সুতুনে আসবে বলে কী সাজ করেছে মরিয়ম বেগম, কী পোশাক পরেছে। আজ যদি নবাবের ভালো লেগে যায় মরিয়ম বেগমকে তো আজ অনেক মোহর পাবে সে, অনেক টাকার মালিক হয়ে যাবে। মরালীও আজকে সবাইকে মুখোমুখি প্রথম দেখলে।

কিন্তু নানীবেগমই বাদ সাধলো। বলা-নেই-কওয়া-নেই হঠাৎ ঘরে ঢুকে পড়েছে। ঢুকেই বললে—তুম সব ইঁহা কিঁউ? তুম যাও ইঁহাসে, সব নিকলো—নিকলো—

সকলকে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিলে নানীবেগম। দিয়ে বাঁদীকে ডাকলে। জুবেদাকে বাতিল করে দেবার পর মরিয়ম বেগমের জন্যে নতুন বাঁদী এসেছে,

তাকে ডাকলে। ডেকে মরালীকে সাজাতে বসলো। মীর্জা আসবে চেহেল্-সুতুনে এতদিন পরে, তবু যদি তার মন ভোলে। তবু যদি মরিয়ম বেগমের দিকে ফিরে চায়। তবু যদি মরিয়ম বেগমকে দেখে মনে শান্তি পায়। সুখ পায়। দিদিমার প্রাণ। মীর্জার এতটুকু সুখ শান্তি দেখলে তবু দিদিমার প্রাণটা জুড়োবে। সেইখানে বসে বসে মরালীকে প্রাণ ভরে সাজাতে বসলো।

মীর্জা মহম্মদ সিরাজ-উ-দ্দৌলা জন্মেছিল ১৭৩০ সালে। আর এক দেশে, আর এক ভূখণ্ডে জন্মেছিল আর একটি ছেলে। তার জন্মের তারিখ ১৭২৫। শুধু পাঁচটা বছরের তফাত। তার নাম রবার্ট ক্লাইভ। ইংলণ্ডে স্রপশায়ারের বাজারের সেই ছেলেটাই যে একদিন কুড়ি বছর বয়েসে মাদ্রাজে এসে জাহাজ থেকে নামবে, তা তার বাপও জানতো না, তার গর্ভধারিণীও জানতো না। দুবার পিস্তল নিয়ে নিজের বুক তাগ্ করে ঘোড়া টিপেছিল সেই ছেলে, কিন্তু গুলি বেরোয়নি। সেদিন সে-গুলি বেরিয়ে ক্লাইভের বুকে বিঁধলে উদ্ধব দাসকে 'বেগম মেরী বিশ্বাস' লিখতে হয় না। মাস-কাবারি ছ' টাকা মাইনের চাকরি। বিদেশ-বিভুঁইতে এসে এর চেয়ে ভালো চাকরি করবার বিদ্যেও নেই তার, বুদ্ধিও নেই। অন্তত বাপ-মায়ের তাই মনে হয়েছিল। বখাটে হয়ে যে জন্মেছে, তার কপালে ভবিষ্যতে এই ছাই-ই থাকে। তার চেয়ে এই-ই ভালো। এই ছ' টাকা মাইনে আর এই জল-জঙ্গল-মশা-মাছির দেশ। সারা দিন কোম্পানীর আপিসে কলম পেষো, হিসেব-পত্তোর রাখো, আর রাত্তির হলে কুঠি-বাড়ির এক কোণে নাক ডাকিয়ে ঘুমোও। কিন্তু শান্তি যার কপালে নেই, তার কোথাও গিয়েই শান্তি নেই। নিজের দেশ ছেড়ে বিদেশে এসেও তার যেন ঝগড়া করা স্বভাব গেল না। আশেপাশের সবাই যেন তার শত্রু। কেউ দেখতে পারে না ছেলেটাকে। ওপরওয়ালা কর্তারা সবাই বলে—ওয়ার্থলেস্—

ছেলেটা শোনে, শুনে রেগে যায়, রেগে গিয়ে ঝগড়া করে। হোম-বোর্ডে তার নামে কর্তারা কম্প্লেন করে। সে চিঠি এখান থেকে বিলেতের কর্তাদের হাতে পৌঁছতে ছ'মাস লাগে, উত্তর আসতেও আবার ছ'মাস। কিন্তু ততদিনে ছেলেটা বুঝে নিয়েছে ইণ্ডিয়ার মানুষদের হাল-চাল। বুঝে নিয়েছে ইণ্ডিয়ার ক্লাইমেট। বুঝে নিয়েছে যে এদেশে চাকরি করা তার চলবে না। এখানে এসে ভুল করেছে সে। এখানে এসে একদিন চিঠি লিখেছিল দেশে—I have not enjoyed a happy day since I left my native country!

শেষকালে ইতিহাসের ভাগ্য-বিধাতা ইণ্ডিয়ার এমন এক অবস্থা সৃষ্টি করলে, যার পর ছেলেটা আর চুপ করে থাকতে পারলে না, আগুনের কুণ্ডলীর মধ্যে সশরীরে ঝাঁপ দিয়ে পড়লো।

তা সে আগুনই বটে। ১৭০৭ সালে বাদশা আওরংজেবের মৃত্যুর পর থেকে সারা দেশে বলতে গেলে আগুনই জ্বলে উঠলো। সে আগুন আর নিভলো না। তারপর যখন ১৭৩৯ সালে নাদির শা দিল্লীর বুকে ছোরা বসিয়ে দিলে, মোগল বংশের নাভিশ্বাস শুরু হলো বলতে গেলে সেই তখনই। বলতে গেলে মোগল-সাম্রাজ্য তখনই চিরকালের মত খতম্ হয়ে গেল। দক্ষিণে দুটো বড় ভূখণ্ড,

কর্ণাটক আর দাক্ষিণাত্য। দুটোতেই তখন থেকে শুরু হলো বংশানুক্রমিক সুবাদারগিরি। নিজাম-উল-মুল্‌ক্ আর কর্ণাটের নবাবের মত বাঙলা দেশেও সেই নিয়ম চালু হয়ে গিয়েছে ততদিনে। অর্থাৎ জোর যার মুলুক তার। সুবাদার, নবাব, জায়গীরদার, ডিহিদার থেকে পাহারাদার পর্যন্ত সবাই লুটে-পুটে খাবার জন্যে মারমুখী হয়ে বসে আছে আর তরোয়াল শানাচ্ছে। ক্ষেতে ধান থাকতেও নিশ্চিন্ত থাকবার উপায় নেই। ঘরে সুন্দরী বউ রেখেও নির্লিপ্ত থাকবার অবস্থা নেই কারো।

ছেলেটা কিন্তু ততদিনে বেশ কেষ্ট-বিষ্টু হয়ে উঠেছে। লড়াই করে অদ্ভুত সাহস দেখিয়ে নাম কিনেছে বেশ। হৈ-হৈ পড়ে গেছে পার্লামেণ্টে। কে এই রবার্ট ক্লাইভ? না, এ সেই ছ' টাকা মাইনের রাইটার। পল্টনের দলে নাম লিখিয়ে রাতারাতি একেবারে সকলের নজরে এসে গেছে। এক-একটা লড়াই করে আর জয়-জয়কার পড়ে যায় তার। ডাকো, ডাকো এখানে, ডেকে পাঠাও ওকে। সেই ছেলেকে দেশে ডাকিয়ে নিয়ে গিয়ে একেবারে সবাই বাহবা দিয়ে উঠলো। হিপ্ হিপ্ হুর্‌রে। হিপ্ হিপ্-হুর্‌রে।

নাম-ধাম তো হলো। টাকাও হয়েছে বেশ। কিন্তু মানুষের কি লোভের শেষ আছে?

ইতিহাসের অমোঘ বিধানে যাকে একদিন চিরস্মরণীয় হতে হবে, তার কপালে বুঝি অত সহজে শান্তি আসে না। তাকে সুখ শান্তি ঘুম আরাম কিছুই পেতে নেই। সে-সব সাধারণ মানুষের জন্যে। বাঙলার নবাবের চেয়ে যে পাঁচ বছর আগে পৃথিবীতে এসেছে, তাকেই এখানে এসে মুখোমুখি মুলাকাত করতে হবে, আবার তারই সঙ্গে, এই-ই যদি বিধান হয়ে থাকে তো হোক। ঈশ্বরের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। নিজের দেশে যার সম্মান নেই, তার বিদেশে যাওয়াই ভালো। যে-দেশে সে এতদিন কাটিয়ে গেছে, যে জল-হাওয়ায় সে এত লড়াই করে গেছে, যেখানকার মাটিতে সে নিজের প্রতিষ্ঠা করেছে নিজের হাতে, সেখানেই তার গতি হোক।

যেদিন আবার ছেলেটা করমণ্ডল উপকূলে জাহাজ থেকে নামলো, ঠিক সেইদিনই কলকাতা ছেড়ে পালিয়েছে ফিরিঙ্গীরা। ঠিক সেই একই দিনে। সেই ২০শে জুন ১৭৫৬ সালে। এ এক অদ্ভুত যোগাযোগ ইতিহাসের।

ভালো করে নবাবের গায়ের ঘাম তখনো শুকোয়নি। একটু যে জিরিয়ে নেবে নবাব, একটু যে ফূর্তি করবে, একটু বিশ্রাম করবে চেহেল্-সুতুনে গিয়ে, তারও সময় দিলে না নবাবের খোদাতালা।

নবাব আবার দরবারে গিয়ে বসলেন। দেওয়ান মানিকচাঁদের চিঠিটা নিয়ে পড়লেন—

দেওয়ানজী লিখেছে—আমাদের চরের মুখে খবর পেয়েছি, ফিরিঙ্গীরা ফলতার কাছে গিয়ে জাহাজ নোঙর করে ছিল এতদিন। এবার খবর পেলাম মাদ্রাজের সেণ্ট ডেভিড কেল্লা থেকে কোম্পানী মেজর কিলপ্যাট্রিক বলে এক ফিরিঙ্গীকে পাঠিয়েছে আমাদের সঙ্গে লড়াই করবার জন্যে। আর একজন ফিরিঙ্গী আসছে, তার নাম রবার্ট ক্লাইভ। আমার মনে হয়, যুদ্ধের জন্যে আমাদের তৈরি থাকতে হবে।

শেষে লিখেছে—সঙ্গে ওয়াটসন্ নামক আরো একজন ফিরিঙ্গী যোদ্ধা আসছে। সত্য-মিথ্যা জানি না। চরের মুখের সংবাদ। কিন্তু সত্য হোক বা না

হোক, ফিরিঙ্গী কোম্পানী যে বসে নেই এ তাহারই প্রমাণ। তাহারা আট-নয়শত ফিরিঙ্গী পল্টন এবং এক হাজার সিপাহী সংগ্রহ করতে মনস্থ করেছে। আমি তাহাদের অগ্রগমনে বাধা দিতে মনস্থ করেছি। এখন যা কর্তব্য হয় জানাতে আজ্ঞা হয়। ইতি—বশংবদ...

ইব্রাহিম খাঁ তখনো হাঁফাচ্ছিল। বুড়ো মানুষ। কান্তকে বললে—তুমি চলে যাও বাবাজী, ও যা হবার তা হবে—যে-যার কপাল নিয়ে এসেছে সংসারে। তুমিই বা কী করবে, আর আমিই বা কী করবো—

কান্ত যাবার আগে বলে গেল—আপনি যেন কাউকে বলবেন না পুরকায়স্থ মশাই—

পুরকায়স্থ মশাই বললে—না না, আমি কেন বলতে যাবো বাবাজী! আমার কী? যার চরিত্র খারাপ হবে তার চরিত্র খারাপ হবে। ভালোই হয়েছে বাবাজী, ও-কন্যার সঙ্গে তোমার বিবাহ হয়নি, নষ্ট-চরিত্রা কন্যার পাণি-গ্রহণ পাপ। সে-পাপে সে নিজেও মরে, অপরকেও মারে—তুমি কিছু ভেবো না, ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্য—

কান্ত চলে যাবার পর ইব্রাহিম খাঁ সরাবখানার মধ্যেই বসে ছিল নাকে কাপড় চাপা দিয়ে। হঠাৎ যেন অনেকগুলো লোকের পায়ের শব্দ শোনা গেল। দরবার শেষ হয়ে গেল নাকি তবে! সবাই যাচ্ছে কোথায়?

কিন্তু না। পায়ের শব্দটা আসছে বাইরের দিক থেকে। একটু উঁকি মেরেই দেখতে পেলে। জগৎশেঠজীর তাঞ্জাম এসে চবুতরে নামলো। সঙ্গে পাইক-পেয়াদা-বরকন্দাজ। জগৎশেঠজী তাঞ্জাম থেকে নেমে সোজা সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেলেন।

মতিঝিলের দরবারে কতবার এসেছেন জগৎশেঠজী। তাঁর আসা এই প্রথম নয়। কিন্তু এবার যেন জরুরী তলব দিয়েছে নবাব। নবাব-বাদ্‌শার ব্যাপার। তার মধ্যে চুনোপুঁটি সচ্চরিত্র পুরকায়স্থর সমস্যা নিয়ে কে মাথা ঘামাবে। বড় আরামে আছে সব। খাচ্ছে-দাচ্ছে ফুর্তি করছে, আর বেগমদের নাচ দেখছে গান শুনছে। টাকার কথাও ভাবতে হয় না, কেমন করে পেট চলবে তাও ভাবতে হয় না।

হঠাৎ নেয়ামত খাঁকে যেতে দেখে ইব্রাহিম জিজ্ঞেস করলে—খিদ্‌মদ্‌গারজী, আজ যে দারু খাচ্ছে না কেউ, কী হলো? কেউ মদ খাবে না?

—আরে দূর বুঢ্‌ঢা! এখন সব মাথা-গরম হয়ে রয়েছে, এখন দারু খাবে কে!

—কেন? মাথা-গরম কীসের? নবাব-বাদ্‌শাদের আবার মাথা-গরম কীসে হলো?

নেয়ামত সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে বলে গেল—তুই বুঝবিনে বুড়ো, জগৎ-শেঠজী এসেছে, নবাব রেগে একেবারে সব তুল-ক্লাম করে দিচ্ছে, এখন চুপ কর—

বলতে বলতে সোজা ওপরে উঠে অদৃশ্য হয়ে গেল।

দরবারের ভেতরে তখন নবাব চিৎকার করছেন মহতাপচাঁদ জগৎশেঠের দিকে চেয়ে—তাহলে আপনি কী করতে আছেন? বাদ্‌শার সনদ এনে দেওয়া তো আপনার কাজ! এতদিন আপনি আমাকে বাদ্‌শার সনদ এনে দেননি কেন?

সত্যিই এতদিন এ-জিনিসটার দিকে কারো নজর পড়েনি। পূর্ণিয়ার শওকত জঙ্ দিল্লীর বাদ্‌শার কাছ থেকে উজীর-এ-আজম-এর সিল-মোহর করা সনদ এনে

ফেলেছে। সেই সনদের জোরে শওকত জঙ্ কড়া চিঠি লিখেছে নবাবকে। সে-চিঠি তখনো নবাবের হাতে। সেই চিঠি পেয়েই নবাব অপমানে ছটফট করতে করতে মহতাপ জগৎশেঠকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন।

—এতদিন নবাব হয়েছি, সনদ আনতে এত দেরি হচ্ছে কেন? এই দেখুন শওকত কী লিখেছে আমাকে—লিখেছে 'আমি স্বনামে বঙ্গ-বেহার-উড়িষ্যার সুবাদারি-পদের বাদশাহী সনদ পাইয়াছি। কিন্তু তুমি আমার ভ্রাতা, তোমার প্রাণ-বধের ইচ্ছা করি না। তুমি তোমার ভরণ-পোষণ জন্য ঢাকা প্রদেশের যেখানে ইচ্ছা যাইতে পারো, তোমার প্রার্থনা মত ইহার জন্য সনদ প্রদত্ত হইবে। ইতিমধ্যে রাজকোষ ও অন্যান্য দ্রব্যাদি আমার কর্মচারিগণকে বুঝাইয়া দিয়া ঐ অঞ্চলে চলিয়া যাইবে। অতি শীঘ্র এই পত্রের উত্তর পাঠাইবে। আমি রেকাবে পা তুলিয়া উত্তরের অপেক্ষা করিতেছি।' এর পর বলুন আপনার কী বলার আছে?

মহতাপ জগৎশেঠ বললেন—জাঁহাপনার যা-অভিরুচি তাই-ই করবেন।

—কিন্তু নবাব-সুবাদার আমি, না শওকত জঙ্!

—আপনি, জাঁহাপনা, আপনি। আপনিই বাঙলা-বেহার-উড়িষ্যার নবাব-সুবাদার।

—কিন্তু তাহলে এতদিন আমি কীসের জোরে নবাবিআনা করছি? আমার সনদ কোথায়? সনদের কথাটাও কি আপনাকে আমায় মনে করিয়ে দিতে হবে? আপনারা কি আমাকে এটুকু সাহায্যও করবেন না? আপনারাই তো আমার বল-ভরসা। আপনারা যদি সহায় না হন তো আমি কার ভরসায় দেশ-শাসন করবো?

জগৎশেঠ বললেন—সনদ আনতে তো মোহর লাগবে—নজরানা লাগবে!

—তা লাগবে লাগবে। যা লাগে তা তো আপনারই দেওয়া কাজ। কত মোহর লাগবে, কী কী নজরানা দিতে হবে, সে তো আপনিই জানেন। আপনারাই তো বরাবর সনদ আদায় করে এনে দিয়েছেন। তেমনি আমার বেলাতেও দেবেন। আমি কি সে-সব কথা নিয়েও মাথা ঘামাবো?

—কিন্তু সে যে অনেক টাকা।

—অনেক টাকা লাগলে অনেক টাকাই দেবেন!

মহতাপ জগৎশেঠ উত্তরে অনেক কথাই বলতে পারতেন, কিন্তু দাঁতে দাঁত চেপে বললেন—তাতে প্রজাদের ওপর অত্যাচার হবে—

সঙ্গে সঙ্গে নবাবের রক্ত টগ-বগ করে ফুটে উঠলো। সামনে তেড়ে এগিয়ে গিয়ে বললে—কী...?

ইব্রাহিম শুধু দেখেছিল সিঁড়ি দিয়ে কে যেন দুম্-দুম্ করে নেমে গিয়েছিল। তারপর ভালো করে চেয়ে দেখেছিল, নেয়ামত! আর কিছু জানতে পারেনি সে!

চেহেল্-সতুনে তখন মরিয়ম বেগমকে মনের মতন করে সাজিয়ে তুলেছে নানীবেগম। কত রকমের গয়না পরিয়েছে। হীরে-মুক্তোর ছড়াছড়ি। চোখে সুর্মা দিয়েছে, কানে আতর। কোনো গয়নাটারই নাম জানে না মরালী। বাপের জন্মেও কখনো এসব দামী সৌখীন জিনিস দেখেনি। হাতীর দাঁতের আয়নাটা

নিয়ে বাঁদী মুখের সামনে ধরেছে। নিজেকে যেন তার সুন্দরী মনে হলো বড়। ভালবাসতে ইচ্ছে করলো তার।

নানীবেগম দেখেশুনে বললে—এবার পাঁয়জোড় পরিয়ে দে বেগমসাহেবাকে—

বাঁদীটা তাই-ই পরাতে যাচ্ছিল।

মরিয়ম বেগম বললে—আবার পাঁয়জোড় পরে কী হবে নানীজী, আমার অভ্যেস নেই, পড়ে যাবো শেষকালে—

নানীবেগম বললে—তা হোক মা, পরো, মীর্জা এখনই এসে যাবে—সারা দিন-রাত ধরে দরবার করে খেটে-খুটে মেজাজ গরম করে আসছে, তোমাকে খুবসুরত্ দেখালে তবু মনটা জুড়োবে বাছার। মীর্জাকে তুমি ভয় কোর না মা, তোমার মনে যা আছে সব খুলে বলবে। তোমার সোয়ামীর কথা বলবে, তোমার সতীনের কথা বলবে, কেমন করে ডিহিদার পরওয়ানা পাঠিয়েছিল, তাও বলবে—। কোনো কথা লুকোবে না। দেখবে, বাছা তোমার কথা সমস্ত মন দিয়ে শুনবে—

—কিন্তু যদি রেগে যান?

—রাগবে কেন মা? লোকে অন্যায় করলেই মীর্জা রেগে যায়, নইলে কেন মিছি-মিছি রাগ করতে যাবে তোমার ওপর? তুমি কী অপরাধ করেছো? তোমার তো কোনো দোষই নেই! লোকের মুখে মীর্জার বিরুদ্ধে যা-কিছু শোন সে-সব তো বাড়িয়ে-বাড়িয়ে বলা!

—তা সবাই ওঁর নামেই বা বাড়িয়ে-বাড়িয়ে বলে কেন?

—তা বলবে না? বড় হলেই যে লোকের নজরে পড়ে। যাকে-তাকে গালাগাল দিয়ে তো আরাম হয় না মা! বড়কে গালাগাল দিতেও যেমন ভালো লাগে, বড়র গালাগাল শুনতেও যে তেমনি ভালো লাগে!

তারপর একটু থেমে বললে—তুমি যদি মা হাতিয়াগড়ে ফিরে যেতে চাও, তাও বলবে, আবার যদি তা না-চাও তো তাও বলবে মীর্জাকে। আর যদি তুমি চাও যে কোনো জায়গায় গিয়ে নিরিবিলি বসবাস করবে, তাও বলবে। সে-ব্যবস্থাও করে দেবে আমার মীর্জা। বাছার বড় দয়ার শরীর। তোমার জীবনটা যখন মীর্জার জন্যে একবার নষ্ট হয়ে গেছে, তখন তো মীর্জারই সব দায়িত্ব। জমি-জায়গা ইজারা দিয়ে তোমাকে কুঠি বানিয়ে দেবে, তুমি সেখানেই তোমার নিজের সংসার পাতবে, সেই-ই তো ভালো। তোমাকে এ চেহেল্-সুতুনেও থাকতে হলো না, সোয়ামীর সংসারে যেতে হলো না—আর একটা কথা...

কিন্তু কথা শেষ হবার আগেই নেয়ামত দৌড়তে দৌড়তে এসেছে।

—বন্দেগী নানীবেগমসাহেবা।

—কী রে নেয়ামত? মীর্জা আসছে?

—না বেগমসাহেবা! নবাব খবর ভেজিয়েছে আজ চেহেল্-সুতুনে আসতে পারবেন না।

—কেন? কী হলো? আবার কী খবর এল?

—জগৎশেঠজীকে নবাব চড় মেরেছেন গোসা করে।

—সে কী রে? কেন? কী করলে জগৎশেঠজী? নানীবেগম ভয়ে-আতঙ্কে শিউরে উঠলো।

—জগৎশেঠজী নবাবের মুখের ওপর জবাব করেছিল। তাই জগৎশেঠজীকে নবাব গ্রেপ্তার করে রেখে দিয়েছেন মতিঝিলে। তাকে ফাটকে পাঠানো হবে।

নানীবেগম দাঁড়িয়ে উঠলেন। যেন মাথায় বজ্রাঘাত হলো তাঁর।

—সেখানে আর কে কে আছে?

—সবাই আছেন বেগমসাহেবা। মীরজাফর সাহেব, রাজা দুর্লভরাম, মীর বক্সী মোহনলাল, মীরমদন সাহেব, মেহেদী নেসার সাহেব, সবাই আছে—

—মীর্জা কী বলছে?

—বেগমসাহেবা, মীরজাফর সাহেব নবাবকে বলেছে বাদ্‌শাহী সনদ না-পেলে নবাবের তরফে আর কেউ থাকবে না—

নানীবেগম আর শুনতে পারলে না। তাড়াতাড়ি বললে—আমার তাঞ্জাম সাজাতে বল্‌, আমি মীর্জার সঙ্গে দেখা করতে যাবো মতিঝিলে। মীর্জার কপালে কি একটা দিনের জন্যেও শান্তি থাকতে নেই—

বলে মরিয়ম বেগমের দিকে চেয়ে বললে—তুই একটু অপেক্ষা কর মা, আবার এক গণ্ডগোল বাধিয়ে বসেছে মীর্জা, একটা দিনের জন্যে ওকে শান্তি দেবে না কেউ। কী কাণ্ড করে বসলো! জগৎশেঠজীকে চড় মেরে বসেছে, রেগে গেলে ওর জ্ঞান থাকে না ছোটবেলা থেকে—কী যে করি ওকে নিয়ে—

বলে বাইরে গেলেন ছুটে। গিয়ে আমিনা বেগমের ঘরে ঢুকলেন। বললেন—শুনেছিস, জগৎশেঠজীকে চড় মেরেছে মীর্জা, মেরে ফাটকে পুরে রেখেছে—মীর্জা আজ চেহেল্‌-সুতুনে আসছে না—

আমিনা বেগম তখন বোধহয় নিজের কারবারের হিসেব-পত্র দেখছিল। মুখ তুলে বললে—তুমিই দেখ, আমার ও-সব দেখা আছে, তোমরাই আদর দিয়ে ওকে ছোটবেলা থেকে নষ্ট করে দিয়েছো—এখন বললে কী হবে?

বলে আবার আফিমের হিসেবের কাগজপত্রের মধ্যে মাথা গুঁজে দিলে।

নানীবেগম তখন গেলেন লুৎফুন্নিসার ঘরে।

—সর্বনাশ হয়েছে বহু, জগৎশেঠজীকে চড় মেরেছে মীর্জা, ফাটকে আটকে রেখেছে তাকে, জাফর সাহেব বলেছে মীর্জার দলে আর থাকবে না! মীর্জা খবর পাঠিয়েছে সে আজ চেহেল্‌-সুতুনে আসছে না। এখন যাবি? যাবি মা তুই মতিঝিলে? তা তুই গিয়েই বা কী হবে! তোর কথা তো ভারি শোনে সে! আমি একলাই যাই, দেখি জাফর সাহেবকে বলে-কয়ে ঠাণ্ডা করতে পারি কি না—আমার হয়েছে বুড়ো বয়েসে এক জ্বালা—

বলতে বলতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন নানীবেগম। লুৎফুন্নিসা বেগম একটা কথারও উত্তর দিলে না। শুধু পাথরের মত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো সেখানে। আর মরালীর ঘরে মরালীও তখন আস্তে আস্তে গয়নাগুলো সব খুলে ফেলতে লাগলো একে একে। হঠাৎ তার যেন কাঁদতে ইচ্ছে করলো প্রাণ ভরে।

মনসুর আলি মেহের সাহেবের দফ্‌তরে যথারীতি কাজে চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল। কাজ না থাকলে নিজামতি-কাছারিতে একবার করে হাজরে দিতে হয়। যদি কোথাও কাজ থাকে তো জেনে নিতে হয়, আর নইলে তো হাজরে দিয়েই বাড়ি। সেই মোল্লাহাটি থেকে আসার পর আর কোনো কাজে পড়েনি তার ভাগে।

চলেই আসছিল কাছারি থেকে। এসে সেই সারাফত আলির দোকানে ঢোকা। কিন্তু সারাফত আলিকেও যেন আর ভালো লাগতো না। বাদ্‌শার কাছে সেই

কথাগুলো শোনবার পর থেকেই যেন মনটা বিরস হয়ে গেছে মিঞাসাহেবের ওপর।

নিজামত কাছারির সবারই সেদিন যেন একটু ব্যস্ত-ব্যস্ত ভাব। যেন অন্য-দিনের চেয়ে বেশি তাড়াহুড়ো। কারো কথা বলবার সময় নেই।

সবে ফটকের কাছে এসেছে, হঠাৎ বশীর মিঞার সঙ্গে দেখা। একেবারে হন্ত-দন্ত হয়ে ছুটছে। কান্তকে দেখতেই পায়নি। তারপর কান্তই ধরলে গিয়ে—কী রে, কোথায় যাচ্ছিস?

বশীর বিরক্ত হয়ে উঠলো—আরে তোর জন্যেই তো যত গণ্ডগোল, তুই একেবারে সক্কলকে বিপদে ফেলেছিস।

—আমি? বিপদে ফেলেছি? কাকে?

—আবার কাকে? সক্কলকে। মেহেদী নেসার সাহেব ভীষণ গোসা করেছে আমার ওপর। যাকে-তাকে নোকরি দিয়েছি বলে আমাকে মুখ-খিস্তি করে গালমন্দ করলে। আমার ফুপা মনসুর আলি সাহেব পর্যন্ত আমাকে খামোখা যা-তা বললে। তোর জন্যে আমার পর্যন্ত বদনাম হয়ে গেল। আমি এত তকলিফ করে জাফর আলি সাহেবের চিঠি বেহাত করে নিয়ে এলুম, তবু সাবাস পেলুম না কারো কাছ থেকে। তুই আমার কী সর্ব্বোনাশ করলি বল তো!

তবু কান্ত কিছু বুঝতে পারলে না কী তার অপরাধ।

বশীর বললে—এখন তোর জন্যে আমাকে আবার হাতিয়াগড় যেতে হচ্ছে—

—হাতিয়াগড়? কেন?

—আরে রেজা আলি যে ধরে ফেলেছে সব।

—কী রকম?

—আরে হাতিয়াগড়ের জমিদার সাহেব বিলকুল সব ঠকিয়ে দিয়েছে মেহেদী নেসার সাহেবকে। রাণীবিবি বলে যাকে চেহেল্-সুতুনে পাঠিয়েছে, ও তো আসলি রাণীবিবি নয়! আসলি রাণীবিবিকে তো নিজের বাড়িতে লুকিয়ে রেখেছে। আর নিজের একটা নফর ছিল, তার লেড়কিকে রাণীবিবি বলে চালিয়ে দিয়েছে। রেজা আলির চর সব খোঁজ-খবর নিয়ে জানিয়ে দিয়েছে নিজামতে। শালা মেহেদী নেসার সাহেব আমার ফুপাকে তলব দিয়েছিল, আমাকেও তলব দিয়েছিল। দুজনকেই আচ্ছা করে গালাগালি দিলে, আমাকে জিজ্ঞেস করলে কে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে, আমি বললুম তোর নাম—

—আমার নাম বলে দিলি?

বশীর মিঞা বললে—হ্যাঁ, বলে দিলুম, শুনে তোকেও খুব আচ্ছা করে গালাগাল দিলে। এখন আমি যাচ্ছি হাতিয়াগড়ে, দেখি কী হয়—

বলে আর দাঁড়ালো না। হন হন করে সোজা বাইরে বেরিয়ে গেল বশীর মিঞা। আর ফিরেও একবার তাকালো না, দাঁড়ালো না, থামলো না।

রেজা আলির কাছে সব খবরই পেশছোয়। হাতিয়াগড়ের ডিহিদার বটে, কিন্তু খবর রাখতে হয় মুর্শিদাবাদের। মাঝে মাঝে মুর্শিদাবাদের কানুনগো-কাছারি থেকে চিঠি আসে, তার ফয়সালা করতে হয়। ডিহিদারের দায়-ই কি কিছু কম? এক-একসময় চাকরি রাখাই দায় হয়ে ওঠে রেজা আলির। বিট্‌কেল সব

হ্‌কুম আসে নিজামত-কাছারি থেকে। কখনো হ্‌কুম আসে নানীবেগমের জন্যে পঞ্চাশ হাঁড়ি ঘি পাঠাও, ভালো আম তিন হাজার, কিংবা দশ কুড়ি ম্‌রগী! বেশ ভালো রকম জানে রেজা আলি, এ-জিনিস নানীবেগম চেয়েও দেখবে না, সমস্ত ভোগ করবে মেহেদী নেসার সাহেব। রাগে গর-গর করে রেজা আলি, কিন্তু কিছ্‌ বলতেও পারে না। হ্‌কুম মত সব জিনিসই পাঠিয়ে দিতে হয় নৌকো বোঝাই করে।

আর মেহেদী নেসার সাহেবও জানে, রেজা আলি নিজের ঘর থেকে কিছ্‌ পাঠাবে না। পাঠাবে হাতিয়াগড়ের জমিদারের ঘর থেকে, কিংবা গাঁয়ের প্রজা-পাঠকদের কাছ থেকে জোর করে কেড়ে নিয়ে।

সেদিনও তেমনি হ্‌কুম এসেছে নিজামত-কাছারি থেকে।

যথারীতি ডিহিদারের লোক গেছে ছোটমশাইএর কাছারিতে। জগা খাজাঞ্চি-বাব্‌ তেলে-বেগ্‌নে জ্বলে উঠেছে। নবাবের জ্বালায় কি মান্‌ষ পাগল হয়ে যাবে? এই সেদিন ক'টা পাঁটি চাইতে এলে, দিলাম। তারপর আবার সেদিন গাছের গ্‌ড় চাইতে এলে, তাও দিলাম। তা আমরা কি নবাবের খাস প্রজা হে বাপ্‌! যে যা চাইবে একেবারে দানছত্তোর খ্‌লে বসেছি? আমরা আব্‌ওয়াব্‌ দিইনে? আমরা মাথট্‌ পিল্‌খানা দিইনে?

হঠাৎ যে জগা খাজাঞ্চিবাব্‌ কেন এমন রেগে উঠলো কে জানে। ডিহিদারের লোক বললে—তাহলে ডিহিদার সাহেবকে গিয়ে সেই কথা বলি গে?

জগা খাজাঞ্চিবাব্‌ও বলে ফেললে—হ্যাঁ যাও, বলো গিয়ে—ভয় করিনে আমরা—

ঘটনাটা এমন কিছ্‌ নয়। যখন বড়মশাই এখানে ছিলেন তখন এমন অনেকবার কথা-কাটাকাটি হয়েছে। যখন-তখন যা-তা আবদার করতে সাহস করেনি ডিহিদারের লোক। তখনকার ডিহিদারের সঙ্গে বড়মশাইএর বেশ ভাব-সাব ছিল। এক সঙ্গে ওঠা-বসা ছিল। এখন সে বড়মশাইও নেই, সেই ডিহিদারও নেই। এখন যেন আবদার দিনের-পর-দিন বেড়েই চলেছে। এমন করলে আর ক'দিন চালাতে পারবে জগা খাজাঞ্চিবাব্‌।

সব শ্‌নে বড় বউরানী বললেন—তুমি ঠিক করেছো খাজাঞ্চিমশাই, কোনো অন্যায় করোনি—

—আবার যদি আসে তো আবার আমি ওই কথাই বলবো তো?

বড় বউরানী বললেন—হ্যাঁ, তাই বোলো—

জগা খাজাঞ্চিবাব্‌ কথাটা বলে চলেই যাচ্ছিল। কিন্তু বড় বউরানী আবার ডাকলেন। বললেন—আর একটা কথা শোন, আমি যে চিঠি পাঠিয়েছিলাম নানী-বেগমের কাছে, তার কোনো উত্তর আসেনি?

—আজ্ঞে না, বড় বউরানী!

—চিঠিটা বেগমসাহেবার হাতে ঠিক পেঁ'ছেছিল তো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, নিজামতের উকীলমশাইএর হাত দিয়ে খোজাদের ঘ্‌ষ দিয়ে একেবারে চেহেল্‌-স্‌তুনে নানীবেগমসাহেবার হাতে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল।

সে-চিঠির উত্তর আসেনি তাতে এমন কিছ্‌ ক্ষতি হয়নি হাতিয়াগড়ের। এখন দ্‌কুল বজায় আছে এইটেই শ্‌ভলক্ষণ! বড় বউরানী রোজ ব্‌ড়ো শিবের মন্দিরে প্‌জো দিতে গিয়ে আরো অনেকক্ষণ ধরে জপ-তপ করেন। আর দ্‌র্গা অনেক

রাত্রে এসে চোর-কুঠুরীর ঘরের শেকলটা খুলে চুপি-চুপি ঘরে ঢোকে।

ছোট বউরানী জিজ্ঞেস করে—হ্যাঁ রে দুগ্যা এলি?

দুর্গা এসে ছোট বউরানীর গা-গতর টিপে দেয়, পায়ে তেল মাখিয়ে দেয়। চুল আঁচড়ে দিয়ে চুড়ো করে খোঁপা বেঁধে দেয়। মিষ্টি-মিষ্টি কথা শোনায়। বলে—আর দুটো দিন সবুর করো না ছোট বউরানী, আর দুটো তো মাত্তোর দিন—

ছোট বউরানী জিজ্ঞেস করে—ডিহিদারের সে-লোকটা কোথায় গেল রে? আছে, না গেছে?

—কোন্ লোকটা? সেই জনার্দন হারামজাদাটা? তাকে বাণ মেরে দিইছি—

—বাণ মেরেছিস? বলছিস কী তুই?

তা সত্যিই জনার্দন একদিন মুখে রক্ত উঠে মারা গিয়েছিল। সে এক কান্ড! রাজবাড়িতে কাজ করতে আসার পর থেকেই দুর্গার কেমন যেন সন্দেহ হয়েছিল লোকটার ওপর। কোথাও কিছু নেই, কারণে অকারণে অমন ভেতর-বাড়ির দিকে ছোঁক ছোঁক করে বেড়ায় কেন! তারপর যেদিন পেছন-পেছন গিয়ে দেখলে জনার্দন ডিহিদারের দফ্‌তরে গিয়ে ঢুকলো, সেদিন আর সন্দেহ রইলো না তার। তক্কে তক্কে রইলো কখন জনার্দন আসে।

বহুদিন ধরে লোকটা খেতে পায়নি। বহুদিন ধরে রেজা আলিকে চাকরির জন্যে ধরেছিল। তিনটে মেয়ে নিয়ে এসে জনাইতে রেখে এসেছিল শবশুর-বাড়িতে। যা'হোক করে দুটো টাকা হাতে পেলেই মেয়ে তিনটেকে নিয়ে আসবে হাতিয়াগড়ে, এই ছিল ইচ্ছে। কিন্তু কাজ কি অত সহজে মেলে। কোথায় জনাই আর কোথায় হাতিয়াগড়। মাঝে-মাঝে বড় দেখতে ইচ্ছে করতো মেয়েদের। মা-মরা মেয়ে তিনটের জন্যে মনটা ছটফট্ করতো কেবল।

রেজা আলি বলেছিল—যদি রাণীবিবির খবরটা কবুল করতে পারিস কাউকে দিয়ে তো তোর নোকরি মিলবে—তার আগে নয়—

কিন্তু কে কবুল করবে? কে জানে আসল ব্যাপারটা? কারোরই তো জানবার কথা নয়। শেষকালে মরিয়া হয়ে উঠলো জনার্দন। চোর-কুঠুরীর সন্ধানটা যখন একবার পেয়েছে তখন ভাবনা নেই। মাঝ রাত্তিরে একদিন উঠলো জনার্দন। জয় বাবা বুড়ো-শিবের জয়! জয় মা মঙ্গল-চন্ডীর জয়! যা থাকে কপালে বলে একদিন উঠলো জনার্দন। ঘুমই আসেনি। কতদিন থেকেই ঘুম আসছে না ভেবে ভেবে। ভাবনাটা তিনটে মেয়ের জন্যেও বটে, আবার হাতিয়াগড়ের রাণীবিবির জন্যেও বটে!

তখন সবাই নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। বর্ষার রাত। পুকুর-ঘাটের ওদিকে বেশ শব্দ করে ব্যাঙ ডাকছে। উঠোনের কোণের দিকে রেড়ির তেলের আলো টিম্-টিম্ করে জ্বলছে। দেখতেই হবে চোর-কুঠুরির ভেতরে কে আছে।

আস্তে আস্তে জনার্দন অতিথিশালা থেকে উত্তর-পুব কোণের দরজাটা দিয়ে ভেতরের রান্নাবাড়ির দরদালানে ঢুকলো। তারপর টিপ্-টিপ্ পায়ে একেবারে ভেতর-বাড়ির খিড়কী পেরিয়ে সোজা ভেতর-বাড়ির অন্দর-মহলে ঢুকলো। তারপর সরু একটা গলি। গলির ভেতর পর পর খিলেন-করা থাম। তারপর শেষ দিকটায় দোতলায় ওঠবার আলাদা একটা সিঁড়ি। সেই সিঁড়ির নিচের ঘরখানাই চোর-কুঠুরি। চোর-কুঠুরির সামনে জনার্দন দেখলে দরজার ওপর তালা ঝুলছে। এরই ভেতরে নিশ্চয়ই আছে ছোট বউরানী। একটা মতলব বার করলো জনার্দন।

আস্তে আস্তে দরজায় টোকা দিতে লাগলো।

—কে? দুগ্যা?

ভেতর থেকে মেয়েলি গলায় প্রশ্নটা এল। ছোট বউরানীরই গলা। জনার্দন যদি কোনো উত্তর দেয় তো তখনি ধরে ফেলবে। হঠাৎ দরজার পাল্লা দুটো যেন একটু ফাঁক হয়ে গেল। সেই ফাঁকের ভেতর দিয়ে একটা গলার আওয়াজ বেরিয়ে এল—এই যে দুগ্যা, তুই এত দেরি করে এলি? এই চাবিটা নে—দরজা খোল্—

জনার্দন অন্ধকারে নিঃশব্দে চাবিটা বউরানীর হাত থেকে নিয়ে তালাটা খুলতেই একেবারে অন্ধকারের মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ালো। একেবারে নিজের ভবিষ্যতের মত নিশ্ছিদ্র অন্ধকার।

—তুমি?

—আমি! অ্যামি ছোট বউরানী!

আর 'আমি' বলবার সঙ্গে সঙ্গে কে যেন একেবারে মারমুখী হয়ে জনার্দনের ওপর জোরে ঝাঁপিয়ে পড়লো। জনার্দন দু'একবার চিৎকার করবার চেষ্টা যে করেনি, তা নয়। কিন্তু তার আগেই তার মুখ-কান-নাক সব যেন কে কাপড় দিয়ে চেপে ধরলে। একটুখানি বাতাসের জন্যে হাঁসফাঁস করতে লাগলো জনার্দন। একটুখানি কথা বলতে পারার জন্যে ছট্‌ফট্ করতে লাগলো। তারপর যখন দম একেবারে বন্ধ হয়ে আসতে লাগলো, তখন আস্তে আস্তে নিস্তেজ হয়ে এল সে।

পরদিন সকালে হাতিয়াগড়ের কেউ কিছু জানতেও পারলে না। যথারীতি বিশু পরামানিক এল ছোটমশাইকে খেউরি করতে। অতিথিশালার ঝি-ঝিউড়ি-চাকর-নফর সবাই কাজকর্ম শুরু করে দিলে। তখনো জনার্দনের দেখা নেই। জনার্দন এমনিতে দেরি করেই কাজে আসতো। শোভারামের মত নিয়ম করে না-এলেও বেশি কামাই তার থাকে না। জগা খাজাঞ্চিবাবু বার বার করে বলে দিয়েছিল—এমন হাজরে দিতে দেরি করলে বাপু তোমায় দিয়ে আমাদের কাজ চলবে না—

কিন্তু জনার্দনের ওই এক কথা ছিল—মেয়ে! তিনটে মেয়ের দোহাই দিয়ে সে এমন অনেক কামাই করেছে।

সেদিন সবাই ভাবলে, হয়তো জনার্দন মেয়েদের দেখতে গেছে। এসে পড়লো বলে। কিন্তু যখন ছোটমশাই নেমে নিচেয় এলেন, তেল-গামছা নিয়ে গোকুল এসে হাজির, তবু জনার্দনের দেখা নেই।

—জনার্দন কোথায় গেল?

ছোটমশাই-এর কথার উত্তর কে আর দেবে। গোকুলই নিজে ছোটমশাইকে তেল মাখিয়ে দিলে। চান করিয়ে দিলে। ভিজে-কাপড় নিয়ে শুকোতে দিলে উঠোনের দাঁড়িতে। তারপর যথারীতি সংসার চলতে লাগলো। কাক-পক্ষীতেও জানতে পারলে না কী ঘটনা ঘটে গেল হাতিয়াগড়ের বাড়ির চোর-কুঠুরীতে।

আসলে ছোট বউরানীও কিছু জানতে পারেনি, বড় বউরানীও না। রোজ যেমন অনেক রাত্রে দুর্গা এসে চোর-কুঠুরীর দরজা খুলে দেয়, সেদিনও তাই দিয়েছে। তারপর ছোট বউরানী দুর্গাকে চোর-কুঠুরীর ভেতর রেখে বাইরে থেকে চাবি-তালা দিয়ে ওপরে ছোটমশাই-এর ঘরে চুপি চুপি চলে গেছে। যাবার আগে দরজার পাল্লার ফাঁক দিয়ে চাবিটা দুর্গাকে দিয়ে গেছে। এমনি রোজই করে। তারপর যখন ভোররাত হয়, তখন কাক-চিল ওঠবার আগেই আবার ছোট বউরানী

নিচের চোর-কুঠুরীর সামনে এসে দরজায় তিনবার টোকা দেয়। টোকার শব্দ পেলেই দুর্গা বলে—কে? দুগ্যা? কথাটা বললেই বুঝতে পারে ছোট বউরানী এসেছে। চাবিটা ফাঁক দিয়ে বাইরে বাড়িয়ে দেয়। সেই চাবি নিয়ে ছোট বউরানী তালা খুলে ভেতরে ঢোকে। তখন দুর্গা বাইরে তালা-চাবি দিয়ে আবার রোজকার সংসারের কাজ করে। এমনি রোজ।

ভোর বেলা সেদিনও ছোট বউরানী এসেছে। কিন্তু এসেই অবাক হয়ে গেছে। তালা খোলা কেন?

ভেতরে দুর্গা তখন অঘোরে ঘুমোচ্ছিল।

ছোট বউরানী ডাকতেই ধড়মড় করে উঠে পড়েছে। বললে—আজ তালা খোলা কেন রে দুগ্যা?

দুর্গাও যেন অবাক হয়ে গেছে।

—তালা খোলা? তবে বোধ হয় তুমিও তালা দিতে ভুলে গেছ, আমিও ভুলে গেছি চাবি নিতে—

সেদিন এই নিয়ে আর কিছু বলেনি দুর্গা। হয়তো তাড়াতাড়িতে চাবি নিতেই ভুলে গিয়েছিল ছোট বউরানী। এত বড় বাড়ির মধ্যে কোথায় ছোট বউরানী আছে, কোথায় নেই, তা কারো জানবার কথাই নয়। চুপি চুপি কখন চোর-কুঠুরি থেকে বেরোয় মাঝরাত্রে, কখন ঢোকে তা কেউ জানতে পারেনি। তাই হাতিয়াগড়ের রাজবাড়িতে এ নিয়ে কোনো চাঞ্চল্যই সৃষ্টি হয়নি। যথারীতি তরঙ্গিনীর সঙ্গে দুর্গার ঝগড়া হয়েছে, কথা-কাটাকাটি হয়েছে, তারপর আবার তা মিটেও গেছে।

কিন্তু হঠাৎ একদিন খবর পাওয়া গেল ভোর রাত্রে।

ভোর রাত্রের দিকেই কে যেন ওদিক পানে গিয়েছিল। গিয়ে দেখেছে জনার্দন ছাতিমতলার ঢিবির ওপর মরে পড়ে আছে। তারপরেই খবরটা রটে গেল চার-দিকে। বিশু পরামানিকের কানেও গেল, গোকুলের কানেও গেল। যে-যেখানে ছিল সকলের কানেই গেল—জনার্দনকে সাপে কামড়ে মেরে ফেলেছে—

তা সাপের কামড় এমন কিছু নতুন নয়। এমন হাতিয়াগড়ে হামেশা ঘটে!

ছোট বউরানী শুধু জানতো যে আসলে সাপ-টাপ কিছু নয়। আসলে দুর্গাই বাণ মেরে মেরে ফেলেছে জনার্দনকে।

—তা বাণ মারতে গেলি কেন তুই ওকে?

—বাণ মারবো না? ও যে তোমার পেছনে লেগেছিল গো! যে তোমার পেছনে লাগবে, তাকেই বাণ মেরে মেরে ফেলবো ওমনি করে!

—তা আর কতদিন এমনি করে থাকবো বলো তো লুকিয়ে-লুকিয়ে? আমি যে আর পারছিনে!

দুর্গা বলতো—সে বড় বউরানীকে জিজ্ঞেস করো গে তুমি। তাঁর হুকুম, আমি কী জানি!

কিন্তু বড় বউরানীকে জিজ্ঞেস করবার সাহস নেই কারো। সে বড় কঠিন ঠাঁই। বড় বউরানী এমন আবদার শুনলে শেষকালে মাধব ঢালীকে দিয়ে কেটে ফেলবার হুকুম দেবে। তার চেয়ে এ যেমন চলছে চলুক। যেমন চুপি চুপি রাত্রে গিয়ে ছোটমশাই-এর ঘরে ঢুকতো ছোট বউরানী, তেমনি না-হয় চিরকালই ঢুকবে। কষ্ট যখন কপালে আছে তখন কে আর খণ্ডাবে।

কিন্তু ছোট বউরানীর কপালে বুঝি সেটুকু শান্তিও নেই।

হঠাৎ একদিন একটা লোক এসে হাজির হলো রাজবাড়ির অতিথিশালায়।

নিরীহ গোবেচারা মানুষটা। গরীব গুর্বো চেহারা। দুটো ভাত খেয়ে চুপ করে শুয়ে রইলো।

জগা খাজাঞ্চিবাবু জিজ্ঞেস করলে—তুমি কে? বাড়ি কোথায় তোমার?

লোকটা বললে—আজ্ঞে কর্তা, আমার নাম কার্তিক পাল, কুমোরের ছেলে, আমাদের জল চল, আমার দেশ মগরা, সরকার সাতগাঁয়—

—তুমি এখানে কী করতে এয়েছ?

—আজ্ঞে কর্তা, আমি যাবো কোন্নগর, বর্ষাকালে গাঁ-গঞ্জ সব ডুবে গেছে, তাই হাঁটা পথে চলেছি—

তা থাকুক। দু'চার দিনের বিশ্রামের জন্যেই তো এই অতিথিশালা তৈরি করে দিয়েছিলেন বড়মশাই। এই রকম গরীব-গুর্বো লোকেদের সুবিধের জন্যে! তা লোকটা রইলো। দু'তিন দিন খেলে-দেলে পেট ভরে, ঘুমোতেও লাগলো। আর কাজ না-থাকলেই এর-ওর সঙ্গে গল্প করতে লাগলো। এদের নিয়ে মাথা ঘামায় না কেউ হাতিয়াগড়ের অতিথিশালায়।

কিন্তু মাথা ঘামাতে হলো একদিন। একদিন ছোটমশাই হন্তদন্ত হয়ে জগা খাজাঞ্চিবাবুকে ডেকে পাঠালেন।

বললেন—অতিথশালায় কেউ আছে এখন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, একজন আছে—

—কে সে? কোত্থেকে আসছে?

—তার নাম কার্তিক প্যাল। দেশ মগ্‌রা, সরকার সাতগাঁয়—

—কোথায় যাবে?

—বললে তো কোন্নগরে।

—আচ্ছা, যাও তুমি এখন!

সেই দিন মাঝরাত্রেই নদীর ঘাটে এসে ছোটমশাইএর বজরাটা লাগলো। ঘুট্‌ঘুট্টি অন্ধকার। কিন্তু তারই মধ্যে রাজবাড়ির খিড়কীর দরজা দিয়ে দু'চারজন মানুষ বেরিয়ে এল। কোথাও একটা জন-প্রাণী নেই। ঝাঁ ঝাঁ ঝিঁঝি-ডাকা রাত। শুধু কয়েকটা গেঁয়ো কুকুর একবার হল্লা করে উঠেছিল, কিন্তু চেনা-মুখ দেখে তখনই আবার পায়ের কাছে এসে ল্যাজ নাড়তে লাগলো। তারপর বজরার ভেতরে গিয়ে ঢুকলো দু'টি ঘোমটা দেওয়া প্রাণী। বাইরে লাঠি-সড়কি নিয়ে পাহারা দিতে লাগলো একজন জোয়ান পুরুষ। পুরোন সাতপুরুষের মাঝি। তারা বজরার কাছি খুলে দিলে। আর ইতিহাসের পালে পশ্চিমের ঝোড়ো বাতাস লেগে বজরাটা সোঁ-সোঁ করে ছুটে চললো স্রোতের মুখে তীর বেগে! বদর বদর!

কান্ত আবার সারাফত আলির দোকানে ফিরে এল। বশীর মিঞার কথা শোনবার পর থেকেই মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। বশীর মিঞা কী করে জানতে পারলে! কী করে জানতে পারলে শোভারাম বিশ্বাস মশাইএর মেয়ে এসেছে চেহেল্‌-সুতুনে। এ কথা তো কেউ জানে না। একমাত্র জানে ইব্রাহিম খাঁ—ওই সচ্চরিত্র পুরকায়স্থ মশাই! সে-ই কি বলে দিলে? তাকে এত করে বলে দেওয়ার পরও কি শেষ পর্যন্ত বলে দিলে!

সারাফত আলি দেখতে পেয়েছে। বললে—কী রে কান্তবাবু, হাজ্‌রে হলো দফ্‌তরে?

কান্ত বললে—হ্যাঁ—

বেশি কথা বলতে ভালো লাগছিল না তার। মাথার মধ্যে তখন কেবল ঘুরছিল রাণীবিবির কথা, মরালীর কথা। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ভাবনা যেন মাথার মধ্যে এসে ঢুকেছিল। যদি বশীর মিঞা হাতিয়াগড়ে গিয়ে খোঁজ নিয়ে জানতে পারে যে ছোটমশাই নিজের বউকে না-পাঠিয়ে নফরের মেয়েকে পাঠিয়েছে, তাহলে কী হবে! কী হবে তা যেন ভাবতেও ভয় হলো।

—কোথায় যাবার হুকুম হলো তোর?

—কোথাও হুকুম হয়নি, শুধু হাজরে দিয়ে এলাম—

সারাফত আলি বললে—তাহলে তো তোর খুব আরাম! তাহলে আজ আরাম করে চেহেল্‌-সুতুনে যা—গিয়ে রাত কাটিয়ে আয়—

কান্ত বললে—তা কী করে যাবো মিঞাসাহেব, কাল নজর মহম্মদ যে বলে গেল নবাব চেহেল্‌-সুতুনে আসবে—চেহেল্‌-সুতুনেই রাত কাটাবে—

—দূর বোকা, নবাব তো কাল চেহেল্‌-সুতুনে যায়নি!

—যায়নি?

—না রে, তুই কিছুই খবর রাখিস না, সে তো সব গোলমাল হয়ে গেছে! নবাব জগৎশেঠজীকে সব আমীর-ওমরাদের সামনে বে-ইজ্জৎ করেছে—মীরজাফর সাহেব তাই নিয়ে হল্লা করেছে, তুই কিছুই খবর রাখিস না কান্তবাবু! নবাব তো যায়ইনি চেহেল্‌-সুতুনে—

কান্ত সব শুনে অবাক হয়ে গেল। বললে—তারপর! তারপর কী হলো?

—তারপর নানীবেগম তাঞ্জাম নিয়ে গেল মতিঝিলে!

—নানীবেগম!

সমস্ত ঘটনা শুনলো কান্ত। মিঞাসাহেবের কাছে কেমন করে যেন সব খবর আসে। মুর্শিদাবাদের যেখানে যা ঘটে সব যেন টের পায় সারাফত আলি। কান্তও দেখেছিল তাঞ্জামটা। মনে আছে নজর মহম্মদ চলে যাবার অনেক পরে এমনি একা-একা চক-বাজারে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ জোড়া-হাতী দেখে পিছিয়ে এসেছিল সে। নানীবেগমের তাঞ্জাম যাচ্ছিল মতিঝিলের দিকে।

শুধু কান্ত নয়, রাস্তার অনেকেই দেখেছিল। সরাবখানার ভেতরে বসে ইব্রাহিম খাঁও দেখেছিল। আগের দিন থেকেই মতিঝিলের ভেতরে যেন নাগাড়ে ঝড় বয়ে চলছিল। কলকাতা থেকে আসার পর থেকেই এমনি চলেছে। ফিরিঙ্গী কোম্পানীর সঙ্গে লড়াইতে অনেক বাজে-খরচা হবার পর থেকেই নবাবের মেজাজ বিগড়ে আছে। প্রথম দিন গুলসন বেগমকে দিয়ে নাচিয়েও নবাবের মেজাজ ঠাণ্ডা করতে পারা যায়নি। নেহাত না-হাসলে নয় তাই হেসেছে, না ফুর্তি করলে নয় তাই ফুর্তি করেছে, আর পরদিন থেকেই শুরু হয়েছে দরবার। সেই দরবারেও রাগারাগি চেঁচামেচি চলেছে। নানীবেগম এসেছিল শোভারাম বিশ্বাস মশাইএর মেয়েকে নিয়ে। তারপর কথা ছিল দরবার ভেঙে দিয়ে নবাব চেহেল্‌-সুতুনে যাবে। সেই যাওয়াও বন্ধ হয়ে গেছে। জগৎশেঠজীকে আটক করে রেখেছে। সেই খবরটা পেয়েই আবার নানীবেগম এসে গেছে—

নবাব দরবার ভেঙে দিয়ে নিজের ঘরেই চলে যাচ্ছিল।

এমন সময় নেয়ামত খবর নিয়ে এল—নানীবেগমসাহেবা এসেছেন—

নানীবেগম আসতেই যেন দরবার আবার নতুন করে বসলো। এবার আর আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে কথা নয়। এবার একেবারে দরবারে মীর্জার মুখোমুখি।

কিন্তু মীর্জাকে কিছু বললে না নানীবেগম। সোজা মীরজাফর আলি সাহেবের দিকে চেয়ে বললে—জাফর আলি খাঁ কি আমাকে চিনতে পারছো?

মীরজাফর মাথা নিচু করে বললে—বান্দা নিমকহারাম নয় নানীবেগমসাহেবা!

—কিন্তু শুনলাম নিমকহারামের কাজই নাকি তুমি করছো? মীর্জার সঙ্গে তুমি দুষমনি করছো?

—বেগমসাহেবা ভুল খবর পেয়েছেন মনে হয়!

—তাহলে কি আমি মিছিমিছি মতিঝিলে এসেছি বলতে চাও?

মীরজাফর আলি বড় অনুগত সুরে তখনো কথা বলছে। বললে—আপনি কেন এত কষ্ট করে এখানে আসতে গেলেন, আমার সঙ্গেই যদি আপনার কথা ছিল তো বান্দাকে ডাকলেই তো বান্দা যেত বেগমসাহেবার চেহেল্-সুতুনে।

নানীবেগমসাহেবা এবার মীর্জার দিকে চাইলে। বললে—শুনলাম জগৎ-শেঠজী এখানে আছেন, তাঁকে দেখছি না, তিনি কোথায়?

মীর্জা সে কথার উত্তর না দিয়ে বললে—তুমি কেন আবার এখানে এলে নানীজী, আমি তো খবর পাঠিয়েছি যে আমি আজ চেহেল্-সুতুনে যেতে পারবো না—

নানীবেগম বললে—আমার কথার উত্তর দাও আগে, বলো জগৎশেঠজী কোথায়?

—তাঁকে আমি ফাটকে রেখেছি!

—নিয়ে এস তাঁকে ফাটক থেকে।

—কিন্তু নানীজী, আমি যে নবাব হয়েছি বাঙলা বেহার উড়িষ্যার, তার সনদই এখনো আনেননি তিনি। সনদ নেই অথচ আমি নবাবী করছি। সনদের কথাটাও কি আমাকে ভাবতে হবে? ওদিকে শওকত জঙ্ যে সনদ আনিয়েছে দিল্লীর বাদ্শার কাছ থেকে—এখন যে সে আমাকে লড়াই করবে বলে ভয় দেখিয়ে চিঠি লিখেছে! এর পরেও আমি ক্ষমা করবো জগৎশেঠজীকে? এর পরেও তুমি আমাকে ক্ষমা করতে বলো তাঁকে?

—তবু, তাঁকে নিয়ে এস আমার সামনে!

জীবনে মহতাপজী এত অপমান কখনো পাননি। বোধহয় তাঁর ঊর্ধ্বতন চতুর্দশ-পুরুষও কখনো বাঙলার নবাবের হাতের এ-অপমান কল্পনা করতে পারেনি। দিল্লীর বাদ্শার দরবারেও কোনো দিন কোনো বাদ্শাও এমন করে অপমান করতে সাহস পায়নি জগৎশেঠজীদের। মুখখানা তাই হয়তো কালো হয়ে উঠেছিল।

—জগৎশেঠজী!

জগৎশেঠজী নানীবেগমসাহেবাকে দেখে নিচু হয়ে কুর্নিশ করলেন।

—আমি আমার মীর্জার হয়ে আপনার কাছে মাফ চাইছি জগৎশেঠজী। মীর্জা ছোট ছেলে, এখনো ছেলেমানুষ, কিন্তু আপনার বয়েস হয়েছে, আপনি অনেক দেখেছেন, অনেক ভুগেছেন, আপনি এমন ভুল করবেন এ আমি ভাবতে পারিনি! আপনি জানেন মীর্জার জন্ম থেকেই চারদিকে তার শত্রু। মানুষ যখন ছোট থাকে তখন তার শত্রু থাকে না। শত্রু হয় বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে—কিন্তু যখন ও সবে জন্মেছে তখন থেকেই চারদিকে ওর দুষমন—আমি ওকে বুকে করে করে মানুষ

করেছি—নইলে কবে ও খুন হয়ে যেত! আসলে মুর্শিদাবাদের মসনদই ওর শত্রু, সেই মসনদের জন্যেই ওর এত কষ্ট—তা তো আপনি জানেন—

—নানীজী!

মীর্জা নানীবেগমের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্যে একবার ডাকলে। কিন্তু নানীবেগম তখনো বলেই চলেছে জগৎশেঠজীর দিকে চেয়ে চেয়ে—আমি আপনাকেও বলছি, আর মীরজাফর সাহেবকেও বলছি, আপনারা দুজনেই বুকে হাত দিয়ে বলুন যে, আপনাদের কাছে স্বার্থ বড় না নবাব বড়! আপনাদের দুজনেই আমার কাছে কবুল করুন আজ যে, নবাব যত অন্যায়ই করুক, তবু সে নবাবই! আপনারা আমার মীর্জাকে না মানতে পারেন, কিন্তু কবুল করুন, নবাবকে আপনারা মানবেন! করুন কবুল! কবুল করুন!

জগৎশেঠজী, মীরজাফর আলি সাহেব দুজনেই মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

—আপনারা আমার মীর্জাকে খুন করে ফেললেও আমি কিছু বলবো না, কারণ সে আপনাদের মনে আঘাত দিয়েছে, আপনাদের সম্মান-হানি করেছে! কিন্তু নবাব মীর্জা মহম্মদ সিরাজ-উ-দ্দৌলা! তাকে আপনারা কেমন করে অস্বীকার করেন বলুন! নবাবকে অস্বীকার করলে যে মুর্শিদাবাদের মসনদকেই অস্বীকার করা হয় জগৎশেঠজী! আপনারা কি সেই মসনদকেই অস্বীকার করতে চান? সনদ পায়নি বলেই কি সে নবাব নয়?

মীর্জা আর একবার বাধা দিলে—আঃ, নানীজী!

—তুমি থামো—

নানীবেগমসাহেবা এবার মীর্জার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললে—তুমি থামো! জানো তুমি কাদের ভরসায় নবাব হয়েছো? জগৎশেঠজী যদি তোমার বিরুদ্ধে যান তো তুমি নবাবী করতে পারবে? মীরজাফর সাহেব যদি তোমায় সাহায্য না করে তো তুমি তোমার মসনদ টিঁকিয়ে রাখতে পারবে? কে তোমার বল-ভরসা? কাদের ওপর নির্ভর করে তুমি ফিরিঙ্গী-কোম্পানীর সঙ্গে লড়াই করে এলে? কে তোমাকে টাকা জুগিয়েছে এতদিন? কে তোমার নানাকে টাকা জুগিয়ে এসেছিল এতদিন? তোমার লজ্জা করে না তাদের অপমান করতে? চাও, এখনি ক্ষমা চাও, এখনি মাফ চাও এঁদের কাছে! চাও—

জগৎশেঠজী হঠাৎ বললেন—থাক্ বেগমসাহেবা—থাক্—

মীরজাফর আলির মুখখানাও যেন কেমন নরম হয়ে এল।

নানীবেগম বললে—না জগৎশেঠজী, আপনি মুর্শিদাবাদের মসনদের শুভাকাঙ্ক্ষী তাই ও-কথা বললেন, কিন্তু মীর্জার বয়েস কম, তাই এখনো কার সম্মান কীভাবে রাখতে হয় তা জানে না! সে-সব ওর শেখা উচিত! ফিরিঙ্গী হলওয়েল সাহেবের বেলাতেও আমি কাল এই কথাই বলেছিলাম, আপনাদের বেলাতেও আমি আজ সেই কথাই বলছি। আমি যতদিন অন্তত বেঁচে থাকবো ততদিন এই কথাই বলবো, আমার সামনে কোনো অন্যায় হতে দেখলে আমি চুপ করে থাকবো মনে করবেন না। এর পর যদি আমার মীর্জা আপনাদের কোনো অপমান করে তো আমাকে আপনারা খবর দেবেন দয়া করে, আমি তার প্রতিকার করবো। শুধু একটা কথা, দয়া করে মুর্শিদাবাদের পবিত্র মসনদের কখনো অসম্মান করবেন না—আমাকে কথা দিন—

জগৎশেঠ মাথা নিচু করে কুর্নিশ করে বললেন—বেগমসাহেবার ইচ্ছেই বান্দার ইচ্ছে—

—আর জাফর আলি সাহেব, তুমি?

মীরজাফর আলি খাঁও মাথা নিচু করে বললে—বেগমসাহেবার ইচ্ছেই বান্দার ইচ্ছে—

—তবে আপনারা এখন আসুন!

—না—

নবাব হঠাৎ বললে—না, যাবার আগে শওকত জঙ্‌কে চিঠি লেখার কথাটাও বলে যান জাফর আলি সাহেব, বলে যান কেন আমার বিরুদ্ধে তাকে লেলিয়ে দিয়েছিলেন!

—আমি তো বলেছি ও চিঠি জাল!

নবাব বললে—তাহলে শওকত জঙ্‌ আমাকে যে-চিঠি লিখেছে, সে-চিঠিও কি জাল মনে করেন?

মীরজাফর আলি বললে—জাল কি না তা শওকত জঙ্‌ই জানে!

—তাহলে আমি যদি শওকত জঙের সঙ্গে কাল লড়াই করতে পূর্ণিয়ায় যাই তো আপনি আমার সঙ্গে যেতে প্রস্তুত? যদি প্রস্তুত থাকেন তাহলে বুঝবো আপনি আমার ভালো চান, আপনি আমার শুভাকাঙ্ক্ষী—

নানীবেগম মীরজাফর আলির দিকে চাইলে।

বললে—বলো জাফর আলি সাহেব, মীর্জার কথার জবাব দাও—

তারপর আর যারা দাঁড়িয়ে ছিল সকলের দিকেই চেয়ে বললে—দুর্লভরাম, মোহনলাল, সবাই বলুন আপনারা নবাবের দলে—

সবাই একে একে বললে—আমরা সবাই নবাবের দলে—

নবাব বললে—তাহলে আজকেই তৈরি হয়ে নিন—শেষ রাত্রের দিকে যাত্রা করবো—

সবাই একে একে কুর্নিশ করে দরবারের বাইরে চলে গেল। তখনো নানী-বেগম ঘরের মধ্যে মীর্জার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে।

মীর্জা বললে—নানীজী, তুমি আর আমাকে বাধা দিও না—

নানীবেগম বললে—আমি তোকে বাধা দেবো কে বললে?

—না নানীজী, যতবার আমি যা করতে গিয়েছি ততবার তুমি বাধা দিয়েছো, তোমার মত না নিয়ে কখনো আমি কিছু করিনি। হুশেনকে খুন করবার আগেও তোমাকে জিজ্ঞেস করে নিয়েছি, এই মতিঝিল থেকে মাসিকে তাড়িয়ে দেবার সময়ও আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করে নিয়েছি। কাল হল্‌ওয়েল সাহেবকে আমি ছেড়ে দিতে চাইনি, শুধু তোমার কথাতেই ছেড়ে দিলাম। আজ জগৎশেঠজীকেও আমি উচিত শিক্ষা দিতুম, কিন্তু তোমার কথাতেই আমি চুপ করে রইলুম। তুমি কি মনে করো ওদের মুখের কথাই ওদের মনের কথা? ওরা মনে মুখে এখনো এক হতে পারলো না—ওদের আমি বিশ্বাস কী করে করি বলো?

—তা হোক মীর্জা, ওদের নিয়েই তো তোকে চলতে হবে। ওদের চটালে চলবে কেন?

—তা, কেন ওরা সত্যি কথা বলে না? সত্যি কথা বললে তো আমি কোনো কিছু বলি না। আমার সঙ্গে যে ওরা মন-রাখা কথা বলে কেবল! ওরা কি মনে করে আমি এতই বোকা, আমি কিছু বুঝি না? আমি কি ছেলেমানুষ!

নানীবেগম বললে—কী করবি বল মীর্জা, সকলে তো ভালো ভাগ্য নিয়ে জন্মায় না—

—তুমি আর ভাগ্যের দোহাই দিও না নানীজী! আমি অত দুর্বল নই যে আমি ভাগ্যের দোহাই মেনে সব অন্যায় মুখ বুজে সহ্য করবো, ভাগ্য যদি আমার বিপক্ষে থাকে তো ভাগ্যকে আমি জোর করে আমার বশে আনবো! আমি শওকত জঙ্‌কে এবার এমন শিক্ষা দেবো যে সে জীবনে কখনো তা ভুলবে না—

—কিন্তু তাহলে চেহেল্-সুতুনে যাবি না আজ?

—আজ কেমন করে যাবো বলো নানীজী? আজ শেষ রাত্রেই তো রওনা দেবো—

—তা ওখান থেকে ফিরে এসে!

—ফিরে এসে যাবো কী করে? মানিকচাঁদ যে চিঠি লিখেছে তাতে তো খবর আরো খারাপ। ফিরিঙ্গীরা বোধহয় আর আমাকে শান্তিতে থাকতে দেবে না।

—তাহলে কবে তোর সময় হবে শুনি?

মীর্জা নানীবেগমের হাত দুটো ধরলে। বললে—তুমি তো দিনরাত কোরাণ পড়ো নানীজী, তুমি তো রোজ জুম্মা মসজিদে গিয়ে নমাজ পড়ো, তুমি তোমার খোদাতালাকেই জিজ্ঞেস করে দেখো না, তাঁকে শুধু এই কথাটা জিজ্ঞেস কোরো যে তোমার মীর্জা কবে সময় পাবে? কবে শান্তি পাবে সে?

নানীবেগম আর দাঁড়াতে পারলে না। তার চোখ তখন ভিজে এসেছে।

—তারপর?

কান্ত এতক্ষণ চুপ করে গল্প শুনছিল। জিজ্ঞেস করলে—তারপর মিঞাসাহেব, তারপর কী হলো?

সারাফত আলি বললে—তারপর জিন্দগী কি খেল্ শুরু হোনে লাগা। নানীবেগমসাহেবা আবার তাঞ্জামে চড়ে চেহেল্-সুতুনে চলে এল। নবাব চলে গেছে মুর্শিদাবাদ ছেড়ে—

—কখন গেল?

—আজ ভোর রাত্তিরে চলে গেছে। এতক্ষণে বোধহয় রাজমহলে পৌঁছে গেছে নবাবী ফৌজ। এখন মুর্শিদাবাদ একেবারে ফাঁকা, চেহেল্-সুতুন ভি ফাঁকা—আজ নজর মহম্মদ এলে তার সঙ্গে তুই চেহেল্-সুতুনে যাবি, কোনো ডর নেই, কেউ কিছু বলবে না—নবাব তো পুর্ণিয়ার লড়াই ফতে করতে গেছে—

সে রাত্রের কথা রাত্রে হবে। সে তো এখন অনেক দেরি। কান্তর মনে হলো, তার আগে বশীর মিঞার কোনো খবর পেলে ভালো হতো। সেখানে সেই হাতিয়াগড়ের অতিথিশালায় গিয়ে যদি খবর পায় যে সত্যি-সত্যি তারা রাণীবিবিকে না-পাঠিয়ে শোভারাম বিশ্বাসের মেয়েকে পাঠিয়ে দিয়েছে এখানে, তাহলে কী হবে!

কিন্তু সন্দেহটাই বা হলো কেন? কে বলে দিলে?

এক সচ্চরিত্র পুরকায়স্থ মশাই জানে। সে-ই যদি বলে দিয়ে থাকে! তাছাড়া আর তো কারো জানবার কথাও নয়। ইব্রাহিম খাঁ যদি কথায়-কথায় বশীর মিঞাকে বলে দিয়ে থাকে তাহলেই শুধু বশীর মিঞার জানা সম্ভব।

কান্ত পায়ে পায়ে সোজা মতিঝিলের দিকেই চলতে লাগলো।

দু'দিন ধরে চলেছে বজরাটা। ছোট বউরানী আবার অনেক দিন পরে বজরা করে চলেছে। বজরার জানালা দিয়ে দিনের বেলা বাইরে চেয়ে দেখে দেখে প্রথম দিনটা কেটেছিল। কিন্তু রাত হলেই সব অন্ধকার। তখন বাইরে আর কিছু দেখা যায় না। তবু এ অনেক ভালো। সমস্ত দিন অন্ধকার চোর-কুঠুরীর মধ্যে আটকে থাকার চেয়ে এ অনেক ভালো।

দুর্গা পাহারা দিত। বলতো—বাইরে অত মুখ বাড়িয়ে দেখো না বউরানী, কে আবার দেখে ফেলবে, তখন আবার হেনস্থা হবে—

ছোট বউরানী বলেছিল—এখানে আর কে দেখবে বল্?

—তা কি বলা যায় বউরানী, অমন রূপ করেছো, দেখবার লোকের কি আর অভাব হবে গো—একবার নবাবের ইয়ার-বক্সীরা দেখে ফেলেছিল তার জেরই এখনো সামলানো যায়নি, এখন আবার নতুন কী ঝঞ্ঝাট হয় কে বলতে পারে—

—তা কেষ্টনগরে নামবার সময় যদি কেউ দেখে ফেলে আমাকে?

—সে ছোটমশাই আগের থেকে সব বন্দোবস্ত করে রেখেছে গো, তোমায় কিছু ভাবতে হবে না। কেষ্টনগরের ঘাটে পৌঁছবার আগেই রাজার লোকজন সব তৈরি থাকবে, তারাই সব আড়াল করে নামিয়ে নেবে তোমাকে—

—তা যদি তারাই কেউ দেখে ফেলে নিজামতের লোকদের জানিয়ে দেয়? টাকার লোভে সবাই এখন সব কিছু করতে পারে।

—সেটি হবে না গো। সে বুদ্ধিও আমি করেছি। বড় বউরানী আমাকে বলে দিয়েছে যে—

—কী বলে দিয়েছে?

—বলেছে, কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে বলবি এ হচ্ছে হাতিয়াগড়ের নফর শোভারাম বিশ্বাসের মেয়ে মরালী! নিজের নাম কখনো ভুলেও যেন বলে ফেলো না বউরানী, তাহলে সব্বনাশ হয়ে যাবে!

ছোট বউরানী বললে—সে তো আমাকেও বলে দিয়েছে। কিন্তু একলা-একলা থাকবো কী করে বল্ তো দুগ্যা, রাত্তিরে কি একলা শুয়ে ঘুম আসবে! এতদিনের অভ্যেস—

—একলা শুতে হবে কেন তোমাকে শুনি। ছোটমশাই তো এখানে আসবে ঘন ঘন, এসে তো তোমার পাশেই শোবে—তোমাকে ছেড়ে ছোটমশাইএরই কি ঘুম হবে বলতে চাও? আমি সে-সব ব্যবস্থাও করে এসেছি যে! ওই বেটা বশীর মিঞা এসেই তো যত গন্ডগোল করে দিলে, নইলে তো জনার্দনটাকে আমি বাণ মেরে ঠান্ডা করে দিয়েছিলুম—

—বশীর মিঞা? বশীর মিঞাটা আবার কে রে?

—ওই যে কার্তিক পাল। নিজামত থেকে ওকেই তো পাঠিয়েছিল, ও বেটা যে নিজামতের চর। ও হাতিয়াগড়ে এসেছিল সরেজমিনে তদন্ত করে দেখতে—। ক'দিন থেকে অতিথশালায় এসে উঠেছে, চারদিকে নজর রাখছে। বলে কি না মগ্রায় বাড়ি, কোন্নগরে যাবে—আমার কাছে চালাকি পেয়েছে বাছাধন, দিতুম ওকে বাণ মেরে ঠান্ডা করে, কিন্তু বড় বউরানী বারণ করলে তাই...

তারপর একটু থেমে বললে—তোমার কিছু ভাবনা নেই গো, মহারাজ কেষ্ট-চন্দ্রো তোমাকে লুকিয়ে রাখবে বলেছে, খুব মানী রাজা তো, দশজনে মান্যি-গন্যি করে, কেউ সন্দেহ করতে পারবে না। এখন সু-ভালোয়-ভালোয় কেষ্টনগরে পৌঁছতে পারলে হয়—

বিকেল বেলার দিকে একটু মেঘ করে এসেছিল। দেখতে-দেখতে সেই মেঘ আরো কালো হয়ে আকাশ ছেয়ে ফেললে। বেশ মজবুত বজরা। ছ'খানা দাঁড়। পেছনে হাল ধরে আছে ছিন্নাথ। দুর্গা মেঘ দেখেই জানালার পাল্লা দুটো বন্ধ করে দিয়েছিল।

হঠাৎ ছিন্নাথ চিৎকার করে উঠলো—দিদিমণি, সাবধান—

কথাটা শুনে প্রথমে দুর্গা ভেবেছিল, বুঝি ঝড় উঠেছে তাই সাবধান করে দিচ্ছে শ্রীনাথ। কিন্তু তা নয়। খানিক পরেই বন্দুকের গুলির আওয়াজ কানে এল।

—ছিন্নাথ, কী হলো রে?

শ্রীনাথ উত্তর দেবার আগেই বজরাটা দুলে উঠেছে। সেই ঝাঁকুনিতেই ছোট বউরানী ভয়ে হাঁউমাউ করে উঠেছে। শ্রীনাথ একেবারে ছই-এর মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। বললে—দিদিমণি গো, আর পারলাম না, সামাল্ নাও এখুনি—

—কেন, কী হয়েছে রে?

শ্রীনাথ বললে—ফিরিঙ্গী-বোম্বেটের নৌকো আসছে, সঙ্গে গোরা-পল্টন—

শ্রীনাথের কথা আর শেষ হলো না। ওদিক থেকে ফিরিঙ্গীদের নৌকো থেকেও তখন দমাদম বন্দুকের শব্দ হতে লাগলো। ছোট বউরানী তখন দুর্গাকে জাপটে ধরেছে। বললে—কী হবে এখন দুগ্যা?

রেজা আলি রোজ দফ্‌তরে বসে থাকতো অপেক্ষা করে। মুর্শিদাবাদের খবরের জন্যেও অপেক্ষা করে থাকতো, আবার বশীর মিঞার খবরের জন্যেও অপেক্ষা করে থাকতো। জীবনে অনেক অপব্যয়-অপকর্ম করে করে খুব নিচু থেকে উঠে আজ ডিহিদার হয়েছে। মুর্শিদাবাদে অনেক মুরগী পাঠিয়েছে, অনেক ঘি পাঠিয়েছে, অনেক আম-আনারস-কাঁঠাল পাঠিয়েছে নবাবকে, অনেক মেয়েমানুষও পাঠিয়েছে নবাবকে খুশী রাখবার জন্যে। শুধু তাই নয়, নবাবকে খুশী করবার জন্যে অনেক খুন-জখমও করতে হয়েছে। হাসিমুখে বাড়িতে নেমন্তন্ন করে এনে খেতে বসিয়ে পেছন থেকে ছুরি মারতে হয়েছে। শুধু নবাব খুশী হবে বলে! এবং নবাব আলীবর্দী খাঁ বাহাদুর আলমগীর খুশী হয়েছে বলেই রেজা আলি খাঁ আজ ছোট থেকে উঠে উঠে হাতিয়াগড়ের ডিহিদার হতে পেরেছে। রেজা আলি খাঁ ভালো করেই জানে যে শুধু কাজ দেখিয়ে নোকরিতে বড় হওয়া যায় না। শুধু নবাবের হুকুম তামিল করেই জীবনে উন্নতি করা যায় না। উন্নতি করতে গেলে খোঁজ রাখতে হবে কে নবাবের দুষমন! সেই দুষমনকে হঠাতে পারলেই নির্ঘাৎ উন্নতি! সেই কাজই এতদিন ধরে চালিয়ে এসেছে রেজা আলি। এবারও সেই একই কাজ।

এবার হাতিয়াগড়ের রাজার পালা এসেছে।

জনার্দনটা উজবুগ। শালার না আছে বুদ্ধি না আছে দিমাগ। শুধু নিজের সংসারের কথা ভাবতে ভাবতেই হয়রাণ হয়ে গেল। অত যদি মেয়েদের কথাই ভাববি তাহলে নোকরি করতে এসেছিলি কেন? নোকরিতে যদি উন্নতি করতে চাস তো নোকরির কথাই ভাব কেবল। কীসে ডিহিদার রেজা আলি খুশী থাকে সেই চেষ্টা কর। তা নয়, কেবল মেয়ে মেয়ে আর মেয়ে।

শেষ পর্যন্ত লোক হাসিয়ে গেল জনার্দনটা। বেটা জান দিয়ে দিলে নোকরি করতে এসে। সাধে কি বেটাকে উজবুগ বলি!

শেষকালে এল বশীর মিঞা। কানুনগো-কাছারির মনসুর আলি মেহের সাহেবের রিস্তাদার। মুর্শিদাবাদের নিজামতি-চর। পাকা লোক। সব খবরাখবর মন দিয়ে শুনলে। তারপর বললে—কুছ পরোয়া নেই, আমি এর ফয়সালা করে দেবো—

রেজা আলি জিজ্ঞেস করেছিল—ঠিক পারবি তো রে? তোকেও জনার্দনটার মত বাণ মেরে দেবে না তো আবার?

বশীর মিঞা বলেছিল—কী বলছেন আপনি ডিহিদার সাহাব, এ যদি না ফয়সালা করতে পারি তো নোকরিই ছেড়ে দেবো—

—দ্যাখ তাহলে, কোশিস করে দ্যাখ! ওদের বাড়িতে যে নোকরানীটা আছে, ওটাই আসলি হারামজাদী! ওকে কবজা করতে পারবি?

—খুব পারবো খাঁ সাহেব, খুব পারবো। মেহেদী নেসার সাহেব আমাকে আচ্ছা করে গালাগালি দিয়েছে, আপনাকেও ভি গালাগালি দিয়েছে—

রেজা আলি খাঁ সে-কথায় বিশেষ গা করেনি। মেহেদী নেসার সাহেব গালাগালি দিলেই আর গা কিছু পচে যায় না। বললে—ঠিক আছে, তুই কাফের সেজে ওদের অতিথিশালায় গিয়ে ওঠ, কাফের নাম নিয়ে ওখানে দিন কতক থাক, হাল-চাল দ্যাখ। তারপর আমাকে সব বলে যাবি—

সব ব্যবস্থা রেজা আলি সাহেবই বলে ঠিক করে দিয়েছিল। বশীর মিঞাই কার্তিক পাল সেজে গিয়ে উঠেছিল রাজবাড়ির অতিথিশালায়। খেত আর ঘুমোতো। কিন্তু তালে ঠিক থাকতো। কেবল ভাব করতো গোকুলের সংগে। রান্নাবাড়ির লোকদের সংগে বসে বসে গল্প করতো। বিশু পরামানিকের সংগে কথা বলতো, আর ছোটমশাইকে দেখলেই পালিয়ে চলে আসতো!

জগা খাজাঞ্চিবাবু একদিন জিজ্ঞেস করেছিল—কী নাম তোমার?

—আজ্ঞে কার্তিক পাল, আমরা কুমোর—

—তোমার বাড়ি কোথায়?

—আজ্ঞে মগরা। সরকার সাতগাঁ—

সন্দেহ করছে নাকি? বশীর মিঞা সেদিন থেকে আরো সাবধান হয়ে গেল। খেয়ে দেয়ে নিয়ে ঘুমটা আরো বাড়িয়ে দিলে। যেন কোনো কিছুতেই তার মন নেই, এমনি ভাবখানা। দু'তিন দিন আরো থাকলো, আরো মিশলো, আরো দেখলো। কিন্তু না, সব ঝুট। সব বাজে কথা। রেজা আলি খাঁ সাহেবের দফতরে এসে বললে—না খাঁ সাহেব, জনার্দনটা আপনাকে ঝুট খবর দিয়েছিল, বেটা চাকরি বাগাবার জন্য আপনাকে ও-সব কথা বলেছে—

—তাহলে দুসরি রাণীবিবি কুঠিতে নেই?

—না খাঁ সাহেব, না। তাকে চেহেল-সুতুনে পাঠিয়ে দিয়েছে। মরিয়ম বেগম খুদ নিজে কবুল করেছে সে হাতিয়াগড়ের রাণীবিবি!

—তা হলে সেই হারামজাদী নোক্‌রানীটা কোথায় গেল? তার সঙ্গে মুলাকাত হয়েছে তোর?

—না খাঁ সাহেব, সে এখন নেই ওখানে।

—নেই ওখানে?

রেজা আলি খাঁ সাহেব যেন খবরটা শুনে চম্‌কে উঠলো। নেই?

—না, খাঁ সাহেব, আমি খুব তালাস করেছি, সে নেই। রাণীবিবি চলে যাবার পর সেও ভি চলে গেছে।

—কোথায় চলে গেছে? এই তো সেদিন পর্যন্ত ছিল এখানে!

—ছিল, লেক্‌ন্‌ এখন চলে গেছে, এখন কাশী চলে গেছে। এখন তো কোনো কাম নেই তার, কাশী গিয়ে খোদাতালার নাম করছে।

—কবে গেল?

—তা জানি না খাঁ সাহেব, লেক্‌ন্‌ রাণীবিবি ও-কুঠিতে নেই, আমি হলফ করে বলছি, রাণীবিবি গেছে চেহেল্‌-সুতুনে, মিছিমিছি আপনি ভি তকলিফ পেলেন, আমার ভি তকলিফ হলো—

তারপর হাতিয়াগড় থেকে একদিন ভোর রাত্তিরে বেরিয়ে পড়লো বশীর মিঞা। যখন মুর্শিদাবাদে এল তখন শহর ফাঁকা। নবাব নেই, জাফর আলি সাহেব নেই, কেউ নেই। মতিঝিলের দরবার-ঘরও ফাঁকা। নবাব পূর্ণিয়ায় যাবার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত শহরটা যেন আবার ঝিমিয়ে পড়েছে। তবু নিজামতে গিয়ে দেখা করে সব খবর পেশ করতে হবে। এ-রকম অনেকবার হয়েছে। বশীর মিঞা এতে মুষড়ে পড়ে না। ফিরিঙ্গীদের সঙ্গে লড়াই হবার আগে বশীর মিঞা অনেকবার উমিচাঁদ সাহেবের বাড়ির দরোয়ান জগমন্ত সিং-এর সঙ্গে ভাব করবার চেষ্টা করেছে। শেঠবাবুদের মুন্সিবাবুর সঙ্গে কথা বলেছে, বেভারিজ সাহেবের সোরার গদীর মালবাবু কান্তর সঙ্গে রাত কাটিয়েছে, তবে লড়াই ফতে হয়েছে শেষ পর্যন্ত। এমন হয়। এমন হয়ে থাকে। এ-কাজে বেকার ঘোরাঘুরি করতে হয় অনেক।

দফ্‌তর থেকে বেরিয়ে সোজা নিজের হাবেলিতে যাচ্ছিল। হঠাৎ মনে পড়লো কান্তর কথা। সে বোধহয় ভাবছে। যাবার আগে অনেক খারাপ কথা বলে গিয়েছিল কান্তকে। বেচারা বোধহয় খুব মুষড়ে পড়েছে। সারাফত আলির দোকানের দিকে চলতে লাগলো বশীর মিঞা।

খুশ্‌বু তেলের দোকানের পেছন দিকে থাকে কান্ত।

বাইরে থেকে বশীর মিঞা ডাকতে লাগলো—কান্ত, এই কান্ত—

ডাকাডাকিতেও কোনো সাড়া নেই। তখন বেশ ভোর-ভোর। এখনো ঘুম থেকে ওঠেনি নাকি!

আবার ডাকলে—এই কান্ত, কান্ত—

ভেতর থেকে বাদ্‌শা বেরিয়ে এল। বশীর মিঞা বাদ্‌শার দিকে চেয়ে দেখলে। আগে বাদ্‌শাটার চেহারা ভালো ছিল। বদ্‌মায়েসি করে করে একেবারে জাহান্নমে গেছে।

বাদ্‌শা বললে—নেহি হ্যায় কান্তবাবু—ঘরমে নেহি হ্যায়—

—এত ভোরে কোথায় গেল? রাত্তিরে বাড়িতে আসেনি?

বাদ্‌শা বললে—না—

অবাক হয়ে গেল বশীর মিঞা। রাত্রে বাড়ি আসেনি! তাহলে কোথায় গেল! কান্তবাবু তো জাহান্নমে যাবার ছেলে নয়। কোথায় গেল তাহলে?

বশীর মিঞা ভাবতে ভাবতে আবার নিজের হাবেলির দিকে চলতে লাগলো। এমন তো হয় না। সত্যিই বড় তাজ্জব ব্যাপার!

কান্ত সত্যিই জানতো না বশীর মিঞা এত তাড়াতাড়ি হাতিয়াগড় থেকে ফিরে আসবে। আর জানলেও কিছু করবার ক্ষমতা ছিল না তার তখন। তখন যে কোথা দিয়ে কান্তর সময় কেটে গিয়েছিল তাও জানতে পারেনি। চেহেল্-সুতুনের ভেতরে সময় বলে যেন কিছু নেই। সময় যেন চেহেল্-সুতুনের মতই সেখানে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। আর নড়তে চায় না।

আর কান্তও জানতো না যে আবার তাকে যেতে হবে চেহেল্-সুতুনের ভেতরে।

সমস্ত চেহেল্-সুতুন জুড়ে তখন আবার শান্তি নেমে এসেছে। নবাব মীর্জা মহম্মদ নেই। পিরালি খাঁ, নজর মহম্মদ, বরকত আলিরা আবার মাথা চাড়া দিয়ে নবাবী করছে। নবাব মুর্শিদাবাদে না থাকলে যেন নানীবেগমও কেউ নয়। নানী-বেগম চেহেল্-সুতুনে শুধু থাকে, এই পর্যন্ত। তার বেশি কিছু নয়। আমিনা বেগম কোনোদিনই মীর্জাকে নিয়ে মাথা ঘামায়নি। ছেলেকে বিইয়েই মা খালাস। তখন থেকেই এই চেহেল্-সুতুনে বড় হয়েছে মীর্জা। ছোট ছেলে এক্রামুদ্দৌলা ছিল, তাকেও পুষ্যি নিয়েছিল দিদি। দিদি ঘসেটি বেগম তখন অনেক টাকার মালিক। তখন থেকেই কথা শোনাতো।

বলতো—তুই তোর ছেলেকে শাসন করতে পারিস না?

আমিনা বলতো—আমি শাসন করবো? ও কি আমার ছেলে?

—ন্যাকামি রাখ্, শাসন করতে না-পারিস তো আমার ওপর ভার দে, আমি ওকে শায়েস্তা করে দিচ্ছি—

আমিনা বলতো—না দিদি, একটু বয়েস হোক, বয়েস হলেই, সেয়ানা হলেই সব ঠিক হয়ে যাবে—কিন্তু ওর ওপর তোমার এত বিষ-নজর কেন বল তো?

যখনই ঘসেটি, আমিনা, ময়মানা মুর্শিদাবাদে আসতো তখনই মীর্জাকে নিয়ে ঝগড়া লাগতো তিন বোনে। নবাব আলীবর্দী তখন বেঁচে। তাঁর কানে কথাটা যেতেই তিনি মীর্জাকে কাছে ডাকতেন। বলতেন—দুনিয়াটাই এইরকম রে মীর্জা, তোকে নবাবী দেবো বলে তোর ওপরে ওদের এত রাগ—

সেই মীর্জা বড় হলো। সেই মীর্জার বিয়ে হলো। তখন মীর্জার বয়েস পনেরো বছর। সেই তখনই হাতিয়াগড়ের ছোটমশাই এসেছেন দ্বিতীয় পক্ষের রানীকে নিয়ে। গরীবের ঘরের মেয়ে রাসমণি। কখনো মুর্শিদাবাদ দেখেনি। বড় বউরানী বারণ করেছিলেন, কিন্তু ছোট বউরানীর আবদার এড়াতে পারেননি। সেখানেই নজরে পড়ে গেল মেহেদী নেসারের।

পেশমন বেগমের ঘরে বসে মরালী এই সব গল্পই বলছিল।

পেশমন জিজ্ঞেস করলে—তা তোমার সোয়ামী কিছু বললে না?

—বলবে আবার কী! আমি তো কিছুই জানতুম না। আমার স্বামীও কিছু জানতেন না।

তারপর একটু থেমে মরালী জিজ্ঞেস করলে—তা তুমি এখানে কী করে এলে?

—আমি ভাই বাইজীর লেড়কী! আমার মা দিল্লীর বাদ্‌শার দরবারে নাচ-গান করতো, আমি সঙ্গে সঙ্গে থাকতুম। ওই সব দেখে আমিও নাচতে শিখলুম, গান গাইতে শিখলুম। তারপর মুজরো নিয়ে গান গেয়ে বেড়াতুম, শেষকালে এই নবাবের বিয়ের সময় এখানে এলুম মুজরো নিয়ে, সে ভাই আজ এগারো-বারো বছরের কথা, তারপর থেকেই এখেনে—

—তোমারই বুঝি অসুখ হয়েছিল?

পেশমন বললে—তোমাকে কে বললে?

—প্রথম যখন এখানে এসেছিলাম তখন কান্নার শব্দ শুনতাম কি না, তাই গুলসনকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, গুলসনই বলেছিল তোমার কথা! তা এখন সেরে গেছে তো সব?

পেশমন যেন কেমন ম্রিয়মাণ হয়ে গেল। বললে—এ রোগ ভাই সারে না—

—কেন, চিকিৎসা করলেও সারবে না?

—এ কী করে সারবে। এ যে মালেখুল্লিয়া দিমাগী!

—সে আবার কী রোগ?

—এ এইসব জায়গাতেই বেশি হয়। নবাব-বাদ্‌শাদের এ-সব রোগ থাকে। সারা রাত ধরে নাচ-গান করার পর খুব মদ-টদ খেলে তখন কি আর শরীরের কিছু থাকে! এ আর সারবে না—

—এ রোগ অন্য কারো আছে?

—কত বাঁদীর আছে, কত বেগমের আছে। আমি দিল্লীর বাদ্‌শার হারেমের মধ্যেও তো গিয়েছি, থেকেছি, সেখানেও আছে—

—সবাই তোমার মতন ভোগে?

—ভোগে বৈ কি! ভুগে ভুগে মরে যায়। আমিও ভাই আর বেশি দিন বাঁচবো না—

—তা ওষুধ খাও না কেন কবিরাজের, হেকিমের।

—খাই, আরক খাই। সারাফত আলির আরক খাই, তাইতেই একটু কম থাকে!

মরালী বললে—আমি সারাফত আলির নাম শুনেছি ওই নজর মহম্মদের কাছে। দেখিনি কখনো—

—আমিই কি দেখেছি! ও এসে আমাকেও মাঝে-মাঝে বলে কি না—

—কী বলে?

—আরক খেতে বলে। বলে, আরক খেলে তবিয়ত ভালো থাকে—

পেশমন হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে—আর কিছু বলে না?

—আর কী বলবে?

—আরো কিছুদিন থাকো এখানে, দেখবে তোমার ঘরে বাইরের লোক এনে দেবে। বাইরের লোক এনে দিলে ওরা অনেক টাকা পায়। ওদের অনেক টাকা। ওরা খোজাগিরি করে, কিন্তু ওরা আমাদের কিনতে পারে—

—অত টাকা নিয়ে ওরা কী করে?

—টাকা থাকলে সব কিছু করা যায়। টাকাই তো সব ভাই দুনিয়ায়।

—কী করে অত টাকা উপায় করে?

—কারবার করে। মহাজনী কারবার করে। সোরা রেশম ফিরিঙ্গীদের সঙ্গে বেচা-কেনা করে।

—কিন্তু সবাই তো খেতে-পরতে পাচ্ছে এখানে, তাহলে কেন এত টাকা-টাকা করে?

পেশমন বললে—বাঃ, এখন তো খেতে-পরতে পাচ্ছি, কিন্তু চিরকাল খেতে-পরতে পাবো তার কি কোনো ঠিক-ঠিকানা আছে? লড়াই করতে গিয়ে যদি নবাব মারা যায় তো তখন কী হবে?

—তখন যে নবাব হবে সে-ই খাওয়াবে?

—তা কি বলা যায়? তখন যারা জওয়ান মেয়ে তাদের না-হয় রাখবে, কিন্তু বুড়ো-হাবড়াদের? তাদের যদি লাথি মেরে তাড়িয়ে দেয়? তোমার এখন কম বয়েস, তোমাকে এখন নানীবেগম খুব খাতির করছে, সাজাচ্ছে-গোজাচ্ছে। বুড়ো হয়ে গেলে তোমাকে আর দেখবে ভেবেছো? আমাকেও তো প্রথম-প্রথম খুব সাজাতো-গোজাতো, নবাবের সামনে এগিয়ে দিত, যাতে নবাবের মন ভোলে, কিন্তু এখন? এখন যে আমি এত ভুগছি, আমার দিকে চেয়ে দেখে কেউ?

—তা তুমি টাকা জমাওনি?

—না ভাই, আমি বোকার মতন কেবল ফুর্তি করে মরেছি। ভেবেছি চিরকাল বুঝি যৌবন থাকবে! এখন হায়-হায় করছি—

—তা এখান থেকে পালানো যায় না?

—হ্যাঁ, খুব যায়। ঘুষ দিলে পালানো যায়। খোজারা সব করতে পারে, কিন্তু পালিয়েই বা যাবো কোথায়? কোন্ চুলোয় গিয়ে উঠবো? আমার তো কেউ নেই আর। মা ছিল এককালে, আমার সঙ্গে এখানেই থাকতো। কিন্তু মা মারা যাবার পর আর কার কাছে যাবো? আর কে আছে?

—বাবা?

—ও আমার কপাল, আমাদের আব্বার বাবা থাকে না কি?

কথাটা বলেই মরালী যেন কেমন লজ্জায় পড়ে গিয়েছিল। তারপর পেশমন হেসে উঠতে খানিকটা হাল্কা হয়ে গেল জিনিসটা। মরালী বললে—নবাব তো এখন নেই, আমি যদি কোথাও বাইরে যেতে চাই, আমাকে এরা যেতে দেবে?

পেশমন জিজ্ঞেস করলে—কোথায় যাবে তুমি?

মরালী একটু দ্বিধা করে বললে—কাউকে বোল না যেন তুমি, আমি যাবো সারাফত আলির দোকানে—

—সারাফত আলির দোকানে? কার কাছে?

—সেখানে একজন থাকে। তার কাছেই যাবো—

—কে সে? তোমার কেউ হয়?

মরালী বললে—হ্যাঁ—

—কে?

মরালী বললে—আমার খুব আপনার লোক—

—তার কাছে কী করতে যাবে?

মরালী বললে—আমার বাবা কেমন আছে, তাকে খবর আনতে বলেছিলাম, ভাবছি সেইটে জেনে আসতে যাবো, ক'দিন ধরে বাবার কথা খুব মনে পড়ছে—

—তা তাকে এখানে ডেকে পাঠাও না। টাকা দিলেই তাকে ওরা ডেকে নিয়ে আসবে এখেনে—

মরালী বললে—না, এখানে তাকে আনতে চাই না, আর তা ছাড়া আমি টাকা কোথায় পাবো? আমি একবার নিজে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করলে ভালো হতো!

কতদিন যে বাবাকে দেখিনি! বাবা জানেও না যে আমি এখানে। আমার তো ভাই-বোন নেই, আমার মা-ও নেই—

—তা শ্বশুর-বাড়িতে তোমার স্বামী তো আছে?

—তা আছে, কিন্তু সে-সম্পর্ক তো এখানে আসার পর চুকে-বুকে গেছে ভাই চিরকালের মত। তার জন্যে আমি বেশি ভাবছি না, আমার বাবার জন্যেই বেশি মন-কেমন করছে—

পেশমনের বোধহয় মায়া হলো মরিয়ম বেগমের জন্যে। বললে—তুমি কিছু ভেবো না, আমি তোমার ব্যবস্থা করে দেবো—

—কী করে ব্যবস্থা করবে?

—সে ভার আমার ওপর ছেড়ে দাও ভাই তুমি! বরকত আলি বলে যে-খোজাটা আছে না, ও আমার খুব হাত-ধরা। বরকত আলিকে বললে তোমাকে তার সঙ্গে দেখা করিয়ে দেবে—

সেদিন শুধু এইটুকু কথাই হয়েছিল পেশমন বেগমের সঙ্গে। কিন্তু সত্যি-সত্যিই যে শেষ পর্যন্ত পেশমন পাকা বন্দোবস্ত করে ফেলবে তা কল্পনাও করতে পারেনি মরালী! সেদিন মরালীকে ডেকে কথাটা বলতেই মরালী নিজেই চমকে উঠেছে!

বরকত আলিও সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। তখন বেশ অনেক রাত হয়ে গেছে। ভয় ভয়ও করতে লাগলো। কেন সে কথাগুলো বলতে গেল পেশমনকে। শেষ পর্যন্ত যদি কোনো বিপদ হয় তার। যদি তার কোনো সর্বনাশ হয়?

বরকত আলি বললে—চলিয়ে, বেগমসাহেবা—চলিয়ে, কুছ্ ডর নেই—

পেশমন বললে—যাও না ভাই, ভয়টা কীসের? নবাব তো আর মুর্শিদাবাদে নেই। এখানে তো আমি রইলুম। আর তুমি ওই বেগমের সাজ-পোশাক ছেড়ে একটা পায়জামা পরে নাও না। কুর্তা-পায়জামা পরলে আর রাত্তির-বেলায় কে তোমায় চিনছে? আর তা ছাড়া তুমি তো তাঞ্জামে করে যাবে, কে দেখতে পাচ্ছে? সবাই ভাববে কোনো আমীর-ওমরা কেউ বুঝিবা—

বরকত আলিও সেই একই কথা বললে। কোথা থেকে সে কুর্তা-পায়জামা তাজ এনে জোগাড় করে রেখেছে। এ কী কান্ড! ওই পরে কি কোথাও যাওয়া যায়? যদি জানাজানি হয়ে যায়? যদি...

মরালী বললে—আমার যে ভয় করছে ভাই—

পেশমন বললে—ওমা, সে কি, আমি বলে তোমার জন্যে এত তোড়জোড় করে সব ব্যবস্থা করলুম, আর এখন তুমি পেছিয়ে যাচ্ছো?

বরকত আলি বললে—আমি তাঞ্জামের বন্দোবস্ত ভি করেছি, কোথায় যাবেন বেগমসাহেবা, চলুন না—

পেশমন আরো সাহস দিয়ে বললে—তোমার কিছু ভয় করবার দরকার নেই ভাই, এ-রকম আমরা কতবার করেছি, আমি করেছি, আমিনা বেগমসাহেবা করেছে, ভয় কী?

—তা তুমি চলো না ভাই আমার সঙ্গে, আমি যাবো আর চলে আসবো, বেশিক্ষণ দেরি হবে না আমার—শুধু জেনে আসবো বাবা কেমন আছে, আর কিছু নয়—

পেশমন বললে—আমি থাকলে বরং এ-দিকটা সামলাতে পারবো। নানীবেগম কি কেউ যদি খোঁজ করে তো আমি তবু বলতে পারবো যে তুমি ঘুমিয়ে পড়েছো।

কিন্তু দুজনে একসঙ্গে বেরোলে সন্দেহ করবে যে—
মরালী বরকত আলিকে জিজ্ঞেস করলে—তুমি সারাফত আলির দোকানটা চেনো?
পেশমন বললে—হ্যাঁ হ্যাঁ, খুব চেনে, দুবেলা ওখানে যাচ্ছে ওরা আরক কিনতে, খোশ-গল্প করতে—
মরালী বললে—আমি কিন্তু তাঞ্জাম থেকে নামবো না—
—সে আমি জানি বেগমসাহেবা!
—যদি কেউ জিজ্ঞেস করে তাঞ্জামের ভেতর কে, তুমি কী বলবে?
—আমি বলবো সফিউল্লা ওমরাহ্ সাহেব—
—ওই সারাফত আলির দোকানের পেছনের ঘরে সে থাকে। তুমি সেখানে গিয়ে তাকে ডেকে আনবে। যদি জিজ্ঞেস করে কে ডাকছে, তাহলে তুমি বলবে ওমরাহ সফিউল্লা খাঁ সাহেব—বুঝলে?
—সে সব আপনাকে কিছু বলতে হবে না বেগমসাহেবা! পেশমন বেগম সাহেবাকে কত কত জায়গায় নিয়ে গেছি আমি, সেখানে রাত কাবার করে ফিরিয়ে এনেছি, কেউ টের পায়নি! আপনি জিজ্ঞেস করুন না পেশমন বেগমসাহেবাকে!
—দেখো, আমাকে যেন বিপদে ফেলো না তুমি বরকত! তাহলে তোমার কিছুই হবে না, আমারই বিপদ—
মনে আছে, সেদিন নিজের চেহারা দেখেও নিজেকে চিনতে পারেনি মরালী! পেশমন বেগম একেবারে নিখুঁত করে সাজিয়ে দিয়েছিল তাকে। চুস্ত্ পায়জামার সঙ্গে চুড়িদার আচ্কান, আর মাথায় তাজ! চেহারা দেখে পেশমন বেগমই একেবারে গলে গিয়েছিল। মরালীর গালে নিজের ঠোঁট ঠেকিয়ে লম্বা করে চুমু খেয়ে নিলে।
বললে—তোমাকে যে কী মানান মানাচ্ছে ভাই, কী বলবো—এসো তুমি—
সেই অন্ধকার রাত্রে চেহেল্-সুতুনের চোরা ফটক দিয়ে বেরোল বরকত আলি আর আর-একজন ওমরাহ্ সফিউল্লা খাঁ সাহেব। পেছনে কোন্ মহলে তখন গুলসন বেগমের গলায় একটা নতুন ঠুংরির সুর ভেসে আসছে—

যো হোনেকা থী, উও তো হো গয়ি
আভি উস্কো ক্যা পরোয়া...

মোটা মোটা খিলেন। মুর্শিদকুলী খাঁর আমলের ইটের তৈরি। পায়ের তলাতেও ইট বাঁধানো সড়ক। নতুন নাগরা জুতোর তলায় ইটগুলো যেন কথা কয়ে উঠলো। তারাও যেন বলতে লাগলো—যো হোনেকা থী, উও তো হো গয়ি, আভি উস্কো ক্যা পরোয়া—
বাইরের খোলা আকাশের নিচে দাঁড়িয়েও মরালীর মনে হলো—সমস্ত আকাশ-বাতাস-অন্তরীক্ষ সবাই যেন একসঙ্গে গলা মিলিয়ে গাইছে—যো হোনেকা থী, উও তো হো গয়ি, আভি উস্কো ক্যা পরোয়া—
তাঞ্জামের ফটকটা খুলে হঠাৎ মরালী বরকত আলিকে ডাকলে।
—ও গানটার মানে কী বরকত আলি?
—কোন্ গানটার বেগমসাহেবা?
—ওই যে গুলসন বেগমসাহেবা চেহেল্-সুতুনের ভেতরে গাইছিল। যো হোনেকা থী, উও তো হো গয়ি, আভি উস্কো ক্যা পরোয়া—
বরকত আলি বললে—ওর মতলব হচ্ছে বেগমসাহেবা, যা হয়ে গেছে তা নিয়ে

আর কেন ভেবে মরছো, ও তো হয়েই গেছে, এখন ভেবে কোনো লাভ নেই—

মরালীরও মনে হলো—সত্যিই লাভ নেই। যা হয়ে গেছে তা নিয়ে কেন ভেবে মরছি, ও তো হয়েই গেছে, ও নিয়ে ভেবে তো কোনো লাভ নেই!

তাঞ্জামটা চারটে বেহারার কাঁধে চক-বাজার দিয়ে হুম্-হুম্ করে এগিয়ে চলতে লাগলো।

এ এক বিচিত্র দেশ। এই বেঙ্গল! রবার্ট ক্লাইভ এ-দেশে আগে কখনো আসেনি। ম্যাড্রাস দেখেছে, আর্কট দেখেছে, ত্রিচনাপল্লী দেখেছে, কাঞ্চিপুরম দেখেছে। কিন্তু এ অন্যরকম। এখানকার রোগা-রোগা কালো কালো মানুষগুলো ফিরিঙ্গীদের দিকে কেমন রেস্পেক্ট-মেশানো দৃষ্টি দিয়ে চেয়ে দেখে। ভিলেজ-এর লোকগুলো দিনের বেলায় লুকিয়ে থাকে। কিন্তু সন্ধ্যের পর তখন আর তাদের ভয় থাকে না। লুকিয়ে-লুকিয়ে চাল-ডাল বিক্রি করে যায় জাহাজের কাছে এসে।

ফলতার খাড়ির মুখে অনেক দিন কাটলো। শেষে আর বেশিদিন অপেক্ষা করতে রাজি হলো না কেউ। রবার্ট ক্লাইভ একদিন অ্যাডমিরাল ওয়াটসন্‌কে বললে—দিস্ ইজ্ টেরিবল্—আমি আর ওয়েট করতে পারবো না—উই মাস্ট্ অ্যাটাক হুগলী ফোর্ট—

ক'টা লড়াইতে জিতে ক্লাইভ সাহেব তখন বেঙ্গলের ব্যাটল্ ফিল্ড-এ নিজের ক্ষমতা দেখাবার জন্যে ছট্‌ফট্ করছে!

তারপর একদিন দলবল নিয়ে ফিরিঙ্গীদের ক'টা জাহাজ এসে হাজির হলো এই এখানে।

ক্লাইভ বাইরে মুখ বাড়িয়ে চারদিকে দেখে জিজ্ঞেস করলে—এ-জায়গাটার নাম কী?

অ্যাড্‌মিরাল ওয়াটসন বললে—বজ-বজ—

—এখান থেকে হুগলী কত দূর আর?

তা দূরই হোক আর যা-ই হোক, স্রপশায়ারের সেই বখাটে ছেলেটার যেন কিছুতেই ভ্রুক্ষেপ নেই। বললে—আরো এগিয়ে চলো, লেট্ আস গো নিয়ারার—

নিয়ারার মানে কোথায়? আছে, আর একটা জায়গা আছে কাছাকাছি। তার নাম মায়াপুর। মায়াপুর পর্যন্ত তো যাওয়া যাক, তার পরের কথা পরে ভাবলেই হবে।

বেশ জঙ্গলা-জঙ্গলা জায়গাটা। জাহাজগুলো এসে থামলো সেখানে। দলের নৌকোগুলো হুগলী-রিভারের ভেতরে অনেক দূর-দূর গিয়ে টহল দিয়ে আসে। দেখে আসে কোথায় কাছাকাছি নবাবের ফৌজ আছে। আর ওয়াটসন্ সেখান থেকে রাজা মানিকচাঁদের চিঠির জন্যে হাঁ করে অপেক্ষা করে বসে থাকে। চোখে দূরবীণ লাগিয়ে দেখে দূরের ভিলেজগুলোর দিকে। নবাবী-ফৌজ কতদূরে!

চারদিকে বেরিয়ে যায় নৌকোগুলো।

কোনোটা পুব দিকে, কোনোটা দক্ষিণে। সারা রাত টহল দেয়, আশে-পাশের গাঁ থেকে প্রভিশনস্ কিনে আনে। না পেলে লুটপাট করে আনে। মুরগী, ভেড়া,

গর্। ওয়ারের সময় অত নিয়ম মানতে গেলে চলে না। দ্যাট ব্ল্যাক নিগার অব্ এ প্রিন্স! তাকে একটা লেশন্ দিতে হবে। ক্লাইভের সোনালী রক্ত ভাবতে ভাবতেই গরম হয়ে ওঠে। বলে—লেট্ আস্ গো নিয়ারার—

নিয়ারার মানে কোথায়? আছে, আর একটা জায়গা আছে কাছাকাছি। কিন্তু অত দূরে যাওয়া কি সেফ্? রাজা মানিকচাঁদের হাতে তৈরি আছে দু'হাজার ফুট-সোলজার আর পনেরো শো ঘোড়া। যে-কোনো মোমেণ্টে রাজা ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে আমাদের ওপর।

নৌকোগুলো রাত্রে বেরিয়ে যায়, আর ভোর-রাত্রেই ফিরে আসে। খবর নিয়ে এস কোথায় কতদূরে রাজা মানিকচাঁদ।

দিনের পর দিন যায়, রাতের পর রাত। চারখানা চিঠি দেবার পরও কোনো উত্তর আসে না নবাবের কাছ থেকে। সমস্ত ইণ্ডিয়ার ইস্ট্-কোস্ট জয় করে এসে এই সাউথ-বেঙ্গলে এসে হেরে যাবে নাকি ফোর্ট সেণ্ট্ ডেভিডের কম্যাণ্ডার?

ক্লাইভ আবার বললে—লেট্ আস্ গো নিয়ারার—

কিন্তু সেদিনই রাত্তিরে জাহাজের ঘরে ধাক্কা পড়লো। কে? কে? কে?

তড়াক করে লাফিয়ে উঠেছে লেফটেন্যাণ্ট্ কর্নেল ক্লাইভ। বন্দুকটা পাশেই থাকে বরাবর, সেটা হাতে নিয়ে সামনে বেরিয়ে এসেছে। মেজর কিলপ্যাট্রিক, অ্যাড্মিরাল ওয়াটসন্ সবাই-ই উঠে পড়েছে। কিন্তু কোথাও তো সাড়া-শব্দ নেই, ফায়ারিং হচ্ছে না কোথাও। হোয়াট্স্ আপ্? কী হলো?

—কর্নেল, দু'জন লেডীকে ধরে এনেছে সেপাইরা।

—দু'জন লেডী?

—হ্যাঁ কর্নেল, দু'জন লেডী!

—স্পাই নাকি? ফিমেল স্পাই? স্ট্রেঞ্জ! ভেরি স্ট্রেঞ্জ! এদেশে ফিমেল স্পাইও আছে নাকি নবাবের আর্মিতে!

নৌকো করে নেভির যে-লোকরা টহল দিতে বেরিয়েছিল তারা তখন দু'জন মেয়েমানুষকে ধরে এনে জাহাজে তুলে ফেলেছে।

—আমরা প্রথমে ভেবেছিলাম কর্নেল ফ্রেঞ্চ-বোট। আমরা বন্দুকে ফায়ার করতেই ওরাও ফায়ার করলে। তখন বোটটাকে আমরা ক্যাপচার করে দেখি বোটের ভেতরে এই দু'জন লেডী!

লেডী দু'জন তখন ঘোমটা দিয়ে জাহাজের ওপরেই দাঁড়িয়ে আছে।

—তোমরা কে? কারা তোমরা? হু আর ইউ?

একজন সেপাই ভালো করে বাঙলা করে বুঝিয়ে দিলে। একজন লেডী তো তখন থর-থর করে কাঁপছে। পাশের মেয়েমানুষটার সাহস হয়তো একটু বেশি। সে বললে—হুজুর, আমরা নবাবের কেউ নই, আমরা হিন্দু—

—তোমরা রাত্তিরে কোথায় যাচ্ছ?

—হুজুর, কাশীধামে! বাবা বিশ্বনাথ দর্শন করতে!

—তোমরা কাদের লোক? নাম কি তোমাদের?

—হুজুরে আমার নাম দুগ্গা! আমি এর দাসী। ইনি হাতিয়াগড়ের জমিদার ছোটমশাইয়ের নফরের মেয়ে। নফর শোভারাম বিশ্বাস। ইনি তারই মেয়ে—শ্রীমতী মরালীবালা দাসী—

ঘোমটার ভেতর ছোট বউরানী তখন ভয়ে ঘেমে নেয়ে উঠে একেবারে মূর্ছা যাবার জোগাড়।

সংসারে এক-একটা মানুষ জন্মায় যারা ঠিক ইতিহাসের মত। এক-একটা শতাব্দী পার হয়ে যায়, হঠাৎ এমনি এক-একটা মানুষের সাক্ষাৎ মেলে। ইতিহাসের মতই তারা কাউকে পরোয়া করতে জানে না। সংসার তাদের অবহেলা করে, সমাজ তাদের তাচ্ছিল্য করে, আত্মীয়-স্বজন-বন্ধু-বান্ধব তাদের নিরুৎসাহ করে, তবু সেই প্রতিকূল ভাগ্যকে অস্বীকার করে তারা অমোঘ ভবিতব্যের দিকে এগিয়ে চলে।

এমনি একজন মানুষ এই লেফটেন্যাণ্ট্ কর্নেল ক্লাইভ।

নিজের দেশে তাকে কেউ সম্মান দিলে না। নিজের দলের লোকও কেউ তাকে শ্রদ্ধা করলে না। অ্যাড্মিরাল ওয়াটসনের সঙ্গে রোজই খিটিমিটি বাধতে লাগলো। তবু রবার্টের গোঁ, বাঙলার সুবাদার-নবাবের অত্যাচার সে বন্ধ করবেই।

যারা দিশি সেপাই তারা নৌকো করে অনেক দূরে চলে যায়। গিয়ে লোকের সঙ্গে কথা বলে, মেলামেশা করে। তাদের মনের কথাগুলো জানবার চেষ্টা করে। তারা কি ফিরিঙ্গীদের চায়, না নবাবকে চায়! গাঁয়ের লোকের বাড়িতে গিয়ে হুঁকো নিয়ে তামাক খেতে খেতে গল্প করে।

গাঁয়ের লোকরা বলে—আমরা হলুম উলুখড় গো, সেপাই মশাই, আমাদের কাছে ফিরিঙ্গীরাও যা, ও নবাবও তাই—

সেপাইরা বলে—তা এই যে তোমরা উপোস করছো, নবাব তোমাদের খেতে দিচ্ছে, নবাব তোমাদের কথা ভাবছে? নবাব তো মতিঝিলের ভেতর বসে বসে ফূর্তি করছে বেগমদের নিয়ে—

—তা ফিরিঙ্গীরাও পয়সা হলেই ফূর্তি করবে। পয়সা হবার পর কে আর গরীব-গুর্বোদের কথা ভাবে বলো? আমরা বড়লোক হলে আমরাই কি আর তা ভাববো?

সেপাইরা তবু বোঝায়।

বলে—এই আমাদেরই দেখ না, ফিরিঙ্গীদের পল্টনে নাম লেখাবার আগে আমরাও তোমাদের মত ভাবতুম, তারপর এখন দলে ঢুকে দেখছি অন্য-রকম—

—কী রকম দেখছো শুনি?

—আরে, এ তোমাদের নবাবের পল্টনের মতন নয়। এখানে এরা ভালো খেতে-পরতে দেয়, ভালো করে কথা বলে, ভালো মাইনে দেয়। দেখছো না, খেয়ে-দেয়ে কী রকম খোদার খাসী হয়েছি—

এই রকম করে ঘুরে ঘুরে দেখে এসে সবাই রিপোর্ট দেয় রবার্ট ক্লাইভকে, ক্লাইভ সব মন দিয়ে শোনে।

জিজ্ঞেস করে—সবাই অ্যাণ্টি-নবাব, সবাই নবাবের বিরুদ্ধে?

—হ্যাঁ হুজুর, সবাই চায় ফিরিঙ্গীরা ফিরে আসুক। সবাই সেপাইএর দলে নাম লেখাতে চায়!

—কেন চায়?

—চায় এই জন্যে যে এখানে নাম লেখালে তাদের ভালো হবে। তারা পেট ভরে খেতে পাবে!

—এখন খেতে পায় না?

—এখন খেতে পাবে কী করে হুজুর, নবাব মারে জমিদারদের, জমিদার মারে প্রজাদের। কারোর ঘরে ফসল উঠতে দেখলে ডিহিদারের নজর পড়ে, তারপর হুজুর মুসলমান প্রজা হলে সাত খুন মাফ, আর কাফের হলে তার আর রক্ষে নেই।

অ্যাডমিরাল ওয়াটসন্ আর রবার্ট ক্লাইভ দুজনেই মন দিয়ে সব কথা শোনে। ওয়াটসন্ যুদ্ধ করতে এসেছে, এত কথা শুনে কী লাভ বুঝতে পারে না। জিজ্ঞেস করে—এ-সব কথা নিয়ে আমাদের কী দরকার, নবাবের ফৌজ কোথায় সেই সব খবর জানলেই তো যথেষ্ট!

কিন্তু কর্নেল ক্লাইভ বলে—না—

সত্যিই, ছেলেটা সেই যুগেই বুঝে নিয়েছিল যে লড়াই করতে গেলে শুধু ফৌজ-এর খবর নিলেই চলবে না। সেখানকার মানুষের মতিগতির খবরও নিতে হবে। সেখানকার মানুষের সুখ-দুঃখের খবরও নিতে হবে।

কর্নেল ক্লাইভ জাহাজের ওপরে খোলা আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে দেশটাকে দেখে। শীতকালের দিনের বেলায় বেশ আরাম দেয় রোদটা। বরফের দেশের লোক গায়ের জামা খুলে রোদ পোয়ায়। রাত্রে আবার কনকনে শীতের ঠাণ্ডা। জাহাজ থেকে নেমে হেঁটে গিয়ে গাঁয়ের মধ্যে চলে যায়। ফিরিঙ্গী দেখে ছেলে-বুড়ো সবাই পালায়। তবু সাহেব হতাশ হয় না। লোকগুলোর সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করে। অ্যাড্মিরাল ওয়াটসন্ সাবধান করে দিয়েছিল—খুব কেয়ারফুল রবার্ট, ওরা সাউথ-ইন্ডিয়ান নয়, ওরা বেঙ্গলী, ওরা ভেরি ডেঞ্জারাস—

—ভেরি ডেঞ্জারাস মানে?

—মানে, ওরা ভেরি ডিজ্-অনেস্ট! ওরা লায়ার, আন্ফেথফুল—

ক্লাইভ বললে—কিন্তু ডেঞ্জারাস হোক আর আন্ফেথফুলই হোক, ওদের নিয়েই আমাকে চলতে হবে, ওদেরই তো কাণ্ট্রি এটা, আমরা তো ফরেনার—!

তারপর বললে—না অ্যাড্মিরাল, আমার কিন্তু খুব ভালো লাগে, আই লাইক দেম্—

—কী রকম, তুমি কি ওদের সঙ্গে মেশো নাকি? ওরা যে ভয়ানক পাজি!

ক্লাইভ বলে—তা আমাদের কাণ্ট্রির লোকেরাই কি কম পাজি! আমাদের কাণ্ট্রির লোকরাই কি আমার সঙ্গে কম ডিজ-অনেস্টি করেছে? আমাকে কি তারা কম হেট্ করেছে? তা না হলে সাধ করে কি আমি আবার পালিয়ে এসেছি ইন্ডিয়াতে?

কথা বলতে বলতে কর্নেল ক্লাইভ নিজেকে আবার হঠাৎ সামলে নেয়। বেশি বললে আবার ওরা অন্য রকম ভাববে। ইন্ডিয়ায় সার্ভিস করতে এসে নিজের অফিসারকে আর চটাবে না আগেকার মত! সবাই সেলফিস্! সবাই ডেঞ্জারাস। একসঙ্গে এক জাহাজে যাদের সঙ্গে খায়-দায়-ঘুমোয় তাদেরও যেন হেট্ করতে ইচ্ছে করে ক্লাইভের। যাদের জন্যে ক্লাইভ এত কিছু করলো তারা তার কী উপকার করেছে! আকাশ-পাতাল ভাবতে ভাবতে কখন তন্দ্রা আসে, আর চোখ দুটো বুজে আসে। স্বপ্ন দেখে, ইংলণ্ডের লোকেরা তার গলায় ফুলের গারল্যান্ড্ পরিয়ে দিচ্ছে, তাকে পার্লামেণ্টের মেম্বর করে নিচ্ছে! স্বপ্ন দেখে, ইংলণ্ডের লোকেরা বলছে—হিয়ার ইজ্ এ হিরো, হিয়ার ইজ্ এ কম্যাণ্ডার—

কিন্তু স্বপ্নটা ভেঙে গেলেই আবার যে-কে-সেই। নিজের কাণ্ট্রির ওপর আবার ঘেন্না হয়। তার চেয়ে এরা অনেক ভালো। এই ইন্ডিয়ানরা। এরা ভয়ে

ভালো করে কথা বলে না বটে, কিন্তু ইংলণ্ডের লোকদের মত নয়। বড় সরল, বড় বোকা। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কথা বললেও, মনের কথা চেপে রাখতে পারে না ওরা। সব বলে দেয়। বলে—আপনারা হুজুর বড় ভালো লোক—আপনারা হুজুর আমাদের সঙ্গে বেশ ভালো করে কথা বলেন—

ক্লাইভ জিজ্ঞেস করে—কেন, নবাবের লোকরা ভালো করে কথা বলে না?

—না হুজুর, তবে আর আমাদের দুঃখটা কীসের? তারা আমাদের কাফের বলে। আমাদের কল্‌মা পড়িয়ে মুসলমান করতে চায়। আপনারা যদ্দিন কলকাতায় ছিলেন তদ্দিন লোকে কত সুখ্যাত্‌ করেছে আপনাদের! আপনারা চলে যাবার পর আবার সেখানে যে-কে-সেই!

—তোমরা কি চাও আমরা আবার আসি?

লোকেরা বলে—নবাবের সঙ্গে আপনারা পারবেন কী করে—আপনাদের কী আর অত ফৌজ আছে?

—সে তোমাদের ভাবতে হবে না, বেশি ফৌজ থাকলেই লড়াইতে জেতা যায় না, তোমরা যদি আমাদের দিকে থাকো তাহলেই আমরা জিতবো—

লোকগুলো বেশ ঘরোয়া হয়ে গিয়েছিল ক'দিনেই। ক্লাইভকে খেজুর-রস খাওয়াতো, আশ্‌কে পিঠে-পুলি খাওয়াতো। ক'দিনেই বেশ জমিয়ে নিয়েছিল গাঁয়ের লোকদের সঙ্গে। শেষকালে ঠিক যাবার আগের দিনই ওই কাণ্ডটা ঘটলো। বেশ মুশকিলে পড়লো ক্লাইভ সাহেব। দুজন লেডী, তাদের নিয়ে কী করবে!

—তা এদের এখেনে ধরে নিয়ে এলি কী জন্যে? হোয়াই?

সেপাইদেরও দোষ নেই। এ-রকম তারা করে থাকে বরাবর। নবাবের ফৌজি-সেপাইরা মেয়েছেলে পেলে ধরে নিয়ে এসে মীর-বক্সীকে উপহার দেয়। এইসব দিয়েই তো চাকরিতে উন্নতি হয়। এই-ই তো রেওয়াজ!

অ্যাড্‌মিরাল ওয়াটসন্‌ বললে—এই নিগার মেয়েদের নিয়ে এখন কী করবে তুমি?

ক্লাইভ বললে—কিন্তু এদের কার কাছে ছেড়ে দেবো?

ওয়াটসন্‌ বললে—সেই কথা নিয়ে এখন মাথা ঘামাবে নাকি তুমি?

—কিন্তু এদের কে দেখবে? চেহারা দেখে মনে হয় খুব রেসপেক্টবল্‌-ফ্যামিলির ওয়াইফ। আর ওটা তার মেড্‌-সারভেণ্ট। দেখি, আমি ওদের কী করতে পারি—

বলে সেই রাত্রেই ক্লাইভ লেডী-দুজনের কাছে গেল। লেডী দু'জন তখন শীতে কাঁপছে। সঙ্গে সেই সেপাইটাও রয়েছে। সে বাঙলা কথা বুঝিয়ে দিতে পারবে।

সেই যে-রাত্রে ধরে এনেছে, তখন থেকে ছোট বউরানী দুর্গার কোল ঘেঁষে বসে আছে। একে গঙ্গার ঠাণ্ডা হাওয়া, তার ওপর ফিরিঙ্গীদের জাহাজ, ম্লেচ্ছ। জীবনে কখনো দুর্গা এমন কাণ্ডর মধ্যে পড়েনি। ছোট বউরানীও না। সেপাই হরিচরণ বার বার বুঝিয়েছে—তোমাদের কিছু ভয় নেই গো, আমাদের কর্নেল সাহেব খুব ভালো লোক—

দুর্গা বলেছে—তুমি তো বলছো বাছা, কিন্তু ওরা তো ম্লেচ্ছ, গরু খায়, ওরা কী করে ভালো লোক হবে?

হরিচরণ বলেছে—গরু খেলেই কি আর খারাপ লোক হয়, দেখবে তোমাদের কোনো ক্ষেতি হবে না—

দুর্গা বলেছে—দেখো বাপু, তোমাদের সাহেব আমাদের যেন ছুঁয়ে দেয় না, তাহলে আমাদের জাত যাবে—

কিন্তু সাহেব যখন এল তখন দুর্গা একগলা ঘোমটা দিয়ে দিলে। ঘোমটার ফাঁক দিয়ে যতটা দেখা যায় চেয়ে দেখলে সাহেবের মুখের দিকে। লাল টকটকে মুখখানা। মুখময় যেন ঘামাচি ভর্তি। দেখে দুর্গা যে দুর্গা, তারও বুকটা ঢিপ্-ঢিপ্ করে উঠলো।

সাহেব বললে—আমার সেপাইরা তোমাদের ভুল করে ধরে এনেছে, ভেবেছে ফ্রেঞ্চ-বোট—তা তোমরা কোথায় যাবে বলো, আমি তোমাদের সেখানেই পাঠিয়ে দিচ্ছি—বলো কোথায় যাবে?

দুর্গা বললে—আমরা কাশীধামে যাচ্ছিলাম, সেইখানেই যাবো—

—কাশী? কাশীধাম? সে কোথায়?

হরিচরণ বললে—সে উত্তরে, সে অনেক দূর হুজুর, ছ'মাসের পথ—

সাহেব বললে—কিন্তু অত দূরে তোমরা দু'জন লেডী যাবেই বা কী করে? তোমাদের সঙ্গে কেউ নেই?

দুর্গা বললে—আমাদের সঙ্গে তো আমাদের বিশ্বাসী পাহারাদার ছিল, তার কাছে বন্দুক ছিল—সে তো গুলী খেয়ে মরে গেছে, আর মাঝিরা কোথায় গেছে জানি না—

সাহেব বললে—মাঝিদের আমরা ধরে রেখেছি, পাছে তারা ভয় পেয়ে তোমাদের ছেড়ে পালিয়ে যায়; কিন্তু সঙ্গে তোমাদের নিজেদের কোনো পুরুষ নেই? এই লেডীর হাজব্যাণ্ড্ কোথায়?

হরিচরণ সব বুঝিয়ে দিলে সাহেবকে। দুর্গার কাছে সবই শুনে নিয়েছিল সে। মহিলাটির হাজব্যাণ্ড্ হুজুর পাগলাটে মানুষ। বিয়ে হবার পর থেকেই সে নিরুদ্দেশ। সে হলো পোয়েট। বাঙলা দেশে তো জাত-কুল মিলিয়ে বিয়ে দিতে হয়, তাই ওই রকম পাত্রের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল এ'র। ইনি বড় দুঃখী সাহেব, এরা বাবা বিশ্বনাথের চরণে আশ্রয় নেবার জন্যে যাচ্ছিল, হঠাৎ পথের মধ্যে এই বিপদ!

হরিচরণ দুর্গার দিকে ফিরে বললে—তা তোমরা কোথায় যাবে ঠিক করো আগে, সেই রকম ব্যবস্থা করে দেবে—তবে সাহেব কাশীধামে পৌঁছিয়ে তো দিতে পারবে না। যদি নিজের দেশে ফিরে যেতে চাও তো বলো—

সাহেবও বললে—আমাদের নিজেদেরই তো এখানে দাঁড়াবার জায়গা নেই, আগে ছিল, এখন নবাবের সঙ্গে ওয়ার চলছে—এ-অবস্থায় আমরাই বা তোমাদের কতটুকু সাহায্য করতে পারি—

তা বটে! দুর্গাই বা কী বলবে! সব কথা কি খুলে বলা যায় সবাইকে!

সাহেব বললে—তাহলে তোমরা এখন ভাবো—ভেবে বলো—

বলে সাহেব চলে গেল। হরিচরণকে ওদের দেখা-শোনা খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করতে বললে। অ্যাড্মিরাল ওয়াটসন্ পাশের জাহাজে ছিল। সেখানে যেতেই অ্যাড্মিরাল জিজ্ঞেস করলে—তুমি কী ঠিক করলে রবার্ট?

ক্লাইভ বললে—ওদের বলে এসেছি ভাবতে, ভেবে যা ঠিক করে তাই হবে—

অ্যাড্মিরাল রেগে গেল—আমি ওদের কথা বলছি না, ড্রেট দেম গো টু হেল্—এখন এগিয়ে যাবে, না এখানেই ক'দিন থেকে ওয়াচ করবে—

ক্লাইভ বললে—জাহাজ নিয়ে এগিয়ে যাওয়া ভালো—লেট্ আস্ গো নিয়ারার—

ওয়াটসন্ বললে—না, জাহাজ নয়, হাঁটাপথে এগিয়ে ওদের অ্যাটাক্ করা ভালো—

খানিক তর্ক হলো। কিন্তু অ্যাড্মিরাল ওয়াটসন্ চাকরিতে বড়, সুতরাং তার

কথায় সায় দিতে হলো। হাঁটা-পথেই যাবে ইংরেজ-ফৌজ। দশ মাইল রাস্তা। সেপাইরা পথের নিশানা জানে। তারাই পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে। শীতকাল, রাস্তায় কাদা নেই, যেতে কষ্টও হবে না কারো।

ছোট বউরানী ভোরবেলা ডাকলে—দুগ্যা—

—কী বউরানী?

—তুই বললি না কেন আমরা কেষ্টনগরে যাবো, তাহলে এখানে আর এমন করে পড়ে থাকতে হতো না—

দুগ্যা বললে—হ্যাঁ, কেষ্টনগরের কথা বলি আর সব জানাজানি হয়ে যাক, তখন?

—কিন্তু আমার যে বড় ভয় করছে!

—ভয় কীসের সাহেবকে? দূর, সাহেব এমনিতেই জব্দ হয়ে গেছে।

—কীসে জব্দ হলো?

—তোমাকে দেখে!

—তোর মরণ। ফের যদি ও-কথা বলবি তো আমি এই গঙ্গায় ঝাঁপ দেবো বলে রাখছি!

সাহেব কিন্তু সত্যিই ভালো। মাঝে-মাঝে হরিচরণকে দিয়ে খবর নেয়। নিজেও আসে। কোনো কষ্ট হচ্ছে কি না, খাওয়া-দাওয়ার অসুবিধে হচ্ছে কি না এই সব। পল্টনের দল হেঁটে হেঁটে চলেছে, আর জাহাজগুলো চলেছে গঙ্গার ওপর দিয়ে।

কিন্তু সেদিন সাহেবও ভয় পেয়ে গিয়েছিল। জাহাজ দাঁড়িয়ে ছিল গঙ্গায় নোঙর বেঁধে, হঠাৎ খবর এল মানিকচাঁদ দু'হাজার ফুট-সোল্‌জার আর দেড়-হাজার ঘোড়সওয়ার নিয়ে আগেই কখন বজ্‌বজে এসে হাজির হয়েছে টের পায়নি কেউ। হঠাৎ দুম-দাম শব্দ পেয়েই দুর্গার ঘুম ভেঙে গেছে। ছোট বউরানীও উঠে বসেছে। উঠে বসে জিজ্ঞেস করলে—ও কীসের শব্দ রে দুগ্যা?

বাইরে ডাঙ্গায় তখন হট্টগোল। সেদিকে উঁকি মেরে দেখে দুর্গা বললে—হরিচরণকে ডাকি—

হরিচরণকে আর ডাকতে হলো না। তার আগেই সাহেব এসে হাজির। একেবারে হাঁফাচ্ছে। পেছনে-পেছনে হরিচরণ।

এসেই বললে—লেডীজ্, আমাদের বড় বিপদ হয়েছে, জানি না আমাদের কপালে কী আছে, তোমরা যদি কোথাও যেতে চাও, এই হরিচরণ তোমাদের বোটে করে নিয়ে যাবে। আমার সঙ্গে আর দেখা হবে না। উইশ্ ইউ গুড লাক্,—

তখন আর ভাববারও সময় নেই ক্লাইভ সাহেবের। মাত্র এই ক'টা সোলজার নিয়ে মানিকচাঁদের সঙ্গে লড়াই করা মানেই তো মারা যাওয়া।

ওদিক থেকে ওয়াটসন্ চিৎকার করছে—রবার্ট, রবার্ট—

আর দাঁড়াতে পারলে না সাহেব। দুর্গা হঠাৎ উঠলো। উঠে সাহেবের কাছ থেকে এক হাত দূরে হঠাৎ মাথাটা মেঝের ওপর ঠেকিয়ে গড় করলে। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললে—তোমার ভালো হবে সাহেব, তোমার কথা আমাদের অনেকদিন মনে থাকবে—

নৌকো ছেড়ে দিলে। হরিচরণও উঠলো। মাঝিরা তৈরি ছিল। সেদিকে অত দেখবার সময় নেই ক্লাইভের। মেজর কিলপ্যাট্রিক, অ্যাডমিরাল ওয়াটসন্, রবার্ট ক্লাইভ তখন আর-এক লড়াইয়ের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

দূর থেকে কখনো কামানের শব্দ আসছে। ছোট বউরানী বললে—ফিরিঙ্গীটা ভালো লোক, না দুগ্যা, আমাদের তো কিছু করলে না—

দুর্গা বললে—করবে কী করে, আমি যে তার আগেই উচাটন করে দিয়েছিলাম, দেখলে না, আমি সামনে গড় হয়ে পেন্নাম করলাম, তার মানেটা কী?

শ্রীনাথ তখন প্রাণপণে বৈঠা বেয়ে চলেছে। হরিচরণ ফিরিঙ্গী কোম্পানীর সেপাই। সেপাই হলেও ক্লাইভ সাহেব তাকে এই কাজের ভার দিয়েছে। যে-কোনো নিরাপদ জায়গায় এদের পৌঁছে দিয়ে আবার যেমন করে হোক ফৌজের দলে ফিরে যেতে হবে।

কিন্তু তখনো হরিচরণ জানে, না দুর্গাই জানে যে, তাদের জন্যে আরো এক নতুন বিপদ অপেক্ষা করে আছে!

বজবজের ওপারে আলিগড়, আর ওদিকে মকওয়া। দুটো জায়গাতেই দুটো মাটির কেল্লা রয়েছে। নবাবের বজবজের কেল্লার ভেতর থেকে রাজা মানিকচাঁদের সেপাইরা গোলা ছুঁড়ছে। বড় বড় কামানের গোলা এসে পড়তে লাগলো গোরা পল্টনদের সামনে।

কর্নেল ক্লাইভের মাথায় তখন বজ্রাঘাত। আর পেছুনো চলে না। অর্ডার দিলে—ফরওয়ার্ড মার্চ—

শ্রীনাথ তখন প্রাণপণে বৈঠা বেয়ে চলেছে। হরিচরণ বললে—আরো জোরে চালাও ছিন্নাথ—ফিরিঙ্গীদের আর ভরসা নেই, রাজা মানিকচাঁদ এবার আর ছেড়ে কথা বলবে না, এবার পালাবে এ তল্লাট ছেড়ে—

নৌকোটা যেন তীরের মত সোঁ সোঁ করে এগিয়ে চললো।

সারাফত আলি যথারীতি দোকানে বসে মৌতাতে ঝিমোচ্ছিল। এই ঝিমুনিটাই তার বড় আরামের জিনিস। এই আরামটার জন্যেই সে আগরবাতি জ্বালায়, গড়-গড়ায় তামাকের ধোঁয়া টানে। এই আরামের মধ্যেই মনে মনে সে অনেক মতলব আঁটে। তার মনে হয় একদিন চেহেল্-সুতুন গুঁড়ো হয়ে মাটিতে মিশিয়ে ধুলো হয়ে যাবে। হাজী-আহম্মদের চেহারাটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে। এ মসনদ চিরকাল এমনি চলবে না। ভাইতে ভাইতে লড়াই শুরু হয়ে গেছে। এবার শওকত জঙ্ আসছে নবাব হয়ে। শওকত জঙ্কেও আবার যেতে হবে। তারপর ফিরিঙ্গীরা আসবে, ফিরিঙ্গীরাও যাবে। এমনি করেই দুনিয়াদারি চলবে ইন্তেকাল পর্যন্ত। এই-ই দুনিয়া। কিন্তু তবু সারাফত আলির মনে হয় চোখের সামনে সব ঘটনাটা না দেখতে পারলে যেন তৃপ্তি নেই।

হঠাৎ সামনে একটা তাঞ্জাম এসে দাঁড়াতেই যেন সারাফত আলির নেশাটা জমে উঠলো।

—কৌন্?

না, খদ্দের নয়, খোজা বরকত আলি।

—হুজুর, কান্তবাবু এই খুলিতে থাকে?

—থাকে। কেন?

—ওমরাহ্ সফিউল্লা খাঁ সাহেব একবার মুলাকাৎ করতে চান।

কান্তবাবু কি আবার আমীর-ওমরার সঙ্গে দোস্তালি লাগিয়েছে!

—কী জরুরৎ?

—তা জানি না মিঞাসাহেব, খাঁ সাহেব তাঞ্জামের অন্দরে বসে আছেন, কান্তবাবুর সঙ্গে বাত্-চিজ্ আছে—

এই সফিউল্লা, ইয়ারজান, মেহেদী নেসার একদিন এই চক্-বাজারের রাস্তায়-রাস্তায় বেত্তমিজি করে বেড়িয়েছে। জেনানাদের বোরখা উঠিয়ে মুখ দেখেছে, গঙ্গায় চান করতে করতে আওরতদের দেখে শিষ দিয়ে খোয়ার করেছে। আর এখন আবার তাঞ্জাম না হলে এক পা নড়তে পারে না। ইজ্জৎদার আদমি হয়ে গেছে। তাজ্জব দুনিয়া।

সারাফত আলি সেইখানে বসেই চেঁচিয়ে উঠলে—কী, সফিউল্লা সাহাব, মিঞাসাহেবকে আর যে পহছনতে পারেন না দেখছি! আমি খুশ্‌বু তেলওয়ালা সারাফত আলি। বহুত বহুত বন্দেগী জনাব—

বরকত আলি একটু ভড়কে গেল।

সারাফত আলি তখনো বলে চলেছে—তাঞ্জামটা সামনে নিয়ে আসুন না সফিউল্লা সাহাব, আমাকে অত ডর কেন?

বরকত আলি তাঞ্জামের কাছে গেল। মুখ নিচু করে বললে—মিঞাসাহেব বাত্ করছে আপনার সঙ্গে—

মরালী বললে—জিজ্ঞেস করো, কান্তবাবু কুঠিতে আছে কি না—

সারাফত আলি সাহেব তখনো চেঁচাচ্ছে। বহুদিন পরে সফিউল্লার সঙ্গে দেখা, এমন সুযোগ ছাড়া যায় না, যাদের এককালে কুকুর-বেড়ালের মত মনে করেছে সারাফত আলি, তারাই আজ মুর্শিদাবাদের মসনদ নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। তারাই এখন আট-বেহারার তাঞ্জামে চড়ে চক্-বাজারের রাস্তা দিয়ে বুক ফুলিয়ে চলছে।

—সে-সব দিনের কথা বেবাক ভুলে গেলে খাঁ-সাহেব! আজকে মীর্জা মহম্মদের পা চেটে চেটে বুড়ো মিঞাসাহেবকেও ইয়াদ রাখলে না। নিমকহারামের বাচ্ছা যত—

নেশার ঝোঁকে মিঞাসাহেব যা-নয়-তাই বলে সফিউল্লা খাঁ সাহেবকে নাগাড়ে গালাগালি দিয়ে যেতে লাগলো। চক্-বাজারের রাস্তার কিছু লোক জড়ো হয়ে গেল খুশ্‌বু-তেলের দোকানের সামনে। বাদ্‌শাও এসে দাঁড়ালো ভেতরে। বরকত আলি দেখলে এ এক মহাবিপদ শুরু হয়ে গেল।

মিঞাসাহেব বললে—কোথায় যাচ্ছিস তুই? দাঁড়া এখানে। তুই তো নবাবের নোকরি করিস, সফিউল্লা সাহেব তোর কোন? তুই সফিউল্লা খাঁর পা চাটিস কেন? সফিউল্লা তোকে তলব দেয়?

বুড়ো যেন হঠাৎ অনেক দিন পরে একেবারে হাজী-আহম্মদকে সামনে পেয়েছে হাতের কাছে। হাতের কাছে পেয়ে তার বিবি চুরির বদ্‌লা নিচ্ছে।

মরালী তাঞ্জামের মধ্যে তখন থর-থর করে কাঁপছিল। কী করতে গিয়ে কী হয়ে গেল। চক্-বাজার থেকে পালাতে পারলেই যেন বাঁচে সে। চেহেল্-সুতুনের ভেতরেই যেন তার নিশ্চিন্ত আশ্রয়। অথচ বরকত আলি হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে আর গালাগালিগুলো শুনছে।

ততক্ষণে অনেক লোক জড়ো হয়ে গেছে। চক্-বাজার সুদ্ধ সব লোক এসে ভেঙে পড়েছে দোকানের সামনে। বুড়োকে সবাই নিরীহ মানুষ, নেশাখোর মানুষ বলে জানে, সে হঠাৎ কেন চিল্লাচিল্লি করছে তা বুঝতে পারলে না।

কিন্তু ওদিকে আর এক কান্ড হলো। ওদিক থেকে আর একটা আট-বেহারার

তাঞ্জাম আসছিল। সেটা এই ভিড়ের সামনে এসেই হঠাৎ থেমে গেল।

—কৌন্?

তাঞ্জামের দরজার পাল্লা দুটো খোলাই ছিল। তার ভেতর থেকে মুখ বাড়িয়ে বেরিয়ে এল নবাব মীর্জা মহম্মদের ইয়ার ওমরাহ সফিউল্লা খাঁ!

সবাই তাজ্জব হয়ে গেছে। এ কোন্ সফিউল্লা সাহেব!

—আরে মিঞাসাহেব, এত গালাগাল দিচ্ছ কোন্ বেল্লিককে?

—আরে তুম, সফিউল্লা সাহেব?

বুড়ো সারাফত আলিও যেন এতক্ষণে চমকে উঠেছে। তাহলে এতক্ষণ কোন্ সফিউল্লাকে গালাগাল দিচ্ছিল সে? তারপর বরকত আলিকে দেখে বললে—এই, তোর তাঞ্জামের মধ্যে কোন্ সফিউল্লা? অ্যাঁ?

সফিউল্লা সাহেব তখন নিজেই মরালীর তাঞ্জামের দরজাটা হাট করে খুলে দিয়েছে।

—আরে, তুম কৌন্ হো?

মরালীর সমস্ত শরীরই কাঁপছিল। এবার কান দুটোও ঝাঁ ঝাঁ করে উঠলো! কেন যে বরকত আলি সফিউল্লা খাঁ সাহেবের নাম করতে গিয়েছিল, আর কে যে সফিউল্লা সাহেব, তাও সে জানে না। মাথার ওপর যেন বাজ ভেঙে পড়লো তার।

ততক্ষণে মরালীর হাত ধরে টান দিয়েছে সফিউল্লা সাহেব। একেবারে নরম তুল-তুলে হাত। কী যেন সন্দেহ হতেই সফিউল্লা সাহেব মুখ নিচু করে তাঞ্জামের ভেতরে উঁকি দিয়েছে। আশেপাশের ভিড়ের মধ্যে থেকেও অনেকে উঁকি মেরে দেখলে। ভারি কচি মুখখানা।

বরকত আলি হাঁ হাঁ করে বাধা দিতে যাচ্ছিল। কিন্তু ওমরাহ সফিউল্লাকে বাধা দেবার সাহস নেই খোজা বরকত আলির। আর ঠিক সংগে সংগে মরালী চিৎকার করে উঠেছে—ছাড়ো, হাত ছাড়ো—

প্রথমটায় সফিউল্লা একটু থতমত খেয়ে গিয়েছিল। কিন্তু মুর্শিদাবাদের ফুর্তির স্বাদ একবার পেয়ে যার হাড় পেকে গেছে, সে অত সহজে ছাড়বার পাত্র নয়।

জিজ্ঞেস করলে—কে, এ কৌন, বরকত আলি? কোন্ সফিউল্লা?

বরকত আলি তখন বোবা! পাথরের মত সে ঠায় চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। তার নোকরি তো এবার যাবেই, কিন্তু কোতল্ থেকে রেহাই পাবে কি না তাই-ই তখন সে ভাবছে।

সফিউল্লা সাহেব আবার হাত ধরতে যেতেই মরালী এক চড় মেরেছে সফিউল্লা সাহেবের গালে।

আর যাবে কোথায়! সফিউল্লা সাহেব চিৎকার করে উঠেছে—কোতোয়াল!

মরালীর মনে আছে সে-সব দিনের কথা। সমস্ত মুর্শিদাবাদ যেন একেবারে আনচান্ করে উঠেছিল। এত বড় দুঃসাহসের কথা তখন কেউ ভাবতেই পারেনি। কল্পনা করতেও ভয় পেয়েছিল। নানীবেগম পাগলের মত ছুটে এসেছিল মতিঝিলে। বলেছিল—এ কী করলি মা তুই, এমন করে নিজের সর্বনাশ কেন করতে গেলি?

কিন্তু মরালীই কি জানতো এমন হবে!

সফিউল্লা সাহেব গালে চড় খেয়ে চুপ করে থাকবার মানুষ নয়। একেবারে হিড়-হিড় করে টেনে বার করলে মরালীকে। আর টানাটানিতে তার মাথার তাজটা

খসে পড়ে গেল। আর সবাই দেখলে একজন জেনানা, একেবারে খাস বেগম-মহলের জেনানা।

সফিউল্লা খাঁ সাহেব আর দেরি করেনি।

একবার শুধু বরকত আলিকে জিজ্ঞেস করেছিল—এ কে? এ কোন্ বেগম?

কিন্তু বরকত আলিরও তো গর্দানের ভয় আছে! বরকত আলিরও তো জানের ভয় আছে! সে বোবার মত দাঁড়িয়ে থেকে তারপর কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিল, আর দেখতে পাওয়া যায়নি তাকে। তারপর সারাফত আলির চোখের সামনে দিয়ে, চক্-বাজারের হাজার হাজার মানুষের সামনে দিয়ে সফিউল্লা সাহেব একেবারে মরালীকে নিয়ে গিয়ে তুলেছিল মতিঝিলে। মতিঝিলের ফটক বন্ধ করে দিয়েছিল পাহারাদার। তারপর মতিঝিলের একটা ঘরের ভেতরে নিয়ে গিয়ে সফিউল্লা সাহেব চিৎকার করে উঠেছিল—তুমি কে? তুম্ কোন্?

সে-ঘটনার কথাও মনে আছে মরালীর। মরালী তখনো হাঁসফাঁস করছে। বললে—আমাকে ছেড়ে দাও—

সরাবখানার ভেতরে বসে ইব্রাহিম খাঁ সব দেখেছিল। মরালীকে দেখেই চমকে উঠেছে আবার। আবার মুখপুড়ী এখানে এসেছে সফিউল্লা খাঁ সাহেবের সঙ্গে। মুখপুড়ী চরিত্রটা একেবারে খারাপ করে ফেলেছে গো! ছি ছি ছি!

ইতিহাসের আর একটা শিক্ষা এই যে, যে-জাত একবার ক্ষয় হবার মত হয়, তখন তার সব দিক দিয়ে সর্বাঙ্গে ক্ষয়ের লক্ষণ প্রকাশ পায়। আলীবর্দী খাঁর মসনদ ছিল ষড়যন্ত্র আর চক্রান্তের মসনদ। মানুষের মনুষ্যত্বকে অস্বীকার করার মসনদ। শুধু তো জয় দিয়ে ইতিহাসের বিচার হয় না, তার পরাজয়ও ইতিহাসের মানদণ্ডে বিচার করে দেখতে হয়। মসনদ যখন দাঁড়িয়ে থাকে তখনো তার পরীক্ষা, যখন পতন হয়, তখনো তাই। তাই শান্তির সময়ের হালচাল দেখে পতনের সময়ে চমকে উঠতে নেই। পতনের বীজ লুকিয়ে থাকে শান্তির মধ্যে। সে-পতনের বীজ পুঁতে গিয়েছিলেন আলীবর্দী খাঁ নিজেই। নবাব মীর্জা মহম্মদ সিরাজ-উ-দ্দৌলা শুধু তার অসহায় উত্তরাধিকারী।

সেদিন মতিঝিলের মধ্যে নবাব সুজাউদ্দীনের আত্মাও বোধহয় চমকে উঠেছিল তাঁর নিজের মূর্তি দেখে। সফিউল্লা যেন তাঁরই প্রতিচ্ছায়া, তারই মানস-শয়তান। শুধু সুজাউদ্দীনই নয়। সরফরাজ, আলীবর্দী সবাই যেন নিজেদের প্রতিমূর্তি দেখে একসঙ্গে তারস্বরে আর্তনাদ করে উঠেছিলেন। আর শুধুই কি সরফরাজ, আলীবর্দী খাঁ? হোসেনকুলী খাঁ, করিম খাঁ, ভাস্কর পণ্ডিত, যারা এতদিন ঘুমিয়ে ছিল বিস্মৃতির অতলগর্ভে, তারাও হঠাৎ জেগে উঠে বলে উঠলো—সাবাস—সাবাস—

মতিঝিলের খিদ্‌মদ্‌গাররাও জানতে পারেনি ইতিহাসের প্রতিশোধ তখনো ষোলকলা পূর্ণ হতে কতখানি বাকি আছে। মরালীও জানতে পারেনি সেদিন তার অতখানি দুঃসাহস কে অমন করে যুগিয়ে দিয়েছিল! কারা! কারাই বা তারা! সেদিন সে তার অতীত ভাবেনি, বর্তমান ভাবেনি, ভবিষ্যৎও ভাবেনি। ভাবেনি কী তার প্রতিফল, কতখানি তার শাস্তি, কেমন তার প্রতিক্রিয়া। সাধারণ গ্রামের একটা মেয়ে সে। নিয়তির অমোঘ চক্রে সে এসে পড়েছিল বাঙলার ইতিহাসের এক বিষণ্ণ সন্ধিক্ষণে। সে জানতে পারেনি, তাকে উপলক্ষ করেই ইতিহাসের গতি একদিন নতুন করে মোড় ঘুরবে।

সফিউল্লা সাহেব তখন মতিঝিলের একটা ঘরের মেঝের ওপর অজ্ঞান অচৈতন্য

হয়ে পড়ে আছে। শ্বেতপাথরের ঠাণ্ডার ওপরেও সফিউল্লা সাহেবের গরম রক্ত যেন জমে বরফ হয়ে উঠতে জানে না। শীতকালের ঠাণ্ডাতেও টগবগ করে ফুটছে সে-রক্ত। সফিউল্লা সাহেবের ঠাণ্ডা দেহটার পাশে টগবগে গরম রক্ত গড় গড় করে গড়িয়ে গড়িয়ে চলেছে নর্দমার দিকে।

আমাকে অপমান? আমার ইজ্জৎ কি তোমার মা-বোনের ইজ্জতের চেয়ে কোনো অংশে ছোট? আমি কি তোমার রক্তের হক্‌দার? মানুষের সম্মানের দাম কি রাস্তার ধুলো? যদি রাস্তার ধুলোই হয় তো সেই রাস্তার ধুলোতেই তোমার ঠাঁই হোক!

সঙ্গে সঙ্গে মতিঝিলের খিদ্‌মদ্‌গাররাও বোধ হয় গন্ধ পেয়েছিল। বাইরে থেকে নেয়ামত দরজা ঠেলছে। কেওয়াড়ী খোল, কেওয়াড়ী খোল, কেওয়াড়ী খোল—

কেওয়াড়ীর তলার ফাঁক দিয়ে সফিউল্লা সাহেবের গরম রক্ত বাইরের বারান্দায় এসে তখন এদিকে-ওদিকে মাথা কুটতে লেগেছে! তবে কি আরো অনেকের মত মরিয়ম বেগমও খুন হয়ে গেল!

আবার সেই এক চিৎকার এল—কেওয়াড়ী খোল, কেওয়াড়ী খোল, কেওয়াড়ী খোল—

মরালী তখন পাথর হয়ে গেছে। মতিঝিলের শ্বেত-পাথরের থামগুলোর মতই নিথর-নিশ্চল নিষ্প্রাণ পাথর।

চেহেল্‌-সুতুনের ভেতরের বাগানে তখনো সেই গানটা ভাসছে—যো হোনেকা থী, উও তো হো গয়ী, আব্‌ উসকী ক্যা পরোয়া—

মতিঝিলে যাওয়া হয়নি কান্তর। ইব্রাহিম খাঁর কাছে গিয়েই বা কী লাভ। বশীর মিঞা হাতিয়াগড়ে গিয়েছিল। সেখানে কী করছে কে জানে! হয়তো এবার সব জানাজানি হয়ে যাবে। তার আগে যদি মরালী বেরিয়ে আসে তো বেঁচে যাবে!

মহিমপুরের দিক থেকেই ফিরে আসছিল আবার। সব যেন গোলমাল হয়ে গেছে কান্তর। যেভাবে কান্ত জীবন আরম্ভ করেছিল, সে যেন আজ কল্পনা। হয়তো এ-চাকরিও তার থাকবে না বেশিদিন। মেহেদী নেসার সাহেব তার ওপর চটে গেছে, মনসুর আলি মেহের সাহেবও চটে গেছে। এর পর কে তাকে রাখবে! সারাফত আলি সাহেব? কিন্তু সারাফত আলি সাহেবের যে চাকরি সে-চাকরিও কি তার পোষাবে!

—নজর মহম্মদ না?

নজর মহম্মদও দেখতে পেয়েছে তাকে।

—আপনার কাছেই যাচ্ছিলাম কান্তবাবু! আজকে চেহেল্‌-সুতুনে যাবেন না? নবাব তো ফৌজ নিয়ে পূর্ণিয়ায় লড়াই করতে গেছে।

—মেহেদী নেসার সাহেব?

—মেহেদী নেসার সাহেব ভি গেছে। চলিয়ে।

—আমার কাছে তো এখন মোহর নেই নজর মহম্মদ, চলো, সারাফত আলি সাহেবের খুশবু-তেলের দোকানে চলো।

নজর মহম্মদ বললে—সে আমি পরে মোহর নিয়ে নেবো, আপনি সেজন্যে ভাববেন না। আমি মিঞাসাহেবের পুরোন খদ্দের—

অনেক আশা নিয়েই সেদিন কান্ত চেহেল্-সুতুনে গিয়েছিল। কিন্তু তখন কি জানতো সেখানে গিয়ে সে আর-এক অদৃশ্য-পূর্ব নাটকের মধ্যে জড়িয়ে পড়বে।

মরালী তার একটু আগেই চলে গেছে। পেশমন বেগম তখন সবে একটু বিশ্রাম নিচ্ছে। পেশমন বেগম একদিন নাচতে এসেছিল, গান গাইতে এসেছিল। একদিন অনেক আশা নিয়ে দিল্লীর বাদশার দরবারে মা'র সঙ্গে যাতায়াত শুরু করেছিল। সে অনেক দিন আগের কথা। পেশমনের মা বলেছিল—আখের চিনে জিন্দ্গীর পথে চলবি মা, নইলে দুনিয়া থেকে একেবারে বরবাদ হয়ে যাবি—

সেই বরবাদই শেষ পর্যন্ত হয়ে গেছে পেশমন বেগম। আজ আর তার ডাক পড়ে না। আজ মতিঝিলের দরবারে গুলসনের ডাক আসে। অথচ একদিন পেশমন না হলে মহ্ফিলের আসরই বসতে পারতো না। সে-সব দিন আর নেই। সে-সব দিন আর আসবেও না।

বাইরে থেকে গুলসনের গান ভেসে আসছিল তখনো। গুলসন আজ নিজের ঘরে বসেই সন্ধ্যে থেকে গানের তালিম নিচ্ছে। যো হোনেকা থী, উও তো হো গয়ী, আব্ উস্‌কী ক্যা পরোয়া। যা হবার ছিল তা তো হয়েই গেছে, এখন আর তা নিয়ে ভেবে কী লাভ! সমস্ত চেহেল্-সুতুনটাই যেন ওই কথা বলে চলেছে। গুলসন যেন সকলের হয়েই সকলের মনের কথাটা বলে চলেছে। কী হবে এই জীবন রেখে! কী হবে রোজ রাত্তিরে এই সেজে-গুজে, কী হবে এই রূপ-যৌবন-মোহর-প্রশংসা নিয়ে। সবই তো নিরর্থক। সবই তো মিথ্যে! তাই শুধু ফুর্তি করে যাও। যা হবার তা হবেই। একদিন ছিল যখন নবাব মীর্জা মহম্মদ পেশমনের পায়ে মাথা বিকিয়ে দিতে পারলে ধন্য হয়ে যেত। একদিন ছিল যখন মেহেদী নেসার, ইয়ারজান, সফিউল্লা সাহেব পেশমনকে খোশামোদ করে করে গান শুনতে চাইতো। একদিন ছিল যখন এই চেহেল্-সুতুন পেশমনের সেবার জন্যে উন্মুখ হয়ে থাকতো। আজ তাকে নিজের ঘরে একলা কাটাতে হচ্ছে। পেশমন বেগমের হাসি পেল সেদিনের কথা ভেবে।

এতক্ষণ বোধ হয় মরিয়ম বেগম চক্-বাজারে পৌঁছে গেছে। চুস্ত-পায়জামা, সেরোয়ানী আর তাজ মাথায় দিয়ে নিজের বালমের সঙ্গে দেখা করছে।

একদিন পেশমন বেগমও খোজাদের সঙ্গে নিয়ে তাঞ্জামে করে চক্-বাজারে গিয়ে লুকিয়ে-লুকিয়ে রাত কাটিয়ে এসেছে। তারপর আজ আর তার কোথাও ডাক পড়ে না। এখন গুলসনের পালা। কিন্তু একদিন গুলসনেরও দিন চলে যাবে। তখন মরিয়ম বেগমের পালা শুরু হবে। এমনি করেই অনাদি অনন্তকাল ধরে চেহেল্-সুতুন চলবে, ইতিহাস গড়িয়ে গড়িয়ে সামনে এগিয়ে যাবে। আর তারপর একদিন পেশমনের মত মরিয়ম বেগমও মুছে যাবে চেহেল্-সুতুন থেকে। তখন আবার আসবে নতুন একজন। সেই নতুনকে নিয়েই আবার কাড়াকাড়ি পড়ে যাবে তখন!

—কে?

হঠাৎ মনে হলো যেন ঘরের বাইরে কার ছায়া নড়ে উঠলো।

—আমি বেগমসাহেবা, আমি নজর মহম্মদ!

নজর মহম্মদকে দেখেই পেশমন উঠে বসলো। এমন তো হয় না কখনো। নজর মহম্মদ তো এমন সন্ধ্যেবেলা কখনো আসে না তার ঘরে।

—একজন জওয়ান এসেছে বেগমসাহেবা। খুব খুব্‌সুরত জওয়ান, আপনার ঘরে আনবো?

এমন ঘটনাও যেন অনেকদিন তার জীবনে ঘটেনি। একটু অবাক হয়ে গেল পেশমন।

—আমার ঘরে?

—হ্যাঁ বেগমসাহেবা, সারাফত আলির খুশ্‌বু-তেলওয়ালার আদমি। বহুত খুব্‌সুরত!

পেশমন তবু বললে—আমার ঘরে? ঠিক জানিস তুই? অন্য দুসরী কোন বেগম নয়, আমি?

নজর মহম্মদ তাড়াতাড়ি গিয়ে কান্তকে ঘরে ডেকে নিয়ে এসেছে। কান্তও কম অবাক হয়নি। এ কার ঘরে আজ নজর মহম্মদ তাকে নিয়ে এল। এ তো রাণীবিবি নয়। এ তো মরিয়ম বেগম নয়। এ তো মরালী নয়।

কান্ত চুপ করেই দাঁড়িয়ে ছিল। নজর মহম্মদ এ কার ঘরে পৌঁছিয়ে দিয়ে গেল তাকে। পেশমন বেগমও যতখানি অবাক, কান্তও ততখানি।

বাইরের পৃথিবীতে যখন পূর্ণিয়ায় শওকত জঙ্‌-এর সঙ্গে নবাব মীর্জা মহম্মদের লড়াই চলছে আর যখন মানিকচাঁদ বজবজের কেল্লার ওপর থেকে ফিরিঙ্গীদের পল্টনদের ওপর কামানের গোলা ছুঁড়ছে, যখন হাতিয়াগড়ের রাণী-বিবিকে নিয়ে দুর্গা গঙ্গার বুকের ওপর বজ্‌রার ছইএর ভেতরে বসে দুর্গা-নাম জপ করছে, তখন এখানে এই চেহেল্‌-সুতুনের ভেতরে পেশমন আর-এক স্বপ্ন দেখতে লাগলো।

স্বপ্নই বটে!

এতদিন তো নজর মহম্মদ কাউকে তার ঘরে আনেনি! হঠাৎ কি আবার তার ভাগ্য ফিরে গেল! কিন্তু নিজের ওপরেই মায়া হতে লাগলো পেশমন বেগমের। এখন তো সে বাতিল হয়ে গেছে। এখন কেন একে তার ঘরে নিয়ে এল নজর মহম্মদ!

—বৈঠিয়ে!

একটা গদিমোড়া বসবার জায়গা দেখিয়ে দিয়ে পেশমন বেগম তাকে আদর-অভ্যর্থনা করবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়লো।

—বসুন আপনি—

কান্ত বসলো না। বললে—আমি কিছু বুঝতে পারছি না, নজর মহম্মদ আমাকে এ কোথায় নিয়ে এল!

পেশমন বেগম বললে—আপনি কিছু ভাববেন না জনাব, আমি তো আছি, আমার নাম পেশমন বেগম। আপনি আরাম করে বসুন—

তারপর পাশের কামরায় গিয়ে নিজের বাঁদীকে ডেকে নিয়ে এল। ঘাগরাপরা মেয়ে একটা। হাসি-হাসি মুখ। হাতে কাচের একটা পাত্রে সরবৎ এনেছে।

পেশমন বললে—এই সরবৎটা খেয়ে নিন, এ আপনার পা টিপে দেবে।

কান্ত আগের বারে এখানে এসেছিল মরালীর কাছে। সেবার তো সরবৎ এনে দেয়নি কেউ। পা টিপে দিতেও আসেনি কেউ। এবার এরা এমন করছে কেন? না কি চেহেল্‌-সুতুনের বেগমদের এই-ই নিয়ম!

—আমি সরবৎ খাবো না—আমার এখন তেষ্টা পায়নি!

পেশমন যেন আদরে ফেটে পড়লো—তা কেমন করে হয় জনাব, আপনি আমার

মেহ্‌মান, আপনাকে তাহলে কী দিয়ে খাতির করবো? নিন—

কান্ত ঢোঁক-ঢোঁক করে সরবৎটা গিলে বেগমসাহেবার হাতে ফেরত দিলে।

—নাচ দেখবেন, নাচ?

কান্ত আরো আড়ষ্ট হয়ে পড়লো! এতখানি ধাড়ি একজন মেয়েমানুষ তার সামনে নাচবে সেটাই বা কী রকম!

—আপনি আরাম করে বসুন জনাব, আমার বাঁদী আপনার পা টিপে দিক, পা টিপলে আপনার তকলিফ দূর হবে, আপনি অনেক দূর থেকে আসছেন—

কান্ত বললে—আমি অনেক দূর থেকে আসিনি তো, আমি সারাফত আলির খুশ্‌বু তেলের দোকান থেকে আসছি—

পেশমন বললে—সে তো আমি জানি—সারাফত আলির খুশ্‌বু তেলের দোকান থেকে অনেক জওয়ান আসে, এসে চেহেল্‌-সুতুনের সরবৎ খেয়ে যায়—আমার বাঁদী তাদের পা টিপে দেয়,—

কান্ত বললে—আমি আগে আসিনি, একবার শুধু এসেছিলাম—

—কোন্‌ বেগমসাহেবার ঘরে? গুলসন বেগম?

কান্ত বললে—না।

—তক্কি বেগম?

—না না, ও-সব কেউ-ই না—

পেশমন বেগম বললে—আপনি আর কারোর ঘরে যাবেন না জনাব। সবাই আপনার কাছ থেকে টাকা খিঁচে নেবে। টাকাও খিঁচে নেবে, ঔর আরাম ভি পাবেন না। আপনি নজর মহম্মদকে বলে আমার ঘরে আসবেন। রাত-ভর আমার ঘরে থাকতে পারবেন, কেউ দেখতে পাবে না, কেউ জানতেও পারবে না। নজর মহম্মদ আমার বড় পেয়ারের খোজা, বড় বিশ্বাসী আদমী, ওকে বলে দেবেন, ও সোজা আপনাকে আমার ঘরে নিয়ে আসবে—

বাঁদীটা হঠাৎ তার পায়ে হাত দিতেই কান্ত পা দুটো টেনে নিয়েছে। বললে—না না, পা টিপতে হবে না, তুমি যাও—

—কেন, টিপুক না—

কান্ত বললে—না না, ওকে যেতে বলে দিন—

পেশমন বাঁদীকে বাইরে চলে যেতে বলতে সে চলে গেল। তারপর বললে—আপনার খুব সরম্‌ বুঝি?

—না, সরম নয়, আমার পা কখনো কাউকে দিয়ে টেপাইনি আগে!

পেশমন বেগম হঠাৎ এক কাণ্ড করে বসলো। একেবারে কান্তর মুখের কাছাকাছি এসে গেল। প্রায় গায়ের ওপর পড়ে আর কি। মুখের কাছে মুখ এনে জিজ্ঞেস করলে—আপনার বয়েস কত জনাব?

কান্ত নিজের মুখখানা সরিয়ে নিতে যেতেই পেশমন বেগম তার মুখখানা দুই হাতের পাতা দিয়ে ধরে ফেলেছে।

—বলুন জনাব, আপনার উমর্‌ কত?

পেশমন বেগমকে এড়াবার জন্যেই কান্ত নিজের বয়েসটা বলে দিলে।

কিন্তু তাতে উল্টো ফল হলো। কান্তর বয়েসটা শুনে যেন পেশমন বেগম একেবারে ক্ষেপে গেল। কান্তর পাশেই বসে দুহাতে তাকে জড়িয়ে ধরলে। বললে—তোমার কানে কানে একটা কথা বলবো, মুখটা সরিয়ে নিয়ে এসো—

—কী কথা?

পেশমন বেগম বললে—কী কথা শুনতে চাও তুমি বলো! আমি তাই-ই বলবো। আমি তোমার মতন সুন্দর একটা জওয়ান চেয়েছিলুম, জানো জনাব! ঠিক তোমার মতন খুবসুরত! তুমি খুব খুবসুরত! দুনিয়ামে সব চিজ ঝুটা, তা জানো। আসল চিজ শুধু মহব্বত,—আর সব চিজ ঝুটো—সব—

কান্ত হঠাৎ বললে—নজর মহম্মদ কোথায় গেল?

পেশমন যেন আরো জোরে আঁকড়ে ধরলো কান্তকে। বললে—নজর মহম্মদকে দূরে হটাও, সবাইকে দূরে হটাও, এখন আর কেউ নেই চেহেল্-সুতুনে জনাব, শুধু তুমি আছ আর ম্যায়—! মহব্বত তোমার ভালো লাগে না জনাব? মহব্বত?

যেন আবোল-তাবোল সব কথা বলতে লাগলো বেগমটা। বলতে লাগলো—আমি সব পেয়েছি জনাব, জিন্দগীতে যা কিছু জেনানারা চায়, সব পেয়েছি। রুপেয়া পেয়েছি, আশ্রফি পেয়েছি, রূপ পেয়েছি, জওয়ানি পেয়েছি, দিল্লীর দরবারে আমি সব কুছ পেয়েছি জনাব, শুধু মহব্বত পাইনি। এখানে নাচ-গান করতে এসেছিলাম, ভেবেছিলাম এখানে এসে মহব্বত পাবো, কিন্তু এই মুর্শিদাবাদের চেহেল্-সুতুনে এসে আমার সব খোয়া গেল। আমার রূপ গেল, আশ্রফি ভি গেল, তবু মহব্বৎ আমি পেলাম না জনাব, তবু মহব্বৎ আমি পেলাম না—

বেগমটার চোখ দিয়ে ঝর-ঝর করে জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো!

এ কী বিপদে পড়লো কান্ত! বেগমটাকে যত ছাড়াতে চায়, ততই জড়িয়ে ধরে সে।

কান্ত উঠে দাঁড়িয়ে বললে—আমি উঠি এবার বেগমসাহেবা—

—না না না, আমাকে তুমি মহব্বৎ দেবে জনাব? আমি যে মহব্বৎ পাইনি! আমি কী নিয়ে বাঁচবো? আমি তোমার কাছে আর কিছু চাই না, আমি শুধু মহব্বৎ চাই—আমাকে মহব্বৎ দেবে না—?

কান্ত আর পারলে না। তাড়াতাড়ি বেগমটাকে সরিয়ে উঠে দাঁড়ালো। তারপর ঘরের দরজাটার দিকে এগিয়ে যেতেই বেগমটা হাতটা ধরে ফেলেছে।

—তোমাকে যেতে দেবো না জনাব, তুমি রাত-ভর আমার ঘরে থাকবে। আমায় তুমি মহব্বৎ দেবে—

কান্তর মনে হলো সে চিৎকার করে নজর মহম্মদকে ডাকে।

—নজর মহম্মদ! নজর মহম্মদ!

কিন্তু তার আগেই বেগমটা তার মুখ চাপা দিয়ে দিয়েছে নিজের হাতের পাতা দিয়ে।

—বলো, তুমি আমার এখানে রাত-ভর থাকবে, আমায় মহব্বৎ দেবে?

কান্ত বললে—আমি তো আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসিনি—

বেগমটা ততক্ষণে তার মুখখানা নিয়ে নিজের মুখের ওপর চেপ্টে দিতে শুরু করেছে। তার গাল, ঠোঁট, নাক সব যেন জখম করে দিতে চাইছে। বেগমটার গায়ে এত জোর! কান্তর মনে হলো তার ঠোঁট দিয়ে যেন রক্ত বেরোতে শুরু করেছে।

—আমি মরিয়ম বেগমের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম বেগমসাহেবা, ভুল করে নজর মহম্মদ আমাকে আপনার ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে গেছে।

বেগমটা যেন আরো ক্ষেপে গেল।

—মরিয়ম বেগম তো বাইরে গেছে!

—বাইরে? কোথায়?

—চক্-বাজারে তার বালমের সঙ্গে দেখা করতে গেছে। কেন, আমাকে তোমার পছন্দ হচ্ছে না? আমি জওয়ান নই? আমি সুন্দরী নই? আমায় মহব্বৎ দেবে না তুমি?

শেষকালে বেগমটা বোধহয় একেবারে পাগলের মত হয়ে গেল। আঁচড়ে কামড়ে খামচে একেবারে একাকার করে দিলে কান্তকে। কান্তকে বোধহয় পিষে গুঁড়িয়ে ফেলবে বেগমটা! কান্ত প্রাণপণে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলে। কিন্তু কিছুতেই ছাড়বে না বেগমটা। কেবল বলে—আমাকে মহব্বৎ দাও জনাব, মহব্বৎ দাও—

শেষপর্যন্ত কান্ত বোধহয় হেরেই যেত বেগমটার গায়ের জোরের দাপটে, কিন্তু চেহেল্-সুতুনের ভেতরে হঠাৎ যেন অনেকগুলো পায়ের আওয়াজ হতে লাগলো। কোথায় যেন ঢং-ঢং করে ঘণ্টা বেজে উঠলো। অনেক মেয়েলি-গলার আওয়াজ আসতে লাগলো কানে। তাতেও বেগমটা কাবু হয়নি। বেগমটার লাল-মুখ আরো টক্‌টকে লাল হয়ে উঠেছে। শরীরের সমস্ত রক্ত যেন তার মুখে এসে জমাট বেঁধে গেছে।

হঠাৎ সেই সময়ে বলা-নেই কওয়া-নেই, নজর মহম্মদ হাঁফাতে হাঁফাতে ঘরে এসে ঢুকেছে। সেদিন নজর মহম্মদ ঠিক সেই সময়ে পেশমন বেগমের ঘরে ঢুকে না পড়লে কী হতো বলা যায় না। হয়তো কান্তকে আঁচড়ে কামড়ে খামচে মেরেই ফেলতো বেগমটা।

পেশমন বেগমের তখন উত্তাল-উন্দাম অবস্থা। তার ওড়নী-ঘাগ্‌রা ছিঁড়ে গেছে টানাটানিতে। নজর মহম্মদকে সেই অবস্থায় ঘরে ঢুকতে দেখেই বেগম-সাহেবা পাগলের মত চিৎকার করে উঠেছে—তুম ক্যুঁ আয়া? তুম ক্যুঁ অন্দর ঘুষা? নিক্‌ল্ যাও—নিক্‌ল্ যাও—নিকলো ইঁহাসে—

—বেগমসাহেবা, খুব বিপদ হয়েছে!

—যো কুছ্ হোনে দেও, আব তুম নিকলো,—নিক্‌ল্ যাও—নিক্‌ল্ যাও—

নজর মহম্মদকেই বোধহয় সেদিন খুন করে ফেলতো বেগমটা। কিন্তু নজর মহম্মদ বেগমটার মুখের ওপরেই বললে—মতিঝিলমে সফিউল্লা খাঁ সাহাব খুন হো গিয়া—

যেন আগুনে জল পড়লো।

—সফিউল্লা সাহেব রাতে মতিঝিলে ঢুকেছিল, এখন নেয়ামত খবর পাঠিয়েছে, সাহাব খুন হয়েছে।

—কে খুন করেছে?

—মরিয়ম বেগমসাহেবা!

কান্ত চিৎকার করে উঠলো—কে? কার নাম বললে?

নজর মহম্মদ আবার সেই একই উত্তর দিলে—মরিয়ম বেগমসাহেবা খুন করেছে খাঁ সাহেবকে।

মরিয়ম বেগমের নামটা শুনে কান্তর মাথাতেও যেন শরীরের সমস্ত রক্ত উঠে জমাট বেঁধে গেল! মরিয়ম বেগম! রাণীবিবি! মরালী! মরালী খুন করেছে সফিউল্লা খাঁ সাহেবকে?

—তুমি ঠিক শুনেছো নজর মহম্মদ? ভুল শোননি তো?

—না হুজুর, নেয়ামত কোতোয়ালকে খবর পৌঁছিয়ে দিয়েছে। মতিঝিলের

ঘরে খুন ঝরছে। ঝুট্ শুনবো কেন হুজুর? নানীবেগমসাহেবাকে ভি খবর দিয়ে দিয়েছি আমি। নানীবেগমসাহেবা লুৎফুন্নিসা বেগমসাহেবাকে খবর ভেজিয়ে দিয়েছে। আপনি এখন চলুন হুজুর, এখন চেহেল্-সুতুন তালাস করতে পারে কোতোয়াল সাহাব। পীরালী খাঁ চেহেল্-সুতুনের পাগলা-ঘণ্টি বাজিয়ে দিয়েছে—চলিয়ে, বাহার চলিয়ে—

পেশমন বেগমের হাত থেকে মুক্তি পেয়েছে বলে কান্ত মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলবার সময়টাও পেল না। তার মনে হলো, এ আবার কোন বিপদের মধ্যে জড়িয়ে পড়লো মরালী।

বাইরে আসতে আসতে কান্ত জিজ্ঞেস করলে—মরিয়ম বেগম মতিঝিলে কী করতে গিয়েছিল নজর মহম্মদ? আমি তো মরিয়ম বেগমের সঙ্গে দেখা করতেই চেহেল্-সুতুনে এসেছিলুম—

নজর মহম্মদ—কিন্তু হুজুর, পেশমন বেগমসাহেবা ভি আচ্ছি জওয়ান বেগম, উও ভি মরিয়ম বেগমসে খুব্‌সুরত—

—হোক খুবসুরত, তুমি তো আমাকে বলোনি যে মরিয়ম বেগম চেহেল্-সুতুনে নেই, তাহলে আমি আজ এখানে আসতুম না।

নজর মহম্মদ বললে—তা আমার মালুম হবে কী করে হুজুর, আমি কি করে জানবো যে মরিয়ম বেগমসাহেবা বরকত আলির সঙ্গে চক্-বাজারে যাবে?

—চক্-বাজারে? চক্-বাজারে কোথায়?

—হুজুর, সারাফত আলির দোকানে। মরিয়ম বেগম তাঞ্জামে করে সারাফত আলির দোকানে গিয়েছিল আপনার সঙ্গে মুলাকাত করতে!

—সারাফত আলির দোকানে গিয়েছিল? আমার সঙ্গে দেখা করতে?

—হ্যাঁ হুজুর, আর আমি এদিকে আপনাকে নিয়ে চেহেল্-সুতুনে চলে এসেছি। আমি হুজুর তখন তো জানি না যে বরকত আলি মরিয়ম বেগমকে নিয়ে সারাফত আলির দোকানে গেছে। সেখানে যাবার পরই তো সফিউল্লা সাহেব মরিয়ম বেগমকে মতিঝিলে নিয়ে গেছে—

কান্ত আকাশ থেকে পড়লো যেন সব শুনে।

বললে—এখন তা হলে কী হবে নজর মহম্মদ? মরিয়ম বেগমের কী হবে?

নজর মহম্মদ বললে—কাজীর কাছে কাছারিতে বিচার হবে!

—বিচার হয়ে যদি প্রমাণ হয় যে মরিয়ম বেগম সফিউল্লা খাঁ সাহেবকে খুন করেছে, তা হলে কী হবে?

—তাহলে ফাঁসিতে লট্‌কে দেবে, হুজুর।

—ফাঁসি হয়ে যাবে মরিয়ম বেগমের?

—তা তো হবেই হুজুর। কোতোয়াল সাহাব যে বড়া কড়া আদমী, ঔর কাজীসাহাব ভি বড়া কড়া সদরস্ সুদুর—

কথা বলতে বলতে দুজনেই চোরা-ফটকের কাছে এসে পড়েছিল। রাত গভীর। বাইরের আকাশে তারাগুলো ভালো করে দেখা যায় না কুয়াশার জন্যে। যে-গানটা সন্ধ্যে বেলা চেহেল্-সুতুনের ভেতর হচ্ছিল সেটা অনেক আগেই থেমে গেছে। বো হোনেকা থী উও তো হো গয়ী, আব্ উসকী ক্যা পরোয়া। কান্তর মনে হলো তবু যেন কিছু করার আছে। সে যেন মরালীর কিছু উপকার করতে পারে এখনো। সমস্ত বুকটা তার দুর-দুর করে কাঁপতে লাগলো। যদি সত্যিই মরালীর ফাঁসি হয়ে যায়! যদি কাজী সাহেব তার ফাঁসির হুকুম দিয়ে বসে! কিন্তু কেন

সে খুন করতে গেল সফিউল্লা সাহেবকে? মরালী কি জানে না যে সফিউল্লা খাঁ সাহেব নবাব মীর্জা মহম্মদের কত পেয়ারের দোস্ত্!

ফটকের কাছে পৌঁছে দিয়ে নজর মহম্মদ তখন চলে গেছে।

হঠাৎ পেছন ফিরে কান্ত চিৎকার করে ডাকলো—নজর মহম্মদ—

—কী হুজুর?

পেছনের অন্ধকার থেকে নজর মহম্মদ আবার এগিয়ে কাছে সরে এল। বললে—আস্তে আস্তে কথা বলুন হুজুর, আজ বড় কড়া পাহারা বসে গেছে শহরে—

কান্ত গলা নামিয়ে বললে—বলছি কি, তোমাদের কাজী সাহেব, তোমাদের সদরস্ সুদুরকে বলে-কয়ে মরিয়ম বেগমের ফাঁসিটা ঠেকানো যায় না?

—না হুজুর, ঠেকানো যায় না।

—কেন? যদি নবাবকে খুব করে পায়ে ধরি, তাহলে?

—না হুজুর, তাহলেও ঠেকানো যাবে না। তবে এক কাজ করলে ঠেকানো যায়—

—কী কাজ? বলো না নজর মহম্মদ, কী কাজ?

—আপনার টাকা আছে? কিছু টাকা খরচ করতে পারবেন?

—টাকা? কত টাকা?

—আশ্রফি! এক হাজার আশ্রফি!

কান্তর যেন একটু আশা হলো। বললে—এক হাজার আশ্রফি দিলে মরিয়ম বেগমসাহেবার ফাঁসি আটকানো যাবে?

—বিলকুল!

—সত্যি বলছো তুমি? এক হাজার আশ্রফি দিলে মরিয়ম বেগমসাহেবাকে ছেড়ে দেবে?

—আলবৎ ছেড়ে দেবে হুজুর, কেউ না ছাড়ে তো আমাকে বলবেন। আমার কাছে আসবেন আপনি এক-হাজার আশ্রফি নিয়ে, মহকুমে কাজার সদরস্ সুদুরের সঙ্গে আমি আপনার মুলাকাত করিয়ে দেবো। গুণে গুণে এক-হাজার আশ্রফির পয়জার মারবো তার মুখে আর সে 'তোবা' 'তোবা' বলে মরিয়ম বেগমকে ছেড়ে দেবে! তা হুজুর, মরিয়ম বেগমের জন্যে ঝুট-মুট্ কেন এতগুলো আশ্রফি খরচ করতে যাবেন? পেশমন বেগমকে কি আজ আপনার পসন্ হলো না? পেশমন বেগম কি আপনাকে সুখ দিলে না?

কান্তর গাটা রি-রি করে উঠলো।

বললে—ও কথা থাক, তুমি মরিয়ম বেগমের কথা বলো! মরিয়ম বেগমের জন্যে আমি সব করতে পারি। বলো, কী করলে একবার তার সঙ্গে দেখা করতে পারি!

—কোথায়? মতিঝিলে? মতিঝিলে গিয়ে মুলাকাত করবেন? তাহলেও ভি টাকা লাগবে আপনার। নেয়ামত খিদ্মদ্গারকে দিতে হবে, কোতোয়ালকে ভি দিতে হবে—

—কত লাগবে?

—পাঁচ মোহর!

—পাঁচ মোহরের কমে হয় না?

নজর মহম্মদ বললে—কী যে বলেন হুজুর, কোতোয়াল তো এক-মোহর দিলে বাত্ই বলবে না। নেয়ামত নেবে এক মোহর, আরো দুজন খিদ্মদ্গার আছে, তারা নেবে এক মোহর, তারপর ফটকের পাহারাদার আছে, তারাও ভি নেবে এক-

দু'মোহর। তা পাঁচ মোহর না দিতে পারেন, চার মোহর দেবেন,—আমার সঙ্গে কোতোয়ালের জান-পহচান আছে, আমি বলে-কয়ে বন্দবস্ত্ করে দেবো—

তারপর কান্তকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে বললে—আপনি কিছ্ছু ঘাবড়াবেন না হুজুর, মোহর দিলে দিল্লীর মসনদ ভি আপনার পায়ের তলায় এনে দিতে পারি, মরিয়ম বেগম তো দূর অস্ত্! আপনি কিছ্ছু ঘাবড়াবেন না, সারা রাত আপনার পরেশান হয়েছে, এখন আরামসে নিদ্ দিনগে যান—

বলে কান্তর পিঠ চাপড়ে দিয়ে নজর মহম্মদ আবার ফটকের ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেল। তখন বাইরের জগতে অন্ধকার প্যাতলা হয়ে আসছে। আর খানিক পরেই হয়তো চেহেল্-সুতুনের মসজিদের ওপর থেকে মৌলভী সাহেব আজান পড়তে শুরু করবে সুর করে করে। আর তারপর ইনসাফ্ মিঞা নহবতে টোড়ির আলাপ তুলবে উদারার নিখাদ থেকে।

কান্ত তাড়াতাড়ি চক্-বাজারের দিকে পা বাড়ালো।

পাটনার নায়েব-নাজিম রামনারায়ণকে আগের থেকে খবর পাঠানো হয়েছিল। শওকত জঙ্কে দু'দিক থেকে আক্রমণ করা হবে। রামনারায়ণ সেপাই নিয়ে ওদিক থেকে এগোবে। আর এদিকে রাজা মোহনলাল সেপাইদের নিয়ে গঙ্গা পেরিয়ে মালদহ জেলার সোমদহ, হিয়াৎপুর আর বসন্তপুর-গোলার দিকে এগিয়ে গিয়ে পূর্ণিয়ার ওপর গোলা ছুঁড়বে।

ছাব্বিশ বছরের নবাব শান্তি পেতে চেয়েছিল জীবনে। নানীবেগমের কাছে শান্তির জন্যে খোদাতালার দরবারে দোয়া চাইতে বলেছিল। কিন্তু শান্তি চাইবার আগে শান্তির যোগ্যতা অর্জন না করলে চলবে কেন? শান্তি আমি তোমাকে দেবো, কিন্তু শান্তির বোঝাই কি তুমি বইতে পারবে? শান্তির যন্ত্রণা কি অশান্তির যন্ত্রণার চেয়ে কিছু কম দুর্বিষহ মীর্জা মহম্মদ!

রাজা মোহনলাল বলেছিল—আপনি জাঁহাপনা এখানে থাকুন, আমি শওকত জঙ্ সাহেবের সঙ্গে ফয়সালা করে আসি—

নবাব মীর্জা মহম্মদ নিজের মনেই হাসলেন। মোহনলাল হয়তো ভালো মনে করেই কথাটা বলেছে। সে নবাবের মঙ্গলই চায়। নবাবকে বাঁচাতেই চায় সে। কিংবা হয়তো ভেবেছে নবাব ভাই-এর সঙ্গে যুদ্ধ করতে সংকোচ করবে! শওকতের গায়ে তরোয়াল ছোঁয়াতে দ্বিধা করবে।

একবার শুধু জিজ্ঞেস করলেন—জাফর আলি আছে?

মোহনলাল বললে—আছে জাঁহাপনা—

—ওর দিকে একটু লক্ষ্য রাখবে মোহনলাল। ওকে আমি বিশ্বাস করি না। আর কে কে আছে সঙ্গে?

—আর আছে দোস্ত্‌মহম্মদ খাঁ, মীরকাজেম খাঁ, আর আছে দিলীর খাঁ আর আসালৎ খাঁ—

—ওরা আবার কারা?

—ওরা হলো জাঁহাপনা, উমের খাঁর ছেলে।

নবাব মীর্জা মহম্মদ একটু আশ্বস্ত হলেন। শওকত জঙ্-এর দলে আছে

শ্যামসুন্দর, আর আছে লালুহাজারী। ওদের ওপর একটু নজর রাখবে ভালো করে।

রাজা মোহনলালকে কিছু বলতে হয় না। নবাবের মনের কথাটুকু যেন সে আগে থেকে জানতে পারে। সে কামান থেকে গোলা ছোঁড়বার হুকুম দিয়ে দিলে। গোলাগুলো গিয়ে নবাবগঞ্জ আর মনিহারীর মধ্যেখানের বিলের মধ্যে দুম-দাম করে পড়তে লাগলো।

রাত্রে যখন নবাব মীর্জা মহম্মদ শুতে গেলেন, তখনো গোলা-ছোঁড়ার শব্দ আসছিল কানে। কিন্তু বিছানায় শুয়ে শুয়েও ঘুম এল না। সমস্ত জীবনটার কথা মনে পড়তে লাগলো। কোথায় মসনদ পাবার পর এখন মতিঝিলে বিশ্রাম নেবার কথা, কিংবা চেহেল্-সুতুনের ঘরে পালকের বিছানায় শুয়ে বেগমসাহেবাদের গান শোনা—আর কোথায় এই পুর্ণিয়া! কোন্ অপ্রত্যাশিত কোণ্ থেকে এই আবার আর-এক অশান্তি এসে হাজির হয়েছে।

হঠাৎ মনে হলো কে যেন ঘরে ঢুকেছে।

—কে?

নবাব মীর্জা মহম্মদ উঠে বসলেন। আবার জিজ্ঞেস করলেন—কৌন্ হ্যায়?

—আমি মীরজাফর!

—এত রাত্রে তুমি? লড়াই-এর কী খবর?

—খবর ভালো নয়। এ লড়াই-এর খবর ভালো হতে পারে না।

—কেন? ও-কথা বলছো কেন?

—ভালো খবর কী করে তুমি আশা করো?

নবাব মীর্জা মহম্মদ যেন চমকে উঠলেন। তবু নিজের মনের ভাব নিজের মনেই চেপে রাখলেন।

বললেন—তুমি আছ, তবু কেন খারাপ খবর আশা করবো?

মীরজাফর আলি যেন একটু দ্বিধা করতে লাগলো। তারপর বললে—আমাকে কি তুমি আমার যথার্থ সম্মান দিয়েছো মীর্জা? আমাকে কি তুমি নিজের রিস্তাদার বলে বিচার করেছো যে ভালো খবর আশা করবে?

—তার মানে?

—তার মানে মানিকচাঁদকে তুমি আলীনগরের রাজা করে দিলে। অথচ আমি কি ফিরিঙ্গীদের কলকাতা থেকে তাড়িয়ে দিইনি? আবার এবার পুর্ণিয়ার লড়াইতেও তুমি হয়তো আর কাউকে আরো বড় চাকরি দিয়ে দেবে, তাহলে কেন আমি তোমার স্বার্থের জন্যে প্রাণ দিয়ে লড়াই করবো?

নবাব মীর্জা মহম্মদ রেগে উঠতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু হঠাৎ নিজেকে সামলে নিলেন।

বললেন—এই কথাই বলতে তুমি এখানে এসেছো লড়াই ছেড়ে?

—লড়াই ছেড়ে নয়, লড়াইতে হেরে। আমিই তোমাকে হারিয়ে দিয়েছি।

—আর শওকত জঙ্?

মীরজাফর আলি গম্ভীর গলায় বললে—শওকত জঙ্ জিতেছে, সে আসছে তোমার সঙ্গে মোলাকাত করতে।

—বলছো কী তুমি? তুমিই আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করলে?

মীরজাফর আলি বললে—তুমি কারো সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করোনি? তুমি রাজা রাজবল্লভকে তাড়িয়ে দাওনি? তুমি ঘসেটিকে চেহেল্-সুতুনের ফাটকে আটকে রাখোনি? তুমি হুসেন কুলী খাঁকে খুন করোনি? নিজে বিশ্বাসঘাতক

হয়ে আমাকে বিশ্বাসঘাতক বলতে তোমার লজ্জা করলো না?

নবাব মীর্জা মহম্মদ স্তম্ভিতের মত মীরজাফর আলির দিকে চেয়ে রইলেন। মীরজাফর আলি কি তাঁকে ভয় দেখাতে এসেছে নাকি?

—মোহনলাল কোথায় গেল?

—শওকত জঙ্ তাকে ধরে নিয়ে বন্দী করে রেখেছে।

—সে কী? দোস্তমহম্মদ খাঁ, মীরকাজেম খাঁ, দিলীর খাঁ, আসালৎ খাঁ, তারা কোথায়?

—তারা খুন হয়ে গেছে!

—তাহলে তুমি? তুমি এখনো চুপ করে আছ? আমি কি একটু বিশ্রাম করতেও পাবো না? তোমাদের দিয়ে কি আমার একটা উপকারও হবে না? তুমি আমার কাছে এসেছো এখন নিজের কাঁদুনি গাইতে?

মীরজাফর আলির মুখের ভেতর দাঁতে দাঁত চাপার শব্দ হলো।

বললে—না, আমি এসেছি তোমার কাছে জবাবদিহি চাইতে!

—কীসের জবাবদিহি?

—এই অন্যায় ব্যবহারের।

—আমার সেপাইরা কোথায়? আমার সিপাহ-শালার না হয় নেই. কিন্তু সেপাই-লস্কর-গোলন্দাজ, তারা কোথায়?

মীরজাফর যেন দাঁত বার করে হাসতে লাগলো। আজ মীর্জা মহম্মদের বিপদের দিনেই যেন মীরজাফর আলির হাসবার পালা। অন্য সময় হলে বুকে এক লাথি দিয়ে জাফর আলিকে ছুঁড়ে ফেলে দিতেন তিনি। কিন্তু এ-সময় আশে-পাশে যে কেউ নেই তাঁর।

—কই, জবাবদিহি দাও!

নবাব মীর্জা মহম্মদের যেন শ্বাসরোধ হয়ে এল। বললেন—জবাবদিহি চাইছো তুমি কার কাছে তা জানো?

—চাইছি নবাব আলীবর্দী খাঁ'র আদরের নাতির কাছে।

—খবরদার, জাফর আলি খাঁ!...

নবাবগঞ্জের জল-হাওয়ার বোধহয় কোনো যাদু আছে। যে মীর্জা মহম্মদ কখনো কোনদিন ঘুমিয়ে পড়ে না, তার যে কেমন করে এমন অকাতর ঘুম এসেছিল কে জানে! হঠাৎ বাইরে হৈ-হৈ শব্দে নবাব উঠে বসলেন। ছোট একটা শিবির। বাইরের বিল থেকে ব্যাং ডাকার শব্দ আসছিল। তাকে ছাপিয়ে আর একটা আওয়াজ কানে আসতেই তাঁর ঘুম ভেঙে গেছে।

কোথায়? মীরজাফর আলি খাঁ কোথায় গেল হঠাৎ?

খবর দিলে প্রথম রাজা মোহনলাল নিজে। রাজা মোহনলাল এত বড় সুখবরটা আর কারো মুখ দিয়ে শোনাতে চায়নি বলেই নিজে এসেছে।

—ভেবেছিলাম, আপনি ঘুমিয়ে পড়েছেন জাঁহাপনা।

নবাব বললেন—মীরজাফর আলি কোথায়? তাকে দেখছি না—

মোহনলাল বললে—মীরজাফর সাহেব আজকে জান দিয়ে লড়েছে জাঁহাপনা। শওকত জঙ্ খুন হয়ে গেছে, এই খবরটা দিতে এলাম—

পেছন-পেছন আরো অনেকে এল। একেবারে ভিড় করে দাঁড়ালো সবাই দোস্ত মহম্মদ, মীরকাজেম, দিলীর, আসালৎ। সবাই এসে নবাবের সামনে কুর্নিশ করে দাঁড়ালো।

—জাফর আলি সাহেব কোথায়? আসেনি?

মোহনলাল বললে—তাঁর হাতে চোট লেগেছে জাঁহাপনা, দাওয়াই লাগাতে গেছে হেকিমখানায়—

—চলো, আমি যাই জাফর আলি সাহেবকে দেখে আসি—

মীরজাফর আলির হাতে চোট লেগেছিল। সত্যিই জাফর সাহেব প্রাণ দিয়ে লড়েছে আজ। হেকিমখানার একটা খাটিয়ায় শুয়ে ছিল। মীর্জাকে দেখেই উঠে দাঁড়ালো। উঠে দাঁড়িয়ে কুর্নিশ করলে।

—আপনি আমার জন্যে যা করেছেন জাফর আলি সাহেব, আমি তা ভুলবো না—

বলে দুই হাতে জড়িয়ে ধরলেন নবাব মীরজাফর আলিকে। তখনো তার সারা গায়ে ঘাম ঝরছে। তখনো মীরজাফরের মুখে কোনো কথা নেই। হঠাৎ স্বপ্নটার কথা মনে পড়লো মীর্জা মহম্মদের।

নবাবগঞ্জের মাঠের ওপর তখন সেপাইরা ছুটে ছুটে পালাচ্ছে। এ-দৃশ্য আগেও অনেকবার দেখেছে মীর্জা। কলকাতার লড়াই-এর পর ঠিক এই রকমই ঘটেছিল। ঠিক তারই পুনরাবৃত্তি। বাঙলার ইতিহাসের সে এক সন্ধিক্ষণ। তবু সেদিন মীর্জার মনে হয়েছিল এ হয়তো ভালোই হলো। এ না হলে কি তিনি জানতে পারতেন, মীরজাফর আলি তাঁর কত আপন, কত আত্মীয়! এ না হলে কি তিনি জানতে পারতেন, যে-মসনদের ওপর তিনি বসে আছেন তা পাথরের না মাটির!

মীর্জা মহম্মদের চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে এল। এরা তার এত আপনার জন। অথচ এদেরই তিনি এত সন্দেহ করেছেন। এদেরই তিনি এত অপমান করেছেন। কিন্তু সম্মান বিলোন কি অত সহজ। তাঁর হাতে তো সম্মানের অফুরন্ত ভাঁড়ার নেই। ক'জনকে তিনি রাজা করবেন, ক'জনকে মহারাজা। অথচ তিনি নিজেই কি নবাব বলে নিজেকে ঘোষণা করতে পারেন!

সম্মান যারা নিতে জানে, সম্মান তারা দিতেও জানে। সম্মান দিলে তবে সম্মান নেবার অধিকার জন্মায়। তুমি আমাকে মনে মনে গালাগালি দিয়েছো তোমাকে মর্যাদা দিইনি বলে! কিন্তু আমাকে কে সম্মান দিয়েছে? আমাকে কে মর্যাদা দিয়েছে? আমি তো তোমাদের শত্রুতা আর ঘৃণার ওপর দাঁড়িয়ে তোমাদের কাছ থেকে নিজের সম্মান আদায় করে নিয়েছি। কই, আমি তো সেজন্যে তোমাদের কাউকে আঘাত দিইনি। কাউকে অপমানও করিনি। হোসেন কুলী খাঁকে আমি খুন করেছি স্বীকার করছি, কিন্তু সে তো আমাকে অপমান করেছে বলে নয়। সে তো হাজী-মহম্মদের বংশে কলঙ্ক দিয়েছিল বলে। কিন্তু তার আগে তো আমি নানীবেগমের মত চেয়ে নিয়েছি, নানা-নবাবের সমর্থন চেয়ে নিয়েছি। আর ঘসেটি? আমার শৈশব থেকে যে আমার শত্রুতা করেছে, যে আমার মৃত্যু কামনা করে আসছে, তাকেও আমাকে ক্ষমা করতে বলো? রাজা মানিকচাঁদের কথা বলছো তোমরা। কিন্তু রাজা মানিকচাঁদ কি বিপদের দিনে তোমাদের মত আমার পাশ থেকে কখনো সরে দাঁড়িয়েছে?

—আমি আজ আপনার ওপর খুব খুশী জাফর আলি খাঁ!

মীরজাফর আলি তখনো চুপ করে ছিল। একটু পরে বললে—আমি এখানে আসবার আগে নানীবেগমের কাছে প্রতিজ্ঞা করে এসেছিলাম—

—আপনি আপনার প্রতিজ্ঞা রেখেছেন দেখে আমি খুব খুশী জাফর আলি খাঁ।

—আমি আপনার বান্দা, নবাব!

মীরজাফর আলি কি মীর্জা মহম্মদকে না কাঁদিয়ে ছাড়বে না নাকি!

মীরজাফর আবার বললে—আমি প্রমাণ করতে চেয়েছিলাম যে, শওকত জঙ্‌কে লেখা চিঠি বলে যেটা আপনি দেখেছেন, সেটা জাল!

নবাব বললেন—এখন আমার বিশ্বাস হলো জাফর আলি, সত্যিই জাল—

রাত বোধ হয় তখন ভোর হয়ে আসছে। ওপারে নবাবগঞ্জ আর মনিহারী, আর এপারে বলডিয়াবাড়ি। মাঝখানে শুধু একটা বিল। ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে যেন রাত্রের সমস্ত কদর্যতা চোখের ওপর স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠলো।

—বেগমরা কোথায়?

রাজা মোহনলাল বললে—সবাইকে সৈয়দ আহম্মদ সাহেবের হাবেলিতে নজরবন্দী করে রেখেছি জাঁহাপনা—

নবাব বললেন—ওদের সম্পত্তি যা কিছু আছে, যারা মুর্শিদাবাদে যেতে চায়, সকলকে মুর্শিদাবাদে পাঠিয়ে দাও—কাউকে যেন কোনো অসম্মান করা না হয়, দেখো তুমি—

—আর শওকত জঙ্‌ সাহেব?

—তাকে কবর দেবে। সে তো এখন সম্মান-অসম্মানের বাইরে চলে গেছে!

নিজের শিবিরের কাছে এসে হাতীটা থামলো।

—জাঁহাপনা, রাজা মানিকচাঁদের চিঠি নিয়ে এসেছে আলিনগরের উজীরের লোক।

—কীসের চিঠি?

সেই হাতীর পিঠে বসেই চিঠিটা হাতে নিলেন নবাব। জরুরী চিঠি। তাড়াতাড়ি লেফাফা খুলে পড়তে লাগলেন—

রাজা মানিকচাঁদ লিখেছে—

...ফিরিঙ্গীরা দল-বল লইয়া ফিরিয়া আসিয়া আমাদিগের বজবজের কেল্লা অধিকার করিয়া ফেলিয়াছে। আরো দুঃসংবাদ এই যে, বজবজ কেল্লা অধিকার করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই। তাহাদের আক্রমণে আমাদের সৈন্যদল টানা দুর্গমধ্যে চল্লিশটি কামান ফেলিয়া রাখিয়া পলায়ন করিয়াছিল, সে দুর্গও ফিরিঙ্গীরা ১লা জানুয়ারী তারিখে অধিকার করিয়া ফেলিয়াছে। ২রা জানুয়ারী তারিখে রবার্ট ক্লাইভ সাহেব সহসা কলিকাতা-দুর্গ অতর্কিতে আক্রমণ করাতে আমি সৈন্যদল সমেত কলিকাতা-দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিয়াছি। ইহার পর কী ঘটিয়াছে জানি না। শুনিয়াছি তাহারা হুগলী-দুর্গ আক্রমণ করিয়াছে। দুর্গ ও ফৌজদারী সম্পত্তি এবং হুগলী নগর লুণ্ঠন করিয়া তাহারা সরকারি গোলাবাড়ি আদি আক্রমণ করিতেছে। আমি আজই মুর্শিদাবাদ যাত্রা করিতেছি, সাক্ষাতে সমুদয় সংবাদ বলিব।—ভবদীয় বশংবদ—

রাজা মোহনলাল পাশেই দাঁড়িয়েছিল। নবাব তারই হাতে চিঠিটা দিলেন। তারপর হুকুম দিলেন—সোজা মুর্শিদাবাদ চলো, মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতা, তারপর দরকার হলে কলকাতা থেকে সোজা হুগলী!

সে হুকুম শুনলো মোহনলাল। শুনলো মীরজাফর আলি খাঁ, শুনলো দোস্ত মহম্মদ খাঁ, মীরকাজেম খাঁ, দিলীর খাঁ, আসালৎ খাঁ, সবাই।

আর ইতিহাস সেই মুহূর্তে আবার আর এক দিকে মোড় ঘুরলো।

তখন বেশ ভোর হয়েছে। চক্-বাজারের রাস্তায় তখন কান্তর পা দুটো যেন আর চলতে চাইছে না। কোথায় কার কাছে যে সান্ত্বনা চাইবে, কার কাছে যে পরামর্শ

চাইবে, তারও যেন কোনো হদিস নেই। ছোটবেলা থেকে একলাই সে বড় হয়েছে, একলাই নিজের অন্ন-সংস্থান করে নিয়েছে, তবু কখনো তার যেন নিজেকে এত নিঃসঙ্গ নিঃসহায় মনে হয়নি।

আকাশের দিকে একবার চোখ তুলে চাইলো কান্ত।

যার কেউ নেই, তার হয়তো এই আকাশ আছে, এই সসাগরা পৃথিবী আছে, অন্তত এই নিঃসঙ্গ নির্জীব রাত্রিটা আছে। হে অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের দেবতা, হে অনন্ত-অনাদি-অদৃষ্ট সৃষ্টিকর্তা, তোমার কাছে কোনোদিন কিছু অঞ্জলি পেতে আমি চাইনি। তোমার কাছে নিজের জন্যে কোনোদিন কিছু প্রার্থনা করবার প্রয়োজন আমার হয়নি। কিন্তু আজ চাইছি। আজ আমাকে তুমি ভিক্ষা দাও। আজ তুমি এমন কিছু আমাকে দাও যা দিয়ে আমি আর একজনের শৃঙ্খল মোচন করতে পারি। সে কিছু অপরাধ করেনি। আমি শপথ করে বলতে পারি, তার কোনো অপরাধ নেই। সে নিষ্পাপ। সে আর একজনের ক্ষতি নিবারণ করবার জন্যে নিজে এই পাপ মাথায় তুলে নিয়েছে। আর আমি তার এই পাপের সাহায্য করেছি, তাকে এখানে এনে এই চেহেল্-সতুনে তুলে দিয়ে। আমারই সব পাপ ভগবান, আমারই সব অপরাধ। আমিই দোষী, আমিই অপরাধী! তুমি তার ওপর প্রসন্ন হও ঈশ্বর! তোমার প্রসন্নতা আমার চিরন্তন অন্তরের সম্পদ হয়ে আমার অনন্তজীবনের সম্বল হোক!

—কে?

হঠাৎ রাস্তায় চলতে চলতে পায়ে একটা ধাক্কা লাগতেই কান্ত চমকে উঠেছে —কে!

এমন শীতের রাত্রে এ-রকম করে যে রাস্তায় মানুষ শুয়ে থাকবে তা যেন ভাবতেই পারা যায় না। অন্যমনস্ক অবস্থায় চলতে গিয়ে লোকটার পায়ে ধাক্কা লেগে গিয়েছে।

—কে তুমি?

মাথা নিচু করে দেখতে গিয়ে কেমন সন্দেহ হলো। ঠিক যেন চেনা-চেনা চেহারা।

—উদ্ধব দাস!

তাড়াতাড়ি ভালো করে মুখটা দেখেই আবার মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে। মদের গন্ধে যেন কান্তর বমি এসে গেল। আশ্চর্য, লোকটা মদ খেয়ে রাস্তার ওপরেই শুয়ে পড়ে আছে। খেয়ালও নেই কিছু। যদি পালকী-বেহারারা যেতে গিয়ে পায়ে হোঁচট লাগে। যদি নবাবের হাতির দল চলতে চলতে লোকটাকে চাপা দিয়ে পিষে দেয়।

লোকটাকে দুহাতে ধরে রাস্তার একধারে শুইয়ে দিলে কান্ত। তবু লোকটার সাড় নেই। তার পর আবার চক্-বাজারের পথ ধরে চলতে লাগলো।

তারপর সারাফত আলির দোকানের কাছে এসে পেছন দিকে গিয়ে ডাকলে—বাদ্শা, ও বাদ্শা—

বাদ্শা তখনো ওঠেনি। বাদ্শা দেরি করে ওঠে ঘুম থেকে। সারাফত আলি ওঠে আরো দেরি করে।

—বাদ্শা, ও বাদ্শা, আমি কান্তবাবু—

অনেকবার ডাকতে তবে বাদ্শার ঘুম ভাঙলো। ঘুমচোখে দরজা খুলে দিয়ে বললে—এত দেরি হলো বাবুজী? আপনাকে যে একজন তালাস করতে এসেছিল—

—কে? কে তালাস করতে এসেছিল?

—একটা তাঞ্জামে করে সফিউল্লা খাঁ সাহেব এসেছিল চেহেল্-স্তুন থেকে।

—তুমি কী বললে?

বাদ্শার তখন ঘুমের ঘোর কেটে গেছে। বললে—আসলে সফিউল্লা খাঁ সাহেব নয় বাবুজী, মরিয়ম বেগম!

—তারপর?

—তারপর আস্লি সফিউল্লা খাঁ সাহেব মরিয়ম বেগমকে ধরে নিয়ে গেল হুজুর মতিঝিলে।

—তারপর সেখানে গিয়ে কী হয়েছে, তার কিছু শুনেছো?

—না বাবুজী, আর কিছু শুনিনি!

ভালোই হয়েছে। সফিউল্লা সাহেবের খুন হয়ে যাওয়ার খবরটা এখনো শোনেনি তাহলে বাদ্শা। না-শুনেছে ভালোই হয়েছে। বাদ্শা আবার ঘুমোতে গেল। কান্তও নিজের ঘরের ভেতর ঢুকলো। ছি, ছি, মাতাল লোকটাকে কিনা উদ্ধব দাস বলে ভুল করেছিল সে। উদ্ধব দাস কেন মদ খেতে যাবে আর মদ খেয়ে ও-রকম রাস্তাতেই বা শুয়ে থাকবে কেন?

শুতে গিয়েও কান্ত কিন্তু শুতে পারলো না। পাশেই সারাফত আলির ঘর। সেই একখানা ঘরেই সারাফত আলি ঘুমোয়, বসে, যা কিছু করে। একটা মাত্র দেয়ালের ফারাক। ভাবনাটা আসতেই সমস্ত ঘুম মাথায় উঠে গেল কান্তর। সারাফত আলির তো অনেক টাকা। অনেক মোহর, অনেক আশ্রফি! চাইলে এক হাজার আশ্রফি দেয় না! কিন্তু যদি না দেয়! সারাফত আলির সমস্ত টাকাকড়ি যা-কিছু একটা সিন্দুকের ভেতর থাকে। আধখানা মাটিতে পোঁতা। অত টাকা মিঞাসাহেবের কী হবে! যদি কান্ত মোহরগুলো সিন্দুক ভেঙে নিয়ে নেয়। বুড়ো জানতে পারবে? বুড়ো সন্দেহ করবে? কিন্তু সারাফত আলি সন্দেহ করলেই বা, জানতে পারলেই বা। মরালী তো ছাড়া পাবে! মরালীকে তো ছেড়ে দেবে সদরস্-সুদুর। বুড়োর টাকা খাবার তো কেউ নেই। তবু টাকাটা সদ্ব্যয় হবে। এক হাজার আশ্রফি নিলে বুড়োর আর কীসের ক্ষতি!

ভাবতে ভাবতে ভোর হয়ে এল। সারাফত আলির নাক ডাকা তখন থেমে গিয়েছে। এইবার বোধহয় উঠবে মিঞাসাহেব। দিনের বেলা সিন্দুকটা ভালো করে দেখে নেবে কান্ত, তারপর সন্ধ্যেবেলা যখন আগরবাতি জ্বেলে দিয়ে বুড়ো আফিং খেয়ে তামাক টানতে শুরু করবে তখন নেশার ঝোঁকে কিছুই বুঝতে পারবে না মিঞাসাহেব। নেশার মৌতাতে তখন মশগুল হয়ে থাকবে। তখনই সিন্দুক ভাঙা ভালো।

কথাটা ভেবে যেন নিশ্চিন্ত হলো কান্ত। একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লো।

হুগলী তখন পুড়ছে। রবার্ট ক্লাইভ-এর এ-ক'দিন ঘুম ছিল না। সেন্ট ফোর্ট ডেভিডের কম্যান্ডার বেঙ্গলে এসেছিল ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানীর অপমানের প্রতিশোধ নিতে। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রতিশোধ বড় কঠিন প্রতিশোধ। এক-একটা ফোর্ট দখল করেছে আর্মি আর প্রতিশোধের নেশা যেন বেড়ে গেছে রবার্ট ক্লাইভের।

এমন করে ভাগ্য উল্‌টে যাবে নিজামতি-ফৌজের এ যেন রাজা মানিকচাঁদ ভাবতেই পারেনি। নবাব মীর্জা মহম্মদও।

কিন্তু রাজা মানিকচাঁদ তো জানতো না কাকে বলে অপমান। অপমান যে নিজে না পেয়েছে, সে অপমানের প্রতিশোধ নিতেও জানে না। রাজা মানিকচাঁদ জানতো না অপমান শুধু ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীরই নয়, অপমান কর্নেল ক্লাইভের নিজেরও। নবাবের ফৌজকে হারিয়ে ক্লাইভ যেন নিজেরই অপমানের প্রতিশোধ নিচ্ছে। তোমরা আমাকে রেসপেক্ট দাওনি, তোমরা আমাকে দেশ-ছাড়া করেছো, তোমরা আমাকে কিক্ করে তাড়িয়ে দিয়েছো এখানে। আমি তাই এসেছি তোমাদের অপমানের প্রতিশোধ নেবো বলে। এই তোমরা, যারা আমার স্বজাত, যারা আমার স্বধর্মী! তোমরা দূর থেকে দেখ কাকে তোমরা মাতৃভূমি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছো, সে একটার পর একটা লড়াইতে জিতে তোমাদের মুখে কালি লেপে দিচ্ছে।

হরিচরণ বড় মুশকিলে পড়েছিল। কোথায় কোম্পানীর চাকরি নিয়ে পল্টনের দলে কাজ করবে—না, এই এদের নিয়ে হুগলীতে এসে উঠেছিল।

বজরার মধ্যে দুজন চুপ করে বসে ছিল।

হরিচরণ বাইরে থেকে ডাকলে—দিদি—

—কে? হরিচরণ? এসো—

হরিচরণ আসতেই দুর্গা জিজ্ঞেস করলে—কী বাবা, কিছু হদিস পেলে?

হরিচরণ বললে—বড় যে ভয় করছে দিদি, কেউ বলছে নবাব আলিগড়ের দিকে আসছে, কেউ বলছে পূর্ণিয়ার দিকে গেছে। কিছু তো টের পাচ্ছিনে। বুঝতে পাচ্ছিনে কী করবো!

দুর্গা বললে—তাহলে এক কাজ করো না বাবা, আমাদের হাতিয়াগড়ের দিকে পৌঁছিয়ে দাও না, ঘরের লোক ঘরে ফিরে যাই, বাবা বিশ্বনাথ আমাদের মাথায় থাকুন—

—তবে তাই চলি।

শ্রীনাথ বৈঠা ধরে ছিল। হরিচরণ শ্রীনাথকে গিয়ে সেই কথাই বললে। বজরা আবার হাতিয়াগড়ের দিকেই ফিরে চললো। শ্রীনাথের সব রাস্তাই চেনা। ছোট-মশাইকে নিয়ে বহুদিন এই বজরার বৈঠা বেয়েছে। সকাল বেলা বজরার জানালাটা দিয়ে সূর্য উঠতে দেখা যায়, আবার সন্ধ্যাবেলা এ-পাশের জানালাটা দিয়ে সেই সূর্যটাকেই আবার ডুবতে দেখা যায়।

ছোট বউরানী বলে—আর কতদিন এই রকম কাটবে রে দুগ্যা?

দুর্গা বলে—পাঁজি-পুঁথি দেখে না বেরুলে এই হয় গো, তোমার বড় বউ-রানীর যা মেজাজ, হুকুম করলে তো আর কারু 'না' বলবার সাধ্যি নেই—

হঠাৎ আবার হরিচরণের মতিগতি বদলে যায়। বলে—না দিদি, আর হাতিয়া-গড়ের দিকে যাওয়া হবে না—

দুর্গা জিজ্ঞেস করে—কেন?

—শুনলাম ওলন্দাজরা ওদিকে নৌকোর ওপর কামান সাজিয়ে বসে আছে, নদীতে নৌকো দেখলেই গোলা ছুঁড়বে—

দুর্গা বললে—তা হলে কী করবে হরিচরণ?

হরিচরণ বললে—কী করবো এখন তাই বলো? অন্য কোথাও যাবে তো চলো—

দুর্গা বললে—তাহলে কেষ্টনগরে নিয়ে যেতে পারো?

—তা কেষ্টনগরেই যাচ্ছি! বলে হরিচরণ শ্রীনাথকে নৌকোর মুখ ঘোরাতে বললে।

ছোট বউরানী বললে—দুগ্যা, তুই উচাটন করতে পারিসনে? এত লম্বা-চওড়া কথা বলিস, ওদের উচাটন করে দে না—

—কাকে?

—কেন, নবাবকে!

দুর্গা বললে—শেষ পর্যন্ত তাই-ই করতে হবে দেখছি। কিন্তু বজরায় বসে তো আর উচাটন হয় না। ঘোড়ার খুরেই বা কোথায় পাবো আর পারা-ভস্মই বা কোথায় পাবো? একবার ড্যাঙায় না-নামলে তো আর তা হচ্ছে না।

বউরানী বললে—এই ফিরিঙ্গী-সাহেবটা খুব ভালোমানুষ, না দুগ্যা? আমি তো ভয় পেয়েছিলাম প্রথমে, কিন্তু ম্লেচ্ছ হোক আর যাই হোক বাপু, বড় মিষ্টি কথা ফিরিঙ্গীটার—

দুর্গা বললে—আমি তো তাই গড় হয়ে পেন্নাম করে এলাম আসবার সময়—

হরিচরণ আবার সেদিন বাইরে এসে ডাকলে—দিদি—

—কী হরিচরণ?

হরিচরণ ভেতরে এসে বললে—কেষ্টনগরের দিকে যাওয়া যাবে না দিদি। চূর্ণি নদীর মোহানায় ফরাসীরা নৌকোর মহড়া দিচ্ছে—নদীর দিকে কামান সাজিয়ে বসে আছে গোরা পল্টনরা।

—কেন?

—ইংরেজ ফিরিঙ্গীদের সঙ্গে যে ফরাসী-ফিরিঙ্গীদের লড়াই বেধেছে গো।

দুর্গা বললে—তা বাছা, সবাই কি লড়াই করে করেই মরবে! ফিরিঙ্গীরা নিজেদের মধ্যে লড়াই করছে, নবাবের সঙ্গেও লড়াই করছে, হলোটা কী? আমরা সাত-জন্মে তো এত লড়াই দেখিনি কখনো। আমাদের সময় বর্গীরা আসতো, আবার লুঠ-পাট করে চলে যেত, এমন নাগাড়ে লড়াই চলতো না তো তখন! তা তুমি বাপু কাছাকাছি কোথাও নিয়ে চলো, বজরার দুলুনি আর সহ্য হচ্ছে না আমার মেয়ের—যেখানে পারো আমাদের নামিয়ে দাও, ড্যাঙায় পা রেখে বাঁচি—

শেষকালে একদিন হরিচরণ বললে—চলো দিদি, এবার একটা ভালো জায়গা পেইছি—

—কোথায় গো? কোথায় ভালো জায়গা? নাম কী জায়গার?

—হুগলী!

—হুগলী? এখানে আবার ভালো জায়গা কোথায় আছে? তোমার জ্ঞাতি-গুষ্ঠি কেউ আছে নাকি?

হরিচরণ বললে—না, জ্ঞাতি-গুষ্ঠি আমি কোথায় পাবো দিদি? এখানে একজন সজ্জন সাহেব আছে দিদি, বড় ভালোমানুষ। কাশিমবাজার কুঠির ডাক্তার সাহেব এখানে এই চুঁচুড়োয় পালিয়ে এসে আছেন। নবাবের ভয়ে এখানে রয়েছেন। আমার চেনা সাহেব দিদি। তোমাদের কোনো ভয় নেই। আমাকে দেখে সাহেব বললেন—তুই আমার এখানে ওঁদের নিয়ে আয় হরিচরণ, আলাদা বাড়ি পড়ে রয়েছে, ওঁদের কোনো অসুবিধে হবে না—, আমি তোমাদের বিপদের কথা সাহেবকে বললুম কি না—

দুর্গা বললে—ওমা, জানাশুনো নেই কিছু না, ওমনি তার বাড়িতে গিয়ে উঠবো?

—তার বাড়িতে তো উঠছো না তোমরা, তার আলাদা একটা বাড়ি খালি পড়ে আছে, সেখানে গিয়ে উঠবে! তারপর তোমাদের সেখানে নামিয়ে দিয়ে আমি হাতিয়াগড়ে গিয়ে খবর দিয়ে আসবো, তখন চলে যেও, দুটো তো মাস্তোর দিন! থাকতে পারবে না তোমরা? আর এ তো নবাবের এলাকাও নয়, ওলন্দাজদের জমিদারির মধ্যে পড়লো চুঁচুড়ো, ভয়টা কী তোমাদের?

তা অগত্যা তাই-ই সাব্যস্ত হলো। সার্জন ডাক্তার উইলিয়ম ফোর্থ্। বেশ পাকা দেয়াল বাড়িটার। কিন্তু খড়ের চাল। চারদিকে বাগান। বাগানে বেশ বড় বড় গাছ। ফোর্থ্ সাহেব কোম্পানীর ডাক্তার হয়ে এসেছিলেন। কাশিমবাজার কুঠি ভেঙে দেবার পর এই চুঁচুড়োর ডাচদের এলাকায় এসে লুকিয়ে আছেন। হরিচরণকে চুঁচুড়োর ঘাটে দেখে সাহেব জিজ্ঞেস করেছিলেন—তুমি হরিচরণ? এখানে কেন? বোটের ভেতর কে?

হরিচরণ বলেছিল—আজ্ঞে, আমাকে কর্নেল ক্লাইভ দুজন মেয়েমানুষকে নিরাপদ জায়গায় পৌঁছিয়ে দিতে হুকুম দিয়েছেন—

—কোন মেয়েমানুষ? কাদের লোক? ইউরোপীয়ান? ইংলিশ লেডী?

—না হুজুর, হিন্দুর মেয়ে। নবাবের ফৌজের ভয়ে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছি ওঁদের নিয়ে। হাতিয়াগড়ে যাবার উপায়ও নেই, কেষ্টনগরে যাবারও উপায় নেই, ক'দিন ধরে জলে-জলে ঘুরে বেড়াচ্ছি, খাওয়া-দাওয়া মাথায় উঠেছে, উপোস করছি সবাই মিলে।

বেশ ফাঁকা বাড়িটা। বাইরে থেকে দেখা যায় না। মেয়েদের ভেতরে উঠিয়ে দিয়ে তাদের রান্না-খাওয়ার বন্দোবস্ত করে দিয়ে হরিচরণ সাহেবের ঘরে এল।

সাহেব জিজ্ঞেস করলে—ওদের কোনো অসুবিধে হচ্ছে না তো?

হরিচরণ বললে—বাজারে কোনো জিনিসই পাওয়া যাচ্ছে না, ফিরিঙ্গীদের কেউ জিনিসপত্তোর বেচতে চাইছে না, সবাই পালিয়ে যাচ্ছে। বলছে, রাজা মানিকচাঁদ নাকি হুকুম দিয়ে গেছে ফিরিঙ্গীদের কেউ চাল ডাল বেচবে না। আমি হিন্দু বলে কিছু কিনে এনেছি, কিন্তু পরে কী হবে?

সাহেব বললে—পরে সব পাবে।

—কী করে পাবো? না পেলে ওঁরা খাবেন কী? আমি তো হুজুর হাতিয়াগড়ে ওঁদের আত্মীয়স্বজনদের খবর দিতে যাবো, তখন কে দেখবে ওঁদের?

সাহেব বললে—তা তুমি যাও, আমি ওদের সব দেখা-শোনার বন্দোবস্ত করবো—তোমার কোনো ভাবনা নেই ওঁদের জন্যে—

হরিচরণ সেই রাত্রেই হাতিয়াগড় যাবার জন্যে বন্দোবস্ত করছে, এমন সময় দুম-দাম করে কামানের গোলা পড়তে লাগলো হুগলী ফোর্টের ওপর। একটার পর একটা। সে আর থামে না। হরিচরণ বাইরে এসে দেখে অবাক কাণ্ড। ওলন্দাজ-দের ওপর কারা গোলা ছুঁড়ছে! দূর থেকে আগুন দেখা গেল। চুঁচুড়োর ঘাট থেকে সোজা দেখা যায় হুগলীর কেল্লাটা। হুড়মুড় করে দৌড়তে দৌড়তে লোকগুলো ছুটে আসতে লাগলো চুঁচুড়োর দিকে।

দুর্গা বললে—এ আবার কোথায় নিয়ে এলে আমাদের হরিচরণ, যেদিকে যাই সেদিকেই যে নবাবের সেপাই, যাই কোথায় আমরা?

জাহাজ থেকে গোরা-পল্টনরা নেমে একেবারে বাড়িঘর সব জায়গায় আগুন লাগিয়ে দিলে। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলতে লাগলো হুগলী শহরে। একটা আগুনের ফুল্কি চুঁচুড়োতে এসে পড়লেই এখানকার বাড়ি-ঘরও পুড়তে শুরু

করবে। দোকান-পাট-কেল্লা-শহর-ফৌজদারের দপ্তর সব পুড়ে তখন ছাই হয়ে যাবার জোগাড়। ছোট বউরানীর সারা রাত ঘুম নেই। দুর্গা কেবল হরিচরণকে ডাকে। বলে—তুমি বাপু একলা আমাদের ফেলে রেখে কোথাও যেও না—এ আমাদের কী বিপদে ফেললে বল দিকিনি তুমি? কোথায় তোমার সাহেব? সাহেবকে ডাকো দিকিনি একবার আমার কাছে, আমি কথা শুনিয়ে দিচ্ছি—ডাকো—আমি এখন মেয়েকে নিয়ে কী করি? ভালো জ্বালা হলো দেখছি তোমার কথায় বিশ্বাস করে—

সাহেব এল না, কিন্তু এল আর একজন সাহেব। রবার্ট ক্লাইভ!

—এ কি হরিচরণ, তোমরা এখানে?

—স্যার, এই ডাক্তার সাহেব আমাদের এখানে রেখেছেন।

ক্লাইভ বললে—তা তো শুনলাম, কিন্তু ওদের বাড়ি পৌঁছে দিতে পারলে না?

হরিচরণ বললে—যাবো কোথা দিয়ে? চারদিকে রাজা মানিকচাঁদ কামান সাজিয়ে রেখেছে যে। আলিগড়ের দিকে গিয়েছিলাম, সেখান থেকে কামানের শব্দ এল, টানার দিকে গিয়েছিলাম, শুনলাম রাজা মানিকচাঁদ ওত পেতে আছে ওখানে। হাতিয়াগড়ের দিকে যাবার চেষ্টা করলাম সে পথও বন্ধ। কেষ্টনগরের দিকে যাচ্ছিলাম ওদের রাখতে, সেদিকেও শুনলাম চূর্ণি নদীর মোহানায় কামান সাজানো। হাঁটাপথে যাওয়ার চেষ্টা করিনি হুজুর, তাতে মেয়েছেলে নিয়ে আরো বিপদ—

—তা এখন কী করবে ওদের নিয়ে? কলকাতায় যাবে? কলকাতার কেল্লা তো আমরা নিয়ে নিয়েছি।

হরিচরণ বললে—ওদের জিজ্ঞেস করে দেখি তাহলে!

ততক্ষণে হুগলীর ওদিকের আকাশটা ধোঁয়ায় ধোঁয়া হয়ে গেছে। রাজা মানিকচাঁদের সেপাইরা দলে ছিল দু'হাজার জন। তারা তখন কেল্লা ফেলে পালাচ্ছে। ক্লাইভ তাদের পেছনে গোরা-পল্টনদের লেলিয়ে দিয়ে ফোর্থ্ সাহেবের কাছে চলে এসেছিল। সেখানে এসেই এদের খবরটা শুনতে পেয়েছে।

ফোর্থ্ সাহেব জিজ্ঞেস করেছিল—হু আর দোজ্ লেডীজ? তুমি চেনো নাকি ওদের?

ক্লাইভ সে কথার উত্তর না দিয়ে সোজা এখানে চলে এসেছিল। শেষকালে এত জায়গা থাকতে ওদের এখানে নিয়ে এসেছে হরিচরণ!

বজবজ জয় হয়েছে, টানা জয় হয়েছে, মেটিয়াবুরুজ জয় হয়েছে, কলকাতা জয় হয়েছে, শেষকালে এই হুগলী ফোর্ট! এখনো তার জয়ের অনেক বাকি আছে যে। কোম্পানীর ইন্‌সাল্টের প্রতিশোধ নিতে হবে যে! লেফটেনাণ্ট কর্নেল ক্লাইভকে ইংলণ্ড যে অপমান করেছে, তারও যে প্রতিশোধ নিতে হবে! তার নিজের ওপরেও যে প্রতিশোধ নিতে হবে কর্নেল ক্লাইভকে। যে পৃথিবী সম্মান দেয় অন্যায়কে, যে পৃথিবী শ্রদ্ধা করে ডিস-অনেস্টিকে, যে পৃথিবী মিথ্যেকে মর্যাদা দেয়, সে পৃথিবীর ওপরেও যে প্রতিশোধ নিতে হবে! যে বাপ-মা তাকে সংসারে নিয়ে এসে তাচ্ছিল্য আর অবহেলা দিয়ে তার অভ্যর্থনা করেছে, তাদের ওপর প্রতিশোধ নেওয়াও যে বাকি আছে এখনো। ওরা ভাবে, ওই অ্যাডমিরাল ওয়াটসন,

ক্যাপ্টেন কুট, মেজর কিলপ্যাট্রিক, গভর্নর হল্‌ওয়েল, ড্রেক, সবাই ভাবে ক্লাইভ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চাকরি করে বলেই বুঝি এত প্রাণ দিয়ে লড়ছে। চাকরি না করলেও যে লড়তো এটা তারা জানে না। তারা এ কথা কল্পনাও করতে পারে না। তারা জানে না ইংলণ্ডকে আর ক্লাইভ তার বার্থপ্লেস বলে মনে করে না। এই ইণ্ডিয়াই তার দেশ, এই বেঙ্গলই তার মাতৃভূমি। এখানকার লোকদের সে নিজের লোক বলে মনে করে ফেলেছে।

তা ক'দিন আর লাগলো হুগলী জয় করতে। ১০ই জানুয়ারী থেকে ১৯শে জানুয়ারী। ন'দিন। ন'দিনেই হুগলী শহর পুড়ে ছারখার হয়ে গেল। হুগলী থেকে ব্যাণ্ডেল পর্যন্ত একখানা বাড়ি একখানা খামারও আস্ত রইলো না।

সেদিন ক্লাইভ জাহাজ নিয়ে আবার কলকাতার কেল্লায় ফিরে এল, দু'জন লেডীকে সঙ্গে দেখে সেদিন সবাই অবাক হয়ে গেছে।

হল্‌ওয়েল, ড্রেক, ওয়াটসন সবাই তাজ্জব হয়ে গেছে দেখে। রবার্ট কি নেটিভ মেয়ের সঙ্গে লাভে পড়লো নাকি! স্ট্রেঞ্জ!

ওয়াটসন জিজ্ঞেস করলে—তুমি কি ওই নেটিভ গার্লদের ফোর্টের মধ্যে রাখবে নাকি?

ক্লাইভ বললে—যদি রাখি সে আমার খুশী, তোমার অর্ডার মানবো এমন লোক পাওনি আমাকে।

—জানো, এখানে ইংলিশ লেডীরা রয়েছে, এর ভেতরে তোমার নেটিভ মিসট্রেসদের রাখতে দেবো না, দ্যাটস্‌ মাই কমাণ্ড—

ক্লাইভের রক্ত গরম হয়ে উঠেছিল। একটা ঘুষি উঁচিয়ে ওয়াটসনের মুখের ওপর মারতে যাচ্ছিল—স্টপ দ্যাট্‌ ননসেন্স্‌, আর একবার ওই কথা উচ্চারণ করলে আমি তোমার মুখ ভেঙে ক্রাশ্‌ করে দেবো!

—ওরা তোমার মিস্‌ট্রেস নয় বলতে চাও?

ক্লাইভের আর সহ্য হলো না। তার হাতের ঘুঁষিটা গিয়ে সোজা ওয়াটসনের মুখের ওপর ফেটে চৌচির হয়ে গেল।

আর সঙ্গে সঙ্গে ওদিক থেকে দৌড়ে এসেছে ড্রেক। দু'জনকে দু'হাতে ঠেকিয়ে দিয়েছে।

ক্লাইভ বললে—আমি কি চাকরির ভয় করি মনে করেছে ওয়াটসন? আমি কি নিজের সেফ্‌টির কেয়ার করি মনে করেছে ও? দি কাওয়ার্ড, দি ব্যাস্টার্ড, দি—

খবর পেয়ে কেল্লার ভেতরের আরো সবাই এসে পড়েছে সেখানে। ফোর্টের ভেতরে নবাব একটা মসজিদ তৈরি করিয়েছিল, সেটা তখন ভাঙা হচ্ছিল। আলিনগর নাম বদলে আবার ক্যালকাটা নাম লেখা হচ্ছিল চারদিকে। ভেতরে সেপাই পল্টন, রাজমিস্ত্রীদের ভিড়, পল্টনরা সব কেল্লা সব শহর লুঠপাট করে যা-কিছু এনেছে তাই নিয়ে হইচই শুরু করে দিয়েছে। রাজমিস্ত্রীরা ভাঙা কেল্লা আবার সারিয়ে তুলছে। তার মধ্যে হঠাৎ কর্নেল আর অ্যাড্‌মিরালের ঝগড়া কথা-কাটাকাটি শুনে দৌড়ে কাছে এসেছে।

—অলরাইট্‌, আমি এখানে থাকবো না, আমি বরানগরে গিয়ে থাকবো।

ড্রেক অনেক বোঝাতে লাগলো—কর্নেল, আপনি ইংরেজদের এই বিপদের সময় রাগ করলে চলবে কী করে? যখন এনিমি দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে, তখন আপনি কেন নন্‌-কোঅপারেট করছেন?

ক্লাইভ বললে—তা আমি ইংলিশ আর্মির কম্যাণ্ডার, না ওয়াটসন? কে?

ড্রেক বললে—ফোর্টের মধ্যে আমিই হচ্ছি গভর্নর, আমার কথা তো আপনার দু'জনেই শুনবেন! তারপর কাউন্সিলের সিলেক্ট কমিটি যা ঠিক করে তাই-ই হবে—

—তবে তাই-ই হোক, আমি কিন্তু এখানে থাকবো না। আমি বরানগরের ক্যাম্পে গিয়ে উঠছি, আমি সেখানে নেটিভদের সঙ্গে মোর কম্ফোর্টেবলি থাকতে পারবো—আই হেট্ ইউ পিপল অল—

দুর্গা, ছোট বউরানী, হরিচরণ সবাই ব্যাপারটা দেখেছিল। শুধু তাদের জন্যেই সাহেবকে এত অপমান সইতে হলো। বরানগরের পথে যেতে যেতে ক্লাইভ চেয়ে দেখলে চারদিকে। সমস্ত শহরটা পুড়ে ছারখার হয়ে গেছে। চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগলো সাহেবের। শহর ভাঙা তা সহজ! হুগলীও তো নিজে পুড়িয়ে এসেছে এমনি করে। এমনি করে কি সমস্ত ইণ্ডিয়াকেই পোড়াতে হবে? কাণ্ট্রি না পোড়ালে কি নতুন করে কাণ্ট্রি গড়া যায় না? কে জানে! হয়তো নতুন করে ইণ্ডিয়াকে গড়বার জন্যেই লর্ড জেসাস ক্রাইস্ট ক্লাইভকে পাঠিয়েছে এই এখানে। হয়তো রবার্ট ক্লাইভই নতুন করে গড়ে তুলবে ইণ্ডিয়াকে। হয়তো ইণ্ডিয়াই হবে রবার্ট ক্লাইভের মাদারল্যাণ্ড। এই মাদারল্যাণ্ডেই রবার্ট ক্লাইভ খুঁজে পাবে নিজেকে। আশ্চর্য! কত স্বপ্নই না দেখেছিল একদিন ক্লাইভ।

সেদিন বরানগরে পৌঁছেই দুর্গা একেবারে সাহেবের কাছে এসে হাজির হয়েছিল।

দুর্গা বলেছিল—আমাদের জন্যে তোমার অনেক হেনস্থা হলো বাবা, তোমার অনেক দুর্গতি সইতে হলো—

ক্লাইভ জিজ্ঞেস করেছিল—আপনাদের কোনো অসুবিধে হচ্ছে না তো? অসুবিধে হলে বলবেন!

—তুমি থাকতে আর আমাদের অসুবিধে হবে কী করে বাবা। হরিচরণকে তো আমাদের সেবা করবার জন্যেই ছেড়ে দিয়েছো, সে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি ছেলেটি বড় ভালো বাবা!

সাহেব বললে—সব ইণ্ডিয়ানরাই ভালো, ইউরোপীয়ানরাই খারাপ—

—ও কথা কেন বলছো বাবা! তুমিও তো ফিরিঙ্গী, তুমি কি খারাপ?

ক্লাইভ বললে—হ্যাঁ দিদি, আমি খারাপ! আমি লেখাপড়া শিখিনি, আমি ইল্‌লিটারেট, মুখ্যু, আমার বাবা-মা, আমার সোসাইটি, আমার ফ্রেণ্ডস্, আমাদের পার্লামেণ্ট, সবাই আমাকে ওয়ার্থলেস বলে এইখানে পাঠিয়ে দিয়েছিল। ভেবেছিল আমি এখানকার ক্লাইমেটে মাছি-মশার কামড়ে অসুখ হয়ে মারা যাবো। মারা গেলেই ওরা গ্ল্যাড্ হতো। কেন যে মারা গেলুম না, গড্ নোজ।

সাহেব গম্ভীর মুখে বসেছিল। কথা বলতে গিয়ে যেন খই ফুটতে লাগলো মুখ দিয়ে।

বলতে লাগলো—মরতেই আমি চেয়েছিলুম দিদি! বিলিভ মি! আমি মরতেই চেয়েছিলুম! প্রত্যেকটা লড়াইতে আমি ফায়ার-আর্মস-এর সামনে ঝাঁপিয়ে পড়েছি মরে যাবার জন্যে। আমি নিজের বুক লক্ষ্য করে দু'দুবার পিস্তলের গুলী ছুঁড়েছি। তবুও মরিনি। লোকে আমাকে বলে কি জানো দিদি, বলে আমি নাকি খুব বীর। আমি নাকি খুব সাহসী! কিন্তু ওরা তো আসল কথাটা জানে না। ওরা তো জানে না মরার মত শক্ত কাজ আর নেই। আমি সেই শক্ত কাজটাই করতে পারলুম না। আই ওয়াণ্ট টু ডাই দিদি, আই ওয়াণ্ট টু ডাই। আমি মরতেই চাই—

দুর্গা বললে—ছি বাবা, ও-কথা কি মুখে আনতে আছে? আমাদের হিন্দুঘরে একটা কথা আছে—মরার বাড়া গাল নেই। ও কথা বার বার বোল না—

সাহেব বলতে লাগলো—ও তুমি বুঝবে না দিদি, মরার মত সুখ নেই এই ওয়ার্ল্ডে! এখানকার নবাব যেমন বাঁচার জন্যে আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করছে, আমি তেমনি মরার জন্যে যুদ্ধ করতে ইন্ডিয়ায় এসেছি—কিন্তু মরতে পারলাম কই? কলকাতার ফোর্টে আজ আমাদের যে সব ইউরোপীয়ান দেখলে, ওদের সঙ্গে এই জন্যেই আমার বনে না—! ওরা তোমাদের ইনসাল্ট করলো বলেই সে ইনসাল্ট আমার গায়ে লাগলো। আমি তাই এখানে চলে এসেছি! ওরা ইন্ডিয়ানদের হেট্ করে, ওরা ইন্ডিয়াতে এম্পায়ার তৈরি করতে চায়, কিন্তু আমি ওদের বলে বোঝাতে পারি না যে, বেঙ্গলের নবাব খারাপ হতে পারে, কিন্তু ইন্ডিয়ানরা আমাদের সঙ্গে কী দোষ করেছে? তারা তো কোনো অন্যায় করেনি! তাদের কেন আমরা হেট্ করবো? তাদের কেন আমরা ক্ষতি করবো?

নিজের ঘরে যেতেই ছোট বউরানী জিজ্ঞেস করলে—এতক্ষণ কী গল্প করছিলি রে দুর্গা? সাহেবের সঙ্গে এত কী গল্প তোর? হাতিয়াগড়ে ফেরত পাঠিয়ে দেবার কথা কিছু বললে?

দুর্গা বললে—সাহেবটা পাগল বউরানী, একেবারে বদ্ধ পাগল—

—কেন? কী বলছিল?

—বলে কি না সাহেব মরতে এসেছে এখানে। সাহেবের মরতে বড় সাধ!

—ওমা, সে কী? মরতে চায় কোন্ দুঃখে?

—তবেই বোঝ! পাগল কি আর সাধে বলছি! এমন মানুষের সঙ্গে থাকলে আমরাও কোন্ দিন মারা পড়বো দেখছি! তাই তো বললাম সাহেবকে। বললাম—তুমি বাবা আমাদের একটা হিল্লে করে তারপর মরো বাঁচো আমরা দেখতে যাচ্ছিনে!

—তা কী বললে?

—বলবে আবার কী! নিজের মাথার ঘায়েই কুকুর পাগল!

হঠাৎ হরিচরণ ঘরে ঢুকেছে। বললে—দিদি, একটা সুখবর আছে, তোমার জামাই এসেছে—

দুর্গা তো অবাক। বললে—কী বলছো তুমি হরিচরণ? জামাই আমার আবার কে?

হরিচরণ বললে—কেন, তোমার মেয়ের বর?

ছোট বউরানীর বুকখানা ছাঁৎ করে উঠলো। দুর্গা বললে—কে? ছোটমশাই? ছোটমশাই? ছোটমশাই খবর পেয়ে গেছে?

—না দিদি, এ যে বললে এর বউ-এর নাম মরালীবালা। তাই শুনেই তো ডেকে আনলাম। লোকটা বরানগরের পথে গান গাইতে গাইতে যাচ্ছিল—ভারি ভালো গান গাইতে পারে তোমার জামাই, দিদি—আমি রবো না ভব-ভবনে—গান শুনে আমি জিজ্ঞেস করলাম—তোমার নাম কী? সে বললে—উদ্ধব দাস! তোমার জামাই-এর নাম উদ্ধব দাস তো!

দুর্গা বললে—না হরিচরণ, তুমি ওকে বিদেয় করে দাও বাছা, ও পাগল মানুষ, তোমাদের সাহেবের মত বদ্ধ-পাগল—

—তবে ও বললে যে হাতিয়াগড়ে ওর শ্বশুরবাড়ি, ওর বউ-এর নাম মরালীবালা, ওর শ্বশুরের নাম শোভারাম বিশ্বাস। তুমি যা-যা বলেছিলে, সব তো মিলে যাচ্ছে—

তারপর আর উত্তরের অপেক্ষা না করে বললে—যাই, ওকে ডেকে নিয়ে

আসিগে, ওকে আমি বলেছি যে ওর বউ এখানে আছে—

বলেই ঘরের বাইরে চলে গেল।

দুর্গা ছোট বউরানীর দিকে চাইলে। বললে—হরিচরণ আবার এ কী বিপদে ফেললে বল তো ছোট বউরানী। এই এতগুলো পাগলকে নিয়ে তো দেখছি মহা মুশকিলে পড়া গেল—

মুর্শিদাবাদের চেহেল্-সুতুনের ভেতরে তখন তুমুল হৈ-চৈ বেধে গেছে। মরিয়ম বেগমের খবরটা যেন দেখতে দেখতে আগুনের মত ছড়িয়ে পড়লো সব জায়গায়।

রাত থেকেই শুরু হয়েছিল। ভোর হবার পর থেকে আরো বেড়ে গেল। লুৎফুন্নিসার ঘরে নানীবেগম দৌড়তে দৌড়তে এসেছে।

—শুনেছিস বহু, আমাদের মরিয়ম বেটির কাণ্ড?

লুৎফুন্নিসা আগেই শুনেছিল। শুধু পাথরের চোখ দিয়ে একবার চেয়ে দেখলে নানীবেগমের দিকে। কোনোদিনই তার মুখে ভাষা নেই, আজও যেন তার মুখে কথা ফুরিয়ে গিয়েছে। শিরিনার কোলে নতুন মেয়েটা তার দুধ খাচ্ছিল, সেই দিকেই চেয়ে রইলো অপলক দৃষ্টি দিয়ে।

—তুই কিছু বলবিনে তাহলে? তাহলে কার কাছে আমি যাই বল তো? কে আমার কথা শুনবে?

তবু কিছু উত্তর দিলে না লুৎফুন্নিসা। সকাল বেলা নানীবেগমের নাস্তা পর্যন্ত খাওয়া হয়নি। অন্যদিন কোরাণ পড়তে পড়তে রাত ভোর হয়ে যায় আজ শেষ রাত্রের দিকে খবর পাওয়ার পর থেকেই নানীবেগম সোজা উঠে এসেছে বাইরে।

এসেই আমিনা বেগমের ঘরে গিয়েছিলেন—শুনেছিস আমিনা?

আমিনার বরাবর দেরি করে ঘুম থেকে ওঠা অভ্যেস। যখন আজিমাবাদে জৈনুদ্দীন আহম্মদের সঙ্গে ছিল, তখন থেকেই বড় আয়েসী মেয়ে সে। তিন ছেলের মা, তিনটে ছেলে প্রসব করেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। ভেবেছিল এক ছেলে যখন নবাব হবেই, তখন তার আর কী ভাবনা। বড় ছেলের যদি কোনো ক্ষতিও হয়, আরো দু'জন তো রইলো। ফজল কুলী খাঁ, আর মির্জা মেহেদী। কিন্তু বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে যে ছেলেরা এমন করে পর হয়ে যাবে কে ভেবেছিল! ঘুম থেকে ওঠবার আগেই তার পা টিপে দেবার আরামটুকুর জন্যে বিছানায় শুয়ে থাকতো আমিনা বেগম। যখন প্রথম তন্দ্রা ভাঙতো তখন ডাকতো—সাকিনা—

সাকিনা বলতো—জী, বেগমসাহেবা—

তারপর সেই সকাল বেলাই মাথার কাছে আসতো টাটকা আঙুরের রস। তাতে এক ছিটে আফিং মেশানো থাকতো। সেই নেশাতে চোখ খুলতো বেগম-সাহেবার। তখন পেয়ালা আসতো, পেয়ালায় থাকতো দুধ। সেই দুধের সঙ্গে কাশ্মিরী জাফরান মিশিয়ে প্রথম নাস্তা হতো। তারপর গোসলখানা। সেখানে থাকতো ঝারির গরম জল। সমস্ত পোশাক-পরিচ্ছদ—ওড়নী, কাঁচুলী, ঘাগরা, সব খুলে নিয়ে বেগমসাহেবাকে ঝারির তলায় বসিয়ে দিত সাকিনা বাঁদী। তারপর

া ডলে দিত চুল খুলে দিত। তারপর আসতো তেল। পদ্মফুলের পাপড়ি নিঙড়ে য রস বেরোয় তার সঙ্গে ভৃঙ্গরাজের রস মিশিয়ে তেল তৈরি করে আমিনা বেগমসাহেবার চুলে মাখাতে হবে। চুলের গোড়ায় গোড়ায় ঘষে ঘষে দিতে হবে সেই তেল। তারপর যখন গোসলখানা থেকে বেরোবে তখন পায়ে জরিদার চটি পরিয়ে দিতে হবে। আমিনা বেগম তখন ঘরে এসে কেদারায় বসে রোদ্দুরে চুল শুকোবে। তখন আসবে আসল নাস্তা!

খেতে খেতে বেগমসাহেবা তখন হিসেবের খাতা বার করতে বলবে সাকিনাকে! উমিচাঁদের কাছে কত পাওনা, জগৎশেঠজীকে কত দিতে হবে। সুদ কত হলো মহাজনীতে। দিনের সব হিসেব ওই সময় থেকেই শুরু হয় আমিনা বেগমের।

এই-ই বরাবরের নিয়ম!

শুধু আমিনার কেন, চেহেল্-সুতুনের সব বেগমের ঘরেই এই-ই নিয়ম। কারোর কম কারোর বেশি। আগের রাত্রে যে একটু অনেক রাত পর্যন্ত গান গেয়েছে, অনেক রাত পর্যন্ত ফুর্তি করেছে, সে আরো দেরি করে ওঠে। তারপর যত বেলা বাড়ে তত খোজা আর বাঁদীদের হাঁক-ডাক বেড়ে যায়। তখন এ-ওর ঘরে যায়। এ ওর কেচ্ছা ওর কাছে গিয়ে বলে, ও এর কেচ্ছা তার কাছে গিয়ে শোনায়। তখন নতুন করে আবার বেরোয় বীণ, নতুন করে আবার সারেঙ্গীর ঢাকা খোলা হয়। কিংখাবের মখমলের আর জরির ঘাগরা আবার ঝলমল করে ওঠে। তখন থেকেই গুজ-গুজ ফিস-ফিস শুরু হয়। আশ্রফির হিসেবে শূন্যের পর শূন্য বসে। অঙ্কের খাতায় হিসেবের শূন্য সংখ্যায় বেড়ে বেড়ে পাতা ভর্তি করে দেয়। তারপর যখন বেলা পড়ে আসে তখন চেহেল্-সুতুনের খানা-খানায় মোরগ-মশাল্লামের সঙ্গে কড়া জাফরাণের গন্ধ বেগমদের তন্দ্রা ছুটিয়ে দেয়। তখন সেতার ছেড়ে তক্কি বেগম বলে—যা তো মামুদা, কী খানা বানাচ্ছে দেখে আয় তো—

পেশমন বেগম আগের দিন সারা রাত বেলেল্লাগিরি করে অসাড় হয়ে ঘুমোচ্ছিল।

বাঁদী আঙুরের রসের ভিতর এক পুরিয়া আফিম মিশিয়ে মুখের কাছে এনে মাথা নিচু করে আস্তে আস্তে মিহি গলায় ডাকলে—বেগমসাহেবা—

পেশমন বেগমের সারা মুখে-গালে-ঠোঁটে নখের আঁচড়ের দাগ লেগেছিল। সেই ঘুম চোখেই বললে—দে জবীন, পেয়ালা দে—

ওটা আঙুরের রস নয়, ওটা সরাব। ওটা না খেলে বেগমদের জড়তা কাটে না সকালে।

—বেগমসাহেবা, বেলা হয়ে গেছে, ধুপ উঠেছে!

—সবুর কর, সবুর কর, ডাকিসনে এখন—

বলে আড়মোড়া খেতে লাগলো বিছানায়। মখমল-মোড়া শিমুল তুলোর পুরু গদির ওপর দু-তিনবার না গড়িয়ে নিলে পেশমনের ভোরের নেশা কাটে না।

কিন্তু সেদিন নানীবেগমের ডাকাডাকিতে পেয়ালায় মুখ দেবার আগেই উঠে বসতে হলো।

—বেগমসাহেবা, নানীবেগম আয়ি।

—কাল মরিয়ম কোথায় ছিল রে পেশমন? রাত্তিরে কোথায় ছিল? চক্-বাজারে কখন গেল? কে নিয়ে গেল? কী করতে গিয়েছিল সেখানে? কে আছে তার চক্-বাজারে?

নানীবেগম সোজা ঘরের মধ্যে ঝড়ের মত এসেছিল। পেশমন সোজা হয়ে ওঠবার সময়টুকু পর্যন্ত পেলে না।

বললে, আমি তো জানি না বেগমসাহেবা!

—তোর সঙ্গে মরিয়ম মেয়ের দেখা হয়নি কাল? তোর ঘরে আসেনি?

—না বেগমসাহেবা!

—আমি যে দেখি তোদের দুজনের খুব ভাব। ক'দিন ধরে যে তোর ঘরে খুব আসতো সে!

—তা আসতো, কিন্তু কাল আসেনি মরিয়মবিবি।

—চক্-বাজারে কী করতে গিয়েছিল সে তুই জানিস? তুই কারো কাছে পাঠিয়েছিলি?

—আমি কেন তাকে বাইরে পাঠাতে যাবো বেগমসাহেবা? বাইরে আমার কে আছে যে তার কাছে আমি পাঠাতে যাবো?

—হেঁয়ালি রাখ, আমি যেন জানি না তোর মতি-গতি! আমি যেন জানি না তুই কী-রকম স্বভাবের মেয়ে! আমাকে তুই নতুন পেয়েছিস এখেনে? আমি এতকাল চেহেল্-সুতুন চরিয়ে এলাম, আমি চিনিনে তোদের? তা তুই না পাঠিয়ে থাকিস তো কে পাঠিয়েছে বল?

পেশমন বললে—আমি কিছুই জানি না বেগমসাহেবা!

—আলবৎ জানিস!

পেশমন বেগম এবার কেঁদে ফেললে। বললে—আমি জানি না বেগমসাহেবা, সত্যি বলছি আমি জানি না, আমারও কপালের দোষ বেগমসাহেবা, এতদিন আছি চেহেল্-সুতুনে তবু আমার এই বদনাম দিলে তুমি বেগমসাহেবা? এখনো আমাকে কেউ বিশ্বাস করলে না?

—মড়াকান্না রাখ তুই বাপু, তোর কান্না শোনবার সময় নেই এখন, আমি এখন যাই—

হঠাৎ পীরালি খাঁ ঘরের সামনে কুর্নিশ করলে—বেগমসাহেবা—

—কী রে পীরালি?

—শওকত জঙ্ বাহাদুর খুন হয়ে গেছে বেগমসাহেবা। পূর্ণিয়ার লড়াই ফতেহ্ হয়ে গেছে। পূর্ণিয়া থেকে ময়মানা বেগমসাহেবারা মুর্শিদাবাদের দিকে আসছে।

নানীবেগমের মাথাটা হঠাৎ যেন ঘুরে উঠলো। ঠিক নেশা করলে যেমন হয় তেমনি। আল্লা, অনেক দিন বেঁচে থাকলে বোধহয় এমনিই হয়। এমনি ভাবেই সব আঘাত সইতে সইতে পাথর হয়ে যেতে হয়। শওকত জঙ্কে মনে পড়লো নানীবেগমের। সেই মীর্জার সঙ্গে একই বিছানায় একদিন শুয়ে কাটিয়েছে, কতদিন নানীবেগমের কোলে ওঠবার জন্যে দুজনে ঝগড়া মারামারি করেছে। আজ আবার তার মৃত্যু-সংবাদটাও বেঁচে থেকে সহ্য করতে হবে মুখ বুজে। এতটুকু চোখ ছলছল করলে চলবে না।

—ময়মানা বেগমসাহেবা রওআনা দিয়েছে পূর্ণিয়া থেকে।

—আর মীর্জা? মীর্জা আসছে না?

—জাঁহাপনা ভি আসছেন বেগমসাহেবা! পূর্ণিয়া থেকে সওয়ানে-নেগার খবর নিয়ে এসেছে নিজামতের দফ্তরে!

নানীবেগম বললে—ঠিক আছে পীরালি, আমার তাঞ্জাম বার করতে বল,

আমি মতিঝিলে যাবো মরিয়ম বেগমকে দেখতে—নেয়ামতকে বলে দিবি ফাটকের দরজা খুলে দেবে আমার জন্যে।

ভোরবেলা চেহেল্-সুতুনের নহবতখানায় গিয়ে উঠে বসতে গেল ইনসাফ মিঞা। এই নহবতখানায় জীবন কেটে গেল ইনসাফের। নবাব মীর্জা মহম্মদের যে-বছরে সাদি হলো তখন নতুন নোকরিতে ভর্তি হলো ইনসাফ মিঞা। বাপ আতাউল্লা খাঁ এক-একটা করে নহবতের ফুটো টিপতে আর ছাড়তে শিখিয়েছিল ছেলেকে। নহবতে ফুঁ দিতে শিখিয়েছিল।

ইনসাফ মিঞা বলতো—ইসমে ফোকর ছোড়না ঔর বন্ধ্ করনাই আসলি কাম—

ছোট সাগ্রেদ মমতাজ মিঞা তবলা নিয়ে চাঁটি দিত আর লোভীর মত একদৃষ্টে চেয়ে দেখতো ওস্তাদজীর ফুটো ছাড়া আর ফুটো বন্ধ করার কেরামতি! কবে ওস্তাদজীর মত বাজাতে পারবে, কবে ফুটো ছেড়ে আর বন্ধ করে সুরের দিমাগ টলিয়ে দেবে। সারা মুর্শিদাবাদ শহর দিওয়ানা করে দেবে ইনসাফ মিঞার মত! কবে? কবে?

টোড়ি রাগটা ভারি বেয়াড়া। আগের দিন রাত্রেই ইনসাফ মিঞা ঠিক করেছিল টোড়িটা আজ দিলচসপ্ করে বাজাতে হবে! সবে এসে নহবতখানায় যন্তরটা নিয়ে বসেছে, হঠাৎ ছোট সাগ্রেদ এসে বললে—ইয়া বিসমিল্লা ওস্তাদজী, গজব খবর, মরিয়াম বেগমনে সফিউল্লা খাঁ সাহাবকো খুন কিয়া—

ইনসাফের টোড়ির মেজাজটা বেসুরো হয়ে বিগড়ে গেল হঠাৎ।

—ক্যা বেহুদা আদমী, তুমহে ইয়ে সুর কভি বাজানা নেহি আয়েগা—

সত্যিই মেজাজ বিগড়ে যাবার মত খবরই বটে। কিন্তু ইনসাফ মিঞা ও-কথায় কান না দিয়ে উদারার নিখাদে ফুঁ দিলে। আর সঙ্গে সঙ্গে ছোট সাগ্রেদ বাহবা দিয়ে উঠলো—সাবাস উস্তাদজী—সাবাস—

তখন ফরসাও ভালো করে হয়নি। মুর্শিদাবাদ শহর ছুঁয়ে ছুঁয়ে সে সুর অনেক দূর ভেসে ভেসে চলতে লাগলো। সত্যিই অনেক দূর। সেই একেবারে আওরঙ্গজেবের সাগ্রেদ শায়েস্তা খাঁর আমলে গিয়ে যেন আছড়ে পড়তে লাগলো ইনসাফ মিঞার টোড়ি! বাদ্শা তখন দাক্ষিণাত্যে, আর ওদিকে মারাঠা-শক্তির কেন্দ্রমণি ছত্রপতি শিবাজী তাঁর সাম্রাজ্যের ভেতরে-বাইরে আঘাত হেনে একেবারে ফোঁপরা করে তুলছে। কখনো কর্ণাটক, কখনো মহারাষ্ট্র, একের শান্তি আসে তো অন্যের বিদ্রোহ। একেবারে জেরবার হয়ে গেছেন বাদ্শা। একে ঠাণ্ডা করলে ও মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে ওদিকে। নিজের তৈরি চালাকির জালে নিজেই জড়িয়ে পড়েছেন বাদ্শা। পশ্চিমে কান্দাহার বাদক্শান হাতছাড়া হয়েই যে রেহাই পেলেন তাই-ই নয়, হিন্দুস্থানের প্রত্যন্তর দেশে সবাই তখন বাদ্শার বিরুদ্ধে মাথা তুলে উঠে বলছে—অয়মহং ভো! তরোয়াল উঁচিয়ে বলে উঠলো—অয়মহং ভো! আর কোথায় ছিল এই পূর্ব সীমান্তের এক চেতো বরদার শোভাসিংহ, সেও যেন তখন তরোয়াল উঁচিয়ে বলে উঠলো—অয়মহং ভো!

ইনসাফ মিঞার নহবতের টোড়ি-রাগ তার গ্রামের কড়ি-কোমল পর্দায় বলতে লাগলো—তুমি নাদির শাহ একদিন এসেছিলে হিন্দুস্থান লুঠ করতে, আর

এসেছিলে সুন্দরী মেয়েমানুষ ভোগ করতে। মার্কোপোলোর সময় থেকেই তাই তোমরা এখানে এসেছো আর লুঠ করে সর্বস্ব নিয়ে চলে গেছ। এরা কিছু বলেনি, এই হিন্দুরা। তোমাদের সময় থেকে আমরা জেনে এসেছি মোগল-দরবারে বিদ্যে-বুদ্ধির চেয়ে সুন্দরী মেয়েমানুষেরই খাতির বেশি, ঘুষের প্রতিপত্তি সর্বাধিক। তোমাকে ঘুষ দিয়ে তাই আবার আর-এক নাদির শাহের দল এখন এসেছে। এরা আরো চতুর, আরো শঠ। এদের হাতে কিন্তু এবার নাদির শাহের মত তরোয়াল নেই, এবার আছে দাঁড়িপাল্লা। সেই দাঁড়িপাল্লা দিয়েই এরা এবার ওজন করে নেবে তোমার পাপ আর তোমার পুণ্য, যাচাই করে নেবে তোমার বিদ্যে আর তোমার বুদ্ধি, পরখ করে নেবে তোমার শক্তি আর তোমার বিত্ত। তুমি এদের সঙ্গে শক্তি-পরীক্ষার চেষ্টা করো না নবাবজাদা। করলে তুমি হারবে। কারণ তোমার চেহেল্-সুতুনের মধ্যেই তোমার পরাজয়ের বীজ লুকিয়ে আছে। কারণ তুমি নিজেই তোমার নিজের শত্রু, তোমার নিজের আত্মীয়-স্বজনই তোমার বৈরী। তুমি যে শত্রু নিয়েই জন্মেছ, আবার শত্রু সৃষ্টি করতেও তুমি যে অদ্বিতীয়। তোমারই দীর্ঘশ্বাস চেহেল্-সুতুনের ভেতর পুঞ্জীভূত হয়ে দিনের পর দিন পাথরের দেয়ালে যে মাথা কুটে মরছে আর তুমি মতিঝিলের দরবারে বসে সব দেখেও চোখ বুজে রয়েছো আর আমীর-ওমরাওরা যা বলছে তাই বিশ্বাস করছো।

নহবত আরো বলছে—মনে রেখো, বাইরের জগতে যখন মানুষের আকাশে নতুন গ্রহ-উপগ্রহের উদয় হয়েছে, তুমি তখনো রয়ে গেছ সেই চেহেল্-সুতুনের আদিম খোসবাগে। তুমি তখনো গুলসন বেগমের ঠুংরির লয়ে-লয়ে মাথা দোলাচ্ছো, মরিয়ম বেগমের আত্মবঞ্চনার সুযোগ নিচ্ছ। তোমার দুঃখ নিয়ে তো তোমার বিচার করবো না নবাব! তোমার কাজই যে তোমার বিচারকর্তা। তুমি হা-হুতাশ করো, তুমি অনুতাপ করো, তুমি ক্ষমা চাও, তবু তোমাকে আমরা অব্যাহতি দেবো না। ইতিহাসের নিষ্ঠুর দাঁড়িপাল্লা দিয়ে তোমার তুল্য-মূল্য বিচার করে তোমাকে মাথায় তুলে নেবো কিংবা ছুঁড়ে ফেলে দেবো পায়ের তলার মাটিতে।

ইনসাফ মিঞার টোড়ির সুরে-লয়ে কান্তর যেন নেশা লেগেছিল। মতিঝিলের সেই শ্বেতপাথরের সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে কান্ত ওপরে উঠতে লাগলো। সামনে নেয়ামত, পেছনে নজর মহম্মদ। দুজনে দুটো মোহর নিয়েছে। ফাটকের ভেতরে মরালীর সঙ্গে শুধু একবার দেখা করিয়ে দেবে। আর কিছু নয়। তারপর যা হবার হবে। এই কড়ার।

কান্তও ঘুমোয়নি সারা রাত, মরালীও ঘুমোয়নি।

—এ কি, তুমি?

ফাটকের লোহার শেকলটা যেন হঠাৎ বাঙ্ময় হয়ে উঠলো।

কান্ত বললে—এ কি করলে তুমি মরালী? এমন করে নিজের সর্বনাশ কেন করতে গেলে?

মরালী বললে—তুমি এখানে কী করে এলে?

—আমার কথা ছেড়ে দাও, আমার যা-হয় হোক, কিন্তু তোমার কথা ভেবে-ভেবে যে আমি পাগল হয়ে গেছি, আমি যে দিন-রাত ছটফট করে মরছি—

মরালী—তুমি পালিয়ে যাও গো, তুমি এখানে আর এসো না, নইলে তোমাকেও এরা আমার মত ধরে রাখবে—তোমাকেও এই ফাটকের মধ্যে পুরে রাখবে!

—কিন্তু কেন তুমি চক্-বাজারে যেতে গেলে? আমি তো তোমার কাছেই

গিয়েছিলুম তখন। তোমার সঙ্গে দেখা করতেই তো চেহেল্-সুতুনে গিয়েছিলুম আমি!

মরালী বললে—সে যা-হবার হয়ে গেছে, তুমি চলে যাও এখান থেকে, তোমার দুটি পায়ে পড়ছি তুমি চলে যাও—

—তোমাকে আমি এখান থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে যাবোই মরালী!

—কী করে ছাড়াবে?

—আমি এক হাজার আশ্‌রফি ঘুষ দেবো মহকুমে কাজার সদরস্-সুদুরকে!

—অত আশ্‌রফি কোথায় পাবে?

—কেন, সারাফত আলির সিন্দুক ভাঙবো!

মরালী চমকে উঠলো—না না, অমন সর্বনাশ কোর না, কেন আমার জন্যে ও-কাজ করতে যাবে। আমি তোমার কে যে তুমি অতখানি ঝুঁকি মাথায় তুলে নেবে? না না, খবরদার, অমন কাজটি কোর না—! আমার জীবনের কোনো দাম নেই, আমার কে আছে বলো না যে তার জন্যে ভাববো? তুমি চলে যাও এখান থেকে, আর কখনো এসো না—যাও—লক্ষ্মীটি যাও—

কান্ত বললে—দেখ, এখানে এখন নবাব নেই, এই-ই সুযোগ! এমন সুযোগ আর আসবে না, তুমি কথা দাও যে এখান থেকে ছাড়িয়ে নিলে তুমি আমার সঙ্গে পালিয়ে যাবে?

—পালিয়ে কোথায় যাবো?

—কেন, সেদিন তো পালিয়ে যেতে রাজি ছিলে তুমি, যেদিন তোমাকে নিয়ে প্রথম এখানে আসি?

—কিন্তু আমি কী পরিচয় দেবো আমার? লোকে যদি জিজ্ঞেস করে কী বলবো তাদের?

—যা সত্যি কথা তাই-ই বোল!

—কী সত্যি কথা?

হঠাৎ নেয়ামত খাঁ দৌড়ে এসেছে—বাবুজী, ভাগ যাইয়ে, ভাগ যাইয়ে—

নজর মহম্মদও ভয় পেয়ে কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

—চলুন বাবুজী, জলদি চলুন—

কান্ত বুঝতে পারলে না কিছু। মরালীকে এখানে এ-ভাবে ছেড়ে যেতে তার ইচ্ছে হচ্ছিল না। দুটো মোহর দিয়েছে সে এইটুকু কথা বলবার জন্যে?

কান্ত বললে—কেন, যেতে বলছো কেন? আমার যে আরো অনেক কথা বলবার আছে মরিয়ম বেগমের সঙ্গে—

নেয়ামত খাঁ বললে—নেহি হুজুর, জলদি ভাগ যাইয়ে ইধারসে, নানীবেগম আতি হ্যায়—

আর সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো যেন মতিঝিলের একতলার চবুতরে একটা তাঞ্জাম থামবার শব্দ হলো। হাতীর চলার শব্দও কানে এল! কী হবে তাহলে? এইটুকু কথা বলেই তাকে বিদায় নিতে হবে! এইটুকু কথার জন্যেই দুটো মোহর দিতে হলো!

নানীবেগম আসতেই নেয়ামত ফাটকের দরজা খুলে দিয়েছে। কোতোয়ালের লোক মোহরের ভাগ পেয়েছিল, তাই কান্তকে কিছু বলেনি। কান্ত কথা বলবার সময় আড়ালে চলে গিয়েছিল। এবার নানীবেগম আসতেই লম্বা সেলাম আলেকুম করলে।

একদিন এই ফাটকের ভেতরেই জগৎশেঠজী বন্দী হয়েছিল। কাশিমবাজার কুঠির ওয়াটস্ সাহেবের বিবিকেও এখানে আটকে থাকতে হয়েছে একদিন। হল্ওয়েল, কলেট সবাইকে এমনি করে পাহারা দিয়েছে কোতোয়ালের এই পাহারাদার। শুধু তাই নয়। ঘসেটি বেগমসাহেবাকেও একদিন এখানে নজরবন্দী হয়ে থাকতে হয়েছে এই পাহারাদারের তাঁবে। আজ মরিয়ম বেগমকেও সেই তাদের সঙ্গে একই ফাটকের অন্দরে আটকে থাকতে হচ্ছে।

তবু মরালী মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে ছিল।

সফিউল্লা খাঁর দেহটা সকাল বেলাই সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল। রক্তের দাগও ধুয়ে মুছে ফেলা হয়েছে। যাদের আসবার, যাদের দেখা করবার আর তদন্ত করবার কথা তারা তা করে গেছে।

কোতোয়াল জিজ্ঞেস করেছিল—আপনি সফিউল্লা খাঁ সাহেবকে খুন করেছেন?

মরালী বলেছিল—হ্যাঁ—

—কেন?

—আমার ওপর অত্যাচার করতে এসেছিল।

—আপনি হারেমের বেগম, আপনি চক্-বাজারে মর্দানা সেজে কেন গিয়েছিলেন? সেখানে কী কাম ছিল আপনার?

—আমার নিজের কাজ ছিল।

—কী কাজ?

—সব কথা আমি বলবো না।

—সব কথা খুলে না বললে কিন্তু আপনারই লোকসান হবে, তা জানেন তো? মহকুমে কাজার সদরস্-সুদুরের কাছারিতে আপনার বিচার হবে। খুন করলে দণ্ড হয় তা জানেন তো?

মরালীর চোখে জল পর্যন্ত নেই, গলা একটুকু কাঁপা পর্যন্ত নেই, একেবারে কাটাকাটা উত্তর দিয়েছিল সেদিন। আর শুধু একবার নয়। নিজামত-কাছারির এক-একজন আমীর ওমরাহ্ বার বার করে তদন্ত করে গেল। প্রত্যেকবারই একই উত্তর দিয়েছে সে। প্রত্যেকবারই একই কথার পুনরাবৃত্তি করেছে। শেষকালে যখন আর পারেনি তখন বলেছে—আমাকে আর বার বার বিরক্ত করবেন না আপনারা, আমাকে ফাঁসি দিন, ডালকুত্তা দিয়ে খাইয়ে দিন, আমাকে মেরে ফেলে আপনাদের হাতীর পিঠের ওপরে শুইয়ে সকলকে দেখান না—আমি তো আমাকে ছেড়ে দেবার জন্যে আপনাদের পায়ে ধরে সাধতে যাচ্ছিনে—

মরিয়ম বেগমের তেজ দেখে সবাই অবাক হয়ে গিয়েছিল। এমন তেজী বেগম তো আগে দেখা যায়নি! আর তারপরই এসেছিল কান্ত! তুমি কেন এলে? তোমাকে দেখে যদি আমি শক্ত থাকতে না পারি! যদি ভেঙে পড়ি। যদি আমি

ওদের পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়ে ফেলি! তুমি যাও, তুমি সামনে থাকলে আমি ভেঙে পড়বো, আমি হাত-জোড় করে ক্ষমা চাইবো! তুমি কেন এলে! তোমাকে এখানে দেখলে সবাই যে তোমাকেও সন্দেহ করবে! তোমাকেও ফাটকে পুরে রাখবে। আমার সঙ্গে তোমাকেও ওদের কুকুর দিয়ে কামড়িয়ে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে খাওয়াবে।

কান্ত তবু যেতে চায়নি।

বলেছিল—তোমাকে এ-অবস্থায় ফেলে আমি যাই কী করে?

মরালী বলেছিল—আমার জন্যে তোমার কেন ক্ষতি হবে বলো তো? আমি তোমার কে? আমার সঙ্গে তোমার কীসের সম্পর্ক?

—আমি যে তোমাকে সঙ্গে করে এখানে এনেছি মরালী! সম্পর্ক না থাকলে কি এমন করে আসি এখানে? কেন তুমি গিয়েছিলে বলো তো আমার কাছে? আমি তো তোমার কাছে যাই-ই, তবু কেন তুমি এ ঝুঁকি নিলে? আমাকে একবার নজর মহম্মদকে দিয়ে খবর দিলেই তো তোমার কাছে যেতাম!

মরালী বলেছিল—কিন্তু বাবাকে যে অনেক দিন দেখিনি, বাবার খবর জানতেই তো গিয়েছিলাম—

—তা আমাকে ডাকতে পারলে না তুমি?

মরালী যেন একটুখানি করুণ হয়ে এসেছিল খানিকক্ষণের জন্যে। কেন এ তার জন্যে এতখানি ঝুঁকি নিয়ে এখানে এসেছে। এর সঙ্গে তো কোনো সম্পর্কই নেই তার। সম্পর্ক হতে গিয়েও তো শেষ পর্যন্ত সম্পর্ক হয়নি তার সঙ্গে। অথচ যার সঙ্গে তার সত্যিকারের সম্পর্ক হলো সে তো এল না। সে তো তাকে খোঁজবার চেষ্টাও করলে না একবার।

—তুমি আর এসো না এখানে, জানো? এখানকার সবাই আজ আমার কাছে এসে বারবার অনেক কথা জিজ্ঞেস করে গেছে। আমি কেন মেরেছি সফিউল্লা খাঁ সাহেবকে, কেন আমি চক্-বাজারে গিয়েছিলুম, কার সঙ্গে দেখা করতে। সব কথা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করে গেছে, তোমার কাছে গিয়েও তারা হয়তো জিজ্ঞেস করবে, তোমাকেও হয়তো জিজ্ঞেস করবে তোমার সঙ্গে আমার কীসের সম্বন্ধ, কেন তুমি আমার সঙ্গে দেখা করতে যাও চেহেল্-সুতুনে— একবার সন্দেহ করলেই তোমার কাছে যাবে ওরা, তখন তোমাকেও ফাটকে পুরবে—

আর ঠিক এই সময়েই এসেছিল নানীবেগম!

কান্ত ঠিক সময়েই লুকিয়ে পড়েছিল, নইলে নানীবেগম দেখতে পেত। নানীবেগমের ওপরে রাগ হয়ে গিয়েছিল মরালীর। ঠিক সেই সময়েই কি নানী-বেগমের আসতে হয়!

—এ কী করলি মা, কী সর্বনাশ করলি তুই? কেন ওকে খুন করতে গেলি? তুইও কি আমাকে পাগল না-করে ছাড়বি না?

ফাটকের ভেতরে ঢুকে নানীবেগম একেবারে দুই হাতে জড়িয়ে ধরেছে মরালীকে। দুই চোখ দিয়ে ঝর-ঝর করে জল পড়ছে তার।

—আর দুটো দিন সবুর কর মা, মীর্জা আসুক পূর্ণিয়া থেকে, আমি তাকে বলে তোকে ছাড়িয়ে নেবো, হুট করে যেন তুই কিছু বলিস না কোতোয়ালকে।

পেছন থেকে নেয়ামত খাঁ ডাকলে—বেগমসাহেবা—

নেয়ামত বাইরে চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল এতক্ষণ। তারও দায়িত্ব আছে কিছু। মোহর নিয়ে একটু আগেই কান্তকে এখানে আসতে দিয়েছিল, কিন্তু নানীবেগম-

সাহেবাকে যেতেও বলতে পারলে না।

—তুই থাম এখন। তুই যা আমার সামনে থেকে, ভাগ ই'হাসে—

তারপর মরালীকে জিজ্ঞেস করলে—হাতিয়াগড়ে তোর সোয়ামীকে খবর দেবো? তোর সতীনকে চিঠি লিখবো?

মরালীর এতক্ষণে কথা বেরোল। বললে—না—

নানীবেগম বললে—তবু খবর পেলে তারা এখানে মহকুমে কাজায় এসে উকীল দিতে পারতো।

মরালী বললে—না নানীজী, কাউকে খবর দিতে হবে না, আমার কেউ নেই—

—কেউ নেই তোর? বলছিস কী তুই?

—না নানীজী, আমার কেউ নেই! কেউ থাকলে কি তোমরা আমাকে এখানে এমন করে আনতে পারতে? কেউ থাকলে কি আর আজ আমাকে এমন করে জানোয়ারটার বুকে ছুরি বসাতে হতো?

—ছুরি কোথায় পেলি তুই মা? কে ছুরি দিলে তোকে?

—ভগবান জুগিয়ে দিয়েছে নানীজী, লজ্জানিবারণ ভগবান আমাদের।

—তা খুন করতে তোর হাতে বাধলো না? জলজ্যান্ত পুরুষমানুষটাকে খুন করে ফেললি তুই?

—নানীজী, তুমি আমাকে ভালোবাসো তাই তোমার এত কথার জবাব দিচ্ছি, নইলে দেখতে এতদিন আরো ক'টাকে খুন করে ফেলতাম! খুন করলে তোমারও ভালো হতো, তোমার নাতিরও ভালো হতো! এত লোককে তোমার নাতি খুন করেছে আর এগুলোকে খুন করতে পারেনি?

—কে? কাদের কথা বলছিস তুই মা?

—তুমি সব জানো নানীজী, সব জেনে শুনেও তুমি আমাকে এত কথা জিজ্ঞেস করছো? তুমি কি মনে করছো তোমার চেহেল্-সুতুন থাকবে? তুমি কি মনে করেছো তুমি তোমার নাতিকে টি'কিয়ে রাখতে পারবে?

নানীবেগম তাড়াতাড়ি মরালীর মুখে হাত চাপা দিয়ে দিলে। যদি কেউ শুনতে পায় তো তাদের দু'জনেরই গর্দান যাবে।

—এ ক'দিনে আমি সব দেখে নিয়েছি নানীজী! আমার আর দেখতে কিছু বাকি নেই। আমি তো একটাকে খুন করলুম, যদি পারো তো তুমি বাকিগুলোকেও খুন করে ফেলো, নইলে—

—কার কথা বলছিস তুই?

—কেন, মেহেদী নেসার, ইয়ারজান—

নানীবেগম আর সহ্য করতে পারলে না। নানীবেগমেরও ভয় হলো। এ মেয়ের কি এতটুকু ভয়-ডর নেই গা!

মরালী বলে চললো—তোমার ভালোর জন্যেই বলছি আমি নানীজী, তোমার নাতিরও ভালোর জন্যে বলছি, আমি তো এখন চলেই যাচ্ছি, কিন্তু একদিন তোমাদেরও আমার মতন চলে যেতে হবে নানীজী! তোমার কোরাণ তোমাকে বাঁচাতে পারবে না। যেমন আমার মাথার সি'দুর আমাকে বাঁচাতে পারেনি, তেমনি কেউ কাউকেই বাঁচাতে পারবে না—

নানীবেগম কিছুই বুঝতে পারলো না। এ মেয়েটা এ-সব কী কথা বলছে।

—তোমাকে আমি চুপি-চুপি বলে যাই নানীজী, আমি যদি ওই পাষণ্ডটাকে খুন না করতাম তো ও-ই তোমাদের সকলকে খুন করতো!

—কে বললে রে এ-কথা তোকে?

নানীবেগম মরালীকে ছেড়ে দিয়ে হঠাৎ সোজা হয়ে দাঁড়ালো।

—বল, কে বললে তোকে ও-কথা?

মরালী বললে—আমি বললে তো তুমি বিশ্বাস করবে না নানীজী! কিন্তু আমি বলছি একদিন ওই পাষণ্ডই তোমার নাতিকে খুন করতো! শুধু ও একলা নয়, ওর সঙ্গে আরো অনেক পাষণ্ড আছে। পারলে তাদেরও আমি খুন করতাম, কিন্তু আর যে উপায় নেই, ওরা যে আমায় ধরে ফেললে রাত্রে—নইলে—

নানীবেগম বললে—তুই সত্যি বলছিস মা?

—মরতে চলেছি আমি, এখন কেন মিছে কথা বলতে যাবো নানীজী? মিছে কথা বলে কি পাতকী হবো ভগবানের কাছে?

নানীবেগম ফাটকের বাইরের দিকে চেয়ে দেখলে নেয়ামত খাঁ দূরে দাঁড়িয়ে আছে, তার পাশে কোতোয়ালের পাহারাদারও দাঁড়িয়ে আছে।

নানীবেগম তাদের দিকে চেঁচিয়ে বললে—এই, তোরা দূরে সরে যা, যা—

যেন অনিচ্ছার সঙ্গেই তারা আরো দূরে সরে গেল। নানীবেগমকে কোনো কিছু কথা বলা তাদের এক্তিয়ারে নেই।

—বল মা, এবার বল,—বলে মরালীর কানের কাছে মুখ সরিয়ে আনলে নানীবেগম।

মরালী বললে—ওই পাষণ্ডটার কুর্তার ভেতরে একটা চিঠি পেয়েছি আমি! ওই ছোরাটা টেনে নিতে গিয়ে চিঠিটাও বেরিয়ে এসেছিল—

—কীসের চিঠি? কার চিঠি? কে কাকে লিখেছে?

মরালী বললে—সে তুমি জানতে চেও না নানীজী, জানলে তোমাদের অনেক আমীর-ওমরাও জড়িয়ে পড়বে—আমি তো সকলের নাম জানি না, মনে হলো নবাব তাদের বিশ্বাস করেন—

—সে চিঠি কই, দেখি? দেখা আমাকে। আমি কাউকে বলবো না, দেখা—

মরালী বললে—সে আমি তোমাকে দেখাবো না নানীজী, আমি মহকুমে কাজার সদরস্-সুদুর সাহেবকে দেখাবো—

—তা আমাকে দেখালে দোষ কী? আমি তো বলছি কাউকে বলে দেবো না।

—না নানীজী, তুমি জানো না, যখন পাষণ্ডটা মরছে, ঝর-ঝর করে রক্ত বেরোচ্ছে বুক দিয়ে, তখনো আমার হাত থেকে চিঠিটা কেড়ে নেবার জন্যে হাত-পা ছুঁড়তে চেষ্টা করেছে, আমি তখন তার বুকের ওপর দাঁড়িয়ে ক্যাঁৎ-ক্যাঁৎ করে লাথি মেরেছি, তবে হারামজাদা মরেছে—

নানীবেগমসাহেবা তখন মরালীর চিবুকটা ধরে আদর করতে লাগলো—তা বেশ করেছিস মা, তুই লাথি মেরেছিস, কিন্তু আমাকে সেটা দেখাতে দোষ কী! তাতে তো তোরই ভালো হবে—

—না নানীজী, তাতে আমারও ভালো হবে না তোমারও ভালো হবে না। যারা জানে আমার কাছে চিঠিটা আছে তারা সকাল থেকে কেবল আমার কাছে এসেছে, আমাকে কেবল জিজ্ঞেস করেছে, আমি ওমরাহ্ সাহেবকে কেন খুন করেছি তাও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জানতে চেয়েছে—

নানীবেগম বললে—তাহলে তুই চিঠিটা দেখা মা আমাকে, আমি একবার দেখে আবার তোকে ফিরিয়ে দেবো—আমি শুধু মীর্জাকে বলবো কোন্ কোন্ লোক তার শত্রু, কোন্ কোন্ লোক তাকে মসনদ থেকে সরাতে চাইছে—

মরালী বললে—শুধু মসনদ থেকে নয় নানীজী, এই পৃথিবী থেকেই নবাবকে সরাতে চাইছে—নবাবকে একেবারে খুন করবার ষড়যন্ত্র করেছে।

—ওমা, কী সব্বোনাশ? দেখি মা, কার কার নাম আছে ওতে—

হঠাৎ নেয়ামত কাছে এসে ডাকলে—নানীবেগমসাহেবা—

নানীবেগম পেছন ফিরে দেখলে নেয়ামত আর কোতোয়ালের লোক আবার ফাটকের কাছে সরে এসেছে।

নানীবেগম ঝাঁঝিয়ে উঠলো—আবার এখানে সরে এসেছিস, বেল্লিক কাঁহিকা, বাহার নিক্‌লো—

—মেহেদী নেসার সাহেব এসেছেন বেগমসাহেবা, মেহেদী নেসার সাহেব, ইয়ারজান সাহেব মরিয়ম বেগমসাহেবার সঙ্গে মুলাকাৎ করতে এসেছে—

ঠিক এই সময়েই এল! আর আসবার সময় পেলে না। নামগুলো শুনে নানীবেগম প্রথমে ভেবেছিল চলে যেতে বলবে তাদের, কিন্তু কী ভেবে আবার বললে—আচ্ছা নিয়ে আয় তাদের—

মেহেদী নেসার সাহেব প্রথম দিকে জানতে পারেনি। নবাব মীর্জা মহম্মদ পুর্ণিয়ায় যাবে লড়াই করতে শওকত জঙ্‌-এর সঙ্গে। খবরটা ইয়ার-বক্সীদের কাছে সুখবর। সেপাইরা যখন লড়াই করবে তখন নবাবের সঙ্গে থাকবে কে? নবাবের সঙ্গে খোজা যায়, বাঁদী যায়, বেগম যায়। বাঈজী, তয়ফাওয়ালী, বাজনাদার, কেউই বাদ পড়ে না। নবাবের বেগমদের জন্যে খানা যায়, খানা-পাকাবার বাবুর্চি যায়। লোক-লস্কর-পাইক-বরকন্দাজ সবাই যায়। আর যায় ইয়ার-বক্সীরা। যখন শিবিরের ভেতরে নবাবের জন্যে নাচ হয় তখন ইয়াররা 'সাবাস' দেয়। গানের সময় যখন সম্‌ পড়ে তখন 'শোহান্‌-আল্লা' চেঁচায়। অর্থাৎ যেন যুদ্ধের ভাবনা ভুলে থাকতে পারে নবাব, যেন নাচ দেখে গান শুনে চাঙ্গা হয়ে ওঠে নবাব।

ওদিকে মোহনলাল তখন কামান ছুঁড়ছে নবাবগঞ্জ লক্ষ্য করে। নবাবগঞ্জ আর মনিহারীর মধ্যে শওকত জঙ্‌ শিবির বসিয়েছে। আর এদিকে নবাবের শিবিরের মধ্যে তখন নতুন তয়ফাওয়ালী গান গাইছে—ইয়ে দিল্‌ দিওয়ানা হো চুকা...

বোধ হয় রাতটা নির্ভয়ে নির্বিঘ্নেই কাটতো। কিন্তু তা হলো না। মেহেদী নেসার সাহেবের অত সখের তয়ফাওয়ালীর গান শোনা হলো না। অনেক দাম দিয়ে ফয়জাবাদ থেকে আনা বাঈজী একেবারে বরবাদ হয়ে গেল হঠাৎ।

—ওমরাও সাহেব!

মেহেদী নেসার সাহেব মুখ ঘুরিয়ে লোকটাকে দেখেই বললে—কী রে ইব্‌লিশ?

—সফিউল্লা সাহাব খুন হো গয়া সাহাব!

তড়াক করে লাফিয়ে উঠেছে মেহেদী নেসার সাহেব। অত দামী নাচ-গান-তয়ফাওয়ালী, সবকিছু ছেড়ে উঠে পড়েছে এক নিমেষে। ইয়ারজান সাহেবও এক মনে দিল খুশ করে গান শুনছিল। তাকেও ডেকে বাইরে নিয়ে এল মেহেদী নেসার, বাইরে তখন অন্ধকার। এক-একটা কামান ছুঁড়ছে আর আগুনের পিন্ডটা গিয়ে পড়ছে নবাবগঞ্জের বিলের দিকে।

—কে খুন করলে?

—মরিয়ম বেগমসাহেবা!

মেহেদী নেসার সাহেবের মুখ দিয়ে একটা অশ্রাব্য গালাগালি বেরিয়ে এল।

ইবলিশ বললে—কোতোয়াল সাহাবকে খবর ভেজিয়ে দিয়েছি, এখন মতি-ঝিলের ফাটকে আটকা আছে।

—ফাটক কে পাহারা দিচ্ছে?

—কোতোয়ালের লোক আর নেয়ামত খাঁ খিদ্‌মদ্‌গার!

—ঘোড়া তৈয়ার?

ইয়ারজান সাহেব কী করবে বুঝতে পারছিল না। মেহেদী নেসার সাহেবের তখন যেন ভূত দেখার মত অবস্থা। বললে—জলদি কর ইয়ার, সফিউল্লা খাঁর কাছে করিম খাঁর খত্‌ আছে, সে খত্‌ বে-হাত হয়ে যেতে পারে—জলদি কর—

ইয়ারজান সাহেবেরও যেন নেশা ছুটে গেল করিম খাঁর নামটা শুনে। এখন যদি সব ফাঁস হয়ে যায় তো মুশকিল। সে-চিঠি যদি মরিয়ম বেগমের হাতে পড়ে গিয়ে থাকে! কিংবা নানীবেগমের হাতে। তাহলে যে সবাই ধরা পড়বে, সবাই গর্দান হারাবে।

নবাবের তখন বোধ হয় তন্দ্রার মত এসেছে। নিঃশব্দে দুজনে বেরিয়ে এল রাস্তায়। রাস্তার ওপর সেপাইরা তখন মোহনলালের হুকুম তামিল করবার জন্যে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। ওদিক থেকে শওকত জঙের মীর বক্সী কারগুজার খাঁর সেপাইরা বিলের ওপর দিয়ে যাতে এদিকে ঝাঁপিয়ে না পড়ে তারই বন্দোবস্ত করে রেখেছে মীরজাফর সাহেব।

—কৌন?

লম্বা-চওড়া হাঁক দিলে সিপাহি-সর্দার।

মেহেদী নেসার আর ইয়ারজান আর ইবলিশ তিনজনেই তিনটে ঘোড়ায় করে পাঞ্জা দেখিয়ে সেপাইদের বেড়া পেরিয়ে এল। মুর্শিদাবাদ থেকে সোজা ঘোড়া নিয়ে দৌড়তে দৌড়তে এসেছিল ইবলিশ। অনেক পথ পেরিয়ে জান দিয়ে সে ছুটে এসেছে শুধু মেহেদী নেসার সাহেবের নিমকের মর্যাদা রাখতে। মাঝে মাঝে ইবলিশ যে মেহেদী নেসার সাহেবের কাছে মাসোহারা পায় সে তো এইসব কাজের জন্যেই। কে কোথায় যাচ্ছে, কে কাকে কী বললে, কোথায় কী কানাঘুষো হচ্ছে, তা ইবলিশকেই মেহেদী নেসার সাহেবের কানে তুলে দিতে হয়। তারপর যা কিছু করবার তা মেহেদী নেসার সাহেব নিজেই করে। তখন ইবলিশের ছুটি। চেহেল্‌-সুতুনের ভেতরে যা-কিছু হয়, জগৎশেঠ-মীরজাফর-মনসুর আলি মেহের সাহেবের দফ্‌তরেও যে ঘটনা ঘটে, তার খবর মেহেদী নেসারের কানে তুলে দেওয়া তার কাজ।

কিন্তু সফিউল্লা খাঁ যে এমন কাঁচা কাম করবে তা মেহেদী নেসার সাহেব ভাবতে পারেনি। কথা ছিল করিম খাঁ কী কী বন্দোবস্ত করেছে তা লিখে সফিউল্লা সাহেবের হাতে দেবে। নবাব যখন পূর্ণিয়াতে থাকবে তখনই সব বন্দোবস্ত করতে হবে। বেল্লিক, বেত্তমিজ, বেওকুফ, হারামজাদা! যখন সঙ্গে অত জরুরী খত্‌ রয়েছে তখন কি কেউ মেয়েমানুষের দিকে নজর দেয়? মেয়েমানুষের দিকে নজর দেওয়ার সময় তো অঢেল রয়েছে হাতে। চিঠিটা আর কারো হাতে পড়ে গেলে সব মতলব যে খোলসা হয়ে যাবে!

ভোর হয়ে এসেছিল রাজমহলের পথেই। তারপরেই তীর বেগে তিনটে ঘোড়া

ছুটে চললো দক্ষিণের রাস্তাটা ধরে।

যখন মুর্শিদাবাদ পৌঁছুল তখন আর একটা দিন, আর একটা রাতও কাবার হয়ে গেছে। পরের দিনের ভোর বেলা যখন কাজীসাহেবের হাবেলীতে পৌঁছুল তখন বেশ সকাল।

কাজীসাহেব নিজামতি মহকুমে কাজার সদরস্-সুদুর। নামাজ পড়া তার শুরু হয় ভোর বেলা, শেষ হয় ঘণ্টা দু'এক পরে। মেহেদী নেসার সাহেবকে দেখে দাড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে সেলাম আলেকুম করলেন।

সব শুনে বললেন—দিনকাল বড় খারাপ পড়েছে নেসার সাহেব, সব চীজ মাংগা হয়ে যাচ্ছে, নিজামতি নোকরিতে আর মজা নেই তেমন—

নেসার সাহেব বললে—কিন্তু এ তকলিফ আপনাকে করতেই হবে কাজীসাহেব—

—ওই তো বললুম জনাব, সব চীজ্ মাংগা হয়ে যাচ্ছে, দুনিয়ার জিন্দগী ভি মাংগা হয়ে যাচ্ছে ঔর মুর্দা ভি মাংগা হয়ে যাচ্ছে—

—আপনি কত নেবেন বলুন কাজীসাহেব, অত বাহানা করবেন না।

কাজীসাহেব আবার দাড়িতে হাত বোলাতে লাগলেন। বললেন—মরিয়ম বেগমসাহেবা এখন কোথায় আছে?

—মতিঝিলে!

কাজীসাহেব বললেন—সে-চিঠি যদি দুসরা কারো হাতে চলে গিয়ে থাকে?

ইবলিশ বললে—না হুজুর, আমি নেয়ামতকে বলে রেখেছি কাউকে যেন মুলাকাত করতে না দেয় মরিয়ম বিবির সংগে—

কাজীসাহেব বললেন—তাহলে তাড়াতাড়ি কোতোয়ালীতে নিয়ে গিয়ে আটকে রাখতে হবে, নইলে মরিয়ম বিবি সব ফাঁস করে দেবে।—আর নবাব কোথায়?

—পুর্ণিয়ায়। শওকত জঙ্-এর সংগে জোর লড়াই চলছে দেখে এসেছি।

—নবাব কবে নাগাদ লেট্‌বে?

মেহেদী নেসার সাহেব বললে—সে কাজীসাহেব এখন দেরি হবে অনেক, শওকত জঙ্-এর তাগদ কম নয়, তার মীরবক্সী কারগুজার খাঁ জাঁদরেল লড়নে-ওয়ালা—আপনি বে-ফিকির থাকুন! ওই মরিয়ম বিবির হাতে যদি চিঠি পড়ে থাকে তো আমাদের সব মতলব বরবাদ হয়ে যাবে। তখন জান নিয়ে টানাটানি হবে আমাদের।

—সফিউল্লা সাহেবের কাছে সে-চিঠি নেই ঠিক জানেন জনাব?

ইবলিশ বললে—সফিউল্লা খাঁর কাছে কোনো চিঠি নেই জনাব, কোতোয়াল সাহেব মুর্দা ঘেঁটে পায়নি!

—আর করিম খাঁ? চিঠি ঠিক দিয়েছিল তো করিম খাঁ?

ইবলিশ বললে—করিম খাঁর সংগে আগেই তো মোলাকাত করেছি কাজীসাহেব, সে বলছে সফিউল্লা সাহেবের হাতে চিঠি দিয়ে দিয়েছে নেসার সাহেবের জন্যে! সে চিঠি যখন সফিউল্লা সাহেবের বরাবর পাওয়া গেল না, তখন কে নেবে আর? হরগিজ মরিয়ম বিবি নিয়েছে—

কাজীসাহেব আবার দাড়িতে হাত বোলাতে লাগলেন। বললেন—সব চীজ মাংগা হচ্ছে জনাব, এটা তো আপনাদের খেয়াল রাখতে হয়!

মেহেদী নেসার সাহেব রেগে গেল। বললে—তাই তো বলছি, কত নেবেন তাই বলুন, বেশি বাহানা করবেন না—পাঁচ শো আশ্রফি?

—কী যে বলেন, পাঁচ শো আশ্‌রফি তো আমার মুফ্‌তী খুদ নেবে, তারপর আছে আমার কাজী উল্‌ কোজাত্‌—তারপর আছে দারোগা-ই-আদালৎ—সব চীজ যে মাঙ্গা হয়ে যাচ্ছে আজকাল জনাব—

—আচ্ছা, তা হলে এক হাজার আশ্‌রফি!

কাজীসাহেব দাড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে হো-হো করে হেসে উঠলেন। যেন ছেলেখেলা করছে এরা তার সংগে।

শেষ পর্যন্ত রফা হলো দশ হাজারে। দশ হাজার আশ্‌রফিতে সফিউল্লা খাঁ সাহেবের খুনের প্রতিশোধ কেনা হয়ে গেল। মেহেদী নেসার, ইয়ারজান, করিম খাঁ সকলের জিন্দগী কিনে ফেলাও হলো, এ তো খুব সস্তা-দরই পড়লো বলতে গেলে।

কিন্তু কাজীসাহেব ধারে বিশ্বাস করেন না, নগদ চাই!

মেহেদী নেসার বললে—আমিও ধারে বিশ্বাস করি না কাজীসাহেব, নগদই দেবো—কিন্তু মরিয়ম বেগমকে ফাঁসিতে লট্‌কাতেই হবে—

নগদই দেওয়া হলো আশ্‌রফি। মোহরগুলো যে কোথা থেকে মেহেদী নেসার বার করলো রাতারাতি কে জানে! অনেক ডিহিদার, অনেক ফৌজদার, অনেক তালুকদার জমিদারের পরমায়ু নিঙড়ে উপায় করা মোহর আবার সদরস্‌-সুদুরের হাতে উপুড় করে দিতে হলো।

কাজীসাহেব বললেন—যদি ভালো চান জনাব তো মরিয়মবিবিকে কোতোয়ালীতে এনে রাখুন, নইলে আমার হাতের বাইরে চলে যাবে। তখন আপনাদের মোহর ভি চলে যাবে, আপনাদের জান ভি চলে যাবে—

—আলেকুম সেলাম জনাব!

মেহেদী নেসার চলে গেল। সংগে সংগে ইয়ারজান ইবলিশ তারাও সেলাম করে চলে গেল। কাজীসাহেব মোহরগুলো নিয়ে ঘরের ভেতরে লোহার সিন্দুকে রাখতে গেলেন। কিন্তু বাইরে তখনই আবার যেন কে ডাকলে সদরস্‌-সুদুরকে।

—কৌন?

মোহরগুলো রেখেই কাজীসাহেব ফিরে এসে দেখেন নজর মহম্মদ দাঁড়িয়ে আছে।

—কী রে, তুই? তবিয়ত আচ্ছা তো?

—তবিয়ত তো আচ্ছা, লেকে্‌ন্‌ কাম পে ফাঁস গিয়া সাহাব। একজন গরীব আদমীকে আপনার পাশ নিয়ে এসেছি দোয়ার জন্যে!

গরীব আদমী, দোয়া, এই-সব কথা শুনেই কাজীসাহেবের খুশ মেজাজটা বিগড়ে গেল আবার। গরীব আদমীরা আবার তাঁর কাছে কী করতে আসে!

—আমার কী সময় আছে রে এখন! কাছারিতে যেতে হবে। আর দিনকাল যা পড়েছে, সব চীজ মাঙ্গা হয়ে যাচ্ছে, দেখছিস তো—

নজর মহম্মদ বললে—তা তো হাড়ে-হাড়ে বুঝছি হুজুর, লেকি্‌ন্‌ এ বড়া গরীব আদমি!

—কোথায় সে?

—হুজুর, বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে এসেছি, ভরসা দেন তো ভেতরে ডেকে নিয়ে আসি!

—কী কাম আমার কাছে?

—হুজুর, সে খুদ্‌ নিজেই হুজুরের বরাবর তার আর্জি পেশ করবে।

ভরসা পেয়েই নজর মহম্মদ বাইরে গেল। আর সঙ্গে করে নিয়ে এল একজন লোককে। সদরস্-সুদুর সাহেব গোঁফ-দাড়ির ফাঁক দিয়ে ভালো করে লোকটার দিকে চেয়ে দেখলেন। জওয়ানী ছোকরা, কিন্তু গরীব আদমীদের দেখতে পারেন না সদরস্-সুদুর সাহেব। গরীব আদমীরা সদরস্-সুদুর সাহেবের চক্ষুশূল। তাদের না আছে রেস্ত না আছে দিল-দিমাগ!

নজর মহম্মদ বললে—হুজুর, এর নাম কান্ত সরকার, সারাফত আলির খুশ্বু তেলের দুকানের পেছনে থাকে, বড় গরীব।

—কী চায় এ? কাজী সাহেব জিজ্ঞেস করলেন।

নজর মহম্মদ বললে—হুজুর, মরিয়ম বেগম সফিউল্লা সাহেবকে খুনের দায়ে গ্রেফতার হয়েছে, এখনো মতিঝিলের ফাটকে আটকে আছে—তাকে ফাঁসির হাত থেকে বাঁচিয়ে দিতে হবে—

—কেন?

—হুজুর, মরিয়ম বেগমসাহেবা এর ভারি পেয়ারের মেয়েমানুষ। বড় পেয়ার করে এ মরিয়ম বেগমকে, মরিয়ম বিবির ফাঁসি হয়ে গেলে এর কলিজা একেবারে ফেটে যাবে হুজুর! আপনি যদি মরিয়ম বিবিকে ছেড়ে দেন তো এর খুব আনন্দ হয়! তার জন্যে আপনাকে এ খুশী করে দেবে—

সব শুনে কাজীসাহেব দাড়িতে হাত বুলোতে লাগলেন।

বললেন—দুনিয়া বড় খত্‌রা হয়ে গেছে রে নজর, আজকাল সবকিছু মাঙ্গা হয়ে যাচ্ছে, দেখছিস্ তো, বড় খত্‌রা হয়ে যাচ্ছে দুনিয়া—

নজর বলতে লাগলো—বড় গরীব মানুষ এই কান্তবাবু হুজুর, ছ'টাকা তলব্ পায়, উপরি ভি নেই, কোত্থেকে দেবে আপনাকে বেশি—

কাজী সাহেব তখনো দাড়িতে হাত বোলাচ্ছেন। বলতে লাগলেন—সব চিজ্ মাঙ্গা হয়ে যাচ্ছে এটা তো তোদের খেয়াল রাখতে হয় নজর!

নজর বললে—তাই তো বলছি কত নেবেন তাই বলুন, বেশি বাহানা করবেন না পাঁচ শো আশ্‌রফি!

—কী যে বলিস, পাঁচ শো আশ্‌রফি তো আমার মুফ্‌তি খুদ নেবে, তারপর আছে আমার কাজী-উল-দোজাত্—তারপর আছে দারোগা-ই-আদালৎ—সব চিজ যে মাঙ্গা হয়ে যাচ্ছে আজকাল নজর—

—আচ্ছা, তাহলে এক হাজার? তার বেশি ও দিতে পারবে না হুজুর, ও মারা যাবে, জানে মারা যাবে—

গরীব আদমি! বেশি আর টানাটানি করলেন না কাজীসাহেব।

বললেন—ঠিক আছে, গরীব আদমী, তাহলে তাই-ই দে—

নজর উঠে দাঁড়ালো। বললে—বহুত্ মেহেরবানি হুজুর, আশ্‌রফি নিয়ে এসে কালই ও দিয়ে যাবে আপনার বরাবর—মেহেরবানি রাখবেন গরীবের ওপর হুজুর—

নজর মহম্মদের সঙ্গে কান্তও বাইরে বেরিয়ে এল।

ওদিকে মতিঝিলে তখন মেহেদী নেসার সাহেব, ইয়ারজান সাহেব, ইব্‌লিশ মিঞা সবাই গিয়ে হাজির হয়েছে। সঙ্গে কোতোয়াল সাহেবও গিয়েছে।

ফাটকের সামনে গিয়ে নানীবেগমকে সবাই মাথা নিচু করে কুর্নিশ করলে।

—মরিয়ম বেগমসাহেবকে কোতোয়ালীতে নিয়ে যেতে এসেছি বেগমসাহেবা।

—কাজীসাহেবের পরোয়ানা আছে?

—জী বেগমসাহেবা!

নানীবেগম কী যেন ভাবলে। তারপর বললে—মীর্জা মুর্শিদাবাদে আসবার আগে এর বিচার হবে, না পরে হবে?

—তা তো মালুম নেই বেগমসাহেবা! কাজীসাহেব জানে!

তারপর নানীবেগম মেহেদী সাহেবের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করল—পূর্ণিয়ার লড়াইএর খবর কী নেসার? মীর্জা ভালো আছে?

—হ্যাঁ বেগমসাহেবা!

তারপর কোতোয়াল সাহেব মরিয়ম বেগমকে নিয়ে ফাটকের বাইরে এল। মরালীও যেন মরিয়া হয়ে উঠেছে। যেতে যেতে বললে—আসি নানীজী!

কোতোয়াল সাহেব মরিয়ম বিবিকে পালকিতে তুলে নিয়ে রাস্তার দিকে চলতে লাগলো। পেছনে পেছনে ঘোড়ায় চড়ে চলতে লাগলো কোতোয়াল সাহেব, মেহেদী নেসার সাহেব, ইয়ারজান সাহেব, আর আরো অনেকে।

কাজীসাহেবের হাবেলির বাইরে এসে দাঁড়াতেই কান্ত হতাশ হয়ে পড়লো। হাজার আশ্‌রফি। হাজার আশ্‌রফি দিলে মরালীকে কাজীসাহেব ছেড়ে দেবে। কিন্তু এই এক দিনের মধ্যে হাজার আশ্‌রফি কী রকম করে জোগাড় করবে!

হঠাৎ সামনে দিয়ে একটা পালকি আসছিল—হট্ যাও—হট্ যাও—

তফাতে সরে দাঁড়ালো কান্ত। নজর মহম্মদ বললে—ওই তো কোতোয়াল সাহেব মরিয়ম বিবিকে কোতোয়ালীতে নিয়ে যাচ্ছে—

—আর ওরা কারা?

—আরে ওই তো কোতোয়াল সাহেব, মেহেদী সাহেব, ইয়ারজান সাহেব, আর পাহারাদারের দল—

সেদিন সরখেল মশাই আবার এসে উঠলো হাতিয়াগড়ের অতিথিশালায়। কেষ্টনগর থেকে এসেছে। খাজাঞ্চিবাবুকে ডেকে বললে—ছোটমশাই আছেন নাকি খাজাঞ্চিবাবু?

খাজাঞ্চিবাবু চেহারা দেখেই চিনে ফেলেছে। চুপি চুপি বললে—কেষ্টনগর থেকে এসেছো নাকি তুমি?

—আজ্ঞে, হ্যাঁ কর্তা!

—তাহলে এস আমার সঙ্গে—

বলে সোজা অন্দর-বাড়ির সিঁড়ি দিয়ে একেবারে ছোটমশাইএর ঘরে নিয়ে গেল। তার সেখানে পৌঁছিয়ে দিয়ে খাজাঞ্চিবাবু নিচেয় নেমে এসেছে।

ছোটমশাইএর হাতে চিঠিটা দিতেই ছোটমশাই বললেন—তুমি নিচেয় যাও, আমি তোমায় খবর পাঠাবো।

সরখেল চলে যেতেই ছোটমশাই লেফাফাখানা ছিঁড়ে চিঠিখানা পড়তে লাগলেন। চিঠিটা লিখছেন মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের মন্ত্রী কালীকৃষ্ণ সিংহ মহাশয়—

শ্রীযুক্ত রাজা হিরণ্যনারায়ণ রায় বাহাদুর অসংখ্য দীন প্রতিপালকেষু—

রাজাধিরাজ মহারাজ নবদ্বীপাধিপতি শ্রীল শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র রায় আজ্ঞা মত অত্র পত্রে নিবেদন কুরু, মহাশয়, মহাশয়ের ধর্মপত্নীকে অস্মাদাঞ্চলে মহারাজ-ভবনে

পাঠাইবার ব্যবস্থাদি করিয়াছিলেন। সেই মত মহারাজ কতিপয় দিবস অপেক্ষা করণান্তর হতাশ-পূর্বক জ্ঞাত করাইতেছেন যে অদ্যাবধি হাতিয়াগড়ের রাণী-মহাশয়ার আগমনের কোনও লক্ষণাদি নাই। বহু দিবস গত হওন পর কোনও বিপদাপদ আবির্ভাবের সন্দেহ উদ্রেক হওয়ায় অত্র পত্র পত্র-বাহক মারফৎ প্রেরিত হইল। মহাশয় পত্রান্তরে সন্দেহভঞ্জন করতঃ শুভম্বিশেষঃ সংবাদ দানে চিত্ত-বিক্ষোভ রহিত করিবেন বাঞ্ছা করিয়া পত্র সমাপ্ত করিলাম। ইতি...চির-বশংবদ—

বড় বউরানী ঘরে এসেছিলেন। বললেন—কার চিঠি?

—এই দেখ—বলে ছোটমশাই চিঠিটা এগিয়ে দিলেন।

তারপর অনেকক্ষণ দুজনেই চুপ করে রইলেন। এ ক'দিন ছটফট করছিলেন ছোটমশাই। তাঁরও ঘুম আসেনি রাত্রে। দিনের বেলাতেও কাছারিতে আসেননি। জগা খাজাঞ্চিবাবু সেরেস্তার কাগজ-পত্র নিয়ে এসে দরকার মত দেখিয়ে গেছে। হুকুমনামা নিয়ে গেছে। প্রজা-পাঠকরা যারা দেখা করতে এসেছে তারা জেনে গেছে ছোটমশাইএর শরীর খারাপ। নিচেয় নামবেন না।

—সরখেল মশাই আছে না চলে গেছে?

ছোটমশাই বললেন—আছে, অতিথশালায় থাকতে বলেছি—

বড় বউরানী বললে—এ-চিঠির কী উত্তর দেবে, কিছু ভেবেছো?

—না, এখনো কিছু ভেবে পাইনি।

বড় বউরানী বললে—তুমি ভেবে পাওনি, কিন্তু আমি ভেবে ফেলেছি—

—কী ভেবেছো?

বড় বউরানী বললে—তুমি মহারাজকে লিখে দাও, আমি নিজে যাবো মহাতাপ-চাঁদ জগৎশেঠের কাছে, যদি মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র পারেন তো তিনি একবার যেন সেখানে আসেন।

—তুমি যাবে? তুমি নিজে?

—কেন, দোষ কী?

—না, সে-কথা বলছি না, জগৎশেঠজীর কাছে গিয়ে তোমার লাভ কী হবে? ছোটবউকে কি জগৎশেঠ লুকিয়ে রেখে দিয়েছে?

—না, তা রাখেনি। লুকিয়ে রেখেছে নবাবের লোক

—কী করে জানলে?

—কেন, নবাবের লোক লুকিয়ে রাখতে পারে না? নবাবের কোন্ কাজটা করতে বাধে শুনি? পরের বউ-এর ওপর নজর যে দিতে পারে, সে সব পারে! আমি নিশ্চয় করে বলছি, এ আর কারো কাজ নয়; নবাবের ডিহিদার-ফৌজদার আর তার চরেরা মিলে এ-কাজ করেছে। ওই যে লোকটা এসেছিল, নিজের নাম বলেছিল কার্তিক পাল—ওই বশীর মিঞাই এই কাণ্ড করেছে।

ছোটমশাই বললেন—বশীর মিঞা কী করে জানবে? তার আগেই তো মাঝ-রাত্তিরে বজরা করে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে—

—তা তুমি কি ভেবেছো ওদের এক জোড়া চোখ? তাহলে এখানে ডিহিদার রেজা আলি রয়েছে কী করতে? ঘাস কাটতে?

ছোটমশাই বললেন—সেইজন্যেই তো আমি ওদের অমন করে একা-একা পাঠাতে চাইনি, তুমি জোর করলে তাই তো পাঠালাম, তখনি জানতুম একটা-না-একটা বিপদ বাধবে। শেষে যা ভেবেছিলুম তাই হলো তো? এখন মহারাজাই বা কী করবেন, জগৎশেঠজীই বা কী করবেন? কোথায় যে তারা আছে, কী করছে,

কী খাচ্ছে, কারো বোঝবার উপায় নেই।

বড় বউরানী বললে—দোষ তুমি তো আমারই দেখলে। আর যখন ছোটকে নিয়ে মুর্শিদাবাদে গিয়েছিলে তখন তো আমার পরামর্শ নাওনি? তখন তো আমার কথা একবারও শোননি? তখন আমার কথা শুনলে কি আর এই দুর্দশা হয়! তখনই তো তোমার ভাবা উচিত ছিল এ-সব কথা—।

তারপর একটু ভেবে বললে—তা সে যা-হবার তা হয়ে গেছে, এখন ভাবলে কোনো লাভ নেই, এখন আমি মুর্শিদাবাদে যাচ্ছি, তার জোগাড়-যন্ত্র করে দাও—

—তুমি যাবে মুর্শিদাবাদে? সেখানে কোথায় গিয়ে উঠবে? কার কাছে যাবে?

—তা বাঙলা দেশে কি মানুষ নেই? সব মানুষ কি বাঙলা দেশের মরে গেছে? জগৎশেঠজীরও তো বউ-ঝি আছে, তাঁরও তো একটা বাড়ি আছে, সে-বাড়িতে তো থাকবার জায়গাও আছে! সেখানেই গিয়ে উঠবো। গিয়ে জগৎশেঠজীকে বলবো যে আপনারা থাকতে বাঙলাদেশের মেয়েরা কি সব আগুনে ঝাঁপ দিয়ে পুড়ে মরবে? রাজপুতদের মেয়েদের মত জহর-ব্রত করবে?

ছোটমশাই বললেন—তুমি একটু মাথা ঠাণ্ডা করো, যা করবে মাথা ঠাণ্ডা করে করো। অমন হুট্‌পাট করে কিছু কোর না। তাতে তোমারও ভালো হবে না, আমারও ভালো হবে না—

বড় বউরানী বললে—আর ভালো হয়ে কাজ নেই, যথেষ্ট ভালো হয়েছে—

—কিন্তু শেষকালে যে সব জানাজানি হয়ে যাবে! একবার ডিহিদারের কানে গেলে তখন মেহেদী নেসারের কানেও উঠে যাবে, তখন আর সামলাতে পারবো না, তাও বলে রাখছি—

—আর সামলাবার রইলোটা কী শুনি? বউ গেল, ইজ্জৎ গেল, মান-সম্ভ্রম সব গেল, এখনো তুমি সামলাবেটা কী? সামলাবার আছে কি যে সামলাবার কথা বলছো?

ছোটমশাই বললেন—অত চেঁচিও না তুমি, কেউ শুনতে পাবে—

—তা তুমি কি ভাবো এই রকম করে বরাবর খবরটা চাপা রাখতে পারবে তুমি? একদিন ছোটবউটা গেছে, এর পর কবে তোমার তালুকও যাবে, তখন কেঁদেও কূল পাবে না!

ছোটমশাই কিছুক্ষণ ভেবে বললেন—তা তুমি কী করতে বলো আমাকে। আমি না-হয় তাই-ই করবো!

—তোমাকে আর কিছু করতে হবে না, যা করবার আমিই করবো।

—তা কী করবে তুমি সেটা আমাকে বলবে তো?

—তোমাকে বলেই বা কী লাভ হবে বলো তো! তুমি তো কোনো সুরাহা করতে পারবে না!

—বলো আমাকে, বলে দাও, কী করলে সুরাহা হয়!

—তা তোমরা এতগুলো মানুষ এক দলে রয়েছো, তোমরা সবাই মিলে পরামর্শ করে একটা সুরাহা করতে পারলে না, আর আমি মেয়েমানুষ হয়ে তোমাদের সুরাহার পথ বাত্‌লে দেবো? তুমি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের কাছে যাও, গিয়ে জগৎশেঠজীর সঙ্গে দুজনে মিলে দেখা করো! তাঁকে গিয়ে বলো যে বাঙলাদেশের মানুষগুলো মরে-হেজে যাক্‌ এইটেই কি আপনি চান? আপনার টাকা আছে, আপনার লোকবল আছে, দিল্লীর বাদ্‌শার ওপর আপনার এত জোর আছে, তবু আপনি এর একটা বিহিত করবেন না?

—তা নবাবের সঙ্গে কি লড়াই করতে বলো আমাদের?

—কেন, লড়াই করতে তোমাদের এত ভয়?

—ভয় কে বললে? কিন্তু আমাদের নিজেদের মধ্যেই যে কারোর সঙ্গে কারোর মতের মিল নেই। কে যে নবাবের দলে আর কে যে নয়, তারই যে ঠিক নেই। আমাদের সামনে তো সবাই নবাবকে গালাগালি দেয়, কিন্তু নবাবের সামনে গিয়ে আবার যে সবাই মাথা নিচু করে কুর্নিশ করে! নবাব একটু হেসে কথা বললে যে সবাই কৃতার্থ হয়ে যায়। যে-ই একটু মুখ বেঁকায় অমনি তাকে চাকরি দিয়ে নবাব দলে টেনে নেয়!

—কিন্তু আজ না-হয় হাতিয়াগড়ের বউকে নিয়ে গেছে, কাল যদি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের বউকে নিয়ে যায় তো তখন কি মহারাজ চুপ করে বসে থাকবেন তোমার মত?

—তা আমি কি চুপ করে বসে আছি? আমি কি ভাবছি না মনে করছো?

বড় বউরানী রেগে গেল। বললে—বসে বসে তুমি তাহলে ভাবো, তাতেই বউ উদ্ধার হয়ে যাবে, আর কি!

—তা তুমি অমন রাগ করছো কেন? দুটো পরামর্শের কথা বলো, তাহলে তো তবু আমি শান্তি পাই।

—সবাই যখন মরো-মরো, তুমি তখন শান্তি চাইছো! বেশ তো!

ছোটমশাই বললেন—তাহলে তুমি যা বলছো তাই-ই করি! আজকেই রওনা দিই কেষ্টনগরে, গিয়ে মহারাজকে নিয়ে জগৎশেঠজীর কাছে যাই। গিয়ে বলি এইসব ব্যাপার!

—হ্যাঁ, বলবে! তারপর ফিরিঙ্গীরা রয়েছে, ফরাসী-ফিরিঙ্গীরাও রয়েছে, তারাও তো ক্ষেপে আছে নবাবের ওপর, তাদেরও তো তোমরা দলে টানতে পারো! ইচ্ছে থাকলে কী না পারে লোকে। আর তা যদি না বলতে পারো তো আমি নিজেও গিয়ে বলতে পারি!

—না না, তুমি মেয়েমানুষ, তুমি যাবে, সেটা ভালো দেখাবে না!

—কেন, রানীভবানীও তো তোমাদের দলে, তিনিও তো মেয়েমানুষ! তিনি যদি আসেন, আমিও যেতে পারি!

—রানীভবানী আর তুমি? ওঁরা কী ভাববেন বলো তো?

—কী আর ভাববেন, ভাববেন হাতিয়াগড়ের জমিদারের কোনো সাহস নেই তাই তার বউকে পাঠিয়েছে। তুমি কি নিজেকে পুরুষমানুষ বলতে চাও? পুরুষমানুষ হলে কি এর পরেও কেউ চুপ করে বাড়িতে বসে থাকতে পারে? আজ তোমার চক্ষুলজ্জাটাই বড় হলো, আর নিজের বউএর ধর্মটা কিছু নয়?

ছোটমশাই গম্ভীর হয়ে ছিলেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন—তাহলে আজই যাবার ব্যবস্থা করি, যদি কেউ জিজ্ঞেস করে তো বলে দিও আমি তীর্থে দেখতে বেরিয়েছি, বুঝলে?

সরখেল মশাই তখনো অতিথিশালায় ছিল। তার হাতে চিঠি দিলেন ছোট-মশাই। লিখলেন—আমি আপনার চিঠি পাইয়া অতিশয় চিন্তান্বিত হইয়া পড়িয়াছি। অবিলম্বে আপনার বরাবর হাজির হইয়া সমুদয় নিবেদন করিবার মানস করিয়াছি। সাক্ষাতে সমস্ত জ্ঞাত করাইব।

সেদিন গভীর রাতে ছোটমশাই আবার নদীর ঘাটে একটা বজরাতে উঠলেন। গোকুলও সঙ্গে সঙ্গে বজরায় উঠলো। কাকপক্ষীতেও যাতে টের না পায় তাই

সরখেল মশাইকে আগেই যাত্রা করতে বলে দিয়েছিলেন। ছাতিমতলার ঢিবির কাছে যেন কালো মতন একটা কী নড়ে উঠলো।

ছোটমশাই-এর কী যেন সন্দেহ হলো। গোকুলকে জিজ্ঞেস করলেন—ওখানে কে রে গোকুল?

গোকুলও দেখতে পেয়েছিল। জোরে গলা ছেড়ে জিজ্ঞেস করলে—ওখানে কে গা, কে ওখানে দাঁড়িয়ে?

কেউ উত্তর দিলে না। শুধু মনে হলো ছায়ামূর্তিটা যেন নড়ে উঠে সরে গেল। কিন্তু কিছু উত্তর দিলে না।

গোকুল আবার চেঁচিয়ে উঠলো—কে ওখানে? ওখানে কে সরে গেলে?

তবু কারো উত্তর নেই।

তবে হয়তো গরু-টরু হবে। কেরষাণটা গাইটাকে গোয়ালে পুরতে ভুলে গেছে।

গোকুল বললে—ও ওই ভূতেশ্বরের কান্ড, শ্যামলা-গাইটাকে বাইরে রেখেই খোঁয়াড় বন্ধ করে দিয়েছে হুজুর, ওখেনে ঘাস খেয়ে বেড়াচ্ছে—যদি—

ছোটমশাই বললেন—থাক গে, এবার বজরা ছাড়তে বল্—

কিন্তু বজরা ছাড়বার আগেই ছাতিমতলার ঢিবির ওপার থেকে চিৎকার এল সরখেল মশাই-এর। সরখেল মশাই চিৎকার করতে করতে দৌড়ে আসছে—ও গো, কাদের নৌকো গো, একটু বাঁধো, আমি যাবো গো—

গোকুল বজরা বাঁধতে বললে। কিন্তু ছোটমশাই সরখেল মশাইকে দেখে অবাক হয়ে গেছেন।

সরখেল মশাইও ছোটমশাইকে দেখে হতবাক্।

—এ কি? তুমি? তুমি যাওনি এখনো? তোমাকে যে দু প্রহরের সময় যেতে বললাম!

সরখেল তখনো হাঁফাচ্ছে। নদীর ঘাটে বৈঠার ঝপ্-ঝপ্ শব্দ পেয়েই দৌড়ে এসেছিল ঊর্ধ্বশ্বাসে।

বললে—হুজুর, সব্বোনাশ হয়ে গেছে—

—কী হলো?

—আজ্ঞে, ডিহিদারের লোক ধরে নিয়ে গিয়েছিল আমাকে!

—কেন?

—তা জানিনে হুজুর, অতিথশালা থেকে আমি বেরোচ্ছি, হঠাৎ কে একজন এসে আমাকে ডিহিদারের দফ্তরে যেতে বললে।

ছোটমশাই বললেন—সর্বনাশ! তারপর?

—তারপর আজ্ঞে, ডিহিদার আমাকে জিজ্ঞেসবাদ করলে আমি কোত্থেকে এসেছি, কী কাজে এসেছি, কেন এসেছি, হ্যান্-ত্যান্ কত কী! শেষে আমাকে বললে—চিঠিখানা দেখি?

—তুমি চিঠি দিলে নাকি?

—আমি কি দিতুম হুজুর? তারা যে কেড়ে নিলে।

—কেড়ে নিলে আর তুমিও দিয়ে দিলে? চিঠিখানা পড়লে নাকি ডিহিদার?

—আজ্ঞে হাঁ, পড়লেন। সবটা পড়লেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন আমি কী চিঠি নিয়ে এসেছি, সেখানাতে কী লেখা ছিল? আমি বললাম, আমি তা দেখিনি হুজুর, আমি লেখাপড়া জানি না, দেখলেও পড়তে পারতাম না।

ছোটমশাই চিন্তিত হয়ে উঠলেন। বললেন—কী সর্বনাশ করলে এখন বল

দিকিনি সরখেল। আমি তোমায় কতবার সাবধানে যেতে বলেছি না, আর তুমি কিনা এই কাজ করলে?

—আমি তো কতবার এমনি চিঠি নিয়ে গিয়েছি হুজুর, কখনো তো এমন হয়নি!

আর কী হবে! যা হবার তা হয়ে গেছে। ছোটমশাই বজরা ছাড়তে বলে দিলেন। কাছি খুলে দিলে মাঝিরা। ছোটমশাই সরখেলমশাইকে জিজ্ঞেস করলেন—যে-লোকটা তোমায় ডেকে নিয়ে গেল তার কী-রকম চেহারাটা বলো তো? মনে আছে?

সরখেল মশাই বললে—খুব মনে আছে হুজুর, পাতলা ক্ষয়া চেহারা, শ্যামলা রং গায়ের, মাথায় বড় বড় চুল, মুখে নুর!

ঠিক হয়েছে! ছোটমশাই শিউরে উঠলেন চেহারার বর্ণনা শুনে। বশীর মিঞা! বশীর মিঞা তাহলে আবার এসেছে হাতিয়াগড়ে। সেবার কার্তিক পাল সেজে এসে উঠেছিল অতিথিশালায়, এবার এসে উঠেছে ডিহিদার রেজা আলির দফ্‌তরে! কিন্তু এবার কীসের মতলব!

ছোটমশাই-এর বজরা তখন সোঁ-সোঁ করে তীরের বেগে উজানে বয়ে চলেছে।

বরানগরের ছাউনির ভেতর তখন ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষের মানচিত্র আঁকা হতে চলেছে পাকাপাকিভাবে। সে ভারতবর্ষ আর-এক ভারতবর্ষ। সে ভারতবর্ষ থেকে র-মেটিরিয়াল চালান যাবে ইউরোপে, আর ফিনিশড্-প্রোডাক্ট হয়ে আমদানী হবে এই ইণ্ডিয়ায়। এরা কাপড় পরতে পায় না, এখানে চালান করবে সেই কাপড় ইংলণ্ড। সেই মানচিত্রে ইণ্ডিয়ার রং হবে রেড। সেই রেড রং দিয়েই এম্পায়ারের ভিত্‌ তৈরি হবে এখানে। এই যেখানে হাতিয়াগড়ের ছোটরানী আর তার ঝি দুর্গা এসে উঠেছে। শুধু যে লাল রং হবে তাই-ই নয়, ইংলণ্ডের ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রিভলিউশনের সঙ্গে সঙ্গে যাতে রেডি-মার্কেট পাওয়া যায়, তার জন্যেও তো জমি তৈরি করার দরকার; ইণ্ডিয়ার মত এমন উর্বর জমি কোথায় পাওয়া যাবে? এখানে বাদশার অস্তিত্ব তখন লোপাট হবার জোগাড়। এখানে-ওখানে যে-সব স্টেট আছে তারা বাদশাকে খাজনা দেবার কথাও ভুলে গেছে ইচ্ছে করে। তারপর মানুষ যারা তখনো কোনো রকমে টিঁকে আছে, তারাও মনে মনে বলছে—আমাদের তোমরা বাঁচাও সাহেব, আমরা মরে যাচ্ছি—

ওয়াটসন সেই চিঠিখানা দেখালে, সেই চিঠির উত্তরটাও দেখালে।

কর্নেল ক্লাইভ পড়তে লাগলো।

'মান্যবর নবাব-বাহাদুর বরাবরেষু—

ইংরেজ-কোম্পানীর বাণিজ্য রক্ষার্থ ইংলণ্ডাধিপ আমাকে এই দেশে প্রেরণ করিয়াছেন। আপনি বলপ্রয়োগে ইংরেজাদিগকে কলিকাতা হইতে বিতাড়িত করিয়াছেন। তাহাদের বহু পল্টন ও বহু অর্থ লুণ্ঠিত হইয়াছে। ইংরেজ-কোম্পানীর বাণিজ্যের জন্য মোগল-এম্পায়ারের প্রভূত মুনাফা আসিতেছে। আপনার আমীর-ওমরাহরা এবং আপনার বেগমরা পর্যন্ত আমাদের কোম্পানীর সহিত বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন করিয়া উপকৃত হইতেছেন। অতএব ভরসা করি,

ইংরাজ পক্ষের বাণিজ্যাধিকার পুনঃপ্রদান ও ন্যায়সঙ্গত ক্ষতিপূরণ করিয়া বাধিত করিবেন...'

—এর উত্তরে নবাব কী লিখেছে?

ওয়াটসন বললেন—এই দেখ নবাবের চিঠি। নবাব লিখেছে—'আপনার পত্র পাইবামাত্রই উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু বোধ হইতেছে সে উত্তর আপনারা পান নাই। সুতরাং পুনরায় লিখিতেছি—ইংরেজ অধ্যক্ষ ড্রেক আমার আদেশ না-মানিয়া পলায়িত প্রজা কৃষ্ণবল্লভকে আশ্রয় দিয়াছিলেন, তজ্জন্য তাহাকে শাস্তি দিয়াছি। তাহার বদলে অন্য কাহাকে অধ্যক্ষ মনোনীত করিলে ইংরেজদিগের বাণিজ্যাধিকার পুনঃস্থাপনায় আমার কোনও আপত্তি নাই।'

—তারপর দেখ, আমি সেই চিঠির উত্তরে এই চিঠি লিখেছিলাম—'রাজারা স্বকর্ণে শুনিয়া বা স্বচক্ষে দেখিয়া কার্য করেন না, এজন্য কুটিল কর্মচারিবর্গের দ্বারা তাঁহারা অনেক সময় প্রতারিত হন। আপনার নিজের আমীর-ওমরাহরাই যত নষ্টের জড়। আপনি সেই কুপরামর্শদাতাদের শাস্তি দিন, ইংরেজপক্ষের লোকসানের ক্ষতিপূরণ করুন। ড্রেক সাহেব কোম্পানীর ভৃত্য। তাহাকে শাস্তি দিবার অধিকার আপনার নাই। কোম্পানীর নিকট জানাইলে কোম্পানীই তাঁহার বিচার করিবেন।'

ওয়াটসন বললেন—এর পর কী করতে চাও তুমি, বলো—এ-চিঠির উত্তর এখনো কিছু আসেনি—

কর্নেল ক্লাইভ বললে—আমি বলি নবাবের সঙ্গে ঝগড়া করে আমরা পারবো না—

—তুমিও শেষকালে ভয় পেয়ে গেলে?

ক্লাইভ হাসলো। বললে—ভয় পেলে আর এখানে আসতুম না এমন করে। ভয় পেলে ইংলণ্ডেই থেকে যেতুম, কিন্তু ভয় আমার জন্যে নয়, ভয় তোমার জন্যে, ভয় তোমাদের কোম্পানীর জন্যে। মোটা টাকা প্রফিট বন্ধ হবার ভয়। ফ্রান্সের সঙ্গে এখন লড়াই বেধেছে আমাদের, সে-চিঠি তো তুমি পেয়েছো। এই সময় নবাব যদি এখানকার চন্দননগরের ফ্রেঞ্চ-কম্যাণ্ডারের সঙ্গে হাত মেলায় তখন আমাদের দশা কী হবে ভাবো তো—

হঠাৎ হরিচরণ ঘরে ঢুকলো। বললে—আপনাকে একবার ভেতরে ডাকছেন—

—কে?

—দুগ্যা দিদি!

ক্লাইভ বললে—বলো যাচ্ছি—

ওয়াটসন জিজ্ঞেস করলে—সেই ফিমেল দুটোকে এখনো রেখেছো নাকি?

ক্লাইভ রেগে উঠলো—ফিমেল বোল না, বলো লেডী! একটু রেসপেক্ট নিয়ে কথা বলা উচিত মেয়েদের সম্বন্ধে।

—ও, তুমি এখনো সেই রকম আছ দেখছি। যদি লড়াইতে জিততে চাও তো ও-সব ছেড়ে দাও রবার্ট, মেয়েদের উইকনেস সর্বনাশ করে দেবে তোমার। ভুলো না আমরা এখানে ফুর্তি করতে আসিনি—

আবার সেদিনকার মত ক্লাইভের মাথায় রক্ত চড়ে উঠেছিল। কিন্তু নিজেকে সামলে নিলে। বললে—তুমি এখন যাও ওয়াটসন, আমি এখন টায়ার্ড—

ওয়াটসন গজ্ গজ্ করতে করতে চলে গেল। ক্লাইভ ভেতরের দিকে আসতেই দেখলে, দাওয়ার ওপর কে বসে রয়েছে।

—তুমি কে? হু আর ইউ?

লোকটা উঠে দাঁড়ালো। মাথা নিচু করে প্রণাম করলে। বললে—অধীনের নাম উদ্ধব দাস হুজুর—

—তার মানে বেগার! ভিক্ষে চাও? না, এখানে কোনো ভিক্ষে-টিক্ষে হবে না।

ক্লাইভ সাহেব রেগেই ছিল সেই থেকে। ওয়াটসনের কথায় মেজাজ বিগড়ে গিয়েছিল। তারপর এই ভিখিরিটা এখানে এসেছে। হয়তো ভিখিরি নয়, নবাবের মিলিটারি ইনফরমার। স্পাই। নবাবের গুপ্তচরেরা এই রকম করেই ইংলিশ আর্মির খবর নিয়ে যায়। কী-রকম একটা কৌতূহল হলো।

জিজ্ঞেস করলে—এখানে কী করতে এসেছো তুমি? আমার সেপ্টি তোমায় ঢুকতে দিলে?

—আমাকে সবাই সব জায়গায় ঢুকতে দেয় সাহেব, আমাকে সবাই ভালবাসে কিনা, শুধু আমার বউই ভালবাসে না, তাই পালিয়ে গেছে আমায় ছেড়ে—

—তোমার ওয়াইফ? তোমায় ছেড়ে পালিয়ে গেছে? হোয়াই?

—সেই জন্যেই তো আমি গান বেঁধেছি সাহেব—আমি রব না ভব-ভবনে।
যে-নারী করে নাথ পতিবক্ষে পদাঘাত, তুমি তারি বশীভূত, আমি তা সবো কেমনে।

সাহেব কথাগুলোর মানে ভালো করে বুঝতে পারলে না। বললে—তার মানে কী?

উদ্ধব দাস বললে—তার মানে হলো, আমার নিজের বউই যখন আমায় তাড়িয়ে দিলে তখন আর আমি এ-সংসারে থেকে কী করবো? আমি তাই ঘুরে ঘুরে বেড়াই সাহেব, সারা পৃথিবীই আমার সংসার, আমি যখন যেখানে থাকি সেইটেই আমার ঘর!

—হোল্ ওয়ার্ল্ড তোমার ঘর?

কর্নেল রবার্ট ক্লাইভ যেন নতুন একটা কথা শুনলো, নতুন একটা কথা শিখলো। এতদিন ইণ্ডিয়ায় এসেছে, এমন কথা তো কেউ আগে বলেনি। হোল্ ওয়ার্ল্ডই একটা ফ্যামিলি। একই ফ্যামিলিরই লোক আমরা সবাই। তবু কেন ওরা ঝগড়া করে? তবু কেন ওরা লড়াই করতে পাঠিয়েছে তাকে?

—তোমার ওয়াইফ পালিয়ে গেছে বলে সত্যিই তোমার কষ্ট হয়, না?

উদ্ধব দাস হাসলো হো হো করে। বললে—কষ্ট না হলে কি কবি হতে পারতুম গো সাহেব? কষ্ট হয় বলেই তো ওই গান বাঁধতে পেরেছি! কষ্ট হওয়া ভালো গো, সাহেব, একটু কষ্ট হওয়া ভালো। তোমার একটু কষ্ট হোক আমার মতন, দেখবে তুমিও কত কাজ করতে পারবে। আর যদি একটু অহঙ্কার হয় তোমার তো তুমি গেলে! দর্পহারী মধুসূদন—

—দর্পহারী মধুসূদন? সে কে? হু ইজ হি?

—হুজুর, তিনিই তো এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছেন, দর্প দেখলেই তিনি তাকে বিনাশ করেন! দেখছো না সাহেব, নবাবের কত দর্প আমাদের! মাথার ওপর বসে সেই দর্পহারী তো সমস্ত দেখছেন!

সাহেব এবার উদ্ধব দাসের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো।

বললে—তুমি তো বেশ নতুন-নতুন কথা বলছো পোয়েট! ইণ্ডিয়াতে এতদিন এসেছি, এ-সব কথা তো আগে আমাকে কেউ বলেনি হে!

উদ্ধব দাস বললে—তুমি আবার একটা ছড়া শুনবে সাহেব? নতুন একটা ছড়া বেঁধেছি, শোন—

বলে উদ্ধব দাস গান আরম্ভ করলে—

এসেছিলাম ভবে আমি
ভজবো বলে হরির চরণ।
পড়ে ভূমে মাটি খেয়ে
ভুলে গেল আমার এ মন॥
ঘোর জননীর মায়া,
নিত্য বাড়ে মম কায়া।
এ-সংসার ভোজবাজির ছায়া,
বিফলে গেল এ-জীবন॥
দারা-সুত-পরিবার,
দেখ রে মন কে বা কার!
আঁখি মুদলে অন্ধকার,
বেঁধে লবে তোরে শমন॥
দিনান্তরে একবার,
ডাক কৃষ্ণ সারাৎসার।
অন্তিমে পাবে নিস্তার,
তিনি ব্রহ্ম সনাতন॥

হঠাৎ গানের মাঝখানেই হরিচরণ এসে হাজির। বললে—না গো, তুমি ওদের জামাই নও গো—

—আমি ওদের জামাই নই? কিন্তু আমার সঙ্গে যে ওনার বিবাহ হয়েছে প্রভু! সম্প্রদান হয়েছে, কুশণ্ডিকা হয়েছে, মালা-বদল হয়েছে। ওনার নাম তো মরালীবালা দাসী?

কর্নেল ক্লাইভ সাহেব এতক্ষণ সব শুনে হকচকিয়ে গিয়েছিল। কিছুই বুঝতে পারছিল না।

বললে—হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই লেডীর নামও মরালীবালা ডাসী! তুমিই ওর হাজব্যান্ড?

উদ্ধব দাস সবিনয়ে বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ প্রভু! আমারই স্ত্রী উনি।

হরিচরণ বললে—না না স্যার, এ অন্য লোক, এ ওর হাজব্যান্ড নয়—

—কিন্তু পোয়েট যে বলছে ওর ওয়াইফ?

—তা বলুক, ও পাগল! পাগলের কথায় কান দেবেন না আপনি! তুমি এখন যাও বাছা, আমি ভুল করে তোমায় ডেকেছিলাম গো! তুমি যাও—

সাহেব কিন্তু ছাড়বার লোক নয়। বললে—ব্যাপারটা কী বলো তো? তোমার ওয়াইফের নামটা কী বলো তো?

—মরালীবালা দাসী, প্রভু!

—কোথায় তোমার শ্বশুরবাড়ি?

—আজ্ঞে হাতিয়াগড়ে!

সাহেব হরিচরণের দিকে ফিরে বললে—তাহলে তো সবই মিলে যাচ্ছে। পোয়েটের বউও তো পালিয়েছে। নিশ্চয়ই কোথায় গোলমাল আছে হরিচরণ!

উদ্ধব দাস বললে—ঠিক ধরেছেন আপনি প্রভু! গোলমাল আছে সে তো আমি আগেই আপনাকে বলেছি আজ্ঞে!

—কিসের গোলমাল!

উদ্ধব দাস বললে—আজ্ঞে, আমার বউ যে আমাকে পছন্দ করে না।

—কেন? লাইক করে না কেন?

—আপনিই বলুন প্রভু, আমাকে কি করে পছন্দ করবে? আমার তো চেহারা ভালো নয়, আমাকে কি পছন্দ হয় কারো?

—কিন্তু তুমি তো পোয়েট, তোমার পোয়েট্রি তো আমার খুব ভালো লাগছে! কেন তোমাকে লাইক করবে না?

তারপর বললে—চলো তো, তুমি আমার সঙ্গে ভেতরে চলো তো, তোমার ওয়াইফকে তুমি চিনতে পারবে তো?

হরিচরণ বাধা দিয়ে বললে—না স্যার, দিদি জামাইকে ভেতরে নিয়ে যেতে বারণ করেছে—

—কিন্তু হাজব্যান্ড-ওয়াইফে মিল হবে না, এটা তো ভালো কথা নয়, দিস ইজ ভেরি ব্যাড্—চলো পোয়েট ভেতরে চলো, আমি তোমার বউ-এর সঙ্গে মিল করিয়ে দেবো—

কিন্তু ভেতরে আর যেতে হলো না। ভেতর থেকে দুর্গাই বেরিয়ে এসে বললে—না সাহেব, ও আমার জামাই নয়—

তারপর উদ্ধব দাসের দিকে চেয়ে বললে—তুমি আবার কেন এখেনে মরতে এসেছো শুনি? আর মরবার জায়গা পেলে না? আমরা মরছি নিজের জ্বালায়, আর তুমি কিনা আবার জ্বালাতে এসেছো? একজনকে জ্বালিয়েও তোমার আশ মেটেনি? আর একজনের জীবনটাও নষ্ট করতে চাও?

উদ্ধব দাস হঠাৎ দুর্গাকে এখানে দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল।

বললে—আমার কী অপরাধটা হলো মা-জননী? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না—

—আর বুঝে দরকার নেই তোমার, তুমি এখান থেকে যাও—

ক্লাইভ সাহেব, হরিচরণ দুজনেই যেন হতবাক্ হয়ে গিয়েছিল কাণ্ড-কারখানা দেখে।

উদ্ধব দাস নিজের পুঁটলিটা আবার মাথায় করে নিলে। তারপর সাহেবের দিকে ফিরে বললে—তাহলে আসি প্রভু!

এতক্ষণে ক্লাইভ সাহেবের মুখে যেন কথা বেরোল। দুর্গার দিকে ফিরে বললে—তাহলে এ তোমার জামাই নয় দিদি?

দুর্গা খেঁকিয়ে উঠলো—ওই অকালকুষ্মাণ্ডটা আমার জামাই হতে যাবে কোন্ দুঃখে শুনি সাহেব? অমন জামাই-এর হাতে মেয়েকে তুলে দেওয়ার চাইতে গলায় দড়ি দেওয়া যে ভালো সাহেব—

সাহেবের যেন তবু কেমন সন্দেহ হলো। বললে—তোমার মেয়েকে একবার জিজ্ঞেস করো না দিদি, তোমার মেয়ে হয়তো জামাই-এর সঙ্গে একবার কথা বললে দুজনের মিটমাট হয়ে যেত!

—না সাহেব, আমার মেয়ে কথা বলবে না ওর সঙ্গে। তুমি যাও বাছা এখেন থেকে—

হঠাৎ এ্যাডমিরাল ওয়াটসন এসে হাজির।

—কর্নেল!

ক্লাইভ মুখ ফেরাতেই ওয়াটসন বললে—তোমার এখনো সেই নেটিভ-মেয়েদের ওপর লোভ গেল না—শোন, এদিকে নবাবের লেটার এসেছে, এই যে—

নবাব লিখেছেন—

'তোমরা হুগলী লুণ্ঠন করিয়া আমার প্রজাগণের যথেষ্ট ক্ষতিসাধন করিয়াছ। ইহা ব্যবসায়ী বণিকের উপযুক্ত কার্য নহে। আমি ইহার জন্য রাজধানী হইতে হুগলী পর্যন্ত আসিয়াছি। যাহা হউক, ইংরাজেরা যদি আমার আদেশ মান্য করিয়া বণিকের ন্যায় কার্য করেন তবে আমি যথোচিত ক্ষতিপূরণ করিয়া তোমাদের সন্তোষ-সাধন করিতে প্রস্তুত আছি। তোমরা খ্রীষ্টান, বিবাদ বাধানো অপেক্ষা গোলযোগের মীমাংসা যে শ্রেয় তাহা অবশ্যই জ্ঞাত আছ। তবে যদি তোমরা কোম্পানীর ক্ষতি করিয়া যুদ্ধ করিতেই সংকল্প করিয়া থাক, তাহা হইলে পরে আমাকে দোষ দিও না—'

ঘরের ভেতরে যেতেই ছোট বউরানী বললে—লোকটা কোথায় গেল রে দুগ্যা?

দুর্গা বললে—প্যাগলাটাকে এক ধমক দিলুম। বেটা যেতে কি চায়, কেবল বউ-এর সঙ্গে কথা বলতে চায়,—

ছোট বউরানী বললে—আহা গো, আমার বড় কষ্ট হয় রে দুগ্গ্যা ওর জন্যে—আমার জন্যে যেমন ছোটমশাই-এর কষ্ট হচ্ছে, ওরও তেমনি ওর বউ-এর জন্যে কষ্ট হচ্ছে! ছোটমশাই যেমন জানতে পারছে না আমি কোথায় আছি, ও-ও তেমনি জানে না যে ওর বউ মুর্শিদাবাদের চেহেল্-সেতুনে আটকা পড়ে আছে—

হঠাৎ দূর থেকে উদ্ধব দাসের গানের আওয়াজ আসতে লাগলো।

দুর্গা বললে—ওই দেখ কেমন গান ধরেছে পাগলাটা, কষ্ট হলে কারো গলা দিয়ে অমন গান বেরোয়?

উদ্ধব দাস তখন গলা ছেড়ে গাইছে—

আমি রব না ভব-ভবনে।
শুন হে শিব শ্রবণে॥
যে নারী করে নাথ পতি-বক্ষে পদাঘাত,
তুমি তারি বশীভূত, আমি তা সবো কেমনে॥

ক্লাইভও শুনছিল গানটা। বললে—পোয়েটের গান শুনছো ওয়াটসন্? পোয়েটটা আমায় একটা নতুন কথা শোনালে আজ। বললে কি জানো,বললে হোল্ ওয়ার্লড্টাই ওর সংসার, ও যেখানে থাকে, সেইটেই ওর ঘর! বড় ওয়াণ্ডারফুল লাগলো ওর কথাটা! তখন থেকেই কেবল সেই কথাটাই ভাবছি! হোল্ ওয়ার্লড্টাই আমার সংসার, এখন ইণ্ডিয়ায় আছি, ইণ্ডিয়াই যেন আমার ঘর!

এ্যাডমিরাল ওয়াটসন ক্লাইভের মুখের দিকে চেয়ে রইলো খানিকক্ষণ! কর্নেল রবার্ট ক্লাইভ, সেণ্ট্ ফোর্ট ডেভিডের কম্যাণ্ডারও কি শেষকালে ওই পোয়েটটার মত পাগল হয়ে গেল নাকি!

মহিমাপুরের মহাতাপ জগৎশেঠজীর হাবেলির ফটকে ভিখু শেখ তখন পাহারা দিচ্ছে। বড় কড়া পাহারাদার ভিখু শেখ। একটা মাছি পর্যন্ত জগৎশেঠজীর হাবেলির ভেতর ঢুকতে পারে না ভিখু শেখের নজর এড়িয়ে।

—এই কুত্তা, ভাগ্, ভাগ্ ইঁহাসে।

রাস্তা দিয়ে কেউ গেলেই ভিখু শেখের সন্দেহ হয়। সবাই যেন চর। সবাই

যেন শেঠজীর বাড়ির ভেতরের খবর জানতে চায়। ভেতরে কী ষড়যন্ত্র হচ্ছে তাই-ই যেন সবার লক্ষ্য!

—ভাগ্ শালা কুত্তা। ভাগ্ ইধারসে।

হাতিয়াগড়ের ছোটমশাই তখন দরবারঘরের ভেতরে চুপি চুপি কথা বলছেন। বললেন—আপনি সত্যিই জানেন? ভালো লোকের মুখে শুনেছেন?

জগৎশেঠজী বললেন—হ্যাঁ, আমার খবর ভুল হবার নয় ছোটমশাই। প্রথমে শুনেছিলাম চেহেল্-সুতুনের হারেমের মরিয়ম বেগম সফিউল্লা খাঁকে খুন করেছে। কিন্তু পরে শুনলাম, আপনার স্ত্রী!

—আপনি ভালো রকম জানেন আমার স্ত্রী?

জগৎশেঠজী বললেন—আমি তো বললুম আমার খবর ভুল হয় না। এতদিন আপনার স্ত্রীকে ওরা মতিঝিলের ফাটকে আটক রেখে দিয়েছিল, আজ ভোরে কোতোয়ালীতে এনে পুরেছে। মেহেদী নেসার আর ইয়ারজান ওরা দু'জন কাজী-সাহেবের কাছে গিয়েছিল। কাজীসাহেবের কাছে দরবার করে দশ হাজার আশ্রফি ঘুষ দিয়েছে—

—কেন?

জগৎশেঠজী বললেন—সফিউল্লা সাহেবের কাছে একটা চিঠি ছিল, সেটা তার শরীর তল্লাসী করেও পাওয়া যায়নি। ওরা বলছে, সেটা নাকি আপনার স্ত্রীর কাছেই আছে।

—কীসের চিঠি?

—সেই চিঠিখানাতে নবাবকে খুন করবার মতলবের কথা লেখা ছিল। করিম খাঁ পাঠিয়েছিল মেহেদী নেসারের কাছে। সে চিঠি যদি আপনার স্ত্রী নবাবকে দেখিয়ে দেয় তো মেহেদী নেসার, ইয়ারজান সকলের ফাঁসি হয়ে যাবে। তাই আপনার স্ত্রীকে ফাঁসি দেবার জন্যে ওরা কাজীসাহেবকে ঘুষ দিয়েছে।

ছোটমশাই যেন বজ্রাহতের মত অচৈতন্য হয়ে গেলেন। এই ক'দিনের মধ্যে এত কাণ্ড হয়ে গেছে!

—তাহলে তাকে বাঁচাবার কী উপায় হবে শেঠজী?

জগৎশেঠজী বললেন—আপনি এখনি গিয়ে কাজীসাহেবের সঙ্গে দেখা করুন। ওরা দশ হাজার আশ্রফি দিয়েছে, আপনি পনেরো হাজার আশ্রফি ঘুষ দিন। সব ফয়সালা হয়ে যাবে।

—কিন্তু পনেরো হাজার আশ্রফি আমি এখন এত শিগগির কোথায় পাবো?

জগৎশেঠজী বললেন—আপনার কিছু ভয় নেই, আমি দেবো, আপনি হুণ্ডি কেটে দিন, পরে শোধ করে দেবেন।

ছোটমশাই বললেন—তাহলে তাই দিন শেঠজী, আমি আর ভাবতে পারছি না, যেমন করে পারুন আমায় এই বিপদ থেকে উদ্ধার করুন!

কোতোয়ালীর ফাটকের মধ্যেও মরালীর শান্তি ছিল না। একবার কে একজন আসে, উঁকি মেরে দেখে যায়, আবার তার পরেই আসে আর একজন। চারদিকে পাকা ইঁটের দেওয়াল। শুধু সামনে একটা লোহার গরাদে দেওয়া দরজা। আর নেই কোথাও। সেই সকাল বেলাতেও ভেতরটা অস্পষ্ট অন্ধকার। যেন রাত। চেহেল্-সুতুনের হারেমের মতই কোনো দিকে পালাবার উপায় নেই।

মেহেদী নেসার প্রথমেই কোতোয়াল সাহেবকে পাঠিয়েছিল। বেশ মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে খুশী করতে চেয়েছিল মরালীকে। কোনো তকলিফ থাকলে যেন মুখ

ফ্রুটে বলেন বেগমসাহেবা। বেগমসাহেবার কী কী অসুবিধে হচ্ছে বললে তখনই তার প্রতিকার করবেন তিনি।

মরালী শুধু বলেছিল—আমার কোনো তকলিফ নেই—

—বেগমসাহেবা নাস্তা করবেন?

মরালী বলেছিল—না—

—খানা? কী খানা খাবেন বেগমসাহেবা?

মরালী বলেছিল—যা খুশি, যা আপনারা দেবেন!

প্রথমবার এইটুকু মাত্র। তারপর অনেকবার এসেছে, খোঁজ নিয়েছে, তবিয়ৎ কেমন আছে সবিনয়ে জিজ্ঞেস করেছে! কোনো কথারই স্পষ্ট জবাব দেয়নি মরালী!

শেষকালে শুরু হলো কড়া কড়া কথা। বেগমসাহেবা কোথা থেকে ছুরি পেলেন?

—ওর হাতেই ছুরি ছিল, আমি কেড়ে নিয়েছিলুম।

—আর কী কেড়ে নিয়েছিলেন?

—আর কিছু কেড়ে নিইনি।

—কোনো চিঠি?

—না।

এমনি করেই সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত অনেকবার জেরা চললো। শেষকালে বোধ হয় কোতোয়াল বুঝতে পারলে, এ বেগমসাহেবা সাধারণ বেগমসাহেবা নয়। সাধারণত এ রকম ব্যাপারে ভয় দেখিয়ে কড়া কথা বললেই কাজ হয়ে যায়। অন্য বেগমসাহেবারা কেঁদে ফেলে। কেঁদে সব কথা বলে দেয়। তারপর হাত জোড় করে ম্যাফি চায়। এমন অনেকবার হয়েছে। তারপর কাজীসাহেবের কাছারিতে বিচার হয়ে তাদের ফাঁসি হয়ে গেছে। চেহেল্-সুতুনের ভেতরে হলে সে বিচার খোজারাই করে। পীরালি খাঁ নিজেই মহড়া নেয়। নবাব থাকেন তার হুকুমদার, কিন্তু এ খুন হয়েছে মতিঝিলে। মুর্শিদাবাদের কোতোয়ালের এক্তিয়ারের ভেতরে। এর বিচার করবে কাজীসাহেব। এ বিচারে মেহেদী নেসারের হাত আছে। সে ইচ্ছে করলে ফাঁসিও দিতে পারে, ফাঁসির হাত থেকে ছাড়িয়ে আনতেও পারে। এ ব্যাপারে আশ্রফির খেলা চলে দু'পক্ষ থেকে। যে যত বড়লোক আসামী, তার বিচারে তত বেশি আশ্রফি খরচা হয়ে যায়। একবার যদি কাজীসাহেব জানতে পারে আসামী বড়লোক, ততই ঝুলিয়ে রাখে বিচারটা। দু'পক্ষ থেকেই লোক আসে, দর কষাকষি হয়, দর ওঠে আর কাজীসাহেব তত ভারিক্কী চালে কথা বলে।

মুর্শিদকুলী খাঁর আমল থেকেই এমনি চলে আসছে। এর জন্যে দিল্লীর বাদ্শার হুকুমের দরকার হয় না। নিজামতি ফারমানে অনেক অধিকার নবাব বহুদিন থেকেই ভোগ করে আসছে! বিশেষ করে শাহান্শা আওরংজেব বেহেস্তে যাবার পর থেকে। নবাবজাদা মীর্জা যখন মুর্শিদাবাদের রাস্তায় হোসেনকুলী খাঁকে খুন করে, তখনো তার কাছে কেউ জবাবদিহি চায়নি। চাইবার সাহসই পায়নি। ফৈজী বেগমকে যখন গুম্ খুন করে নবাবজাদা মীর্জা মহম্মদ হাতের রক্ত ধুয়ে পরিষ্কার করে ফেলেছিল, সেদিনও কেউ তার কৈফিয়ৎ চায়নি। শুধু কি নবাবজাদা মীর্জা মহম্মদ? নবাব আলীবর্দী খাঁ-ই কি কিছু কম অপরাধ করেছেন। পাটনার সুন্দর সিংকে নিজের বাড়িতে নেমন্তন্ন করে এনে যেদিন খুন করেছিলেন সেদিনও কেউ তাঁকে দোষ দেয়নি। আবদুল করিম খাঁকে নিজের তিনজন লোক দিয়ে দরবারের মধ্যে খুন করেও আল্লার দরবারে বেকসুর খালাস পেয়ে গিয়েছিলেন

আলীবর্দী খাঁ। এইটেই ছিল নবাবী রীতি। এই নিয়মই নিজামতের কাজীসাহেবের কাছারিতে চলে আসছিল বরাবর। এরই বা হঠাৎ ব্যতিক্রম হবে কেন?

মেহেদী নেসার আর বেশি দেরি করেনি। সন্ধ্যে হতেই এসে হাজির হয়েছিল কোতোয়ালীতে!

ফাটকের দরজাটা খুলতেই তন্দ্রা ভেঙে গিয়েছিল মরালীর। আগের রাত্রে ঘুম হয়নি, খাওয়া হয়নি, পরের দিনও সারাদিন তাকে নিয়ে জেরা চলেছে। ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল সমস্ত শরীর।

—কে?

নিজের ছায়া দেখেই যেন নিজে চমকে উঠেছিল মরালী। মরালী নিজেই যেন নিজেকে খুন করতে এসেছে কোতোয়ালীর ফাটকের ভেতরে।

—আমি, বেগমসাহেবা, আমি মেহেদী নেসার!

—কী চাই আপনার?

—আমি বেগমসাহেবার বরাবরে কুর্নিশ দিতে এসেছি!

মরালী বুঝতে পারলে মতলবটা। বললে—আমি এখন আর বেগমসাহেবা নই, আমি খুনের আসামী!

—তা হোক, তবু বেগমসাহেবা বেগমসাহেবাই!

—আপনি কী চান?

—বেগমসাহেবা কি সফিউল্লার কাছ থেকে কোনো চিঠি নিয়ে লুকিয়ে রেখেছেন?

—যদি লুকিয়েই রাখি, তা আপনাকে বলতে যাবো কেন? আপনি কে?

মেহেদী নেসার সাহেব হেসে উঠলো শব্দ করে। বললে—আমি? আমি বেগমসাহেবার বান্দা!

—বান্দা তো বান্দার মত করে কথা বলুন!

এবার মেহেদী নেসারের শক্ত হবার পালা। বললে—আমি বেগমসাহেবার শরীর তালাস করতে এসেছি, কুর্নিশ করতে আসিনি। সেই চিঠি আমার চাই!

—খবরদার, আমাকে ছুঁও না।

মেহেদী নেসার হাত বাড়িয়ে ছুঁতে এল মরালীকে।

—খবরদার! আর কাছে এলে বিপদ আছে তোমার বলে রাখছি!

—মেহেদী নেসার বিপদ কাকে বলে তা জানে না বেগমসাহেবা। কী বিপদ সেটা একবার জানিয়ে দিলে ভালো হয়!

মরালী দাঁত দিয়ে নিজের হাতটা কামড়ালো।

—তাহলে বলে রাখছি। সফিউল্লা খাঁ যেখানে গেছে, তোমাকে সেখানেই পাঠাবো!

মেহেদী নেসার আর দেরি করলে না। একেবারে মরালীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে হাত দুটো চেপে ধরলে!

ইতিহাসের পাতায় যত অনাচার-অত্যাচারের কাহিনী লেখা আছে এ তাদেরই মধ্যে আর একটা নয়। তবু এ এমন নতুন কিছুও নয়। কোতোয়ালসাহেবের এ সব দেখা আছে। শহরের বাইরে যখন সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা আপাতভাবে অব্যাহত গতিতে চলেছে, তখন তার আড়ালে-আবডালে তার অলিতে-গলিতে যা ঘটে তার প্রমাণ কোথাও থাকে না। আবদুল করিমের খুনের উপাখ্যান লিখে গেছে গোলাম হোসেন। নাজির আহম্মদের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে সরকারে বাজেয়াপ্ত হওয়ার উপাখ্যানও লিখে গেছে তারিখ-ই-বাঙলার অজ্ঞাতনামা লেখক। নাজির আহম্মদের ফাঁসি হবার পর তার মসজিদ বাগানবাড়ি কেমন করে সুজাউদ্দীনের ফর্‌রাবাগে রূপান্তরিত হয়েছিল, তার উপাখ্যানও লেখা আছে তারিখ-ই-বাঙলার পাতায় পাতায়। কিন্তু কত মরালী, কত কান্ত, কত সারাফত আলি, কত রাণীবিবি ইতিহাসের অন্দরমহলে দীর্ঘশ্বাসের তাপে শুকিয়ে ক্ষয় হয়ে গেছে, তার নজীর মুতাক্ষরীণ, তারিখ-ই-বাঙলা, রিয়াজুস-সালাতিনেও নেই। এমন কি নিজামতি সেরেস্তার রেকর্ডেও তার হদিস মেলবার কোনো ভরসা নেই। নেই বলেই হয়তো উদ্ধব দাস এই 'বেগম মেরী বিশ্বাস' কাব্য লিখেছিল। কে জানে!

পুরোন পাণ্ডুলিপি নিয়ে যাঁরা ঘাঁটাঘাঁটি করেন তাঁরা জানেন, গল্প যেখানটায় খুব জমে ওঠে, পোকাগুলো ঠিক জায়গা বুঝে বুঝে সেই জায়গাগুলোতেই দাঁত বসায়। এর পরেই উদ্ধব দাস লিখেছে—

মরাও নয় জীয়ন্তও নয়, যেমন চিররোগী
হিন্দুও নয় যবনও নয়, তার সাক্ষী যুগী।
এখন রাম ভজি কি রহিম ভজি
দিশে পাইনে কীসে মজি।
নিশে কে করে শেষে আমার পক্ষে।
এখন ব্রত করি কি রোজা করি
সন্ধ্যে করি কি নামাজ পড়ি
করতে চাই তো পরকালটা রক্ষে।
হলো কথা কওয়ার ভারি জ্বালা।
কলা বলি কি বলি কেলা
এ কি জ্বালা কাকে হেলা করিব?
দিদি বলি কি বলি নানী।
জল বলি কি বলি পানি।
কোরাণ মানি কি শাস্ত্রের মত ধরিব?
হলো মরণ কালে বিপদ ঘোর।
গঙ্গা নিই কি নিই গোর।
কার কাছে বা শরণ লয়ে থাকিব।
কিবা করেন গোকুলের চাঁদ
যা করেন পীর গোরাচাঁদ,
কিছু কিছু দুইএর মতেই চলিব॥

মোল্লাহাটির মধুসূদন কর্মকারের সঙ্গে দেখা। বললে—কী গো দাসমশাই, নতুন গান বেঁধেছো নাকি?

উদ্ধব দাস বললে—রাস্তায় হাঁটছি আর এই গান বাঁধছি—

—কী গান শুনি?

উদ্ধব দাস গানটা আবার গাইতে লাগলো। বললে—আমার কাছে সবই সমান গো মধুসূদন, ওই কোরাণ-গীতা, জল-পানি, দিদি-নানী, পীর-সাধু, মন্দির-মসজিদ সবই সমান আমার কাছে। তবু ভাবছিলুম আমরা ওই নিয়েই সবাই মাথা ঘামাচ্ছি, খোসা নিয়েই খেয়োখেয়ি করছি। আসল শাঁস ধুলোয় গড়াগড়ি যাচ্ছে—

—তা হঠাৎ একথা মাথায় এল কেন তোমার দাসমশাই?

উদ্ধব দাস তখন দাওয়ায় উঠে বসেছে। বললে—এই বরানগরে গিয়েছিলুম, সেখানে আমার বউএর সঙ্গে দেখা হলো, জানো!

—তোমার বউ? যে-বউ পালিয়ে গিয়েছিল?

—হ্যাঁ কর্মকারমশাই।

—বউ কী বললে? কেন পালিয়েছিল?

—বলবে আবার কী? হাতিয়াগড়ের রাজবাড়ির একটা ঝি ছিল, সে কি আমাকে বউএর সঙ্গে দেখা করতে দিলে? দেখা হলে তো বলতুম বউকে। বলতুম, আমার বাইরের চেহারাটা দেখেই তুমি আমার বিচার করলে গো। আমার ভেতরটা তো দেখলে না। এই তোমরা সবাই যেমন করছো?

মধুসূদন বললে—আমরা আবার তোমার কী করছি?

—তোমরা তো সবাই আমার বউএর মতন।

—আমরা তোমার বউএর মতন? বলছো কী তুমি?

—তা নয়? ওই কোরাণ-গীতা, জল-পানি, দিদি-নানী, পীর-সাধু, মন্দির-মসজিদ সবই কি এক বলে মানো তোমরা? সেই সচ্চরিত্র পুরকায়স্থকে চেনো তো? সেই যে ঘটকমশাই? সেদিন কেষ্টনগরের পথে দেখা। আমাকে দেখেই হাউ হাউ করে কান্না। বলে কি, মোছলমানরা নাকি তাকে স্লেচ্ছ মাংস খাইয়ে দিয়েছে। তার নাকি জাত গিয়েছে, তাকে নাকি তার গাঁয়ের লোক একঘরে করেছে, তার মাগ্-ছেলেমেয়ে তাকে ত্যাগ করেছে। আমি তো হেসে খুন। আমি বললুম—পুরোকায়েত্ মশাই, তোমার গা কি তুলসীগাছ যে কুকুরে পেচ্ছাব করলেই পাতাগুলো সব পচে গেল? তা শুনে কী বললে জানো?

মধুসূদন কর্মকার ও-সব বাজে কথা শুনতে চায় না। বললে—ও-সব কথা থাক দাসমশাই, তোমার বউএর কথা বলো। বউ তোমার সঙ্গে দেখা করলে না?

উদ্ধব দাস বললে—না গো, সে বউ এখন আরাম করে সাহেবের বাড়িতে আছে, আয়েস করে ভালো-মন্দ খাচ্ছে-দাচ্ছে, নফর শোভারাম বিশ্বাস মশাইএর মেয়ে, এত ভালো খাওয়া-দাওয়া তো পায়নি কখনো আগে!

মধুসূদন বললে—সাহেব? সাহেব মানে? স্লেচ্ছ সাহেব?

—হ্যাঁ গো, ফিরিঙ্গী কোম্পানীর সাহেব। কলিকালে সবাই স্লেচ্ছ, কলির দেবতাই বলে স্লেচ্ছ হয়ে গেছে হে, কেউ স্লেচ্ছ হতে বাকি নেই আর। তুমিও স্লেচ্ছ মধুসূদন, আমিও স্লেচ্ছ।

—বলছো কী দাসমশাই, পাগলের মত কী বলছো সব তুমি?

উদ্ধব দাস বললে—ঠিক বলছি মধুসূদন, আর কিছুদিন সবুর করো তখন দেখবে আল্লা-হরি সব একাকার হয়ে অন্যরকম চেহারা হয়ে গেছে—

—কী রকম চেহারা?

—ওই ফিরিঙ্গীদের মত চেহারা? তখন দেখবে আল্লা আর হরি কোট-প্যাণ্টালুন পরে গ্যাট-ম্যাট করে ঘোড়ায় চড়ে বন্দুক ছুঁড়ছে। যাকে সামনে পাচ্ছে তাকেই বন্দুক ছুঁড়ে মারছে। মারতে মারতে যখন কেউ আর থাকবে না, তখন কলিযুগ শেষ হয়ে যাবে!

—কলিযুগ শেষ হয়ে যাবে? বলো কী গো?

—তা হবে না? শেষ হলেই তো ভালো গো। তখন আবার সত্যযুগ শুরু হয়ে যাবে। আবার আরাম করে কেষ্টনগরের রাজবাড়িতে গিয়ে মুগের ডাল খাবো। হাতিয়াগড়ের অতিথশালায় গিয়ে রসের গান গাইবো। জানো মধুসূদন, হাতিয়াগড়ের ছোটরানী রসের গান শুনতে খুব ভালবাসে। নতুন নতুন রসের গান বাঁধবো আর গাইবো। সত্য যুগে একটা ভালো জিনিস হবে হে মধুসূদন, বিয়ের রাত্তিরে আর বউ পালাবে না কারো।

—কেন?

—কী করে পালাবে শুনি? তখন তো আর বাইরের চেহারা দিয়ে মানুষের বিচার হবে না গো, বিচার হবে যে গুণ দিয়ে! তোমার জাত দিয়েও বিচার হবে না, ধর্ম দিয়েও বিচার হবে না, বিচার হবে তোমার কর্ম দিয়ে। তুমি আমি যেমন কর্ম করবো, তেমনি ফলভোগ করবো। তখন কী আরামে দিন কাটাবো বলো তো মধুসূদন ভায়া?

মধুসূদন বললে—তোমার মাথাটি এবার সত্যিই খারাপ হয়েছে দাসমশাই—বউ পালিয়ে যাবার পর থেকেই দেখছি মাথাটা গোলমাল হয়ে গেছে—

—না মধুসূদন, কত গান কত ছড়া বেঁধেছি জানো! শুনবে আমার নতুন ছড়া?

—বলো।

উদ্ধব দাস বললে—তবে শোন—

পিতা-পুত্রে এক নারী করে আলিঙ্গন।
উভয় ঔরসে জন্ম উভয় নন্দন॥
অগ্রেতে তাদের নাহি পরিচয় ছিল।
অবশেষে মৃত্যুমুখে শুনিতে পাইল॥
কী নাম তাদের ভাই বল দেখি শুনি।
অনুমানে বুঝি আমি না প্যারিবে তুমি॥

হঠাৎ ছড়াটা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই মোল্লাহাটির শাহী রাস্তাটার দিকে নজর পড়ে গেছে।

—আরে, বশীর মিঞা না?

দূরে দেখা গেল ডিহিদার রেজা আলি তার 'ফিরিঙ্গি'র ওপর চড়ে আসছে, আর বশীর মিঞা ঘোড়া ছুটিয়ে কাছে এল।

—কী গো, দাসমশাই, তুমি এখেনে?

বহু দিন উদ্ধব দাসকে দেখেছে বশীর মিঞা। দুজনেই রাস্তার লোক। রাস্তায়, গাছতলায়, ধর্মশালায়, অতিথিশালায় একসঙ্গে রাত কাটিয়েছে।

উদ্ধব দাস বললে—একটা ছড়া বেঁধেছি নতুন, শুনবে মিঞাসায়েব? এই মধুসূদনকে শোনাচ্ছিলাম—

বশীর মিঞা বাধা দিলে। বললে—এখন ছড়া থাক দাসমশাই, ডিহিদার সাহেব সঙ্গে রয়েছে—তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে, বলি তোমার বউএর কিছু হদিস

পেলে? জানতে পারলে কিছু?

—পেইছি!

কথাটা শুনেই ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নেমে পড়লো বশীর মিঞা।

—সত্যি পেয়েছো? না দেয়ালা করছো?

উদ্ধব দাস বললে—নিজের মাগ নিয়ে কেউ দেয়ালা করে?

বশীর মিঞার আর তর সইছে না। বললে—পাগলামি কোর না এখন, ডিহিদার সাহেব দাঁড়িয়ে আছে, সময় নেই, এখন বল শিগ্‌গির কোথায় আছে তোমার বউ?

উদ্ধব দাস যে উদ্ধব দাস, সে-ও অবাক হয়ে গেল। বললে—তা আমার বউ-এর ওপর তোমার এত নজর কেন গো মিঞাসায়েব? আমার বউ-এর খোঁজ পাওয়া গেল কি গেল না, তা জেনে তোমার লাভ কী?

—লাভ আছে! ওদিকে হাতিয়াগড়ে সব ফাঁস হয়ে গেছে।

—ফাঁস হয়ে গেছে মানে? ফাঁস হয়ে গেছে মানেটা কী?

—তা তোমাকে সব খুলে বলতে হবে নাকি?

—তুমি খুলে না বললে তাহলে আমিও খুলে বলবো না।

বশীর মিঞা বললে—তা তুমি এত গোসা করছো কেন দাসমশাই? নিজামতি-কাছারির সব কথা খুলে বলা যায় কখনো? চারদিকে আমাদের কত দুষমন তা জানো না? আমরাও যে খুঁজে বেড়াচ্ছি তোমার বউকে?

—আমার বউকে খুঁজছো? তোমরা? কেন?

বশীর মিঞা গলাটা নিচু করে বললে—সে সব অনেক কাণ্ড। এখন সব কথা বলবার ওয়াক্‌ত্‌ নেই, নবাব পূর্ণিয়ায় গেছে নিজের ভাইজানের সঙ্গে লড়াই করতে—

—তাই নাকি? আবার লড়াই?

—হ্যাঁ, এদিকে মুর্শিদাবাদেও আবার খুনোখুনি ব্যাপার ঘটে গেছে। সফিউল্লা সাহেবকে খুন করে ফেলেছে মরিয়ম বেগমসাহেবা!

—মরিয়ম বেগমসাহেবা? সে আবার কোন্‌ বেগম?

—তুমি কি সব বেগমসাহেবার নাম শুনেছো নাকি। সে লস্করপুরের তালুকদার কাশিম আলি সাহেবের মেয়ে। তুমি তো চিনতে তাকে?

—খুব চিনতুম!

বশীর মিঞা বললে—সেই সব নিয়ে বড় হল্লা হচ্ছে দাসমশাই, আমার ফুপা মনসুর আলি মোহরার সাহেব বলেছে হাতিয়াগড়ে গিয়ে সব তালাস করে আসতে। তাই তো হাতিয়াগড়ে গিয়েছিলুম, তাই তো ডিহিদার সাহেবকে নিয়ে যাচ্ছি।

—কোথায়? কোথায় যাচ্ছো?

—সব কথা শুনতে চেও না দাসমশাই। যাচ্ছি কেষ্টনগরে। হাতিয়াগড়ের রাজাবাবু গেছে সেখানে। তার হাতের লেখা চিঠি পেয়ে গেছি আমরা। তার মধ্যে তোমার বউ-এরও নাম লেখা আছে!

—সেই চিঠিতে? আমার বউ-এর নাম? তা কী করে হয় মিঞাসায়েব? আমার বউ কোথায় আছে সে তো আমি ছাড়া আর কেউ জানে না।

বশীর মিঞা গলা নিচু করে বললে—আমি কাউকে বলবো না। বলো তোমার বউ কোথায় আছে?

—হ্যাঁ, বলি, শেষকালে আমার বউকেও তোমরা ধরে ফেল আর কি!

—না, মাইরি দাসমশাই, তোমার বউকে আমরা ধরবো না, বলো তুমি, কোথায় আছে!

—সত্যি বলছো? আমার বউকে ধরবে না?

—আরে, বউ তো তোমার নামে-মাত্তোর বউ, সে-বউএর জন্যে অত মায়া কেন তোমার? তোমার মুখে তো লাথি মেরে পালিয়ে গেছে সে!

—তবু তো বউ মিঞাসায়েব! অগ্নিসাক্ষী রেখে বিয়ে তো হয়েছে। আমার সঙ্গে না-ই রইলো, কিন্তু আমি তো নিজের হাতে তার সিঁথিতে সিঁদুর লাগিয়ে দিয়েছি, আর মন্তর পড়ে তাকে গ্রহণ করেছি!

ওদিকে ডিহিদার তখন 'ফিরিঙ্গি'র ওপর বসে ছটফট্ করছে।

বশীর মিঞা সেদিকে চেয়ে বললে—ওই দেখ, রেজা আলি দাঁড়িয়ে আছে। জানতে পারলে তোমায় কিন্তু কোতল করবে!

উদ্ধব দাস হেসে উঠলো। বললে—আমাকে ভয় দেখাচ্ছ নাকি বশীর মিঞা? তাহলে কিন্তু কিছুছু বলবো না—

বশীর মিঞা চিনতো উদ্ধব দাসকে।

বললে—না না, ভয় দেখাচ্ছি না দাসমশাই, তুমি নিজের ইচ্ছেতেই বলো, আমি জোর করবো না। কোথায় আছে বলো দিকিনি?

—পথে এসো মিঞাসায়েব! পথে এসো। তাহলে বলো তার কোনো অনিষ্ট করবে না। কথা দাও আগে!

—হ্যাঁ, কথা দিচ্ছি। তোমার বউএর কোনো ক্ষতি করবো না।

—কথা দাও তার ধর্ম রাখবে?

—রাখবো, কথা দিলাম তোমাকে।

উদ্ধব দাস বললে—তাহলে শোন, সে আছে কলকাতায়। কলকাতার উত্তরে বরানগরে ফিরিঙ্গীদের ছাউনিতে!

—ফিরিঙ্গীদের ছাউনিতে? সে কী?

উদ্ধব দাস বললে—হ্যাঁ, ফিরিঙ্গীদের কর্তা ক্লাইভ সাহেবের ছাউনিতে! সেখানে গেলেই দেখা পাবে তার।

সারাফত আলি তখনো মৌতাত করছে খুশ্‌বু তেলের দোকানে। দুনিয়াটা বেশ খুশ্‌বু হয়ে উঠেছে তার চোখের সামনে। একটা তো মরলো তবু একটা ইয়ার তো খুন হয়ে গেল! এমনি করে একদিন মেহেদী নেসার যাবে, ইয়ারজান যাবে। তারপর যাবে নানীবেগম, লুৎফা বেগম, আমিনা বেগম, ঘসেটী বেগম, পেশমন বেগম, বব্বু বেগম, তক্কী বেগম, মরিয়ম বেগম। তারপর যাবে চেহেল্-সুতুন। তারপর যাবে মুর্শিদাবাদ, চক্-বাজার। তারপর যাবে নবাব মীর্জা মহম্মদ হেবাৎ জং বাহাদুর আলমগীর! ইয়া আল্লাহ্ রসুল্ আল্লা!

হঠাৎ পেছন দিকে খুট করে একটা কীসের শব্দ হলো!

বোধহয় চুঁহা! কোঠির ভেতর চুঁহা ঢুকেছে। আবার গড়গড়ায় টান দিলে সারাফত আলি। আগরবাতির ধোঁয়ার গন্ধের সঙ্গে তাম্বাকুর গন্ধ মিশে মৌতাত বেশ আরো জম-জমাট হয়ে উঠলো। সারাফত আলি চোখ বুজে হাজী-

আহম্মদের বংশের ধ্বংস দেখতে দেখতে বেসামাল হয়ে বললে—ইয়া আল্লাহ্—

কান্ত তখন নিঃশব্দে সারাফত আলির শোবার ঘরের ভেতরে ঢুকেছে। কেউ তাকে দেখতে পায়নি। সকাল থেকেই সুযোগ খুঁজছিল সে। এই সন্ধ্যেবেলাটাই হলো আসল সুযোগ। এই সময়েই সারাফত আলির মেজাজ খুশ থাকে। এই সময়েই বাদ্শা নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকে।

কান্ত সিন্দুকের ডালাটা খুলতে গিয়ে একটু শব্দ করে ফেলেছিল। মোটা লোহার তালা ভাঙতে একটু শব্দ হবারই কথা। কিন্তু শব্দটা হতেই কান্ত নিজের নিশ্বাস বন্ধ করে ফেলেছে। এক হাজার আশ্রফি চাই। এক হাজার, কাজীসাহেব এক হাজারের কমে মরালীকে ছাড়বে না। একবার মরালীকে ছাড়িয়ে নিতে পারলে তখন আর চেহেল্-সুতুনে চলে যেতে দেবে না মরালীকে। তখন এই চক্-বাজার ছাড়িয়ে একেবারে অন্য কোথাও চলে যাবে। যেখানে যেতে চায়। যদি উদ্ধব দাসমশাইকে একবার দেখতে পায় তো তার হাতেই তুলে দিয়ে বলবে—এই নাও দাসমশাই, তোমার বউকে তুমি নাও, এখন আমার ছুটি।

হঠাৎ বাইরে চক্-বাজারের রাস্তায় যেন হুড়-মুড় করে শব্দ হলো একটা। কীসের শব্দ ওটা?

একটুখানি কান পেতে শুনতে লাগলো কান্ত!

প্রথমে মনে হলো যেন বান আসছে। ঠিক গঙ্গায় ষাঁড়াষাঁড়ি বান আসবার সময় যেমন শব্দ হয় তেমনি। তারপর গোলা-গুলি ছোঁড়ার দুম-দাম্ শব্দ! লড়াই শুরু হলো নাকি চক্-বাজারে!

অন্ধকারের মধ্যেই কান্ত হাত দিয়ে দিয়ে মুঠো মুঠো আশ্রফি তুলে নিজের কোঁচড়ে রাখতে লাগলো। গোণবার সময় নেই। বেশি নেওয়াই ভালো। না হয় বেশিই হবে! এক হাজারের বেশি। এক হাজারের বেশি নিলে তো দোষ নেই। কম হলেই মুশকিল। একটা আশ্রফি কম হলে আর কাজীসাহেব তার কথা রাখবে না।

বাইরের শব্দটা আরো বাড়তে লাগলো।

—নবাব মীর্জা মহম্মদ সিরাজ-উ-দ্দৌলা হেবাৎ জং বাহাদুর শা-কুলি খান্ আলমগীর কি ফতেহ্—

আর সবাই একসঙ্গে চিৎকার করে উঠলো—ফতেহ্—

নবাব বোধহয় পূর্ণিয়া থেকে লড়াই ফতেহ্ করে ফিরলো। সঙ্গে হাতী, ঘোড়া. সেপাই, সবাই ফিরছে। তাই এত শব্দ!

এবার আর শব্দ হলেও ক্ষতি নেই। বাইরের আওয়াজে ভেতরের আওয়াজ ঢাকা পড়ে যাবে!

কান্ত তাড়াতাড়ি মুঠো মুঠো আশ্রফি কোঁচড়ে ভরতে লাগলো।

—কৌন!

কান্তর মাথার ওপর যেন সঙ্গে সঙ্গে বাজ পড়লো শব্দ করে। কান্ত পেছন ফিরে চেয়ে দেখলে, বুড়ো সারাফত আলি দরজার ওপর দাঁড়িয়ে তার দিকে হাঁ করে চেয়ে আছে।

ভয় পেয়ে হাতটা ফসকে গেল। ফসকে যেতেই সিন্দুকের লোহার ডালাটা ঝপাং করে পড়ে গেল হাতের ওপর। হাতটা চেপটে থেঁতলে গেল। কিন্তু তবু কান্তর মুখ দিয়ে একটা টু শব্দও বেরোল না।

সারাফত আলি নেশার ঝোঁকে তখন সামনে এগিয়ে এসে খপ করে তার

গলাটা টিপে ধরেছে।

আর টিপে ধরতেই কান্তর ঘুম ভেঙে গেছে। ঘুমটা ভেঙে যেতেই কান্ত চারদিকে চেয়ে দেখলে ভালো করে। অন্ধকার ঘরে সে একা শুয়ে আছে। কেউ কোথাও নেই। ঠাণ্ডা শীতের মধ্যেও তার সমস্ত শরীর ঘেমে একেবারে ভিজে গেছে। সব নিস্তব্ধ। শুধু চক্-বাজারের রাস্তায় কয়েকটা কুকুর ঘেউ-ঘেউ আওয়াজ করছে।

ঘুম থেকে উঠে বাইরে আসতেই সারাফত আলি সাহেব ধরেছে। কাল কোথায় ছিলি? সন্ধ্যেবেলা চেহেল্-সুতুনে গেলি না কেন? ক্যা হুয়া তুমারা?

হাজারো প্রশ্ন করে তোলপাড় করে তুললো মিঞাসাহেব! তোকে খাওয়াচ্ছি, তোকে মুফত থাকতে দিচ্ছি, তোকে মোহর দিচ্ছি মিনি-মাগনা? কিছু কাম করবার নাম নেই, শুধু বে-ফিকির সময় চলে যাচ্ছে! আর ক'দিনই বা বাঁচবো? আর ক'দিনই বা আমার মোহর থাকবে! মোহর ফুরিয়ে গেলে তখন চেহেল্-সুতুনের ভেতর নিয়ে যাবে কোন হারামজাদ্?

সারাফত আলির মেজাজ এ-রকম বিগড়ে যায় মাঝে-মাঝে। সে সকাল বেলার দিকে। তখন মনে পড়ে যায় তার বয়েস বাড়ছে, মনে পড়ে যায় নবাব ফিরিঙ্গী-কোম্পানীকে লড়াইতে হারিয়ে দিয়েছে। তখন মনে পড়ে যায় জগৎশেঠজী নবাবের হাতে থাপ্পড় খেয়েছে। সব মনে পড়ে আর মনে পড়লেই মেজাজ বিগড়ে যায় তার।

ডাকে—বাদ্শা—

বাদ্শা এলেই তখন তার সঙ্গে টাকার হিসেবের গোলমাল নিয়ে কথা-কাটা-কাটি করে। তখন একেবারে অন্য মানুষ হয়ে যায় সারাফত আলি! তখন দেখে সিন্দুকের তালাটা ঠিক লাগানো আছে কি না। ভেতরে ঢুকে আরক বানানো তদারক করে। গুলীগুলো ঠিক বানানো হচ্ছে কি না নজর দিয়ে পরখ করে নেয়। কী রান্না হবে, কী খেতে ভালো লাগে বুড়োর, সব খোলসা করে বলে তখন।

কান্ত একবার ভাবলে আশ্রফির কথাটা বলবে। কিন্তু যদি রেগে যায়! যদি রেগে গিয়ে কাউকে বলে দেয়। যদি জানাজানি হয়ে যায়। বুড়ো নিশ্চয়ই জিজ্ঞেস করবে—কেন এত টাকা লাগবে? কীসের জন্যে? কার দরকার?

কী উত্তর দেবে তখন সে?

হঠাৎ বশীর মিঞার সঙ্গে দেখা। চক্-বাজারের রাস্তায় হন্ হন্ করে চলেছে বশীর।

কান্ত দৌড়িয়ে গিয়ে ধরলো তাকে!

—কী রে? কোথায় গিয়েছিলি এ্যাদ্দিন?

বশীর বললে—বড় জরুরী কামে ঠেকে গিয়েছিলুম ইয়ার, বড় মুশকিলকা কাম। সব গোলমাল হয়ে গেছে। হাতিয়াগড় থেকে এখন আসছি, নিজামত-কাছারিতে গিয়ে খবর দিতে হবে—

—কী খবর?

বশীর গলা নিচু করলে। বললে—আরে সব বিলকুল গোলমাল হয়ে গেছে। হাতিয়াগড়ের ছোটমশাই তোর বউকে কলকাতায় ভেজিয়ে দিয়েছে—

—আমার বউ?

—তোর বউ নয় ঠিক। যার সঙ্গে তোর বিয়ে হবার কথা ছিল। শোভারাম বিশ্বাসের মেয়ের সঙ্গেই তো তোর বিয়ে হবার কথা ছিল?

—হ্যাঁ।

এ-এক অদ্ভুত সংবাদ দিলে বশীর মিঞা। সমস্ত ঘটনাটা চুপ করে শুনে

গেল কান্ত। এত গন্ডগোল হয়ে গেল এই ক'দিনে। কিছুই জানতো না সে। কতদিন আগে থেকে সে মরালীকে এখানে এনে রেখে দিয়েছে, কতদিন রাত্রে চেহেল্-সন্তুনে গিয়ে সেই মরালীর সঙ্গে দেখা করেছে! বোঝা গেল সেসব কিছুই জানতে পারেনি বশীর। না পেরেছে ভালোই হয়েছে। শুধু জানে, হাতিয়াগড়ের রাণীবিবি সফিউল্লা খাঁ সাহেবকে খুন করার দায়ে কোতোয়ালীতে আটক আছে। তার কাছে যে চিঠিটা আছে সেই চিঠিটা যাতে না-পায় কেউ, সেই চেষ্টা করছে মেহেদী নেসার; আর হাতিয়াগড়ের রাজা এখানে এসেছে রাণীবিবিকে ফাঁসির হাত থেকে বাঁচাতে!

—তারপর?

—তারপর মোল্লাহাটিতে দেখা হলো উদ্ধব দাসের সঙ্গে, সেই পাগলাটা। তার কাছেই তো শুনলুম সব!

উদ্ধব দাসের কথাটা শুনে কান্ত যেন কেমন বিহ্বল হয়ে গেল।

জিজ্ঞেস করলে—সে জানে এইসব! এই এত কান্ড হচ্ছে?

—আরে সে তো পাগলা-ছাগলা মানুষ। কীসব গান বেঁধেছে, সেইসব শোনাতে লাগলো। তখন কি আর সে-সব শোনবার সময় ছিল আমার। আমার সঙ্গে ডিহিদার রেজা-আলি সাহেবও ছিল যে! সে-বেটাও তাড়া দিচ্ছে তখন!

কান্ত জিজ্ঞেস করলে—সে তার বউএর কথা কিছু জিজ্ঞেস করলে না?

—বউএর কথাও বললে। ফিরিঙ্গী-কোম্পানীর সিপাহ-শালার ক্লাইভ সাহেবের হেফাজতে রয়েছে তার বউ। তার সঙ্গে দেখা করেনি!

কান্ত চুপ করে রইলো। তবে কি রাণীবিবি কলকাতায় আছে?

বশীর বললে—আমার তাড়া আছে ইয়ার, আমি খবরটা আমার ফুপাকে দিয়ে আসি যে হাতিয়াগড়ের রাজাসাহেব মুর্শিদাবাদে এসেছে।

কান্ত বললে—তোর সঙ্গে একটু জরুরী কথা ছিল ভাই—

—কী কথা, জলদি বল্!

—আমাকে এক-হাজার আশ্রফি পাইয়ে দিবি ইয়ার? খুব দরকার ছিল আমার!

—এক হাজার আশ্রফি? তুই বলছিস্ কী? এক হাজার আশ্রফি আমি নিজে কখনো চোখে দেখেছি?

কান্ত বললে—কিন্তু আমার যে দরকার!

—কীসের দরকার তোর? এত আশ্রফি নিয়ে তুই কী করবি? বিবি পুষবি?

—না!

—তা হলে কীসের কাম তোর? খুলে বল!

কান্ত বললে—খুলে বলতে পারবো না ভাই। আমার জীবন দিয়েও যদি হাজার আশ্রফি পাওয়া যেত তো তাও দিতুম! কিন্তু আমার জীবনের আর দাম কী বল্! কানাকড়ি!

—কিন্তু কী করবি তুই অত টাকা নিয়ে, বল্ না!

কান্ত বললে—সে-কথা আমাকে জিজ্ঞেস করিসনি। আমাকে কেটে ফেললেও আমি তা বলতে পারবো না ভাই, আমি নাচার—শুধু টাকাটা পাইয়ে দে—

চক্-বাজারে তখন বেশি ভিড় নেই। মুর্শিদাবাদের রাস্তায় ভিড় শুরু হয় বেলা করে। দোকান-পশারীরা বেলা করে সওদা কেনা-বেচা করে। আগের রাত্রে অনেকক্ষণ ফুলওয়ালারা ফুল বেচেছে। গণৎকারেরা রেড়ির তেলের আলো

জ্বালিয়ে ভাগ্য গুনেছে, তাই পরের দিন ঘুম থেকে উঠতে তাদের দেরি হয়। তারপর দেরি করে কাছারি খোলে। শুধু দুপুরবেলা কয়েক ঘণ্টার জন্যে কাছারি বন্ধ থাকে। তারপর বেলা তিন-প্রহর থেকে আবার কাছারি খুলবে। তখন যারা বাইরে থেকে মুর্শিদাবাদে আসে তারা সওদা করতে বেরোয়।

—কিছুতেই দিতে পারবি না তুই?

বশীর মিঞার বোধ হয় বাজে কথা শোনবার সময় ছিল না। সে হন্ হন্ করে এগিয়ে গেল। আর ফিরে তাকালো না।

কান্ত চুপ করে সেখানেই কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর আবার পেছন ফিরলো। তারপর আবার ফিরে আসতে লাগলো সারাফত আলির খুশ্‌বু তেলের দোকানের দিকে। রাস্তার ধারে তখন সবে একজন গণৎকার আসন পেতে বসতে শুরু করছে। লোকটাকে অনেক দিন ধরে দেখে আসছে কান্ত। বুড়ো লোক। অনেক লোক ভিড় করে তার সামনে।

লোকটাও কান্তর দিকে চাইলে একবার। চেয়েই বললে—মশাই, অত ভাববেন না!

কান্ত চমকে উঠলো। সে যে এত আকাশ-পাতাল ভেবে বেড়াচ্ছে তা লোকটা কেমন করে জানতে পারলে। তা হলে তার মুখে-চোখে কি দুর্ভাবনার ছাপ পড়েছে!

—মঙ্গল আপনার কুপিত হয়েছেন। আপনি অশেষ ভাগ্যবান মশাই, আপনি অমূল্য রত্ন হারিয়েছেন, কিন্তু আবার অমূল্য রত্ন পেয়েওছেন!

কেমন যেন অভিভূত হয়ে গেল কান্ত লোকটার কথা শুনে। লোকটার সামনে এসে দাঁড়ালো। তারপর লোকটা বললে—বসুন না—বসুন—মশাই খুব ভাগ্যবান ব্যক্তি।

তখনো কেউ খদ্দের জোটেনি। কান্তর কৌতূহল হলো। বললে—আমার কাছে তো এখন কিছু নেই—

লোকটা বললে—না-ই বা থাকলো, পরে দেবেন—

কান্ত বললে—আমি কিন্তু গরীব লোক, ছ'টাকা মাইনে পাই, বেশি কিছু দিতে পারবো না—

লোকটা বললে—আপনাকে কিচ্ছু বলতে হবে না মশাই, আমি সব দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি—

বলে কী যেন অঙ্ক কষতে লাগলো একটা পাথরের ওপর। বললে—অত ভাবেন কেন বলুন তো আপনি? আপনার তো ভাবার কিছু নেই। মঙ্গলের লোক কখনো ভাবে? এগিয়ে যান ঘুঁষি পাকিয়ে। কাউকে ভয় করবেন না। লগ্নের ওপর মঙ্গল রয়েছে, বৃহস্পতি সহায়। আপনার স্ত্রী নিয়ে একটু বিপদ আছে, সাবধানে থাকবেন!

—স্ত্রী! স্ত্রী তো আমার নেই!

লোকটা মাথা নাড়তে লাগলো।

—নেই বলছেন কী! নিশ্চয় আছে। আপনি বিবাহ করেছেন আর বলছেন নেই?

কান্ত বললে—দেখুন, আমি মিথ্যে কথা বলতে যাবো কেন, আমার বিয়ের সময় গণ্ডগোল হয়ে গিয়েছিল, তারপর আর বিয়ে হয়নি!

—যার সঙ্গে বিয়ের গণ্ডগোল হয়েছিল, তাকেই আবার বিয়ে করেছেন তো?

কান্ত বললে—না—

—তার সঙ্গেই বিয়ে হবে আপনার, যান্!

কান্ত আরো অবাক হয়ে গেল। বললে—তার সঙ্গে আবার কী করে বিয়ে হবে? তার তো একবার বিয়ে হয়ে গেছে!

গণৎকারটা বললে—তা জানিনে মশাই, তবে এটুকু জেনে রাখুন, কেউ আপনাকে হারাতে পারবে না! সেই বিবাহিতা কন্যার সঙ্গেই মশাইএর বিবাহ হবে!

—সে কী?

—যা বলছি ধ্রুব সত্য!

—কিন্তু সে যে অসম্ভব! তারও ধর্ম নষ্ট হবে, আমারও ধর্ম নষ্ট হবে যে। আমাদের দুজনেরই যে জাতিপাত হবে!

—জাতিপাত হবে না। জাতিপাতের আশঙ্কা আপনার নেই। আপনার আশঙ্কা শুধু জলে!

—জল মানে?

—জল থেকে দূরে থাকবেন আর কি। জলই আপনার শত্রু!

কান্তর মনে পড়লো ছোটবেলায় একবার জলে ডুবে যাচ্ছিল। বর্গীদের হাঙ্গামার সময় কোনো উপায় না-পেয়ে গঙ্গায় ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। আর তারপরেই এসে বেভারিজ সাহেবের কাছে সোরার গদীতে চাকরি পেয়েছিল।

কান্ত উঠে আসছিল। হঠাৎ একটা লোক এসে ডাকলে। রাস্তার একধারে নিয়ে গিয়ে বললে—আপনার নাম কান্ত সরকার?

কান্ত বললে—হ্যাঁ,—

—আপনাকে ডাকছেন একজন কোতোয়ালীতে!

—কে?

—মরিয়ম বেগমসাহেবা! আজ ভোর রাত্তিরেই আমাকে খবর দিয়েছেন ডাকতে, আপনাকে পাইনি। দোকান বন্ধ ছিল। সারাফত আলির চাকরটা নানান্ কথা জিজ্ঞেস করতে লাগলো। বড় হুজ্জৎ করছিল বলে আমি চলে গিয়েছিলুম। এখন আপনাকে দেখতে পেলুম!

—তুমি কে?

লোকটা বললে—আমি কোতোয়ালীর নোকর, তদারকি করি, বেগমসাহেবার বড় তকলিফ যাচ্ছে—

কান্ত বললে—তা হলে চলো—

লোকটা আগে আগে চলতে লাগলো। সকালবেলার শহর তত জমজমাট নয়, তবু কান্তর মনে হলো অন্যদিনের চেয়ে যেন শহরটা আরো নিঝুম হয়ে গেছে। যেন সবাই বুঝতে পেরেছে। একজন মানুষকে এরা এখানে বন্দী করে রেখেছে, এখানে তাকে ফাঁসি দেবে, এখানে তার শ্বাসরোধ করে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবে, তা যেন জানতে পেরেছে সবাই। অথচ কেউ তাকে বাঁচাবার নেই। কারো কিছু করবার নেই। সবাই হাত গুটিয়ে বসে আছে। রোজ যেমন করে ভোর হয় তেমনি করেই ভোর হয়েছে, তেমনি করেই লোক-জন-পশারী এসে জুটছে বাজারে। বাঁকে করে ভারীরা নদী থেকে জল তুলে আনছে মাটির কলসীতে। রাস্তার ধুলোর ওপর জল পড়ছে টপ্ টপ্ করে। অন্য দিন এ-সব দৃশ্য দেখেছে কান্ত, কিন্তু এমন করে কখনো চোখ ভরে দেখেনি। মরালীর ফাঁসি হবার পর কান্তও যেন এ-সব এমন করে আর দেখতে পাবে না। মরালীর সঙ্গে সঙ্গে সেও

যেন নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে এ-পৃথিবী থেকে। কোতোয়ালীর সামনে বেশ নিরিবিলি তখন। লোকটা বললে—আপনি পেছনের দরজা দিয়ে আসুন হুজুর, আমি ওদিকে গিয়ে খিড়কী খুলে দিচ্ছি—

কিন্তু কান্ত ভেবে অবাক হলো, হঠাৎ মরালী তাকে ডাকতে গেলই বা কেন?

—আসুন!

লোকটা পেছনের দরজা দিয়ে আস্তে আস্তে ভেতরে নিয়ে গেল। তারপর সুড়ঙ্গ রাস্তা। সেখানে যেতেই মরালীর গলা শুনতে পেলে। মেহেদী নেসারের গলাও শুনতে পাওয়া গেল। যেন দুজনে খুব ঝগড়া হচ্ছে।

—ও কে?

লোকটাও বোধহয় অবাক হয়ে গেছে। সেও বোধহয় অবাক হয়ে গেছে মেহেদী নেসার সাহেবের গলা শুনে। সে আর এগোল না। কিন্তু কান্ত সেই গলার আওয়াজ অনুসরণ করে এগিয়ে গেল। তারপর এঁকেবেঁকে যেতে যেতে একেবারে সোজা ফটকের সামনে এসে হাজির। সেখানে তখন কোতোয়াল সাহেব বাইরে দাঁড়িয়ে আছে আর মেহেদী নেসার সাহেব মরালীর হাত ধরে টানাটানি করছে।

কান্ত আর থাকতে পারলে না। সেও সামনে গিয়ে মেহেদী নেসারের ওপর আচম্‌কা ঝাঁপিয়ে পড়লো।

নানীবেগম চেহেল্‌-সুতুনে এসে সেই ভোর বেলাই পীরালি খাঁকে ডাকলে।

পীরালি খাঁর মেজাজ বলে একটা জিনিস আছে। পীরালি খাঁ আলীবর্দী খাঁর আমলের সর্দার খোজা। নবাবী আমলের খান্‌দানি খিদ্‌মদ্‌গার। অনেক আশ্‌রফি জমিয়েছে নিজের খাশ সিন্দুকে। এখনি যদি খোজাগিরি চলে যায় তো কারোর পরোয়া করবার দরকার নেই। সোজা নিজের দেশে চলে যাবে। তালুক কিনবে, সেখানে নিজেই আবার আর একটা চেহেল্‌-সুতুন বানাবে। সেখানকার চেহেল্‌-সুতুনে আবার নবাব হয়ে বসবে। আর তা ছাড়া জগৎশেঠজীর কারবারেও পীরালি খাঁর অনেক টাকা খাটছে, সেখান থেকেও অনেক আমদানি হয় তার।

কিন্তু এবার বোধহয় সত্যি সত্যিই পীরালির নোকরিটা চলে যাবে। নইলে জুবেদার ব্যাপারে অনেকখানি অপমান মাথা পেতে হজম করতে হয়েছে। এ রকম অপমান এই-ই প্রথম। কোথাকার কোন্‌ হাতিয়াগড়ের রাণীবিবি এসে তার সমস্ত ইজ্জৎ একেবারে ধুলোয় মিশিয়ে দিলে। আগে সমস্ত বেগমসাহেবারা এসে সবাই তাকে খাতির করেছে। কিন্তু মরিয়ম বেগমসাহেবা আসার পর থেকেই যেন সব উল্টেপাল্টে গেল। চেহেল্‌-সুতুনের ভিত্‌ পর্যন্ত নড়িয়ে দিলে একেবারে মরিয়ম বেগম।

নজর মহম্মদ যা রোজগার করে তারও ভাগ দেয় পীরালি খাঁকে।

বলে—মামুলি! মামুলি নাও সর্দার!

তা যত বাইরের ছোকরা আমদানি হয়, তার ভাগ দিয়েও নজর মহম্মদের নিজের ভাগে অনেক থাকে। তারও সিন্দুক আছে। সেখানে সে মোহর জমায়।

কিন্তু এ-সব টাকা আবার অনেক খোয়াও যায়। খোজাদের টাকার ওয়ারিসন

কে-ই বা থাকে। একদিন যখন কবরে যায় তারা, তখনই সে টাকার ভাগাভাগি হয়ে যায় রাতারাতি। এমনি করে যে পুরুষানুক্রমে কত মোহর জমেছে পীরালির কাছে, তার আর গোনাগুনতি নেই।

এমনি যখন অবস্থা তখন হঠাৎ কোথাকার কোন্ মরিয়ম বেগম এসে তার ইজ্জৎ ধরে নাড়া দিলে। সর্দারের আঁতে সেদিন বড় ঘা লেগেছিল। কিন্তু নবাবজাদা মীর্জার ইজ্জতের দিকে চেয়ে মুখ বুজে ছিল—কিছু বলেনি পীরালি খাঁ!

এবার আর কোনো রাগ নেই পীরালি খাঁর মনে।

এবার পীরালি খাঁ রাত্রে বিছানায় শুয়ে দম্ ভোর সিদ্ধি খায়। ওই একটাই নেশা পীরালি খাঁর। চেহেল্-সুতুনে যখন সবাই নেশায় ঢুলু-ঢুলু করে, তখন পীরালি খাঁ একটা বাটিতে সিদ্ধির সরবৎ চুমুক দিতে দিতে স্বপ্ন দেখে তালুকদারির। নজর মহম্মদ, বরকত আলির ওপর চেহেল্-সুতুন ছেড়ে দিয়ে তখন একটু সামান্য মৌজ করে। চোখ দুটো বুজিয়ে নেয়।

কিন্তু সব দিন তা হয় না। ভোরের দিকের একটুখানি নেশা তাও এক-একদিন জমে না। তার আগেই পেশমন বিবির ঘর থেকে হল্লা ওঠে। কিংবা তক্কি বেগমসাহেবার ঘর থেকে গালাগালির চিৎকার কানে আসে। তখন আবার গিয়ে সব ঠাণ্ডা করতে হয়। নইলে নানীবেগম আবার চটে যাবে। নানীবেগম আবার ডেকে পাঠিয়ে দুটো কথা শোনাবে। কারো কথা শুনতে পীরালি খাঁ রাজি নয় জীবনে।

নইলে সব তো জানে পীরালি খাঁ।

কোন্ বেগমসাহেবার ঘরে কী ঘটছে তা তো জানতে তার বাকি নেই। নতুন যে ছোকরা আসতো মরিয়ম বেগমের ঘরে, তাকেও চিনে রেখে দিয়েছিল পীরালি খাঁ। ছোকরাটা ঠাণ্ডা মেজাজের। সারাফত আলি সাহেবের খুশবু তেলের দোকানে থাকতো আর নিজামত কাছারিতে কাজ করতো। মরিয়ম বিবির সঙ্গে বেশ ভাব জমিয়ে ফেলেছিল। কিন্তু বেশি বাড়াবাড়ি করতে গিয়েই সব গণ্ডগোল করে ফেললে।

দোষটা বরকত আলির।

—তুই কেন নিয়ে গেলি মরিয়ম বেগমসাহেবাকে? তাকে চেহেল্-সুতুনের বাইরে নিয়ে গিয়ে তোর কী কাম?

বরকত আলি বলেছিল—সর্দার, বেগমসাহেবা যে মুহব্বত করছে ওই ছোকরার সঙ্গে—

—তা মুহব্বত করছে তো করুক না, চেহেল্-সুতুনের ভেতরে মুহব্বত হয় না?

—ও ছোকরাবাবু যে আসছিল না। দিমাগ্ বিগড়ে গিয়েছিল মরিয়ম বিবির! আর পেশমন বেগমসাহেবা আমাকে মোহর দিলে, আমি কী কসুর করলুম সর্দার!

—তা, নিয়ে গেলি তো সফিউল্লা খাঁ সাহেবের নাম করলি কেন? অন্য দুসরা নাম দিতে পারলি না?

—হঠাৎ ওই নামটা মনে পড়লো যে সর্দার। নইলে এত নাম থাকতে ও-নাম ইয়াদ আসবে কেন? ওই-ই তো নসীব! ওকেই তো নসীব বলে সর্দার, সফিউল্লা খাঁ সাহেব ভি ওই বখত্ ওখানে আসবে কেন?

পীরালি খাঁ কিন্তু মনে মনে খুশী।

বলে—ঠিক করেছিস, আচ্ছা করেছিস্, বহুতখুব কাম করেছিস্—

বলে আর এক-একবার চুক্-চুক্ করে সিদ্ধির সরবতে চুমুক দেয়। তখন ভোর হয়-হয়। তখন একটু তন্দ্রা আসে পীরালি খাঁর। তন্দ্রা মানে একই স্বপ্ন। নবাবিআনার স্বপ্ন।

সেই স্বপ্নের মধ্যেই হঠাৎ নজর মহম্মদ এসে ডাকলো—সর্দারজী, সর্দারজী—

পীরালি খাঁ তন্দ্রা ভেঙে লাফিয়ে উঠলো—ক্যা হুয়া?

একটা-না-একটা দুর্ঘটনা না ঘটলে এমন করে কেউ পীরালি খাঁকে ডাকে না।

—ক্যা হুয়া?

—ময়মানা বেগমসাহেবা আয়ি।

—ময়মানা বেগমসাহেবা!

—হ্যাঁ, নানীবেগমসাহেবা এত্তেলা দিয়েছে!

তাড়াতাড়ি মাথায় পাগড়িটা পরে নিলে পীরালি খাঁ। পূর্ণিয়ার নবাব শওকত জঙ্ বাহাদুরের মা, বউ, সবাই এসে গেছে।

পীরালি খাঁ সোজা গিয়ে ফটকের সামনে দাঁড়ালো। হাতীর পিঠ থেকে নেমে আলীবর্দী খাঁ সাহেবের বিধবা মেয়ে তখন তাঞ্জামে উঠছে। তাঞ্জামে করে চেহেল্-সুতুনের ভেতরে আসবে! অস্পষ্ট কান্নার শব্দে গুন্ গুন্ করে উঠছে আবহাওয়া। সেই ভোর রাত্রেই যেন বড় করুণ হয়ে উঠলো চেহেল্-সুতুন। আলীবর্দী খাঁর তিন মেয়ের মধ্যে, দু'মেয়ে চেহেল্-সুতুনেই ছিল এতদিন। এবার আরো এক মেয়ে এল। একেবারে অনাথ হয়ে এল। শুধু মেয়ে নয়, পূর্ণিয়ার হারেমের অন্য বেগমসাহেবারাও এল। একেবারে হারেম জম-জমাট হয়ে উঠলো। নানী-বেগমের মনটাও হু-হু করে উঠলো ময়মানাকে দেখে। তবু প্রাণ ভরে কাঁদবারও উপায় নেই যেন।

সামনেই দাঁড়িয়ে ছিল আমিনা বেগম।

তাকে যেন দেখেও দেখলো না ময়মানা। এরই ছেলে তাকে অনাথ করেছে। মীর্জা মহম্মদ! যেন সমস্ত দোষটাই আমিনার। যেন আমিনাই শিখিয়ে দিয়েছে নিজের ছেলেকে।

আর সেই সময়ে নবহতখানায় ইনসাফ মিঞা নহবতে সুর ধরলে—মিঞা-কি-মল্হার।

আর সঙ্গে সঙ্গে সারা মুর্শিদাবাদে সাড়া পড়ে গেল। নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলা হেবাৎ জং বাহাদুর মীর্জা মহম্মদ আলমগীর কি ফতে—এ-এ-এ-এ—

আর সামনে-পেছনের সবাই চিৎকার করে উঠলো একসঙ্গে—ফতে—

হাতীর মিছিলের মাথায় বসে ছিল নবাব। হাতীর মিছিল মতিঝিলের দিকেই যাচ্ছিল। হাতীরা কলকাতাতেই যাক আর পূর্ণিয়াতেই যাক, ফিরে এসে এই মতিঝিলের দিকেই তাদের গতি। তাদের সে-পথ মুখস্থ হয়ে গেছে। আলীবর্দী খাঁর আমলেও সেই নিয়ম ছিল, নবাব মীর্জা মহম্মদের আমলেও সেই একই নিয়ম আছে।

কিন্তু কোতোয়ালীর সামনে আসতেই নবাব হুকুম দিলে—এখানে থামো—

সবাই অবাক হয়ে গেল। রাজা মোহনলাল, মীরজাফর, দুর্লভরাম সবাই অবাক। এ আবার মীর্জার কী খেয়াল! কোতোয়ালীতে ঢুকবে নাকি নবাব!

লম্বা কাঠের সিঁড়িটা এনে লাগানো হলো হাতীর পিঠে।

নবাব সেই অবস্থাতেই সেই কাঠের সিঁড়ি দিয়ে কোতোয়ালীর চবুতরে নামতে লাগলো।

মুর্শিদাবাদ তো শুধু একলা নবাবের নয়। মুর্শিদাবাদ কারো একলার ইচ্ছেয় চলে না। একলার ইচ্ছেয় চললেও একলার চালনায় চলে না। তার জন্যে বিভিন্ন আমীর-ওমরাহ্ আছে। ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ আছে। এ অনেকটা এই দেহযন্ত্রের মত। তার বিভিন্ন বিভাগের চালনার জন্যে বিভিন্ন ছোট-ছোট যন্ত্র আছে। আবার সেগুলোকে চালনার জন্যে আরো বড় বড় যন্ত্র আছে। সেই বড় বড় যন্ত্রগুলোর মাথার ওপরে সবচেয়ে যে বড় যন্ত্রটা কাজ করে তারই নাম হলো নবাব।

মীর্জা মহম্মদ সিরাজ-উ-দ্দৌলা হেবাৎ জঙ বাহাদুর আলমগীর অষ্টাদশ শতাব্দীর ইতিহাসে সেই রকম সবচেয়ে একটা বড় যন্ত্র!

সে-যন্ত্রকে শ্রদ্ধা যেমন করতে হয়, সম্মান যেমন করতে হয়, তেমনি আবার ভয়ও করতে হয়। কারণ ভয় না করলে তার হুকুম পালন করতে যে আমাদের দ্বিধা হবে। আর দ্বিধা হলেই আর মুর্শিদাবাদ চলবে না। এখানে ভয়টা রাষ্ট্র-চালনার পক্ষে অপরিহার্য অঙ্গ।

এবার কিন্তু সেই ভয়ের ওপরেই হস্তক্ষেপ হয়েছে।

একদিন দাক্ষিণাত্য-নিবাসী এক অখ্যাত ব্রাহ্মণ-সন্তান যে মসনদের পত্তন করেছিলেন এই মুর্শিদাবাদে, সেই নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর মাথাতেই যেন কেউ থুথু ফেলেছে। যেন সেই পরলোকগত আত্মা বেহেস্ত্ থেকে নেমে এখানে জবাবদিহি চাইতে এসেছে।

কোতোয়াল সাহেব একটু অপ্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সে খানিকক্ষণের জন্যে। তারপরেই খাড়া হয়ে কুর্নিশ করেছে।

অন্ধকার ফটকের ভেতরে মরালী তখন একসঙ্গে দুজনের সঙ্গে যুঝছে। মেহেদী নেসার থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল খবর পেয়েই। কিন্তু কান্ত ছাড়েনি। কান্ত নেস্যারের হাত দুটো তখনো জাপটে ধরে আছে।

—ইয়ে কৌন্?

কান্ত নবাবকে বোধ হয় চিনতে পারলে।

কোতোয়াল সাহেব সামনে এগিয়ে এসে বললে—খোদাবন্দ্, এ বাহারকা ফালতু আদমী, কোতোয়ালীর ভেতরে ঘুষে গেছে—

—আউর তুম্?

মেহেদী নেসার বললে—নবাব, এ বেগমসাহেবা সফিউল্লাকে খুন করেছে একে আমি জেরা করছি—

—জেরা? জেরা তো আদালতে করবে উকীল। তুমি কোতোয়ালীতে এসে জেরা করছো কেন?

—কাজী সাহেবের অনুমতি নিয়ে এসেছি আমি, নবাব।

নবাব কান পেতে শুনলো কথাটা। তারপর মরালীর দিকে ফিরে বললে—ঔর তুম্?

মরালী মাথা নিচু করেছিল। সকলের মনে হলো সারা কোতোয়ালীটাই যেন তখন নবাবকে দেখে লজ্জায় হতাশায় মাথা নিচু করে ফেলেছে।

—জবাব দিচ্ছ না কেন? জবাব দাও?

কোতোয়াল মাথা বাড়িয়ে নবাবের হয়ে যেন ধমক দিয়ে উঠলো।

নবাব বললে—তুমি থামো। আমি হুকুম দিচ্ছি, জবাব দাও, কে তুমি? কোন্ তুম্?

মরালী তবু মাথা নিচু করে রইলো।

এবার মরালী মুখ তুললো। বললো—জবাব আমি কাকে দেবো?

—কেন, আমি জিজ্ঞেস করছি, আমার কাছে জবাব দেবে!

মরালী ঘাড় বেঁকিয়ে বললে—আপনি আমার কথা বিশ্বাস করবেন না।

—কী করে জানলে আমি তোমার কথা বিশ্বাস করবো না?

—আপনি যে সংসারে কাউকেই বিশ্বাস করেন না!

—তুমি তা কী করে জানলে?

মরালী বললে—আমি সব জানি! আপনার সম্বন্ধে আপনি নিজেও যা' জানেন না, আমি তাও জানি!

—তুমি তো চেহেল্-সুতুনে থাকো, তুমি কী করে এত জানলে?

—আপনার চেহেল্-সুতুনের সবাই সব কিছু জানে।

তারপর একটু থেমে বললে—আর তা ছাড়া আমি যা জানি, এখানে এত লোকের সামনে তা বলতে পারবো না, আমায় বলতে বলবেন না আপনি দয়া করে।

—নবাবের হুকুম, তোমায় বলতে হবে!

—আমায় বলতে বলবেন না আপনি!

—আবার বলছি আমি নবাব, নবাবের হুকুম, তোমাকে বলতেই হবে!

মরালী এবার হঠাৎ বলে উঠলো—আপনি নবাব নামের কলঙ্ক!

আর সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো কোতোয়ালীর ছাদটা যেন ভেঙে গুঁড়িয়ে পড়লো মেঝের ওপর। যে-যেখানে ছিল সবাই চমকে উঠেছে। এত বড় কথা দিল্লীর বাদশাও বুঝি বলবার সাহস করতো না কখনো। এত বড় কথা বুঝি নবাব আলীবর্দী খাঁও কখনো বলতে সাহস করেনি নবাবজাদাকে। তুমি আমি আর পাঁচজন যখন সবাই নবাবকে খোশামোদ করে আরো প্রতিষ্ঠা আরো প্রতিপত্তির লালসায় মিথ্যেকে সত্যি বলে প্রিয়ভাজন হবার চেষ্টা করছি, তখন এ-মেয়েটার এত বড় সাহস হলো কেমন করে? তবে এ কি আরো বেশি প্রতিষ্ঠা চায়? আরো বেশি প্রতিপত্তি? আমাদের সকলকে ছাপিয়ে ও কি অপ্রিয় কথা বলে নবাবের নজরে পড়তে চায়?

—ওকে মতিঝিলে পাঠিয়ে দাও—

বলে নবাব আবার চলে যাচ্ছিল। কিন্তু কী যেন মনে পড়ে যেতেই বললে—আর ওকেও—

বলে কোতোয়ালীর বাইরে চলে গেল নবাব। গিয়ে আবার হাতীর পিঠে গিয়ে উঠলো।
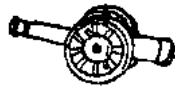
এতদিন বাইরে ছিল নবাব, কিন্তু মুর্শিদাবাদের ভেতরে এই ক'দিনের মধ্যেই যেন সমস্ত কিছু ওলট-পালট হয়ে গেছে। ফিরিঙ্গী-কোম্পানীর কাছ থেকে চিঠি এসেছে। ক্লাইভ বরানগরে এসে বসে আছে। অ্যাডমিরাল ওয়াটসন্ কলকাতার কেল্লায় ঢুকে পড়েছে। কেল্লার ভেতরে যে মসজিদ তৈরি হতে শুরু হয়েছিল তাও ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। চারদিকে সব ছারখার হয়ে গেছে। তুমি

বাঙলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব, তুমি কোথায় এখন? তুমি যা-যা বলেছিলে আমি তো বর্ণে বর্ণে তা পালন করে আসছি জাঁহাপনা। ওরা ফিরিঙ্গী, ওদের তো আমি হিন্দুস্থান থেকে তাড়াতে চাইনি। শুধু চেয়েছিলাম ওরা আমাকে নবাব বলে মানুক। ওরা জানুক যে হিন্দুস্থানের মালিক ওরা নয়, হিন্দুস্থানের মালিক আমি। আমি আরো চেয়েছিলাম যে ওরা বুঝুক এখানে নবাব বলে একজন আছে, তার ফার্মান নিয়ে তবে কারবার করতে হয়, কেল্লা বানাতে হয়, তাকে অগ্রাহ্য করলে এখানে টেঁকা যায় না; এখানে সোরা, রেশম, নুন, গালার ব্যবসা উঠিয়ে দিয়ে নিজের দেশে ফিরে যেতে হয়। আমি তো আর কিছু চাইনি। ওরা যে আমার মসনদ নিতে চায় নবাব! ওরা যে আমায় উৎখাত করতে চায়! তবু আমি কিছু বলতে পারবো না? আমি তোমার কাছেই যুদ্ধ করতে শিখেছি। তুমিই আমায় শিখিয়ে গেছ যে রাজনীতিতে ন্যায়-অন্যায় বলে কিছু নেই। রাজনীতি হলো কূটনীতি। কূটনীতির গতি বড় কুটিল, বড় জটিল। আমি তো তাই কুটিল হয়েই কোম্পানীর সঙ্গে লড়াই শুরু করেছি। বলো, এখন আমি কী অন্যায় করলাম, আমি কোন্ অপরাধ করলাম?

—মীর্জা!

সমস্ত দিনটা বড় অশান্তিতে কেটেছে। রাজা মানিকচাঁদ এসে সমস্ত খবর জানিয়ে গেছে। মতিঝিলের দরবার-ঘরে তখন সবে একটু বিশ্রামের স্বপ্ন নেমে এসেছে। ঠিক হয়েছে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধই করতে হবে আবার। তবে এবার আর দুদিকে নয়, একদিকে। পূর্ণিয়ার দিক থেকে আর কোনো ভয় নেই। এবার মোহনলালের সঙ্গে থাকবে চল্লিশ হাজার ঘোড়-সওয়ার। ষাট হাজার পায়দল-ফৌজ। গোটা পঞ্চাশেক হাতী আর তিরিশটা কামান। এবার শেষ করে দিতে হবে কোম্পানীকে। সেবার যেমন দয়া-মায়া দেখিয়েছিল, এবার আর তা নয়।

—মীর্জা!

নানীবেগম ঘরে ঢুকলো।

—তুই যে চেহেল্-সুতুনে গেলি না?

নানীবেগমকে দেখে আর থাকতে পারলে না মীর্জা। দুই হাতে জড়িয়ে ধরলো। চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো।

নানীবেগমের চোখ দুটো কিন্তু শুকনো, খট্‌খটে। বুকের মধ্যে তখনো মীর্জা মুখ গুঁজে কাঁদছে। শুধু মীর্জার মাথায় হাত বোলাতে-বোলাতে নানীবেগম বলে—ময়মানা এসেছে রে মীর্জা,—চেহেল্-সুতুনে এসেছে—। কিন্তু সে-কথা বলতে আসিনি—

মীর্জা মুখ তুললো—আর কী বলবে বলো নানীজী!

—আমার খত্ পেয়েছিলি?

—হ্যাঁ নানীজী, তোমার খত্ পেয়েই তো মুর্শিদাবাদে এসে সোজা কোতোয়ালীতে গিয়েছিলুম। মরিয়ম বেগমকে নিয়ে এসেছি মতিঝিলে!

—তার কাছে যে-চিঠি আছে সেটা দেখেছিস?

—না, এখনো সময় পাইনি নানীজী! রাজা মানিকচাঁদ এসেছিল, তার সঙ্গে পরামর্শ করতেই অনেক সময় কেটে গেল। তারপর একটু তন্দ্রা এসেছিল আমার, এবার ডাকবো মরিয়ম বেগমকে!

—মরিয়ম বেগমের সঙ্গে আর কাকে ধরে এনেছিস?

—আর একটা ছোকরা নানীজী! যার কথা তুমি লিখেছিলে। ও কে নানীজী?

নানীবেগম বললে—বোধ হয় ওর দেশের লোক। ওর সঙ্গে ওর খুব পেয়ার আছে, ওর কাছেই তো গিয়েছিল মেয়ে—

—কিন্তু ও কোতোয়ালীতে কী করেছিল? সেখানে মেহেদী নেসারের সঙ্গে হাতাহাতি করছিল কেন?

নানীবেগম বললে—তা জানি না—

—তোমার চিঠি পেয়ে আমি আর কোতোয়ালীতে ওকে রাখতে সাহস করলাম না। সবাই মিলে আমাকে বিপদে ফেলবার চেষ্টা করছে। আমি কতদিক সামলাই বলো তো? একলা সব দিকে তো দেখা যায় না।

নানীবেগম বললে—ভালো ভালো লোকের হাতে কাজের ভার দিয়ে দে—

—কার হাতে ভার দেবো? কাকে বিশ্বাস করবো বলো তো নানীজী? যাকে বিশ্বাস করবো সে-ই আমার বিরুদ্ধে লোক ক্ষেপাবে। শওকতকে যে আজ মেরে ফেলতে হলো, এ কি আমি করতুম? সবাই তাকে খোশামোদ করে করে আমার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলেছিল। শওকত মুখে মুখে বলে বেড়াতো—বাঙলা দেশ জয় করে অযোধ্যার সুজাউদ্দৌলা আর উজীর গাজীউদ্দীনকে হারিয়ে নিজের পছন্দ মত লোককে অযোধ্যার বাদ্‌শা বানাবো, তারপর লাহোর কাবুল জয় করে খোরাসানে গিয়ে রাজধানী বসাবো—বাঙলা দেশের জলহাওয়া খারাপ—! লোকেরাই তো তাকে এত আহাম্মক করে তুলেছিল, নইলে ও তো ছোটবেলায় এত বোকা ছিল না—

নানীবেগম সে-কথায় কান না-দিয়ে হঠাৎ বললে—আমি মরিয়ম মেয়েকে তোর কাছে আনছি—

—এখন?

—কেন, এখন তোর সময় নেই?

—আমি যে কাল কলকাতায় যাচ্ছি, কোম্পানীর ফৌজের সঙ্গে মোকাবেলা করতে!

—কিন্তু তার আগে তোর নিজের মোকাবেলা কে করবে?

—আমার মোকাবেলা? সে মোকাবেলা তো তোমার খোদাতালা করবে নানীজী! তার আগে মোকাবেলা করবে এমন ক্ষমতা কার আছে?

নানীবেগম বললে—কে মোকাবেলা করবে তার নিশানই তো আছে সেই চিঠিতে! সেই চিঠি কেড়ে নেবার জন্যেই তো দু'দিন ধরে মুর্শিদাবাদে এত ষড়যন্ত্র চলছে। সেই জন্যেই তো তোকে চিঠি লিখে তাড়াতাড়ি চলে আসতে বলেছিলুম—আমি তাকে আনছি তোর কাছে—বোস্ একটু—

বলে নানীবেগম ঘরের বাইরে চলে গেল। মীর্জা বাইরের দিকে চেয়ে দেখলে। বহুদিন যেন এমন করে একলা-থাকার আরাম ঘটেনি মীর্জার জীবনে। সারাদিন-সারারাত সবাই তাকে চোখে-চোখে রাখে। সবাই তাকে ভুলিয়ে রাখতে চায়, হয় আরাম দিয়ে নয় তো মেয়েমানুষ দিয়ে। আশ্চর্য, কোরাণ ছুঁয়ে যে একবার মদ ছেড়ে দেবার প্রতিজ্ঞা করেছে, আবার কেমন করে সে মদ ছোঁবে! তবু ওরা লোভ দেখায়। আর জেনানা! ও বড় পুরোন চিজ! মেয়েমানুষের নতুন করে দেখবার কিছু নেই। মেয়েমানুষের শরীরের রাস্তা-ঘাট-অলি-গলি-ঘুঁঝি সব দেখা হয়ে গেছে মীর্জার। অচেনা নেই কিছুই। শুধু মনটা! কিন্তু সেটাও যে কানাগলি। সেখানে যে ঢোকাই যায় শুধু, সেখানে যে সবই ভুল-ভুলাইয়া, সব যেন গোলক-ধাঁধার মত ঘুলিয়ে যায়। সে ভুল-ভুলাইয়ার থেকে বেরোবার পথ কে বলে দিতে পারে! কে তার

হদিস দেবে!

সামনে চেয়ে দেখলে মরিয়ম বেগম আসছে। পেছনে নানীবেগম!

নানীবেগম মরালীকে সামনে এগিয়ে দিয়ে বললে—কুর্নিশ কর মেয়ে—

মাথাটা নিচু করে আনাড়ির মত কুর্নিশ করলো মরালী।

—তোর কাছে কী চিঠি আছে দেখা!

—মরালী চুপ করে রইলো।

মরালী বললে—তার আগে ওকে ছেড়ে দিতে হবে!

নানীবেগম ব্ঝতে পারলে না। জিজ্ঞেস করলে—কাকে?

—ওই আমার জন্যে যাকে ধরে আনা হয়েছে, তাকে।

—তা, ও তোর কে?

মরালী বললে—ও আমার নিজের লোক—

—নিজের লোক মানে কী? তোর রিস্তেদার?

মরালী বললে—রিস্তেদারের চেয়েও বড়—এর বেশি আমাকে জিজ্ঞেস কোর না, এর বেশি আমি কিছ্ বলবোও না—

—ব্ঝেছি! তা এতদিন এ-কথা বলিসনি কেন? তাহলে কবে তোকে আমি ছেড়ে দিতুম—

মরালী বললে—না, আমি ছাড়া পেতে চাই না, আমি এখানেই থাকবো।

—এখানে থেকে কী করবি? চেহেল্-স্তুনের বেগমরা যেমন করে থাকে, যেমন করে চুলোচুলি করে বাঁচে, তেমনি করতে পারবি?

—পারবো! এখানে আমার থাকতে কোনো কষ্ট নেই।

—তাহলে দেখা তোর কাছে কী চিঠি আছে—দেখা—

মরালী ওড়নীর ভেতর থেকে হাত গলিয়ে বার করলে একখানা কাগজ। ভাঁজ করা এক ট্করো চিঠি। চিঠিখানা হাত বাড়িয়ে দিলে নবাবকে। নবাব সেখানা খ্লে পড়তে লাগলো।

নবাব মীর্জা মহম্মদ অনেকক্ষণ ধরে কাগজখানা পড়তে লাগলো। নানীবেগমও নিচু হয়ে ঝ্কে পড়ে দেখতে লাগলো।

মরালী বললে—সবাই এখানা কেড়ে নিতে চেয়েছে, আমি অনেক কষ্টে এটাকে সামলে রেখেছি—

পড়তে পড়তে মীর্জা মহম্মদ উঠে বসলো। তার কপালে ঘাম জমে উঠলো বিন্দ্-বিন্দ্। নানীবেগমও একমনে পড়ছিল।

—কিন্তু এ করিম খাঁ কে?

নবাব নানীবেগমের দিকে চেয়ে বললে—এ করিম খাঁ কোথাকার লোক? আমি তো একে চিনি না—

নানীবেগম বললে—তাহলে মেহেদী নেসারকে জিজ্ঞেস কর্, করিম খাঁ কে?—

—তাহলে তুমি যাও নানীজী, মরিয়ম বেগমকে নিয়ে পাশের কামরায় যাও, আমি ডেকে পাঠাচ্ছি—

বলে নেয়ামত খাঁকে ডাকলে। বললে—মেহেদী নেসার, ইয়ারজান, সকলকে এত্তেলা দে—

উমিচাঁদ সাহেব শুধু সাহেব নয়, খানদানী সাহেব। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে দিশী পাড়ার সব মার্চেণ্টদের মাথার ওপর তার জায়গা। ফিরিঙ্গীরাও তার প্রভাব-প্রতিপত্তি দেখে অবাক হয়ে যেত। বলতো—রাজা উমিচাঁদ। রাজাই বটে। রাজার মতই তার চাল-চলন। বিরাট বাড়িটার সামনে সকালে-বিকেলে ভিস্তিরা গোলাপ-জল ছিটিয়ে ছিটিয়ে রাস্তার ধুলো ওড়া বন্ধ করতো।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী উমিচাঁদের হাত দিয়ে প্রথম-প্রথম কেনা-বেচা করতো। তখন ফিরিঙ্গীদের সঙ্গে উমিচাঁদ সাহেবের মহা দোস্তি। রোজ একসঙ্গে ওঠা-বসা, একসঙ্গে খানা-পিনা চলছে। বেভারিজ সাহেব সোরা কিনতো উমিচাঁদ সাহেবের গদি থেকে। লাভের কড়ি বেশির ভাগ উঠতো গিয়ে উমিচাঁদের সিন্দুকে। উমিচাঁদের সিন্দুক ফুলে-ফেঁপে একেবারে ঢোল হয়ে উঠলো। কান্তকে অনেক দিন নিজে গিয়ে উমিচাঁদের গদিতে গোমস্তার সঙ্গে লেন-দেন চালাতে হয়েছে। বাড়ির বাগানে বিরাট বিরাট সব মেহগনি গাছ ছিল। কোত্থেকে সব গাছ এনে বসিয়েছিল উমিচাঁদ সাহেব। টাকাও অঢেল, মানুষটাও শৌখীন। দাড়ি-গোঁফের আড়ালে শৌখীন লোকটার আসল চেহারাটা ঠিক বোঝা যেত না। কেউ বলতো ভালো, কেউ বলতো শয়তান।

১৭৫৩ সাল থেকেই কোম্পানীর দাদনের ব্যবস্থা উঠে গেল। তার বদলে কোম্পানীর গোমস্তারা গ্রামে-গ্রামে গিয়ে আড়ঙের মাল নিজেরা দেখা-শোনা করে কেনাকাটা আরম্ভ করলে। তাতে মুনাফা বাড়লো কোম্পানীর। কিন্তু লোকসান হতে লাগলো উমিচাঁদের।

তখন থেকেই ঝগড়াটা শুরু হলো। শেষ হলো কেল্লার মধ্যে উমিচাঁদকে বন্দী করে।

কিন্তু সে অনেক আগের কথা। তারপর উমিচাঁদের সে-বাড়ি আবার সেজে-গুজে প্রাসাদ হয়ে উঠেছে। জগমন্ত সিং নেই, কিন্তু অন্য দারোয়ান আছে। আবার উমিচাঁদ মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। আবার খোরাসান কাবুল কান্দাহার থেকে শুরু করে সুতানুটির গঙ্গার ঘাট পর্যন্ত তার নৌকো মাল নিয়ে আমদানি-রপ্তানির কাজ করছে। আবার ফিরিঙ্গী-কোম্পানীর সাহেবরা যাতায়াত শুরু করেছে তার বাড়িতে।

সেদিন সন্ধ্যের সময় উমিচাঁদের বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়ালো এক ফকির। ফকিরই বটে। একেবারে ঠিক ফকিরের মত চেহারা। গায়ে তালি-মারা আলখাল্লা, গলায় স্ফটিকের মালা। হাতে এঁকানো-বেঁকানো লাঠি। গুণ গুণ করে আল্লার নাম করে ভিক্ষে চাইতে এল। তারপর ভিক্ষে নিলেও। কিন্তু চলে গেল না।

গোমস্তা খুব খাতির-যত্ন করে ভেতরে নিয়ে গেল। তারপর ভেতরে কোথায় গিয়ে যে ঢুকলো তা বাইরের কেউ আর দেখতে পেলে না।

কিন্তু উমিচাঁদ সাহেবের কাজ হাঁসিল হয়ে গেল সেইদিনই।

একেবারে সাহেবের খাস-কামরার ভেতরে দরজা-বন্ধ কুঠুরীতে বড় চুপিসারে কথা হতে লাগলো দুজনে।

—কেউ দেখতে পায়নি তো তোমাকে?

—না হুজুর, দেখতে পেলেও চিনতে পারেনি কেউ, আমি মোল্লাহাটি হয়ে ঘুরে এসেছি। মেহেদী নেসার সাহেব আমাকে তাড়াতাড়ি সব জানাতে বলেছে। সব জানাজানি হয়ে গেছে হুজুর!

—কী জেনেছে?

—নবাবকে নানীবেগম সব জানিয়ে দিয়েছিল চিঠি লিখে। সেই চিঠি পেয়েই একেবারে কোতোয়ালীতে এসে হাতে-নাতে ধরে ফেলেছে মেহেদী নেসার সাহেবকে। সে-চিঠি এখন নবাবের হাতে চলে গেছে।

—সেখানে তো করিম খাঁর নাম আছে। আমি তো আমার নাম দিইনি সে-চিঠিতে।

—তা জানি না হুজুর। সেই খবরটা আপনাকে বলতে এলাম! মেহেদী নেসার সাহেব আমাকে পাঠালেন হুজুরের কাছে, সেখানে আপনার নিজের নাম লিখেছেন কিনা জানতে—

উমিচাঁদ সাহেব বললে—আমার নিজের নামওয়ালা চিঠি আছে, কিন্তু সেটা ও-চিঠির সঙ্গে নেই—

—সে চিঠিতে কী লেখা ছিল?

—আমাদের মতলব লেখা ছিল তাতে। নবাবকে কোনোরকমে কলকাতায় এনে তারপর যেমন করে হোসেন কুলী খাঁকে মারা হয়েছে, তেমনি করে মারা হবে লোক তৈয়ার আছে—

—এ সব কথা চিঠিতে লেখা আছে?

—আছে, কিন্তু সফিউল্লা সাহেবের কাছে যে চিঠি আছে তাতে নেই। এ চিঠিখানা সফিউল্লা সাহেবকে রাস্তাতেই খাজা হাদীকে দিতে বলে দিয়েছি খাজা হাদী তো আমাদের লোক, সে-ই সব ব্যবস্থা করবে যে—

—খাজা হাদীকে সে চিঠি দেওয়া হয়েছিল আপনি ঠিক জানেন হুজুর?

—নিশ্চয় দিয়েছে। সে চিঠি সফিউল্লাসাহেব মুর্শিদাবাদে নিয়ে যাবে কেন?

—তাহলে আমি চলি হুজুর। এইটে জানতেই আমাকে পাঠিয়েছিল নেসার সাহেব।

কথা শেষ হবার আগেই খিদ্‌মদ্‌গার এসে খবর দিলে, ওয়াটসন্ সাহেবের লোক এসেছে।

—তুমি পাশের কামরায় যাও, ফিরিঙ্গী-কোম্পানীর বড়সাহেব এসেছে তোমাকে দেখতে পাবে—মেহেদী নেসার সাহেবকে বলবে, কী হলো যেন আমাকে জানান তিনি। আমি ফিরিঙ্গীদের সঙ্গে সব ব্যবস্থা করে ফেলেছি—

বিরাট প্রাসাদ উমিচাঁদ সাহেবের। পাঞ্জাবী আড়ৎদার। তামাম হিন্দুস্থানে ছড়িয়ে আছে তার কারবার। একদিন এই বাড়িই পুড়ে ছারখার হয়ে গিয়েছিল কিন্তু উমিচাঁদ আবার তা সারিয়ে নিয়ে সাজিয়ে ফেলেছে। এই কদিনের মধ্যেই আবার সামনের বাগানে ফুলগাছে ফুল ফুটিয়েছে মালী। সমস্ত সম্পত্তি গুরু গোবিন্দ নানকের নামে চালালেও দেওয়ালের গায়ে মাঝখানে বড় বড় অক্ষরে 'গণেশায় নমঃ' লেখা। বাঙলার অষ্টাদশ শতাব্দীর ইতিহাসে এ এক অদ্ভুত পুরুষ

অ্যাড্‌মিরাল ওয়াটসন্ অত্যন্ত সন্তর্পণে ভেতরে ঢুকেই জিজ্ঞেস করলে—কী হলো উমিচাঁদ সাহেব? এ-ঘরে কেউ এসেছিল নাকি?

—কই, না!

—মনে হলো যেন কেউ এতক্ষণ এ-ঘরে ছিল!

—ভুল অ্যাড্‌মিরাল, ভুল। আপনি বড় ভয় পেয়ে গেছেন তাই এই ধারণা। আমি তো আপনার জন্যেই অপেক্ষা করে বসে আছি।

অ্যাড্‌মিরাল ওয়াটসন্ যেন এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হলো। তারপর ভালো করে আয়েস করে বসলো।

উমিচাঁদ সাহেব বললে—আমার এখানে আসতে আপনার কোনো ভয় করবার দরকার নেই। নবাব আর কাউকে বিশ্বাস করুক আর না-করুক, আমাকে নিজের লোকের মত বিশ্বাস করে, এ সম্বন্ধে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন—

—শুনলাম মুর্শিদাবাদে নাকি কী সব ট্রাবল্ হয়েছে।

—কোথেকে শুনলেন?

—আমাদের স্পাইএর মুখের খবর। শুনলাম কোন্ একটা বেগম নাকি মার্ডার করেছে সফিউল্লা খাঁ সাহেবকে। তার কাছে নাকি ভ্যালুয়েবল্ ডকুমেণ্ট্ ছিল, সেটাও ধরা পড়েছে। তাতে নাকি মেহেদী নেসার, ইয়ারজান, আপনি সবাই জড়িয়ে পড়েছেন!

—ফুঃ—

গুরুগোবিন্দ নানকের ভক্ত এক ফুঁয়ে ওয়াটসনের সব সন্দেহ হাওয়ায় উড়িয়ে দিলে!

বললে—এটা জেনে রাখবেন, আমার বিরুদ্ধে যে যা-কিছু বলুক, নবাব আমাকে কখনো অবিশ্বাস করবে না—

—কেন?

—সে চালাকি শেখা চাই অ্যাড্‌মিরাল। সেটা আমি কাউকে শেখাই না। নইলে কোটি কোটি টাকা এই একটা জীবনে আয় করতে পারি? কারবার করে খাই, লোকচরিত্র জানবো না?

—তাহলে কী হবে?

—কিসের কী হবে?

—সে ডকুমেণ্ট ধরা পড়লে কী হবে?

—কিছুই হবে না। আপনারা অত ঘাবড়াচ্ছেন কেন? আপনারা যদি নবাবকে না-হটাতে পারেন তাহলে কেন আবার ফিরে এলেন? ফলতায় থাকলেই পারতেন? আমরা নিজেরাই সরাবো।

ওয়াটসন্ অবাক হয়ে গেল—আপনারা নিজেরাই সরাবেন?

—আমরা সরাতে পারি না ভাবছেন? নবাব যাকে-তাকে যখন-তখন অপমান করবে, যার-তার বউকে ধরে হারেমে পুরবে, যা খুশী তাই করবে, তাহলে আমরা আছি কী করতে?

অ্যাড্‌মিরাল কী যেন ভাবলে—আমাদের যে মুশকিল হয়েছে—

—আপনাদের আবার মুশকিল কী? আমরা সবাই তো আপনাদের পেছনে আছি—

ওয়াটসন্ বললে—ফ্রেঞ্চরা যে চন্দননগরে রয়েছে, মঁসিয়ে লা যে নবাবের ফ্রেণ্ড—

—দেখুন—

উমিচাঁদ অভয় দিয়ে বললে—দেখুন, টাকার জোর বড় জোর, আমার টাকা আছে, মুর্শিদাবাদের জগৎশেঠজীর টাকা আছে। যতক্ষণ আমাদের টাকা আছে ততক্ষণ আমরা যা খুশী তাই করবো। যদি আমাদের খুশী হয় তো নবাবকে

মসনদে বসাবো, আবার খুশী হলে নবাবকে মসনদ থেকে নামাবো—তাতে আপনারা আমাদের দলে থাকুন আর না-ই থাকুন—

অ্যাডমিরাল ওয়াটসন্ যেন কিছুক্ষণ কী ভাবলে।

তারপর বললে—তাহলে বলছেন কিছু ভয় নেই?

—না, যতক্ষণ উমিচাঁদ আছে ততক্ষণ কিছু ভয় নেই, আপনারা তোড়জোড় শুরু করে দিন, আমি থাকতে ভয় কী?

—মীরজাফর সাহেব—

—আরে, মীরজাফর সাহেব তো আমার হাতের পুতুল। আমি যা বলবো সে তা-ই করবে। বলুন তো এখানে আমার বাড়িতে তাকে ডেকে নিয়ে আসি—তা আপনার ফ্রেন্ড কোথায় গেল? সে এল না?

—কে ফ্রেন্ড্?

—কর্নেল ক্লাইভ!

অ্যাড্‌মিরাল ওয়াটসনের মুখে একটা তাচ্ছিল্য ফুটে উঠলো।

—তার দ্বারা কিছু হবে না উমিচাঁদ সাহেব, তার আর কোনো পদার্থ নেই।

—কেন?

—সে এক নেটিভ-ওম্যানের সঙ্গে লাভে পড়েছে—

—দিশি মেয়ে? কোথাকার মেয়ে?

—কোথাকার কোন্ কাণ্ট্রি-গার্ল, আবার ম্যারেড। বিয়ে হয়ে গেছে ওম্যানটার। তাকে নিয়ে নিজের ঘরে তুলেছে। আমি তাকে নেটিভ-গার্ল বলেছিলুম বলে আমার সঙ্গে মারামারি করেছে—ওর আর কোনো ভরসা নেই—

—ছি ছি ছি—শেষকালে লড়াই করতে এসে মেয়েমানুষের খপ্পরে পড়লো!

কথাটা শেষ হবার আগেই খবর এসে গেল। উমিচাঁদ সাহেবের খোদ খিদ্‌মদ্‌গার এসে কুর্নিশ করলে—হুজুর, কর্নেল ক্লাইভ সাহাব হাজির—

—ওই দেখ, এসে গেছে।

ইণ্ডিয়ার মানুষদের এতদিনে চিনে ফেলেছিল ক্লাইভ সাহেব। ক্লাইভ জানতো যারা কনস্‌পিরেটার তাদের কাছে নিজেকে ছোট করতে নেই। মাথা নিচু করলেই ষড়যন্ত্রকারীরা পেয়ে বসে। এরা কাউকেই ভালবাসে না। এরা নিজেরা ছোট বলেই পরকেও ছোট মনে করে। এরা নবাবের এনিমিই শুধু নয়, এরা ক্লাইভেরও এনিমি।

কিন্তু ঘরে ঢুকেই মুখময় হাসি ভরিয়ে তুললো।

—হ্যালো আমিচাঁদ দি গ্রেট্!
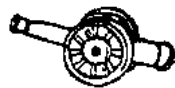
ততক্ষণে মেহেদী নেসারকে ডেকে পাঠিয়েছিল নবাব। মীর্জার হাতে তখনো চিঠিটা ধরা আছে। শুধু মেহেদী নেসারই নয়, ইয়ারজানকেও ডেকে পাঠিয়েছে।

—এটা কিসের চিঠি ইয়ার?

বড় হাসিমুখে এগিয়ে এল মেহেদী নেসার। নবাব মীর্জা মহম্মদ সিরাজ-উ-দ্দৌলা তাদের সন্দেহ করেছে। এতদিনের ইয়ারগিরির আজ বুঝি পরীক্ষা হয়ে যাবে। তবু মীর্জাকে চিনতে তাদের বাকি নেই। মীর্জাকে ভোলাতে তারা জানে। মীর্জার গুণও তারা জানে, মীর্জার দোষও জানে। বাচ্‌পান থেকে একসঙ্গে উঠেছে

বসেছে তারা, একসঙ্গে ফর্তি করেছে, আবার কখনো ঝগড়াও করেছে। কিন্তু মীর্জা কখনো সন্দেহ করেনি তাদের, বরং সন্দেহ করলেও অবিশ্বাসে উড়িয়ে দিয়েছে। যখন চারদিকে আরো শত্রু ছিল মীর্জার, যখন নবাবী টলমল করতো, তখনো পাশে দাঁড়িয়ে যারা উৎসাহ দিয়েছে, আশা জুগিয়েছে, দুষমনদের দূর করেছে, তারা মেহেদী নেসার, ইয়ারজান আর সফিউল্লা। কত রাত ভোর করে দিয়েছে একসঙ্গে, কত দিন খতম্ করে দিয়েছে একসঙ্গে। সেই সব কথা মনে রেখেই একদিন মেহেদী নেসার, ইয়ারজান আর সফিউল্লা মুর্শিদাবাদে নবাবের মত কলিজা ফুলিয়ে বেড়িয়েছে। কারোর পরোয়া করবার দরকার হয়নি। সেই তাদেরই আজ ভয়ে-সঙ্কোচে-দ্বিধায় এসে দাঁড়াতে হয়েছে মীর্জার সামনে আসামী হয়ে।

সে-সব দিনের কথা কি মীর্জা সব ভুলে গেল?

সেই যেদিন হাতিয়াগড়ের রাণীবিবিকে দেখেছিল বজরার ভেতরে। ভারি খুব্‌সুরত লেগেছিল চোখের চাউনিটা। শুধু কি হাতিয়াগড়ের রাণীবিবি! কত লেড়কী, কত আওরাৎ, কত জেনানা, কত মহ্‌ফিল! সব তো মীর্জার জন্যে!

অথচ যেদিন থেকে হাতিয়াগড়ের রাণীবিবি চেহেল্‌-সুতুনে এসেছে, সেইদিন থেকেই যেন সব ওলট-পালট হয়ে গেছে নিজামতীতে। নানীবেগমও তাদের সন্দেহ করতে শুরু করেছে। মীর্জাও তাদের সন্দেহ করতে শুরু করেছে। সেইদিন থেকেই সুখের দিন, সোয়াস্তির দিন চলে গেছে তাদের।

—এটা কিসের চিঠি ইয়ার? এ করিম খাঁ কে?

সমস্ত মতিঝিলের মধ্যে যেন একটা অস্ফুট জিজ্ঞাসার চিহ্ন সবকিছু তোল-পাড় করে ফেললে।

মেহেদী নেসার সে কথার সোজা উত্তর দিলে না।

—আজ আমাদের তুই অবিশ্বাস করলি মীর্জা?

—বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কথা নয় ইয়ার। আমার সব বিশ্বাস-অবিশ্বাস আজ আমাকে পাগল করে তুলেছে। আমার মসনদের ওপর ঘেন্না ধরে গেছে। কাকে বিশ্বাস করবো আর কাকে অবিশ্বাস করবো, আমি বুঝতে পারছি না। জানিস ইয়ার, শেষকালে কোন্‌দিন শুনবো নানীবেগম আমাকে খুন করবার জন্যে জহ্লাদ লাগিয়েছে—তা শুনলেও হয়তো আজ আর তাজ্জব হবো না—

মেহেদী নেসার বললে—কিন্তু কেন এ রকম হলো ইয়ার?

—কেন হলো? হয়তো মসনদের খাতিরে হলো। হয়তো মসনদ না পেলে কেউ আমার পেছনু লাগতো না, আমিও কারো পেছনে লাগতুম না। আমিই কি কম খুন করেছি, তোরাই বল্?

মেহেদী নেসার বললে—তোর সঙ্গে আমার কথা বলতেও শরম লাগছে ইয়ার! ভাবছি আমি যা-কিছু বলবো তুই তা-ই সন্দেহ করবি—

—তা করবো! মীরজাফর এ চিঠি লিখলে আমি অবাক হতুম না, এমনকি জগৎশেঠজী লিখলেও অবাক হতুম না। হিন্দুস্থানের কেউ লিখলেও অবাক হতুম না। বোধ হয় নানীবেগম লিখলেও অবাক হতুম না। কিন্তু তা বলে তোরা?

মেহেদী নেসার বললে—তাহলে এক কাম কর, আমি মাথা পেতে দিচ্ছি তোর সামনে, তুই আমাদের কোতল কর—

বলে মেহেদী নেসার নবাবের সামনে নিজের মাথাটা নিচু করলে।

—ঠিক যেমন ভাবে হোসেন কুলীকে কোতল করেছিলি তেমনি করেই কোতল

কর। আমি হাসতে হাসতে বেহেস্তে চলে যাবো—

—তাহলে এ করিম খাঁ কে, বল্‌?

মেহেদী নেসার বললে—তার দরকার নেই। একবার যখন তোর মনে সন্দেহ হয়েছে তখন তার উত্তর পেলেও তোর সন্দেহ ঘুচবে না। তার চেয়ে তুই আমাদের খতম্‌ করে দে—সফিউল্লা যেখানে গেছে আমরাও সেখানে চলে যাই—

বলে মীর্জার সামনে তেমনি করেই মাথা নিচু করে রইলো।

—ওঠ—

মীর্জা হাত ধরে টেনে ওঠালে। বললে—দ্যাখ ইয়ার, যখন নবাব হইনি তখন বেশ ছিলাম রে, এখন কেবল সকলকে সন্দেহ হয়। রাগের ঝোঁকে সেদিন জগৎ-শেঠকেই চড় মেরে বসেছিলুম! এখন নবাব হয়ে আমার এ কী হলো বল তো!

বলতে বলতে কেমন করুণ হয়ে উঠলো মীর্জার গলাটা।

—এখন কবে যে প্রাণ ভরে ঘুমিয়েছি তাও মনে পড়ে না। এখন একটু ঘুমোব ভেবেছিলুম, তাও হলো না। কোথা থেকে কী একটা চিঠি এসে সব গোলমাল বাধিয়ে তুললো—

বলে চিঠিটা নিয়ে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে দিলে।

বললে—যা যা, ভাগ তোরা, ভাগ এখান থেকে—ভাগ, আমি ঘুমোব এখন—

মেহেদী নেসার, ইয়ারজান দুজনেই চলে গেল দরবার ছেড়ে। চলে যেতেই নানীবেগম ভেতরে এসেছে। সঙ্গে সঙ্গে মরিয়ম বেগম।

নানীবেগম বললে—কী হলো, চিঠি ছিঁড়ে ফেললি?

মীর্জা বললে—হ্যাঁ নানীজী, ওদের ছেড়ে দিলুম—

—তোকে খুন করবার জন্যে ওরা সড় করছে আর তুই ওদের ছেড়ে দিলি মীর্জা! এই চিঠির জন্যে ওরা এত টানা-হ্যাঁচড়া করছে, আর তুই কিছু বললিনে?

মীর্জা বললে—আমার দেমাগটা বড় খারাপ হয়ে আসছে নানীজী!

—তা দেমাগ খারাপ বলে খুনীদের মাফ করে দিবি তুই?

মীর্জা বললে—খুন তো আমিও আগে অনেক করেছি নানীজী! তাতে কি আমার দুষমন কমেছে? এই তো শওকতকে খুন করে এলুম, তুমি কি ভাবছো তাতে আমার দুষমন কমবে? এখন আমার বড় ঘুম পেয়েছে নানীজী, আমি একটু ঘুমোব এখন—

—তাহলে নবাবী নিলি কেন?

—আমি ভুল করেছি নানীজী!

—তাহলে নবাবী ছেড়ে দে, দুষমনের মোকাবিলা না করতে পারলে নবাবী ছেড়ে দিয়ে ফকিরি নে—

মীর্জা বললে—না নানীজী, ওদের কিছু কসুর নেই, ওদের তুমি দোষ দিও না,—ওরা আমার পুরোন ইয়ার—

—নবাবের ইয়ারের কি অভাব হয় রে মীর্জা! দুষমনরাই তো ইয়ার সেজে আসে!

মীর্জা এবার সোজা হয়ে বসলো। বললে—কিন্তু বলতে পারো নানীজী, কাকে আমি বিশ্বাস করবো? ওদেরও যদি আমি ছেড়ে দিই তো কাদের নিয়ে আমি থাকবো? ঠগ বাছতে গিয়ে যে গাঁ উজাড় হয়ে যাবে!

এতক্ষণ মরালী চুপ করে ছিল। জিজ্ঞেস করলে—জাঁহাপনা কি আমার দেয়া চিঠি ছিঁড়ে ফেলেছেন?

—হ্যাঁ, ওই যে পড়ে আছে!

—তাহলে চিঠিতে যা লেখা ছিল সব ভুল?

—হ্যাঁ বিবিজী, সব ভুল। ওরা কখনো ও-চিঠি লেখাতে পারে না।

—তা কীসে বুঝলেন জাঁহাপনা?

নবাব বললে—করিম খাঁ বলে কেউ নেই। মেহেদী নেসারের কোনো দুষমন আছে, ওটা তারই কাজ। ওরা আমার ইয়ার, ওদের আমি ভালোবাসি, এটা অনেকের সহ্য হয় না—

—তা যদি হয় তাহলে এ-চিঠি কার লেখা?

বলে মরালী আর একটা চিঠি তার ওড়নীর আড়াল থেকে বার করলে। করে নবাবের দিকে নিচু হয়ে এগিয়ে দিলে।

—এ চিঠি আবার কোথায় ছিল?

মরালী বললে—সফিউল্লা খাঁ সাহেবের জামার ভেতরে। এটা আলাদা করে রেখেছিলাম।

মীর্জা মহম্মদ তাড়াতাড়ি চিঠি নিয়ে পড়ে বললে—এ কি! উমিচাঁদ সাহেব? উমিচাঁদও এদের দলে?

নানীবেগম সাহেবা চিঠিটার ওপর ঝুঁকে পড়লো উদ্‌গ্রীব হয়ে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর ইতিহাস আজকের বিংশ শতাব্দীর ইতিহাস নয়। ইতিহাস বদলায় কিন্তু ইতিহাসের বাইরের বোরখার চেহারাটা হয়তো একই থাকে। আজকের প্রাইম মিনিস্টার সেদিনের নবাব। আজকের মিনিস্টার সেদিনের মেহেদী নেসার। তবু নবাবদের কিন্তু পরিবর্তন নেই, মেহেদী নেসাররাও অজর-অমর। তারা আসে, নবাবী করে, বক্তৃতা দেয়, লড়াই করে, ষড়যন্ত্র করে, খোশামোদ করে, ঘুষ খায়, তারপর আবার একদিন ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে কোথায় হারিয়ে গিয়ে নিঃশেষ হয়ে যায়, কেউ তাদের মনে রাখে না। দু'একটা রাস্তার নাম, বাড়ির নাম, কি প্রতিষ্ঠানের নামে শুধু তারা বেঁচে থাকে। তারপর আবার শুরু হয় আর একজনের পালা। তখন আবার সেই একই নিয়মে ইতিহাস এগিয়ে চলে। যে-নিয়মে সেই মহারাজ অশোক এসেছে গেছে, সেই নিয়মেই নবাব সিরাজ-উ-দৌলা এসেছে গেছে, মেহেদী নেসাররাও এসেছে গেছে, সেই নিয়মেই আবার আপনি আমি সবাই এসেছি আবার একদিন যাবোও।

তবু বলছি ইতিহাস বদলায়।

আপনি আমি চাইলেও বদলায়, না-চাইলেও বদলায়।

বদলায় বলেই যুগে-যুগে ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখতে আসে উদ্ধব দাসরা। উদ্ধব দাস লিখে গেছে—

বিধির বিধান রবে, কেবা আর রবে ভবে।
চলে যেতে হবে সবে না-হইতে শেষ॥
বিপুল পৃথিবী তাঁর, রবে মাত্র সারাৎসার,
কে বোঝে রহস্য কার এবম্বিশেষ॥

কাব্য রচি কাটে দিন, আমি অতি দীন হীন,
তব পদে চিরদিন ভক্তি মম আশ।
ওহে প্রভু কল্পতরু, হে গোবিন্দ কৃপাঙ্কুরু
লিখিতং কার্য্যণ্যাগে শ্রীউদ্ধব দাস॥

—কাব্য লিখবে যে তুমি দাস মশাই, তাহলে এত ঘুরে বেড়াও কেন তুমি!

মোল্লাহাটির মধুসূদন কর্মকার কথাটা জিজ্ঞেস করেছিল একদিন। যে-লোকটাকে তার বউ পর্যন্ত নিলে না, দেখা হওয়ার পর তাড়িয়ে দিলে, তার তুল্য দুঃখী কেউ আছে এটা যেন কেউ কল্পনাই করতে পারতো না।

মধুসূদন বলতো—রায় গুণাকর তো রাজার সভায় ছাদের তলায় বসে অন্নদা-মঙ্গল লিখেছিল, তাই অত ভালো লেখা হয়েছিল—কিন্তু তোমার কাব্য অত ভালো হবে না, তুমি যে কেবল ঘুরে বেড়াও—

উদ্ধব দাস বলতো—আমার তো আর রাজাকে খুশী করবার জন্যে লেখা নয় গো—

—তবে কাকে খুশী করবার জন্যে?

—রাজার রাজাকে খুশী করতে পারলেই হলো।

—রাজার রাজা? সে আবার কে গো? বাদ্‌শা?

—দূর বোকা।

মধুসূদন বুঝতে পারেনি। বলেছিল—ও বুঝেছি—ভগবান—

—দূর বোকা! ভগবান আছে না ছাই আছে! কচু আছে, ঘেঁচু আছে—

—তাহলে রাজার-রাজা কে?

উদ্ধব দাস বলেছিল—আরে বুঝলিনে বোকাচাঁদ, আমার রাজার-রাজা হচ্ছে মানুষ—মানুষ-ভগবান। সেই মানুষ-ভগবানকে দেখবার জন্যেই তো কাঁহা-কাঁহা ঘুরে বেড়াই কর্মকার মশাই। ছাদের তলায় বসে থাকলে কি আর মানুষ-ভগবানকে দেখা যায়? মানুষ-ভগবান গঙ্গায় নৌকো ঠেলে, মাঠে লাঙল চযে, পথে মোট বয়।

মানুষ-ভগবান কথাটা কেউই শোনেনি। হিন্দু, মুসলমান, বোষ্টম, কর্তাভজা, সহজে, সাহেবধনী, বাউল, বলরামভজা, কত রকম ভগবান-ভজার দল কত রকম কথা বলে বেড়ায়, কিন্তু উদ্ধব দাসের কথার সঙ্গে কারোর কথা মেলে না।

—তা তোমার মানুষ-ভগবানকে পুজো করো তুমি?

—করিনে? ওরে বাবা, না-করলে 'বেগম মেরী বিশ্বাস' কাব্য লিখবো কী করে? এ তো মানুষ-ভগবানকে নিয়েই লেখা।

—কখন তার পুজো করো?

—সব সময়েই করি!

উদ্ধব দাস বলতো—কী রকম করে পুজো করি শুনবে? শয়নে-স্বপনে-নিদ্রে সব সময়েই পুজো করি। তবে শোন, আমার পুজো কী রকম মন দিয়ে করি—

(যেমন) বারিগত মীন দাতাগত দীন।
নদীগত তরী ভক্তিগত হরি।
বনগত পশু মাতৃগত শিশু।
স্বামীগত সতী ক্রিয়াগত গীত।
জলগত মকর চন্দ্রগত চকোর।
বৃক্ষগত লতা জিহ্বাগত কথা।

আহারগত কায়া ধর্মগত দয়া।
অর্থগত নর পিত্তগত জ্বর।
অর্জনগত ধন আশাগত মন
ধনগত মান—
তেমনি আমার কাব্যগত প্রাণ॥

বলেই হাঃ হাঃ করে হেসে কুটোকুটি হয়ে পড়ে উদ্ধব দাস! তারপর উদ্ধব দাস চলে গেলে হরিচরণ সোজা এসে ঢুকলো। বললে—দিদি গো, পাগলাটা চলে গেছে—

দুর্গা জিজ্ঞেস করলে—তোমার সাহেব কোথায়?

কর্নেল ক্লাইভ বরানগরে এসে যেন একটু শান্তি পেয়েছিল। এতদিন মাদ্রাজে ছিল। সেখানে কেল্লার মধ্যে বসে বসে শুধু বই পড়েছে আর লড়াই করেছে। কিন্তু ফলতায় আসার পর থেকেই দেশটাকে যেন আরো ভালো লাগছে। অনেকদিন দূর থেকে দেখেছে রাণীবিবিকে। মনে হয়েছে, বড় অদ্ভুত মেয়েটা। মাথায় যাদের সিঁদুর থাকে তারা ম্যারেড লেডী সেটা জেনে নিয়েছে। কিন্তু ম্যারেড হলেও কেন হাজব্যান্ডের কাছে গেল না। অথচ অত ভালো হাজব্যান্ড! সারা ওয়ার্লডই লোকটার সংসার। এ ওয়ার্লড্-সিটিজেন। মনে হলো এই পোয়েটটা তার নিজের মনের কথাটাই বলে গেল। ইন্ডিয়ায় এসে যদি কোনো লাভ হয়ে থাকে তো তা ওই।

ক্লাইভ সাহেবও গিয়ে ডাকলে—দিদি—

দুর্গা এল। বললে—কী সাহেব?

—ওই পোয়েটটা কিন্তু ভালো লোক দিদি। আই লাইকড্ দ্যাট্ পোয়েট। কিন্তু ওকে তোমরা ঘরে ঢুকতে দিলে না কেন? ও কী করেছে?

দুর্গা আর কী বলবে! সাহেবকে কী করে বোঝাবে যে ও-লোকটা তার জামাইও নয়, কেউই নয়। ও লোকটা একটা বাউন্ডুলে পাগল।

দুর্গা বললে—ওর কথা থাক বাবা, তুমি আমাদের কোথাও পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করে দাও, আমরা আর এখেনে থাকতে পারছিনে—

—কেন? এনি ট্রাবল্? কোনো কষ্ট হচ্ছে?

—তা কষ্ট হবে না? বাড়ি-ঘর ছেড়ে এসে এখেনে পড়ে থাকতে কারো ভালো লাগে? আমাদের কি ঘর-সংসার নেই?

সাহেব বললে—আমার তো এখানে বেশ ভালো লাগছে দিদি, তোমাদের সঙ্গে থাকতে আমার খুব ভালো লাগছে। দেশে আমার তো বাবাও নেই, মাও নেই—

—মা-বাবা কেউ নেই? মারা গেছেন বুঝি, আহা—

সাহেব হাসলো। বললে—না দিদি, মা-বাবা থেকেও নেই আমার।

—কেন?

—আমার বাবা যে মাতাল, আমার মা তাই বাবার সঙ্গে থাকে না। আমার মা মাসির কাছে থাকতো, আমিও সেখানে থাকতুম—

অত বড় দুর্ধর্ষ সাহেব দুর্গার সঙ্গে যখন গল্প করতো তখন যেন অন্য মানুষ হয়ে যেত। দুর্গার মনে হতো যেন সে ঘরের ছেলে। কোথাকার কোন্ সাত সাগর তের নদী পেরিয়ে এখেনে যুদ্ধ করতে এসেছিল, নবাবকে খুন করে ফেলতে এসেছিল; কিন্তু মানুষটাকে দেখে তা যেন বোঝা যেত না। তিন বছর বয়েস পর্যন্ত মা'র সঙ্গে মাসির সঙ্গে কাটিয়েছে, তারপর আর দেখা হয়নি। মা তাকে দূরে পড়তে পাঠিয়েছে ইস্কুলে।

—তারপর থেকে আর বাড়ি কাকে বলে তা জানি না দিদি। কাকে বলে ভাই, কাকে বলে বোন তাও জানি না। তাই এই যে-ক'দিন তোমরা আছ এখেনে, মনে হচ্ছে যেন নিজের দেশেই আছি, নিজের বাড়িতেই আছি। আমার তাই খুব ভালো লাগছে দিদি,—তোমরা চলে গেলে আমার খুব কষ্ট হবে—

দুর্গা বললে—আমাদেরও তো তেমন খারাপ লাগতো না বাবা—কিন্তু—

—কিন্তু কী?

—কিন্তু তোমরা যে বাবা স্লেচ্ছ, তোমরা যে বাবা মোছলমানদের মত গরু খাও, গরু খেলে আর কেমন করে থাকি বাবা তোমাদের এখেনে—

—বীফ? তোমরা বীফ খাও না?

দুর্গা বললে—ও নাম কোর না বাবা, শুনলে আমার মেয়ে বমি করে ফেলবে!

—তা বীফ আমি খাবো না। তোমরা যদি চাও আমি গরুর মাংস খাওয়াও ছেড়ে দিতে পারি, আমার কোনো অসুবিধে হবে না দিদি। আমি ফিশ্ খাবো, আমি এগ্‌স্ খাবো, ফাউল-কারি, চিকেন-কারি...

—মুরগী? না বাবা, ও সব মোছলমানেরা খায়, আমরা ও-সব খাইনে—

সাহেব বললে—তোমরা ফাউল-চিকেন কিছুই খাও না? তাহলে মাটন্? মাটন্ খাও তো? আমি তাই-ই খাবো—

—না বাবা, তা কেন খাবে না? আমাদের জন্যে তুমি কেন অত কষ্ট করতে যাবে? আমরা দু'দিন আছি, দু'দিন পরেই চলে যাবো—আমাদের সঙ্গে তোমার কীসের সম্পর্ক বাবা?

সাহেবের মুখটা যেন কেমন ম্লান হয়ে গেল।

বললে—ঠিক আছে, আমি তো তোমাদের ওপর জোর করতে পারি না—

দুর্গা বললে—আমি তো সে-কথা বলিনি বাবা। আমাদের কপালে যে-ক'দিন কষ্ট আছে সে-ক'দিন তো এখেনে থাকতেই হবে। আমাদের জন্যে তোমারও তো কষ্ট হচ্ছে, সে তো দেখতেই পাচ্ছি—

—না দিদি, আমার কোনো কষ্ট নেই, তোমাদের যদি কষ্ট না হয় তো আমার কিছু কষ্ট নেই। এ-ক'দিন তোমরা থাকাতে তবু হোম-লাইফ এন্‌জয় করতে পাচ্ছি—

দুর্গা বললে—তা যদি বলো তাহলে ওই ছাই-পাঁশগুলো আর কেন খাও?

—কীসের কথা বলছো?

—ওই যে মদ! কী বিটকেল গন্ধ বেরোয় রোজ—

—কেন? মদ তো আমরা সবাই খাই। আমার বাবা তো পিপে-পিপে মদ খেত—

—তা খাক্, আমার মেয়ের বাপু বমি আসে ওই গন্ধ নাকে গেলে!

সাহেব বললে—তাই নাকি? তা এতদিন বলোনি কেন? আগে জানলে আমি খেতাম না দিদি—

—না বাছা, খেও না তুমি। ও কি ভদ্দরলোকে কেউ খায়? আমাদের গাঁয়ের ছোটলোকেরা খায় ও-সব, খেয়ে বাড়িতে এসে বউদের গালাগাল দেয় আর মারধোর করে—

সাহেব বললে—তা বেশ তো খাবো না, তোমাদের যদি খারাপ লাগে তো তাও খাবো না, প্রথম-প্রথম একটু কষ্ট হবে, কিন্তু হোক কষ্ট, না-খেলে তোমরা থাকবে তো?

—ওমা, দুর্গা বললে—তা কি কথা দিতে পারি বাছা! আমরা আমাদের ঘর-সংসার ছেড়ে তোমার বাড়িতে পড়ে থাকবো সে-কথা কেমন করে দেবো?

—না না, তা আমি বলছি না। তোমাদের বাড়ি যাবার বন্দোবস্ত তো আমিই করে দেবো, তোমাদের বাড়িতে না-পাঠিয়ে কি চিরকাল তোমাদের আটকে রাখবো? সে-কথা তো আমি বলিনি—।

সত্যিই কর্নেল ক্লাইভের সে-ক'দিন কেমন মনে হয়েছিল ওরা তার বাড়িতে থাকলেই যেন ভালো হয়। নবাবের সঙ্গে ওয়ার-ফেয়ার করতে এসে এ কী হলো তার! তবে কি সে ছোটবেলা থেকে যে ফ্যামিলি-লাইফের আস্বাদ পায়নি, এ সেই ফ্যামিলি-লাইফের লোভ?

কথা বলতে বলতে কখন যে দেরি হয়ে গিয়েছিল তার খেয়াল ছিল না। উমিচাঁদ সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার কথা ছিল অ্যাড্‌মিরাল ওয়াটসনের সঙ্গে, সে-কথাটাও বেবাক ভুলে গিয়েছিল। খেয়াল হতেই উঠে পড়লো। বললে—উঠি দিদি, একটা কাজের কথা একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম—

কিন্তু কলকাতার কেল্লায় গিয়ে শুনলে, ওয়াটসন্ তার জন্যে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে করে শেষকালে নাকি একলাই বেরিয়ে গিয়েছে। রবার্ট আর নামলো না ঘোড়া থেকে। সোজা চললো হালসীবাগানের দিকে। বন-জঙ্গল ঢাকা রাস্তা, উমিচাঁদের বাড়িটাও এমন জায়গায় করেছে যে সহজে যাওয়া-আসার উপায় নেই। ফিরিঙ্গীদের ছোঁয়াচ এড়িয়ে আছে। অনেকদিন ওয়াটসন্ বলেছে—লোকটাকে বিশ্বাস করা উচিত নয়।

ক্লাইভ বলেছিল—উমিচাঁদ যদি আমাদের কাজে লাগে তো বিশ্বাস করতে আপত্তি কী?

—না রবার্ট, ইণ্ডিয়ানদের বিশ্বাস কোর না, ডোণ্ট্ বিলিভ দেম, দে আর লায়ার্স!

এইসব কথা শুনলেই ক্লাইভের রাগ হয়ে যেত। ইণ্ডিয়ানরা সবাই লায়ার, এটা হতে পারে না। মিথ্যেবাদী সত্যবাদী সব দেশেই আছে। সমস্ত জগতটাকেই একেবারে লায়ার বলে দোষ দিচ্ছ কোন্ অপরাধে?

এই যে নবাব সকলকে বারণ করে দিয়েছে ইংরেজদের যেন কেউ জিনিস-পত্র না বেচে, কিন্তু সবাই তো এসে লুকিয়ে লুকিয়ে তাদের চাল-ডাল-মাছ-মাংস বিক্রি করে যায়! লণ্ডনে কোম্পানীর হেড্-অফিস থেকে কেবল চিঠি আসছিল—তোমরা বেঙ্গল ছেড়ে চলে এসো। ওখানে তোমাদের আর থেকে কোনো লাভ নেই। আমাদের অকারণে অনেক টাকা-কড়ি নষ্ট হচ্ছে, আর নষ্ট কোর না।

উমিচাঁদের বাড়ির সামনে আসতেই গেটের দরোয়ানটা সেলাম করলে।

—ওয়াটসন্ সাব আয়া হ্যায়?

—জী হাঁ।

দরোয়ানটা ফিরিঙ্গী-কোম্পানীর সাহেব দেখলে একটু বেশি খাতির করে। একেবারে সোজা টেনে নিয়ে গেল ভেতরে। বিরাট গদী-পাতা আসর উমিচাঁদের। লোকটা মাল্‌টি-মিলিওনেয়ার। আগে কখনো আসেনি ক্লাইভ এ-বাড়িতে। কিন্তু শুনেছিল সব। চারদিকে চেয়ে অবাক হয়ে গেল। এত বড় বাড়ি, এত ট্রেজার উমিচাঁদের!

—কী দেখছো সাহেব?

ক্লাইভ বসলো গদীতে। বললে—তুমি খুব রিচ লোক, আমি জানতুম, কিন্তু

এত রিচ জানতুম না—

উমিচাঁদ সে-কথার ধার দিয়ে গেল না। বললো—ইচ্ছে করলে তোমরাও আমার মত বড়লোক হতে পারো—

—কী করে?

—আমি যেমন করে হয়েছি।

—কী করে বড়লোক হয়েছো তুমি?

উমিচাঁদ দাড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে বললে—সেই কথাই তো এতক্ষণ বলছিলুম তোমার ফ্রেন্ড্‌কে। কিন্তু একটা কথা কর্নেল ক্লাইভ, তুমি কি সত্যিই বড়লোক হতে চাও? মালটি-মিলিওনেয়ার হতে চাও?

অ্যাডমিরাল চুপ করে বসে ছিল একপাশে। রবার্ট তার দিকে চাইলে।

—তাহলে এ-দেশের মেয়েমানুষের দিকে নজর দিও না। আগে ঠিক করে নাও, টাকা চাও, না মেয়েমানুষ চাও—এদেশে টাকা দিলে অনেক মেয়েমানুষ পাবে। যেমন নবাব-বাদ্‌শারা টাকা দিয়ে হারেমের মধ্যে মেয়েমানুষ কিনে রেখেছে। কিন্তু টাকা উপায় করতে গেলে আমার মত হতে হবে—

ক্লাইভের মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল হঠাৎ। বললে—হোয়াট ডু ইউ মীন বাই দ্যাট্? তুমি কী বলতে চাও বুঝিয়ে বলো!

—তুমি তোমার ক্যাম্পে মেয়েমানুষ পুষেছো শুনলুম!

—কে বললে? ওয়াটসন্?

অ্যাডমিরাল ওয়াটসন্ তখনো চুপ করে বসেছিল একপাশে। ক্লাইভ তার দিকে চাইলে।

—মিস্টার উমিচাঁদ, অন্য কেউ এ-কথা বললে আমি তাকে আমার বন্দুক দিয়ে গুলি করে মারতুম। কিন্তু তুমি ইংরেজ-কোম্পানীর ফ্রেন্ড, বেঙ্গলের নবাবেরও ফ্রেন্ড, তাই কিছু বললুম না,—অন্য কথা বলো, লেট আস কাম্ টু আওয়ার ওয়ার্ক—

বলে রাগে গোঁ গোঁ করে ফুলতে লাগলো ক্লাইভ। মনে হলো যেন জীবনে কখনো এত রেগে ওঠেনি সে। ইণ্ডিয়ায় আসার পর থেকেই বরাবর দেখে আসছে, এখানকার ইংলিশম্যানেরা যেন অন্য রকম। এখানে তারা নিজের দেশকে যেন সবাই ছোট করে।

বললে—তোমরা সবাই লেডীদের যে-চোখে দেখ আমি সে-চোখে দেখি না।

উমিচাঁদ বললে—আমরা কী চোখে দেখি?

ক্লাইভ বললে—শুধু তুমি কেন? এই ওয়াটসন্, এও একজন ক্রীশ্চান, জেসাস্ ক্রাইস্টের ফলোয়ার, সান্‌ডেতে চার্চে যায়, এও লেডীদের অনার করে কথা বলতে জানে না। আমার ক্যাম্পের পাশে দুজন লেডীকে আমি শেলটার দিয়েছি, দে আর হেল্‌প্‌লেস, তাদের রিলেটিভসদের কাছে তারা যেতে পারছে না। দে আর ইণ্ডিয়ান, কিন্তু কোনো ইণ্ডিয়ান তো তাদের আশ্রয় দেয়নি। আমি কি তাদের আটকে রেখেছি বলতে চাও? অ্যাম আই সো মীন? যেদিন তারা নিরাপদ জায়গায় আশ্রয় পাবে, সেইদিনই আমি তাদের সেখানে পাঠিয়ে দেবো—

উমিচাঁদ এবার কৌতূহলী হয়ে উঠলো।

—কে তারা?

ক্লাইভ বললে—আই ডোণ্ট নো। আমি জানি না। আমি তাদের জিজ্ঞেসও করিনি—

—তোমার কাছে তারা এল কী করে?

—দে ওয়্যার স্ট্র্যাণ্ডেড্। আমি আমার সেপাই হরিচরণকে তাদের দেখাশোনা করবার জন্যে রেখে দিয়েছি। ওরা কেষ্টনগরে যেতে চেয়েছিল, সেখানেও যেতে পারেনি ফ্রেঞ্চদের ভয়ে, তারা হাতিয়াগড় যেতে চেয়েছিল, সেখানেও—

—হাতিয়াগড়?

উমিচাঁদ যেন হঠাৎ কৌতূহলী হয়ে উঠলো।

ক্লাইভ বললে—হ্যাঁ, হাতিয়াগড়।

—হাতিয়াগড়ে যেতে চেয়েছিল কেন?

—আই ডোণ্ট নো। শুনেছি সেখানে তাদের রিলেটিভস্ আছে। কিন্তু আই ডোণ্ট বদার আইদার। আমি শুধু ওদের সেফ্‌টির জন্যে আমার কাছে রেখে দিয়েছি। আমি জানি তোমাদের নবাব একজন লেডীকিলার, যদি একবার কোনো রকমে তোমাদের বিস্ট্‌লি নবাবের হাতে এরা পড়ে তো—দি ইয়ং লেডী উইল বি রেপড্—হি উইল মেক এ বেগম অব হার,—ওকে বেগম বানিয়ে ছাড়বে—!

তারপর একটু থেমে বললে—তুমি কি মনে করো ওদের আমি মিছিমিছি আমার কাছে রেখেছি?

এতক্ষণ অ্যাডমিরাল ওয়াটসন্ চুপ করে বসে ছিল। বললে—রবার্ট, ও-সব কথা থাক, লেট আস কাম টু আওয়ার ওয়ার্ক—। উমিচাঁদ সাহেব বলছে নবাবের সঙ্গে আমাদের মিটমাট করিয়ে দেবে!

—মিটমাট করে কী হবে?

অ্যাডমিরাল ওয়াটসন্ বললে—কিন্তু কতদিন এ-ভাবে আমরা থাকতে পারবো এখানে? কেউ আমাদের সঙ্গে কারবার করছে না। আমাদের মার্কেট কোথায়? শুধু ফোর্ট দখল করলেই চলবে? আমাদের এখানে থাকা-খাওয়া আর্মি মেনটেন করার খরচ নেই? আমাদের কোম্পানীর হেড্-অফিস থেকে চিঠি লিখছে বেঙ্গল ছেড়ে চলে আসবার জন্যে! শেষকালে কোথায় টাকা পাবো? শ্যাল উই স্টার্ভ?

ক্লাইভ বললে—কিন্তু আমি তো এখানে হারবার জন্যে আসিনি—

—কে বলছে আমরা হেরেছি? আমরা তো জিতেছি!

ক্লাইভ বললে—একে জেতা বলে না। আমি একেই বলি হার। ওরা আমাদের বিজনেস বয়কট করলে তো আমাদের হারই হলো—

—কিন্তু মিটমাট করতে তোমার আপত্তিটা কী?

ক্লাইভ বললে—এখন মিটমাট করতে গেলে নবাব আমাদের টার্মস ডিক্‌টেট করবে। যে সব শর্ত দেবে তাতে সই করা আর লড়াইতে হেরে যাওয়া একই কথা।—

অ্যাডমিরাল ওয়াটসন্ মিস্টার উমিচাঁদের দিকে চাইলে।

বললে—আপনার কী মত মিস্টার উমিচাঁদ?

উমিচাঁদ বললে—নবাব আমাকে বিশ্বাস করে। আপনারা যদি চান মিটমাট হোক, তাও করিয়ে দিতে পারি, আবার আপনারা যদি চান নবাবকে লড়াইতে নামিয়ে দিতে, তাও করিয়ে দিতে পারি। আমি সব করিয়ে দিতে পারি—কোন্‌টা চান আপনারা বলুন।

ওয়াটসন্ বললে—আমি মিটমাট চাই—

উমিচাঁদ বললে—মিটমাট করে আপনাদের আগেকার কারবার চালাতে চান?

—হ্যাঁ! নইলে আমাদের অনেক লস্ হচ্ছে!

উমিচাঁদ বললে—মিটমাট করিয়ে দিতে পারলে আমি কী পাবো? আমায় কত টাকা দেবেন বলুন?

ওয়াটসন্ রবার্টের মুখের দিকে চাইলে।

ক্লাইভ বললে—আমি চাই ওয়ার, আমি নবাবের সঙ্গে ফাইট করতে চাই—

উমিচাঁদ বললে—আমি তাও করিয়ে দিতে পারি। করালে আমায় কত টাকা দেবেন বলুন? আমি কারবারি লোক, কারবার করে খাই, নাফা ছাড়া আমি কিছু বুঝি না—

ক্লাইভ চুপ করে শুধু কথাটা শুনলো। কিছু কথা বললে না।

ওয়াটসন্ উমিচাঁদকে জিজ্ঞেস করলে—টেল মি হোয়াট ইজ্ ইওর ডিম্যাণ্ড—আপনার কত দাবী সেটা বলুন আগে—

উমিচাঁদ হঠাৎ উঠলো। বললে—বলছি, তার আগে আমি একটু পাশের ঘর থেকে আসছি—বলে পাশের ঘরে উঠে গেল উমিচাঁদ সাহেব।

ক্লাইভ দাঁতে দাঁত চেপে বললে—নাম্বার ওয়ান স্কাউণ্ড্রেল—

—অত চেঁচিয়ে বোল না রবার্ট! লোকটাকে এখন আমাদের কাজে লাগাতে হবে! একবার ওকে আমরা প্রিজনার করেছিলাম, দরকার হলে না-হয় আবার ওকে জেলে পুরবো। কিন্তু ওকে চটিয়ে লাভ কী। এখন ওকে আমরা হাতের মুঠোয় রাখতে চাই। হি ইজ এ মাল্‌টিমিলিওনেয়ার—

পাশের ঘরে ফকিরটা তখনো লুকিয়ে ছিল। উমিচাঁদ সাহেব কাছে যেতেই বললে—ওরা ভেগে গেছে নাকি সাহেব?

—না, ওদের বসিয়ে রেখে দিয়ে এসেছি। তোকে একটা কাজ করতে হবে!

—কী কাজ?

—ওরা এখানে থাকতে থাকতে তোকে দেখে আসতে হবে বরানগরে গিয়ে যে, ক্লাইভ সাহেবের ছাউনিতে আওরৎ দুজন কে?

—আওরৎ?

—হ্যাঁ রে হ্যাঁ, জেনানা! কাদের লুকিয়ে রেখেছে ফিরিঙ্গীটা, সেটা খোঁজ নিয়ে এসে আমাকে বলবি। তারপরে মেহেদী নেসার সাহেবের কাছে যাস!

—কিন্তু তাহলে যে আমার দেরি হয়ে যাবে!

—দেরি হলে মেহেদী নেসার সাহেবের কাছে আমার নাম করিস। তুই ওই দিকের দরজাটা দিয়ে সোজা বরানগরে চলে যা!

ফকিরটা সত্যি সত্যিই চলে যাচ্ছিল।

উমিচাঁদ সাহেব থামিয়ে দিলে। বললে—দূর বেত্তমিজ্, ফকির সেজে যাসনি। হিন্দুদের মত সাধু-সন্নেসী সেজে যা!

—এখন সাধু কী করে সাজবো! গেরুয়া কোথায় পাবো? কমণ্ডলু কোথায় পাবো? ওদের হরিনামের মালা কোথায় পাবো?

উমিচাঁদ চুপি চুপি ধমকে উঠলো। বললে—একেবারে বেল্লিক একটা তুই, মেহেদী নেসার বাজে লোককে চরের নোকরি দিয়েছে। আমি তো হিন্দু রে! আমার বাড়িতে তো সব আছে। গেরুয়া, কমণ্ডলু, হরিনামের মালা—বলে বোধহয় ওই সব আনতেই ঘরের বাইরে চলে গেল উমিচাঁদ সাহেব।

সেদিন হালসিবাগানের উমিচাঁদ সাহেবের বাড়িতে যে-ঘটনা তখন ঘটেছিল মুর্শিদাবাদের মতিঝিলের মধ্যেও সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হলো। সেই আত্মপ্রতিষ্ঠা। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ইণ্ডিয়াতে এসে আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল কারবার করে। মুর্শিদাবাদের নবাবও আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল নতুন পাওয়া মসনদের ওপর নিজের অধিকার পাকা করে। উমিচাঁদ সাহেবও আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল তার ফিরে পাওয়া ঐশ্বর্যের ওপর অধিষ্ঠিত হয়ে।

পৃথিবীর ইতিহাস এই আত্মপ্রতিষ্ঠারই ইতিহাস। একজন আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করে, আর আশপাশের দশজন তাকে হয় সাহায্য করে নয়তো বাধা দেয়। কোনো সাহায্য উপকারে লাগে, আবার কোনো বাধা দুর্লঙ্ঘ হয়ে তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

নবাব মীর্জা মহম্মদের যেন নতুন করে চোখের দৃষ্টি খুলে গেল। তাহলে কি কাউকেই বিশ্বাস করবার উপায় নেই সংসারে? একজনকে ধ্বংস করে মুক্ত হতে না হতে আর একজন শত্রু ওদিক থেকে গজিয়ে ওঠে।

নানীবেগম লক্ষ্য করছিল সমস্ত। মীর্জার কথায় কিন্তু আশ্চর্য হলো না। মীর্জার সামনে নিচু হয়ে বসলো।

বললে—ভেবে আর কী করবি মীর্জা, চল্ আজকে চেহেল্-সুতুনে থাকবি চল্—

চেহেল্-সুতুনে আগে থেকেই সাড়া পড়ে গিয়েছিল। নবাব চেহেল্-সুতুনে আসবে শুনলেই সব আবহাওয়াটাই যেন বদলে যায়।

পেশমন বেগম খবরটা শুনেই সাজগোজ আরম্ভ করে দিয়েছিল। ময়মানা বেগম নতুন এসেছে। তার ঘর, তার আসবাব সব কিছুর ব্যবস্থা করতে হয়েছে পীরালি খাঁকে। সমস্ত দিন তাই নিয়েই কেটে গেছে, তারপর হঠাৎ খবর এল নবাব আসবে চেহেল্-সুতুনে।

রাত তখন হয়নি ভালো করে। চক্‌বাজারে দোকানে-দোকানে আলো জ্বলে উঠেছে। পিলখানা থেকে হাতীর দল চরতে বেরিয়েছিল গঙ্গার ধারে। তারা সব দলে দলে ফিরে আসছে। সারাফত আলি দোকান খুলে আগরবাতি জ্বালিয়ে দিয়ে গড়গড়ায় তামাকুর ধোঁয়া টানতে শুরু করেছে। হঠাৎ বাইরে নবাবের তাঞ্জাম দেখে যেন নেশা কেটে গেল।

—বাদ্‌শা!

বাদ্‌শা আসতেই সারাফত আলি জিজ্ঞেস করলে—ও কার তাঞ্জাম রে? নবাবের না?

বাদ্‌শা বললে—জী হাঁ জনাব!

গড়গড়ার নল থেকে আরো লম্বা-লম্বা ধোঁয়া টেনে সারাফত আলি নিজের রাগ চেপে রাখবার চেষ্টা করলে।

জিজ্ঞেস করলে—ও বাঙালীবাচ্ছা কাঁহা?

বাদ্‌শা বললে—অন্দরে আছে—

—ডাক ওকে—ডাক—

এ-সময়ে সাধারণত ডাকে না সারাফত আলি। তাই কান্ত একটু অবাক হয়ে

গিয়েছিল। কান্ত আসতেই মিঞাসাহেব জিজ্ঞেস করলে—কী করছিলি কান্তবাবু?

—এমনি শুয়ে ছিলুম!

—তোর কাজ-কাম কিছু নেই? কেবল শুয়ে থাকবি দিনরাত? কী হয়েছে তোর?

কান্ত বললে—আমার কিছু ভালো লাগছে না মিঞাসাহেব।

—তবিয়ত খারাব?

কান্ত বললে—হ্যাঁ—

—কেন? আরক খাবি?

কান্ত ভয় পেয়ে গেল। বললে—না মিঞাসাহেব, না—ক'দিন বিশ্রাম নিলেই ভালো হয়ে যাবে। আরক খাবার দরকার নেই—

ততক্ষণে রাস্তার ওপর দিয়ে আগে আগে হাতীর দল সার-সার চলেছে। তার পেছনে দু'টো তাঞ্জাম। পেছনে আবার হাতীর সার। সমস্ত চক্‌বাজারের রাস্তার ভিড় সরাতে সরাতে চলেছে হুকুম-বরদার।

—পেছনে কার তাঞ্জাম রে বাদ্‌শা?

—নানীবেগমসাহেবার!

হুম্‌! সারাফত আলি সাহেব নিজের মনের ভেতরেই যেন নিঃশব্দে গুমরে উঠলো। হাজি-আহম্মদের ঘরানা এখনো মিঞাসাহেবের কলিজা মাড়িয়ে মাড়িয়ে চলেছে। বহু দিনের মনের রাগ যেন বুক ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছিল। দিনের পর দিন এই খুশ্‌বু তেলের দোকানের সামনে দিয়েই নবাব এসেছে গেছে। কখনো গেছে কলকাতায় ফিরিঙ্গী কোম্পানীর সঙ্গে লড়াই করতে, কখনো গেছে পূর্ণিয়ায় শওকত জঙ্‌-এর সঙ্গে লড়াই করতে। প্রত্যেক বারই লড়াই ফতেহ্‌ করে নবাবী-ফৌজ বুক ফুলিয়ে মুর্শিদাবাদে ফিরে এসেছে। আর সারাফত আলির বুকখানা ভেঙে গুঁড়িয়ে গেছে। আর কতদিন ইন্তিজারি করবে সে!

কান্তও দেখছিল জলুসটা। নবাব তো মতিঝিলেই থাকতো বরাবর। হঠাৎ আবার চেহেল্‌-সুতুনে চলেছে কেন? তাহলে মরালী কোথায় গেল? মরালীকে কি ছেড়ে দিয়েছে নবাব? ক'দিন থেকেই চক্‌বাজারে বড় গোলমাল চলছিল। বড় ভয় পেয়ে গিয়েছিল কান্ত, যদি সত্যি-সত্যিই মরালীর ফাঁসি হয়ে যেত! ভাগ্যিস মরালী ডেকে পাঠিয়েছিল তাকে! ভাগ্যিস কান্ত ঠিক সময়ে গিয়ে পড়েছিল। নইলে মেহেদী নেসার কী করতো কিছু বলা যায় না!

সকাল বেলা যখন হঠাৎ তাকে কোতোয়াল ছেড়ে দিলে তখনো বুঝতে পারেনি। নবাব নিজে তাকে দেখে ফেলেছে। অথচ নিজের জীবন দিয়েই সে বাঁচাতে গিয়েছিল মরালীকে। মরালীকে বাঁচাতে গিয়ে সে হয়তো মেহেদী নেসারের হাতেই খুন হয়ে যেত। খুন যে হয়নি সে তার কপাল।

তারপর মতিঝিলে যাবার সময় পুরকায়স্থ মশাইও তাকে দেখতে গিয়েছিল। হাতে হাতকড়া বেঁধে নিয়ে গিয়েছিল তাকে। নেয়ামত যখন তাকে চলে যেতে বললে তখন যেন বিশ্বাসই হয়নি।

—কেন? আমাকে ছেড়ে দিলে কেন নবাব?

নেয়ামত বলেছিল—মরিয়ম বেগমসাহেবা নবাবকে বলে আপনাকে ছাড় করিয়ে নিয়েছে!

—মরিয়ম বেগমসাহেবা!

যেন কথাটা বিশ্বাস করবার মত নয়। প্রথমটা তাই একটু অবাকই হয়ে গিয়েছিল কান্ত। কিন্তু তারপর আর ভাববার সময় পায়নি। কোতোয়ালের

পাহারাদাররা হাতের বাঁধন খুলে দিতেই সিঁড়ি দিয়ে নিচেয় নেমে এসে একেবারে পুরকায়স্থ মশাই-এর সঙ্গে মুখোমুখি দেখা। সচ্চরিত্র পুরকায়স্থ মশাইও হঠাৎ এই ব্যাপারে বোধহয় আকাশ থেকে পড়েছিল।

—কী বাবাজী, তুমি কি না শেষকালে এই কাজ করলে?

কান্তর মনটা ভালো ছিল না। তবু জিজ্ঞেস করলে—কী কাজ?

—ওরা না-হয় স্লেচ্ছ, শোভারাম বিশ্বাস মশাই-এর মেয়ে না-হয় চরিত্রটি খারাপ করে বসেছে, তা বলে তুমি কেন বাবাজী এ-সব স্লেচ্ছ কাণ্ডের মধ্যে এলে? তুমি তো ভদ্রসন্তান বলে জানতুম!

ওদিক থেকে কার যেন পায়ের শব্দ এল। আর কথা বলবার সাহস হলো না। নবাব মতিঝিলে এসেছে বলে মুর্শিদাবাদের আমীর-ওমরাও সবাই তটস্থ হয়ে উঠেছে। লোকজন, সেপাই-শান্ত্রী, খিদ্‌মদ্‌গার, হুকুমবরদার, সবাই এদিক-ওদিক করছে। তার মধ্যে কখন কে দেখে ফেলবে তখন আরো মুশ্‌কিলে পড়বে। তাই বেশিক্ষণ আর দাঁড়ায়নি সেখানে। সোজা ফটক পেরিয়ে রাস্তায় চলে এসেছিল। তারপর সেখান থেকে সেই যে সে নিজের ঘরে এসে ঢুকেছে আর বেরোয়নি।

সত্যিই তো, কেন সে এখানে এখনো পড়ে আছে। এর চেয়ে তো নিজের দেশে চলে গেলেই পারতো। সেখানে হয়তো কলকাতার মত জাঁক-জমক নেই, মুর্শিদাবাদের মত নবাবিআনা নেই, কিন্তু শান্তি তো আছে।

হঠাৎ বশীর মিঞা এসে হাজির হলো।

—এই ইয়ার, এদিকে আয়!

কান্ত দোকান থেকে বাইরে গিয়ে দাঁড়ালো। তখনো জলুসটা চলেছে চেহেল্‌-সুতুনের দিকে।

কাছে যেতেই বশীর বললে—আয় আমার সঙ্গে, একটা বাত্‌ আছে—

বলে রাস্তার এক কোণে নিয়ে গেল। সমস্ত লোকজন তখন হাঁ করে জলুস দেখছে। বশীর এক ধারে টেনে নিয়ে গিয়ে বললে—তোর নামে সব কী শুনলুম? তুই কী করেছিস?

কান্ত বললে—রাণীবিবি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিল কোতোয়ালীতে, তাই গিয়েছিলুম।

—কে ডেকেছিল তোকে?

—রাণীবিবি। সফিউল্লা খাঁ সাহেবকে যে খুন করেছিল।

—কাকে দিয়ে ডেকেছিল? তাকে চিনিস?

—না।

—তাকে চিনিয়ে দিতে পারবি?

—না, ভালো করে চিনে রাখিনি।

বশীর মিঞা যেন খুব চিন্তিত হয়ে উঠেছে। বললে—শালার সব গোলমাল হয়ে গেল। হৈ-চৈ পড়ে গেছে চারদিকে। তোর নোকরি হয়তো আর রাখতে পারবো না। তবে কোশিস করবো। তুই কিছু ঘাবড়াসনি।

কথাটা শুনে কান্ত মুখ ফেরালো।

—আমার চাকরি চলে যাবে? কেন?

—তুই কী সব লট-ঘট করেছিস মেহেদী নেসার সাহেবের সঙ্গে। আমার ফুপা মনসুর আলিকে মেহের সাহেব বলছিল। আমি হাতিয়াগড়ে গিয়েছিলুম ডিহিদারের সঙ্গে দেখা করতে, এর মধ্যে তামাম সব কুছ বদলে গেছে!

কান্ত বললে—আমিও আর চাকরি করবো না ভাই। এ চাকরি করার ইচ্ছেও আমার নেই—

—কেন, চাকরি করবি না তো খাবি কী?

—খাবার ভাবনা নেই আমার। বুড়ো মিঞাসায়েব যতদিন আছে ততদিন আমাকে সে-ই খাওয়াবে। আর তা ছাড়া মুর্শিদাবাদ আমার আর ভালোও লাগছে না, আমি দেশে চলে যাবো, বড়চাতরায়—সেখানে আমাদের বাবুদের সেরেস্তায় একটা যা-হোক কাজ জুটিয়ে নেবো।

তারপর একটু থেমে বললে—শুধু একটা কারণের জন্যে যেতে পারছি না—

—কী?

—ওই রাণীবিবির জন্যে!

—মরিয়ম বেগম?

—হ্যাঁ!

—মরিয়ম বেগমসাহেবার জন্যে তোর কী পরোয়া?

—মরিয়ম বেগমসাহেবার যদি ফাঁসি হয়ে যায়? শুনেছি ফাঁসি হবে নাকি?

বশীর জিজ্ঞেস করলে—ফাঁসি হলে তোর কী? মরিয়ম বেগম তোর কে? তোর বিবি না তোর জরু?

—ও-কথা বলিসনি! তুই তো জানিস, আমিই মরিয়ম বেগমকে চেহেল্-সুতুনে এনে দিয়েছি! আমিই তো তার জবাবদার। মরিয়ম বেগমসাহেবার যদি ফাঁসি হয় তো তার জবাবদারি তো আমারই।

—কে তোর জবাব চাইবে? কাজীসাহেব, না কোতোয়াল, না নিজামত!

—ওদের কথা ছেড়ে দে! আমার বিবেক বলে কিছু নেই, মাথার ওপর ভগবান বলে কেউ নেই বলতে চাস? স্বর্গে গেলে আমার কাছে জবাবদিহি চাইবে না ভগবান?

বশীর মিঞা হেসে উঠলো।

—রেখে দে তোর ইমানদারি! ইমানদারি নিয়ে ধুয়ে খাবি? ইমানদারি নিয়ে দুনিয়া কখনো চলে? কখনো চলেছে? ইমানদারিতে দিল্লীর বাদ্‌শাগিরি চলছে? ইমানদারিতে নিজামত চলছে?

কান্ত বললে—ইমানদারি না থাকলে কিছুই চলবে না জেনে রাখিস! এই তোর নিজামতিও চলবে না। ইমানদারিই হচ্ছে আসল জিনিস। ইমানদারি আছে বলে এখনো আকাশে চন্দ্র সূর্য উঠছে, ইমানদারি আছে বলেই এখনো তুই-আমি সবাই বেঁচে আছি!

—দূর গাধা কোথাকার! তুই কিছু্ছু জানিস না।

কান্ত বললে—ও নিয়ে তোর সঙ্গে তর্ক করতে চাই না ভাই। তুই কী বলতে এসেছিলি, বল—

বশীর বললে—না রে, তোর ভয় নেই, তোর পেয়ারের রাণীবিবির ফাঁসি হবে না।

—হবে না? কেন?

—নবাব খুদ্ নিজে মরিয়ম বেগমসাহেবাকে ছাড়িয়ে নিয়ে গেল, দেখলি না? ওই যে জলুস গেল? সামনের তাঞ্জামে নবাব আর পেছনের তাঞ্জামে নানীবেগম আর মরিয়ম বেগমসাহেবা। রাণীবিবির নসিবটা ভালো রে ইয়ার, এক ঝটকায় নবাবের নেক্-নজরে পড়ে গেছে।

—তাহলে ফাঁসি হবে না আর?

—ফাঁসি হবে কি রে! হলে কোতোয়াল সাহেবের ফাঁসি হবে, মেহেদী নেসার সাহেবের ফাঁসি হবে, ইয়ারজান সাহেবের ফাঁসি হবে, তামাম মুর্শিদাবাদের সকলের ফাঁসি হতে পারে। লেক্‌ন্‌ মরিয়ম বেগমসাহেবার কোন ফাঁসি দেবে?

তারপর একটু গলাটা নিচু করে বললে—তোর কাছে যে-জন্যে এসেছি তাই বলি—উমিচাঁদ সাহেবের কাছে যেতে পারবি? কোলকাতায়, হালসিবাগানে?

—কেন?

—মেহেদী নেসার সাহেব উমিচাঁদ সাহেবের কাছে আদমী পাঠিয়েছিল, সে এখনো ফিরে আসছে না। খবর মিলছে না কিছু। তুই যেতে পারবি?

—কে সে? কোন্‌ লোক? কাকে পাঠিয়েছিল?

—দরবার খাঁ, ফকির সেজে গিয়েছিল উমিচাঁদ সাহেবের কাছে।

—কেন গিয়েছিল?

—সে তোর জানবার দরকার কী? তুই শুধু জেনে আসবি দরবার খাঁ বলে কোনো লোক ফকিরের পোশাকে উমিচাঁদ সাহেবের হাবেলিতে ঢুকেছে কিনা।

কান্ত বললে—সে আমাকে বলবে কেন?

—তুই মেহেদী নেসার সাহেবের পাঞ্জা নিয়ে যাবি। তোর ডর কী? তুই উমিচাঁদ সাহেবকে মেহেদী নেসার সাহেবের পাঞ্জা দেখাবি, তাহলেই বলবে সব।

চলতে চলতে অনেক দূর চলে এসেছিল দু'জনে। নবাবের তাঞ্জামের জলুস তখন চেহেল্‌-সুতুনে ঢুকে পড়েছে। হাতীর দল চেহেল্‌-সুতুন থেকে বেরিয়ে আবার মতিঝিলে চলে গেছে। রাস্তার ধারে সেই গণৎকারটা এক মনে কার হাত দেখছিল আর পাথরের ওপর কী সব লিখছিল।

কান্ত বললে—ওই দেখ, ওকে কাল আমার হাত দেখিয়েছিলুম রে—

বশীর মিঞাও দেখলে। বললে—ওর কাছে গিয়েছিলি কেন?

—মনটা খারাপ ছিল খুব। ভাবছিলাম জীবনে তো কিছুই হলো না। কলকাতার সেই বেভারিজ সাহেবের গদিতে জীবন শুরু হয়েছিল, কত আশা ছিল জীবনে তখন। তারপর এখানে চলে এলাম। বিয়ে করতে গিয়ে গণ্ডগোল হয়ে গেল। তাই ভাবলাম হাতটা দেখাই। দেখি না ভাগ্যে কী লেখা আছে। গিয়ে দেখালাম—

—কী বললে?

—বললে, যার সঙ্গে আমার বিয়ে হবার কথা ছিল, তার সঙ্গেই আমার নাকি আবার বিয়ে হবে ভাই।

—আর কী বললে? আর কিছু বলেছে?

—আর বললে, জলই আমার শত্রু। কখনো যেন জলের কাছে আমি না যাই।

বশীর মিঞা বললে—একবার তো জলে ডুবে গিয়েছিলি তুই?

—ডুবে যাইনি ঠিক। বর্গীদের হামলার সময় আমি বুড়ি-গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিলুম। প্রায় ডুবে যেতুম। অনেক কষ্টে সুতোনুটির ঘাটে উঠেছিলুম, তাই বেঁচে গিয়েছিলাম। কিন্তু সে না-হয় হলো। না-হয় নৌকোয় কখনো যাবো না। কিন্তু একবার যার অন্য লোকের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেছে, তার সঙ্গে আবার বিয়ে হবে কী করে? তোদের মত আমাদের হিন্দুদের তো নিকে হয় না। তালাক্‌ও হয় না—

—দূর, ও-সব বুজরুকি। ও-লোকটা বুজরুক। ও-সব নিয়ে কিছু ভাবিসনি।

কান্ত বললে—ভাববো না তো ভাবি, কিন্তু ভাবনাটা কিছুতেই যে মন থেকে দূর করতে পারি না!

—কেন, তুই কি এখনো তার কথা ভাবিস?

কান্ত বললে—হ্যাঁ, ভাবি, কেবল ভাবি

—তাহলে এক কাজ কর না। যে লোকটার সঙ্গে তার সাদি হয়েছে সে তো পাগলা। তাকে তো তার বউ তাড়িয়ে দিয়েছে। সেদিন মোল্লাহাটিতে আমার সঙ্গে উদ্ধব দাসটার দেখা হলো তো। সে নিজেই তো বললে—তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে তার বউ, তার সঙ্গে দেখাই করেনি। তা তুই কল্‌মা পড়ে মোছলমান হয়ে যা না! হবি?

—মুসলমান হবো?

—হ্যাঁ। হতে দোষ কী! হলে তো তোর নোকরিরও সুবিধে হবে, সাদিরও সুবিধে হবে। উদ্ধব দাসের বউও মুসলমান হবে, তুইও মুসলমান হবি, হয়ে আবার সাদি করবি তোরা। তুই তো কলকাতায় যাচ্ছিস উমিচাঁদ সাহেবের হাবেলিতে। ওখান থেকে কামটা সেরে সোজা বরানগরে যাবি, গিয়ে বলবি তোর বউকে মোছলমান হতে! আর আমি এদিকে মওলভি সাহেবকে ভি সব বলে ঠিক করে রাখবো! কিছু ভাবিসনি, যা। মন খারাপ করিসনি। যা, আমার কাজ আছে আমি চললুম।

কান্ত তখনো কিছু কথা বলছিল না।

বশীর মিঞা বললে—কী রে, সব বন্দোবস্ত তো করে দিলুম, আবার কী ভাবছিস?

কান্ত হঠাৎ বললে—আচ্ছা, মরিয়ম বেগমসাহেবাকে যে আজকে নবাব চেহেল্‌-সুতুনে নিয়ে গেল, এর মতলবটা কী? কী করবে নবাব?

বশীর মিঞা হাসলো, বললে—কী আবার করবে? যে-জন্যে রাণীবিবিকে চেহেল্‌-সুতুনে নিয়ে এসেছিল তাই করবে?

—কী জন্যে নিয়ে এসেছিল?

বশীর মিঞা বললে—ফুর্তি করবার জন্যে! সেই ফুর্তি করবে!

—ফুর্তি করবে মানে?

বশীর মিঞা বললে—তোকে আমি আর বোঝাতে পারবো না—ফুর্তি করবে মানে মহ্‌ফিল্‌ করবে, মজলিস করবে!

—আর কী করবে?

বশীর মিঞা বিরক্ত হয়ে গেল। আর এ-কথার উত্তর দিলে না। চলে যেতে যেতে বললে—তোর মাথায় বিলকুল গোবর পোরা, তোর কিছু হবে না। আমি চলি, আমার কাম আছে। কাল ভোর বেলা তৈয়ার থাকবি—যা—

বলে বশীর মিঞা চলে গেল। কিন্তু কান্তর পা দুটো তখন কে যেন শেকল দিয়ে বেঁধে ফেলেছে। সে সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলো। সেই চক্‌-বাজারের রাস্তার ওপর। তার যেন নড়বার ক্ষমতাটাও হারিয়ে ফেলেছে সে!

চেহেল্-সতুনে সেদিন আর কারো বিশ্রাম নেই। বহু দিন পরে নবাব মীর্জা মহম্মদ চেহেল্-সতুনে এসেছে। এসে রাত কাটাবে বেগম-মহলে। বাবুর্চিখানায় সোরগোল পড়ে গেছে। জাফরান দিয়ে মোরগ-মুশল্লাম, বিরিয়ানী আর কাবাব বানানো হয়েছে। নবাবের বড় পেয়ারের খানা সব। নানীবেগমসাহেবা জানে মীর্জা কী খেতে ভালবাসে। ছোটবেলা থেকে নানীবেগমের সঙ্গে সঙ্গে কাটিয়েছে মীর্জা। মীর্জা হাঁ করলে নানীবেগম বুঝতে পারে নাতি কী চায়।

পীরালি খাঁ পোশাক বদলিয়েছে। নজর মহম্মদ, বরকত আলি সবাই আজ তটস্থ। বুব্বু বেগম, তক্কি বেগম, পেশমন বেগম অনেক দিন পরে আবার সাজতে বসেছে ঘরে ঘরে। অনেক দিন পরে আবার ইনসাফ মিঞা অসময়ে নহবত শুরু করেছে। সাগ্রেদ তবলাটা বেঁধে নিয়ে চাঁটি দিয়ে পরখ করে নিয়েছে সুরটা। গোসলখানায় গরম পানির ফোয়ারা খুলে দিয়েছে ভিস্তিওয়ালা। সমস্ত চেহেল্-সতুনটা যেন আবার সরগরম হয়ে উঠেছে নবাবের পায়ের ধুলো পেয়ে।

নানীবেগম একবার ময়মানা বেগমের ঘরে গিয়েছিল। ময়মানা তখনো চুপ করে বসে ছিল। তার মহলে কোনো ঘটা নেই, কোনো জাঁক-জমক নেই। ছেলে শওকত জঙ-এর সঙ্গে সঙ্গে যেন ময়মানার সব সাধ সব আকাঙ্ক্ষা খতম হয়ে গেছে।

—কী রে ময়মানা? তোর মহলে আঁধিয়ার কেন রে? রোশনি জ্বালাবি না?

সেই যে ময়মানা এসেছে চেহেল্-সতুনে, তারপর থেকে তার মুখে আর হাসি দেখেনি কেউ। সে চেহেল্-সতুনের এক কোণে নিজেকে আড়াল করে রেখেছে।

সেখান থেকে নানীবেগম গেল লুৎফুন্নিসার মহলে।

—কী রে, তুই এখনো সাজিসনি?

—সাজবো কেন নানীজী?

—যদি মীর্জা তোকে ডাকে আজ! সাজ সাজ, আর ওয়াক্ত নেই—

বলে নানীবেগম তাড়াতাড়ি গিয়ে মরিয়ম বেগমের মহলে গিয়ে ঢুকলো।

মরালী তখন তৈরি হয়েই ছিল। নানীবেগম ঘরে ঢুকে অবাক হয়ে গেল। নবাব মীর্জা মহম্মদের কাছে মেয়ে যাবে এমনি করে? এই পোশাকে?

মরালী বললে—তা হোক নানীজী, তোমার নাতি আমার সঙ্গে শুধু তো কথাই বলবে, আর-কিছু তো করবে না, গান গাইতেও বলবে না, নাচতেও বলবে না —আর আমি তো ওসব জানিও না—

—কিন্তু আমার নাতি হলে কি হবে, সে তো মুর্শিদাবাদের নবাব!

মরালী বললে—না নানীজী, আমাকে তুমি আজকে সাজতে বোল না। অন্য সব বেগমরা সাজুক। তোমার নাতি তো কখনো চেহেল্-সতুনে আসে না, এতদিন পরে এসেছে, তার জন্যে তো বাবুর্চিখানাতে অনেক এলাহি রান্না হচ্ছে, সে-গন্ধও পাচ্ছি। কিন্তু এখন কি মজলিস করবার সময়?

নানীবেগম হাসলো।

—ওরে, নবাবদের জীবনে কখনো ফুরসুৎ হয় না। তোর নানাজীর কি

কখনো মজলিস করবার ফুরসুৎ হয়েছিল? তবু আমি সাজতুম। যখন লড়াই করতে যেত তোর নানাজী, তখন আমি কেন সংগে যেতাম? ওই জন্যেই তো যেতাম। সব বেগমদেরও বেছে বেছে নিয়ে যেতাম। যারা গান গাইতে জানতো, নাচতে জানতো, তাদের সংগে নিয়ে যেতাম তো ওই জন্যেই। তবু যদি নবাব একটুখানির জন্যে শান্তি পায়, তবু যদি মুখে একটু হাসি ফোটে নবাবের—

কথাটা যেন পছন্দ হলো মরালীর।

বললে—আচ্ছা, নানীজী, এখন কী নবাবের কাছে কেউ আছে?

—তা জানি না, মীর্জা তোকে ডেকে পাঠাবে এখুনি, সেই জন্যেই তো তোকে তৈরি হয়ে থাকতে বলছি। মীর্জার মেজাজ তো কারো বোঝবার সাধ্যি নেই। কখন যে কী মেজাজ থাকে ওর, কে বলতে পারে?

তারপর একটু থেমে বললে—তোকে একটা কথা বলছি মা, তুই মীর্জাকে বলবি—

—কী বলবো?

—বলবি, ইয়ার-বক্সীদের কথা যেন কানে না শোনে মীর্জা, ওরাই হয়েছে ওর কাল! জানিস, মীর্জার সব ভালো, শুধু এই ইয়ার-বক্সীদের কথায় যদি না উঠতো-বসতো তো ওরও ভালো হতো, বাংলা মুলুকেরও ভালো হতো—

—তা আমার কথা কেন শুনবে তোমার মীর্জা, নানীজী! আমি কে?

নানীবেগম বললে—শুনবে রে শুনবে; ও আমার কথা শোনে না, ও ওর মা'র কথা শোনে না, ও ওর নিজের বউ-এর কথা পর্যন্ত শোনে না, কিন্তু তোর কথা শুনবে।

—তুমি বলছো কী নানীজী! আমার কথা শুনবে?

—হ্যাঁ, তুই যে ওর জান বাঁচিয়েছিস্ রে! তুই যদি আজ ওই খত্ না দেখাতিস, তাহলে কি ও তোকে খালাস করতো? দেখলি না তোকে নিয়ে মতিঝিলে গেল, তোর কথায় তোর পেয়ারের লোকটাকে বেমালুম খালাস করে দিলে। তোর কথায় মেহেদী নেসার, ইয়ারজানদের ডেকে পাঠালে? তুই ওই খত্ না দেখালে ও কি বিশ্বাস করতো তোর কথা?

মরালী জিজ্ঞেস করলে—তাহলে কী বলবো আমি নানীজী?

—বলবি, নবাব, আপনি আপনার ওই ইয়ার-বক্সীদের কথায় আর উঠবেন-বসবেন না। ওরাই আপনার শত্রু! আপনি ঝুট-মুট মোহনলালকে মীর বক্সী করে দিলেন বলে মীরজাফরজী আপনার শত্রু হয়ে গেল। বলবি, আপনি নানীজীর পুরোন আমলের আমীর-ওমরাওদের কেন অপমান করতে গেলেন? তাই তো তারা আপনার দুষমন হয়ে গেল। এ-সব বলতে পারবি না?

মরালী বললে—কিন্তু এসব কথা তো তুমিও বলতে পারো নানীজী!

নানীবেগম বললে—না রে না, আমি বললে শোনে না, তোর কথা শুনবে।

—আমার কথা শুনবে, আর তোমার কথা শুনবে না? নবাবের কাছে তোমার চেয়ে আমিই বড় হলুম আজ?

নানীবেগম বললে—হ্যাঁ রে মেয়ে, হ্যাঁ। এতদিন চেহেল্-সুতুনে আছি, আমি বুঝতে পারি কে কার কথা শোনে। আমি চোখ দেখলে যে বলে দিতে পারি!

মরালী কেমন অবাক হয়ে গেল।

বললে—তুমি ঠিক বলছো নানীজী, আমার কথা নবাব শুনবে?

—হ্যাঁ রে মেয়ে, হ্যাঁ। তোকে মীর্জার নজরে লেগেছে। যে তোকে একবার

দেখবে তারই নজরে লাগবে! সাধে কি আর তোর গুণ গাইছি মা!

মরালী নানীজীর হাত দুটো ধরে ফেললে। বললে—কেন নানীজী? কেন আমার ওপর লোকের নজর লাগে? কী জন্যে? আমার মধ্যে কী আছে?

নানীবেগম বললে—ছাড় ছাড় আমাকে—আমি আসছি, তুই তৈরি হয়ে নে—

—না, ছাড়বো না তোমাকে, তুমি আমাকে বলে যাও—

—কী বলবো?

—কেন আমাকে সকলের ভালো লাগে? আর, যদি আমাকে লোকের এত ভালোই লাগে তাহলে আমার কপালে এত কষ্ট কেন? কেন আমি সুখী হতে পারলাম না জীবনে? আমি কী অপরাধ করেছিলুম?

নানীবেগম মরালীর মুখটা নিজের বুকের মধ্যে জাপটে ধরলো।

—ওমা, কাঁদছিস তুই? একেবারে কেঁদে ফেললি?

মরালী মুখটা তুললো। চোখ দুটো তার জলে ভরে গেছে। বললে—তুমি তো জানো নানীজী, এখানে আসা পর্যন্ত তুমি তো আমাকে দেখছো? আমি কারো কোনো ক্ষতি করেছি? কেন তোমরা জুবেদাকে অমন করে শাস্তি দিলে? ও কী করেছিল? আর আমিই বা কী পাপ করেছি যে ভগবান আমাকে এই শাস্তি দিলে?

নানীবেগম মরালীকে সান্ত্বনা দিতে লাগলো।

বললে—চুপ কর মা, চুপ কর। কাঁদিসনে। তোর কীসের কষ্ট? আমি তো আছি, তোর যখন যা কষ্ট হবে আমাকে বলবি তুই, আমি তার বিহিত করবো—! তোর খাবার কিছু কষ্ট হচ্ছে? তোর পরার কষ্ট হচ্ছে? তোর খেদ্‌মতের কষ্ট হচ্ছে?

মরালী নানীবেগমের দিকে চেয়ে বললে—তুমি নিজে মেয়েমানুষ হয়ে আমাকে এই কথা জিজ্ঞেস করছো নানীজী? তুমি জানো না মেয়েমানুষ কী চায়? তুমি জানো না মেয়েমানুষ কীসে খুশী হয়? তুমি নিজে মেয়েমানুষ হয়ে আমাকে এই কথা বলছো?

মরালীর কথা শুনে নানীবেগম কেমন হয়ে গেল যেন। আর যাওয়া হলো না। বললে—না, তুই দেখছি ঠিক আমার লুৎফা মেয়ের মত, কথায় কথায় কেঁদে ভাসিয়ে দিলে সংসার চলে? এ কি তোর বাড়ি পেয়েছিস? এ কি তোর বাপের বাড়ি না শ্বশুর বাড়ি? তোদের মতন কাঁদতে পারলে আমি বেঁচে যেতুম তা জানিস? তোরা আমার দুঃখটা তো কখনো বুঝতে চেষ্টা করিস না। তোদের মত আমারও কি কান্না পায় না, ভেবেছিস? আমার বুকটা হা-হা করে না মনে করেছিস? এই যে আজ চেহেল্-সুতুনে এতদিন আছি, আমার চোখে কেউ কান্না দেখেছে? কিন্তু কই, আমার তো কান্নার উপায় নেই! আমার নিজের পেটের মেয়েরা একটার পর একটা বিধবা হয়েছে, ঘসেটির মুখ পর্যন্ত আমার দেখবার হুকুম নেই, আর আজই ময়মানা আমার এখানে এসে উঠলো! কই, আমার চোখ দিয়ে তো এক-ফোঁটাও জল বেরোল না। তবে কি আমার চোখের সব জল শুকিয়ে গেছে?

মরালী তখন একদৃষ্টে নানীবেগমের দিকে চেয়ে আছে।

নানীবেগম বলতে লাগলো—এই চেহেল্-সুতুনের ভেতরে যা ঘটতে দেখেছি, সব যদি ভাবতে বসি তো আত্মঘাতী হতে ইচ্ছে হবে. তাই তো কিছু আর ভাবি না মা। তাই তো কেবল কোরাণ নিয়ে দিনরাত থাকি। তাই তো সেইসব মনে

পড়লেই খোদার নাম জপ করি আর নমাজ পড়ি। ওরে, এতদিন পাগল হয়ে যাইনি কেন, তা তো তোরা কেউ জিজ্ঞেস করিস না আমাকে? তুই তোর দুঃখের কথা বলছিস, কিন্তু আমারও তো দুঃখ থাকতে পারে, আমারও তো কষ্ট থাকতে পারে। তা তো কেউ জিজ্ঞেস করে না। সকলের নানীজী বলে কি আমি মানুষ নই বলতে চাস?

মরালী এবার নানীবেগমকে ছেড়ে দিলে।

বললে—তুমি যাও নানীজী, তোমাকে আমি আর আটকাবো না, আমি সাজছি—

নানীবেগম মরালীর চিবুকটা ধরে বললে—কিছু মনে করিসনে মা এত কথা বললুম বলে! এত কথা আমি বড় একটা বলি না। তুই কথা তুললি বলেই বলে ফেললুম! জীবনে আমি কিছুই পাইনি রে, তার তুলনায় তোরা অনেক কিছু পেইছিস্—আমার যখন বিয়ে হলো আমিও অনেক জ্বালা সয়েছি, তখন একটা লোক পাইনি যার সঙ্গে দুটো কথা বলি, যার কাছ থেকে একটু আদর পাই। তোরা বাইরে থেকে এসেছিস, আমার দুঃখটা তোরা বুঝবিনে—

মরালী বললে—না নানীজী, আমি আর তোমাকে এ-সব কথা বলবো না—তুমি যাও, তোমাকে আর আটকে রাখবো না—

—তাহলে যা বললুম সেইসব কথা বলবি তো মীর্জাকে?

—সব বলবো নানীজী!

—কী বলবি?

—বলবো, ইয়ার-বক্সীদের কথায় জনাব যেন না ওঠেন-বসেন। বলবো, যার যা মান-মর্যাদা তাকে যেন তা দেন।

—আরো বলবি, লোকে তাকে যে অত্যাচারী বলে সেটা মিথ্যে বলে না। তার মানে সারা মুর্শিদাবাদে তার যা কিছু কলঙ্ক সব তার ইয়ার-বক্সীদের জন্যে। আরো বলবি, এখন মীর্জা বড় হয়েছে, এখন দেশের কথা তাকে ভাবতে হবে। ইয়ার-বক্সীদের কথা দেশের লোকের কথা নয়। এইসব কথা বলতে পারবি তো? বলতে পারবি তো যে, দেশের লোকেরা নবাবের নামে ছি ছি করে বেড়াচ্ছে, নবাবের নামে দোষ দিয়ে বেড়াচ্ছে, এটা মীর্জার বোঝা উচিত! বলবি, নবাব আলীবর্দীর নামে যেন মীর্জা কলঙ্ক না লাগায়। নবাব আলীবর্দী খাঁ অনেক কষ্ট করে অনেক লড়াই করে অনেক তকলিফ করে এই মসনদ মজবুত করে রেখে দিয়ে গিয়েছিল। তাঁর নাতি হয়ে মীর্জা মসনদ যেন পরের হাতে তুলে না দেয়। বলতে পারবি তো মা এ-সব কথা? তোর বলতে সাহসে কুলোবে তো মা?

মরালী বললে—সাহস না থাকলে কি আমি সফিউল্লা খাঁকে খুন করতে পারি নানীজী?

—তুই যদি বলতে পারিস মেয়ে তো তোকে আমি কী বলে যে আশীর্বাদ করবো তা বলতে পারছি না। আমার এ অনেক সাধের চেহেল্-সুতুন রে। নবাব সুজাউদ্দীনের সময়কার এই সংসার, আমি কত কষ্টে একে বাগে এনেছি কী বলবো! এককালে এই হারেমের মধ্যে মেয়েরা এসেছে আর শুকিয়ে মরে গেছে। এখন তো তোরা তবু লুকিয়ে-চুরিয়ে বাইরে যাস্। আর আগে কত খোজার গর্দান গেছে সেই জন্যে! কত বেগম গলায় দড়ি দিয়েছে এর মধ্যে তার কি ইয়ত্তা আছে রে!

তারপর হঠাৎ যেন সচেতন হয়ে নানীবেগম বললে—তাহলে আমি আসছি, এতদিন পরে মীর্জা এসেছে, আমার অনেক কাজ বাকি পড়ে আছে, পীরালি খাঁকে বলে আসি বাবুর্চিখানায় কী-বন্দোবস্ত্ হলো! চলি মা তাহলে, আবার আসবো পরে—

বলে নানীবেগম চলে গেল।

মরালী আয়নাটা নিয়ে নিজের মুখখানা দেখলে একবার। তারপরেই কার পায়ের শব্দ হতেই পেছন ফিরে দেখে অবাক হয়ে গেছে মরালী।

—এ কি, তুমি?

তাড়াতাড়িতে ভেতরে ঢুকে তখনো হাঁফাচ্ছে কান্ত। সে ভেতরে ঢুকেই ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়েছে।

—তুমি কেন আবার এলে এখানে? তুমি কি আবার বিপদে পড়তে চাও?

কান্ত বললে—নজর মহম্মদ আমাকে নিয়ে এসেছে—

—কিন্তু আমি তো বলেছি, এখানে আসা ঠিক নয়। কেন এলে?

কান্ত বললে—শুনলাম আজকে নবাব চেহেল্-সুতুনে নিয়ে এসেছে তোমাকে, চক্-বাজারের রাস্তা দিয়ে তোমাদের তাঞ্জাম আসতে দেখলুম, তাই খুব ভয় হয়ে গেল—

—নবাব চেহেল্-সুতুনে এলে তোমার ভয়টা কীসের?

—বলছো কী তুমি? ভয় হবে না? ভয় তো তোমার জন্যে!

মরালী বললে—আমার জন্যে শেষকালে তোমার নিজের জীবনটাও খোয়াবে নাকি?

কান্ত বললে—আমার কথা থাক্ এখন—

—কেন, তোমার কথা থাক কেন? তুমি কেন এই নরকের মধ্যে এলে?

কান্ত বললে—তোমার সঙ্গে অনেক কথা ছিল। কথাগুলো না বলতে পারলে আমার স্বস্তি হচ্ছিল না—

—কিন্তু আজ যে নবাব চেহেল্-সুতুনে রয়েছে। এখন কি আসতে আছে?

কান্ত বললে—নবাব তো চলে গেছে—চেহেল্-সুতুন থেকে চলে গেছে—

—চলে গেছে মানে?

—নবাব থাকলে কি আসতুম?

—কী যা-তা বলছো? আমার চেয়ে তুমি বেশি জানো?

কান্ত বললে—আমাকে নজর মহম্মদ যে বললে। নজর মহম্মদ আজ সারাফত আলির দোকানে আরক কিনতে গিয়েছিল। তখন আমি আসতে চেয়েছিলুম চেহেল্-সুতুনে। কিন্তু ও বললে, নবাব আছে, আজ হবে না। আমি তো তাই হাল ছেড়ে দিয়েছিলুম। কিন্তু এক্ষুনি দৌড়তে দৌড়তে গিয়ে আমাকে খবর দিয়ে নিয়ে এল। বললে, নবাব নাকি হঠাৎ চেহেল্-সুতুন ছেড়ে মতিঝিলে চলে গেছে—

—কেন?

—কলকাতা থেকে রাজা মানিকচাঁদ এসেছে নবাবের সঙ্গে সলা-পরামর্শ করতে, কলকাতায় ফিরিঙ্গী কোম্পানীরা লড়াই শুরু করে দিয়েছে!

মরালীর মাথায় যেন চেহেল্-সুতুনের ছাদটা ভেঙে পড়লো।

বললে—তুমি ঠিক বলছো?

—আমাকে নজর মহম্মদ যা বললে তাই-ই বলছি, আমি কী করে এত সব

জানবো বলো। আমার তো আবার বাইরে যাবার কথা ছিল কি না নিজামতির কাজে—

—মুর্শিদাবাদের বাইরে? কী কাজে?

—কত রকমের কাজ আছে, তার কি ঠিক আছে? তোমাকে যেমন হাতিয়াগড় থেকে পাহারা দিয়ে নিয়ে এসেছিলুম, এ-ও সেই রকম কাজ!

—আবার কাউকে চেহেল্-সূতুনে নিয়ে আসবে নাকি?

—না না, তা নয়, এ অন্য রকমের কাজ। এ-সব কাজ সকলকে বলা নিয়ম নয়। আমাকে নিজামত থেকে কলকাতার উমিচাঁদের বাড়িতে গিয়ে একটা খবর আনতে যাবার হুকুম হয়েছে—

মরালী কৌতূহলী হয়ে উঠলো। বললে—কী খবর?

কান্ত বললে—সে-খবর তোমাকে বলা যাবে না। এ-সব ব্যাপার খুব গোপনীয়। আজকাল এমন সব কাণ্ড চলছে মুর্শিদাবাদে, যা কাউকে বলা যায় না। নবাবের বিরুদ্ধে অনেক ষড়যন্ত্র চলছে, আমরা খুব সাবধান হয়ে চারদিকে দেখাশোনা করছি—

—কীসের ষড়যন্ত্র?

কান্ত বললে—সে তোমার না-শোনাই ভালো! আর সে তোমাকে আমি বলবোও না—

মরালী কান্তর হাতখানা হঠাৎ ধরে ফেললে। বললে—না, তোমাকে বলতেই হবে। কে ষড়যন্ত্র করছে? কারা? খাজা হাদীর নাম তুমি শুনেছো?

—না।

—করিম খাঁ?

কান্ত বললে—না—। কিন্তু ও-সব জেনে তোমার লাভ কী? নবাবকে কে মারলো না-মারলো, তা জেনে তোমার লাভ কী? তুমি চেহেল্-সূতুন থেকে বেরিয়ে চলো, তোমাকে আমি চেহেল্-সূতুন থেকে বার করে অন্য জায়গায় নিয়ে যেতে এসেছি। আমি নজর মহম্মদের সঙ্গে সব ব্যবস্থা করে ফেলেছি—যত টাকা লাগে, সব দেবে সারাফত আলি সাহেব—

—সারাফত আলি? যার আরকের দোকান আছে চক্‌বাজারে? যার দোকানে আমি সেদিন তোমাকে খুঁজতে গিয়েছিলাম? সে কেন টাকা দেবে?

কান্ত বললে—সে বুড়ো আমাকে খুব ভালবাসে—

—তোমাকে ভালবাসে বলে আমাকে ছাড়াবার জন্যে টাকা দেবে কেন?

—আমি যে তোমার কথা সব বলেছি মরালী।

—আমার কথা? আমার কথা কী বলেছো?

—তোমার সঙ্গে আমার যা সম্পর্ক, সব কথা বলেছি!

মরালী আরো কৌতূহলী হয়ে উঠলো—তোমার সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক?

কান্ত হঠাৎ যেন বোবা হয়ে গেল।

—বলো, কী সম্পর্ক তোমার সঙ্গে আমার থাকতে পারে, বলো?

কান্ত বললে—কেন, তোমার সঙ্গে কি আমার কোনো সম্পর্ক নেই?

—সম্পর্কটা কীসের?

কান্ত বললে—আমার নিজের মুখ দিয়ে সেটা না-ই বা বলালে! তোমার কি কিছুই মনে নেই? একদিন তো তোমার সঙ্গে আমার সব সম্পর্ক হতো, যদি না—

—যদি না?

কান্ত বললে—সে-কথা মনে পড়লেই আমার কষ্ট হয় মরালী! সে-কথা আমি বার বার ভুলে থাকতেই তো চাই। কিন্তু ভুলতে পারি না যে মোটে! যখনই একলা থাকি তখনই মনে পড়ে যায়। সারাফত আলির দোকানের পেছনের অন্ধকার ঘুপচি ঘরের মধ্যে শুয়ে কেবল তোমার কথাই ভাবি! জানি, তোমার কথা ভাবা পাপ, তোমার কথা ভাবা অন্যায়; বুঝি, আজকে তোমার এই অবস্থার জন্যে আমিই দায়ী, কিন্তু কী করবো বলো? একবার যে-দোষ করে ফেলেছি তার যে আর চারা নেই!

—ও কি? অত কাছে সরে আসছো কেন?

—আমাকে কি তুমি সত্যিই ক্ষমা করবে না?

মরালী বললে—ও-কথা মুখে এনো না তুমি আর—

—তাহলে আমি কী নিয়ে থাকবো? কী করে বাঁচবো?

—আমার কথা আর ভেবো না। জানো না আমি স্লেচ্ছ হয়ে গেছি!

কান্ত আর থাকতে পারলে না। বললে—তা হোক, তবু তুমি আমার—

—ছিঃ। বলে মরালী কান্তর মুখখানা নিজের হাত দিয়ে চাপা দিয়ে দিলে। —ও-কথা যদি আর কখনো বলো তো তোমার সঙ্গে আর আমি দেখা করবো না, আর কখনো আমি তোমাকে চেহেল্-সুতুনে আসতে দেবো না—নজর মহম্মদকে আমি বারণ করে দেবো; শেষ পর্যন্ত তাতেও যদি আসো তো আমি নানীবেগমকে বলে দেবো—তুমি যাও এখন, যাও—

হঠাৎ বাইরে দরজায় ধাক্কা পড়লো—

—ও মেয়ে, দরজা বন্ধ করলি কেন? কী হলো?

মরালীর মুখখানা শুকিয়ে গেল।

—ওই নানীবেগম সাহেবা এসেছে!

—কে এসেছে?

মরালী বললে—চুপ। অত জোরে কথা বোল না, নানীবেগমসাহেবা এসেছে। যাও, ওই সিন্দুকটার পেছনে লুকিয়ে পড়ো, শিগ্গির, দেরি কোর না—যাও যাও, দাঁড়িয়ে দেখছো কী হাঁ করে? যাও, লুকিয়ে পড়ো—

কান্ত বললে—দরকার নেই লুকিয়ে, দেখুক নানীবেগম!

—কিন্তু দেখে ফেললে যে তোমার সর্বনাশ হবে, তোমাকে যে কোতল করবে।

কান্ত তবু ঠায় দাঁড়িয়ে রইলো সেখানে। বললে—আমাকে কোতল করলে আমাকেই কোতল করবে; তোমাকে তো করবে না—আমার যা-হয় হয়ে যাক আজ, আমি আর পারছি না—

মরালী বড় ব্যস্ত হয়ে উঠলো—এ গোঁয়ার লোককে নিয়ে তো খুব মুশকিলেই পড়লুম; বলছি যে তোমার সর্বনাশ হবে, কথা শোনো, শিগ্গির লুকিয়ে পড়ো—

কান্ত বললে—না—

—ওরে ও মেয়ে, দরজা খোল, মীর্জা চেহেল্-সুতুন থেকে চলে গেছে, আমি যাচ্ছি মতিঝিলে—

মরালী আর পারলে না। কান্তকে ধরে সোজা সিন্দুকের পেছনে নিয়ে গেল। তারপর সেখানে তাকে তার ঘাড় গুঁজিয়ে বসিয়ে দিয়ে বললে—লক্ষ্মীটি, এখানে চুপ করে বসে থাকো, নানীবেগম চলে গেলে তারপর উঠে এসো; তোমার পায়ে

ধরছি, উঠো না এখান থেকে। তোমাকে দেখে ফেললে সর্বনাশ হয়ে যাবে আমার—

তারপর দরজাটা খুলে দিয়ে বললে—কী নানীজী?

নানীবেগমের মুখখানা কাঁদো কাঁদো হয়ে গেছে। বললে—ওরে, আমার মীর্জা মতিঝিলে চলে গেছে রে, আমি ওদিকে বাবুর্চিখানায় খানার বন্দোবস্ত দেখতে গেছি, আর এদিকে মীর্জা কখন মতিঝিলে চলে গেছে টেরই পাইনি, পীরালি খাঁ হঠাৎ এসে এখন আমায় খবর দিলে!

—তাহলে কী হবে নানীজী?

—আমি তো তাই মতিঝিলে যাচ্ছি। শুনলাম নাকি রাজা মানিকচাঁদ এসেছে জরুরী খবর নিয়ে! ফিরিঙ্গী কোম্পানী নাকি লড়াই শুরু করেছে কলকাতায়। এই কাল সবে লড়াই থেকে মীর্জা ফিরে এল। সোজা তো পূর্ণিয়া থেকে কলকাতায় চলেই যাচ্ছিল, আমিই বলে কয়ে মুর্শিদাবাদে আনিয়েছিলাম। কখন একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেছি আর সঙ্গে সঙ্গে কখন মতিঝিলে চলে গেছে!

—আমিও তোমার সঙ্গে মতিঝিলে যাবো নানীজী?

—যাবি তুই? তাহলে তো ভালোই হয়, তাহলে তো আমি বেঁচেই যাই! আমি একলাই যাচ্ছিলুম, আমার সঙ্গে কেউ যেতে চাইলে না, তাই তোর কাছে এলুম। এখন যাবি তো চল্—

—মরালী বললে—তুমি চলো, আমি তৈরি হয়ে নিচ্ছি—

নানীবেগমসাহেবা আর দাঁড়ালো না। তাড়াতাড়ি বাইরে চলে গেল। মরালী সিন্দুকটার কাছে গিয়ে বললে—এসো, বেরিয়ে এসো—

কান্ত আস্তে আস্তে বাইরে বেরিয়ে এল।

মরালী বললে—এবার বাইরে চলে যাও—

কান্ত বললে—না, আমি যাবো না—

—কিন্তু নানীবেগম যদি এসে তোমায় দেখে ফেলে তাহলে কিন্তু তোমায় আমি বাঁচাতে পারবো না—

কান্ত বললে—আমি বাঁচতে চাইও না—

—বাঁচতে চাও না বলে কি এইরকম করে খোজার হাতে কোতল হবে?

কান্ত বললে—আমি তোমাকে নিয়ে এখান থেকে চলে যেতে চাই—তুমি না গেলে আমি যাবো না।

মরালী বললে—কিন্তু এখন তো আর আমার যাওয়া চলে না—

—কেন?

—আমার অনেক কাজ আছে, এখানে নবাবের বিরুদ্ধে অনেকে ষড়যন্ত্র করেছে, আমি তাদের সকলের কথা টের পেয়েছি, তাদের ধরিয়ে দিতে হবে। সে কাজ শেষ না-হলে আমার যাওয়া হবে না।

—তাহলে নবাবের স্বার্থই তোমার কাছে বড় হলো? যে-নবাব তোমার ওপর অত্যাচার করে তারই ভালো করতে চাও তুমি? যে নবাবের ধ্বংস চায় সবাই তারই জন্যে তুমি এখানে থাকতে চাও? তুমি কি মনে করো সত্যিই তুমি নবাবকে বাঁচাতে পারবে?

মরালী রেগে উঠলো।

বললে—তুমি যে নবাবের নামে এত কথা বলছো, তুমি নবাবকে চেনো? তুমি নবাবের সঙ্গে কথা বলেছো কখনো?

হঠাৎ দরজা খুলে যেতেই নানীবেগম ঘরে ঢুকে পড়েছে। কী যেন বলতে চেয়েছিল নানীবেগম। কিন্তু কান্তকে দেখেই থমকে দাঁড়ালো।

বললে—এ কে?

নানীবেগম কান্তর দিকে তাকালো। কান্ত মরালীর দিকে তাকালো। মরালী নানীবেগমের দিকে চেয়ে কী যেন বলতে গিয়েও থেমে গেল।

নানীবেগম মরালীর দিকে চেয়ে আবার জিজ্ঞেস করলে—এ কে?

মরালী এগিয়ে এসে বললে—নানীজী, এ আমার চেনা লোক, আমাদের দেশের—

—এখানে এর ভেতরে কে নিয়ে এল?

মরালী বললে—তুমি ওকে কিছু বলতে পারবে না নানীজী, তোমার পায়ে পড়ি নানীজী, ওকে কিছু ব'লো না তুমি। আমিই ওকে ডেকে নিয়ে এসেছি এখানে, আমারই কাজে ও এসেছে—

কান্ত তখনো চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল।

মরালী বললে—আমি অনেকদিন আমার বাবার খবর পাইনি, তাই এর কাছে চক্‌বাজারে খবর আনতে গিয়েছিলুম, এ আমার দেশ থেকে খবর এনে দেবে বলেছিল। তুমি ওকে কিছু ব'লো না নানীজী।

—কিন্তু ওকে কে নিয়ে এল এখেনে?

—তাও তুমি জানতে চেও না।

নানীবেগম বললে—না, তুই বল্ আমাকে, কে নিয়ে এল ওকে এখেনে। কী করে নিয়ে এল? এত খোজা রয়েছে, এত পাহারাদার, খিদ্‌মদ্‌গার রয়েছে, তারা মোটা মোটা তলব্ নিচ্ছে কী জন্যে? আমি তাদের একজনকে এখনি ডাকছি...

বলে বাইরেই চলে যাচ্ছিল নানীবেগম, কিন্তু মরালী নানীবেগমের হাতটা ধরে ফেললে। বললে—না নানীজী, তুমি যেতে পারবে না—

—তা হ'লে বল্ আর কখনো ভেতরে নিয়ে আসবি না বাইরের লোককে?

মরালী বললে—নিয়ে আসবো না—

—তা হলে এখুনি ওকে বাইরে পাঠিয়ে দে! এখুনি বাইরে পাঠিয়ে দে—! আমি ডাকছি পীরালিকে—

মরালী বললে—না নানীজী, পীরালিকে ডাকতে হবে না তোমাকে, আমিই সব ব্যবস্থা করবো। যে নিয়ে এসেছিল ওকে, সে-ই ওকে বাইরে পাঠিয়ে দিয়ে আসবে—

নানীবেগম এবার কান্তর দিকে ফিরে বললে—মরিয়ম বেগমসাহেবার বাবা কেমন আছে, তুমি জানো কিছু?

কান্ত বললে—এখন তবিয়তটা কিছু খারাপ আছে বিবিজীর বাবার—

—কী হয়েছে?

—মাথাটা একটু খারাপ হয়ে গেছে। বিবিজীকে দেখবার জন্যে ছট্‌ফট্ করছে দিনরাত। রাণীবিবি চেহেল্‌-সুতুনে আসবার পর থেকেই ওই রকম হয়েছে, মেয়েকে কেবল দেখতে চাইছে—

মরালী বললে—এ না থাকলে আমাকে কোতোয়ালীর মধ্যে মেহেদী নেসার সাহেব খুন করেই ফেলতো নানীজী, এ না থাকলে সেইদিনই মারা যেতুম। সেই জন্যেই তো নবাব একে সেদিন খালাস করে দেবার হুকুম দিলেন নানীজি!

—তুমিই সেই?

এতক্ষণে মনে পড়লো যেন নানীবেগমের। বললে—ঠিক আছে, আমি ওকে

বাইরে পাঠিয়ে দিচ্ছি, কিন্তু খবরদার বলছি মেয়ে, ওকে তুই আর কখনো চেহেল্-সুতুনের ভেতরে আনতে পারবিনে। আমি যা দেখতে পারিনে তাই হয়েছে—আমি গিয়ে বোরখা পাঠিয়ে দিচ্ছি, সেইটে পরে পালকি করে বাইরে চলে যাক্ ও—

বলে নানীবেগম বাইরে বেরিয়ে গেল।

কান্তর মুখে এবার কথা ফুটলো। বললে—আমি যাবো না—

—না, তুমি যাও—

—তা হলে এই পাল্কিতে তুমিও চলো আমার সঙ্গে। কেউ জানতে পারবে না। তোমার পোশাকটা আমাকে দাও—

মরালী বললে—আমার জন্যে তুমি কেন এত ভাবছো?

—না, সত্যি বলছি, এক্ষুনি হয়তো কোনো খোজা বোরখা নিয়ে আসবে। তার আগেই তোমার ঘাগরা ওড়নী আমি পরে ফেলি, আর আমার পোশাকটা তুমি পরে নাও। তুমি বোরখা পরে চলে যাও আমার বদলে—

—আর তুমি?

কান্ত বললে—আমার কথা ভেবো না তুমি। নজর মহম্মদ আমার চেনা লোক, আমাকে বাইরে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেবে, মোহর পেলে সে সব করবে। তারপর আমি বাইরে গিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করবো—

—বাইরে গিয়ে কোথায় যাবো? কোথায় থাকবো? হাতিয়াগড়ে তো যেতে পারবো না।

কান্ত বললে—তুমি যেখানে বলবে সেখানে নিয়ে যাবো তোমাকে। তোমাকে কোনো নিরাপদ জায়গায় রেখে দিয়ে আমি চলে যাবো—। আমার কথা শোনো মরালী, আমাকে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে দাও, বেশি দেরি ক'রো না, এখুনি কেউ এসে পড়বে, শিগ্গির করো!

মরালী বললে—পাগলামি ক'রো না, সমস্ত বাঙলা দেশে আগুন জ্বলে উঠবে, কোথাও নিয়ে গিয়ে তুমি আমাকে বাঁচাতে পারবে না, আর দু' দিন পরেই দেখতে পাবে—!

—আগুন জ্বলবে? তার মানে?

মরালী বললে—সে তুমি এখন বুঝবে না।

—আমি বাইরে থাকি, এত জায়গায় ঘুরি, আমি জানবো না, আর তুমি চেহেল্-সুতুনের ভেতরে থেকে এত জানলে কী করে?

মরালী বললে—সব কথা বলবার সময় নেই এখন। এখানকার চেহেল্-সুতুনের অন্য বেগমরা কেউ সে-সব জানে না, নানীবেগমও কিছু জানে না। শুধু আমি জানি। সফিউল্লা খাঁ সাহেবের কাছে যে চিঠি পাওয়া গিয়েছে তা থেকে আমি সব জেনেছি। আমি যদি এ সময়ে চেহেল্-সুতুনে না থাকি তো সমস্ত ছারখার হয়ে যাবে। মুর্শিদাবাদ ছারখার হবে, কেষ্টনগর ছারখার হবে, হাতিয়াগড়ও ছারখার হয়ে যাবে। আমি তো দূরের কথা, কেউই বাঁচবো না, তুমিও বাঁচবে না সেই বিপদ থেকে।

কান্ত বললে—কি বলছো তুমি? আমি যে কিছু বুঝতে পারছি না—

মরালী বললে—তোমাকে সব কথা এখন খুলে বলা যাবে না। নিজামতের এখন ভীষণ বিপদ চলছে। বাইরে থেকে কেউ কিছু বুঝতে পারছে না, কিন্তু আমি উমিচাঁদের চিঠি থেকে সব টের পেয়ে গিয়েছি—এই সময় যদি আমি এখান থেকে চলে যাই তো সব তছনছ হয়ে যাবে—

—কী হবে?

—বলেছি তো, সব তোমাকে বলা যাবে না। হয়তো উমিচাঁদই মুর্শিদাবাদের নবাব হয়ে বসবে।

—তাই নাকি?

মরালী বললে—শুধু উমিচাঁদ নয়, জগৎশেঠজীও নবাব হতে পারে। মহারাজ কেষ্টচন্দ্রও হতে পারে, সবাই ষড়যন্ত্রের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছে। মেহেদী নেসারও নবাব হবার চেষ্টা করছে। কর্নেল ক্লাইভ বলে কে একটা ফিরিঙ্গী আছে, সেও নবাব হতে পারে। হাতিয়াগড়ের ছোটমশাইও এই দলের মধ্যে আছে—

কান্ত শুনতে শুনতে অবাক হয়ে যাচ্ছিল।

মরালী আবার বলতে লাগলো—মুর্শিদাবাদে এমন একজনও নেই, যে এর মধ্যে নেই। তারা সবাই লুঠপাট করে বড়লোক হতে চাইছে! যেমন করে হোক, নবাবকে হটিয়ে দিয়ে সব টাকা-কড়ি-মোহর লুটেপুটে নিতে চাইছে—

তারপর একটু থেমে বললে—তা এ-সব কথা তোমাকে বলছিই বা কেন? তুমিই বা কী করতে পারবে? যদি পারতে তো তোমাকে একটা কাজ করতে বলতুম—

—কী কাজ বলো না, তুমি বললে আমি সব কিছু করতে পারবো!

—তা হলে তুমি বাইরে যেখানে যা কিছু শুনবে, আমাকে বলে দিও এসে, আমি নবাবকে বলে দেবো!

কান্ত বললে—আমি এখেনে কী করে আসবো?

—সে আমি নজর মহম্মদের সঙ্গে ব্যবস্থা করবো। কেউ জানতে পারবে না। জানো, নবাবকে এই অবস্থায় ছেড়ে চলে যেতে আমার কেমন লাগছে।

কান্ত জিজ্ঞেস করলে—সত্যিই নবাব ভালো লোক বলে তুমি মনে করো?

মরালী বললে—নবাব ভালো হোক মন্দ হোক, নবাবের জায়গায় যে-ই আসুক, সে-ই এইরকম করবে। উমিচাঁদ নবাব হলে কি আর ভাবছো পরের বউকে ধরে টানাটানি করবে না? রাতারাতি সাধু হয়ে যাবে?

—দেখ মরালী, একটা কথা—কান্ত বললে—আমাদের সারাফত আলি আছে, যার বাড়িতে আমি থাকি, সেই বুড়ো মিঞাসাহেব আমাকে এত টাকা দেয়, আমার জন্যে এত খরচ করে শুধু চেহেল্-সুতুন ধ্বংস করবার জন্যে।

মরালী বললে—আমি জানি। আমি এখানে এসে পর্যন্ত দেখছি, কেউ নিজামতের ভালো চায় না। নবাবের মা পর্যন্ত নবাবকে গালাগালি দেয় তার নিজের সোরার কারবার বন্ধ হয়ে গেছে বলে। টাকার জন্যে নিজের ছেলের পর্যন্ত শত্রু হয়ে গেছে, ভাবতে পারো?

—কিন্তু তুমি যে নবাবকে এত ভালবাসো, নবাব তোমার জন্যে কী করবে?

মরালী বললে—আমার আবার কী করবে? আমি এখন আর আমার নিজের জন্যে কিছুই চাই না—

—তোমার নিজের সুখ, তোমার নিজের শান্তি, তোমার নিজের সংসার—

মরালী বললে—সংসারের কথা, সুখের কথা, শান্তির কথা আমাকে আর ব'লো না। যেদিন থেকে মরিয়ম বেগম হয়ে গেছি সেইদিন থেকেই আমার সব সুখ, সব শান্তি ঘুচে গেছে—

কান্ত বললে—না, ও কথা তুমি ব'লো না! আমি তোমাকে শান্তি দেবো!

—তোমার সাধ্যি কি আমাকে শান্তি দাও, আকাশের ভগবানেরও আমাকে শান্তি দেবার ক্ষমতা নেই।

—কিন্তু তা হলে আমি থাকবো কী নিয়ে?

—আগে বেঁচে থাকো কিনা তাই দেখ, তারপর সুখশান্তি, সংসারের কথা ভেবো। আমি ক'দিন ধরে একদণ্ডের জন্যে ঘুমোতে পারিনি, তা জানো? আমি শুধু একটা সফিউল্লা খাঁকে খুন করেছি। পারলে ওই সব ক'টাকে খুন করতুম! ওই উমিচাঁদ, মেহেদী নেসার, মীরজাফর খাঁ, সকলকে খুন করতুম। শুধু তো নবাবকে খুন করতে চায় না ওরা, ওরা সমস্ত বাঙালী জাতকে খুন করে ফেলতে চায়—

তারপর বললে—এ-সব তুমি বুঝবে না, তুমি এবার যাও, এখুনি হয়তো কেউ তোমাকে বাইরে নিয়ে যাবার জন্যে আসবে—আমি নানীবেগমের সঙ্গে মতিঝিলে যাবো নবাবের সঙ্গে দেখা করতে—

—কেন?

—সেখানে রাজা মানিকচাঁদ এসে আবার কী মতলব দিচ্ছে কে জানে। আমি পাশে থাকলে নবাবকে সাবধান করে দিতে পারবো! আজকে অনেক কষ্টে নানী-বেগমের হাত থেকে তোমাকে বাঁচিয়েছি, এর পর হয়তো আর তোমাকে লুকিয়ে আসতে হবে না, তখন সোজা পাঞ্জা দেখিয়ে চলে আসতে পারবে—

—কী করে?

—তা হলে আমি তোমাকে যা বলবো তাই করতে হবে! দরকার হলে যাকে খুন করতে বলবো তাকে খুনও করতে হবে, পারবে তা করতে?

কান্ত বললে—তোমার জন্যে আমি সব পারবো—

তারপর হঠাৎ দরজাটা খুলে গেল।

—বেগমসাহেবা!

বরকত আলি একটা বোরখা নিয়ে ঘরে ঢুকেছে। বললে—পালকি তৈরী।

মরালী কান্তকে বললে—বোরখাটা পরে নাও, ওর সঙ্গে বাইরে চলে যাও, আমি না ডাকলে আর কখনো এসো না—

—কবে ডাকবে তুমি?

—যখন ডাকবো তখন জানতে পারবে, এখন যাও, দেরি ক'রো না—

কান্ত বরকত আলির হাত থেকে বোরখাটা নিয়ে পরে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। এ আবার কোন্ ষড়যন্ত্রের মধ্যে জড়িয়ে পড়লো সে! কান্তর মনে হলো যেন আরো জটিল জালে সে আটকে গেল মরালীর জীবনের সঙ্গে! হয়তো ভালোই হলো। তবু তো এই সূত্র ধরে সে মরালীর সঙ্গে দেখা করতে পারবে! মরালীর কাছে আসতে পারবে।

পালকিটা চেহেল্-সুতুনের সুড়ঙ্গ পেরিয়ে যখন ফটকের কাছে এসেছে, তখন বরকত আলির গলা শোনা গেল। ফটক খোলার হুকুম। ফটকটা খুলতেই পালকিটা বেরিয়ে এল। আর সঙ্গে সঙ্গে ফটক বন্ধ করার শব্দ হলো।

আর ওদিকে মরিয়ম বেগমের ঘরের ভেতর নানীবেগমসাহেবা এসে বললে—চল্ মেয়ে, চল্—তৈরী?

—হ্যাঁ নানীজী!

—বাছাকে একদিনের জন্যে আমি চেহেল্-সুতুনে আনতে পারলুম না। চল্, তুই একটু বুঝিয়ে বলবি, চল্ মা। তোর কথা শোনার পর থেকে আমার বড় ভয় করছে মা—

মরালী বললে—ভয় কিসের নানীজী, আমি তো রয়েছি।

নানীবেগম বললে—কিন্তু যদি আবার ওরা মীর্জাকে লড়াই করতে টেনে নিয়ে যায়?

মরালী বললে—তুমি কিছু ভেবো না নানীজী, যদি যান তো আমি সঙ্গে থাকবো—বলতে বলতে চবুতরের তাঞ্জামে গিয়ে উঠতেই তাঞ্জাম ছেড়ে দিল।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তখন নদীয়ার একছত্রাধিপতি। নদীয়ার রাজস্ব আদায় তখন ন' লক্ষ টাকার মতন। কিন্তু তার মধ্যে ৮,৩৫,৯৫২ টাকা রাজস্ব দিতে হতো নবাব সরকারের খাজাঞ্চিখানায়। ক'দিন থেকে মহারাজ বড় ব্যস্ত ছিলেন। এতগুলো টাকা জলে চলে যায়, অথচ খরচ অনেক। সারা বাংলা দেশ থেকে পণ্ডিতেরা আসে, নৈয়ায়িকরা আসে, জমিদাররা আসে। তাদের দেখাশোনা করার একটা খরচ আছে। বাড়িতে বাঁধা পণ্ডিত আছেন কালিদাস সিদ্ধান্ত মশাই। তিনি মহারাজকে সংস্কৃত শাস্ত্র শেখান। বিশ্রাম খাঁ কালোয়াতের কাছে গান-বাজনা শেখেন। মুজাফার হুসেনের কাছে অস্ত্র-শস্ত্র চালাতে শেখেন। এদের সকলের খাওয়া-পরা-থাকার ব্যবস্থা করতে হয়েছে, জমির ইজারা দিতে হয়েছে। এ ছাড়া আছে পণ্ডিত-বিদায়। পণ্ডিতই কি একজন! রাজা বিক্রমাদিত্যের সভায় যেমন ছিলেন ক্ষপণক, ধন্বন্তরী, অমরসিংহ, শম্বুক, বেতালভট্ট, ঘটকর্পর, কালিদাস, বরাহমিহির আর বররুচি, তেমনি মহারাজার সভাতেও ছিল হরিরাম তর্কসিদ্ধান্ত, রামচন্দ্র বিদ্যানিধি, কৃষ্ণানন্দ বাচস্পতি, বীরেশ্বর ন্যায়পঞ্চানন, ষড়দর্শনবেত্তা শিবরাম বাচস্পতি, ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর, গুপ্তিপাড়ার বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, ত্রিবেণীর জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, হালিশহরের রামপ্রসাদ সেন।

দেওয়ানজীর খাতায় সকলের নাম-ধাম কুলজী লেখা থাকতো। মাসে মাসে সবাই মহারাজার দরবারে এসে শাস্ত্র আলোচনা করতেন আর মাসিক বৃত্তি নিয়ে যেতেন। কিন্তু যাঁরা সব সময় কাছে থাকতেন তাঁরা হলেন ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ, গোপাল ভাঁড়, মুক্তিরাম মুখোপাধ্যায় আর রামরুদ্র বিদ্যানিধি।

সেদিনও সকলকে নিয়ে বসেছিলেন।

দরবারী এসে জানালো—হাতিয়াগড় থেকে রাজা হিরণ্যনারায়ণ রায় এসেছেন—

কথাটা শুনেই মহারাজা উঠলেন। বললেন—আপনারা বসুন, আমি আসছি—

যখন ভারতচন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্রের দরবারে আসেন তখন আলীবর্দীর আমল। ফরাসী গভর্নমেন্টের দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণই তার আলাপ করিয়ে দেন মহারাজার সঙ্গে। চারদিকে তখন অরাজক অবস্থা। ভারতচন্দ্র মন দিয়ে কেবল সংস্কৃত পড়তেন। ভারতচন্দ্রের বাবা রাজেন্দ্রনারায়ণ বড় রাগ করতেন। বলতেন—সংস্কৃত পড়ে কী হবে শুনি? দিনকাল যা পড়েছে তাতে ও ভাষা শিখলে কে তোমায় খেতে দেবে? জমিদারি সেরেস্তায় যদি কাজকর্ম পেতে চাও তো ফারসী পড়ো বাপু। তা ভাগ্যিস ফারসীটা পড়েছিলেন ভারতচন্দ্র। বর্ধমানের মহারাজা কীর্তিচন্দ্রের মা যখন বাবার জমিদারি বাজেয়াপ্ত করলেন, তখন গাজীপুরে গিয়ে ফারসী পড়ে ফারসীর পণ্ডিত হয়ে গেলেন। সেখানেই ইন্দ্রনারায়ণের বাড়িতে আশ্রয় পেয়ে গেলেন। আর সেই সূত্রেই একেবারে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভায়। এমন একজন সংস্কৃত, ফারসী জানা পণ্ডিত পেয়ে মহারাজা যেন হাতে চাঁদ পেলেন।

জিজ্ঞেস করলেন—চাকরি আমি তোমায় দিতে পারি, কিন্তু তোমার মত লোককে কী কাজ দেবো বলো তো?

—আজ্ঞে, যে কাজ দেবেন সেই কাজই করবো! জমিদারি সেরেস্তার কাজকর্মও করতে পারি!

গোপাল ভাঁড় মশাই বসে ছিলেন সেখানে। বলেছিলেন—আমি যে গপ্‌পো-গুলো বলি সেগুলো লেখার কাজ তো এ'কে দিতে পারেন মহারাজ! তা হলে আমি অমর হয়ে থাকতুম!

মহারাজ বলেছিলেন—তোমার ভাঁড়ামি যদি লোকের মুখে মুখে ফেরে তা হলেই তুমি অমর হয়ে যাবে গোপাল, কিন্তু লিখলে আমার বদনাম হবে—

—কেন মহারাজ?

—লোকে ভাববে, দেশের যখন দুর্দিন তখন রাজ-সভায় বসে বসে মহারাজ কেবল ফষ্টিনষ্টিই করে গেছেন! আমি যে দেশের কথা ভাবি, সেকথা কেউই বুঝবে না।

গোপাল ভাঁড় মশাই বলেছিল—না, তা ভাববে না মহারাজ; ভাববে, মহারাজ রাজকার্যে এতই বিব্রত হয়ে পড়েছিলেন যে, দুশ্চিন্তা ভোলবার জন্যে গোপাল ভাঁড়কে বাড়িতে পুষে রেখেছিলেন!

মহারাজ খুশী হয়েছিলেন। বলেছিলেন—তুমি তো বেশ বলেছো গোপাল, খাসা বলেছো। কিন্তু বিদ্বানকে বিদ্যাচর্চার সুযোগ না দিয়ে বসিয়ে রাখলে লোকেও যে আমাকে নিন্দে করবে!

তারপর ভারতচন্দ্রের দিকে চেয়ে বলেছিলেন—তুমি নিজেই বলো, তুমি কী করতে চাও—

ভারতচন্দ্র উত্তর দিয়েছিলেন—আজ্ঞে আমি মহারাজের অনুচর, আপনি যা আদেশ করবেন তাই-ই করবো—

সেই তখনই শুরু হয়েছিল 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য-রচনার সূত্রপাত!

তারপর থেকে অনেক বছর কেটে গেছে। এর মধ্যে নবাব সরকার থেকে খাজনা আদায়ের হুমকি এসেছে। অনেকবার দেওয়ান কালীকৃষ্ণ সিংহকে যেতে হয়েছে নবাব নিজামতে। বার বার দরবার করতে হয়েছে নবাবের আম-দরবারে। কোনো ফল হয়নি। মহারাজকে নিজেকে গিয়েও জগৎশেঠ মহতাপজীর সঙ্গে শলা-পরামর্শ করতে হয়েছে। তাতেও ফল হয়নি। অনেক রকম ষড়যন্ত্র হয়েছে নবাবকে নিয়ে। কতবার ভেবেছেন একদিন সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু দেখেছেন আস্তে আস্তে নিজামতের জলুস বেড়েই চলেছে। সন-পিছু ৮,৩৫,৯৫২ টাকা রাজস্ব দিলে রাজ্য চলবে কেমন করে সেটা কেউ দেখে না। দেখেছেন, মীরজাফর আলি সাহেবও খুশী নয়, জগৎশেঠজীও খুশী নয়, মেহেদী নেসার, ইয়ারজান, সফিউল্লা খাঁ, কেউই খুশী নয়। নিজামতের প্রত্যেকটা আমীন কর্মচারী থেকে শুরু করে আমীর-ওমরাওরা পর্যন্ত সবাই যেন নিজামতের সর্বনাশ চায়। এমন অবস্থা আগে কখনো ছিল না। আগে কখনো এমন করে নবাবকে অভিশাপ দিত না সবাই। নবাবের অবশ্য টাকার দরকার। বর্গীদের হাঙ্গামার পর থেকেই টাকার টানাটানিটা যেন দিন দিন বেড়ে চলেছে। আর তারপর ফিরিঙ্গী কোম্পানীর সঙ্গে যখন ঝগড়া বাধতে শুরু হলো তখন থেকে নিজামতের খাঁই যেন আরো বেড়ে যেতে লাগলো। শেষকালে যখন আরো অসহ্য হয়ে উঠলো তখন মহারাজ দেখলেন, তাঁর দলে আরো অনেকে আছেন। শুধু তিনিই নন, শুধু জগৎশেঠই নন, কিংবা শুধু মীরজাফর, মেহেদী

নেসার, ইয়ারজান, সফিউল্লা খাঁই নন, ফিরিঙ্গী কোম্পানীও আছে, আর আছে হাতিয়াগড়ের রাজা হিরণ্যনারায়ণ রায়। বেচারীর অনেক বয়েস কম। কোনো দিন কোনো রকমে কোনো ভাবেই হাতিয়াগড়ের রাজা নিজের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার জন্যে অন্যায় পন্থা গ্রহণ করেননি। নিজের কোনো সন্তান নেই, কিন্তু দুটি সতীসাধ্বী স্ত্রী নিয়ে সুখে ঘর-করনাই করতে চেয়েছেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রেরও যেমন দু'টি স্ত্রী, হিরণ্যনারায়ণেরও তেমনি দু'টি। তবু নবাবের দৃষ্টির শনি সেখানেও পড়েছে। নিজের গোমস্তা সরখেলমশাইকে অনেকবার পাঠিয়েছেন হাতিয়াগড়ে খবর আদান-প্রদানের জন্যে। অন্তত কিছুটাও যদি সাহায্য করতে পারেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বোধ হয় তা-ও পারা গেল না। দ্বিতীয়পক্ষের পত্নীকে মহারাজ নিজের প্রাসাদে আশ্রয় দেবেন কথা দিয়েছিলেন। কিন্তু তাতেও হয়তো শনির দৃষ্টি পড়লো।

পাশের ঘরেই হাতিয়াগড়ের ছোটমশাইকে বসানো হয়েছিল। মহারাজকে খবর দিয়ে দেওয়ান কালীকৃষ্ণ সিংহ মশাই এসে হাজির হলেন। বললেন—কী সংবাদ ছোটমশাই? মুর্শিদাবাদের কিছু সংবাদ পেলেন?

ছোটমশাই বললেন—পেলাম! কিন্তু মহারাজা কোথায়?

—তিনি আসছেন, খবর পাঠিয়েছি। আমাদের এদিকেও খুব গন্ডগোল চলছে, মহারাজার মন ভালো নেই—

—কেন?

—নিজামতের খাঁই বাড়ছে দিন দিন। নবাবের পাওনা বেড়েই চলেছে সন-সন। এবার চিঠি এসেছে আট লাখ পঁয়ত্রিশ হাজার ন'শ বাহান্ন টাকা দিতে হবে। এত টাকা কোত্থেকে আসে?

—আমারও তো তাই হয়েছে। আমাকেও এক লাখ সতেরো হাজার দিতে হুকুম হয়েছে। কিন্তু এত টাকার দরকারই বা হচ্ছে কেন নিজামতের?

—আমি তো সেই কথা জানতে গিয়েছিলুম—নিজামত-কাছারিতে। তহসিলদার বললে—দিল্লীর বাদ্‌শার কাছ থেকে হুকুমত্‌ এসেছে।

ছোটমশাই বললেন—সব বাজে কথা।

—বাজে কথাই তো। আমি কিছু জানি না ভেবেছে ওরা? দিল্লীর বাদ্‌শার কাছারিতে আমিও তো যাতায়াত করি। তারা বলে, বাংলা দেশ থেকে আলীবর্দী খাঁ শুধু একবার খাজনা পাঠিয়েছিলেন, তার পর আর কেউই পাঠায়নি। মুর্শিদকুলি খাঁর সময় থেকে কেউই খাজনা পাঠায়নি। যে যখন প্রথম নবাব হয় তখনই মাত্র একবার খাজনা পাঠায় বাদ্‌শার কাছে, তারপর আর পাঠায় না—

হঠাৎ মহারাজ ঘরে ঢুকলেন। ছোটমশাই উঠে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা করলেন তাঁকে। কালীকৃষ্ণ সিংহ মশাই ভেতরে চলে গেলেন।

—আপনার গৃহিণীর কোনো সংবাদ পেলেন ছোটমশাই?

—পেলাম মহারাজ, কিন্তু না পেলেই হয়তো ভালো হতো।

—কী রকম?

—আপনি শুনেছেন বোধ হয় সব! আমার স্ত্রীকে নবাবের লোক চুরি করে চেহেল্‌-সুতুনে রেখেছে!

—কিন্তু আপনি তো আপনার পত্নীর বদলে অন্য একটি মেয়েকে পাঠিয়েছিলেন চেহেল্‌-সুতুনে।

—সে তো পাঠিয়েছিলুম, কিন্তু এবার আপনার কাছে পাঠাবার সময় যে সব গোলমাল হয়ে গেল। কী করে জানবো বলুন যে, ফিরিঙ্গীরা ঠিক এই সময়েই

আবার ফিরে আসবে, আর কলকাতা দখল করে নেবে; নবাবের ফৌজের সঙ্গে পল্টনদের লড়াই হবে। যারা বজরার সঙ্গে ছিল তারা এসে বললে, বোম্বেটে ডাকাতরা বজরা নিয়ে পালিয়ে গেছে—তারা কোনো রকমে হাতিয়াগড়ে ফিরে এসেছে—

মহারাজ জিজ্ঞেস করলেন—আর আপনার শ্রীনাথ, মাঝির সর্দার?

—সে কি আর বেঁচে আছে? তাকে বোধ হয় নবাবের লোকরা ঠেঙিয়ে নদীর জলে ডুবিয়ে দিয়েছে!

—তারপর?

ছোটমশাই বললেন—তারপর আপনার চিঠি পেয়েই আমি মুর্শিদাবাদে জগৎশেঠজীর হাবেলীতে গেলাম। গিয়ে শুনি সব অদ্ভুত কাণ্ড। আমার গৃহিণীকে কল্‌মা পড়িয়ে মুসলমান করে নাম বদলিয়ে দিয়ে চেহেল্‌-সুতুনে রেখে দিয়েছে। এখন নাম হয়েছে মরিয়ম বেগম। সেই আমার গৃহিণীর ওপর নাকি নবাবের ওম্‌রাও সফিউল্লা খাঁ অত্যাচার করতে গিয়েছিল। তাতে তাকে খুন করে ফেলেছে সে!

—সে তো সব শুনেছি আমি। মরিয়ম বেগম কি আপনারই গৃহিণী?

ছোটমশাই বললেন—এ-সব কি আমিই জানতুম? আমাকে জগৎশেঠজী সব বললেন যে! সেই খুনের অপরাধে তো আমার গৃহিণীর ফাঁসি হয়ে যাবার কথা। আমি জগৎশেঠজীর কাছ থেকে পনেরো হাজার আশ্‌রফি হাওলাত নিয়ে তবে কাজীসাহেবকে ঘুষ দিয়ে তাকে ছাড়াই—

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র কথাগুলো শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। বললেন—এ তো আমি জানতুম না—তারপর? তারপর এখন কী অবস্থা?

—এখন নবাব তাকে ছাড়িয়ে নিয়ে গিয়ে চেহেল্‌-সুতুনে তুলেছেন। তারপর ভগবান যা করেন! আমি এইটুকু দেখে আপনার কাছে ছুটে এসেছি, আপনি পরামর্শ দিন এখন কী করবো?

মহারাজ খানিকক্ষণ ভাবলেন।

তারপর বললেন—আপনি জগৎশেঠজীর কাছে আর যাননি?

—গিয়েছিলুম। তিনি নিজেও এখন অপমানের ভয়ে চুপ করে আছেন। একবার নবাবের হাতে চড় খেয়েছেন সকলের সামনে। সে অপমান এখনো ভুলতে পারেননি। আমি তো সেই জমায়েতের সময় ছিলাম, যখন জগৎশেঠজীর বাড়িতে মীরজাফর আলি সাহেব এসেছিলেন, ওয়াটসন্‌ সাহেব এসেছিলেন, মেহেদী নেসার সাহেব ছিলেন, তখন থেকেই তো চেষ্টা চলছে আমার; কিন্তু দেখছি আপনি ছাড়া কিছু হবে না। আপনি নিজে একটু চেষ্টা-চরিত্র করুন, নইলে কিছুই হবে না।

মহারাজ বললেন—আমি তো আমার দেওয়ানকে পাঠিয়েছিলাম। বলে পাঠিয়েছিলাম যে, নবাবের মীর বক্সীকে যদি দলে টানা যায় তবেই আমাদের সব চেষ্টা সার্থক হবে। মীর বক্সী যদি নবাবের দলে থাকে, তা হলে কিছুই হবে না—

ছোটমশাই বললেন—শুনেছি তো মীরজাফর সাহেবও নবাবের ওপর খাপ্পা হয়ে উঠেছে নাকি!

—তা তো উঠেছে। সে আমিও জানি। কিন্তু কেন হয়েছে তা ঠিক জানি না।

ছোটমশাই বললেন—ওই যে মীরজাফর আলি সাহেব কলকাতার উমিচাঁদ

সাহেবের সঙ্গে জোট বেঁধে নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে—এইরকম খবর নবাবকে কে নাকি দিয়েছে!

মহারাজ বললেন—সে খবর আমার কানেও গেছে!

—না, শুধু খবর নয়, নবাবের হাতে উমিচাঁদের লেখা চিঠিও নাকি পেঁছে গেছে! এর পর কী হবে তা বুঝতে পারছি না। ও-সব খবর নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় আমার নেই, এখন আমি নিজের ব্যাপারে কী করবো তাই ভাবছি, সেই-জন্যেই আপনার কাছে পরামর্শ করতে এলাম—

মহারাজ বললেন—এখন একমাত্র উপায় ইংরেজরা—

—তাদের সঙ্গে তো আর দেখা হচ্ছে না। আর তাদের কাউকে আমি চিনিও না। তারাও আমাকে চেনে না। একবার তারা নবাবের সঙ্গে লড়াইতে হেরে গেছে, তারা তো ভয়ে নবাবকে চটাতেই চাইবে না। কলকাতায় তারা উপোস করছে এখন, কেউ তাদের চাল-ডাল-তেল-নুন বেচছে না! এ সময়ে কি তারা লড়াই করতে সাহস করবে?

মহারাজ বললেন—লড়াই না করেও তো নবাবকে জব্দ করা যায়!

—কী রকম?

মহারাজ বললেন—সে-সব কথা আপনার জানবার দরকার নেই—আপনি এক কাজ করুন—

—কী কাজ?

—আমি একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি ফিরিঙ্গী কর্নেলের কাছে, আপনি সেখানা নিয়ে তার সঙ্গে দেখা করুন গিয়ে।

—কে সে?

—তার নাম কর্নেল রবার্ট ক্লাইভ!

—সে আবার কোন্ সাহেব?

মহারাজ বললেন—সে এক নতুন কম্যান্ডার এসেছে মাদ্রাজ থেকে। লোকটা ভালো। এরই মধ্যে বেশ মেলামেশা করে নিয়েছে বাঙালীদের সঙ্গে, চাষাভুষোদের সঙ্গে মিশে তাদের অনেক ভাষা শিখে নিয়েছে। আমি এবার যখন কালিঘাটে গিয়েছিলুম, ঠাকুর দেখার নাম করে তার সঙ্গে দেখা করে এসেছি। উমিচাঁদ সাহেবের সঙ্গে খুব ভাব তার। খুব জাঁদরেল লোক, নবাবকে উচ্ছেদ করবেই। আমি যা বলবার তা বলেছি। বলেছি, দেশের গরীব বড়লোক কেউ নবাবকে চায় না। এখন আপনিও গিয়ে দেখা করে বলে আসুন। বলবেন, দরকার হলে আমরা টাকা দিয়ে, লোকজন দিয়ে, সব কিছু দিয়ে তাদের পেছনে আছি—

ছোটমশাই বললেন—কলকাতার কোথায় থাকে তারা?

—আপনি কখনো যাননি কলকাতায়?

ছোটমশাই বললেন—না।

—দলবল নিয়ে পল্টনরা থাকে কেল্লায়, আর ক্লাইভ থাকে বরানগরে।

ছোটমশাই বললেন—তা আমি তো উমিচাঁদ সাহেবের বাড়িতে গিয়ে উঠতে পারি!

—খবরদার, খবরদার! মহারাজ সাবধান করে দিলেন—খবরদার, ও লোকটা একটা কাঁকড়াবিছে—ও নবাবের দলেও আছে, আমাদের দলেও আছে। আপনি ওর ছায়া মাড়াবেন না—

—তা হলে আমি বরানগরেই যাবো?

—হ্যাঁ, ওখানে ক্লাইভ সাহেবের ছাউনি আছে, সেখানে গেলেই খবর পাবেন।
ছোটমশাই বললেন—তা হলে উঠি আমি মহারাজ—
মহারাজ বললেন—কিন্তু বিশ্রাম না করেই যাবেন? এক দিন এখেনে আরাম করে গেলে হতো!
ছোটমশাই বললেন—বহুদিন থেকেই আমার বিশ্রাম ঘুচে গেছে মহারাজ। মাথার ওপর যতদিন বাবামশাই ছিলেন, ভাবনা ছিল না। তখন দিনকালও ছিল অন্যরকম। এখন কী যে হয়েছে, সব দিক থেকেই অশান্তি—
তারপর একটু থেমে বললেন—কিছু মনে করবেন না, আমি উঠি—
—তা হলে পালকিটা নিয়ে যান!
—হ্যাঁ, ওরা তো ওখানে বসে রয়েছে, আমি লোকজনদের বসিয়ে রেখে দিয়ে এসেছি। বলে প্রণাম করে চলে গেলেন।
খানিক পরেই দেওয়ান কালীকৃষ্ণ ঘরে ঢুকেছেন। ঘরে ঢুকেই অবাক হয়ে গেছেন। মহারাজ, মহারাজ কোথায় গেলেন! পাশের ঘরে গেলেন, সেখানে গোপাল ভাঁড় মশাই একধারে বসে ছিলেন। আর কেউ নেই।
—কোথায়? মহারাজ কোথায় গেলেন?
—পাশের ঘরেই তো আছেন, দেখুন!
ভেতরে খবর পাঠালেন। জরুরী খবর এসেছে, মহারাজকে জানাতে হবে। খবর পেয়ে মহারাজ ভেতর থেকে এলেন—কী হলো? কিসের জরুরী খবর দেওয়ান মশাই?
দেওয়ান মশাই বললেন—এখুনি মুর্শিদাবাদ থেকে খবর পাঠিয়েছেন আমাদের উকীলবাবু, নবাব কলকাতায় যাচ্ছেন লড়াই করতে!
—নবাব যাচ্ছেন লড়াই করতে? কেন, ফিরিঙ্গীরা কি কিছু বাড়াবাড়ি করেছে?
—তা জানি না। এই খবরটা পেয়েই আমাদের জানিয়েছেন। আর কিছু জানাননি।
মহারাজ বললেন—এখুনি যে ছোটমশাই কলকাতায় রওনা হয়ে গেলেন, দেখুন তো বজরা ছেড়ে দিয়েছে কিনা! ঘাটে গিয়ে একবার খবর নিতে বলুন তো শিগ্গির। শিগ্গির করুন।
সিংহ মশাই আর দাঁড়ালেন না। সোজা কাছারির দিকে লোকের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে গেলেন।
কিন্তু ঘাটে গিয়ে যখন লোক পৌঁছুলো তখন ছোটমশাই-এর বজরা ছেড়ে দিয়েছে। নদীর এ মুড়ো থেকে ও মুড়ো পর্যন্ত লক্ষ্য করেও তার বজরার কোনো নিশানা পাওয়া গেল না।

বরানগরের ক্লাইভ সাহেবের ছাউনির সামনে গিয়ে দরবার খাঁ মিষ্টি গলায় সুর করে বলে উঠলো—জয় রাধে কৃষ্ণ—শ্রীরাধে—
বাড়ির চালে একটা লাউগাছের ডগা লক্‌লক্ করে লতিয়ে উঠেছে। বেলা পড়ো-পড়ো।
দরবার খাঁকে আর চেনবার উপায় নেই। ডান হাতে হরিনামের মালা, গলায়

কণ্ঠি, পরনে গেরুয়া কাপড়।

হালসীবাগান থেকে হাঁটতে হাঁটতে একেবারে বরানগরে এসে ঠিক আস্তানা খুঁজে বার করেছে।

—জয় রাধে কৃষ্ণ, শ্রীরাধে। দুটি সেবা পাই মা!

ভেতর থেকে দুর্গা কথাটা শুনতে পেয়েছিল। ছোট বউরানীর কানেও কথাটা গিয়েছিল। দুর্গা বললে—আবার কোন্ আবাগীর বেটা জ্বালাতে এল!

ছোট বউরানী বললে—বোষ্টম-বাউল কেউ হবে বোধ হয়, দেখবো?

—না গো, তোমায় দেখতে হবে না। আমি দেখছি!

বাইরে তখন দরবার খাঁ আবার একবার মিহি সুরে বলে—জয় রাধে-কৃষ্ণ, দুটো সেবা পাই মা—

আর থাকতে পারলে না দুর্গা। হরিচরণটাও কোথায় এই সময়ে কাজে গেছে। দুর্গা নিজেই বাইরে বেরিয়ে এল। এক-মুখ দাড়িগোঁফ বোষ্টমটার। কোন্ দলের কে জানে! কর্তাভজা, না বলরামভজা, না সাহেবধনি কে জানে!

বললে—এখানে কিছু হবে না বাছা, এ গেরস্ত-বাড়ি নয়—

বলে ভেতরেই চলে যাচ্ছিল। কিন্তু হঠাৎ বোষ্টমটা বলে উঠলো—তোর সামনে খুব বিপদ আসছে মা, ভারি বিপদ। একটু সাবধানে থাকিস্!

বিপদের কথা শুনেই দুর্গা থমকে দাঁড়ালো। ভালো করে চেয়ে দেখলে বোষ্টম-বাবাজীর দিকে। এও কি বুজরুক নাকি!

—কিসের বিপদ?

দরবার খাঁ বললে—একটু দাঁড়া না মা, দেখি তোর কপালটা ভালো করে দেখি! আমার দিকে চা, ভালো করে চা—

দুর্গার কেমন সন্দেহ হলো। বোষ্টমরা তো এমন করে কথা বলে না। আবার ভালো করে চেয়ে দেখলে।

বললে—তুমি কোন্ দলের বোষ্টম বাছা? সাহেবধনি, না কর্তাভজা?

দরবার খাঁ বললে—রাগ ক'রো না মা, আমি গরীব বোষ্টম, আমার আবার দল কী? আমি শ্রীরাধার সেবা করে দিন কাটাই।

বলে সেইখানেই বসে পড়লো। বললে—একটু তেষ্টার জল দেবে মা?

দুর্গা বললে—এ তো গেরস্ত-বাড়ি নয় বাছা, এখানে কিছু সেবা হবে না—

দরবার খাঁ বললে—শ্রীরাধের নাম করে যখন চাইছি মা, তখন আর ফিরে যেতে বোল না। তোমার ভালো হবে, তোমার মেয়েরও ভালো হবে!

—মেয়ে!

—হ্যাঁ মা, তোমার মেয়েরও ভালো হবে। তোমার মেয়ের সব দুঃখু ঘুচে যাবে। তোমার মেয়ের কপালে এবার থেকে সুখ আসছে!

দুর্গার কেমন সন্দেহ হতে লাগলো। এ-ও আর-এক বুজরুক নাকি!

—বলি তুমি বাটি চালতে পারো? আমার জামাই কোথায় আছে বলতে পারো?

দরবার খাঁ বললে—পারবো না কেন মা? কিন্তু তোমার মেয়ের কপালটা একবার দেখতে হবে। কপাল দেখবো, হাতের পাতা দেখবো। ভূত-ভবিষ্যৎ কি অত সহজে বলা যায় মা! তোমার মেয়েকে একবার ডাকো না দেখি!

দুর্গা কী করবে বুঝতে পারলে না। হরিচরণটাও নেই, ফিরিঙ্গী সাহেবটাও নেই। কাকেই বা জিজ্ঞেস করে। আশেপাশে তো সবই জঙ্গল। জঙ্গলের ওপাশে

গোরা-পল্টনদের ছাউনি। ডাকলে তারা এখনি এসে পড়বে হুড়মুড় করে। কোম্পানীর রাজত্বের মধ্যে বসে কেমন যেন ভয়-ভয় করতে লাগলো দুর্গার। হাতিয়াগড় হলে এখুনি হাঁক-ডাক করলে পাইক-পেয়াদারা হই-হই করে এসে পড়তো।

ভেতর থেকে ছোট বউরানী হঠাৎ বেরিয়ে পড়েছে।

দুর্গা দেখতে পেয়েই বললে—তুমি আবার কেন বাইরে এসেছো বউরানী?

—ভেতর থেকে আমি সব শুনিচি যে—

দরবার খাঁ বললে—খুব ভাগ্যবতী মা, খুব ভাগ্যবতী তোমার মেয়ে—দেখি মা তোমার কপালটা ভালো করে দেখি।

দুর্গার ভয়-ভয় করতে লাগলো।

কিন্তু ছোট বউরানী সোজা এগিয়ে এল দরবার খাঁর দিকে।

—এবার বাঁ হাতের পাতাটা দেখি মা তোমার?

বলে নিজের হাতটা বাড়িয়ে দিলে ছোট বউরানীর দিকে। ছোট বউরানীও নিজের বাঁ হাতটা দিলে দরবার খাঁর দিকে। খুব মন দিয়ে কী যেন দেখতে লাগলো দরবার খাঁ।

বললে—সামনে বড় বাধা আছে মা তোমার জীবনে, খুব সাবধানে থাকবে!

—কীসের বাধা? আমার নিজের ঘরে ফিরে যেতে পারবো তো? আমাদের বড় কষ্ট হচ্ছে বাবা! অনেক দিন ধরে ঘরে ফেরবার চেষ্টা করছি, কিছুতেই পারছিনে।

—তোমাদের ঘর কোথায় মা?

—হাতিয়াগড়ে!

—হাতিয়াগড়ে? হাতিয়াগড়ে তোমাদের যদি ঘর তো এখানে কেমন করে এলে? এখানে কে নিয়ে এল?

দুর্গা বললে—ওই ফিরিঙ্গী সাহেব আমাদের।

—ফিরিঙ্গী সাহেব? ওই গোরা পল্টনদের সাহেব? হ্যাঁ, ঠিক ধরেছি। ম্লেচ্ছ-সংস্পর্শ করাচ্ছে রাহু। রাহু না সরলে তো মুক্তি নেই মা তোমার!

—রাহু? কিন্তু আমরা তো সাহেবের ছোঁয়া খাইনে। আমি নিজেই তো রান্নাবাড়া করি।

দরবার খাঁ বললে—এখনো সংসর্গ পুরোপুরি হয়নি, কিন্তু এবার আর এড়াতে পারবে না মা।

—তা হলে কি জাত যাবে আমাদের?

—জাত যাবে কেন? বৃহস্পতি আছে কী করতে? রাহুর পরেই বৃহস্পতি আসছেন। তিনিই বাঁচিয়ে দেবেন। কিন্তু রাহু তার ঝঞ্ঝাট যা-দেবার তা তো দেবেই, তা তো এড়াতে পারবে না মা!

ছোট বউরানীর মুখখানা কালো হয়ে উঠলো।

বললে—তা হলে কী উপায়?

—উপায় আছে বইকি মা! একটা উপায় আছে।

বলে দরবার খাঁ নিজের কমণ্ডলুর ভেতর থেকে একটা হরতুকী বার করলে।

বললে—তোমার সোয়ামীর নাম কি মা?

ছোট বউরানী একটু বিব্রত হয়ে পড়লো।

দুর্গা রেগে গেল। বললে—তোমার তো আক্কেল খুব বাবা! সোয়ামীর নাম

কী করে করবে মেয়ে! ইস্ত্রী হয়ে কি সোয়ামীর নাম কেউ করে? তুমি কী রকম বোষ্টম শুনি?

দরবার খাঁ প্রায় বেসামাল হয়ে পড়েছিল। বললে—আমাদের ধর্মে কিছু আটকায় না মা, আমারও তো বোষ্টুমি আছে, সে তো আমার নাম ধরে ডাকে।

—তা আমরা তো বোষ্টম নই!

—তবে তোমরা কী মা?

কিন্তু তার উত্তর দেওয়া আর হলো না। ওদিক থেকে ঘোড়া ছোটাতে ছোটাতে দুজন পল্টন আসছিল, তাদের দেখেই দুর্গা আর ছোট বউরানী ভেতরে চলে গেল।

—এই, ভাগো ভাগো ইধার সে, ভাগ্ যাও—

দরবার খাঁ ভয় পেয়ে গেল। বললে—কেন বাবা, আমি তোমাদের কী ক্ষেতি করেছি?

—নেহি, হুকুম নেহি ইধার ঘুসনে কা। ই কোম্পানীকো পল্টনকা ক্যাম্প হ্যায়।

—আমি তো গরীব বোষ্টম বাবা, আমি তো লড়াই করতে আসিনি। দুটো সেবা নিতে এসেছিলুম।

হঠাৎ তখন ওদিক থেকে হরিচরণ এসে পড়েছে। হরিচরণও পল্টনের লোক। কিন্তু সাহেব তাকে দুর্গাদের সেবার কাজে লাগিয়ে দিয়েছিল। সে তখন ছাউনি থেকে বরাদ্দ চাল-ডাল আনতে গিয়েছিল। বাড়ির সামনে এসে এই হই-চই কাণ্ড দেখে অবাক। একটুখানি বাইরে গিয়েছে, আর তার মধ্যে এত কাণ্ড ঘটে গিয়েছে!

—এ কে? কী হয়েছে?

গোরা পল্টন দুজন ততক্ষণে দরবার খাঁকে ধরে ফেলেছে। দরবার খাঁ বললে—আমাকে ছেড়ে দাও বাবা, আমি জানতুম না এ কোম্পানীর পল্টনদের ছাউনি। আমি সেবা নিতে এসেছি।

—দাঁড়াও, তোমার সেবা নেওয়া দেখাচ্ছি।

আর একজন পল্টন বললে—এ শালা স্পাই আছে, বি কেয়ারফুল—কাপড়ের ভেতরে আর্মস্ থাকতে পারে—

সঙ্গে সঙ্গে গায়ের গেরুয়া আলখাল্লাটা টান দিতেই কোমরের ভেতর থেকে চক্‌চকে ছোরা একখানা খসে পড়েছে মাটিতে। ছোরাখানা দেখেই হরিচরণ কুড়িয়ে নিলে। কী সর্বনেশে কাণ্ড! এরই মধ্যে এত!

গোরা পল্টন দুটো দরবার খাঁর হাত দুখানা পিছমোড়া করে বেঁধে ফেললে। তারপর হিড়হিড় করে টানতে টানতে নিয়ে গেল নিজেদের ছাউনির দিকে। কলকাতার কেল্লার মত বরানগরেও ছোটখাটো পল্টন ছাউনি।

হরিচরণ দৌড়তে দৌড়তে ভেতরে ঢুকলো।

—ও দিদি, দিদি—

দুর্গা, ছোট বউরানী—দুজনেই এতক্ষণ সব শুনছিল ভেতর থেকে। হরিচরণ যেতেই দুর্গা বললে—ও কে, হরিচরণ? কী করতে এসেছিল?

হরিচরণ বললে—নবাবের চর গো দিদি—কোম্পানীর ছাউনির হাঁড়ির খবর নিতে এইছিল—

নবাবের চর কথাটা শুনে ছোট বউরানী ভয়ে চম্‌কে উঠলো।

—তোমাদের কী জিজ্ঞেস করছিল?

দুর্গা বললে—জিজ্ঞেস করছিল এর সোয়ামীর নাম কী, কোথায় বিয়ে হয়েছে, এই সব—

—বলোনি তো কিছু তোমরা?

—না হরিচরণ, আমরা আর একটু হলেই বলতে যাচ্ছিলুম! শুধু বলেছি হাতিয়াগড়ে এর শ্বশুরবাড়ি, আর কিছু বলিনি। কিছু বলবার আগেই গোরা পল্টন দু'জন যে এসে গেল, তাই রক্ষে—

—ভাগ্যিস বলোনি, নইলে সব্বোনাশ হতো। আমি একটুখানি গিয়েছি ছাউনি থেকে তোমাদের চাল-ডাল আনতে, আর এরই মধ্যে শয়তানটা এসে ঢুকে পড়েছে এখানে—সাহেব এসে সব জানতে পারলে খুব বকবে আমাকে দিদি।

হঠাৎ বাইরে ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ হতেই হরিচরণ অন্যমনস্ক হয়ে উঠলো।

—ওই আমার সাহেব আসছে দিদি। সাহেবের ঘোড়ার আওয়াজ আমি শুনলেই বুঝতে পারি।—বলে দৌড়ে বাইরে গেল।

হরিচরণ সাহেবের মুখখানার দিকে চেয়ে দেখলে। সাহেবের মুখের চেহারা দেখেই হরিচরণ বুঝতে পারে সাহেবের মেজাজ। কেমন যেন রুক্ষ-রুক্ষ ভাব। সত্যিই ক্লাইভ সাহেবের রাগ হয়ে গিয়েছিল উমিচাঁদের কথা শুনে। উমিচাঁদ বলতে চেয়েছিল, টাকা দিলে নবাবের সঙ্গে লড়াই বাধিয়েও দিতে পারে, আবার মিটমাট করিয়েও দিতে পারে। লোকটা ট্রেটর! এই ট্রেটরদেরই ক্লাইভ টলারেট করতে পারে না। এরাই চিরকাল রবার্ট ক্লাইভদের এনিমি, আবার নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলাদেরও এনিমি। এরাই তাকে ইংলণ্ড থেকে তাড়িয়ে ইণ্ডিয়াতে পাঠিয়েছে। এরাই আবার কোম্পানীকে নবাবের সঙ্গে লড়াইতে নামিয়েছে। অথচ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তো লড়াই করতে এখানে আসেনি!

পাশের ঘর থেকে ফিরে এসেই উমিচাঁদ সাহেব বলেছিল—তাহলে কী হলো, বলো?

অ্যাড্মিরাল ওয়াটসন্ বললে—বলুন, আপনি কত নেবেন?

—আমি তোমাদের সঙ্গে নবাবের লড়াই বাধিয়ে দেবো!

ওয়াটসন্ বললে—শুধু লড়াই বাধিয়ে দিলে চলবে না, লড়াইতে জিতিয়েও দিতে হবে?

—তাহলে অনেক টাকা চাই।

—কত টাকা?

—নবাবের খাজাঞ্চিখানায় যত টাকা তোমরা পাবে, তার চার ভাগের এক ভাগ!

ক্লাইভ বললে—তাই-ই দেবো!

উমিচাঁদ সাহেব বললে—আমরা কারবারী লোক, তোমরাও নতুন, তোমাদের সঙ্গে কারবারে তোমরা আমার কথা রাখোনি আগে, এবার লেখা-পড়া করে নেবো!

—তা লেখাপড়াই করে নেবেন।

—বেশ, সেই কথাই রইলো। এখন কী করতে হবে আমাদের?

উমিচাঁদ বললে—একটা খবর তোমাদের মুফতে তুলে দিই, এর জন্যে তোমাদের টাকাকড়ি কিছু দিতে হবে না। আমার কাছে মুর্শিদাবাদ থেকে এখুনি একটা চর এসে একটা খবর দিয়ে গেছে।

—কী খবর?

উমিচাঁদ দাড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে বললে—নবাব মীর্জা মহম্মদ মুর্শিদাবাদ থেকে রওনা হয়েছে তোমাদের সঙ্গে লড়াই করবার জন্যে!

—সে কী? আমরা তো কিছু খবর পাইনি?

উমিচাঁদ বললে—তোমরাই যদি খবর পাবে সাহেব, তাহলে আমি কী করতে হালসীবাগানে বসে কোটি-কোটি টাকা কামাচ্ছি!

—নবাব বেরিয়ে পড়েছে?

—হ্যাঁ সাহেব, হ্যাঁ!

—আপনি ঠিক বলছেন? আপনি ঠিক জানেন?

—এ তো ছোট তুচ্ছ খবর সাহেব। এ-খবর তোমাদের মুফত্ দিয়ে দিলুম। এর জন্যে একটা দামড়িও নেবে না উমিচাঁদ। উমিচাঁদ মাছি মেরে হাত নষ্ট করে না সাহেব!

একটু থেমে আবার বললে—তবে আরো শোন, নবাবের সঙ্গে আছে চল্লিশ হাজার ঘোড়সওয়ার, ষাট হাজার পয়দল-ফৌজ, পঞ্চাশটা হাতী আর তিরিশটা কামান—ভয় হচ্ছে?

অ্যাড্‌মিরাল ওয়াটসন্ রবার্টের দিকে চাইলে।

—আর তোমাদের?

অ্যাড্‌মিরাল বললে—আমাদের আছে গোরা পল্টন সাতশো এগারজন, গোলন্দাজ একশোজন, নেটিভ সেপাই প্রায় তেরো শো—

উমিচাঁদ জিজ্ঞেস করলে—আর কামান? কামান ক'টা আছে?

অ্যাড্‌মিরাল বললে—তিন সেরি গোলা ছোঁড়বার মত কামান আছে চোদ্দটা।

উমিচাঁদ হেসে উঠলো। বললে—তোমাদের তো সাহস কম নয় হে! মোটে এই ক'টা মাল নিয়ে তোমরা নবাবের সঙ্গে লড়বার জন্যে পাঁয়তাড়া কষছো?

ক্লাইভ বললে—পারি না-পারি সে আপনার দেখবার দরকার নেই, কিন্তু আপনি বলুন আমাদের কতটা হেল্‌প্ করতে পারবেন!

—আমি?

উমিচাঁদ সাহেব সেই একই রকম রহস্যময় হাসি হাসতে লাগলো।

বললে—হেল্‌প আমি করবো, কিন্তু তার আগে তোমাদের একটা কাজ করতে হবে।

—কী কাজ?

—তোমাদের একটা ফার্সি-জানা মুন্সি রাখতে হবে।

—মুন্সি তো আমাদের আছে।

উমিচাঁদ বললে—তাকে দিয়ে চলবে না। অন্য মুন্সি রাখতে হবে। সে আমাদের লোক। মুর্শিদাবাদ থেকে যে-সব চিঠি আসবে সে-সব চিঠি যাকে-তাকে দিয়ে পড়ালে চলবে না। বাইরের লোক জেনে ফেলবে। আমাদের নিজেদের জানাশোনা মুন্সিকে দিয়ে পড়াতে হবে।

—তা তাই করবো। সে মুন্সিকে কোথায় পাবো?

—আমি তাকে তোমাদের কাছে পাঠিয়ে দেবো।

—কে সে?

—সে একজন গরীব ছোকরা। বেচারি চাকরি খুঁজছে অনেক দিন ধরে। আমার কাছেও এসেছিল চাকরির খোঁজে। আমি কিছু করতে পারিনি। কিন্তু ছেলেটা বিশ্বাসী। প্রাণ গেলেও ছেলেটা ভেতরের কথা কাউকে ফাঁস করবে না।

—তা বেশ তো। তাকেই রাখবো। কত মাইনে নেবে?

—তিন টাকা, চার টাকা, পাঁচ টাকা—যা দেবে তাতেই সে খুশী থাকবে।

—কী নাম তার?

—নবকৃষ্ণ।

নামটা শুনে রেখেছিল ক্লাইভ! কোথাকার কোন্ নবকৃষ্ণ, ছেলেটা কেমন কাজ করবে কে জানে। তবু কথাটা মনে লেগেছিল। মন্দ বলেনি উমিচাঁদ। ইণ্ডিয়াতে এসে ব্যবসা করতে গেলে ইণ্ডিয়ানদের হেল্প নিতেই হবে। ইণ্ডিয়ানদেরই এজেণ্ট বানাতে হবে। সেই এজেণ্টদের দিয়েই ইণ্ডিয়াকে হাত করতে হবে।

হঠাৎ নিজের ক্যাম্পের সামনে আসতেই হরিচরণকে দেখে ঘোড়া থামিয়ে দিলে ক্লাইভ সাহেব।

—কী হরিচরণ? হোয়াট নিউজ? কী খবর?

হরিচরণ যা-কিছু ঘটেছিল সব বলতেই মাথায় রক্ত উঠে গেল ক্লাইভের। বললে—কোথায় গেল স্পাইটা?

—তাকে পল্টনরা ছাউনিতে ধরে নিয়ে গেছে হুজুর—

ক্লাইভ ঘোড়া থেকে আর নামলো না। সোজা ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে ছাউনির দিকে ছুটে চললো। লড়াই যদি শেষ পর্যন্ত করতেই হয় তো ধীরে-সুস্থে করলে চলবে না। নবাব মুর্শিদাবাদ থেকে আর্মি নিয়ে কলকাতার দিকে আসছে, এখন তো আর সময় নষ্ট করলে চলে না। অ্যাডমিরাল চলে গেছে কেল্লার দিকে তোড়জোড় করতে। এদিকে বরানগরের ক্যাম্পেও তোড়জোড় শুরু করতে হবে।

হরিচরণ পেছন থেকে বললে—রান্না হয়ে গেছে হুজুর—খেয়ে যান—

দূর, খাওয়ার কথা এখন ভাবলে চলে! আগে খাওয়া না আগে লাইফ! লাইফ্ আর ডেথ্-এর প্রশ্ন এখন। এখন কি খাওয়ার কথা ভাবলে চলে!

মতিঝিলের আম-দরবার তখন জম-জমাট হয়ে উঠেছে। নানীবেগমের সঙ্গে মরিয়ম বেগমসাহেবা গিয়ে সেইখানেই হাজির হলো।

চবুতরার ওপর তাঞ্জামটা গিয়ে থামতেই নেয়ামত খবর পেয়েছে।

সামনে এসে সেলাম করে দাঁড়ালো নেয়ামত। বললে—বন্দেগী বেগমসাহেবা—

—নবাব কী করছে নেয়ামত?

নেয়ামত বললে—দরবার খতম করে কলকাতায় লড়াই করবার হুকুম জারি করে দিয়েছে জাঁহাপনা—

—এখন কে কে আছে মতিঝিলে?

—কেউ নেই বেগমসাহেবা। জগৎশেঠজী ছিলেন, তিনিও ভি চলে গেছেন। মানিকচাঁদজী, মীরজাফরজী, মোহনলালজী, মীরমদনজী, মেহেদী নেসার সাহেব, ইয়ারজান সাহেব, সবাই চলে গেছেন বেগমসাহেবা। জাঁহাপনা ভি মুস্তায়েদ হচ্ছেন—

সত্যিই বাঙলা বিহার উড়িষ্যার নবাব মীর্জা মহম্মদ সিরাজ-উ-দ্দৌলা মতিঝিলের মধ্যে আর একবার একটা বিরাট আয়নার সামনে নিজের চেহারাটা

দেখছিলেন। জগৎশেঠজী একটু আগেই ফিরিঙ্গী-কোম্পানীর সঙ্গে লড়াই করতে বারণ করে গেছে। কিন্তু মানিকচাঁদ বলেছে লড়াই চালিয়ে যেতে! একেবারে উল্টো কথা!

মানিকচাঁদ বলেছিল—লড়াই না করলে ওরা ভাববে জাঁহাপনা ভয় পেয়েছেন!

জগৎশেঠজী বিজ্ঞ মানুষ। বলেছিলেন—কিন্তু একবার তো লড়াই করে জাঁহাপনা দেখিয়ে দিয়েছেন ভয় পাবার লোক জাঁহাপনা নন—

মানিকচাঁদ বলেছিল—কিন্তু এবার তো ড্রেক সাহেব নয় জাঁহাপনা, এবার যে তৈলঙ্গ দেশ থেকে নতুন দল এসেছে। এদের সঙ্গে অ্যাড্‌মিরাল ওয়াটসন্‌ আছে, রবার্ট ক্লাইভ বলে আর একজন জাঁদরেল কর্নেল আছে—

নবাব বললে—এ লোকটা কেমন, মানিকচাঁদ? ওই ক্লাইভ?

—জাঁহাপনা, লোকটা কাটখোট্টা আদমি। কাকে বলে মেহেরবানি, কাকে বলে তোয়াজ্জু কিছুছু জানে না। দিল্‌ বলে কোনো পদার্থ নেই লোকটার—এক কথায় মতলববাজ—!

মীর্জা মহম্মদ সব শুনলে।

তারপর বললে—এতদিন যে ফিরিঙ্গীরা ফলতায় গিয়ে ছিল, কী খেয়ে থাকতো? আমি তো হুকুম দিয়ে দিয়েছিলাম কেউ ওদের খুরাকি বেচবে না! কে ওদের খুরাকি জোগান দিলে?

হঠাৎ মানিকচাঁদের মুখটা খানিকক্ষণের জন্যে যেন কালো হয়ে গেল। কথা বলতে গিয়ে জিভটা আটকে গেল।

—তুমি খুরাকি জুগিয়েছ?

নবাবের গলার শব্দে যেন আসমানের বাজ ভেঙে পড়লো আম-দরবারে।

—না জাঁহাপনা।

—তাহলে কে জোগান দিল? খিলাফত-ই-খুদা?

সবাই চুপ। মাসের পর মাস ফিরিঙ্গীরা ফৌজ-পল্টন নিয়ে হিন্দুস্থানের নবাবের হুকুম অমান্য করে হিন্দুস্থানের দরিয়াতে ভেসে রইলো তবে কি সির্ফ হাওয়া খেয়ে? নিশ্চয় হিন্দুস্থানের নিমকহারামরা তাদের খুরাক জুগিয়েছে। কে সে নিমকহারাম? কে সে বেত্তমিজ্‌! কে সে হারিফ? কে সে দুষমন? কে সে শয়তান?

সমস্ত আম-দরবারটা যেন গম্‌গম্‌ করতে লাগলো নবাবের রাগের চিৎকারে।

—তা আমি জানি না জাঁহাপনা।

—কিন্তু আমি জানি!

এবার আর রাগ নয়। এবার নবাবের গলায় যেন আর্তনাদের বিভীষিকা ভয়াল মূর্তিতে ফুটে উঠলো।

তা হলে নবাব কি সব জেনে গেছে! মীরজাফর আলির বুকটা জ্বলে উঠলো শির শির করে। জগৎশেঠজী স্থির নিশ্চল নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। নবাবের তো কিছু জানবার কথা নয়। তবে কি এও একটা কৌশল! ভেতরের খবর আদায় করবার কারসাজি?

—তুমি কেমন করে নিমকহারামী করতে পারলে মানিকচাঁদ? তোমাকে না আমি কলকাতার সুবাদার করে দিয়েছিলাম! তোমার ওপর কলকাতার ভার তুলে দিয়ে আমি না নিশ্চিন্ত হতে পেরেছিলাম! তোমাকে না আমি বিশ্বাস করেছি, তোমাকে না আমি ইয়াকিন করেছি! বলো, সত্যি কি মিথ্যে?

মানিকচাঁদ মাথা উঁচু করলো।

—না জাঁহাপনা, আমি নিমকহারামী করিনি!

—তুমি ফিরিঙ্গীদের খুরাক জোগাওনি?

—না।

—তুমি উমিচাঁদের সঙ্গে হাত মেলাওনি? সত্যি বলো, কত টাকা কামিয়েছ তোমরা দু'জনে আমার দুষমনদের খুরাক হাজত্-রফাই করে?

মানিকচাঁদের মাথাটা আস্তে আস্তে হেঁট হয়ে এল।

—এত টাকা কামিয়ে তোমরা কার নিমকহারামী করলে মানিকচাঁদ? আমার, না হিন্দুস্থানের, না খুদাতালার? বলো বলো—

সমস্ত মতিঝিল, সমস্ত আম-দরবার হতবাকের মত স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে রইলো নবাব মীর্জা মহম্মদের করুণ মুখখানার দিকে।

—এ হিন্দুস্থান কি আমার একলার মানিকচাঁদ? না আলীবর্দী খাঁর, না দিল্লীর শাহেন শা বাদ্শাজাদার? এ তো কারো একলার তালুকদারি নয়! এ তোমার আমার খিলাফত্-ই-খুদার! তোমরা কার সর্বনাশ করলে? আমার, না তোমার? না তামাম হিন্দু-মুসলমানের? যাদের আমি কলকাতা থেকে মেরে তাড়িয়ে দিয়েছি, তাদের তুমি আবার ডেকে আনলে টাকার লোভে? এত তোমার টাকার লোভ? কলকাতার সুবাদারি পেয়েও তোমার টাকার লোভ মিটলো না?

এতক্ষণে মানিকচাঁদ সাহস করে আবার মুখ তুললো।

বললে—জাঁহাপনা আমার ওপর অবিচার করছেন, জাঁহাপনা হয়তো ভুল খবর পেয়েছেন!

—ভুল খবর?

মানিকচাঁদ বললে—নিজামতের চররা লোকের মুখের ভুল খবর জাঁহাপনাকে জানিয়েছে!

—নিজামতের চর নয় মানিকচাঁদ।

—তবে কে জানিয়েছে, জিজ্ঞেস করতে পারি কি জাঁহাপনা?

নবাব বললে—সে খত্ আমার কাছে রয়েছে—এই চিঠিতেই সব লেখা আছে—

—ও কার চিঠি জাঁহাপনা?

—উমিচাঁদের!

আবার থম্ থম্ করে উঠলো আম-দরবার! আবার খানিকক্ষণের জন্যে যেন বিহ্বল হয়ে রইলো মতিঝিল। কী বলবে ভেবে পেলে না কেউ।

—ও চিঠি তো জালও হতে পারে জাঁহাপনা!

—না, জাল নয়। সফিউল্লা খাঁ-র জেব থেকে পাওয়া গেছে এই খ্যাজদার খত্!

—কে পেয়েছে?

—পেয়েছে আমার বেগম। চেহেল্-সুতুনের বেগম!

—তিনি কী করে পেলেন এ চিঠি?

—সেই বেগমই খুন করেছে সফিউল্লাকে! সেই বেগমসাহেবার নাম মরিয়ম বেগম!

তারপর যেন বড় ঘৃণা হয়েছিল মীর্জা মহম্মদের। এই আমীর-ওমরাও সকলকে জুতো মেরে আম-দরবার থেকে বার করে দিতে ইচ্ছে হয়েছিল। হায় রে! এরাই তার আমীর। এদের পরামর্শ নিয়েই তিনি চালাচ্ছেন বাঙলা বিহার

উড়িষ্যার মসনদ! এদেরই খেতাব দিয়ে, খেলাত দিয়ে তিনি তোয়াজ করছেন। এরা নিমকও খাবে আবার হারামীও করবে। অথচ কাকে বিশ্বাস করবেন? মরবার সময় আলীবর্দী খাঁর চোখমুখ বড় করুণ হয়ে উঠেছিল মীর্জার কথা ভেবে। কাদের হাতে তুলে দিয়ে যাচ্ছেন তিনি তাঁর নাতিকে। দিল্লীর বাদশার দিন ফুরিয়ে গেছে। মসনদের চারপাশে শেয়াল-কুকুর-শকুনির ভিড়, আর ওদিকে ওত পেতে বসে আছে ফিরিঙ্গীরা। তামাম হিন্দুস্থান হয়তো শ্মশান করে দিয়ে তবে ছাড়বে!

—যাও, ভোরবেলা কলকাতা রওনা হবো!

সবাই মীর্জা মহম্মদের সামনে থেকে আড়ালে সরে গিয়ে যেন মুক্তি পেলে।

হঠাৎ নেয়ামতের গলার শব্দে চমক ভাঙলো।

—জাঁহাপনা, নানীবেগমসাহেবা আয়ি!

—নানীবেগমসাহেবা?

—জী জাঁহাপনা!

—একলা?

—না জাঁহাপনা, মরিয়ম বেগমসাহেবা ভি সঙ্গে আছে—

মীর্জা মহম্মদ আয়নার সামনে থেকে সরে এসে আম-দরবারের মাঝখানে দাঁড়ালো। বললে—দাও, এত্তেলা দাও—

মতিঝিল, মুরাদবাগ, মনসুরগঞ্জ—আজকে এ-সব শুধু স্বপ্নের নাম। স্বপ্নের সমষ্টি হয়ে ঔপন্যাসিকের কল্পনার আশ্রয় হয়ে উঠেছে। কিন্তু সেদিন সেই বিপ্লবের সন্ধিযুগে কে ভাবতে পেরেছিল দিল্লীর মোগল বাদশার অধীনে বাঙলার নগণ্য সুবাদারের একটা মসনদ নিয়ে সারা হিন্দুস্থানের ভাগ্যে এতবড় একটা বিপর্যয় ঘটে যাবে! কোথাকার কোন সাত-সাগর তের-নদীর পারের একটা তিরিশ বছরের বাপে-খেদানো মায়ে-তাড়ানো ছেলে এমনি করে হাজি আহম্মদের একমাত্র চোখের মণির চোখ থেকে ঘুম কেড়ে নেবে!

সমস্ত হিন্দুস্থানটাই যেন সেদিন বারুদখানা হয়ে উঠেছিল। বারুদের স্তূপ।

রাত্রে ঘুমোতে ঘুমোতে শুধু কি মীর্জা মহম্মদই শিউরে উঠতো? চেহেল্-সুতুনের অন্দরে বেগমদের যখন সারাফত আলির আরক খেয়ে দামী ঘুম কিনতে হতো, তখন মীর বক্সী, মীর মহম্মদ জাফর খাঁও তো ছট্‌ফট্ করতো এক ফোঁটা ঘুমের জন্যে। আর মীর মহম্মদ জাফর খাঁই বা একলা কেন? কে ঘুমোতে পারতো নিশ্চিন্ত মনে? হাতিয়াগড়ের ডিহিদার রেজা আলির ঘোড়া সেই ফিরিঙ্গিটা পর্যন্ত নিজের আস্তাবলে দাঁড়িয়ে পা ঠুকতো খট্ খট্ শব্দ করে। হাতিয়াগড়ে রাজবাড়ির অতিথিশালায় অতিথিরা পর্যন্ত ছট্‌ফট্ করতো নিজের মনে। বর্গীরা নেই, ভাস্কর পণ্ডিতরা আর আসে না পশ্চিম দিক থেকে। তবু ভয় কীসের জন্যে কে জানে! রাস্তায় একা একা চলতে ভয়, অচেনা লোকের সঙ্গে কথা বলতে ভয়। নদীতে নৌকো বাইতে ভয়।

তা ভয় করবে না?

কেউ বুঝতে পারে না, কেউ বোঝাতেও পারে না। তবু মনে হয় সকলের পায়ের তলার মাটিতে কোথাও যেন ফাটল ধরেছে। নিজামতের কাছারিতে গেলে টাকা না দিলে কেউ কথা বলে না। ঘরে বউ-ছেলেমেয়ে রেখে কোথাও যেতে ভরসা হয় না। প্রাণটাও যেন বেওয়ারিশ হয়ে গেছে গরু-ছাগল-মুরগীর মত। ওপরওয়ালা বলে একমাত্র যদি কেউ থাকে তো সে আছে। কিন্তু তাকে তো দেখা যায় না। তাহলে কোথায় যাই? কার কাছে গিয়ে নালিশ পেশ করি?

বুঝতে পেরেছিল শুধু ওই মেয়েটা। হাতিয়াগড়ে থাকতে অতটা বোঝা যায়নি, কিংবা তখন বয়েস কম ছিল বলে হয়তো বুঝতে পারেনি। কিন্তু মুর্শিদাবাদে আসার পর থেকেই দেখলে এ এক অরাজক দেশ। গাঁয়ে যতদিন ছিল মরালী ততদিন বাড়ি-বাড়ি ঘুরে দেখেছে। সেখানেও বুঝি এর চেয়ে বেশি নিয়ম-শৃঙ্খলা আছে। নিয়ম করে সূর্য ওঠে সে-সব সংসারে, আবার নিয়ম করে সূর্য ডোবে। কিন্তু মুর্শিদাবাদে নিয়ম-কানুনের বালাই নেই। নিয়ম যা আছে তা সেরেস্তা-কাছারির নথি-পত্রে। অথচ এই মুর্শিদাবাদে আসবার আগে কত ভয় করেছিল। কিন্তু এসে দেখলে এর বাইরেই শুধু বজ্র-আঁটুনি। ভেতরে ভেতরে ফস্কা গেরো। এখানে বসে যা-কিছু বেনিয়ম করা যায়, কেউ কিছু বলবার নেই। ইচ্ছে করলেই তো একদিন চেহেল্-সুতুন থেকে পালিয়ে যেতে পারতো সে। ওই কান্ত রয়েছে। ওকে একটু বললেই নিয়ে যায় এখান থেকে। কিন্তু চোখের সামনে যখন খাঁচার ফটকটা খোলা দেখলে তখন আর পালাবার উপায় রইলো না। মনে হলো পালিয়ে কোথায় যাবে? যেখানেই যাবে সেখানেই তো আবার তার জন্যে নতুন খাঁচা তৈরি হয়ে থাকবে। ওই মেহেদী নেসার, ওই ইয়ারজান, ওই সফিউল্লারা তো সারা দেশটাতেই ছড়িয়ে রয়েছে। ওই উমিচাঁদ, ওই মীরজাফর, ওই জগৎশেঠ, ওরা থাকতে পালিয়েই বা যাবে কী করে?

কান্ত বলেছিল—ওদের সঙ্গে কি তুমি পারবে মনে করেছো?

কান্তর মুখের দিকে চেয়ে একটু মায়া হয়েছিল মরালীর। ছেলেটার কিছু হবে না। কেন যে পড়ে আছে মুর্শিদাবাদে! চলে গেলেই পারে! আবার বিয়ে-থা করে ঘর-সংসার করবার চেষ্টা করলেই ল্যাঠা চুকে যায়।

কান্ত বলেছিল—তা আর হয় না!

—কেন? হয় না কেন?

কান্ত প্রথমে বলতে চায়নি। বলেছিল—তুমি তো ও-সব বিশ্বাস করবে না!

—কী সব?

—হাত দেখা!

হাত দেখা! হাত-দেখার কথা শুনে মরালী একটু কৌতূহলী হয়ে উঠেছিল।

—হাত-দেখা মানে? তুমি কাউকে হাত দেখিয়েছ নাকি? কী বলেছে সে?

কান্ত কিছুতেই বলতে চায় না। মরালী পীড়াপীড়ি করলে—বলো না, কী বলেছে, বলো না—

কান্ত বললে—তুমি যদি রাগ না করো তো বলি!

—না, রাগ করবো না, বলো।

কান্ত বললে—বলেছে, যার সঙ্গে আমার বিয়ে হবার কথা ছিল তার সঙ্গেই নাকি আমার আবার বিয়ে হবে!

—তার মানে?

কান্ত চুপ করে রইলো।
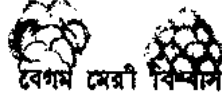
মরালী বললে—তার মানে আমার সঙ্গে? তুমি বুঝি সেই আশাতেই আমার পেছনে ঘুর ঘুর করছো? এই তোমার মতলব? ওসব মতলব থাকলে কিন্তু তোমাকে আর আমার কাছে আসতে দেবো না, তা বলে রাখছি।

কান্ত বলেছিল—না না, সত্যি বলছি মরালী, আমার সে-মতলব নেই। বিশ্বাস করো আমাকে, আমি সে-কথা বিশ্বাস করিনি—

মরালী বলেছিল—আচ্ছা, তুমি এখন যাও তো, তুমি এখন আমার সামনে থেকে যাও—

বলে কান্তকে জোর করে ঠেলে পাঠিয়ে দিয়েছিল মরালী। যেতে কি চায়! জোর না করলে হয়তো যেতই না। তাঞ্জামে করে চক-বাজার দিয়ে আসতে আসতে কান্তর কথাই বেশি করে মনে পড়েছিল তার।

নানীবেগম জিজ্ঞেস করেছিল—কী ভাবছিস মেয়ে?

মরালী বলেছিল—কিছু না—

নানীবেগম কিছুই বোঝে না। এতদিন নবাব আলীবর্দী খাঁর সঙ্গে সারা দেশ ঘুরে বেড়িয়েছে আর চেহেল্-সুতুনের ভেতরে নিজের বেগমগিরি ফলিয়েছে। বাইরের পৃথিবীতে যে কী ষড়যন্ত্র চলছে তার নাতির বিরুদ্ধে, তার খবরও রাখে না। জানে না যে, এমনি করে চললে তার চেহেল্-সুতুনও একদিন চলে যাবে, সঙ্গে সঙ্গে তার বেগমগিরিও চলে যাবে।

নেয়ামত ডাকতেই মরালী এগিয়ে গেল। পেছনে নানীবেগম। আজ আর কোনো ভয় করলো না মরালীর নবাবের সামনে যেতে। আজ আর কোনো সঙ্কোচও হলো না।

নানীবেগমই প্রথম কথা বললে—তুই নাকি আবার লড়াই করতে যাচ্ছিস মীর্জা?

—হ্যাঁ নানীজী!

—তা তুইও কি তোর নানার মত কেবল লড়াই করেই জিন্দ্গী কাটাবি?

—নবাবী রাখতে গেলে তাই-ই হয়তো করতে হয় নানীজী!

মরালী এবার মুখ তুললো। বললে—জাঁহাপনা আমার কসুর মাফ করবেন। নানাজী তো লড়াই করেছিল ডাকাতদের সঙ্গে, মারাঠা ডাকাত। জাঁহাপনা কার সঙ্গে লড়াই করতে যাচ্ছেন?

নবাব বললে—এরা মারাঠা ডাকাতদের চেয়েও বদমাস্, তার চেয়েও শয়তান এরা—

—কে জাঁহাপনাকে বললে সে-কথা? জাঁহাপনা কি তাদের সঙ্গে কথা বলেছেন?

নবাব মরালীর কথায় যেন ক্ষুণ্ণ হলো। বললে—তোমার তো খুব সাহস বেগমসাহেবা! তুমি কার সঙ্গে কথা বলছো তা জানো?

মরালী মাথা নিচু করে একবার কুর্নিশ করে নিলে। তারপর বললে—আমি গাঁয়ের মেয়ে, গেরস্ত ঘরের বউ, আমার যদি কিছু বেয়াদপি হয়ে থাকে, জাঁহাপনা আমাকে ক্ষমা করবেন!

—কী বলছিলে বলো, আমার বেশি কথা বলবার সময় নেই।

নানীবেগম বললে—কোনো দিনই তো তোর সময় হবে না মীর্জা। তোর জন্যে সবাই চেহেল্-সুতুনে আমরা বসেছিলুম। আমি নিজে বাবুর্চিখানায় গিয়ে তোর মুরগী-মশল্লাম খানার বন্দোবস্ত করেছিলুম। হঠাৎ শুনলুম মানিকচাঁদের ডাকে তুই চলে এসেছিস—

মরালী বললে—আপনি সেই চিঠি পড়বার পরও মানিকচাঁদকে বিশ্বাস করছেন?

—বিশ্বাস!

হঠাৎ এক মুহূর্তের মধ্যে নবাব যেন ছেলেমানুষে পরিণত হয়ে গেল। সেই হাসিটার কথা মরালী জীবনে কখনো ভুলবে না। নবাব হেসে নানীবেগমের দিকে চেয়ে বললে—তোমার এই নতুন বেগমকে বুঝিয়ে বলো না নানীজী যে, মীর্জা মহম্মদ কাউকেই বিশ্বাস করে না। বুঝিয়ে বলো না যে, মীর্জা তার নিজের মাসিকে পর্যন্ত বিশ্বাস না করে তাকে ফাটকে পুরে রেখে দিয়েছে।' শুধু মাসি কেন, বলে দাও তোমার মীর্জা তার নিজের মা, নিজের বউ, নিজের ভাইকে পর্যন্ত কখনো বিশ্বাস করেনি। নিজের ভাইকে সে এই সেদিন খুন করে এসেছে। এখনো তার হাতের রক্ত শুকোয়নি। বলো না নানীজী, ভালো করে বুঝিয়ে বলো না বেগমসাহেবাকে। বেগমসাহেবা তো নতুন এসেছে, তাই এখনো জানে না তোমার মীর্জাকে—

মরালী বললে—আমি জানি জাঁহাপনা, সব জানি। জানি বলেই তো জাঁহাপনার হুকুম ছাড়াই এখানে এসেছি!

—তা আমি লড়াইতে যাই এটা তুমি চাও না, না?

মরালী বললে—হ্যাঁ—

নানীবেগম বললে—আমিও তো সেই কথাই তোকে বলতে এসেছি মীর্জা—

—কিন্তু কই, আমার মা, আমার মাসি তারা তো কেউ বারণ করতে এল না। তারা কি কেউ আমাকে ভালোবাসে না? তোমরাই শুধু আমাকে ভালোবাসো?

মরালী বললে—জাঁহাপনা, এ সংসারে কেউ কাউকেই ভালোবাসে না।

—সে কী? কী বলছো তুমি?

—আমি ঠিক কথাই বলছি জাঁহাপনা। ওটা কথার কথা। আমরা সবাই নিজেকেই ভালোবাসি। জাঁহাপনাই কি কাউকে কোনো দিন ভালোবেসেছেন? আমরা জাঁহাপনার বেগম। আমাদের সকলের মুখ কি কোনো দিন জাঁহাপনা ভালো করে দেখেছেন? আমাদের কথা ছেড়েই দিন, জাঁহাপনা কি লুৎফুন্নিসা বেগমকেই কোনো দিন চিনতে চেষ্টা করেছেন?

মীর্জা মহম্মদ সিরাজ-উ-দ্দৌলা এই যেন প্রথম ভালো করে চেয়ে দেখলেন মরিয়ম বেগমের দিকে। এতদিন যেন আমলই দেননি এই মেয়েটাকে। এ মেয়েটা এত কথা শিখলো কেমন করে!

—এই যে আমি, এই যে নানীবেগমসাহেবা, এই আমরাই কি জাঁহাপনাকে ভালোবাসি বলে এত কথা বলতে এসেছি?

মীর্জা বললে—তাহলে এত রাতে কী জন্যে এসেছো তোমরা?

—এসেছি আমাদের নিজেদের স্বার্থেই। আমরা আমাদের ভালোর জন্যই এসেছি। আমাদের যাতে কোনো ক্ষতি না হয় তাই আমরা জাঁহাপনাকে লড়াই করতে যেতে বারণ করতে এসেছি!

—তা আমি লড়াই করতে গেলে তোমাদের কীসের লোকসান? আমি যদি হেরে যাই, সেই ভয়? আমি হেরে গেলে তোমাদের দেখবার কেউ থাকবে না, সেই লোকসান?

—না, তা নয়!

মরালী একটু থেমে আবার বললে—নবাব কি আপনিই প্রথম হয়েছেন? ত

তো নয়। আমি তো শুনেছি আপনার আগে আরো অনেক নবাব এসেছেন গেছেন। সবাই লড়াই করেছেন। কেউ হেরেছেন, আবার কেউ বা জিতেছেন। জীবনেরই যখন কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই, তখন লড়াইতে হার-জিত তো ছোট কথা। আমি তা বলছি না। আমি বলছি, জাঁহাপনার মত এমন করে শত্রু নিয়ে কেউ লড়াই করতে যায়নি আগে। আপনি কাদের ওপর ভরসা করে লড়াই করতে যাচ্ছেন? কে আপনার দলে? কারা জাঁহাপনার লোক? আপনার কে আছে? জাঁহাপনার আমীর-ওমরার মধ্যে কেউই তো নেই যে আপনার ভালো চায়।

মীর্জা মহম্মদ চুপ করে রইলো।

মরালী আবার বলতে লাগলো—যে মানিকচাঁদকে আপনি কলকাতার সুবাদার করেছিলেন, সেই মানিকচাঁদই ফিরিঙ্গীদের চাল-ডাল-আটা বিক্রি করে হাজার হাজার মোহর কামালে। আপনি চেয়েছিলেন ফিরিঙ্গীদের দেশ-ছাড়া করতে, আপনার ওমরাওরা তাদেরই আবার দেশের ভেতরে ডেকে আনলে। আপনি যাকে সব চেয়ে বিশ্বাস করেন, সেই উমিচাঁদও আপনার সর্বনাশ করবার জন্যে ফাঁদ পাতছে। আমার বে-আদপি মাফ করবেন জাঁহাপনা, আমি সফিউল্লা খাঁকে খুন না করলে এত কথা জানতেও পারতাম না, এত কথা বলতেও আসতাম না—

মীর্জা মহম্মদ নানীবেগমের দিকে চেয়ে বললে—নানীজী, তুমি বেগম-সাহেবাকে বুঝিয়ে বলো না যে, নবাবের কাছে এ-সব কথা নতুন নয়। নবাব সব জানে। একে বুঝিয়ে দাও যে, নবাবের মা, যে নবাবকে পেটে ধরেছে, সেও নবাবের ভালো চায় না! বলে দাও যে, বাঙলার নবাব শত্রু নিয়েই সংসারে জন্মেছে।

নানীবেগম বললে—সে-সব আমি মরিয়মকে বলেছি, এ সব শুনেছে, তবু তোর কাছে এসেছে, তুই আর কারো কথা না শুনিস এর কথা শোন-না বাবা—

মীর্জা যেন উত্তেজিত হয়ে উঠলো। বললে—এ-সব পুরোন কথা শুনে কী করবো? তবে কি বলতে চাও ওর কথা শুনে আমি সরফরাজ খাঁর মতন চেহেল্-সুতুনে গিয়ে বেগমদের সঙ্গে ফুর্তি করতে বসবো? বেগমদের ঠুংরি গান শুনে আর তয়ফাওয়ালীর নাচ দেখে দিন কাটাবো? চারদিকে শত্রু আছে বলে কপাল চাপড়ে কাঁদতে বসবো?

তারপর একটু থেমে আবার বলতে লাগলো—আর ভালোবাসার কথা বলছো? মহব্বতের কথা বলছো? সে যে পায় সে পায়! আমি মহব্বত পাইনি বলে খুদা-তালাকে গালাগালি দেবো? খুদাতালার সঙ্গে কাজিয়া করবো? আজ যদি আমি হিন্দুস্থানের খাতিরে ফিরিঙ্গীদের সঙ্গে মুকাবিলা করতে না যাই তো হিকায়াৎ আমাকে মাফ করবে? তারিখ-দান আমাকে ক্ষমা করবে?

মরালী খানিকক্ষণ চুপ করে রইলো। তারপর বললে—জাঁহাপনা কথা দিন, জাঁহাপনার সঙ্গে আমাকে যেতে দেবেন—

—তুমি আমার সঙ্গে যাবে?

—কেন, জাঁহাপনার সঙ্গে কি তয়ফাওয়ালীরা যায় না?

—তুমি কি তয়ফাওয়ালী?

—ধরে নিন জাঁহাপনা, আমি আপনার তয়ফাওয়ালী।

—কিন্তু তুমি আমার সঙ্গে গিয়ে কী করবে?

মরালী বললে—আমি জাঁহাপনার পাশে পাশে থাকবো—জাঁহাপনার যখন ভাবনায় ঘুম আসবে না, জাঁহাপনা যখন অশান্তিতে ছট্‌ফট্ করবেন, আমি তখন জাঁহাপনাকে একটু সান্ত্বনা দেবো, কিংবা জাঁহাপনা যখন দুষমনদের হারিয়ে ক্লান্ত

হয়ে পড়বেন, আমি তখন জাঁহাপনার মুখের সামনে সরবতের গাগরা তুলে ধরবো।
মীর্জা মহম্মদ বললে—তার জন্যে তো আমার বাঁদীই থাকবে!

—মনে করবেন না-হয় আমি জাঁহাপনার বাঁদীই!

মীর্জা মহম্মদ আরো কৌতূহলী হয়ে উঠলো। আরো ভালো করে দেখতে লাগলো মরিয়ম বেগমের মুখের দিকে।

বললে—কেন বলো তো? তুমি আমার জন্যে এতখানি করতে চাও কেন? তুমি কী চাও?

মরালী তেমনি মুখ তুলেই বললে—আমি কিছুই চাই না জাঁহাপনা।

—কিন্তু বাঙলার নবাবের জন্যে এতখানি দরদ তো ভালো নয়? তুমি কি শোনোনি লোকে আমার আড়ালে কী বলে? লোকের কথা বুঝি তোমার কানে যায়নি? যদি কানে না গিয়ে থাকে তো যাকে জিজ্ঞেস করবে সে-ই তোমাকে বলে দেবে যে আমি লম্পট, আমি চরিত্রহীন, আমি বদমাইস, আমি মেয়েমানুষবাজ! এর পরেও তুমি আমার সঙ্গে যাবে?

মরালী হাসলো নবাবের দিকে চেয়ে। বললে—আমি চেহেল্-সুতুনে এতদিন কাটালুম, লম্পট দেখলে আমার আর ভয় করে না জাঁহাপনা—আমি পাপের আড়তের মধ্যে বসে আছি, আমি জাঁহাপনার চরিত্রকে ভয় করি না—! জাঁহাপনার ভালোর জন্যে আমি জাহান্নমে পর্যন্ত যেতে রাজি আছি—

মীর্জা মহম্মদ এবার একটু চুপ করে রইলো। তারপর জিজ্ঞেস করলে—আসলে তুমি কে? তুমি কোত্থেকে এসেছো? আগে কী ছিলে? কোথায় ছিলে? দিল্লীর তোষাখানায়?

নানীবেগম বললে—না রে মীর্জা, ও হলো হাতিয়াগড়ের ছোট রাণীবিবি! ও হিন্দু! ওকে মেহেদী নেসার পরোয়ানা পাঠিয়ে চেহেল্-সুতুনে এনে তুলেছে!

মরালী নানীজীর কথা শেষ না-হতেই বললে—সে-কথা আমি এখন ভুলে গিয়েছি জাঁহাপনা। আমি এখন মরিয়ম বেগম। আমার আর অন্য কোনো নাম নেই—

—তুমি কি নিজের বাড়ি ফিরে যেতে চাও?

—আমি ফিরে গেলেও আমার বাড়ি আমাকে আর ফিরিয়ে নেবে না। আমি চেহেল্-সুতুনে এসে পতিত হয়ে গিয়েছি।

—তাহলে তুমি আর কী চাও বলো? কোথায় যেতে চাও? কার কাছে যেতে চাও? দেশে তোমার আর কে আছে বলো? কে তোমায় ফিরিয়ে নেবে?

—কেউ নেবে না। জাঁহাপনা যাকে একবার নিয়েছে চিরকালের মত তার ভবিষ্যৎ চলে গেছে! দুনিয়ার কোথাও তার ঠাঁই নেই!

—টাকা নেবে তুমি? আশ্রফি? মোহর?

—না, আমার কিছুই চাই না। আমি জাঁহাপনার কাছে কাছে থাকতে চাই শুধু! যত দিন বেঁচে থাকবো ততদিন জাঁহাপনার কাছে থাকবো, আর কিছুই চাই না!

মীর্জা মহম্মদ বললে—কিন্তু আমার কাছে থাকলে যে চিরকালের মত সুখের আশা জলাঞ্জলি দিতে হবে, তা পারবে?

—কিন্তু আমি তো সুখ চাই না জাঁহাপনা।

—মানুষ হয়ে জন্মিয়ে সুখ চাও না এ তো বড় তাজ্জব কথা। আমার বেগমদের মধ্যে এমন কথা তো আগে কখনো কারো মুখে শুনিনি!

মরালী বললে—জাঁহাপনা কি সকলের মনের কথা জানেন? সকলে কি জাঁহাপনার কাছে নিজেদের মন খুলে কথা বলে?

—তুমি তো অনেক কথাই জানো দেখছি!

মরালী বললে—অনেক কথা না-জানলে কি জাঁহাপনার কাছে সাহস করে এসেছি? অনেক কথা জানি বলেই তো এমন করে মন খুলে কথা বলছি! আমার শুধু একটা অনুরোধ জাঁহাপনা, যদি লড়াই করতেই যান তো আমাকে শুধু আপনার সঙ্গে যেতে দিন! তয়ফাওয়ালীরা যেমন যায়, বাঁদীরা যেমন যায়, বেগম-সাহেবারা যেমন যায়, এবার তাদের মত আমাকে জাঁহাপনার সঙ্গে যেতে দিন।

—তা হয় না!

—কেন হয় না জাঁহাপনা? আমি কি জাঁহাপনাকে সেবা করতে পারবো না?

মীর্জা মহম্মদ বললে—এবার সে লড়াই নয় বেগমসাহেবা, এবার সে-রকম লড়াই নয়। এবার ফিরিঙ্গীদের একেবারে হিন্দুস্তান-ছাড়া করে দিয়ে আসবো। যাতে তারা আর এখানকার নোনা মাটিতে শেকড় গজাতে না পারে!

হঠাৎ বাইরে যেন কীসের গোলমাল হলো। ভোর হয়ে এল নাকি? নাকি নবাবী ফৌজ কলকাতায় যাবার জন্যে তৈরি হয়ে এসেছে! কিন্তু কই, ভোরই যদি হবে ইনসাফ মিঞার নহবত বাজে না কেন?

নেয়ামত দৌড়তে দৌড়তে এসেছে—জাঁহাপনা, সরাবখানার খিদ্‌মদ্‌গারকে ধরেছি—

মীর্জা মহম্মদ বললে—কোতোয়ালের কাছে নিয়ে যা—এখন আমি ব্যস্ত আছি—

—জাঁহাপনা, তার সঙ্গে আর একজন ছিল, দুজনে লুকিয়ে লুকিয়ে কথা বলছিল সরাবখানায়!

—কে সে?

—আমি তাকে নিয়ে আসছি জাঁহাপনা—বলে নেয়ামত দৌড়ে বাইরে গেল। গিয়েই আবার সঙ্গে সঙ্গেই ফিরে এল দুজনকে নিয়ে। একজন বুড়ো মানুষ, তার সঙ্গে কান্ত!

মরালী দেখেই চমকে উঠেছে। কান্ত আবার এখানে এল কী করে!

—জাঁহাপনা, এ আমাদের সরাবখানার খিদ্‌মদ্‌গার, আর এ...

মীর্জা মহম্মদ ভালো করে চেয়ে দেখছিল কান্তর দিকে। যেন চেনা-চেনা লাগছিল। মরালীও অবাক হয়ে গিয়েছিল। নানীবেগমসাহেবাও কান্তর দিকে চেয়ে দেখছিল। এই ছেলেটাকেই তো চেহেল্‌-সুতুনে মরিয়ম বেগমের ঘরে সন্ধ্যে বেলা দেখেছিল!

—জাঁহাপনা, এর নাম ইব্রাহিম খাঁ। আর এ হলো কাফের। এই কাফেরটার সঙ্গে এ সরাবখানার ভেতরে গুজগুজ ফিসফিস করে কথা বলছিল!

মীর্জা মহম্মদ দুজনের দিকে চেয়েই কেমন যেন তাদের মনের ভেতরের মতলব বার করবার চেষ্টা করলে।

—জাঁহাপনা, এই ইব্রাহিম খাঁর মতলব ভালো নয়। বাইরের আদমির সঙ্গে বাত্‌চিত করে, চক-বাজারে গিয়ে শলা-পরামর্শ করে, মুরাফত আলির আদমি বাদ্‌শার সঙ্গে...

ইব্রাহিম খাঁ আর পারলে না। মরিয়ম বেগমের দিকে হাউ-হাউ করে কেঁদে ফেললে—মা, তুমি আমাকে বাঁচাও মা, আমি বুড়ো মানুষ! আমাকে তুমি চিনতে

পারবে না মা—আমি সেই সচ্চরিত্র পুরকায়স্থ মশাই, আমার পিতা ইন্দীবর ঘটক, পিতামহ ঈশ্বর কালীবর ঘটক...

মরালী চমকে উঠলো। বললে—আপনি সেই ঘটক মশাই?

—হ্যাঁ মা, আমি এই কান্ত-বাবাজীর সঙ্গে একটু কথা বলছিলাম, এরা আমাকে ধরে এনেছে।

মরালী কান্তর দিকে চাইলে আবার—আর তুমি? তুমি আবার কী করতে এসেছিলে এখানে?

—তোমার জন্যে!

—আবার তুমি এসেছো? আমি বলেছি না, আমি ডাকলে তবে আসবে! কেন এলে?

মীর্জা এতক্ষণ সব শুনছিল। মরিয়ম বেগমের দিকে চেয়ে বললে—তুমি এদের চেনো নাকি?

—হ্যাঁ জাঁহাপনা।

—এ আমার বিয়ের সময় ঘটকালি করেছিল জাঁহাপনা। আগে হিন্দু ছিল। আমি প্রথমে চিনতে পারিনি, নবাবের কোনো ক্ষতি করবার ক্ষমতা এর নেই জাঁহাপনা।

—আর এ?

—এর কথা আমি পরে বলবো। ওরা আগে চলে যাক—

মীর্জা মহম্মদ ইঙ্গিত করতেই নেয়ামত দুজনকে নিয়ে বাইরে চলে গেল।

মরালী আবার বললে—এর জন্যেই আমি জাঁহাপনাকে বলতে এসেছিলাম।

—ওর সঙ্গে তোমার কীসের সম্পর্ক?

—কোনো সম্পর্ক নেই জাঁহাপনা। একদিন ওর সঙ্গেই আমার বিয়ে হবার কথা হয়েছিল। কিন্তু হয়নি! তারপর চেহেল্-সুতুনে আসবার সময় ও-ই আমাকে পাহারা দিয়ে নিয়ে এসেছিল।

—কিন্তু এখনো কেন তোমার কাছে আসে?

—ও আমার ভালো চায়!

—তোমার ভালো চেয়ে ওর লাভ?

মরালী বললে—ভালো চাওয়া যার স্বভাব সে লোকের ভালোই চাইবে, লাভ-লোকেসানের কথা ভাববে না। এই আমি যেমন জাঁহাপনার ভালো চাই—

—ওর সম্বন্ধে তুমি কী বলতে এসেছিলে?

—জাঁহাপনা, আমার একটি শুধু আর্জি, জাঁহাপনার সঙ্গে যদি আমাকে না যেতে দেন তো ওকে জাঁহাপনার সঙ্গে যেতে দিন, ও জাঁহাপনাকে মদৎ দেবে, ও জাঁহাপনার সেবা করবে। ও জাঁহাপনার পাশে পাশে থাকবে, জাঁহাপনার কোনো ক্ষতি না-হয় তাই দেখবে। ও জাঁহাপনার...

—কিন্তু তার জন্যে তো অন্য লোক আছে!

মরালী বললে—এর পর আমি আর কাউকেই বিশ্বাস করি না জাঁহাপনা। ও কাছে থাকলে আমি তবু নিশ্চিন্ত হবো, নইলে এই চেহেল্-সুতুনে বসে বসে আমার ভাবনায় দিন কাটবে না।

মীর্জা মহম্মদ নানীবেগমসাহেবার দিকে চাইলে এবার।

—নানীজী, তবে যে তুমি বলেছিলে আমাকে কেউ ভালোবাসে না। এই তো একজন রয়েছে যে আমার ভালো চায়, যে আমার জন্যে ভাবে—

নানীবেগম কথা বলবার আগেই নহবতখানায় ইনসাফ মিঞার নহবতে টৌড়ির সুর বেজে উঠলো। সুরটা শুনেই যেন সবাই সচেতন হয়ে উঠেছে।

মীর্জা মহম্মদ বললে—তোমার কথাই রইলো বেগমসাহেবা, ও থাকবে আমার সঙ্গে, কিন্তু তোমরা এখন যাও, আমায় তৈরি হতে হবে—আমি এখনি হুকুমত জারি করে দিচ্ছি—

তারপর ডাকলে—নেয়ামত!

ততক্ষণে মরালী নবাবকে কুর্নিশ করে আম-দরবার থেকে বেরিয়ে এসেছে। নানীবেগমও বেরিয়ে এসেছে মরালীর পেছন-পেছন। চবুতরার ওপরে তাঞ্জাম দাঁড়িয়ে ছিল। দু-জোড়া হাতীও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পায়ে তাল ঠুকছিল।

মুর্শিদাবাদের আকাশের পুব দিকটায় তখন অন্ধকার পাতলা হয়ে এসেছে। পাতলা হয়ে এসেছে মোগল ঐশ্বর্যের শেষ আড়ম্বরের গাঢ় রঙ। নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলা তখনো জানতো না যে এবারে যে সূর্য পুব দিক থেকে উঠছে সে অন্যদিনের চেয়েও প্রখর, অন্যদিনের চেয়েও উজ্জ্বল। ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে যে সভ্যতা আরব-সমুদ্র পেরিয়ে হিন্দুস্তানে এসে আসন গাড়তে এসেছিল সে অন্য রকম। হিন্দুস্তানের পশ্চিম আকাশে তার আবির্ভাব একদিন অমোঘ হয়েছিল বলেই এ-দেশের মানুষ নিজের অর্থ, নিজের ঐশ্বর্য, নিজের গৃহলক্ষ্মীকে পর্যন্ত তার পায়ে জলাঞ্জলি দিয়েছিল। কিন্তু এবার আর অত সহজে ওদের ক্ষিধে মিটবে না। এবার যে আসছে সমস্ত পৃথিবী তার মুঠোর মধ্যে চাই। আগে যারা এসেছিল তারা এখানকার মসনদ নিয়েছিল, এবার এরা নেবে মুনাফা। কারবারের মুনাফা, মসনদের মুনাফা আর মনুষ্যত্বের মুনাফা নিয়ে তবে এরা হিন্দুস্তানকে রেহাই দেবে।

তাঞ্জাম যখন মতিঝিলের ফটক পেরিয়ে আবার চক-বাজারের রাস্তায় পড়লো তখন নবাবী ফৌজ তৈরি হয়ে নিয়েছে। সেই ভোরবেলাই নহবতের টৌড়ির রাগের সঙ্গে ফৌজি কাড়া-নাকাড়ার খাদ মিশে তুমুল হট্টগোল শুরু করে দিয়েছে। আর সারা মুর্শিদাবাদ সেই হট্টগোলেই ঘুম ভেঙে জেগে উঠেছে।

ছোটমশাই-এর বজরা যখন বরানগরের ঘাটে পৌঁছল তখন বিকেল হয়ে গেছে। শীতকাল। জঙ্গুলে জায়গা, আশেপাশে কোথাও কোনো লোকজনের দেখা নেই, কোথায় ফিরিঙ্গী কোম্পানীর কর্নেল সাহেবের ছাউনি তাও জানা নেই। ছোটমশাই বজরা থেকে নেমে ঘাটে উঠলেন। ঘাটের ওপরেই একটা ভাঙা পোড়ো মন্দির। এককালে ওলন্দাজরা ছিল এ জায়গাটায়। ইংরেজ-ফিরিঙ্গীরা আসার পর তারা হুগলীর দিকে চলে গিয়েছে।

রাস্তায় চলতে চলতে একজনের সঙ্গে দেখা হলো।

ছোটমশাই জিজ্ঞেস করলেন—ওগো, ও মশাই—

লোকটা কাছে এল। ছোটমশাই জিজ্ঞেস করলেন—এখানে ফিরিঙ্গী কোম্পানীর ছাউনিটা কোথায় বলতে পারো? পল্টনরা থাকে?

লোকটা বললে—আজ্ঞে, আরো পোটাক রাস্তা পেরোতে হবে—

—সেখানে ক্লাইভ বলে একজন ফিরিঙ্গী ফৌজী বড়সাহেব থাকে?

লোকটা বললে—তা জানিনে হুজুর—থাকতে পারে!

—তা তোমরা এতদিন এখেনে আছো, আর ফিরিঙ্গী ফৌজের খবর রাখো না!

—না হুজুর, আমরা ও-সব খবর রাখবো কী, ফিরিঙ্গীদের মাল কেনা-বেচা করতে মানা করে দিয়েছে সরকার!

বলে লোকটা যেদিকে যাচ্ছিল সেইদিকেই চলে গেল। চাষী লোক, হাতে একটা পাঁচন-বাড়ি। সাপ-খোপের ভয়ে পাঁচন-বাড়ি নিয়ে পথ চলছে। আরো ওদিকে লম্বা আকাশ-ছোঁয়া ধান ক্ষেত। নতুন ধান বুনেছে গাঁয়ের লোকেরা।

ছোটমশাই যেন দিশেহারা হয়ে গেলেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র যে নিশানা দিয়েছিলেন সেই নিশানা ধরেই চলেছিলেন। কিছু দূর গিয়েই মনে হলো অনেক-গুলো গোলপাতায় ছাওয়া চালাঘর। ওইগুলোই বোধহয় ফৌজী ছাউনি। ফিরিঙ্গীদের পল্টন-লস্করেরা বোধহয় ওইখানেই থাকে। কিন্তু কাছে গিয়ে কারোর দেখা পেলেন না। সব ফাঁকা পড়ে আছে। ঘর-দোর নির্জন। মাটির এ'টো হাঁড়ি-কুঁড়ি ভাঙাচোরা অবস্থায় ছড়িয়ে আছে। গেল কোথায় সব! ঘর-দোর সমস্ত ছেড়ে গেল কোথায় সব! দু'চারটে কুকুর ভাতের লোভে ছোঁক ছোঁক করে ঘুরে বেড়াচ্ছে এখানে-সেখানে। ছোটমশাইকে দেখে একটু বোধহয় ভয় পেল। তারপর আবার এ'টো ভাতের হাঁড়ি চাটতে লাগলো।

ওদিক থেকে আর একটা লোক আসছিল।

ছোটমশাই তাকেও ডাকলেন—ওগো, ও মশাই, শুনছো—

লোকটা পাগলা-কছমের বলে মনে হলো। কাছে এসে বললে—আমি মশাই নই গো, মশাই নই আমি।

—তবে তুমি কে?

—এজ্ঞে আমি হরির দাস উদ্ধব দাস!

—তুমি ফিরিঙ্গী-পল্টনের লোক?

—না বাবুমশাই, ফিরিঙ্গী-পল্টনের লোক হতে যাবো কোন্ দুঃখে? আমি হরির লোক।

—কোন্ হরি?

—এজ্ঞে শ্রীহরি পতিতপাবন ভগবান। শ্রীহরির নাম শোনেননি বাবুমশাই? আমি তাঁরই লোক। আপনি কার লোক?

ছোটমশাই বুঝলেন লোকটা পাগল। বেশি ঘাঁটাতে চাইলেন না। শুধু বললেন—তুমি এখেনে কী করতে এসেছো?

—এজ্ঞে, আমার বউ এখেনে আছে, তারই সন্ধানে এসেছি।

—তোমার বউ? এই পল্টনের ছাউনিতে তোমার বউ এল কেমন করে?

উদ্ধব দাস বললে—আমার বউই তো আমার বালাই বাবুসাহেব—

—বালাই? তার মানে?

উদ্ধব দাস বললে—তবে শুনুন একটা ছড়া বলি—

ভূতের বালাই রাম।
যোগীর বালাই কাম॥
পথের বালাই টাকা।
পিঁপড়ের বালাই পাখা॥
সতীর বালাই সজ্জা।
ভিখিরির বালাই লজ্জা॥

ব্যাঙের বালাই সর্প।
বলীর বালাই দর্প॥
সেপাই-এর বালাই ডর।
সকলের বালাই পর॥
নন্দের বালাই হর।
ইংরেজের বালাই জ্বর॥
মৌমাছির বালাই মউ।
আর, আমার বালাই বউ॥

বলে উদ্ধব দাস হা হা করে হেসে উঠলো। সেই নির্জন নিরিবিলি বিকেল বেলায় পাগলাটার হাসিটা যেন প্রতিধ্বনি হয়ে আবার ছোটমশাইএর কাছেই ফিরে এল।

—তা এখানে কর্নেল ক্লাইভ সাহেবের ডেরাটা কোথায় বলতে পারো?

উদ্ধব দাস বললে—ওই তো, ওইটে। ওই ফিরিঙ্গী সাহেবটাই তো আমার বউটাকে তার বাড়িতে রেখে দিয়েছে বাবুমশাই, সাহেবটা এজ্ঞে খুব ভালো লোক, আমার বউই আমার কাছে আসতে চায় না।

—কেন? আসতে চায় না কেন?

—আমাকে পছন্দ হয় না বাবুমশাই। আমি যে কুরূপ!

ছোটমশাই আর বেশি কথা না বলে কর্নেল সাহেবের ডেরার দিকেই এগোতে লাগলেন। বেশ খড়ের চালের বাড়ি। চালের ওপর লাউডগা লক্ লক্ করে লতিয়ে উঠেছে। উদ্ধব দাসও ছোটমশাই-এর পেছন-পেছন চলতে লাগলো।

পলাশীর যুদ্ধের পরে একদিন বাগানবাড়ির বারান্দায় বসে গড়গড়া টানতে টানতে কর্নেল রবার্ট ক্লাইভ বেঙ্গলে আসার পর থেকে সমস্ত ঘটনাগুলো মনে মনে আলোচনা করে দেখেছিল। বেশি বয়েস হলেই হয়তো অতীত জীবনটা ঝালিয়ে নিতে ইচ্ছে করে। তখন মনে হয় এতদিন এই পৃথিবীতে বেঁচে থেকে করলুম কী! এক-একটা যুদ্ধ করেছি আর ইন্ডিয়ানদের খুন করেছি। নিজের লোকও কিছু খুন হয়েছে। কিন্তু কার জন্যে এ সব করলাম? এতে কার কী লাভ হলো? আমি কার লাভ চেয়েছিলাম? আমার নিজের, না ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর, না ইন্ডিয়ার? সেদিন ইন্ডিয়ার ম্যাপটাই চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল কর্নেল ক্লাইভের।

সত্যিই, সেদিন যখন খবর এল নব্যাব সিরাজ-উ-দ্দৌলা ত্রিবেণী পর্যন্ত এসে গেছে, তখন আর ভাববারও সময় ছিল না।

তাড়াতাড়ি ছাউনি থেকে ফিরে এসেই ডাকলে—হরিচরণ!

হরিচরণ ছিল না। দুর্গা বেরিয়ে এল। বললে—কী বাবা, হরিচরণ তো নেই—

সাহেব বললে—দিদি, এদিকে একটা ডেঞ্জার হয়েছে, নবাব আসছে কলকাতায়, আমি তো ফৌজ নিয়ে নবাবের মোকাবিলা করতে যাচ্ছি—

—তার মানে? তুমি আর ফিরবে না?

—ফিরবো না তো বলিনি। বলছি নবাবের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করতেই হবে এবার। আর ঠেকানো গেল না। কিন্তু তোমাদের কথা ভেবেই একটু অস্থির হচ্ছি—

—কোথায় লড়াই হবে! এখেনে নাকি?

যে-রবার্ট ক্লাইভকে ফৌজের লোকেরা এত ভয় করে, যে-রবার্ট ক্লাইভের নামে মুর্শিদাবাদের নবাব-নিজামত পর্যন্ত থর-থর করে কাঁপে, যার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে আমীর-ওমরাওরা পর্যন্ত নিজেদের মধ্যে লুকিয়ে-লুকিয়ে পরামর্শ করে, সুদূর করমণ্ডল উপকূল থেকে শুরু করে বাঙলার প্রত্যন্ত প্রদেশ পর্যন্ত যে-রবার্ট ক্লাইভের নাম ছড়িয়ে গেছে অত্যাচারের প্রতিভূ হিসেবে, সেই লোকটাই যখন আবার দুর্গার সামনে দাঁড়ায়, ছোট বউরানীর কাছে আসে, তখন সে যেন একেবারে ঘরের ছেলে হয়ে যায়।

—তাহলে আমি চললুম দিদি, তোমরা এখানে থাকতে পারবে তো?

—কিন্তু সায়েব, তুমি যদি আর না ফেরো?

—ফিরবো না মানে?

—বলা তো যায় না কিছু বাবা, গুলি-গোলা নিয়ে লড়াই করতে যাচ্ছো, মারা যেতে কতক্ষণ!

সাহেব হেসে উঠলো—আমি অত সহজে মরবো না দিদি, মরলে অনেক আগেই মরে যেতুম। দু'-দু' বার পিস্তল ছুঁড়েছি নিজের বুক লক্ষ্য করে, তবু যখন মরিনি তখন আর মরবো না—আমি চলি দিদি—

দুর্গা অবাক হয়ে গেল। বললে—তুমি চললে কী গো, তাহলে আমরা কোথায় যাবো? এখানে আমাদের দেখবার কে থাকবে?

সাহেব বললে—তাহলে না-হয় আমার সঙ্গে চলো!

—তোমার সঙ্গে কোথায় যাবো গো? তোমরা তো লড়াই করবে, তোমাদের সঙ্গে আমরাও কি লড়াই করতে গিয়ে মরবো নাকি? তার চেয়ে আমাদের বাপু যেমন করে হোক হাতিয়াগড় পেঁীছে দাও, মরতে হয় আমরা নিজের দেশে গিয়ে মরবো।

সাহেব বললে—হাতিয়াগড়ে এখন এই অবস্থায় তোমাদের পাঠাই কী করে? কোন রাস্তায় কখন কী হয় কে বলতে পারে?

তারপর একটু ভেবে বললে—তার চেয়ে আমাদের তো পল্টন-লস্কর-সেপাইরা সব যাচ্ছে, আমাদের সঙ্গেই চলো, রাস্তা-ঘাট ঠিক আছে বুঝলে তোমাদের দেশে পাঠিয়ে দেবো—

—তোমরা কদ্দূর যাবে?

—তা কি আগে থেকে বলতে পারা যায় দিদি, নবাব তো ত্রিবেণী পর্যন্ত এসে গেছে, আমরাও পল্টন নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি, যেখানে মোলাকাত হয় সেখানেই লড়াই বেঁধে যাবে।

দুর্গা সব শুনে একটু ভাবলে। বললে—তারপর?

—তারপরের কথা আমিও জানি না, কেউই জানে না। এখানে তোমরা একলা থাকার চেয়ে তো সেই ভালো! এখানে সেদিন কী কাণ্ডটা হয়েছিল বলো তো! আমি সেই সময়ে না এসে পড়লে সেই স্পাইটা তো তোমাদের সর্বনাশ করতো!

—সে লোকটার শেষ পর্যন্ত কী হলো বাবা?

সাহেব বললে—কী আর হবে, স্পাইটাকে গুলী করে মারলুম!

দুর্গা চমকে উঠলো—জ্যান্ত লোকটাকে গুলী করে মারলে তোমরা?

—তা মারবো না! ও যে স্পাই দিদি!

—কী সর্বনাশ, গুলী করতে তোমাদের একটু বাধলো না গো?

সাহেব হেসে উঠলো। বললে—কত হাজার-হাজার লোককে গুলী করে মেরেছি এই হাত দিয়ে তা তো গুণে রাখিনি!

—কী করে মারো বাবা তোমরা? তোমাদের প্রাণে একটু মায়া-দয়া নেই! মারতে হাত কাঁপে না তোমাদের? তোমার চেহারা দেখে তো বাপু বোঝা যায় না তুমি আবার লোক খুন করতে পারো!

সাহেব বললে—আমি তাহলে আসি দিদি, তোমাদের জন্যে সব ব্যবস্থা করে আমি লোক পাঠিয়ে দিচ্ছি, হরিচরণ এলেই তোমরা তার সঙ্গে চলে যাবে—

তা এমনি করেই সেদিন হঠাৎ আস্তানা গুটিয়ে নিয়ে ক্লাইভকে চলে যেতে হয়েছিল বরানগর ছেড়ে। সে সব ক্লাইভের মনে ছিল। সে দিনগুলো স্মৃতির খাতায় চিরকাল জ্বল-জ্বল করতো কর্নেল ক্লাইভের। বিকেল-বিকেল রওনা দিয়েছিল পল্টনরা। ক'টাই বা পল্টন। নবাব যদি ইচ্ছে করে তো পিষে মেরে ফেলতে পারতো সে ক'জনকে। দল বেঁধে সার সার পল্টনরা চলেছে। পল্টনদের দেখে গাঁ থেকে দলে-দলে লোক পালাচ্ছে। ক্ষেত-খামার ছেড়ে লোকগুলো সব কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গেল।

গরুর গাড়ির ভেতরে বসে ছোট বউরানী বাইরের দিকে চেয়ে দেখেছিল। গাঁ-গঞ্জে কেউ কোথাও নেই। শীতকালের বেলা। দেখতে দেখতে অন্ধকার হয়ে আসে। চারদিক দেখলে ভয় হয়।

দুর্গা সাহস দিলে। বললে—ভয় কী? আমি তো সঙ্গে রয়েছি—

বউরানী বললে—আমি তো আর ভরসা পাচ্ছিনে দুগ্গা—কোথায় কোথায় সাহেবের সঙ্গে ঘুরছি বল দিকিনি—আবার কোথায় আমাদের নিয়ে যাচ্ছে কে জানে! একটা মেয়েছেলের মুখ পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছিনে, সব পল্টন—

—তা মেয়েছেলে না-ই বা রইলো, আমি তো আছি, সাহেব তো আছে!

বউরানী বললে—সায়েবই বা কোথায়, তার তো টিকিই দেখা যাচ্ছে না—

তা বরানগর থেকে বাগবাজার কি কম রাস্তা! কেবল বন-জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যাওয়া। গাড়ির ছইএর ভেতর পর্দা দিয়ে ঢাকা। গাড়োয়ানের মুখখানা পর্যন্ত দেখা যায় না। চলতে চলতে এক-জায়গায় গিয়ে গাড়ি থামলো।

—এ কোথায় নিয়ে এলো গো আমাদের? ও দুগ্গা, এ যে জঙ্গল রে—

দুর্গাও তখন পর্দাটা তুলে বাইরে চেয়ে দেখছে। তখন রীতিমত ঘুটঘুটে রাত। গাড়িটা থামতেই হরিচরণ এল। বললে—নেমে পড়ো দিদি, নেমে পড়ো—

—এ আমাদের কোথায় নিয়ে এলে হরিচরণ? এখেনে কোথায় থাকবো?

হরিচরণ বললে—কেন? এ তো বাগবাজারের পেরিন সাহেবের বাগান, এখেনে তোমাদের কোনো ভয়-ডর নেই, ঘর-দোর সব আছে, চান করা খাওয়া-দাওয়ার সব বন্দোবস্ত আছে।

—আর তোমার সায়েব?

—সায়েব খুব ব্যস্ত দিদি! পল্টনরা সব সেজে-গুজে তৈরি হয়ে নিচ্ছে, লড়াই হবে কি না?

দুর্গার মাথাটা ঘুরে গেল। বললে—লড়াই হবে কি গো! লড়াই হলে আমরা যাবো কোথায়?

মনে হলো হরিচরণও যেন বেশ ভয় পেয়েছে। সেও যেন বেশ ভাবনায় পড়েছে। তবু নামতে হলো বাগানে। পেরিন সাহেবের বাগানে ঘর-দোর অনেক। এককালে পল্টন-লস্কর সব থাকতো। এখানেই আগে একদিন বড় রকমের একটা লড়াই হয়ে গেছে। বড় বড় সব গাছ চারদিকে। পাশেই গঙ্গা। ইচ্ছে করলে রোজ গঙ্গাস্নান করতে পারবে ওরা।

দুর্গা আর বউরানী একটা ঘরে গিয়ে ঢুকলো। ঘরটা একেবারে একটেরে। ওদিকের পল্টনদের হইচই কানে আসে না। হরিচরণ বললে—তোমরা একটু বোস এখেনে, আমি তোমাদের খাবার-দাবারের বন্দোবস্ত করে আসছি—

কিন্তু তবু যেন হরিচরণের কথায় বিশ্বাস হলো না। কোথায় নবাবের সঙ্গে এরা যুদ্ধ করবে, তা নয়, মেয়েমানুষ নিয়ে এদের আর এক বিড়ম্বনা।

সত্যিই বিড়ম্বনা। বাগানের ভেতর আর একখানা বন্ধ ঘরে তখন ক্লাইভ আর-একজনের সঙ্গে চুপি-চুপি কথা বলছে।

লোকটার পায়েও জুতো নেই। গায়ে শুধু একটা উড়ুনী। মাথার পেছন দিকে একটা টিকি!

—তোমার কী নাম বললে?

—হুজুর, নবকৃষ্ণ!

নবকৃষ্ণ! নবকৃষ্ণ! ক্লাইভ যেন নামটা উচ্চারণ করে নিজের জিভটাকে সড়োগড়ো করতে চাইলে। লোকটার দিকে আবার ভালো করে চেয়ে দেখলে। গরীব লোক। লোকটার জীবনের ইতিহাস শুনেও অবাক হয়ে গেল ক্লাইভ।

—হ্যাঁ হুজুর, সাহেবদের কোম্পানীতে কাজ করতে আমার বড় সাধ! আমার বড় সাধ আমি কোম্পানীর সেবা করি!

—কত টাকা মাইনে চাও?

—আজ্ঞে, হুজুরদের শ্রীচরণে আশ্রয় পেলেই আমি ধন্য হয়ে যাবো, আমি মাইনে চাই না।

অদ্ভুত লোকটা। রবার্ট ক্লাইভ যেন লোকটার মধ্যে নিজেকেই দেখতে পেয়েছিল সেদিন। তারই মত একটা অনাথ ছেলে। ত্রিভুবনে কেউ নেই। শুধু নিজের পায়ে মাটির ওপর দাঁড়াবার মত একটা আশ্রয় পেলেই খুশী। সুতোনুটির গঙ্গার ঘাটে কোম্পানীর জাহাজগুলো পাল তুলে এসে থামে, আর ছেলেটা ঘাটের কাছে এসে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। সাহেবদের জাহাজ থেকে নামতে দেখলেই সেলাম করে, গুড মর্নিং করে। কেউ যদি কোনো রকমে একটা চাকরি দেয় কোম্পানীর দফ্‌তরে তো খেতে-পরতে পায়!

—তারপর?

যেন রবার্ট ক্লাইভের নিজের সঙ্গেই মিলে যাচ্ছিল। এই লোকটাই পারবে। একে দিয়েই কাজ উদ্ধার হবে। মনে মনে সব ঠিক করে ফেলেছিল। আর শুনছিল কথাগুলো। উমিচাঁদ লোকটা জহুরীই বটে। বেছে বেছে ঠিক লোককেই পাঠিয়ে দিয়েছে।

হঠাৎ হরিচরণ ঘরে ঢুকলো। সাহেবের ঘরে হরিচরণের অবাধ গতি!

—হুজুর, ওদের এখেনে এনে তুলেছি। খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করেছি। ওরা ভয় পাচ্ছেন, বলছেন লড়াই হলে ওদের কী হবে! আমি বলেছি কিছু ভয় নেই। বুঝিয়ে-সুঝিয়ে হুজুরের কাছে এসেছি।

ক্লাইভ সাহেব কিছুক্ষণ ভাবলে। বললে—তুই যা, আমি কাজ সেরে যাচ্ছি এখুনি—

হরিচরণ চলে যাচ্ছিল। সাহেব বললে—কলকাতার কেল্লা থেকে পল্টনরা এসে পৌঁছেছে?

—আজ্ঞে এখনো আসেনি হুজুর।

—আসার খবর পেলে আমাকে জানাবি।

কিন্তু খবর আর দিতে হলো না। ওদিক থেকে তখন বিউগল্ বাজাতে বাজাতে পল্টনরা এসে পড়েছে। পেরিন সাহে বাগানের বাইরে মশালের আলোতে সব আলোময় হয়ে উঠেছে।

—তাহলে আমি কি বসবো হুজুর?

সাহেব বললে—বোস, তোমাকে আমি আজ থেকেই চাকরি দিলুম। কলকাতার কেল্লা থেকে আমাদের আর্মি আসার কথা, তারা না আসাতে ভাবছিলুম খুব—

সাহেব ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বাইরের বারান্দায় দাঁড়ালো। ওয়াটসন্ তা হলে কথা রেখেছে। মোট দাঁড়ালো পাঁচশো গোরা পল্টন, সাড়ে পাঁচশো গোরা-লস্কর, আটশো দিশি সেপাই, ষাটজন গোরা-গোলন্দাজ আর দুটো কামান।

সামনে এসে দাঁড়ালো স্ক্যাফটন। হাতে অ্যাডমিরাল ওয়াটসনের নোট। ক্লাইভকে স্যালিউট করে চিঠিটা এগিয়ে দিলে। ক্লাইভ বললে—এসো, ভেতরে কে আছে দেখো—

—কে?

ক্লাইভ বললে—আমার নতুন ক্লার্ক—

নবকৃষ্ণ চুপ করে ঘরের ভেতরে বসে ছিল। দুজন সাহেব ভেতরে ঢুকতেই উঠে দাঁড়ালো।

—এই আমার নতুন ক্লার্ক। ফার্শি জানা মুন্সী!

—কিন্তু আমাদের ক্লার্ক রামচাঁদ তো আছে। সেও তো ফার্শি জানে! আবার একে কেন রাখলেন কর্নেল?

—আছে, দরকার আছে। ওদিককার কী খবর আছে বলো? নবাবের সঙ্গে আর্মি কত আছে?

স্ক্যাফটন বললে—খবর পেয়েছি ওদের সঙ্গে আছে আঠারো হাজার ক্যাভালরি, ফিফটিন থাউজ্যান্ড সোলজার, পঞ্চাশটা এলিফ্যান্ট আর চল্লিশটা ক্যাননৃ—

কথাটা শুনে কেমন যেন চুপ করে রইলো সাহেব কিছুক্ষণ! তারপর দাঁড়িয়ে উঠলো।

বহুদিন আগে সেন্ট ফোর্ট ডেভিডের সোলজাররা একদিন এই লোকটার আসল মূর্তি দেখেছিল। স্ক্যাফটন আর নবকৃষ্ণ সে মূর্তি দেখেনি। কিন্তু দেখলে, এক মুহূর্তে যেন চেহারাটা হঠাৎ বদলে গেল। বাইরে মশাল জ্বালিয়ে গোরা-পল্টনের দল বিউগল্ বাজাচ্ছে তখনো।

—কী, ভয় পাচ্ছো মুন্সী?

নবকৃষ্ণ ভয় পেয়েছিল মনে মনে। কিন্তু মুখে বললে—আমি হুজুরের সারভেণ্ট স্যার—

সাহেব বললে—তাহলে স্ক্যাফটন, তুমি আমার অর্ডার জানিয়ে দাও আর্মির লোকদের, আজকেই এখুনি মার্চ শুরু হবে—

তারপর বললে—আমি একটু ওদিক থেকে আসছি—

বলে সোজা বারান্দা পেরিয়ে, বাগান পেরিয়ে একেবারে গঙ্গার পাড়ের ওপর

ঘরখানার দিকে দৌড়ে গেল সাহেব। হরিচরণ সাহেবকে দৌড়ে আসতে দেখে অবাক হয়ে গেছে।

—ওরা কোথায়?

—হুজুর, খেতে বসেছেন। ডাকবো?

না, ওরা খেতে খেতে আমার মুখ দেখবে না। আমি পরে আসবো'খন।

বলে সাহেব চলেই যাচ্ছিল। কিন্তু দুর্গা খবর পেয়েই তাড়াতাড়ি হাত-মুখ ধুয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে।

—সায়েব!

দিদির ডাক শুনে ক্লাইভ ফিরলো। বললে—আমি জানতুম না তোমরা খেতে বসেছো দিদি, তাহলে আমি ডাকতুম না। কিন্তু দিদি, তোমাদের কথা ভেবেই আমি দৌড়ে এসেছি—তোমাদের আর এখানে রাখতে পারলুম না দিদি—

—ওমা, সে কি? আমাদের আবার কোথায় পাঠিয়ে দেবে?

—যেখানে হোক তোমরা যাও, আমার হরিচরণ তোমাদের সঙ্গে যাবে, আরো লোকজন দেবো। নবাব এদিকেই আসছে।

—আর তোমরা?

—আমরা একটু পরেই সোলজার নিয়ে মার্চ করতে শুরু করবো, নবাব আসবার আগেই অ্যাটাক করবো নবাবের আর্মিকে। হরিচরণ, বি-কুইক! এই নে টাকা। দিদিদের যদি কোনো ক্ষতি হয় তো তোকে আর আস্ত রাখবো না!

—কিন্তু যাবো কোন্‌দিকে হুজুর?

—যাবি কোন্‌দিকে তাও কি বলে দিতে হবে আমাকে! তাহলে এতদিন আমার সঙ্গে থেকে কী ট্রেনিং পেলি? যেখানে গেলে ওরা সেফ থাকবে সেখানে নিয়ে যাবি। সঙ্গে বন্দুক থাকবে তোর, ডেকয়েটরা যদি চুরি করতে আসে ফায়ার করবি। তোমার কিছু ভয় নেই দিদি, যেখানেই তুমি যাও, আমি ঠিক খবর নেবো তোমার, আমার জন্যে ভেবো না। আমি মরবো না—

কথাটা বোধহয় তখনো ভালো করে শেষ হয়নি। হঠাৎ দূর থেকে নবাবের আর্মি'র মশালের আলো দেখা গেল। ক্লাইভ সাহেব আর দাঁড়ালো না। দৌড়তে দৌড়তে আবার চলে এসেছে আর্মিদের মধ্যে। সবাই তৈরিই ছিল। সেখানে গিয়েই চিৎকার করে উঠলো—ব্যাটালিয়ন!

ওদিকে ছোট ঘরখানার মধ্যে নবকৃষ্ণ স্ক্র্যাফটন সাহেবের মুখের দিকে একবার চাইলে। এখনো তো সাহেব আসছে না!

জিজ্ঞেস করলে—সাহেব কোথায় গেল হুজুর?

স্ক্র্যাফটন সাহেব বললে—তুমি কার লোক? কে পাঠিয়েছে তোমাকে? কী করে কর্নেল সাহেবের নজরে পড়লে তুমি?

নবকৃষ্ণ বললে—হুজুর, সবই মায়ের দয়ায়।

—মা? ইওর মাদার?

—ইয়েস স্যার, আমার মা। মাদার সিংহবাহিনী।

—হু ইজ সিংহবাহিনী?

—আমার ইষ্ট দেবী হুজুর। মাদারের কাছে আমি রোজ প্রে করি হুজুর, যেন কোম্পানীর ভালো হয়, কোম্পানী যেন নবাবকে হারিয়ে হিন্দুস্থানের কিং হয়। দেখবেন হুজুর, মাদার আমার মনোবাসনা পূর্ণ করবেন!

কথাটা শেষ হবার আগেই বাইরে কান-ফাটানো একটা শব্দ হলো। সঙ্গে সঙ্গে

আর একটা শব্দ। রবার্ট ক্লাইভের গলার শব্দও শোনা গেল। সমস্ত শব্দ ছাপিয়ে ক্লাইভের গলা তখন চেঁচাচ্ছে—ব্যাটালিয়ন, ফায়ার—ফায়ার—

স্ক্র্যাফটন দরজা খুলে দৌড়ে বাইরে চলে গেল। নবকৃষ্ণর বুকটা তখন দুর দুর করে কাঁপছে।

হালসীবাগানে উমিচাঁদের বাড়ির বাগানের ভেতরে তখন নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলার ছাউনি পড়েছে। হাজার-হাজার লোকের রান্নার ব্যবস্থা করতে হয়েছে। সামনে তিন সার সেপাই পাহারা দিচ্ছে। তার পেছনে গোলন্দাজ, তার পেছনে অনেক দূরে আমীর-ওমরাওদের ছাউনি।

দূর থেকে কাউকে দেখলেই বন্দুক উঁচিয়ে ধরে পায়দল ফৌজ। কুয়াশার মধ্যে ভালো করে দেখা যায় না, তবু উঁচিয়ে ধরে।

বলে—উই আসছে শালারা—উই আসছে—

কেউই আসে না। আসলে নবাবের ফৌজের সামনা-সামনি আসার কারো সাহসই নেই। মুর্শিদাবাদ থেকে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ত্রিবেণী পেরিয়ে আসতে কি কম সময় লাগে!

সকাল হতে-না-হতেই কান্ত ছাউনি থেকে বেরিয়ে চারদিকে চেয়ে দেখলে। আকাশটা কুয়াশায় ঢাকা। যেন ঢাকাই চাদর দিয়ে সব কিছু ঢাকা। ক'দিন ধরে হাঁটাহাঁটি চলেছে। দিন নেই রাত নেই—কেবল হাঁটা। কোথায় সেই মুর্শিদাবাদ, আর কোথায় কলকাতা! নবাবের ফৌজের সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে একেবারে সোজা বাগবাজারে পেরিন সাহেবের বাগানের কাছে এসেই ফিরিঙ্গীদের সঙ্গে মুখোমুখি মুলাকাৎ। তখন রাত হয়েছে বেশ। অন্ধকারে জঙ্গলের মধ্যে ছাউনি পড়লো। কান্ত একেবারে নবাবের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। কে কী বলছে, কে কী করছে, কে কী ভাবছে সব বোঝবার চেষ্টা করছিল, জানবার চেষ্টা করছিল। মরালী বলে দিয়েছিল কান্তকে—সব সময়ে নবাবের কাছে কাছে থাকবে।

কান্ত বলেছিল—কিন্তু আমাকে যদি নবাব কাছে থাকতে না দেয়?

মরালী বলেছিল—দেবে, তোমাকে থাকতে দেবে—নবাবের সঙ্গে আমার কথা হয়ে গেছে—

কান্ত বলেছিল—বশীর মিঞা যদি কিছু বলে? আমাকে যে সে উমিচাঁদের বাড়ি যেতে দরবেশ খাঁর খোঁজ করতে—

মরালী বলেছিল—তা তুমি আমার কথা শুনবে, না বশীর মিঞার কথা শুনবে?

—তোমার কথা শুনবো মরালী, তোমার কথাই আমি শুনবো। তুমি যা বলবে তাই করবো। তোমার জন্যে আমি সব করতে পারবো। তুমি শুধু বলে দাও আমাকে কী কী করতে হবে!

—তোমাকে শুধু নবাবের পাশে পাশে থাকতে হবে, দেখবে যেন নবাবের কোনো ক্ষতি না হয়। কে কী বলছে, কে কী করছে, সব দেখবে, তারপর আমাকে জানাবে, আমাকে সেখান থেকে খবর দেবে!

এমনি করেই নবাবের ফৌজের দলের সঙ্গে কান্ত এসেছিল।

একদিন দশহাজারী মনসবদার ইয়ার লুৎফ্ খাঁ জিজ্ঞেস করেছিল—তুমি কে? তুম্ কৌন্?

মনসবদার সাহেব দেখতো লোকটা সব সময় নবাবের পাশে পাশে থাকে। নবাবও যেন লোকটাকে বিশ্বাস করে। যখন ছাউনির মধ্যে নবাব সকলকে ডেকে কথা বলে, সকলের সঙ্গে পরামর্শ করে, তখন অন্য পাহারাদারদের সঙ্গে সেও থাকে। তার সামনে নবাব গোপন কথা বলতেও দ্বিধা করে না। যখন বরানগরে এসে একেবারে কোম্পানীর ফৌজের মুখোমুখি হলো, তখন পরামর্শ হচ্ছিল সকলের সঙ্গে। ইয়ার লুৎফ্ খাঁ ছিল, মীরজাফর আলি ছিল, মেহেদী নেসার ছিল, ইয়ারজান, মোহনলাল, মীরমদন সবাই ছিল। কেউ বললে কামান দাগতে, কেউ বললে কোম্পানীর ছাউনিতে দূত পাঠাতে, কেউ বললে পিছু হটে নবাবগঞ্জে যেতে। কেউ বললে কোম্পানীর ফৌজে ষাট হাজার গোরাপল্টন আছে, কেউ বললে বিশ হাজার, কেউ বললে দশ হাজার। সে এক বিপজ্জনক অবস্থা। কান্ত তখন চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব শুনতো। কত রকম লোক কান্ত জীবনে দেখেছে। বেভারিজ সাহেব, ষষ্ঠীপদ, ভৈরব, সারাফত আলি, বাদশা, সচ্চরিত্র পুরকায়স্থ, বশীর মিঞা, বশীর মিঞার ফুপা মনসুর আলি মেহের সাহেব। কিন্তু এরা সব অন্যরকম। কিন্তু অন্যরকম হলেও ভেতরে ভেতরে যেন সবাই এক। এতদিন এদের নামই শুনে এসেছে, এতদিন এদের ভয়ই করে এসেছে, এতদিন হয়তো এদের শ্রদ্ধা ভক্তিও করে এসেছে। সম্মানে, প্রতিষ্ঠায়, প্রতিপত্তিতে এরা তো সকলের চেয়ে বড়ই। কিন্তু এতদিনে বুঝলো যাদের সে দূরে থেকে দেখেছিল, তাদের কাছাকাছি আসাতে তারা যেন সবাই ছোট হয়ে গেল। সবাই কেবল নিজের নিজের স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত। ওর দুটো চাকর, আমার কেন একটা চাকর থাকবে। ওর তিনটে বাঁদী, আমার কেন একটাও বাঁদী থাকবে না। কারোর খাওয়া-দাওয়ার কিছু ত্রুটি হলে গালাগালি দেয় বাবুর্চিকে। খেদ্‌মত্ করতে গাফিলতি করলে বান্দাদের চড়-চাপড় খেতে হয়। অথচ এরাই তো দেশের হর্তা-কর্তা-বিধাতা।

একদিন গুঞ্জন উঠলো—ও লোকটা কে? ওর কী কাজ? ও কেন এসেছে ফৌজের সঙ্গে?

কান্তকে জিজ্ঞেস করলে, কান্ত বলে—আমি নবাবের খিদ্‌মদ্‌গার!

—তা নবাবের খিদ্‌মদ্‌গার তো তুমি সব কথায় কান দাও কেন? তুই কেন সব সময় আমাদের কাছে থাকবি?

—তা সে জনাব আপনি নবাবকে বলুন। আমাকে কেন বলছেন?

কিন্তু আশ্চর্য, নবাবকে বলবার সাহস নেই কারো। সেখানে যখন সবাই যায় তখন মাথা নিচু করে থাকে, যেন কত ভক্তি!

তিন চারটে কামানের গোলা ছুঁড়তেই ওদিক থেকে ফিরিঙ্গীরাও গোলা ছুঁড়তে লাগলো। একটা গোলা একেবারে বাবুর্চিখানার পাশেই এসে পড়লো। সমস্ত ছাউনিটা যেন ফেটে চৌচির হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। প্রথমটায় কান্তর কানে তালা লেগে গিয়েছিল। তারপর একটু চেতনা ফিরতেই দেখলে নবাব মাথা থেকে তাজটা সরিয়ে রাখলে। তারপর বললেন—ইয়ার লুৎফ্ খাঁকে ডাকো—

দশহাজারি মনসবদার ইয়ার লুৎফ্ খাঁ তখন ঘামতে ঘামতে এসে কুর্নিশ করে দাঁড়ালো।

—জাঁহাপনা, কোম্পানীর ফৌজ এগিয়ে আসছে।

নবাব বললেন—ফির কামান দাগো—

তারপর একটার পর একটা। সমস্ত সন্ধ্যেটা শব্দের চোটে অন্ধকার খান খান হয়ে যেতে লাগলো। শীতের কুয়াশায় ঢাকা অন্ধকার চিরে গোলাগুলো আকাশের বুকের ওপর ফাটতে লাগলো পর পর। কান্ত নবাবের পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। মুখখানার দিকে চেয়ে দেখছিল বার বার। মনে হলো উত্তেজনায় নবাবের বুকের ভেতরটা ফেটে যেতে চাইছে। কিন্তু মুখে একটাও কথা নেই। শুধু একবার বললেন—একটু সরবৎ আনতে বল্—

নবাবকে দেখে কান্তর মায়া হচ্ছিল। বন্ধ ছাউনির মধ্যে মশার উৎপাত। একটা পাখা দিয়ে কান্ত নবাবকে হাওয়া করতে লাগলো। নবাব কিছু বললেন না। মনে হলো যেন নবাবের আরাম হচ্ছে। তারপর যখন রাত বাড়লো ওদিক থেকে সমস্ত চুপ হয়ে গেল। আর কোনো সাড়াশব্দ নেই কোম্পানীর ফৌজের।

ইরাজ খাঁ ঘরের মধ্যে এসে বললে—আমার মনে হয় এখান থেকে এখন আমাদের সরে যাওয়া দরকার বাবাজী—

—কেন? নবাব জিজ্ঞেস করলেন। নবাবের নিজের শ্বশুর ইরাজ খাঁ। ইরাজ খাঁর কথা সহজে ঠেলতে পারেন না নবাব।

ইরাজ খাঁ বললে—যুদ্ধ না করে ওদের কাছে না-হয় দূত পাঠানো যাক, দেখা যাক না কী উত্তর দেয় ওরা—

কথাটা যেন ভাবিয়ে তুললো নবাবকে। কান্ত চেয়ে দেখলে নবাবের কপালের রেখাগুলো কুঁচকে এল। এতদূর এসে পেছিয়ে যাওয়া! যারা এতদিন তাঁকে সম্মান দেয়নি, মসনদ পাবার পর একটা নজরানা পর্যন্ত দেয়নি, যারা বরাবর তাঁকে অগ্রাহ্য করেই এসেছে, সেই শয়তানদের কাছে দূত পাঠানো!

—কিংবা এখান থেকে তিন ক্রোশ দূরে নবাবগঞ্জে গিয়ে ওদের মতিগতি লক্ষ্য করি, জায়গাটা ভালো—

—ওরা কী বলে? মীরমদন আর মীরজাফরজী?

—ওরা বলতে সাহস করছে না তোমাকে, ওরাই আমাকে কথাটা তোমার কাছে তুলতে বলেছে!

—কিন্তু ফিরিঙ্গীরা যদি ভাবে আমি ওদের কামানের গোলার ভয়ে পালিয়ে গেছি?

ইরাজ খাঁ বললে—তুমি হলে বাঙলার নবাব, তুমি ওদের ভয় পাবে এ-কথা কে বিশ্বাস করবে?

—তাহলে এখানেই থাকি! এ-জায়গার নাম কী?

—এটা বরানগর! এখানে চারদিকে জঙ্গল, কাল সকাল বেলাতেও যদি কোম্পানীর ফৌজ আমাদের ওপর হামলা করে আমরা জঙ্গলের ভেতরে কাউকে দেখতেই পাবো না।

—আর নবাবগঞ্জ?

—সেখানে সব ফাঁকা বাবাজী। চারদিকে ফাঁকা জায়গা। খোলা মাঠ।

কান্ত ইরাজ খাঁর দিকে চেয়ে লোকটার কথাগুলো বোঝবার চেষ্টা করতে লাগলো। তবে কি নবাবের নিজের শ্বশুরও নবাবের বিরুদ্ধে! কিন্তু কান্তর কথা কে শুনবে! কে তার পরামর্শ নেবে!

নবাব রাজি হতেই সমস্ত ছাউনির লোক সেই রাত্রেই আবার চলতে শুরু করলো। ত্রিশ ক্রোশ রাস্তা। কোথায় বরানগর আর কোথায় নবাবগঞ্জ! সেখান

থেকেই খবর পাঠানো হলো কোম্পানীর দফ্তরে। কথাবার্তা করবার জন্যে লোক পাঠাও। তোমাদের সঙ্গে ফয়সালা করবে নবাব!

দু'দিন ধরে নবাব সেই নবাবগঞ্জেই অপেক্ষা করলেন, তবু কেউ এল না। নবাব রেগে গেলেন। ফৌজ, হাতী, পাইক, বরকন্দাজ সবাই যেন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। এতদূর এসে যুদ্ধ করতে না পেয়ে সবাই যেন ক্ষেপে গেল। সেই দিনই হুকুম বেরিয়ে গেল—আবার বরানগরে যেতে হবে, আবার কামান দাগতে হবে, আবার মুখোমুখি হামলা করতে হবে ফিরিঙ্গী ফৌজের ওপর!

কিন্তু পথেই কথা উঠলো বরানগর গিয়ে কাজ নেই। সোজা গিয়ে উমিচাঁদের বাগানে উঠলেই ভালো হয়।

—কেন?

মীরজাফর আলি বললে—ফিরিঙ্গীদের একটা মওকা দেওয়া ভালো!

—কিন্তু উমিচাঁদকে কি এখনো বিশ্বাস করতে বলো? সে ফিরিঙ্গীদের কাছে খুরাকি বেচে টাকা কামিয়েছে! সে তো নিমক-হারাম!

ইয়ার লুৎফ্ খাঁ সব কথা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছিল। বললে—জাঁহাপনা, সওয়ানে নেগার খবর এনেছে আহ্মদ্ শা' আব্দালি দিল্লী হামলা করেছে—দিল্লী থেকে তারা বাঙলা দেশের দিকে ধাওয়া করছে—

খবরটা শুনে নবাব খানিকক্ষণের জন্যে বিমূঢ় হয়ে রইলেন। এ-ধরনের আবহাওয়ার সঙ্গে কান্তর কোনো কালে পরিচয় ছিল না। চিরকাল ঠান্ডা-প্রকৃতির মানুষ। লড়াই-ফড়াই-এর মধ্যে থাকতে ভালো লাগে না। বন্দুক-কামান জিনিসগুলোকে চিরকাল ভয় করে এসেছে। অথচ সমস্ত দিন সেই সবই দেখতে হয়। সকাল থেকে ফৌজের লোকেরা কুচকাওয়াজ করে, শরীরটাকে মজবুত রাখবার জন্যে দৌড়-ঝাঁপ করে, আর যখন ছুটি হয় তখন সার সার কলাপাতা পেড়ে ভাত খেতে বসে। হালসীবাগানের মধ্যেখানে হাজার-হাজার লোক খেতে বসে। এক-একজন দু'বার তিনবার করে করে ভাত চেয়ে খায়। ফৌজী-কাছারি সঙ্গে সঙ্গে এসেছে। সেখান থেকে টাকা নিয়ে চাল কিনে আনে লোকেরা, সেই চাল এনে সকাল থেকে রান্না শুরু হয়। মাছ হয়, মাংস হয়। কালিয়ার গন্ধে হালসীবাগানের বাতাস একেবারে মাতাল হয়ে ওঠে। কিন্তু ক্ষিধে পেলেও তখন খাবার উপায় নেই কান্তর। নবাব না খেলে সে খেতে পারে না।

সেদিন হঠাৎ কে একজন জিজ্ঞেস করলে—তুমি কে?

কান্ত বললে—আমি কান্ত সরকার—

—কায়স্থ?

কান্ত জিজ্ঞেস করলে—তুমি?

—আমি ভাই সদ্গোপ। আমাদের জল-চল্।

কান্ত হেসে উঠলো। বললে—ফৌজের দলে আবার কায়স্থ-সদ্গোপ কী? তোমার নাম কী?

—শশী! কাজ-কম্ম কিছু পাইনে, তাই নাম লিখিয়েছি সেপাই-এর দলে। লড়াইটা না হলে আবার চাকরিটা চলে যাবে। লড়াই হবে, না হবে না? তুমি শুনেছো কিছু? তুমি তো দেখেছি নবাবের কাছাকাছি থাকো। শুনছি নাকি লড়াই করবে না নবাব! শুনে তো ভয় লেগে গেছে। নতুন চাকরি, অনেক কষ্টে চাকরিটা পেয়েছি, লড়াই না-হলে তো চাকরিটাও যাবে ভাই—

—তা এমন চাকরি নিলেই বা কেন?

—নিয়েছি কি সাধে ভাই, টাকা না উপায় করলে খাবো কী? বাপের ক্ষেত-
খামার তো কিছু নেই, গতরে খেটে খেতেই হবে!

ছেলেটাকে বেশ ভালো মনে হলো। লড়াই বন্ধ হবে শুনলেই দুঃখ হয়।
কেবল জিজ্ঞেস করে—কিছু শুনলে ভাই তুমি?

কান্ত বলে—তুমি তো ফৌজের দলের সঙ্গে থাকো, তুমি কিছু শুনতে
পাও না?

শশী বললে—ওরা তো বলে লড়াই হবে না—

—কেন? হবে না কেন?

শশী বলে—ওরা বলছিল নবাব নাকি যুদ্ধ করতে চায় না। দিল্লী থেকে
নাকি আহ্‌মদ শা আব্‌দালি বাঙলা দেশে হামলা করতে আসছে বলে নবাব
একটু দ্বিধা করছে—তুমি কিছু জানো ভাই?

ছেলেটাকে দেখে কান্তর বড় ভালো লাগলো। আশ্চর্য, ওর তো ভয় করছে
না! কিন্তু বেশিক্ষণ বাইরের লোকের সঙ্গে কথা বলবারও সময় থাকে না।
হালসীবাগানে আসার পরদিন থেকেই নানা লোকের সঙ্গে নানা সল্লা-পরামর্শ
করছে নবাব। ইয়ার লুৎফ্ খাঁ, মীরমদন, মোহনলাল, মীরজাফর সবাই যেন খুব
ভাবনায় পড়েছে।

উমিচাঁদও থাকে নবাবের সঙ্গে। হালসীবাগানে আসার সঙ্গে সঙ্গে উমিচাঁদ
সাহেব নবাবের সামনে এসে লম্বা কুর্নিশ করে দাঁড়িয়েছিল। তারপরে দুজনে
একটা ঘরের ভেতরে গিয়ে কী সব কথা বলতে লাগলো। সেখানে কাউকে ঢুকতে
দেওয়া হলো না। কান্ত বাইরে দাঁড়িয়ে রইলো।

কিন্তু সন্ধ্যে পর্যন্ত কিছুই জানা গেল না।

নবাব বসেছিলেন। হঠাৎ বাগানের গেটের কাছে কোম্পানীর একটা পাল্‌কী
গাড়ি এসে দাঁড়ালো। ফৌজের লোকেরা রাস্তা ছেড়ে দিলে। অবাক কাণ্ড।
রাজা দুর্লভরাম সামনে এগিয়ে গেল।

—আসুন—আসুন—

কান্ত দেখলে গাড়ি থেকে তিনজন নামলো। দুজন ফিরিঙ্গী সাহেব, আর
একজন বাঙালী টিকিওয়ালা।

নবাবের সামনে আসতেই রাজা দুর্লভরাম ফিরিঙ্গী দুজনের জামা-কাপড়
সব খুঁজে খুঁজে দেখলে। কান্ত নবাবের পেছনে দাঁড়িয়ে ছিল। কুর্তা, ইজের
তন্ন তন্ন করে দেখে কোথাও কিছু পাওয়া গেল না।

নবাব জিজ্ঞেস করলেন—এরা কারা দুর্লভরাম—

—জাঁহাপনা, এরা কর্নেল ক্লাইভ সাহেবের আর্জি নিয়ে এসেছে—এর নাম
স্ক্রাফটন—

—আর ও?

—ওর নাম মিস্টার ওয়ালস্—

—আর ও কে?

দুর্লভরামও জানতো না লোকটাকে। গায়ে একটা চাদর, মাথায় টিকি, পায়ে
খড়ম। লোকটা বোকার মত হাঁ করে সব চেয়ে দেখছিল।

সাহেব নিজেই লোকটার পরিচয় দিলে—জাঁহাপনা, এ আমাদের কর্নেলের
মুন্সী—কর্নেলের খাস মুন্সী নবকৃষ্ণ, আমাদের ইণ্টারপ্রেটার হিসেবে
এসেছে—

—বোস।

সমস্ত আবহাওয়াটা থম থম করতে লাগলো। নবাবের শ্বশুর ইরাজ খাঁ, মীরমদন, মীরজাফর, উমিচাঁদ সবাই হাজির ছিল।

হঠাৎ কান্তর দিকে বোধহয় মীরজাফর আলির নজর পড়েছে। বললে—ও কেন এখেনে? উস্‌কো বাহার যানে বোলো—

কান্ত বাইরেই চলে যাচ্ছিল। নবাবের কানে গিয়েছিল কথাটা। বললে—না, ও রহেগা—

বাইরে শশী দাঁড়িয়ে ছিল। শশী বলে দিয়েছিল—ভেতরে কী হলো আমাকে জানিয়ে দিও ভাই, বড় ভাবনায় পড়েছি—

কান্ত বলেছিল—কেন, অত ভাবনা করছো কেন? লড়াই হলে তো সকলের পক্ষেই খারাপ—

শশী বলেছিল—কিন্তু যদি ফিরিঙ্গীদের সঙ্গে একটা মিটমাট হয়ে যায় তো আমার চাকরি কি থাকবে, হয়তো ছাঁটাই করে দেবে—

কান্ত কথা দিয়েছিল, ঘরে যা যা কথা হবে সব জানাবে। আহা বেচারি! দুটো খেতে পাবে বলে সেপাইয়ের দলে নাম লিখিয়েছে। কিন্তু জানে না, প্রাণে মারা গেলে তখন কে খাবে? তখন কোথায় থাকবে তোর খাওয়া?

হঠাৎ স্ক্র্যাফটন সাহেব কুর্নিশ করে নবাবের সামনে দাঁড়িয়ে উঠলো।

নবাব তাকিয়া হেলান দিয়ে বসে ছিলেন। বললেন—বলো—
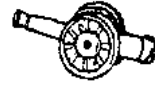
ছোটমশাই এসে নামলেন বাগবাজারের পেরিন সাহেবের বাগানের ঘাটে। ঘাটে জম-জমাট। ইংরেজ ফৌজ ঘিরে রেখেছে সমস্ত জায়গাটাকে। বজরাটাকে ঘাটে বেঁধে ওপরে উঠছিলেন তিনি।

উদ্ধব দাস সঙ্গে ছিল। বললে—অধীনের বড় ক্ষিধে পেয়েছে আজ্ঞে

ছোটমশাই রেগে গেলেন—তোমার নিজের বউ-এর খোঁজে বেরিয়ে এমন ক্ষিধে পায় কী করে শুনি? তুমি তো তাজ্জব লোক—

উদ্ধব দাস হাসলো। বললে—তা বউ পালিয়ে গেছে বলে কি ক্ষিধে পেতেও দোষ হুজুর?

ছোটমশাই থামিয়ে দিলেন। বললেন—তুমি থামো—

ঘাট পেরিয়ে যেতেই উদ্ধব দাস বললে—ধরুন আপনার যদি আমার মত বউ পালিয়ে যেত তো আপনিই কি ক্ষিধে-তেষ্টা ত্যাগ করতে পারতেন?

—বলছি থামো! আবার কথা বলছো?

বরানগর থেকে নৌকো করে বাগবাজারে আসতে কতক্ষণ বা সময় লাগে! কিন্তু ছোটমশাই-এর মনে হচ্ছিল যেন এক যুগ পার হয়ে গেল। লোকটাও সঙ্গ ছাড়ে না। পথেই খবর পাওয়া গেল ক্লাইভ সাহেব বাগবাজারে গিয়ে উঠেছে।

ছোটমশাই জিজ্ঞেস করেছিল—তুমি কদ্দুর যাবে?

উদ্ধব দাস বলেছিল—আমার কাছে কোনো দূর-দুরান্তর নেই হুজুর, আপনি আমাকে বলুন না, এখনি আপনার সঙ্গে আমি হেঁটে কেষ্টনগর চলে যাচ্ছি, গিয়ে আয়েস করে মুগের ডাল খাবো—

—মুগের ডাল?

—হ্যাঁ হুজুর, কেষ্টনগরের মহারাজের অতিথশালায় মুগের ডালটা এমন করে া, সে খেলে আমি বউ-এর কথাও ভুলে যাই। মুগের ডাল খেতে আমি বড় ালোবাসি যে—

কথা বলতে বলতে একেবারে ক্লাইভ ফটকে এসে হাজির য়ে গেল।

ফটকে গোরা-পল্টন পাহারা দিচ্ছিল। কিছুতেই ঢুকতে দেয় না। ছোটমশাই লেলে—বলো, আমি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের কাছ থেকে এসেছি।

গোরা-পল্টন ওসব কথা শুনতে চায় না। তার কাছে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র-ফন্দ্র কউ নয়। বললে—ঢুকতে দেবার হুকুম নেই কর্নেল সাহেবের—

বলে রাইফেল খাড়া করে পথ আটকে রইলো।

ছোটমশাই বললেন—এ তো মহা মুশকিল হলো দেখছি, আমি অত দূর থেকে দখা করতে এলুম—

উদ্ধব দাস বললে—দাঁড়ান ুর, আপনাকে তো ঢুকতে দিলে না, দেখুন আমাকে কী-রকম ঢুকতে দেয়-

বলে এগিয়ে গেল গোরা-পল্টনটার দিকে। বললে—তুমি তোমার কর্নেল াহেবকে গিয়ে একবার খবর দাও না পল্টন-সাহেব—

—কী খবর দেবো? কাউকে ঢুকতে দেবার অর্ডার নেই!

উদ্ধব দাস বললে—বলো গে, পোয়েট এসেছে—

—পোয়েট?

পল্টনটাও যেন অবাক হয়ে গেল। মিলিটারি-ক্যাম্পে আবার পোয়েট কী রতে এল।

—হ্যাঁ হ্যাঁ পল্টন-সাহেব, পোয়েট! পদ্য লিখি, কাব্য লিখি গো! রায় গুণাকর ভরতচন্দ্র রায়ের নাম শুনেছো তো, তিনি যেমন অন্নদামঙ্গল লিখেছেন, তেমনি আমিও কাব্য লিখছি—

গোরা-পল্টনটার কী মনে হলো কে জানে। ভেতরে চলে গেল। তারপর ানিক পরেই আবার ফিরে এসে বললে—কাম্ অন্—

উদ্ধব দাস ছোটমশাই-এর দিকে তাকালো। বললে—চলে আসুন হুজুর— লে আসুন—দেখলেন তো, সাহেব আমায় কত খাতির করে? চলে আসুন—
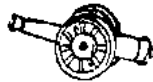
রবার্ট ক্লাইভের তখন নিঃশ্বাস ফেলবার সময় নেই। তবু বিপদ আর বিপর্যয়ের মধ্যেও মাথা ঠাণ্ডা রাখতে তার জুড়িও কেউ নেই তখনকার দিনে। িপদের মধ্যেই যেন ক্লাইভের মাথাটা হালকা হতো বেশি। বিপদের মধ্যেই যেন ুরোপুরি নিঃশ্বাস ফেলে রবার্ট ক্লাইভ। নইলে সেণ্ট ফোর্ট ডেভিডের যুদ্ধের ই সোজা নিজের দেশে গিয়ে চুপচাপ বসে থাকতে পারতো পায়ের ওপর পা দিয়ে। ওদিকে পাঠান সর্দার দুরানি আহ্মদ শা আব্দালি মথুরা করে দিল্লীর কাছে এসে পড়েছে, সে-খবরটা পৌঁছে গিয়েছিল ক্লাইভের । সেখান থেকে পূব দিকে আসছে তার আর্মি, সে-খবরও কানে এসে

গিয়েছিল। এ-সময়ে নবাবকে যা বলা হবে তাই-ই সে শুনবে। তাও আঁচ করে নিয়েছিল। আর যুদ্ধটা যদি আরো কিছুদিন ঠেকিয়ে রাখা যায় তবে নবাবেরই লাভ, কোম্পানীর লোকসান।

নবাবের কাছে যাবার সময় স্ক্র্যাফটনকে বলে দিয়েছিল—চুপি চুপি দেখে আসবে নবাবের ফৌজে কত সোলজার আছে, আর্টিলারি কত, এই সব—

তিনজন তো লোক। স্ক্র্যাফটন, ওয়ালস্ আর নতুন মুন্সী নবকৃষ্ণ।

—ফার্স্ট কনডিশন হলো নবাবকে কলকাতা ছেড়ে চলে যেতে হবে!

তাতে যে নবাব রাজি হবে না তা তো জানা কথাই। তবু নবাবকে বোঝাতে হবে যে কোম্পানীর সদিচ্ছে আছে ট্রুস্ করতে। কোম্পানী নবাবের সঙ্গে একটা রফা করতে চায় ভয় পেয়ে।

একটা করে কথা বলে স্ক্র্যাফটন, আর সেটা ফার্সিতে বুঝিয়ে দেয় নবকৃষ্ণ

কান্ত চুপ করে নবাবের পাশে দাঁড়িয়ে সব দেখছিল, সব শুনছিল।

নবাব সব শুনে বললেন—ঠিক আছে, আপনারা এখন দেওয়ানখানায় গিয়ে অপেক্ষা করুন, আমি কাল সকালে আপনাদের আমার মতামত জানাবো—

তিনজনেই বেরিয়ে এল দরবার থেকে। কান্ত দেখলে তি খুব ভয় পেয়ে গেছে। উমিচাঁদ সাহেব তিনজনকে নিয়ে বাইরে এল।

শশী বাইরের অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ছিল চুপ করে। কান্তকে দেখে তার দিকেই এগিয়ে আসছিল।

—কী হলো ভাই, কিছু শুনলে? লড়াই হবে?

কান্ত সে-কথার উত্তর দিলে না। দু'জন গোরা সাহেব তখন উমিচাঁদ সাহেবের সঙ্গে কথা বলছে। কান্ত কাছাকাছি গিয়ে কান খাড়া করে রইলো। সব কথা জানাতে হবে মরালীকে। মরালী চেহেল্-সুতুনের ভেতর চুপ করে বসে থাকে কান্তর চিঠির জন্যে। দু'দিন খবর না দিতে পারলেই ছটফট করে কান্ত। খবরটা লিখে একটা লেফাফার মধ্যে এঁটে দেয়। তারপর দেওয়ানখানার ভেতরে গিয়ে খাসনবীশের হাতে দেয় লেফাফাখানা।

খাসনবীশ বলে—এত চিঠি কাকে লেখ বাবুসাহেব?

—বুড়ো সারাফত আলিকে জনাব। আমার ওপর বুড়োর খুব মেহেরবানি কি না, চিঠি না পেলে আবার ভাববে বড্ড!

—সারাফত আলি তোমার কে বাবুসাহেব? তুমি তো হিন্দু—

কান্ত বলে—হিন্দু হলে কী হবে জনাব, সারাফত আলি সাহেব আমার বাপের মতন। আমাকে রোজ-রোজ খত্ লিখতে বলেছে—

সেই চিঠি নিজামতের চিঠির সঙ্গে ঘোড়ার পিঠে রোজ মুর্শিদাবাদে যায় ঘোড়ার ডাক মাঝখানে বদলি হয়। এক ঘোড়া থেকে আর এক ঘোড়ার পিঠে ওঠে। তারপর সারাফত আলির নামের চিঠি আবার নিজামত-দফতর থেকে কেমন করে নজর মহম্মদের হাত দিয়ে সোজা একেবারে মরালীর হাতে গিয়ে পৌঁছোয়

মরালী চেহেল্-সুতুনে বসেই জানতে পারে স্ক্র্যাফটন আর ওয়ালস্ সাহেব দু'জনে নবাবের কাছে এসেছিল ফয়সলা করতে। আর উমিচাঁদ সাহেব নবাবকে কেমন করে খোসামোদ করে ভাব করে ফেলেছে। পড়তে পড়তে মরালী কেমন উত্তেজিত হয়ে ওঠে। মনে হয় যদি সম্ভব হতো নিজেই চলে যেত হালসীবাগানে

কান্ত লেখে—'এখানে খুব শীত পড়েছে। তোমার কথা খুব মনে পড়ে, এখানে সবাই উৎসুক হয়ে ভাবছে কী হবে! কেউ ভাবছে যুদ্ধ বাধবে, কে

ভাবছে সন্ধি হয়ে যাবে। যে দুজন ফিরিঙ্গী এসেছিল কর্নেল ক্লাইভ সাহেবের চিঠি নিয়ে, তাদের মতলব খারাপ বলে মনে হলো। তাদের কথাবার্তার ধরন ভালো লাগলো না। তাদের সঙ্গে যে ফার্সী জানা মুন্সী এসেছিল তার নাম নবকৃষ্ণ। তাকেও খুব শয়তান মনে হলো। নবাব তাদের সঙ্গে খুব ভালো ব্যবহার করলেন। এই রকম ভালো ব্যবহার পেয়ে পেয়েই ওরা বড় প্রশ্রয় পেয়ে গেছে। তাদের দেওয়ানখানায় থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে। তাদের জন্যে আবার নবাব ভালো খানা-পিনার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। তুমি থাকলে হয়তো অন্য ব্যবস্থা হতো। কিন্তু আমি তো কিছু বলতে পারি না। এমনিতেই সবাই আমাকে সন্দেহ করে। সবাই জিজ্ঞেস করে—আমি কে? আমাকে নবাব কেন পাশে পাশে থাকতে দেন। সবাই আমাকে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে বলে। নবাব না থাকলে আমাকে বোধহয় সবাই খুনই করে ফেলতো। আমি কাউকেই কিছু বলি না। আমি শুধু চুপচাপ সব দেখি সব শুনি। তেমন কিছু বিপদ হলেই তোমাকে আমি সব জানাবো। আমাকে এখানকার খাসনবীশ সাহেব জিজ্ঞেস করছিল আমি কাকে চিঠি লিখি। সারাফত আলি সাহেব আমার কে? এরা কেউ এখনো জানে না যে আমি তোমাকে সব খবর খুঁটিয়ে জানাই। নবাব সত্যিই খুব ক্লান্ত। এবার নবাবের সঙ্গে তয়ফা-ওয়ালীরা কেউই আসেনি। মুখ দেখে মনে হয় খুব ভাবনায় পড়েছেন নবাব। ঘুমোবার সময়ও আমি কাছাকাছি থাকি। পাহারাদারদেরও আমি পাহারা দিই। ঘুমোতে ঘুমোতে নবাব এক-একবার কী যেন কথা বলেন। ভালো বুঝতে পারি না। মাঝে মাঝে মনে হয়—মীরজাফর আলিকে ডাকছেন। কখনো উমিচাঁদ, কখনো ইয়ার লুৎফ্ খাঁ। আজকে এখানেই শেষ করি। পরে কী হয় তোমাকে জানাবো।'

চিঠিটা নিয়ে দেওয়ানখানার দিকে যেতে গিয়েই দেখলে, উমিচাঁদ সাহেব দুজনকে কাছে ডাকলে।

সাহেব দুজন কাছে এল। নবকৃষ্ণও কাছে এসে দাঁড়ালো।

—কী বুঝলেন মিস্টার উমিচাঁদ? নবাব কি কলকাতা ছেড়ে চলে যেতে রাজি হবে?

উমিচাঁদ সাহেবের মুখখানা কথা বলতে গিয়ে যেন বেঁকে গেল।

বললে—নবাবকে তাহলে তোমরা চেনোনি সাহেব। নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলা অত সোজা চিজ নয়। ওর মুখ দেখে বোঝবার উপায় নেই মনে মনে কী প্যাঁচ কষছে—

সাহেব দুজন অবাক হয়ে গেল উমিচাঁদ সাহেবের কথা শুনে। বললে—খুব প্যাঁচোয়া লোক নাকি? মুখ দেখে তো কিছু বোঝা যায় না?

উমিচাঁদ সাহেব বললে—হাজি আহম্মদের বংশধর তো, ওদের মুখ দেখে কখনো বোঝা যায়? ওর গ্র্যান্ড-ফাদার ওই রকম করে সরফরাজ খাঁকে খুন করে থান নিয়ে নিয়েছিল। ওদের রক্তের মধ্যে ওই গুণ রয়েছে যে—

—তাহলে কী হবে?

যেন মহা ভাবনায় পড়েছিল সাহেবরা।

—ওই দেখলে না সাহেব, তোমাদের রাত্তিরে দেওয়ানখানায় থাকতে বললে! তোমাদের ভালো করে খাইয়ে-দাইয়ে খাতির করবার মানেটা কী? অত খাতির কি ভালো?

ওয়াল্‌স্ সাহেব জিজ্ঞেস করলে—সত্যি, কেন এত খাতির বলুন তো?

উমিচাঁদ বললে—কাল যে আরো গোলন্দাজ ফৌজ এসে পৌঁছচ্ছে, তোমাদের

কোনো রকমে কাল পর্যন্ত ঠেকিয়ে রাখতে চায়, তারপরেই দুম্ দাম্ করে গুলী চালাবে—

সাহেবরা ভয়ে ভয়ে দেওয়ানখানার দিকে গেল। দেওয়ানখানার একধারে একটা ঘরে তিনজনের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। সেখানে গিয়ে কী করলে কে জানে। কোনো রকমে দু'টি খাওয়া-দাওয়া সেরেই দরজা বন্ধ করে দিলে। ঘরের আলোও নিভে গেল।

খাসনবীশমশাই বললে—কী গো কান্তবাবু, ডাকের কিছু চিঠি আছে নাকি?

তখন চারদিকের আলোই নিভে গেছে। নবাবও খেয়ে নিয়েছেন। সমস্ত হালসীবাগানটা যেন ভয়ে থম্ থম্ করছে। রাত বেশি নয়। শশী এসেছিল। জিজ্ঞেস করলে—কি হলো ভাই? কিছু খবর পেলে?

কান্ত বললে—যা হলো তা তো দেখলে! কালকে আবার কথাবার্তা চলবে।

ছেলেটা যেন বড় মুষড়ে পড়েছিল। আশ্চর্য, এ সংসারে কত লোকের কত রকমের সমস্যা। কান্তর এক রকম সমস্যা, শশীর আর এক রকমের। মীরজাফর আলি, জগৎশেঠ, উমিচাঁদ সকলেরই নানারকম সমস্যা। নবাবের আবার অন্য রকম ভাবনা। কেউ চাইছে যুদ্ধ হোক। যুদ্ধ হলে চাকরিটা বজায় থাকবে। যুদ্ধ হলে উমিচাঁদ অনেক টাকা মুনাফা করবে। যুদ্ধ হলে মীরজাফর আলির আবার অন্য রকম লাভ। নবাবকে বিপদে ফেলে লাভ। কারোর লাভ নবাবকে বাঁচিয়ে রেখে, কারোর লাভ নবাবকে মেরে।

নিজের ঘরে এসে কান্ত আবার আলো জ্বালিয়ে চিঠিটা শেষ করতে বসলো—'তারপর উমিচাঁদ সাহেবের কথাগুলো শুনে আমার খুব খারাপ লাগলো মরালী। আমার ঘুম এলো না। তোমার কথা মনে পড়তে লাগলো। ভাবলাম তুমি বোধ হয় এখন আরাম করে মখমলের বিছানায় শুয়ে ঘুমোচ্ছ। সন্ধ্যেবেলা খাসনবীশ আমায় জিজ্ঞেস করছিল আমার কোনো চিঠি ডাকে দেবার আছে কি না। আমি বলেছিলাম—না। কারণ তখনো আমার অনেকখানি লিখতে বাকি আছে...'

হঠাৎ শশী বাইরে থেকে ডাকলে—কান্ত, কান্ত...

কান্ত ধড়ফড় করে উঠে পড়েছে। চারদিকে যেন হইচই পড়ে গেছে। সবাই যেন ব্যস্ত! কী ব্যাপার? কী হলো হঠাৎ? এত গোলমাল কীসের? কেউ জানে না কী হয়েছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সাজ সাজ রব পড়ে গেল। সেই তিনজন লোক দেওয়ানখানা থেকে পালিয়েছে। নবাব তখন ঘুমোচ্ছিলেন। খবর গেল সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কাছে।

ইয়ার লুৎফ্ খাঁ তৈরিই ছিল বোধহয়।

শশীকে তখন আর দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। তার তখন আর আনন্দের বোধহয় শেষ নেই। সমস্ত হালসীবাগানটা যেন ঘুম থেকে জেগে উঠলো রাতারাতি। ফৌজের সমস্ত লোক 'ইয়া' 'ইয়া' করে চিৎকার করে উঠলো। গর্জন করে উঠলো একসঙ্গে।

আর সঙ্গে সঙ্গে...

কান্ত চিঠিটা বার করে সেই হট্টগোলের মধ্যে দু' ছত্র তাতে লিখে দিলে। মরালী জানুক। নইলে সে যা মেয়ে, বড় ভাববে। তারপর তাড়াতাড়ি দেওয়ানখানায় খাসনবীশের কাছে গিয়ে হাজির। খাসনবীশ তখন দফ্‌তর গুটিয়ে ফেলছে।

—আমার একটা খত্ আছে খাসনবীশ সাহেব!

—কীসের খত্? কী লেখা আছে এতে?

—আজ্ঞে হুজুর, তেমন কিছু নয়। সারাফত আলি সাহেবকে লিখছি এখানকার কথা, সারাফত আলি সাহেব আমার বাপের মতন তো, শেষকালে আমার জন্যে ভেবে মরবে!

অনেক ধরা-করার পর বোধহয় দয়া হলো খাসনবীশের। ডাকের থলির মুখটা আবার খুলে তার মধ্যে চিঠিখানা পুরে দিলে। তারপর দফ্তর গুটিয়ে তল্পি-তল্পা গুছোতে লাগলো।

সে চিঠি যখন পরদিন নিজামত কাছারিতে গিয়ে পৌঁছুলো, নজর মহম্মদ সেখানা নিয়ে সোজা মরালীর হাতে দিলে।

মরালী পড়তে লাগলো—'তোমাকে চিঠি লেখা শেষ করে যখন শুতে যাচ্ছি তখন হৈ-হৈ পড়ে গেল ছাউনির মধ্যে। শশীর ডাকে আমার ঘুম ভেঙে গেল। উঠে শুনি অবাক কান্ড। যা ভয় করেছিলাম তাই। সেই স্ক্র্যাফটন আর ওয়ালস্ সাহেব তারা ঘরের আলো নিভিয়ে ঘুমোতে গেল ভেবেছিলাম। কিন্তু তা নয়। আমাদের ফৌজের সেপাইরা যখন নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়ে পড়েছে, তখন তারা রাত্রের অন্ধকারে লুকিয়ে লুকিয়ে পালিয়ে গেছে। সেই নবকৃষ্ণ মুন্সী বলে যে লোকটা সঙ্গে ছিল, সে-ও তাদের সঙ্গে পালিয়েছে। তারপর আর কী হয়েছে কেউ জানে না। এই একটু আগেই ক্লাইভ সাহেবের গোলন্দাজ ফৌজ আমাদের নবাবের ঘরের পাশেই একটা কামানের গোলা ছুঁড়ে মেরেছে। আর একটু হলেই নবাবের ছাউনির ওপরে পড়তো। তাহলে নবাবও আর বাঁচতেন না, আমিও বাঁচতুম না মরালী। আজ এখানেই শেষ করছি। খাসনবীশসাহেবকে বলে-কয়ে খোসামোদ করে এ চিঠি পাঠাতে দেওয়ানখানায় যাচ্ছি। দেখি যদি রাজী হয়।'

বাঁদী এসে বললে—গোসলখানায় গরম পানি দেবো বেগমসাহেবা?

সে কথার উত্তর না দিয়ে মরালী জিজ্ঞেস করলে—নানীবেগমসাহেবা কোথায়?

তারপর তার উত্তরের অপেক্ষা না করে সোজা গেল একেবারে নানীবেগমের মহলের দিকে।

নানীবেগমসাহেবা তখন মসজিদ থেকে নমাজ পড়ে আসছিল। মরালী গিয়ে বললে—সর্বনাশ হয়েছে নানীজী, তোমার মীর্জা খুব বিপদে পড়েছে—

—তা তুই কী করে জানলি?

—এই দেখ নানীজী, কান্ত খত্ লিখেছে—

—তা এখন কী করবি?

—এ সবই উমিচাঁদ সাহেবের ফাঁদ নানীজী! আমি ঠিক বলছি ঐ উমিচাঁদ সাহেবের ফাঁদ।—আমি হালসীবাগানে যাবো নানীজী! আমি এখখুনি যাবো—

নানীবেগমসাহেবা আলীবর্দী খাঁ'র সঙ্গে অনেক লড়াই দেখেছে। ঘোড়ায় চড়েছে, উটে চড়েছে। হাতীতে চড়েছে। কতবার নানীবেগমের কানের পাশ দিয়ে কামানের গোলাও চলে গেছে। কতবার জানে মারা যেতে যেতে বেঁচে গেছে। যুদ্ধ কাকে বলে তা নানীজীর জানা আছে।

বললে—পাগল নাকি তুই? এই লড়াই-এর মধ্যে যাবি কী করে?

—না নানীজী, তুমি বন্দোবস্ত করে দাও, আমি যাবো।

—সেখানে কী তুই যেতে পারবি? মুখেই বলছিস, সেখানে গেলে ভয়ে মরে যাবি। আমি কত লড়াইতে গেছি তোর নানাজীর সঙ্গে—। আমি জানি যে!

—তা সব জেনেও আমি কী করে চুপ করে থাকবো বলো! একটা লোককে সবাই মিলে খুন করে ফেলবে আর আমরা এখানে চুপ করে বসে বসে তাই শুনবো? আমাদের কি হাত-পা নেই! ওরা যে বদমাইশ্ লোক নানীজী, ওরা যে শয়তান! আমরাও কি ওদের মত শয়তানি করতে জানি না?

—তা তুই কি সেখানে গিয়ে লড়াই করবি নাকি ফিরিঙ্গীদের সঙ্গে?

—হ্যাঁ নানীজী, আমি লড়াই-ই করবো!

নানীজী বললে—তাহলে তুই মর্‌গে যা, আমি যেতে পারবো না—

—না নানীজী, তুমি চলো!

—আমি কিছুতে যাবো না।

মরালী বললে—কিন্তু তুমি না গেলে আমি যাবো কী করে নানীজী? আমি একলা কী করে যাবো? তোমার তো লড়াই-এর মধ্যে যাওয়া অভ্যেস আছে—

—তা হোক, আমি যেতে পারবো না।

—তাহলে আমি একলা যাই?

—যা, তোর যা খুশী তাই করগে যা!

মরালী বললে—তাহলে সেখানে গিয়ে মরে গেলে তুমি কিন্তু কাঁদতে পারবে না!

নানীজী বললে—আমার কাঁদতে বয়ে গেছে, আমার নিজের তিন-তিনটে মেয়ে বিধবা হলো তাই-ই আমি বলে কাঁদলুম না—

—তাহলে বেশ, আমি যাই! আমি কিন্তু বলে রাখছি আর ফিরবো না। আর আমার মুখ দেখতে পাবে না তোমরা।

নানীজী চলে যেতে যেতেও ফিরে দাঁড়িয়ে বললে—সেইজন্যেই তো বলছি তুই যাস্ নে!

—না নানীজী, আমি যাবোই। তুমি যাও আর না-যাও, আমি যাবোই যাবো!

বলে মরালী সোজা নিজের ঘরের দিকে চলে যাচ্ছিল। নানীজী আর পারলে না। বললে—এই মেয়ে, শোন শোন—

মরালী তবু শুনলো না। যেমন নিজের মহলের দিকে যাচ্ছিল তেমনি চলতে লাগলো। নানীজী তার পেছনে আসতে লাগলো। তারপর একেবারে নিজের ঘরের মধ্যে এসে মরালী দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছে।

বাইরে থেকে নানীজী বলতে লাগলো—ওরে দরজা খোল্, আমার কথা শোন—

ভেতর থেকে মরালী বললে—আগে কথা দাও তুমি যাবে আমার সঙ্গে।

—যাবো রে যাবো, তুই আগে দরজা খুলবি তো!

—সত্যি যাবে?

—হ্যাঁ যাবো।

মরালী দরজা খুলে দিলে। নানীবেগম ভেতরে ঢুকে বললে—কী অভিমানী মেয়ে বল্ তো তুই, আমি কি চিরকাল বাঁচবো? আমি মরে গেলে কে তোর মান-অভিমানের দাম দেবে বল তো! কে তোকে দেখবে? তুই কার ভরসায় এত আবদার করিস শুনি?

বলে মরালীকে ধরতেই মরালী নানীবেগমের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে মুখ লুকিয়ে কাঁদতে লাগলো। কাঁদতে কাঁদতে বললে—আমার যে কেউ নেই নানীজী, আমার যে কেউ নেই। তুমি ছাড়া আমার আর কে আছে বলো যে তার কাছে গিয়ে আমি বায়না করবো, আবদার করবো! আমার মা'ও নেই, বাপও নেই, ভাইও নেই, সোয়ামী নেই। তুমি ছাড়া কে আমার দুঃখ বুঝবে বলো? আমি সাধ করে কি কলকাতায় যেতে চাইছি নানীজী! তোমার মীর্জাকে যে ওরা মেরে ফেলবে, যেমন করে ওই মেহেদী নেসার, ইয়ারজান, সফিউল্লা আমার সর্বনাশ করেছে, তেমনি করে তোমার মীর্জারও যে সর্বনাশ করবে ওরা!

—তা মৃত্যুই যদি ওর কপালে থাকে তো তুই কি বাঁচাতে পারবি ওকে?

মরালী বললে—নবাব মরলে যে সবাই মরবে নানীজী! নবাব মারা গেলে যে সব ছারখার হয়ে যাবে! উমিচাঁদ, মীরজাফর সবাই যে ওই ফিরিঙ্গীটার সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। এবার যে তোমার চেহেল্-সুতুনও চলে যাবে। নবাব মারা গেলে তুমি কেমন করে বাঁচবে তা একবার ভাবছো না?

বাঁদীটা ঘরের দিকে আসছিল। নানীবেগম তাকে দেখতে পেয়ে বললে—পীরালিকে একবার ডেকে দে তো আমার কাছে।

বলে মরালীকে বললে—যাওয়া তো অত সোজা নয় রে মেয়ে, গেলে তার আগে ডিহিদারকে খবর দিতে হবে, সে বজরা তৈরি করে রাখবে, খাওয়া-দাওয়ার বন্দোবস্ত করতে হবে, থাকার বন্দোবস্ত করতে হবে, বেগমরা তো আর বাইরে বেরোলেই হলো না, বাঁদীদের সঙ্গে নিতে হবে, খোজারা যাবে!

—না নানীজী, কাউকেই সঙ্গে নিতে পারবে না। কেউ যেন জানতে না পারে বেগমরা যাচ্ছে, সাজগোজও করবো না। যেমন করে গাঁয়ের বউ-ঝিরা বাপের বাড়ি যায়, শ্বশুরবাড়ি যায়, তেমনি করে যাবো—

—তা সঙ্গে একটা বাঁদীও নিবি না?

—না! জানি তোমার একটু কষ্ট হবে নানীজী। কিন্তু তোমার মীর্জার ভালোর জন্যে একটু কষ্টও করতে পারবে না তুমি? না-হয় নিজে একটু কষ্টই করলে, তাতে তোমার কী এমন ক্ষতি হবে? তুমি জানো না নানীজী, ওদিকে বোধহয় যা-হবার তা এতক্ষণে হয়ে গেছে। ফিরিঙ্গীরা তোমার মীর্জার ছাউনির ওপর কামানের গোলা ছুঁড়েছে—

পীরালি আসতেই নানীজী বললে—শোন্ পীরালি, আমাদের তাঞ্জামের ইন্তেজাম করে দে, আমরা বেরোব—

—কতদূর যাবেন বেগমসাহেবা?

—সে তোকে জানতে হবে না। নিজামত-কাছারিতে খবর দিতে হবে [illegible] ডিহিদারকে যেন এখ্খুনি এত্তেলা ভেজিয়ে দেয়, আমি যাবো। খবরটা না-মালুম থাকবে, কেউ যেন নাক্‌স না পায়, কেউ যেন নিশানা না পায়, দেখিস—আমি আর মরিয়ম বেগমসাহেবা যাবো, শুধু আমরা দু'জন—

—বাঁদী? খোজা?

—নেহি, কোই নেহি—যা, দেরি করিসনে, জলদি [illegible] বলবি, গড়বড় যেন না হয় দেখিস্। যা—

পীরালি খাঁ কুর্নিশ করে চলে গেল।

নানীবেগম বললে—তাহলে তুই তৈরি হয়ে নে মেয়ে—আমিও তৈরি হয়ে নিই—

মরালী নানীবেগমকে আনন্দে জড়িয়ে ধরলো একেবারে। বললে—তুমি কত ভালো নানীজী! তুমি কত ভালো—সত্যি নানীজী, তুমি কত ভালো—

নানীজী বিরক্ত হয়ে উঠলো—তুই ছাড় বাপু, তোকে আর অত আদর করতে হবে না—তোর কী? আমার এখন কত ভাবনা বল্ তো, তুই তো শুধু আমার সঙ্গে গিয়েই খালাস, আমার কত দায়িত্ব বল দিকিনি—

মরালী নানীবেগমকে আরো জোরে জড়িয়ে ধরলে। বললে—বা রে, তুমি তাহলে নানীজী হয়েছিলে কেন? নানীজী হলে তো নাত্নীর ধকল নিতেই হবে।

১৭৫৭ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী। বাগবাজারের বাগানবাড়ির ভেতরে তখন ইণ্ডিয়ার ম্যাপটিকে নতুন করে নতুন রং দিয়ে আঁকবার তোড়জোড় করছিল কর্নেল রবার্ট ক্লাইভ। যে-মানুষ ঘরেরও নয়, বাইরেরও নয়, যে-মানুষটার কাছে সমস্ত পৃথিবীটাই তার নিজের দেশ, যে-মানুষ পরের দেশের মানুষকেই আত্মীয় মনে করে নিজের ঘরে আশ্রয় দেয়, সে-মানুষ যখন পৃথিবীর মানচিত্র বদলাবে বলে মনস্থ করে, তখন তাকে ঠেকানো বড় শক্ত। তার কাছে সোলজার না থাকুক, তার কাছে কামান-বন্দুক না থাকুক, সে তার উদগ্র ইচ্ছার অসামান্য সম্বল দিয়ে যে অসাধ্য সাধন করতে পারে, তাতে কে সন্দেহ করবে!

যখন খবরটা পেল যে পোয়েট এসেছে, তখন তার সময়ই ছিল না কথা বলবার মত। তবু কেন, কে জানে, পোয়েটকে ভেতরে ডাকতে বললে।

ছোটমশাই উদ্ধব দাসের পেছন-পেছন যাচ্ছিল।

—কী পোয়েট, তোমার খবর কী?

তারপর পেছনে আর একজন জেণ্টলম্যানকে দেখে একটু অবাক হয়ে গেল। কিন্তু ছোটমশাই তার আগেই নিজের পরিচয় দিয়ে দিলে।

—আমি এসেছিলুম আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে!

—হু আর ইউ?—এ কে পোয়েট?

—আজ্ঞে, ইনি হলেন বাবুমশাই, ভারি সজ্জন ব্যক্তি! হুজুরের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।

—কোথা থেকে আসছেন আপনি?

—আমাকে আপনি চিনবেন না। আমি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের কাছ থেকে আসছি...

—কী কাজ?

—আপনাকে একটু আড়ালে সে-সম্বন্ধে কথা বলতে চাই।

কর্নেল ক্লাইভ ছোটমশাই-এর দিকে ভালো করে চেয়ে দেখলে। যখন নবাবের সঙ্গে চরম একটা বিরোধ চলছে, ঠিক তখন এ-লোকটা কেন দেখা করতে এল?

ক্লাইভ বললে—পোয়েটের সামনে আপনার বলতে আপত্তি কী! পোয়েট তো এ-সব পলিটিক্স-এর মধ্যে থাকে না।

উদ্ধব দাস বললে—ঠিক বলেছেন সাহেব, আমি শুধু হরির কথা নিয়ে আছি, এই যে আমার বউ অপরের কাছে আছে, আমি কি তার কথা ভাবছি? আমার

যে বউ আমার সঙ্গে কথাই বললে না, আমি কি সে কথাই ভাবছি?

ক্লাইভ বললে—তোমার খুব মনের জোর আছে পোয়েট, তোমার মত যদি মনের জোর পেতাম—

—পাবেন সাহেব, পাবেন, একটু চেষ্টা করলেই পাবেন!

—কী করে পাবো? আমার নিজের দেশের লোকরা, আমার আত্মীয়রা আমাকে হেট করে, সে-যন্ত্রণা আমি ভুলতে পারি না। তাই তো তোমাদের ইণ্ডিয়াতে মরতে এসেছি।

ছোটমশাইও চমকে উঠলেন। জিজ্ঞেস করলেন—মরতে এসেছেন? মরতে এসেছেন মানে?

ক্লাইভ সে-কথার উত্তর না দিয়ে উদ্ধব দাসের দিকে চেয়ে বললে—এত মনের জোর তুমি কোথায় পাও পোয়েট?

—ওই যে বললুম হরির জন্যে!

—হরি? হু ইজ হরি? হরি কে?

উদ্ধব দাস বললে—আজ্ঞে, হরি মানেই মানুষ আর মানুষ মানেই হরি—মানুষই আমার গড্!

—মানুষই তোমার গড্? খুব নতুন কথা বলেছো তো হে! তুমি তোমার পোইট্রিতে এই কথা লিখেছো নাকি?

—লিখবো হুজুর, মহাকাব্য লিখবো। রায়গুণাকর যেমন "অন্নদামঙ্গল" কাব্য লিখেছে, আমি তেমনি একটা কাব্য লিখবো আমার বউকে নিয়ে। রায়গুণাকর লিখেছে গড্ নিয়ে, আর আমি লিখবো মানুষের মাহাত্ম্য নিয়ে।

ক্লাইভ কী যেন ভাবতে লাগলো খানিকক্ষণ। অনেক ভাবনা মাথার মধ্যে গজ্ গজ্ করছে। ছাউনির মধ্যে কোম্পানীর আর্মির লোকরা হইচই করছে। স্ক্র্যাফটন আর ওয়ালস্ গেছে নবাবের কাছে ট্রুসের টার্মস্ নিয়ে। সঙ্গে গেছে সেই নতুন মুন্সী নবকৃষ্ণ। কিন্তু অত সহজে নবাবকে বশে আনা যাবে না। নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলা অত সহজ মানুষ নয়। ফ্রেঞ্চ জেনারেল বুশীকে তলে তলে ডেকে পাঠিয়েছে সাউথ্ ইণ্ডিয়া থেকে। বাইরের দিকে একবার তাকালে ক্লাইভ। তাকিয়ে দেখলে কেউ আসছে কি না। শীতের রাতটা বড় অন্ধকার ঠেকলো।

ছোটমশাই বললেন—আপনি বোধহয় খুব ব্যস্ত সাহেব, আপনি যদি বলেন তো না হয় কাল সকালে আবার আসবো।

—রাত্তিরে কোথায় থাকবেন?

—আমার বজ্‌রা আছে ঘাটে। সেখানেই খাওয়া-দাওয়া করবো, সেখানেই ঘুমোব!

ক্লাইভ বললে—কিন্তু কাল সকালে কী ঘটবে তা আজ বলতে পারছি না—নবাবের ক্যাম্পে আমি আমার এজেণ্টদের পাঠিয়েছি।

ছোটমশাই বললেন—আমি সেই নবাবের সম্বন্ধেই কথা বলতে এসেছি।

—নবাবের বিরুদ্ধে?

—হ্যাঁ।

—কী কথা?

ছোটমশাই উদ্ধব দাসের দিকে একবার চাইলেন।

ক্লাইভ বললে—ওকে কোনো ভয় নেই, ও হার্মলেস্ পোয়েট—

ছোটমশাই বলতে লাগলেন—আপনি যদি নবাবের সঙ্গে লড়াই করেন তো

আমরা সবাই আপনার পেছনে আছি। আমরা সবাই নবাবের বিরুদ্ধে—

ক্লাইভ সোজাসুজি চাইলে ছোটমশাই-এর দিকে। জিজ্ঞেস করলে—কেন? আপনারা সবাই নবাবের এগেনস্টে কেন? নবাব আপনাদের কী ক্ষতি করেছে?

—কী ক্ষতি করেনি তাই বলুন? আমরা সামান্য জমিদার, আমাদের খাজনা বাড়িয়েছে, আমাদের মাথট্ বেড়েছে, আবওয়াব বেড়েছে। আমাদের কথা আপনার বিশ্বাস না হয় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকেও জিজ্ঞেস করতে পারেন, তাঁর জমিদারির আয় কী আর খরচ কী! নবাব কি প্রজাদের জমিদারদের তালুকদারদের সুখ দেখেছে কখনো। আলীবর্দী খাঁও দেখেনি, এই নতুন নবাবও দেখছে না। তারপর ডিহিদার, ফৌজদার, কোতোয়াল, চৌকীদারদেরও অত্যাচার কি কম বেড়েছে মনে করেছেন? সবাই মনে মনে তিতি-বিরক্ত হয়ে আছে নিজামতের ওপর। আমরা মেয়ে-বউ নিয়ে ঘর পর্যন্ত করতে পারিনে।

—কেন?

—আজ্ঞে, সুন্দরী বউ থাকলে তো আর কথাই নেই, নবাবের ঠিক নজরে পড়ে যাবে।

—সে কী?

—হ্যাঁ, আমার কথা বিশ্বাস না হয় আপনি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকে জিজ্ঞেস করতে পারেন, নাটোরের মহারানী রানীভবানীকে জিজ্ঞেস করতে পারেন।

ক্লাইভ উদ্ধব দাসের দিকে চাইলে। বললে—কী গো পোয়েট, সব সত্যি?

ছোটমশাই বললেন—ও কী জানে সাহেব, আমি নিজেই তো ভুক্তভোগী, আমার নিজের বউকেই তো নবাব নিজের হারেমে নিয়ে গেছে!

ক্লাইভ অবাক হয়ে গেল—সত্যি?

—হ্যাঁ সাহেব, যা বলছি সব সত্যি। আমার নিজের বউকে হারেমে নিয়ে গিয়ে কল্মা পড়িয়ে তাকে মুসলমান করে দিয়েছে, নাম রেখেছে মরিয়ম বেগম,—সেই জন্যেই তো আপনার কাছে ছুটে এসেছি প্রতিকারের জন্যে।

—তুমি কিছু জানো পোয়েট?

উদ্ধব দাস বললে—আমি কী জানবো হুজুর, আমার নিজের বউ-এরই খোঁজ-খবর রাখতে পারিনে, আমি রাখবো পরের বউ-এর খবর?

ক্লাইভ বললে—তা তোমার বউ তোমার কাছে যাবে না তার আমি কী করবো? তুমি আর একটু আগে এলে না কেন?

—আমি কি আর আমার বউ-এর জন্যে এসেছি হুজুর, এদিকে এসেছিলাম, তাই আপনার সঙ্গে দেখা করতে এলাম। বউ আমার কেমন আছে হুজুর?

ক্লাইভ বললে—তোমার বউ তো আমার এখেনে নেই।

—নেই?

—না, একটু আগেও ছিল, ভাবলাম এখানে কামানের গোলা-টোলা পড়তে পারে তাই তাদের পাঠিয়ে দিলাম বাইরে। সঙ্গে লোক দিয়েছি, কোনো ভাবনা নেই তোমার। একটু আগে এলেই দেখা করিয়ে দিতাম তোমার সঙ্গে...

হঠাৎ দৌড়তে দৌড়তে ঘরে ঢুকেছে স্ক্র্যাফটন, ওয়ালস্ আর নবকৃষ্ণ। ক্লাইভ তাদের দেখেই অবাক হয়ে গেছে। এত রাত্রে তো ফিরে আসার কথা নয়! কী হলো? নবাব এগ্রি করেছে আমার টার্মস্-এ?

ওয়ালস্ তখনো হাঁফাচ্ছিল। বললে—নবাব ওয়ারের প্রিপেয়ারেশন করছে!

—সে কী?

—হ্যাঁ, মিস্টার উমিচাঁদ বললে আরো ক্যানন্ এসে পোঁছবে কাল, আমাদের ওখানে ডিটেন করে রাখতে চেয়েছিল, তাই লুকিয়ে লুকিয়ে পালিয়ে এসেছি। আমাদের মনে হয় আজ রাত্রেই নবাব অ্যাটাক্ করবে আমাদের।

ক্লাইভ জিজ্ঞেস করলে—আর ইউ শিওর? ঠিক বলছো তুমি?

একমুহূর্তে যেন সেই মিষ্টি চেহারাটা কেমন লোহার মত কঠিন হয়ে উঠলো। সে চেহারা দেখে আর চেনা গেল না ক্লাইভ সাহেবকে। এক মুহূর্তে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে উঠেছে। আর চোখ দুটো নিষ্ঠুর হয়ে পৃথিবীকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছে।

উদ্ধব দাসের দিকে চেয়ে দেখলে ক্লাইভ। বললে—পোয়েট, তোমরা এখন যাও—আই মাস্ট্ গেট প্রিপেয়ার্ড—কাল সকালে আবার এসো।

উদ্ধব দাসের যেন কোনো বিকার নেই। সঙ্গে সঙ্গেই উঠে দাঁড়ালো।

বললে—চলুন বাবুমশাই—চলুন—আমরা যাই, কাল আবার আসবো।

ছোটমশাইও অগত্যা উঠলেন। বাগানের ফটক পেরিয়ে বাইরে এসে দাঁড়ালেন। তারপর সোজা গঙ্গার ঘাটের দিকে চলতে লাগলেন। এত আশা করে এসেছিলেন। সব কথা ভালো করে বুঝিয়ে বলা হলো না সাহেবকে।

অন্ধকার ঘাট। গঙ্গার জল তর তর করে বয়ে চলেছে।

উদ্ধব দাস বললে—বড় ক্ষিদে পেয়েছে বাবুমশাই।

ছোটমশাই সে কথার উত্তর দিলেন না। মনটা তাঁর ছটফট করছিল ছোট বউ-রানীর জন্যে। ক্ষিধে-তেষ্টা সব কিছু তাঁর ক'দিন থেকেই উড়ে গিয়েছে।

হঠাৎ দূরে থেকে একটা বিকট শব্দ হতেই তিনি চমকে উঠেছেন। কামানের শব্দ নাকি? লড়াই বাধলো নাকি নবাবের সঙ্গে?

উদ্ধব দাস বললে—ওই কামানের শব্দ শুনলেন বাবুমশাই?

সে কথায় কান না দিয়ে ছোটমশাই মাঝিদের বললেন—ওরে, বজ্‌রা ছেড়ে দে, শিগ্‌গির, কাছি খোল—লড়াই লেগে গেছে।

ত্রিবেণীর ঘাটে তখন সবে ভোর হয়েছে। ছোটমশাই-এর বজ্‌রার ভেতরে তখন ছোটমশাই ঘুমোচ্ছিলেন। অনেক কষ্টে বাগবাজারের ক্লাইভ সাহেবের ছাউনি থেকে পালিয়ে এসেছেন। নবাবের সঙ্গে কোম্পানীর যে এমন লড়াই বাধবে ভাবতেই পারেননি। পাগলা লোকটাও সঙ্গে ছিল।

বাইরে বজরার গলুইএর ওপর উদ্ধব দাস তখন চেঁচিয়ে গান ধরেছে—

আমি রবো না ভব-ভবনে।
শুন হে শিব শ্রবণে॥
যে নারী করে নাথ
পতিবক্ষে পদাঘাত
তুমি তারি বশীভূত
আমি তা সবো কেমনে॥
পতিবক্ষে পদ হানি
সে হলো না কলঙ্কিনী
মন্দ হলো মন্দাকিনী
ভক্ত হরিদাস ভণে॥

গানটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গলা ছেড়ে গাইছিল উদ্ধব দাস।

হঠাৎ যেন মনে হলো আর একটা বজরা এসে লাগলো ঘাটে। বজ্‌রার বাইরে লোকজন ছিল। ঘাটে যেন আরো অনেক লোকজন জড়ো হয়েছে। পালকী নিয়ে যেন ত্রিবেণীর ডিহিদারও হাজির রয়েছে। সবাই বেশ সন্ত্রস্ত-সন্ত্রস্ত ভাব।

উদ্ধব দাস দেখলে, বজরা থেকে দু'জন মেয়ে নামলো বোরখায় সমস্ত শরীর ঢেকে। পা'টা উঁচু করতেই দেখা গেল ফরসা টক্ টক্ করছে গায়ের রং। তাতে মেহেদী পাতার রং লাগিয়েছে আলতার মত।

ভেতরে মুখ বাড়িয়ে ডাকলে—ও বাবুমশাই, বাবুমশাই গো!

ছোটমশাই ভেতর থেকে জিজ্ঞেস করলেন—আবার কী?

—আজ্ঞে, বাইরে এসে দেখে যান—

—কী দেখবো!

—কারা যেন ঘাটে এসে নামলো!

সে-সব দিনের কথাও উদ্ধব দাসের মনে আছে। দেখতে পাগলা হলে কী হবে, উদ্ধব দাস সব বুঝতো। আমাদের এই সংসারটাই তো ধোঁকার টাটি হে! সব দেখবে সব জানবে, কিছু বললেই বিপদ।

ছোটমশাই-এর বজরাটা ত্রিবেণীর ঘাটে বেঁধে রাখা হয়েছিল। সেই হাতিয়াগড় থেকে কবে বেরিয়েছিলেন ছোটমশাই। তারপরে গেছেন কেস্টনগরে, তারপর কলকাতার বরানগরে। সেখান থেকে বাগবাজার পেরিন সাহেবের বাগানে। কিন্তু হঠাৎ এমন লড়াই বেধে যাবে কে জানতো। কামানের গোলার শব্দ পেয়েই নৌকো ছেড়ে দিয়েছিলেন। সেই নৌকো ভাসতে ভাসতে ত্রিবেণীতে এসে কাছি বেঁধেছিল। মাঝরাত পর্যন্ত ভালো ঘুম আসেনি। পাগলটা বক্ বক্ করেছিল অনেকক্ষণ। অনেক ছড়া শুনিয়েছিল। তারপর ছোটমশাই বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন—তুমি এখন যাও হে,—আমি এখন ঘুমোব—

উদ্ধব দাস তার 'বেগম মেরী বিশ্বাস' কাব্যে লিখে গেছে। তখনো সে জানে না যে তার সহধর্মিণীর সঙ্গেই দেখা হয়ে যাবে সেদিন। তখনো জানে না তার বউ-ই সেই ভোরবেলা নানীবেগমকে নিয়ে সেই ত্রিবেণীর ঘাটেই এসে আবার উঠবে।

নবাবি কায়দা বড় কড়া। বজরা থেকে নামবার আগেই গানটা মরালীর কানে গিয়েছিল—আমি রবো না ভব-ভবনে—

যে-মেয়ে বাঙলা দেশের এক অখ্যাত জনপদে জন্মেছিল কোন্ এক অখ্যাত গ্রাম্যকবির গৃহিণী হবার জন্যে, ইতিহাসের অমোঘ প্রয়োজনে আবার সেই মেয়েকেই নবাবের চেহেল্-সুতুনে এসে উঠতে হয়েছিল। ইতিহাসের প্রয়োজনে এমনি করেই এক-একটা জীবন উৎসর্গ করতে হয়েছে বার বার। মরিয়ম বেগম থেকে শুরু করে জোয়ান-অব-আর্ক পর্যন্ত এর নজীরের আর সীমাসংখ্যা নেই সংসারে। নইলে স্বামী-পুত্র-কন্যা-সংসার নিয়ে মত্ত থাকলে কে আর মরিয়ম বেগমদের চিনতো, কে আর জোয়ান-অব-আর্কদের জানতো। কে আর তাদের নিয়ে কাব্য লিখতো। ছোটমশাইকে আবার ডাকলে উদ্ধব দাস—ও বাবুমশাই, উঠুন, উঠুন—

কেমন যেন হাব-ভাব দেখে উদ্ধব দাসের সন্দেহ হয়েছিল, এরা সাধারণ গৃহস্থ ঘরের বউ-ঝি নয়। সঙ্গের লোক-জন-পাইক-জমাদার সবাই যেন কেমন সন্ত্রস্ত-ব্যস্ত হয়ে কাজ করছে। নইলে ডিহিদারের অত ভোরে আসার দরকার কী?

—ও বাবুমশাই, বাবুমশাই—

ছোটমশাই সত্যিই তখন ঘুমোচ্ছিলেন। ডাকাডাকিতে আর থাকতে পারলেন

না। বড় কষ্ট যাচ্ছে ক'দিন ধরে। এবার সঙ্গে কাউকে আনেনও নি। মাঝি-মাল্লা যারা ছিল তারাই যা-কিছু করছে। গোকুলও নেই যে দেখবে। এমন করে একলা-একলা থাকার অভ্যেস নেই তাঁর। পাশে কেউ না থাকলে ঘুমও আসে না। তারপর যা শীত পড়েছে!

বাইরে আসতেই উদ্ধব দাস বললে—ওই দেখুন—

—কী দেখবো?

—নবাবজাদী-টাদী কেউ হবে বোধ হয়।

—কীসে বুঝলে?

—আজ্ঞে বোরখার তলায় আমি পায়ের রং দেখছিলাম। দাঁড়ান আমি জিজ্ঞেস করে আসি—বলে উদ্ধব দাস আর সেখানে দাঁড়ালো না। গলুই থেকে ডাঙায় ঝাঁপিয়ে পড়লো।

ছোটমশাই বললেন—কী দেখতে যাচ্ছো ওদিকে?

উদ্ধব দাস বললে—আপনি তখন বলছিলেন না যে আপনার বউ নবাবের হারেমে আছে? আমি জিজ্ঞেস করে আসছি ওদের, আপনার বউ-এর খবর জানে কি না—আপনার বউ-এর কী নাম বললেন?

—তা ওদের জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছো কেন? তোমাকে ও-সব জিজ্ঞেস করতে হবে না।

—তা আপনার বউ-এর কী নাম রেখেছে ওরা সেইটেই বলুন না! মরিয়ম বেগম না কী যেন?

—না না, খবরদার ও-সব কথা জিজ্ঞেস করতে যেও না।

কিন্তু উদ্ধব দাসের বারণ শোনবার মত অবস্থা নয় তখন। সে তখন হন্‌-হন্‌ করে গঙ্গার পাড় ভেঙে ওপরে উঠছে।

ওপরে বিরাট একটা অশ্বত্থ গাছ। ঝাঁকড়া মাথায় সারা জায়গাটা আরো অন্ধকার করে রেখেছে। সেপাই-লস্কররা একটা পালকিকে ঘিরে রয়েছে চারদিকে। উদ্ধব দাস সেখানে গিয়ে দাঁড়ালো। বোরখা-পরা মেয়েমানুষ দুটো পালকির ভেতরে উঠতে যাচ্ছে।

একজন সেপাইকে গিয়ে উদ্ধব দাস জিজ্ঞেস করলে—এ'রা কারা গো?

সেপাইটা কথাটায় তত কান দেয়নি প্রথমে। উদ্ধব দাস আবার জিজ্ঞেস করলে—এ'রা কে গো সেপাই-বাবাজী?

তবু কেউ কান দিলে না সে-কথায়। ডিহিদার নিজে দাঁড়িয়ে তদারকি করছে। পালকিতে উঠলেই সেটা চলতে শুরু করবে। ত্রিবেণীর ডিহিদারের ওপর হুকুম আছে বেগমদের হালসীবাগান পর্যন্ত পোঁছিয়ে দিয়ে তবে তার ছুটি।

উদ্ধব দাস আবার চুপিচুপি জিজ্ঞেস করলে—ও কোন্‌ বেগম গো?

একজন সেপাই বললে—ও নানীবেগমসাহেবা আর...

হঠাৎ হৈ-হৈ পড়ে গেছে। একজন সেপাই ধরে ফেলেছে উদ্ধব দাসকে। মারে একেবারে মারে আর কি!

উদ্ধব দাসও তখন চেঁচাচ্ছে—তোমরা বলো আগে ও মরিয়ম বেগম কিনা—

ভাগো ই'হাসে—ভাগো—

—উনি যে বাবুমশাই-এর বউ গো—তোমরা বাবুমশাই-এর বউকে চেহেল্‌-সুতুনে চুরি করে ধরে রেখেছো।

ছোটমশাই বজরার ওপর থেকে বেশ স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিলেন কথাগুলো। এ

পাগলটার কি ভয়-ডর নেই। এইবার বোধ হয় পাগলাটাকে ধরবে ওরা। ধরে নিয়ে যাবে। চারদিকে বড় কুয়াশা। ভালো করে দেখা যায় না, শুধু কথাগুলো শোনা যায়। ওরা যত চেঁচায়, এও তত চেঁচায়।

এতক্ষণে ডিহিদারের কানে গেছে কথাটা। ক্যা হুয়া?

উদ্ধব দাস হাতজোড় করে ডিহিদারকে বললে—হুজুর, ধর্মাবতার, আমাদের বাবুমশাই-এর বৌকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে এরা।

—বাবুমশাই-এর বউ? কোন্ বাবুমশাই? তুমি কে?

—আজ্ঞে, আমি হরির দাস উদ্ধব দাস। আমাকে সেপাই-বাবাজী বললে, মরিয়ম বেগমসাহেবা যাচ্ছে, তাই আমি বললাম উনি তো বাবুমশাই-এর বউ, তোমরা ওঁকে মরিয়ম বেগমসাহেবা নাম দিয়েছো—ওঁকে ছেড়ে দাও।

সেই ভোর বেলা ত্রিবেণীর ঘাটে সেদিন সে এক কাণ্ড শুরু হয়ে গেল। ঘাটের অন্য দিকে যে-সব নৌকো বাঁধা ছিল হল্লা-চিৎকার শুনে মাঝি-মাল্লারা তখন জেগে উঠেছে। হল্লা শুনে তারাও ঘাটের ওপর গিয়ে হাজির হয়েছে। সেই ঝাপসা অন্ধকারের মধ্যেই ভিড় জমে গেল চারদিকে।

হুজুর, আমি কী অপরাধ করলাম? আমি তো কারো গায়ে হাত তুলিনি।

বোধ হয় বেশি কথা শোনবার লোক নয়। হুকুম দিলে—বাঁধো একে—

—তা, বাঁধো বাবাজী, কেউ আমাকে বাঁধতে পারেনি, দেখো, তোমরা যদি পারো—

—তোকে বাঁধতে পারিনে ভেবেছিস?

উদ্ধব দাস বললে—হুজুর, কেউ কি কাউকে বাঁধতে পারে? ভালবাসাই তো একমাত্র বন্ধন হুজুর, সে কি আপনাদের আছে? তাহলে একটা ছড়া শুনবেন হুজুর? আমি ভালোবাসা নিয়েই একটা ছড়া লিখেছি—শুনুন—

আশার অধিক দেয় যদি তাকেই বলে দান।
পণ্ডিত যারে মান্য করে তাকেই বলে মান॥
দরিদ্র দুর্বলে দয়া তাকেই বলে পুণ্য।
স্বনামে যে বিক্রিত হয় তাকেই বলি ধন্য॥
দেবতায় করে বশীভূত তাকেই বলি সাধ্য।
ভোজনে অমৃতগুণ তাকেই বলে খাদ্য॥
বাহুবলে করে যুদ্ধ তাকেই বলি বীর।
আখের ভেবে কর্ম করে তাকেই বলি ধীর॥
ইশারায় কর্ম করে তাকেই বলি বশ।
মফস্বলে ব্যাখ্যা করে তাকেই বলি যশ॥
দশের কাছে দুষ্য হয় না তাকেই বলি ভাষা।
অন্তরেতে ভালোবাসে তাকেই ভালোবাসা॥

উদ্ধব দাস আরো বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু ডিহিদার মশাই-এর বোধ হয় একটু রসবোধের অভাব ছিল। বললে—থাম্-থাম্, পাগলা!

তারপরে সেপাইদের একজনকে কী ইঙ্গিত করতেই সে উদ্ধব দাসের কাছে এসে তার গলাটা ধরলে। ধরে বললে—চল্—

সামান্য শাস্তিতে বোধ হয় ডিহিদার খুশী হলো না। বললে—হাত দুটো বাঁধ আগে ওর—

উদ্ধব দাসও হাত দুটো বাড়িয়ে দিলে। বললে—এই নাও বাবাজী, বাঁধো—

কিন্তু সেপাইরা অত সহজ মানুষ নয়। তারা যাকে বাঁধে তাকে মরণ-বাঁধন দিয়েই বাঁধে। পালকির ভেতরে তখন বেগমসাহেবারা তৈরি। পালকিও যাবে, সঙ্গে সঙ্গে উদ্ধব দাসকেও বেঁধে নিয়ে যাওয়া হবে।

দূর থেকে ছোটমশাই সব দেখছিলেন। পাগলটার যেন কোনো ভয়-ভীতি নেই। সেপাইদের সঙ্গে সমানে ছড়া কেটে চলেছে। কুয়াশাও তখন বেশ কেটে এসেছে চারদিকে। অল্প-অল্প আলো ফুটে বেরোচ্ছে।

হঠাৎ এক কাণ্ড ঘটলো ওদিকে।

অত লোক-জন, অত সেপাই মাঝি-মল্লা, সবাই থমকে গেছে কাণ্ড দেখে। পালকির ভেতর থেকে বেগ ছুটে বেরিয়ে এসেছে দিনের আলোয়। এমন ঘটনা স্বাভাবিক নয়, সহজও নয়।

—ছেড়ে দাও, ওকে ছেড়ে দাও—

সারা শরীর বোরখায় ঢাকা। মুখ দেখা যাচ্ছে না। তবু কথা বুঝতে কারো অসুবিধে হলো না। যে-সেপাই উদ্ধব দাসের হাত বাঁধছিল সে হতভম্ব হয়ে রইলো। এতক্ষণে যেন ডিহিদার সাহেবেরও হুঁশ হলো।

—ছাড়ো—

উদ্ধব দাস কিন্তু অবাক হয়নি। সেই অবস্থাতেই ছড়া কেটে উঠলো—অন্তরেতে ভালোবাসে তাহাই ভালোবাসা—

ডিহিদার কোনো উপায় না পেয়ে সেপাইকে উদ্ধব দাসের হাত ছেড়ে দিতে বললে।

ধমকে উঠলো মরালী—কেন ওকে ধরলে তোমরা? কী করেছে ও?

উদ্ধব দাস বললে—আমি কিছুই অপরাধ করিনি মা-ঠাকরুণ, এরা শুধু শুধু আমাকে বাঁধছে—

ডিহিদার বললে—না বেগমসাহেবা, এ লোকটা আমার সেপাইকে জিজ্ঞেস করছিল বেগমসাহেবারা কোথায় যাচ্ছে, বেগমসাহেবার নাম মরিয়ম বেগম কিনা, এই সব—

—না মা-ঠাকরুণ, আমি তা জিজ্ঞেস করিনি, বাবুমশাই আমার সঙ্গে বজরাতে রয়েছেন, তার বউকে নবাবের লোকরা পরোয়ানা দিয়ে চেহেল্-সুতুনে নিয়ে গিয়ে মরিয়ম বেগম নাম দিয়ে দিয়েছে—

—কোথায় বাবুমশাই?

—আজ্ঞে হুঁই যে মা-ঠাকরুণ, হুঁই যে বজরার ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছেন, সিঁদুর-পানা চেহারা—আপনি তো ওরই বউ মা-ঠাকরুণ! আপনার জন্যে উনি কেঁদে কেঁদে মরছেন।

ডিহিদার আর থাকতে পারলে না। বললে—চোপরাও—

বোরখার আড়াল থেকে ধমকানি এল—আপনি থামুন, আপনি নবাবের নৌকর, আমি বেগমসাহেবা কথা বলছি এর সঙ্গে, আপনি কোন্ এক্তিয়ারে বাধা দিচ্ছেন?

ডিহিদার চুপ করে গেল।

উদ্ধব দাস বললে—কেন মিথ্যে-মিথ্যে চেঁচামেচি করছেন ডিহিদার সাহেব, আমি তো হরির দাস উদ্ধব দাস, আমি তো প্রভুর কোনো ক্ষতি করিনি—বেগম-সাহেবাদেরও কোনো বে-ইজ্জৎ করিনি—

তারপর একটু থেমে বললে—তা ছাড়া আমার নিজেরই তো বউ পালিয়ে গেছে প্রভু—

—তোমার বউ পালিয়ে গেছে নাকি?

পাশ থেকে কে একজন ফুট্ কাটলো।

—আজ্ঞে হ্যাঁ প্রভু, আমার নিজের বউ, আমার নিজের বিয়ে-করা বউ প্রভু, বিয়ের রাতে বাসর ঘর থেকে পালিয়ে গেছে—

—তা বউ পালিয়ে গেছে আর তুমি ফ্যা ফ্যা করে হাসছো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, হাসি আর গান গাই। সেই বউ নিয়েই তো ছড়া বেঁধেছি, আমি রবো না ভব-ভবনে—! গানটা গাইবো মা-ঠাকরুণ?

মরালী বললে—না,—

—আজ্ঞে মা-ঠাকরুণ, গাই না! দেখবেন কেমন সোন্দর সুর, যে শোনে সেই বলে বাহা—সব্বাই গানটা শুনে বাহা দেয়—

—তা দিক, আমার শোনবার সময় নেই। তুমি কোথায় থাকো?

ডিহিদার বুঝতে পারলে না বেগমসাহেবা কেন এত কথা বলছে পাগলাটার সঙ্গে।

উদ্ধব দাস বললে—আমার কথা আর কী শুনবেন মা-ঠাকরুণ, আমার কথা শোনবার মত নয়—আমি ভিখিরি, দেবাদিদেব শিবও যেমন আমিও তেমনি—দুজনেই ভিক্ষে করে বেড়াই, দুজনেরই সংসার থেকেও সংসার নাই—

তারপর মরালীর দিকে চেয়ে বললে—বাবুমশাইকে তাই তো বলছিল মা-ঠাকরুণ, আপনার বউ চলে গেছে ভালোই হয়েছে বাবুমশাই, আমার মতন ভিখিরি সেজে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ুন, দেখবেন আর কোনো দুঃখু থাকবে না—

ডিহিদার সেপাইরা অনেকক্ষণ সহ্য করেছে। আর দেরি সহ্য হচ্ছিল না কারো। কিন্তু নবাবের বেগমসাহেবা নিজে কথা বলছে, তাতে বাধা দেয়ই বা কী করে? ওদিকে অনেকখানি সকাল হয়ে গেছে। হুকুম ছিল ত্রিবেণীতে বজরা থেকে নামবার সঙ্গে সঙ্গে শিবিকা তৈরি থাকবে, সেই শিবিকা বেগমসাহেবাদের নিয়ে সোজা গন্তব্যস্থানের দিকে যাবে। নবাবগঞ্জেও খবর দেওয়া হয়ে গেছে। সেখানেও ডিহিদার আছে। সেই নবাবগঞ্জের ডিহিদার আবার শিবিকা পৌঁছে দেবে হালসীবাগানে।

ডিহিদার সাহেব আবার সামনে এসে কুর্নিশ করে দাঁড়ালো।

—বেগমসাহেবা, তাঞ্জাম নবাবগঞ্জে পৌঁছুতে তাওয়াক্কুফ্ হয়ে যাবে—

মরালী ডিহিদারের দিকে ফিরে ধমকে উঠলো—থামুন আপনি, বেগমসাহেবার সঙ্গে কেমন করে কথা বলতে হয় তার কায়দা জানেন না—

নানীবেগমসাহেবা অনেকক্ষণ ধরে তাঞ্জামের ভেতরে অপেক্ষা করছিল। কিন্তু আর পারলে না। তাঞ্জাম থেকে বেরিয়ে সোজা মরিয়ম বেগমসাহেবার কাছে এল। মেয়ে কার সঙ্গে কথা বলছে এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে!

মরালী বললে—যাচ্ছি নানীজী, চলো,—বলে নানীজীর দিকেই এগিয়ে যাচ্ছিল।

হঠাৎ পাগলা উদ্ধব দাস একটা কাণ্ড করে বসলো। বললে—মা-ঠাকরুণ কি চলে যাচ্ছেন?

—কী রে মেয়ে, কার সঙ্গে কথা বলছিস? দেরি হয়ে যাচ্ছে যে!

—এই উল্লুক! বলে ওদিক থেকে ধমকে উঠলো একজন শান্ত্রী!

কিন্তু আশ্চর্য! উদ্ধব দাস সে-কথায় কানই দিলে না। গালাগালি দিয়ে উদ্ধব

দাসকে রাগানো যায় না। উদ্ধব দাসের কাছে গালাগালিও যা, স্তুতিও তাই।

বললে—আমার যে একটা কথা ছিল মা-ঠাকরুণ—

মরালী ফিরে দাঁড়ালো—আমার সঙ্গে?

—হ্যাঁ মা-ঠাকরুণ।

—বলো! বলে মরালী উদ্ধব দাসের কাছে এসে দাঁড়ালো।

উদ্ধব দাস বললে—সকলের সামনে তো বলা যাবে না, আপনাকে একটু অন্তরালে বলবো—

নানীবেগমসাহেবা পেছন থেকে বললে—ও মেয়ে, আবার কার সঙ্গে কথা বলছিস? কে ও?

মরালী বললে—দাঁড়াও নানীজী, আমি ওর সঙ্গে একটু কথা বলে আসি—

—ওর সঙ্গে তোর এত কী কথা? তোর সকলের সঙ্গে কী এত কথা থাকে রে?

মরালী বললে—শুনিই না নানীজী, কী বলতে চায় ও?

বলে উদ্ধব দাসের দিকে চেয়ে বললে—এসো—

ঘাটের ওপর যেখানটায় অশথ গাছটা ছিল সেখান থেকে একটু এগিয়েই একটা মন্দির। মন্দিরের ওপাশে একটু ঝোপ-ঝাড়ের মতন। বজরার গলুই-এর ওপর থেকে ছোটমশাই এতক্ষণ সব কান্ড দেখছিলেন। চারদিকে বেশ ফরসা হয়ে এসেছে। সবাই চুপচাপ উদ্ধব দাসের দিকে চেয়ে আছে। পাগলাটার সাহস দেখে সবাই তাজ্জব হয়ে গেছে। এত সেপাই-শান্ত্রী, ডিহিদার সাহেব নিজে দাঁড়িয়ে, আর পাগলা-লোকটা কি না বেগমসাহেবার সঙ্গে বেশ ভাব জমিয়ে ফেললে!

ছোটমশাই গলুই-এর ওপাশে সরে গিয়ে দেখতে লাগলেন। যতটা স্পষ্ট দেখা যায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর দেখা গেল না। পাগলাটা বোরখা-পরা বেগম-সাহেবার সঙ্গে মন্দিরের আড়ালে চলে গেল। সত্যিই কি ছোটবউরানী নাকি! পাগলাটা তো ঠিক ধরেছে? পাগলা হলে কী হবে, লোকটার তো চোখ আছে!
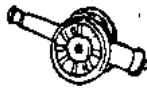
গোবিন্দ মিত্তিরের বাগানবাড়িতে তখন নবাবের ছাউনি পড়েছিল। কান্ত শেষ রাতে ঘুম থেকে উঠে চিঠি লিখছিল—'তোমাকে এ ক'দিন চিঠি লিখতে পারিনি মরালী। এ ক'দিন যে কী-রকম করে কেটেছে তা ভগবানই জানেন। তুমি আমাকে যে ভার দিয়েছো তা বর্ণে বর্ণে পালন করার চেষ্টা করছি। কিন্তু আমি একলা কত পারবো। শেষ পর্যন্ত নবাব ভীষণ বিপদে পড়েছিলেন। আমরাও সবাই বিপদে পড়েছিলুম। ফিরিঙ্গীরা যে এত ফন্দিবাজ তা আগে কেউ জানতে পারেনি। আমাদের ফৌজ নিয়ে পালাতে হয়েছিল হালসীবাগান ছেড়ে। সে এক বিপর্যয় কান্ড। শেষ পর্যন্ত যদি কন্নড় দেশ থেকে ফরাসী জেনারেল বুশীসাহেব এসে পড়তো তাহলে আর এমন হতো না। ওদিক থেকে আহ্‌মদ শা আব্‌দালির মথুরা করে দিল্লী চড়াও হবার খবর কানে আসাতে নবাব কেমন হয়ে গেছেন। ক'দিন ধরেই দেখছিলাম নবাব খুব মন-মরা। আমি কী করবো! ওদিকে জগৎশেঠজীর দেওয়ান রণজিৎ রায় মশাই এসে পরামর্শ দিলেন ফিরিঙ্গী-কোম্পানীর সঙ্গে মিটমাট করে নিতে।'

বাইরে থেকে কে যেন ডাকলে—ও কান্ত, কান্ত!

শীতের দিনে অত ভোরে আবার কে ডাকে? তাড়াতাড়ি চিঠিটা বিছানার তলায় লুকিয়ে রেখে বাইরে এল কান্ত।—কে?

—আমি শশী গো? কী করছিলে? চিঠি লিখছিলে নাকি?

কান্ত বললে—তুমি এত সকালে? কী খবর?

—ভাই, খবর তো আমার কাছে নয়, তোমার কাছেই। খবর নিতেই তো এসেছি।

কান্ত বললে—আমার কাছে আর কোনো নতুন খবর নেই—

শশী বললে—রণজিৎ রায় লোকটা ভালো নয় তো ভাই—

—কেন?

শশী বললে—বেশ তো লড়াই চলছিল, ও বেটা আবার কী করতে এল? যুদ্ধ-টুদ্ধ সব থামিয়ে দেবে নাকি?

কান্ত চেপে গেল। বললে—তা জানি না—

—তা হলে ওদের ক্লাইভ আর ওয়াটসন্ সাহেব দুজনে নবাবের সঙ্গে দেখা করতে এল কেন? মিটমাটের কথা বলতে বুঝি?

কান্তর এমনিতেই বিরক্তি লাগছিল। তাড়াতাড়ি চিঠিটা শেষ করে ফেলা যেত। কিন্তু তা হবার নয়।

শশী চলেই যাচ্ছিল। হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে বললে—একটা কথা তোমাকে ক'দিন ধরে ভাই জিজ্ঞেস করবো-করবো ভাবছি—তোমার বিয়ে হয়ে গেছে নাকি?

কান্ত অবাক হয়ে গেল শশীর কৌতূহল দেখে।

বললে—কেন? ও-কথা জিজ্ঞেস করছো কেন?

—না, দেখি কি না, তুমি রোজ রাত জেগে চিঠি লেখ। এত চিঠি বউ না থাকলে আর কাকে লিখবে!

কান্ত বললে—কেন, বিয়ে না করলে আর কারোর খবর নিতে নেই? মানুষের কি বউ ছাড়া আর কেউ থাকতে নেই? বাপ-মা-ভাই-বোনও তো থাকে মানুষের।

শশী বললে—কিন্তু তুমি তো নিজেই বলছো তোমার সংসারে কেউ নেই!

কান্ত বললে—তা তো বলেছি, কিন্তু পরও তো সময়ে-সময়ে নিজের মানুষের চেয়ে আপন হয়—

শশী বললে—সে তো হলো মনের মানুষ! তোমার আবার তেমন মনের-মানুষ কেউ আছে নাকি?

—না ভাই, আমি লিখি সারাফত আলি সাহেবকে।

—সারাফত আলি? সে আবার কে?

—সে মুর্শিদাবাদের চক্-বাজারে একজন খুশ্‌বু-তেলওয়ালা!

—কিন্তু সে তো মুসলমান!

—তা মুসলমান কি মনের মানুষ হয় না? তুমি তো হাসালে দেখছি—

শশীর যেন ভুল ভাঙলো। বললে—না, আমি ভেবেছিলুম তোমার বউ আছে, সেই বউ-এর কথা ভেবে ভেবে রাত জেগে তাকে চিঠি লেখো—

বাইরে তখন বেশ আলো হয়েছে। এখনি সব ফৌজের সেপাইরা কুচ-কাওয়াজ করতে বেরোবে। দাঁতন নিয়ে সবাই মুখ ধুতে যাচ্ছে। তৈরি হয়ে নিতে হবে তাড়াতাড়ি। শশীর আর সময় ছিল না। শশী চলে যেতেই কান্ত চিঠিটা বার করে আবার লিখতে বসলো।

এদিকে ত্রিবেণীর ঘাটের ওপর শিবের মন্দিরটার আড়ালে যেতেই মরালী উদ্ধব দাসের দিকে চেয়ে বললে—কী বলবে, বলো।

উদ্ধব দাস বললে—আমার শুধু একটি জিজ্ঞাসা মা-ঠাকরুণ, আমি শুধু আপনার আসল নামটি জিজ্ঞেস করবো—আপনার নামই কি মরিয়ম বেগম?

মরালী বললে—হ্যাঁ—

—তাহলে আপনিই তো বাবুমশাই-এর বউ?

মরালী বললে—না—

কেমন যেন সন্দেহ হলো উদ্ধব দাসের। বললে—আপনি মা-ঠাকরুণ মিছেই নারাজ হচ্ছেন, আপনি ভাবছেন আপনি মুসলমান হয়ে গেছেন বলে বাবুমশাই আপনাকে গ্রহণ করবেন না। কিন্তু তিনি আপনার জন্যে পাগল মা-ঠাকরুণ।

মরালী বললে—কিন্তু বাবুমশাই-এর জন্যে তোমার এত টান কেন? তুমি কী করো?

—আমি? আমি কিছুই করিনে মা-ঠাকরুণ। আমি ছড়া বানাই আর হরির নাম করি—আমি ভক্ত হরিদাস—আমার নাম উদ্ধব দাস, আজ্ঞে।

—তোমার সংসার নেই?

উদ্ধব দাস বললে—সংসার করা আমার হলো না মা-ঠাকরুণ! আমার কথা ছেড়ে দেন—

—তোমার বউ ছেলেমেয়ে?

—বউই নেই তার ছেলেমেয়ে!

—তুমি বিয়ে করোনি?

—করেছিলুম মা-ঠাকরুণ! কিন্তু বিয়ের রাতেই আমার বউ পালিয়ে গেল—

—তারপর?

—তারপর আর কী মা-ঠাকরুণ! তারপরে আর কিছু নেই!

মরালী জিজ্ঞেস করলে—কেন, তোমার বউ পালিয়ে গেল কেন?

—আজ্ঞে মা-ঠাকরুণ, পালিয়ে তো যাবেই, আমার মত বাউণ্ডুলে বরের সঙ্গে কে ঘর করবে তাই বলুন? আর আমি যে কুরূপ মা-ঠাকরুণ। কে আমাকে পছন্দ করবে! আমি তাই একটা ছড়া বেঁধেছি মা-ঠাকরুণ, শুনবেন? শুনুন—

—না, ছড়া থাক্। তুমি আর একটা কথার উত্তর দাও।

—কী, আজ্ঞে করুন—

—তোমার বাবুমশাই কি হাতিয়াগড়ে থাকেন?

—তা তো জিজ্ঞেস করিনি মা-ঠাকরুণ, আমার নিজের বিয়ে হয়েছিল হাতিয়াগড়ে—তা আমার সঙ্গে বাবুমশাই-এর পথে দেখা। আমি গিয়েছি বরানগরে ক্লাইভ সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে, এদিকে বাবুমশাইও গিয়েছেন—

—ক্লাইভ সাহেব? ক্লাইভ সাহেবকে তুমি চেনো?

উদ্ধব বললে—তা চিনবো না? ক্লাইভ সাহেব যে আমাকে কবি বলে খুব খাতির করে মা-ঠাকরুণ। আমার ছড়া শোনে, আমার গান শোনে। ক্লাইভ সাহেবের ছাউনিতেই আমার বউ ছিল যে—সাহেব বড় ভালো লোক—

বোরখার ভেতরে মরিয়ম বেগম যেন উসখুস করতে লাগলো।

বললে—তোমার বউ ক্লাইভ সাহেবের কাছে?

—আজ্ঞে, হ্যাঁ মা-ঠাকরুণ! আমি কথা বলতে গেলাম। ভাবলাম জিজ্ঞেস করবো কেন আমার কাছ থেকে পালিয়ে গেল, কিন্তু আমার সঙ্গে কথাই বললে না—আমার সামনে বেরোলই না—সাহেব অনেক বললে তবু বেরোল না—

—তা তোমার বউ সাহেবের কাছে এল কী করে?

—তা কী করে বলবো মা-ঠাকরুণ!

—সাহেবের কাছেই থাকে নাকি এখনো?

—হ্যাঁ মা-ঠাকরুণ, এখনো থাকে, তবে এবার যখন দেখা হলো, বললেন, তাদের কোথায় পাঠিয়ে দিয়েছেন। যুদ্ধ-বিগ্রহ হচ্ছে কি না, তাই ছাউনির ভেতরে আর রাখতে সাহস হয়নি। আমরা যখন ফিরে আসছিলাম তখন আজ্ঞে কামানের গোলার শব্দ পেলাম—খুব কামানের লড়াই হয়ে গেল নবাবের সঙ্গে—

—নবাব কোথায় তা জানো তুমি?

—আজ্ঞে না মা-ঠাকরুণ! আমি ভিখিরি মানুষ, নবাব-বাদশাদের খবর জেনে আমার কী লাভ? ছড়া বানিয়ে আমি নবাবি-সুখ পাই।

বোরখাটা আবার নড়ে উঠলো। বেগমসাহেবা বললে—আমার একটা কথা রাখবে তুমি?

—আজ্ঞা করুন।

—তুমি আবার একটা বিয়ে করে ফেল।

—না মা-ঠাকরুণ! একবার বিয়ে করেই ভুল করে ফেলেছি, আর করবো না। আমাকে বিয়ে করে কোনো কন্যাই সুখী হবে না—

বেগমসাহেবা বললে—ক্লাইভ সাহেবের ঘর করছে বলে তোমার আপত্তি?

—না মা-ঠাকরুণ, আমি জাত মানিনে, আমার বউ যদি মুসলমানের ছোঁয়া অন্নও খেত তাতেও আমি আপত্তি করতাম না—

—তোমার বউ মুসলমান হয়েছে নাকি?

—হলেও হতে পারে মা-ঠাকরুণ। মুসলমান হওয়া কি খারাপ? আমরাও যেমন মানুষ তাঁরাও তেমনি মানুষ তো! মানুষ মাত্তোরই তো হরি মা-ঠাকরুণ? তাঁদের মধ্যেও হরি আছেন, তাই তো আমি হরির মধ্যেই মানুষকে দেখতে পাই, আবার মানুষের মধ্যে হরিকে। আমি হরি নিয়ে একটা ছড়া বেঁধেছি, একটু শুনবেন আজ্ঞে?

—না, আমি এখন হালসীবাগানে যাচ্ছি, আমার সময় নেই। যদি আমি কখনো তোমাকে ডেকে পাঠাই তুমি আমার সঙ্গে দেখা করবে?

—কেন করবো না মা-ঠাকরুণ? আমি এমন কী একটা পীর-পয়গম্বর মানুষ! অধীনকে যখনই ডাকবেন, তখনই...

হঠাৎ নানীবেগম এসে হাজির।

—ওরে মেয়ে, ওদিকে যে সব্বোনাশ হয়েছে রে, মীর্জা লড়াইতে হেরে গিয়ে ফিরে আসছে!

মরালী বললে—কী বলছো নানীজী?

তারপর উদ্ধব দাসের দিকে চেয়ে বললে—তুমি এখন যাও, পরে তোমাকে ডাকবো—

উদ্ধব দাস বললে—তা তো যাচ্ছি মা-ঠাকরুণ, কিন্তু বাবুমশাইকে গিয়ে কী

বলবো বলে যান? বাবুমশাই যদি আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান তো আপনি দেখা করবেন তো?

—কী করে দেখা করবো?

—যেমন করে আমার সঙ্গে দেখা করবেন বলেছেন, তেমনি করে দেখা করবেন!

—তোমার কথা আলাদা।

উদ্ধব দাস বললে—কেন মা-ঠাকরুণ, আমি কেন আলাদা হতে যাবো? আপনার নিজের স্বামীর সঙ্গে দেখা করবেন, আপনার অনিচ্ছা কীসের? আপনার স্বামীর চেয়ে কী আমি আপন হলাম মা-ঠাকরুণ!

মরিয়ম বেগম বললে—দেখ, আমার এখন অত কথা বলবার সময় নেই, তুমি কোথায় থাকো বলো, আমি তোমায় খবর পাঠাবো—

—তবেই হয়েছে! আমার কি আর থাকার ঠিক আছে মা-ঠাকরুণ।

নানীজী বললে—তোর কথা দেখছি আর শেষ হবে না, চল্!

মন্দিরের ওপাশে তখন আরো লোকজনের আনাগোনার শব্দ হচ্ছে। কুয়াশা নেমে গিয়ে দিন হয়েছে। নবাবগঞ্জের ডিহিদার এসেছে নতুন খবর নিয়ে। হালসীবাগান থেকে নবাব ছাউনি তুলে নিয়ে কোথায় চলে গিয়েছিল কেউ জানে না। সেখানে খবর দিতে গিয়েছিল ডিহিদার। নানীবেগমসাহেবা হালসীবাগানে আসছে সে-খবরটা নবাবকে না দিলে চলে কী করে! সেখানেও নবাব নেই। তারপর গিয়েছিল কলকাতার আরো দক্ষিণে। দক্ষিণে যাওয়াও অত সোজা নয়। ফিরিঙ্গীরা শহরের দক্ষিণে খাদ কেটে রেখেছিল। নবাবের ফৌজের সঙ্গে ফিরিঙ্গীদের ফৌজের খুব একচোট লড়াই লেগে গিয়েছিল সেখানে। শেষকালে দেখা পাওয়া গেল গোবিন্দ মিত্তিরের বাগানবাড়িতে। সেখান থেকে সব খবর নিয়ে সোজা ঘোড়া ছুটিয়ে ডিহিদার নিজে চলে এসেছে ত্রিবেণীতে।

—বেগমসাহেবা কি এখন হালসীবাগানে যাবেন?

দুজনেই তাঞ্জামের ভেতরে তখন উঠে বসেছে। নানীবেগম বললে—হ্যাঁ; চলো—

—কিন্তু সেখানে গিয়ে কোনো ফয়দা নেই বেগমসাহেবা, নবাব ছাউনি তুলে নিয়ে ফিরে আসছেন—ফিরিঙ্গী কোম্পানীর সঙ্গে সব ফয়সালা হয়ে গিয়েছে, ডিহিদার নিজে এসেছে খবর দিতে—

নানীবেগম বললে—ফয়সালা হয়ে গিয়েছে? বিলকুল?

মরালী বললে—তা হোক ফয়সালা, তবু চলো নানীজী, রাস্তায় নবাবের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে—

হুকুম হয়ে যেতেই ডিহিদারের দল তাঞ্জাম কাঁধে তুলে নিলে। সেপাই-এর দল সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে চলতে লাগলো। মাঝি-মাল্লারা আবার সবাই যে-যার নৌকোয় গিয়ে উঠলো।

ছোটমশাই হাঁ করে বসে ছিলেন। উদ্ধব দাস বজরায় আসতেই সামনে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—কী কথা হচ্ছিল তোমার সঙ্গে এতক্ষণ? ও কে? জানতে পারলে নাকি কিছু?

উদ্ধব দাস বললে—উনি আপনারই সহধর্মিণী আজ্ঞে—

—কী করে জানলে? জিজ্ঞেস করলে নাকি? কী নাম?

—মরিয়ম বেগম! প্রথমে কিছুতেই স্বীকার করতে চান না। শেষে বললাম

বাবুমশাই আপনাকে আবার ফিরিয়ে নেবেন মা-ঠাকরুণ, আপনি ফিরে চলুন—

—তুমি বললে ওই কথা?

—তা বলবো না? মুসলমান হলে কি একেবারে জাত চলে গেল মানুষের? মুসলমানরা কি মানুষ নয়, মানুষ? চলুন আজ্ঞে, এবার লড়াই থেমে গেছে, আবার বাগবাজারে যাই-

—লড়াই থেমে গেছে! কে বললে?

—ওই তো নবাবগঞ্জের ডিহিদার নিজে এসে খবর দিয়ে গেল, এখন দু' দলে ভাব হয়ে গেছে। এখন তো আর কামান ছোঁড়াছুঁড়ি হচ্ছে না সেখানে, ভয় কী আপনার?

ছোটমশাই বললেন—কিন্তু নবাব যে তাহলে আরো বেড়ে উঠবে! একে সবাই নবাবের জ্বালায় অস্থির হয়ে উঠেছি, এর পর যে হাতে মাথা কাটবে—

উদ্ধব দাস বললে—আমার কোনো ভয় নাই আজ্ঞে, আমি ভিখিরি মানুষ, আমায় আবওয়াবও দিতে হয় না, মাথট্‌ও দিতে হয় না—আমি হরির দাস, আমি মাথট্ দিই হরিকে—আমার একটা ছড়া শুনবেন? শুনুন—

বলে উদ্ধব দাস ছড়া আরম্ভ করলে—

যে বিদ্যায় ফল নাই
তাকে, মিথ্যা বিদ্যা জানি।
যে ব্যবসায় লভ্য নাই
তাকে নাহি মানি॥
যে-পুষ্প নয় দেবের আধার
মিথ্যা তাকে ধরা।
যে-ভূষণে শোভা নাই
মিথ্যা তাকে পরা॥
যে-কার্যের যশ নাই
মিথ্যা সেই কার্য॥
যে-রাজ্যে বিচার নাই
মিথ্যা সেই রাজ্য॥
যে-গৃহে অতিথি নাই
মিথ্যা সেই গৃহ।
যে-দেহেতে ধর্ম নাই
মিথ্যা সেই দেহ॥
যে-দ্রব্যে রস নাই
মিথ্যা তাহার মান।
যে-গীতে নাই হরির নাম
মিথ্যা সেই গান॥

ছড়া থামিয়ে উদ্ধব দাস বললে—চলুন বাবুমশাই, এখন আপনার গৃহিণীর তো সন্ধান পাওয়া গেল, এবার আমার গৃহিণীর সন্ধান পাই কি না চলুন দেখি গিয়ে—

—কোথায় যাবো?

—কেন, আবার সেই ক্লাইভ সাহেবের ছাউনিতে। তখন তো লড়াই হচ্ছিল বলে চলে এসেছিলুম, এখন তো লড়াই থেমে গেছে, এখন আপনার আর ভয় কী?

আর আপনিও ক্লাইভ সাহেবকে গিয়ে বলবেন যে আপনার সহধর্মিণীর সাক্ষাৎ পেয়েছেন—

ছোটমশাই আবার বাগবাজারের পেরিন সাহেবের বাগানের দিকে ফিরে চললো।

"বাদ্‌শাহী ফার্মান অনুসারে কোম্পানী সমস্ত বাণিজ্যাধিকার পুনঃপ্রাপ্ত ২২৮ । কোম্পানী কলিকাতার দুর্গ-সংস্কার করিতে পারিবেন। কলিকাতায় টাঁকশাল নির্মাণ করিয়া, কোম্পানীর নামে মুদ্রিত টাকা প্রচলন করিবার অধিকার পাইবেন। এই মুদ্রায় কোনো বাটা দিতে হইবে না। কোম্পানীর যে-সমস্ত কুঠি নবাব দখল করিয়াছেন তাহা ছাড়িয়া দিবেন। এবং বিগত আক্রমণে তাঁহাদের যে সমস্ত দ্রব্যাদি লুণ্ঠিত হইয়াছে তাহা প্রত্যর্পণ করিবেন। অথবা ন্যায়বিচারে ঐ সমুদয় নষ্ট দ্রব্যের যাহা মূল্য হয় তাহা দিবেন।"

বার বার সন্ধিপত্রটা পড়া হলো। জগৎশেঠজীর দেওয়ান নিজে খসড়াটা তৈরি করেছিল। কোথাও কোনো ফাঁক না থেকে যায়। কান্ত ক'দিন থেকেই পাশে পাশে থেকেছে। একবারও কাছ-ছাড়া হয়নি। ঘুমের মধ্যেও নবাবকে যেন কথা বলতে শুনেছে সে। পাশের ঘর থেকে উঠে এসে দেখেছে। যারা পাহারা দেয় বন্দুক নিয়ে তারাও তখন বসে বসে ঘুমের ঘোরে ঢুলছে।

কান্ত তাদের জাগিয়ে দিয়েছে। সজাগ করে দিয়ে বলেছে—ঘুমোচ্ছ কেন সেপাইজী—

তারা আচম্‌কা ঠেলা খেয়ে সামনে কান্তবাবুকে দেখে অবাক হয়ে গিয়েছে।

—দেখছো না বাবা, চারদিকে এত শত্রু, এ-সময় কি এমন করে ঘুমোতে আছে?

সেপাইটা বললে—কই, কোথায় ঘুমোচ্ছি—

—না বাপু, ঘুমিও না। তোমরাও যদি ঘুমোও তাহলে কার ভরসাতে নবাব ঘুমায় বলো তো? তোমরা মাইনে পাচ্ছো তোমাদের কাজের জন্যে, আর দেখছো তো নবাব কত ভাবনায় পড়েছে, একটা মানুষ নেই যে সৎ পরামর্শ দেয়—

সত্যিই একটা লোকও ছিল না সেদিন নবাবের সঙ্গে, যে নবাবের শুভাকাঙ্ক্ষী। সবাই আসতো। রাজা দুর্লভরাম, মীরজাফর, ইরাজ খাঁ, রণজিৎ রায়, মোহনলাল, উমিচাঁদ। সকলকেই বিশ্বাস করতে চাইতো, সকলের ওপরেই নির্ভর করতে চাইতো নবাব।

বাঙলা বিহার ওড়িষ্যার নবাব সকলকেই জিজ্ঞেস করতো—মেরা ক্যা গলৎ হ্যায়—

দেওয়ান রণজিৎ রায় বলতো—না জাঁহাপনা, আপনার কোনো গলৎ নেই, গলৎ ওদের, ওই ফিরিঙ্গী বোম্বেটেদের—

—তব্‌?

এই 'তব'এর উত্তর এক-একজন এক-এক-রকম দিতো। কেউ বলতো এখন কিছুদিন ওদের ঠান্ডা করে রাখা দরকার জাঁহাপনা। জেনারেল বুশী যতদিন না এসে পৌঁছোয় ততদিন ওদের ঠেকিয়ে রাখুন। তারপর আমরাই ওদের আবার

সাত-সাগর-তের-নদীর ওপারে পাঠিয়ে দেবো!

—কিন্তু আমার মীর বক্সী কি ওদের মীর বক্সীর চেয়ে কমজোরী? আমি একলা ওদের হঠিয়ে দিতে পারবো না? আমি কি বাঙলার নবাব নই? ওরা কি আমার চেয়েও বেশি তাকত্‌দার?

—না জাঁহাপনা, কেন আপনি ও-কথা বলছেন?

—তাহলে এতে দস্তখত্‌ দিতে বলছো কেন আমাকে?

—আপনার ভালোর জন্যেই দস্তখত্‌ করতে বলছি জাঁহাপনা।

—আমার ভালো আমি নিজে বুঝবো না, আর তোমরা আমার চেয়ে বেশি বুঝবে দেওয়ানজী?

রণজিৎ রায় বললে—জাঁহাপনা, আজ তিরিশ সাল আমি নিজামতের সঙ্গে কাজ করছি, বরাবর নিজামতের ভালোটাই দেখেছি, আজ হঠাৎ এমন কী হয়েছে যে আমি নিজামতের লোকসান করতে যাবো?

—ওরা কী বলে? মীরজাফর আলি খাঁ?

আবার সমস্ত বুঝেও মীরজাফর আলিকেই ডেকে পাঠালেন নবাব। মীরজাফর আলি খাঁ সাহেব তাড়াতাড়ি নবাবের খাসকামরায় ঢুকে সেই একই কথা বলেছিল। সবাই পরামর্শ করেই কথা বলছে। সবারই এক মত।

কান্ত সে-ক'দিন চুপ করে সব দেখেছে। চুপ করে সব শুনেছে। যখন ওয়াটসন্‌ আর ক্লাইভ সাহেব তুলোট্‌ কাগজটা পড়ে নবাবকে দস্তখত্‌ করতে দিলে তখন নবাবের হাত কাঁপছিল। কান্ত ভালো করে চেয়ে দেখেছে শুধু হাত কাঁপা নয়, নবাব দস্তখত্‌ করার আগে সকলের মুখের দিকেও একবার তাকালে। দেওয়ান রণজিৎ রায়ের দিকে চাইতে দেওয়ানজী মাথা নেড়ে সায় দিলে। আর সঙ্গে সঙ্গে কান্ত চমকে উঠলো। তার মনে হলো কলমটা সে কেড়ে নেয় নবাবের হাত থেকে। যে-হাত দিয়ে নবাব তরোয়াল চালাতে পারে সে-হাত দিয়ে যেন দাসখত্‌ লেখা মানায় না।

কিন্তু ক্লাইভ সাহেব তাতেও যেন খুশী নয়। বললে—এতে আরো দু'জনের দস্তখত্‌ চাই—

—কা'র কা'র?

—রাজা দুর্লভরাম আর মীরজাফর আলি খাঁ সাহেবের।

তারা দু'জন তৈরিই ছিল। তাড়াতাড়ি কলমটা নিয়ে দু'জনেই দস্তখত্‌ করে দিলে নবাবের দস্তখতের নিচেয়। সত্যিই এ দস্তখত্‌ নয়, দাসখত্‌। বাঙলা বিহার ওড়িষ্যার নবাবের দাসখত্‌। তামাম্‌ হিন্দুস্থানের দাসখত্‌। মোগল বাদশার দাসখত্‌। এই দাসখত্‌ নিয়েই নবাব সমস্ত হিন্দুস্থানের পত্তনি লিখে দিলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পায়ে। পরে অনেক দিন কান্ত ভেবেছিল, কেন সেদিন নবাবের হাত থেকে সে কলমটা ছিনিয়ে নেয়নি। ছিনিয়ে নিলে তার আর কী এমন শাস্তি হতো? কতটুকু শাস্তি হতো! আর সে-শাস্তির তুলনায় যে-শাস্তি সে পরে পেয়েছিল তার গুরুত্ব যে অনেক বেশি! সেদিনই তার মনে পড়ে গিয়েছিল চক্‌-বাজারের রাস্তার ধারের সেই গণৎকারের কথাটা! সেই তুচ্ছ বিনা-পয়সার ভবিষ্যৎ-বাণী যে তার জীবনে অমন করে অক্ষরে অক্ষরে ফলে যাবে তাই-ই কি সে আগে থেকে কোনো দিন কল্পনা করতে পেরেছিল?

কিন্তু সে-কথা এখন থাক।

আবার নবাবের ফৌজ সার বেঁধে চলেছে কলকাতা ছেড়ে। এবার আর বুক

চিতিয়ে চলতে পারছে না কেউ। সবাই যেন ঝিমিয়ে পড়েছে। কারো সঙ্গে লড়াই হলো না, কারো সঙ্গে শক্তি-পরীক্ষা হলো না, কে বীর কে ভীরু, কে শক্তিমান কে দুর্বল, তারও যাচাই হলো না, তবু একদল সমস্ত লজ্জা সমস্ত অপমান সমস্ত কলঙ্ক মাথায় নিয়ে মাথা নিচু করে ফিরে চলে গেল। আর একদল বিগ্‌ল্‌ আর ব্যাণ্ড বাজিয়ে সেদিন সারাটা রাত পেরিন সাহেবের বাগানে মদের ফোয়ারা ছুটিয়ে দিলে। কলকাতায় ফোর্টে সেদিন জয়ের উল্লাসে নাচের তাণ্ডব চললো সমস্ত রাত। যখন ফুর্তি করে করে হয়রাণ হয়ে পড়লো সবাই তখন কেল্লার ভেতরের ভাঙা চার্চটার ভেতর থেকে ব্যাণ্ডের শান্ত গম্ভীর মিউজিক বেজে উঠলো—গড্‌ সেভ্‌ দি কিং...

ভোর বেলাই ক্লাইভের ঘুম ভেঙে গেছে।

—কে?

পেরিন সাহেবের বাগানের প্রত্যেকটা গাছও তখন যেন বড় ক্লান্ত হয়ে বেশি বেলা পর্যন্ত ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যপাদে এসে সমস্ত হিন্দুস্থানই যেন তখন অসাড় হয়ে ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল। আমরা ভাবতাম তোমাদের রাজা-রাজড়াদের লড়াই হচ্ছে হোক, আমাদের তা নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই। আমরা জাতিভেদ নিয়ে মাথা ঘামিয়েছি, আমরা নতুন করে রঘুনন্দন মিশ্রকে দিয়ে মেল্‌বন্ধন করিয়ে নিয়েছি। সম্রাট আকবরের আমল থেকে সায়েস্তা খাঁর চট্টগ্রাম বিজয় পর্যন্ত আরাকানের মগ আর পর্তুগীজ জলদস্যুরা আমাদের ঘর-বাড়ি সমস্ত লুঠ করেছে। তারপর এসেছে সুদূর মারাঠা দেশ থেকে বর্গীরা। তবু আমরা রাঢ়ী বড় না বারেন্দ্র বড়, সেই সমস্যা নিয়েই মাথা ঘামিয়েছি, একবার চোখ মেলেও দেখিনি পর্যন্ত যে কে আমাদের রাজা, কে আমাদের বাদ্‌শা, কে আমাদের হর্তা-কর্তা-বিধাতা। আর দেশের যদি-বা কেউ রাজা-বাদশা থাকেও তো সে ভালো না খারাপ তা নিয়েও আমরা মাথা ঘামাইনি। ততক্ষণ আমরা পাশা খেলেছি দাবা খেলেছি, আর নয় তো ঘরের দাওয়ায় বসে ন্যায়শাস্ত্রের পুঁথি লিখেছি। ওদিকে হিন্দুস্থানের বাইরে যে আর এক সভ্যতা তার সর্বগ্রাসী ক্ষুধা নিয়ে পৃথিবীকে গ্রাস করবার জন্যে সাত-সাগর-তের-নদী পাড়ি দিয়েছে, তার খবরও আমরা রাখিনি। তখন আমরা সব বাচস্পতি মিশ্ররা মিলে কুলীনের গুণ ব্যাখ্যা করে তালপাতায় লিখেছি—

আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্‌।
নিষ্ঠাবৃত্তিস্তপো দানং নবধা কুললক্ষণম্‌॥

কিন্তু ক্লাইভ সাহেব ঘুমোবার জন্যে ইণ্ডিয়ায় আসেনি। আওয়াজ কানে যেতেই চেঁচিয়ে উঠেছে—কে?

—আমি হরিচরণ, সাহেব!

তাড়াতাড়ি দরজা খুলেই হরিচরণকে দেখে অবাক হয়ে গেছে।

—তুমি? ওরা কোথায়?

—আজ্ঞে, ওঁরাও এসেছেন। খবর পেলাম লড়াই থেমে গেছে, তাই আবার ওঁদের নিয়ে এখানেই ফিরে এলাম—

পেরিন সাহেবের বাগানের তখন একেবারে অন্য চেহারা। সেই বড় বড় দেবদারু গাছগুলোর পাতা আগুনের ঝলসানি লেগে শুকিয়ে গেছে। নবাবের কামানের যে-গোলাটা এসে বাগানের কাছাকাছি পড়েছিল সেখানে সেটা একটা বিরাট গর্ত তৈরি করে দিয়েছে। কোথায় হালসীবাগানের উমিচাঁদের বাগান, সেখান থেকে ফৌজের গোলন্দাজরা গোলা ছুঁড়েছিল এখানে। তারপর যে-কাণ্ডটা ঘটলো তা যেমন আকস্মিক তেমনি ভয়াবহ। রাত পোয়ালো কোনো রকমে, কিন্তু যখন ভোর হলো তখন চারদিকে আর কিছু দেখা যায় না। কেবল সাদা ধব্‌ধবে কুয়াশা আর কুয়াশা। ভিজে স্যাঁতসেঁতে জমির ওপর থেকে আকাশের মাথা পর্যন্ত সব কিছু কুয়াশায় ঢাকা।

যখন কুয়াশা কাটলো তখন বেশ বেলা হয়ে গেছে।

কিন্তু চোখ চাইতেই দেখা গেল নবাবের ছাউনির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ফিরিঙ্গী ফৌজ। তখন আর ফিরে আসা যায় না। ক্লাইভ তখন পাগলের মতন হয়ে গিয়েছে। সেখান থেকে আর ফেরবার উপায় নেই। তাড়াতাড়ি সকলকে চমকে দিয়ে অর্ডার দিলে—ব্যাটালিয়ান, ফায়ার—

কিন্তু যাকে ধরবার জন্যে এত আয়োজন, সেই নবাব তার আগেই হালসীবাগান ছেড়ে পালিয়েছে।

নবাবের সঙ্গের লোকজন তখন ধরে বসেছে—এখান থেকে সরে যেতেই হবে—

সমস্ত ঘটনাটা কান্ত নিজের চোখে দেখলে। কেউ যুদ্ধ করতে চায় না। শুধু শশী প্রাণপণে লড়ছিল। যখন পালিয়ে গিয়ে আবার ছাউনি গেড়েছিল দক্ষিণের জলাজমির পাশে, তখনো শশীর দুঃখ যায়নি।

যুদ্ধটা মিটে যেতে তারই বড় কষ্ট হয়েছিল।

বললে—তাহলে কী হবে ভাই কান্তবাবু, নবাব কেন মিটমাট করে নিলে?

যেন কান্ত মালিক। সেই কবে একদিন বেভারিজ সাহেবের গদীতে চাকরিতে ঢুকেছিল, তারপর নিজামতের চরের চাকরি থেকে কেমন করে এই নবাবের খিদ্‌মদ্‌গারের চাকরিতে ঢুকে পড়েছে! কে তার ভাগ্যকে নিয়ে এমন করে ঘুরিয়ে বেড়াচ্ছে?

—আমরা কি লড়াই করতে পারি না? আমাদের গায়ে কি জোর নেই ভাই? তুমিই বলো।

কান্ত বললে—নবাব যা ভালো বুঝেছে তাই করেছে, তুমি আমি তার কী বিচার করবো?

—তা তুমি নবাবকে বুঝিয়ে বলতে পারো না? আর তুমি না বুঝিয়ে বলতে পারো, আর কেউ নেই? আমাদের ফৌজ আর ওদের ফৌজ? ওরা তো পেট ভরে খেতেই পাচ্ছে না—

—খেতে পাচ্ছে না?

—আরে না। আমাদের চরেরা খবর এনেছে যে! আর দুটো দিন যদি চেপে থাকতে পারতো তো ওরা সুড় সুড় করে পগার পার হয়ে যেত।

—তুমি ঠিক জানো?

শশী বললে—আরে হ্যাঁ, আমাদের বক্সীসাহেব জানে সব। ফিরিঙ্গীদের গোস্ত না হলে তো চলে না, ওরা আজ পনেরো দিন গোস্ত খেতে পায়নি—

—কী করে তাহলে চালিয়েছে?

করে আমি আমার লোন্‌লিনেসের প্রতিশোধ নিয়েছি। তাই তোমাদের কাণ্ট্রিকে কন্‌কার করে আমি সকলের তাচ্ছিল্যের রিভেঞ্জ নিয়েছি—

তারপর একটু থেমে বলতো—এই যে তোমাদের বেগম মেরী বিশ্বাস, কে জানে! যেদিন শুনেলুম নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌল্লা খুন হয়েছে, সেদিন আমি কেঁদেছি, হ্যাঁ, তোমাদের হিস্টোরিয়ানরা হয়তো বিশ্বাস করবে না পোয়েট, কিন্তু বিলিভ মি, বিশ্বাস করো, আই হ্যাভ্‌ শেড্‌ টিয়ার্স, আমি রিয়্যালি কেঁদেছি, কিন্তু সে-কান্না আমার কেউ দেখেনি, আমাদের চোখের জল দেখতে নেই, আমি ওয়ারিয়র, আমার কাঁদতে নেই, আমার কাঁদা ক্রাইম, আমাদের ডিউটি শুধু ডু অর ডাই—

বলে রবার্ট ক্লাইভ শুধু গড়-গড় করে গড়গড়ার নলটা টানতো আর পেট ভর্তি ধোঁয়া ছাড়তো।

যখন রাত অনেক হতো, দমদমার বাগানবাড়ির বাইরের আলোগুলো যখন একে-একে নিভে আসতো, তখন উদ্ধব দাস উঠতো। বলতো—আমি আসি সায়েব।

সেকালে অনেকে দেখেছে সেই উদ্ধব দাসকে। তখন মীরজাফর খাঁর রাজত্ব। আরো অরাজক, আরো ভয়ানক সে-কাল। রাস্তায় ডাকাতের ভয়। একলা-একা পথে বেরোয় না কেউ। বেরোলে দল বেঁধে বেরোয়। বিশেষ করে রাত্তির বেলা। কিন্তু তখন ব্রিটিশ-রাজত্বের সবে গোড়াপত্তন হতে শুরু করেছে। সেই যুগে উদ্ধব দাস একা-একা রাস্তায় চলতো। পায়ে তখন খড়ম উঠেছে, গায়ে চাদর, হাতে একটা তুলোট-কাগজের পুঁথি। লোকে উদ্ধব দাসকে কিছু বলতো না। জানতো বুড়ো নিরীহ কবি, কাব্য লিখছে ভারতচন্দ্রের মতো। তখন লেখা শেষও হয়নি, তবু লোকে পুঁথির নাম জানতো। বলতো—বেগম মেরী বিশ্বাস কাব্য। বেগম মেরী বিশ্বাস কে? না, ওই যে দমদমার বাগানবাড়িতে থাকে। কখনো শাড়ি পরে, কখনো ঘাগরা পরে, কখনো মেম-সাহেবদের মতো গাউন, ওরই নাম তো বেগম মেরী বিশ্বাস। যারা খেতে পায় না, যারা পরতে পায় না, তা[illegible] আর্জি শোনবার জন্যে বেগম মেরী বিশ্বাসের দরজা বরাবরের মত খোলা।

ওই যে দমদমার চার ক্রোশ দূরে দক্ষিণ-পশ্চিম কোনাকুনি একটা প্রকাণ্ড পুকুর—ওটা বেগম মেরী বিশ্বাসই টাকা দিয়ে কাটিয়ে দিয়েছিল। জল-কষ্টে যখন গাঁয়ের সবাই কষ্ট পেত, তখন খবর পেয়ে বেগম মেরী বিশ্বাস ওর খরচ দিয়েছিল। তখন ওর সামনে শান-বাঁধানো ঘাট ছিল। পুকুরে লাল-লাল পদ্মফুল ফুটে থাকতো। সর্বসাধারণের পুকুর। এখন আর সেই পাথরের পৈঁঠের নাম-গন্ধ নেই। নাম ছিল—কান্ত-সাগর। কেন যে ওই পুকুরের নাম ছিল কান্ত-সাগর তা কেউ জানে না। কে কান্ত, কেন তার নামে পুকুর উৎসর্গ করা হয়েছিল তাও কেউ জানতো না, শুধু জানতো উদ্ধব দাস।

আর সত্যিই তো, কান্তই বা তখন কোথায়? ইতিহাসের জঞ্জালের সঙ্গে নিজামতের চর কান্ত সরকারও কখন আর সকলের সঙ্গে তলিয়েই গিয়েছিল। নানীবেগম, ঘসেটি বেগম, ময়মানা বেগম, গুলসন বেগম, তক্কি বেগম, বব্বু বেগম, সচ্চরিত্র পুরকায়স্থ, বশীর মিঞা, মেহেদী নেসার, সফিউল্লা খাঁ, ইয়ারজান, ছোট-মশাই, সবাই-এর সঙ্গে কান্ত সরকারও বিস্মৃতির তলায় তলিয়ে গিয়েছে। তার কথা আর কারো মনে নেই। এই এতদিন পরে বেগম মেরী বিশ্বাস পুঁথি আবিষ্কার না হলে হয়তো চিরকালের মতই সে তলিয়ে যেত। কিন্তু দু'শো বছর

যে আবার তার নামটা ছাপার অক্ষরে উঠলো এ-ও ওই উদ্ধব দাসের জন্যে! ব দাস লিখে গেছে...

কিন্তু সে-কথা এখন থাক। উদ্ধব দাসের কথা বলার অনেক সময় পরে পাবো। গে সেইদিনকার সেই পেরিন সাহেবের বাগানের ঘটনাটা বলি।

ভোরবেলা তখনো কেউ জাগেনি। কিন্তু রবার্ট ক্লাইভের তখন অনেক কাজ। নেক ভাবনা। শুধু নবাবের সঙ্গে ফয়সালা হলেই যে সব সমস্যার সুরাহা হয়ে ল এমন আশা আর যারই থাক, রবার্ট ক্লাইভের ছিল না।

ক্লাইভ অ্যাড্‌মিরাল ওয়াটসন্‌কে বলেছিল—একটা এনিমি গেল, এবার অন্য লিমিটার শেষ করে দিতে হবে—

সমস্ত বেঙ্গলে যদি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীকে ব্যবসা করে যেতে হয় তাহলে খানে ফ্রেঞ্চদের বাড়তে দিলে চলবে না। আজ যদি সাউথ্‌ থেকে জেনারেল বুশী সে পৌঁছতো তো এমন করে সন্ধিপত্রে সই করতো না নবাব।

কাগজের ওপর নিজের দস্তখত্‌ করতে নবাবের বড় কষ্ট হচ্ছিল। যেন হাতের আঙুলগুলো কাঁপছিল। জেনারেল বুশী এসে পৌঁছুলো না। নবাব যেন বড় একলা। বড় নিঃসহায়। ও ... পেয়ে যেন তাকে দিয়ে এরা দাসখত্‌ই লিখিয়ে নিচ্ছে।

বাইরে এসে ক্লাইভ বললে—...—

প্রথমে অ্যাড্‌মিরাল বুঝতে পা... করেছিল—হোয়াই? কেন?

—তুমি বুঝতে পারছো না, আজ যদি ... বুশী এসে পড়তো কে ... ক এই ভিক্টরি হতো? যতদিন চন্দননগরে ফ্রেঞ্চ-পাওয়ার থাকবে ততদিন ... আমাদের কোম্পানীর কোনো আশা নেই—

—হাউ ডু ইউ নো?

ক্লাইভ বললে—আই নো। আমি জানি। ফ্রেঞ্চদের সম্বন্ধে আমার চেয়ে তুমি বেশি জানো না ওয়াটসন্‌, দে আর স্কাউন্ড্রেলস্‌—তারা চায় ইন্ডিয়া থেকে হটিয়ে দিয়ে নিজেরা বিজনেস করবে। আর বিজনেস মানেই রুল করবে ওভার ইন্ডিয়া! একটা কান্ট্রির দুজন মাস্টার থাকতে পারে না—

—হোয়াট ইউ মীন্‌?

—আই মীন হোয়াট আই সে! আমি বেঙ্গলের ... অ্যাটাক করবো—

—তুমি কি পাগল হয়েছো? এখুনি ... এলে? তাতে লেখা রয়েছে নেটিভ ... ফ্রেঞ্চ ... ইংরেজদেরও ফ্রেন্ড, যে নবাবের এনি... এনিমি...

ক্লাইভ ঘোড়াটার লাগাম ধরে টা...

সেদিন রবার্ট ক্লাইভ অ্যাড্‌মি... কথার উত্তর দিতে পারেনি। সেদিন রাস্তায় চলতে চলতে কেবল ... কীসের ... মিটমাট, কীসের ফয়সালা। লাইফ-ই কি ট্রুস ... লাইফের সঙ্গেই তো অনেকবার সন্ধি করতে চেয়েছে রবার্ট ক্লাইভ। ... কতবার। কতবার ভেবেছে, আবার ইংলণ্ডে ফিরে যাবে। ইংলণ্ডে ফিরে গিয়ে পার্লামেন্টের মেম্বর হবে। দেশে ফিরেও তো গিয়েছিল একবার। বিয়ে করে সংসার পাতবে একদিন। আর দশজন যেমন করে সংসারী হয়ে ইংলণ্ডের সিটিজেন হয়ে বাস করছে, তেমনি করে সে-ও সিটিজেন লিস্টের খাতায় নাম লিখিয়ে ভদ্রলোক হবে। কিন্তু তা পেরেছে কী? কেন পারে

না তা? লাইফের সব সন্ধি কেন ওলট-পালট হয়ে যায়? লাইফের সব হিসে কেন গোলমাল হয়ে যায়?

সেই অবস্থাতেই রাত্রে বাড়িতে এসে ভেবেছে কেবল। তারপর হঠাৎ অনে রাত্রে ক্যাম্পে খবর এসেছে, ইওরোপে ফ্রান্সের সঙ্গে ওয়ার বেঁধে গেছে ইংলণ্ডের। ওয়ার। ওয়ার।

খবরটা পেয়েই বিছানার ওপর উঠে বসেছে ক্লাইভ।

মাদ্রাজের গভর্নর ডেসপ্যাচে পাঠিয়েছে ক্যালকাটার সিলেক্ট কমিটিকে—যে এখুনি চন্দননগর অ্যাটাক্ করা হয়।

ডেসপ্যাচটা পেয়ে পর্যন্ত সারা রাত কর্নেল ক্লাইভ ঘরের মধ্যে পায়চারি করেছে। অ্যাডমিরাল ওয়াটসনকে ঠিক এই কথাই বলেছিল সন্ধ্যেবেলা।

—কিন্তু নবাবের সঙ্গে যে আমরা ট্রুস করেছি? নবাব যদি সে-ট্রুস না ভাঙে তো আমরা সে-ট্রুস কী করে ভায়োলেট করতে পারি?

ক্লাইভ বলেছিল—পারি। লাভ আর ওয়ারের ব্যাপারে কোনো নিয়ম কেউ কখনো মানেনি, আমরাও মানবো না—

—কিন্তু এই ইণ্ডিয়াতে ফ্রেঞ্চরা যে নবাবের ফ্রেণ্ড!

ক্লাইভ বলেছিল—এখন আর তারা নবাবের বন্ধু নয়। ফ্রেঞ্চরা এখন আমাদের শত্রু, সুতরাং নবাবেরও শত্রু!

তাহলে নবাবকে সে-কথা জানিয়ে আগে চিঠি লেখো—তারপরে চন্দননগর অ্যাটাক করো!

ক্লাইভ বলেছিল—ঠিক আছে, আমি নবাবকে লেটার লিখবো—

বলে দুজনে দুদিকে চলে গিয়েছিল। অ্যাডমিরাল ওয়াটসন্ হয়তো ফোর্টের ভেতর গিয়ে আরামে নাক ডাকিয়ে ঘুমিয়েছিল, কিন্তু ক্লাইভের ঘুম নেই। ঘরের মধ্যে একবার বিছানায় শুয়েছে, আবার উঠে পায়চারি করেছে।

তারপর যখন ভোর হয়েছে, তখনই হরিচরণের ডাক।

দুর্গাকে দেখে সাহেবের মুখে হাসি বেরোল। পাশেই ঘোমটা দেওয়া সেই ম্যারেড লেডী!

—কী বাবা, আমাদের কিছু হিল্পে করতে পারবে তুমি? এখন তো তোমাদের লড়াই থেমে গেছে!

হরিচরণ বললে—আমরা সেই ত্রিবেণী পর্যন্ত গিয়েছিলুম হুজুর—

—ত্রিবেণী! ... অত দূর পর্যন্ত গিয়েছিলে তো আবার ফিরে এলে কেন? তোমাদের হাতিয়াগড়ে ফিরে যেতে পারলে না?

দুর্গা বললে—ফিরবো কী করে? সেখানে দেখি, সেই বাউণ্ডুলে পোয়েট একটা বজরার ওপর বসে বসে গান গাইছে—

—কার কথা বলছো? আমাদের সেই পোয়েট? সে তো তোমরা চলে যাবার পরেই আবার এই ক্যাম্পে এসেছিল।

—এখানেও এসেছিল? মরবার আর জায়গা পেলে না মিনসে? আবার এখেনে এসেছিল কী করতে? মরতে?

সায়েব বললে—সে একজন জেণ্টলম্যানকে নিয়ে এসেছিল এখানে। তোমরা নেই শুনে চলে গেল—

—তা মিনসেকে তুমি কেন ঢুকতে দিলে হেথা এখেনে?

ক্লাইভ বললে—পোয়েটকে আমার বড় ভালো লাগে দিদি—

—তা ভালো লাগে তো ভালো লাগুক, তা বলে তোমার বাড়ির মধ্যে ঢুকতে দাও কেন?

ক্লাইভ বললে—তা তোমার মেয়েরই তো হাজব্যান্ড সে? তাকে আমি তাড়িয়ে দিতে পারি?

—হ্যাঁ বাবা তাড়িয়ে দিও, আমি বলছি, তাড়িয়ে দিও, অমন জামাই-এর মুখে ঝ্যাঁটা মারি আমি! তুমি যদি তাকে ধরে রাখতে বাবা তো আমি তোমার সামনে তার মুখে সাত ঝ্যাঁটা মেরে বিদায় করতাম—

ক্লাইভ হাসলো। অদ্ভুত এই ইণ্ডিয়ার মানুষরা। নিজের জামাইকে এরা বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয় অপমান করে। অথচ জামাই কিছু বলতে পারে না। মুখ বুজে চলে যায়। ক্লাইভ ম্যাড্রাসে এদের কথা শুনেছিল। অথচ এই বেঙ্গলেই হাজব্যাণ্ডের চিতায় উঠে ওয়াইফরা নাকি পুড়ে মরে। এরা এত ফেথফুল, আবার এত ক্রুয়েল। কী অদ্ভুত মানুষ এই বেঙ্গলী লেডীরা।

আবার থাকবার ব্যবস্থা হয়েছিল দুজনের। ঘরের মধ্যে পৌঁছিয়ে দিয়ে ক্লাইভ বললে—তোমাদের এখানে হয়তো খুব কষ্ট হবে দিদি—

দুর্গা বললে—তা কষ্ট তো হবেই সায়েব, আমাদের কপালে কষ্ট থাকলে কে খণ্ডাবে বলো? নইলে নিজের ঘর-দোর থাকতে আমরা শ্লেচ্ছদের হাতে পড়ি?

ক্লাইভ হাসতে লাগলো—আমরা বুঝি এখনো আনটাচেবল্‌ দিদি? এতদিন যে আমার এখানে থাকলে তোমরা, তোমাদের জাত চলে যাবে তো!

—ওমা, কী বলছো তুমি সায়েব? জাত যাবে না? আমাদের জাতের আছেটা কী শুনি? জাত তো তুমি আমাদের মেরে দিয়েই বসে আছো—

—তা হলে কী হবে?

—কী আর হবে! প্রায়শ্চিত্তির করতে হবে! সাধ করে কি তোমার এখেনে আসতে চাইনি আমরা! আমরা হরিচরণকে পই-পই করে বললাম, আমাদের অন্য কোথাও নিয়ে চলো! তা ও-ও হয়েছে তোমার মত—

সাহেব দুর্গার কথা বুঝতে পারলে না। হরিচরণকে জিজ্ঞেস করলে—প্রায়শ্চিত্তির মানে কী?

হরিচরণ বুঝিয়ে দিলে। ব্রাহ্মণদের ডেকে খাওয়াতে হবে, ভূরিভোজন করাতে হবে। অনেক টাকা দক্ষিণে দিতে হবে। গোবর খেতে হবে।

—গোবর? তার মানে?

হরিচরণ গোবর কথাটা বুঝিয়ে দিতেই সাহেব বললে—ও, ইউ মীন কাউ-ডাং? দ্যাট ইজ গোবর? কেন? গোবর খেতে হবে কেন?

—আজ্ঞে, তা তো খেতেই হবে। গোবর খেলে সব পাপ ধুয়ে-মুছে পবিত্র হয়ে যাবে!

ক্লাইভ বললে—তা হলে তুমি? তুমি গোবর খাবে না?

—আজ্ঞে, আমি তো সেপাইদের দলে নাম লিখিয়েছি, আমার আত্মীয়-স্বজনেরা জানে, আমার জাত চলে গিয়েছে।

—তা তুমি যে দেশে টাকা পাঠাও তোমার বাড়িতে, সে-টাকা তারা নেয়?

হরিচরণ বললে—সে-টাকা তারা কি অমনি নেয়! গঙ্গাজলে ধুয়ে তবে ঘরে তোলে—

ক্লাইভ হাসতে লাগলো।

দুর্গা বললে—আর যদি কখনো এখানে আসে সে-মিনসে তো তাকে ঢুকতে

দিও না বাবা, তা তোমায় বলে রাখছি—

—কী করেছে তোমার জামাই, বলো তো দিদি?

দুর্গা বললে—করবে আবার কী, সে আমার জামাই নয়—

—কিন্তু সে যে বলেছিল, তার ওয়াইফের নাম মরালী—

—তা মরালী কি আর কারো নাম হতে নেই? এই যে তোমার নাম ক্লাইভ, ও-নামে কি আর কেউ নেই তোমাদের দেশে? একলাই তুমি একেশ্বর হয়ে জন্মেছো?

—সত্যি বলছো?

দুর্গা বললে—তা সত্যি বলছি না তো কি মিথ্যে কথা বলবো তোমার সঙ্গে?

ক্লাইভ বললে—তা হলে ত্রিবেণীতে তাকে দেখে তোমাদের অত ভয় হয়ে গেল কেন?

—তা রাস্তাঘাটে বাউণ্ডুলে মিন্‌সে দেখে ভয় হবে না? তুমি নেই, যদি অপমান করে, হেনস্থা করে, যদি মেয়ের হাত ধরে টানাটানি করে?

ক্লাইভ বললে—কিন্তু আমি তো পোয়েটকে জানি, পোয়েট তো তা করবার লোক নয়, পোয়েট তো ভেরি গুড্‌ ম্যান—

দুর্গা বললে—তা তুমি কি মেয়েমানুষ যে তোমার হাত ধরে সে টানাটানি করবে? তুমি তো বেটাছেলে, তোমার সঙ্গে সে তো ভালো ব্যাভার করবেই বাছা—

ক্লাইভ সাহেব হো-হো করে হাসতে লাগলো।

দুর্গা বললে—হেসো না বাছা, আমরা মরছি নিজের জ্বালায় আর তুমি দাঁত বার করে হাসছো—

ক্লাইভ বললে—হাসতে যে আমার বড় সাধ দিদি। ছোটবেলা থেকে যে হাসবার সুযোগই পাইনি। কেবল সকলের সঙ্গে ঝগড়া আর মারামারি করেছি, কেউ আমাকে হাসতেই দেখেনি জীবনে, এই শুধু তুমিই আজ হাসতে দেখলে—এই তো তোমার সঙ্গে আমি হাসছি, কিন্তু তুমি জানো না কাঁদতে পারলে আমি বেঁচে যাই—

—ও মা, তোমার আবার কী হলো, তুমি তো দিব্যি খাচ্ছো দাচ্ছো আর লড়াই করছো—

ক্লাইভ সাহেবের মুখখানা যেন হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। হঠাৎ যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেল সাহেব। যেন আর চিনতেই পারা গেল না তাকে। আর দাঁড়ালো না সাহেব সেখানে। ঘর ছেড়ে নিজের ঘরের দিকে চলে গেল।

দুর্গা হরিচরণকে জিজ্ঞেস করলে—তোমার সাহেবের কী হলো গো? মুখখানা অমন সাদা হয়ে গেল কেন হঠাৎ?

হরিচরণ বললে—ও রকম হয় মাঝে-মাঝে, ও নিয়ে তুমি ভেবো না—

—তা আমাদের ওপর রাগ করলে নাকি?

হরিচরণ বললে—না, রাগ করবে কেন? মাথার মধ্যে ভাবনা রয়েছে তো, কেবল ভাবছে আর কেবল ভাবছে—

—মদ খেয়েছে বুঝি?

হরিচরণ বললে—না তো, সাহেব তো আর মদ খায় না, তুমি বলার পর থেকে তো সাহেব মদ ছেড়ে দিয়েছে, গরুর গোস্ত খাওয়াও ছেড়ে দিয়েছে—

—সে কী?

—হ্যাঁ দিদি, আর তা ছাড়া ও-সব পাবে কোথায় যে খাবে! এতদিন তো নবাবের ভয়ে কেউ খাবার-দাবার কিছু বেচতোই না আমাদের, আমরা তো পেট ভরে খেতেও পাইনি—

—ও মা, তাই নাকি?

হরিচরণ বললে—হ্যাঁ দিদি, তোমাদের কিছুই বলিনি এতদিন তোমরা মনে কষ্ট পাবে বলে—

দুর্গা বললে—তা তো আমরা জানতুম না! না বাপু, আমরা তোমাদের ঘাড়ে বসে আর খাবো না—

হরিচরণ বললে—না দিদি, এখন আর তা নেই, এখন তো নবাবের সঙ্গে মিট-মাট হয়ে গেছে, এখন টাকা ছাড়লেই সব মাল পাওয়া যাবে—

—তাহলে সাহেব তোমার অমন গম্ভীর হয়ে যায় কেন হঠাৎ?

হরিচরণ বললে—সে তোমাকে পরে বলবো দিদি, সে অনেক কথা।

দুর্গা বললে—বলো না শুনি—

হরিচরণ বললে—কাউকে বোল না যেন, কেউ জানে না, সাহেবের মা মারা গেছে—

—সে কী? কবে?

—মাস দু'এক আগে। মা ছাড়া তো সায়েবের আপনার কেউ ছিল না। বাপ তো না-থাকার মধ্যেই। কেবল মদ গিলেই পড়ে থাকে দিনরাত—

—তা অশৌচ-টশৌচ কিছু হয় না সায়েবদের?

—তুমিও যেমন দিদি, ওদের আবার অশৌচ হবে। আর খবর তো এল মারা যাবার ছ'মাস পরে, তখন মা মরে ভূত হয়ে গেছে—

দুর্গার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—আহা গো—

—জানো দিদি, সাহেব লুকিয়ে লুকিয়ে এক-একদিন কাঁদে, কেউ টের পায় না, শুধু আমি লুকিয়ে লুকিয়ে দেখেছি—

দুর্গা বললে—কাঁদতে বুঝি সায়েবের লজ্জা করে খুব?

—না, লজ্জা করবে কেন? কিন্তু আমাদের কর্নেল তো, সায়েবকে কাঁদতে দেখলে সেপাইদের মন যদি নরম হয়ে যায় তো তারা তো যুদ্ধু করতে পারবে না। সেই জন্যে লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদে—

দুর্গার নাক দিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়লো—আহা গো, এ কী চাকরি বাছা তোমাদের, মায়ের মিত্যুতেও প্রাণ ভরে কাঁদতে পারবে না—এমন চাকরি না করলেই পারো—

হঠাৎ দূর থেকে ডাক এল—হরিচরণ!

হরিচরণ বললে—ওই সাহেব ডাকছে দিদি, আমি আসছি, তোমাদের সব বন্দোবস্থা আমি এসে করে দিচ্ছি—

বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল হরিচরণ।

ছোট বড়রানী এতক্ষণ আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিল। এতক্ষণে কাছে এসে বললে—দিগা, এ তো বড় জ্বালা হলো দেখছি—ঘুরে ফিরে সেই আমাদেরই এখেনেই বসতে হচ্ছে—

দুর্গা বললে—তা কী করবে বলো, আমার কি দেশে ফিরে যেতে অসাধ? কপালের গেরো থাকলে কে খণ্ডাবে?

—তা এদের লড়াই তো থেমে গেল, এবার হাতিয়াগড়ে ফিরে যেতে আপত্তি

কী? এখন তো রাস্তা ফাঁকা—

দুর্গা বললে—রাস্তা না-হয় ফাঁকা কিন্তু সেই রেজা আলি বেটা তো এখনো হাতিয়াগড়ে ঘাঁটি আগলে বসে আছে! একবার জানতে পারলে কি আর রেহাই দেবে তোমাকে? আর সেই বশীর মিঞা, সে-ও তো ওৎ পেতে আছে—

—তা নবাব যদি কোনোকালে না মরে তো চিরকাল এমনি করে এখানে পড়ে থাকবো?

দুর্গা বললে—তাই তো নবাবের মিত্যু কামনা করছি ছোট বউরানী, দিনরাত মিত্যু-কামনা করছি—

—তা তুই নবাবকে উচাটন করতে পারিস না? নবাবকে বাণ মারতে পারিস না? তাহলে তুই ছাই-এর মন্তর শিখেছিস্—

দুর্গা বললে—না ছোট বউরানী, এবার দেখছি তাই-ই করতে হবে। ও ফিরিঙ্গীদের দিয়ে কিছু হলো না। মায়ের মিত্যুতে যে মানুষ কেঁদে ভাসিয়ে দেয় তাকে দিয়ে কিছু হবে না, আমাদের সায়েব দেখছি মেয়েমানুষেরও বেহদ্দ আমাকে শেষকালে ঝাড়-ফুঁক করতে হবে—

নাদির শা'র আমলে যে-বংশের ইতিহাস শুরু, সে-বংশ বড় সাধারণ বংশ নয় বড় সামান্য অবস্থা থেকে একেবারে বাঙলা বিহার উড়িষ্যার নবাব। হাজি আহম্মদই শুধু যে সারাফত আলির সর্বনাশ করেছিল তা-ই নয়, ছোট ভাই আলীবর্দী খাঁর প্রসাদেও দিল্লীর বাদশা'র সর্বনাশের অন্ত ছিল না। হল্‌ওয়েল সাহেব লিখেছে—মারাঠারা যখন মহম্মদ শা'র কাছে চৌথের দাবি করেছিল তখন বাদশা বলেছিলেন—নবাব আলীবর্দী খাঁ খাজনা পাঠায়নি, আমি চৌথ্ দেব কী করে?

মারাঠারা নাছোড়বান্দা। বললে—আমাদের চৌথ্ চাই-ই চাই—চৌথ্ আমরা ছাড়বো না—

সে কথা শুনে বাদশা বলেছিলেন—তোমরা যাও বাঙলা দেশে, আলীবর্দীকে উৎখাত করে তোমরা তোমাদের পাওনা উসুল করে নাও—আমার কোনো আপত্তি নেই—

এক-একজন ঐতিহাসিকের এক-এক রকম মত। কিন্তু গোলাম হোসেন বলেছেন, আলীবর্দী দিল্লীর বাদশার কাছ থেকে পেয়েছিলেন সাতহাজারী মনসব আর সুজা-উল্-মুল্ক হেসাম-উদ্দোলা উপাধি। আর তার বিনিময়ে নবাব নজরানা পাঠিয়েছিলেন এক কোটি টাকা।

উদ্ধব দাসও ইতিহাস লিখেছে। সে কিন্তু এ-সব টাকাকড়ি লেনদেনের কথা লেখেনি। তার কাছে সবাই সমান। দিল্লীর বাদশা থেকে শুরু করে নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলা, কর্নেল ক্লাইভ, মীরজাফর, বেগম মেরী বিশ্বাস, কান্ত সরকার ছোটমশাই সবাই একাকার। সে কারো চাকরও নয়, কারো কাছ থেকে তার উপাধি পাওয়ার লোভও ছিল না। কোনো নবাব কি রাজাকে খুশী করবার জন্যেও সে 'বেগম মেরী বিশ্বাস' লেখেনি। তাই তার লেখার মধ্যে ক্লাইভ সাহেবের নিন্দে আছে, আবার গুণগানও আছে। তেমনি নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলার নিন্দে-প্রশংসা আছে। উদ্ধব দাস নিজে নিন্দে-প্রশংসার ধার ধারতো না বলেই এমন অকাত

সব কিছু লিখে যেতে পেরেছে সে।

এক জায়গায় এসে কিন্তু থমকে গেছে উদ্ধব দাস।

উদ্ধব দাস লিখেছে—তোমরা কেউ নবাবকেও চিনতে পারোনি, ক্লাইভ সাহেবকেও চিনতে পারোনি। আমি তো তোমাদের মত দূর থেকে দেখিনি ওদের। একেবারে কাছাকাছি ছিলুম, একেবারে ঘেঁষাঘেঁষি। লোকে আমাকে পাগল বলতো তাই আমাকে কাছে ঘেঁষতে দিত। ভাবতো আমি কিছুই বুঝি না বুঝি।

সত্যিই তো, কান্তই কি বুঝতো মরালীর বরের মনের মধ্যে এত কাব্য ছিল। নইলে মরালীর জন্যে অমন করে সব কিছু ভুলে গিয়ে নিজেকে জলাঞ্জলি দিলে। আর মরালীই কি জানতো উদ্ধব দাসের বাইরের পাগল-চেহারাটার আড়ালে অমন একটা রসিক-মন লুকিয়ে আছে। যদি বুঝতো তাহলে তো সমস্ত ইতিহাসটাই উল্টে যেত। বুঝলে হয়তো শেষ পর্যন্ত পলাশীর যুদ্ধটাই হতো না। যখন বুঝলো তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। তখন আর শোধরাবার সময় নেই। তখন সব নিশ্চিহ্ন হয়ে নিঃশেষ হয়েছে।

গোবিন্দ মিত্তিরের বাগানবাড়িতে যখন সমস্ত লেখা-জোখা সই-সাবুদ শেষ হয়েছে তখন হঠাৎ নবাবের ছাউনিতে খবর এল, ত্রিবেণীর ঘাটে নানীবেগম এসে হাজির হয়েছে।

—হঠাৎ নানীবেগম সাহেবা এল কেন?

—তা জানি না জাঁহাপনা।

কথাটা কান্তর কানেও গেল। কান্তর সমস্ত শরীরে একটা রোমাঞ্চ খেলে গেল। নানীবেগম সাহেবার সঙ্গে আর কেউ এসেছে নাকি? আর কেউ?

—এখানে কে তাদের আসতে বললে?

—তাও জানি না জাঁহাপনা!

উমিচাঁদ সাহেব আর ওয়াটস্ সাহেব দাঁড়িয়ে ছিল পাশে। কাশিমবাজারের কুঠি নতুন করে খোলা হবে। নবাবের দরবারেও ফিরিঙ্গী-কোম্পানীর একজন প্রতিনিধি রাখতে হবে। নবাবই বেছে নিয়েছেন ওয়াটস্ সাহেবকে। বেশ নাদুস-নুদুস চেহারা। তারা নবাবের সঙ্গেই রওনা দেবে রাজধানীর দিকে।

—তা তারা যে আসবে তা আগে খবর দাওনি কেন?

—আগে খবর মেলেনি জাঁহাপনা!

নবাব মীর্জা মহম্মদ যেন অস্বস্তিতে উস্‌খুস্ করতে লাগলেন। বাঙলার নবাব যেন ছেলেমানুষ। দিদিমার সামনে নিজের দৌরাত্ম্য প্রকাশ করতে লজ্জা হতে লাগলো।

—সঙ্গে বেগমসাহেবাও আছেন জাঁহাপনা।

—আবার বেগমসাহেবা সঙ্গে এসেছেন কেন? কোন্ বেগমসাহেবা?

মীরজাফর আলি, রণজিৎ রায়, ইয়ার লুৎফ খাঁ, ইরাজ খাঁ সবাই অবাক হয়ে গেল। নবাবের ছাউনিতে বেগমসাহেবাদের আসা নতুন নয়। কিন্তু সে তো নবাবের সঙ্গে। এমন করে হুকুম না পেয়ে তো আসার নিয়ম নেই।

—কোন্ বেগমসাহেবা?

—মরিয়ম বেগমসাহেবা।

নবাব চুপ করে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর সরবতের গ্লাসে চুমুক দিলেন। অনেক ঝড়-ঝাপটা গিয়েছে ক'দিন ধরে। ফিরিঙ্গীদের হাতে বন্দী হতে হতে

নবাব বেঁচে গিয়েছেন। তারপর ফিরিঙ্গীদের সব কিছু শর্তে নির্বিকারে দস্তখত্ দিয়ে লজ্জায় মুখ কলঙ্কিত করে রয়েছেন। ঠিক এই সময় এখানে না এলে হতো না?

সবাই উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো। খানিক পরেই ছাউনির বাইরে যেন ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ হলো। ওই ওরা এল নাকি?

—কে?

—জাঁহাপনা, কর্নেল ক্লাইভ সাহেবের খত্ নিয়ে ফিরিঙ্গী ঘোড়সওয়ার এসেছে!

নবাব বললেন—ভেতরে নিয়ে এসো—

ঘোড়সওয়ার ভেতরে এল না। তার চিঠি নিয়ে এল নবাবের পাহারাদার। সে-চিঠি সে মীর-বক্সীর হাতে দিলে। মীর-বক্সী সে-চিঠি মীর-মুন্সীর হাতে দিলে। মীর-মুন্সী সে-চিঠি খুলে পড়তে লাগলো নবাবকে শুনিয়ে শুনিয়ে—

"ইওর মেজেস্টি, মনসুর-উল-মুল্‌ক্, সিরাজ-উ-দ্দৌলা শা কুলী খান, হেবাৎ জং, আলমগীর! আপনার সন্ধির শর্ত অনুযায়ী ইহা জ্ঞাপন করা যাইতেছে, আপনি স্বীকার করিয়াছেন ইংরাজের শত্রু নবাবের শত্রু এবং ইংরাজের বন্ধু নবাবেরও বন্ধু। সম্প্রতি ইওরোপ প্রদেশ হইতে ইণ্ডিয়ায় সংবাদ আসিয়াছে যে, ফ্রান্সের সহিত ইংলণ্ডের যুদ্ধ-ঘোষণা হইয়াছে। সুতরাং এখন হইতে ফ্রান্স আমাদের শত্রু। বাঙলা দেশের অভ্যন্তরে ফরাসী-অধিকৃত চন্দননগরও শত্রু-অধিকৃত দেশ। চন্দননগরের ফরাসী-কোম্পানী আমাদের শত্রুস্থানীয়। আশা করা যায়, সন্ধির শর্ত অনুযায়ী তাহারা আজ হইতে আপনারও শত্রু বলিয়া গণ্য হইলেন। আমরা আজ ফরাসীদের চন্দননগর আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইতেছি—আশা করি, আপনি আমাদের সহায় হইবেন।"
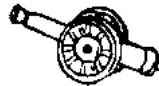
পেরিন সাহেবের বাগানের ভেতরে তখন সার-সার সোলজার দাঁড়িয়ে আছে। কর্নেল ক্লাইভের কম্যান্ড পেলেই তারা কুইক-মার্চ করতে শুরু করবে।

ক্লাইভ সাহেব নিজে তখনো তার নিজের কামরায়। একটা লড়াই মিটতে-না-মিটতে আর একটা লড়াই। তবু সেণ্ট-ফোর্ট-ডেভিডের কম্যাণ্ডার শেষবারের মত নিজের মনটাকে চাঙ্গা করে নিচ্ছিল। হাতের বন্দুকটা আর একবার পরীক্ষা করে নিচ্ছিল।

হঠাৎ গার্ড এসে খবর দিলে নবাবের বেগমসাহেবার তাঞ্জাম এসেছে।

—হোয়াট!!!

—নবাবের বেগমসাহেবার তাঞ্জাম!

তবু যেন ক্লাইভের কানে কথাটা ঢুকলো না।

বললে—হোয়াট ডু ইউ মিন?

গার্ড আবার স্পষ্ট করে বুঝিয়ে বললে—মুর্শিদাবাদের নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলার বেগমসাহেবা কর্নেল সাহেবের সঙ্গে মোলাকাত্ করতে এসেছে—

ক্লাইভ চিৎকার করে উঠলো—আর ইউ ম্যাড? কে বেগম? কোন্ বেগম? নাম কি বেগমসাহেবার?

—মরিয়ম বেগম!

এমন যে হবে কেউই ভাবতে পারেনি। আজকে যা ইতিহাস, সেদিন তা ছিল বাস্তব সত্য। উদ্ধব দাসের সময়ে মানুষ ভাবতেই পারতো না জাহাজে চড়ে যে-সব সাদা চামড়ার মানুষরা এখানে ব্যবসা করতে এসেছে, তারা একদিন আবার এখানকার নবাবের কাছ থেকে মসনদ কেড়ে নেবে। তারা ভাবতো, যেমন পশ্চিম থেকে বর্গীরা এসে ধান চাল লুঠ করে এখানকার মানুষদের খুন-জখম করে পালিয়ে যায়, এই সাদা চামড়ার মানুষরাও তেমনি একদিন দেশ ছেড়ে চলে যাবে নবাবের ভয়ে।

কিন্তু তখনকার মানুষরা বড় ছিল।

তারা বলতো—মাথার ওপর ভগবান আছে হে, যা করবার তিনিই করবেন—আমরা তো নিমিত্ত মাত্র—

কিন্তু হিন্দুর যেমন ভগবান আছে, মুসলমানেরও তেমনি আছে আর একটা ভগবান। আর শুধু হিন্দু-মুসলমান কেন, খৃষ্টানদেরও কি ভগবান নেই? সকলেরই তো নিজের নিজের আলাদা আলাদা ভগবান। সকলের ভগবানই তাদের নিজেদের ভক্তদের মঙ্গল কামনা করতো। তাই খৃষ্টানরা যেত গীর্জায়, মুসলমানরা যেত মসজিদে, আর হিন্দুরা মন্দিরে।

আসলে অষ্টাদশ শতাব্দীতে যা ঘটলো সেটা বোধহয় ভগবানে-ভগবানে লড়াই। মুসলমানের আল্লাতালাহ্‌র সঙ্গে খৃষ্টানের যিশুর লড়াই। আর তাই-ই যদি না হবে তো এমন বিপর্যয়ই বা ঘটবে কেন?

ইংরেজরা যেদিন প্রথম হিন্দুস্থানে এল সেদিনের সাল-তারিখ ইতিহাসের পাতার এক কোণে হয়তো লেখা আছে। কিন্তু কে জানতো সেদিন যে, হিন্দুস্থানের ম্যাপের রং মবলক্ বদলিয়ে দিয়ে তবে তারা এখান থেকে দেশে ফিরে যাবে? সামান্য ষোল হাজার টাকা তো মাত্র। ধারাপাতের ষোড়শ শব্দের পরে তিনটে গোল গোল শূন্য বসালে যা হয় তাই। বলতে গেলে মিনি-মাগনায় পাওয়া সেই কলিকাতা, সুতানটি আর গোবিন্দপুরের জমিদারি যে এম্‌পায়ারে পরিণত হবে তাই-ই বা কে জানতো? সেণ্ট ফোর্ট ডেভিডের কম্যাণ্ডার কর্নেল রবার্ট ক্লাইভই কি তা কল্পনা করতে পেরেছিল?

নবাব মীর্জা মহম্মদ সিরাজ-উ-দ্দৌলা আলমগীরের কথা ছেড়ে দাও। দাদুর আদরের নাতি, উত্তরাধিকার-সূত্রে অমন লাখেরাজী মৌরসী-পাট্টার জমিদারি পেয়ে অনেকেরই মাথা বিগড়ে যায়। যার মাথা বিগড়ে যায় না, সে বাহাদুর মানুষ। কিন্তু রবার্ট ক্লাইভ?

ক্লাইভের আগে আরো অনেক ক্লাইভ এসেছে। ক্লাইভের পূর্বপুরুষ থেকেই তো শুরু হয়েছিল এম্পায়ার তৈরির কাজ। তারা কেন এল এই মাছি-মশা বন-জঙ্গলের দেশে? কে তাদের আসতে বলেছে? তুমি আমি যখন বটতলায় চণ্ডীমণ্ডপে বসে রামায়ণ-মহাভারত পড়ে হরিধ্বনি দিয়ে পরকালের সুখ-ঐশ্বর্যের স্বর্গবাস কায়েম করতে চেয়েছি, তখন ইহলোকের সুখ-ঐশ্বর্যের পাকা বন্দোবস্ত কায়েম করতে আর-এক দেশের আর-এক মানুষের দল যে ঝড়-ঝাপটা-বিপদ-বিসম্বাদ অগ্রাহ্য করে পালতোলা কাঠের জাহাজে নিয়ে সমুদ্রের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, তা কল্পনা করতেও পারিনি। যতবারই এখানে এসেছে তারা চেয়েছে বিনা মাশুলে ব্যবসা করতে। বিনা মাশুলে ব্যবসা করে নিজেদের দেশে

টাকা-মোহর-সোনা-দানা পাঠাতে। এ দেশের রক্ত শুষতে। কিন্তু নবাব-বাদশা তাতে বাধা দিলেই তিনি খারাপ হয়ে গেলেন। মুর্শিদকুলী খাঁ থেকে শুরু করে যত নবাব ফিরিঙ্গীদের ব্যবসায় মাশুল আদায় করতে চেয়েছে, সকলের সঙ্গেই খিটিমিটি বেঁধেছে ইংরেজ-কাউন্সিলের। যেন এটা ফিরিঙ্গীদের দেশ। যেন নবাব এখানকার মানুষের স্বার্থ না দেখে বিলেতের মানুষের স্বার্থ দেখবে। যেন নিজেদের দেশের মানুষদের উপোস করিয়ে রেখে বিদেশের মানুষকে খাওয়ানোর দায়িত্বটা বেশি বড়।

কিন্তু আসলে স্বার্থের প্রশ্নই নয়। প্রশ্নটা নতুন পৃথিবীর সঙ্গে পুরোন পৃথিবীর বিরোধের প্রশ্ন। একটা সভ্যতা আচার-নিয়ম-নিষ্ঠা-অনুষ্ঠানের শাসনে জর্জর। বিলাস-আরাম-অনাচারের আঘাতে মরো মরো। আর একটা বিদেশী নতুন সভ্যতা তার সমস্ত জড়তা কাটিয়ে উদার-অভ্যুদয়ের উচ্ছ্বাসে পুরোনকে নির্মূল করে তার জায়গায় নিজেকে প্রতিষ্ঠা করবার মানসে পৃথিবীর চারদিকে প্রভুত্ব বিস্তার করতে চায়। নতুনের সঙ্গে পুরোন পারবে কেন? কর্নেল রবার্ট ক্লাইভ যে সেই নতুনেরই প্রতিনিধি। নবাবের আরাম চাই, নবাবের তোয়াইফ চাই, নবাবের চেহেল্-সুতুন চাই, মতিঝিল, হীরাঝিল, মনসুরগঞ্জ, বেগম-বাঁদী-খোজা সব কিছুই চাই। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর যে-সভ্যতার ট্রেড-মার্ক নিয়ে ক্লাইভ এসেছে, তাদের কাছে নবাবের মসনদের নাম ফিউডালিজম। ক্লাইভের কাছে কলোনীয়ালিজম আরো বড় রাজতন্ত্র। তারা সেই উপনিবেশবাদের মন্ত্র নিয়েই এখানে এসেছে নিজেদের সাম্রাজ্যের প্রসার প্রতিষ্ঠা করতে, তাই তারা ঠাণ্ডা মাটির ওপরে ঘুমিয়ে কাটাতে পারে, মশার কামড় খেয়েও নিশ্চিন্ত থাকতে পারে, খেতে না পেলেও মুখে হাসি ফোটাতে পারে। তারাই যে অষ্টাদশ শতাব্দীর নতুন সভ্যতার ভগীরথ। সে ভগীরথকে যে ঠেকাবে তেমন শক্তি হিন্দুস্থানে কার আছে?

তবু সেই ভোর বেলা রবার্ট ক্লাইভ একটু ভেবে নিলে।

নবাবের বেগম তার ক্যাম্পে এসেছে। এ যেমন অবিশ্বাস্য তেমনি অভাবনীয়।

—একলা এসেছে, না সঙ্গে আর কেউ আছে?

—সঙ্গে নবাবগঞ্জের ডিহিদার সাহেব আছে। আর তাঞ্জামের মধ্যে আছেন বেগমসাহেবারা!

—আমার সঙ্গে কী দরকার, কিছু বলেছে?

—না, শুধু আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান, আর কিছু বলেননি।

নবাবের বেগমসাহেবা! তাঁদের এই ক্যাম্পের মধ্যে কোথায় বসাবে, কেমন করে খাতির করবে তার ব্যবস্থাটা একবার ভেবে নিলে ক্লাইভ। তারপর বললে—আচ্ছা, ভেতরে নিয়ে আয়—

ওদিকে ব্যাটালিয়ন তৈরি হয়ে গিয়েছে। তাদের নিয়ে রওনা দিতে হবে চন্দননগরের দিকে। এই অবস্থায় নবাবের বেগমের সঙ্গে ভালো করে কথা বলাও যাবে না।

কিন্তু ভাববারও আর সময় পাওয়া গেল না। দুজন সেপাই-এর সঙ্গে বোরখা-পরা একটা মূর্তি এসে দাঁড়াতেই ক্লাইভ সম্মানে নিচু হয়ে কুর্নিশ করলে।

—আমি চেহেল্-সুতুনের বেগমসাহেবা মরিয়ম বেগম!

ক্লাইভ নিচু হয়ে বোরখা-পরা মূর্তিটার দিকে চেয়ে বললে—আমি আপনার

কী নজরানা দিতে পারি বলুন?

মরালী বললে—নজরানা নিতে আমি আসিনি—

ক্লাইভ বললে—বেগমসাহেবা নজরানা নিতে না এলেও, কোম্পানীর উচিত নজরানা দেওয়া—

মরালী বললে—না, নজরানা নেওয়ার এ-সময় নয়, আর এ জায়গাও নয়। আপনি যখন মুর্শিদাবাদে নবাবের দরবারে যাবেন তখন নজরানা নিয়ে যাবেন, এখন নয়।

—এ তো বেগমসাহেবার অনুগ্রহ!

—অনুগ্রহ করতে আসিনি আমি। আমি আজ অনুরোধ করতে এসেছি কোম্পানীর কর্নেল রবার্ট ক্লাইভের কাছে!

ক্লাইভ বললে—ও কথা বলবেন না বেগমসাহেবা। আমি কোম্পানীর সারভেন্ট, আর নবাবের আন্ডারে কোম্পানী হিন্দুস্থানে কারবার করে টাকা উপায় করতে এসেছে। নবাব যা হুকুম করবেন কোম্পানী তা মাথা পেতে পালন করতে বাধ্য!

—কালকে যে-ঘটনা ঘটে গেছে তার পরেও কি আর সে-কথা বলা চলে?

ক্লাইভ বিনীত সুরে বললে—কোম্পানী যদি অন্যায় করে কিছু করে থাকে তো সে-কথা বলা চলে বৈকি!

মরালী বললে—কিন্তু নবাব তো কাল কোম্পানীর ফৌজের সঙ্গে লড়াইতে হেরে গেছে, হেরে গিয়েই ফয়সালা করতে বাধ্য হয়েছে।

ক্লাইভ একটু চুপ করে থেকে বললে—বেগমসাহেবাকে কি এই কথা বলতেই নবাব আমার কাছে পাঠিয়েছেন?

মরালী বললে—নবাব এত বেইমান নয় কর্নেল সাহেব, নবাব যে-কাগজে দস্তখত করেছেন তিনি তার মর্যাদা রাখতে জানেন। তা নাকচ করবার জন্যে আমি আপনার কাছে আসিনি। আমি এসেছি অন্য কাজে—

—অর্ডার করুন বেগমসাহেবা।

মরালী বললে—লোকের মুখে শুনেছিলুম, ইংরেজ কোম্পানীর নতুন কর্নেল সাহেব খুব মতলববাজ, মানুষকে বিপদে ফেলে কাজ হাঁসিল করতে ওস্তাদ।

ক্লাইভ বললে—বেগমসাহেবারা চেহেল্-সুতুনের ভেতরে থেকে সব সময়ে সত্যি খবর পান না বলে সন্দেহ হয়—

—কর্নেল সাহেব দেখছি চেহেল্-সুতুনের খবরও রাখেন?

—চেহেল্-সুতুনের খবর না রাখলে যে কোম্পানীর চলে না বেগমসাহেবা!

—কেন? চেহেল্-সুতুনে যে সুন্দরী-মেয়েমানুষ থাকে তার খবর বুঝি বিলেতের কোম্পানীর দফতরেও পৌঁছিয়েছে?

ক্লাইভ হাসলো। বললে—সুন্দরী-মেয়েমানুষ থাকে সে খবর না পৌঁছোলেও সেখানকার বেগমসাহেবাদের তহবিলে যে অনেক টাকা আছে, তার খবর পৌঁছিয়েছে।

—কোম্পানী তাহলে শুধু হিন্দুস্থানের টাকাই নয়, বেগমসাহেবাদের টাকার দিকেও নজর দেয়?

ক্লাইভ বললে—না বেগমসাহেবা, নজর কোম্পানীর সাহেবরা দেয় না, বরং ঠিক তার উল্টো। বেগমসাহেবারাই বরং কোম্পানীর তহবিলের টাকার দিকে নজর দেন।

মরালী বললে—তার মানে?

—তার মানে যে বেগমসাহেবা জানেন না তা নয়, কিংবা হয়তো নতুন করে

আমার মুখ থেকে মানেটা শুনতে চাইছেন। বেগমসাহেবা নিশ্চয় জানেন, নবাবের মা কোম্পানীর কাছে মাল বিক্রি করতেন, এবং তার জন্যে নগদ মোটা মুনাফা পেতেন। এতদিন পরে নবাবের সঙ্গে বোঝাপড়া হবার ফলে সে কারবার তাদের আবার চালু হবে। তাতে কোম্পানীরও লাভ, বেগমসাহেবাদেরও লাভ বই লোকসান নেই।

মরালী বললে—বেগমসাহেবাদের লাভ হলে যে নবাবের লাভ হয় না এটা বোধহয় কর্নেল সাহেবের জানা আছে। বাংলার নবাবের আর বেগমদের স্বার্থ যে এক নয়, তাও বোধহয় কর্নেল সাহেবের জানতে বাকি নেই!

ক্লাইভ বললে—নবাবের হাঁড়ির খবর আমাদের জানবার কথা নয়, বেগমসাহেবা!

—তা তো নয়, কিন্তু নবাবের ক্ষতি করবার জন্যে ষড়যন্ত্র করবার সময় তো সে-কথা মনে থাকে না কর্নেল সাহেবের!

ক্লাইভ সে-কথার উত্তর না দিয়ে বললে—বেগমসাহেবা কি ঝগড়া করবার জন্যেই এখানে এসেছেন? এখন কিন্তু আমার ঝগড়া করবার সময় নেই—

মরালী বললে—সময় আমারও নেই, কর্নেল সাহেব, কিন্তু অনেক কষ্টে সময় করে নিয়ে এসেছি—

—চেহেল্-সুতুনের বেগমসাহেবাদের সময় কাটে না বলেই তো জানা ছিল এতদিন।

—এবার থেকে জেনে রাখুন, চেহেল্-সুতুনের সব বেগমসাহেবা মাটির পুতুল নয়।

ক্লাইভ বললে—মাটির পুতুল তো আমি বলিনি তাঁদের, আমি শুধু বলেছি নবাবের কথায় তাঁরা ওঠেন বসেন!

—কিন্তু নবাবের কথায় উঠলে বসলে কি নবাবের বেগমসাহেবারা কোম্পানীর ফিরিঙ্গী আমলাদের সঙ্গে সোরার কারবার করতে পারতেন? নবাবের কথা যদি বেগমসাহেবারা শুনতেন তাহলে কি আমিই কর্নেল সাহেবের সঙ্গে এমন করে এখানে দেখা করতে আসতে পারতাম?

ক্লাইভের চোখ দুটো এবার কৌতূহলী হয়ে উঠলো।

—তাহলে নবাবের অমতেই কি বেগমসাহেবা কোম্পানীর ক্যাম্পে এসেছেন?

মরালী বললে—নবাবের বেগমসাহেবারা মাটির পুতুল নন বলেই আসতে পেরেছি।

তারপর একটু থেমে বললে—কিন্তু নবাব আপনাদের কী শত্রুতা করেছে যে, তাকে দিয়ে এমন অপমানের শর্তে দস্তখত করিয়ে নিলেন?

ক্লাইভ বললে—বেগমসাহেবা দেখছি নবাবের আম-দরবারের ব্যাপারে নিয়ে মাথা ঘামান।

মরালী বললে—নবাবের লোকসান হোক এ আমরা চাই না বলেই এত কথা বলছি।

—যাক্, তবু একজনকে পাওয়া গেল যিনি নবাবের লোকসান কামনা করেন না। বেগমসাহেবা যে নবাবের শুভাকাঙ্ক্ষী, এটা জেনেও আনন্দ হলো!

মরালী বললে—আপনার উপহাস শোনবার জন্যে আমি এখানে আসিনি, কর্নেল সাহেব, আর আপনার উপহাসের পাত্রীও আমি নই।

ক্লাইভ বললে—আমার অপরাধ মাপ করবেন বেগমসাহেবা—

—মাপ করবার কথা নয়, নবাব যখন দাসখতে দস্তখত করে দিয়েছে, তখন

সব-কিছু অপমানের জন্যে তৈরি হয়েই আপনার কাছে এসেছি—

—বলুন, বেগমসাহেবার আমি কী উপকার করতে পারি?

মরালী বললে—আমি মুর্শিদাবাদ থেকে বেরিয়েছিলুম নবাবকে সৎ-পরামর্শ দেবার জন্যে। কারণ আশেপাশে যারা আছে, তারা কেউই নবাবের মঙ্গল চায় না। কিন্তু আমি এসে পৌঁছোবার আগেই যা হবার তা হয়ে গেছে। এখন আমি এসেছি অন্য কাজে!

—হুকুম করুন!

—আমার সঙ্গে নানীবেগমসাহেবা আছেন, তিনি বাইরে তাঞ্জামে অপেক্ষা করছেন।

—সে কী? তাঁকে বাইরে রেখে এসেছেন কেন? ভেতরে নিয়ে আসুন!

বলে ক্লাইভ নিজের আর্দালিকে কী হুকুম করতে যাচ্ছিল, কিন্তু মরালী বাধা দিলে।

বললে—একটা বিশেষ কারণেই তাঁকে বাইরে রেখে এসেছি, নানীবেগমের সামনে সে-কথা বলা যাবে না।

—তাহলে এদেরও বাইরে যেতে বলি?

বলে ইঙ্গিত করতেই গার্ড-পাহারা-সেপাই সবাই বাইরে চলে গেল। ক্লাইভ সাহেবের ঘরের মধ্যে তখন একেবারে দু'জনে দু'জনের মুখের দিকে চেয়ে রইলো।

—এবার বলুন বেগমসাহেবা।

মরালী বললে—আপনার ছাউনিতে একজন জেনানা আছে—

—জেনানা!

—মিথ্যে কথা বলবেন না কর্নেল সাহেব। আমি খুব ভালো লোকের মুখ থেকে খবর পেয়েছি আপনার ছাউনিতে একজন হিন্দু মেয়েমানুষ আছে, গেরস্তের বউ; আপনি তাকে আপনার অন্দর-মহলে লুকিয়ে রেখে দিয়েছেন।

ক্লাইভ কিছু উত্তর দিতে পারলে না। চুপ করে রইলো।

মরালী বলতে লাগল—বরাবর মুর্শিদাবাদের নবাবদেরই বদনাম আছে যে, তারা নাকি পরের বউ-মেয়ে-ঝিদের চেহেল্-সুতুনে এনে পুরে রাখে। কর্নেল সাহেবেরও কি সেই দোষ আছে?

—কে বেগমসাহেবাকে এ-কথা বললে?

—কর্নেল সাহেব আগে বলুন যে, আমি যে-খবর পেয়েছি সে-খবর মিথ্যে!

ক্লাইভ বললে—বেগমসাহেবা তো নিজে মুসলমান, আমি যদি হিন্দু মেয়েকে নিজের জেনানাতে রেখেই থাকি, তাতে বেগমসাহেবার কিসের আপত্তি? বেগম-সাহেবা কি আমার প্রাইভেট লাইফের ওপরেও নজর দিতে চান? আর আমি যদি হিন্দু মেয়েকে নিয়ে ঘরে তুলে থাকিই তো তাতেও কি নবাবের বিরুদ্ধাচরণ করা হয়? নবাব যদি একশো-দু'শো জেনানা রাখতে পারেন তাঁর চেহেল্-সুতুনে, নবাবের প্রজারা কি তা পারে না? আর তা ছাড়া, আমি তো নবাবের প্রজাও নই—

হঠাৎ বাইরে থেকে গার্ড ডাকলে—হুজুর—

—কে?

—অ্যাডমিরাল ওয়াটসন সাহেব আয়া হুজুর।

ক্লাইভ সাহেবের মুখটা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলো। তারপর বললে—একটু ওয়েট করতে বলো—

গার্ড চলে যেতেই বেগমসাহেবার দিকে চেয়ে ক্লাইভ বললে—আমি লর্ড যেসাস্ ক্রাইস্টও নই, নবাব মীর্জা মহম্মদ সিরাজ-উ-দ্দৌলাও নই, আমি যদি আমার ক্যাম্পে মেয়েমানুষ রাখিই তো কার কীসের ক্ষতি? নবাবের সঙ্গে আমার সন্ধির যে-টার্মস তাতে তো মেয়েমানুষ রাখা-না-রাখার কোনো শর্তও নেই। আমি আমার ক্যাম্পের ভেতরে বসে যা-খুশী তাই-ই করতে পারি—

মরালী বললে—তারা কি এখন এখানে আছে?

ক্লাইভ বললে—বেগমসাহেবা কার কাছ থেকে শুনলেন, সে-কথা আগে বলুন।

মরালী বললে—শুনেছি একজন রাস্তার লোকের কাছ থেকে—

—কে সে?

—সে একজন পাগল, পাগল কবি!

—পোয়েট? তার সঙ্গে বেগমসাহেবার কোথায় দেখা হলো?

—ত্রিবেণীতে! কিন্তু যেখানেই দেখা হোক, কথাটা সত্যি কিনা কর্নেল সাহেব বলুন, যদি সত্যি হয় তো আমি কর্নেল সাহেবকে অনুরোধ করবো তাদের নিজেদের বাড়িতে পাঠিয়ে দিতে। পরের বাড়ির বউকে নিজের কাছে আটকে রাখা যে ভালো নয় তা কর্নেল সাহেব নিশ্চয় বোঝেন।

ক্লাইভ বললে—বেগমসাহেবার সদুপদেশ পালন করতে পারলে আমি খুশীই হতাম, কিন্তু বাঙলা দেশের নবাবের যা চরিত্র তাতে তাঁকে একলা ছাড়তেও ভয় হয়। আমার হাত থেকে ছাড়া পেলেও নবাবের দৃষ্টি থেকে ছাড়া পাবে এমন আশা কম, বেগমসাহেবা।

মরালী বললে—বাঙলার নবাব সম্বন্ধে অনেক কথাই বলতে পারতাম কর্নেল সাহেব, কিন্তু এখন সে-সময় আমার নেই—যাহোক, আমার অনুরোধ আমি রেখে গেলাম কর্নেল সাহেবের কাছে, যদি সম্ভব হয় কর্নেল সাহেব সে-অনুরোধ রাখবেন, আর সম্ভব না হলে রাখবেন না—আমার কিছু করবার নেই—

—কিন্তু সেই গৃহস্থ-বাড়ির বউ-এর জন্যে বেগমসাহেবার এত উদ্বেগ কেন, জানতে পারি কি?

মরালী বললে—উদ্বেগ অন্য কারণে নয়, উদ্বেগ তিনিও আমার মত মেয়েমানুষ বলে! মেয়েমানুষ না হলে মেয়েমানুষের দুঃখ কে বুঝবে, কর্নেল সাহেব তা নিজেই বুঝতে পারেন!

—কিন্তু যদি এমন হয় যে তারা নিজের ইচ্ছেতেই এখানে আছে? তাদের নিজেদের গরজেই এখানে আছে? তাহলেও কি বেগমসাহেবা আমাকেই দোষী করবেন?

—হিন্দু মেয়েরা কি স্বামীকে ছেড়ে নিজের গরজে পর-পুরুষের আশ্রয়ে থাকে কর্নেল সাহেব? তাও কি আমাকে বিশ্বাস করতে বলেন?

ক্লাইভ বললে—তাহলেই বুঝুন বেগমসাহেবা, নবাবের শাসনে দেশের কী অবস্থা হয়েছে, হিন্দু মেয়েরা বরং আমাদের মত ম্লেচ্ছ লোকের আশ্রয়ে আসা নিরাপদ মনে করে, তবু নিঃসঙ্গ অবস্থায় রাস্তায় বেরোতে সাহস পায় না।

তারপর একটু থেমে বললে—বেগমসাহেবা হয়তো সবই জানেন, তবু যদি তাঁর মনে না থাকে তো জানিয়ে রাখি যে, হাতিয়াগড়ের এক রাণীবিবিকেও নবাব নিজের খেয়াল স্যাটিসফাই করবার জন্যে নিজের হারেমে পুরে রেখেছেন—

—আপনি কী করে জানলেন? কে বললে আপনাকে?

ক্লাইভ বললে—আমি জানি, আমি বিশ্বাসযোগ্য লোকের মুখে শুনেছি—

—কে সে?

—তাঁর নাম না-ই বা শুনলেন বেগমসাহেবা। নাম জানলে হয়তো তাঁর ওপর নিজামতের অত্যাচার বাড়তে পারে!

—সেই রাণীবিবির এখনকার নাম কী?

—বেগমসাহেবা যদি প্রতিজ্ঞা করেন কাউকে বলবেন না, তাহলে বলবো।

মরালী বললে—প্রতিজ্ঞা করছি বলবো না, এবার বলুন?

—মরিয়ম বেগম!

মরালী হেসে উঠলো—কী আশ্চর্য, মরিয়ম বেগম তো আমারই নাম, কিন্তু আমি তো হাতিয়াগড়ের রাণীবিবি নই!

ক্লাইভ বললে—তাহলে অন্য মরিয়ম বেগম। চেহেল্-সুতুনে শুনেছি তিন-চারশো বেগমসাহেবা আছেন, বেগমসাহেবা কি সকলকেই চেনেন? আরো ক'জন মরিয়ম বেগম আছেন, বেগমসাহেবার পক্ষে কি তা জানা সম্ভব?

—কিন্তু কে কর্নেল সাহেবকে এত খবর জানালে [illegible] কর্নেল সাহেব বললেন না!

—মনে থাকে যেন বেগমসাহেবা, প্রতিজ্ঞা করেছেন [illegible] কাউকে বলবেন না।

—মনে আছে!

ক্লাইভ বললে—হাতিয়াগড়ের রাজাসাহেব নিজেই [illegible]

—তিনি কি নিজেই এসেছিলেন কর্নেল সাহেবের [illegible]

কিন্তু বেগমসাহেবার এ-কথার আর উত্তর দেওয়া হলো না। অ্যাডমিরাল ওয়াটসন্ সোজাসুজি ঘরে ঢুকে পড়েছে, আর বাইরে এতক্ষণ ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে পারেনি। অ্যাডমিরালকে দেখে বেগমসাহেবাও যেন অপ্রস্তুত হয়ে গেছে। ক্লাইভও অপ্রস্তুত! বোরখা-পরা মূর্তিটা বিনা সম্ভাষণেই ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে গেল।

অ্যাডমিরালের চোখ-মুখ তখন লাল হয়ে উঠেছে [illegible]স্ততে!

—রবার্ট, হোয়াট ইজ দিস?

ক্লাইভ বললে—কীসের কী?

—আমি কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবো বাইরে? চন্দননগর অ্যাটাক করার প্রোগ্রাম কি ভুলে গেছো তুমি? নবাবের কাছে যে চিঠি লেখা হয়েছিল তার রিপ্লাই এসেছে?

—রিপ্লাই-এর জন্যে আমি ওয়েট করবো না ঠিক করেছি।

—রিপ্লাই-এর জন্যে যদি ওয়েট না করো তো এতক্ষণ কার জন্যে ওয়েট করছিলে? হু ইজ দ্যাট পর্দা-লেডী? তোমার সঙ্গে এর কী রিলেশন? মেয়েদের ওপর উইকনেস কি এখনো তোমার গেল না? মেয়েরা কি খুঁজে-খুঁজে তোমার কাছেই আসে কেবল? কই, আমার কাছে তো আসে না কেউ?

তারপর ভালো করে ক্লাইভের দিকে চেয়ে বললে—টেল মি রবার্ট, হু ইজ সি? তোমার কাছে কী করতে এসেছিল?

ক্লাইভ বললে—সে কথা তোমার জানবার দরকার নেই—

—ইজ ইট এ সিক্রেট?

—ইয়েস!

—ও কি নিজামতের স্পাই?

—না! ও-কথা থাক, অন্য কথা বলো। আমি উমিচাঁদকে খবর দিয়েছিলাম আমাদের চিঠি পেয়ে নবাব কী বলেছে তা জানতে! আমি উমিচাঁদের রিপ্লাই-এর জন্যে অপেক্ষা করছি। সেই চিঠি পেলেই আমি আর্মি নিয়ে হুগলী-রিভার পেরিয়ে চন্দননগরের দিকে যাবো।

—আর কতক্ষণ ওয়েট করবো?

—যতক্ষণ না উমিচাঁদের চিঠি আসে। সেই লেটার পেলেই বুঝবো নবাব আমাদের ফ্রেন্ড না এনিমি! উমিচাঁদের লেটার না পেলে আমি কিছুই ডিসাইড করতে পারছি না!

বাইরের তাঞ্জামের ভেতরে ঢুকতেই নানীবেগম বললে—ওমা, এতক্ষণ কী করছিলি রে তুই? আমার তো ভয়ে হাত-পা হিম হয়ে আসছিল। এত কী কথা তোর সাহেব-ফিরিঙ্গীদের সঙ্গে?

মরালী ভেতরে ঢুকেই বোরখার মুখটা মাথায় তুলে দিয়েছিল। বাইরের সেপাইদের হুকুম দিলে—চলো, নবাব-ছাউনিতে চলো—

বাইরে তখন বেশ দিন। দূর থেকে কে যেন ঘোড়া ছুটিয়ে আসছিল। ভেতর থেকে তার আওয়াজ শোনা গেল। হয়তো নবাবের লোক। নানীবেগম কলকাতায় আসছে খবর পেয়ে নিজামতের খাসনবীশ হয়তো ঘোড়-সওয়ার পাঠিয়ে দিয়েছে। কিন্তু, না, তা নয়। ঘোড়-সওয়ারটা আওয়াজ তুলতে তুলতে ধুলো উড়িয়ে কোম্পানীর বাগানের দিকে এগিয়ে গেল। তাঞ্জাম সোজা এগিয়ে চলতে লাগলো। তাঞ্জামের ভেতর থেকে তখন শুধু তাঞ্জামের বেহারাদের ভারি নিঃশ্বাস পড়ার শব্দ শোনা যাচ্ছে—হুম, হাম, হুম, হাম, হুম...
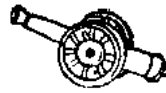
নবাবের ফৌজী সেপাই গোবিন্দ মিত্তিরের বাগান থেকে বেরিয়ে সোজা নবাবগঞ্জের দিকে যাচ্ছিল। সমস্ত দিন চলে সন্ধ্যে বেলা একটা বাগানের নিচে এসে ঘাটি গেড়েছিল সবাই। সেখানে সারারাত থেকে আবার ভোর বেলা রওনা দিতে হবে।

কিন্তু ভোর বেলাই চিঠিটা এল কর্নেল রবার্ট ক্লাইভের।

চিঠিটা সবাই দেখলে। উমিচাঁদ আর ওয়াটস্ পাশেই ছিল। চিঠিটা পড়ে নবাব সবাইকে দেখালে একের পর এক। শুধু কান্ত চুপ করে সকলের মুখের দিকে চেয়ে দেখতে লাগলো। কারোর মুখে কোনো কথা নেই।

—তোমার কী মতলব জাফর খাঁ?

শুধু জাফর আলি খাঁ নয়, সকলকেই মতামত জিজ্ঞেস করলেন নবাব। এই সেদিন ফিরিঙ্গীরা যা বলেছে তাতেই রাজি হয়ে নবাব দস্তখত দিয়ে এসেছে। একটা রাত কাটতে না কাটতেই আবার নতুন আবদার জুড়ে দিয়েছে। এরা কি সত্যিই শান্তি চায়, না লড়াই চায়?

কান্ত নবাবের মুখের দিকে তাকিয়ে অনেক কষ্টে নিজের দুঃখ চেপে রাখতে চেষ্টা করলো। কান্তকে তো কেউ কিছু জিজ্ঞেস করে না। কান্তর তো কিছু বলবার অধিকারও নেই।

শশীর তখনো চাকরি যায়নি। ফৌজের দলের সঙ্গে সে-ও চলেছে।

তাড়াতাড়ি দৌড়ে এসেছে সে কান্তর কাছে।

—আবার কী চিঠি এসেছে ভাই?

—কার চিঠি?

—ওই যে ফিরিঙ্গীদের ছাউনি থেকে নাকি চিঠি এসেছে শুনলাম? আবার লড়াই লেগে গেল নাকি?

কান্ত বললে—আমি জানি না—বোধহয় লড়াই হবে না—

শশী বললে—লড়াই হবে না তো নানীবেগমসাহেবা কী জন্যে আসছে?

—কে বললে নানীবেগমসাহেবা আসছে?

শশী বললে—আরে, তুমি কিছু শোনোনি? নানীবেগমসাহেবা আসছে বলেই তো ছাউনি পড়েছে এখেনে।

—কে বললে তোমাকে নানীবেগমসাহেবা আসছে?

—আরে, নবাবগঞ্জের ডিহিদারের লোক এসে যে খবর দিয়ে গেছে। সে নিজেই আমাকে বললে।

কান্ত অবাক হয়ে গেল।—সত্যি? ঠিক বলছো?

—হ্যাঁ, ঠিক না তো কি বেঠিক? নানীবেগমসাহেবার সঙ্গে আর একজন বেগমসাহেবাও আসছে যে!

—কে সে? কে? নাম কী তার?

—বললে মরিয়ম বেগমসাহেবা। নবাবের নাকি খুব পেয়ারের বেগম!

কান্ত আর দাঁড়ালো না সেখানে। সোজা নবাবের দরবার-ঘরে ঢুকে গেল একেবারে। সেখানে তখন সবাই রয়েছে। নবাব তখন হুকুমনামা পাঠাচ্ছে মীর-বক্সীর কাছে। জেনারেল বুশী যদি বাঙলা দেশে আসে তো তার আগেই আজিমাবাদের পথে যেন তাকে আটকে দেওয়া হয়!

সমস্ত দরবার-ঘরটা তখন থম্ থম্ করছে।

হুকুমনামাটায় দস্তখত করে দিয়ে হঠাৎ নবাব মুখ তুলে জিজ্ঞেস করলে—এখনো নানীবেগমের তাঞ্জাম আসছে না কেন? কত দূরে তাঞ্জাম?

ডিহিদারের লোক কুর্নিশ করে বললে—জাঁহাপনা, তাঞ্জাম এই দিকে আসছিল, আসতে আসতে বাগবাজারে পেরিন সাহেবের বাগানের দিকে গেছে, ফিরিঙ্গী-ফৌজের ছাউনির দিকে—

—কেন?

—মরিয়ম বেগমসাহেবার মর্জি!

বেগম মেরী বিশ্বাসের সে-মর্জির কারণ খুঁজতে গেলে মরালীর মনের মধ্যেই ঢুকতে হয়। যে-মেয়ে নগণ্য এক গ্রামের মধ্যে জন্মেছিল, তার পক্ষে এ-ঘটনা সত্যিই অবিশ্বাস্য। তবু চেহেল্-সুতুনের অন্ধকার বন্দীদশার মধ্যে যে সেদিন তাকে মরতে হয়নি, সেইটেই এক পরম আশ্চর্যের ব্যাপার। নইলে অন্য বেগমরা যে-ভাবে দিন কাটাতো সেইভাবে জীবনটা কাটিয়ে দিলেই তো চলতো। তাতে কেউই বাধা দিত না। এমন কি চেহেল্-সুতুন যেদিন গুঁড়িয়ে গেল সেদিন অন্য সকলের সঙ্গে মরালীও গুঁড়িয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারতো। বহুদিন আগে ছোটবেলায় হাতিয়াগড়ের গাঁয়ে যে-সব মেয়েদের বিয়ে হতে দেখেছে সে, তারা কেউ কেউ শ্বশুরবাড়ি থেকে ফিরে এসে গল্প করতো মরালীর কাছে। মরালী চুপ করে সব শুনতো মন দিয়ে।

এক-সময় মরালী জিজ্ঞেস করতো—তোর সতীন তোকে আদর করে ভাই?

কেষ্ট দাসীর নতুন বিয়ে হয়েছিল। সে বললে—দূর, সতীন কখনো সতীনকে আদর করে? সতীন তো বুকের কাঁটা রে—

তখন থেকেই বিয়ের নাম শুনলে ভয় হতো তার। বলতো—তোর বর কার সঙ্গে শোয়?

—আমার সতীনের সঙ্গে! সতীন যে বড়।

—তুইও তো বড়।

—দূর, আমার সতীন আমার মায়ের বয়েসী।

—আর তোর বর? তোর বরের বয়েস কত?

—আমার বর আমার বাবার চেয়েও বড়। খুব রাগ ভাই মানুষটার, হাঁপানী আছে কি না—

—তা নতুন বউ ফেলে পুরোন বউ-এর কাছে শোয় কেন?

কেষ্ট দাসী বলতো—ওমা, তা শোবে না, আমার সতীনের গায়ে যে খুব জোর, আমার সঙ্গে শুলে বরকে মেরে একেবারে হাড় গুঁড়িয়ে দেবে না! আমার সতীন তো তাই আমার বরকে বলে। বলে—তুমি বিয়ে করেছো বেশ করেছো, পোড়ার-মুখীকে মা হতে দেবো না—

শুনে মরালীর হাড় হিম হয়ে আসতো। আহা, সেই কেষ্ট দাসীর শেষকালে পেটে ছেলে হলো। কিন্তু আঁতুড় ঘরে মরা-ছেলে বিইয়ে সেই যে চোখ মট্‌কে পড়ে রইলো, আর উঠলো না। তখন থেকেই শোভারাম বিয়ের কথা তুললেই মরালী ভেতরে ভেতরে শিটিয়ে উঠতো। নয়ান পিসির কাছে গিয়ে বলতো—তুমি বাবাকে বলো পিসি, আমি বিয়ে করবো না—

নয়ান পিসি চোখ কপালে তুলে বলতো—ছিঃ, ও-কথা মুখে আনতে নেই, বিয়ে না করে কি আঁটকুড়ী থাকতে আছে?

—কেন, আটকুড়ী থাকলে কী হয়?

—তা জানিসনে বুঝি, সোমত্থ মেয়ে আঁটকুড়ী থাকলে ভূতে ঢেলা মারে যে!

—ভূতে ঢেলা মারলে বুঝি আমিও ভূতকে ঢেলা মারতে পারিনে?

নয়ান পিসি অবাক হয়ে যেত মরির তেজ দেখে। শোভারামকে বলতো—তুমি দাদা, একটু তাড়াতাড়ি ওর বিয়ের যোগাড়-যন্তর করো, আমি ওর মতিগতি ভালো বুঝছিনে—

আবার বহুদিন পরে যখন চেহেল্-সুতুনে গিয়েছিল মরালী তখনো সেই রকম। তখনো নানীবেগম দেখতো এ এক অদ্ভুত মেয়ে। অনেক মেয়ে দেখেছে নানীবেগম। সকলকে নিয়ে এতদিন সামলে এসেছে। কেউ এসেছে কান্দাহার থেকে, কেউ খোরাশান। কেউ বা চট্টগ্রাম, আবার কেউ বা আগ্রার তয়ফাওয়ালীর ঘরানার মেয়ে। কিন্তু প্রথম দিনটা থেকেই মরালী যেন নানীবেগমের বুকটা জুড়ে সব আদর কেড়ে নিয়েছে। কোনো নিয়ম-কানুন মানবে না, কোনো আদব-কায়দা শিখবে না।

পেশমন বেগম কতবার নালিশ পেশ করেছে—মরিয়ম বেগমকেই তুমি বেশি ভালোবাসো নানীজী, আমাদের দিকে একবারও নজর দাও না—

মরিয়ম বেগমের কাছে এসে নানীবেগম কতবার বলেছে—সকলের সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারিসনে কেন তুই, সবাই যে তোর নামে শিকায়ৎ করে—

মরালী বলতো—তাহলে তুমি আমাকে বকো—আমাকে মারো—

নানীবেগম বলতো—তুই রাগ করছিস কেন, আমি কি তাই বলেছি?

মরালী বলতো—তাহলে আমিই খারাপ, ওরা সবাই ভালো—

সে এক তুমুল কাণ্ড বাঁধিয়ে বসতো তখন মরিয়ম বেগম। খাবে না, দাবে না, কিছু করবে না। বিছানায় মুখ গুঁজে পড়ে থাকতো। সমস্ত চেহেল্-সুতুনে যখন সবাই গান-বাজনা নিয়ে আছে, তখন মরালী নিজের ঘরে মুখ-গোমড়া করে থাকলে নানীবেগমের ভালো লাগতো না। নিজের মেয়েরা মায়ের দিকে ফিরেও চেয়ে দেখতো না। মীর্জা মহম্মদ ঘসেটি বেগমকে মতিঝিল থেকে তাড়িয়ে দিয়ে নজরবন্দী করে রেখেছে, ময়মানা বেগমের ছেলেকে খুন করে ফেলেছে, সমস্তই যেন নানীবেগমের দোষ। আমিনা-বেগমের ফিরিঙ্গীদের সঙ্গে সোরার কারবার বন্ধ হয়ে গেছে, তাও যেন নানীবেগমের দোষ। যতদিন নবাব আলীবর্দী খাঁ সাহেব বেঁচে ছিল ততদিন নানীবেগমের ভয়ে সবাই তটস্থ থাকতো। চেহেল্-সুতুনের সব কানুন-কায়দা সবাই মেনে চলতো। ভিস্তিখানায় ঠিক সময়ে পানি দিত ভিস্তিওয়ালা। ঠিক সময়ে ইনসাফ মিঞা নহবতখানায় উঠে নহবতে সুর লাগাতো। জুম্মা মসজিদে ঠিক সময়ে সিন্নি চড়তো।

—কী ভাবছিস রে মেয়ে?

মরালী বললে—তোমার কথা ভাবছি নানীজী—

তাঞ্জামের ভেতর দুলতে দুলতে মরালী যেন অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল, একদিন মরবার সংকল্প নিয়ে এসেছিল সে চেহেল্-সুতুনে, এখন বেরিয়েছে চেহেল্-সুতুনকে বাঁচাবার জন্যে; কোথায় সেই মুর্শিদাবাদ আর কোথায় এই কলকাতা!

নানীবেগম আবার জিজ্ঞেস করলে—সত্যি বলতো, তুই ফিরিঙ্গী ছাউনিতে কী করতে গিয়েছিলি? মীর্জা শুনলে কী বলবে বল তো! মীর্জার কানে কথাটা যাবে না ভেবেছিস?

মরালী বললে—লোকটাকে দেখতে গিয়েছিলুম নানীজী—

—কোন্ লোকটাকে?

—ওই যে লোকটা তোমার মীর্জাকে এত জ্বালাচ্ছে।

—কে? লোকটা কে?

—ক্লাইভ গো, ক্লাইভ!

—তুই তারই সঙ্গে দেখা করে এলি!

—হ্যাঁ নানীজী, লোকটাকে যত খারাপ ভেবেছিলুম তত খারাপ নয়।

নানীজী বললে—বলিহারি মেয়ে তুই বটে, তুই কী বলে তার সঙ্গে দেখা করলি? মীর্জা যদি কিছু বলে?

মরালী বললে—বললেই বা, আমি তো তোমার মীর্জার ভালোর জন্যেই দেখা করলুম!

—কিন্তু তোকে যদি ধরে রাখতো?

মরালী বললে—এই দেখো, আমার কাছে কী রয়েছে দেখো—

বলে ওড়নাটা তুলে নানীজীকে দেখালে। একটা ধারালো ছোরা চক্ চক্ করে উঠলো সেই অন্ধকারের মধ্যে!

—আমার সঙ্গে কিছু ইত্রামি করলে সফিউল্লা সাহেবকে যা করেছি, ক্লাইভেরও তাই করতাম। আমাকে তো চেনে না কেউ! এখন ক্লাইভ সাহেবকে দেখলুম, এবার উমিচাঁদ সাহেবকে দেখবো—দেখি কত বড় শয়তান সে! নানীজী,

তুমি কিন্তু কিছ্ছু বলতে পারবে না তোমার মীর্জাকে। আমি তোমার মীর্জার ভালোর জন্যেই যা-কিছ্ছু করছি। যখন একবার কাজে নেমেছি নানীজী, তখন এর শেষ দেখে তবে ছাড়বো—

তারপর একটু থেমে বললে—একটু তাড়াতাড়ি বেহারাদের চালাতে বলো নানীজী, অনেক দেরি হয়ে গেছে, তোমার মীর্জা বোধহয় এতক্ষণ ছাউনি তুলে মুর্শিদাবাদের দিকে রওনা দিয়েছে। তার আগেই আমাদের পৌঁছোনো দরকার-- জল্দি চালাতে বলো, জল্দি—

চারি সমাজের পতি কৃষ্ণচন্দ্র মহামতি
ভূমিপতি ভূমিসুরপতি।
তাঁর রাজ্যে শ্রেষ্ঠ ধাম সমাজপূজিত গ্রাম
শ্রীকান্ত-সাগরে নিবসতি॥
শ্রীউদ্ধব দাস নাম, হরিভক্তি লাভ কাম
উপনাম শ্রীশ্রীহরিদাস।
পয়ারে রচিয়া ছন্দ, লিখিতং গীতবন্ধ—
শ্রীবেগম মেরী বিশ্বাস॥

শেষ জীবনে উদ্ধব দাস বোধহয় ওই কান্ত-সাগরের ধারেই বাস করতো। কাব্য লিখতে আরম্ভ করেছিল বহুদিন আগেই। তখন পলাশীর যুদ্ধ হয়ে গেছে। একদিকে মুর্শিদাবাদ আর একদিকে কলকাতা। দুই নগরের কাহিনী। তারই মধ্যে আবার কৃষ্ণনগরের কথাও থাকতো। কৃষ্ণনগরের কথা না লিখলে তো বাঙলা দেশের ইতিহাস হয় না। এর পর রামরুদ্র বিদ্যানিধির কথাও আছে। একদিকে যেমন রঘুনন্দন মিশ্রের ন্যায়শাস্ত্রের বই, অন্যদিকে তেমনি রামরুদ্র বিদ্যানিধির জ্যোতিষশাস্ত্র। মহারাজ রামরুদ্র বিদ্যানিধিকে দিয়ে পঞ্জিকা লিখিয়ে নিতেন। একখানা নিজের হাতে লিখতেন রামরুদ্র বিদ্যানিধি মশাই। কৃষ্ণচন্দ্র আর একখানা নকল করিয়ে পাঠাতেন নবাবের দরবারে। নবাব আলিবর্দী দরবারের মৌলভী সাহেবকে দিয়ে আবার সেখানা পড়িয়ে নিতেন।

বেগম মেরী বিশ্বাস বলতো—রামরুদ্র বিদ্যানিধির কথাও লিখো কিন্তু তুমি—

উদ্ধব দাস বলতো—লিখবো বৈকি। নিশ্চয় লিখবো—

বেগম মেরী বিশ্বাস বলতো—যেদিন কর্নেল সাহেব ফরাসী চন্দননগরের কেল্লা দখল করতে গেল, সেদিন আমি তো গেলাম নবাবের ছাউনিতে। তারপর তুমি আর ছোটমশাই কোথায় গেলে?

উদ্ধব দাস বলতো—আমি তো জানতাম না বাবুমশাই-এর নামই ছোটমশাই। হাতিয়াগড়ে ছোটমশাই-এর অতিথিশালায় কতদিন রাত কাটিয়েছি, সেই তিনিই যে আমার সঙ্গে সঙ্গে রয়েছেন তা কেমন করে জানবো বলো না—জানতেই তো পারিনি!

তা উদ্ধব দাস সেই কথাও লিখে গেছে।

রেঁড়ির তেলের আলোর তলায় বসে বসে উদ্ধব দাস লিখতো আর সুর করে

করে পড়তো। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের কথা, তাঁর দেওয়ান কালীকৃষ্ণ সিংহের কথা, গোপাল ভাঁড় মশাই, রায়গুণাকর, রামরুদ্র বিদ্যানিধির কাহিনীও লিখতো।

সেদিন উদ্ধব দাস বাবুমশাই-এর সঙ্গে বাগবাজারের বাগানে এসে দেখে ছাউনিতে কেউ নেই, ফাঁকা। লটবহর নিয়ে সবাই রওনা দিয়েছে চন্দননগরের দিকে। ছোটমশাই আর সেদিন অপেক্ষা করেননি সেখানে, সোজা চলে গিয়েছিলেন কৃষ্ণনগরে।

কৃষ্ণচন্দ্র এমনিতে পণ্ডিতদের নিয়ে দিন কাটাতেন বটে, কিন্তু নজর রাখতেন সব দিকে। তাঁর লোক ছিল দিল্লীতে বাদশার দরবারে। তেমনি আবার অন্য লোক ছিল মুর্শিদাবাদে কাছারির কাজ করবার জন্যে। নতুন নবাব হবার পর থেকেই বড় ঝঞ্ঝাট চলছিল। আগেও ঝঞ্ঝাট ছিল। কিন্তু নবাব আলীবর্দী খাঁ ছিল রসিক মানুষ। বয়েস হয়েছিল। অনেক ঠেকে, অনেক শিখে, অনেক দেখে জীবন সম্বন্ধে একটা জ্ঞান হয়েছিল। বাকি খাজনার জন্যে যেমন রাজা-জমিদারদের জমি বাজেয়াপ্ত করেছিল নবাব, তেমনি খালাসও দিয়েছিল অনেককে।

রামরুদ্র বিদ্যানিধিকে মহারাজ বরাবর সঙ্গে নিয়ে দরবারে যেতেন।

দরবারে একবার নবাব জিজ্ঞেস করলেন—আচ্ছা মহারাজ, আজ তিথি কী?

নবাব কৃষ্ণচন্দ্রকে মহারাজ বলে ডাকতেন।

মহারাজ রামরুদ্র বিদ্যানিধির দিকে চাইতেই বিদ্যানিধি বললেন—আজ পূর্ণিমা—

নবাব জানতেন পণ্ডিতরা অনেক সময় ঠিকে ভুল করে। জিজ্ঞেস করলেন—আজ কি তাহলে সমস্ত রাতই জ্যোৎস্না থাকবে?

বিদ্যানিধি বললেন—হ্যাঁ জাঁহাপনা, আজ সমস্ত রাতই জ্যোৎস্না থাকবে—

আলিবর্দী হেসে ফেললেন। বললেন—পণ্ডিত, আপনি কিন্তু মিছে কথা বলছেন—

সমস্ত দরবারসুদ্ধ আমীর-ওমরাহ্‌রা পণ্ডিতের মুখের দিকে তাকালেন। রামরুদ্র বিদ্যানিধিকে সবাই চিনতেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকেও সবাই চিনতেন। রামরুদ্র বিদ্যানিধিকে মিথ্যেবাদী বলা মানে মহারাজকেও মিথ্যেবাদী বলা।

—কিন্তু আপনার এই পঞ্জিকাতেই তো আপনি লিখেছেন আজ চন্দ্রগ্রহণ?

মহারাজের মাথায় বজ্রাঘাত হলো। বিদ্যানিধি মশাই কি তাঁকে লজ্জায় ফেলবেন নবাবের সামনে!

কিন্তু বিদ্যানিধি মশাই বললেন—না খোদাবন্দ্‌, আজ চন্দ্রগ্রহণ বটে, কিন্তু সে চন্দ্রগ্রহণ হিন্দুস্থানে অদৃশ্য, তাই সারা রাতই আকাশ জ্যোৎস্নাময় থাকবে—দেখে নেবেন—

কথাটা বিদ্যানিধি বললেন বটে, কিন্তু মহারাজের ভয় গেল না। দরবার থেকে ফিরে বিদ্যানিধির কাছে এসে মহারাজ বললেন—কী সর্বনাশে ফেললেন বলুন তো পণ্ডিতমশাই, এখন কী করে আমার মুখরক্ষে হবে?

সে অনেক কাল আগের কথা। সত্যিমিথ্যে, বাস্তব-কল্পনা, সব কিছু মিশিয়ে সেই নবাবী আমল। উদ্ধব দাস নিজে দেখেনি। বেগম মেরী বিশ্বাসও দেখেনি। শুধু চেহেল্‌-সুতুনের ভেতরে বেগমমহলের কাছ থেকে গল্প শুনেছে। নানীজী নিজে বলেছে মরালীকে। নবাব রাত্রে চেহেল্‌-সুতুনে এসে নানীবেগমকে বলেছিলেন—আজ কৃষ্ণনগরের পণ্ডিতকে জব্দ করবো—

নানীবেগম জিজ্ঞেস করেছিল—কেন গো, কীসে জব্দ করবে—

—আজ পণ্ডিত বিদ্যানিধি বললে, চন্দ্রগ্রহণ হিন্দুস্থানে দেখা যাবে না—তাই দেখবো মিনারে উঠে—

ওদিকে মহারাজেরও ভাবনার অন্ত নেই। কী করে মুখরক্ষে হবে মহারাজের তাই নিয়েই ভাবনা।

নবাব বলেছিলেন—যদি চন্দ্রগ্রহণ দেখা যায়, তা হলে কী হবে পণ্ডিতমশাই?

—তা হলে আপনার যা অভিরুচি, তাই-ই করবেন!

তা মহারাজের ভাবনা দেখে রামরুদ্র বিদ্যানিধি বললেন—মহারাজ চিন্তা করবেন না, গ্রহণ হবে না—

মহারাজ বললেন—কিন্তু এ-আপনি কী বলছেন পণ্ডিতমশাই, সর্বগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ কখনো না হয়ে যায়? আপনি প্রলাপ বকছেন না কি? এক বছর মাথা ঘামিয়ে যা গণনা করে বার করেছেন, এক দিনের কথায় তা আজ রদ হয়ে যাবে? আপনি বলছেন কী?

বিদ্যানিধি বললেন—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন মহারাজ, স্নানাদি করতে যান, আজকে আমার সঙ্গে দিবারাত্রির মধ্যে আর দেখা করতে আসবেন না—

—বুঝেছি, আপনি পালিয়ে যাবেন। কিন্তু নবাবের মুল্লুক ছেড়ে কোথায় পালাবেন?

বিদ্যানিধি বললেন—মহারাজ, প্রাণের মায়া কি আমার এত বড় যে বিপদের সময়ে মহারাজকেও ত্যাগ করবো? আমি তেমন লোক নই—

সেই দিনই বিদ্যানিধি ভাগীরথী পাড়ে গিয়ে পুজো আরম্ভ করলেন। একটা তামার কলসী আগেই জোগাড় করেছিলেন। আর জোগাড় করেছিলেন একশো আটটা লোহিতবর্ণ জবাফুল। সামনে পেছনে কেউ কোথাও নেই। মহারাজের সাঙ্গোপাঙ্গরা সেই পুজোর জিনিসপত্র নিয়ে গিয়ে ভাগীরথীর নির্জন একটা বাঁকে তুলে দিয়ে এল। বিদ্যানিধি মশাই সেই একশো আটটা জবাফুল দিয়ে যথাবিধি নিজের উপাস্যদেব সহস্রাংশুর পুজো করতে লাগলেন। তারপর সন্ধ্যে হবার সময়েই তামার কলসীটা পুজোর বেদীতে রেখে মন্ত্রবলে রাহুকে আকর্ষণ করে কলসীর মধ্যে পুরে ফেললেন। তার ওপরে একখানা তামার থালা ঢাকা দিয়ে পাঁচটি শিবলিঙ্গ স্থাপন করে একমনে উপাস্য দেবতার জপ শুরু করলেন।

নবাব মিনারের ওপর চাঁদোয়া খাটিয়ে চন্দ্রগ্রহণ দেখবেন বলে তখন আসর জাঁকিয়ে বসেছেন। গল্প করতে করতে বললেন—মহারাজের পণ্ডিতটা একটা বুজরুক হে! মৌলভী সাহেবও আমাকে বলেছিল যে, দিল্লীর পঞ্জিকাতেও নাকি লেখা আছে রাত চার দণ্ডের সময় গ্রহণ লাগবে আর দ্বিতীয় প্রহরে ছাড়বে, আর পূর্ণগ্রাস হবে—

কিন্তু না, সবাই দেখলে গ্রহণ হলো না।

নবাব তখন নিজের মহলে ঘুমোতে গেলেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের কিন্তু আর ঘুম এল না। তিনি বিদ্যানিধি মশাইয়ের খোঁজে বেরোলেন। বিদ্যানিধি মশাই-এর তখন বাহ্যজ্ঞান নেই। সেই জনমানবহীন গঙ্গাগর্ভে মাঘ মাসের দুঃসহ ঠাণ্ডার মধ্যেও একলা নাসাগ্রে দৃষ্টিস্থাপন করে সহস্রাংশুর নাম জপ করে চলেছেন। শেষে যখন রাত শেষ হয়ে এল, তখন চাঁদ নিষ্প্রভ হয়ে গেছে। বিদ্যানিধি মশাইও গাত্রোত্থান করে শিব পাঁচটি গঙ্গাগর্ভে বিসর্জন দিলেন। তারপর তামার থালাটি তুলতেই সমস্ত পৃথিবী ঝাপসা হয়ে এল। নবাব ঘুম থেকে উঠে দেখলেন, অস্তগামী চাঁদ আকাশপটে মিলিয়ে যাচ্ছে—

মহারাজ বিদ্যানিধির ঘরে এসে পণ্ডিতকে একেবারে জড়িয়ে ধরলেন।

বললেন—আপনি আমার মুখ রক্ষে করেছেন পণ্ডিতমশাই, আজকে আমি যথার্থ নবদ্বীপের মহারাজা—

তারপর সকালবেলাই নবাব আলীবর্দী খাঁ দরবারে এলেন। এসেই বিদ্যানিধি মশাইকে জ্যোতিষশাস্ত্র সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন করলেন। শেষে বললেন—কী খেলাৎ পেলে আপনি খুশী হবেন পণ্ডিত?

বিদ্যানিধি দাঁড়িয়ে উঠে কুর্নিশ করে বললেন—মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের অভীষ্টই আমার অভীষ্ট জাঁহাপনা!

বিদ্যানিধির সেই কথাতেই নবাব আলীবর্দী সেবার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের বকেয়া খাজনা সমস্ত মকুব করে দিয়েছিলেন।

উদ্ধব দাসই লিখে গেছে এ-সব কাহিনী আদিকালের। আদিযুগের মানুষ-গুলোর সঙ্গেই ঐসব কাহিনী হারিয়ে গিয়ে নিঃশেষ হয়েছে। সেই আলীবর্দী খাঁও নেই, সেই রামরুদ্র বিদ্যানিধিও নেই। শুধু আছেন মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র আর বিদ্যানিধি মশাই-এর পঞ্জিকা। সেই পঞ্জিকা নিয়েই তিনি নাড়াচাড়া করছিলেন সেদিন।

হঠাৎ খবর এল দেউড়িতে হাতিয়াগড়ের ছোটমশাই এসেছেন সাক্ষাৎ করতে।

বড় অসময়ে ফিরে আসা দেখে সন্দেহ হলো মহারাজার। ক্লাইভ সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে বলে দিয়েছিলেন তাঁকে। এত তাড়াতাড়ি তো ফেরবার কথা নয়। দেওয়ানজীকে ডাকতেই তিনি এলেন। কালীকৃষ্ণ সিংহ মশাই।

মহারাজ জিজ্ঞেস করলেন—হঠাৎ এত তাড়াতাড়ি হাতিয়াগড়ের রাজা ফিরে এলেন কেন?

কালীকৃষ্ণ সিংহ মশাই তার আগেই সব আলোচনা করেছেন ছোটমশাই-এর সঙ্গে। জলাঙ্গীর ঘাটে তাঁর বজরা রাখা আছে। চেহারা শুকিয়ে গেছে ক'দিনের মধ্যেই। এই কিছুদিন আগেই দেওয়ানমশাই তাঁকে তাঁর নিজের বজরায় তুলে দিয়ে এসেছেন। তখনো দেখেছেন, আবার এখনো দেখছেন।

বললেন—আপনার শরীর খুব খারাপ হয়ে গেছে এই ক'দিনেই—

ছোটমশাই বললেন—এ ক'দিনে বিশ্রামও হয়নি, কোনো কাজও হয়নি! শরীরের আর অপরাধ কী দেওয়ানমশাই, সেই সব কথাই মহারাজ বাহাদুরকে বলতে এসেছি—

—কিন্তু ক্লাইভ সাহেব কী বললেন?

ছোটমশাই বললেন—মুশকিল হলো কি, আমিও যেই গেলাম অমনি নবাবও গিয়ে পড়লেন ওখানে। যদি জানতুম ঠিক এই সময়েই নবাব ওখানে যাবেন তো আমি আর যেতাম না।

—নবাবের কী হাল দেখলেন?

—খুবই খারাপ হাল দেওয়ানমশাই, খুবই খারাপ!

কালীকৃষ্ণ সিংহ মশাই বললেন—আমি আপনি আসার ক'দিন আগেই মুর্শিদাবাদ থেকে ফিরেছি। সেখানেই এইসব খবর পেয়েছিলাম।

—কার কাছ থেকে সব খবর পেলেন?

—কেন, আমাদের জগৎশেঠজীর কাছ থেকে। আমিই তো জগৎশেঠজীকে বললাম রায়মশাইকে কলকাতায় পাঠাতে।

—রায়মশাই কে?

—আজ্ঞে, জগৎশেঠজীর দেওয়ান। রায় মশাই তো সবই জানেন!

—আমার স্ত্রীর ব্যাপারটাও জানেন নাকি?

—তা আর জানেন না? আর কেই বা না জানে? নাটোরের রাণী ভবানীর পর্যন্ত কানে গিয়েছে। প্রথমে ভয় পেয়েছিলেন তিনি। নবাবের চরের তো শেষ নেই। ওই যে মনসুর আলি মেহের মুহুরি আছে, ও বেটা এদিকে আমাদের দলেও আছে, আবার নবাবের দলেও আছে। আমাদের খুব সাবধানে কাজ করতে হচ্ছে কি না। বশীর মিঞার নাম শুনেছেন তো?

ছোটমশাই বললেন—হ্যাঁ হ্যাঁ, শুনেছি বটে, আমার অতিথিশালাতেও একবার গিয়েছিল, কী একটা হিন্দুর নাম নিয়ে উঠেছিল—

—সে বেটা এখন মুর্শিদাবাদে রয়েছে।

—কেন?

—আজ্ঞে, নবাব যখন দলবল নিয়ে কলকাতায় লড়াই করতে গেছে, তখন রাজধানীটা ফাঁকা পড়ে থাকবে, সেটা দেখবার জন্যেই রয়েছে। সেই জন্যেই তো আমি রাত্তিরে গিয়ে উঠেছিলাম শেঠজীর বাড়িতে। সেই পাঠান পাহারাদার আছে শেঠজীর, ভিখু শেখ, চেনেন তো? ভারি বিশ্বাসী লোক, তাকে বললাম—একটু দেখিস বাবা, আমি যে এখানে এসেছি তা যেন কেউ না জানতে পারে, বলে তার হাতেও একটা মোহর গুঁজে দিলাম। বলা তো যায় না, আজকাল দিনকাল তো বদলে গেছে সব, সেই আলীবর্দী খাঁর আমল হলে আর এমন ভাবতাম না। মনে আছে তো সেই রামরুদ্র বিদ্যানিধির ব্যাপারটা?

ছোটমশাই বললেন—হ্যাঁ, কর্তাবাবার কাছে শুনেছিলাম।

—দেখুন, সেই দু' লাখ টাকার বকেয়া-বাকি খাজনা, এক-কথায় খুশী হয়ে মকুব করে দিলেন। তিনি ছিলেন জহুরী, গুণের কদর করতে জানতেন। সে-সব দিন কোথায় চলে গেল!

—তা জগৎশেঠজী কী বললেন? রাজি হলেন রায়-মশাইকে পাঠাতে?

—রাজি কী আর হন? রাজি করালাম। মহারাজার চিঠি নিয়ে গিয়েছিলাম, এ-সব কাজ তো আর নায়েব-গোমস্তা দিয়ে হয় না। বললাম—আপনার কথাও বললাম। বললাম, মহারাজ হাতিয়াগড়ের রাজামশাইকে পাঠিয়েছেন ক্লাইভ-সাহেবের কাছে আর আপনার কাছে পাঠিয়েছেন আমাকে—

তা জগৎশেঠজী বললেন—রায়মশাইকে নবাবের কাছে পাঠিয়ে কী ফায়দা হবে?

আমি বললাম—নবাবকে অন্তত বুঝিয়ে-সুঝিয়ে কিছুদিন থামিয়ে তো রাখা চলবে।

তা জগৎশেঠজী আবার জিজ্ঞেস করলেন—থামিয়ে রেখে লাভ কী?

আমি সব বুঝিয়ে বললাম—এখন ফিরিঙ্গীদের সঙ্গে লড়াই হলে, ফিরিঙ্গীরাই হেরে যাবে, তাতে আমাদের ক্ষতি—। আর কিছুদিন পরে লড়াই হলে ভালো—

জগৎশেঠজী জিজ্ঞাসা করলেন—কেন?

—আজ্ঞে শেঠজী, ইংরেজদের আরো দু-তিনটে জাহাজ আসার কথা আছে, তারা আগে আসুক, তবে তো ইংরেজরা হারাতে পারবে নবাবকে।

—কিন্তু ওদিক থেকে আহ্‌মদ শা আব্‌দালী যদি এসে পড়ে?

—সে এলে তখন দেখা যাবে!

—তা ছাড়া যদি জেনারেল বুশী এসে পড়ে কর্ণাট থেকে, তখন কী হবে? তার আগেই তো সব ফয়সালা হয়ে যাওয়া ভালো!

আমি বুঝিয়ে বললাম—জগৎশেঠজী, তারা কেউ না-ও তো আসতে পারে! তারা এসে পড়লে তখন না-হয় অন্য পথ খুঁজে বার করা যাবে! আমার কথায় রায়মশাই সায় দিলেন। তিনিও বললেন—এখন লড়াইটা না হতে দেওয়াই ভালো! ইংরেজরা আগে ভালো করে তৈরি হয়ে নিক! মানে, যদি কোনো রকমে একটা মিটমাট করিয়ে দেওয়া যায় দু'পক্ষে, সেইটেই আমাদের পক্ষে ভালো।—

ছোটমশাই হঠাৎ বললেন—মহারাজ কখন আসবেন নিচেয়?

—এই এলেন বলে, খবর পাঠিয়ে দিয়েছি। আজকে আবার একজন মস্ত কুস্তীগীর আসছেন কুস্তী লড়তে—

—কুস্তী লড়তে? ছোটমশাই অবাক হয়ে গেলেন কথাটা শুনে! মহারাজ আবার কুস্তী দেখতে ভালোবাসেন নাকি?

কালীকৃষ্ণ মশাই বললেন—মহারাজের তো ওই খেয়াল। গোপাল ভাঁড় মশাই-এর ভাঁড়ামিও শুনতে ভালোবাসেন, রায়গুণাকরের কাব্য শুনতেও ভালোবাসেন, আবার শিবরাম বাচস্পতির ষড়দর্শনের ব্যাখ্যাও শুনতে ভালোবাসেন, সঙ্গে সঙ্গে আবার মুজাফর হুসেনের কুস্তী দেখতেও ভালোবাসেন—। আজ দিল্লী থেকে এক কুস্তীগীর আসছে যে—

—তাহলে তো মহারাজা ব্যস্ত খুব!

—তার আগে কুস্তী হয় কি না তাই দেখুন!

—কেন?

কালীকৃষ্ণ মশাই বললেন—সেই জন্যেই তো তিনি পঞ্জিকা দেখছেন, তর্কালঙ্কার মশাইকে ডেকে পাঠিয়েছেন—মল্লক্রীড়ার জন্যে আজ প্রশস্ত সময় কিনা জানতে—

হঠাৎ ভেতর থেকে ডাক এল। মহারাজার খাস-চাকর এসে খবর দিলে, ডাক পড়েছে মহারাজার কামরায়।

মহারাজ যাদের সঙ্গে গোপনে দেখা করেন, তাদের ভেতরে খাস-কামরায় ডাক পড়ে। কালীকৃষ্ণ সিংহ মশাই উঠলেন। বললেন—চলুন, নিচে যখন এলেন না, তখন আপনার সঙ্গে নিরিবিলিতে কথা বলতে চান, চলুন—

কৃষ্ণনগরের রাজবাড়ির ভেতরে কখনো যাননি ছোটমশাই। ভেতরেও সদর-মহল আছে। শিবমন্দির, পুকুর, অতিথিশালা, চন্ডীমণ্ডপ, কুস্তীর আখড়া, বিরাট কান্ডকারখানা। কাছারি-বাড়ি পেরিয়ে একেবারে পুব দিকে গিয়ে মহারাজার খাস-কামরা। বিরাট রাজবাড়ি। প্রকান্ড রাজবাড়ির পেছনে রাজবাড়ির অন্দরমহল।

ছোটমশাই গিয়ে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলেন।

—আসুন—

তারপর কালীকৃষ্ণের দিকে চেয়ে বললেন—আপনি এখন নিজের কাজে যান দেওয়ানমশাই, আমি পরে ডেকে পাঠাবো, ভেতরে খবর দিয়ে দেবেন ছোটমশাই-এর কথা, ইনি আজকে থাকবেন এখানে—

কালীকৃষ্ণ চলে যেতেই মহারাজ ছোটমশাই-এর দিকে চেয়ে বললেন—এত তাড়াতাড়ি চলে এলেন যে?

ছোটমশাই বললেন—না এসে উপায় কী বলুন, কোনো কাজই হলো না যে—

—আমাদের কালীকৃষ্ণকে সব বলেছেন নাকি?

—হ্যাঁ, সব বলেছি।

—রণজিৎ রায় মশাই-এর সঙ্গে দেখা করেছেন?

—কী করে দেখা করবো, আমি তো নবাবের ছাউনিতে যাইনি।

—যাননি ভালোই করেছেন। ক্লাইভ সাহেব কী বললে?

ছোটমশাই বললেন—যেতে না-যেতেই যুদ্ধ বেধে গেল, তাই বেশিক্ষণ কথা হলো না। তারপর ত্রিবেণীতে গিয়ে বজরা বাঁধলাম। সেখানে আমার স্ত্রীর সাক্ষাৎ পেলাম!

—সে কী? আপনার স্ত্রী?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, মরিয়ম বেগম। আপনি তো জানেন সব বৃত্তান্ত!

—তারপর?

ছোটমশাই বললেন—আমার সঙ্গে পথে এক পাগল জুটেছিল। সেই পাগলটার সঙ্গে দেখলুম ক্লাইভ সাহেবের খুব ভাব।

—আপনার স্ত্রী আপনাকে চিনতে পারলেন? কথা হলো তাঁর সঙ্গে?

—কথা হবে কী করে? তবে সেই পাগলটার সাহস খুব, সে গিয়ে সরাসরি বেগমসাহেবাকে আমার কথা বললে।

—আপনিও দেখলেন আপনার স্ত্রীকে?

ছোটমশাই বললেন—স্পষ্ট দেখতে পেলাম না, বোরখায় সর্বাঙ্গ ঢাকা ছিল, সঙ্গে আর একজন বেগমসাহেবা ছিল—

মহারাজ বললেন—নানীবেগমসাহেবা—

ছোটমশাই অবাক হয়ে গেলেন।

—আপনি কী করে জানলেন?

মহারাজ হাসলেন। বললেন—তারপর আপনার সহধর্মিণী ক্লাইভ সাহেবের ছাউনির বাগানে গিয়ে সাহেবের সঙ্গে দেখা করেছেন—

আরো অবাক হয়ে গেলেন ছোটমশাই। বললেন—আপনি এ-সব জানলেন কী করে? কে খবর দিলে আপনাকে?

—তারপর যখন আপনি ক্লাইভ সাহেবের ছাউনিতে গেলেন তখন ক্লাইভ সাহেবও সেখানে নেই, তাদের ফৌজও নেই। আপনার সহধর্মিণী কি নানীবেগম-সাহেবা, কেউই নেই। বাগান ফাঁকা—

ছোটমশাই স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন। আর বসে থাকতে পারলেন না।

—তখন ক্লাইভ সাহেব ফৌজী-সেপাই দল-বল লস্কর-গোলন্দাজ সব নিয়ে ফরাসী চন্দননগর দখল করতে ভাগীরথীর ওপারে চলে গেছে!

—হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন। সব ঠিক। কিন্তু আপনি কেষ্টনগরে বসে জানলেন কী করে? দেওয়ান মশাই কলকাতায় গিয়েছিলেন নাকি? আমাদের সঙ্গে তো দেখা হয়নি। আমাকে তো কিছুই বললেন না।

মহারাজ বললেন—না, কালীকৃষ্ণ এ-সব কিছুই জানে না, সেই জন্যেই তো কালীকৃষ্ণকে এ-ঘর থেকে সরিয়ে দিলাম—

ছোটমশাই উদ্‌গ্রীব হয়ে শুনছিলেন। জিজ্ঞেস করলেন—তারপর?

—তারপর আপনি সাহেবের দেখা না-পেয়ে এখানে চলে এলেন!

—হ্যাঁ, কিন্তু ওদিকে আমার স্ত্রী? আমার স্ত্রীর কী হলো? নবাব তো গোবিন্দ মিত্তির মশাই-এর বাগানবাড়ি থেকে শুনলাম ছাউনি তুলে নিয়ে ত্রিবেণীর দিকে আসছেন, মুর্শিদাবাদে ফিরে আসবার জন্যে—

মহারাজ বললেন—না, তিনি পথে শুনলেন নানীবেগম আর মরিয়ম বেগম-সাহেবা নবাবের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে ত্রিবেণী থেকে তাঞ্জামে করে আসছেন,

তাই শুনে আবার একটা বাগানে ছাউনি গাড়লেন—

—তারপর? আপনার কাছে এত তাড়াতাড়ি এ-খবর কী করে এল?

—তারপর খবর পেলেন বেগমসাহেবারা তাঁর ছাউনিতে আসতে আসতে পেরিন সাহেবের বাগানে কর্নেল ক্লাইভ সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে গেছে!

—সে-খবরও নবাবের কানে গেছে নাকি? তাহলে তো নবাব খুব রেগে গিয়েছেন মরিয়ম বেগমের ওপর? তাহলে কী হবে? তাহলে ক্লাইভ সাহেবের কাছ থেকে ওরা কি আবার নবাবের ছাউনিতে গেছে?

মহারাজ বলতে লাগলেন—হ্যাঁ, আর তারপর নবাব দুই বেগমসাহেবাকে নিয়ে অগ্রদ্বীপে গেছেন। সেখানে গিয়ে শুনেছেন ইংরেজরা চন্দননগর দখল করবার জন্যে সৈন্য-সামন্ত নিয়ে ভাগীরথী পেরিয়ে ওপারে গেছে—

ছোটমশাই এতক্ষণ সব শুনছিলেন। শুনে অবাক হয়ে যাচ্ছিলেন।

—আপনি এত খবর কোথা থেকে পান? কে দিলে আপনাকে এত খবর?

মহারাজ সে-কথার উত্তর না দিয়ে বললেন—আমি ভেবেছিলাম আপনি এখানে ফিরে না এসে ক্লাইভের সঙ্গে চন্দননগরে যাবেন। কারণ আপনার গৃহিণী অগ্রদ্বীপে নবাবের সঙ্গেই আছেন। আমার কাছে খবর এসেছিল আপনি আপনার নৌকো নিয়ে ত্রিবেণী ছাড়িয়ে পশ্চিম দিকে গেছেন। এত তাড়াতাড়ি তো আপনার আসার কথা নয় এখানে!

ছোটমশাই বললেন—আমি এ-সব কথা কিছুই জানতাম না—

মহারাজ বললেন—আমি এখানে বসে সব টের পাচ্ছি আর আপনি নিজে সেখানে গিয়েও সব খবর পেলেন না। ওদিকে নবাবের ছাউনিতেও যে গোলমাল বেধেছে—

—কেন?

—আপনার স্ত্রীকে নিয়ে!

—আমার স্ত্রী? মরিয়ম বেগম?

—হ্যাঁ, মরিয়ম বেগম কর্নেল ক্লাইভ সাহেবের বাগানে গিয়েছিল বলে উমিচাঁদ সাহেব ভীষণ রেগে গেছে। আমার কাছে শেষ যে-খবর এসেছে তাতে মনে হচ্ছে আপনার স্ত্রীর ভীষণ বিপদ। তাঁকে খুন করবার চেষ্টা চলছে! আপনার পক্ষে যদি সম্ভব হয় এখনই আপনার সেখানে চলে যাওয়া উচিত—

—কিন্তু খুন করবে কেন?

মহারাজা হাসলেন। বললেন—দেখুন, আপনি তো গোড়া থেকেই সব দেখছেন, আপনার চেয়ে আমি বয়েসে আরো বড়, আমি সুজাউদ্দীনের আমল দেখেছি, সরফরাজের আমলও দেখেছি, আবার এই আমাদের সিরাজ-উ-দ্দৌলার আমলও দেখছি। বাকি খাজনার দায়ে মুর্শিদকুলী খাঁর আমলে বৈকুণ্ঠের মধ্যে নরক-যন্ত্রণাও সহ্য করেছে জমীদাররা, বর্গীদের হামলার সময়েও লোকেরা অকথ্য অত্যাচার সহ্য করেছে, কিন্তু এই আমলেই প্রথম দেখছি আমার প্রজারা খেতে না পেয়ে গলায় দড়ি দিয়েছে। এ-ঘটনা আগে কখনো হয়েছে?

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের মুখে ছোটমশাই আগে কখনো এমন কথা শোনেননি।

—আমি নবদ্বীপে গিয়ে এবার নিজের চোখে এই ঘটনা দেখে এসেছি। এর পরেও কি আমি চুপ করে থাকতে পারি?

ছোটমশাই বললেন—সে তো আমিও হাতিয়াগড়ে দেখেছি, কিন্তু এর প্রতিকার কোথায়?

প্রতিকারের কথা শুধু মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র কেন, সবাই ভেবেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর জমিদার, রাজা-মহারাজা, তালুকদার সবাই ভুক্তভোগী। গুণের আদর কোথায় আছে আপনিই বলুন? আমার টোলের পণ্ডিতদের কে আদর করে? তাদের আদর করে লাভ নেই বলেই কেউ আদর করে না। তার চেয়ে সরকারী আমলা-আমীর-ওমরাহ্‌দের খাতির করলে লাভ বেশি! এই দেখুন না, আমার এক প্রজা সুতোর ব্যবসা করে, তাকে নিজামতে সরকারী মাশুল দিতে হয় শতকরা কুড়ি টাকা, আর বেভারিজ সাহেব কলকাতায় সোরার কারবার করতো, সে বছরে তিন হাজার টাকা এক-কালীন নজরানা দিয়ে লাখ-লাখ টাকা মুনাফা করে, তার বেলায় কোনো বিচার নেই—।

একটু থেমে মহারাজ বললেন—আপনি কিছু ভাববেন না ছোটমশাই, আপনি হয়তো সামান্য রাজা, আমি হয়তো মহারাজ, এখানে আপনাতে আমাতে কোনো প্রভেদ নেই। আমরা সবাই ভুক্তভোগী। গীতাতেও দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন করবার কথা আছে। রাজা যদি অন্যায় করে তো তারও শাস্তি দেবার বিধান আমাদের ধর্মে আছে, সেটা অন্যায় কর্ম নয়। স্বয়ং মহাত্মা ব্যাসদেব মহাভারতে অশ্বমেধ পর্বের তৃতীয় অধ্যায়ে যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ দিয়েছেন, মানুষ সমস্ত কর্মই ঈশ্বর প্রেরণায় করে থাকে, তাতে ব্যক্তি-বিশেষের কোনো অপরাধ হয় না—

নহি কশ্চিৎ স্বয়ং মর্ত্ত্যঃ স্ববশঃ কুরুতে ক্রিয়াং।
ঈশ্বরেণ চ যুক্তোহয়ং সাধ্বসাধু চ মানবঃ
করোতি পুরুষঃ কর্ম তত্র কা পরিবেদনা॥

কথা বলতে বলতে হঠাৎ দেউড়ির ঘণ্টা বেজে উঠলো। মহারাজা উঠলেন কাঁধের চাদরটা তুলে নিয়ে বললেন—আজকে আবার আমার আখড়ায় কুস্তী হবে দিল্লী থেকে একজন কুস্তীগীর এসেছে—পাঁজি দেখে সময়টা ঠিক করছিলুম-পণ্ডিত মশাইকে আবার ডেকে পাঠিয়েছি কি না—

ছোটমশাই বললেন—আমার কুস্তী দেখতে ভালো লাগে না—

মহারাজ বললেন—আরে ভালো কি আমারই লাগে ছোটমশাই? কিন্তু তব এত বড় রাজত্ব চালাতে হয়, ও গোপাল ভাঁড়কেও যেমন ঘাড়ে নিয়েছি, তেমনি রায়গুণাকরকেও ঘাড়ে নিয়েছি—ইচ্ছে না থাকলেও ঘাড়ে নিতে হয়। শুধু নিজের বউটি আর আমিটি নিয়ে থাকলে তো বনে গিয়ে বাস করলেই হতো—

—কিন্তু ওদিকের কী হবে?

—কোন্ দিকের? আপনার স্ত্রীর ব্যাপারটা?

—হ্যাঁ।

—সে আমার লোক আছে! আমি তো বলেছিলুম আপনাকে যে, আমার কাছে সব খবরই আসে। আপনি এসে বলবার আগেই আমার কাছে সব খবর এসে গেছে।

—কে সে?

—সে আপনার জেনে দরকার নেই। নবাবের ফৌজের দলে যখন সেপাই নিচ্ছিল, তখন সে-ও সেপাইয়ের দলে নাম লিখিয়ে দিয়ে ফৌজের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। তাকে কেউ চেনে না। সে একটা বাঙালী হিন্দু সেপাই, সে-ই সব খবর দেয়—

তারপর একটু থেমে বললেন—আপনি এখন বিশ্রাম করুন, আহারাদি করুন, তারপর যেমন-যেমন খবর আসে আপনাকে জানাবো, আপনি সেই মত কাজ করবেন।

ছোটমশাইও উঠে নিচেয় নেমে এলেন।

শীত বেশ জাঁকালো হয়ে পড়েছে অগ্রদ্বীপে। নবাবের ছাউনিতে অনেক রাত পর্যন্ত সলা-পরামর্শ চলেছে। শেষরাত্রের দিকে সবাই ঘুমোতে গেছে। উমিচাঁদ আর ওয়াটস্ দুজন ছাড়া আর সবাই ছিল নবাবের সামনে। এতদিনের সব আয়োজন, সব আলোচনা, সমস্ত যেন ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। নিজের হাতে সে-সন্ধিতে সই করে গেছে ক্লাইভ, নিজেই আবার যেন সেই কাগজটা ছিঁড়ে টুকরো-টুকরো করে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে।

মীরজাফরকে দেখে বললেন—আপনিই তো এদের সঙ্গে ফয়সালা করতে বললেন আমাকে? এখন এর পরেও এদের বিশ্বাস করতে বলেন? ফরাসীরা আমার দোস্ত, তাদের সঙ্গে শত্রুতা করা মানে তো আমার সঙ্গেও শত্রুতা করা—

মীরজাফর সাহেব মাথা ঠান্ডা রেখে বললে—জাঁহাপনা তো হুগলীর ফৌজদার নন্দকুমারকে ডেকে পাঠিয়েছেন—

—শুধু নন্দকুমারকে কেন, উমিচাঁদকেও ডেকে পাঠিয়েছি। আমি নন্দকুমারকে বার বার বলেছি, ইংরেজরা যেন ফৌজ নিয়ে চন্দননগরের দিকে না যেতে পারে। তার পরেও কেন উমিচাঁদের কথায় সে কোনো বাধা দিলে না?

মীরজাফর কোনো উত্তর না দিয়ে চুপ করে রইলো।

—তা হলে আমি যে খবর পেয়েছি, তা কি সত্যি?

—জাঁহাপনা তো মিথ্যে খবরও পেতে পারেন। ফৌজদারের তো শত্রুর অভাব নেই—

—মিথ্যে খবর? মিথ্যে খবর আপনারাই বার বার দিয়ে আমাকে বিভ্রান্ত করেছেন। আমি আপনাদের কথা শুনেই কাফেরদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেছি! এখন বলুন, আমি ঠিক করেছি না ভুল করেছি—

—না জাঁহাপনা, আমরা এখনো বলছি, আপনি ঠিকই করেছেন। ইংরেজরা কখনো মিথ্যে কথা বলে না। তারা কখনো সন্ধি ভাঙে না। ইংরেজদের দেশে যদি কেউ মিথ্যে কথা বলে তাকে সবাই একঘরে করে দেয়, তার ছোঁওয়া পানি পর্যন্ত কেউ খায় না—

নবাব বললেন—তা হলে ক্লাইভ উমিচাঁদকে চিঠি লেখেনি?

—সে চিঠি কি জাঁহাপনা দেখেছেন?

—সব জিনিস দেখা যায় না। আপনাদের ক্লাইভ তত বোকা নয়, উমিচাঁদও তত বোকা নয় যে, সে-চিঠি অন্য কেউ দেখতে পাবে। কিন্তু উমিচাঁদ নন্দকুমারকে গিয়ে বারো হাজার টাকা দেয়নি বলতে চান?

ইয়ার-লুৎফ্ খাঁ পাশ থেকে বললে—জাঁহাপনার মনে সন্দেহ জাগাবার জন্যেই এ-খবর কেউ দিয়েছে হয়তো—

—তা হলে বলবো কে এ-খবর দিয়েছে? আপনারা শুনতে চান?

—শুনলে আমরা সবাই খুশী হবো জাঁহাপনা!

—মরিয়ম বেগম!

পাশের ঘরে কথাটা নানীবেগম সাহেবার কানে গেল। মরালীর কানেও গেল। কিন্তু তার পরে আর কারো মুখ দিয়ে কোনো কথা বেরোল না। শুধু শোনা গেল, উমিচাঁদ সাহেব আর নন্দকুমার এলে সব অভিযোগ প্রমাণ হবে। ততক্ষণ পর্যন্ত অগ্রদ্বীপে থাকাই স্থির হয়ে গেল। চারদিকে হুহু করে হাওয়া দিচ্ছে। ঠাণ্ডায় হিম হয়ে আসে হাত-পা। কিন্তু বাঙলার ইতিহাস সেই ঠাণ্ডায় বুঝি সেদিন হিম হয়ে থাকেনি। হলে অন্য রকম হতো। সে-ইতিহাসের বুকে আগে অনেক ঝড় বয়ে গেছে। ভাস্কো-ডা-গামা যেদিন হিন্দুস্থানের উদ্দেশে পাড়ি দিয়েছিল, সেদিনও এমনি হাড়-কাঁপানো শীতের হাওয়া বয়েছে। ১৫৯৯ সালে যেদিন এক অল্ডারম্যানের বাড়িতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, সেদিনও এমনি হাত-পা হিম হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু হাত-পা হিম হয়ে গেলে ইতিহাসের চলে না। তাকে অনাদি অতীতকাল থেকে এগিয়ে চলতে হয় সামনের দিকে। এগিয়ে চলাই তার ধর্ম। মহম্মদ বখ্‌তিয়ার খিলজীই আসুক আর সুলতান মুঘিস-উদ্দিন উজবুকই আসুক, একদিন সকলকেই যথা-স্থানে ফিরে যেতে হবে। কিন্তু যে ফিরবে না, সে এই ইতিহাস। উদ্ধব দাস সেই ইতিহাসের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে তাই লিখে গেছে এই—বেগম মেরী বিশ্বাস।

রাত যখন গভীর হলো, তখন সামান্য একটু শব্দ হতেই মরালী বিছানা ছেড়ে উঠে পর্দা ঠেলে বাইরে এল। কান্ত দাঁড়িয়েছিল।

মরালী বললে—সেটা পেয়েছো?

কান্ত চাদরের ভেতর থেকে বার করে একটা ছোরা মরালীর দিকে বাড়িয়ে দিলে। মরালী সেটা নিয়ে নিজের বোরখার মধ্যে পুরে ফেললে। তারপর আবার পর্দা সরিয়ে ভেতরে চলে যাচ্ছিল।

কান্ত ডাকলে—শোনো।

মরালী ফিরলো। বললে—কী?

—কোথায় পেলুম জানো? নবাবের ঘরের গোসলখানার পথে। কেউ বোধহয় সরিয়ে রেখেছিল। তুমি যখন কাল নবাবের সঙ্গে কথা বলে উঠে এলে, তখন বোধহয় কেউ উঁকি মেরে দেখেছিল। কিন্তু আর একটু দাঁড়াও, আর-একটা জরুরী কথা আছে—

মরালী দাঁড়ালো। বললে—বলো, শিগগির বলো, কেউ দেখে ফেলবে—

—তুমি একটু সাবধানে থেকো মরালী।

—আমাকে ভয় পাওয়াচ্ছো?

—না, আমি ভয় পাওয়াচ্ছি না। ওদের কথা শুনে তোমার জন্যে আমার ভয় হচ্ছে—

—কেন? কারা?

—তুমি তো চেনো সকলকে। নবাব তোমার নাম করাতে ওরা খুব চটে গেছে। আমি দেখলুম, ওরা তিনজনে চুপি চুপি কী সব পরামর্শ করছে। শশীর নাম শুনেছো তো? আমার বন্ধু? শশীকে খবর রাখতে বলেছিলাম। সে আমাকে বললে।

—কী বললে?

—ওই যে উমিচাঁদ সাহেব কাশিমবাজার যাবার পথে হুগলীর ফৌজদার নন্দকুমার সাহেবের সঙ্গে কথা বলে বারো হাজার টাকা ঘুষ দেবার কথা বলেছে, ওইটে জানাজানি হওয়াতে এখন সবাই তোমার ওপর রেগে গেছে।

মরালী বললে—তা আমার ওপর রেগে গিয়ে কী করবে? খুন করবে আমাকে?

—যদি তাই করে?

—তা খুন করলে না-হয় খুনই হবো। আমার বেঁচে থাকায় তো কারো কোনো লাভ-লোকসান নেই—

কান্ত আরো কাছে এগিয়ে গেল। বললে—ছি, কেন ও-সব কথা যে বলো তুমি বার বার। তোমার মুখে কিছু আটকায় না দেখছি—

মরালী সে-কথার উত্তর না দিয়ে বললে—ক্লাইভ সাহেবের সঙ্গে দেখা করার পর থেকেই তো ওরা চটে গেছে, এখন না-হয় আরো একটু বেশি করেই চটলো। আমি কি কারো পরোয়া করি? দেখি না কাল নন্দকুমার আর উমিচাঁদ সাহেব এসে কী জবাবদিহি করে—

বলে মরালী পর্দা সরিয়ে নিঃশব্দে ভেতরে চলে গেল। কান্তর উত্তর শোনবার জন্যে আর দাঁড়ালো না।

এক-একজন মানুষ সংসারে থাকে যারা নিঃশব্দে নিজের কার্যসিদ্ধি করে যায়। তারা আড়ালে থাকতেই ভালোবাসে। তারা আড়াল থেকেই সব লক্ষ্য করে। উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাদের থাকে বটে, কিন্তু সে উচ্চাকাঙ্ক্ষা অন্যের ক্ষতি করে না। সে-উচ্চাকাঙ্ক্ষা শুধুই কেবল স্বার্থসিদ্ধির জন্যে, অন্যের সর্বনাশ করবার জন্যে নয়। অন্যে যদি বড় হয় তো হোক, তার সঙ্গে আমার বড় হওয়াটা বাধা না-পেলেই আমি নিশ্চিন্ত!

অষ্টাদশ শতাব্দীর যারা শীর্ষস্থানীয় আমীর-ওমরাহ্, তারা নিজের উন্নতি চাইতো তো বটেই। কিন্তু উন্নতি তো কোনোদিন কারো চিরস্থায়ী হয়ে থাকবার জিনিস নয়। আজ বড় হলাম, কিন্তু কাল তো আবার ছোট হয়ে যেতে পারি। কাকে কখন ধরলে আমার বড় হওয়াটা অব্যাহত থাকবে সেটা যে-লোক বিচার-বিবেচনা করে চলতে পারে, সেই এ-সংসারে আজীবন বড় হয়ে থাকে।

আজ না-হয় মীর্জা মহম্মদ সিরাজ-উ-দ্দৌলা বাঙলা বিহার উড়িষ্যার নবাব, কিন্তু কাল নবাব না থাকতেও পারে, পতনের সঙ্গে সঙ্গে নিজের পতন যেন না-হয়, তাই নজর রাখতে হয়, কে ভাবী নবাব! এখন থেকে সেই ভাবী নবাবেরও প্রিয়পাত্র হয়ে থাকি।

যে দূরদৃষ্টি থাকলে এই বিচার খাঁটি বিচার হয়, সেই দূরদৃষ্টি সকলের ছিল না। ছিল দুজন লোকের। প্রথম নন্দকুমার, দ্বিতীয় মুন্সী নবকৃষ্ণ। অষ্টাদশ শতাব্দীর দুজন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন পুরুষ। উদ্ধব দাস নবকৃষ্ণের কথা আগে লিখেছে। এবারে লিখছে নন্দকুমারের কথা।

হুগলীর ফৌজদার নন্দকুমার। ব্রাহ্মণ বংশাবতংশ। আহ্নিক করে, জপ করে, গায়ত্রী না আউড়ে জল গ্রহণ করে না। কিন্তু চোখ আর মন পড়ে থাকে

মুর্শিদাবাদে। রাজধানী থেকে দূরে থাকতে হয় বলে অসুবিধে যা হবার তা হয়। কিন্তু উদ্যোগী পুরুষের কাছে কোনো কাজই অসাধ্য হতে পারে না।

ফৌজদারের কাছে যারাই আসে তাকেই জিজ্ঞেস করে—মুর্শিদাবাদের খবর কী?

যারা আসে ফৌজদারের কাছে তারা জানে মুর্শিদাবাদের খবর মানে নবাবের হাঁড়ির খবর। নবাবের প্রিয়পাত্র কে, নবাব এখন কার কথায় ওঠে-বসে, নবাবের মেজাজ এখন কেমন, জগৎশেঠজী এখন কার দলে, মীরজাফর সাহেবের সঙ্গে নবাবের এখন কী-রকম সম্পর্ক ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক জানবার এবং জানাবার মত কথা। কোন আমলার এখন নসীব খুললো, নবাব এখন হিন্দুদের দিকে ঝুঁকেছে, না মুসলমানদের দিকে, এই সব। মোহনলাল, মীরমদন যখন হিন্দু আর তারা যখন নবাবের নেক-নজরে পড়েছে, তখন নন্দকুমারের ওপরেও একদিন নবাবের নেক-নজর পড়তে পারে।

ফৌজদারের কাছে ফিরিঙ্গীরাও আসে। সোনার দেশ ছেড়ে এই মশা, মাছি, জ্বর, গরম, হিংসে, খুন-খারাবি আর খোসামোদের দেশে এসে দুটো পয়সার লোভে পড়ে আছে তারা। কিন্তু শুধু কারবার করলে চলে না। কারবার করতে গেলে ট্যাক্সো দিতে হয় নিজামতে। তাই নিজামতের খবর নিতে আসে ফৌজদারের কাছে।

কেউ বলে—শুনছি, এখন নবাবের সব চেয়ে পেয়ারের লোক মরিয়ম বেগম—

—মরিয়ম বেগম? সে আবার কে জনাব?

একজন বললে—হাতিয়াগড়ের রাজার ছোট তরফের বউ—তারই কথায় যে নবাব ওঠে-বসে—

—সে কি? কী করে হলো? এখন বুঝি পেশমন বেগমসাহেবার রাহুর দশা যাচ্ছে?

এ-সব গুজব সব সুবাতেই আস্তে আস্তে ছড়িয়ে গিয়েছিল, এককালে নবাবের ওপর ফৈজী বেগমের যে ক্ষমতা ছিল এখন নাকি মরিয়ম বেগমের সেই ক্ষমতা হয়েছে। এখন নাকি নবাব কারো সঙ্গে লড়াই করবে কি না তা নিয়ে পরামর্শ করে মরিয়ম বেগমের সঙ্গে। আবার মরিয়ম বেগমও নাকি চেহেল্-সুতুনের আদব-কায়দা নিয়মকানুন কিছুই মানে না। যখন খুশী তখনই হারেম থেকে বাইরে যায়।

কেউ বলে—আহা, অত কথা কী ফৌজদার সাহেব, আমি শুনেছি মরিয়ম বেগমসাহেবা নাকি আবার সুরত্ বদলে মর্দানার কাপ্ড়ে পরে আন্ধেরি রাতে মুর্শিদাবাদে ঘুরে বেড়ায়—

নন্দকুমার সাহেব জিজ্ঞেস করে—রাত্রে শহরে ঘুরে বেড়ায়? কেন?

—কেন আবার? নবাবের দুষমনদের ধরবার জন্যে! কে নবাবের দুষমন আর কে দোস্ত্ তা জানতে কোশিস করে—

যারা শোনে তারা হতবাক্ হয় বেগমসাহেবার আক্কেল শুনে। বলে—ইয়ে বড়ি তাজ্জব বাৎ জনাব—

একজন শ্রোতা বলে—নবাবকা দোস্ত্ কাঁহা! সব্হি তো দুষমন হ্যায়।

খবরটা ওলন্দাজ-কুঠিতেও যায়। চন্দননগরের ফরাসী-কুঠিতেও যায়। হুগলীর ইংরেজ-কুঠিতেও যায়। নবাবের সঙ্গে ইংরেজদের লড়াই-এর খবর যখন আসতো তখন সে-কদিন খুব গরম হয়ে থাকতো ফৌজদারের দফতর।

খন কী হয়, কখন কী হুকুম আসে, তারই জন্যে সবাই উন্মুখ হয়ে থাকতো। শুধু যে ইংরেজের সঙ্গে লড়াই, তা তো নয়, কাল হয়তো ওলন্দাজদের সঙ্গেও লড়াই হতে পারে, কিংবা ফরাসীদের সঙ্গেও হতে পারে। হিন্দুস্থানে কেউ বলতে পারে না কাল তার কপালে কী লেখা আছে। নবাবী-নিজামতে কাউকে বিশ্বাস করে কথা বলার নিয়ম নেই। কে কখন কোন ফাঁকে গিয়ে নিজামতে কথাটা লাগাবে, আর নিজামত থেকে ডাক আসবে সঙ্গে সঙ্গে। আর তখনই নোকরি খতম্। শুধু নোকরি নয়, জানও খতম্। তারপর যদি একবার মরিয়ম বেগম-সাহেবার কানে যায় তো একদম ফরসা। তা ছাড়া মেহেদী নেসার সাহেব আছে, ইয়ারজান সাহেব আছে, মনসুর আলি মেহের মোহরার সাহেব আছে, এমন কি খুদে জাসুস্ বশীর মিঞা আছে—

তারপরে একদিন খবর এল নবাবের ফৌজ ইংরেজ ফৌজের কাছে লড়াইতে হেরে গেছে। লড়াইতে হেরে গিয়ে তাবাকুফে দস্তখত্ও করেছে। ওয়াটস্ ফিরিঙ্গী আর উমিচাঁদ সাহেবের ওপর মুর্শিদাবাদের দরবারে যাবার হুকুমত্ হয়েছে। দু'জনে রওয়ানা দিয়েছে কলকাতা থেকে।

তখনো ফৌজদার সাহেব রোজ জপ করতে করতে মনে মনে বলছে—হে মা, হে কালী, হে জগদম্বা, নবাব যেন ভালোয় ভালোয় মুর্শিদাবাদে ফিরে যায় মা, হুগলীতে যেন না আসে—

নবাব হুগলীতে এলেই যত ঝঞ্ঝাট। আসবার আগে থেকে তোড়জোড়, থাকার সময় ঝামেলা, চলে যাবার পরেও ভাবনা দূর হয় না। নবাব যখন আসে তখন তো আর একলা আসে না, সঙ্গে করে ভূত-পিশাচদেরও নিয়ে আসে। নবাবের চেয়ে ভূত-পিশাচরাই নবাবি-আনায় বেশি দড়। তাদের খাঁই মেটানোই বেশি শক্ত। কোথায় মদ, কোথায় মেয়েমানুষ, কোথায় টাকা, কোথায় কী, সব জুগিয়েও সুনাম পাওয়ার আশা নেই। নবাবের ভূত-পিশাচদের খুশী করতে করতেই ফৌজদারদের প্রাণান্ত!

শেষকালে হঠাৎ কলকাতা থেকে নবাবের কাছারির একটা খত্ এল।

নবাব লিখে পাঠিয়েছে—'ইংরাজেরা আমার সন্ধি অগ্রাহ্য করিয়া মদীয় দোস্ত্ চন্দননগরে ফরাসীদের নগরী ও কেল্লা দখল করিতে অগ্রসর হইলে হুগলীর ফৌজদারসাহেব জনাব নন্দকুমারের উপর ফৌজ লইয়া বাধাপ্রদান করিবার হুকুম হইল। ইহার অন্যথা না হয়।'

চিঠিটা পড়ে ফৌজদার প্রথমে হতবাক্ হয়ে গেল। আবার যুদ্ধ! আবার লড়াই। খবরটা প্রথমে চাপাই ছিল। ফৌজদারসাহেব বার দুই চিঠিটা পড়লে। তারপর লোকটার দিকে চেয়ে দেখলে।

বললে—টাকা? টাকা কই?

—কীসের টাকা?

—কেন, লাখ টাকার কথা লেখা রয়েছে যে!

চিঠির সঙ্গে আর একটা চিঠি। সে চিঠিতে লেখা আছে—এই পত্রবাহকের হাতে এক লাখ টাকা পাঠাইলাম। এই টাকা ফরাসী-সরকারকে দিবে। তাহাদের নিকট হইতে নবাব-সরকার দুই লাখ টাকা লইয়াছিল। এই টাকার সাহায্যে তাহারা ইংরাজকে শায়েস্তা করুক, ইহাই আমি চাহি।

—এই থলেটার ভেতর কী আছে জানি না হুজুর, এইটেও আপনাকে দেবার হুকুম হয়েছে।

ফৌজদার সাহেব থলিটা নিয়ে মুখের বাঁধনটা খুলে ফেললে। বেটা বদ্‌মায়েস লোক। টাকাটা বাজেয়াপ্ত করতে চেয়েছিল। তারপর টাকাটা নিজের সিন্দুকের মধ্যে পুরে বললে—যা, এখন যা—

—একটা চিঠি দেবেন না, হুজুর?

—আবার কীসের চিঠি?

—চিঠি পেলেন, টাকা পেলেন, তার রসিদ দেবেন না?

লোকটা হুঁশিয়ার বটে। বললে—যা, আমার দফ্‌তরে যা, রসিদ দেবে আমার খাস মুন্সী—

ফৌজদারের দফ্‌তরও বড় দফ্‌তর। হুগলীর ফৌজদারের মাইনেও কম নয়। সামান্য ব্রাহ্মণ-সন্তানের পক্ষে বাৎসরিক তিন লাখ টাকার চাকরি বড় ছোট চাকরি নয়। কিন্তু তবু টাকাকে তো বিশ্বাস নেই। টাকা আজ আছে, কাল নেই। তা ছাড়া নবাবের চাকরির কোনো ঠিক-ঠিকানাও নেই। অনেক তদ্‌বির করে চাকরিটা পাকা করে নিয়েছে ফৌজদার সাহেব। কিন্তু দিনকাল যা পড়েছে তাতে কোন্ দিন কে এসে লাথি মেরে তাড়িয়ে দেবে গদি থেকে। বলবে—ভাগো—

তারপর আবার ছোকরা নবাব। মেয়েমানুষের কথায় ওঠে বসে। ওদের কাছে চাকরি করাও যা, ওদের মুখের থুতু খাওয়াও তাই। সব সময়ে মুর্শিদাবাদের নিজামতের দিকে হাঁ করে থাকতে হয়।

কিন্তু দু'দিন যেতে না যেতেই হঠাৎ একদিন উমিচাঁদ সাহেব এসে হাজির। দেখে ফৌজদারসাহেবের একেবারে একগাল হাসি।

—আপনি?

উমিচাঁদসাহেব কিন্তু হাসলো না। বললে—আশেপাশে কেউ নেই তো? থাকলে এখন ঘরে ঢুকতে বারণ করে দিন—গোটা কতক জরুরী কথা আছে। কিছু টাকা মবলক উপায় করতে চান?

টাকা! বলে কী পাঞ্জাবীটা! টাকা আবার সংসারে কে না উপায় করতে চায়! টাকাই তো কলিযুগের মোক্ষ, উমিচাঁদ সাহেব! নবাবী আমলে আমাদের হরিনাম-টরিনাম তো সব ফক্কিকারি, টাকাই তো একমাত্র সত্য।

—কিন্তু হঠাৎ আপনার কাছ থেকে টাকা নিতে যাবোই বা কেন? আমি কী এমন পুণ্য করেছি? আমি তো মন্তর-দেওয়া বামুন নয়।

—বলি, কলকাতার কিছু খবর রাখেন? কলকাতার হালচালের?

নন্দকুমার বললে—কলকাতার খবর না রাখলে কি আর ফৌজদারি চালাতে পারি? শুনছি তো এখন আর নবাবের আমল নয়, এখন মরিয়ম বেগমের আমল। শেষকালে নাকি আলীবর্দী খাঁর মসনদ চালাচ্ছে একজন মেয়েমানুষ!

উমিচাঁদ সাহেব বললে—আরে ওই তো। মেহেদী নেসারটার কাণ্ড! লোকটা নিজে মাতাল, নবাবের সঙ্গে অত দহরম-মহরম, কিন্তু আখেরের কাজ গুছিয়েই নিতে পারলে না। কোথা থেকে কোন্ হাতিয়াগড়ের বউটাকে এনে হারেমে পুরে দিয়েছিল, সে মাগীও তেমনি জাঁহাবাজ, এখন মেহেদী নেসারের পেছনে কাঠি দিচ্ছে।

—কী রকম?

—আর কী রকম! আমাদের আর পাত্তাই দিতে চায় না নবাব। সকলকে বাতিল করে দিতে শুরু করেছে। ওর দাদামশাই বুড়ো-নবাব আমাকে বিশ্বাস করতো, আমাকে বিশ্বাস করে মনের কথা বলতো, এবার দেখি একেবারে উল্টো!

আমাকে মানতেই চায় না। আমরা কারবার করে খাই। আমাকে বলে কি না, আমি নবাবকে খুন করবার মতলব করেছি। বলে কি না, আমার হাতের লেখা চিঠি পেয়েছে সফিউল্লার কাছে। সফিউল্লা সাহেব খুন হয়ে গেছে, শুনেছেন তো?

—তাই তো শুনলুম!

—ওই মরিয়ম বেগমই তাকে খুন করে সাবাড় করে দিলে। আমি খুন করলে আমার তো গর্দান চলে যেত, আর মরিয়ম বেগমের বেলায় উল্টো হলো। একেবারে নবাবের নেকনজর পেয়ে গেল। নেকনজর পেয়ে এখন আমাদের ওপর চোখ রাঙায় আবার!

—দেখতে খুব উমদা নাকি?

—আরে টাকার চেয়ে তো আর দুনিয়ায় উমদা চিজ্ কিছু নেই, তবে? না কি কিছু অন্যায় কথা বলেছি আমি, বলুন?

—তা তো বটেই!

উমিচাঁদ সাহেব বললে—সেই জন্যেই তো আপনার কাছে এলাম ফৌজদার সাহেব, আপনি নবাবের কাছ থেকে কিছু নির্দেশ পেয়েছেন?

—পেয়েছি!

—তাই বলুন! আমাকে ক্লাইভ সাহেব লিখেছে যে! ক্লাইভ সাহেবকে চেনেন তো?

—খুব চিনি!

উমিচাঁদ সাহেব বললে—তাহলে একটা কাজ করতে হবে দাদা, আপনিই করতে পারেন, আপনি ছাড়া আর কারো করবার ক্ষমতা নেই! টাকা যা চান তা দেওয়া যাবে!

টাকা! নন্দকুমার সাহেবের মুখ দিয়ে ফস্ করে কথাটা বেরিয়ে গেল। কে টাকা দেবে?

—কেন, ফিরিঙ্গী কোম্পানী দেবে!

—কত টাকা দেবে?

—যা চান আপনি!

ফৌজদার সাহেব বললে—কী করতে হবে আমাকে?

—আপনাকে এমন কিছু কঠিন কাজ করতে হবে না। ইংরেজরা ফৌজ নিয়ে চন্দননগর দখল করতে যাবে, আপনি মোট কথা বাধা দেবেন না, ফৌজ দিয়েও বাধা দেবেন না—

ফৌজদার সাহেব কথাটা শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো।

উমিচাঁদ সাহেব বললে—আরে মশাই, এতে ভাবার কিছু নেই। এমন হাতী-ঘোড়া কাজ কিছু নয় এটা, আসলে তো আপনার নবাবও যা, ও ক্লাইভ সাহেবও তাই।

—সে কী-রকম?

উমিচাঁদ সাহেব বললে—আরে মশাই, চারদিকের হালচাল দেখছেন না? ওদিক থেকে পাঠান আহ্মদ শা আব্দালী তো এসে পড়লো বলে। এই তো এবার কলকাতা থেকে ফিরেই নবাবকে যেতে হবে আজিমাবাদের দিকে, শুনেছেন তো?

—শুনেছি, পথে পাঠানদের আটকাবার জন্যে।

—আটকাতে কী পারবে নাকি ভেবেছেন? এই ধরুন আপনিই যদি ফৌজ নিয়ে যান তো আপনিই কি লড়াই করতে পারবেন মন খুলে? বলুন না, পারবেন? আপনার দফ্তরের লোকেরা, আপনার ফৌজের সেপাইরা নিয়ম করে মাইনে পায়? আপনিই কি মাইনে-ফাইনে পান মাসের পয়লা তারিখে?

নন্দকুমার বললেন—অনেক লিখে লিখে তবে আদায় হয়—

—আদায় হয় শেষ পর্যন্ত?

—ওই ন'মাসে ছ'মাসে আসে কোনো রকমে। তা-ও মাইনে বাড়াবার জন্যে তাগিদ দিচ্ছি মশাই, তারও কোনো জবাব নেই। জিনিস-পত্তোরের দাম বাড়ছে—

—আপনার মাইনে?

নন্দকুমার বললেন—নিয়ম করে মাইনে পেলে আর কী ভাবনা, উমিচাঁদ সাহেব! তা পেলে তো পায়ের ওপর পা দিয়ে...

উমিচাঁদ সাহেব বললে—তা আমি জানি। ও দেখবেন, এ-নবাবি টিঁকবে না আর। যে ক'টা দিন আছেন, কাজ গুছিয়ে নিন, আখেরের কাজ গুছিয়ে নিন—নইলে পরে পস্তাতে হবে! তাই তো বলছিলাম, বড় গাছে নৌকো বাঁধুন। এরা সব বনেদী মানুষ, এই ইংরেজরা। এদের কারবারের কায়দা-কানুনই আলাদা। আমিও তো কারবার করি, আর ও-বেটাদের কারবারও দেখছি। কথার খেলাপ করে না মশাই, যার যা পাওনা-গণ্ডা, তাকে তা আগে মিটিয়ে দিলে তবে ওদের ভাত হজম হয়। আমিও তো কারবার করি তাদের সঙ্গে, আমার একটা কড়া ক্রান্তির হিসেব পর্যন্ত না মিটিয়ে দিলে ওদের ঘুম হয় না, তা জানেন?

—তা কী করতে হবে আমাকে, বলুন?

—ওই যে আপনাকে বললুম! ক্লাইভ সাহেবের সঙ্গে আমার কথা হয়ে গেছে সব। আপনি যত টাকা চাইবেন ও-বেটারা দেবে! দু'হাজার চান দু'হাজার, চার হাজার চান চার-হাজার! ও-বেটাদের মশাই হক্কের টাকা, কিছু দুয়ে নিন্ না—

—তা কত নিই বলুন তো ঠিক ঠিক?

—যা আপনার খুশী!

—পাঁচ হাজার চাইলে দেবে?

—তা দেবে না কেন, পাঁচ হাজার চাইলে পাঁচ হাজারই দেবে!

নন্দকুমার বললে—তাহলে ছ' হাজারই চাই, কী বলেন!

—তা চান!

নন্দকুমার বললে—দাঁড়ান, ছ'হাজারই বা কেন, যখন মাগ্না পাওয়া যাচ্ছে তখন আট হাজারই চাই। আট হাজার হলেই আমার ভালো হতো। আমার তে অনেক ঝুঁকি—

উমিচাঁদ বললে—ঝুঁকির কথা যদি বলেন তো আট কেন, দশ হাজারই চান না পুরোপুরি।

নন্দকুমার আর পারলে না। বললে—দাঁড়ান, আমি একবার ঠাকুর-ঘর থেকে আসি—

—ঠাকুর-ঘর?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, ঠাকুরকে জিজ্ঞেস না করে আমি কিছু করিনে কি না, বড় জাগ্রত ঠাকুর আমার, কালী মূর্তি—

বলে চলে গেল ভেতরে। আর তার একটু পরেই হাসতে হাসতে বাইরে এল। বললে—কিন্তু উমিচাঁদ সাহেব, ঠাকুর বলছেন—তুই বারো হাজার টাকা নে

উমিচাঁদ বললে—আপনার ঠাকুর নিজের মুখে বলেছে? তাহলে বারো হাজারের এক দামড়ি কম নেবেন না—বারো হাজারই নিয়ে নিন—

—দেবে তো?

—নিশ্চয়ই দেবে। আপনি টাকা না দিলে কাজ করবেন না। মিছিমিছি কাজ করতে যাবেন কেন? কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে আমরা ঘর করি, টাকা না পেলে কাজ করবো কেন? আপনি এক কাজ করুন। আপনি আমার কথার ওপর বিশ্বাস করবেন না। আমি সোজাসুজি লোক পাঠাচ্ছি ক্লাইভ সাহেবের কাছে। ক্লাইভ সাহেব যদি উত্তরে লিখে পাঠায় 'গোলাপ ফুল', তাহলে বুঝে নেবেন সাহেব আপনার কথায় রাজি, আর যদি কিছু উত্তর না আসে বুঝতে হবে গররাজি—

—আমাকে তাহলে কী করতে হবে?

—আপনাকে কিছুই করতে হবে না। ফরাসীদের কাছে নবাবের দেওয়া টাকাটা পাঠাতেও হবে না, ইংরেজরা যখন চন্দননগর হামলা করতে যাবে তখন শুধু আপনি আপনার ফৌজ নিয়ে হুগলীতে ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে বসে থাকবেন, বুঝলেন? াহলে আমি চলি?

উমিচাঁদ সাহেব চলে গেল।

বারো হাজার টাকা! বারো হাজার টাকা মবলক পাওয়া গেল। ঘরের মধ্যে নেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলো নন্দকুমার ফৌজদার সাহেব। ব্রাহ্মণ বংশে জন্মে এমন চাকরি হবে, এত টাকা হবে, বাপ-মা কি ভাবতে পেরেছিল! হঠাৎ বাইরে আবার ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ হলো। এই ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দটাকেই ফৌজদার সাহেবের যত ভয়। কখন হঠাৎ ডাক আসে মুর্শিদাবাদের দরবারে, কখন উজীর-এ-আজম আসে, সেই ভয়েই ওষ্ঠাগত হতে হয়। নইলে বেশ চাকরি। তখত্-এ-তাউসে বসে ঘুমোলেও কেউ কিছু বলবার নেই। বেশ চায়েন, বেশ আরাম।

—হুজুর!

—কৌন্?

—ফিরিঙ্গী-কোঠি থেকে হরকরা এসেছে।

দিশি হরকরা। কুর্তা-কামিজ পরা। এসেই ফৌজদার সাহেবকে মাটি পর্যন্ত মাথা নিচু করে সেলাম করলে। তারপর একটা লেফাফা এগিয়ে দিলে। দিয়ে আবার চলে গেল কুর্নিশ করে। হুকুম-বরদারও চলে গেল।

ফাঁকা ঘরের মধ্যে নন্দকুমার লেফাফাখানার মুখ ছিঁড়ে ফেললে। ভেতরে একটা সাদা কাগজ শুধু। তার ওপর ফার্সিতে বড় বড় হরফে লেখা—'গুলাব্ কে ফুল'।

কে লিখছে, কেন লিখছে, কোথা থেকে লিখছে, কিছুই লেখা নেই তাতে। না থাক, ফৌজদার সাহেব লেফাফাখানা নিয়ে মাথায় ঠেকালে। জয় মা কালী, জয় মা জগদম্বা, ভাগ্যিস তুমি বুদ্ধি দিয়েছিলে। নইলে তো চার হাজার টাকা লোকসান হয়ে যেত! জয় মা বগলামুখী, আজ তোমায় সোনার রেকাবিতে সিন্নী চড়াবো। চাঁরের চামর দিয়ে তোমায় বাতাস করবো, গঙ্গাজলের বদলে আজ খাঁটি গরুর দুধ দিয়ে তোমার চরণামৃত বানিয়ে দেবো! জয়, জয় করালবদনী। জয় হোক তোমার—

অনেক কাজের ভিড়ে যেন শান্তি ছিল না ক্লাইভ সাহেবের। শুধু নবাবের ভাবনাই নয়। সেই আর্কট থেকে যে ভাবনার শুরু হয়েছে, সেই ভাবনাটাই বেড়ে বেড়ে এখন যেন সমস্ত মানুষটাকেই গ্রাস করেছে। এমনি মাঝে মাঝে হয় ক্লাইভ সাহেবের। মনে হয় কোথাও গিয়ে একটু বিশ্রাম নিলে ভালো হতো। কিন্তু কে দেবে রেস্ট? কে আছে এখানে ক্লাইভ সাহেবের? নিজের পার্সোন্যাল আর্দালি ছিল একটা, হরিচরণ, তাকেও দিয়ে দিয়েছে ওদের কাছে!

অনেক দিন আগে মাদ্রাজে থাকার সময় এইরকম হয়েছিল। মনটা কেবল নিজের হোমে ফিরে যেতে চাইতো। এই ব্যথাটা যখনই হতো তখনই বাড়ির কথা মনে পড়তো।

বাইরের দিকে চেয়ে দেখলে ক্লাইভ সাহেব। ফৌজ রেডি রয়েছে। তারও ওদিকে নবাবের সেপাইরা তাঞ্জামটা নিয়ে চলে যাচ্ছে। একটা পেটি বেগম, তারও তেজ কত! এতগুলো বেগম একজন নবাবকে কী করে ভালোবাসতে পারে! ইন্ডিয়াতে না এলে এটাও তো দেখা হতো না। সবাই বলেছে ওরা নাকি স্লেভস্। হরিচরণকে জিজ্ঞেসও করেছে কতবার।

হরিচরণ বলেছে—আজ্ঞে হুজুর, আমি তো কখনো বেগমদের দেখিনি—ওরা সব বাঁদীর মতন—

—বাঁদী মানে?

—বাঁদী মানে চাকরানী, হুজুর। হারেমের বাইরে বেরোতে পারে না বেগমসাহেবারা।

—কারোর সঙ্গে কথা বলতে পারে না?

—না হুজুর, বাইরে বেরোলে বোরখা পরতে হয়।

—তা হলে কোনো পুরুষমানুষ নেই সেখানে?

—না হুজুর, শুধু খোজারা আছে—

সাহেব বুঝেছিল—ইউনাক! স্ট্রেঞ্জ! স্ট্রেঞ্জ এই ইন্ডিয়া আর স্ট্রেঞ্জ এই ইন্ডিয়ার নবাব। বহুদিন পরে বাবাকে একটা চিঠি লিখেছিল রবার্ট! সেই তার ওয়ার্থলেস ছেলে রবার্ট! লিখেছিল—'এখানে সবই অদ্ভুত বাবা। এখানকার নবাব অনেকগুলো বিয়ে করে। একটা অ্যাপার্টমেণ্ট থাকে, তাকে ওরা বলে জেনানা-হারেম। সেখানে এরা এদের মিসস্ট্রেসদের পুরে রাখে। এখানে পলিগ্যামি খুব চলছে। একটা লোক এখানে একশো-দুশো ওয়াইফ রাখতে পারে। কেউ নিন্দে করে না সে-জন্যে। মেয়েদের এরা স্লেভ্ করে রাখে। কিন্তু আজ একটা বেগমের সঙ্গে দেখা হলো, দেখলাম, সে ইনটেলিজেন্ট। আমার ধারণা ছিল, যারা অনেক বিয়ে করে, তাদের ওয়াইফরা তাদের হেট করে। তা নয়। এ বেগমটা তার হাজ-ব্যান্ডকে বেশ রেসপেক্ট করে দেখলাম। খুব ভালো মেয়ে বলে মনে হলো। ইন্ডিয়ান মেয়েদের সম্বন্ধে ক্রমেই আমার ধারণা বদলে যাচ্ছে। যে-হিন্দু বউটাকে আমার এখানে শেলটার দিয়েছি, সে-ও খুব রেসপেক্‌টেবল্ লেডী। কিন্তু আশ্চর্য, তার বিয়ে হয়েছিল একজন পোয়েটের সঙ্গে। পোয়েটটা খুব ভালো লোক। বেশ ব্রড আউট-লুক। সে মানুষকেই গড্ মনে করে পুজো করে। তার কাছে মানুষই

গড্। তার কাছে বেশ নতুন লাইট পেলাম। কয়েকদিন আগে সিলেক্ট কমিটির কাছে খবর এসেছিল যে, ফ্রান্সের সঙ্গে আমাদের ওয়ার বেঁধে গেছে। আমার ওপর কাউন্সিলের অর্ডার হয়েছে, এখানকার ফ্রেঞ্চ-টেরিটোরি চন্দননগর অ্যাটাক করবার জন্যে। আমি তাই নিয়ে খুব ব্যস্ত আছি। আমি বেঙ্গলের মিলিটারি-অ্যাফেয়ার্সটা সেটেল করতে পারলেই আর একবার ওখানে যাবো। ভাই-বোন আর মা'কে আমার ভালোবাসা দিও। তুমি আমার বেস্ট রিগার্ডস্ নিও—আই অ্যাম ইওরস্—'

চিঠিটা শেষ করে ক্লাইভ চিঠির মুখটা বন্ধ করতে যাচ্ছিল। তাড়াতাড়ি চিঠিটা হোমের ডাকে না দিলে আবার যাবে না। আর এই জাহাজে যদি না যায় তো আবার কবে যাবে, তার কোনো ঠিক নেই। এই চিঠিটাই পোঁছতে সাত মাসও লাগতে পারে, আট মাসও লাগতে পারে—

—তুমি আছ নাকি সাহেব?

—হ্যাঁ দিদি, কী হলো?

দুর্গা বাইরে থেকে ভেতরে ঢুকলো—তুমি তো বাবা আমাদের বলোনি, হরিচরণ বললে, তাই জানতে পারলুম!

—কার কথা বলছো দিদি? আমি তো ঠিক বুঝতে পারছি না?

—তোমরা নাকি লড়াই করতে যাচ্ছ আবার! তা হলে আমরা কোথায় থাকবো?

—কেন দিদি, তোমরা এখানেই থাকবে! তোমাদের সমস্ত ব্যবস্থা তো আমি করে দিচ্ছি।

—তা তুমি থাকবে না এখানে, তা হলে আমরা কী করে থাকবো? কার ভরসায় থাকবো?

ক্লাইভ বললে—বাঃ, আমি কি বরাবরের মত চলে যাচ্ছি? তোমাদের পাহারা দেবার জন্যে আমি তো লোক রেখে যাচ্ছি—

—তা নবাবের সঙ্গে তোমাদের লড়াই যখন মিটে গেছে, এবার আমাদের বাড়ি পাঠিয়ে দাও না বাবা, আর কদ্দিন এ-রকম করে ছন্নছাড়া হয়ে থাকি? আমাদের বাড়ি পাঠাবার একটা ব্যবস্থা করে দাও না—আমরা যে আর পারিনে বাবা—

ক্লাইভ বললে—তোমাদের কষ্ট যে হচ্ছে, তা কি আর বুঝতে পারছি না? কিন্তু নবাবের সঙ্গে মিটমাট হয়েছে, কে বললে তোমায়? নবাব এখনো যে আমার পেছনে লেগে রয়েছে। এই দেখ না, আমাদের সঙ্গে নবাবের যে কথা হয়েছে, সে-কথার আবার খেলাপ করতে চাইছে!

—তা তোমরা এত সব বড় বড় বীর রয়েছো, নবাবকে মেরে ফেলতে পারছো না? অমন হতচ্ছাড়া নবাব থেকে লাভটা কীসের? বউ-ঝি যে-দেশে ঘরে নিশ্চিন্তে থাকতে পারবে না, সে-দেশের নবাবের মুখে ঝ্যাঁটা মারি!

—দাঁড়াও না দিদি, আর দুটো দিন সবুর করো, তোমাদের নিশ্চিন্তে বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়ে তবে আমি দেশ ছেড়ে যাবো!

—দেশ ছেড়ে যাবে মানে!

ক্লাইভ হাসতে লাগলো—বারে, আমার নিজেরও বুঝি ঘর-বাড়ি নেই? আমার নিজের বুঝি বাপ-মা'কে দেখতে ইচ্ছে করে না? আমার বউ-ছেলেমেয়ে বুঝি নেই ভেবেছো?

—ওমা, তাই নাকি? তোমার মা বেঁচে আছে?

—কেন, বেঁচে থাকবে না কেন? আমি এখানে এসে যুদ্ধ করে বেড়াই বলে আমার বাবা-মা থাকবে না?

দুর্গা কপালে হাত দিলে।

—ও আমার কপাল! তবে যে হরিচরণ বললে, তোমার মা মারা গেছে বলে তুমি নাকি আড়ালে লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদো?

—হরিচরণ বলেছে তোমাদের ওই কথা? আরে, আমার মা বেঁচে আছে কি না, তা আমার আর্ডালি জানবে কী করে?

বলে ডাকতে লাগলো—আর্ডালি—আর্ডালি—

দুর্গা বললে—না বাবা, ওকে আর তুমি বোক না। ও হয়তো বুঝতে পারেনি। কী বুঝতে কী বুঝে ফেলেছে। যাক গে, শুনে মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল বাবা। সত্যিই তো, তুমি এমন ভালো লোক, তোমার মা কেন মারা যাবে। আহা, তোমার মা বেঁচে-বর্তে থাক। আশীর্বাদ করি, এবার যুদ্ধ-টুদ্ধ ছেড়ে দেশে ফিরে গিয়ে মায়ের কোল-জোড়া হয়ে থাকো। যাই বলো, তোমাদের চাকরি কিন্তু বড় বিচ্ছিরি চাকরি বাবা। এমন চাকরি আর কখখনো নিও না। তোমার ছেলেমেয়ে-বউ তাদের ছেড়ে বা আছ কী করে বাবা এই এত দূরে? তাদের জন্যে তোমার মন-কেমন করে না?

ক্লাইভ সেই রকমই হাসতে লাগলো।

বললে—মন-কেমন করলে কী চলে দিদি? তোমাদের দেশের মত আমাদের দেশে এমন আরাম তো নেই। সে ঠান্ডার দেশ, তোমাদের দেশ থেকে মাল-মশলা গেলে তবে আমরা খেতে পাই, তা জানো? বউ-ছেলেমেয়ে-পরিবার ছেড়ে না এলে চলবে কেন? দেশের লোক খাবে কী?

দুর্গা বললে—তা ভালো, তুমি কাজ-কম্ম তো যথেষ্ট করলে, এখন আমাদের একটা হিল্লে করে দিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও, বাপ-মার প্রাণটা জুড়োক—

—তা তোমাদের ভাবতে হবে না দিদি, আমি যেখানেই যাই না কেন, তোমাদের একটা ব্যবস্থা করে দেবোই—

—কিন্তু তুমি চলে গেলে যদি আবার সেই পাগলা বাউন্ডুলেটা আসে?

—কে? সেই পোয়েট?

—পোয়েট-ফোয়েট বুঝিনে বাবা, তাকে এখানে ঢুকতে দিলে আমি একশা কান্ড করে বসবো, তা বলে রাখছি—

হঠাৎ বাইরে থেকে একজন সেপাই একটা চিঠি নিয়ে এল। ক্লাইভ সাহেবের মুখখানা কেমন যেন গম্ভীর হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

বললে—তুমি একটু বসো দিদি, আমি আসছি—

বলে বাইরে বারান্দায় এসে খামটা খুলে চিঠিটা পড়তে লাগলো। দিয়েছে হুগলী থেকে উমিচাঁদ।

লিখেছে—'সাহেব, আমি তোমার কথামত হুগলীর ফৌজদার নন্দকুমারের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি। লোকটা বামুন হলে কী হবে, এক নম্বরের ফেরেব্বাজ। টাকার জন্যে লোকটা সব করতে পারে। আমি তাকে টাকার লোভ দেখাবো, যাতে তোমাদের বিরুদ্ধে ফৌজ না পাঠায়। তোমরা চন্দননগরে হামলা করলেও সে চুপ করে থাকবে হাত-পা গুটিয়ে, এই শর্তে তাকে আমি দশ-বারো হাজার টাকা ঘুষ দেবার কথা বলবো। তুমি এই লোকের মারফত শুধু একটা কথা লিখে নন্দকুমারের কাছে পাঠিয়ে দাও—'গুলাব্ কে ফুল'। আমি যেই ফৌজদারের দফ্তর থেকে বেরিয়ে আসবো, তখনি যেন সে সেই চিঠিটা নিয়ে গিয়ে ফৌজদারকে দেয়। তোমার যে টাকা দেবার অমত নেই, সেইটেই কথাটার মানে, তা আমি তাকে বুঝিয়ে

বলবো। চিঠিটা খুব সাবধানে নিয়ে যেতে বলবে সাহেব। চারদিকে নবাবের চর পিল-পিল করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমি আর ওয়াট সাহেব মুর্শিদাবাদ যাচ্ছি। নবাব এখন অগ্রদ্বীপে ছাউনি করেছে। এই সঙ্গে আর-একটা কথা তোমাকে জানিয়ে রাখি—নবাবের এক বেগম মুর্শিদাবাদ থেকে এসেছে। সঙ্গে নানীবেগম-সাহেবা আছে। নবাবের দিদিমা। বড় জাঁহাবাজ মেয়েমানুষ ওই মরিয়ম বেগমসাহেবা। আমাদের সব খবরদারি করবার জন্যে চর লাগিয়েছে। আমাদের ইয়ার সফিউল্লা সাহেবকে ওই মাগীটাই খুন করেছে। খুব সাবধান। ও-মাগীটার কাছে পেট-কাপড়ে সব সময় ছোরা থাকে। বলা যায় না, ওই বেগম হয়তো অন্য কোনো ছুতো করে তোমাদের বাগানেও যেতে পারে। মেয়েমানুষ বলে যেন রূপ দেখে গলে যেও না। তোমার তো আবার মেয়েমানুষের ওপর দুর্বলতা আছে। ও মাগী সব পারে—খুব সবাধান। এদিকে আমার দ্বারা তোমাদের যা উপকার করা সম্ভব, তা করছি। ভবিষ্যতেও আরো করবো। আশা করি, আমার কথা তোমরা ভুলে যাবে না। সুদিন এলে আমাকে নিশ্চয় তোমরা মনে রাখবে আশা করি।'

নিচেয় কারো নাম নেই। না থাক, বুঝতে কষ্ট হয় না উমিচাঁদের লেখা—

একখানা কাগজে ক্লাইভ লিখলে—'গুলাব্-কে-ফুল'। তারপরে খামের মুখটা আঠা দিয়ে এঁটে সেপাইটার হাতে দিয়ে বললে—এই নাও—সোজা হুগলীর ফৌজদার সাহেবের বাড়ি দিয়ে আসবে, কিছু বলতে হবে না—

দুর্গা সাহেবের মুখখানার দিকে চেয়ে অবাক হয়ে গেল। এই এতক্ষণ বেশ হেসে হেসে কথা বলছিল তার সঙ্গে, আর এখনি মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল কেন?

—হ্যাঁ বাবা, একটা কথা বলবো?

—কী দিদি, বলো?

—তোমার মুখটা মাঝে-মাঝে অমন গম্ভীর হয়ে যায় কেন বলো দিকিনি বাবা? বেশ হাসিখুশি আছ, আর হঠাৎ কী হয়? কার কথা ভাবো?

ক্লাইভ বললে—কিছু মনে কোর না দিদি, আমার একটা রোগ আছে—

—রোগ? সে কী?

—হ্যাঁ দিদি, রোগ! ওই একটাই আমার রোগ। আমার নার্ভ মাঝে-মাঝে অসাড় হয়ে যায়, তখন কিচ্ছু ভালো লাগে না। মাঝে-মাঝে আমার এত ব্যথা হয় যে, আমি অজ্ঞান হয়ে যাই—

দুর্গা বললে—অজ্ঞান হয়ে যাও?

—হ্যাঁ দিদি, অজ্ঞান হয়ে যাই, ছোটবেলা থেকে রোগটা আমার আছে, এই রোগের যন্ত্রণায় এক-একবার আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে করে, ভীষণ ব্যথা হয়—

—আহা গো, তা কবিরাজ দেখাও না কেন? হাকিম দেখালেও তো পারো! রোগ পুষে রাখা তো ভালো নয় বাছা, বিদেশ-বিভুঁই-এ এসে শেষে কি বেঘোরে প্রাণটা দেবে?

ক্লাইভ বললে—আমার নিজেরও তাই ভয় হয় মাঝে-মাঝে—

—তবে বাবা তুমি একটু শুয়ে পড়ো, আমি যাই, একটু গড়িয়ে নাও। খাওয়া-দাওয়ার সময়ের ঠিক নেই, ঘুমেরও ঠিক নেই, পিত্তি তো পড়বেই! এক কাজ করতে পারো না, ভোরবেলা উঠে খালি পেটে ছোলা-ভিজান জল খেতে পারো না? ও পিত্তির ব্যথা, আমারও আগে হতো, এখন সেরে গেছে—

ক্লাইভ সাহেব কিছু উত্তর দিলে না দেখে দুর্গা ভেতর দিকে চলে গেল। বললে—আমি চললুম, তুমি একটু গড়িয়ে নাও—

হায় রে, গড়িয়ে নিলেই যেন চলবে! খবরটা অ্যাড্‌মিরাল ওয়াটসন্‌কে দিতে হবে। দুর্গা চলে যেতেই বাইরের পাহারাদারকে ডাকলে—আর্ডালি—

অগ্রদ্বীপে নবাবের ছাউনির ভেতরে সমস্ত আবহাওয়া যেন তখন থমথম করছে। কাল রাত থেকেই নবাব খুব মেজাজ গরম করেছে। মীর-বক্সী থেকে শুরু করে ছোটখাটো চৌকিদারটা পর্যন্ত ভয়ে তটস্থ হয়ে আছে। উমিচাঁদ সাহেব আর হুগলীর ফৌজদার নন্দকুমার সাহেবকে জরুরী তলব দিয়ে ডেকে পাঠানো হয়েছে।

•

পাশের ছাউনি থেকে হঠাৎ মরিয়ম বেগমসাহেবার ডাক এল কান্তর কাছে।

—মরিয়ম বেগমসাহেবা কান্তবাবুকে এত্তেলা দিয়েছে।

—যাচ্ছি—

বলে কান্ত পাশের কামরায় গেল। কামরার পর্দা তুলে দেখলে মরালীর একেবারে অন্য চেহারা। একখানা লাল ওড়নী মাথায় ঢেকে দাঁড়িয়ে আছে।

—আমাকে আবার এ-সময়ে ডাকলে কেন? নবাব খুব বেতর্‌ হয়ে রয়েছে; যদি জানতে পারে?

মরালী বললে—একটা জরুরী কথা, পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখছিলাম ক'দিন ধরে একটা লোকের সঙ্গে ফিস্‌ ফিস্‌ করে কথা বলছো, ও লোকটা কে?

—রোগা লম্বা মতন ছেলেটা? ওরই নাম তো শশী। ওর কথাই তো তোমাকে লিখেছিলুম।

—ওর সঙ্গে তোমার কীসের এত কথা?

কান্ত মরালীর মুখের দিকে চেয়ে যেন ভয় পেয়ে গেল।

—ও কেবল জিজ্ঞেস করে ভেতরের খবরাখবর।

—কীসের খবর?

কান্ত বললে—এই যুদ্ধ বন্ধ হলে ওর চাকরি চলে যাবে ফৌজ থেকে, তাই খুব ভয় ওর। ও জানতে চায় যুদ্ধ হবে কি হবে না—ছেলেটা ভালো, খুব নিরীহ গোবেচারী মানুষ!

মরালী গম্ভীর গলায় বললে—তা হোক, ওর সঙ্গে অত কথা বলতে হবে না, ও লোকটা ভালো নয়—

—না-না, আমি বলছি, খারাপ লোক নয় তেমন!

—তা হোক ভালো লোক, তবু ওর সঙ্গে কথা বলো না। ও কারো চর নিশ্চয়ই—

—বা রে, তুমি কী করে জানলে?

—আমি যা বলছি শোন, ওর সঙ্গে অত কথা বলতে হবে না, আমি গোঁফ দেখলে লোক চিনতে পারি, ও নিশ্চয়ই কারো চর, ওর ছায়া মাড়াবে না—

হঠাৎ বাইরে কিসের শব্দ হলো। তারপর বোঝা গেল, ঘোড়া ছুটিয়ে কারা আসছে এদিকে—

মরালী বললে—যাও, এবার চলে যাও, উমিচাঁদ আর নন্দকুমার এসে গেছে, নবাবের ঠিক পাশে পাশে থাকবে তুমি, সব দিকে নজর থাকে যেন, যাও—

অষ্টাদশ শতাব্দীর মানুষ বুঝি অস্থায়ী যুগের মানুষ। সুখ, ঐশ্বর্য, দুঃখ, জীবন, সমস্তই তখন অস্থায়ী। তবু বোধহয় অস্থায়ী জিনিসের ওপর মানুষের কোনোদিনই আস্থা নেই। তাই সেই ক্ষণস্থায়ীকে স্থায়ী করবার জন্যেই হুগলীর ফৌজদার নন্দকুমার অত ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। নইলে তিন লাখ যার বার্ষিক খেলাৎ তার পক্ষে মাত্র বারো হাজার টাকায় নবাবের এত বড় ক্ষতি করা সম্ভব হতো না।

নবাবের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে, নবাব যখন জবাবদিহি চাইলে তখন সেই যুক্তিই দিলে ফৌজদার সাহেব।

বললে—জাঁহাপনা কী করে ভাবতে পারলেন যে, আমি নবাবের দুষমনদের কাছ থেকে টাকা নেবো? নবাব তো আমার কোনো ক্ষতি করেননি যে, আমি নবাবের ক্ষতি করবো?

নবাবের গলা বড় গম্ভীর। কিন্তু কান্তর মনে হলো নবাব যেন নন্দকুমারের সামনে করজোড়ে প্রার্থনা জানাচ্ছে। মনে মনে বড় কষ্ট হতে লাগলো কান্তর। নবাবের সামনে দাঁড়িয়ে যে-লোক এমন করে মিছে কথা বলতে পারে তাকে তো কেটে ফেলা উচিত। কোতল করা উচিত। এরা কি বোঝে না যে নবাবের ক্ষতি মানে সকলের ক্ষতি? নবাব বাঁচলেই তো সবাই বাঁচবে। নবাবের পর যদি আহ্‌মদ শা আব্‌দালী এই বাঙলাদেশে আসে, সে কি আর আমাদের এমন করে বাঁচাবে! সে তো লুট-পাট করে দেশ-গাঁ উজাড় করে সবাইকে ভিটে-মাটি ছাড়া করবে! আর এই যে মরালী নবাবকে না-বলে ক্লাইভ সাহেবের সঙ্গে দেখা করে এল, অন্য নবাব হলে কি এত বড় গুণাহ্‌ বরদাস্ত করবে!

মরালী ফিরে আসতেই কান্ত জিজ্ঞেস করেছিল—তুমি কোন্‌ সাহসে গেলে মরালী?

মরালী বলেছিল—কেন, আমি তো নবাবের ভালোর জন্যেই গিয়েছিলাম—

—সাহেবের সঙ্গে কথা বলতে তোমার ভয় করলো না?

মরালী বলেছিল—চেহেল্‌-সুতুনে আসতেই যখন ভয় করেনি তখন পেরিন সাহেবের বাগানে যেতেই বা ভয় করবে কেন?

কান্ত বলেছিল—কিন্তু কেন তুমি চেহেল্‌-সুতুন ছেড়ে এখানে এলে? কেমন করে এলে? সঙ্গে একটা বাঁদী নাওনি, খোজা নাওনি, তোমার ভয় করলো না?

মরালী বললে—ভয় হয়েছিল প্রথমে—

—তাহলে? তাহলে কী করে ভয় কাটলো?

—আর একজনের কথা ভেবেই ভয় কেটে গেল!

কান্ত জিজ্ঞেস করলে—কার কথা ভেবে? নবাবের কথা?

মরালী বললে—প্রথমে নবাবের কথা ভেবেই কলকাতায় এসেছিলুম। কিন্তু আর একজনের কথা ভেবে ক্লাইভ সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলুম—

—কার কথা?

—সে-কথা এখন তোমায় বলবো না। নবাবকেও বলিনি। আমার এত কষ্ট করা সব বোধহয় মিথ্যে হয়ে গেল। নিজেও সুখ পেলুম না, অন্যকেও সুখী

করতে পারলুম না।

বলতে বলতে মরালীর মুখখানা কেমন ছল্-ছল্ করে উঠেছিল সেদিন।

সত্যিই তখন কি মরালী জানতো যে, যাকে নবাবের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে রাণীবিবির ছদ্মবেশ পরে চেহেল্-সুতুনে এসেছিল, সেই হাতিয়াগড়ের ছোট বউরানীই আবার কোন্ ঘটনাচক্রে পড়ে ক্লাইভ সাহেবের ছাউনিতে গিয়ে উঠবে! তাহলে তার এত কাণ্ড করার দরকার কী ছিল।

কান্ত বলেছিল—চলো না মরালী, আমরা কোথাও চলে যাই—

—কোথায়?

কান্ত বলেছিল—এ-সব যুদ্ধ-লড়াইয়ের মধ্যে কেন থাকি আমরা। যারা নবাবের আশেপাশে রয়েছে দেখছি, তারা সবাই স্বার্থপর। কেবল নিজের নিজের সুবিধে আদায় করে নেবার জন্যে ঘুর-ঘুর করছে। আমি যত দেখছি ততই মনটা বিষিয়ে উঠছে মরালী—আমার আর ভালো লাগছে না—

মরালী বললে—আমারই কি ভালো লাগছে বলতে চাও?

—তোমার যদি ভালো না লাগে তো কেন এখানে এলে? চলো না, কোথাও চলে যাই—। চলো না, এখান থেকে গেলে কেউ জানতে পারবে না, কেউ ধরতে পারবে না।

মরালী বললে—গেলে তো যাওয়া যায়। আগে হলে হয়তো যেতে পারতুম, কিন্তু এখন যে আটকে গেছি, এখন যে বাঁধা পড়ে গেছি একেবারে—

—কীসের বাধা তোমার? কে তোমার আছে এখানে?

—কী বলো তুমি? কেউ নেই? আমি যদি যাই তো হাতিয়াগড়ের ছোট বউরানীর কী হবে? তখন তো তাকে নিয়েই টানাটানি পড়বে—। আর তা ছাড়া তুমি তো জানো না, নবাবকে ছেড়ে আর যেতে পারবো না।

—যে তোমার সব দুঃখ-কষ্টের মূলে তার জন্যে তোমার এত দরদ?

—আমার কষ্টের জন্যে কি নবাব দায়ী? যদি দায়ী হতো তো আমি এখনই নবাবকে লাথি মেরে পালিয়ে যেতাম।

—তাহলে কে দায়ী?

—তবু তুমি তা' শুনতে চাও? তুমি যদি দেরি করে সেদিন বিয়ে করতে না আসতে, তাহলে আমিই কি ছোটমশাইএর বাড়িতে বিয়ের আসর থেকে পালিয়ে যেতাম, না রাণীবিবি সেজে চেহেল্-সুতুনেই আসতে হতো?

কান্ত বললে—একটা অপরাধ করে ফেলেছি বলে তার গুণোগার তো এতদিন ধরেই দিচ্ছি। আর কত গুণোগার দেবো বলো?

—সে কথা এখন আর ভেবে কী হবে।

—গুণোগারেরও তো একটা শেষ আছে! সেই জন্যেই তো মুর্শিদাবাদে একবার গণৎকারকে নিজের হাতটা দেখিয়েছিলুম।

মরালী বলেছিল—ও-সব কথা অনেকবার শুনেছি, যা হবার নয় তা নিয়ে কথা বলতে ভালো লাগে না। যখন চেহেল্-সুতুনেই চিরকাল থাকতে হবে তখন চেহেল্-সুতুনের কী করে ভালো হয় সেই কথা ভাবাই ভালো। আমি কেবল ভুলতে চেষ্টা করি যে আমি মরালী—

—কিন্তু সেই উদ্ধব দাস? সে কী করেছে? তার কী অপরাধ!

—অপরাধ তার নয়, অপরাধ আমার কপালের, আর যে মুখপোড়া আমাকে তৈরি করেছিল সেই ভগবানের—! তোমার পায়ে পড়ি, এ-সব কথা আর তুলো না

আমার সামনে। আমার ও-সব কথা ভাবতেও ভালো লাগে না। নইলে যেদিন ওরা আমার সিঁথির সিঁদুর তেল দিয়ে ঘষে ঘষে মুছে দিয়েছে, সেই দিনই আমার নাম মরিয়ম বেগম হয়ে গেছে। ধরে নাও আমি মরে গেছি—

—ছি!

বলেই কান্ত মরালীর মুখখানা নিজের হাত দিয়ে চাপা দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু মরালী তার আগেই নিজের ঘরের ভেতর চলে গিয়েছিল। যাবার সময় বলে গিয়েছিল—আমি নবাবের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি, দেখো কেউ যেন এ-সময়ে ওখানে না ঢোকে—

তারপর নানীবেগমসাহেবা আর মরিয়ম বেগম নবাবের সঙ্গে দেখা করেছিল। ইতিহাসের সে এক সন্ধিক্ষণ। নবাব তখন নিঃসহায় সর্বস্বান্তের মত চুপ করে অপেক্ষা করছিল। নানীবেগম আর মরিয়ম বেগম ঘরে যেতেই চমকে উঠলো।

বললে—তোমরা কেন এসেছো?

নানীবেগম আগে উত্তর দিলে। বললে—তোর জন্যেই ভেবে ভেবে এখানে চলে এলুম মীর্জা, তোর জন্যে আমাদের বড় ভাবনা হয়েছিল রে, তুই একলা আছিস্—

নবাব বললে—কে বললে একলা আছি, এখানে আমার সবাই আছে, জগৎ শেঠজী নিজের দেওয়ানকে পাঠিয়ে দিয়েছে, ইরাজ খাঁ সাহেব আছেন, কে নেই আমার? তুমি কি ভাবো তোমার মীর্জা সেই ছেলেমানুষই আছে আগেকার মতন? মীর্জা মসনদ চালাতে পারে না?

—না না, সে-কথা বলবো কেন? কিন্তু মরিয়ম মেয়ে যে বললে তোর খুব বিপদ—

—কীসের বিপদ? নবাব এতক্ষণে মরিয়ম বেগমের দিকে চেয়ে দেখলে!

মরিয়ম বেগম বললে—আমি জানি আপনার বিপদ জাঁহাপনা—

—তুমি চেহেল্-সুতুনে বসে কী করে জানলে এখানে আমার বিপদ?

মরিয়ম বেগম বললে—আমি চেহেল্-সুতুনে বসেই তো জানতে পেরেছিলুম জাঁহাপনা যে, সফিউল্লা সাহেব আপনার সর্বনাশ করতে চাইছে, আমি তো সেই-দিনই জাঁহাপনাকে সাবধান করে দিয়েছিলুম! তবে আজ কেন আমাকে এ-কথা জিজ্ঞেস করছেন? আপনি উমিচাঁদ সাহেবকে জিজ্ঞেস করলেই সব টের পেতেন। আপনি জিজ্ঞেস করেছিলেন তাঁকে?

—দেখো...

নবাব চারদিকে অসহায়ের মত চাইলো। তারপর বললে—জীবনে যা চাওয়া যায় সব কি পাওয়া যায়? সবাই কি বন্ধু পায়? আমি শত্রু পেয়েছি, দুশমন পেয়েছি, আমাকে তাদের নিয়েই কাজ চালাতে হবে।

—কিন্তু আপনি তাঁকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন না কেন, সে-চিঠি তিনি লিখেছেন কিনা? কিংবা সে-চিঠির মানে কী?

নবাব কী বলবে যেন বুঝতে পারলে না। তারপর বললে—আমাকে যখন ওদের নিয়েই চালাতে হবে তখন ওদের কথাই আমাকে শুনতে হবে!

—কেন, ওরা ছাড়া কি আর কোনো ভালো লোক নেই? ওদের সকলকে ছাড়িয়ে দিয়ে অন্য লোক রাখুন না!

—অত সোজা নয় বেগমসাহেবা! নবাব হলে তুমিও বুঝতে পারতে অত সহজে কাউকে ছাড়ানোও যায় না, অত সহজে কাউকে বহাল করাও যায় না।

মরিয়ম বেগম বললে—সে কি? কেউ দোষ করলেও তাকে বরখাস্ত করা যাবে না? তাহলে আপনি কীসের নবাব জাঁহাপনা?

—লোকে বাইরে থেকে তাই-ই জানে বটে! লোকে জানে আমি সকলের দণ্ড-মুণ্ডের কর্তা। আমি ইচ্ছে করলে যাকে যা-খুশী তাই-ই করতে পারি, নবাব হয়েও আমি যা-খুশী তাই-ই করেছি। এই নানীজী সমস্ত জানে। আমি ঘসেটি বেগমকে এখনো নজরবন্দী করে রেখেছি। আমি মীরজাফর খাঁর জায়গায় মীর মদনকে বসিয়েছি। আমার নিজের দেওয়ান মোহনলালকে আমি দেওয়ান-ই-আলা, মোদার-উল্-মহান্ করেছি, গোলাম হোসেন খাঁকে মুলুক থেকে তাড়িয়েছি। কিন্তু তাতে ফল ভালো হয়নি বেগমসাহেবা, তাতে আমার বদনামই হয়েছে—! আর তা ছাড়া দেখো না, আমি তো তোমাকেও তোমার খসমের কাছ থেকে নিয়ে এসে চেহেল্-সুতুনে পুরে রেখে দিয়েছি!

মরিয়ম বেগম বললে—কেমন চেহেল্-সুতুনে পুরে রেখেছেন তা তো দেখতেই পাচ্ছি, তাই তো আপনার অনুমতি না নিয়েই আমি ক্লাইভ সাহেবের সঙ্গে গিয়ে দেখা করে এলুম—

নবাব বললে—তা জানি—

—কিন্তু কই, আমি আপনার শত্রুর কাছে গিয়েছিলুম বলে আমাকে তো জিজ্ঞেস করলেন না, কেন সেখানে গিয়েছিলুম!

নবাব নানীবেগমসাহেবার দিকে তাকালে। বললে—নানীজী, বলতে পারো যাদের আমি শাস্তি দিই তারা কী জন্যে আমাকে এত ভালোবাসে? আর যাদের আমি কোনো ক্ষতি করি না তারা কেন আমার শত্রুতা করে? এই ইংরেজরা, এদের সব কিছু শর্তে আমি তো রাজি হয়ে ওদের তাবাকুফে দস্তখত করে দিয়েছি, তবু কেন ওরা শর্ত ভাঙতে চাইছে এখন?

নানীবেগম বললে—কিন্তু কেন তুই ওদের বিশ্বাস করতে গেলি মীর্জা?

—বিশ্বাস করলুম কি সাধে! ওদিকে আহ্মদ শা আব্দালী পাঠানটা যে দিল্লী হয়ে আমার মুলুকে আসছে! দু'দিকে দুটো শত্রু নিয়ে আমি কেমন করে সামলাবো!

মরিয়ম বেগম কথার মাঝখানে বাধা দিলে।

বললে—জাঁহাপনা, নবাব কখনো দেখিনি জীবনে, আর হয়তো কখনো পরে দেখবোও না। কিন্তু একটা কথা আপনাকে বলে যাই জাঁহাপনা, আপনার নবাবী যদি না টেঁকে তো সে আপনার নিজের জন্যেই—

—আমি বড় বেশি অত্যাচারী, তাই না?

মরিয়ম বেগম বললে—না, আপনার বড় বেশি সহ্য-ক্ষমতা!

—লোকে কিন্তু অন্য কথা বলে। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র থেকে শুরু করে জগৎ শেঠজী পর্যন্ত সবাই বলে, আমি নাকি বড় অত্যাচারী, বড় অহঙ্কারী, বড় বদ্‌মিজাজী! বলে, আমার অহঙ্কার নাকি নবাবী পাবার পর আকাশ ছুঁয়ে গেছে—

মরিয়ম বেগম বললে—লোকে যা-ই বলুক, আমি নিজে যা জানি তাই-ই বললুম; এত সহ্য-ক্ষমতা ভালো নয়! ক্লাইভ সাহেবের ছাউনিতে যাবার জন্যে আমাকে আপনার শাস্তি দেওয়া উচিত ছিল!

নবাব বললে—শাস্তি দিতে গেলে তো আমাকে নিজের মা'কেই আগে বেশি শাস্তি দিতে হয় বেগমসাহেবা। কিন্তু কী শাস্তি তুমি চাও বলো, শাস্তি দেবার ক্ষমতাটা এখনো আমার হাতেই আছে!

—কিন্তু আমি কী অপরাধ করেছি তা তো শুনতে চাইলেন না আমার কাছে?

—তুমি নিজেই বলো তুমি কী অপরাধ করেছো?

—আমি যদি নিজে নিজের অপরাধ স্বীকার না করি তো আপনি তা জোর করে আদায় করে নিতে পারবেন না?

নবাব বললে—তুমি হাসালে বেগমসাহেবা। এককালে তাও করেছি। লোকের কাছ থেকে জোর করে অপরাধ স্বীকার করিয়ে নিয়েছি। লোকে আমার নামে ভয়ে থর থর করে কেঁপেছে। হয়তো এখনো কাঁপে। নবাব-বাদ্‌শাদের ভয়ে লোকে না কাঁপলে মসনদ চালানোই হয়তো যায় না। কিন্তু এতদিন পরে ভাবছি, এবার না-হয় ভয় না করে আমাকে একটু ভালোই বাসুক! তাতেও যদি একটু শান্তি পাই।

—তাতে আপনি না-হয় বাঁচলেন, কিন্তু আপনার মসনদ? আপনার মসনদের জন্যেই তো মুর্শিদাবাদ থেকে আপনি এতদূরে এসেছিলেন ইংরেজদের সঙ্গে লড়াই করতে—আপনার মসনদের জন্যেই আপনার মাসীকে নজরবন্দী করে রেখেছেন, শওকত জঙকে খুন করেছেন, হোসেন কুলীর নাম পর্যন্ত মুছে ফেলেছেন। এতদিন যা-কিছু করেছেন সব তো নিজের মসনদের জন্যেই করে এসেছেন! আপনি আর আপনার মসনদ কি আলাদা?

নবাব কী যেন ভাবলে কিছুক্ষণ। তারপর বললে—কিন্তু তখন যে ভেবে-ছিলাম মসনদ পেলেই আমি সুখ পাবো, শান্তি পাবো, আনন্দ পাবো—

—আর এখন?

—এখন ভাবছি সেই দিনগুলোই যেন বেশি ভালো ছিল, যখন মসনদ পাইনি।

—কিন্তু সত্যিই কি জাঁহাপনা সেই দিনগুলো ফিরে পেতে চান? মসনদ পাবার আগেকার দিন?

—সে কি আর পাওয়া সম্ভব?

মরিয়ম বেগম বললে—সবই সম্ভব জাঁহাপনা, সম্ভব সবই।

—কী করে তা সম্ভব বলে দাও—

—আপনি সকলকে এক সঙ্গে বরখাস্ত করে দিন। আমি যাদের-যাদের নাম করবো তাদের সকলকে বরখাস্ত করে দিন!

নবাব বললে—এখন ফরাসীদের সঙ্গে ইংরেজদের লড়াই বেঁধেছে, ওদিকে আহ্‌মদ শা আব্‌দালী বাঙলা মুলুকের দিকে আসছে, এই সময়ে সকলকে বরখাস্ত করবো কী করে?

—তাহলে আপনি হুগলীর ফৌজদারকে অন্তত বরখাস্ত করে দিন!

—কে? নন্দকুমার? ও তো বিশ্বাসী লোক বেগমসাহেবা!

মরালী বললে—না—

—কী করে জানলে তুমি?

—ফৌজদার সাহেব উমিচাঁদ সাহেবের হাত দিয়ে বারো হাজার টাকা ঘুষ নেবার কড়ার করেছে।

—কেন? আমি তো তাকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে ফৌজ পাঠাবার হুকুম দিয়েছি।

—আপনার হুকুম যাতে না মানে ফৌজদার সাহেব, তাই এই কড়ার।

—কিন্তু এ-কথা তুমি কী করে জানলে?

—এখানে ডেকে আনুন তাকে।

—কিন্তু তুমি কী করে জানলে আগে তাই বলো?

মরিয়ম বেগমসাহেবা বললে—তা আমি বলবো না জাঁহাপনা, নিজামতের যেমন চর থাকে, বেগমসাহেবারাও তেমনি চর পোষে, তা জানেন তো!

—তুমিও কি চর পুষেছো?

—আমার চর পুষতে হয়নি জাঁহাপনা, নিজামতে আমারও পেয়ারের লোক আছে, আর আমাকে খবর জোগায়, নবাবের ভালোর জন্যেই মুফত্ খাটে।

—কে সে? নাম কী তার?

—আপনি নাম জিজ্ঞেস করবেন না জাঁহাপনা, সে আপনার এখানেই আছে এখন—

নবাব মাথা উঁচু করে সোজাসুজি মরালীর দিকে চাইলে।

জিজ্ঞেস করলে—সত্যি বলছো?

—আগে ফৌজদার সাহেবকে এখানে ডাকুন—

কান্ত এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব শুনছিল। এবার চমকে উঠলো। কার কথা বলছে মরালী! সত্যি না মিথ্যে কে জানে! যদি মরালী প্রমাণ না করতে পারে, যদি প্রমাণ হয় যে মরালীর কথা মিথ্যে! সমস্ত সাজানো কথা! বাইরে যেন কার পায়ের শব্দ হলো। হুকুম হয়েছিল যতক্ষণ নবাব বেগমসাহেবাদের সঙ্গে কথা বলবে ততক্ষণ কেউ নবাবের ছাউনির পাশে যেতে পারবে না। সমস্ত বাগান-বাড়িটাতে সবাই সন্ত্রস্ত হয়ে আছে। এতদিন চলছিল একরকম। সন্ধি হয়ে গেছে ফিরিঙ্গীদের সঙ্গে। এখন আর কোনো গোলমাল নেই। সবাই গা এলিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু বেগমসাহেবারা আসার পর থেকেই আবার সব চন্‌মন্ করে উঠেছে।

কান্ত পর্দার কাছ থেকে সরে এসে দেখলে, শশী।

—তুমি এখানে?

শশীর মুখটা গম্ভীর গম্ভীর, তার মনটা কয়েকদিন থেকেই খারাপ হয়ে গিয়েছিল। লড়াই থেমে গেলেই চাকরি চলে যাবে বলে সারাদিন মন-মরা হয়ে থাকে।

—তোমার সঙ্গেই দেখা করতে এসেছিলাম ভাই, কী খবর?

কান্ত বললে—খবর কিছু নেই—

তবু শশী নড়লো না। একটু থেমে বললে—বেগমসাহেবা কী জন্যে এখানে এসেছে ভাই?

কান্ত বললে—তা জানি না—

—আমার কাছে তুমি লুকোচ্ছ ভাই, নিশ্চয়ই তুমি সব জানো। তুমি তো সব সময় নবাবের পাশে পাশে থাকো, আমি দেখছি।

—তা আমার কাজই তো নবাবের জুলুস দেখা, নবাবের পাহারাদারি করা।

শশী বললে—কিন্তু আমি যে দেখেছি তুমি বেগমসাহেবার সঙ্গে কথা বলছিলে?

—আমি? কখন দেখলে তুমি?

শশী বললে—না, আমি দেখেছি। তুমি যে পর্দা তুলে বেগমসাহেবার ঘরের ভেতর ঢুকলে! তোমার সঙ্গে বেগমসাহেবার বুঝি জানাশোনা আছে? বলো

না, আমার কাছে কেন মিছিমিছি লুকোচ্ছ? আর আমি তো কারোর কাছে বলতে যাচ্ছি না—। আমি আমার নিজের চাকরি নিয়েই ভাবছি কেবল, আমার অন্য কোনো চিন্তাই নেই—

শেষ পর্যন্ত শশী নাছোড়বান্দা। কিছুতেই যাবে না। শেষে কান্তই চলে গিয়েছিল। কেমন যেন সন্দেহ হয়েছিল কান্তর মনে। লোকটা চর-টর নয় তো কারো! বলেছিল—আমার এখন কাজ আছে ভাই, আমি চলি—

তারপর যখন রাত্রে সব নিরিবিলি হয়ে গেল, নবাবের খানা-খাওয়াও হয়ে গেছে, তখন ছটফট্ করতে লাগলো কান্ত। ছাউনিও পাতলা হয়ে গেছে সেদিন। উমিচাঁদ সাহেব আর ওয়াট সাহেব দুজনেই কাশিমবাজার কুঠির দিকে চলে গেছে। ইরাজ খাঁও আর বেশি সময় নষ্ট না করে সোজা মুর্শিদাবাদের দিকে রওনা দিয়েছে। দেওয়ান রণজিৎ রায়ও আর বেশি দিন থাকবার লোক নয়। তাকেও সব খবরাখবর দিতে হয়ে জগৎশেঠজীকে।

কান্ত বাইরে শব্দ করতেই পর্দার ভেতর থেকে খস্ খস্ শব্দ হলো।

—আবার কী? তোমার কী একটা কাণ্ডজ্ঞান পর্যন্ত নেই?

গলা নিচু করে মরালী সামনে এসে কান্তকে পর্দার ভেতরে নিয়ে গেল।

কান্ত বললে—আমার বড় ভয় করছে মরালী—

—কী হয়েছে? ভয় করছে তো আমার কাছে কেন? ফৌজের লোকজনদের কাছে যাও না, ওদের কাছে কামান আছে, বন্দুক আছে—

—না, সে জন্যে নয়। তুমি নবাবের সঙ্গে যা-যা কথা বলেছিলে আমি সব লুকিয়ে লুকিয়ে শুনেছি! এখন কী হবে?

—কীসের কী হবে?

—তুমি প্রমাণ করতে পারবে?

—কীসের প্রমাণ?

—ওই যে হুগলীর ফৌজদার ঘুষ নিয়েছে ক্লাইভ সাহেবের কাছ থেকে! যদি প্রমাণ হয় যে তুমি মিছে কথা বলেছো, তখন? তখন উমিচাঁদ সাহেব কি তোমার রক্ষে রাখবে ভেবেছো? ও যে সর্বনেশে লোক, তুমি ওকে চেনো না!

—কে তোমাকে বললে আমি চিনি না?

কিন্তু তুমি তো দেখোনি ওকে। ও বড় জাঁহাবাজ লোক! ও লোকটার দাড়ি দেখলেই আমার ভয় করে। তোমার কাছে ছোরাটা সব সময় রেখে দিও, কালকের মতন আবার যেন ফেলে এসো না কোথাও—

—ঠিক আছে, রাত হয়েছে, তুমি এবার ঘুমোও গে, যাও—

বলে কান্তকে ঠেলে বাইরে বার করে দিয়ে মরালী পর্দাটা এঁটে দিলে ভেতর থেকে।

শেষ রাত্রের দিকেই তোড়-জোড় শুরু হয়ে গিয়েছিল পেরিন সাহেবের বাগানে। অ্যাড্মিরাল ওয়াটসন্ এসেছিল রাত থাকতে। সেপাইরা সেজেগুজে নিয়েছে। ওয়াটসন্ আসতেই ক্লাইভ একেবারে তাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরেছে।

—হোয়াটস্ আপ্ রবার্ট? কী হলো তোমার?

রবার্ট ক্লাইভ আনন্দে অধীর হয়ে গেছে একেবারে। ছাড়তেই চায় না ওয়াটসন্‌কে। এতদিনের ঝগড়া দ্‌জনের, তা যেন রবার্ট ভুলেই গিয়েছে এক মুহূর্তে।

—ওয়াটসন্‌, এখ্‌নি দ্যাট্‌ স্কাউণ্ড্রেল অব্‌ এ বিস্ট্‌ চিঠি দিয়েছে। নন্‌-কুমার রাজি!

—রাজি মানে? এগ্রীড্‌?

—হ্যাঁ, বারো হাজার টাকা তাকে ব্রাইব্‌ দিতে হবে। তাহলে সে আর আমাদের এগেন্‌স্টে আর্মি পাঠাবে না। আজকেই আমরা চন্দননগর অ্যাটাক্‌ করবো! বি রেডি। নাউ অর নেভার!

—কই, চিঠি দেখি!

ক্লাইভ সাহেব টেবিলের ওপর থেকে উমিচাঁদের চিঠিখানা নিয়ে দেখাতে গেল। অনেক কাগজপত্রের ভিড় তার ওপর। ইংলণ্ডের সিলেক্ট কমিটিকে যে-চিঠি লিখেছে, বাবাকে যে চিঠি লিখেছে, বাবার কাছ থেকে যে চিঠি এসেছে তাও রয়েছে।

—এই যে, এই নাও!

'গ্‌লাব্‌-কে-ফ্‌লে'র কথা লেখা যে-চিঠিটা উমিচাঁদ লিখেছিল সেটা নিয়ে ক্লাইভ ওয়াটসন্‌কে দেখালে।

ওয়াটসন্‌ চিঠিটা পড়ে বললে—আমাকে তো তোমার এ-প্ল্যান আগে বলোনি!

—না, আগে বলিনি, এখন সাক্‌সেস্‌ফ্‌ল হয়েছি বলে বলছি।

—তুমি কী লিখেছিলে?

—আমার এই হলো ফার্স্ট লেটার, এই লেটার পেয়ে উমিচাঁদ আমাকে সব লিখলে—

—উমিচাঁদের চিঠিটা কোথায়? দেখি—

—ক্লাইভ উমিচাঁদের চিঠিটা খ্‌জতে লাগলো। কোথায় গেল সে-চিঠিটা! হোয়ার ইজ দ্যাট্‌ লেটার? ক্লাইভের ম্‌খটা শ্‌কিয়ে গেল! সে চিঠিটা কোথায়?

—কেউ চুরি করেনি তো?

—কে আবার চুরি করবে? আমার ঘরে তো কেউ আসেনি!

—কেন, সেই যে নবাবের বেগম এসে বসেছিল তোমার ঘরে, সে নিয়ে যায়নি তো?

—কিন্তু...

কিন্তু হঠাৎ ক্লাইভের মনে পড়লো। বেগমসাহেবাকে একলা ঘরে বসিয়ে ক্লাইভ বাইরে ওয়াটসনের সঙ্গে কথা বলতে গিয়েছিল, সেই সময়ে বেগমসাহেবা চিঠিটা নিয়ে যায়নি তো! সর্বনাশ! গড্‌ সেভ্‌ মাই সোল্‌! সত্যিই কি চিঠিটা নিয়ে ব্ল্যাকমেল করবে নাকি! কথাটা ভাবতেই রবার্ট ক্লাইভের ব্‌কটা ধড়াস করে উঠলো তাহলে কী হবে!
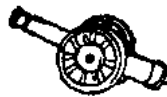
অ্যাড্‌মিরাল ওয়াটসন্‌ দেখছিল এতক্ষণ। রবার্টকে যতদিন ধরে দেখছে ততদিনই কেমন অবাক লাগছে। রবার্ট শ্‌ধ্‌ এখানে যেন য্‌দ্ধ করতে আসেনি,

এ-কাণ্ট্রিটাকে জানতেও এসেছে। সেই ম্যাড্রাস থেকেই দেখেছে ওয়াটসন্। ছেলেটা কখন কী করে, কখন কী মতলব আঁটে, তা কারো জানবার উপায় নেই। হয়তো নিজেই জানে না। কিন্তু যার হাতে এতগুলো লোকের জীবন নির্ভর করছে, যার ওপর কোম্পানীর ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে, তার পক্ষে কি এত খেয়ালী হলে চলে! হঠাৎ বলা নেই কওয়া নেই, এখানকার ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে গল্প করতে বসে যায়। ভিলেজের লোকরা রাস্তায় হুঁকো নিয়ে তামাক খেতে খেতে চলেছে, রবার্ট দেখতে পেয়েই দাঁড়িয়ে যায়। বলে—হোয়াট ইজ্ দিস? এটা কী?

নেটিভরাও ভয় পেয়ে যায় প্রথমে। তারপর বলে—এ হুঁকো—

—হুঁকো?

বলে নিজেই সেটা নিয়ে তামাক খেতে যায়।

নেটিভরা আপত্তি করে। বলে—না হুজুর, নিও না—

রবার্ট বলে—দেখি না, আমি স্মোক করতে পারি কি না—

একটা হুঁকোয় অন্য জাতের লোক মুখ দিলে তাতে যে জাত চলে যায় তা রবার্ট বোঝে না। হুঁকোয় মুখ দিলে জাত চলে যাবে কেন তা তার কাছে দুর্বোধ্য। শেষকালে আবার হরিচরণকে দিয়ে একটা হুঁকো কিনিয়ে আনে। হরিচরণকে দিয়ে তামাক সাজায়, টিকে ধরায়, ধোঁয়া টানে, তারপর মুখ দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে মহা খুশী। হো-হো করে হাসে।

ওদিকে আবার মেয়েদের দেখলে তাদের সঙ্গে কথা বলতে যায়। নেটিভ মেয়েরা গঙ্গায় স্নান করতে আসে, মাটির কলসীতে জল নিয়ে বাড়ি যায়, পুকুরে কাপড় কাচতে আসে, রবার্ট সেই দিকে হাঁ করে চেয়ে দেখে।

ওয়াটসন্ বলতো—ওদের দিকে চেয়ো না অমন করে, ওরা আমাদের ভয় পাবে—

—কেন ভয় পাবে কেন, আমি কি ওদের খেয়ে ফেলবো?

—না, ওরা ভাববে তুমি ওদের রেপ্ করবে!

রবার্ট বলতো—হোয়াই? ওরা বিউটিফুল, তাই ওদের দিকে চেয়ে দেখছি—

ওয়াটসন্ বলতো—না, তুমি নেটিভদের দিকে চেয়ো না, ওরা আমাদের ইংলিশ লেডীদের মতন নয়, ওরা পুরুষদের স্লেভ্—

—ইজ্ ইট্?

—হ্যাঁ, দেখো না, নেটিভ্রা ওদের মেয়েদের বাইরে বেরোতে দেয় না, নেটিভরা কতগুলো বিয়ে করে, ওরা স্লেভ্স্—

রবার্ট বলতো—কিন্তু ওরা কত বিউটিফুল তা জানে না ওরা?

পরে বুঝেছিল রবার্ট—নেটিভ মেয়েরা অত বিউটিফুল বলেই নেটিভরা অমন করে তাদের ঘরের মধ্যে লুকিয়ে রাখে। পাছে তাদের বিউটিফুল চেহারা দেখে কেউ রেপ্ করে, কেউ তাদের কিড্ন্যাপ্ করে, তাই তারা মাথায় ঘোমটা দিয়ে মুখ ঢেকে রাখতে বলে। হোয়াট এ স্ট্রেঞ্জ পিপল্, হোয়াট এ স্ট্রেঞ্জ ল্যাণ্ড্!

অথচ রবার্ট বিয়ে করেছে, ছেলে-মেয়ে হয়েছে তার। বউকে চিঠি লেখে, বাবাকে চিঠি লেখে। তাদের চিঠি না পেলে রবার্টের মন খারাপ হয় আবার।

বলে—এখনো মেল্ এলো না কেন ওয়াটসন্—সাত মাস হয়ে গেল, নো লেটার ফ্রম্ পেগী!

পেগীর কাছ থেকে কোনো চিঠি না-এলেই রবার্ট ভাবতে বসে। এক মেলেই দুখানা তিনখানা চিঠি লিখে দেয়। সব কথা লিখতে মনে থাকে না। বাকি

কথাগুলো মনে পড়ে গেলেই আবার আর একখানা চিঠি লিখতে বসে। তোমরা কেমন আছ? এখানে মেয়েরা মাথায় ঘোমটা দেয়! তাদের বিউটিফুল মুখ দেখে পাছে কেউ তাদের কিড্ন্যাপ করে নিয়ে যায় তাই তারা বাড়ির মধ্যে দিনরাত থাকে, রাস্তায় বেরোয় না। শুধু গঙ্গায় স্নান করবার সময় তাদের দেখতে পাই। দে আর ভেরি বিউটিফুল। আর একটা ভারি মজার ব্যাপার করেছি আজ পেগী। আজ আমি হুঁকো খেয়েছি। একটা কোকোনাটের খোলের ওপর নল লাগিয়ে তার ওপর একটা মাটির পটে আগুন দেয়, তারপর কোকোনাটের মুখের গর্ততে দুটো ঠোঁট দিয়ে হাওয়া টানে। তখন মুখ দিয়ে ধোঁয়া বেরোয়। ভেরি প্লেজাণ্ট্। আমাদের সিগারের চেয়ে তা মিষ্টি, ভেরি সুইট্। মাই ডারলিং যখন দেশে ফিরে যাবো তখন এখানকার আরো কুইয়ার স্টোরি বলবো তোমাকে। এখানে গ্রীষ্মকালের গরমে আমি গায়ে জামা রাখতে পারি না। কিন্তু এখন খুব ঠাণ্ডা। খুব শীত। আমরা এবার চন্দননগর অ্যাটাক করতে যাচ্ছি। একদিন ফ্রেঞ্চদের সঙ্গে আমি ফাইট্ করেছি, আবার শুরু হবে ফাইট্। ডুপ্লের কথা তো তুমি জানো। ভেরি শ্রুড্ ম্যান্। এবারে হয়তো খবর পেয়ে আবার এই বেঙ্গলে আসবে। আবার মুখোমুখী ফাইট্ দিতে হবে। লাভ টু চিলড্রেন। থাউজ্যান্ড্ কিসেস্ টু ইউ, মাই ডারলিং!

আবার এদিকে দুজন নেটিভ্ উওম্যানকে নিজের কাছে রেখে দিয়েছে। ওয়াইফ্‌কে ভালোবাসে, আবার এদেরও ছাড়তে পারে না। আজকাল ড্রিঙ্ক্‌ও করে না। বীফ্ খাওয়াও ছেড়ে দিয়েছে।

ওয়াটসন্ একবার বলেছিল—তা ওদের রেখেছো কেন এখানে? ওদের ছেড়ে দাও না!

রবার্ট রেগে গিয়েছিল কথা শুনে। বলেছিল—কেন, ওরা এখানে থাকলে তোমার কী ক্ষতি হচ্ছে? আর কোম্পানীরই বা কী লোকসান হচ্ছে? ওরা তো আমার টাকায় খাচ্ছে—

—তোমার টাকায় খাচ্ছে?

রবার্ট বলেছিল—হ্যাঁ, তোমরা কি মনে করেছো আমি কোম্পানীর অ্যাকাউণ্টে ওদের খরচ দেখাচ্ছি? আমি আমার নিজের মাইনের টাকা খরচ করে যাকে ইচ্ছে খাওয়াতে পারি, তাতে কারো কিছু বলবার নেই। আর তাছাড়া, ওরা কতটুকু খায়? কতটুকু খেতে পারে দু'জনে?

ওয়াটসন্ বলেছিল—না, আমি তা বলছি না—

—না, ওদের মধ্যে আবার একজন তো উইডো। ইণ্ডিয়ার উইডোরা কিছুই খায় না। ফিশ্ খায় না, বীফ্ খায় না, মটন্ খায় না, এমন কি পেঁয়াজ পর্যন্ত খায় না, তা জানো?

ওয়াটসন্ বলেছিল—না, আমি তার জন্যে বলিনি, আমি বলেছিলুম আমার রেশনের জন্যে, রেশন তো আগে প্লেণ্টি পাওয়া যেত না—

—তা এখন তো পাওয়া যাচ্ছে। এখন তো যত চাও তত পাওয়া যাচ্ছে। এখন তো উমিচাঁদ যত কিনবো তত সাপ্লাই করবে! এখন তো আমাদের মাথায় হাত বুলিয়ে ওই বাস্টার্ড মেকিং হিউজ্ মানি—

তারপর থেমে আবার বললে—আর তা ছাড়া, তুমি যদি চাও তো আমি না-হয় নিজে না খেয়ে আমার রেশন থেকে ওদের খাওয়াতে পারি!

—না না, আমি তা বলিনি! কিন্তু এক-একবার ভাবি ওই উওম্যানদের কেন

তুমি রেখেছো এখানে? হোয়াট্ ফর?

—কেন রেখেছি তা তুমি জানো না? তোমাকে বলিনি?

—ওদের সেফ্ শেল্টার দেবার জন্যে! ওদের নিরাপদ করার জন্যে!

—ইয়েস, এক্জ্যাক্টলি সো! তুমি শুনলে অবাক হয়ে যাবে ওয়াটসন্, ক'দিন আগে আমার কাছে হাতিয়াগড়ের রাজা এসেছিল—

—কেন? কী বলতে?

—মহারাজা কিষণচন্দর তাকে পাঠিয়েছিল আমার কাছে, টু হেল্প্ হিম!

—হাউ? কী ভাবে?

—তার ওয়াইফ্কে বেঙ্গলের নবাব কিড্ন্যাপ্ করে নিজের হারেমে রেখে দিয়েছে।

—সে তো তারা এমন করেই! দ্যাট্ ইজ্ এ কাস্টম্ হিয়ার!

—কিন্তু তার ওয়াইফ্কে নবাব কন্ভার্ট করেছে, হিন্দুকে মহ্মেডান করেছে, নাম চেঞ্জ করে মরিয়ম বেগম নাম দিয়েছে।

—তারপর?

—তারপর তার হাজ্ব্যান্ড এখন তার ওয়াইফ্কে কী করে ফিরিয়া নেওয়া যায়, সেই পরামর্শ করতে এসেছিল আমার কাছে। বলছিল, নবাবকে ওভার-থ্রো করতে চেষ্টা করলে তারা সবাই আমাদের সঙ্গে কো-অপারেট করবে! আমাদের টাকা দিয়ে, মানুষ দিয়ে সব-রকমে হেল্প করবে। অল্ দি জমিন্দারস্ আমাদের সাইডে আসবে!

—সে তো আমরা জানি!

—না, শুধু জগৎশেঠ নয়, মীরজাফর আলি নয়, এমনকি পেটি জমিন্দারস্রাও উইল হেল্প্ আস্।

—দ্যাটস্ গুড্! কিন্তু নবাবকে ওভার-থ্রো করলে কে নিউ নবাব হবে? হু?

রবার্ট বলেছিল—সে পরের কথা। নবাব হবার জন্যে লোকে ইগার হয়ে বসে আছে। সবাই নবাব হতে চায়! সে-সব কথা এখন ভাববো না। আগে ফ্রেঞ্চদের এই এরিয়া থেকে তাড়াতে হবে। তা না হলে দে মে জয়েন দি নবাব!

—তুমি কী বললে হাতিয়াগড়ের রাজাকে?

—আমি কিছু কমিট্ করিনি। পুরো কথা হয়নি আমার সঙ্গে। তার আগেই নবাবের আর্মি আমাদের ক্যাম্পে কামান ছুঁড়তে লাগলো আর সঙ্গে সঙ্গে এখান থেকে চলে গেল। আই থিঙ্ক, আবার একবার আসবে আমার কাছে। আর সেই জন্যেই আমি এই লেডীদের ছাড়ছি না। লেট্ দেম্ রিমেন্ হিয়ার, নইলে রাস্তায় নবাবের নিজামতের লোক কেউ দেখে ফেললেই, ওদের কিড্ন্যাপ করে নবাবের হারেমে পুরে দেবে! তুমি নিজে দেখেছো তো, কী-রকম বিউটিফুল লেডী? বিউটিফুল নয়?

—আমি তো কোনো বিউটি দেখতে পাই না! যাক্ গে, আমার বিউটি দেখবার অত সময় নেই তোমার মত!

—আমার সময় কোথায় বিউটি দেখবার?

—দেখতে তো পাচ্ছি তোমার সময় রয়েছে। তুমি ওদের সঙ্গে গল্প করো, ওদের সঙ্গে তুমি জোক্ করো!

—নো!

ক্লাইভের নীল চোখ দুটো হঠাৎ কথাটা শুনে লাল হয়ে উঠতে যাচ্ছিল, কিন্তু আবার সামলে নিলে রবার্ট। এদের ওপর রাগ করে কোনো লাভ নেই। এরা তো ইণ্ডিয়াকে আমার চোখ দিয়ে দেখছে না! এরা তো ইণ্ডিয়ানদের মানুষ বলে মনে করে না। এরা এসেছে এ কাণ্ট্রি কন্‌কার করতে। আমিও এসেছি, কিন্তু কাণ্ট্রি কন্‌কার করতে হলে আগে যে কাণ্ট্রির লোকেদের হার্ট কন্‌কার করতে হয় তা এরা জানে না।

রবার্ট বললে—ও নিয়ে আমি তোমার সঙ্গে ডিস্‌কাস করতে চাই না। তারপর আমি ভেবেছিলুম হাতিয়াগড়ের রাজাকে ডাকিয়ে আনবো আমার কাছে। তার ওয়াইফ্‌কে নবাবের হারেম থেকে উদ্ধার করবার চেষ্টা করবো। যাতে নবাবকে বলে তাকে রাজার কাছে ফেরত দেয় সেই চেষ্টা করবো! কিন্তু না, এখন আর চেষ্টা করবো না ঠিক করলাম—

—না না, তুমি ওর মধ্যে যেও না রবার্ট! নবাবের ফ্যামিলি-অ্যাফেয়ার্স নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার নেই আমাদের। আমরা এখানে এসেছি বিজ্‌নেস করতে, টাকা কামাতে। নবাবের মর‍্যালিটি নিয়ে আমাদের কারবার নয়। লেট্‌ হিম্‌ ডু হোয়াট-এভার হি লাইকস্‌! কোন্‌ রাজার বউকে নিয়ে নবাব কী অ্যাডাল্‌ট্রি করছে, দ্যাট্‌স্‌ নট্‌ আওয়ার লুক-আউট!

রবার্ট বলেছিল—কিন্তু আমিও তো ম্যান্‌! ম্যান্‌ হিসেবে আমারও তো একটা মর‍্যাল ডিউটি আছে!

—তাহলে তুমি প্রীচার হলেই পারতে! মিশ্‌নারি-ফাদার হলেই পারতে!

রবার্ট বললে—না, তাও আমি করতুম। কিন্তু সেই হাতিয়াগড়ের রাজার ওয়াইফ আমার কাছে এসেছিল—

—হুঁ? সেই হাতিয়াগড়ের রাজার ওয়াইফ্‌? তোমার কাছে? কখন?

রবার্ট বললে—তুমি তাকে দেখেছো।

—আমি? আমি কখন দেখলুম?

—হ্যাঁ, তুমি দেখেছো! তুমি সেদিন এসে দেখলে আমার ঘরে একজন লেডী রয়েছে, বোরখা-পরা লেডী, সেই লেডীই হলো হাতিয়াগড়ের রাজার ওয়াইফ্‌!

—কিন্তু সে তো বেঙ্গলের নবাবের বেগম!

—তারই নাম মরিয়ম বেগম! দ্যাট্‌ ইজ্‌ দি ওয়াইফ অব্‌ হাতিয়াগড়ের রাজা! এখন নবাবের বেগম হয়েছে। আগে রাজার কথা শুনে তার ওয়াইফের ওপর সিম্‌প্যাথি হয়েছিল, কিন্তু এখন আর আমার কোনো সিম্‌প্যাথি নেই। খুব ধড়িবাজ! তখন বুঝতে পারিনি কী উদ্দেশ্য নিয়ে আমার কাছে এসেছিল। ভেবেছিলাম হারেম থেকে কী করে পালিয়ে যাওয়া যায় সেই পরামর্শ করতে এসেছে পারহ্যাপ্‌স্‌। কিংবা হয়তো হাজ্‌ব্যাণ্ডের কাছে খবর পাঠাবার কথা বলতে এসেছে—

ওয়াটসন্‌ উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছে।

—তাহলে কী জন্যে এসেছিল?

—খুব ধড়িবাজ মেয়ে। আমাকে বোকা বানিয়ে দিয়ে চলে গেল ওয়াটসন্‌। আমি বি-ফুলড্‌ হয়ে গেলাম। এখন বুঝছি সে আমাকে ধাপ্পা দিতে এসেছিল—

ওয়াটসন্‌ বললে—তাহলে সেই বেগমসাহেবাই তোমার চিঠি চুরি করে নিয়ে গেছে?

—ইয়েস!

তাহলে উমিচাঁদ খুব বিপদে পড়বে! উমিচাঁদ উইল্ বি কট্!

—হ্যাঙ্ আওয়ার উমিচাঁদ! উমিচাঁদের জন্যে আমার মাথাব্যথা নেই। উমিচাঁদ মে গো টু হেল্। নবাব আমাদের অ্যাটাক করতে পারে!

—বেগমসাহেবা তোমার এখান থেকে কোথায় গেল, জানো?

—নিশ্চয় নবাবের কাছে। আমাকে বলে গেল সে নবাবের পরামর্শ না নিয়েই এসেছে। আমার মনে হয় ওটা মিথ্যে কথা! নবাব আমাদের চিঠি পেয়েছে, চিঠি পেয়েই বেগমকে এখানে পাঠিয়েছে! আমাদের ক্যাম্পের সব খবরাখবর জানবার জন্যে!

—কিন্তু সে-ই যে মরিয়ম বেগম তা তুমি জানলে কী করে? মে বি সাম্‌বডি এল্‌স্! অন্য কেউ তো হতে পারে! হয়তো মরিয়ম বেগমের নাম করে কোনো পুরুষমানুষ এসেছিল। তুমি কি তার চেহারা দেখেছো?

—কী করে দেখবো? বোরখা পরা ছিল যে!

—বোরখা খুলে দেখলে না কেন?

—কিন্তু আমি তো তাকে সন্দেহ করিনি!

—সেইটেই তো তোমার উইক্‌নেস্ রবার্ট! আমি কতদিন থেকে বলেছি মেয়েদের বিশ্বাস করো না! এই যে তুমি এখানে নেটিভ উওম্যানদের ক্যাম্পের ভেতরে রেখেছো, ওরাও তো স্পাই হতে পারে। নবাবের স্পাই হতে পারে। হতে প্যারে আমাদের সমস্ত মুভমেণ্টের খবর নেবার জন্যে নবাব ওদের পাঠিয়ে দিয়েছে।

ক্লাইভ কী যেন ভাবলে খানিকক্ষণ। তারপর বললে—কিন্তু তা কী করে হতে পারে? দে আর সো গুড্!

—স্পাইরা তো সব সময়েই ভালো হয়!

—কিন্তু আমি যে ওর হাজ্‌ব্যান্ডকে চিনি। হি ইজ এ পোয়েট! পোয়েটটা খুব ভালো লোক।

—পোয়েট তোমাকে কি বলেছে যে, ও ওর ওয়াইফ্?

—হ্যাঁ বলেছে। কিন্তু ওয়াইফ্ যেতে চায় না হাজব্যান্ডের কাছে! হয়তো পছন্দ হয়নি হাজ্‌ব্যান্ডকে।

—কোথায় যেতে চায়?

—ওর ফাদারের কাছে!

—তা ওরা একলা বোটে করে কোথায় যাচ্ছিল?

—ওরা বলছে তীর্থ করতে। হিন্দু লেডী তো। খুব ধার্মিক। জানো ওয়াটসন্, ওরা বীফ খায় না, ফাউল খায় না, ড্রিঙ্ক করে না। ওরা কী করে স্পাই হবে?

ওয়াটসন্ বললে—তবু, তুমি উমিচাঁদকে চিঠি লেখো—

—কী জন্যে!

—লিখে দাও যে তার একটা চিঠি এখানে তোমার টেবিল থেকে চুরি হয়ে গেছে। মরিয়ম বেগমসাহেবা চুরি করে নিয়ে গেছে!

বাইরে একটা শব্দ হতেই ক্লাইভ চেয়ে দেখলে। আর্মির লোক। মেসেঞ্জার।

—কী খবর ফ্লেচার?

ফ্লেচার ঘরে ঢুকলো।

—আমি এখনি আসছি হুগলীর ফৌজদারসাহেবের কাছ থেকে।

—সেই লেটারটা ডেলিভারি দিয়েছো?

—ইয়েস স্যার। কিন্তু শুনলাম নবাব ফৌজদারসাহেবকে নিজের ক্যাম্পে ডেকে পাঠিয়েছে।

—হোয়াট ফর? কী জন্যে?

—তা জানি না। কিন্তু খুব আর্জেণ্ট কল্! ফৌজদারসাহেব এখানেই আসছে।

—এখানে?

—না, এখানে নয়। নবাবের ক্যাম্পে! নবাবের সঙ্গে দেখা করতে!

—অল্‌রাইট্! তুমি ওয়াচ্ রাখো, যাও—

ফ্লেচার চলে যেতেই অ্যাড্‌মিরাল ক্লাইভের দিকে চাইলে। বললে—এখন কী করতে চাও বলো, হোয়াট নেক্সট্?

ক্লাইভ হঠাৎ এক মুহূর্তে আবার সেণ্ট্ ডেভিড্ ফোর্টের কম্যাণ্ডার হয়ে উঠলো।

বললে—এই সুযোগ! দিস ইজ্ দি অপারচুনিটি ওয়াটসন্! নাউ অর নেভার! আমি চন্দননগর অ্যাটাক করবো!

হুগলীর ফৌজদারসাহেব তখন নবাবের ছাউনির দরবারে নবাবের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। পাশে উমিচাঁদ।

নবাবের সামনে দাঁড়িয়ে হুগলীর ফৌজদারও ভয়ে থর থর করে কাঁপছে। মা জগদম্বার ভক্ত ছেলেকে যেন পাঁঠার মত বলির জন্যে দেবীর সম্মুখে আনা হয়েছে। শুধু ফৌজদার কেন, মহা-মহা রথী-মহারথীদেরও কতবার লাঞ্ছিত হয়ে ফিরে যেতে হয়েছে নবাবের দরবার থেকে। দশ পুরুষের জমিদারকেও বকেয়া খাজনার দায়ে নবাবের কয়েদখানায় আটক থাকতে হয়েছে। নবাবের কাছে এলে জগৎশেঠের মত কোটিপতির বুকটা দুরদুর করে কাঁপে। কুর্নিশ করতে সামান্য ত্রুটি হলেও ধমক খেতে হয় তাদের সকলকে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মানুষের কাছে দিল্লীশ্বর যা, বঙ্গেশ্বর যা, জগদীশ্বরও তাই। তুমি নবাব, তুমিই দেবতা। তোমার পাপ বলে কোনো কিছু থাকতে নেই। তুমি নিষ্পাপ নির্দোষ। তোমার মেহেরবানিতেই আমরা বেঁচে আছি। তোমার মর্জি হলে তুমি আমাকে বাঁচিয়ে রাখতেও পারো, খুনও করতে পারো। তোমার হুকুমের ওপরে আপীল নেই। তুমি খোদাতালা, তুমি আল্লাতালাহ্ আর আমি কীটানুকীট দাসানুদাস বশংবদ। তুমি আমাকে রাখলে রাখতে পারো, মারলেও মারতে পারো। সব দোষ আমার, সব গুণাহ্ আমার, সব অপরাধ আমার।

যে আমীর ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে রোজ ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করে, সে প্রথমেই বলে—হে মা কালী, হে মা জগদম্বা, আমাকে দেখো মা, নবাবের বিষ-নজরে যেন না পড়ি। নবাব যেন খুশী থাকে আমার ওপর।

যে জমিদার ভোর বেলা ঘুম থেকে উঠে রোজ ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করে, সে প্রথমেই বলে—হে মা কালী, হে মা জগদম্বা, আমাকে দেখো মা, নবাবের বিষ-নজরে যেন না পড়ি। নবাব যেন খুশী থাকে আমার ওপর।

শুধু আমীর-ওমরাহ নয়, শুধু জমিদার-তালুকদারই নয়, তামাম হিন্দুস্থানের মানুষের ওই আর্জি। আজ না-হয় সকাল হলো, আজ না-হয় বেঁচে আছি। কিন্তু কাল সকাল পর্যন্ত বেঁচে না-থাকতেও পারি। কাল পর্যন্ত তুমি আমাকে দেখো। কাল যদি বেঁচে থাকি তো তখন পরশুর কথা পরশু বলবো। ১৭০৭ সালে বাদশা আওরংজেবের মৃত্যুর পর থেকেই জীবন ঐশ্বর্য আশা আস্থা সব কিছুই যেন মানুষের মনে ক্ষণস্থায়ী হয়ে গিয়েছিল। এই যে আজ ক্ষেত থেকে ধান কেটে নিয়ে এসে আমার মরাইতে রাখলুম, কাল সকালবেলা ডিহিদার এসে তা কেড়ে নিয়ে যেতে পারে। এই যে আজ অনুষ্টুপ ছন্দে মন্ত্র পড়ে আমার স্ত্রীকে ঘরে নিয়ে এলুম, কাল নবাবের লোক এসে পরোয়ানা দেখিয়ে তাকে তুলে নিয়ে যেতে পারে। খোদাতালার রাজ্যে তবু দু'দণ্ড সবুর করা চলে। কবিরাজ কি হকিম ডেকে মানুষের মৃত্যুকে তবু দু'দিন ঠেকিয়ে রাখাও যায়, কিন্তু নবাবের হুকুম সবুর সয় না। নিজামতের পরোয়ানার আর নড়চড় নেই। সে বিধাতার বিধানের চেয়েও মোঘ। নিজামতের বিধানে আজ না হয় হুগলীর ফৌজদার হয়ে আছি, কিন্তু সেই নিজামতের বিধানেই হয়তো কাল আবার নিজামতের কয়েদখানায় থাকতে পারি। কে বলতে পারে?

—কিন্তু উমিচাঁদের যাবার কথা কাশিমবাজারে, কাশিমবাজারে না গিয়ে সে তোমার দফ্‌তরে গেল কেন?

উমিচাঁদ পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল।

বললে—নন্দকুমারজী আমার বন্ধু জাঁহাপনা। তাই তার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলুম—

—কিন্তু দেখা করবার আর সময় পেলে না? ঠিক যে-সময়ে ফিরিঙ্গীরা চন্দননগরে হামলা করতে যাবার মতলব করছে, সেই সময়ে?

—ফিরিঙ্গীরা চন্দননগরে হামলা করবার মতলব করেছে? কই, আমি তো কিছু জানি না জাঁহাপনা!

উমিচাঁদ যেন হঠাৎ আকাশ থেকে পড়েছে।

—উমিচাঁদ!

এবার নবাবের গলার আওয়াজ আর এক পর্দা চড়ে উঠলো। পাশে কান্ত পুতুলের মত দাঁড়িয়ে ছিল শুরু থেকে। কান্তর মনে হলো নবাব আরো জোরে চেঁচিয়ে ওঠে না কেন? নবাবের হাতে কি ক্ষমতা নেই? নবাব কি বাঙলা-মুলুকের ভাগ্যবিধাতা নয়! তবে এত নরম হয়ে আছে কেন? জেলখানায় পুরতে পারে না আগেকার মত? কোতল করতে পারে না যেমন করেছিল হোসেন কুলী খাঁর বেলায়? নবাবের মুখের দিকে চেয়ে দেখল কান্ত। সমস্ত মুখখানা যেন শুকিয়ে গেছে। সেই যেদিন থেকে নবাবের সঙ্গে কলকাতায় এসেছে সেই দিন থেকেই নবাবের পাশে পাশে থেকে দেখেছে। এই মানুষটার ওপরেই বুড়ো সারাফত আলির এত রাগ; এই মানুষটাকেই লোকে ঠকায়! এই মানুষটারই এত নিন্দে। অথচ দেখে কিছুই বোঝা যায় না। সারাদিন নবাব চুপ করে ঘরের মধ্যে বসে থাকে, কারো সঙ্গে কথা বলে না। মেহেদী নেসার, ইয়ারজান সাহেবরা এত বন্ধু ছিল আগে, তারাও কাছে থাকে না। কাছে থাকতে দেয় না তাদের। কেউ দেখা করতে এলে নাম-ধাম-পরিচয় জিজ্ঞেস করে নিয়ে তবে দেখা করে। সকলের কথা শোনে। মন দিয়ে শোনে। তারপর একটা কি দুটো কথা বলে। তাও আস্তে আস্তে। ইংরেজদের সঙ্গে মিটমাট হয়ে যাবার পর থেকেই কেমন যেন গম্ভীর

হয়ে গেছে আরো। আশ্চর্য, ছাউনির ভেতরে মদের ফোয়ারা চলে। মেহেদী নেসার সাহেব খায়, ইয়ারজান সাহেব খায়, মীরজাফর আলি সাহেবও খায়। আমীর-ওমরাওরা কেউই বাদ যায় না। কিন্তু নবাবকে কোনো দিন মদ খেতে দেখলে না কান্ত। দরকার হলে শুধু জল কিংবা সরবৎ আসে খানাঘর থেকে। তাও প্রথম-প্রথম গরম-মশলা দিয়ে মোগলাই খানা রান্না হতো। ভারি লোভ লাগতো কান্তর। মিষ্টি গন্ধ। চারদিক একেবারে গন্ধে ভুর-ভুর করতো। কিন্তু হালসীবাগানের ব্যাপারটার পর থেকেই খুব মন-মরা হয়ে গিয়েছিল। থালায় সব খাবার পড়ে থাকতো। কেউ খেতে বলবারও লোক নেই। রাত্রে ঘুমও কমে গিয়েছিল। কান্ত ঘুম থেকে উঠে এসে দেখতো তার আসার অনেক আগেই নবাব উঠে পড়েছে। উঠে ঘরের কোণের অলিন্দ দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে রয়েছে। তখনো সূর্য ওঠেনি। অনেক দূরের ধান-ক্ষেত খাঁ খাঁ করছে, এই লড়াই-এর জন্যে চাষারা গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছে, কেউ চাষ করতে পারেনি। তার ওপাশে গঙ্গা, তার ওপাশে ঝাপ্‌সা-ঝাপ্‌সা দেখা যায় গাছের সার। এক ঝাঁক পাখি উড়ে আসছে আকাশ চিরে। তার ওপাশে একেবারে অন্ধকার, ওদিকের আকাশটাতে তখনো পুবের আলো পৌঁছোতে পারেনি। সেই দিকে চেয়ে নবাব কী ভাবে কে জানে। কান্ত ভেবেছিল আবার বাইরে ফিরে যাবে, কিন্তু যায়নি। বেশ লাগতো নবাবকে দেখতে, নবাবের কাছে কাছে থাকতে।

—কে?

যেদিন নানীবেগম মরালীর সঙ্গে প্রথম ছাউনিতে এল সেদিন তার চোখ দিয়ে ঝর-ঝর করে জল পড়তে দেখেছে কান্ত!

—তুই কত রোগা হয়ে গেছিস মীর্জা? তুই কত শুকিয়ে গেছিস? খাওয়া-দাওয়া করিস না বুঝি ঠিকমত?

নবাব হেসেছিল শুধু নানীবেগমের কথা শুনে। যেন ঠিকমত খাওয়া-দাওয়া করলেই শরীর ভালো হয়। আশ্চর্য, কান্ত যদি এই চাকরিতে না আসতো তো জানতেই পারতো না যে, নবাব-বাদশাদেরও দুঃখ থাকতে পারে। জানতেও পারতো না যে, বাইরে যাদের সবাই হিংসে করে, যাদের অর্থ, নাম, ঐশ্বর্য লোককে লোভ দেখায়, তাদেরও ক্ষিধে থাকে না, তারাও রাত্রে ভাবনায় ঘুমোতে পারে না। বুঝতেও পারতো না যে, তাদেরও কষ্ট আছে, তারাও আমাদের গরীব লোকদের মত যন্ত্রণায় ছটফট করে। সত্যিই সেদিন বাঙলা মুলুকের নবাবকে অত কাছাকাছি থেকে দেখেছিল বলেই আর কোনো দিন তার মনের মধ্যে লোভ এল না। টাকার লোভ, নামের লোভ, শান্তির লোভ, সুখের লোভ। অনেকে কান্তকে পাগল বলেছে। বলেছে, তুই নবাবের অত কাছাকাছি ছিলি—নবাবের কাছ থেকে কিছু বাগিয়ে নিতে পারলি না? ওরা জানে না যে, দেবার মালিক নবাব নয়, দেবার মালিক বাদশাও নয়। নিতে গেলে আগে নেবার যোগ্য হতে হয়। সবাই কি নিতে পারে? আলীবর্দী খাঁ তো মসনদ দিয়ে গিয়েছিল নবাব মীর্জা মহম্মদকে, নবাব কি রাখতে পারলে? চাইতেই যদি হয়, তো চাইবো এমন কিছু যা রাখা যায়, যা হারায় না, যা থাকে! যা পেয়ে হারাবার ভয়ে কাতর হবো না, যা পেয়ে বলতে পারবো—এ আমার, এ আমার চিরকালের ধন। এ পাওয়া আমার কেউ কেড়ে নিতে পারবে না, এই পাওয়াই আমার সত্যিকারের প্রাপ্তি।

যাক্‌ এ-সব কথা!

সেদিন নবাবের চেহারা কিন্তু অন্য রকম হয়ে গিয়েছিল। সেই নন্দকুমার,

যাকে আলীবর্দী খাঁ এত ভালোবাসতো, যাকে খুশী হয়ে হুগলীর ফৌজদার করে দিয়েছিল, সেই নন্দকুমার এমন করে বিশ্বাসঘাতকতা করবে! অথচ বাইরে পুরো-পুরি হিন্দু ব্রাহ্মণ। নিয়ম করে পুজো করে, আহ্নিক করে, জপ করে, তপ করে, সেই নন্দকুমার?

—আমার কথায় বিশ্বাস করুন জাঁহাপনা, আপনার কাছে ভুল খবর দিয়েছে কেউ!

—কিন্তু উমিচাঁদের হাতের লেখাও ভুল?

উমিচাঁদ পাশ থেকে বললে—আমার হাতের লেখা আগেও একবার জাল হয়েছিল জাঁহাপনা, এবারও জাল হবে না তার কী প্রমাণ?

—এ যদি জাল হয় তো তুমিও জাল উমিচাঁদ! আর, আমিও জাল। এই বাঙলা মুলুক, যে মুলুকের নবাব আমি, তাও জাল! তোমরা কি বলতে চাও বাঙলা মুলুকের নবাব বলে কেউ নেই? ফরাসীরা বাঙলা মুলুকের নবাব হয়ে গেছে? তোমরা কি বলতে চাও দিল্লীর বাদশা তোমাদের সনদ্ দিয়েছে? তোমরা কি বলতে চাও আমি মসনদ ছেড়ে কান্দাহারে পালিয়ে গেছি পাঠানদের ভয়ে? আমার নিজের নামে আমার সনদ্ বরবাদ করে দিয়েছে দিল্লীব বাদশা? বলতে চাও দিল্লীর বাদশা আহ্‌মদ-শা-আব্‌দালী?

দরবারের মধ্যে থম থম করছে সমস্ত আবহাওয়াটা। যে-নবাব ভালো করে খায় না, ভালো করে ঘুমোয় না, বাইরের নিঃশব্দ নিঝুম আকাশটার দিকে চেয়ে চুপ করে থাকে, তার গলায় যেন বাজ ভেঙে পড়লো। যারা আশেপাশে ছিল, সবাই চম্‌কে উঠলো গলার শব্দে।

ছাউনির ভেতরে সমস্ত কথাই কানে যাচ্ছিল মরালীর। নানীবেগমের কানেও যাচ্ছিল। মরালী আর থাকতে পারল না।

বললে—আমি যাই নানীজী!

নানীবেগম বললে—ওমা, তুই কোথায় যাবি? দরবারের মধ্যে যাবি নাকি?

—হ্যাঁ নানীজী, ওরা তোমার মীর্জাকে বিশ্বাস করছে না। শুনছো না?

—তা তুই দরবারের ভেতরে গেলেই কি বিশ্বাস করবে ওরা?

—হ্যাঁ, আমি ওদের বিশ্বাস করিয়ে দেবো ওরা সবাই জোচ্চোর, ওরা সবাই ঠগ্!

—তা তুই কী করে বিশ্বাস করাবি ওদের?

—তার তরিখা আমি জানি! তাতেও যদি ওরা বিশ্বাস না করে, আমি ওদের মুখের ওপর সাত জুতো মারবো, তখন ওরা বাপ্-বাপ্ বলে স্বীকার করবে!

—কিন্তু বেগম হয়ে দরবারের মধ্যে যাবি কী করে? মীর্জা কী বলবে?

মরালী বললে—কেন, আমি তো ক্লাইভ সাহেবের ছাউনিতে গিয়েছিলাম, তোমার মীর্জা কিছু বলেছে?

বলে আর দাঁড়ালো না। তাড়াতাড়ি বোরখাটা পরে নিলে। তারপর ছাউনির পর্দাটা ফাঁক করে দরবারের ভেতরে ঢুকলো।

কোথায় কবে কখন কেমন করে কার ভাগ্যোদয় হয় কে বলতে পারে! যেদিন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সমুদ্রের ওপর কাঠের পাল-তোলা জাহাজ ভাসিয়ে বাঙলা মুলুকে এসে নামলো তখন সে ছেলেটা জন্মায়নি। সেই নবকৃষ্ণ। একদিন বড় হয়ে যখন চোখ ফুটলো, তখন দেখলে দিল্লীর বাদশার ফার্মানের কোনো দামই নেই। কোথা থেকে কোন্ ম্লেচ্ছ জাতের লোকেরা এসে কলকাতায় বেশ আসর জাঁকিয়ে বসেছে। নয়ানচাঁদ মল্লিকের ভাড়াটে বাড়িতে গোরা সাহেবরা থাকতো। সেখানে নবাবের আমীর-ওমরাওরা আসতো পালকি চড়ে। অনেক রাত পর্যন্ত খানা-পিনা চলতো, হই-হুল্লোড়ের শব্দ কানে আসতো। ক'টা আর লোক তখন শহরে। মিউনিসিপ্যালিটি করেছে, হল্‌ওয়েল সাহেব তখন ছিল তার বড়কর্তা। তখন থেকেই ছেলেটা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতো সেদিকে। গঙ্গার ধারে গিয়ে জাহাজের মাল ওঠা-নামা দেখতো।

ছোট চাকরি নবকৃষ্ণের। পোস্তার রাজার দাদামশাই-এর বাড়িতে সামান্য মুন্সীর চাকরি। লক্ষ্মীকান্ত ধর মশাইকে লোকে বলতো নকু ধর। নকু ধর মশাই-এর কারবার ইংরেজ কোম্পানীর সঙ্গে। কোম্পানীকে টাকা দিতে হতো। মাল বন্ধক রেখে টাকার সুদ আদায় করতে হতো। জাহাজ-ঘাটায় কোম্পানীর সাহেবদের সঙ্গে দেখা করতে কে যাবে?

নবকৃষ্ণ বলতো—আমি যাবো কর্তা!

ফুটফুটে ছেলেটা। বেশ বিনয়ী। নম্র ভদ্র গরীব। নকু ধর মশাই বেশ পছন্দ করতেন।

বলতেন—মুহুরী মশাই, ওই নবোকেই পাঠাও—

সে সব অনেক দিন আগেকার কথা। কোম্পানীর ঘাটে তখন কোম্পানীর মাল ছাড়া আরো অনেকের মাল ওঠা-নামা করতো। হুজুরিমল, বৈষ্ণবচরণ শেঠ, বেভারিজ সাহেব, পোস্তার রাজবাড়ির বাবুদের মালও নামতো ওখানে। ছেলেটার চোখের সামনে সব ঘটেছে। একদিন কোম্পানীর ঘাট ভেসে গেল জোয়ারের জলে। তখন নতুন ঘাট তৈরি করতে হলো। সাহেবরা নিয়ম করে দিলে, যে-মহাজন কোম্পানীর ঘাটে মাল ওঠাবে নামাবে তাকে মাশুল দিতে হবে। নকু ধর মশাই বললেন—তাহলে আমরা নিজের ঘাট তৈরি করবো।

তা তা-ই হলো। একে একে নতুন ঘাট তৈরি হতে লাগলো গঙ্গার ধারে ধারে। চাঁদপাল ঘাট, কাশীনাথ ঘাট, ব্যাবেটোর ঘাট, জ্যাকসন ঘাট, কোয়ে সানস্ ঘাট, ব্লাইথার ঘাট, হুজুরিমল ঘাট। তারপর হলো বাজার। শোভাবাজার, চার্লস বাজার, হাটখোলার বাজার, ঘাসটোলার বাজার।

ছেলেটার চোখের সামনে যেন আরব্য-উপন্যাস ঘটে যেতে লাগলো। কেবল মনে হতো জীবনটা নষ্ট হয়ে যেতে বসেছে নকু ধরের সেরেস্তার চারটে দেয়ালের মধ্যে! কেবল ছট্‌ফট্ করতো বাইরে বেরিয়ে যাবার জন্যে। যদি একটা চাকরি মেলে সাহেবদের দফ্‌তরে, তাহলে যেন জীবনটা ধন্য হয়ে যায়।

জাহাজ-ঘাটায় কোম্পানীর জাহাজ এসে নামতো আর সাহেব দেখলেই মাথা নিচু করে সেলাম করতো।

বলতো—সেলাম সাহেব—

একটু একটু ইংরিজী বলতেও শিখেছিল শেষের দিকে। তখন বলতো—গুড্ মর্নিং স্যার—

সত্যিই, কোথায় কবে কখন কেমন করে কা'র ভাগ্যোদয় হয়, কে বলতে পারে! রাজা রাজবল্লভ যখন কলকাতায় এসেছিল, তখন নবকৃষ্ণ নিজের দুঃখের কথা শুনিয়েছিল। বলেছিল—আপনার তো সাহেবদের সঙ্গে খুব দোস্তি আছে দেওয়ানমশাই, আমাকে একটা চাকরি করে দিন-না ওদের দফ্তরে—

রাজা রাজবল্লভের বোধ হয় দয়া হয়েছিল। বললে—কী কাজ জানো তুমি?

নবকৃষ্ণ বলেছিল—আজ্ঞে সব কাজ জানি—

—ফিরিঙ্গীরা গরু খায়, জানো তো?

—আজ্ঞে খুব জানি, সে তো মুসলমানরাও খায়। তাতে আর আমার কী? দফ্তর থেকে কাজ করে এসে গঙ্গায় চান করে নিলেই হলো!

—লেখাপড়া জানো?

—আজ্ঞে শুভঙ্করী জানি।

—আর ফার্সী?

—ফার্সী লিখতে পারি, পড়তে পারি—

কথাটা মনে ছিল দেওয়ানজীর। উমিচাঁদের সঙ্গে যখন রাজা রাজবল্লভের কথা হলো তখন ইংরেজরা ফার্সী জানা লোক খুঁজছে। মুন্সী কাজিউদ্দীন আছে বটে, কিন্তু সে তো মুসলমান। দেওয়ান রামচাঁদও আছে। কিন্তু মুর্শিদাবাদের হিন্দু আমির-ওমরাওরা, হিন্দু জমিদাররা যে নবাবের উচ্ছেদ চায়, তারা যে ইংরেজদের মদৎ দেবে, সে চিঠি যাকে-তাকে দিয়ে তর্জমা করানো যায় না। বেশ বিশ্বাসী মুন্সী চাই।

ক্লাইভ জিজ্ঞেস করেছিল—তেমন বিশ্বাসী হিন্দু মুন্সী কোথায় পাবো?

উমিচাঁদ বলেছিল—আমি তোমাদের দেবো সাহেব।

—কী নাম তার?

—নবকৃষ্ণ!

তাই উদ্ধব দাসও লিখেছে তার কাব্যে—কোথায় কবে কখন কেমন করে কা'র ভাগ্যোদয় হয় কে বলতে পারে। নবকৃষ্ণ ছিল নকু ধরের সেরেস্তার কর্মচারী, একেবারে সেই দিন থেকে হয়ে গেল ইংরেজ দফ্তরের মুন্সী! তার পর থেকে যত চিঠি উমিচাঁদ লিখেছে, মীরজাফর লিখেছে, সব তর্জমা করে দিয়েছে নবকৃষ্ণ। রামচাঁদের তখন আর ডাক পড়ে না। সব কাজে ডাক পড়ে নবকৃষ্ণের।

সেদিন আবার নবকৃষ্ণের ডাক পড়লো পেরিন সাহেবের বাগানে। নবকৃষ্ণ গিয়ে আভূমি সেলাম করে দাঁড়ালো।

—মুন্সী, আমি ভীষণ বিপদে পড়েছি, তোমাকে বাঁচাতে হবে। ক্যান্ ইউ সেভ্ মী?

মুন্সী বললে—আমি তো হুজুরের নিমক খেয়েছি সাহেব, হুজুর যা হুকুম করবেন তাই-ই করবো—

—আমার একটা ইম্পর্ট্যাণ্ট লেটার চুরি হয়ে গেছে।

—কে চুরি করেছে হুজুর? আমাকে নাম বলে দিন, আমি তার গলায় গামছা দিয়ে হুজুরের সামনে ধরে নিয়ে আসবো।

—না না, তা নয়, শোন—

ভগবান বুদ্ধি দিয়েছিল মুন্সী নবকৃষ্ণকে অকারণে নয়। কিংবা হয়তো ইতিহাসের প্রয়োজনেই নবকৃষ্ণের আবির্ভাব অনিবার্য হয়েছিল। নইলে নকু ধরের সেরেস্তায় পড়ে থাকলে বুদ্ধির খেলা দেখাবার সুযোগই মিলতো না তার জীবনে।

সব শুনে মুন্সী বললে—ঠিক আছে হুজুর, আমি এখুনি যাচ্ছি—

—কিন্তু হুগলীর ফৌজদার সেখানে হাজির রয়েছে, উমিচাঁদও হাজির রয়েছে, সেটা যেন মনে থাকে—আর মরিয়ম বেগমও সেখানেই আছে, সেটাও যেন মনে থাকে—

মুন্সী বললে—হাজার হোক হুজুর, মরিয়ম বেগমসাহেবা তো মেয়েমানুষ বই আর কিছু নয়—মেয়েমানুষের বুদ্ধির কাছে মুন্সী নবকৃষ্ণ হেরে যাবে না, এটা নিশ্চয় জানবেন!

—না না মুন্সী, তুমি মরিয়ম বেগমকে চেনো না। ভারি ক্লেভার, ভেরি শ্রুড্ গার্ল—খুব সাবধানে কথা বলবে তুমি!

মুন্সী বললে—আমি হুজুরের নুন খেয়েছি, আমাকে সে-কথা বলতে হবে না—দরকার হলে আমি বেগমের পা জড়িয়ে ধরবো—

—সে কী? তুমি মুসলমান মেয়ের পা জড়িয়ে ধরবে?

—কেন হুজুর? আপনি আমাকে এক্ষুনি হুকুম করুন, পা জড়িয়ে ধরা দূরের কথা, আমি মরিয়ম বেগমের পা চেটে আসবো। হুজুরদের জন্যে যদি তা করতে হয় তো তাও করবো—

—তাহলে তুমি এক্ষুনি চলে যাও মুন্সী, তোমার ওপর আমার কোম্পানীর একজিস্‌টেনস্ নির্ভর করছে। যদি এই কাজটা তুমি করতে পারো মুন্সী তো ইংলণ্ডের প্রাইম মিনিস্টার মিস্টার পিট্‌কে তোমার কথা লিখে দেবো, তোমাকে আমি রিওয়ার্ড দেবো—

আর বাক্যব্যয় না করে মুন্সী বেরিয়ে গেল।

এতক্ষণ ওয়াট্‌সন্ কিছু বলেনি। এবার ক্লাইভের দিকে চেয়ে হেসে বললে—এরাই হলো রিয়্যাল ইণ্ডিয়ান, রবার্ট, এরা টাকার জন্যে সব করতে পারে। বেগমের পা পর্যন্ত চাট্‌তে পারে। আমরা রাইট্-ম্যান্ পেয়েছি, উমিচাঁদ আমাদের রাইট্-ম্যান্ দিয়েছে, দি স্কাউণ্ড্রেল!

১৭৩৯ সালে নাদির শা দিল্লীর সিংহাসনে মাত্র আটান্ন দিন রাজত্ব করে চার কোটি টাকা নিয়ে নিজের দেশে ফিরে গিয়েছিল। মহীশূরের রাজার শ্বশুর জামাই-এর সব ইয়ার-বন্ধুদের নাক কেটে দিয়ে সকলের সামনে তাদের অপমান করেছিল। হিন্দুস্থানের আসল মালিক কে তারই ঠিক নেই তখন। মালিক দিল্লীর বাদশা না হায়দার আলি না জেনারেল বুশী না নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলা—তারও কোনো হিসেব-নিকেশ হয়নি! সুতরাং কোম্পানীর কোনো খিদ্‌মদ্‌গার যদি হতে চাও তো নবাবের পা চাটো, নবাবের বেগমের পা-ও চাটো, দরকার হলে অ্যাড্‌মিরাল ওয়াটসন্, রবার্ট ক্লাইভের পা-ও চাটো, তাতে হিন্দুস্থানের ভালো না হোক তোমার নিজের তো ভালো হবে! হিন্দুস্থানের ভালোর কথা ভাবার দরকার নেই, সে খোদাতালাহ্ ভাবুক। তুমি তোমার নিজের ভালোর কথা আগে ভাবো। যে

হিন্দুস্থানের মালিক হবে সে তোমাকে বাঙলা মুলুকের মালিক বানিয়ে দেবে। তারই ভজনা করো।

মুন্সী নবকৃষ্ণ যখন নবাবের ছাউনিতে পোঁছল তখন চারদিকে বেশ উত্তেজনার ফেনা ছড়িয়ে গেছে। এমনিতে মুন্সী নবকৃষ্ণ আগে কখনো নবাবের দরবারে যায়নি। দরবারী কায়দা-কানুন জেনেছে, শিখেছে নকু ধর মশাই-এর সেরেস্তায় কাজকর্ম করবার সময়, অনেকবার নিজামতের আমীর-ওমরাওদের সঙ্গে মুলাকাত করতে হয়েছে, সেরেস্তার কাজে বাবুদের হয়ে কথাবার্তা চালিয়েছে। কিন্তু নিজেকে বড় ছোট মনে হয়েছে। মনে হয়েছে, সকলে যেন বড় নিচু নজরে দেখছে তাকে। তারপর সুতোনুটি গোবিন্দপুর কত বড় হয়েছে, সাহেবরা আস্তে আস্তে শহরে জাঁকিয়ে বসেছে। কিন্তু নবকৃষ্ণ যে-কে-সেই রয়ে গেছে। সেই খাতা বগলে সেরেস্তায় যাওয়া আর আসা।

কিন্তু এতদিন পরে কোম্পানীর চাকরি পাওয়াতে চোখের সামনে আবার একটু আশার আলো ফুটে উঠেছে।

বাবু শুনে খুশীই হয়েছিল। বলেছিল—ধর্মটা বজায় রেখে কাজ কোর নবকৃষ্ণ, তাহলে ধর্মও থাকবে, ওদিকে টাকাও হাতে আসবে—

তা ধর্ম রাখতে কায়স্থ-বংশের ছেলে নবকৃষ্ণ জানে। ধর মশাইরা সুবর্ণ বণিক। কতদিন চাকরি করেছে সেখানে, কিন্তু কেউ বলতে পারে না নবকৃষ্ণ কোনোদিন ধর্ম খুইয়ে চাকরি বজায় রেখেছে। রোজ চটিজোড়া বাইরে রেখে কাছারিতে ঢুকেছে, আবার কাছারি থেকে ফেরবার সময় চটিজোড়া পরে বাড়িতে এসেছে। বেনের ছোঁওয়া এক ফোঁটা জল পর্যন্ত খায়নি সেখানে। আবার এখানেও তাই। এখানেও কোম্পানীর সেরেস্তা। কোম্পানীর মুসলমান মুন্সী কাজিউদ্দীন সাহেব একটু-একটু বিষ-নজরে দেখতে আরম্ভ করেছিল নবকৃষ্ণকে। কিন্তু নবকৃষ্ণর জানা আছে, পরের কাছে নিজেকে ছোট করার মধ্যে অসুবিধে যতই থাক, সুবিধেটাই বেশি। না হয় ছোটই হলুম তোমার চোখে, কিন্তু আসলে তো ছোট হলুম না। নিজের কাজ গুছিয়ে নেবার পর তখন তুমি যতই ছোট করবার চেষ্টা করো না কেন, তখন আর আমাকে ছোট করতে পারবে না।

সেদিন সিংহবাহিনীর মূর্তির সামনে অনেকক্ষণ ধরে নবকৃষ্ণ চোখ বুজে সেই প্রার্থনাই করেছিল।

বলেছিল—হে মা, তোমার কাছে আর কিছু চাইনে আমি। আমাকে শুধু অগাধ টাকা দিও। টাকার জন্যে এতদিন অনেকের পায়ে ধরনা দিয়েছি, আর পারছিনে ধরনা দিতে। এমন সুযোগ জীবনে আসবে না আর। ওদিকে নবাবের বিপদ, এদিকে কোম্পানীরও বিপদ। এমন বিপদের দিনেই তো সুযোগ আসে মানুষের জীবনে। বিপদ আছে বলেই তো কোম্পানীর ফিরিঙ্গীরা আমার মুঠোর মধ্যে এসেছে। বিপদ চলে গেলে কি আর আমাকে পুঁছবে, মা? আমাকে তখন লাথি মেরে তাড়িয়ে দেবে কুকুর বেড়ালের মত। তাই বলছি, ওদের বিপদ থাকতে থাকতে আমার একটা কিছু হিল্লে করে দাও মা—আমি তোমার মাথায় হীরের মুকুট, নাকে সোনার নথ্ করে দেবো—

কথাটা মা শুনেছিল কি না কে জানে। কিন্তু সেরেস্তায় আসতেই সাহেবের ডাক পড়েছিল। আর তারপরেই এই সুযোগ।

বিরাট ছাউনি নবাবের। দূর থেকে দেখা যায় ছাউনির চূড়া। সার-সার ঘোড়া বাঁধা রয়েছে সদরে। মাথার ওপর নিজামতের নিশেন উড়ছে। যেখানে যেখানে

নবাব যায়, সঙ্গে যায় সেপাই-বরকন্দাজের দল। কাছারির লোকজন থাকে সঙ্গে বাঈজী-বেগমদের তাঁবুও পড়ে। বাবুর্চী, মশালচী, নৌকর, খিদ্‌মদ্‌গার, সবাই থাকে।

কিন্তু সেদিন যে মুন্সী নবকৃষ্ণ সোজা নবাবের দরবারে ঢুকতে পেরেছিল সে চাকরির খাতিরে নয়, সে শুধু উদগ্র উন্নতির কামনায়। যেমন করে হোক, টাকা করতেই হবে। টাকা না হলে কিছুই হবে না জীবনে। টাকা চাই-ই চাই। হুগলীর ফৌজদারের টাকা হয়েছে, লক্ষ্মীকান্ত ধরের টাকা হয়েছে, বৈষ্ণবচরণ শেঠের টাকা হয়েছে, নবকৃষ্ণ শেঠেরও টাকা হওয়া চাই। অগাধ টাকা!

নবাবের দরবারে এত্তেলা দিয়ে ঢুকতে হয়।

নবকৃষ্ণ এত্তেলা দিয়ে ঢুকতে যাচ্ছিল, হঠাৎ বোরখা-পরা বেগমসাহেবা এসে দাঁড়ালো।

নবকৃষ্ণ পড়ি-কি-মরি করে একেবারে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে কুর্নিশ করে ফেললে। বেগমসাহেবা যে-ই হোক, নবাবের বেগমসাহেবাকে কুর্নিশ করা মানে নবাবকেই কুর্নিশ করা।

মরালী জিজ্ঞেস করলে—তুমি কে?

নবকৃষ্ণ বললে—বেগমসাহেবা, আমি দাসানুদাস মুন্সী নবকৃষ্ণ!

—হিন্দু? কাফের?

—হ্যাঁ বেগমসাহেবা। অধীন কাফের। পেটের দায়ে ফিরিঙ্গী সাহেবের সেরেস্তায় কাজ করি। কিন্তু নবাবের নুন খাই।

—নবাবের নুন খাই মানে?

—আজ্ঞে, নবাবের নুন কে না খায়? তামাম হিন্দুস্থানের লোক তো নবাবের নুন খেয়েই বেঁচে আছে।

—তুমি এখানে কী করতে এসেছো?

নবকৃষ্ণ বুঝেছিল—এই-ই নিশ্চয় মরিয়ম বেগম। এই মরিয়ম বেগম সম্বন্ধেই সাহেব খুব সাবধান করে দিয়েছিল। কিন্তু এমন করে এত সহজে বেগমসাহেবার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে ভাবতে পারেনি।

—আপনিই কি মরিয়ম বেগমসাহেবা হুজুর?

—তুমি আমাকে চেনো?

—আপনাকে কে না চেনে বেগমসাহেবা? আমার মনিব ক্লাইভ সাহেব আপনার প্রশংসায় পঞ্চমুখ একেবারে। আমাকে আসবার সময় বলে দিয়েছেন, বেগমসাহেবাকে দেখলেই কুর্নিশ করবে।

—তুমি কি ক্লাইভ সাহেবের কাছ থেকে আসছো?

—হ্যাঁ বেগমসাহেবা। নইলে আর কার কাছ থেকে আসবো?

—এখানে তোমাকে কী করতে পাঠিয়েছে তোমার সাহেব?

নবকৃষ্ণ বললে—আপনার সঙ্গে দেখা করতেই পাঠিয়েছে বেগমসাহেবা। বলে পাঠিয়েছে বেগমসাহেবা সাহেবের দফ্‌তরে এসেছিলেন কিন্তু কোনো নজরানা দিতে পারেননি। খুব আফশোষ করছিলেন। তাই আমাকে এখানে পাঠিয়ে দিলেন সাহেব!

—আমি চলে আসার পর কেউ এসেছিল সাহেবের দফ্‌তরে?

—কে আবার আসবে বেগমসাহেবা? আমিই এসেছি। আমিই তো সাহেবের খাস্‌ মুন্সী এখন। আপনি সাহেবের কোনো অপরাধ নেবেন না বেগমসাহেবা।

সাহেবের বড় ভুলো মন। আপনি সাহেবের কাছ থেকে তাড়াতাড়ি চলে এলেন তাই নজরানার কথা সাহেব একেবারে ভুলে গেছেন!

পাশ দিয়ে নবাবের চোপ্‌দার যাচ্ছিল। মরালী বললে—নৌসের আলী—

নৌসের আলী কুর্নিশ করে সামনে এসে দাঁড়ালো।

মরালী বললে—একে ধরো তো—হাত-পা বেঁধে নবাবের সামনে নিয়ে যাও—

—আজ্ঞে বেগমসাহেবা, আমি তো কিছু করিনি—

নৌসের আলী কিন্তু ততক্ষণে বেগমসাহেবার হুকুম তামিল করে ফেলেছে। তারপর আর বেশি কথা না বলে একেবারে দরবারের ভেতরে নিয়ে গেছে।

নবাবের সামনে তখন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে উমিচাঁদ আর নন্দকুমার।

দরজার দিকে চোখ পড়তেই হঠাৎ নবাব দেখলে আর-একজনকে ধরে নিয়ে আসছে নৌসের আলী।

—এ কে?

উত্তরটা আর নৌসের আলীকে দিতে হলো না। উত্তর দিলে মরালী।

মরালী বললে—আমিই একে বাঁধবার হুকুম দিয়েছি জাঁহাপনা, এ ফিরিঙ্গীদের চর—

—এখানে কী করতে এল?

নবকৃষ্ণ একবার উমিচাঁদের দিকে চাইলে, তারপর নন্দকুমারের দিকে। তারপর নবাবের দিকে চেয়ে কেঁদে ফেললে। বললে—আমি চর নই জাঁহাপনা, আমি ক্লাইভ সাহেবের মুন্সী!

—এখানে কী করতে এসেছো?

—আমাকে ক্লাইভ সাহেব জাঁহাপনার বেগমসাহেবার কাছে মাফ চাইতে পাঠিয়েছিল।

—কীসের মাফ? কী কসুর?

নবকৃষ্ণ বললে—বেগমসাহেবা মেহেরবানি করে সাহেবের দফ্‌তরে গিয়েছিলেন, কিন্তু আমার সাহেব নজরানা দিতে ভুলে গিয়েছিলেন।

মরালী বলে উঠলো—বাস্‌—খতম্‌—

সমস্ত দরবারটা যেন হঠাৎ মরিয়ম বেগমের আবির্ভাবে দপ্‌ করে জ্বলে উঠেছিল।

মরালী বললে—চারদিকে সবাই একসঙ্গে জাল পেতেছে জাঁহাপনা, এ মুন্সীও আর এক জাল। ক্লাইভ সাহেবের কাছে খবর গেছে যে জাঁহাপনা হুগলীর ফৌজদার আর উমিচাঁদকে ডেকে পাঠিয়েছেন, তাই এখানে নিজের মুন্সীকে পাঠিয়েছে সব কিছু দেখবার জন্যে!

নবাব কী করবে বুঝতে পারলে না।

মরালী বললে—নানীবেগমসাহেবা বলছেন এখানে এখন দরবার বন্ধ থাক, মুর্শিদাবাদে মতিঝিলে গিয়ে দরবার করবেন জাঁহাপনা। এদের তিনজনকে বন্দী করে মুর্শিদাবাদে নিয়ে যাওয়াই ঠিক হবে!

ক'দিন ধরে নবাবেরও বিশ্রাম হচ্ছিল না। অগ্রদ্বীপের ঠাণ্ডায় সমস্ত শরীর-মন যেন জমে গিয়েছিল। বাঙলা বিহার ওড়িষ্যার নবাবের সমস্ত দায়িত্ব যেন পাথরের মত মাথায় বোঝা হয়ে বসেছিল। এত সহজে সব কিছুর সমাধান হবার কথা নয়। হয়তো সেই ভালো।

নবাব দরবার ছেড়ে উঠে পড়লো। মরালী আগেই চলে গিয়েছিল। নবাব

তার পেছন-পেছন পাশের তাঁবুর ভেতর গিয়ে দাঁড়ালো।

মরালী তখন বোরখার মুখের ঢাকা খুলে ফেলেছে। একেবারে নবাবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বললে—জাঁহাপনা, এখান থেকে তাড়াতাড়ি করে চলুন—নইলে আবার এক ষড়যন্ত্রের মধ্যে জড়িয়ে পড়বো আমরা—

নানীবেগমসাহেবাও এতক্ষণ সব শুনেছে ভেতর থেকে।

বললে—চল্‌ মীর্জা, এখান থেকে চলে যাই আমরা—

—কিন্তু কেন চলে যাবো নানীজী! এও তো আমার তালুক, এও তো আমার মুলুক! আমিই তো এই মুলুকের নবাব!

মরালী বললে—এরা সবাই জাঁহাপনার দুষমন, এদের কাছে ফিরিঙ্গীদের আড্ডা। নন্দকুমার, উমিচাঁদ, নবকৃষ্ণ এই তিন শয়তানকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলে আর কোনো ভয় নেই জাঁহাপনার—

—কিন্তু আমি আজই নন্দকুমারকে বরখাস্ত করে দিতে চাই!

—এখন বরখাস্ত করে দিলে ফল ভালো হবে না জাঁহাপনা। ও খোলাখুলি ক্লাইভের দলে গিয়ে জুটবে। তার চেয়ে ওদের সকলকে কোতোয়ালীতে জমা করে দিন। সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে!

—কিন্তু এই মুন্সীটা?

মরালী বললে—আমি ক্লাইভ সাহেবের দফ্‌তর থেকে যে-চিঠি চুরি করে এনেছি সেইটে নিতে এসেছে ও—

—এতদূর সাহস হবে ক্লাইভের?

—আপনি কি ক্লাইভকে এখনো চেনেননি জাঁহাপনা?

—কিন্তু মীরজাফর যে অন্য কথা বলেছে! ওরা নাকি খুব ইমানদার জাত!

—মীরজাফর আলি সাহেবকেও তো জাঁহাপনা ভালো করে চিনেছেন! ওদের তিনজনকেই হাতে হাত-কড়া দিয়ে বেঁধে মুর্শিদাবাদে ধরে নিয়ে চলুন। ওদের ধরলে ক্লাইভ সাহেব ভয় পেয়ে যাবে, চন্দননগরে হামলা করতে আর এগোবে না—আমি বলছি, আপনি নিয়ে চলুন জাঁহাপনা—

—কিন্তু এ-সময়ে ওদের চটানো কি ভালো হবে, তাই ভাবছি!

মরালী বললে—কিন্তু জীবনে কখনো কি ভালো সময় পেয়েছেন আপনি জাঁহাপনা? জীবনে ধীরে সুস্থে নিশ্চিন্তে কাজ করবার মত সময়? আপনার দাদামশাই-ই কি পেয়েছেন তেমন সময়? জীবনে কেউ কি তা পায়? দিল্লীর বাদশাও কি কখনো তা পেয়েছে?

নানীবেগম কথাগুলো চুপ করে শুনছিল।

নবাব মরিয়ম বেগমের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইলো।

বললে—জীবন সম্বন্ধে তুমি এত কথা জানলে কি করে বেগমসাহেবা? কে তোমাকে এত কথা শেখালো? কত বছর বয়সে তোমার বিয়ে হয়েছিল?

—সে-সব কথা থাক আলি জাঁহা!

—না, বলো তুমি, আমার অন্য বেগমরা তো এমন করে কখনো বলেনি! তারা তো এ-সব কথা জানে না, এ-সব কথা ভাবেও না!

মরালী বললে—এত নরম হবেন না আলি জাঁহা, এত নরম হলে মসনদ চালাতে পারবেন না—

—কেবল মসনদ আর মসনদ! আর মসনদের কথা ভাবতে ভালো লাগে না আমার। এখন শুধু বাঁচতে ইচ্ছে করে—

—কিন্তু আপনার ও-কথা বলা সাজে না জাঁহাপনা! হিন্দুস্থানের লাখ লাখ মানুষ যে আপনার মুখের দিকে চেয়ে আছে!

নবাব আরো অবাক হয়ে গেল। বললে—সত্যি বলো না, কোত্থেকে এ-সব কথা শিখলে তুমি? কে শেখালে তোমাকে?

মরালী বললে—আমার কথা থাক আলি জাঁহা, আমি সামান্য মেয়ে, আমি কিছুই নই—

—না না, বলো তুমি। তোমাকে বলতেই হবে!

মরালী বললে—ওদিকে দরবারে ওরা সব আপনার হুকুমের জন্যে অপেক্ষা করছে যে—

—করুক অপেক্ষা। ওদের অপেক্ষা করা অভ্যেস আছে! তুমি বলো!

—আলি জাঁহা কি এ-সব কথা আগে কারোর কাছে শোনেননি?

—না, এমন করে কেউ বলেনি।

—সে কি! আপনার কত মৌলভী রয়েছে, কত পণ্ডিত আছে, আপনার কাছ থেকে তন্‌খা পেয়ে কত লোক কোরাণ নকল করছে, গীতা নকল করছে...

নবাব বললে—সে তাদের পেশা বেগমসাহেবা, তাই করেই তারা রুজি-রোজগার করে—

—আলি জাঁহা কি কখনো সে-সব পড়েও দেখেননি? মৌলভীদের ডেকে সে-সব কথাও শোনেননি?

নবাব বললে—ছোটবেলা থেকে আমি বখে গিয়েছিলাম বেগমসাহেবা, আমি ভালো ভালো গজল শুনেছি, ঠুংরী শুনেছি, ভালো ভালো নাচ দেখেছি, ভালো ভালো তোয়াইফ্ আনিয়েছি দিল্লী থেকে, তাদের সঙ্গে এক বিছানায় রাত কাটিয়েছি, আর কিছু জানবার সময় পাইনি, জিন্দ্‌গীর যে আরো একটা অন্য দিক আছে তা কখনো ভাবিনি—

—কিন্তু কোরাণ? কোরাণও কখনো পড়েননি?

নবাব বললে—না—

নানীবেগম শুনছিল। বললে—আমি কতবার পড়িয়ে শুনিয়েছি মীর্জাকে, ও শুনতে চায়নি—কেবল দুষ্টুমি করে বেড়িয়েছে রে—

—আমার যে তখন কিছুই ভালো লাগতো না নানীজী।

মরালী বললে—কিন্তু এখন কেন ভালো লাগছে আলি জাঁহা?

—তা জানি না বেগমসাহেবা। ওই যে তুমি বললে, জীবনে ভালো-সময় বলে কিছু নেই, কথাটা ভালো লাগলো—

মরালী বললে—সমুদ্রে যেমন ঢেউ থাকাটাই নিয়ম, জীবনেও তেমনি বিপদ থাকাটাই যে নিয়ম। ঢেউ থামলে তবে স্নান করবো যারা বলে, তাদের স্নান করা যে আর হয় না এ-জীবনে!

—সত্যি বলো না বেগমসাহেবা, এত কথা কে শেখালে তোমাকে? হাতিয়াগড়ের রাজা? তোমার খসম?

—না।

—তবে? মৌলভী সাহেব? তোমাদের পুরোহিত?

—না আলি জাঁহা!

—তবে কে?

মরালী বললে—আমার এক পিসি ছিল, তার নাম নয়ান-পিসি, আমাকে

রামায়ণ-মহাভারত পড়ে শোনাতো, তার কাছেই সব শিখেছি—

—আমাকে একবার শোনাতে পারো বেগমসাহেবা? তাকে একবার নিয়ে আসতে পারো আমার চেহেল্-সুতুনে?

মরালী হাসলো। বললে—না আলি জাঁহা, আমি না-হয় জাত দিয়েছি, কিন্তু সবাই জাত দেবে কেন?

—কিন্তু আমার চেহেল্-সুতুনে এলেই তার জাত যাবে?

—যাবে। আমাদের হিন্দুদের জাত বড় ঠুন্কো জিনিস আলি জাঁহা, বড় সহজে জাত চলে যায়।

তারপর একটু থেমে বললে—কিন্তু আর একজনের কাছে আমি অনেক শিখেছি আলি জাঁহা—

—কে সে?

—সে একজন কবি, আলি জাঁহা। গান লেখে!

—হাফিজ?

—না।

—তবে? কবীর? কবীরের দোঁহা?

মরালী বললে—না, এর তত নাম নেই। এ রাস্তায় রাস্তায় বাউণ্ডুলের মত ঘুরে বেড়ায়, এর ঘর নেই, বাড়ি নেই, জাত নেই, ধর্মও নেই।

—কোথায় থাকে সে?

মরালী বললে—তারও কোনো ঠিক নেই। সবাই তাকে পাগল বলে জানে। কিন্তু তার গান শুনে আমি অনেক শিখেছি আলি জাঁহা, আমি যা-কিছু বলছি সবই তার গান শুনে—

—তাহলে তাকে ডেকে আনো একদিন!

মরালী বললে—যদি কোনোদিন সুযোগ হয় আলি জাঁহা তো ডাকবো তাকে। ডেকে আপনাকেও তার গান শোনাবো—শুনলে আপনিও শান্তি পাবেন আমার মত!

—তার নাম কী?

মরালী বললে—সে নিজে বলে সে হরির দাস—ভক্ত হরিদাস—

কান্ত এতক্ষণ আড়ালে দাঁড়িয়ে সব শুনছিল। উদ্ধব দাসের কথাটা উঠতেই শিউরে উঠলো। মরালী উদ্ধব দাসের কথা তা হলে মনে রেখেছে! এত শ্রদ্ধা করে মরালী উদ্ধব দাসকে? মরালীকে যেন নতুন দৃষ্টি দিয়ে দেখতে পেলে কান্ত! এমন তো ভাবেনি সে।

ঘর ছেড়ে নবাব পাশের ঘরে যেতেই কান্ত সচেতন হয়ে সরে এসেছে। মোহন্মদী বেগের আলী তখনো দরবার ঘরে মুন্সী নবকৃষ্ণকে ধরে রেখেছে। ভেতর থেকে নবাব হুকুম দিয়ে দিয়েছিল, উমিচাঁদ আর নন্দকুমারকেও বন্দী করে মুর্শিদাবাদে নিয়ে যেতে হবে। সেখানেই বিচার হবে তিনজনের।

উমিচাঁদের দাড়ির ভেতরেও দাঁতে দাঁতে চাপার শব্দ হলো। হুগলীর ফৌজদার সাহেব নন্দকুমার অসহায়ের মত চাইলে উমিচাঁদের দিকে।

চুপি চুপি বললে—কী হবে উমিচাঁদ সাহেব? আপনার চিঠি মরিয়ম বেগম-সাহেবার হাতে কী করে পড়লো?

মুন্সী নবকৃষ্ণের কানে কথাটা গেল।

বললে—আমাদের কোতল করবে নাকি উমিচাঁদ সাহেব? আমি কী করেছি?

উমিচাঁদের মুখে কোনো ভাষা নেই বটে, কিন্তু চোখ দেখে বোঝা গেল অপমানে সমস্ত বুকটা যেন পুড়ে যাচ্ছে। যেন মরিয়ম বেগমসাহেবাকে সামনে পেলে দাঁত দিয়ে কামড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে।

নবাব দরবারে ঢুকতেই সবাই স্থির হয়ে দাঁড়ালো।

নবাব বললে—আমরা আজই মুর্শিদাবাদে রওনা দিচ্ছি উমিচাঁদ সাহেব, আপনাদের তিনজনকেও হাত-কড়া বাঁধা অবস্থায় যেতে হবে আমার সঙ্গে—

বলেই নবাব আবার চলে যাচ্ছিল। উমিচাঁদ সাহেব হঠাৎ পেছন থেকে বললে—তাহলে কি বুঝবো আমরা জাঁহাপনার বন্দী?

—আমার কথার সেই মানেই তো দাঁড়ায়।

বলে আর দাঁড়ালো না সেখানে নবাব। তাড়াতাড়ি পাশের তাঁবুতে গিয়ে ঢুকলো। আর তার একটু পরেই ছাউনির মধ্যে চারদিকে সাজ-সাজ রব পড়ে গেল। আবার ছুটোছুটি, আবার হাঁকডাক, আবার নাকাড়া বাজিয়ে সকলকে হুঁশিয়ার করে দেওয়া হলো। ওঠো ওঠো, তল্পি গুটোও। হাতী ঘোড়া সাজাও। মীর্জা মহম্মদ হায়াৎ খাঁ সিরাজ-উ-দ্দৌলা আলমগীর বাহাদুর কী ফতে! জিগিরে জিগিরে আকাশ ফেটে চৌচির হয়ে গেল।

একটু নিরিবিলি পেতেই উমিচাঁদ বললে—অনেকদিন সহ্য করা হয়েছে নন্দকুমার, এবার আর দেরি করা নয়, এবার ওকে খতম্ করতে হবে—

নন্দকুমার চুপি চুপি জিজ্ঞেস করলে—কাকে উমিচাঁদ সাহেব?

—মরিয়ম বেগমসাহেবাকে!

মুন্সী নবকৃষ্ণ চম্‌কে উঠলো নামটা শুনে। তার মাথার লম্বা টিকিটাও সঙ্গে সঙ্গে কেঁপে উঠেছে।

গঙ্গার বুকে তখন অনেক রাত। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের বজরার ভেতরে বড় আসর বসেছে। অনেকদিন পরে রামপ্রসাদ সেনকে পাওয়া গিয়েছে। সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছেন কালীঘাটে। রামপ্রসাদ দরাজ গলায় গান ধরেছে—

> মা গো, আমার এই ভাবনা।
> আমি কোথায় ছিলাম কোথায় এলাম
> কোথায় যাবো নাই ঠিকানা।
> আমার দেহের মধ্যে ছজন রিপু
> তারা দেয় মা কুমন্ত্রণা...

গানের মধ্যে হঠাৎ বাধা পড়লো। বজরার বুড়ো মাঝি হঠাৎ গানের মধ্যেই ভেতরে ঢুকে বললে—মহারাজ, নবাব আসছেন—বজরা থামাতে বলছেন—

ছোটমশাই পাশে ছিলেন। বললেন—সে কী?

ভারতচন্দ্র বললেন—অ্যাঁ? কার কথা বললে?

গোপালবাবু বললে—মহারাজ, নিশ্চয় কেউ ফাজলামি করতে চায় আমাদের সঙ্গে—

বুড়ো মাঝি বললে—না মহারাজ, নবাব হুকুম পাঠিয়েছেন আমাদের বজরায়

আসবেন। তিনি কলকাতা থেকে মুর্শিদাবাদে ফিরে যাচ্ছেন—সেন মশাই-এর গান শুনে জানতে পেরেছেন, মহারাজ এই বজরায় আছেন—

মাঝরাত্রের গঙ্গা বড় সর্বনেশে গঙ্গা। বিশেষ করে অষ্টাদশ ... মাঝরাত্রির গঙ্গা। ওই মাঝরাত্রের গঙ্গায় কত সর্বনাশ যে ঘটে গেছে, তারিখ ইউসুফী বা মুতাক্ষরীণেও তা লেখা নেই। চল্লিশ দাঁড়ের নবাবী বজরা এ সব জানতো।

অত রাত্রেও মরালীর ঘুম ছিল না। নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলার ঘুম না এলে মরিয়ম বেগমের ঘুম আসে কি করে?

মরালী বলেছিল—ঘুম আসবে আলি জাঁহা, ঘুম আসবে—আর একটু চেষ্টা করুন।

—কিন্তু বেগমসাহেবা, কী করে ঘুম আসবে? চেষ্টার তো কসুর নেই আমার—

উমিচাঁদ, নন্দকুমার আর মুন্সী নবকৃষ্ণ পেছনে আর একটা বজরায় রয়েছে। তারা কিন্তু অঘোরে ঘুমোচ্ছে তখন। যারা অনিদ্রার কারণ, তাদের বন্দী করেও বাঙলা মুলুকের মালিকের চোখে ঘুম নেই। আর কা'দের বন্দী করবে নবাব, আর ক'জনকে বন্দী করবে? আর ক'জনকে বন্দী করলে মুলুকের মালিক নিরাপদ হবে, নির্ভয় হবে?

—জানো বেগমসাহেবা!

মরালী কাছেই ছিল। বললে—বলুন আলি জাঁহা—

—চেহেল্-সুতুনে একবার আমাকে আরক দিয়েছিল এক বেগমসাহেবা—

—কোন্ বেগমসাহেবা?

নবাব বললে—তা আমার মনে নেই, সব বেগমদের নাম আমার মনে থাকেও না, কিন্তু বড় আরাম হয়েছিল আমার সেই আরক খেয়ে। আমার বড় ঘুম এসেছিল—

মরালী বললে—সে আরক আমি জানি আলি জাঁহা—

—তুমি জানো? তুমি সে আরক খেয়েছো?

—না আলি জাঁহা, আমার তা খাবার দরকার হয়নি। আমি গরীব মেয়েমানুষ, ঘুমের জন্যে আমার অত কষ্ট করতে হয় না, ঘুম আমার এমনিতেই আসে!

নবাব বললে—আমার সেই রকম গরীব হতে ইচ্ছে করে। এককালে মসনদ চেয়েছিলুম, এখন আর তাই তা চাই না—

—না আলি জাঁহা, মসনদে বসেও গরীব হওয়া যায়!

—কী করে তা সম্ভব বেগমসাহেবা? মসনদের জন্যেই তো আমার এত অশান্তি—

-তা ঠিক নয় আলি জাঁহা, মহাভারত পড়লে আপনি জানতে পারতেন, হাফিজ পড়লে আপনি তা জানতে পারতেন, কবীর পড়লেও আপনি তা জানতে পারতেন!

—তুমি বুঝি সব পড়েছো?

মরালী বললে—না আলি জাঁহা, সব পড়তে হয় না। সব না পড়লেও জানা যায়। আমাদের মহাভারতে যা আছে, আপনাদের কোরাণেও তাই-ই আছে—

—কোরাণ পড়লেই আমার ঘুম আসবে বলতে চাও?

মরালী বলেছিল—নানীবেগমসাহেবা তো ওই জন্যেই কোরাণ পড়ে, আলি জাঁহা—

—আমার দরবারে কত মৌলভী সাহেব কোরাণ নকল করবার জন্যে টাকা পায় বেগমসাহেবা, তারা কেতাব তৈরি করে, কিন্তু আমি তা কখনো পড়িনি—

—এবার পড়ে দেখবেন আলি জাঁহা, দেখবেন ঘুম আসবে—

—আর তোমার যে কে এক কবি আছে বলছিলে!

—ভক্ত হরিদাস?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, ভক্ত হরিদাস, তার গান শোনাতে পারো না? তার গান শুনলে আমার ঘুম আসবে না?

ঠিক এই সময়েই দূরে থেকে একটা সুর ভেসে এসেছিল। এই সর্বনেশে মাঝরাত্রের গঙ্গায় কে এমন করে গান গায়?

অস্পষ্ট আওয়াজ, কিন্তু ভারি সুরেলা।

—ওই শুনুন আলি জাঁহা—

গানটা তখন আরো কাছাকাছি এসেছে—

মা গো, আমার এই ভাবনা।
আমি কোথায় ছিলাম কোথায় এলাম
কোথায় যাবো নাই ঠিকানা—

মরালী গানের মানেটা বুঝিয়ে দিলে। মহাজীবনের এপার-ওপার থেকে যেন অপার শান্তির ঠাণ্ডা হাওয়া এসে নবাবের মেজাজটা ঠাণ্ডা করে দিয়ে গেল।

নবাব নাওদারকে ডাকলে! কান্ত এসে কুর্নিশ করে দাঁড়ালো।

—ও কে গান গাইছে? কার বজরা ওটা?

কান্ত বাইরে গিয়ে খবর নিয়ে এল। বললে—জাঁহাপনা, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের বজরা যাচ্ছে কলকাতায়, গান গাইছে রামপ্রসাদ—

নবাব জিজ্ঞেস করলে—রামপ্রসাদ? কৌন্ হ্যয় উও?

মরালী উত্তর দিলে—হালিসহরের কবি, আলি জাঁহা, সাধক কবি—

—তুমি এত জানলে কী করে বেগমসাহেবা? কোথায় হালিসহর, কোথায় হাতিয়াগড়, কোথায় মুর্শিদাবাদ—

মরালী বললে—আমরা যে সবাই ও-গান গেয়েছি আলি জাঁহা। আমাদের দেশের চাষারা চাষ করতে করতে ও-গান গায়, গেরস্ত ঘরের বউ-ঝি-ঠাকুমা-দিদিমা সবাই ওই গান গায় যে—

তামাম বাঙলার নবাব মীর্জা মহম্মদ সিরাজ-উ-দ্দৌলা অবাক হয়ে গেল। বাঙলার মসনদের ওপর বসে যে মানুষ সারা দেশের মালিক হয়েছে, যাকে দেখলে সব মানুষ মাথা নীচু করে কুর্নিশ করে, মসনদ না পেয়েও তেমনি আর একজন মানুষকে সবাই আর এক মসনদে বসিয়ে দিয়েছে? এ কেমন করে হয়?

—এ বাদশার খেলাৎ পেয়েছে?

—না, আলি জাঁহা।

—জায়গীর?

—তাও না, হুজুর!

—তাহলে? তাহলে কীসের এত খাতির? কীসের এত তারিফ? তাহলে তো একে দেখতে হয়! হুকুম হয়ে গেল নবাবের।—সেই মাঝরাত্রে গঙ্গার বুকেই

মহারাজার বজরা থামাও। বাঙলা মুলুক   নবাব আর-এক মসনদহীন নবাবকে দেখবে।

নবাবের হুকুম নড়বার নয়। নবাব গিয়ে উঠলো মহারাজার বজরায়। কান্তও সঙ্গে সঙ্গে গেছে। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র চার কামরাওয়ালা বজরা থেকে বেরিয়ে এসেছে। ভারতচন্দ্র, গোপালবাবু, ছোটমশাই তারাও বেরিয়ে এসেছে। কোথাও কোনো গলদ হয়েছে নাকি? কোনো গাফিলতি? আব্‌ওয়াব্‌ দিতে দেরি হয়েছে? মাথট্‌ পিলখানা দিতে খেলাপী হয়েছে?

—গান গাইছিল কে মহারাজ?

এতক্ষণ যেন আশ্বস্ত হলো সবাই। টাকা নয়, সম্মান নয়, দণ্ড নয়, শাস্তি নয়, কিছু নয়। নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলা মাঝরাত্রে গান শুনতে এসেছে?

—আমি আর একটা গান শুনবো ওর, মহারাজ!

একজন সাধারণ সাদাসিধে ভদ্রলোক। দাড়ি গোঁফে মুখ ভর্তি। মাথায় বড় বড় চুল। গায়ে একটা চাদর। বাবু হয়ে বসে আছে। মাথায় একটা সিঁদুরের ফোঁটা শুধু। হাসি হাসি মুখ।

—কী গান গাইবো জাঁহাপনা, হুকুম করুন!

—যে গান খুশী!

রামপ্রসাদের গলা আবার গেয়ে উঠলো—

সেঁইয়া গেও পরদেশ
সখিরি, ক্যা করু ময়—

নবাব বাধা দিলে। বললে—না না, ও-গান নয়—যে-গান গাইছিলে, ওই গান।

—কোন গান?

—ওই যে মা মা করে গান করছিলে!

রামপ্রসাদের চোখ দুটো এবার বুজে এল আবার। গান গাইতে গাইতে চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল পড়তে লাগলো। একমনে গেয়ে চলেছে—

মা গো, আমার এই ভাবনা।
আমি কোথায় ছিলাম, কোথায় এলাম,
কোথায় যাবো নাই ঠিকানা।
আমার, দেহের মধ্যে ছ'জন রিপু
তারা দেয় মা কুমন্ত্রণা।
আমি মনকে বলি ভজ কালী
তারা কেউ কথা শোনে না—

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যপাদে এসে সেদিন বাঙলার ইতিহাস যেন নতুন দিকে মোড় ফিরলো। আর মাঝরাত্রের গঙ্গার বুকে নতুন করে আবার এক নতুন সর্বনাশ ঘনিয়ে উঠলো!

—তারপর?

মরালী বললে—তারপর সর্বনাশটা হয়েছিল পর দিন।

দমদমার বাগান বাড়িতে পুঁথি বগলে করে নিয়ে এসে উদ্ধব দাস গল্প

শুনতো আর লিখতো। উদ্ধব দাস নিজেই লিখে গেছে সে সব কাহিনী। তখন বড় দুর্দিন চলেছে কর্নেল ক্লাইভ সাহেবের। কোম্পানীর সিলেক্ট-কমিটির সঙ্গে ঝগড়া চলছে। মন-মেজাজ খারাপ। বেগম মেরী বিশ্বাস এক এক করে সব কাহিনী বলে যায়, আর উদ্ধব দাস লিখে নেয় পুঁথির পাতায়। উদ্ধব দাস সোজা কথা সোজা করে লেখেনি। সমস্ত বাঙলা দেশটা ঘুরে ঘুরে বেড়িয়ে তখন বুড়ো হয়ে পড়েছে। কান্ত-সাগরে ক্লাইভ সাহেবের কাছ থেকে তালুক পেয়েছে। সেখান থেকে রোজ হেঁটে হেঁটে আসে আর বেগম মেরী বিশ্বাসের সামনে বসে থাকে।

এ একেবারে বেগম মেরী বিশ্বাসের শেষের দিকের কথা। বলতে গেলে শেষ সর্গ।

মরালীর তখন আর সে চেহারা নেই। কোথায় গেছে সেই কাঁচা সোনার মত গায়ের রং, সেই মেহেদী পাতার রঙে রাঙানো হাতের নখ। সেই ওড়নীও নেই, সেই জরির চুড়িদার সালোয়ার কামিজও নেই।

নবাব বড় ভক্ত হয়ে গিয়েছিল মরিয়ম বেগমের। যে মানুষ মতিঝিল থেকে কখনো চেহেল্-সুতুনে আসতো না, যে মানুষ মতিঝিলের মধ্যেই দরবার বসাতো রোজ, আর দরবারের নাম করে মতিঝিলের মধ্যেই রাত কাটিয়ে দিত, সেই মানুষকেই হঠাৎ সেদিন চেহেল্-সুতুনের মধ্যে আসতে দেখে সবাই অবাক হয়ে গিয়েছিল।

নবাব বলেছিল—লোকে বলে মুর্শিদাবাদের মসনদ চালায় নাকি মরিয়ম বেগম—

—আলি জাঁহা কি বিশ্বাস করেন নাকি সে কথা?

নবাব বহুদিন পরে প্রাণ খুলে সেদিন হেসেছিল। আশ্চর্য, আকবর বাদশা থেকে শুরু করে বাদশা সাজাহান, সুজাউদ্দীন, সরফরাজ খাঁ, এমন কি আলীবর্দী খাঁ পর্যন্ত কে মসনদ চালাতে পেরেছে বেগমদের সাহায্য ছাড়া! নানীবেগম না থাকলে নানা-নবাবই কি মসনদ চালাতে পারতো!

পেশমন বেগম বলেছিল—তুই কী করে যাদু করলি ভাই নবাবকে?

ঘরের মধ্যে কেউ আসতে পারেনি। কারোর আসার হুকুম ছিল না। বহুদিন পরে নবাব আরাম করে ঘুমিয়েছিল সেদিন। বোধহয় সেই রামপ্রসাদের গানের জন্যে। রামপ্রসাদের গানই বোধহয় সেদিন নবাবকে বুঝিয়েছিল যে, ঐশ্বর্য-বিলাস-আড়ম্বর ও-সব কিছু নয়। একদিন যেমন নবাব সুজাউদ্দীন গেছে তেমনি তুমিও যাবে। একদিন যেমন নবাব আলীবর্দী খাঁ চলে গেছে, তেমনি তুমিও চলে যাবে, আলি জাঁহা। মাঝখানের এই ক'টা দিনের কিছু যন্ত্রণা নিয়ে মানুষের যেমন জীবন, নবাবেরও তেমনি তাই। অহঙ্কার করতে নেই, অত্যাচার করতে নেই। অনিয়ম করতে নেই। রিপুর কুমন্ত্রণা শুনো না। ও তোমায় অশান্তি দেবে, অনিদ্রা দেবে, অন্তরায় দেবে। এই যা দেখছো, এ সব-কিছুই অনিত্য, এ সব-কিছুই অসার। সার যদি কিছু থাকে তো সে ভালোবাসা। ভালোবাসতে শেখো আলি জাঁহা, এই দুনিয়ার সব কিছুকে সব মানুষকে ভালোবাসতে শেখো। তাতেই তোমার নিদ্রা আসবে, তাতেই তোমার শান্তি আসবে।

—কিন্তু ওদের আমি শাস্তি দেবো না? ওই যারা আমার দুষমনি করেছে?

—নিশ্চয় শাস্তি দেবে আলি জাঁহা! পালনও করতে হবে, আবার শাসনও করতে হবে। পালন না করলে শাসন করবার অধিকার তোমার নেই!

—কিন্তু আমি কি প্রজা-পালন করি না বলতে চাও?

—না।

—তাহলে আমি কী করেছি এতদিন?

—তোমার পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, বৃদ্ধ-প্রপিতামহ যা করে এসেছে, তুমিও তাই করেছো। নারীকে তুমি ভোগ করেছো, ভূমিকে তুমি অপহরণ করেছো, যৌবনকে তুমি অপব্যয় করেছো। ঠিক যেমন করে তোমার পূর্ব-পুরুষ করেছে, তেমনি করেই অপব্যয় করেছো। কিন্তু এখন ইতিহাস বদলে গেছে, এখন ইতিহাস উজানে বইছে। এখন মানুষ আর-এক ধাপ এগিয়ে গেছে। এখন সভ্যতা এক জনপদ থেকে আর-এক জনপদে ছড়িয়ে পড়ছে। সে আজ তোমার কাছে তোমার পিতা-পিতামহ-প্রপিতামহের পাপের জবাবদিহি চাইছে। তোমাকে আজ সেই সমস্ত পূর্ব-পুরুষদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

—কেন? তাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমি করতে যাবো কেন? আইন-ই-আকবরীতে তো সে-কানুন নেই—

—নেই, কিন্তু ইতিহাসের আইন-ই-আকবরীর তাই-ই কানুন।

—তাহলে আমি কী করবো?

—তোমার জীবন বলি দিতে হবে!

হঠাৎ চোখের সামনে একটা ধারালো ছোরা চক্ চক্ করে উঠলো। আর সঙ্গে সঙ্গে একটা নিষ্ঠুর আর্তনাদে নবাব মীর্জা মহম্মদের ঘুম ভেঙে গেল। ইনসাফ মিঞা তখন ভৈঁরো ঠাটের আলাপ ধরেছে নহবতে। মীড় আর মূর্ছনা, গমক্ আর তান সমস্ত কিছু মিলিয়ে একটা কথাই হেলে-দুলে বলতে চাইছে—ভোর হলো, এবার ওঠো নবাব, পুবের আসমানে আপতাফ্ তুলু হয়েছে, এবার ধুপ উঠবে, নতুন দিনের সঙ্গে সঙ্গে নতুন করে তোমার কিস্‌মত পরীক্ষা হবে। দেখবো কেমন করে তুমি নতুন সর্বনাশের মুখোমুখি হও। দেখবো রামপ্রসাদের গান শুনে তুমি যে শিক্ষা পেলে কেমন করে তুমি তা কাজে লাগাও!

মতিঝিলের দরবারে সবাই সেদিন নবাবের চেহারা দেখে অবাক হয়ে গেল। এমন মর্জি এমন মেজাজ বহুদিন কেউ দেখতে পায়নি। মুন্সী নবকৃষ্ণ, উমিচাঁদ, হুগলীর ফৌজদার নন্দকুমার, তারাও হাজির।

নবাব তাদের তিনজনকে লক্ষ্য করেই বললে—তোমাদের সবাইকে ছেড়ে দিলাম উমিচাঁদ—

তিনজনেই মাথা নুইয়ে মনের কৃতজ্ঞতা জানালে।

—ভেবো না তোমাদের অপরাধের বদ্‌লা আমি নিতে পারতাম না। কিন্তু কসুর আমিও করেছি—

সবাই নবাবের আত্মদোষ স্বীকার শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেল।

—হ্যাঁ, কসুর আমিও করেছি। শুধু আমি একলা করিনি। আমার পিতা, আমার পিতামহ, আমার প্রপিতামহ, আমার বৃদ্ধ-প্রপিতামহ, সবাই কসুর করেছে। শাস্তি যদি কাউকে নিতেই হয় তো সে-শাস্তি তোমাদের সঙ্গে আমাকেও নিতে হবে। আমিও সেই শাস্তির হক্‌দার। সে শাস্তি আমি নেবোই। যেদিন তোমাদের শাস্তি দেবো, সেদিন তোমাদের সকলের সঙ্গে আমিও সে-শাস্তি নেবো। ঐশ্বর্য-বিলাস-আড়ম্বর ও-সব কিছু নয় উমিচাঁদ। একদিন যেমন নবাব সুজাউদ্দীন চলে গেছে, তেমনি আমিও চলে যাবো। একদিন যেমন নবাব আলীবর্দী চলে গেছে, তেমনি একদিন আমিও যাবো। মাঝখানের এই কটা দিনের যন্ত্রণা নিয়ে যেমন তোমাদের সকলের জীবন, তেমনি আমারও জীবন।

অহঙ্কার করতে নেই, অত্যাচার করতে নেই, অনিয়ম করতে নেই। রিপুর কুমন্ত্রণা শুনো না উমিচাঁদ, ও তোমায় অনিদ্রা দেবে, অশান্তি দেবে, অন্তরায় দেবে। এই যা দেখছো, এ সব-কিছুই অনিত্য, এ সব-কিছুই অসার। সার যদি কিছু থাকে তো সে মুহব্বত্। এই দুনিয়ার সমস্ত কিছুকে মুহব্বত্ করতে শেখো উমিচাঁদ, তাতেই তোমার শান্তি আসবে, তাতেই তোমার নিদ্রা আসবে—

বাইরে বেরিয়ে ফৌজদার সাহেব উমিচাঁদের দিকে চাইলে।

—নবাব হঠাৎ তাজ্জব বাত্ বলতে লাগলো কেন আজ?

মুন্সী নবকৃষ্ণও অবাক হয়ে গেছে। বললে—নবাব লোকটা তো তেমন বদ্ মানুষ নয় ফৌজদার সাহেব!

উমিচাঁদ হাসলো।

বললে—নবাব-বাদশাদের অমন পাগলামি হয় মাঝে-মাঝে। ও-সব শয়তানি। বাদশা ঔরংজেবের ওই রকম হতো। শয়তানি করে আমীর-ওম্‌রাওদের সামনে মক্কায় চলে যাবে বলে ভয় দেখাতো—

শুধু উমিচাঁদ নয়। নন্দকুমার, নবকৃষ্ণই নয়—মতিঝিলের সমস্ত কর্মচারীও ভাবতে শুরু করেছিল—নবাবের আজ এ কী হলো? নবাব তো কোনোদিন এমন করে হাসে না। হেসে কথা কয় না! এমন করে মতিঝিলে এসে ঘুমোয়ও না। এ কী হলো নবাবের?

মরালী ডেকে পাঠালো কান্তকে। এতদিনের পর আবার কান্ত মুর্শিদাবাদে এসেছে। কিন্তু তবু খুশ্‌বু তেলওয়ালা বুড়ো সারাফত আলির সঙ্গে দেখা করতে পারেনি। কখন আবার কীসের জন্যে ডাক পড়ে কে বলতে পারে। নবাব ঘুমোচ্ছে জেনে ভাবছিল একবার খুশ্‌বু তেলের দোকানে গিয়ে সারাফত আলির সঙ্গে দেখা করবে। সবে মতিঝিল থেকে বেরিয়েছে, এমন সময় ডাক এল মরিয়ম বেগমসাহেবার কাছ থেকে।

কান্ত দৌড়ে গেল। বললে—কী?

মরালী বললে—তোমাকে একটা কাজ করতে হবে—

—বলো না কী কাজ?

—সেই তাকে একবার ডাকতে হবে!

—কাকে? ঠিক বুঝতে পারলে না কান্ত, কার কথা বলছে মরালী!

—সেই যে গান বাঁধে, ছড়া বাঁধে! আমার কথা কিন্তু বলো না কিছু। বলো যে নবাব তার গান শুনতে চেয়েছে!

কান্ত অবাক হয়ে গেল। বললে—উদ্ধব দাস? উদ্ধব দাসের কথা বলছো? কিন্তু তাকে আমি কোথায় পাবো? সে কি এখন মুর্শিদাবাদে আছে?

—তা আমি জানি না। যেখান থেকে পারো তাকে ডেকে আনতে হবে! সারা বাঙলা দেশে যেখানে হোক, এক-জায়গায় না এক-জায়গায় তাকে পাবেই—

হঠাৎ এতদিন বাদে কেন যে মরালী নিজের স্বামীকে ডাকতে বললে বোঝা গেল না। কিন্তু মরালীর হুকুম না মানলেও চলে না। অবাক হয়ে খানিকক্ষণ চেয়ে রইলো মরালীর মুখের দিকে। তারপর বললে—আচ্ছা, যাচ্ছি—

কিন্তু সেদিন তখনো কি কান্ত জানতো যে মরালীর সে-ইচ্ছে ওলোট-পালোট হয়ে যাবে অমন করে? মুর্শিদাবাদের ইতিহাস অমন করে অন্য দিকে মোড় ফিরবে? বাঙলা মুলুকের কপালে অমন করে সর্বনাশ ঘনিয়ে আসবে?

নবাব ঘুম থেকে উঠেই খিদ্‌মদ্‌গারকে ডাকলে।

খিদ্‌মদ্‌গার কাছে যেতেই নবাব বললে—নকল্‌চিকো বোলাও—

া! কে নকল্‌চি! কোথাকার নকল্‌চি!

নবাব বললে—যারা দরবারে কোরাণ নকল করে, তাদের বোলাও—

কোরাণ নকল করে! নবাব অনেকবার অনেক রকম তাজ্জব হুকুম করেছে। কিন্তু কখনো কোরাণ নকল্‌চিদের ডেকে পাঠায়নি আগে।

ইব্রাহিম খাঁ সরাবখানার মধ্যে চুপ করে বসেছিল। কখন কোন্ ওম্‌রাহ আসে, কখন মেহেদী নেসার, ইয়ারজান সাহেব এসে সরাব চেয়ে পাঠায়, তারই অপেক্ষায় হাঁ করে মুহূর্ত গুনছিল, হঠাৎ নবাবের অদ্ভুত খেয়ালের কথা শুনে অবাক হয়ে গেল। কোরাণ পড়বে নাকি নবাব!

এ এক অবাক ঘটনা মতিঝিলে। সরাবের হুকুম হয়েছে, তওয়ায়িফের হুকুম হয়েছে, ওস্তাদের হুকুম হয়েছে, টাকার হুকুম হয়েছে, পাপের হুকুম হয়েছে। কিন্তু কখনো কোরাণের হুকুম হয়েছে বলে কেউ শোনেনি। নবাব কোরাণ চোখে দেখেছে কি না সন্দেহ। একবার শুধু নবাব হাত দিয়ে কোরাণ ছুঁয়েছিল। নবাব আলীবর্দী খাঁর মৃত্যুর সময়ে নবাবকে কোরাণ ছুঁয়ে শপথ করতে হয়েছিল, জিন্দ্‌গীভর কখনো মদ খাবে না। বাস্, সেই পর্যন্ত। তারপরে কোরাণেরও আর কখনো নবাবকে দরকার হয়নি, নবাবেরও আর কখনো কোরাণকে দরকার হয়নি।

কিন্তু খিদ্‌মদ্‌গার নকল্‌চিকে নিয়ে ফিরে আসবার আগেই আর এক খবর নিয়ে এল খিদ্‌মদ্‌গার।

—খোদাবন্দ্, মীর বক্সী মোহনলাল দরবারে হাজির।

—ক্যা?

দু'বার করে জবাব দিতে হলো তবে যেন নবাবের কানে গেল কথাটা। বললে—দরবারে নিয়ে এসো—

তারপর মোহনলাল যে-খবর নিয়ে এল তা যেমন মর্মান্তিক তেমনি উত্তেজক। ইংরেজফৌজ হামলা করেছে চন্দননগরে। লড়াই ফতে হয়ে গিয়েছে। কর্নেল ক্লাইভ ফরাসডাঙার কেল্লার নিশেন নামিয়ে দিয়ে তার ওপর ইউনিয়ন-জ্যাক্ উড়িয়ে দিয়েছে।

সঙ্গে সঙ্গে নবাব লাফিয়ে উঠেছে। সাতাশ বছরের পাঠানী-রক্ত যেন টগবগ্ করে উঠলো। তাহলে হুগলীর ফৌজদার কোথায়? উমিচাঁদ কোথায়? মুন্সী নবকৃষ্ণ কোথায়? তাদের কে যেতে দিলে মুর্শিদাবাদ ছেড়ে? মীরজাফর আলি সাহেব কোথায়? ডাকো তাকে আমার সামনে। আমি সকলকে কোতল্ করবো। দিল্লীর বাদশার সনদ পাওয়া নবাব আমি, মেরা হুকুম কোঁউ বদল কিয়া উস্‌কো লাগো নে? আর, কাশিমবাজার কুঠির ওয়াটস? মঁসিয়ে ল? উন লোগোঁ কো ভি আব্‌ভি বোলাও—

চেহেল্-সুতুনেও খবরটা পৌঁছলো। মরালী একটু নিশ্চিন্ত ছিল। কিন্তু খবরটা পেয়েই পীরালি খাঁকে ডেকে পাঠালো—মেরা তাঞ্জাম তৈয়ার করো, ম্যায় মতিঝিল যাউঙ্গি—আব্‌ভি—

মরালীর বাঁদীও হঠাৎ হুকুম পেয়ে বেগমসাহেবার পেশোয়াজ বার করে দিলে, ওড়নী বার করে দিলে, কাঁচুলী, ঘাগরা, পেজোড় বার করে দিলে। হুলস্থূল পড়ে গেল চেহেল্-সুতুনে—আবার মরিয়ম বেগমসাহেবা নবাবের কাছে যাবে। রাত্রে এক সঙ্গে কাটিয়েও তার গরম কাটেনি বুঝি রে!

হালীসহরের কবির গান শুনতে শুনতে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র যখন ত্রিবেণীর ঘাটে গিয়ে পৌঁছল, তখন খবর এসে পৌঁছলো ইংরেজ-ফৌজ ফরাসডাঙার কেল্লা দখল করে নিয়েছে।

ছোটমশাই অনেক আশা করেছিল কলকাতায় গিয়ে এবার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকে নিয়ে ক্লাইভ সাহেবের কাছে যাবে। ক্লাইভ সাহেব চেষ্টা করলেই নবাবের হারেম থেকে ছোট বউরানীকে উদ্ধার করে দিতে পারে।

মহারাজ বলেছিল—কিন্তু এর পরেও কি বৌমাকে ঘরে ফিরিয়ে নিতে পারবেন আপনি ছোটমশাই!

ছোটমশাই বলেছিল—সে লোকে যা বলে বলুক, না-হয় প্রায়শ্চিত্তই করবো, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ডেকে যা বিধান দেন তাঁরা তাই-ই না-হয় করবো!

মহারাজ সব শুনে বলেছিল—যা শুনছি তাতে তো মনে হয় বউমাকে মোল্লারা একে যাদু করেছে—

—কী রকম?

—মুর্শিদাবাদের মসনদ তো এখন বউমাই চালাচ্ছে! বউমার কথায় নাকি নবাব ওঠেন-বসেন! দেখলেন তো নবাবের শ্যামা-সঙ্গীত শোনবার বহরটা। দেখেছিলেন, রামপ্রসাদের গান শুনতে শুনতে নবাবের চোখ দিয়ে কেমন ঝর-ঝর করে জল পড়ছিল? একটা উর্দু গজল পর্যন্ত শুনতে চাইলে না, শুধু শ্যামা-সঙ্গীত! বউমা না হলে এ আর কারো সাধ্যি ছিল!

গোপালবাবু বললে—তাহলে মোল্লারা আর কী করে যাদু করলে মহারাজ, আমাদের ছোট বউরানীই তো মোল্লাদের যাদু করেছে মনে হচ্ছে—

মহারাজ বললে—না গোপালবাবু, মনে হচ্ছে মোল্লারাই বউমাকে যাদু করেছে। নইলে বউমার কানে তো গিয়েছিল যে তাঁর স্বামী আমার বজ্‌রায় আছেন, তবু কেন গান শোনবার ছল করে নবাবের সঙ্গে এলেন না?

ছোটমশাই বললে—না মহারাজ, বেগম হয়ে কী করে আপনার বজরায় আসে সে? আসলে তো জাত গেছে। ভেবেছে আমি বুঝি তাকে আর গ্রহণ করবো না—

—সত্যিই তো, আপনিই বা তাকে গ্রহণ করবেন কী করে?

ছোটমশাই বললে—আপনি পথ বলে দিন আমি তাকে কেমন করে গ্রহণ করবো? আপনি হলেন নবদ্বীপের মহারাজা, পণ্ডিতদের বিধানদাতা। আপনি যা বলবেন আমি তাই করতেই রাজি। যদি বলেন তো আমি না-হয় মুসলমানই হবো বউ-এর জন্যে—

খবরটা ঠিক এই সময়েই এসে পৌঁছল। ইংরেজরা ফরাসডাঙা দখল করে নিয়ে নিয়েছে।

মহারাজ খবরটা শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো। তারপর বললে—আচ্ছা, আগে তো কালীঘাটে যাওয়া যাক্, তারপর ভেবে দেখা যাবে কী করবো—

চন্দননগর যখন ফরাসডাঙা ছিল এ সেই তখনকার কথা। একদিন ১৬৬৮

সালে ফরাসীরা জাহাজে করে এসেছিল ওই ফরাসডাঙায়। প্রথমে জলাজমি ছিল, তারপর বসতি হলো। পাকা বসত-বাড়ি হলো, কেল্লা উঠলো। ডুপ্লের আমলে সেই চন্দননগরের বাড়-বাড়ন্ত দেখে কে! তখন কলকাতার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলেছে চন্দননগর। দেখে ইংরেজরা কপালে চোখ তুলেছে। হিন্দুস্থানে অমন ভালো ভালো বাড়ি কোথাও আছে নাকি! ফরাসীদের জাহাজ নানা দেশ থেকে মাল কিনে নিয়ে আসে। জেদ্দা মক্কা, বসোরা, চায়না, পেগু সব জায়গা ঘুরে ঘুরে হুগলী নদীতে এসে থামে জাহাজগুলো।

তা গোলা-বারুদ কামান সব কিছু গিয়েছিল জাহাজে। আর হাজার হাজার সেপাই গিয়েছিল হাঁটাপথে। ফোর্ট ডি'অরলিনস শুধু কেল্লা নয়। ফরাসী ক্ষমতার প্রতীক ফোর্ট ডি'অরলিনস্। খোজা ওয়াজিদ্ ফরাসীদের সঙ্গে কারবার করে মোটা মোটা টাকা উপায় করছে তখন। জগৎশেঠজী ফরাসীদের সাড়ে সাত লাখ টাকা ধার দিয়ে মোটা সুদ আদায় করছেন। ফরাসীদের সঙ্গে ইংরেজদের লড়াই হলে তাদেরও তো মোটা লোকসান।

কিন্তু যুদ্ধ যখন বেঁধে গেলই, তখন আর তা হজম করা ছাড়া উপায় নেই।

যতই দিন যেতে লাগলো, ততই বড় খারাপ খবর কানে আসতে লাগলো। কেউ বলে, ইংরেজদের বোমা লেগে ফরাসীদের কেল্লা একেবারে গঙ্গায় ধ্বসে পড়েছে—

কেউ বলে, ইংরেজদের গুলীতে ফরাসীরা মরে গঙ্গায় ভাসছে।

যারা ওদিকে নৌকো নিয়ে মাল বেচা-কেনা করতে যায় তারা যে সব খবর আনে তা শুনে লোকে চমকে ওঠে। তবে কি ইংরেজ আর ফরাসীতে লড়াই মারামারি করে বেটারা কুপোকাত হবে নাকি?

লোকে ঘাটে গিয়ে মাঝি-মাল্লা দেখলেই জিজ্ঞেস করে—ফরাসডাঙার খবর কিছু জানো নাকি গো তোমরা?

আসলে কে কার খবর রাখে? আর খবর রেখেই বা লাভ কী? ততক্ষণ গাঁয়ের হরিসভায় গিয়ে হরিনাম শুনলেই পরকালের কাজ হয়। তুমি আমি খবর রেখে তো কিছু উপকার করতে পারবো না হে কারো। নিজেরও উপকার করতে পারবো না, পরেরও নয়। তার চেয়ে এই-ই ভালো। এই চাষবাস করে, গান গেয়ে আর কাঁসি বাজিয়ে। কাশিমবাজারে ফরাসডাঙা থেকে দলে দলে সব ফরাসীরা এসে উঠেছে কুঠিতে। ম'সিয়ে ল' তাদের কাছে সব গল্প শোনে। পুরো ফরাসডাঙাটাই নাকি একেবারে গুঁড়িয়ে ধুলো হয়ে গেছে। অত বড় কেল্লা ফোর্ট্ ডি'অরলিনস্—তার একখানা ইঁটও নাকি আর আস্ত নেই।

ওয়াটস্ এসে উঠেছিল নিজেদের কুঠিতে; ইংরেজদের কুঠি থেকে খুব বেশি দূর নয় ফরাসীদের কুঠি। ওয়াটস্ চুরোট খায় নিজের কুঠিতে বসে আর খবরগুলো শোনে। কিন্তু পাহারা দেওয়ার ব্যবস্থা রাখে দিনরাত। ফিরিঙ্গী সেপাইরা দিন-রাত বন্দুক নিয়ে পাহারা দেয় কুঠির সামনে। মসিয়েকে বিশ্বাস নেই। কবে কী মতি-গতি হয় কে জানে?

রাত্তির বেলা সব চুপচাপ থাকে। গঙ্গায় এদিক-ওদিক থেকে নৌকো-বজরা-বোট যাতায়াত করে। সেদিকে ওয়াটস্ সাহেবের পাহারাদারদের কড়া নজর থাকে। কোন্ দিক থেকে কখন কে এসে অ্যাটাক করে ঠিক নেই। চন্দননগরের পালিয়ে আসা ফরাসীদের নবাব শেলটার দিয়েছে, এটা ভালো কাজ হয়নি।

সেদিন অনেক রাত্রে কুঠিতে এসে হাজির হলো ফ্লেচার।

ফ্লেচার কর্নেলের লোক। এখানে-ওখানে খবর নিয়ে আসা-যাওয়া করে। অনেক দূর থেকে ঘোড়া ছুটিয়ে এসেছে। কুঠিতে ঢুকেই হাঁপাতে লাগলো।

কিন্তু ওয়াটস্ সাহেবের সামনে এসে বেশ খুশী হয়ে কথা বলতে লাগলো।

—কী খবর ফ্লেচার? কর্নেলের খবর কী?

—সব ভালো খবর স্যার। চন্দননগর কন্কার করে ফেলেছি আমরা।

কর্নেল ক্লাইভের ম্যাড্রাস ফিরে যাবার কথা ছিল। ওয়াটস্ও সেই কথাও জানতো। বেচারী রাইটার হয়ে এসেছিল ইণ্ডিয়ায়। অনেক দিন আছে। গড় গড় করে বাঙলা বলে, ফার্সী বলে। হিন্দুস্থানীও বলে। গোড়া থেকে ইণ্ডিয়ায় থেকে থেকে অনেক কিছু শিখেছে। তাই ওয়াটস্-এর ওপর লন্ডনের অনেক আস্থা। বাঙলার নবাবের নাড়ি-নক্ষত্র জেনে ওয়াটস্ এইটুকু বুঝেছে যে নবাবের যারা আমীর-ওমরাহ্, যারা নবাবের মিনিস্টার, তারা কেউ নবাবের ফেবারে নয়। ওই আড়াই হাজারী মনসবদার ইয়ার লুৎফ খাঁ, কিংবা মীরজাফর আলি খাঁ, কিংবা জগৎশেঠ, উমিচাঁদ সবাই নবাবকে হটিয়ে নবাব হতে চায়। আসল কাজ যখন হয়ে গেছে, যখন চন্দননগরের ফোর্ট অকুপাই করা হয়ে গেছে, তখন কর্নেলের আর বেঙ্গলে না-থাকলেও ক্ষতি নেই। এখন ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী সেফ্। এখন ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী আস্তে আস্তে নবাবকে হাতের মুঠোর মধ্যে পুরে ফেলতে পারবে! ফ্রেঞ্চরা নেই, ডেন্রা নেই, ডাচ্রা নেই, পর্তুগীজরাও নেই। থাকলেও তাদের কোনো প্যাওয়ার নেই।

কিন্তু ফ্লেচার যা বললে তা উল্টো কথা।

—কর্নেল ক্লাইভ আর্মি নিয়ে মুর্শিদাবাদের দিকে এগিয়ে হুগলীর মাঠে ক্যাম্প করে রয়েছে।

—কেন?

ফ্লেচার বললে—সেই কথা বলতেই আমি এসেছি স্যার—যদি নবাব ইংরেজদের অ্যাটাক্ করে তার জন্যে রেডি থাকতে হবে! হিয়ার ইজ্ দি লেটার ফ্রম কর্নেল—

ওয়াটস্ চিঠিটা নিয়ে পড়লে। পড়ে খানিকটা হাসলে মনে মনে।

তারপর বললে—কিন্তু নবাবকে ভয় পাবার এত কী দরকার? কর্নেল কি জানে না যে নবাবের ওয়ার করবার ইচ্ছেই নেই?

—তাহলে স্যার রাজা দুর্লভরাম কেন আর্মি নিয়ে পলাশীতে ওয়েট করছে?

—সে তো নবাবের বেগমের পরামর্শে!

—নবাবের বেগম?

ওয়াটস্ বললে—হ্যাঁ, সে আমি খবর পেয়েছি। নবাব যেদিন চন্দননগর অ্যাটাকের খবর পেলে সেইদিনই মরিয়ম বেগম মতিঝিলে গিয়েছিল। আমি সব খবর পেয়েছি। নইলে নবাব তো আমাদের টার্মস্ অনুযায়ী ক্ষতিপূরণের কিছু টাকা পাঠিয়ে দিয়েছে—

—তাহলে আপনি ওই কথাটা লিখে দিন স্যার কর্নেলকে। কর্নেল শুনে খুশী হবে!

ওয়াটস্ বললে—আমি লিখে দিচ্ছি, কিন্তু তুমি মুখে তাঁকে বলো এইসব কথা। বলো, নবাবকে আর আমাদের ভয় করবার দরকার নেই। শুধু মরিয়ম বেগম নবাবকে তাতাচ্ছে—ওই মরিয়ম বেগমকে শায়েস্তা করলেই কাজ হাসিল হয়ে যাবে—এই দেখ না, নবাবের চিঠির কপি তো আমার কাছেও রয়েছে—

বলে নবাবের চিঠির কপিটাও দেখালে। কপিতে লেখা আছে—'আমি

অঙ্গীকৃত টাকা প্রায় শোধ দিয়াছি, সত্বরই অবশিষ্ট প্রদত্ত হইবে। আমি সন্ধির নিয়ম অক্ষরে-অক্ষরে পালন করিতেছি, কিন্তু আপনাদের পক্ষে সে-রূপ দেখি না। ইংরেজ-সৈন্যের উৎপাতে হুগলী, হিজলি, বর্ধমান ও নদীয়া ত্রস্ত হইয়াছে। কালিঘাট কলিকাতার জমিদারি বলিয়া দাবি করা হইয়াছে। এসমস্ত যে আপনার জ্ঞাতসারে হইয়াছে, তাহা আমার বিশ্বাস হয় না। যাহা হউক, পরস্পরের মধ্যে যে বন্ধুভাবের অঙ্কুর হইয়াছে তাহার পোষণ করাই কর্তব্য। শুনিলাম ফরাসীরা আপনাদের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য দক্ষিণাপথ হইতে ফৌজ পাঠাইয়াছে। কিন্তু তাহারা আমার রাজ্যে বিবাদ উপস্থিত করিবার ইচ্ছা করিলে আমাকে লিখিবামাত্র সিপাহি-সৈন্য পাঠাইয়া তাহাদিগকে নিরস্ত করিব।'

ফ্লেচার বললে—কিন্তু এই লেটার লেখার পরেও কেন নবাব আর্মি পাঠালে রাজা দুর্লভরামের সঙ্গে?

—ওই তো বললুম, মরিয়ম বেগমের পরামর্শে!

—তা মরিয়ম বেগম কি লড়াই চায় কোম্পানীর সঙ্গে?

—চায় বলেই তো মনে হচ্ছে।

—তাহলে তো কর্নেল ঠিকই করেছেন। এখন তো কর্নেলের ম্যাড্রাস যাওয়া চলে না।

ওয়াটস্ চুরোটের ধোঁয়া ছেড়ে বললে—না, সে-ভয় নেই—

—কেন?

—কর্নেল বোধ হয় জানে না। মরিয়ম বেগম আর বেশি দিন নেই।

—তার মানে?

ওয়াটস্ বললে—আমি সেই জন্যেই আজ সব বন্দোবস্ত করতে যাচ্ছি। আজ মিড্-নাইটে আমি আড়াই-হাজারী মনসবদার ইয়ার লুৎফ খাঁর বাড়িতে যাচ্ছি—

—ইয়ার লুৎফ খাঁ সাহেব কি আমাদের ফেবারে?

ওয়াটস্ সাহেব বললে—টাকা দিলে সব ইন্ডিয়ান আমাদের ফেবারে। সবাই টাকা চায়—টাকা দিলে সবাই আমাদের জন্যে সব কিছু করতে পারে। নন্দকুমার যেমন আমাদের চন্দননগরের ব্যাপারে নিউট্র্যাল্ থেকেছে, তেমনি আরো বেশি টাকা দিলে যে-কেউ মরিয়ম বেগমকে মার্ডার পর্যন্ত করতে পারে!

ফ্লেচার চম্‌কে উঠলো—ইয়ার লুৎফ খাঁ কি নিজেই মার্ডার করবে বেগমসাহেবাকে?

—সে-সব কথা এখন বলবো না ফ্লেচার। আজ নাইটটা তুমি কুঠিতে থাকো. কাল আর্লি মর্নিং-এ তোমায় বলবো। কর্নেলের চিঠিও তোমার হাতে দিয়ে দেবো সেই সঙ্গে—

ওদিকে তখন মতিঝিলের ভেতর গোলাপী আতরের গন্ধে নবাবের মেজাজ অনেকদিন পরে খুশ হয়েছে। মরিয়ম বেগমসাহেবা নিজের হাতে ধূপ জেবলে দিয়েছে দরবার-ঘরে। বড় ভালো লাগছে গন্ধটা।

নবাব বললে—ভালো করেছো বেগমসাহেবা, ধূপের গন্ধটা আমার খুব ভালো লাগে—

—তা জানি আলি জাঁহা—দেখবেন আজকেও আপনার ঘুম আসবে—

নবাব বললে—আজ ক'দিন ধরেই তো খুব ঘুমোচ্ছি বেগমসাহেবা। অনেক দিন পরে এমন করে রাত্রে ঘুমোতে পাচ্ছি—তুমি আমার কাছে থাকলেই আমার ঘুম আসে—

—আমি রোজ ধূপ জেবলে দিতে বলবো খিদ্‌মদ্‌গারকে।

নবাব বললে—ধূপ জেবলে দিক, কিন্তু তোমাকে আমার সঙ্গে এখানে থাকতে হবে বেগমসাহেবা!

মরালী এক-পা পিছিয়ে এল। বললে—ছিঃ, আলি জাঁহা কি অত ছোট?

—কেন বেগমসাহেবা? আমি ছোট নই এ-কথা তোমাকে কে বললে? আমি তো লম্পট—

—লম্পট আর যে বলে বলুক, আমার কাছে আপনি অনেক বড় আলি জাঁহা—

নবাব চোখ দুটো বড় করে বললে—বেগমসাহেবা, তুমি দেখছি আমাকে ভালোবাসছো? তুমি যে আমাকে অবাক করে দিলে গো!

—কেন, আপনি কি কারো ভালোবাসা পাননি আলি জাঁহা?

নবাব বললে—ভালোবাসা? হয়তো পেয়েছি, হয়তো পাইনি। কিংবা হয়তো পেলেও তা জানতে পারিনি। ভেবেছি, আমার টাকার জন্যেই হয়তো সবাই আমায় ভালোবাসে!

মরালী বললে—আর আমি? আমি বুঝি আপনার টাকা চাই না?

—তুমি?

নবাব কী যেন ভাবলে। তারপর বললে—তা-ও তো বটে! সবাই-ই যখন আমাকে আমার টাকার জন্যে ভালোবাসে তখন তুমিই বা অন্যরকম হতে যাবে কেন! তুমিই বা আমায় কী দেখে ভালোবাসবে? আমার তো কোনো গুণ নেই। আমি লম্পট, আমি নীচ, আমি গোঁয়ার-গোবিন্দ! একমাত্র টাকা ছাড়া আমার দেবার মত আর কী-ই বা আছে বলো?

মরালী এবার আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে বসলো। নবাবের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললে—আলি জাঁহা যদি সত্যিই ভালোবাসার এত কাঙাল তো এটা কি জানেন না যে, ভালোবাসা পেতে গেলে ভালোবাসা দিতেও হয়?

নবাব বললে—তাহলে তোমাকে সত্যি কথাই বলি বেগমসাহেবা, ভালোবাসা যে কী জিনিস তা আমি জানি না। ছোটবেলা থেকে ভালোবাসা কেউ আমাকে শেখায়নি। তুমি বিয়ে করেছো, তুমি তোমার স্বামীকে ভালোবেসেছ, তোমার স্বামীও তোমাকে নিশ্চয় ভালোবেসেছে—ভালোবাসার ব্যাপারটা তুমি আমার চেয়ে হয়তো বেশি জানো। বলো তো, ভালোবাসা কাকে বলে!

মরালী বললে—একটা কথা বলুন তো আলি জাঁহা, আপনি আপনার মসনদকে ভালোবাসেন তো?

—তা বাসি। কিন্তু সে তো অন্যরকম!

—যে-রকম ভালোবাসাই হোক, মসনদ ছাড়তে তো আপনার কষ্ট হয়! কেউ যদি আপনার মসনদ কেড়ে নেয় তো আপনার মনে তো দুঃখ হয়। হয় না?

নবাব বললে—তা হয়।

—তা হলে আপনি যত মেয়েকে কেড়ে নিয়ে এসে চেহেল্‌-সুতুনে পুরেছেন, সেই মেয়েদেরও যে স্বামীকে ছেড়ে আসতে কষ্ট হয়, তা তো বোঝেন?

নবাব চাইলে মরালীর দিকে। বললে—তাহলে তোমাকেও কি খুব কষ্ট

দিয়েছি বেগমসাহেবা? তুমি কি এখনো তোমার খসমকে ভুলতে পারোনি তাহলে?

মরালী বললে—আপনি সে বুঝবেন না আলি জাঁহা।

—কেন বুঝবো না বেগমসাহেবা? তুমি বলো না, তুমি বুঝিয়ে দিলেই আমি বুঝবো!

মরালী বললে—সে-সব শুনলে আজ রাত্তিরে তাহলে আর আপনার ঘুম আসবে না—

—না না, তুমি বলো বেগমসাহেবা, বলো তুমি! আমি শুনবো।

মরালী বললে—আমরা মেয়েমানুষ, আমরা দু'বার ভালোবাসতে পারি না।

নবাব খানিকক্ষণ চুপ করে রইলো। তারপর বললে—আমায় ক্ষমা করো বেগম-সাহেবা, আমি তোমার ওপর খুব জুলুম করেছি। আমাকে তুমি মাফ্ করো।

মরালী বললে—ছিঃ আলি জাঁহা, আপনি না বাঙলার নবাব—

—তোমার কাছে আমি নবাব নই বেগমসাহেবা, এই এখন আমি আর নবাব নই।

—তা হোক, আপনার মসনদ সকলের আগে, তারপর আমি।

—না না বেগমসাহেবা, মসনদ-টসনদের কথা এখন আর আমাকে মনে করিয়ে দিও না। এখন আর ও-সব কথা শুনতে ভালো লাগছে না। এখন শুধু তুমি তোমার কথা বলো। আমি আর কোনো কথা শুনবো না। বলো, আমি তোমার জন্যে কী করবো? কী করলে তুমি আবার খুশী হবে?

মরালী বললে—কেন আলি জাঁহা ও-সব কথা তুলছেন?

—কেন তুলবো না বেগমসাহেবা? আমি যদি অন্যায় করে থাকি তো সে-কথা তুলতে দোষটা কী? আমি যদি পাপ করে থাকি তো সে-পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে আপত্তি কী?

মরালী বললে—কেউ যদি আপনার কথা এখন এই-সময়ে শুনতে পায় আলি জাঁহা?

—শুনলে ভাববে নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলা শুধু নবাবই নয়, নবাব মানুষও বটে!

—তা শুনলে আপনার লোকসান হবে আলি জাঁহা! লোকে আপনাকে আর ভয় করবে না!

নবাব বললে—ভয় না করুক, ভালো তো বাসবে! আমি তো এখন থেকে ভালোবাসাই চাই বেগমসাহেবা!

তারপর একটু থেমে বললে—কিন্তু তুমি আমার কথাটা এড়িয়ে যাচ্ছো বেগমসাহেবা, বলো, কী করলে তুমি খুশী হবে বেগমসাহেবা।

মরালী বললে—আমাকে খুশী করা আলি জাঁহার সাধ্য নয়।

—কী বলছো তুমি বেগমসাহেবা? জানো, আমি বাঙলার নবাব, আমি হুকুম করলে বাঙলার এক প্রান্ত থেকে আর-এক প্রান্ত এখনি কেঁপে উঠবে!

—তা হোক, আমি তাতে খুশী হবো না আলি জাঁহা। খোদাতালারও সাধ্য নেই আমাকে খুশী করে!

—কী বলছো তুমি বেগমসাহেবা? তোমার এত কষ্ট?

মরালী বললে—হ্যাঁ আলি জাঁহা—

নবাব কিছুক্ষণ চেয়ে রইলো মরালীর দিকে। তারপর বললে—তাহলে আমি তোমার এত বড় ক্ষতি করেছি বেগমসাহেবা—আমি তোমাকে এত কষ্ট দিয়েছি?

মরালীর চোখ দিয়ে তখন ঝর-ঝর করে জল পড়ছে। নবাব তাড়াতাড়ি

মরালীর ওড়নি দিয়ে তার চোখ দুটো মুছিয়ে দিতে যেতেই মরালী মুখটা ঘুরিয়ে নিজেই নিজের চোখ দুটো মুছতে লাগলো।

নবাব উঠে বসে মরালীর সামনে ঝুঁকে পড়লো।

বললে—জানো, বেগমসাহেবা, তুমিই আমার সামনে প্রথম কাঁদতে পেলে? এই প্রথম কেবল তোমাকেই আমার সামনে কাঁদতে দিলুম—

—আমার কসুর মাফ করুন আলি জাঁহা! আমি আর কখনো কাঁদবো না, এই আমি হাসছি—এই হাসছি—

নবাব বলতে লাগলো—এতদিন তোমার সব কথা শুনে এসেছি বেগমসাহেবা। তুমি যা বলেছো তাই করেছি। তোমার কথাতে আমি রাজা দুর্লভরামকে দিয়ে ফৌজ পাঠিয়েছি পলাশীতে—তোমার কথাতেই আমি কাশিমবাজারের ফরাসী কুঠি রাখতে দিয়েছি। কারণ তুমিই প্রথম আমাকে ঘুম পাড়িয়েছ! কিন্তু কেন আবার আমার মন খারাপ করে দিলে? কেন আমার সামনে তুমি কাঁদলে? আজ কি আর আমার ঘুম আসবে?

মরালী বললে—আপনি নিজের ঘুমের কথাই ভাবছেন, কিন্তু আর কেউ ঘুমোয় কি না তা কি কখনো ভেবেছেন? কখনো কি জানতে চেষ্টা করেছেন আপনার চেয়েও আরো বড় দুঃখ কারো আছে কি না?

নবাব বললে—আমি তো তাই বলছি আমি প্রায়শ্চিত্ত করবো। তোমার ওপর যত অত্যাচার হয়েছে আমি তা দূর করবো! বলো, আমি কী করলে তুমি খুশী হবে!

মরালী বললে—আমি তো বলেছি আলি জাঁহা, আমাকে খুশী করা আপনার সাধ্য নয়—

—কিন্তু আমিই তো তোমাকে তোমার স্বামীর কাছ থেকে চুরি করে এনে আমার চেহেল্‌-সুতুনে পুরেছি!

—চেহেল্‌-সুতুনে এনে আপনি আমাকে বাঁচিয়েছেন আলি জাঁহা!

নবাব অবাক হয়ে গেল।

—সে কি?

—হ্যাঁ, আলি জাঁহা। আপনি না নিয়ে এলে আমার আরো কষ্ট হতো। এখানে এনে আপনি আমাকে বাঁচিয়েছেন!

—কিন্তু এ কথা তো এতদিন আমাকে বলোনি? আমি তাহলে তোমার ক্ষতি করিনি?

মরালী বললে—না—

—তাহলে কি তোমার উপকার করেছি?

—হ্যাঁ!

নবাব আরো অবাক হয়ে গেল। মরালী বললে—আপনি আমাকে এখানে না নিয়ে এলে আমার সর্বনাশ হয়ে যেত আলি জাঁহা। আপনি আমাকে এখানে নিয়ে এসেছিলেন বলেই আমি বেঁচে গিয়েছি! নইলে হয়তো এতদিনে আমায় গলায় দড়ি দিতে হতো। আমাকে কেউ দেখতেই পেতো না আর! আমি তো ভেবেছিলুম গলায় পাথর বেঁধে নদীতে ঝাঁপ দেবো, নয় তো আগুনে পুড়ে মরবো—

—সে কী? তাহলে তুমি কি তোমার স্বামীকে ভালোবাসতে না?

মরালী বললে—আমার পোড়া-কপালে আরো অনেক দুঃখ আছে আলি জাঁহা—

—সত্যিই তুমি ভালোবাসতে না তোমার স্বামীকে?

মরালী বললে—ভালোবাসতে পারলে তো বেঁচে যেতুম আলি জাঁহা! কিন্তু আমার যে পোড়া কপাল। আমার কপালে যে ছাই লেখা আছে—

—কী বলছো তুমি বেগমসাহেবা! আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না—

মরালী বললে—আমার কথা কেউ-ই বুঝবে না আলি জাঁহা। বিয়ে হয়েও আমি স্বামী পেলুম না, স্বামী পেয়েও আমি তার বউ হতে পারলুম না—

নবাব বললে—তুমি আমাকে অবাক করলে বেগমসাহেবা, আমি তোমার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না—

—শুধু আপনি কেন আলি জাঁহা, কেউ আমার কথা বুঝতে পারবে না। আমার বিয়ে হয়েছে তবু আমি কারো স্ত্রী হতে পারিনি, আমি স্ত্রী হয়েছি তবু কেউ আমার স্বামী হতে পারেনি—

নবাব অনেকক্ষণ পরে বললে—তুমি কি যাদু জানো বেগমসাহেবা?

—কেন অমন করে বলছেন আলি জাঁহা!

—নইলে, কেন এমন করে আমাকে ভুলিয়ে দাও? কেন এমন করে লোভ দেখাও? আমি তো সকলের সব-কথাতেই রাজি হচ্ছি, আমি তো সকলের সব অপরাধই ক্ষমা করছি। উমিচাঁদকেও ক্ষমা করেছি, নন্দকুমারকেও ক্ষমা করেছি। তাদের সব অপরাধ ভুলে গিয়ে আমি তাদের ছেড়ে দিয়েছি। ভেবেছিলাম এবার থেকে ভালোবেসে দেখবো কেউ আমাকে ভালোবাসে কি না। কিন্তু তুমি তো আমার সব গোলমাল করে দিলে বেগমসাহেবা!

মরালী বললে—কেন আলি জাঁহা? আমি আপনার কী করলুম?

—তুমি? তুমিই তো আমাকে রামপ্রসাদ সেনের গান শোনালে! তুমিই তো আমাকে কোরাণ পড়ালে! আমি যে তোমাকে ভালবাসতে আরম্ভ করেছিলাম!

মরালী বললে—আমার ভয় হচ্ছে আলি জাঁহা, আজকে বোধহয় আপনার আর ঘুম আসবে না—

—না আসুক, ঘুম না-আসা আমার নতুন নয়।

মরালী বললে—না আলি জাঁহা, আপনার ঘুম না এলে যে আমার ঘুম আসবে না।

নবাব বললে—তুমি যাও বেগমসাহেবা। চেহেল্-সুতুনে চলে যাও, সারাফত আলির আরক খেয়ে ঘুমোওগে, যাও। আর তাছাড়া তোমার ঘুম না এলে আমার কী! তুমি তো আমাকে ভালোবাসো না—

মরালী বললে—মেয়েমানুষ কি দু'বার ভালোবাসে আলি জাঁহা? দু'বার ভালোবাসতে পারে?

নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলার চোখ দুটো যেন সে কথা শুনে একটু জ্বলজ্বল করে উঠেছিল। অনেকক্ষণ কিছু কথা বলেনি। মরালী বলেছিল—আপনি শুয়ে পড়ুন আলি জাঁহা—

নবাব বলেছিল—না, আমি ঘুমোব না—তুমি যাও, চলে যাও এখান থেকে—

মরালী তবু বলেছিল—অমন করে রাগ করতে নেই আলি জাঁহা, বাঙলার নবাবের রাগ করলে চলে না—সামান্য একটা মেয়েমানুষের ওপর রাগ করা তার মানায় না—

তবু নবাব শুতে যায়নি। বলেছিল—তুমি যাও, আমার যা খুশী তাই করবো, আমি কালই মঁসিয়ে ল'কে ডেকে কাশিমবাজার থেকে তাড়িয়ে দেবো—আমি বলবো ফরাসীরা আমার কেউ নয়, ইংরেজরাই আমার বন্ধু, ইংরেজরাই আমার

সব! আমি তোমার কোনো কথা শুনবো না—তুমি যাও—

হায় রে! সব পুরুষমানুষই কি একরকমের হতে হয়। ও নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলাও যা, ওই কান্তও তাই। ওই উদ্ধব দাসও তাই, ওই কর্নেল ক্লাইভও তাই। একবারে তুমি মুসলমান করে নেবে, একবার তুমি খ্রীষ্টান করে নেবে, আবার একবার হিন্দুর মেয়ের মত পতি-ভক্তি চাইবে, তা কী করে হয়! তোমরা তোমাদের নিজেদের দিকটাই দেখলে শুধু, আমার কথা তো তোমরা কেউই ভাবলে না! আমার যেন মনের বালাই থাকতে নেই। আমার যেন নিজের বাছ-বিচার বলে কিছু থাকা অপরাধ! আমি যেন পাথর, আমি যেন পাহাড়, আমি যেন মেয়েমানুষই নই!

মতিঝিল তখন অন্ধকার নিঝুম। মরালী রোজকার মত নবাবকে ঘুম পাড়িয়ে মতিঝিল থেকে চেহেল্-সুতুনে যাচ্ছিল। বাঁদীটা আগে আগে যাচ্ছিল। পেছনে মরালী। নিচেয় চবুতরে তাঞ্জাম তৈরি।

হঠাৎ গলার আওয়াজে একেবারে চমকে উঠেছে মরালী।

—কে? কৌন্ হ্যায়?

বাঁদীটা পেছন ফিরতেই দেখলে মরিয়ম বিবি থম্‌কে দাঁড়িয়েছে। কান্ত এতক্ষণ এই সুযোগটুকুর জন্যে বাইরে অপেক্ষা করছিল।

সামনে এসে বললে—তোমার বাঁদীটাকে একটু সরে যেতে বলো, একটা কথা আছে—

বাঁদীটা আড়ালে সরে গেল।

মরালী বললে—এবার বলো কী কথা? তাকে পেলে?

—কাকে?

—কাকে মনে নেই? তোমাকে অত করে বলে দিলুম—নবাব তার গান শুনতে চেয়েছে, তবু তোমার মনে থাকে না!

কান্ত বললে—তাকে খুঁজতেই তো গিয়েছিলুম মরালী। কিন্তু পাওয়া কি অত সোজা। এই তো এখন অনেক খুঁজে ফিরছি!

—তাহলে পাওয়া যাবে না?

—আবার যাবো। কিন্তু একটা খবর শুনে তোমাকে বলতে এলুম। এই একটু আগে কাশিমবাজারের ওয়াটস্ সাহেব আমাদের মনসবদার ইয়ার লুৎফ খাঁর বাড়িতে গিয়ে ঢুকলো।

—ঢুকলো তা কী?

—না, এত রাত্তিরে পালকি চড়ে একজন বোরখা পরে ঢুকলো দেখে খুব সন্দেহ হলো। ভাবলাম মনসবদার সাহেবের বাড়িতে এই অসময়ে কে ঢোকে। আমিও ভাব করলাম সেপাইটার সঙ্গে। সেপাইটা বশীর মিঞার খুব বন্ধু। শুনে বড় ভয় হলো মরালী। শুনলাম তোমাকে খুন করবার জন্যে নাকি ওরা ষড়যন্ত্র করছে। কী হবে?

মরালী বললে—আমাকে খুন করবে?

—হ্যাঁ মরালী, সেপাইটা ভেতরে গিয়ে চুপি চুপি শুনে এসে তাই বললে!

—কিন্তু আমি কী করেছি যে আমাকে ওরা খুন করবে?

কান্ত বললে—তুমি যে সেদিন ক্লাইভ সাহেবের বাড়ি থেকে চিঠি চুরি করেছিলে! তোমার ওপর যে তাই ওদের রাগ। তোমার কথাতেই তো নবাব পলাশীতে রাজা দুর্লভরামকে দিয়ে ফৌজ পাঠিয়েছে। তোমার কথাতেই তো

কাশিমবাজারের ফরাসীদের কুঠিতে নবাব সব ফরাসী উদ্বাস্তুদের থাকতে দিয়েছে। তোমার জন্যেই তো সকলের এত হেনস্থা! সব যে জানে সবাই!

মরালী আবার জিজ্ঞেস করলে—কী করে খুন করবে আমাকে? বিষ খাইয়ে?

কান্ত বললে—তা জানি না। মনসবদার সাহেব টাকা পেলে সব করতে পারে মরালী, ও সব করতে পারে! তুমি রোজ যে মতিঝিল থেকে রাত্তির বেলা চেহেল্-সতুনে যাও তা সবাই জানে। রাস্তায় যদি কোনোদিন কেউ কিছু করে ফেলে? আমার বড় ভয় করছে মরালী, তাই তোমাকে বলতে এলুম—

—ওয়াট সাহেব কি এখনো মনসবদার সাহেবের বাড়িতে আছে?

কান্ত বললে—হ্যাঁ, বোধ হয় আছে, আমি তো এই সেখান থেকেই আসছি—

মরালী বললে—ঠিক আছে, তুমি যাও—

বলে মরালী এগিয়ে গেল! কান্ত বললে—কোথায় যাচ্ছো?

মরালী বললে—মনসবদার সাহেবের বাড়িতে—

বলে বাঁদীর সঙ্গে মরালী তাঞ্জামে গিয়ে উঠলো। কান্ত সেইখানেই চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো। চেয়ে দেখলে তাঞ্জামটা ফটক দিয়ে বেরিয়ে ডান দিকে না গিয়ে বাঁ দিক বরাবর চলতে লাগলো।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের এই-ই প্রথম কালীঘাটে আসা নয়। তিনি কালীক্ষেত্রে এলে হালদার-বংশে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। এবার রামপ্রসাদ সেন সঙ্গে এসেছেন। নাটমন্দিরে একেবারে গানের বন্যা বয়ে গেছে। লোকে গান শুনে কেঁদে আর কুল পায়নি। বলেছে—আরো গান শুনবো সেনমশাই-এর—

তা সেন-মশাইকে বলতে হয় না কাউকে। তিনি ভক্তির আতিশয্যে গেয়ে-গেয়ে বিভোর হয়ে ওঠেন। দূর-দূর থেকে লোকে গান শুনে ভিড় জমাতে আসে। শুধু লোক নয়, ভিখিরিদেরও ভিড় জমে ওঠে। তারা প্রসাদ পায়, ভিক্ষেও পায়। পুজোরি-বামুনরা সিধে পায়, দক্ষিণেও পায়। আবার কবে মহারাজ আসবেন, কে বলতে পারে। সে কালীঘাট তো আর নেই এখন। এখন ফিরিঙ্গী-কোম্পানী আসার পর থেকে যাত্রী বেড়েছে বটে, আগের চেয়ে আরও ভালো হচ্ছে বটে, কিন্তু যে-রকম দু-দুটো লড়াই হয়ে গেল, তারপরে আর কি কারো বিশ্বাস থাকে! সারা কলকাতাটা তো একবার পুড়ে ছারখার হয়ে গিয়েছিল। আগুনটা আর একটু দক্ষিণ ঘেঁষে লাগলেই একেবারে মায়ের মন্দিরে আঁচ লাগতো।

তারা বলে—সেবারে মা'ই বাঁচিয়ে দিয়েছেন মহারাজ—

একজন বলে—এবারেও অনর্থ কাণ্ড বাঁধতো মহারাজ, লড়াই করতে করতে নবাবের ফৌজ একেবারে ওই ঢাকুরে পর্যন্ত হটে গিয়েছিল—

মহারাজ জিজ্ঞেস করলেন—তারপর?

—তারপর এই মা'ই আমাদের বাঁচিয়ে দিলেন। আমরা সব হালদাররা মিলে 'মা মা' বলে ত্রাহিস্বরে ডাকতে লাগলাম। বললাম—মা, এবার তুমি ঠেকাও তোমার ছেলেদের—। মা আর থাকতে পারলেন না, আমাদের ডাক শুনে মায়ের ত্রি-নয়ন দিয়ে আগুন ঠিকরে বেরোতে লাগলো—

একজন ভক্ত বললে—তা তো ই, ও দুটোই তো যবন, ওই কোম্পানীর

ফিরিঙ্গীরাও যবন, ওই নবাবও যবন। দুটো দলের একটাও হিন্দু হলে তবু কথা ছিল—

ক'দিন মহা-ধুমধামেই কাটলো মহারাজের। ছোটমশাই কিন্তু ছটফট করছিলেন প্রথম থেকেই। বহুদিন পরে এবার সবাই একসঙ্গে কালীক্ষেত্রে এসেছেন। রায়-গুণাকর রামপ্রসাদের গান শোনেন আর বলেন—মা, মা—

গোপালবাবু বললে—এবার প্রসাদের সন্দেশে চিনির ভাগটা বেশি মহারাজ—

মহারাজ বললেন—কী করে বুঝলে?

গোপালবাবু বললে—দেখছেন না পিঁপড়েগুলো সেবারে কত মোটা ছিল, এবারে কত রোগা হয়ে গেছে—

—তা চিনি বেশি থাকলে কি পিঁপড়েরা রোগা হয়ে যাবে?

গোপালবাবু বললে—তা রোগা হবে না? আপনি গুড়-খাওয়া পিঁপড়ের সঙ্গে ছানা-খাওয়া পিঁপড়ের লড়াই লাগিয়ে দিন, দেখবেন গুড়-খাওয়া পিঁপড়ে হেরে যাবে, ওদের তাকত কম—

রায়গুণাকর শুনছিলেন। বললেন—গোপালবাবুর যেমন কথা—

গোপালবাবু বললে—আমারও তো মহারাজ প্রথমে বিশ্বাস হতো না। আমার নিজের বাড়িতে পিঁপড়েগুলো আগে খুব মোটা-মোটা ছিল, খুব কামড়াতো। আমি তখন রাবড়ি খেতাম, ছানা খেতাম, দুধ খেতাম—

মহারাজ হাসছিলেন। জিজ্ঞেস করলেন—তারপর?

গোপালবাবু বললে—তারপর আপনি যখন আমার জমি দখল করে নিলেন, মাসোহারা কমিয়ে দিলেন, তখন হঠাৎ একদিন দেখি, পিঁপড়েগুলো রোগা হয়ে গেছে সব—

—কেন? তোমার মাসোহারা কমানোতে পিঁপড়েগুলো রোগা হয়ে গেল কী করে?

—আজ্ঞে, গুড় খেয়ে খেয়ে। তখন আর আমার রাবড়ি খাবার পয়সা নেই। গাই-গরু বেচে দিতে হলো, শুধু গুড় খাই। ঘরে গুড়ের নাগরি ছিল, সেই নাগরির গুড় খেয়ে খেয়ে পিঁপড়েগুলো সব রোগা হয়ে গেল—

মহারাজ বললেন—তা তুমি নিজে রোগা না হয়ে পিঁপড়েগুলো রোগা হলো কেন?

গোপালবাবু বললে—আজ্ঞে, পিঁপড়ের জান্ আর আমার জান্? আমি পিঁপড়ে হলে আমিও রোগা হয়ে যেতুম—

কালীকৃষ্ণ সিংহী মশাই বললে—মহারাজ, গোপালবাবু কী বলছে বুঝতে পারলেন তো?

মহারাজ বললেন—গোপালবাবু, তোমার জমির বন্দোবস্ত করে দিলে আবার দুধ-ঘি খাবে তো, না কেবল নেশা-ভাঙ করবে—

—নেশা-ভাঙ করতে গেলেও তো দুধ-ঘি লাগে মহারাজ, দুধ-ঘি না হলে কি নেশা জমে?

রায়গুণাকর বললেন—নেশা-ভাঙ কেন করেন গোপালবাবু? ওতে কী ফয়দা?

গোপালবাবু বললে—সে আপনি বুঝবেন না রায়গুণাকর, আপনি তো কাব্য-সরস্বতীর পায়ে মাথা মুড়িয়ে বসে আছেন। আপনার ও-সব দরকার নেই। কিন্তু ভাবুন তো আমার কথা। ভাবুন তো আমার পেশার কথা! আমার দুঃখ থাকতে নেই, আমার অসুখ-বিসুখ থাকতে নেই, আমার চোখে জলও থাকতে নেই। আমার

চোখে যদি কোনো দিন মহারাজ জল দেখতে পান তো আমার চাকরি গেল! ভাবতে পারেন আমার ছেলেটা যেদিন মারা গেল, সেদিনও আমায় মহারাজের সভায় এসে নিয়ম-মাফিক হাসাতে হয়েছে, নিয়ম-মাফিক মহারাজার দুর্ভাবনা ভোলাতে হয়েছে...আমার ছেলের মৃত্যুর খবর কেউ জানতে পারেনি দুদিন, আমি বউকে কাঁদতে বারণ করে এসেছিলাম রায়গুণাকর, পাছে মহারাজের কানে গেলে মহারাজ কষ্ট পান—

মহারাজ বললেন—সেই জন্যেই তো তোমাকে এত ভালবাসি গোপালবাবু, তোমার ছেলের মৃত্যুর খবর সেইদিনই আমার কানে এসেছিল, কিন্তু আমি তোমায় বলিনি—

—আপনি আগেই জানতেন?

গোপালবাবু মহারাজের কথা শুনে অবাক হয়ে গেল!

—সাধে কি তোমার চাকরি রয়েছে গোপালবাবু, আমি তোমাকে অনেক পরীক্ষা করেছি। তুমি জানতেও পারোনি। তোমার জমি কেড়ে নিয়ে দেখেছি, তোমার মাইনে কমিয়ে দিয়ে দেখেছি। মানুষকে কি সহজে চেনা যায়! সীতাকে কি বাল্মীকি অত সহজে ছেড়েছিলেন? তাঁকে অনেক পরীক্ষার মধ্যে ফেলে তবে তাঁকে সতী করে তুলেছিলেন। বাচস্পতি-মশাইকেও তোমার মত পরীক্ষা করে তবে তাঁকে সভাপণ্ডিত করেছিলাম। এই ভারতচন্দ্রকে অনেক পরীক্ষা করে তবেই রায়গুণাকর করেছি—আর তাই-ই যদি না করবো তো এতদিন এই রাজত্বে রাজ্য চালাচ্ছি কী করে?

ক'দিন ধরেই এই রকম আসর বসতো। ছোটমশাই থাকতো সঙ্গে। সবাই হাসতো, গল্প করতো। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের এই-ই ছিল নিয়ম। বাইরের কেউ বুঝতে পারতো না মহারাজের মনের মধ্যে কী ঝড় চলছে।

একদিন ডেকে বললেন—কী হলো? অত মুখ-ভার করে থাকেন কেন ছোটমশাই?

ছোটমশাই আর থাকতে পারছিলেন না। ক'দিন ধরে দেখছিলেন, মহারাজ হাসি-রসিকতা নিয়েই ব্যস্ত। অথচ চন্দননগর দখল করে ক্লাইভ সাহেবের ফিরে আসার কথাও শোনা হয়ে গেছে। প্রথম দিকে মহারাজের ভয় হয়েছিল হয়তো নবাব আবার ফৌজ নিয়ে ক্লাইভের সঙ্গে লড়াই করতে আসবে। কিন্তু কিছুই হলো না। কলকাতা থেকে কিছু লোক পালিয়ে গিয়েছিল গঙ্গার ওপারে। কিছু লোক কালীঘাটের মন্দিরের আশেপাশে এসে উঠেছিল। কয়েক দিনের মধ্যেই কালীঘাটে লোকজনের ভিড় বেড়ে গেল। হালদারদের আয় বেড়ে গেল, ভিখিরিদের তবিল ফুলে উঠলো।

মহারাজ আবার বললেন—আমি নবদ্বীপেরও মহারাজা ছোটমশাই, কিন্তু জানেন, আমি আমার নিজের স্ত্রীকেও শায়েস্তা করতে পারিনি, নিজের স্ত্রীকেও বশে আনতে পারিনি—

ছোটমশাই কথাটা শুনে অবাক হয়ে গেল।

—হ্যাঁ ছোটমশাই, তবে শুনুন গল্পটা। কেউ জানে না, আপনাকেই বলি। আপনি তো জানেন, আমি দ্বিতীয়বার বিবাহ করেছি, এবং যার পাণিগ্রহণ করেছি, সে উচ্চকুলের মেয়ে! আমার সঙ্গে সে-কন্যার বিবাহ দিতে ইচ্ছে ছিল না আমার শ্বশুরের। কিন্তু আমার অর্থ প্রতিভা প্রতিপত্তি দেখে পর্যন্ত লোভও সংবরণ করতে পারেনি। আমি ফুলশয্যার রাত্রে আমার বউকে জিজ্ঞেস করলাম—কেমন

লাগছে বলো? আমার সঙ্গে বিয়ে না হলে কি এই রকম রুপোর খাটে শুতে পারতে? তা শুনে আমার গৃহিণী কী বললে জানেন? বললে—আর কয়েক শ' বিঘে দূরে বিয়ে হলে আমি সোনার খাটে শুতে পারতাম।

বলে মহারাজ হো-হো করে হাসতে লাগলেন।

—তার মানে নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলার সঙ্গে শুলে সোনার খাটে শুতে পারতো, এইটেই বলতে চাইলে আর কি! উত্তরটা শুনে মনে প্রথমে একটু কষ্ট হয়েছিল বই কি। সে রাত্রে ভালো করে ঘুম হলো না। ভাবলাম, সারা বাংলা দেশের মহারাজ হয়েও আমি আমার সহধর্মিণীকে সুখী করতে পারিনি, আমার কীসের অহঙ্কার? আমার কীসের গর্ব?

—তারপর? তারপর কী করলেন?

—তারপর আর কী করবো? স্ত্রীর সামনে হাসিমুখে অপমানটা হজম করে নিলাম। কিন্তু মনের মধ্যে খচ্ খচ্ করে কাঁটা বিঁধতে লাগলো। আমার এত অগাধ সম্পত্তিও তো আমার গৃহিণীকে আকর্ষণ করতে পারলে না। মনে হতে লাগলো—তা হলে আমার এই সিংহাসনও তো আমার গৃহিণীর কাছে তুচ্ছ! তা সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠেও মনের অশান্তি ঘুচলো না। ডেকে পাঠালুম গোপালভাঁড়কে। ভাবলাম, ওকে পরখ করে দেখি। ওর বন্দোবস্তী জমি কেড়ে নিলুম, ওর মাসোহারা কমিয়ে দিলুম। ওর একমাত্র ছেলে একদিন মারা গেল। আমার কানে সে-খবরও এল। ওকে আমি কিছুই বললুম না। কিন্তু তখনো দেখলুম—ও সেই রকমই হেসে কথা কইতে লাগলো, ঘুণাক্ষরেও নিজের ছেলের মৃত্যুর খবরটা বললে না। রোজ যেমন হেসে ভাঁড়ামি করে যায়, সেদিনও তাই করে গেল। ভাবলাম—গোপালবাবু সত্যিই মহাপুরুষ! দুঃখ তো এ-সংসারে আছেই ছোটমশাই, কিন্তু সেই দুঃখকে এড়িয়ে গিয়ে যে তার ঊর্ধ্বে উঠতে পারে, যে শ্মশানে বসে জীবনের জয়গান গাইতে পারে, তাকেই তো লোকে বলে গোপাল-ভাঁড়। লোকে গোপালবাবুকে ভাঁড় বলেই জানে, ভাঁড় বলেই চিরকাল জানবে। কিন্তু আমি জানি ও মহাপুরুষ। ওই বাচস্পতি মিশ্র, রায়গুণাকর, ওঁদের মতই গোপালবাবু একজন সিদ্ধ মহাপুরুষ।

—তারপর?

—তারপর তো আজ শুনলেন! রামপ্রসাদ সেন মশাইকে ডেকে তাই তো আজ এমন করে গান শুনছি। হা-হুতাশ করে লাভ কী? নবাবের হা-হুতাশ নেই? আপনার সহধর্মিণীকে নিয়ে নবাব যে চেহেল্-সুতুনে তুলেছে, ভাবছেন নবাবই কি সুখী? নইলে রামপ্রসাদের গান শুনতে নবাব কখনো আমার বজরায় আসে? আর ওই যে ক্লাইভ! ওই ফিরিঙ্গী-বেটার কথাই ধরুন না কেন। নিজের দেশে বউ ছেলেমেয়ে ফেলে রেখে এখানে এই বন-জঙ্গল, মশা-মাছির মধ্যে পড়ে আছে! পড়ে আছে কেন? আপনি কি ভাবছেন লড়াই করে বাঙলা দেশ লুঠ করবার জন্যে? তা না-ও তো হতে পারে! হয়তো আপনার আমার মত ওর মনের কোনো জ্বালা আছে, কোনো যন্ত্রণা আছে। লোকে যা-ই বলুক, কিন্তু আমি বুঝতে পারি, আমাদের মত বেটার মনে কিছু কাঁটা বিঁধছে, নইলে এই রকম করে ওই ক'টা সেপাই নিয়ে নবাবের সঙ্গে কেউ লড়াই করতে পারে? কেউ কেউ বলবে দৈব ক্ষমতা। কিন্তু আমি বলবো, ওই জ্বালা-যন্ত্রণা, ওইটেই হলো দৈব ক্ষমতা। ওই দৈব ক্ষমতাটাই মানুষকে মহামানুষ করে। ওটা কাউকে করে বীর, কাউকে করে কবি, কাউকে আবার করে ভাঁড়। ওরা সবাই-ই মহাপুরুষ! আমি নিজে মহাপুরুষ

নই, কিন্তু মহাপুরুষ চিনতে পারি। মহাপুরুষদের চিনতে পারাটাও একটা ক্ষমতা। আমার সে-ক্ষমতা আছে ছোটমশাই! আমার তো অন্য কোনো গুণ নেই, আমার শুধু টাকা আছে। আমি টাকা দিয়ে তাই মহাপুরুষ পুষেছি। ওই রায়-গুণাকরকেও যেমন পুষেছি, তেমনি আবার গোপাল-ভাঁড়কেও পুষেছি। উপায় থাকলে আমি ওই ক্লাইভটাকেও পুষতুম—ও-ও একটা মহাপুরুষ!

ছোটমশাই এতক্ষণ চুপ করে সব শুনছিল।

খানিকক্ষণ থেমে বললে—তা হলে আমি কী করবো বলুন? আমি অনেকদিন হাতিয়াগড় ছেড়ে রয়েছি, আমার বড় গৃহিণী একলা আছেন, তিনিও তো চিন্তিত হয়ে আছেন!

মহারাজ বললেন—আর কিছুদিন সবুর করুন ছোটমশাই. আমি এবার এসেছি ক্লাইভের সঙ্গে দেখা করতে, সে তো আপনি জানেন—। লোকের কাছে শুধু বলেছি, কালীঘাটে মাকে দর্শন করতে এসেছি—ঠিক তা তো নয়।

ছোটমশাই বললে—কিন্তু আর কতদিন এখানে থাকবো?

মহারাজ বললেন—আপনার জন্যেই তো আমি এখানে রয়েছি, ক্লাইভ সাহেব রয়েছে হুগলীতে ছাউনি করে। ওদিকে দুর্লভরামও পলাশীর মাঠে সেপাই-সামন্ত নিয়ে ঘাটি আগলে বসে আছে—

—তা হলে?

—আমি হুগলী যেতে পারতুম। কিন্তু সেখানে আমি গিয়ে ক্লাইভ সাহেবের সঙ্গে দেখা করলে আবার নবাবের চরের নজরে পড়বো, সেই ভয়ে যাচ্ছি না। শুনেছি আজকালের মধ্যেই নাকি সাহেব ছাউনি তুলে দিয়ে পেরিন সাহেবের বাগানে আসবে—

—পেরিন সাহেবের বাগানে কেন?

মহারাজ বললেন—তা বুঝি জানেন না? ওখানে যে আবার সাহেব একটা এদিশি মেয়েমানুষ পুষেছে—

—সে তো শুনেছিলাম। সে সেই পাগলাটার বউ। যে-পাগলাটা ছড়া লেখে—

মহারাজ বললেন—বেটারা গরু-শুয়োর খায় তো, তাই বেটাদের গায়ে গরম খুব। মেয়েমানুষ না থাকলে ওরা রাত কাটাতে পারে না।

ছোটমশাই বললে—তা বলে পরের বউ নিয়ে থাকাটা কি ভালো মহারাজ?

—আরে মেয়েটাও যে খারাপ-জাতের। সে সোয়ামীর কাছেই যাবে না। সোয়ামীকে দেখতেই পারে না। সোয়ামীর নাম পর্যন্ত শুনতে পারে না। এ কী-রকম স্বভাব?

—আজ্ঞে, লোকটাও যে বাউন্ডুলে। অমন স্বামীটার সঙ্গে থাকেই বা কী করে?

মহারাজ বললেন—যাকগে, ও-সব নিয়ে আমাদের দরকারটা কী? যার-যার স্বভাব নিয়ে লোকে পৃথিবীতে আসে। লোকটার জ্বালা-যন্ত্রণা আছে, ওই নিয়েই ভুলে থাকতে চাইছে। আসলে কী জানেন? দুরকম তন্ত্রসাধক আছে পৃথিবীতে—এক রকম বীরাচারী, আর-এক রকম পশ্বাচারী, ক্লাইভ সাহেব হলো পশ্বাচারী সাধক—

তারপর বললেন—আর এই দেখুন না আমাদের সেনমশাইকে—সেই যে নাট-মন্দিরে গিয়ে গান গাওয়া ধরেছে, আর ছাড়ছে না—যে যাতে আনন্দ পায়—

হঠাৎ হালদার-বাড়ির এক পাণ্ডা ঘরে ঢুকলো।

—কী খবর হালদার মশাই?

—একজন আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে—

মহারাজ বুঝতে পারলেন। বললেন—ছোটমশাই, এবার আপনি একটু ও-ঘরে বসুন গিয়ে—

ছোটমশাই উঠে যেতেই শশী ঘরে এল। মহারাজ বললেন—কী খবর, শশী?

—খবর সব নিয়ে এসেছি মহারাজ—

—আগে মুর্শিদাবাদের খবর বলো। সেই মরিয়ম বেগমের খবর কিছু আছে?

—তারই খবর এনেছি। বেগমসাহেবা নবাবকে একেবারে হাতের মুঠোয় করে ফেলেছে মহারাজ। আমি তো আরো অনেক খবর আনতে পারতাম, কিন্তু বেগম-সাহেবা কান্তকে আমার সঙ্গে কথা বলতে বারণ করে দিয়েছে যে—

—কেন?

—আমাকে সন্দেহ করছে কেবল। বলেছে—ওর সঙ্গে কথা বলো না। আমি প্রথম-প্রথম তার কাছ থেকেই তো খবর আদায় করতুম। বলতুম—আমি গরীব লোক, ফৌজের দল থেকে নাম কাটা গেলে উপোস করবো, এই বলে খুব পটিয়েছিলুম, কিন্তু তারপর আর কথা বলতো না আমার সঙ্গে—এখন অন্য পথ ধরেছি—

—কী পথ?

—এখন ফকির সেজে মুর্শিদাবাদের রাস্তায় ঘুরে বেড়াই। আর সারাফত আলি বলে এক খুশ্‌বু-তেলওয়ালা আছে, তার একটা চাকর আছে, তার নাম বাদ্‌শা। সেই বাদ্‌শার সঙ্গে থাকি আর খবর আদায় করি। খুশ্‌বু তেলওয়ালা আমাকে খেতে দেয়। সে-ই আমাকে মরিয়ম বেগমের খবর দিলে।

—কী খবর?

—বললে, মরিয়ম বেগমসাহেবাকে খুন করবার চেষ্টা করছে ওরা।

—কারা?

—ওই উমিচাঁদ, নন্দকুমার আর ক্লাইভ সাহেবের মুন্সী নবকৃষ্ণ। ওদের সবাইকে যখন মরিয়ম বেগমসাহেবা ধরে নিয়ে গিয়েছিল, তখন ওখানে একজন লুকিয়ে লুকিয়ে ওদের কথা শুনেছিল।

মহারাজ সব শুনলেন মন দিয়ে। তারপর জিজ্ঞেস করলেন—আর এদিকের খবর কী? হুগলীর?

—আজ্ঞে, ওদিককার ছাউনি উঠিয়ে দিয়ে ক্লাইভ সাহেব কলকাতায় আসছে—

—আসছে?

—হ্যাঁ, সেপাইরা একদল তাঁবুর খুঁটি খুলছে দেখে এলুম। দেখে আমি আর দাঁড়াইনি সেখানে। সোজা চলে এসেছি।

মহারাজ জিজ্ঞেস করলেন—ঠিক জানো তো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ মহারাজ, ঠিক জানি।

মহারাজ বললেন—ঠিক আছে, তুমি যাও, মুর্শিদাবাদে গিয়ে কতদূর কী হলো খবর পাঠিও—

শশী চলে যেতেই মহারাজ ছোটমশাইকে ডেকে পাঠালেন। বললেন—চলুন ছোটমশাই, এবার যাহোক কিছু একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাবে, ক্লাইভ সাহেব কলকাতায় এসে গেছে।

ছোটমশাই-এর তবু যেন সন্দেহ গেল না। বললে—খবর পেয়ে গেছেন? কে

খবর দিলে?

—আমার লোক আছে ছোটমশাই। তার জন্যেই এতদিন অপেক্ষা করছিলাম এখানে, চলুন।

—আমি যাবো?

—হ্যাঁ, আপনিও থাকবেন আমার সঙ্গে। আপনি সব কথা খুলে বলবেন।

—সেবার তো বলেছিলাম সব। কিন্তু হঠাৎ গোলা-গুলি চলতে লাগলো, আমি ভয়ে চলে গেলাম। কিন্তু আপনার সঙ্গে গেলে কিছু ভাববে না তো?

মহারাজ বললেন—আমার রায়গুণাকর লিখেছে দেখেননি, 'বড়র পীরিতি বালির বাঁধ, ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ।' তা সে হতে পারে কর্নেল ক্লাইভ, আমিও তো মহারাজা। দেখা যাক্ না কী হয়—চলুন, তৈরি হয়ে নিন—

পেরিন সাহেবের বাগানে এসেই ক্লাইভ সাহেব খোঁজ নিয়েছে। দিদি রয়েছে সেখানে, দিদির বউ রয়েছে। মনটা ছট্‌ফট্ করছিল কয়েকদিন ধরেই।

—দিদি!

দুর্গারও প্রাণটা যেন হাঁফিয়ে উঠছিল। দেখা সাক্ষাৎ নেই, কিছু নেই, কেমন করে দিন কাটে! হরিচরণকেও যা-নয়-তাই বলে বকা-ঝকা করেছে।

বলেছে—তোমার সাহেব কী রকম লোক বাছা? আমাদের বলে গেল ক'দিন পরেই আসবে, আর আজ একমাস হয়ে গেল একেবারে আসার নাম-গন্ধও নেই, একটা খবর পর্যন্ত দেয় না—

হরিচরণ বলেছে—যুদ্ধ করতে গেলে কি কিছু জ্ঞান থাকে দিদি, কোনো দিকেই খেয়াল থাকে না—

—তা খেয়াল যদি না থাকে তো আমাদের কেন কথা দেওয়া? তুমি বাপু আমাদের বাড়িতে পৌঁছিয়ে দিয়ে এসো—আমরা এখানে আর থাকতে পারবো না—

আর ঠিক সেইদিনই দল-বল নিয়ে সাহেব এসে হাজির।

বললে—খুব রাগ করেছো তো আমার ওপর?

দুর্গা বললে—তা রাগ করবো না? তোমার না-হয় মাগ-ছেলে সাত-সমুদ্দুর পারে রয়েছে, আমাদের জন্যে তোমার ভেবে লাভ কী? আমরা তোমার কে বলো না যে, আমাদের কথা ভাবতে যাবে তুমি?

ক্লাইভ বললে—সে কি? আমি তোমাদের কথা ভাবছি না কে বললে?

হঠাৎ ওদিক থেকে হরিচরণ এসে খবর দিলে, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র এসেছেন সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে—

সাহেব একটু অবাক হয়ে গেল। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র! মহারাজ অব্ নদীয়া?

—অলরাইট, ডাকো তাকে, আমার ড্রয়িং-রুমে বসাও—

হরিচরণ বললে—সঙ্গে আর একজন ভদ্রলোক রয়েছেন—

—তাকেও ডাকো, দু'জনকেই বসাও, আমি যাচ্ছি দিদির সঙ্গে কথা বলে—

হরিচরণ চলে গেল।

দুর্গা ক্লাইভ সাহেবের মুখের দিকে ভালো করে চেয়ে দেখলে আবার। যখন

তার সঙ্গে কথা বলে তখন এক-রকম চেহারা, আবার যখন অন্য লোকের সঙ্গে কথা বলে তখন সে চেহারা একেবারে বদলে যায়। কিন্তু দুর্গা তো জানে না কাকে বলে রাজনীতি। তোমরা তো বেশ আছ দিদি, কোথা থেকে চাল-ডাল-তেল-নুন-ঘি আসছে কিছুই জানতে চাইছো না। তোমাদের নিজেদের বাড়িতেও তোমরা তার খবর রাখো না। খবর রাখে তোমাদের মেন্-ফোক্। আমার দেশে আমার ওয়াইফ পেগীও তোমাদের মত সেই আসল আমিটার খবর রাখে না। এই যে আমি এখানে কত কষ্ট করে কোম্পানীর এম্পায়ার তৈরি করতে চেষ্টা করছি, আমার সিলেক্ট কমিটিও তার কোনো খবর রাখে না। নবাবের বেগমরাই কি খবর রাখে নবাবের মনের কথার? যদি রাখতো তা হলে যে পৃথিবী চলতো না। তাই তোমাদের সামনে আমি হাসি, তোমাদের সঙ্গে আমি গল্প করি। নবাবরাও তাই বাইরে গান-বাজনা-ফুর্তি করে, শিকার করে, আর ভেতরে তারাও ঠিক আমার মতন। তারাও আমার মত বাইরে এক রকম, ভেতরে আর-এক রকম। তোমরা তো রাত্রে ঘুমোও। আমি কতদিন দেখেছি তোমরা আরাম করে রাত্রে ঘুমোচ্ছ। কিন্তু আমি? তোমরা জানতেও পারোনি যে, আমার ঘুম নেই রাত্রে। আমি যদি ঘুমিয়ে পড়ি তা হলে যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীও ঘুমিয়ে পড়বে। আর নবাব? গিয়ে দেখে এসো মুর্শিদাবাদের মতিঝিলে। ঘুমের জন্যে নবাবকে কত কসরত করতে হচ্ছে তা বেঙ্গলের মানুষ জানতেও পারছে না।

চন্দননগর থেকে ফিরে এসেই ক্লাইভের যেন আর শান্তিতে থাকা চলছিল না। কোথায় যেন সব গোলমাল পাকিয়ে উঠছিল। কাউকে তো বিশ্বাস করবার উপায় নেই ইন্ডিয়াতে। হুগলীর ফৌজদার নন্দকুমার একটা স্কাউন্ড্রেল। উমিচাঁদটা একটা বিস্ট। অথচ তাদের কাছ থেকেই হেল্প নিতে হবে। তাদের ডিস্‌রিগার্ড করা চলে না। খবরটা ঠিক সময়েই ফ্রেচার দিয়ে গিয়েছিল যে, নবাবের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে গেছে তিনজনে। মুন্সী নবকৃষ্ণ তিনজনের মধ্যে সব চেয়ে কম বয়েসী।

ক্লাইভ তাকে জিজ্ঞেস করেছিল—নবাব তোমাদের হঠাৎ ছেড়ে দিলেই বা কেন? হোয়াই?

নবকৃষ্ণ মুর্শিদাবাদ থেকে একেবারে সোজা সাহেবের কাছে এসে হাজির।

বললে—হুজুর, আসলে শয়তানি—

—শয়তানি মানে? নবাব তোমাদের সঙ্গে শয়তানি করেছে বলতে চাও?

—হুজুর, উমিচাঁদ সাহেব বললে এ রকম খেয়াল নবাব-বাদশাদের হয় মাঝে মাঝে। কেউ-কেউ মক্কায় চলে যাবার ভয় দেখায়। বাদ্‌শা আওরংজেব তাই করতো। ও শুনে আপনি আশ্বস্ত হবেন না। ভেতরে ভেতরে নবাব আপনাদের হিন্দুস্থান থেকে তাড়াবার মতলব করেছে—

—সে কী? কে বললে তোমাকে?

—আজ্ঞে, আমি নিজেই মুর্শিদাবাদ থেকে সব শুনে এলুম। সকলের সঙ্গেই যে দেখা করে এলুম। জগৎশেঠের সঙ্গে দেখা করলুম, দো-হাজারী মনসবদার ইয়ার লুৎফ খাঁর সঙ্গে দেখা করলুম, আমি সবাই-এর সঙ্গে দেখা করেছি হুজুর আপনার জন্যে।

—কিন্তু সেই চিঠিটা? যে চিঠিটা মরিয়ম বেগম আগলে করে নিয়ে গিয়েছিল? সেটা আদায় করতে পারলে?

—তা আপনিই বা কী রকম ল্যালাক্ষ্যাপা লোক হুজুর। অত ভালো লোক হলে সংসারে চলে? আপনি একটু ঘুঘু হোন না—যেমন কুকুর তেমনি মুগুর।

ভালো মানুষের আর কাল নেই তা জানেন? এই যে আমি। আমাকে দেখছেন তো! আমি ভালো-মানুষ বলেই এতদিন বসে বসে ভুগছি—এত হেনস্থা আমার—

—তুমি যে বলেছিলে মরিয়ম বেগমের কাছ থেকে তুমি চিঠিটা আদায় করবে যেমন করে হোক?

—সেই তো বলেছিলাম, আর সেই জন্যেই তো তোড়-জোড় চলছে। উমিচাঁদ সাহেব খুব ক্ষেপে গেছে হুজুর। ক্ষ্যাপবার তো কথাই। কোথাকার কোন্ মেয়েছেলে নবাবের বেগম হয়েছে বলে একেবারে ধরাকে সরা জ্ঞান করছে, আমাদের কাউকে একেবারে মানুষ বলেই মনে করে না। মনে করেছে চিরকাল বুঝি ওর এমনিই যাবে!

ক্লাইভ বললে—কিন্তু মুন্সী, শুনেছি ওই মরিয়ম বেগম নাকি হাতিয়াগড়ের রাজার সেকেণ্ড ওয়াইফ? হাতিয়াগড়ের রাজা একবার এসেছিল আমার কাছে, তার কাছেই শুনেছি—

মুন্সী বললে—তা যখন ছিল তখন ছিল, এখন যে আজ্ঞে, নবাবের সঙ্গে শুচ্ছে—

—শুচ্ছে মানে?

—শুচ্ছে মানে শুচ্ছে, স্লিপিং। সেম্ বেড্!

—সত্যি?

—সে কী হুজুর? আপনি অবাক হয়ে যাচ্ছেন? এ রকম কত মেয়েমানুষের সঙ্গে নবাব শোয়! নবাবের কি মেয়েমানুষের অভাব আছে ভেবেছেন? আমার পয়সা নেই তাই অত বিয়ে করতে পারি না। আমাদের হিন্দুদের মধ্যে হুজুর যারা কুলীন তারা দেড় শো দু' শো মেয়েমানুষের সঙ্গে স্লিপ করে। সে-সব আপনি বুঝবেন না। মরিয়ম বেগম নবাবের সঙ্গে শুয়ে শুয়ে খুব মজা পেয়েছে তো, গায়ে ভালো ভালো জড়োয়া গয়না পেয়েছে, বাঁদী-ঝি পেয়েছে, তাই সোয়ামীকে একেবারে ভুলে গিয়েছে। মেয়েজাতের যে মজাই ওই। যখন যেখেনে, তখন সেখেনে। তাই তো বলি আজ্ঞে, তুই এত নেমক্‌হারাম মাগী রে? একবার সোয়ামীর কথাটা ভাবলিনে?

—ছেলে-মেয়ে আছে নাকি মুন্সী?

—নেই, তবে ছেলে থাকলেও ওমনি করতো। কত মেয়েমানুষ যে ছেলে-মেয়ে ফেলে রেখে চেহেল্-সুতুনে গিয়ে রয়েছে তার ইয়ত্তা নেই হুজুর। এক দিকে যেমন দেখবেন বিধবা মেয়েরা সোয়ামীর চিতার ওপর আগুনে পুড়ে মরছে, তেমনি আবার সোয়ামীকে ছেড়ে পরপুরুষের ঘর করছে, তাও দেখতে পাবেন। সেই জন্যেই তো হুজুর আমাদের হিন্দুশাস্ত্রে মেয়েমানুষকে নরকের দ্বার বলেছে! মনু বলেছেন, মেয়েদের দরজা-জানালা বন্ধ করে ঘরে শেকল দিয়ে রাখবে। একটু ঢিলে দিয়েছো কি পরপুরুষের কাছে পালাবে!

ক্লাইভ শুনছিল। মুন্সীর কথাটা শুনে একটু ভাবলো। তারপর বললে—কিন্তু দেশে আমারও তো ওয়াইফ্ আছে, সে তো আমাকে ছেড়ে কোথাও যায় না। আমি তো তাকে শেকল দিয়ে বেঁধে রাখিনি—আমি তো তাকে সেখানে রেখে দিয়ে এত দূরে পড়ে আছি—

মুন্সী বললে—কী বলছেন আপনি হুজুর? আপনাদের সঙ্গে আমাদের তুলনা? আপনারা হলেন গিয়ে দেবতার জাত। হিন্দুশাস্ত্রে আপনাদের বলেছে শ্বেতদ্বীপের মানুষ। আমরা যে আপনাদের চেয়ে নীচু জাত হুজুর—

—কিন্তু—

ক্লাইভ বললে—কিন্তু আমার এই বাগানবাড়িতে দু'জন হিন্দু লেডী আছে মুন্সী, তারা তো খুব ভালো! একজন উইডো আর একজন ম্যারেড্! তারা তো খুব ভালো লোক মুন্সী! তারা ড্রিঙ্ক করে না, বীফ্ খায় না, ফাউল খায় না।

মুন্সী বললে—তা তো হলো, কিন্তু তার হাজব্যাণ্ডের কাছে যায় না কেন, সেইটে আগে বলুন—

—তার হাজব্যাণ্ডটা খুব বড় পোয়েট মুন্সী! খুব ভালো পোয়েট্রি বানায়—কিছুতেই তার কাছে যাবে না এরা।

—তবেই বুঝুন! কেন যায় না?

ক্লাইভ বললে—সত্যি বলো না মুন্সী, যায় না কেন?

মুন্সী বললে—যায় না কেন, বলবো?

—বলো!

মুন্সী বললে—যায় না, শুধু লোকটা বাউণ্ডুলে বলে! পোয়েট্রি দিয়ে তো পেট ভরবে না হুজুর। পোয়েট্রি শুনতে ভালো, পোয়েট্রি সুর করে গাইতেও ভালো, কিন্তু পোয়েট্রি দিয়ে তো গয়না হয় না, পোয়েট্রি দিয়ে তো শাড়ি হয় না, ভাত হয় না। অমন জিনিস নিয়ে কী হবে হুজুর? সেইজন্যেই তো হুজুর আপনার পায়ের তলায় পড়ে আছি যে, প্রাণ ভরে আপনাকে সেবা করবো।

ক্লাইভ বললে—আমি আর তোমার কী করতে পারবো মুন্সী, আমার টাকা কোথায়?

মুন্সী বললে—এখন টাকা নেই, কিন্তু পরে তো টাকা হবে, তখন যেন দাসানুদাসকে মনে রাখেন—

ক্লাইভ বললে—পরে কী করে টাকা হবে? আমি তো কোম্পানীর চাকরি করি, কোম্পানী আমাকে মাইনে দেয়—

—আপনার টাকা হবে হুজুর, আমি বলছি আপনার টাকা হবে। ভগবান আপনাকে দেবে। আমি তো আমার গডেস্ সিংহবাহিনীর কাছে তাই প্রে করি হুজুর যে, সাহেবকে আমার অনেক টাকা পাইয়ে দাও—আপনার টাকা হলেই আমার টাকা হবে!

—কিন্তু টাকা আমার কী করে হবে, তাই বলো না?

মুন্সী বললে—মুর্শিদাবাদের নবাবের কি কম টাকা আছে ভেবেছেন?

—মুর্শিদাবাদের নবাবের টাকা আমি কী করে পাবো? নবাব আমাকে দেবে কেন?

মুন্সী বললে—টাকা কি কেউ কাউকে দেয় হুজুর? আপনি চাইলেই পেয়ে যাবেন!

—চাইলে পাবো কেন?

—ভয় পেয়ে আপনাকে নবাব দিয়ে দেবে!

—নবাব আমাকে ভয় পাবে কেন?

—ভয় না পেলে আমাদের তিনজনকে ছেড়ে দিলে কেন তাই বলুন? সবাই তো আমাকে বললে, নবাব ক্লাইভ সাহেবকে ভয় পেয়ে বলে আপনাদের ছেড়ে দিলে। ইয়ার লুৎফ খাঁ সাহেব তাই বললে, মীরজাফর সাহেব তাই বললে, জগৎশেঠজীও তাই-ই বললেন।

—সবাই নবাবের এগেন্‌স্টে?

—হ্যাঁ সায়েব, সব্বাই। এতদিন অন্য লোকের মুখে শুনে এসেছেন, এবার আমার মুখে শুনলেন। আমি তো আর আপনাকে মিথ্যে কথা বলবো না। মিথ্যে কথা বলা বড় পাপ হুজুর, যে মিথ্যে কথা বলে সে নরকে যায় হুজুর, সে রৌরব নরকে গিয়ে পচে মরে—

ক্লাইভ সাহেব মুন্সীর কথা শুনে খানিকক্ষণ ভাবতে লাগলো।

মুন্সী তখনো বলছে—এই যে আপনি চন্দননগর দখল করলেন, আগে কত ভয় পেয়েছিলেন, আগে কত সন্দেহ করছিলেন, কিন্তু কিছু হলো? নবাব কিছু করতে পারলে? পারবে কী করে? ওদিকে দিল্লী থেকে পাঠান আহ্‌মদ শা আব্‌দালী বাঙলা দেশের দিকে তো আসছে, তখন কত দিকে যুদ্ধ করবে? কে মদত্‌ দেবে? নবাবের দলে তো কেউ নেই।

—কেন, ফরাসীরা? জেনারেল বুশী? মঁসিয়ে ল?

—আজ্ঞে, ফরাসীরা আর আপনারা? আপনার বুদ্ধির কাছে ফরাসীর বুদ্ধি? নবাব কি ভাবছেন জানে না আপনার বুদ্ধির কথা?

ক্লাইভ বললে—বুদ্ধির কথা বলছো বটে, কিন্তু মরিয়ম বেগমের তো আরো বুদ্ধি—আমার চেয়েও বুদ্ধি, নইলে আমাকে ঠকিয়ে যায়?

মুন্সী বললে—তার কথাই তো হচ্ছে, এবার দেখুন না কী হয়, তাকে কী করি—

—কী করবে? মার্ডার?

মুন্সী বললে—সে যখন হবে, তখনই শুনতে পাবেন—

এসব কথা আগেই হয়ে গিয়েছিল। সেই হুগলীতে ক্যাম্প করে থাকবার সময়। তারপর সেখান থেকে ওয়াটস্‌-এর চিঠি এসেছে। ফ্রেঞ্চদের সঙ্গে ঝগড়া বাধবার কথাও জানিয়েছে। রাত্রে যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে তখন ক্লাইভ আবার বিছানা থেকে উঠলো। নবকৃষ্ণকে ডাকালে।

নবকৃষ্ণ সামনে আসতেই ক্লাইভ বললে—মুন্সী, নবাবের খাজাঞ্চীখানায় কত টাকা আছে?

মুন্সী বললে—কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা হুজুর।

—তবু আন্দাজ কত?

—তা আজ্ঞে এত টাকা যে, আপনি এক হাতে বইতে পারবেন না। আপনি আমি দু'জনে মিলেও বইতে পারবো না—পুরুষানুক্রমে জমে আসছে কি না। আসলে সে টাকার হিসেব নেই। নবাব নিজেও জানে না কত টাকা আছে। বেগমরাও জানে না—

ক্লাইভ বললে—যদি নবাবের সঙ্গে ঝগড়া বাধাতেই হয় তো ভালো করেই বাধুক। এই দেখ, নবাব কী চিঠি লিখেছে পড়ে দেখ—

মুন্সী পড়তে লাগলো—'আমি কোম্পানীর কাছে যে টাকা দিবার জন্য প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ, তাহার প্রায় সবটাই শোধ করিয়াছি। আমি সন্ধির শর্তও অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতেছি। কিন্তু আপনাদের পক্ষে সেরূপ দেখি না। ইংরেজ সৈন্যের অত্যাচারে হুগলী হিজলী বর্ধমান ও নদীয়া ত্রস্ত হইয়াছে। এ-সমস্ত যে আপনাদের জ্ঞাতসারে হইতেছে, ইহা আমার বিশ্বাস হয় না। শুনিলাম ফরাসীরা আপনাদের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য দক্ষিণাপথ হইতে ফৌজ পাঠাইয়াছে। তাহারা আমার রাজ্যে বিবাদ উপস্থিত করিবার ইচ্ছা ক[illegible] আমাকে লিখিবামাত্র

সৈন্য পাঠাইয়া তাহাদিগকে নিরস্ত করিব।'

ক্লাইভ জিজ্ঞেস করলে—চিঠি পড়ে তোমার কী মনে হয় মুন্সী?

মুন্সী বললে—মনে হচ্ছে এর পেছনে মরিয়ম বেগমের হাত আছে হুজুর—

—কেন?

—নবাবকে মরিয়ম বেগম বুদ্ধি দিয়েছে। বলেছে, একটু নরম সুরে চিঠি লিখলে কাজ হাঁসিল হবে। নইলে নবাব তো এ রকম নরম সুরে চিঠি লেখবার লোক নয়! আপনি এ চিঠির উত্তরে কড়া করে জবাব দিন হুজুর—বেশ কড়া। আপনি নরম হবেন না—

—তা হলে কী লিখবো বলে দাও—

মুন্সী কলম নিয়ে বসলো। তারপর লিখলে—'আপনার পত্র পাইয়াছি। কিন্তু কাশিমবাজারের ফরাসীগণকে উচ্ছেদ করিবার সম্মতি না দিলে ইংরেজদের সঙ্গে নবাবের যে সদ্ভাব আছে তাহা প্রমাণ হইবে না। আপনি অবিলম্বে কাশিমবাজারের ফরাসী-কুঠি উঠাইয়া দিন।'

চিঠিটা পড়ে ক্লাইভ নীচেয় নিজের নাম সই করে দিলে।

সই করার পর মুন্সী চিঠিটা নিয়ে মুর্শিদাবাদের দরবারে পাঠানোর বন্দোবস্ত করতে গেল। যাবার আগে বললে—আপনি আর এক কাজ করুন হুজুর, কাশিম-বাজারের ওয়াটস্ সাহেবকে লিখে দিন যেন এখনি একবার ইয়ার লুৎফ খাঁ সাহেবের সঙ্গে দেখা করেন—

ক্লাইভ বললে—তাতে তো সবাই জেনে যাবে মুন্সী?

—আজ্ঞে, জানবে কী করে? মেয়েমানুষের মত বোরখা পরে অনেক রাত্রে দেখা করতে বলবেন। পালকিতে করে যেতে বলবেন, তা হলে কেউ আর সন্দেহ করবে না। ইয়ার লুৎফ খাঁকে যদি নবাব করে দেন হুজুর তো তিনি আপনাদের হয়ে সবকিছু করবেন—

এর পর সেই চিঠিও লেখা হয়েছিল। মুন্সী নবকৃষ্ণের যা কাজ তা সে করেছিল। এখন তোমার হাত-যশ আর আমার ভাগ্য। নিজের দেশের লোকেরা যা করেনি আমার, তাই-ই তুমি করে দেবে। এতদিন তোমাকে ডেকেছি মা, তুমি শোনোনি। এবার হীরের কানবালা গড়িয়ে দেবো মা তোমার কানে, জড়োয়া গয়না দিয়ে মুড়ে দেবো তোমার সর্বাঙ্গ, তুমি সদয় থাকলে এই মুন্সী নবকৃষ্ণ তোমার জন্যে সবকিছু করবে। আমার ওপর একটু দৃষ্টি দিও মা—

তা তার পরদিনই বাগানে এসে পৌঁছেছিল ক্লাইভ সাহেব। কতদিন পরে আবার আসা।

দুর্গা বললে—তোমার সঙ্গে যে একটু কথা বলবো ধীরে-সুস্থে বাবা, তারও উপায় নেই—ও কারা এল তোমার সঙ্গে দেখা করতে—

—ওদের তুমি চিনবে না দিদি। ওরা নিজের নিজের মতলব হাঁসিল করতে আসে আমার কাছে।

—যাকে-তাকে তুমি আমল দাও কেন বাবা? তোমারও কাজ-কর্মের ক্ষেতি, ওদেরও ক্ষেতি—

ক্লাইভ বললে—তা বললে কি চলে দিদি! আমরা এখেনে পরের দেশে এসেছি, সকলের সঙ্গে আমাদের ভাব রাখতে হয়, নইলে কোনদিন তাড়িয়ে দেবে যে—

দুর্গা বুঝতে পারতো না এসব কথা। বলতো—তা যাকেই আসতে দাও বাপু,

সেই পাগলটাকে যেন আসতে দিও না—আমার বউকে নিয়ে হয়েছে এক জ্বালা। এ সোয়ামীর কাছেও যাবে না, নিজের বাড়িতেও যেতে পারবে না—তোমাদের যুদ্ধু কি আর থামবে না বাপু? আমরা কাজ-কম্ম আর করতে প্যারবো না?

ক্লাইভ বললে—এই তো সবে এলুম দিদি ফরাসডাঙা থেকে। এইবার যেখানে বলবে সেখানেই পাঠিয়ে দেবো।

দুর্গা বললে—তা নবাব শায়েস্তা হলো? না, এখনো তেমনি পরের মেয়েমানুষের দিকে নজর দিয়ে দিয়ে বেড়াচ্ছে?

ক্লাইভ বললে—এখন নবাব মরিয়ম বেগমের কথায় উঠছে বসছে দিদি—

—সে কে? সে কোন্ বেগম?

—হাতিয়াগড়ের রাজার সেকেন্ড ওয়াইফ্—দ্বিতীয়পক্ষের বউ। তার নাম এখন হয়েছে মরিয়ম!

দুর্গার পা থেকে মাথা পর্যন্ত শিউরে উঠলো! সেই মরালী নাকি? সেই মরালীই মরিয়ম বেগম হয়েছে? তার এত ক্ষমতা হয়েছে! তার এত প্রতিপত্তি হয়েছে?

ক্লাইভ সাহেব বললে—আমি তা হলে আসি দিদি, ওরা বসে আছে অনেকক্ষণ—

সাহেব চলে যেতেই দুর্গা ভেতরে গিয়ে ডাকলে—ও বউরানী, মুখপুড়ীর কান্ড শুনেছো? মুখপুড়ী ভাতারকে ছেড়ে চেহেল্-সুতুনে গিয়ে নবাবকে হাত করে ফেলেছে গো!

সব শুনে ছোট বউরানীও অবাক।

দুর্গা বললে—আমি এতদিন তাই ভাবছি, সে মুখপুড়ী সেখানে গিয়ে কী করছে! আমি তার জন্যে ভেবে ভেবে মরছি। ভাবছি, শোভারামের মা-মরা মেয়েটাকে আমরা জলে ফেলে দিলাম গো। আর সে মেয়ে কিনা সেখানে পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে আরাম করে নব্যবের সেবা করছে?

ছোট বউরানী বললে—তা এক কাজ করলে হয় না দুগ্যা? একবার খবর পাঠালে হয় না মরালীকে যে, আমরা এখানে কষ্ট করে পড়ে আছি, আমাদের যাতে নবাব আর কিছু না করে?

—কী করে খবর পাঠাই বউরানী? সায়েবকে বললে সায়েব যদি কোনো রকমে খবরটা পাঠাতে পারে।

—আর নয় তো খুলে বললে হয় সায়েবকে, সমস্ত। বললে হয় যে, আমরা আসলে কে! খুলে বললেই হয় যে, আমি হাতিয়াগড়ের ছোটমশাই-এর বউ?

দুর্গা ভাবতে লাগলো। বললে—দাঁড়াও বাপু, অত তাড়াহুড়ো করো না, শেষকালে কী করতে কী হয়ে যাবে, অনর্থ কান্ড বাধবে তখন। তখন তোমাকে আমি আর সামলাতে পারবো না। আমাকে একটু ভাবতে দাও—

ছোট বউরানী রেগে গেল। বললে—ভাবতে ভাবতেই যে তোর বছর কাবার হয়ে গেল দুগ্যা, আর কত ভাববি? এদিকে আমি তো আর থাকতে পারছিনে—

দুর্গা বললে—না বউরানী, আর একটু ধৈর্য ধরে থাকো বাপু, শেষকালে কোন্‌দিন জানাজানি হয়ে গেলে নাকালের একশেষ হয়ে যাবে—

হঠাৎ ওদিক থেকে হরিচরণ আসতেই কথা বন্ধ হয়ে গেল দুর্গার।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র বললেন—এই বাঙলা দেশের কপালে অনেক দুঃখভোগ গেছে সাহেব। দিল্লীর কথা ছেড়ে দিন, দাক্ষিণাপথের কথাও ছেড়ে দিন। সে অনেক দূরের দেশ। তবু যেটুকু কানে আসে তাতে বুঝতে পারি, দিল্লীর বাদশার ক্ষমতা সব দক্ষিণাপথে চলে গেছে। হিন্দুস্থানের ক্ষমতার কেন্দ্র এখন দক্ষিণাপথ। বাদশা আওরংজেব তা বুঝেছিলেন বলেই শেষজীবনে আবার নিজের ক্ষমতা ফিরে পেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু যা হবার নয়, তা কেমন করে হবে? এখন আবার হিন্দু রাজত্ব ফিরে আসছে। বাজিরাও, সিন্ধিয়া, হোলকার, গাইকোয়াড়, তাদের ওপরেই আমাদের এতদিন ভরসা ছিল। এখন এসেছে বালাজী রাও—

ক্লাইভ সব শুনেছিল মন দিয়ে। জীবনে এই প্রথম দেখলে এই কিংটাকে। সঙ্গের লোকটা চুপ করে বসে ছিল।

বললে—দেখুন মহারাজ, আমরা এসেছি ব্যবসা করতে।

—তা তো জানি সায়েব। আপনারা তো আর থাকতে আসেননি এখানে—

—আর আমরা তো চলেই যাচ্ছিলাম ইণ্ডিয়া ছেড়ে। তিন হাজার টাকা ইয়ার্লি পেশ্‌কস্‌ দিয়ে আমরা ব্যবসা করবার সনদ পাই এখানে, কিন্তু কোম্পানীর কিছুই প্রফিট থাকে না তাতে—সে-সব পুরোন ইতিহাস। আজকে যখন লাভ হতে শুরু করেছে তখন নবাব আমাদের চলে যেতে বলছে—

কৃষ্ণচন্দ্র বললেন—আপনারা যাবেন না, মোগল বাদশার দিন শেষ হয়ে গেছে, মারাঠারাও নিজেদের মধ্যে ঝগড়া লাগিয়েছে। আসলে পাপের রাজ্য থাকে না সাহেব। পাপ করলে তার প্রতিফল পেতেই হয়। আমরা হিন্দুরা জন্ম থেকেই তা বিশ্বাস করি। নইলে বাদশা আওরংজেব মরবার সময় কী বলেছিলেন জানেন তো?

—না। কী বলেছিলেন?

মহারাজ বললেন—অত বড় বাদশা, মরবার সময় তাঁর হয়তো হুঁশ হয়েছিল। বলে গেছেন—'আমি সংসারে আসবার সময় কিছুই সঙ্গে করে আনিনি, কিন্তু যাবার সময় পাপের বোঝা সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছি। ভগবানের দয়ার ওপর বিশ্বাস আমার রয়েছে, কিন্তু আমি যা পাপ করেছি তার কথা ভেবে মন আমার অস্থির। এখন যা হয় হোক, আমি অকূল সমুদ্রে জীবন-তরী ভাসিয়ে দিলাম—'

ক্লাইভ বললে—দেখছি, আপনাদের ইণ্ডিয়াতে মহারাজা থেকে আরম্ভ করে পথের ভিখিরি পর্যন্ত সব্বাই ফিলজফার মহারাজা—

—এ আমাদের বোধহয় মাটির গুণ সায়েব।

ক্লাইভ বললে—ফিলজফারদের রাজনীতি করতে না আসাই ভালো মহারাজ। ফিলজফারদের বিয়ে করাও উচিত নয়—

মহারাজ বললেন—তা তো বটেই! সেই জন্যেই তো আমি আমার রাজসভায় সবরকম লোক পুষেছি। কেউ আমার পাঁজি লেখে, কেউ কুস্তী শেখায়, কেউ কাব্য লেখে, কেউ যুদ্ধ করে, কেউ আবার শুধু ভাঁড়ামি করে।

সাহেব বললে—আমার এই বাগানের কুঠিতে একটা হিন্দু বউ আছে মহারাজা, তার হাজব্যাণ্ডটাও ফিলজফার। সে বলে সমস্ত পৃথিবীটাই নাকি তার দেশ—সে পোয়েট, সে গান লেখে—

মহারাজ বললেন—কিন্তু তাকে আপনি কেন রেখেছেন এখানে?

সাহেব বললে—কী করবো? সে যে হাজব্যাণ্ডের কাছে যাবে না।

—তা হলে কে আছে তার বাপের বাড়িতে? সেখানে পাঠিয়ে দিন!

সাহেব বললে—কী করে পাঠাবো? আপনি তো জানেন নবাবকে। পাঠাতে গিয়ে যদি নবাবের স্পাইদের নজরে পড়ে যায়? মরিয়ম বেগমকে তো ওইভাবেই নবাব নিজের হারেমে নিয়ে গিয়ে তুলেছে।

—এই তো, মরিয়ম বেগম তো এঁরই স্ত্রী সায়েব। এঁর কথা বলতেই তো আপনার কাছে এসেছি।

ক্লাইভ বললে—আমি জানি। জানেন, আপনার ওয়াইফ খুব ক্লেভার লেডী!

ছোটমশাই বললে—চালাক? কিন্তু তেমন চালাক তো নয়।

—না না, ভেরি ক্লেভার।

—কিন্তু আমার কাছে যতদিন ছিল ততদিন স্বভাব ভালো ছিল। খুব মিষ্টি স্বভাবের স্ত্রী। একটুতেই কেঁদে ফেলতো, একটুতেই অভিমান করতো। অনেক ভাগ্য করলে তবে অমন স্ত্রী হয় মানুষের, সাহেব। আপনি আমার স্ত্রীকে যেমন করে হোক উদ্ধার করে দিন—

ক্লাইভ বললে—কিন্তু জানেন, আপনার স্ত্রী আমার এখান থেকে ইম্পর্ট্যাণ্ট্ লেটার চুরি করে নিয়ে গেছে! আপনার স্ত্রী আমাকে ব্ল্যাকমেল করেছে? মিলিটারি সিক্রেট চুরি করলে তার কি শাস্তি হয়, তা আপনি নিশ্চয়ই জানেন?

ছোটমশাই বললে—আপনি ভুল করছেন সাহেব, আমার স্ত্রী তেমন কাজ করতেই পারে না। আমার স্ত্রী সতী—

—আপনার স্ত্রী নবাবের সঙ্গে চেহেল্-সুতুনে রাত কাটায়, তবু বলছেন আপনার স্ত্রী সতী?

—আমার স্ত্রীকে আমি চিনি না সাহেব! আপনি চেনেন? আমার স্ত্রী প্রাণ দেবে, তবু নবাবের সঙ্গে চেহেল্-সুতুনে রাত কাটাবে না।

ক্লাইভ বললে—আমি ইণ্ডিয়ান নই, আমি ইংলিশম্যান, আমি আপনাদের হিন্দু ম্যারেড্ লাইফ সম্বন্ধে কিছু জানি না। তবে আমার ধারণা ছিল হিন্দু ওয়াইফরা খুব ভালো। আমার এখানে যে লেডী আছে তাকে তো দেখছি, শী ইজ ভেরি গুড। ড্রিঙ্ক করে না, বীফ খায় না, ফাউল খায় না—

ছোটমশাই বললে—আমার স্ত্রীও ওসব কিছুই খায় না—

ক্লাইভ বললে—কিন্তু উমিচাঁদ সাহেব আমাকে বলেছে আপনার স্ত্রী ও-সব খায়, আরক খায়, নেশা করে—

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র বললেন—যাক্ গে, ও-সব নিয়ে তর্ক করে লাভ কী! নবাবের হারেমে ঢুকলে ও-সব খেতেই হবে—না খেয়ে থাকতে পারবে না—

ছোটমশাই বললে—যদি খায়ও তাতেও আমার কোনো আপত্তি নেই, এখনো যদি আমার স্ত্রীকে আমি পাই, আমি তাকে ঘরে তুলে নেবো।

—কিন্তু সে তো মুসলমান হয়ে গেছে, তাকে আপনি নেবেন কী করে? আপনার জাত যাবে না?

ছোটমশাই মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের দিকে চাইলে। বললে—তা হলে কী হবে মহারাজ? আপনি বিধান দিন আমাকে। বলুন আমি কী করবো?

মহারাজ সে কথার উত্তর না দিয়ে ক্লাইভের দিকে চেয়ে বললেন—আপনি বোধ হয় এর কিছু বিধান দিতে পারবেন সাহেব-

ক্লাইভের হাসি এল। বললে—আপনাদের দেশ বেঙ্গল, আপনি নিজে একজন মহারাজা, আপনি বিধান চাইছেন আমার কাছে? আমরা তো ব্যবসা করতে এসেছি এখানে।

মহারাজ বললেন—দেশ আমাদের, কিন্তু দেশের মানুষ তো সে কথা ভাবে না। আপনারা কোম্পানীর স্বার্থ দেখছেন এখানে এসে, আর আমরা দেখছি নিজের স্বার্থ। দেশটা যে কাদের সেটাই এখনো ঠিক হয়নি যে!

—কিন্তু এ দেশ তো আপনাদের বার্থপ্লেস! আমরা তো ফরেনার—

মহারাজ বললেন—আসলে আমরাও যা আপনারাও তাই। এ আমারও নিজের দেশ নয়, নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলারও নিজের দেশ নয়, এমন কি দিল্লীর বাদশারও নিজের দেশ নয়, বাদশা আওরংজেবের মৃত্যুর পর থেকে আমরা সবাই একাকার হয়ে গেছি—আমরা, আপনারা, ফরাসীরা, পাঠানরা, মোগলরা, হিন্দুরা সবাই—

ক্লাইভ সব শুনে কিছুক্ষণ ভাবলে। তারপর বললে—আমি কোম্পানীর চাকর, কোম্পানীর মত না নিয়ে আমি কিছু করতে পারি না, কোম্পানীকে আমি চিঠি লিখবো। তখন আপনারা আমাকে সাহায্য করবেন?

ছোটমশাই বললে—আমি আপনাকে সাহায্য করবো, আমার যা কিছু আছে সব দিয়ে কোম্পানীকে সাহায্য করবো।

ক্লাইভ মহারাজকে জিজ্ঞেস করলে—আজ যদি নবাবকে আমরা ফাইট করে হারিয়ে দিই, তখন কাকে মসনদে বসাবো আপনি বলতে পারেন?

ছোটমশাই বললে—নবাব হবার লোকের অভাব হবে না সাহেব।

—কিন্তু যাকে-তাকে তো নবাবি করতে দেওয়া যায় না। আপনি হবেন?

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র চমকে উঠলেন—আমি?

—হ্যাঁ, আপনি!

—কিন্তু আমি যে হিন্দু!

—হিন্দু হলে কী হয়েছে? মারাঠারাও তো হিন্দু—

ভেতরের ঘরে ছটফট করছিল দুর্গা। মরালীটার যদি নবাব-দরবারে এত ক্ষমতা তো তাকে একবার খবরটা দিলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়। খবরটা কাকে দিয়েই বা তাকে দেওয়া যায়! হরিচরণকে ডাকলে দুর্গা। বললে—হ্যাঁ গা, বলি তোমার সায়েব কাদের সঙ্গে এতক্ষণ কথা বলছে? কে ওরা? হিন্দু, না মোছলমান?

হরিচরণ বললে—তা জানিনে দিদি—

—তা ওদের কাজ-কম্ম নেই, কেবল কথা বলে বলে তোমার সাহেবের সময় নষ্ট করছে? তুমি ওদের চলে যেতে বলো না—তখন থেকে বসে বসে কী সব ভ্যাজোর-ভ্যাজোর করছে এত?

হরিচরণ বললে—সায়েবের কাজের সময় কাছে গেলে রাগ করবে সায়েব, আমি ওখানে যেতে পারবো না দিদি—

—তা হলে আমি যাই? আমি গেলে তো আর রাগ করবে না!

—আপনি গেলে সায়েব আপনাকে বকবে না, কিন্তু পরে আমাকে বকবে। বলবে, তুই দেখছিলি আমি ওদের সঙ্গে কথা বলছি, তা হলে কেন দিদিকে আসতে দিলি?

দুর্গা বললে—তা তোমার সায়েব কি ভেবেছে, সায়েবের যেমন কাজ-কম্ম কিছু নেই, তেমনি আমাদেরও কিছু নেই? আমাদের এখানে পড়ে থাকলে চলবে?

হরিচরণ বললে—তা সাহেব তো বলেছে দিদি, এবার লড়াই থেমে গেছে, এবার তোমাদের বাড়ি পাঠিয়ে দেবে!

—না বাপ্‌, সায়েব বকুক আর যা-ই করুক, এই আমি যাচ্ছি—

হরিচরণ ব্যস্ত হয়ে বললে—অত চেঁচিয়ে কথা ব'লো না দিদি, সায়েব...

—দুত্তোর তোমার সায়েবের নিকুচি করেছে।

—দোহাই তোমার দিদি, তুমি সায়েবকে চেনো না। হেসে কথা বলে ব'লে সায়েবের রাগ নেই ভেবো না! সায়েবের রাগ তো দেখোনি তোমরা, রাগলে সাহেব একেবারে লঙ্কাকাণ্ড বাধিয়ে দেয়—

—তা আমরা কি তোমাদের মত সায়েবের চাকর যে, কথা বলতে ভয় পাবো? রাগ ওমনি করলেই হলো?

বলে আর দাঁড়ালো না সেখানে। পেছন থেকে ছোট বউরানী বললে—ওখানে বেটাছেলেরা কথা বলছে, তুই ওখানে কেন যাচ্ছিস দুগ্যা? শেষকালে তোকে কেউ দেখে ফেলে যদি?

—তা দেখুক না, কী দেখবে আমার? কী দেখবে?

—শেষকালে অনর্থ বাধতে পারে তো! ভালো করে মাথায় ঘোমটাটা টেনে দিয়ে যা-না—

হরিচরণ বাধা দিলে আর একবার। বললে—তোমার পায়ে পড়ি দিদি, যেও না, পই-পই করে কথা বললেও তুমি শুনবে না? আর নয় তো, আমি সায়েবকে ডেকে নিয়ে আসি, তোমার কী বলবার আছে এখানে মুখোমুখি বলো।

—তা ও মুখপোড়ারা কি সারাদিন এখেনে বসে আড্ডা দিতে এসেছে?

বলতে বলতে দুর্গা হন্‌হন্‌ করে উঠোন পেরিয়ে ক্লাইভের ঘরের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলো।

মধুসূদন কর্মকারের দোকানে তখন উদ্ধব দাস বেশ জাঁকিয়ে বসেছে। অনেক দিন দেখা যায়নি উদ্ধব দাসকে।

মধুসূদন বললে—কী গো দাসমশাই, বলি কোথায় ছিলে অ্যাদ্দিন? কেষ্টনগরে গিয়ে বুঝি খুব মুগের ডাল খাচ্ছিলে? এদিকে তোমাকে নবাবের লোক খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছে যে—

—আমি কারো চাকর নই গো!

মধুসূদন বললে—যখন পরোয়ানা দিয়ে ধরে নিয়ে যাবে, তখন বুঝবে মজাটা—

উদ্ধব দাস হাসতে লাগলো। বললে—পরোয়ানা তো একদিন সকলেরই আসবে কর্মকার মশাই, সে পরোয়ানা যখন আসবে তখন যেতেই হবে। তার আগে কাব্যটা শেষ করতে হবে যে। এখন নবাবের পরোয়ানা নেবার সময় নেই আমার। দাও, বড় গরম পড়েছে, গুড়-জল দাও একটু, খেয়ে তোমার এখেনে একটু গড়াই—

নিজেই গাড়ু থেকে জল ঢেলে নিয়ে মুখ-হাত-পা ধুয়ে নিলে। তারপর পোঁটলাটা খুলে গামছা বার করলে। বললে—একটু ধীরে-সুস্থে যে পুঁথি লিখবো তারও উপায় নেই। যেদিকেই যাই কেবল কামান-বন্দুক নিয়ে সেপাই-সান্ত্রীরা চলেছে—এত লড়াই করে কী লাভ হয় বলো তো কর্মকার মশাই?

মধুসূদন বললে—সবাই তো তোমার মত বাউন্ডুলে হতে পারে না! তোমার নিজের মাগ-ছেলে নেই বলে কি আর কারো থাকতে নেই?

—তা আমি কি বউকে ছেড়ে এসেছি কর্মকার মশাই, বউই তো আমায় ছেড়ে গেল! বউ থাকলেও আমি অত ঝামেলার মধ্যে যেতাম না, খেতাম-দেতাম আর পুঁথি লিখতাম—

তারপর পোঁটলার ভেতর থেকে পুঁথির কয়েকটা পাতা বার করে বললে—পুঁথিটা একটু শুনবে কর্মকার মশাই, প্রথমে 'আদিপর্ব', একেবারে 'বন্দনা' দিয়ে আরম্ভ করেছি—

মধুসূদন বললে—কী রকম শুনি?

উদ্ধব দাস পড়তে লাগলো—

প্রথমে বন্দনা করি দেব গুণপতি।
তারপর বন্দিলাম মাতা বসুমতী॥
পূবেতে বন্দনা করি পূবের দিবাকর।
পশ্চিমেতে বন্দিলাম পাঁচ পয়গম্বর॥
উত্তরেতে হিমালয় বন্দনা করিয়া।
দক্ষিণেতে বন্দিলাম সিন্ধু দরিয়া...

মধুসূদন বললে—বাঃ বাঃ, বেশ হচ্ছে দাস মশাই—

উদ্ধব দাস উৎসাহ পেয়ে গেল। বললে—বেশ হচ্ছে না? রায়গুণাকরের চেয়ে ভালো হচ্ছে না?

কিন্তু বেশিক্ষণ পড়া হলো না। ওদিক থেকে হঠাৎ কান্ত এসে হাজির। উদ্ধব দাসকে দেখেই বললে—দাস মশাই, আপনি এখেনে? আমি যে আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি—

উদ্ধব দাস বললে—আমাকে? আমাকে কেন হে বট?

—আজ্ঞে, আপনাকে খুঁজতে কেষ্টনগরে গিয়েছিলাম। কলকাতায় গিয়েছিলাম। আগে এই কর্মকার মশাই-এর দোকানেও এসেছিলাম একবার—

—কেন, আমি কি মহা তালেবর লোক হয়ে গিয়েছি নাকি?

কান্ত বললে—আপনাকে একবার মুর্শিদাবাদে যেতে হবে, মতিঝিলে গিয়ে নবাবকে গান শোনাতে হবে!

উদ্ধব দাস রেগে গেল। বললে—কেন? আমি যাবো কেন? নবাব আসতে পারে না? আমার গান যদি নবাবের শুনতে এতই ইচ্ছে তো নবাব এখানে আসতে পারে না কেন? আমি কি তোমাদের নবাবের চাকর হে?

—আপনি রাগ করছেন কেন?

—কেন, রাগ করবো না কেন? নবাব রামপ্রসাদের গান শুনতে পুরের বজরায় যেতে পারে আর আমার কাছে আসতে পারে না? আমি কি ফেলনা?

কিছুতেই যেতে চায় না উদ্ধব দাস। মধুসূদন বললে—যাও, নবাব আদর করে ডেকে পাঠিয়েছে, যাও না—

একটু যেন মনটা ভিজলো উদ্ধব দাসের। বললে—আমাকে আদর করে ডেকেছে? তা হলে চলো। কিন্তু যদি হুকুম করে ডাকে তা হলে যাবো না। আমি হরি ছাড়া আর কারো হুকুম মানিনে, তা জানো? তুমি ঠিক বলছো আমাকে আদর করে ডেকেছে?

কান্ত বললে—আচ্ছা দাস-মশাই, তোমার বউ-এর কথা তোমার মনে পড়ে?

উদ্ধব দাস চলতে চলতে অবাক হয়ে গেল কথাটা শুনে। বললে—বউকে নিয়ে একটা কাব্য লিখছি, তা জানো না?

কান্ত বললে—ও-সব কথা থাক, তুমিও তো মানুষ, তোমারও তো রক্ত-মাংস আছে, রক্ত-মাংসের খিদে আছে, তুমি তো আর পাথর নও। বউ-এর জন্যে তোমার মন কেমন করে না বলতে চাও?

উদ্ধব দাস সজাগ হয়ে উঠলো। বললে—তুমি যে এত কথা বলছো, তুমি বিয়ে করেছো?

কান্ত বললে—আমার বিয়ে হয়ে গেছে দাস-মশাই—

—বিয়ে হয়ে গেছে? তা বউ কোথায়?

কান্ত বললে—আমার কথা থাক, তোমার কথা বলো। তোমার নিজের বউ কোথায় আছে, তা জানো তুমি?

উদ্ধব দাস বললে—আমার বউ তো ক্লাইভ সাহেবের বাগান-বাড়িতে—

—তোমার বউ সেখানে পড়ে থাকে কেন? তুমি জোর করে তাকে নিজের কাছে নিয়ে আসতে পারো না?

উদ্ধব দাস হাসলো। বললে—তুমি বিয়ে করেছো আর এই কথাটা জানো না? হরি আর বউ দুজনেই একরকম। ডাকলে কেউই আসে না। কত লোক তো মন্দিরে গিয়ে গলা ফাটিয়ে হরিনাম করছে, কত লোক মসজিদে গিয়ে নমাজ পড়ছে, তাতে হরি আসছে? বলো না গো, চুপ করে রইলে কেন? হরি আসছে তাদের কাছে?

কান্ত বললে—তা হলে কী করলে হরি আসে?

উদ্ধব দাস বললে—হরিকে ডাকলে হরি আসে না। হরির নাম করে জীবন ভাসিয়ে দিতে হয়—

—কী রকম?

উদ্ধব দাস বললে—তবে শোন ভায়া—একটা ছড়া বলি—

বলে ছড়া আরম্ভ করতে যাচ্ছিল, কিন্তু কান্ত বাধা দিয়ে বললে—ছড়া বলতে হবে না, তোমার গান আর ছড়া এখন দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে গেছে। সবাই গায় তোমার গান। নবাবের কানেও গেছে। তাই তো নবাব তোমার গান শুনবে বলে ডেকে পাঠিয়েছে—

—তা তুমি বুঝি নবাবের চাকরি করো?

কান্ত বললে—দেখো, নবাবকে যদি খুশী করতে পারো তো তুমি খেলাৎ পাবে, জায়গীর পাবে, টাকা পাবে—

উদ্ধব দাস বললে—সে-লোভ দেখাও গে তুমি রায়গুণাকরকে, নবাবের নামে পুঁথি লিখে দেবে। আমি পুঁথি লিখবো আমার বউকে নিয়ে। আমার বউকে তুমি চেনো না। হাতিয়াগড়ের রাজাবাবু ছোটমশাই-এর নফর শোভারাম বিশ্বাসের মেয়ে, খুব জাঁদরেল মেয়ে। আমাকে পছন্দ হয়নি বলে রাগ করে বাড়ি থেকে পালিয়ে গেছে।

—তা যে-বউ পালিয়ে গেছে, তাকে নিয়ে কী লিখবে?

উদ্ধব দাস বললে—সে-বউ তো তোমাদের মত বউ নয় গো। খুব জাঁদরেল বউ। তোমাদের বউ কেবল রাঁধে-বাড়ে আর ছেলের জন্ম দেয়। আর তো কিছু করে না। আর আমার বউ ঠিক আমার মত বাউণ্ডুলে। একবার এখানে যায়, একবার সেখানে। এখন গিয়ে ক্লাইভ সাহেবের বাগানে উঠেছে। কিন্তু সেখানেও

কি থাকবে ভেবেছো? সেখানেও থাকবার মেয়ে নয় সে। সেখান থেকেও পালাবে। এই আমি যেমন এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াই, সে-ও তেমনি।

দুজনে রাস্তা দিয়ে চলছিল। মোল্লাহাটি থেকে বেরিয়েছে সেই কোন্ সকালে, তারপর আকাশের সূর্যটা একেবারে মাথার ওপর গিয়ে উঠেছে। খেয়া-ঘাটের কাছে আসতেই কান্ত বসলো গাছতলায়। নৌকোটা তখন ওপারে। মাথার ওপর দিয়ে এতক্ষণ চড়া রোদ গিয়েছে। সামনের দিকে চেয়ে চেয়ে কেমন মাথাটা ঘুরে গেল কান্তর। কান্তর নিজের জীবনটাই যেন ঠিক এই রকম কেবল ঘোরাঘুরি করে কেটে গেল। কিন্তু এই উদ্ধব দাসও তো ঘুরে বেড়াচ্ছে সারা জীবন। এর তো ক্লান্তি লাগে না। পাশের দিকে চাইতেই দেখলে, উদ্ধব দাস সেই মাটির উপরেই শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। হাতের পোঁটলাটা মাথায় দিয়েছে, আর নাক দিয়ে বড় বড় নিঃশ্বাস পড়ছে। ওপারের দিকে চেয়ে দেখলে কান্ত। নৌকোটা ওদিক থেকে ছেড়েছে।

হঠাৎ উত্তর দিকে যেন কীসের শব্দ শোনা গেল। কান্ত মাথাটা ফিরিয়ে দেখলে, অনেক দূরে যেন ধুলোর পাহাড় এগিয়ে আসছে সামনের দিকে। কাল-বোশেখী শুরু হলো নাকি? এই তো কাল-বোশেখীর সময়! তাড়াতাড়ি উদ্ধব দাসকে ডাকতে লাগলো—দাস-মশাই ওঠো, ওঠো, ঝড় আসছে, ওঠো—

কিন্তু উদ্ধব দাসের ঘুম বড় কড়া।

কান্ত আবার চেয়ে দেখলে। না, ঝড়বৃষ্টি নয়, কিচ্ছু নয়। নবাবের ফৌজ আসছে। নবাবের ফৌজ তো লঙ্কাবাগে গিয়েছিল। হঠাৎ ফিরে আসছে কেন? হেরে গেল নাকি লড়াইতে!

ততক্ষণে ফৌজের দল কাছে এসে পড়েছে। সামনে হাতীর দল। তারপর ঘোড়া। তারপর সেপাইরা কামান টানতে টানতে আসছে। বিরাট সব লম্বা মাপের কামান। কান্ত আড়াল থেকে দেখতে লাগলো। এরা সবাই চেনে কান্তকে। এদের অনেকের সঙ্গে কান্ত হালসীবাগানে অনেক দিন একসঙ্গে কাটিয়েছে। ফৌজের দল দেখে আশেপাশের গ্রাম থেকে ছেলে-মেয়ে-বুড়ো-বুড়ীর দল খেয়াঘাটে এসে দাঁড়িয়েছে। তাদের ভিড়ের মধ্যে কান্তকে অতটা কেউ লক্ষ্য করে দেখলে না। ফৌজের দল যখন সবই চলে গেছে, প্রায় শেষ হবো-হবো, তখন হঠাৎ শশী দেখতে পেয়েছে তাকে।

—কী রে, তুই? তুই আবার কবে ঢুকলি ফৌজে?

শশীর মালকোঁচা-বাঁধা কাপড়। সে-ও বললে—তুই এখানে কী করছিস?

কান্ত বললে—আমি কাজে এসেছিলুম, কিন্তু তোরা ফিরে আসছিস কেন? লড়াইতে হেরে গেলি?

—না, লড়াই হলো না। নিজামত থেকে হুকুম এসেছে ফিরে যেতে।

—তা হলে লড়াই হবে না আর?

শশী একটু মুচকে হাসলে। কান্তকে কাছে ডাকলে। বললে—আয়, আমার কাছে আয় বলছি—

তারপর কান্তর কানের কাছে মুখ এনে বললে—লড়াই হবে রে, খুব জবর লড়াই হবে—ভেতরে ভেতরে সব ষড়যন্ত্র চলছে—

কান্ত কী-রকম অবাক হয়ে গেল। এই তো মুর্শিদাবাদে দেখে এল, নবাব বেশ চুপ-চাপ আছে। বেশ আরাম করে মতিঝিলে ঘুমোচ্ছে, এর মধ্যে হঠাৎ আবার কী হলো?

জিজ্ঞেস করলে—তা হলে তোর চাকরি থাকবে?

—থাকবে ভাই থাকবে। এবার আর ভয় নেই।

—কিন্তু কী করে বুঝলি আবার লড়াই হবে? কে বললে তোকে?

শশী বললে—আমি খবর পেয়েছি। সবাই ক্লাইভ সাহেবের কাছে গিয়েছিল।

—কে কে গিয়েছিল?

—সবাই। আমি লক্কাবাগ থেকে ছুটি নিয়ে একদিন কালীঘাটের মন্দিরে গিয়েছিলাম। আমি গিয়ে মা'কে ডালা দিলুম। বললুম—মা, যেন যুদ্ধ হয় মা, আমার চাকরি যেন যায় না মা।

কান্ত বললে—কিন্তু কে কে ক্লাইভ সাহেবের কাছে গিয়েছিল, তাই বল না?

—কে কে আবার, সবাই। ইয়ার লুৎফ খাঁ, আমাদের মনসবদার সাহেব থেকে আরম্ভ করে, সব্বাই।

—কিন্তু কেন গিয়েছিল?

শশী বললে—সকলেরই তো রাগ আছে বেগমসাহেবার ওপর।

—কোন্ বেগমসাহেবা রে? নানীবেগমসাহেবা?

শশী বললে—আরে না। ওই যে হিন্দু বেগমসাহেবাটা। মরিয়ম বেগমসাহেবা। যে আমাদের হালসীবাগানে এসেছিল। তার ওপরই তো রাগ সকলের। ক্লাইভ সাহেবেরও তো খুব রাগ। তুই জানিস না, ওই বেগমই তো ক্লাইভ সাহেবের দফতরে ঢুকে উমিচাঁদের চিঠি চুরি করে নিয়েছিল। ওই বেগমসাহেবাই তো এখন সমস্ত মতলব দিচ্ছে নবাবকে। নবাবকে একেবারে হাতের মুঠোয় পুরে ফেলেছে—

শশী আবার বললে—তুই কিছু শুনিসনি? সবাই যে জানে—

কথা বলতে বলতে কান্ত ফৌজের সঙ্গে অনেক দূর চলে এসেছিল। কিন্তু এবার ফিরলো কান্ত। শশী যেন খুব খুশী হয়েছে মনে হলো। যুদ্ধ হবার খবর শুনে এত আনন্দ! আশ্চর্য, মরালীর ওপর সকলের এত রাগ! অথচ মরালী তো সকলের ভালোই চায়। মরালী তো চায় নবাব ভালো হোক, নবাব সকলের ভালো করুক। মরালীর কথা শুনেই তো নবাব বদলে গেছে। নবাব এখন রোজ কোরাণ পড়ে। নবাবকে রোজ মরালী মহাভারত পড়িয়ে শোনায়। কাকে বলে ভালো রাজা, কাকে বলে ভালো নবাব, কেমন করে প্রজা-পালন করতে হয়, সব তো নবাব মন দিয়ে শোনে। মরালীর কথাতেই তো উমিচাঁদ, নন্দকুমার, নবকৃষ্ণকে ছেড়ে দিলে নবাব। তবু সকলের এত রাগ! তাহলে কি সেই আগেকার মত ব্যবহার করলেই ভালো হতো!

কান্তর বুকটা দুরদুর করে কাঁপতে লাগলো। যদি সত্যিই মরালীর কিছু হয়! কিছু বিপদ! তখন কান্ত কী করবে! কী করে মরালীকে বাঁচাবে? আর মরালীই যদি না বাঁচে তো কান্তরই বেঁচে থেকে লাভটা কী?

তখনো উদ্ধব দাস অঘোরে ঘুমোচ্ছে।

কান্ত ঠেলতে লাগলো—ও দাস-মশাই, দাস-মশাই, ওঠো ওঠো—

উদ্ধব দাস উঠলো। বললে—উঃ, এত শব্দ হচ্ছিল কীসের গো, একটু আরাম করে ঘুমোচ্ছিলাম, তাও ঘুমোতে দেবে না—

কান্ত বললে—খেয়া নৌকো এসে গেছে, চলো—

উদ্ধব দাস অনিচ্ছের সঙ্গে উঠলো। তারপর পুঁথিটা বগলে নিয়ে ঘাটের দিকে চলতে লাগলো।

ইতিহাসের শিক্ষা বড় কঠোর শিক্ষা। সে-শিক্ষা যে গ্রহণ করতে পারে না সে অন্ধ। ইতিহাস বার বার প্রমাণ করে দিয়েছে যে, ষড়যন্ত্র রাজনীতির ব্রহ্মাস্ত্র। তুমি আলেকজান্ডার হতে পারো, নেপোলিয়ন হতে পারো, কিংবা ক্রম্‌ওয়েল হতে পারো, কিন্তু সাম্রাজ্য-স্থাপন করতে পারোনি বলে ইতিহাস তোমাদের নাম বড় গলা করে প্রচার করেনি। যদি সাম্রাজ্য রাখতে চাও কি সাম্রাজ্য সৃষ্টি করতে চাও তো ষড়যন্ত্রের ব্রহ্মাস্ত্র ব্যবহার করতে হবে। তোমরা তা পারোনি। নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলাও তা পারেনি। পেরেছে শুধু ফোর্ট ডেভিডের কম্যান্ডার কর্নেল ক্লাইভ।

উদ্ধব দাস বলতো—কলিই কলিকালের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা—

লোকে জিজ্ঞেস করতো—কেন?

উদ্ধব দাস ব্যাখ্যা করতো তখন। ক্রোধের ঔরসে তার বোন হিংসার গর্ভে কলির জন্ম। কলিও নিজের বোন দুরুক্তিকে বিয়ে করলো। দুটো সন্তান হলো। ছেলেটার নাম ভয়, মেয়েটার নাম মৃত্যু। সেই ভয় আর মৃত্যু দিয়েই কলিকাল আরম্ভ হলো।

নাদির শা যখন হিন্দুস্থানে হামলা করেছিল, তখন দিল্লীর একটা মস্‌জিদের ওপর থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিরীহ মানুষের নিষ্ঠুর মৃত্যু দেখে সে আনন্দে উত্তেজনায় ফৌজের লোকদের বার বার উৎসাহিত করেছিল। সে-কাহিনী দিল্লী ছাড়িয়ে মানুষের মুখে মুখে সমস্ত জনপদে ছড়িয়ে গিয়েছিল। ভয় আর মৃত্যুর প্রতাপের যে-চিত্র সেদিন থেকে মানুষের মনে আঁকা ছিল তা তখনো মোছবার অবকাশ পায়নি। খেয়ে সুখ নেই, ঘুমিয়ে শান্তি নেই, কেবল ভয় হতো—ওই বুঝি মৃত্যু আসে—

ছোটবেলায়, খুব ছোটবেলায় মরালী এ-সব শুনেছে। ঘুমোতে ঘুমোতে হঠাৎ নয়ান-পিসি ডেকে দিয়েছে—ওরে ওঠ ওঠ—

ধড়মড় করে ঘুম থেকে উঠেছে সবাই। উঠে বড় মশাইদের রাজ-বাড়ির ভেতরে গিয়ে ঢুকেছে। শুধু তারা নয়, গ্রামসুদ্ধ লোক এসে জুটেছে সেখানে। অত লোক একখানা রাজ-বাড়িতে ধরবে কেন। অতিথিশালা, পুজোর দালান, শিবের মন্দির, কাছারিবাড়ি সমস্ত গিসগিস করছে লোকে। ছাদের ওপর থেকে মাধব ঢালী কামান দাগতো। বড় মশাই দোতলার ওপর উঠে সব দেখতেন। বাড়ির চারদিকের গড়ে জল ভর্তি করা হতো। তার চারদিকে আগুন লাগিয়ে দিতেন খড়ের গোয়ালে। সে-আগুন দেখে বর্গীরা হয়তো ভয় পেয়ে যেত। সকাল হলে যে-যার বাড়ি চলে যেত আবার।

এই-ই ছিল তখনকার হাতিয়াগড়ের জীবন। মরালী এ-সব দেখেছে। লোকে আলোচনা করতো আটচালায়, চণ্ডীমণ্ডপে, ঢেঁকিশালে, বারোয়ারীতলায়। সে-সব কথা শুনেছে মরালী! কখনো বলতো মোগলদের তাড়িয়ে দিয়ে পাঠানরা আসছে, কখনো বলতো পাঠানদের তাড়িয়ে দিয়ে বর্গীরা আসছে।

লোকে বলতো—মুর্শিদাবাদের নবাব খালি হারেমে বসে বসে মদ খায় আর বেগমদের নিয়ে মহ্‌ফিল্‌ করে—

তখন থেকেই রাগটা ছিল মরালীর। নবাবদের কথা মনে পড়লেই একটা ছবি কেবল চোখের সামনে ভেসে উঠতো। যখন সত্যি-সত্যিই সেই নবাবী-হারেমে আসা অবধারিত হলো, তখনো মনে মনে খুব ভয় হয়েছিল তার। লুকিয়ে লুকিয়ে পেট-কাপড়ের তলায় একটা হাতিয়াগড়ের কাম্মারের তৈরি ছুরি এনেছিল সঙ্গে করে। ভেবেছিল তেমনি যদি কিছু ঘটে তো হয় নিজের বুকে বসাবে নয় তো নবাবের। কিন্তু হারেমের ভেতরে ঢুকে তাজ্জব হয়ে গেল। কই, এরা তো তাকে কিছু বলছে না। নানীবেগমকে দেখে আরো অবাক হয়ে গেল। ঠিক যেন নয়ান-পিসির মতন। নবাবকেও একদিন দেখলে। কই, নবাব তো হারেমে আসে না। নবাব তো কই মদ খায় না!

তারপর যত দিন যেতে লাগলো ততই অবাক-অবাক ঘটনা ঘটতে লাগলো। অতিসাধারণ একটা গ্রামের মেয়ের জীবনে এর চেয়ে বেশি আর কী ঘটতে পারে! একদিন বিয়ে হয়ে শ্বশুর-বাড়ি চলে গেলে এতদিন হয়তো দশটা ছেলে-মেয়ে হয়ে যেত। রোজ রাত্রে শুতে হতো স্বামীর সঙ্গে, আর ঢেঁকিশালে ধান ভেনে সেই চাল রান্না করতে হতো সংসারের জন্যে। সে উদ্ধব দাসের সংসার করলেও যা করতো, ওই কান্তর সঙ্গে বিয়ে হলেও তাই-ই করতে হতো। কোনো তফাৎ হতো না।

উদ্ধব দাসকে নিয়ে ভাবনা ছিল না, কিন্তু ওর জন্যে কষ্ট হতো। ওই কান্ত

ও চুপ করে থাকে, কিছু বলে না, কিছু চায়ও না। যা হুকুম করে তাই-ই তামিল করতে পারলে যেন কৃতার্থ হয়। তার জন্যেই কান্ত ছায়ার মত নবাবের পাশে পাশে থেকেছে, তার জন্যেই কোথায়-কোথায় ঘুরে মরছে! তার একটু ক্ষতি হলে ও যেন ভয়ে কেঁপে ওঠে।

ও বলে—তোমাকে সবাই খুন করবার মতলব করছে মরালী—

যেন মরালী খুন হয়ে গেলে কান্তর সর্বনাশটাই সব চেয়ে বেশি।

ইয়ার লুৎফ্ খাঁ সাহেবের বাড়ির দিকে যেতে যেতে সেই কথাটাই বার বার মনে পড়ছিল। পালকি বেহারারা জানে কোন্ দিকে কোন্ বাড়িটা মনসব্দার সাহেবের। রাত তখন অনেক। সমস্ত মুর্শিদাবাদ শহরটা ঘুমিয়ে পড়েছে। আরো ওদিকে জগৎশেঠজীর বাড়ি। মরালী পালকির ফাঁক দিয়ে চেয়ে দেখলে বাইরের দিকে। ঝাঁঝাঁ করছে অন্ধকার।

একটা বাড়ির সামনে এসে থামলো তাঞ্জাম। থামতেই মরালী নিজের পেট-কাপড়ের তলায় ছুরিটা সামলে নিয়ে বাইরে এসে দাঁড়ালো। তারপর বোরখা দিয়ে সর্বাঙ্গ ঢেকে দিলে নিজেকে।

কিন্তু চক্-বাজারের রাস্তার একটা অন্ধকার কোণ বেছে নিয়ে বশীর মিঞা চুপ করে বসেছিল তখন। দূর থেকে রাস্তাটার যতদূর নজরে পড়ে চেয়ে চেয়ে দেখছিল। সাহী-সড়কের নক্শা সোজা সাদা-সিধে। দিনের বেলা যত ভিড়ই থাক, রাত্রে সে-রাস্তায় লোক হাঁটে না। কোতোয়ালীর পাহারাদাররা অন্য সময় পাহারা দেয় বটে, কিন্তু চারদিকে যখন সব শান্ত, কোথাও কোনো ঝামেলা নেই তখন একটু ঢিলে দেয়।

একবার মনে হয় যেন তাঞ্জামটা আসছে। অন্ধকারের মধ্যে ঝাপ্সা ছায়ার মত চেহেল্-সুতুনের দিকে এগিয়ে আসছে। আবার মনে হয়, না, মনের ভুল।

একলা বশীর মিঞার ওপর ভার নয়। খানিক দূরেই আরো চারজন লুকিয়ে ঘাপটি মেরে বসে আছে।

বশীর মিঞা কখনো কাঁচা কাজ করে না।

বসে থাকতে থাকতে বশীর মিঞার কোমর ব্যথা হয়ে গেল। পকেট থেকে একটা বিড়ি বার করে ধরালে। মুঠোর মধ্যে আগুনটা লুকিয়ে ধোঁয়া টানতে লাগলো। শালার ঝকমারির কাজ এই জাসুসিগিরি। দিন নেই রাত নেই, কেবল ছায়ার পেছনে ঘোরো। হুকুম করতে তো কড়ি খরচ হয় না। মোহরার মনসুর আলি মেহের সাহেব তো হুকুম করে দিয়ে আরামে নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে এখন। যদি হুকুম হাসিল না হয় তো তখন বশীর মিঞার ওপর তম্বি হবে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর রাতগুলো বড় বিশ্রী রাত। এইসব রাত্রের অন্ধকারেই সরীসৃপের মত ষড়যন্ত্রীরা দিল্লী থেকে শুরু করে তামাম হিন্দুস্থানের অলিতে-গলিতে চরতে বেরোত। কোথায় কে কার রাজ্য কেড়ে নেবে, কখন কে কার বিরুদ্ধে চর লাগিয়ে দেবে, কে একদিন নিঃশব্দে দুনিয়া থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে যাবে, তারই ফুস-মন্তর আওড়ানো হতো এই সব রাতগুলোতে। এমনি এক রাত্রেই হাতিয়াগড়ের রাজ-বাড়ি থেকে একদিন ঐশ্বর্য-লক্ষ্মী নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা করেছিল। এমনি এক রাত্রেই মরালী চেহেল্-সুতুনে এসে ভাগ্যলক্ষ্মীর পায়ে লাথি মেরেছিল। এমনি এক রাত্রেই ওয়াটস্ ছদ্মবেশে এসে ঢুকেছিল দো-হাজারী মনসবদার ইয়ার লুৎফ খাঁর বাড়িতে।

সেদিন সমস্ত রাত ঘুম হয়নি নানীবেগমসাহেবার।

একবার চোখ দুটো বুজে এসেছে আর ধড়-মড় করে জেগে উঠেছে।

অথচ কেউ নয়। চেহেল্-সুতুনের মধ্যে জেগে থাকলে অমন অনেক অদ্ভুত শব্দ শোনা যায়। কত পুরুষ ধরে কত খুনখারাপি চলে আসছে, কত নিঃশব্দ আত্মবিসর্জনের আর্তনাদ এখানকার কুঠুরীর মধ্যে চাপা পড়ে আছে, রাত্রের অন্ধকারেই বুঝি সেই সব অদৃশ্য আত্মারা আবার কবর থেকে উঠে আসে। সেই আত্মারা বুঝি আবার ঘাগরা পরে, পেশোয়াজ পরে, কাঁচুলী পরে, আবার পায়ে ঘুঙুর বাঁধে, আবার আরক খায়, আবার হাসতে শুরু করে, কাঁদতে শুরু করে, নাচতে শুরু করে। আবার যেন গুলসন বেগমের মত গাইতে শুরু করে—'যো হোনেকা থী উও তো হো গয়ি, আব্ উসকী ক্যা পরোয়া'—

নানীবেগমসাহেবা এ-সব জানে। কিন্তু তবু সন্দেহ যায় না। মরিয়ম বেগম ফিরে এসেছে তো মতিঝিল থেকে? মসজিদে নমাজ পড়বার সময় হলো নাকি? ভিস্তিখানায় পানি দেওয়া হয়েছে নাকি?

তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে উঠলো নানীবেগম। উঠে ডাকলে—পীরালি খাঁ—

চেহেল-সুতুনে এক বোধহয় পীরালি খাঁরই ঘুম নেই। সেই মুর্শিদ কুলী খাঁর আমল থেকে সে জেগে আছে। জেগে জেগে সে এই চেহেল্-সুতুনের উত্থান আর পতন, অভ্যুত্থান আর অবনতি দেখে আসছে। সপ্তদশ শতাব্দী থেকে যে অবক্ষয় শুরু হয়েছে তার নিঃশব্দ সাক্ষী বুঝি সে একলাই। সে মুর্শিদ কুলী খাঁকে দেখেছে, সুজাউদ্দীন খাঁকে দেখেছে, দেখেছে সরফরাজ খাঁকে, দেখেছে আলীবর্দী খাঁকে। এখন আবার দেখছে আর এক নবাবকে। এ-নবাব আবার ঘুমোতে ভালোবাসে, এ-নবাব আবার কোরাণ পড়তেও ভালোবাসে। এও এক তাজ্জব নবাব! এ দেখবার জন্যেও পীরালি খাঁকে এত বছর বেঁচে থাকতে হলো।

নানীবেগমসাহেবার ডাক শুনেই হাজির হয়েছে সামনে।

কুর্নিশ করে বললে—বন্দেগী বেগমসাহেবা—

—হ্যাঁ রে, মরিয়ম বিবি ফিরেছে?

—জী নেহি!

নানীবেগমের মনটা ছটফট করতে লাগলো। এত দেরি তো করে না মেয়ে কখনো। নবাবকে ঘুম পাড়িয়ে সোজা চলে আসে চেহেল্-সুতুনে। তবে কি মীর্জা তাকে আটকে রেখেছে মতিঝিলে? তবে কি আবার মীর্জার রাত্রে ঘুম আসেনি? তবে কি...

নানীবেগমসাহেবা আস্তে আস্তে গোসলখানার দিকে চলে গেল।

এই সব রাত্রেই কাশিমবাজার কুঠির দফ্তরে ওয়াটস্ সাহেব বসে বসে কন্ফিডেনশিয়্যাল ডেস্প্যাচ লেখে কলকাতার কাউন্সিলে। নিজামতের সব কন্ফিডেনশিয়্যাল খবর। কোথায় কে কে কন্স্পিরেসিতে হেলপ করবে। জগৎশেঠ কোন্ দিকে হেলছে। ফ্রেঞ্চ কুঠির দিকে না ব্রিটিশ-কুঠির দিকে। আর জগৎশেঠ যদি একবার আমাদের দিকে থাকে তো আর কাকে কেয়ার করবো?

আর এই সব রাত্রেই জগৎশেঠজীর বাড়িতে লুকিয়ে লুকিয়ে কুঠির মেসেঞ্জার আসে। এই সব রাতেই মহিমাপুরের রাজ-বাড়ির সদরে পাঠান ভিখু শেখ কড়া নজর রাখে বাইরের দিকে।

ছায়া দেখলেই ভিখু শেখ চিৎকার করে ওঠে—ভাগ্ শালা কুত্তাকে বাচ্চা—

যেদিন উমিচাঁদ আসে সেদিন আরো কড়া নজর রাখবার হুকুম আসে মালিকের কাছ থেকে। সেদিন ভিখু শেখের তেজ দেখে কে!

—ভাগো শালা ইধারসে!

পাঠান ভিখু শেখ সেদিন নিজের ক্ষমতার সিংহাসনে একেবারে খোদাতালাহ্ হয়ে বসে। সে জানে না কে উমিচাঁদ, কে ওয়াটস্, কে-ই বা ইয়ার লুৎফ খাঁ। সে শুধু জানে হিন্দুস্থানের মালিক মহতাপচাঁদ জগৎশেঠ বাহাদুরকে। খোদাতালাহ্ মালিককে বাঁচিয়ে রাখলেই তবে বরাবর তার রুটি মিলবে।

জগৎশেঠজী দেখলেন। বললেন—দেখি—

ওয়াটস্ সাহেব খত্খানা দেখালে। ইয়ার লুৎফ খাঁ লিখেছে—নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলা শীঘ্রই আহ্মদ শা আব্দালীকে ঠেকাইবার জন্য আজিমাবাদে যাইতেছেন। সেই কারণেই ইংরাজদের সঙ্গে তিনি এখন বন্ধুত্ব রাখিবার ভান করিতেছেন। আজিমাবাদ হইতে ফিরিয়া আসিয়াই ইংরাজদের হিন্দুস্থান হইতে তাড়াইয়া দিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। পাত্র-মিত্র আমীর ওমরাহ্ সকলেই নবাবকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করে। একজন উপযুক্ত নেতা পাইলেই সকলে নবাবের বিরুদ্ধে যাইতে প্রস্তুত। নবাবের অনুপস্থিতি ইংরাজ পক্ষের মুর্শিদাবাদ আক্রমণের প্রকৃত সুযোগ। আমাকে নবাব করিলে রায় দুর্লভরাম জগৎশেঠ প্রভৃতি সকলেই যোগ দিবেন লক্ষাবাগ হইতে সৈন্য-সামন্ত সরাইয়া আনিয়া নবাব আপনাদের বিশ্বাসী হইতে চান। আসলে ইহা ধাপ্পাবাজি মাত্র। এই অবস্থায় আপনারা যা চান আমি তাহাই করিতে প্রস্তুত।

ওয়াটস্ জিজ্ঞেস করলে—মনসব্দার সাহেব যা লিখেছে সব সত্যি?

জগৎশেঠজী বললেন—আর মীরজাফর সাহেব?

ওয়াটস্ সাহেব বললে—মীরজাফর সাহেব লিখে দেয়নি কিছু, মুখে বলেছে—

—কী বলেছে?

পাশেই উমিচাঁদ সাহেব বসে ছিল। উমিচাঁদ সাহেব বললে—আমাকে লিখে দিয়েছেন মীরজাফর সাহেব। এই চিঠি আমার কাছে রয়েছে। আমি এই চিঠি নিয়ে নিজে কর্নেল ক্লাইভ সাহেবের কাছে যাবো—

জগৎশেঠজী জিজ্ঞেস করলেন—আমাকে দেখাতে আপত্তি আছে?

উমিচাঁদ সাহেব বললে—আপনাকে দেখাতে কী আপত্তি থাকবে জগৎশেঠজী! আপনি তো আমাদের দলে। এই শুনুন—

বলে উমিচাঁদ সাহেব পড়তে লাগলো :

ঈশ্বর এবং পয়গম্বরের নামে শপথ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি; যত দিন আমি জীবিত থাকিব ততদিন এই সন্ধিপত্রের নিয়ম পালন করিব—

(১) নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলার সহিত ইংরাজদের যে সন্ধিপত্র স্থিরীকৃত হইয়াছে তাহার সমস্ত শর্ত পালন করিতে আমি সম্মত।

(২) হিন্দুস্থানের বা ইয়োরোপের যে কেহ ইংরাজদের শত্রু, সে আমারও শত্রু বলিয়া বিবেচনা করিব।

(৩) জিন্নেৎ-উল্-বেলাৎ এই বঙ্গভূমিতে এবং বিহার ও উড়িষ্যার মধ্যে ফরাসী-গণের যে-সমস্ত কুঠি আছে তাহা ইংরাজদের অধিকারে আসিবে। ফরাসীদের আর এ-দেশে বাস করিতে দিব না।

বশীর মিঞা অনেকক্ষণ ধরে চক্-বাজারের রাস্তায় বসে ছিল। টেনে টেনে চারটে বিড়ি শেষ করে ফেললে। তখনো মরিয়ম বেগমসাহেবার তাঞ্জামের দেখা নেই। আস্তে আস্তে আর একজন ইয়ারের কাছে গেল। বললে—তোরা দাঁড়া রে, আমি তালাস করে আসি—

আবার গেল মতিঝিলের সদর ফটকে।

ফটক-পাহারাদার তখনো পাহারা দিচ্ছে। বশীর মিঞা জিজ্ঞেস করলে—কী মিঞাসাহেব, বেগমসাহেবার তাঞ্জাম এখনো বেরোয়নি?

পাহারাদার বললে—কেন, তোর এত বেগমসাহেবার খোঁজ কেন?

—না, এমনি পুছছি, বেগমসাহেবা বুঝি আজকাল নবাবের সঙ্গেই শুচ্ছে মিঞাসাহেব?

মিঞাসাহেব রেগে গেল। বললে—নবাব যার সঙ্গে খুশী শোবে, তাতে তোর বাপের কী রে?

বশীর মিঞা হো হো করে হেসে উঠলো। রাগ করলে তো বশীর মিঞার চলবে না। কাজ হাসিল করতে হবে।

বললে—রাগ করছো কেন মিঞাসাহেব? রাগের বাত্ আমি বলেছি?

—বেশ করবো রাগ করবো, তোর বাপের কী?

বশীর মিঞা তবু হাসতে লাগলো। বললে—আমার বাপকে গালাগালি দিচ্ছ মিঞাসাহেব, কিন্তু আমার বাপ কবে মরে ভূত হয়ে গেছে—শালা বাপও মরেছে আমার, আমাকেও পথে বসিয়ে গিয়েছে—

—ভাগ্ ভাগ্ এখান থেকে—ভাগ তুই!

বশীর মিঞা ভেতরে চেয়ে দেখলে মতিঝিলের ঝুল-বারান্দার নিচে বেগম-সাহেবার তাঞ্জাম নেই। তবে কোথায় গেল? চলে গেল? কিন্তু চেহেল্-সুতুনে যাবার তো আর কোনো রাস্তা নেই।

সেই রাত্রেই হাঁটতে হাঁটতে একেবারে ফুপার বাড়িতে গেল।

ডাকলে—ফুপাজী, ফুপাজী—

মোহরার মনসুর আলি মেহের সাহেব প্রথম রাত্রে ঘুমোয় না। দফ্তরের পর যেতে হয় মেহেদী নেসার সাহেবের বাড়িতে। সেখানে গিয়ে নোকরির খাতিরে

একটু তদ্‌বির করতে হয়। মেহেদী নেসার সাহেব বাড়িতে না থাকলেও তার গদি-ফরাশে একটু বসতে হয়। পান-তামাক খেতে হয়। সাহেব বাড়িতে থাকলে আরো বেশিক্ষণ "জী হাঁ" বলতে হয় সব কথায়। তার পর পাঁচ বিবি মনসুর আলি সাহেবের—আজ এর সংগে শুলে, কাল ওর সঙ্গে শুতে হবে। বিবিদের মর্জি-মেজাজ বজায় রেখে তখন সরাবে চুমুক দিয়ে গড়গড়া টানতে টানতে বিছানায় এপাশ-ওপাশ করতে করতে ঘুম আসতে মাঝ-রাত পুইয়ে যায়।

বশীর মিঞার ডাক শুনে কাঁচা ঘুম ভেঙে গেল মোহরার সাহেবের।

—শালা, শুয়োরকা বাচ্ছা কাঁহিকা—চিল্লাচ্ছিস্ কেন?

—ফুপাজী, তাঞ্জাম তো মিললো না!

—কার তাঞ্জাম? কোন্ হারামজাদীর তাঞ্জাম?

ঘুমের ঘোরে সব ভুলে গিয়েছিল মোহরার সাহেব।

তারপর ভালো করে জ্ঞান হতে আরো রেগে গেল। বললে—বেত্তমিজ্, বেওকুফ্, বে-আদব কাঁহিকা, তাঞ্জাম মিললো না তার আমি কী জানি? খুঁজে দেখ্ কোথায় গেল! তাঞ্জাম কি আসমানে উড়ে যাবে? মুর্শিদাবাদ শহর খুঁজে দেখ্—! দেখতে না পেলে তোর নোকরি খতম্ করে দেবো বেল্লিক কাঁহিকা—

এর পর আর সাহস হয়নি বশীর মিঞার। ফুপার তাড়া খেয়ে আবার দেখতে বেরোল।

জগৎশেঠজীর দরবার-ঘরের ভেতরে তখন মীরজাফর সাহেবের সন্ধিপত্র পড়া হচ্ছে।

জগৎশেঠজী বললেন—তারপর?

উমিচাঁদ সাহেব পড়তে লাগলো—কলিকাতার ইংরেজ অধিবাসীদের যে সমস্ত দ্রব্যাদি লুণ্ঠিত হইয়াছে তাহার ক্ষতিপূরণের জন্য ৫০ লক্ষ টাকা দিতে স্বীকার করিতেছি এবং দেশীয়গণের লুণ্ঠিত দ্রব্যের ক্ষতিপূরণের জন্য ২০ লক্ষ টাকা......

হঠাৎ দরজায় টোকা পড়লো।

জগৎশেঠজী নিজেই উঠে দরজা খুলে দিলেন। এ-সব সময়ে বাইরের লোকদের ঘরে ঢুকতে দেওয়া উচিত নয়।

সামনেই দাঁড়িয়ে ভিখু শেখ।

—একটা তাঞ্জাম এসেছে হুজুর।

—এত রাত্তিরে কার তাঞ্জাম?

—হুজুর, এক জেনানা?

জেনানা! জগৎশেঠজী অবাক হয়ে গেলেন। একটু কৌতূহলও হলো। এত রাত্রে কে জেনানা তাঁর বাড়িতে আসবে! দরজাটা বন্ধ করে দরবার-ঘরের পাশে দাঁড়িয়ে রইলেন। প্রথমটা বুঝতে পারেননি। বোরখা-পরা চেহারা দেখে আরো অবাক হয়ে গিয়েছিলেন।

জিজ্ঞেস করলেন—কোন্ হ্যায় আপ্?

বোরখা-পরা মূর্তিটা সামনে এগিয়ে এল। তারপর চারদিক ভালো করে পরীক্ষা করে নিয়ে মুখখানা বার করলে। তবু চিনতে পারলেন না জগৎশেঠজী। তখন মেয়েটি বোরখা খুলে ফেলে বললে—আমাকে আপনি চিনতে পারবেন না জগৎশেঠজী! আমিও আপনার মত হিন্দু। আমি হিন্দু মেয়ে। আমি হাতিয়াগড়ের রাজার দ্বিতীয় পক্ষের বউ—

সত্যিই অবাক হয়ে গেছেন জগৎশেঠজী!

—আমাকে এখানে চেহেল্-সুতুনে সবাই মরিয়ম বেগম বলে ডাকে। কিন্তু আসলে আমার নাম অন্য। আমি খুব বিপদে পড়ে আপনার কাছে এসেছি জগৎ-শেঠজী। আমাকে আপনি বাঁচান!

—বোস বোস, আমি শুনেছি তোমার কথা। তোমার কী বিপদ?

জগৎশেঠজী নিজে বসলেন। কিন্তু মরালী বসলো না।

মরালী বললে—সে অনেক দুঃখের জীবন আমার। সব কথা বলতেই আপনার কাছে এসেছি। আমার সংসার ছিল, আমার সব ছিল। আপনাদের এই নবাব একদিন আমাকে জোর করে এনে নিজের হারেমে পুরেছে।

জগৎশেঠজী বললেন—আমি শুনেছি; তোমার স্বামী একদিন এসে আমাকে সব বলে গেছেন।

—আমি ক'দিন থেকে আপনার এখানে আসবো বলে ভাবছি। ইয়ার লুৎফ খাঁ সাহেবের বাড়িতেও যাবো ভেবেছিলাম, কিন্তু সেখানে গিয়েও যেতে পারিনি। রোজ রাত্তিরে বেরোই, আপনার পাঠান পাহারাদার দেখে ভয় করে। কিন্তু আজ আর থাকতে পারলাম না। সাহস করে ঢুকে পড়লাম।

জগৎশেঠজী বললেন—তুমি তো কলকাতায় ক্লাইভ সাহেবের কাছেও গিয়েছিলে?

মরালী বললে—যখন যার কাছে সুবিধে পাচ্ছি তার কাছেই যাচ্ছি—কী করবো বলুন! আমি মেয়েমানুষ, আমার কতটুকু ক্ষমতা?

—শুনেছিলাম ক্লাইভ সাহেবের দফ্‌তর থেকে তুমি নাকি কী একটা চিঠি চুরি করেছিলে?

—আমি? চুরি করবো? ক্লাইভ সাহেবের দফ্‌তর থেকে চিঠি চুরি করবো? চিঠি? কী জন্যে চুরি করবো? ক্লাইভ সাহেব আমার কী ক্ষতি করেছেন?

কথা বলতে বলতে মরালীর চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল পড়তে লাগলো।

জগৎশেঠজী বললেন—কেঁদো না—বলো, তুমি কী বলছিলে, বলো—

—হয়তো আমার কপালে আরো অনেক দুঃখ আছে, নইলে আপনার মত লোক আমাকে অবিশ্বাস করবে কেন? এতকাল ধরে আমি কেবল চেষ্টা করছি কেমন করে আমি নবাবের প্রতিশোধ নেবো, আর আমার নামের এই কলঙ্ক! আমার স্বামীর কানে এ-সব কথা গেলে তিনি কী ভাববেন বলুন তো? নিশ্চয় আমার কোন শত্রু এমন কথা বলেছে আপনাকে!

জগৎশেঠজী বললেন—তা হতে পারে! কিন্তু আমি তোমার কী করতে পারি!

মরালী বললে—আপনি আমার সব করতে পারেন জগৎশেঠজী! আমি এতকাল আছি চেহেল্-সুতুনে, আমি কেবল ভাবছি কী করে পালাবো সেখান থেকে। কতদিন নবাব আমাকে নিয়ে তার পাশে শুতে চেয়েছে, আমি তাকে আরক খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে পালিয়ে গিয়েছি—

—আরক? কীসের আরক?

মরালী বললে—চক্-বাজারে সারাফত আলির খুশ্‌বু তেলের দোকান আছে, সে লুকিয়ে লুকিয়ে বেগমদের জন্যে আরক বিক্রি করে। আমি তাই খাওয়াই নবাবকে। এক-একদিন ভেবেছি নবাবকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলবো, কিন্তু নেয়ামতের জন্যে তা পারিনি।

—নেয়ামত? নেয়ামত কে?

—মতিঝিলের খিদ্‌মদ্‌গার। সে কড়া নজর রাখে। মতিঝিলে নেয়ামত আর চেহেল্‌-সতুনে নানীবেগম।

জগৎশেঠজী বললেন—লোকে যে বলে মুর্শিদাবাদের মসনদ চালাচ্ছো তুমি। সে-কথা কি তাহলে মিথ্যে?

—তবে দেখবেন?

বলে মরালী পট্‌ করে নিজের পেশোয়াজ খুলে ফেললে। কাঁচুলীর আধখানা বার হতেই জগৎশেঠজী বললেন—কী দেখাচ্ছো?

—না দেখালে আপনি বিশ্বাস করবেন না, ওরা আমাকে লোহার শিক পুড়িয়ে কী করে সেঁকা দিয়েছে—

জগৎশেঠজী বললেন—আমি বিশ্বাস করেছি, থাক্‌—

—কিন্তু আমি আর ফিরে যাবো না জগৎশেঠজী ওখানে। আপনি আমাকে এখানে লুকিয়ে রাখুন। যেমন করে হোক আমাকে হাতিয়াগড়ে পাঠিয়ে দিন। আপনি এত বড় মানী লোক, আপনি একজন অবলা মেয়েমানুষকে বাঁচাতে পারবেন না, তার ইজ্জত রক্ষে করতে...

কথা বলতে বলতে মরালী হঠাৎ থেমে গেল।

বললে—পাশের ঘরে কাদের গলা শুনছি, ওখানে কেউ আছে নাকি?

—হ্যাঁ!

মরালী চম্‌কে উঠলো।

—তাহলে কী হবে? আমার কথা তো ওরা শুনতে পেয়েছে? কে ওরা?

জগৎশেঠজী বললেন—না, ওরা আমারই দলের। উমিচাঁদ আর ওয়াটস্‌। তোমার কোনো ভয় নেই। তুমি এখানে বোস, আমি ও-ঘরে একটু যাচ্ছি, ভেবে দেখি আমি তোমার কী করতে পারি—

বলে জগৎশেঠজী পাশের ঘরে চলে গেলেন।

বশীর মিঞা যা ভেবেছে তাই। ফুপার বাড়ি থেকে বেরিয়ে মনসবদার সাহেবের বাড়িতে গিয়েছিল। সেখানে গিয়ে শুনলে তাঞ্জামটা সেখানে গিয়েছিল কিন্তু ফিরে চলে গিয়েছে। তারপরে মহিমাপুরে আসতেই দেখলে, জগৎশেঠজীর বাড়ির ফটকে তাঞ্জামটা রয়েছে।

—ভাগ্‌ শালা, কুত্তিকা বাচ্ছা কাঁহিকা, ভাগ্‌ হিঁয়াসে।

বশীর মিঞা বললে—একটা বিড়ি দাও না মিঞা সাহেব, অত চটছো কেন, আমি কী করেছি?

এবার ভিখু শেখ বন্দুকটা নিয়ে তাক্‌ করে এগিয়ে গেল সামনের দিকে। বশীর মিঞা তাড়াতাড়ি দূরে একটা গাছের আড়ালে লুকিয়ে রইলো।

—শালা, কুত্তিকা বাচ্ছা, উল্লু কা পাঠ্‌ঠা!

পাঠান ভিখু শেখ ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে রাগে আপন মনেই গজ্‌গজ্‌ করতে লাগলো।

ভোর বেলা সারাফত আলির খুশবু তেলের দোকানের পেছন দিকে কান্ত এসে ডাকলে—বাদশা, ও বাদশা—

সারাফত আলির মতন বাদশার ঘুমও বড় গাঢ়। এক ডাকে ঘুম ভাঙে না। অনেক ডাকাডাকিতে তবে উঠলো। ভেতর থেকে বললে—কে?

—আমি কান্তবাবু, দরজা খোল।

বাদশা দরজাটা খুলে দিলে। কান্তবাবুর পাশে আর একজনকে দেখে জিজ্ঞেস করলে—এ কৌন্ হ্যায়?

—এর নাম উদ্ধব দাস গো। যার গান রাস্তার ভিখিরিরা গায়। সেই উদ্ধব দাস। সেই যে 'আমি রবো না ভব-ভবনে—'

উদ্ধব দাস বললে—আমার আর একটা নাম আছে, ভক্ত হরিদাস—

তারপর কান্তর দিকে ফিরে বললে—এইখানেই থাকো বুঝি তুমি? বেশ ঘর পেয়েছো তো! বেশ ঘর। এর নাম বাদশা? বাদশাই বটেক তুমি। দিল্লীর বাদশা না দুনিয়ার বাদশা, কী তুমি?

উদ্ধব দাস তখন যেন বেশ মজা পেয়েছে। বাদশা অবাক হয়ে গেল। বললে—ইনি কে কান্তবাবু? কাকে ধরে নিয়ে এলে?

উদ্ধব দাস বললে—আমি হরির দাস গো—

—হরি কে?

—আরে, এ যে হরিকেই চেনে না দেখছি! হরির নাম শোনোনি তুমি? তবে শোন—তবে শোন তার কথা—

বলে উদ্ধব দাস গাইতে শুরু করে দিলে—

হরির নামে যায় না দুঃখ
　　কার এমন দুর্ভাগ্য!
কান কাটিলে করে না রাগ
　　কার এমন বৈরাগ্য॥
কার এমন সামগ্রী আছে
　　দামোদরের ক্ষুধা হরে।
কার এমন ওষধি আছে
　　ব্রহ্মশাপে মুক্ত করে॥
শ্যামের বাঁশীর নিন্দা করে
　　কার এমন সুরব।
দেহ-ধারণে দুঃখ পায় না
　　কার এত গৌরব॥
সুমেরুকে ক্ষুদ্র করে
　　কার বা এমন বুদ্ধি।
ব্রহ্ম নিরূপণ করে
　　কার বা এত সাধ্য!

গর্ভের কথা মনে পড়ে
কার বা এমন মন।
কার বা হেন শক্তি
খণ্ডে কপালের লিখন॥

বাদশা অত-শত বোঝে না। লোকটার হঠাৎ গান গেয়ে ওঠা দেখে থতমত খেয়ে গিয়েছিল। কান্তই থামিয়ে দিলে। বললে—তুমি থামো, এমন যখন-তখন গান গাইলে লোকে ভাববে কী বলো তো—

বলে টানতে টানতে নিজের ঘরখানার ভেতরে নিয়ে এল।

তারপর বললে—যাকে-তাকে কেন অমন করে গান শোনাও বলো তো দাস মশাই? সবাই কি তোমার মর্ম বুঝবে? তোমার মর্ম বুঝতে পারবে নবাব। নবাবের কাছে গান শোনালে তুমি বাহবা পাবে!

উদ্ধব দাস হাসতে লাগলো কথাটা শুনে।

বললে—না গো, আমি নবাবের বাহবা চাইনে, নবাব তো দুদিনের, নবাবের বাহবাও দু'দিনের। আমি চাষা-ভুষোর বাহবা চাই—

উদ্ধব দাসের সেই কথাটা কান্তর বহুদিন মনে ছিল। উদ্ধব দাস হয়তো চেয়েছিল একদিন সে রামপ্রসাদ হবে। রামপ্রসাদের মতই তার গান চাষা-ভুষো সবাই গাইবে। হয়েছিলও তাই। উদ্ধব দাস সারা মুলুক ঘুরে ঘুরে বেড়াতো পুঁথি বগলে করে, আর যেখানে-সেখানে গান গাইত। সেই গান মুলুকের লোকের মুখে মুখে ফিরতো। লোকে বলতো—উদ্ধব দাসের গান। উদ্ধব দাসের গান হলেই লোকে নড়েচড়ে বসতো। মন দিয়ে শুনতো। বলতো—উদ্ধব দাসের গান আর একটা গাও—

তা ক'দিন ধরে কান্ত ছিল না মুর্শিদাবাদে। একটু বেলা হতেই উদ্ধব দাসকে রেখে সোজা মতিঝিলে চলে গেল।

ইব্রাহিম খাঁ কান্তকে দেখেই ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে।

—কী খবর পুরকায়স্থ মশাই!

ইব্রাহিম খাঁ বললে—তুমি আর আমাকে পুরকায়স্থ মশাই বলে ডেকো না কান্তবাবু, আমার চাকরি চলে যাবে!

—কিন্তু কে আর শুনতে পাচ্ছে আমার কথা! কেউ তো এখানে নেই!

পুরকায়স্থ মশাই বললে—আজকাল সব ওলোট-পালট হয়ে গেছে কান্তবাবু। সে-সব দিন আর নেই। এখন আমার চাকরি থাকে কিনা সন্দেহ—

আশ্চর্য! তুমি হিন্দু থেকে মুসলমান হলে, তবু তোমার চাকরি থাকবে না?

কান্ত অনেকবার ইব্রাহিম খাঁর কথাও ভেবেছে। বেচারি হয়তো মরেই যেত না-খেতে পেয়ে। তবু প্রাণটা টিঁকে আছে ধর্মের বিনিময়ে। যেন ধর্মের চেয়ে প্রাণটা বড় হলো তার কাছে। কিন্তু প্রাণটা বড় নয়ই বা কেন? দু'টো খেতে পাওয়ার তাগিদেই তো কান্ত একদিন চাকরি নিয়েছিল বেভারিজ সাহেবের সোরার গদিতে। সেখান থেকে চাকরি যাওয়ার ওই পেটের তাগিদেই চাকরি নিতে হয়েছিল নিজামত-কাছারিতে। আর তারপর কোথা থেকে কেমন করে জড়িয়ে গেল মরালীর সঙ্গে। মরালীর জীবনের সঙ্গে একবার জড়িয়ে যাবার পর আর তার কোথাও গতি হবে না, কোথাও তার শান্তি হবে না। সে একেবারে একাত্ম হয়ে গেছে এখানে, এই মরিয়ম বেগমের সঙ্গে।

ওপরে উঠতে গিয়ে নেয়ামতের সঙ্গে দেখা।

নেয়ামত বললে—মরিয়ম বেগমসাহেবা এখানে তো নেই হুজুর—

—এখানে নেই তো কোথায় গেলেন তিনি?

—তা জানিনে, আপনি চেহেল্-সুতুনে গিয়ে খোঁজ নিন!

কান্ত বললে—কিন্তু, নজর মহম্মদ যে বললে চেহেল্-সুতুনে নেই।

—চেহেল্-সুতুনে থাকবেন না তো কোথায় আবার যাবেন হুজুর! নিশ্চয় চেহেল্-সুতুনে আছেন। ভোর রাত্তিরে তো রোজ চলে যান চেহেল্-সুতুনে, আজও চলে গেলেন—

আশ্চর্য। সত্যিই আশ্চর্য হয়ে গেল কান্ত। কোথায় গেল মরালী! কোথায়ই বা যেতে পারে? আর গেলে তো তাঞ্জামে করেই যাবে। একলা তো আর রাস্তা দিয়ে হেঁটে হেঁটে যেতে পারবে না।

মতিঝিল থেকে চক্-বাজারের রাস্তায় পড়তেই দেখলে মহিমাপুরের দিক থেকে একটা তাঞ্জাম আসছে। এ কি, মরালী শেষ রাত্রে মহিমাপুরে কোথায় গিয়েছিল? জগৎশেঠজীর বাড়িতে নাকি? তাঞ্জামটা কাছে আসতেই ভালো করে চেয়ে দেখলে কান্ত। ঝালরদার তাঞ্জাম। চারদিক ঢাকা। তাঞ্জামের ভেতরে কে আছে বোঝা যায় না।

হঠাৎ পেছন থেকে একটা হাত গায়ে পড়তেই কান্ত মুখ ফিরিয়ে দেখলে, বশীর মিঞা।

—কী রে, তুই? তুই অ্যাদ্দিন কোথায় ছিলি?

বশীর মিঞা সে-কথার উত্তর না দিয়ে বললে—কী দেখছিস্? ভেতরে মরিয়ম বিবি!

কান্ত জিজ্ঞেস করলে—তুই কী করে জানলি?

বশীর মিঞা বললে—তুই তো বেগমসাহেবাকে একেবারে হাতের মুঠোয় করে ফেলেছিস, কী করে এমন করলি রে?

কান্ত বললে—সে-কথা থাক, বেগমসাহেবা মহিমাপুরে কোথায় গিয়েছিল রে?

—আবার কোথায়, জগৎশেঠজীর কোটিতে! শালা দুষমনি শুরু হয়েছে, তাই খবর আনতে গিয়েছিল শায়েদ।

—কার সঙ্গে কার দুষমনি?

বশীর মিঞা বললে—সে তোকে এখন বলবো না। তুই তো মরিয়ম বেগমসাহেবার লোক। তোকে আমি নোকরি দিলাম নিজামতে, আর তুই কিনা নবাবের লোক হয়ে গেলি! এখন তুই কিনা আমার সঙ্গে দুষমনি করিস?

—আমি তোর সঙ্গে দুষমনি করি? কী বলছিস তুই?

—দুষমনি না করলে মরিয়ম বেগমসাহেবা কেন জাসুসি করছে আমাদের ওপর? বেগমসাহেবা কি মনে করেছে আমাদের সঙ্গে পারবে? আমাদের দলে কে-কে আছে জানিস?

—কে কে?

—সবাই আছে, মনসুর আলি মেহের সাহেব, মীরজাফর খাঁ সাহেব, উমিচাঁদ সাহেব, হুগলীর ফৌজদার সাহেব, জগৎশেঠজী, সবাই আছে। তুই কি আমাদের সঙ্গে দুষমনি করে পারবি ভেবেছিস? তোর মরিয়ম বেগমসাহেবা পারবে?

তাঞ্জামটা ততক্ষণে চেহেল্-সুতুনের দিকে চলে গেছে। কান্ত সেই দিকে চেয়ে

দেখেই বললে—আমি যাই ভাই, আমার খুব জরুরী কাজ আছে, তোর সঙ্গে পরে দেখা করবো—

বলে কান্ত চলে গেল।

বশীর মিঞাও আর দাঁড়ালো না। শালা কাফেরটা বেইমান! দাঁড়াও, আমিও জানি বেইমানির জবাব কী করে দিতে হয়। বলে সোজা আবার মোহরার মনসুর আলি মেহের সাহেবের হাবেলির দিকে চলতে লাগলো।

সে-রাত্রে সত্যিই মরিয়ম বেগমসাহেবার বড় ভয় হয়েছিল। একেবারে বাঘের ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছিল সে। কোথায় জগৎশেঠজীর বাড়ি তাও জানতো না। সে-বাড়ির ভেতরেও কখনো ঢোকেনি, তবু যেন কোথা থেকে বুক-জোড়া সাহস এসে তার বিচারবুদ্ধি সব একেবারে কানা করে দিয়েছিল।

জগৎশেঠজী ঘরের ভেতরে আসতেই উমিচাঁদ জিজ্ঞেস করলে—কে? কে এসেছে জগৎশেঠজী, কে?

ওয়াটস্ সাহেব কিছু একটা সন্দেহ করেছিল। তাড়াতাড়ি কাগজ-পত্র সব গুটিয়ে লুকিয়ে ফেলেছিল।

জিজ্ঞেস করেছিল—হু? হু ইজ ইট? কে এসেছে?

জগৎশেঠ বললেন—চুপ, আস্তে কথা বলুন, মরিয়ম বেগমসাহেবা—

উমিচাঁদ ওয়াটস্ দুজনেই চমকে উঠলো। বললে—এখানে কী করতে?

জগৎশেঠজী বললেন—না, আপনাদের ভয় পাবার দরকার নেই, চেহেল্-সুতুন থেকে মরিয়ম বেগমসাহেবা পালিয়ে এসেছে—

—পালিয়ে এসেছে মানে?

—পালিয়ে এসেছে মানে, আমাকে বলছে ওর হিন্দু স্বামীর কাছে পাঠিয়ে দিতে।

উমিচাঁদ বললে—সত্যি?

—হ্যাঁ, পিঠের দাগ দেখালে আমাকে। বললে চেহেল্-সুতুনে নাকি লোহার শিক্ পুড়িয়ে ওর পিঠে সেঁকা দিয়েছে, তাই দেখাচ্ছিল।

—আপনি পিঠ দেখলেন? পেশোয়াজ খুলেছিল আপনার সামনে?

জগৎশেঠজী বললেন—খোলেনি, খুলতে যাচ্ছিল, আমি বারণ করলাম। খুব কান্নাকাটি করছে, বলছে, প্রাণ গেলেও আর চেহেল্-সুতুনে ফিরে যাবে না—

—আপনি কী বললেন?

—আমি ওঁকে বসিয়ে রেখে আপনাদের সঙ্গে কথা বলতে এলাম।

—এখনো ও-ঘরে বসে আছে নাকি বেগমসাহেবা?

—হ্যাঁ।

জগৎশেঠজী বললেন—কিন্তু আমার মনে হলো নবাবের হাত থেকে ছাড়া পেলে উনিও বেঁচে যান। খুব কষ্ট হচ্ছে ওঁর। হাজার হোক হিন্দুর মেয়ে তো! স্বামীর ঘর ছেড়ে কতদিন বাইরে থাকতে পারেন!

—তাহলে কী করবেন?

—কী করবো সেই পরামর্শ করতেই ওঁকে বসিয়ে রেখে এসেছি এখানে।

হাতিয়াগড়ের রাজা একবার আমার কাছে এসেছিলেন তাঁর স্ত্রীর কথা বলতে। যখন সেই সফিউল্লা সাহেবকে খুন করেছিল ছুরি দিয়ে।

উমিচাঁদ বললে—আপনি বিশ্বাস করলেন নাকি বেগমসাহেবার কথা? জানেন, ওই বেগমসাহেবা একবার ক্লাইভ সাহেবের দফ্‌তরে ঢুকে আমার চিঠি চুরি করেছিল!

জগৎশেঠজী বললেন—কিন্তু আমার তো বিশ্বাস হয় না উমিচাঁদজী! নবাবের কাছে থেকে নবাবের হুকুম না মেনে উপায় কী বলুন! আসলে বোধ হয় মহিলাটি ভালো—

—কীসে বুঝলেন?

জগৎশেঠজী বললেন—খুব কাঁদতে লাগলেন আমার সামনে—

—মেয়েরা অমন কথায়-কথায় কাঁদতে ওস্তাদ, জগৎশেঠজী!

জগৎশেঠজী বললেন—কান্নারও রকম-ফের আছে উমিচাঁদজী! এ বেগমসাহেবা আমার বাড়িতেই থাকতে এসেছেন যে। বলছেন, আর চেহেল্‌-সুতুনে ফিরে যাবো না।

—আপনি কী বললেন?

—আমি বেগমসাহেবাকে কী করে আমার হাবেলিতে রাখি তাই ভাবছি। বেগমসাহেবা আমার এখানে আছেন এ-খবর নবাবের কানে গেলে কি আর রক্ষে থাকবে! আমাদের সব চেষ্টা পণ্ড হয়ে যাবে।

ওয়াটস্‌ সাহেব বললে—আপনি ওকে ভাগিয়ে দিন জগৎশেঠজী!

উমিচাঁদ বললে—হ্যাঁ জগৎশেঠজী, ওকে বিশ্বাস করবেন না—

—কিন্তু হাতিয়াগড়ের রাজাকে আমি কী বলবো? তিনি যদি আবার এসে আমার কাছে দরবার করেন? তখন আমি তাঁকে কী বলবো? কী বলে কৈফিয়ত দেবো? তাঁর স্ত্রীকে নিজের আশ্রয়ে পেয়েও তাঁর কোনো উপকার করিনি এ-জেনে তো তাঁর কষ্ট হবে—তিনি বড় ভালো লোক যে—

—কিন্তু এত রাত্তিরে তাঁকে পাবেন কোথায়?

জগৎশেঠজী বললেন—তাঁকে আজই খবর পাঠাতে হয়!

—খবর পাঠাতে, তাঁর এখানে আসতেও তো দু'তিন দিন সময় লাগবে। ততদিন কোথায় রাখবেন বেগমসাহেবাকে?

জগৎশেঠজী বললেন—তাই তো ভাবছি—

তারপর ভেবে পরামর্শ করে কিছুই কিনারা পাওয়া গেল না।

জগৎশেঠজী বললেন—আপনারা বসুন, অনেকক্ষণ ওঁকে বসিয়ে রেখে এসেছি, একবার পাশের ঘরে যাই, ওকে বুঝিয়ে বলি—

—কী বলবেন?

—আপনারাই বলুন না কী বলবো?

উমিচাঁদ বললে—এখন ক্লাইভ সাহেবের সঙ্গে আমাদের কথা-বার্তা চলছে, এই সময়ে কি বেগমসাহেবাকে নিয়ে এই ঝুঁকির মধ্যে যাওয়া ভালো? নবাব বেশ চুপচাপ আছে, খুঁচিয়ে ঘা করে লাভ কী?

—ঠিক আছে—আমি আসছি—

বলে জগৎশেঠজী আবার দরজা খুলে পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

উঠোন পেরিয়ে দুর্গা তখন সোজা একেবারে ক্লাইভ সাহেবের দফ্‌তরে গিয়ে হাজির। কিন্তু অবাক কাণ্ড! সাহেব কোথায়? এই তো হরিচরণ বললে সাহেব নিজের দফ্‌তরে কার সঙ্গে গল্প করছে। কিন্তু দফ্‌তর ফাঁকা!

—হরিচরণ, ও হরিচরণ, কোথায় গো, তোমার সাহেব কোথায়?

হরিচরণও দৌড়তে দৌড়তে কাছে এল। বললে—সাহেব নেই?

—না, তোমার সাহেবের দফ্‌তর তো ফাঁকা। তুমি বললে দু'জন লোক এসেছে, সাহেবের সঙ্গে কথা বলছে, কই, কেউ তো নেই ঘরে—

হরিচরণও জানতো না সাহেব কখন বেরিয়ে গেছে। সত্যিই সাহেব বেরিয়ে গেছে কি না দেখতে গেল দফ্‌তরের দিকে। হরিচরণও গিয়ে দেখলে সত্যিই সাহেবের ঘর ফাঁকা। সাহেব কখন বেরিয়ে গেছে তাকে বলেও যায়নি। হরিচরণও অবাক হয়ে গেল। কোথায় গেল সাহেব তাহলে? এমন তো হয় না। এমন তো না-বলে সাহেব কখনো চলে যায় না।

দুর্গা এবার ক্ষেপে উঠলো সাহেবের ওপর। হাতের কাছে সাহেবকে না পেয়ে যত তার রাগ হরিচরণের ওপর গিয়ে পড়লো। যেন সাহেব তাদের কোনো উপকারই করেনি। এতদিন সাহেব যে তাদের জন্যে নিজেদের দলের সাহেবদের সঙ্গে ঝগড়া করেছে, তাদের জন্যে এত টাকা খরচ করে বসিয়ে বসিয়ে খাইয়েছে, তাও যেন দুর্গার আর মনে পড়লো না। মুখে যা এল তাই বলে গালাগালি দিতে লাগলো।

বললে—হারামজাদা সাহেব কি ভেবেছে আমাদের কিনে রেখে দিয়েছে? তুমি বলতে পারো না যে, আমরা তার কেনা বাঁদী নই?

হরিচরণ বললে—তুমি ও-কথা বলছো কেন দিদি? কেউ কি তোমাকে বলেছে তোমরা কেনা বাঁদী?

—বলবো না? হাজার বার বলবো। কেন তোমাদের সাহেব আমাদের এখানে আটকে রাখে শুনি? আমরা কিছু বলিনে বলে? লড়াই-ফড়াই সব চুকে-বুকে গেল, এখনো কেন ছুতো করে আমাদের আটকে রেখেছে এখেনে? আমরা আজই চলে যাবো, চলো, এখুনি আমাদের নিয়ে চলো—

বলে তর-তর করে উঠোন পেরিয়ে একেবারে অন্দর-মহলে চলে গেল। ছোট বউরানীও দুর্গার গলার আওয়াজ পেয়ে এদিকে আসছিল।

বললে—কী হলো রে দুগ্‌গা?

দুর্গা বললে—দেখ না, আমাদের এখেনে আটকে রেখে সাহেব গেছে আড্ডা মারতে। চলো, এখুনি আমরা চলে যাবো এখান থেকে। আমাদের কি বাড়ি-ঘর-দোর নেই? আমাদের কি আপনার মানুষ-জন নেই? ও সাহেব ভেবেছে কী?

ছোট বউরানী বললে—কোথায় যাবি? কে নিয়ে যাবে?

—যেখানে হোক যাবো। জাহান্নমে যাবো, চুলোয় যাবো। যাবার কি জায়গার অভাব আছে নাকি? ভেবেছে আমি তোমাকে নিয়ে চলে যেতে পারিনে? নাও, কাপড়-চোপড় গুছিয়ে নাও। আর এক দণ্ডও এখেনে থাকছিনে।

হরিচরণ পেছন পেছন এসেছিল। বললে—তুমি একটু বুঝিয়ে বলো তো বউরানী। সাহেব ফিরে না এলে কি চলে যাওয়াটা ভালো হবে?

ছোট বউরানী বললে—তা তুমি আমাদের পৌঁছে দাও না গা—আমরা চলে যাই—

হরিচরণ বললে—আমি তো পৌঁছে দিতে পারি, কিন্তু সাহেব ফিরে এসে যদি আমাকে বকা-ঝকা করে?

—বকবে কেন? বকবে কেন শুনি?

দুর্গা চেঁচিয়ে উঠলো।—আমরা কি এখানে চেরকাল থাকতে এইচি? আমরা কি তোমার মত সাহেবের চাকর?

হরিচরণ আর তর্কের মধ্যে গেল না। বললে—তা কোথায় নিয়ে যেতে হবে বলো-না, আমি নিয়ে যাচ্ছি; আমি কি বলেছি আমি নিয়ে যাবো না? তোমাদের দেখাশোনা করবার জন্যেই তো সাহেব আমাকে রেখেছে—। বলো, কোথায় যাবে তোমরা?

দুর্গা চাইলে ছোট বউরানীর মুখের দিকে। অর্থাৎ কোন্ দিকে যাওয়া যায়। কিন্তু কারোরই তখন মনস্থির নেই। একদিন কেষ্টনগরের দিকে যাত্রা করবে বলেই বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল দুজনে। সেদিন কী তিথি ছিল তা দেখা হয়নি। তখন যে অবস্থা তাতে তিথি-নক্ষত্র দেখবার সময় ছিল না। শুধু কোনো রকম করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়াটাই ছিল সমস্যা। তখন কি জানতো এই মাসের-পর-মাস আটকে থাকতে হবে পথে! তখন কি জানতো এইরকম এক ম্লেচ্ছ সাহেবের সঙ্গে এক-বাড়িতে এক সঙ্গে রাত কাটাতে হবে!

তখন আড়ালে দুর্গা বলতো—মুখে আগুন অমন সায়েবের! নিজের মাগ-ছেলে কোথায় পড়ে রইলো, এখেনে এসেছে লড়াই করতে! তা লড়াই-ই যদি করবি বাপু তো লড়াই করে নবাবকে খুন করে ফেলতে পারছিসনে? তাহলে তুই কিসের সাহেব শুনি? ও পাষণ্ডটাকে মেরে কবরে পুরতে পারছিসনে?

আবার যখন সাহেবের কথায় মনটা ভিজে যেত তখন আবার খুব মিষ্টি কথা বেরোত দুর্গার মুখে।

—আহা গো, সারাদিন ভেবে ভেবে মুখটা শুকিয়ে গেছে বাছার!

দুর্গা বুঝতে পারতো সাহেব যেন খুব ভাবনায় পড়েছে। কিন্তু ছোট বউরানীর মুখখানার দিকে চাইলেই ছোটমশাই-এর কথাটা মনে পড়ে যেত। আহা, যে-মানুষ বউরানী বলতে পাগল সে-মানুষটা সেখানে কী-রকম করে দিন কাটাচ্ছে কে জানে! কত ফুল দিয়ে বউরানীর খোঁপা বেঁধে দিত দুর্গা। বিকেলবেলা বউরানীর গা ধুইয়ে দিয়ে পায়ে আলতা পরিয়ে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখতো। একদিন খোঁপা বাঁধা খারাপ হলে ছোটমশাই আবার রাগ করতো। সেই মানুষ কি আর বউরানীকে দূরে পাঠিয়ে দিয়ে শান্তিতে আছে! তারও প্রাণটা সেখানে ধড়ফড় করছে। এখানে এই পেরিন সাহেবের বাগানে ছোট বউরানী রাত্রে শুয়ে শুয়ে কাঁদে। বলে—আমার গলাটা টিপে আমাকে তুই মেরে ফ্যাল দুগ্গা, আমি মরে যাই, আমার আর বেঁচে থাকতে ভালো লাগছে না।

কতদিন পাশের বাদাম গাছটা থেকে বাদুড় ডাকার শব্দে বউরানী ভয় পেয়ে চিৎকার করে ডেকেছে—দুগ্যা, দুগ্যা—

দুর্গা বলেছে—কী বউরানী?

বউরানী বলতো—কে যেন কেঁদে উঠলো মনে?

অথচ এখান থেকে বেরিয়ে গেলেই যে একেবারে শান্তি, তারও তো কোনো

ঠিক নেই। আবার ভাসতে ভাসতে কোথায় গিয়ে কার ডেরাতে ঠেকবে কে বলতে পারে!

হরিচরণ বলছিল—তা বেশ তো, কেষ্টনগরেই যদি যেতে চাও তো সেখানেই তোমাদের পৌঁছিয়ে দিচ্ছি—

তখন বিকেল হয়ে গেছে। ছোট বউরানী লম্বা একটা ঘোমটা দিয়ে নৌকোয় গিয়ে উঠলো। সাহেব নেই, না-থাক। সাহেবকে বলে গেলে হয়তো যেতেই দিত না। হয়তো আরো কিছুদিন ঠেকিয়ে রাখতো। নানা ছল-ছুতো করে আটকে রাখতো তাদের। কিন্তু লড়াই যদি কোনোদিন না থামে তো চিরকাল কি তোমার বাড়িতে পড়ে থাকবো নাকি?

কাপড়ের একটা পোঁটলা ছাড়া আর তো কিছু নেই সঙ্গে। সেই পোঁটলাটাই নৌকোর ভেতরে উঠিয়ে রাখলে হরিচরণ।

—সাহেব কিন্তু এসে রাগ করবে খুব দিদি!

দুর্গা বললে—রাগ করুক গে। সায়েব কি আমার একেবারে সাত-পুরুষের ভাতার, রাগ করলে আমার একেবারে সব্বোনাশ হয়ে যাবে!

ছোট বউরানী বললে—তা সায়েব তোমার গেলই বা কোথায় হরিচরণ? আমাদের তো বলে যেতে হয়!

হরিচরণ তখন নৌকোর গলুইতে উঠে বসেছে। বললে—সায়েবের কি মাথার ঠিক আছে বউরানী, এই তো সবে ফরাসডাঙ্গা থেকে ফরাসীদের তাড়িয়ে দিয়ে এল, এরই মধ্যে আবার বোধ হয় কাজ পড়েছে—

—কাজ পড়েছে না ছাই! কাদের সঙ্গে গপ্‌পো করতে বেরিয়েছে! কারা এসেছিল, জানো তুমি?

হরিচরণ বললে—কত কাজের লোক আসে সাহেবের কাছে, আমি কি সকলকে চিনি দিদি?

ততক্ষণে গঙ্গার স্রোতে নৌকোয় টান ধরেছে। তরতর করে ভেসে চলেছে উত্তর দিকে। বরানগরের ঘাট পেরিয়ে যতদূর চাও কেবল গাছপালা আর জঙ্গল। বিকেলের নরম সূর্যের আলোয় জলের ছোট ছোট ঢেউ সোনার মতন চিকচিক করে উঠছে। পেরিন সাহেবের বাগানটা আর নজরে পড়ে না। বাগানের ছাউনির সেপাইরা যারা টের পেয়েছিল, তারা একবার দূর থেকে চেয়ে দেখেছিল। কিন্তু এদিকে তাদের ভালো করে দেখা নিষেধ। কর্নেল সাহেব কাউকেই এদিকে আসতে দিত না। বরানগর পেরিয়ে নৌকো বড়গঙ্গায় পড়লো। বড়গঙ্গার এ-পার ও-পার অনেক দূর।

বউরানী হঠাৎ বললে—মরালীকে খবর দেওয়ার কী করলি রে দুগ্গা?

দুর্গা বললে—তোকে আগে কেষ্টনগরের রাজবাড়িতে তুলি, তারপর দেখি কী করতে পারি।

—সে কি এখন আর আমাদের চিনতে পারবে রে!

—মুখপুড়ি চিনতে না পারলে তার মুখ আরো পুড়িয়ে দেবো না! আমি সেদিন না-বাঁচালে মুখপুড়ি থাকতো কোথায় শুনি! আজ নবাবের সঙ্গে শুয়ে কি একেবারে সাপের পাঁচ পা দেখেছে?

—তা হরিচরণকে বললে হয় না আমাদের খবরটা একবার মরিয়ম বেগমকে দিতে?

দুর্গা বললে—তুমি থামো বউরানী, শেষকালে হিতে বিপরীত হয়ে যাবে।

তার চেয়ে কেষ্টনগরের মহারাজকে বলে যদি কিছু সুরাহা করতে পারি।

শেষকালে যখন নৌকোটা একেবারে মোহানার মুখোমুখি এসে পড়লো তখন বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে। বন-জঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে দু-একটা আলো আরম্ভ করেছে টিমটিম করে। মাঝগঙ্গার ওপর থেকেও বউরানীর গাটা করতে লাগলো।

হঠাৎ হরিচরণ দরজার কাছে এসে বললে—দিদি, আলোটা নিবিয়ে দিচ্ছি—

—কেন হরিচরণ, কী হলো?

—পেছনে কাদের একটা বজরা আসছে!

—বজরা? কাদের বজরা? কারা আসছে?

হরিচরণ বললে—কী জানি দিদি, মনে হচ্ছে নিজামতের। নিজামতি ঝালরদার বজরা—

সঙ্গে সঙ্গে আলোটা নিবিয়ে দিলে হরিচরণ। আর চারদিকের অন্ধকারটা আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলো। দুর্গা বউরানীর আরো কাছে ঘেঁষে এসে দুই হাত দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে রইলো। ভয় পেও না বউরানী, এই তো আমি রয়েছি। আমি যতক্ষণ আছি, ততক্ষণ কাউকে তোমার গা ছুঁতে দেবো না—

পেরিন সাহেবের বাগানে তখন আর-এক নাটক জটিল হয়ে উঠেছে। সকাল থেকেই ক্লাইভের মনটা অস্থির ছিল। হুগলী থেকে ফেরবার সময়ই ক্লাইভ খবর পেয়েছিল, রাজা দুর্লভরাম আর্মি সরিয়ে নিয়ে গেছে লক্ষাবাগ থেকে। তারপর এখানে এসে দিদির সঙ্গে কথা বলবার সময়েই কেষ্টনগরের মহারাজা এসে হাজির হয়েছিল। সঙ্গে ছিল হাতিয়াগড়ের জমিদার।

এতদিন ধরে যে ধারণাটা মনে মনে গড়ে উঠেছিল সেইটেই আরো শক্ত হয়ে শেকড় গজালো সাহেবের মনে। এরাই ইণ্ডিয়ান। অ্যাডমিরাল ওয়াটসন্ আগেই ভালো করে চিনেছিল এদের, এবার ক্লাইভও চিনতে পারলে। হ্যাঁ, এরাই ইণ্ডিয়ান। সামান্য ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীতে একদিন ছ'টাকা মাইনের রাইটার হয়ে এসেছিল সে। না আছে তার ফ্যামিলি পরিচয়, না আছে বিদ্যে, না আছে টাকা। বলতে গেলে কিছুই নেই তার। গড শুধু দিয়েছে দুটো চোখ, একখানা বুক আর দুর্জয় সাহস। ক্যাপিট্যাল বলতে আর কিছুই নেই তার। একজন জগৎশেঠ কি একজন উমিচাঁদ তাকে কিনে নিতে পারে। তবু তার কাছেই এই ইণ্ডিয়ানরা আসছে। সবাই চাইছে ক্লাইভ তাদের কিং করে দেবে। ক্লাইভই তাদের সেভিয়ার, ক্লাইভই তাদের অলমাইটি গড। এদের কি লজ্জাও হয় না! এদের কি নিজেদের ওপর একটু আস্থাও নেই? তোমরা তোমাদের কান্ট্রির কথা ভাবছো না, শুধু ভাবছো নিজের লাভ-লোকসানের কথা। কিন্তু আমিও তো মানুষ, আমারও তো লোভ থাকতে পারে। আমিও তো তোমাদের প্রপার্টি কেড়ে নিতে পারি।

ওয়াটসন্ বলেছিল—এই-ই আমাদের অপারচুনিটি রবার্ট, এমন সুযোগ আর আসবে না। ফ্রেঞ্চরা নেই, ডাচরা নেই, পর্তুগীজরা নেই, এখন আমরাই লর্ড অব্ দি ল্যাণ্ড—

মহারাজার কথা শুনতে শুনতে ওয়াটসনের কথাগুলোই মনে পড়ছিল বারবার।

নবাবের ফেবারে কেউই নেই। নবাবের নিজের মাদার পর্যন্ত নবাবের বিরুদ্ধে। এর চেয়ে বড় হতভাগ্য আর কে আছে দুনিয়ায়। এ নবাব তো যেতে বাধ্য। তবু ইতিহাসের এমনই ভাগ্য যে আমিই এই সেঞ্চুরির ডেনিয়্যাল হয়ে উঠবো!

হঠাৎ ক্লাইভ বললে—আমি যদি মুর্শিদাবাদ অ্যাটাক করি তো আপনারা আমাকে হেলপ করবেন কথা দিচ্ছেন?

ছোটমশাই সমস্ত কথাই মন দিয়ে শুনছিল। বললে—আমি কথা দিচ্ছি আপনাকে সব রকম সাহায্য করবো। আমি টাকা দিয়ে সাহায্য করবো, মানুষ দিয়ে সাহায্য করবো, আমার হাতী আছে, আপনি যদি চান তো তাও দিতে পারি—

কিন্তু ক্লাইভ উত্তর দেবার আগেই বাইরে কার যেন পায়ের শব্দ হলো।

—অর্ডারলি!

অর্ডারলি ভেতরে এসে কী যেন বলতে গিয়ে থেমে গেল। মিলিটারি সিক্রেট বাইরের লোকের কাছে প্রকাশ করার কথা নয়। রবার্ট ক্লাইভ মুখ দেখেই বুঝতে পারলে। মহারাজকে বসতে বলে পাশের ঘরে গেল। অ্যাডমিরাল ওয়াটসন্ বসে ছিল সেখানে। জিজ্ঞেস করলে—ও-ঘরে কারা?

ক্লাইভ বললে—কৃষ্ণনগরের মহারাজ আর হাতিয়াগড়ের জমিন্দার—

—কী বলছে ওরা? কী করতে এসেছে?

—দি সেম প্রপোজাল। ওরাও নবাবের এগেন্স্টে। আমরাই ওদের সেভিয়ার। আমাদের হেলপ করতে রেডি ওরা।

—কিন্তু এই দেখ, ওয়াটস্-এর কাছ থেকে চিঠি এসেছে। দো-হাজারী মনসবদার ইয়ার লুৎফ খাঁ আর মীরজাফর তাদের টার্মস্ দিয়েছে। এই হচ্ছে মীরজাফরের টার্মস্—

এক দুই তিন করে করে বারো দফা শর্ত মীরজাফরের।

এক এক করে সবগুলি শর্ত পড়তে লাগলো ওয়াটসন্। সাত নম্বর শর্তে লেখা আছে—

(৭) আরমানীগণের ক্ষতিপূরণের জন্য ৭ লক্ষ টাকা দিব। ইংরেজ, দেশীয় প্রভৃতির মধ্যে কাহাকে কী পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে তাহা ওয়াটসন্, ক্লাইভ, ড্রেক, ওয়াটস্, কিলপ্যাট্রিক ও বিচার সাহেব ঠিক করিয়া দিবেন।

(৮) কলিকাতা যে খাত দ্বারা বেষ্টিত আছে তাহার মধ্যে অনেক জমিদারের জমি রহিয়াছে। এই জমি এবং খাতের বাহিরে ৬ শত গজ ইংরেজ কোম্পানীকে দান করিব।

(৯) কলিকাতার দক্ষিণে কুল্পী পর্যন্ত স্থান ইংরেজ কোম্পানীর জমিদারি হইবে। তথাকার সমস্ত কর্মচারী কোম্পানীর অধীন হইবে এবং কোম্পানী অন্যান্য জমিদারের মত রাজকর দিবেন।

(১০) যখন আমি ইংরাজ-সৈন্যের সাহায্য চাহিব তখন তাহার ব্যয়ভার আমার।

(১১) হুগলীর দক্ষিণে কোনো স্থানে দুর্গ প্রস্তুত করিব না।

(১২) আমি বাঙলা বিহার উড়িষ্যা এই তিন প্রদেশের রাজ্যে অধিষ্ঠিত হইলেই উল্লিখিত সমস্ত টাকা দিব।

ঈশ্বর এবং পয়গম্বরের নামে শপথ করিয়া প্রতিজ্ঞা যতদিন জীবিত থাকিব ততদিন এই সন্ধিপত্রের নিয়ম পালন করিব।

ইতি—

তারিখ ১৫ই রমজান। ৪ জুলুস। মীরজাফর খাঁ।

তারই নিচে সকলের সই রয়েছে। ওয়াটসন্, ড্রেক, ওয়াটস্, কিলপ্যাট্রিক, বিচার।

ওয়াটসন্ জিজ্ঞেস করলে—তুমি যেমন ড্র্যাফট্ করে দিয়েছিলে ঠিক তেমনিই লিখে পাঠিয়ে দিয়েছে। এখন তুমি একটা সই করে দাও—

ক্লাইভ বার বার পড়তে লাগলো টার্মসগুলো। কোথাও কোনো ফাঁক না থাকে।

ওয়াটসন্ বললে—ফ্লেচার এই টার্মস্ নিয়ে চলে এসেছে কাশিমবাজার থেকে—এখনই আবার একটা কপি নিয়ে মীরজাফরকে দিতে যাবে।

—আর ওয়াটস্?

—সে জগৎশেঠের বাড়িতে গিয়েছিল।

—কিন্তু উমিচাঁদ যায়নি?

—গিয়েছিল। উমিচাঁদ সঙ্গেই ছিল। কিন্তু ফ্লেচার বললে যে, মুর্শিদাবাদে সমস্ত জানাজানি হয়ে গেছে।

—ফ্লেচার কোথায়?

ওয়াটসন্ বললে—বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে এসেছি। তুমি আগে ওদের বিদেয় করে দাও, ওরা চলে গেলে তোমাকে আরো অনেক কথা বলবো—অনেক জরুরী কথা আছে—

ক্লাইভ উঠলো।

পাশের ঘরে তখনো মহারাজ আর ছোটমশাই চুপ করে অপেক্ষা করছিলেন। ক্লাইভ গিয়ে বললে—মহারাজ, আজকে একটা জরুরী কাজে আটকে পড়েছি, আপনি আর একদিন বরং আসবেন—

মহারাজ উঠলেন। ছোটমশাইও উঠলো।

ক্লাইভ বললে—কিছু মনে করবেন না ছোটমশাই, আপনারা যদি আমাকে হেলপ করেন তাহলে আমিও আপনাদের হেলপ করবো—গড উইল হেলপ আস্—

অনেক আশা নিয়ে এসেছিল ছোটমশাই। মনটা বড় ভেঙে গেল। আজ কতদিন ধরে কেবল এই ক্লাইভ সাহেবের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে চেষ্টা করে আসছে। কিন্তু প্রত্যেকবারই একটা-না-একটা বাধা এসে পড়ছে। সেবারও সেই বাউণ্ডুলে কবিটাকে মুরুব্বি ধরে এসেছিল। সেবারও বাধা পড়েছিল।

মহারাজ বাইরে বেরিয়ে বললেন—এতদিনই ধৈর্য ধরলেন, আর একটু ধৈর্য ধরুন! যদি ধৈর্যই ধারণ করতে না-পারবেন তো পুরুষমানুষ হয়েছিলেন কেন?

—কিন্তু আমি বড়গিন্নীর কাছে মুখ দেখাবো কেমন করে?

—তা আপনার তো কিছু দোষ নয়, আপনিই বা কী করবেন?

ছোটমশাই বললে—আমারই তো দোষ, আমি যদি আমার স্ত্রীর রূপ দেখাবার জন্যে বাহাদুরি করে মুর্শিদাবাদে নবাবজাদার বিয়ের সময় না নিয়ে যাই তাহলে এ-সব আর কিছুই হয় না। কেউ জানতেই পারতো না যে আমার স্ত্রী সুন্দরী—

তৎক্ষণে বাইরে বেরিয়েছেন দুজনে। মহারাজ বললেন—আপনার বজরা কোথায়?

—আমি তো কালীঘাটে বজরা রেখে এসেছি।

—তাহলে আমার সঙ্গেই চলুন। একসঙ্গে কালীঘাট পর্যন্ত যাই, ওখান থেকে সকলকে নিয়ে আমি কেষ্টনগরে চলে যাবো। আপনি হাতিয়াগড়ে চলে যাবেন—

—কিন্তু আমি বড়গিন্নীকে গিয়ে কী বলবো?

মহারাজ বললেন—বলবেন আমি তার ভার নিয়েছি। দেখলেন না ক্লাইভ সাহেবের মুখের চেহারাখানা! ভেতরে ভেতরে ওদের ষড়যন্ত্র চলছে। আপনি ভালো করে দেখেননি। আমি দেখেছি, সাহেবের আরদালি যেই ঘরে ঢুকলো আর সাহেবের মুখখানা কেমন গম্ভীর হয়ে গেল।

—আমি তো বললাম সাহেবকে আমি টাকা দিয়ে পয়সা দিয়ে লোকবল দিয়ে হাতী দিয়ে সবকিছু দিয়ে সাহায্য করবো।

—ভালোই করেছেন বলে। আমিও ভেতরে ভেতরে সাহায্য করবো, কিন্তু আমি তো মহারাজা হয়ে প্রকাশ্যে সাহায্য করার কথা বলতে পারিনে আপনার মত। জানাজানি হয়ে গেলে আমাদের সকলের ক্ষতি হয়ে যাবে। রাজনীতিতে অত তাড়াতাড়ি কিছুই করতে নেই। সইয়ে সইয়ে ঠিক সময় ঘা দিতে হয় তা জানেন তো! সেইজন্যেই নবাব এখনো আমার ওপর সন্দেহ করেনি। সকলের ওপর সন্দেহ হলে সব বন্দোবস্ত গোলমাল হয়ে যাবে—

ছোটমশাই বললে—তাহলে আমি এখন কী করবো?

মহারাজ বললেন—আমি কৃষ্ণনগরে গিয়েই আপনাকে খবর দেবো—

—কিন্তু কী খবরই বা দেবেন, আমি তো কোনো আশা দেখতে পাচ্ছি না।

মহারাজ বললেন—আশা কারো মেটবার কথা নয় ছোটমশাই, নইলে বাদশা আওরংজেবের মত লোক বিরেনব্বই বছরে মরবার সময় কখনো ওইরকম কথা বলে যায়? আপনি আমি তো তুচ্ছ। আমরা যদি তিনশো বছর বাঁচি তবু আমাদের আশা মিটবে না।

ঘরের মধ্যে ওয়াটসন্ বললে—ওরা গেছে এখন?

—হ্যাঁ, ওদের বিদেয় করে দিয়ে এলাম।

—তাহলে এখনি একবার ফোর্টে চলো।

—কেন?

—কাশিমবাজার থেকে ওয়াটস্ ফ্লেচারকে চিঠি দিয়েছে যে, মীরজাফরের সঙ্গে যে আমাদের কথাবার্তা চলছে তা মুর্শিদাবাদে সব জানাজানি হয়ে গেছে। জগৎশেঠজীর বাড়িতে যখন ওয়াটস্ আর উমিচাঁদ গিয়েছিল তখন হঠাৎ সেখানে মরিয়ম বেগম গিয়ে হাজির—

—সে কী! মরিয়ম বেগম কী করে জানতে পারলে?

—ভগবান জানে! শুনলাম মরিয়ম বেগম নাকি জগৎশেঠের বাড়িতে গিয়ে কান্নাকাটি করেছে, বলেছে তার হাজব্যান্ডের কাছে ফিরে যেতে চায়—

ক্লাইভ বললে—অল্ ব্লাফ্। সমস্ত মিথ্যে কথা—

—কিন্তু সত্যি হোক মিথ্যে হোক, উই মাস্ট্ বি কেয়ারফুল। চলো, আমি সমস্ত প্ল্যান করে ফেলেছি। কালকে ওয়াটস্ আর উমিচাঁদ আসছে ক্যালকাটায়। আমার মনে হয় এখনি আর্মি নিয়ে মুর্শিদাবাদের দিকে এগিয়ে যাওয়া উচিত—

ক্লাইভ বললে—আচ্ছা, চলো, তাহলে—

দুজনেই বাইরে বেরোল। আর সময় নেই। একবার ইচ্ছে হলো হরিচরণকে বলে যায়। কিন্তু কাছাকাছি কোথাও তাকে দেখা গেল না।

ওয়াটসন্ জিজ্ঞেস করলে—কী খুঁজছো?

ক্লাইভ বললে—আমার এখানে যে লেডীরা রয়েছে তাদের খবর দিয়ে যাচ্ছি—

—তোমার এখানে এখনো তারা আছে? ওরা তো রইলোই, ওদের জন্যে ভাবছো কেন, এখন চলো—পরে এসে দেখা করো—

একদিকে মীরজাফরের টার্মস্, আর অন্য দিকে এরা। ঠিক আছে, একটুখানি ফোর্টে যাবে আর আসবে, কত আর দেরি হবে। অ্যাডমিরাল ওয়াটসন্ও তখন টানাটানি করছে। তখন আর সময়ও নেই। কাউকে না বলে বাইরে চলে এল। তারপর সেই পেরিন সাহেবের বাগানের ছাউনি পেরিয়ে কর্নেল আর অ্যাডমিরালকে নিয়ে কোম্পানীর পালকিটা সোজা ফোর্টের দিকে চলতে লাগলো। হে'ইও-হে'ই, হে'ইও-হে'ই-হে'ইও—

ইতিহাসের এও বুঝি এক পরিহাস। কে জানতো বেগম মেরী বিশ্বাস সেই রাত্রে জগৎশেঠজীর বাড়ি যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এমন করে সারা পৃথিবীর মানচিত্রের রং বদলে যাবে। সামান্য এক গ্রামের মেয়ে মরালী। মরালীবালা দাসী, শোভারাম বিশ্বাসের মেয়ে। সে-ই হবে সেই রং-বদলের উপলক্ষ। আর বেগম মেরী বিশ্বাস নিজেই কি জানতো? না—

যতক্ষণ জগৎশেঠজীর সঙ্গে ওয়াটস্ আর উমিচাঁদের কথা হয়েছে, সব কান পেতে শুনেছে মরালী। পাশের ঘর থেকে স্পষ্ট সব কথা কানে এসেছে।

তারপর আবার যখন জগৎশেঠজী ঘরে ঢুকলো তখন মরালী দূরে সরে এসে নিজের জায়গায় বসলো।

জগৎশেঠজী বললেন—এত রাত্রে আপনি এখানে এসেছেন, আপনার চেহেল্-সুতুনে কেউ টের পায়নি?

মরালী বললে—টের তো পেয়েছেই—আমার তাঞ্জামের বেহারারা আমার সঙ্গেই এসেছে, তারা বাইরে রয়েছে—

—তাহলে?

—কিন্তু আমার তো এখন ওসব কিছু ভাববার সময় নেই।

—কিন্তু আপনাকে এখন আমার ব্যাড়িতে থাকতে দিলে আপনারও ক্ষতি হবে, আমারও ক্ষতি হবে—

মরালী বললে—আপনার মত লোকও যদি এ-কথা বলেন তো আমি কোথায় যাবো? কার কাছে গিয়ে আশ্রয় চাইবো? কে আমার মত মেয়েদের বাঁচাবে? আমাদের ইজ্জৎ কে রাখবে?

জগৎশেঠজীর বোধহয় দয়া হলো। কিংবা হয়তো নিজেকে বাঁচাবার জন্যেই বললেন—আপনি এখন চেহেল্-সুতুনে যান বেগমসাহেবা, পরে আমি হাতিয়াগড়ে আপনার স্বামীর সঙ্গে পরামর্শ করে আপনাকে খবর দেবো—

—কিন্তু আমাকে আপনি খবর দেবেন কী করে?

—আপনি বলুন আপনাকে কী করে খবর দেওয়া যায়?

মরালী বললে—একজন লোক আছে আমার—তার কাছে আমার খবর নিতে পারেন—

—কে সে?

—চক-বাজারে সারাফত আলি নামে একজন খুশ্‌বু তেলওয়ালা আছে, সেখানে

সে থাকে। তার নাম কান্ত। কান্ত সরকার। তাকে খবর দিলেই আমি খবর পাবো—

—সে কে? জগৎশেঠজী অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

মরালী বললে—সে আমার দেশের লোক।

পাশের ঘরে তখন ওয়াটস্ আর উমিচাঁদ অন্য মতলব করছে। যখন মরিয়ম বেগম এসে গেছে জগৎশেঠজীর বাড়িতে তখন আর দেরি করা চলে না। চল্‌ন, চল্‌ন। উমিচাঁদের রক্তের মধ্যে তখন সন্দেহের ফণা ফোঁস ফোঁস করে উঠছে। একবার ফিরিঙ্গী কোম্পানীর হাতে ধরা পড়েছে আগে, আর একবার এই মরিয়ম বেগমের হাতেও ধরা পড়েছিল। এবার ধরা পড়লে আর ছাড়া পাওয়া যাবে না। চল্‌ন। চল্‌ন!

ভিখ্‌ শেখ তখনো কড়া নজর রেখে ফটকের সামনে পায়চারি করছে। হঠাৎ পেছন থেকে দ্‌'জন শরিফ আদমিকে আসতে দেখে পা খাড়া করে ব্‌ক চিতিয়ে দাঁড়ালো।

—সেলাম হ্‌জ্‌র!

কিন্তু তখন আর সেলামের প্রতিদান দেবার সময় নেই কারো। ওয়াটস্ সাহেব বোরখাটা পরে নিয়ে ম্‌খ ঢেকে দিয়েছে। তারপর সোজা পালকিতে উঠে চড়ে বসলো দ্‌'জনেই। রাত শেষ হয়ে আসছে। মহিমাপ্‌রের আকাশের প্‌ব দিকে তখন একটা তারা জ্বল জ্বল করে জ্বলছে শ্‌ধ্‌। সমস্ত প্‌থিবী নিস্তব্ধ। সমস্ত হিন্দ্‌স্থান ঘ্‌মিয়ে পড়েছে। কিন্তু ঘ্‌ম নেই ইতিহাসের। সে নিঃশব্দে নিজের খাতায় সালতামামী করে চলেছে অতীত বর্তমান আর ভবিষ্যতের। সামনের সাদা পাতায় তখন আরো কী কী লিখবে, ভাবছে। ম্‌ত্যু না জীবন, পতন না উত্থান, ধ্বংস না স্‌ষ্টি। মোতোমন উল্ ম্‌ল্‌ক্ আলাউদ্দৌলা জাফর খাঁ নসিরী নাসির জঙ্গ ম্‌র্শিদকুলী খাঁ যে মসনদ পয়দা করে গিয়েছে, তার যদি অসম্মান কেউ করে তো তার শাস্তির বিধান লেখা হচ্ছে তখন সেই সাদা পাতায়। ইতিহাস-প্‌র্‌ষ লিখছে আর ভাবছে।—১৭০৭ সালে, হিজরি ১১১৮, ২৮শে জেক্‌দ, ২১শে ফেব্‌য়ারী তারিখে যে-বাদশা আওরংজেব্ দাক্ষিণাত্যে নশ্বর দেহ রেখে বেহেস্তে চলে গিয়েছে, তার সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে গেল তোমাদের মসনদ! হে ক্ষণভঙ্গ্‌র মন্‌ষ্যসমাজ, কিছ্‌ই চিরস্থায়ী নয়। ইহা স্থির জানিবে যে তোমাদের নিয়মের চেয়ে আমার নিয়ম আরো কঠোর আরো নিষ্ঠ্‌র। আমি নিয়ম স্থির করে দিয়েছি যে, যেখানে অত্যাচার সেখানেই পতন, যেখানে অন্যায় সেখানেই ধ্বংস, যেখানে অপব্যয় সেখানেই বিলোপ। এ নিয়ম তোমরা জানো বা না-জানো, শোনো বা না-শোনো, অনাদি কাল ধরে এ-নিয়ম লঙ্ঘন করে কেউ অবিনশ্বর হতে পারেনি। দোর্দণ্ডপ্রতাপ মহাপ্রাণ আকবর বাদশা যে মহতী শাসননীতির প্রবর্তন করে প্রকৃতিপ্‌ঞ্জের হ্‌দয়াসনে দেশীয় ভূপালের সিংহাসন রচনার প্রকৃষ্ট উপায় উদ্ভাবন করেছিলেন, তাঁর অদ্‌রদর্শী উত্তরাধিকারী ভ্রান্তনীতির অন্‌সরণ করে মোগল রাজশক্তিকে ঘৃণাস্পদ করে তুলেছিল বলেই আমি তার পতন ঘটিয়েছি। সামনে পতনের সঙ্কেত দিলাম, তোমরা যদি সে-সঙ্কেত চিনতে পারো তো বাঁচবে, নয় তো ভাগীরথীর স্রোতে তোমাদের ভাগ্য বিল্‌প্ত হয়ে যাবে দ্‌' তিন শো বছরের মত। আজ এই ১১ই জ্‌ন তারিখের শেষ রাত্রে ইহা লিখিতং। শ্‌ভমস্তু।

ফ্লেচারকে আগেই পাঠিয়ে দিয়েছিল ওয়াটস্।

ফ্লেচার বলেছিল—এ-চিঠি কর্নেল সাহেবকে দেবো, না অ্যাডমিরাল সাহেবকে?

ওয়াটস্ বললে—প্রথমে ক্যালকাটার ফোর্টে যাবে অ্যাডমিরাল ওয়াটসনের কাছে, তারপর ওয়াটসনকে নিয়ে যাবে পেরিন সাহেবের বাগানে কর্নেল ক্লাইভের কাছে। ভেরি ইম্পর্ট্যাণ্ট ডকুমেণ্ট।

রাত্রের ঝাপসা অন্ধকারেই ফ্লেচার চলে গিয়েছিল। কিন্তু খানিক পরে আবার এসেছে—স্যার—

—কী? কী হলো? গেলে না?

ফ্লেচার বললে—স্যার, মরিয়ম বেগমসাহেবা আজ ক্যালকাটায় যাচ্ছে—

চমকে উঠেছে উমিচাঁদ। বললে—কে বললে?

—স্যার, বশীর মিঞা, নিজামতের স্পাই—

—আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি যাও—

আর দাঁড়ালো না ফ্লেচার। কিন্তু কাশিমবাজারের কুঠিতে বসেও মনটা খচখচ করতে লাগলো। তাহলে তো তাদের সব ষড়যন্ত্র জেনে ফেলেছে মরিয়ম বেগম।

উমিচাঁদ বললে—আমিও যাই—

ওয়াটস্ বললে—তুমি একলা গেলে কেউ জেনে ফেলবে—তার চেয়ে...

তারপর একটু ভেবে বললে—আমিও তোমার সঙ্গে যাবো—

—কোথায়?

—ক্যালকাটায়। মরিয়ম বেগম যখন সব জেনে ফেলে গিয়েছে তখন এখানে থাকা আর সেফ্ নয়, সেবারের মত তাহলে নবাব আবার আমাকে অ্যারেস্ট করবে—

উমিচাঁদ বললে—তাহলে কুঠি কে দেখবে?

—কেউ জানবে না আমি চলে যাচ্ছি। এখানে কাউকে জানাবো না। তোমার সঙ্গে যেন আমি মর্নিং-ওয়াক করতে বেরোচ্ছি, এই ভাবে দুটো ঘোড়া নিয়ে দু'জন চলে যাবো—

—তারপর?

ওয়াটস্ বললে—পরের কথা পরে ভেবে দেখবো। এখানে সব জানাজানি হয়ে গেছে, এখনি নবাবের লোক এসে যাবে।

উমিচাঁদ বললে—কিন্তু মরিয়ম বেগম কলকাতায় কী করতে যাবে? সেখানে তার কী কাজ? আবার ক্লাইভ সাহেবের কাছে যাবে নাকি! আবার কী মতলব?

ওয়াটস্ বললে—কী জানি কী মতলব, কর্নেল সাহেবের তো আবার মেয়ে-মানুষের ওপর একটু দুর্বলতা আছে। তাকে মিসগাইড করতে পারে—

আর দেরি নয়। যেখানকার জিনিস সেখানেই পড়ে রইলো। কাশিমবাজার কুঠি থেকে দু'জন ভোর বেলা বেরোল ঘোড়ায় চড়ে। সবাই দেখলে সাহেবরা বেড়াতে বেরোচ্ছে। ফিরিঙ্গী কুঠির সাহেবরা এমন করেই রোজ বেড়ায়। চাষারা লাঙল নিয়ে ক্ষেতের দিকে চলেছে। বর্ষার আগেই ক্ষেত খুঁড়ে তৈরি রাখতে হবে। তারপর যখন আরো সকাল হলো তখন সামনে ধু-ধু করছে ফাঁকা পোড়ো জমি। সেখানে তখন কেউ লোকজন আসেনি। দুটো ঘোড়া জোর কদমে ছুটতে লাগলো।

যখন আর কোনো কেউ দেখবার ভয় নেই, তখন অগ্রদ্বীপের কাছে এসে ঘোড়া থেকে নেমে পড়লো ওয়াটস্। ঘোড়া দুটোকে ছেড়ে দিলে। যা, চরে চরে ঘাস খেয়ে বেড়া। কাদের একটা নৌকো ছিল ঘাটে। সেই নৌকোটা নিয়েই উমিচাঁদ আর ওয়াটস্ দাঁড় বাইতে লাগলো। বললে—কাম অন উমিচাঁদ—কুইক—কুইক—

সাহেবের গায়ে ক্ষমতা আছে বটে। নবদ্বীপ পৌঁছেই ভালো বজরা পাওয়া গেল। খবর পেয়ে কোম্পানীর সাহেব পাঠিয়ে দিয়েছে।

ওয়াটস্ জিজ্ঞেস করলে—ফ্লেচার সাহেব এত শিগগির পৌঁছলো কী করে?

—হুজুর, গহনার নৌকোকে টাকা দিয়ে জলদি জলদি চলে গেছেন। কোম্পানীর ফৌজও কালনার দিকে রওনা দিয়েছে—

—তোমাকে কে পাঠালে?

—অ্যাডমিরাল সাহেব।

বেশ মজবুত বজরা। নবদ্বীপের ঘাট থেকে উঠলে কালনায় পৌঁছতে দেরি হবার কথা নয়। দাঁড়িরা ঝপঝপ করে দাঁড় টেনে চলতে লাগলো। বদর, বদর—

হরিচরণের তখন ভয় লেগে গেছে। সত্যি সত্যিই নিজামতের নৌকো নাকি! হরিচরণও তাগাদা দিতে লাগলো দাঁড়িদের।—একটু জোরে জোরে দাঁড় বাও মিঞা, জোরে জোরে—

কিন্তু আর বোধ হয় ঠেকানো গেল না। পেছনের নৌকোটা যেন তীরের বেগে ছুটে আসছে। অন্ধকার চারদিকে। বজরার আলোটা নিবিয়ে দিয়েছে হরিচরণ, তবু যেন তাদের লক্ষ্য করেই জোরে জোরে বজরাটা ছুটে আসছে।

দুটো বজরাই জোরে চলেছে। কিন্তু আর পারা গেল না। পেছনের বজরাটা কাছে আসতেই হরিচরণ চিৎকার করে উঠেছে—সামাল—সামাল—

কিন্তু কারা যেন হরিচরণকে ধরে তার গলা টিপে ধরেছে। নৌকোর ওপর ধস্তাধস্তির শব্দ হলো খানিকক্ষণ। দুর্গা বাইরে উঁকি মেরে দেখলে অন্ধকারে কালো-কালো ক'টা ছায়ামূর্তি তাদের নৌকোয় উঠে পড়েছে।

—কে? কারা তোমরা?

বউরানী ভয়ে দুর্গার বুকের মধ্যে মুখ লুকিয়ে ফেলেছে। দুর্গা আবার চেঁচিয়ে উঠলো—কে? কারা তোমরা?

ওয়াটস্ তখনো নিজের বজরার মধ্যে বসে আছে। জিজ্ঞেস করলে—ভেতরে লেডী কেউ আছে? জেনানা? মেয়েমানুষ?

—হ্যাঁ, হুজুর। একজন নয়, দু'জন।

ওয়াটস্ উমিচাঁদের দিকে চাইলে। বললে—দেখলে তো, আমি বলেছিলাম, মরিয়ম বেগম লুকিয়ে পালাচ্ছিল, তাই আমাদের দেখে বজরার বাতি নিবিয়ে দিয়েছিল—

তারপর দাঁড়িয়ে উঠে বললে—চলো, ও নৌকোয় গিয়ে দেখে আসি—

উমিচাঁদ বললে—কিন্তু দু'জন কেন? সঙ্গে কি মনিবেগমসাহেবা আছে?

—তা হবে, কিংবা কোনো বাঁদী—

ওয়াটস্ আর উমিচাঁদ দু'জনই এ-নৌকো থেকে ও-নৌকোয় গিয়ে উঠলো। মরিয়ম বেগমের নৌকোর দাঁড়ি-মাঝি-মাল্লাদের হাত-পা-মুখ সব তখন বাঁধা হয়ে গেছে। তারা পাটাতনের ওপর পড়ে রয়েছে, কথা বলতে পারছে না।

উমিচাঁদ বললে—খুব সাবধান ওয়াটস্ সাহেব, মরিয়ম বেগমসাহেবার পেট-কাপড়ে ছোরা থাকে—

ওয়াটস্ বললে—তা থাক, আমার কাছেও পিস্তল আছে—

ওদিকে যখন রাত আরো গভীর হলো, মতিঝিলের ভেতরে নবাবের হঠাৎ কেমন মনে হলো, ঠিক যেমন করে রোজ রাত আসছিল, তেমনি করে আর রাত এল না। প্রতিদিন মরিয়ম বেগমসাহেবা আসে, প্রতিদিন এসে পাশে বসে। রামপ্রসাদের কথা বলে, উদ্ধব দাসের কথা বলে, আর ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে কখন পালিয়ে যায় টের পাওয়া যায় না।

বড় আরামে কাটছিল ক'দিন। অনেক দিন পরে যেন একটু শান্তির মুখ দেখেছিল নবাব।

নানীবেগম যেদিন আসতো মীর্জা জিজ্ঞেস করতো—কেমন আছ নানীজী?

নানীবেগম বলতো—তুই কেমন আছিস মীর্জা?

—আমি খুব ভালো আছি নানীজী!

নানীবেগম বলতো—তুই ভালো থাকলেই আমি ভালো থাকি মীর্জা। আমার নিজের বলতে তো আর কিছু নেই—তুই-ই আমার সব—

—আচ্ছা নানীজী?

মীর্জা যেন হঠাৎ কী বলতে চায়। তারপর বলে—আচ্ছা নানীজী, ছোটবেলায় তুমি আমাকে অনেকবার ভালো হবার কথা বলতে, না?

—হ্যাঁ বলতাম। কিন্তু কেন রে? ও-কথা জিজ্ঞেস করছিস কেন?

মীর্জা বলে—কিন্তু তখন কেন তোমার কথা শুনিনি নানীজী? তোমার কথা না-শুনলে আমাকে তুমি বকোনি কেন? কেন আমাকে বলোনি যে, এ-জীবনেই পাপের ফল ভোগ করতে হয় মানুষকে? কেন তুমি শেখাওনি আমাকে যে, মসনদের চেয়ে মানুষের ভালোবাসা আরো বড় মসনদ!

নানীবেগম বলতো—কিন্তু হঠাৎ তোর এ-কথা কেন মনে এল রে?

—না নানীজী, আমি কোরাণ শুনছিলুম। কোরাণ শোনার পর আমার ঘুম এল আবার। আজকাল রাত্রে ভালো করে ঘুমোই, তা জানো নানীজী?

নানীবেগম বলতো—সে তো ভালো কথা রে। সেই জন্যেই তো আমি কোরাণ রোজ পড়ি—

—কিন্তু তাহলে তুমি আমার নানাকে এ-সব শেখালে না কেন?

নানীবেগমের মুখের জবাব বন্ধ হয়ে আসতো কথাগুলো শুনে। নানীবেগমই কি সেদিন কম কষ্ট পেয়েছিল? এই মসনদ কি কারো কাছে আরামের মসনদ ছিল কোনো দিন? নবাব আলীবর্দী কি বিশ্বাসঘাতকতা করেনি নবাব সুজাউদ্দীনের সঙ্গে? একদিন যে আলীবর্দীকে, যে হাজী আহম্মদকে সুজাউদ্দীন আশ্রয় দিয়েছিল তার বিশ্বাসঘাতকতা করতে কেন নবাব আলীবর্দী খাঁর বাধলো না? সরফরাজ তো কোনো অন্যায় করেনি, তবে কেন আলীবর্দী খাঁ তাকে খুন করতে গেলেন? এ কথা কি সত্যি যে, হাজি আহম্মদ বিষ খাইয়ে সুজাউদ্দীনকে খুন করেছিল? বলো, এ-কথা কি সত্যি?

—এ-সব কথা এতদিন পরে কেন মনে এল মীর্জা?

—না, তুমি বলো, তোমাকে বলতেই হবে। তোমাকে এর জবাব দিতেই হবে।

এর পর নানীজীর আর কোনো জবাব দেবার থাকতো না।

—তাহলে আজ যদি আমাকে কেউ বিষ দিয়ে নবাব সুজাউদ্দীনের মত খুন করে ফেলে, তখন তুমি কাঁদতে পারবে? যেমন করে নবাব সরফরাজকে আমার নানাজী খুন করেছিল, তেমনি করে আমাকেও যদি কেউ খুন করে তো তুমি তাকে দোষ দিতে পারবে? বলো, পারবে?

নানীজী কথাগুলো শুনে শুধু কাঁদে। এর জবাব দিতে পারে না।

—বলো নানীজী, তোমাকে বলতেই হবে। বলো?

—কী বলবো, বল্?

মীর্জা বলে—সত্যি বলো না নানীজী, আমি আমার নিজের পাপের ফলও ভোগ করবো আবার নবাব আলীবর্দীর পাপের ফলও ভোগ করবো? দিল্লীর বাদ্শা যদি কোনো অন্যায় করে থাকে তো তার ফলও ভোগ করবো আমি?

নানীজী এ-সব কথা বেশিক্ষণ শুনতে পারতো না। ঘর ছেড়ে চলে যাবার চেষ্টা করতো। কিন্তু মীর্জা ছাড়তো না। বলতো—বলো না নানীজী, আমি কী করবো?

নানীজী একটু শক্ত হবার চেষ্টা করতো মীর্জার সামনে। বলতো—কেন রে, এখন তো তোর সব ঠিক হয়ে গেছে। এখন তো তোর আর কোনো অশান্তি নেই তুই যা চেয়েছিলি, সব তো পেয়েছিস!

মীর্জা বলতো—আমি কী পেয়েছি নানীজী?

—কেন, কী পাসনি তুই? তুই এই মসনদ চেয়েছিলি, তা তো পেয়েছিস।

মীর্জা বলতো—একে মসনদ পাওয়া বলে নানীজী? চারদিকের ওই ষড়যন্ত্র, চারদিকের এই দুষমনি, এই-ই কি আমি চেয়েছিলুম?

—তাহলে বল্, কী চাস্ তুই?

মীর্জা বলতো—আমি একটু ভালবাসা চাই নানীজী, এখন আর কিছু চাই না!

—কেন, আমি কি তোকে ভালবাসি না?

—তুমি ভালবাসলে কী হবে নানীজী, আমি তো তোমাকে ভালবাসি না। মরিয়ম বেগমসাহেবা আমাকে বলেছে যে, ভালবাসা পেলেই শুধু হয় না, ভালবাসার প্রতিদানও দিতে হয়!

—তা তুই কি আমাকে ভালবাসিস না মীর্জা?

মীর্জা বলতো—আমি তোমাকে কী করে ভালবাসবো নানীজী? পাপ করে করে কি আমার বুকের মধ্যে আর কিছু ভালবাসা আছে যে ভালবাসবো?

নানীজী বলতো—তুই আর ও-সব কথা ভাবিসনি মীর্জা, ও-সব কথা ভাবলে মসনদ রাখা চলে না, মসনদে বসলে ও-সব কথা ভাবতে নেই। কে কী ভাববে, কার কী ক্ষতি হবে, কে আমাকে ভালবাসলো-না-বাসলো, ও-সব নবাব-বাদশার ভাবনা নয়। ও ভাবলে তোর মাথা খারাপ হয়ে যাবে।

—আমার মাথা খারাপই হয়ে গেছে নানীজী।

—কিন্তু এই বয়েসেই মাথা খারাপ হলে তো তোর চলবে না মীর্জা! তোর ভালো-মন্দের ওপর যে আমাদের সকলের ভালো-মন্দ নির্ভর করছে রে। তোর একটা কিছু হলে তখন আমরা কী করবো, আমরা কোথায় যাবো? আমাদের

কথাও একবার ভাববি তো তুই?

চেহেল্-সতুনে এসে নানীবেগম মরালীকে জিজ্ঞেস করতো—কী রে মেয়ে, মীর্জা আজকাল অমন করে কথা বলে কেন রে? তুই ওকে কী শিখিয়েছিস? কী বলেছিস ওকে? তুই কি আমার সর্বনাশ করতে চাস্?

—কেন নানীজী?

—কেন, তুই জানিসনে যে, নবাব-বাদশাদের ও-সব কথা শোনাতে নেই!

মরালী বলতো—কেন নানীজী, নবাব-বাদশারা কি আলাদা?

—আলাদা না-হলে খোদাতালাহ্ তো সকলকেই নবাব করতে পারতো। সকলকে নবাব করেনি কেন? নবাব-বাদশারা যদি আলাদা না হতো তো তাদের কেউ ভয় করতো, ভক্তি করতো?

—কিন্তু তোমার মীর্জা যে তাতে শান্তি পায় না নানীজী। শান্তির জন্যেই তো আমি কলকাতা থেকে আসবার সময় তোমার নাতিকে রামপ্রসাদের গান শুনিয়ে দিলুম। শান্তির জন্যেই তো তোমার নাতি আজকাল মৌলভী সাহেবকে ডাকিয়ে কোরাণ পড়ছে। মসনদের চেয়ে তো শান্তি বড় জিনিস নানীজী!

নানীজী বলতো—যা ভালো বুঝিস কর বাপু, আমার কিন্তু ভয় করছে—

মরালী বলতো—না নানীজী, দেখো, তোমার কোনো ভয় নেই, তোমার মীর্জা এবার ভালো হয়ে যাবে—

—কিন্তু আমার মীর্জার জন্যে তোর এত ভাবনা কেন রে? আরো তো কত বেগম রয়েছে চেহেল্-সতুনে, তারা তো কেউ এমন করে ভাবে না?

মরালী বলতো—তারা তো আমার মত কেউ এত হতভাগী নয় নানীজী!

—সেই তোর এক কথা! তোর কী হয়েছে বল্ তো? কীসের দুঃখু তোর! বললুম তোকে না-হয় তোর সোয়ামীর কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি, না-হয় যা তুই চাইবি, তাই করে দেবো। তা কিছুই তো তুই চাস না—

মরালী বলতো—ভগবান যে আমার চাওয়ার মুখে ঝ্যাঁটা মেরে দিয়েছে নানীজী! লোকে সোয়ামী চায়, সংসার চায়, ছেলেমেয়ে চায়, কিন্তু আমি যে সে-সব কিছুই চাইতে পারিনে নানীজী!

—কেন, তোর কী হয়েছে খুলে বল্ না। চেষ্টা করেই না-হয় দেখি, কিছু করতে পারি কিনা তোর জন্যে।

মরালী বলতো—তোমার নাতিও আমাকে সেই কথা বলে নানীজী।

—তা, সে তো ঠিক কথাই বলে বাছা। মীর্জা তোকে ভালবাসে বলেই ওই কথা বলে।

মরালী বলে—আমি সে-কথা জানি নানীজী। কিন্তু ওই যে বললুম, ভগবান আমার সব চাওয়ার মুখে ঝ্যাঁটা মেরে দিয়েছে! চাইতে কি আমার অসাধ? কিন্তু কেমন করে চাই? আমি বউ হয়েও কারো বউ হতে পারলাম না, আমার সোয়ামী থেকেও কেউ আমার সোয়ামী হতে পারলো না।

নানীজী বলতো—কী জানি বাপু, আমি তোর হেঁয়ালী কথা বুঝতে পারি না—

কথা বলে আর দাঁড়াতো না মরালী, সোজা তার নিজের ঘরে গিয়ে খিল দিয়ে দিত। এ যে কী যন্ত্রণা, তা কাউকেই বোঝানো যেত না, কাউকে বোঝাতে চাইলেও বুঝতো না। কান্ত চেষ্টা করেও কখনো বুঝতে পারেনি। কান্তকে অনেকবার মরালী বলেছে—তুমি কেন আমার পেছন-পেছন ঘুরছো? তুমি যাও না এখান

থেকে! আমাকে না খুন করে কি তুমি শান্তি পাবে না?

কান্ত বলতো—কেন, আমি তোমার কী করলুম?

—কেন তুমি আমার সামনে-সামনে থাকো? কেন তুমি আসো আমার কাছে? তোমার কি আর কোনো চুলোয় যাবার জায়গা নেই? নিজামত ছাড়া কি আর কোথাও চাকরি জোটে না তোমার?

কান্ত বলতো—কিন্তু তুমিই তো আমাকে ডাকো মরালী। আমি একদিন না এলে তুমিই তো আমাকে ডাকতে পাঠাও—

—যাও, এবার থেকে আমি ডাকতে পাঠালেও আর এসো না। খবরদার, আর আসবে না।

মাঝে মাঝে মরালীকে দেখে অবাক হয়ে যেত কান্ত! যেন পাগলের মত আবোল-তাবোল বকতো। কান্তকে দেখলে যা-ইচ্ছে-তাই বলে গালাগালি দিত। আবার কিছুদিন দেখা না হলে ডেকে পাঠাতো।

তখন কাছে গেলে মরালী বলতো—কী হলো, ক'দিন আসোনি যে?

কান্ত বলতো—তুমিই তো আসতে বারণ করলে!

—বা রে, আমিও বারণ করলাম, আর তুমিও তাই আসা বন্ধ করলে?

কান্ত বলতো—আমি আসিনি বটে, কিন্তু তোমার খবর নিয়েছি।

—কিন্তু কেন আমার খবর নাও বলো তো তুমি? আমি তোমার কে? তোমার সঙ্গে আমার কীসের সম্পর্ক?

এই রকম আবোল-তাবোল কত বকতো মরালী। জীবনে কান্ত কখনো মরালীকে বুঝতে পারেনি। একবার মনে হতো মরালী তাকে পছন্দ করে। কান্ত যে তার কাছে লুকিয়ে লুকিয়ে যায়, সেটা তার ভালো লাগে। আবার এক-একদিন কী যে হয়, তখন আর তাকে চেনা যায় না।

সেদিন ভোর বেলা মরালীর তাঞ্জামটা যাচ্ছিল মতিঝিলের দিকে। কান্তও পেছন-পেছন গেল। তাঞ্জামটা মতিঝিলের ভেতরে গিয়ে ঢুকলো। চবুতরায় নেমে ভেতরে যাবার মুখে কান্তকে দেখেই থমকে দাঁড়ালো। বললে—কী হলো, তুমি আবার এখানে কেন?

—তুমি যে আমায় আসতে বলেছিলে?

—আমি? আমি আবার কখন তোমায় ডাকলুম?

—সেই যে উদ্ধব দাসকে নিয়ে আসতে বলেছিলে। তাকে এনেছি মুর্শিদাবাদে। অনেক কষ্টে তাকে মোল্লাহাটি থেকে ধরে এনেছি।

—কিন্তু এখন তো আমার শোনবার সময় নেই। নবাবেরও গান শোনবার সময় হবে না এখন।

কান্ত বললে—তাহলে তাকে চলে যেতে বলবো?

মরালী কী যেন ভাবলে। তারপর বললে—এখন যে ভীষণ কাণ্ড বেধে গেছে এর মধ্যে। তুমি জানো না কিছু? বোধ হয় আমিও আর বাঁচবো না—

—সে কী?

কান্ত অবাক হয়ে গেল মরালীর কথা শুনে। মরালী বলছে কী? অনেক দিন কান্তই মরালীকে সাবধান করে দিয়েছে। আর মরালীই আজ কান্তকে ভয় পাইয়ে দিলে? কান্ত আরো কী বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু ওদিকে চবুতরার মধ্যে যেন কারা এল। অনেক লোকজনের ভিড় হতে লাগলো।

তবু কান্ত এগিয়ে গিয়ে বললে—কী হয়েছে বলো না মরালী!

মরালী বললে—ওয়াটস্ সাহেব কাশিমবাজার কুঠি ছেড়ে পালিয়েছে—

কান্তর মনে আছে, সেদিন সেই ওয়াটস্ সাহেবের পালিয়ে যাওয়া উপলক্ষ করেই সমস্ত মুর্শিদাবাদে যেন ঝড় বয়ে গিয়েছিল। সেদিন আর ভালো করে ঘুমই হয়নি কান্তর। শুধু কান্তর কেন, মুর্শিদাবাদে কি কারোরই ঘুম হয়েছিল? চক্-বাজারের রাস্তায় রাস্তায় আবার সবাই গুজ্-গুজ্ ফিস্-ফিস্ আরম্ভ করেছিল মনে আছে। সবাই সে-সময়ে কান পেতে থাকতো। মীরজাফর সাহেব নাকি ফিরিঙ্গী-ফৌজের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। আপনি কিছু শুনেছেন জনাব? কিছু শোনেননি? এ ওকে জিজ্ঞেস করে, ও একে। চক্বাজারের রাস্তায়-রাস্তায় আবার ছোট-ছোট জটলা হয়। সকলের মুখ শুকিয়ে যায় খবর শুনে। তবে কী হবে? আবার লড়াই শুরু হবে নাকি? তাহলে মরিয়ম বেগম এতদিন কী করছে? যে-গণৎকারটা রোজ মানুষের ভাগ্য গণনা করতো চক্বাজারের রাস্তায় বসে, সেও যেন তখন অন্যমনস্ক হয়ে অন্য আলোচনা করছে। কান্ত সব কথা কান পেতে শুনতে লাগলো সমস্ত দিন ধরে। এ কী হলো! বুড়ো সারাফত আলি আবার রোজকার মত সন্ধ্যেবেলা খুশ্বু তেলের দোকান খুলে বসলো। আবার রোজকার মত আগরবাতির ধোঁয়ার সঙ্গে তাম্বাকুর গন্ধ মিশে রাস্তা মাতোয়ারা করে তুললো। কথাটা বোধ হয় সে-ও শুনেছে। ইয়া আল্লা, জিন্দ্গীর আশা তাহলে পূরণ হবে তার। নেশা তার আরো চড়ে যায়। সন্ধ্যেবেলা বাড়িতে ফিরতেই উদ্ধব দাস জিজ্ঞেস করে—কী গো বাবু-সাহেব, তোমার নবাব আমার গান শুনবে না?

বহুদিন পরে ছোটমশাই আবার হাতিয়াগড়ে ফিরে এসেছে। কোথায় মুর্শিদাবাদ, কোথায় কেষ্টনগর, কোথায় কালীঘাট আর কলকাতা। সব জায়গায় ঘুরে ঘুরে বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। জগা খাজাঞ্চিমশাই একলা কত দিক সামলাবে! ডিহিদার রেজা আলিও বসে থাকবার লোক নয়। একটা-না-একটা ছুতো করে খাজাঞ্চিখানায় আসে। মুন্শী পাঠায়। খোদ মুর্শিদাবাদ থেকে আরো ভেট চেয়ে পাঠিয়েছে নিজামত, তারই তাগাদা করে। ঘি, নয় তো গুড়, নয় তো তামাক। আব্ওয়াব দিয়েও রেহাই নেই। নিজামতের খাতায় যা লেখা আছে তা তো আদায় করবেই, তারপর যা লেখা নেই তারও বরাত আসে।

কিন্তু আসবার সঙ্গে সঙ্গে মহিমাপুর থেকে জগৎশেঠজীর চিঠি নিয়ে লোক এসেছে।

বড়গিন্নীর মেজাজ আরো বিগড়ে গেল সব শুনে। বললে—তাহলে চুপ করে ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে বাড়িতেই বসে থাকো। আর কিছু করতে হবে না—

ছোটমশাই-এর বলবার মুখও ছিল না।

একদিন ছোটমশাই-এর পূর্বপুরুষরা যে-বংশের প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছিল ত্যাগ-ভোগ-সংযম-সংগ্রাম দিয়ে, এই এতদিন পরে যেন তারই পরীক্ষা হয়ে যাচ্ছে তাঁর ওপর দিয়ে। এতদিন পরে যেন তাঁরই পূর্ব-পুরুষ আবার বিদেহী-আত্মা নিয়ে তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। এতদিন পরে এসে যেন আবার বলছে—তোমার ধর্ম, তোমার বংশ, তোমার নিষ্ঠা, তোমার দেশ, তোমার কাছে আজ সাহস চাইছে, তোমার কাছে তোমার বীর্য চাইছে। আজ তোমার পরীক্ষার দিন। আজ

তোমার আত্মবিশ্লেষণের দিন। হয় তুমি ত্যাগ করে দরিদ্র হও, নয় তো আত্ম-অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে সংগ্রাম করো। একক সংগ্রাম যদি সম্ভব না হয়, তাহলে যৌথ সংগ্রাম করো। এ তোমার নিজের অধিকারের প্রশ্ন নয়, এ তোমার নিজের বংশের অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রশ্নও নয়, এ তোমার রাজ্য, তোমার প্রজা-সাধারণ সকলের অস্তিত্বের প্রশ্ন। সকলের অস্তিত্বের প্রশ্ন নিয়ে আজ ইতিহাস তোমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। এর জবাব তোমাকে দিতে হবে।

রাত্রে ঘুমোতে-ঘুমোতেও ছোটমশাই জেগে ওঠে। প্রতিদিনকার পৃথিবী তার চাহিদা নিয়ে সামনে এসে হাত পেতে দাঁড়িয়ে থাকে। বলে—কই, তোমার জবাব দাও—

বড়গিন্নী ভোর বেলা বুড়ো শিবের মন্দির থেকে পুজো দিয়ে ফিরে এসে বলে—কী ভাবছো?

ছোটমশাই বলে—না, কই, কিছু ভাবছি না তো!

বড়গিন্নী আর থাকতে পারে না। বলে—দোহাই, আর বসে থেকো না, একটা কিছু করো, তোমাকে চুপচাপ বসে থাকতে দেখলে আমার ভালো লাগে না—

—কিন্তু কী করবো তুমি বলে দাও?

—আমিই যদি বলবো তো আমি পুরুষমানুষ হলেই পারতাম।

—কিন্তু একটা-কিছু পরামর্শ দেবে তো?

—তোমাদের এত বড়-বড় মাথা রয়েছে, তারা থাকতে আমি দেবো পরামর্শ?

ছোটমশাই বলে—মহারাজ তো বললেন—আরো কিছু দিন সবুর করতে—

—কেন, কীসের জন্যে সবুর করবো? মহারাজের নিজের বউকে যদি নবাব চুরি করে নিয়ে যেত তো মহারাজই কি সবুর করতেন?

—না, সে ব্যাপার নয়। ক্লাইভ সাহেব চেষ্টা করছে খুব। আমাকে বলে কি না আমার বউ নবাবের হারেমের ভেতরে মদ খায়—আমি বললুম তা কখ্খনো হতে পারে না।

বড়গিন্নী বললে—তা বললে না কেন, সে মদই খাক আর জাহান্নামেই যাক, সে আমরা বুঝবো?

—তা তো বললাম।

—তা শুনে কী বললে?

ছোটমশাই বললে—এত ব্যস্ত মানুষ যে কথা বলবার সময়ই নেই সাহেবের। কথা বলতে বলতে লোক এসে গেল। আর আমরা চলে এলুম। আমি বলে এলুম দরকার হলে আমি ফিরিঙ্গীদের টাকা-কড়ি দেবো, হাতী দেবো, নবাবের সর্বনাশ না হলে আমার ঘুম হচ্ছে না—

—তুমি বলে এলে ওই কথা?

—তা বলবো না? মহারাজের সামনেই ও-কথা বলেছি। মহারাজও তার সাক্ষী আছেন! মহারাজকেই কি কম বলেছি? কাকে বলতে বাকি রেখেছি? জগৎশেঠজীর সঙ্গে দেখা করেও সব বলে এসেছি। তুমি কি ভেবেছো আমি সেখানে গিয়ে চুপচাপ বসে থাকি শুধু? শুনলাম এখন নাকি নবাব ছোট বউ-এর হাতের মুঠোর মধ্যে। ছোট বউ যা বলে নবাব তাই-ই করে। মুর্শিদাবাদের সব লোক সেই কথা বলছে!

—আর দুগ্গা? সে-মাগী কী করছে সেখানে বসে বসে? ছোট বউ-এর না-হয়

আক্কেল গেছে, কিন্তু সে তো সেয়ানা, তার তো বুদ্ধি-বিবেচনা আছে? সে কী বলে তাল দিচ্ছে?

ছোটমশাই বললে—তাকে সঙ্গে পাঠালাম সবকিছু সামলাবার জন্যে, আর সে-পর্যন্ত একটা খবর দিচ্ছে না—

বড়গিন্নী বললে—তার কথা ছেড়ে দাও, সে ছোটলোক। ছোটলোকের আর কত বুদ্ধি হবে। কিন্তু তুই যে পোড়ারমুখী নিজের মুখ পোড়ালি, আর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মুখও পোড়াচ্ছিস, তোর একটা আক্কেল-বিবেচনা নেই?

ছোটমশাই বললে—তুমি সব না-জেনে না-শুনে তাকে গালাগালি দিচ্ছই বা কেন?

—দেবো না? আমি তাকে নিজে ঘরে আনলুম, আমিই তাকে এ-বাড়ির বউ করে আনলুম, আর আমারই এমন করে সর্বনাশ করলে? আমি তার এই সংসার নিয়ে কী করে দিন কাটাচ্ছি, তা সে বুঝতে পারছে না? এ কি আমার সংসার না তার সংসার, না ভূতের সংসার?

জগা খাজাঞ্চি ভয়ে ভয়ে কাছে আসে। কাজকর্ম বুঝিয়ে সই-সাবুদ আদায় করে নিয়ে যায়। সেদিন তার ওপরেও রেগে খাপ্পা হয়ে গেল ছোটমশাই। বললে—সব কাজ আমাকেই যদি করতে হয় তো তুমি আছ কী করতে খাজাঞ্চিবাবু?

মাথা চুলকোতে চুলকোতে চলে যায় জগা খাজাঞ্চিবাবু। অথচ এই জগা খাজাঞ্চিবাবু আছে বলেই তবু টিঁকে আছে হাতিয়াগড়, তাও জানে ছোটমশাই।

আবার সেদিন জগা খাজাঞ্চিবাবু সামনে আসতেই রেগে উঠলো ছোটমশাই। —আবার? আবার কী করতে এসেছো শুনি? আমাকে না মেরে তুমি ছাড়বে না?

কিন্তু জগা খাজাঞ্চিবাবু একটা চিঠি দিতেই ছোটমশাই অবাক হয়ে গেল।

—কার চিঠি?

চিঠিখানার চেহারা দেখেই ছোটমশাই একেবারে লাফিয়ে উঠেছে। জগৎশেঠজীর নিজের নামের শিল-মোহর করা লেফাফা। চিঠিখানার একটা ধার ছিঁড়ে ফেলেই ভেতরের লেখা পড়তে লাগলো ছোটমশাই: 'এই পত্রবাহক মারফত জানাইতেছি যে আপনার সহধর্মিণী শ্রীমতী মরিয়ম বেগমসাহেবা কাল রাত্রে আমার হাবেলিতে আসিয়া আমার সহিত দেখা করিয়াছিলেন। তিনি আপনার কাছে ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছুক। আমার নিকট তিনি নিজের দুঃখ-দুর্দশার কথা সবিস্তারপূর্বক নিবেদন করিলেন। আমি তাঁহাকে আশ্বাস দিয়াছি যে, আমি আমার যথাসাধ্য তাঁহার জন্য করিব। এই পত্র-পাঠমাত্র আপনি আমার এখানে চলিয়া আসিবেন। অন্যথা করিবেন না। এখানে নিজামতের ব্যাপারে নিরতিশয় গণ্ডগোল চলিতেছে। কখন কী হয় কিছুই বলিতে পারা যায় না। এই সময়ে আপনার সহধর্মিণীকে সরাইয়া লওয়া যাইতে পারে। পরে এ-সুযোগ আর কখনও না-আসিতে পারে। ইতি—'

ছোটমশাই চোখ তুলে দেখলে জগা খাজাঞ্চিমশাই তখনো সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

জিজ্ঞেস করলে—এ লোক কোথায়?

—আজ্ঞে, অতিথিশালায় বসিয়ে রেখে এসেছি।

ছোটমশাই বললে—ঠিক আছে, তাকে যেতে বলে দাও—

জগা খাজাঞ্চিমশাই চলে যাচ্ছিল। পেছন থেকে আবার ডাকলে ছোটমশাই—শোনো—

জগা খাজাঞ্চিমশাই ফিরলো।

ছোটমশাই কী বলতে গিয়েও থেমে গেল।

বললে—না থাক, তুমি যাও—

জগা খাজাঞ্চিমশাই চলে যেতেই ছোটমশাই চিঠিখানা হাতে নিয়ে বড়গিন্নীর মহলের দিকে চলতে লাগলো।

'আপনি ফেব্রুয়ারীর সন্ধির অনুরূপ কার্য না করিয়া নানাপ্রকার ছল করিয়া আসিতেছেন। চার মাসে অঙ্গীকৃত অর্থের মাত্র পঞ্চমাংশ শোধ করিয়াছেন। সন্ধিবন্ধনের সঙ্গে সঙ্গেই ইংরেজগণকে বাঙলা হইতে তাড়াইবার জন্য ফরাসী সেনাপতি বুশীকে আহ্বান করিয়াছেন। ফরাসীসেনানী ল'কে এখনো রাজধানী হইতে ৫০ ক্রোশ দূরে নিজ অর্থে পোষণ করিতেছেন। অকারণে ইংরেজগণকে অপমান করিয়াছেন। ফৌজ পাঠাইয়া কাশিমবাজার-কুঠি অনুসন্ধান করিয়াছেন, একবার ইংরেজ উকীলকে দরবার হইতে দূরে করিয়া দিয়াছেন। অঙ্গীকৃত স্বর্ণ-মুদ্রা দেন নাই, এবং উমিচাঁদই ইংরেজগণকে ঐরূপ অঙ্গীকারের কথা বলিয়াছে বলিয়া তাহাকে নগর হইতে বহিস্কৃত করিয়াছেন। পক্ষান্তরে ইংরেজগণ সহিষ্ণুতার সহিত সমস্ত সহ্য করিয়াছেন। পাঠান আক্রমণসংবাদে ভীত হইলে তাঁহারা সাহায্য করিতে প্রস্তুত ছিলেন। এক্ষণে উপায়ান্তর না দেখিয়া ইংরেজ-সৈন্য মুর্শিদাবাদ যাত্রা করিল। সেখানে গিয়া আপনার দরবারের প্রধান পাত্র-মিত্র মীরজাফর, দুর্লভ-রাম, জগৎশেঠজী, মীরমদন ও মোহনলালের উপর ভার দিব। তাঁহারা যাহা মীমাংসা করিবেন, রক্তপাত পরিহারের জন্য আপনি তাহা স্বীকার করিয়া লইবেন, ভরসা করি।'

ইংরেজ-ফৌজ আগেই কলকাতা ছেড়ে চলে গেছে। ক্লাইভ সাহেব চিঠিটার নিচেয় সই করে দিয়ে ফ্লেচারের হাতে দিলে।

তারপর নিজেও নৌকোয় চড়ে বসলো। দুশো নৌকোর ব্যবস্থা হয়েছে। পেরিন সাহেবের বাগানে কেউ নেই বলতে গেলে। সব ফাঁকা। শুধু পাহারা দেবার জন্যে কয়েকজন সেপাই রইলো। ক্লাইভ সাহেব আরো কয়েকজনকে নিয়ে বজরায় উঠে বসলো। কলকাতা থেকে নবদ্বীপ। নবদ্বীপ থেকে ছ'ক্রোশ দূরে পাটুলী, পাটুলী থেকে ছ'ক্রোশ দূরে কাটোয়া। সেখান থেকে আরো উত্তরে সাঁকাই। অ্যাডমিরাল ওয়াটসন্ আগেই চলে গেছে।

হঠাৎ মনে হলো আর একটা নৌকো দূর থেকে সাদা কাপড় ওড়াচ্ছে।

—হু ইজ্ দ্যাট? ও কে! ও কারা?

ক্লাইভ নৌকো থামাতে বললে। বললে—স্টপ হিয়ার—

পেছনের নৌকোটা ছুটতে ছুটতে আসছে সোঁ-সোঁ করে। তারপর একটু কাছাকাছি আসতেই ওয়াটস্ চিৎকার করে উঠলো—কর্নেল—

ক্লাইভ অবাক হয়ে গেছে। বললে—কাশিমবাজার কুঠি ছেড়ে চলে এসেছো?

—ইয়েস। কিন্তু আর একটা নিউজ্ আছে কর্নেল। আমরা মরিয়ম বেগমকে অ্যারেস্ট্ করেছি—

—কোথায়?

—ভেতরে আছে।

—তারপর? তারপর কী হলো?

উদ্ধব দাস সেই গল্প এসে শুনতো মরালীর সামনে বসে। আর "বেগম মেরী বিশ্বাস" কাব্য লিখতো।

সে বলতো—তারপর? তারপর কী হলো?

ক্লাইভ সাহেব উদ্ধব দাসকে বড় খাতির করতো। বড় ভালবাসতো তাকে। বলতো—পোয়েট, তুমি নবাবকে গান শোনাতে পারলে না, কিন্তু আমি তোমার গান শুনেছি। তুমি তো মেরীর জীবন-কাহিনী লিখছো, কিন্তু আমার জীবন-কাহিনী কে লিখবে?

আশ্চর্য না আশ্চর্য, ইতিহাসে কে-কার কাহিনী লেখে! সেই ক্লাইভ সাহেবই কি জানতো, একদিন তারও কাহিনী লিখবে উদ্ধব দাস। উদ্ধব দাসকে একদিন সাহেব জিজ্ঞেস করেছিল—লাইফের মানে কী, পোয়েট?

—তার মানে? উদ্ধব দাস বুঝতে পারেনি প্রশ্নটা।

সাহেব বলেছিল—আমি এত যুদ্ধ করলাম, এত কাণ্ড করলাম, অথচ মনে হয় এ যেন আমার ঠিক কাজ হলো না, আমি ন্যায় করলাম কি অন্যায় করলাম বুঝতে পারছি না। আমি ছিলুম গরীব, হয়েছি বড়লোক, কিন্তু তবু মনে হয় ঠিক যেন এই জীবন আমি চাইনি—! বলতে পারো পোয়েট, কেন এমন হয়?

উদ্ধব দাস বলতো—দেখুন প্রভু, মানুষ যখন জন্মায় তখন সে কাঁদে, আর সবাই হাসে—

ক্লাইভ বলতো—তা তো বটেই—মানুষ জন্ম হলেই কান্না দিয়ে শুরু হয় তার জীবন—

—কিন্তু যখন সে চলে যায় তখন আর সবাই কাঁদে, সে-ই কেবল হাসতে হাসতে চলে যায়। যে তেমন করে হাসতে হাসতে যেতে পারে, সেই মানুষের জীবনই তো সার্থক প্রভু—

কথাটা ক্লাইভ সাহেবের ভালো লেগেছিল। সেইদিন থেকেই মরালী দেখেছিল ক্লাইভ সাহেব যেন কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল। নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলার শেষ জীবনটা দেখেনি সে। শুধু কানে শুনেছিল। সে বড় মর্মান্তিক শেষ! সমস্ত মুর্শিদাবাদ সেদিন কান্নায় ভেঙে পড়েছিল। সেদিন কোথায় ছিল এই উদ্ধব দাস আর কোথায়ই বা ছিল সে নিজে।

আরো মনে পড়ে সেই রাত্রের কথা। সে রাত্রে তার মান-সম্ভ্রম সব কিছু জলাঞ্জলি দিয়ে সে ছুটে গিয়েছিল জগৎশেঠজীর বাড়িতে। কে যেন তার কানে কানে বলে দিয়েছিল, সেই রাত্রেই তার চরম সর্বনাশ হবে। জগৎশেঠজী বলেছিলেন —আপনি যান বেগমসাহেবা, আমি আপনার স্বামীর কাছে খবর পাঠাবো—

কিন্তু কে তার স্বামী? কোথায় তার স্বামী? যে-মেয়ে স্বামীর হাত থেকে পালিয়ে বেঁচেছিল তাকে কেমন করে অন্য লোকে উদ্ধার করবে? তাই তাঞ্জামটা আবার মহিমাপুর থেকে তাকে নিয়ে ফিরে এসেছিল। মহিমাপুর দিয়ে ফিরে আসবার সময়ই দেখেছিল, সেই ভোরবেলা কাশিমবাজার কুঠি থেকে সাহেবরা ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে বেরোচ্ছে।

মুখ বাড়িয়ে মরালী বেহারাদের জিজ্ঞেস করেছিল—ওরা কারা রে? ওরা কারা?

বেহারারা তাঞ্জাম থামিয়ে খবর এনে দিয়েছিল। ও হলো ওয়াটস্ সাহেব আর উমিচাঁদ সাহেব। বেড়াতে বেরিয়েছে।

কেমন যেন সন্দেহ হয়েছিল মরালীর। এমন তো হবার কথা নয়।

আর তারপর দাঁড়ায়নি সেখানে। সেখান থেকে চলে গিয়েছিল সোজা একেবারে মতিঝিলে। মতিঝিলে তখন সব শান্ত, সব নিঝুম। সেখানে গিয়ে তাঞ্জাম ছেড়ে দিয়েছিল।

বেহারাদের বলে দিয়েছিল সোজা গঙ্গার ঘাটের দিকে যেতে। ঝালর-দেওয়া তাঞ্জাম। ঝালর ঢাকা থাকলে কারো জানবার কথা নয় ভেতরে কে আছে।

মরালী বলে দিয়েছিল কেউ যদি জিজ্ঞেস করে তো বেহারারা যেন বলে দেয়, মরিয়ম বেগমসাহেবা কলকাতার দিকে চলে গেছে।

গঙ্গার ঘাটে নিজামতের নবাবী বজরা সাজানো থাকে সার সার। নবাব যখন খুশি গিয়ে হাজির হতে পারে সেখানে। হঠাৎ যদি নবাবের ইচ্ছে হয় বিহার করবার তো বজরা ছেড়ে দিতে হবে। তখন আর দেরি করা চলবে না।

খালি তাঞ্জামটা সেখানেই গিয়ে থামলো। তখন বেশ অন্ধকার। গম্ গম্ করছে অন্ধকার। তখন চেহেল্-সুতুনের নহবতখানায় ইনসাফ্ মিঞা সুর ধরেনি। তাঞ্জামটা গিয়ে থামতেই বজ্‌রার মাঝি-মাল্লা টের পেয়েছে।

—কে? কে রে?

মাঝি-মাল্লারা তাড়াতাড়ি দাঁড় নিয়ে তৈরি হয়ে পড়ছে। হয় নবাব এসেছে, নয় তো নবাবের বেগমসাহেবা।

তাঞ্জাম নামলো। কিন্তু ভেতর থেকে কেউ নামে না।

বেহারারা মাঝির কাছে গিয়ে কানে কানে যেন কী বললে। আর মাঝি-মাল্লারাও তৈরি হয়ে বজ্‌রা ছেড়ে দিলে। সেই ভোর রাত্রে মুর্শিদাবাদের গঙ্গার ঘাট থেকে খালি বজ্‌রাটা 'বদর' 'বদর' বলে পাল তুলে কাছি খুলে দিলে।

—কথাটা যেন কেউ জানতে না পারে মিঞাসাহেব, মরিয়ম বেগমসাহেবার হুকুম, দেখো—

মাঝি বললে—না ভাইসাহেব, কেউ জানবে না—

তারপর তাঞ্জামটা আবার মুখ ঘোরালো। আবার ফিরতে লাগলো চেহেল্-সুতুনের দিকে। কিন্তু ফেরবার মুখেই বশীর মিঞার নজরে পড়ে গেছে।

বশীর মিঞা ফিরছিল মোহরার সাহেবের হাবেলি থেকে। কেমন যেন সন্দেহ হলো তাঞ্জামটা দেখে। এই তাঞ্জামটাকেই দেখেছে সে জগৎশেঠজীর বাড়ির চবুতরে। আবার এখন দেখছে গঙ্গার ঘাটের কাছে।

—কী ভাইসাহেব, কার তাঞ্জাম যাচ্ছে?

—বেগমসাহেবার, মিঞাসাহেব, বেগমসাহেবার।

—কোন্ বেগমসাহেবার?

—মরিয়ম বেগমসাহেবার! মরিয়ম বেগমসাহেবা শ্যায়র করতে গেল কলকাতায়—

তাজ্জব হয়ে গেল বশীর মিঞা। মরিয়ম বেগমসাহেবা! মরিয়ম বেগমসাহেবা শ্যায়র করতে গেল কলকাতায়! তবে তো মতলব ধরা গেছে। এতক্ষণ জগৎশেঠজীর বাড়িতে ছিল, এতক্ষণ ওয়াটস্ সাহেব আর উমিচাঁদ সাহেবও ছিল সেখানে।

তাহলে কি সব তালাস পেয়ে গেল নাকি বেগমসাহেবা! তালাস পেয়ে কলকাতায় খবর দিতে গেল!

—সঙ্গে আর কে গেল ভাইসায়েব?

—সঙ্গে গেল বাঁদী, আর কে যাবে?

তোবা, তোবা! বশীর মিঞা আর দাঁড়ালো না সেখানে। দূর থেকে দেখা গেল নিজামতের বজ্‌রাটা তখন অন্ধকার মাঝ গঙ্গাতে পাল তুলে দিয়ে সোঁ সোঁ করে এগিয়ে চলেছে। সোজা সেখান থেকে বশীর মিঞা একেবারে মোহরার সাহেবের বাড়ির দিকে ছুটলো।

কিন্তু পথেই দেখা ফিরিঙ্গী কোম্পানীর হরকরার সঙ্গে। সে ফ্লেচার সাহেব।

বশীর মিঞা বললে—কী সাহেব, এত রাত্তিরে কোথায় চলেছো?

—ক্যালকাটায়।

বশীর মিঞা বললে—আরে, আমাদের মরিয়ম বেগমসাহেবাও যে তোমাদের ক্যালকাটায় গেল।

—কেন? হোয়াই?

—তা জানিনে। শায়েদ মতলব-টতলব কিছু আছে!

ফ্লেচার সাহেব কী যেন ভাবলে। তারপর ঘোড়াটার মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে বললে—যাই, ওয়াটস্ সাহেবকে খবরটা দিয়ে আসি গিয়ে—

বলে ফ্লেচার সাহেব চলে গেল। কিন্তু বশীর মিঞাও আর সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারলে না। মোহরার সাহেবকে খবরটা দিলে খুশি হবে। অনেক গালাগালি দিয়েছে ফুপা সাহেব। এ-খবরটা দিলে এবার খুশ্ করা যাবে তাকে।

ভোর রাত্রেই খবরটা এল। জগৎশেঠজীর বাড়িতে যা-কিছু শলা-পরামর্শ হয় সবই রাত্রে। বেশি রাত্রেই তাঁর কাজ-কারবার। মোগল-আমলে যখন নবাব-বাদশারা রাত্রের আসরে নাচের আর গানের তালে বিভোর হয়ে থাকে, তখনই শুরু হয় আমীর-ওমরাওদের কাজের পালা। দিনের বেলায় যে-কাজ সে-কাজ প্রকাশ্য কাজ। সেখানে শুধু আইন-কানুনের বাঁধা-পথে চলা-ফেরা। ঠিক জায়গায় ঠিক লোককে তসলিম্ জানানো, ঠিক-ঠিক সহবত, ঠিক-ঠিক নজরানা। তখন আদব্-কায়দায় কোনো ভুল নেই। তখন যার-যা তখ্‌মা নিয়ে চাপরাস নিয়ে ঠিক-ঠিক ব্যবহার। কিন্তু রাত্রের বেলাতেই আসল রূপ তাদের। তখন কাকে ওঠাতে হবে, কাকে নামাতে হবে, কাকে বধ করতে হবে, কাকে খেতাব দিতে হবে, এইসব মতলব।

শেষ রাত্রের দিকে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন জগৎশেঠজী! অনেক সম্পত্তির মালিক হলে ঘুম থাকার কথা নয়। সম্পত্তি যত ভারী হয়, ঘুম তত পাতলা হয়ে আসে। কিন্তু পেট ভরে ঘুমোয় জগৎশেঠজীর ঝি-চাকর-নোকর-চোপদার-বরদার-বেহারা-রসুইকার সবাই। তারা খেতেও যেমন ঘুমোতেও তেমনি। কিন্তু সেদিন ডাকাডাকিতে তাদেরও ঘুম ভাঙলো। ভিখু শেখ খবর পাঠালে সদরে। সদরের লোক খবর পাঠালে অন্দরে। অন্দরের লোক খবর পাঠালে অন্তঃপুরে।

—কী খবর?

খবর শুনে জগৎশেঠজীর আর শুয়ে থাকা হলো না। গোসলখানায় ঢুকে

তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলেন। তখনো ভালো করে ভোর হয়নি।

অত্যন্ত চুপি-চুপি কথা। অত্যন্ত আস্তে-আস্তে।

—কী খবর?

মেহেদী নেসার সাহেব একেবারে নিজেই সরাসরি চলে এসেছে। মনসুর আলি মেহের মোহরার সাহেব নিজে ঘুম থেকে উঠে মেহেরবানি করে তাকে খবরটা দিয়ে গেছে। এ সময় আর কারো ওপর নির্ভর করা যায় না। নবাব সব টের পেয়ে গেছে।

—মরিয়ম বেগমসাহেবাকে নবাব ভোর রাত্রেই কলকাতায় পাঠিয়ে দিয়েছে।

—সে কী? বেগমসাহেবা যে আমার বাড়িতেই রাত্রে এসেছিল। আমার সামনে অনেক কান্নাকাটি করলে। আমি তাই শুনে তখনই হাতিয়াগড়ে লোক পাঠিয়ে দিলুম।

—সে লোক চলে গেছে নাকি?

—হ্যাঁ, তাকে হাতিয়াগড়ের ছোটমশাই-এর কাছে পাঠিয়ে দিয়েই তো আমি ঘুমোতে গেলুম। বলে দিলুম যত তাড়াতাড়ি পারো ছোটমশাইকে গিয়ে খবরটা দেবে।

মেহেদী নেসার সাহেব বললে—আপনি এত সহজে শয়তানীর ধাপ্পাবাজিতে ভুললেন জগৎশেঠজী! ওদিকে উমিচাঁদ আর ওয়াটস্‌ সাহেবও কাশিমবাজার কুঠি ছেড়ে পালিয়েছে। সে-খবর নবাবের কানে উঠে গেছে!

—কী করে কানে গেল? তোমাদের চর বেইমানি করেনি তো?

—না শেঠজী, আমার লোক বেইমানি করবে না।

—তাহলে নবাব টের পেলে কী করে? নবাবকে কে খবর দিলে?

মেহেদী নেসার বললে—আবার কে? মরিয়ম বেগমসাহেবা!

—তাহলে কি ক্লাইভ সাহেব এখনো কলকাতায় আছে? ক্লাইভ সাহেবের তো ১২ই জুন তারিখে মুর্শিদাবাদে রওনা দেবার কথা!

মেহেদী নেসার সাহেব বললে—কী জানি, আর তো কোনো খবর পাবার উপায়ই নেই, কাশিমবাজার কুঠিতে যে-লোক খবরাখবর আনতো সে তো আর এখানে আসবে না!

—তাহলে মীরজাফর সাহেব কোথায়?

—তাঁর হাবেলিতে!

—মীরজাফর সাহেব কি জানে যে, মরিয়ম বেগমসাহেবা কলকাতায় পালিয়ে গেছে?

মেহেদী নেসার বললে—তা জানি না। বোধ হয় খবর পাননি!

—তাহলে তুমি এখনি গিয়ে তাঁকে খবরটা দিয়ে দাও। ক্লাইভ সাহেবের সঙ্গে মীরজাফর সাহেবের যে-চিঠি চলছে তা যদি বেগমসাহেবার হাতে পড়ে তাহলে যে সব ফাঁস হয়ে যাবে! তাহলে যে একসঙ্গে সকলের কোতল হয়ে যাবে! ইয়ার লুৎফ খাঁকেও খবরটা দিয়ে এসো—সকলের সাবধান হওয়া দরকার—

বড় সন্দেহের, বড় সাবধানের, বড় সতর্কতার সেই দিনগুলো। আর সেই রাতগুলো। মেহেদী নেসার সাহেবের চলে যাওয়ার পরও জগৎশেঠজী কিছুক্ষণের জন্যে চুপ করে বসে রইলেন। শুধু তো মসনদের পরিবর্তন নয়, মসনদের সঙ্গে সঙ্গে যে সমস্ত মুর্শিদাবাদে ওলোট-পালোট হয়ে যাবে! সরফরাজ খাঁর মৃত্যুর পর যেমন করেছিল আলীবর্দী খাঁ, তেমনি করে কার হাতে সমস্ত কিছুর দখল

নিতে হবে। ফৌজের লোকেরা এখনো কিছু জানে না। তারা জানবার আগেই সব হাসিল করতে হবে। সেখানে মীর বক্সী হয়ে মোহনলাল এখনো নবাবের দলে রয়েছে। কিন্তু আর কতদিন! একদিন-না-একদিন খবর আসবেই। খবর ঠিক এসে পৌঁছোবে যে ক্লাইভ আর অ্যাড্‌মিরাল ওয়াটসন্ সাহেব মুর্শিদাবাদের দিকে সেপাই-কামান-জাহাজ নিয়ে এগোচ্ছে, তখন নবাবের ঘুম ভাঙবে! তখন নবাব জগৎশেঠজীকে ডেকে পাঠাবে।

আস্তে আস্তে দিন হলো। জগৎশেঠজী সকাল থেকেই অপেক্ষা করতে লাগলেন। কোনো খবর এল না। সারাটা দিন বড় অস্বস্তিতে কাটলো। জগৎ-শেঠজীর দফ্‌তরে কানুনগো আর সেরেস্তা আর গোমস্তার দল আবার যথারীতি কাজ করতে এল। জগৎশেঠজীও সকাল বেলা দফ্‌তরে গেলেন। চোখের সামনে হিসেবের খাতা। খাতার পাতায় অঙ্কের অক্ষরগুলো। অনেকগুলো শূন্য বুকে করে তাঁর দিকে হাঁ করে চেয়ে রইলো। অঙ্ক নয় যেন, অঙ্কের পাহাড়। হাজার-হাজার লক্ষ-লক্ষ কোটি-কোটি শূন্যের অঙ্ক যেন হঠাৎ চোখের সামনে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। একদিন নবাব-বাদশার প্রয়োজনেই জগৎশেঠের সৃষ্টি হয়েছিল, এখন যেন আবার নবাব-বাদশার সৃষ্টি হলো জগৎশেঠের জন্যে! সুদের অঙ্ক যেন নিয়ম করে বাড়ছে না। সুদ কমে গিয়ে যেন আসলে গিয়ে ঠেকতে চাইছে। তবে আর কিসের জন্যে জগৎশেঠগিরি! তিনিই যদি জগৎশেঠ তো নবাব কেন তাঁকে হুকুম করে। হঠাৎ পাতার ওপর অঙ্কের শূন্যগুলো যেন তাকে চড় কষাতে লাগলো। যেন অঙ্ক নয়, নবাব। নবাব যেন খাতার পাতায় কামানের গুলি ছুঁড়ে দিয়েছে। অথচ এই অঙ্কগুলো যদি না থাকতো তো কোথা থেকে নবাবিআনা আসতো। কোথা থেকে চেহেল্-সুতুন আসতো। কোথা থেকে মতিঝিল-বেগম-মসনদ-তাঞ্জাম-হাতি-কামান-গোলাগুলি আসতো!

সমস্ত রাস্তাটা তিনি কান পেতে রইলেন। কই, কেউ তো কিছু বলছে না। কেউ কি জানে না যে, ক্লাইভ সাহেব ফৌজ নিয়ে মুর্শিদাবাদে আসছে! কেউ কি জানে না যে, এবার থেকে মীরজাফর খাঁ-ই নিজের বিছানা পাতবে চেহেল্-সুতুনে, নিজের দরবার বসাবে মতিঝিলে।

প্রতিদিন এমনি করেই এই রাস্তা দিয়েই জগৎশেঠজী দফ্‌তরে যান। জগৎ-শেঠজীর পালকি দেখলেই মুর্শিদাবাদের লোক তাঁকে উদ্দেশ করে মাথা নিচু করে হাত জোড় করে প্রণাম করে। রাস্তার লোক সসম্ভ্রমে দু'পাশে সরে দাঁড়ায়। অঙ্কের শূন্যগুলো তাঁর বাড়ির লোহার সিন্দুকের ভেতরে থাকে, শুধু তিনি যান দফ্‌তরে। দফ্‌তরের হিসেবের খাতার পাতায় নিজের চোখে সেই শূন্য-গুলোকে দেখেন আর নিশ্চিন্ত মনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন। সব ঠিক আছে। টাকা-পয়সা-কড়া-ক্রান্তির কূট ভগ্নাংশটা পর্যন্ত তাঁর খাতায় ঠিক লেখা থাকে। নবাব যাই বলুক, ওই হিসেবের খাতার শূন্যগুলোর জন্যে নবাব মুর্শিদাবাদের নবাব আর বাদশা দিল্লীর বাদশা। একটা শূন্যও যদি খাতা থেকে কম পড়ে তো নবাবের মতিঝিলের একটা মশাল সঙ্গে সঙ্গে নিবে যাবে, চেহেল্-সুতুনের খাবার থালায় সঙ্গে সঙ্গে একটা পদ কমে যাবে। যতক্ষণ জগৎশেঠজী আছেন ততক্ষণ নবাবও আছে। শুধু আছে নয়, সগৌরবে সবিক্রমে আছে।

হঠাৎ বাজারের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে একটা গুঞ্জন কানে এল। ওটা কিসের গুঞ্জন? ওটা কীসের কোলাহল?

গুঞ্জনটা ক্রমেই যেন কোলাহলে পরিণত হলো। জগৎশেঠজী বাইরে মুখ

বাড়ালেন। সঙ্গে সঙ্গে স্তম্ভিত হয়ে গেছেন। এরা? এরা কারা? এ কি কোম্পানীর সেপাই? সেপাইরা বন্দুক নিয়ে ঢুকে পড়েছে নাকি? মুর্শিদাবাদে কখন এল? আজ তো বারোই জুন। এত শিগ্গির ওরা এসে গেল এখানে?

চোখের সামনে যেন চক্-চক্ ঝক্-মক্ করে উঠলো সেপাইদের তলোয়ার-গুলো। তলোয়ার উঁচিয়ে তারা ছুটে আসছে ভেতরের দিকে। মতিঝিলের দিকে। চেহেল্-সুতুনের দিকে।

জগৎশেঠজী চিৎকার করে তাড়া দিলেন বেহারাদের—চল্ চল্, জলদি চল্—জল্দি—

কিন্তু ইতিহাসের চেয়ে জল্দি আর কে চলতে পারে! ইতিহাসের পালকি লক্ষ লক্ষ সূর্যের বেহারারা চালায়। তারা ভোর বেলা পূব দিক থেকে ওঠে আর রুদ্ধ নিঃশ্বাসে আকাশ-পরিক্রমা করে, তাদের গতির সঙ্গে কে পাল্লা দেবে? কোন্ জগৎশেঠের এত ক্ষমতা? তুমি জগৎশেঠ হতে পারো কিন্তু আমি ব্রহ্মাণ্ডশেঠ। এই বিশাল বিরাট ব্রহ্মাণ্ডে তুমি কতটুকু? তোমার কত টাকা আছে যে তুমি আমার সঙ্গে পাল্লা দেবে? তুমি আজ নবাবকে হটিয়ে দিচ্ছ; কিন্তু এ-কথা কি তুমি জানো যে, তোমাকেও একদিন আর-একজন হটিয়ে দেবে! সেদিন তোমার টাকা তোমাকে বাঁচাতে পারবে না, তোমার খ্যাতি তোমাকে বাঁচাতে পারবে না, তোমার বিত্ত-সম্পত্তি-আত্মীয়রাও তোমাকে পরিত্যাগ করবে। সেদিন কোনো রবার্ট ক্লাইভ কোনো কোম্পানীর ফৌজ নিয়েই আর রক্ষে করতে পারবে না তোমাকে। সেদিন রবার্ট ক্লাইভের মতই তুমিও মুছে নিঃশেষ হয়ে যাবে চিরকালের মত!

—জগৎশেঠজী!

একেবারে চমকে উঠেছেন নিজের নামটা শুনে! কে? কে ডাকলে আমাকে?

সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে উঠলেন—না না, আমি কেউ নই, আমি কিছু নই, আমি কারো দলে নেই, আমার সঙ্গে মীরজাফর উমিচাঁদ ক্লাইভ ওয়াটসন্ কারো কোনো সম্পর্ক নেই—আমাকে ছেড়ে দাও, আমায় মুক্তি দাও—আমার গলায় বড় লাগছে—

—আমি মেহেদী নেসার, আমায় চিনতে পারছেন না?

এতক্ষণে যেন হুঁশ হলো। চারদিকে চেয়ে দেখলে জগৎশেঠজী। এ কোথায় তিনি! এ তো রাস্তা নয়। এ তো তাঁর নিজের ঘর। এ তো তিনি তাঁর নিজের ঘরেই বসে আছেন আর তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে মেহেদী নেসার সাহেব।

মেহেদী নেসার বললে—মীরজাফর সাহেবকে নবাব বন্দী করেছে, সেই কথাই আপনাকে বলতে এসেছি—

—মীরজাফর খাঁকে ধরেছে?

—হ্যাঁ।

জগৎশেঠজী বললেন—তাহলে তো আমাদের সকলকেই ধরবে, আমাদেরও বন্দী করবে!

মেহেদী নেসার বললে—আপনার কথা শুনে আমি সকালেই গিয়েছিলাম মীরজাফর সাহেবের বাড়ি, সেখানে গিয়েই দেখি নিজামতের সেপাইরা বাড়ি ঘেরাও করে ফেলেছে। তখন আর এখানে আসতে পারিনি, এখন এলাম।

জগৎশেঠজী কী বলবেন ভেবে ঠিক করতে পারলেন না।

মেহেদী নেসার বললে—অত ভাবনার কিছু দরকার নেই, ওদিকে মরিয়ম বেগমসাহেবাকেও ধরে ফেলেছে ক্লাইভ সাহেব—

—সে কী?

—হ্যাঁ! মরিয়ম বেগমসাহেবা কলকাতায় গিয়েছিল চালাকি করতে, যাতে ক্লাইভের ফৌজ মুর্শিদাবাদে না আসে, কিন্তু রাস্তাতেই ওয়াটস্ সাহেব আর উমিচাঁদের নজরে পড়ে যায়, তারাই বেগমসাহেবাকে ক্লাইভ সাহেবের হাতে তুলে দিয়েছে—

হঠাৎ বাইরের সদর-ফটকে মতিঝিলের পেয়াদা এসে দাঁড়ালো।

ভিখু শেখ জিজ্ঞেস করলে—ক্যা হুয়া?

নবাবের পেয়াদার সঙ্গে ভিখু শেখ একটু নরম করেই কথা বলে!

—জগৎশেঠজীর নামে পরওয়ানা আছে।

ভেতরের দরবারে জগৎশেঠজীর হাতে পরওয়ানা পৌঁছুতেই তিনি চমকে উঠলেন। যা ভেবেছেন তাই। পরওয়ানা তাঁরও এসেছে। যখন তাঁরও পরওয়ানা এসেছে তখন সকলেরই এসেছে। ওই মীরজাফর খাঁ'র এসেছে, ইয়ার লুৎফ খাঁ'র এসেছে, উমিচাঁদ সাহেবের এসেছে, মেহেদী নেসারের এসেছে, ইয়ারজান সাহেবেরও এসেছে—

মেহেদী নেসারও দেখলে। দেখে খানিকক্ষণ চুপ করে রইলো। সব ফাঁস হয়ে গেল নাকি! এতদিনের সব ষড়যন্ত্র, সব আয়োজন সব মতলব বিলকুল ফাঁস হয়ে গেল!

জগৎশেঠজী মেহেদী নেসারকে জিজ্ঞেস করলে—কে ফাঁস করে দিলে?

মেহেদী নেসার সাহেবও বুঝতে পারছিল না। বললে—মরিয়ম বেগমসাহেবা ফাঁস করে দিতে পারে। কিন্তু তাই-ই বা কী করে হয়, মরিয়ম বেগমসাহেবাকে তো ধরে ফেলেছে ক্লাইভ সাহেব।

—ধরে কোথায় রেখেছে?

—তা জানি না।

নবাবের মতিঝিলের পেয়াদা পরওয়ানা দিয়ে তখনই চলে গিয়েছিল। জগৎশেঠজী বললেন—তাহলে আমি তৈরি হয়ে নিই—তুমি এসো—

বলে জগৎশেঠজী অন্দর-মহলের দিকে চলে গেলেন। নবাবের পরওয়ানা, বিধাতার পরওয়ানার চেয়ে কি কিছু কম জরুরী?
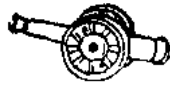
ছোটমশাই চিঠি পেয়েই রওনা দিয়ে দিলেন হাতিয়াগড় থেকে। এতদিন পরে আবার ছোট বউরানীকে পাওয়া গেছে, এ কি কম কথা নাকি? ধর্ম হয়তো গেছে, কিন্তু ধর্মের চেয়েও যা বড়, ধর্মের চেয়েও যা মহৎ তার আকর্ষণ কি কিছু কম?

হয়তো পুরুতমশাই বিধান দেবেন। বলবেন, প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। মুসলমানের সঙ্গে ছোঁওয়া-লেপা করেছে, মুসলমানের রান্না খেয়েছে, সেটা কম অপরাধ নয়। হোক বড় অপরাধ, কিন্তু তবু তো একবার দেখতে পাবেন তাকে।

বড়গিন্নী আসবার সময় বলে দিয়েছিল—খবরটা পেলে আমাকে জানিও, আমিও যাবো মুর্শিদাবাদে—

—তা তুমি আবার কেন যাবে?

বড়গিন্নী বলেছিল—আমি গিয়ে তাকে গোটাকতক কথা জিজ্ঞেস করবো—

—কী কথা বলো-না, সেগুলো না-হয় আমিই জিজ্ঞেস করবো!

—তুমি জিজ্ঞেস করলে হবে না। আমি তাকে শুধু একটা কথা জিজ্ঞেস করবো। পোড়ারমুখী জাত যদি দিয়েই থাকে তো ধম্ম দিয়েছে কি না তাই জিজ্ঞেস করবো।

—তার মানে? জাত আর ধর্ম আলাদা জিনিস নাকি?

বড়গিন্নী বলেছিল—সে তুমি বুঝবে না—সে তোমার বোঝবার দরকারও নেই, তুমি যাও শিগ্‌গির, যা-হয় আমাকে জানিও, তারপর যা-করবার আমি করবো—

এর পর আর কিছু বোঝবার চেষ্টা করেনি ছোটমশাই। সোজা তাড়াতাড়ি দাঁড় বেয়ে চলে এসেছিল মুর্শিদাবাদে। কিন্তু মুর্শিদাবাদে এসে মহিমাপুরের ঘাটে নেমেই কেমন যেন মনে হলো চারদিকে থমথমে ভাব। ঘাটের ওপর মাঝি-মাল্লারা যেন কেমন অন্যমনস্ক। কী হলো ওদের? এমন তো হয় না। অন্যবার ওরা রাঁধা-বাড়া করে, গান গায়, নমাজ পড়ে, কেউ বা কৌতূহলী হয়ে তাঁর দিকে চায়। এবার কী হলো? মুর্শিদাবাদে কিছু হয়েছে নাকি? কিছুই বুঝতে পারলে না ছোটমশাই।

বুঝতে পারলে মহিমাপুরে জগৎশেঠজীর হাবেলিতে এসে।

জগৎশেঠজীর দেওয়ান সামনেই ছিল। বললে—শেঠজী বাড়িতে তো নেই এখন—

—কোথায় গেলেন তিনি? আমি তো তাঁর চিঠি পেয়েই এসেছি—

দেওয়ানজী বললে—তা জানি আমি, তিনি গেছেন মতিঝিলে, নবাবের পরওয়ানা এসেছিল—

—পরওয়ানা? পরওয়ানা কেন?

দেওয়ানজী বললে—মীরজাফর খাঁ সাহেব ধরা পড়ে গেছেন, তা জানেন না আপনি?

—কবে? কখন? তাহলে সব ফাঁস হয়ে গেছে নাকি?

—হয়তো ফাঁস হয়েছে, সকলের নামেই পরওয়ানা বেরিয়েছে। ইয়ার লুৎফ খাঁ, মেহেদী নেসার সাহেব, ইয়ারজান সাহেব, জগৎশেঠজী, কেউ বাদ নেই।

ছোটমশাই জিজ্ঞেস করলে—তাহলে কী হবে?

দেওয়ানজী বললে—কী হবে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। জগৎশেঠজী না-ফিরলে কিছুই বলতে পারছি না—আপনি বসুন, বিশ্রাম করুন, তারপর দেখা যাক কী হয়। নিজামতের অবস্থা বড় খারাপ—

—কেন, খারাপ কেন?

—খারাপ তো বটেই। কাশিমবাজার কুঠির ফিরিঙ্গীরা তো সব কুঠি ছেড়ে পালিয়েছে!

—পালালো কেন?

দেওয়ানজী বললে—নিশ্চয়ই কোম্পানীর হেড্-অফিস থেকে নোটিস এসেছিল সেই রকম, নইলে কি এমন করে সবকিছু ছেড়ে কেউ পালায়?

—তাহলে কি ফিরিঙ্গীরা যুদ্ধ-টুদ্ধ বাধাবে নাকি?

দেওয়ানজী বললে—আপনি বিশ্রাম করুন, জগৎশেঠজী যদি আসেন তো তাঁর মুখ থেকেই সব শুনতে পাবেন—

বলে, দেওয়ানজী ঘর ছেড়ে ভেতরের দিকে চলে গেল।

মতিঝিলের মধ্যে তখন দরবার বসেছে পুরোদমে। মুর্শিদকুলী খাঁর যা-কিছু সম্পত্তি ছিল সুজাউদ্দীন খাঁর আমলেই তার সবটুকু নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। তিনি ছিলেন বিলাসী মানুষ। অল্প টাকায় তাঁর চলতো না। তাঁর কাছে টাকা ছিল হাতের ময়লা। বেগমদের নিয়ে দোল খেলেই লক্ষ লক্ষ টাকা উড়িয়ে দিতেন এক রাত্রে। পরের জমানো টাকা। নিজের গতর নিজের মাথা ঘামিয়ে সে টাকা রোজগার করতে হয়নি। তাই টাকার ওপর মায়া ছিল তাঁর কম।

কিন্তু আলীবর্দী খাঁ যখন নবাব হলেন তখন বাদশাহী পেশকস দিতেই ফতুর হয়ে গেলেন। তারপর আছে ঘুষ। দিল্লীর বাদশার কাছে বাদশাহী সনদ আনা কি অত সহজ! ঘুষ না দিলে কি বাদশার মিনিস্টারদের কাছে পাত্তা পাওয়া যায়? আমীর-ওমরাওরা হাঁ করেই বসে আছে। আগে আমাদের প্রণামী দাও তবে বাদশার কাছে তুমি পৌঁছতে পারবে। চিরকাল এই নিয়মই চলে আসছে, সুতরাং তোমাকেও সেই নিয়ম মানতে হবে।

তারপর গেছে বর্গীদের হাঙ্গামা।

টাকা না জল! বাঙলা দেশের রক্ত নিংড়ে যা টাকা পাওয়া গেছে সব গেছে বর্গী তাড়াতে। বর্গীরা যাবার পর মাত্র তিনটি বছর রাজত্ব করেছিলেন আলীবর্দী খাঁ। তিন বছর পরেই ওপার থেকে ডাক এসেছিল তাঁর। সিরাজ-উ-দ্দৌলা যখন নবাব হলো তখন নিজামতের ভাঁড়ারে মাত্র সেই ক'টা বছরের জমানো টাকা। সেই জমানো টাকা নিয়েই মীর্জা মহম্মদের মসনদ আরম্ভ হয়েছিল।

কিন্তু মীরজাফর আলির ধারণা ছিল অন্যরকম।

মীরজাফর খাঁ বলেছিল—আমি নবাব হলে টাকার অভাব হবে না আপনাদের—আপনাদের আমি লক্ষ লক্ষ দিয়ে ক্ষতিপূরণ করবো—

কিন্তু ঠিক যখন সব তৈরি তখন এমন করে যে ধরা পড়ে যাবে তা ভাবতে পারেনি কেউই।

ভোর থাকতেই নিজামতের ফৌজ গিয়ে মীরজাফর খাঁর বাড়িতে হামলা করলে। আশেপাশের বাড়ি থেকে যারা ঘটনাটা দেখতে পেয়েছিল, তারা যে-যার বাড়ির ভেতরে গিয়ে আবার ঢুকলো। নবাবী রাগ কখন কার ওপর গিয়ে পড়ে তার ঠিক নেই। এর কান থেকে ওর কানে গিয়ে পৌঁছল কথাটা।

চক্‌বাজারের রাস্তায় তখন কানাকানি শুরু হয়ে গেছে।

একজন বললে—নবাব মীরজাফরকে কোতল করে ফেলেছে বড়ে ভাইয়া—

যারা শুনলো তারা অবাক হয়ে গেল। একজন ওরই মধ্যে আবার প্রতিবাদ করে উঠলো—দূর, মীরজাফর সাহেবকে খুন করবে বাংলা মুলুকে এমন কেউ নেই—

আর একজন বললে—তাহলে মীরন সাহেব আছে কী করতে রে! মীরন সাহেব তো গুণ্ডা! গুণ্ডা কি ছেড়ে কথা বলবে?

অন্য একজন বললে—আরে রেখে দে তোর মীরন গুণ্ডার কথা। মীরন সাহেব আমাদের মত ছোট আদ্‌মির সঙ্গে গুণ্ডামি করবে, নবাবের ফৌজের সঙ্গে গুণ্ডামি করতে হিম্মৎ চাই—

—আরে হিম্মৎ দেখাতে যাসনে মীরন সাহেবের কাছে—! গর্দান-খুন করে ছাড়বে তোকে!

শেষকালে মীরনের সাহস আছে না সাহস নেই, এই নিয়ে দুই দলে তর্ক বেধে গেল। তর্ক বাধলেই ভিড় জমে। আরে, নবাব কি কম গুন্ডা নাকি? নবাবের ছোটবেলাকার গুন্ডামি যারা একদিন দেখেছে তাদের কাছ থেকে সে-সব দিনের ইতিহাস অনেকে শুনেছে। নবাব মীর্জা মহম্মদ কি গুন্ডামি কম জানে ভেবেছিস? নবাব নিজেই গুন্ডামি শেখাতে পারে তোদের। আমার চাচার কাছে শুনেছি, নবাব বাচপান্‌মে আওরতদের ধরে ধরে বজরায় পুরে হাওয়া খেতে বেরিয়েছে। সে-সব জমানা আমার চাচা দেখেছে। তুই কী জানিস? তুই তো সেদিনকার ছোকরা!

ছোকরা কথাটা উচ্চারণ করতেই একজন রেগে উঠলো।—ছোকরা বললি কেন আমাকে? আমি কি তোর নওকর? আমার বাপ তোর বাপের চেয়ে বেশি মাইনে পায় নিজামতে, তা জানিস?

তারপর শুরু হয়ে গেল হাতাহাতি।

ঘটনাটা ঘটছিল সারাফত আলির দোকানের সামনে।

—এই, ভাগ্ ইঁহাসে, ভাগ্ যা—

একজন বললে—হুজুর, শালা বলছে নবাব মীরনকে ভয় করে—! নবাব ডরপোক আদ্‌মি! শরিফ আদ্‌মিকে গালাগালি দিচ্ছে বেওকুফ্—

—কে শরীফ্ আদ্‌মি? কৌন্ হারামী বলছে নবাব শরীফ্ আদ্‌মি?

সারাফত আলির গলা চড়ে উঠলো—নিকল্ যা ইধারসে! হাজি আহম্মদ কা পোতা কভি শরীফ্ হো সক্‌তা হ্যায়? ভাগ্ ইঁহাসে, ভাগ্ যা তু লোগ্—

সারা মুর্শিদাবাদে এই রকমই চলে। কাজ-কর্ম না থাকলে যা-হয় তাই। নতুন জমানার বাচ্ছারা কেবল দিনভর চৌকের রাস্তায় বেত্তমিজি আর বেলেল্লাগিরি করে কাটায়। তারা জন্ম হওয়ার পর থেকে দেখে আসছে খোশামোদ আর ঘুষ দিলে যে-কাজ হয়, সত্যি কথা আর সততায় সে কাজ হয় না। নিজামতে নোক্‌রি পেতে গেলে কারো জামাই হওয়া চাই, কারো ছেলে হওয়া চাই, কিংবা কারো পোতা হওয়া চাই। আর তা যদি না হতে পারো তো ঘুষ দাও। ঘুষের কড়ি যদি তোমার না থাকে তো আমীর-ওমরাওদের মেয়েমানুষ জোগাও। যে-কাজ টাকা দিলে হাসিল হবে না, সে কাজ মেয়েমানুষ দিলে জলের মত সোজা হয়ে যাবে। শুধু মুর্শিদাবাদ কেন, দিল্লীর বাদশাকে কাত্ করতেও ওর চেয়ে বড় হাতিয়ার আর দুস্‌রা কিছু নেই। যাদের বয়েস পনেরো-ষোল তারা দেখেছে গুণের কদর নেই নিজামতে, সব চেয়ে বেশি কদর ঘুষের। ঘুষের আর আওরতের। আরে ইয়ার, আলীবর্দী নবাব কখনো খাজনা পাঠিয়েছে বাদশার দরবারে? নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলা কখনো পাঠিয়েছে? দুনিয়াদারি আলখ্ জিনিস! যা কোরাণে লেখা আছে সব-কিছু বেত্তমিজ্, যা গীতা-রামায়ণ-মহাভারতে লেখা আছে সব ঝুটা বাত্। ওগুলো আমাদের মাদ্রাসা আর পাঠশালায় ওরা পড়ায় ওদের সুবিধের জন্যে! ওরা চুরি করবে, বেত্তমিজি করবে, আর আমাদের বলবে কোরাণ পড়তে, গীতা পড়তে! দুনিয়াদারির কানুন বদলে গেছে ইয়ার। ওই কোরাণ-গীতা ভি বদলাতে হবে! নইলে তোমাদের কথা আর শুনবো না।

ওদিকে যখন কোম্পানীর সিলেক্ট কমিটির হুকুমে তরে হাজার হাজার মাইল দূর থেকে নতুন যুগের মানুষরা সারা পৃথিবীতে নতুন বাজার খুঁজতে বেরিয়েছে, জেসাস ক্রাইস্টের ক্রস্ বুকে ঝুলিয়ে পৃথিবীর মানুষকে স্লেভ করে রাখতে

এসেছে, তখন হিন্দুস্থানে বাদশার দরবারে ঘুষ না দিলে সনদ পাওয়া যায় না, মেয়েমানুষ না দিলে খেলাৎ পাওয়া যায় না। তখন পণ্ডিত, মৌলভী, সাধু, ফকির, কোরাণ, গীতার কোনো কদর নেই। কদর আছে শুধু সেলামের আর খোশামোদের। আজ যে নবাবের ভালো চায় নবাব তার ভালো চায় না। যে নবাবের নজরে পড়তে পারবে, নবাব তারই ভালো চাইবে। সেই নজরে পড়বার জন্যেই আমীর-ওমরাওদের প্রিয় হতে হবে। আমীর-ওমরাওদের খুশী করতে হবে। আমীর-ওমরাওদের খোশামোদ করতে হবে। কিন্তু খোশামোদ করবার লোকেরও তো সংখ্যা কম নয়। তাদের সকলের ভিড় ঠেলে সামনে যাবো কেমন করে! আমার কী আছে যে আমাকে তুমি খাতির করবে? আমার টাকা নেই, আমার মেয়েমানুষ নেই, আমার খোশামোদ করবার ক্ষমতাও নেই। তোমার কাছ পর্যন্ত পৌঁছতে পারবো এমন ক্ষমতাও আমার নেই। আমি থাকি মুলুকের এক প্রান্তে, সেখানকার ডিহিদার তালুকদার আমার কথা শুনবে কেন? অনেক কায়দা করে যদি তাদের হাত করতে পারি তো তবে বড়-জোর তোমার মীর-বক্সীর কাছ পর্যন্ত পৌঁছতে পারবো। কিন্তু তারপর? তারপর কি তোমারই এমন সময় আছে যে আমি আমার আর্জি তোমার কাছে পেশ করতে পারবো। তোমার সময় কোথায়, আমার অভাব-অভিযোগের কথা তুমি শুনবে! তোমার নিজের আরাম আছে, মর্জি আছে, অবসর আছে, আছে খেয়াল-খুশি, খেদ্‌মত। খোদাহ্‌তালারও হয়তো সময় আছে মানুষের আর্জি শোনবার, কিন্তু নবাব-বাদশার তো সময় নেই প্রজার কথা শোনবার জন্যে। সে ভুগে ভুগে মরুক, সে জাহান্নামে যাক, সে গোল্লায় যাক। তার কথা আমার কানে তুলো না। কানে তুললে আমার মেহ্‌ফিলের মজা নষ্ট হয়ে যাবে। আমার মসনদের মেজাজ খারাপ হয়ে যাবে। আমাকে তোমরা শান্তিতে থাকতে দাও।

এমনি করেই পাঠান আমল পার হয়েছে। এমনি করেই মোগল আমলও পার হতে চলেছে। কিন্তু আর বুঝি চললো না। ওদিকে শিখরা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল, মারাঠারাও মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু তারা তো নিজেদের মধ্যেই ঝগড়া করে করে নিঃশেষ হয়ে যাবে। এবার সাগর-পার থেকে তোমরা এসেছো, তোমরাই আমাদের ভরসা, তোমরা আমাদের বাঁচাও সরকার। এবার থেকে তোমাদেরই সেলাম করবো। সেলাম সরকার, সেলাম!

নবাব মীর্জা মহম্মদের সামনেও সেদিন সবাই যথারীতি সেলাম করেই দাঁড়িয়েছিল এসে। চিরকাল যারা সেলাম করার দলে তারা দরকার হলে তোমাকে সেলাম করবে, কিন্তু আবার দরকার ফুরিয়ে গেলে অন্য লোককে সেলাম করতেও তাদের বাধবে না।

অন্য সময় হলে মীর্জা মহম্মদ বুঝতো না। কিন্তু সেদিন বুঝলো। একেবারে না-বোঝার চেয়ে দেরি করে বোঝাও বোধ হয় ভালো। সকাল বেলাই ফৌজ পাঠিয়েছিল মীরজাফর আলির হাবেলিতে। কোতোয়ালিতে হুকুম হয়েছিল মীরজাফর সাহেবকে হাত-কড়া পরিয়ে দরবারে ধরে এনে হাজির করতে। কিন্তু খানিক পরে কী যে হলো, নবাব কোতোয়াল সাহেবকে ফিরে আসতে বললে।

বললে—না, আমি নিজেই যাবো মীরজাফর সাহেবের কাছে—

যা কখনো হয়নি, সেদিন তাই হলো। একদিন সেই রাস্তা দিয়েই মীর্জা মহম্মদ কতবার খেলা করতে গেছে ওই হাবেলিতে। ছোটবেলায় খেলার জায়গা

ছিল ওই হাবেলিটা। ও বাড়ির প্রত্যেকটা ইঁটের সঙ্গে নবাবের পরিচয় ছিল একদিন। আলীবর্দী খাঁর বোনের খসম মীরজাফর আলি।

নানীবেগম বলে দিয়েছিল—ওর কাছে ছোট হতেও তোর লজ্জা নেই মীর্জা। ওতে তোর ইজ্জৎ যাবে না। বরং ইজ্জৎ বাড়বে—

মীর্জা বলেছিল—কিন্তু তামাম মুর্শিদাবাদের লোক কী বলবে নানীজী? তারা বলবে আজ বিপদে পড়েছে বলেই নবাব মীরজাফর সাহেবকে আবার খোশামোদ করতে এসেছে—

—তা বলুক মীর্জা। লোকের কথায় আর কান দিস্‌নে!

—কিন্তু লোকের কথায় কান দিয়েই তো আমার এই দশা হয়েছে নানীজী!

—কী এমন দশা হয়েছে তোর যে এমন করে কথা বলছিস?

মীর্জা বলেছিল—না নানীজী, মানুষের সম্মানে আর কখনো আঘাত দেবো না ঠিক করেছি। এবার থেকে মানুষের মেজাজকেও সম্মান দেবো আমি—

—তাহলে তাই যা, মীরজাফর সাহেবকে গিয়ে নিজে এখেনে ডেকে নিয়ে আয়—

প্রথমে মীরজাফর সাহেব অবাকই হয়ে গিয়েছিল মীর্জাকে দেখে। হাসতে গিয়েও হাসি বেরোয়নি মুখ দিয়ে। অনেকদিনের অপমানের প্রতিশোধ নেবার ইচ্ছে হয়েছিল সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু মীর্জার কথায় বুঝলো যে বিপদে পড়লে মানুষ এমনি করেই মাথা নিচু করে।

—কিন্তু আমি দরবারে যদি না যাই তাহলে কি আমাকে তুমি গ্রেফ্‌তার করে নিয়ে যাবে? যদি তাই করতে চাও তো গ্রেফ্‌তারই করো!

মীর্জা বলেছিল—গ্রেফ্‌তার করবার ইচ্ছে থাকলে কি আমি আজ নিজে আসতুম আলি সাহেব? আমি কোতোয়াল পাঠাতুম!

—কিন্তু কোতোয়ালকেই তো পাঠিয়েছিলে আমার কাছে! কোতোয়ালকে ফিরে যেতে বললে কেন?

—তা বলে মানুষের কি ভুল হয় না? ভুল করেছি বলেই ভুলের খেসারত দিতে আমি নিজেই এসেছি আপনার কাছে।

—কিন্তু আমার কাছে কেন?

মীর্জা বললে—আমার আর কেউ নেই বলেই আপনার কাছে এসেছি!

—কিন্তু যারা তোমার নিজের লোক তারা কোথায় গেল?

—আমার নিজের লোক বলতে কার কথা বলছেন?

—কেন? যেদিন আমাকে দরবার থেকে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছিলে সেদিন তো তাদের ওপরেই ভরসা করেছিলে! সেদিন তো তারাই তোমার নিজের লোক ছিল!

—কাদের কথা বলছেন? তারা কারা?

—কেন, তোমার নিজের শ্বশুর ইরাজ খাঁ, মোহনলাল, মীরমদন, আমির কারা?

—আমি নিজে আপনার বাড়িতে এসেছি, মুর্শিদাবাদের নবাব হয়ে আমি আপনার কাছে নিজের ভুলের জন্যে ক্ষমা চাইছি, তবু আপনার রাগ যাবে না?

মীরজাফর আলি বললে—আমার রাগ করাটাই দেখলে, আর তোমার অপমান করাটা বুঝি কিছুই নয়? দরবারে গিয়ে মোহনলালকে কুর্নিশ করার হুকুমটাও বুঝি রাগ করার পক্ষে যথেষ্ট নয়?

—আমি তো বলছি আমি ভুল করেছি। নবাব বলে কি আমি মানুষ নই? আমাকে আপনি আগে যা দেখেছেন, আজ আমি আর তা নই! বিশ্বাস করুন, বাংলামুলুকের ইতিহাস আমাকে একেবারে বদলে দিয়েছে। আমি আজ অন্য মানুষ!

—তার মানে?

মীরজাফর আলি সাহেব মীর্জার মুখের দিকে মুখ ফেরালো। ঘরের চারদিকের জানালা-দরজা সব বন্ধ। এখনি বাঙলার মসনদের মালিকের মুখখানা চিরকালের মত বন্ধ করে দেওয়া যায়। তাহলে আর কোনো বাধাই থাকে না মসনদ দখল করার পথে। কিন্তু আলি সাহেবের মনে হলো রাজনীতি কূটনীতি বটে, কিন্তু কূটনীতিরও একটা নীতি থাকা উচিত। সে নীতি বলে যে, তোমার খাদ্যদ্রব্য সামনে এলেও তাকে খেতে নেই। তার সামনে নির্লোভ নিরহঙ্কার সাজতে হয়। নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক সাজতে হয়। তাতে সুবিধে বই অসুবিধে নেই। আজ যখন সমস্ত প্রকাশ হয়ে পড়েছে তখন নবাব তার কাছে এসেছে অনুশোচনা নিয়ে। খোদাহ্‌তালার মর্জি একেই বলে! খোদাহ্‌তালার দোয়া একেই বলে!

—হ্যাঁ, সত্যিই আমি অন্য মানুষ আলি সাহেব। যে মানুষ হোসেন কুলি খাঁকে খুন করেছিল, যে মানুষ নিজের মাসিকে গ্রেফ্‌তার করে বন্দী করে রেখেছিল, যে মানুষকে মুর্শিদাবাদের লোক ভয় করতো, এখন আর আমি সে মানুষ নই। বিশ্বাস করুন আলি সাহেব, আমার কথা একবর্ণও মিথ্যে নয়!

তারপর একটু থেমে নবাব আবার বলতে লাগলো—লোকে বলছে, আমার বদনামের সুযোগ নিয়ে, আমার দুর্বলতার সুবিধে নিয়ে আপনি নাকি কোম্পানীর ফিরিঙ্গীদের সঙ্গে দুষমনি করছেন, তাদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন—

—লোকে যা বলে বলুক, তুমিও কি তাই বলো?

মীর্জা বলতে লাগলো—লোকের কথা থাক, কিন্তু হঠাৎ বলা-নেই কওয়া-নেই, কাশিমবাজার কুঠি ছেড়ে ওয়াটস্‌ই বা চলে গেল কেন? তারপর এই চিঠি—

বলে একখানা চিঠি দেখালে বার করে।

—এর মানে কী?

মীরজাফর আলি সাহেব চিঠিখানা হাতে নিয়ে পড়লে। তারপর পড়া হয়ে যাবার পর ফেরত দিলে।

—এর মানে, এই মুর্শিদাবাদেই আমার মসনদের জন্যে আমাকে লড়াই করতে হবে। আর আপনারা—মানে আপনি, জগৎশেঠ, ইয়ার লুৎফ, রাজা দুর্লভরাম, আপনারা সবাই আমাকে ত্যাগ করবেন।

মীরজাফর সাহেব তবু চুপ করে রইলো।

—এই আমার জীবনের প্রথম লড়াই নয়, আলি সাহেব। আপনি সবই জানেন। লড়াই করতে আমি ভয় পাই না। তামাম দুনিয়ার সকলের সঙ্গে আমি একলা লড়াই করতে রাজি। কিন্তু ওই যে আমি বললাম, এই মীর্জা মহম্মদ আর সে-মীর্জা মহম্মদ নেই। আমি আজ অন্য মানুষ। আপনি জানেন না হয়তো আলি সাহেব—আমি আজকাল রোজ কোরাণ পড়ছি। আমি আজ সকলের ভাল-বাসা চাই, মুহব্বত চাই। তবে শুনবেন, কেন এমন হলো? আমি কলকাতা থেকে ফিরছিলাম। গঙ্গার ওপর তখন অনেক রাত। বজরার মধ্যে বিছানায় শুয়ে আছি, কিন্তু ঘুম আসছে না। মনের মধ্যে নানারকম ভাবনা ভাবছি। ভাবছি, মসনদ পেয়ে আমার কী লাভ হলো, মসনদ পেয়ে আমার কী সুবিধে হলো? অথচ ছোটবেলায় জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গে এই মসনদ নিয়েই তো আমার যত শত্রুতা। মসনদের জন্যেই তো আমার রিস্তাদারদের সঙ্গে এত ঝগড়া। জীবনে খুন-খারাপি যা কিছু করেছি সব তো এই মসনদের জন্যে। কিন্তু এই কি সেই মসনদ যার জন্যে আমি এত কিছু করেছি? এ মসনদ আমাকে কী দিলে? এই

মসনদ পেয়ে আমি কী পেলুম? ভাবতে ভাবতে ভাবনা আরো বেড়ে গেল। হঠাৎ কোথা থেকে একটা গানের সুর কানে ভেসে এল, আলি সাহেব। মনে হলো, এত রাত্তিরে কে গান গাইছে! বাইরে চেয়ে দেখলুম, আর একটা বজরা যাচ্ছে উল্টোদিকে। গানটা আসছে সেই বজরার ভেতর থেকে।

মীরজাফর আলি সাহেবের মুখে তখনো কোনো কথা নেই। ভাবলে, নবাব আজ কূটনীতির অন্য ঘোরালো পথ ধরে কথা বলছে। তা হোক, আজ কূটনীতির লড়াই-ই হয়ে যাক এখানে।

—তারপর আলি সাহেব, আমি সেই বজরাটা থামাতে বললাম। শুনলাম নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র সেই বজরায় আছে। আর গান গাইছে রামপ্রসাদ! আপনি রামপ্রসাদের গান নিশ্চয় শুনেছেন আলি সাহেব। আমি বাঙলা বিহার উড়িষ্যার সুবাদার, কিন্তু ঘাটে মাঠে নদীতে নৌকোয় যারা দিনরাত একজনের নাম করে সে তো আমি নয় আলি সাহেব, সে তো রামপ্রসাদ। তার তো মসনদ নেই, জায়গীর নেই, খেলাৎ নেই, সনদ নেই, ফার্মান নেই। ভাবলাম, দেখে আসি সেই আর-এক সুবাদারকে, যাকে বড়লোক-গরীব সব লোকই মানে। তারপর গেলুম। আমাকে দেখে সেই রামপ্রসাদ উর্দু গজল গান ধরলে। 'সেঁইয়া গেও পরদেশ, সখিরি ক্যা করু ম্যায়।' আমি বললুম—না, তোমার ওই মায়ের গান গাও—।

মীর্জা মহম্মদ বলতে লাগলো—তারপর আলি সাহেব, সে গাইতে লাগলো—মা গো আমার এই ভাবনা। আমি কোথায় ছিলাম...

হঠাৎ ফটকের বাইরে কার যেন টোকা পড়লো।

মীর্জা মহম্মদ বললে—কে?

মীরজাফর আলি বললে—আমি দেখে আসছি—

মীর্জা বললে—না আলি সাহেব, এখন যাকে-তাকে ঢুকতে দেবেন না, আজকে আমি অনেক কথা বলতে এসেছি, আমার সব কথা আমি আপনাকে শোনাবো।

মীরজাফর আলি সাহেব বললে—ঠিক আছে, আমি আর কাউকে এখানে ঢুকতে দেবো না। তোমার কথাই শুনবো। তবু দেখে আসি—কে। কী জন্যে ডাকছে—

বলে মীরজাফর আলি সাহেব ফটক খুলতে গেল।
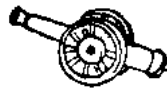
এও ইতিহাসের এক আশ্চর্য ঘটনা। একদিন যে নবাব মতিঝিলের দরবারে সবাইকে ডেকে এনে কুর্নিশ করতে বাধ্য করেছে, সেই নবাবকেই আবার নিজের গরজে একদিন যেতে হয়েছে নিজের ওমরাহের বাড়িতে তোষামোদ করে খুশি করতে। কথায় বলে গরজ বড় বালাই। কিন্তু নবাবের গরজ আরো বড় বালাই।

কিন্তু পৃথিবীর যত বাদশা, যত নবাব অতীতে পাপ করে গিয়েছে, সব যেন একলা নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলারই দায়িত্ব। সকলের সব অপরাধের দায় যেন নবাবের ঘাড়েই এসে পড়েছে। চোখের সামনে যেন নতুন যুগের নতুন মানুষরা এসে নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলার সামনে জবাবদিহি চাইছে। বলছে—জবাব দাও। তোমার পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, বৃদ্ধ প্রপিতামহ, অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ, এমন কি

প্রাগৈতিহাসিক সব মানুষের সব গুণাহ্‌র প্রায়শ্চিত্ত করো।

—কে? কারা?

মীরজাফর সাহেব দরজা খুলতে গিয়েছিল। এবার ফিরে এল।

মীর্জা মহম্মদ আবার জিজ্ঞেস করলে—কে? কে এসেছিল এখন?

মীরজাফর সাহেব বললে—কেউ না, এমনি—

—এমনি মানে? এমনি কখনো দরজায় শব্দ হয়?

মীরজাফর সাহেব বললে—হয়, হয় মীর্জা, হয়! এমন শব্দ আমি প্রায়ই শুনি। দিনে রাত্রে দুপুরে, প্রায়ই মনে হয় কে যেন আমার দরজায় ঘা দিলে!

—সত্যিই হয় আলি সাহেব? সত্যিই আপনার মনে হয় কেউ যেন দরজায় ঘা দিলে?

—হ্যাঁ মীর্জা সাহেব, সত্যিই হয়।

—কিন্তু আমি ভেবেছিলাম শুধু আমি একলাই শুনি, আমি একলাই শুনতে পাই, আর কারো হয় না। কিন্তু কেন এমন হয় আলি সাহেব? কে অমন ধাক্কা দেয় আলি সাহেব? কারা?

মীরজাফর সাহেব বললে—ও কিছু নয়, ও মনের ভুল—

—সত্যিই বলছেন মনের ভুল? সত্যিই বলছেন ও কিছু নয়? কিন্তু আমি ভাবতুম ও শুধু আমারই হয়। আমি ভাবতুম সামনে হয়তো আমার খুব বিপদ আসছে, ও তারই ইঙ্গিত!

মীরজাফর বললে—ও নিয়ে তুমি আর ভেবো না—ওতে আরো শরীর খারাপ হবে—

—কিন্তু শরীরের আমার কী দোষ আলি সাহেব। ওদিকে যখন কাশিমবাজার কুঠি থেকে সবাই পালিয়েছে, ওদিকে ক্লাইভ সাহেব যখন মুর্শিদাবাদে আসবে বলে শাসাচ্ছে, তখন শরীর খারাপ হবে না? আমার শরীর খারাপ হবে না তো কার হবে? কিন্তু আমি কী করেছি বলতে পারেন? আমি আপনাদের কী ক্ষতি করেছি যে, আপনারা এমন করে মুর্শিদাবাদের সর্বনাশ করছেন? মুর্শিদাবাদ আপনাদের কাছে কী দোষ করলো? আজ যদি ফিরিঙ্গীরা এসে এখানে হামলা করে তখন কে মুর্শিদাবাদের মানুষদের রক্ষে করবে?

মীরজাফর সাহেব বললে—কিন্তু আমাকে এসব কথা বলছো কেন তুমি? আমি কে? আমাকে তো তুমি নিজামত থেকে তাড়িয়ে দিয়েছো!

—আমি আপনাকে তাড়িয়ে দিয়েছি?

—তুমি তোমার মীর-বক্সী মোহনলালকে সেলাম করে তবে দরবারে ঢুকতে বলে দিয়েছো সকলকে। আমি যদি সে নিয়ম না মেনে থাকি তো সে কার দোষ? আমার, না তোমার? আমার যদি আত্মসম্মান বলে কোনো জিনিস থাকে তো সে কি আমার দোষ না গুণ? তুমি বাংলার নবাব, তোমার যেমন আত্মসম্মান আছে, তেমনি তোমার প্রজাদেরও তো আত্মসম্মান থাকতে পারে!

—কিন্তু সেই অপরাধের জন্যে আপনি আমাকে এত বড় শাস্তি দেবেন?

—কে বললে আমি তোমাকে শাস্তি দিয়েছি?

—আপনি ইংরেজদের সঙ্গে হাত মেলাননি? আপনি আমাকে মসনদ থেকে উৎখাত করবার জন্যে ফিরিঙ্গী সাহেবদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করছেন না বলতে চান? আপনি বলতে চান, আমি যা কিছু শুনেছি সব মিথ্যে? তা হলে কেন আমি দরবার ছেড়ে আপনার এই জাফরাগঞ্জের বাড়িতে এলুম? বিপদে না পড়লে

কি কোনো নবাব এমন করে তার ওমরাহর বাড়িতে একলা একলা আসে?

—তুমি তো আমাকে ধরে নিয়ে যাবার জন্যে ফৌজ পাঠিয়েছিলে। আমি যাবো না জেনেই তুমি ফৌজ ফেরত পাঠাবার হুকুম দিয়ে নিজে এসেছো। এ তো তোমার নিজেরই গরজ! নিজের গরজেই তুমি এসেছো আমার কাছে!

মীর্জা মহম্মদ বললে—তা না-হয় নিজের গরজই হলো, তবু তো আমি নবাব! আপনিও তো একদিন এই নিজামতের নিমক খেয়েছেন। না-হয় সেই নিমকের দোহাই দিয়েই আমি আপনার কাছে আমার আর্জি পেশ করছি—

মীরজাফর সাহেব বললে—অমন করে তুমি ব'লো না। সোজা করে বলো কী চাও!

—দোষ আমার কি আপনার, আপনি ফিরিঙ্গীদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করছেন কি না-করছেন সে তর্ক না-হয় এখন থাক, সে না-হয় পরেও কোনোদিন ফয়সালা হতে পারে। কিন্তু আমি চাই আপনি আমার সঙ্গে থাকুন।

—কী হিসেবে থাকবো?

—আপনার যা ইচ্ছে। আমি কিছু বলবো না। ফিরিঙ্গীদের সঙ্গে এখন আমার যে ফয়সালা চলছে তাতে আপনি আমার দলে থাকুন এই আমার ইচ্ছে। আপনিও বাঙলা মুলুকের একজন মানুষ। বাঙলা মুলুকের যাতে ভালো হয়, আপনি তাই করুন। আমি আর কিছু চাই না। যাদের সঙ্গে আমার শত্রুতা তারা আমারও কেউ নয়, আপনারও কেউ নয়। তারা বিদেশ থেকে এসেছে। এসে এখানে আমাদের ঝগড়ার সুযোগ নিয়ে আমাকে চোখ রাঙাবে এ অপমান কি আমার একলার? আপনার অপমান নয়? আমার কোনো ক্ষতি হলে কি আপনার ক্ষতি হবে না?

—এত কথা কেন বলছো আমাকে? আমি কি কিছু বুঝি না?

—সবই বোঝেন আপনি, মানছি।। কিন্তু মানুষের মনে একবার যখন অভিমান হয় তখন কি আর কিছু তার মনে থাকে? আপনি আমার ওপর অভিমান করে ওদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন আমার সর্বনাশ করবার জন্যে। কিন্তু আমার সর্বনাশ তো আপনারও সর্বনাশ। আমার সর্বনাশ হলে আপনি কি ভেবেছেন আপনিই বাঁচবেন? বলুন, বাঁচবেন?

মীরজাফর সাহেব বললে—আমার কথা এখন আমি কিছু বলবো না, বললে তোমার যা মনের অবস্থা তুমি তা বিশ্বাসও করবে না।

—আলি সাহেব, এখন আর কথা বলবার সময়ও নেই। কথা যা বলবার তা পরে হবে। তখন আপনি যত কথা বলবেন আমি শুনবো। আমার দিককার কথাও আপনি তখন শুনবেন। এখন আমি আপনাকে শুধু একটা অনুরোধ করবো, বলুন আপনি রাখবেন?

—বলো!

—আপনি আমার সামনে কোরাণ ছুঁয়ে বলুন যে, এই লড়াইতে আপনি ফিরিঙ্গীদের সাহায্য করবেন না। এই লড়াইতে আপনি মুর্শিদাবাদের স্বার্থ দেখবেন, বাঙলা মুলুকের স্বার্থ দেখবেন, বাঙলার মসনদের স্বার্থ দেখবেন, আর আমার স্বার্থ দেখবেন?

মীরজাফর সাহেব চুপ করে কিছুক্ষণ ভাবলো।

—আপনি চুপ করে থাকবেন না আলি সাহেব, কোরাণ নিয়ে আসুন। কোরাণ ছুঁয়ে আপনি দিব্যি করুন। কোরাণ ছুঁয়ে দিব্যি করলে আমি সব ভুলে যাবো আলি সাহেব। আপনার বিরুদ্ধে আমি যা কিছু শুনেছি সব ভুলে যাবো। একবার

ফিরিঙ্গীদের কলকাতা থেকে তাড়িয়ে দিলে তখন আপনি যা চাইবেন আলি সাহেব, সব দেবো। আপনি যদি মুর্শিদাবাদ ছেড়ে নিজের পরিবার নিয়ে দিল্লী গিয়ে বাস করতে চান তাও দেবো। আমি সমস্ত বন্দোবস্ত করে দেবো আপনার। আপনার যাতে সারা জীবন ভরণ-পোষণের কোনো কষ্ট না হয় তার ব্যবস্থাও আমি করবো কথা দিচ্ছি—আনুন, আপনি কোরাণ আনুন—

মীরজাফর সাহেব বললে—আমার মুখের কথা তুমি বিশ্বাস করবে না?

—আপনার মুখের কথাই আমি বিশ্বাস করছি আলি সাহেব। সেই মুখের কথাটাই না-হয় কোরাণের সামনে হোক। আমি যে আজকাল কোরাণ পড়ি আলি সাহেব।

—কিন্তু কোরাণ ছুঁয়ে তো আগেও দিব্যি করেছি কতবার, তবু তো তুমি আমাকে অবিশ্বাস করেছো! এ তো প্রথম নয়!

—তবু আপনি কোরাণ আনুন আলি সাহেব। অন্যবারের সঙ্গে এবারের তুলনা করবেন না, এবার আরো খারাপ অবস্থা মুর্শিদাবাদের। এবার হয় হিন্দুস্থান বাঁচবে, নয়তো যাবে। আমি বাঁচলেই তবে হিন্দুস্থান বাঁচবে আলি সাহেব, হিন্দুস্থান বাঁচলে আপনি আমি উমিচাঁদ জগৎশেঠ সবাই বাঁচবে। ভাববেন না আমি মারা গেলে আপনারা বেঁচে যাবেন। এ বিপদ আমার আপনার সকলের—আনুন আপনি, কোরাণ আনুন।—

মীরজাফর কোরাণ আনতে ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে গেল।

আর জাফরাগঞ্জের দেবতা, মতিঝিলের দেবতা, মহিমাপুরের দেবতা, হাতিয়াগড়, কলকাতা, হিন্দুস্থান, ইংলণ্ড—সকলের দেবতা সবার অলক্ষ্যে মিটিমিটি হাসলেন।

হাতিয়াগড় থেকে এসে ছোটমশাই হাঁফিয়ে উঠেছিল। হাতিয়াগড় থেকে মহিমাপুর কম দূর নয়। মহিমাপুরের এই হাবেলিতেই এই নিয়ে কতবার আসতে হলো। তবু এবার যেন অনেকটা আশা হচ্ছে। ছোট বউরানীর মুখখানা মনে করতে বড় ভালো লাগলো। এই ঘরেই, এই এখানেই পালিয়ে এসে আশ্রয় চেয়েছিল। আর কার কাছেই বা যাবে! চেহেল্-সুতুনের ভেতর থেকে পালিয়ে আসা কি অত সহজ। সেখানে খোজাদের চোখ এড়িয়ে বাইরে আসা সহজ নয়। মুর্শিদকুলী খাঁর আমল থেকে সেখানে পাহারাদারি চলছে। আকাশের চন্দ্র সূর্য যারা দেখতে পায় না, তাদের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে ছোট বউরানী। বিয়ের পর থেকে যে বউ বরাবর ছোটমশাই-এর পাশে না শুলে ঘুমোতে পারেনি, তাকে আজ মুসলমান হারেমের মধ্যে বন্দী হয়ে রাত কাটাতে হচ্ছে। ওগো, তুমি তো জানো, তোমাকে ছাড়া আমিও থাকতে পারি না। আজ কতদিন হলো আমি কাছারির কাজ-কর্ম কিছুই দেখতে পারিনি। জগা খাজাঞ্চিবাবু জমা-খরচের খাতা নিয়ে এসে আবার ফিরে গেছে। সমস্ত হাতিয়াগড়ই অন্ধকার মরুভূমি হয়ে গেছে আমার কাছে। তোমার কষ্টটাও কি আমি বুঝি না ভেবেছো? মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র কেবল ধৈর্য ধরতে বলেন। মহারাজ কী করে বুঝবেন! মহারাজের বয়েস হয়েছে। ছেলে-মেয়ে হয়েছে। কিন্তু আমি তোমাকে কী দিতে পেরেছি?

দেওয়ান মশাইকে আবার ডাকলে ছোটমশাই।

—কই, এখনো তো আসছেন না শেঠজী! এত দেরি হচ্ছে কেন?

দেওয়ান মশাই বললে—মীরজাফর সাহেবের সঙ্গে আজ একটা ফয়সালা হচ্ছে কিনা, তাই দেরি হচ্ছে—

—কীসের ফয়সালা?

দেওয়ান মশাই বললে—আপনি শোনেননি কিছু? কাশিমবাজার কুঠি থেকে ফিরিঙ্গীরা সবাই পালিয়েছে যে—

—সে তো শুনেছি, কিন্তু পালালে কী হয়েছে? পালানো ভালোই তো—

দেওয়ান মশাই বললে—কিন্তু না বলে-কয়ে পালানো মানেই তো নবাবকে অগ্রাহ্য করা। তা ছাড়া ইংরেজদের সঙ্গে এত ষড়যন্ত্র, এত মাখামাখি সব যে জানাজানি হয়ে গেছে!

—কিন্তু জানাজানি হলোটা কী করে?

দেওয়ান মশাই বললে—মরিয়ম বেগমসাহেবা সেদিন রাত্রে এখানে এসেছিল, সে তো সব শুনে গেছে—

—সে কী?

দেওয়ান মশাই বললে—শেঠজী এলেই সব টের পাবেন। মোট কথা, নিজামতের অবস্থা এখন খুব টলোমলো। নবাবের খুব ভয় লেগে গেছে। ক্লাইভ সাহেব নবাবকে যে চিঠি লিখেছে তারপর ভয় হবারই কথা—

—কী রকম? কী চিঠি লিখেছে?

—লিখেছে সেপাই নিয়ে কাশিমবাজারের দিকে আসছে—

—কেন? আসছে কেন ক্লাইভ সাহেব? যুদ্ধ হবে নাকি?

-লিখেছে, ফরাসীদের তাড়াবার জন্যে আসছে। লিখেছে—আমরা শিগ্‌গির যাচ্ছি। সেখানে গিয়ে নবাবকে এক দস্তক দিতে হবে যে, ফরাসীদের পাটনা থেকে ধরে আনবার জন্যে দু' হাজার সৈন্যকে আজিমাবাদের দিকে যেতে দিতে হবে।

ছোটমশাই বড় ভাবনায় পড়লো। ঠিক এই সময়েই কিনা গণ্ডগোল শুরু হলো। আগে যুদ্ধ হয়েছিল কলকাতার জঙ্গলে। কিন্তু এবার একেবারে রাজধানীতে! রাজধানীর বুকের ওপর! ছোটমশাই-এর বুকটা দুর-দুর করে উঠলো। বললে—জগৎশেঠজী কী বলছেন?

দেওয়ানজী জগৎশেঠজীর দফ্‌তরের বহু দিনের পুরোন লোক। যা কিছু শলা-পরামর্শ করবার সমস্তই দেওয়ানজীর সঙ্গে করে তবে কাজে হাত দেন। দেওয়ানজী সব খবর জানে। নবাবের নাকি এখন একেবারে চরম অবস্থা। ফরাসীদের তাড়িয়ে দিলেও ভেতরে ভেতরে তাদের মাইনে ঠিক দিয়ে যাচ্ছে। কেউ বলছে, বুশীকে আবার গোপনে ডেকে পাঠানো হয়েছে। একদিন একটা হুকুমত্ বার করে তার পরদিন আবার সেটা ছিঁড়ে ফেলে দেয়। এখন মতিস্থির করতে পারছে না নবাব! ওদিক থেকে নবাবের গুপ্তচর খবর পাঠিয়েছে ইংরেজদের অর্ধেক সেপাই নাকি কাশিমবাজারের দিকে আগেই রওনা দিয়েছে।

এত খবর হাতিয়াগড়ে বসে ছোটমশাই পায়নি। যুদ্ধ যদি বাধে তো শেষ পর্যন্ত হাতিয়াগড়ও বাদ পড়বে না। সেখানে ডিহিদার রেজা আলি আছে। সে এসে টাকা চাইবে, লোক চাইবে। আগাম আবওয়াব চাইবে। ভাবতে ভাবতে ছোট-মশাই-এর মাথাটা সেখানে বসেই গোলমাল হয়ে গিয়েছিল।

মনে আছে, সেদিন যখন রাত অনেক হয়েছে তখন জগৎশেঠজী মতিঝিলের

দরবার থেকে ফিরেছিলেন। এমন উদ্বিগ্ন দেখা যায়নি কখনো জগৎশেঠজীকে। বলেছিলেন—অবস্থা খুব খারাপ ছোটমশাই—

—সে তো সব বুঝতে পারছি!

—আপনাকে যখন চিঠি লিখেছিলাম তখন বিশেষ জানাজানি হয়ে যায়নি। এখন এই দু' দিনের মধ্যে একেবারে সমস্ত গরম হয়ে উঠেছে। নবাব নিজে গিয়েছিল মীরজাফর সাহেবের জাফরগঞ্জের বাড়িতে। এখন অবস্থা বুঝে অন্যরকম ব্যবহার করছে। এখন আর কাউকে চটাতে চাইছে না। সেবারে আমার গালে চড় মেরেছিল সকলের সামনে। এবার আবার খুব ভদ্র ব্যবহার করলে।

ছোটমশাই বললে—এই সুযোগে আমার স্ত্রীকে বের করে নিয়ে আসা যায় না?

জগৎশেঠজী বললেন—কিন্তু শুনেছি আপনার স্ত্রী নাকি এখন আর চেহেল্-সুতুনে নেই। আমার সঙ্গে কথা ছিল আমি ডেকে পাঠাবো। চক্‌বাজারে সারাফত আলির দোকানে কে নাকি কান্ত বলে একজন আছে, তাকে খবর দিলেই আপনার স্ত্রী আমার এখানে চলে আসতে পারবেন।

—কান্ত! সে আবার কে?

জগৎশেঠজী বললেন—কী জানি সে কে!

ছোটমশাই বললে—তার কাছে কেন যেতে বলেছে?

—তা জানি না। বলেছেন, তার কাছে গেলে আপনার স্ত্রীর কাছে সে খবর পাঠিয়ে দিতে পারবে। কিন্তু এখন তো আর তার কাছে গিয়ে কোনো লাভ হবে না। শুনেছি নাকি আপনার স্ত্রী আমার কাছ থেকে কোনো খবর না পেয়ে কলকাতায় চলে গিয়েছিলেন।

—কলকাতায়? কলকাতায় কেন?

—বোধ হয় ক্লাইভ সাহেবের কাছে কোনো সাহায্য পাবার আশায়।

ছোটমশাই সোজা হয়ে উঠে বসলো এবার। বললে—কিন্তু আমি তো ক্লাইভ সাহেবের কাছে গিয়েছিলুম। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে আমার স্ত্রীর কথাও বলেছিলুম। ক্লাইভ সাহেব তো জানে, মরিয়ম বেগম আসলে কে!

জগৎশেঠজী বললেন—যখন ক্লাইভ সাহেব সব জানে তখন আপনার কাছে নিশ্চয়ই আপনার স্ত্রীকে পাঠিয়ে দেবে! কিন্তু এখন কি তার অত ভাববার সময় আছে? এখন এখানে নবাবের যেমন মনের অবস্থা, ক্লাইভ সাহেবেরও তেমনি। সবই তো নির্ভর করছে মীরজাফর সাহেবের ওপর!

—কেন? মীরজাফর সাহেব কী করবে?

জগৎশেঠজী বললেন—মীরজাফর সাহেব এখন যার দিকে ঢলবে, তারাই জিতবে! মীরজাফরের সঙ্গে তো লেখাপড়া-দস্তক সব চুকে গেছে ফিরিঙ্গী-দের! কিন্তু বিশ্বাস তো কিছু করতে পারছে না। এদিকে নবাব মীরজাফর সাহেবকে দিয়ে কোরাণ ছুঁইয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিলে। তাতে কথাটা যখন ক্লাইভ সাহেবের কানে যাবে তখন কি পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারবে মীরজাফর সাহেবকে?

—তা হলে আমি কী করবো? আমাকে কী করতে বলেন আপনি?

জগৎশেঠজী বললেন—আমিও তো সেই কথাই ভাবছি! ভেবে কিছু ঠিক করতে পারছি না।

—চক্‌বাজারে সারাফত আলির খুশ্‌বু তেলের দোকানে একবার যাবো?

কান্ত না কী নাম বললেন, তাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করবো? সে যদি কিছু হদিস দিতে পারে!

জগৎশেঠজী বললেন—তা যেতে পারেন, কিন্তু সেখানে তার কাছে কোনো হদিস পাবেন কিনা সন্দেহ—কারণ, মরিয়ম বেগম তো আর চেহেল্-সতুনে নেই, কলকাতায় ক্লাইভ সাহেবের তাঁবে।

—তা হলে সেখানেই যাই! ক্লাইভ সাহেবকে গিয়ে সব বলি গে—

জগৎশেঠজী বললেন—আপনি একলা যাবেন?

—কেন? একলা গেলে দোষ কী?

—না, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকে যদি সঙ্গে নিয়ে যেতে পারতেন ভালো হতো। আর তা ছাড়া এখন ক্লাইভ সাহেবকে পাবেনই বা কোথায়? সাহেব তো শুনছি সেপাই-লস্কর নিয়ে কলকাতা থেকে রওনা দিয়েছে।

ছোটমশাই বললে—তা আমি কী করবো বলুন জগৎশেঠজী! আমি আর কিছু ভেবে উঠতে পারছি না। আপনি আমায় একটা কিছু পরামর্শ দিন।

—তা হলে আপনি আজ সারাফত আলির খুশবু তেলের দোকানেই না-হয় যান একবার। তারপর না-হয় ক্লাইভ সাহেবের কাছে যাবেন!

ছোটমশাই উঠলো। বললে—তা হলে যাই এখন?

—এখ্খুনি যাবেন কী? এখন রাস্তায় রাস্তায় চর ঘুরে বেড়াচ্ছে। এখন আপনি এখানে এসেছেন এ কথা চরেরা জেনে ফেলতে পারে। আর একটু রাত হোক তখন যাবেন।

তারপর একটু থেমে বললেন—আর একটা কথা, আপনাকে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে আপনি কে, কোত্থেকে আসছেন, আপনি যেন বলবেন না। এখন এই ডামাডোলের সময় কখন কাকে ধরে কোতোয়ালিতে পুরে রাখে, কিছু বলা যায় না। ধরলে আপনিও বিপদে পড়বেন, আমিও বিপদে পড়বো—

ছোটমশাই হতাশ হয়ে আবার বসে পড়লো। আর যেন তার দেরি সইছে না।

জগৎশেঠজী বললেন—হ্যাঁ, আপনি এখানে থাকুন, একটু রাত হলে তারপর একজন লোক দেবো আপনার সঙ্গে, সে আপনাকে সারাফত আলির দোকানটা দেখিয়ে দেবে। এখন আপনি একটু বিশ্রাম করুন। আমি আপনার খাওয়ার ব্যবস্থা করতে বলে দিচ্ছি—

বলে জগৎশেঠজী খিদ্‌মদ্‌গারকে ডাকলেন।
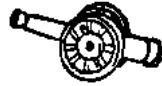
মুর্শিদাবাদের ইতিহাসে সত্যিই তখন ডামাডোল চলেছে। এ মুর্শিদাবাদে নতুন কিছু নয়। যখনই একটা যুদ্ধ হয়েছে তখনই রাজধানীতে তোলপাড় শুরু হয়েছে। মুর্শিদকুলী খাঁ থেকে শুরু করে সরফরাজ খাঁ, আলীবর্দী পর্যন্ত কখনো তার ব্যতিক্রম হয়নি। নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলা যখন ছোট ছিল তখন সারা মুর্শিদাবাদ তোলপাড় করে তুলেছে। কিন্তু সে আর এক রকম। সে ভাইতে-ভাইতে লড়াই, সে বর্গীদের সঙ্গে হামলা, সে হিন্দুস্থানের লোকের সঙ্গে মোকাবিলা, কিন্তু এবার তা নয়। এবার গোরা পল্টনদের সঙ্গে, এবার ফিরিঙ্গীদের সঙ্গে। এবার রাজধানীর টনক নড়ে-ওঠা ডামাডোল। এবার রাস্তায়-ঘাটে চুপিচুপি

কথা, কানাঘুষো আলোচনা। এবার সন্ধ্যে হলেই লোকের বাজার-হাট থেকে বাড়ি চলে যাওয়া। যে গণৎকারটা চক্‌বাজারের রাস্তায় বসে থাকতো অনেক বেলা পর্যন্ত, সেও বেলাবেলি পাততাড়ি গুটিয়ে চলে যায়। বলে—রাহু রন্ধ্রে ঢুকেছে, এবার আকাল আসবেই—

বুড়ো সারাফত আলির কোনো পরিবর্তন নেই। সে রোজ সন্ধ্যেবেলা নিয়ম করে আগরবাতি জেবলে দিয়ে গড়গড়ার নলে অম্বুরি তামাকের ধোঁয়া টানে আর আফিমের নেশায় মশগুল হয়ে মনে মনে গজরায়। আর অভিশাপ দেয় হাজি আহম্মদের বংশধরদের।

অনেকদিন পরে সেদিন নজর মহম্মদ এল। সারাফত আলির সামনে দিয়ে এল না। পেছনের দরজা দিয়ে এসে চুপিচুপি কান্তকে ডাকলে।

—কী রে নজর মহম্মদ?

—হুজুর, আপনাকে তলব দিয়েছে মরিয়ম বেগমসাহেবা!

এতদিন পরে মরালী তাকে ডেকে পাঠাবে তা ভাবতে পারেনি কান্ত।

বললে—মরিয়ম বেগমসাহেবা কি চেহেল্‌-সুতুনে আছে?

—জী হুজুর। ছুপিয়ে ছুপিয়ে আছে, কেউ পাত্তা জানে না।

কান্তর সমস্ত শরীরে আবার রোমাঞ্চ জেগে উঠলো। এতদিন লোকের কানা-ঘুষো থেকে শুনে আসছিল, মরিয়ম বেগম চেহেল্‌-সুতুনে নেই। কত কী বাজে কথা শুনে মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। কেউ বলতো—মরিয়ম বেগমসাহেবা একদিন নাকি শেষ রাত্রে মুর্শিদাবাদের গঙ্গার ঘাট থেকে বজরায় করে একলা চলে গিয়েছে। একজন নাকি আবার নিজের চোখে তা দেখেছে। আবার একটা গুজব উঠেছিল, কলকাতায় ক্লাইভ সাহেব নাকি মরিয়ম বেগমসাহেবাকে গ্রেফ্‌তার করে রেখেছে। কত রকম গুজব শুনতে শুনতে কান্তর মনটা খারাপ হয়ে যেত। কতদিন ভেবেছে কাউকে জিজ্ঞেস করবে। সচ্চরিত্র পুরকায়স্থ মশাইকে জিজ্ঞেস করলে হতো। কিন্তু মতিঝিলেও আর যখন-তখন যাকে-তাকে আগের মতন ঢুকতে দেওয়া হয় না। বশীর মিঞাকেও জিজ্ঞেস করতে ভয় হয়েছে। বিশ্বাস নেই কাউকেই। শুধু মনসুর আলি মেহের মোহরার সাহেবের দফ্‌তরে গিয়ে হাজরেটা দিয়ে এসেছে, আর ঠিক দিনে মাইনে নিয়ে এসেছে।

একটা ফরসা ধুতি পরে নিয়ে কান্ত বেরোল। নজর মহম্মদ বাইরেই অপেক্ষা করছিল। বাদ্‌শাকে ডেকে বললে—দেখ বাদ্‌শা, আমি একটু বেরোচ্ছি—

বাদ্‌শা বললে—কোথায়? কত দেরি হবে?

কান্ত বললে—তা বলতে পারি না। নিজামতের জরুরী তলব এসেছে। কোথায় যেতে হবে, কী কাজ তা তো আগে থেকে বলার নিয়ম নেই ওদের!

যেতে গিয়েও থামলো কান্ত। বললে—দেখ, আর একটা কথা। কেউ যদি আমার খোঁজ করে এখানে আসে তো তাকে যেন কিছু ব'লো না। ব'লো না যেন আমি কোথায় গেছি, কী কাজ করি, কোনো বৃত্তান্ত বলবার দরকার নেই—। আমি এখানে থাকি কিনা তাও বলবার দরকার নেই। নিজামতের কাছারিতে আজকাল বড্ড কড়াকড়ি করে দিয়েছে—

বাদ্‌শা বললে—ঠিক আছে—

মুর্শিদাবাদ চক্‌বাজারে তখন অন্ধকার বেশ জমে উঠেছে। নজর মহম্মদ এবার কোথা দিয়ে যে কোথায় নিয়ে চললো কিছু বোঝা গেল না।

—এদিকে কেন নজর মহম্মদ? সেই সোজা ফটক দিয়ে যাবে না?

নজর মহম্মদ বললে—মরিয়ম বেগমসাহেবা অন্য মহলে আছে—

শেষ পর্যন্ত যেখানে নিয়ে গিয়ে তুললো, সে এক আজব জায়গা, ঠাণ্ডা, নিরিবিলি। চেহেল্-সতুনের কোনো শব্দ সেখানে পেঁছোয় না। ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে নজর মহম্মদ বাইরে চলে গেল। মরালী সামনে দাঁড়িয়ে। চেহারাটা যেন বদলে গিয়েছে তার। সেই জৌলুস নেই।

মরালী বললে—কী দেখছো অমন করে? ব'সো।

কান্ত বসলো। বললে—আমি তোমার সম্বন্ধে অনেক কথা শুনেছি। সবাই বলছে, তোমাকে নাকি ক্লাইভ সাহেব গ্রেফ্‌তার করেছে, তাই নবাব রেগে গিয়ে ফিরিঙ্গীদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাচ্ছে—

মরালী বললে—সবাই তাই-ই জানে—

—কিন্তু নবাব? নবাবও কি তাই জানে?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু হঠাৎ এ গুজব রটলো কেন? আর তুমিই বা সকলকে লুকিয়ে এখানে এমন করে আছ কেন?

মরালী বললে—নবাবের বিপদের জন্যেই আমি এই পথ নিয়েছি। সবাই আমার জন্যে নবাবের সঙ্গে শত্রুতা করছিল। সবাই ভাবছিল নবাব বুঝি আমার কথায় উঠছে-বসছে। সবাই ভাবছিল আমিই বুঝি নবাবের চর। তাই নবাবের ভালোর জন্যেই আমি এখানে লুকিয়ে আছি। এখানকার কোনো বেগমরাও জানে না। নানীবেগম-সাহেবাও না। কেবল একজন জানে।

—কে? কে সে?

—তুমি চিনতে পারবে। যে তোমার সঙ্গে আমার বিয়ের সম্বন্ধ করেছিল, সেই ঘটক। সেই সচ্চরিত্র পুরকায়স্থ। সে এখন ইব্রাহিম খাঁ হয়ে গেছে মুসলমান হয়ে। মতিঝিলে মদের খেদ্‌মদ্ করে। সে একলাই কেবল আমার খবর জানে। আর জানে ওই নজর মহম্মদ—

কান্ত কিছু উত্তর দেবার আগেই মরালী বললে—যাক্ গে, যে জন্যে তোমায় ডেকেছি সেই কথাটা বলি—

কান্ত বললে—বলো—

—ওদিকে সর্বনাশ হয়েছে কলকাতায়।

বলে নিজের ওড়নীর ভেতর থেকে হাত গলিয়ে একটা চিঠি বার করলে।

তারপর বললে—এই চিঠিটা আমাকে লিখেছে ছোট বউরানী।

—ছোট বউরানী?

মরালী বললে—হ্যাঁ, সেই হাতিয়াগড়ের ছোটমশাই-এর দ্বিতীয় পক্ষের বউ যার জন্যে আমি এত কাণ্ড করেছি, সে। তার জন্যেই আমি নাম ভাঁড়িয়ে এই চেহেল্-সতুনে এসেছিলাম, তাকে বাঁচাবার জন্যেই আমি কল্‌মা পড়ে মুসলমান হয়েছি, তাকে রক্ষে করবার জন্যেই আমি মরিয়ম বেগম হয়েছি। অথচ তাকেই শেষ পর্যন্ত বাঁচাতে পারলুম না।

—কিন্তু এ চিঠি তোমার কাছে তিনি কী করে পাঠালেন?

—ওই ইব্রাহিম খাঁর হাত দিয়ে। ও হাতীদের রোজ নিয়ে যায় গঙ্গার ঘাটে নৌকো থেকে মদের পিপে নামিয়ে হাতীর পিঠে করে ও মতিঝিলে নিয়ে আসে তার হাতেই একজন দিয়ে গেছে আমাকে দেবার জন্যে—

কান্ত বললে—লোকটা সত্যিই ভালো—

মরালী বললে—ও তো জানে যে, ওর গন্ডগোলের জন্যেই অন্য একজন বুড়োর সঙ্গে আমার বিয়ে হয়ে গিয়েছিল, তাই মনে মনে খুব দুঃখ করে। বলে—আমার দোষেই তোমার এমন কপাল হলো মা। তা সে যা হোক, এখন ছোট বউরানীকে যেমন করে হোক বাঁচাতেই হবে—

—ছোট বউরানীর কী হয়েছে?

মরালী বললে—আগে শুনেছিলাম যে, ছোট বউরানী ফিরিঙ্গীদের বাগান-বাড়িতে আছে। তখন বিশ্বাস হয়নি। সেই দেখবার জন্যেই একবার ক্লাইভ সাহেবের পেরিন সাহেবের বাগানেও গিয়েছিলাম। কিন্তু সেবার তো সেই উমিচাঁদের হাতের লেখা চিঠিটা পেয়ে কেলেঙ্কারি কান্ড হয়ে গিয়েছিল—এবার আর এক কান্ড!

—কী?

—এবার ভুল করে ফিরিঙ্গীরা ওকে ভেবেছে মরিয়ম বেগম। নৌকো করে দুর্গ্যা আর ছোট বউরানী কেষ্টনগরের দিকে যাচ্ছিল মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের কাছে। পথে ফিরিঙ্গী সাহেবরা ওকে মরিয়ম বেগম মনে করে গ্রেফ্‌তার করে রেখেছে। কোনো উপায় না পেয়ে আমার কাছে দরবার করেছে। আমি যেমন করে হোক ওদের যেন নবাবকে বলে বাঁচাই—

—নবাবকে বলেছো?

—নবাবকে এই অবস্থায় কী করে বলবো? এখন তো ফিরিঙ্গীদের সঙ্গে নবাবের যুদ্ধ লাগে-লাগে!

—তা হলে কী করবে?

মরালী বললে—সেই কথা বলতেই তো তোমাকে ডেকেছি। ঠিক করেছি আমিই ফিরিঙ্গী কোম্পানীর সাহেবদের কাছে যাবো। গিয়ে বলবো, ওদের ছেড়ে দাও, ও মরিয়ম বেগম নয়, আমিই মরিয়ম বেগম—

—কিন্তু তখন যদি তোমাকে আবার ধরে রাখে?

মরালী বললে—তা তো ধরে রাখবেই—এমন সুযোগ পেয়ে কি আর ছাড়বে! আমি ওদের কত ফন্দি ফাঁস করে দিয়েছি। আমাকে পেলে তো টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলবে!

কান্ত কী বলবে বুঝতে পারলে না। মরালীর মুখখানার দিকে চেয়ে দেখতে লাগলো। মুখখানা অনেকদিন পরে দেখছে কান্ত। শুকিয়ে গেছে চেহারাটা একেবারে। তাই প্রতিবাদ করবার কথাও তার মনে এল না। আর যখন কখনো মরালীর কথার প্রতিবাদ করেনি তখন এই কথাতেই বা প্রতিবাদ করবে কেন এখন?

মরালী বললে—তোমাকেও আমার সঙ্গে যেতে হবে। এই জন্যেই তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছি। চলো—

ওদিকে তখন সারাফত আলির খুশ্‌বু তেলের দোকানের সামনে একজন ভদ্রলোক এসে জিজ্ঞেস করলে—এটা সারাফত আলি সাহেবের খুশ্‌বু তেলের দোকান?

সারাফত আলি নিজে তখন নেশায় মশ্‌গুল। কিছু উত্তর দিলে না।

বাদ্‌শা পাশ থেকে উত্তর দিলে হ্যাঁ—কী চাই আপনার?

—এখানে কান্ত নামে কোনো বাবু থাকে?

সারাফত আলির নেশা এতক্ষণে বুঝি হঠাৎ ভেঙে গেল। জিজ্ঞেস করলে—কৌন? হাজি আহম্মদ?

কোথাকার কোন হাজি আহম্মদ, তারই বুঝি ধ্যান হচ্ছে তখন মনে মনে। হাজি আহম্মদ কবে মরে গিয়ে জাহান্নমে চলে গিয়েছে, হাজি আহম্মদের ভাই আলীবর্দী খাঁও কবে মরে গিয়েছে। তবু মরে গিয়েও তারা যেন সারাফত আলিকে যন্ত্রণা দিচ্ছে দিন-রাত। এখনো বুঝি সারাফত আলি সে-কথা ভুলতে পারেনি। সারা দোকান-ঘর আগরবাতি আর তামাকের ধোঁয়ায় ঢেকে আফিমের মৌতাতে সেই দুষমনদের কবর থেকে তুলে এনে যেন নতুন করে খুন না করলে বুড়োর তৃপ্তি হবে না। কান্তকে একদিন যে সারাফত আলি নিজের কাছে আশ্রয় দিয়েছে, সেও তো সেই মতলবেই। নিজে বুড়ো হয়ে গিয়েছে। চোখের তেজ নেই, হাতের পেশীতে সে জোর নেই। শুধু আছে বদ্‌লা নেবার অন্ধ জিদ। কান্তকে বুড়ো বলতো—আর কত দেরি রে? ঔর কিত্‌না দের হ্যায় তেরা?

শুধু কান্ত কেন, কান্তর মতন আরো অনেক ছোকরাকে বাড়িতে রেখেছে, খাইয়েছে-দাইয়েছে আর নিজের মতলব সিদ্ধির স্বপ্ন দেখেছে। কিন্তু এক-এক সময় বুড়ো হতাশ হয়ে পড়ে। আর বোধ হয় দেখে যেতে পারলে না। হাজি আহম্মদের বংশের পতন দেখা আর বুঝি তার কপালে নেই।

কান্ত বলতো—চেষ্টা করছি তো সাহেব, চেষ্টার কসুর নেই—

—লেকিন্ ওই মরিয়ম বেগমকা সাথ তেরা জান-পছান থা? ও বেগম শালী নবাবকে মদত্ দেয় কেন?

কান্ত প্রতিবাদ করতো—কে বললে মদত্ দেয়, সাহেব?

—সব্বাই বলে! সবাই তো বলে হাজি আহম্মদের পোতা মরিয়ম বেগমের কথায় নড়ে-বসে।

কান্ত বলে—আপনি ভুল শুনেছেন জনাব!

—আমি ভুল শুনেছি?

নিজের বার্ধক্যের কথা শুনলেই ক্ষেপে যায় সারাফত আলি। নিজে জানে বুড়ো হয়ে গেছে সে, কিন্তু লোকে সে-কথা বললেই দোষ। বলে—আমি ভুল শুনেছি? আমার কান কালা হয়ে গেছে? আমি কি বুড়ো হয়ে গেছি বেত্তমিজ? আমি বেওকুফ?

তারপর সেই নেশার ঘোরেই বুড়ো খাস আফগানী ভাষায় গালাগালির বন্যা বইয়ে দেয়। সে ভাষা কান্ত বুঝতে পারে না। বুঝতে না পারলেও কান্তর রাগ হয় না। বুড়ো মানুষের কথায় রাগ করতে নেই। কবে একদিন কোন্ হাজি আহম্মদ সারাফত আলির চরম সর্বনাশ করে গিয়েছে, সে ঘা তখনো শুকোয়নি। সেই ঘায়ের যন্ত্রণায় তখনো সারাফত আলি ছটফট করে, আর যত ছটফট করে তত আফিম খায়, তত আগরবাতি জ্বালায়, তত তামাক টানে। টানতে টানতে যখন ধোঁয়ায় সমস্ত দোকান, সমস্ত স্মৃতি আচ্ছন্ন হয়, তখন আর কাউকে চিনতে পারে না। অন্য লোককেও চিনতে পারে না, নিজেকেও চিনতে পারে না। তখন শুধু ঝাপ্‌সা ঝাপ্‌সা একটা নাম মনে থাকে। সে হাজি আহম্মদ। কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে ভাবে বুঝি হাজি আহম্মদের কথাই জিজ্ঞেস করছে।

ছোটমশাই বড় মুশকিলে পড়লো।

বললে—এখানে কান্ত বলে কেউ থাকে না?

বাদ্শো সামনে এগিয়ে এসে বললে—না জনাব, ও নামে কেউ থাকে না এখানে। এ সারাফত আলি সাহেবের খুশ্বু তেলের দোকান। ইঁহা খুশ্বু তেল মিলতি হ্যায়—আপ কৌন?

ছোটমশাই কী করবে বুঝতে পারলে না। এত আশা করে এসেছিল। তবে কি ভুল ঠিকানা শুনেছে জগৎশেঠজী? আরো অনেক কথা জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হলো। জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হলো পাশের দোকানেও কোনো হিন্দু ছেলে থাকে কি না ওই নামে। কিন্তু যে-রকম হাল-চাল তা দেখে আর ভরসা হলো না। রাত তখন অনেক হয়েছে। ছোটমশাই আস্তে আস্তে সেখান থেকে পা বাড়ালো।

অবস্থা যত সঙ্গীন হয় ক্লাইভ সাহেবের মাথা তত খোলে। সংসারে এক-একজন লোক থাকে যারা বিপদ ঝঞ্ঝাট ঝামেলার মধ্যেই নিজের ক্ষমতার বিকাশ দেখাতে পারে। যত ঝঞ্ঝাট আসে ততই যেন তারা ঝঞ্ঝাটের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে আনন্দ পায়। মীরজাফর খাঁকে একটার পর একটা চিঠি দিয়ে আসছে। কিন্তু অনেক দিন পরে একখানা চিঠি মাত্র এল।

মীরজাফর খাঁ লিখেছে—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি যদিও নবাবকে কোরাণ ছুঁয়ে কথা দিয়েছি যে, আমি ইংরেজদের কোনো রকম সাহায্য করবো না, কিন্তু আপনি জেনে রাখুন, আপনাদের সঙ্গে যে সন্ধিপত্রে সই দিয়েছি, এখনো তা স্বীকার করছি। সেইটিই আমার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত।

কিন্তু শেষ মুহূর্তে উমিচাঁদ এসে হাজির হলো।

উমিচাঁদের মুখের চেহারা দেখে ক্লাইভ সাহেবের কেমন যেন সন্দেহ হলো। তবু মুখে হাসি এনে বললে—কী খবর, উমিচাঁদ সাহেব?

পাশেই ওয়াটস্ সাহেব দাঁড়িয়ে ছিল।

উমিচাঁদ বললে—আপনাদের জন্যে যা করে এলুম, তার জন্যে চিরকাল কোম্পানীর সিলেক্ট কমিটি আমাকে মনে করে রাখবে—

—কী করেছেন?

উমিচাঁদ বললে—এই ওয়াটস্ সাহেবকেই জিজ্ঞেস করুন। আমার নিজের মুখে বললে সেটা অহঙ্কারের মত শোনাবে!

ক্লাইভ বললে—তবু আপনি বলুন, আপনাকে আমি এতদিন বিশ্বাস করে সব কথা বলে এসেছি, এখনো বিশ্বাস করছি—

উমিচাঁদ সাহেব হেসে উঠলো। বড় সর্বনেশে সে হাসি। ক্লাইভ সাহেবের মনে পড়লো, ঠিক এই রকম হাসিই শুনেছিল উমিচাঁদের মুখে যেদিন প্রথম ক্লাইভ সাহেব উমিচাঁদের বাড়ি গিয়েছিল দরবার করতে।

উমিচাঁদ বললে—আমরা কারবারী মানুষ সাহেব, আমরা বিশ্বাস-টিশ্বাস বুঝি না।

—তার মানে?

উমিচাঁদ বললে—এখানে এই বজরায় বসে তা বলা যায় না। একটু নিরিবিলি দরকার, আমার হালসীবাগানের বাড়িতে চলুন, একেবারে পাকা বন্দোবস্ত করে ফেলি।

—কীসের পাকা বন্দোবস্ত?

—বিশ্বাসের।

তবু ক্লাইভ সাহেব কিছু বুঝতে পারলে না।

উমিচাঁদ বললে—যেখানে হোক চলুন, হয় আমার বাড়িতে নয় আপনার পেরিন সাহেবের বাগান-বাড়ির দফ্তরে।

এতক্ষণে কথার মানেটা ক্লাইভ সাহেবের মাথায় ঢুকলো। দি স্কাউণ্ড্রেল! এই মাত্র বাগান-বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছে। সবাইকে আগে পাঠিয়ে দিয়ে নিজে শুধু একলা চলেছে। ঠিক এই সময়েই আবার ফিরে যেতে হবে! তবু মুখে কিছু বললে না ক্লাইভ। হাসতে হাসতে শুধু বললে—অল্ রাইট্—

ওয়াটস্ বললে—কিন্তু মরিয়ম বেগমসাহেবার কী হবে কর্নেল?

মরিয়ম বেগম! একটার পর একটা প্রব্লেম্ যেন ক্লাইভকে উন্মাদ করে দেবে। জুন মাসের রাত। একটু পরেই বোধ হয় ঝড়-বৃষ্টি আসবে। ওদিককার সমস্ত আকাশটা ডার্ক হয়ে গেছে। ক্লাইভ সেই দিকে একবার দেখে নিয়ে বললে—মরিয়ম বেগমের সঙ্গে কে আছে?

—একজন বাঁদী! পাছে ধরা পড়ে যায় বলে হিন্দু লেডীর ছদ্মবেশে রয়েছে।

—বজরার মাঝি-মাল্লারা? তারা কোথায়?

—তারা ফাইট করতে আসছিল, কিন্তু আমরা তাদের মুখ বন্ধ করে বেঁধে জলে ডুবিয়ে দিয়েছি। দে আর অল্ ডেড্! কাউকে কথা বলতে দিইনি!

ক্লাইভ সাহেব অবাক হলো—সে কী?

উমিচাঁদ বললে—ঠিকই করেছি সাহেব। তাদের না মেরে ফেললে নবাবের কানে পৌঁছে যেত কথাটা! এতে ভালোই হলো, কেউ আর জানতে পারবে না।

—কিন্তু মরিয়ম বেগমকে এখন ধরে রাখা কি ঠিক হবে? বেগম নিয়ে আমাদের কী কনসার্ন?

ওয়াটস্ বললে—এই মরিয়ম বেগমই তো আমাদের সব কথা জেনে ফেলেছে স্যার; রাত্রে জগৎশেঠজীর বাড়িতে এই বেগমসাহেবাই তো গিয়েছিল। এই-ই সব কথা জানিয়ে দিয়েছে। নইলে তো কারো জানবার কথা নয়!

—ওকে নিয়ে এখন কী করবো? কোথায় রাখবো?

উমিচাঁদ বললে—কেন, আপনার বাগানে তো আরো একজন হিন্দু লেডী আছে, তার সঙ্গে একেও রেখে দিন। একটা ঘরে হিন্দু লেডী থাকবে, আর একটা ঘরে মুসলমান লেডী থাকবে।

ক্লাইভ বললে—না, তারা নেই, সেই হিন্দু লেডী চলে গেছে—

—সে কী? তাড়িয়ে দিয়েছেন তাদের? ভালোই করেছেন। মেয়েমানুষ যদি রাখতেই হয় সাহেব, তা বেশ ভালো মেয়েমানুষ রাখবেন। যে ফুর্তি করতে জানে, ফুর্তি দিতে জানে, সেই তো মেয়েমানুষ!

ক্লাইভ উমিচাঁদের কথা শুনে রেগে গেল। বললে—উমিচাঁদ, তোমার কাছে মেয়েমানুষ সম্বন্ধে আমি আইডিয়া নিতে চাই না। আমি অনেক দিন ইণ্ডিয়াতে আছি, ইণ্ডিয়ান ওম্যান আমি চিনি—

—এই দেখুন, আপনি রেগে যাচ্ছেন। আপনার এই তো দোষ!

—স্টপ্ দ্যাট্ টপিক—ও সম্বন্ধে আর কোনো কথা শুনতে চাই না আমি, অন্য কথা বলো—

তারপর মাঝিদের দিকে ফিরে বললে—পেরিন সাহেবের বাগানের দিকে বজরা ঘোরাও।

ইতিহাসের সে এক কুটিল সন্ধিক্ষণ! হিন্দুস্থানের মানুষ যখন সবাই নিজের নিজের স্বার্থচিন্তার আফিম খেয়ে নেশায় আচ্ছন্ন তখন ভূগোলের এক কোণে এক জলাভূমির রঙ্গমঞ্চে বিদেশ থেকে আসা আর-একদল মানুষ নিঃশব্দে আর-এক ইতিহাস, আর-এক ভূগোল রচনা করবার আগ্রহে আর-এক মতলব আঁটছে। তাদের কাছে কষ্ট কোনো কষ্টই নয়, বিশ্রাম ঘুম স্বাস্থ্য তাদের কাছে শুধু অভিধানের শব্দাবলী! ও কথাগুলো শুধু অভিধানে লেখাই থাক। যেদিন এম্‌পায়ার হবে সেদিনকার জন্যে ওগুলো মুলতুবী রইলো। এই মশা মাছি, এই সাপ জোঁক, এই বিছে মাকড়শা, এই শীত গ্রীষ্ম সেদিন সুদে-আসলে মিলে সোনা-হীরে-জহরত হয়ে উসুল হয়ে যাবে। তখন সবাই বলবে—দি সান্‌ নেভার সেটস্‌ ইন ব্রিটিশ এম্‌পায়ার। সূর্য কখনো অস্ত যায় না ব্রিটিশ এম্‌পায়ারে। এর পর আছে আরব, আফ্রিকা, বর্মা, সিলোন, ইজিপ্ট, মেসোপোটেমিয়া। আমেরিকা হাতছাড়া হয়ে গিয়ে যা লোকসান হয়েছে তা পূরণ হয়ে যাবে ইণ্ডিয়ান এম্পায়ার করে।

আবার সেই পেরিন সাহেবের বাগান। যেখানে যত সেপাই-সোলজার-ফৌজ ছিল চলে গেছে। ফাঁকা হয়ে গেছে কলকাতার ফোর্ট, ফাঁকা হয়ে গেছে পেরিন সাহেবের বাগান। শুধু ওয়ান হান্‌ড্রেড সোলজার রাখা হয়েছে চন্দননগরের ফোর্ট গার্ড দেবার জন্যে। তবু দু-একজন যারা ছিল পেরিন সাহেবের বাগান তদারক করবার জন্যে, তাদের আবার ডাক পড়লো। তারা এসে আবার গেট খুলে দিলে। দফ্‌তরের দরজা খুলে দিলে।

—মরিয়ম বেগমকে কোথায় রাখলে?

—হুজুর, যেখানে আগে জেনানারা ছিল, সেখানেই রেখে দিয়েছি।

ওয়াটস্‌ নিজে তদারক করে এসেছিল। বললে—দরজা বন্ধ করে দিয়ে এসেছি কর্নেল, খুব কাঁদছিল—

—খুব কাঁদছিল?

ওয়াটস্‌ বললে—হ্যাঁ কর্নেল, বলছিল আমি মরিয়ম বেগম নই, আমি মরিয়ম বেগম নই—

উমিচাঁদ বললে—তখন থেকেই ওরা বলছে আমি মরিয়ম বেগম নই—। ভাবতে পারেনি এমন করে ধরা পড়ে যাবে, তাই ওই বলে ছাড়া পেতে চাইছে—

ক্লাইভ উমিচাঁদের দিকে চেয়ে বললে—তোমাকে চিনতে পেরেছে নাকি?

উমিচাঁদ বললে—আমাকে কে না চেনে সাহেব! কিন্তু আমি তাতে পরোয়া করি না। আপনি ভয় করতে পারেন, ওয়াটসন্‌ ভয় করতে পারেন, আমি হলাম কারবারী লোক, আমি জানি প্রাণের চেয়ে কারবার বড়ো! আপনাদের সঙ্গে যখন কারবার করতে বসেছি তখন সব কিছু জেনেশুনেই করেছি—

ক্লাইভের তবু ভাবনা গেল না। বললে—কিন্তু ওদের খাবার বন্দোবস্ত করেছো?

ওয়াটস্‌ বললে—ইয়েস কর্নেল, ল্যাসিংটন ছিল, ওকে বলেছি—

—ডাকো একবার ল্যাসিংটনকে এখানে—

ওয়াটস্‌ ল্যাসিংটনকে ডেকে আনলে ঘরের ভেতরে। ল্যাসিংটন ভেতরে

আসতেই ক্লাইভ জিজ্ঞেস করলে—কী অ্যারেঞ্জমেন্ট করেছো ওদের খাওয়ার?

—ওরা খেতে চাইছে না স্যার, দে' আর ক্লাইং। ওরা বলছে ক্লাইভ সাহেবকে ডেকে দাও।

উমিচাঁদ বললে—আপনি যাবেন না সাহেব। একবার ওরা আপনাকে ঠকিয়ে চিঠি চুরি করে নিয়েছিল, এবারও আবার সেই মতলব করেছে—

ল্যাসিংটন আবার বললে—ওরা বলছে আপনি নাকি ওদের চেনেন—

উমিচাঁদ বললে—নিশ্চয়ই চেনেন সাহেব। খুব ভালো করেই চেনেন!

তারপর ক্লাইভের দিকে ফিরে বললে—ও নিয়ে আর সময় নষ্ট করা উচিত নয় সাহেব, আপনাকেও যেতে হবে, আমাকেও যেতে হবে। আমিও সোজা মুর্শিদাবাদ থেকে আসছি, আমাকেও বাড়ি যেতে হবে, অনেক কাজ পড়ে আছে সেখানে—

ক্লাইভ ল্যাসিংটনের দিকে চেয়ে বললে—ঠিক আছে, তুমি যাও, ওদের কোনো কথায় কান দিও না তুমি, দরজা বন্ধ করে রাখবে সব সময়, দিনরাত পাহারার বন্দোবস্ত করবে—

ল্যাসিংটন চলে গেল।

ক্লাইভ উমিচাঁদের দিকে ফিরে বললে—বলো, তুমি কী বলছিলে?

উমিচাঁদ বললে—যা বলবার আমি তাড়াতাড়ি বলবো সাহেব। আমি বলেইছি তো আপনাকে যে আমি কারবারী লোক, কাজ ছাড়া আমি আর কিছু বুঝি না। আমি আপনাদের জন্য কী কী কাজ এতদিন করেছি তা আপনারা জানেন। নবাবও জানে, নবাবের জন্য আমি কী কী করেছি। আজ যে চন্দননগর আপনারা দখল করে বসে আছেন, তা আমার জন্যে, এ-কথা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন। আজ যে মীরজাফর সাহেবের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া হয়েছে তাও এই উমিচাঁদের জন্যে। এও জানেন যে এই উমিচাঁদ আপনাদের সহায় না-হলে আপনারা এই কলকাতায় কল্‌কে পেতেন না। পাততাড়ি গুটিয়ে আবার ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যেতে হতো—আর এও জানেন যে, এতদিন যে নবাব রেগে গিয়ে আপনাদের ভিটে-ছাড়া করেনি এও আমার জন্যে!

ক্লাইভ বললে—অত কথা শোনবার সময় নেই। কী করতে হবে তাই বলো—

উমিচাঁদ বললে—সেই কথা বলবার জন্যই তো আপনাকে এখানে ডেকে আনলুম। আপনার মতন আমারও তো সময়ের দাম আছে! আমাকে তো কারবার করেই পেট চালাতে হয়!

—বলো আমাকে কী করতে হবে?

উমিচাঁদ বললে—দেখুন, যদি ইয়ার লুৎফ খাঁর সঙ্গে আপনারা বোঝাপড়া করতেন তো আমি কিছু বলতুম না। আপনারা মীরজাফরকেই পছন্দ করলেন। যা হোক, সে যা করে ফেলেছেন, ফেলেছেন; আমার কিছু বলবার নেই। এখন নবাব হবার পর মীরজাফর সাহেব আপনাদের যে টাকা দেবে বলেছে, তার থেকে আমার কিছু ভাগ চাই—

—তোমার ভাগ চাই!

উমিচাঁদ বললে—বেশি না, যা টাকা পাবেন তার শতকরা পাঁচ টাকা।

ক্লাইভ কথাটা শুনে গুম হয়ে বসে রইলো। উমিচাঁদের কথায় এতদূর এগিয়ে শেষকালে কি পেছিয়ে যেতে হবে নাকি। নবাবকে চিঠি লেখা হয়ে গেছে। ইংরেজ-ফৌজ মুর্শিদাবাদের দিকে যাচ্ছে, ফৌজ-কামান সেপাই-সৈন্যসামন্ত সব কিছু চলে গেছে। শুধু ক্লাইভের নিজের যেতে কিছু বাকি। এতদিন উমিচাঁদই তো বুঝিয়েছে

যে, সে ইংরেজের দলে। এতদিন উমিচাঁদই তো তাদের খুঁচিয়ে তুলেছে। বলেছে সমস্ত আমীর-ওমরাহ্ সবাই নবাবের ধ্বংস চায়। জগৎশেঠকে তাদের দলে এনেছে এই উমিচাঁদই তো। এই উমিচাঁদের ঘরেই গুরু নানকের ছবিকে ধূপ-ধুনো দিয়ে পুজো করা হয়। এই উমিচাঁদই ফলতায় তাদের চাল-ডাল-ঘি বিক্রি করে মোটা প্রফিট করেছে। এরা ঠিক শেষ মুহূর্তে আসে। এই উমিচাঁদ, এই নন্দকুমার, এই নবকৃষ্ণের দল। যত দিন যাচ্ছে ততই যেন ক্লাইভ অবাক হয়ে যাচ্ছে এই ইণ্ডিয়ানদের দেখে। সাধারণ রাস্তার মানুষ, গ্রামের চাষাভুষোরা তো এমন নয়। তারা কতবার তামাক খাইয়েছে ক্লাইভকে। তাদের বাড়ির দাওয়ার ওপর বসিয়ে সুখদুঃখের গল্প বলেছে। তারা জানে না—কে উমিচাঁদ, কে জগৎশেঠ, কে মীরজাফর। তারা তো খবরও রাখে না, কে তাদের নবাব আর কে তাদের বাদশা। তারা রামপ্রসাদের গান শুনেছে, হরির নাম শুনেছে, কৃষ্ণের নাম শুনেছে, রাধার নাম শুনেছে। ঘেঁটু, লক্ষ্মী, সরস্বতী, মনসা, শীতলার নামও শুনেছে। আর এই উমিচাঁদের দল, এরাই তাদের লোভ দেখিয়ে ভয় দেখিয়ে উমিচাঁদ জগৎশেঠ হয়ে বসেছে।

—পাঁচ পার্সেণ্ট শুনেই চমকে উঠলেন নাকি সাহেব?

এতক্ষণে যেন ক্লাইভ সাহেবের জ্ঞান ফিরে এল। কিন্তু উমিচাঁদ জানে না যে, ক্লাইভ যদি উমিচাঁদের চালাকি ধরতে না পারবে তো সেণ্ট ফোর্ট ডেভিডের কম্যাণ্ডার সে মিছিমিছি হয়েছিল। হাজার হাজার লাখ লাখ উমিচাঁদদের জব্দ করবার ক্ষমতা নিয়েই সে ইণ্ডিয়ায় এসেছে, এ-কথাও উমিচাঁদ হয়তো ঠাহর করতে পারেনি।

—পাঁচ পার্সেণ্ট হলে আমার পাওনা হয় তিরিশ লাখ টাকা মাত্র! তিরিশ লাখ টাকা এমন কিছু বেশি না।

রাত গভীর হয়ে আসছে। সমস্ত প্রোগ্রাম নষ্ট করে দিয়েছে উমিচাঁদ। তবু ক্লাইভ সাহেব মুখে হাসি ফুটিয়ে উমিচাঁদের দিকে চেয়ে রয়েছে।

বললে—আর?

উমিচাঁদ বললে—আর নবাবের সিন্দুকে যা গয়নাগাঁটি পাওয়া যাবে তার চার ভাগের এক ভাগ আমায় দিতে হবে। বাকি তিন ভাগ আপনারা যে-কেউ নিতে পারেন, আমি কিছু বলতে যাবো না—

—আর?

উমিচাঁদ বললে—আর মানে?

—আর কী চাও তাই জিজ্ঞেস করছি। কারণ সব জিনিসটা আগে থেকে বোঝাপড়া হয়ে থাকা ভালো। আমি চাই না, শেষে কিছু মিস-আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং হোক—

উমিচাঁদ বললে—আমিও তাই চাই না সাহেব। সেই জন্যেই তো সব খোলাখুলি বললুম। আপনি শেষকালে বলবেন যে উমিচাঁদ বেটা আমাকে ঠকিয়ে নিলে—

—কিন্তু আমি তিরিশ লাখ টাকা দিতে পারবো না।

—কত দেবেন?

ক্লাইভ বললে—বলবো?

উমিচাঁদ বললে—বলুন, মন খুলে বলুন। আপনার সঙ্গে আমার লুকোচুরি নেই। আমি কারবারী মানুষ, সোজা কথার ভক্ত, ঘোরপ্যাঁচ বুঝি না—

ক্লাইভ বললে—আমি তিরিশ লাখ টাকা দিতে পারবো না—

—কিন্তু দেবেন কত তাই বলুন!

ক্লাইভ বললে—লেখা-পড়া যখন হচ্ছে তখন পাকাপাকি বন্দোবস্ত হয়ে যাওয়াই ভালো। আমি বিশ লাখ টাকা পর্যন্ত দিতে পারি—রাজি?

উমিচাঁদ ভাবতে লাগলো। ক্লাইভও মনে মনে তখন হিসেব করছে। পঞ্চাশ লাখ দিতে হবে ইংরেজ ব্যবসাদারদের। সেবারের লড়াইতে যাদের লোকসান হয়েছে। আরম্যানিয়ানদের দিতে হবে দশ লাখ টাকা। তারপর আর্মি আর নেভির জন্যে পঁচিশ-পঁচিশ করে পঞ্চাশ লাখ। যারা নেটিভ কারবারী তাদেরও ক্ষতি হয়েছিল। আগুন লেগে ঘর-বাড়ি সব পুড়ে গিয়েছিল। তাদের অন্তত কুড়ি-তিরিশ লাখ টাকা দিতে হবে। আর কোম্পানির জন্যে এক কোটি টাকা তো বরাদ্দ আছেই। এর থেকে তিরিশ লাখ টাকা দিতে হবে উমিচাঁদকে। টাকা দিতে আপত্তি নেই, কিন্তু তিরিশ লাখ টাকা চাইলেই সে-টাকা দিতে রাজি হলে সন্দেহ হতে পারে। তাই একটু দর-কষাকষি করা ভালো।

বললে—বলুন বিশ লাখ টাকা হলে রাজি কি না?

উমিচাঁদ অনেক ভেবে অনিচ্ছের সঙ্গে বললে—ঠিক আছে, বিশ লাখেই রাজি—সেই কথাই রইলো। কিন্তু লেখাপড়া? জানেন তো সাহেব, আমি কারবারী লোক, লেখাপড়া সই-সাবুদ করা দলিল চাই, তাতে আপনাদের সইও থাকবে আর আমিও সই করবো। নইলে যখন কাজ খতম্ হয়ে যাবে তখন বলবেন, টাকা দেবার কথা ছিল না—

ক্লাইভ বললে—না না, সে-রকম কথা বলবো না, তুমি আমাদের গোড়া থেকে সাহায্য করে আসছো, আমরা অত আনগ্রেটফুল নই। তবু তুমি যখন বলছো তখন দলিলই তৈরি হবে—

—বেশ, তাই ভালো।

—কিন্তু আজকে এখন তো হবে না। কাল হতে পারে। আজ আমি এখনই যাচ্ছি, সব বন্দোবস্ত ঠিক করে ভোরবেলা তোমার বাড়িতে সব পেপার নিয়ে যাবো।

উমিচাঁদ বললে—আপনাদের সকলের সই চাই কিন্তু—আপনি, ওয়াটসন্, ড্রেক, ওয়াটস্, মেজর কিল্‌প্যাট্রিক, বীচার—সকলের। মীরজাফরের সঙ্গে ঠিক যেমন-যেমন দলিল হয়েছে, যারা-যারা সই করেছে তাতে, তাদের সকলের সই থাকা চাই—

—ঠিক আছে, ওই কথাই রইলো।

উমিচাঁদ খুশি হয়ে চলে গেল। ওয়াটস্ এতক্ষণ চুপ করে ছিল।

বললে—কর্নেল, ভালোই করেছেন রাজি হয়ে। টাকা না দিলে উমিচাঁদ সাহেব সব বলে দিত নবাবকে—তাতে মীরজাফর সাহেবেরও বিপদ হতো, মীরজাফর সাহেব হয়তো ভয়ে শেষ পর্যন্ত পেছিয়ে যেত—

ক্লাইভ বললে—না—আমি টাকা দেবো না—

—তার মানে? আপনি কথা দিলেন টাকা দেবেন, কুড়ি লাখ টাকা দেবেন, কন্‌ট্র্যাক্ট সই করে দেবেন!

—তা হোক, আমি কথা রাখবো না। স্কাউণ্ড্রেলটাকে আমি ভালো শিক্ষা দেবো—আই শ্যাল টিচ্ হিম্ এ লেসন্।

বলে উঠে দাঁড়ালো ক্লাইভ। শেষ মুহূর্তে প্যাঁচ কষে কিছু টাকা আদায় করে নিতে চায় স্কাউণ্ড্রেলটা। সুতরাং ক্লাইভও প্যাঁচ কষবে।

ওয়াটস্‌কে বললে—চলো, লেট্ আস্ গো—

—কোথায়?

ক্লাইভ বললে—এখনো বোধ হয় ওরা আছে, এর পরে হয়তো সবাই চলে যাবে—আর দেরি করলে চলবে না।

পেরিন সাহেবের বাগানে তখন অন্ধকার ঝিম-ঝিম করছে। ক্লাইভ আর ওয়াটস্ বাগানের গেট পেরিয়ে বাইরে এসে দাঁড়ালো। বড় বড় গাছগুলোর মাথায় কয়েকটা বাদুড় পাখা-ঝাপটানি দিচ্ছে। অনেক ভাবনার বোঝা নিয়ে ইতিহাস আপনার হাতে লিখে চলেছে একটা পরিচ্ছেদের পর আর একটা নতুন পরিচ্ছেদ। সৎ-অসৎ, ন্যায়-অন্যায়, উত্থান-পতনের ঢেউ আছড়ে পড়ছে বার বার। এবার ইণ্ডিয়ার পালা। তোমরা অনেকদিন আমাকে অস্বীকার করেছো, আমাকে অবহেলা করেছো, আমি তোমাদের কিছু বলিনি। তোমরা একবার বলেছো ভগবান আছে, একবার বলেছো ভগবান নেই। তোমরা একবার পরকালে বিশ্বাস করেছো, একবার ইহকালে। আলেকজাণ্ডার যে সমরকন্দের সিংহাসনে বসে একদিন সেকেন্দার বাদশা নামে বিখ্যাত হয়েছিল, সেই সিংহাসনে একদিন তৈমুর আর তার বংশধর বাবর বসেছিল। সিংহাসন তো চিরকাল কারো একচেটিয়া থাকে না। একশ' দশ বছরের এক বুড়ির মুখে হিন্দুস্থানের কথা প্রথম শুনেছিল বাবর। শুনেছিল, ১৩৯৮ সালে কেমন করে তৈমুর হিন্দুস্থান দখল করেছিল। তখন থেকেই এ-দেশে আসবার আগ্রহ হয়েছিল সেই ছেলেটার। একদিন যখন বাবর দিল্লীর সিংহাসনে বসলো, ওদিকে বাঙলা দেশে তখন আর-একজন আর-এক সিংহাসন দখল করে বসেছে। সে শ্রীচৈতন্যদেব মহাপ্রভু। হিন্দুস্থানের ইতিহাস এই সিংহাসন বদলেরই ইতিহাস। সিংহাসন যখন বদলেছে তখন উমিচাঁদের দল এমনি করেই দলিল সই-সাবুদ করে পাকা বন্দোবস্ত করে নিতে চেয়েছে। কিন্তু ভারত-ভাগ্য-বিধাতার বিধানে একদিন সব দলিল, সব সই, সব বন্দোবস্ত আবার বানচাল হয়ে গিয়েছে।

—স্যার!

পেছন থেকে হঠাৎ ল্যাসিংটনের গলা পেয়ে ক্লাইভ ফিরে দাঁড়ালো।

—কী?

ল্যাসিংটন বাগান পেরিয়ে গেটের বাইরে এসে বললে—আপনি চলে যাচ্ছেন?

—কেন? কিছু বলবে?

ল্যাসিংটন বললে—মরিয়ম বেগম আর তার বাঁদীটা আপনাকে ডাকছে। বলছে আপনার সঙ্গে একবার কথা বলবে।

—কী কথা?

—তা বলছে না।

ক্লাইভ বললে—বলো, এখন আমার সময় নেই কথা বলবার। আমি কাল ভোরেই মুর্শিদাবাদ যাচ্ছি, সেখান থেকে ফিরে এসে কথা বলবো—

—কিন্তু ওরা কিছু খাচ্ছে না, না খেয়ে থাকলে যে মারা যাবে।

ক্লাইভ বললে—মারা যায় যাক্। মরিয়ম বেগম মারা গেলে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কোনো লোকসান হবে না—

বলে সোজা অন্ধকারের মধ্যেই পা বাড়িয়ে দিলে।

উমিচাঁদ নিজের বাড়িতে গিয়ে প্রথমেই হিসেবের খাতা বার করে বসলো। মোহর টাকা জমি সম্পত্তি কারবার সব সেই খাতায় লেখা থাকে। নিখুঁত হিসেব। গুরু নানকের শিষ্য মাথার ওপর গুরুর পট টাঙিয়ে রেখে হিসেব লেখে। হিসেবের

মজা বড় মজা। একের পরে একটা শূন্য বসালেই দশ হয়ে যায়। তারপর আর একটা শূন্য বসালেই একশো। আর তারপর আর একটা শূন্য বসালেই এক হাজার। আর তারও পরে একটা শূন্য বসালেই একেবারে দশ হাজার। এমনি একটা করে করে শূন্য বসিয়েই উমিচাঁদ লাখ লাখ টাকার মালিক হয়েছে আজ। আজ আবার আরো কুড়ি লাখ যোগ হলো। কিছু করতে হলো না। পরিশ্রম নয়, মাল কেনাবেচা নয়, শুধু একটু বুদ্ধি খরচ। এই বুদ্ধিটারই দাম বিশ লাখ টাকা। হিসেবের খাতার পাতায় শেষ সংখ্যাটার সঙ্গে আরো বিশ লাখ যোগ করলে মোট কত হবে তারই হিসেব করতে উমিচাঁদ একবার অন্যমনস্ক হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে গুরু নানকের কথা মনে পড়লো। মাথা উঁচু করে দেওয়ালে টাঙানো পটটার দিকে চেয়ে একমনে প্রণাম করে নিলে।

তারপর রাত গভীর হলো। গঙ্গার ধার দিয়ে একটা বজরা ছুটে চলছিল। ভোর রাত্রে মুর্শিদাবাদ থেকে বজরাটা ছেড়েছে। তারপর সারা সকাল, সারা দুপুর সারা সন্ধ্যেটা কেটেছে। তারপর কখন রাত হয়েছে, রাত গভীর হয়েছে তার খেয়াল ছিল না কারো।

কান্ত বললে—তোমার ঘুম পাচ্ছে, তুমি ঘুমোও, আমি উঠি—

মরালী বললে—তুমি কোথায় শোবে?

কান্ত বললে—বাইরে—

মরালী বললে—কালকের মত যদি আবার বৃষ্টি আসে? ওই দেখ না, বাইরে খুব কালো মেঘ করেছে—

—কিন্তু এখানে তুমি শুলে আমি কী করে শোব—

মরালী হাসলো—কেন, এখানে আমার পাশে শুতে তোমার ভয় করে নাকি?

কান্ত বললে—ভয় করবে না? আমি তো আমি, তোমাকে কে না ভয় করে? জগৎশেঠজী থেকে আরম্ভ করে উমিচাঁদ, নন্দকুমার, মীরজাফর, মনসুর আলি মেহেদি নেসার, এমন কি ক্লাইভ সাহেব পর্যন্ত তোমাকে ভয় করে! সত্যি বল তো এ-সব তুমি কোথায় শিখলে এত?

—কী সব?

—এই, কী করে লোকের সঙ্গে মিশতে হয়, লোকের সঙ্গে কথা বলতে হয় কী করে সকলকে হাতের মুঠোয় আনতে হয়!

মরালী আবার হেসে উঠলো। বললো—ওমা, কী যে বলো তুমি, কাকে আবার হাতের মুঠোয় আনলুম?

কান্ত বললে—কেন, জানো না?

মরালী বললে—খুলে বলো না, কাকে? নজর মহম্মদকে? নানীবেগমকে?

কান্ত বললে—কাকে হাতের মুঠোয় আনোনি বলতে পারো? নবাবকে তুমি হাতের মুঠোয় আনোনি? জগৎশেঠজীকে আনোনি? সত্যিই তুমি জাদু জানো না মরালী?

মরালী বললে—আর তোমার নিজের কথাটা যে বাদ দিলে?

—আমি? আমার কথা ছেড়ে দাও, আমি আবার একটা মানুষ! আমাকে

হাতের মুঠোয় আনা আবার কি একটা বাহাদুরি?

মরালী বললে—সত্যি, তুমি কেন আমার জন্যে নিজের জীবনটা নষ্ট করছো বলো তো?

—নষ্ট কোথায় করছি মরালী? এই যে তোমার কাছে থাকতে পারছি, তোমার হুকুম তামিল করতে পারছি, এটা কি আমার কম লাভ মনে করো? এক-একবার মনে হয়, তোমার জন্যে আরো কিছু করতে পারলে যেন ধন্য হয়ে যেতাম—

মরালী সেই পুরোন প্রশ্নটাই আবার করে বসলো।

বললে—কিন্তু আমি তোমার কে যে, আমার জন্যে তুমি এত করো?

কান্ত বললে—সে তুমি বুঝবে না। তুমি যদি পুরুষমানুষ হতে তো বুঝতে!

—কেন, মেয়েমানুষ হলে বুঝি বুঝতে নেই?

কান্ত বললে—কিন্তু তুমি তো সে-রকম মেয়েমানুষ নও! তুমি যে আলাদা—

—আমি আলাদা?

—আলাদা নও? আলাদা না হলে আমার সঙ্গে তুমি এমন ব্যবহার করো? এই যে তুমি আমাকে একসঙ্গে ঘরের ভেতর বসিয়ে কথা বলতে দিচ্ছ, এ অন্য কেউ হলে করতে দিত? অন্য কেউ হলে নিজের স্বামীকে ছেড়ে চেহেল্-সুতুনে এসে নবাবের সঙ্গে রাত কাটাতে পারতো?

—কেন, আমার মত তো অন্য অনেক মেয়ে এসে চেহেল্-সুতুনে রয়েছে!

—কিন্তু তারা কি তোমার মত? তারা তো সবাই সারাফত আলির আরক খায়, তারা নবাবকে খুশি করে টাকা-মোহর-গয়না আদায় করতে চায়। তুমি কি তাই করো?

তারপর হঠাৎ থেমে গিয়ে কান্ত আবার বললে—তুমি একটু শুয়ে পড়ো মরালী, নইলে কাল তোমার আবার শরীর খারাপ হয়ে যাবে। আমি উঠি—

মরালী বললে—কেন, এখানেই শোও না।

—না মরালী, আমাকে আর লোভ দেখিও না। আমার মনের জোর নেই তোমার মত, কখন কী করে ফেলবো, তখন আর আফসোসের শেষ থাকবে না—!

মরালী বললে—অত যদি আফসোসের ভয় তো মুর্শিদাবাদ ছেড়ে অন্য কোথাও চলে গেলেই পারো। অন্য কোনো চাকরি নিয়ে বিয়ে করে ঘর-সংসার করতে পারো—

—তা যদি পারতুম!

বলে আর দাঁড়ালো না। ছই থেকে বাইরে বেরোতেই হঠাৎ আকাশ ভেঙে ঝম্ ঝম্ করে বৃষ্টি এল। কান্ত সেই মেঘ-ভাঙা কালো অন্ধকার আকাশের দিকে চেয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল। কী করবে বুঝতে পারলে না।

মরালী বিছানার ওপর হেলান দিয়ে ছিল।

বললে—দেখলে তো? আমি বললুম বৃষ্টি আসবে। দরজা বন্ধ করে দাও, জলের ছাট্ আসছে—

দরজা বন্ধ করে কান্ত আবার ভেতরে চলে এল।

বাইরে তখন ঝম্‌ঝম্ করে বৃষ্টি পড়ছে। বৃষ্টি নয় তো যেন বাজনা। বাজনা কি শুধু উৎসবেরই প্রতীক! জীবন-মৃত্যু আনন্দ-বিরহ সব কিছুই যেন সঙ্গীত হয়ে নিজেকে প্রকাশ করে। কান্নাও তো একরকম সঙ্গীত। কিন্তু সেই ঝম্‌ঝম্ বৃষ্টি-পড়া নিরিবিলি রাত্রে কান্নাই বা আসবে কেন কান্তর চোখে!

মরালী কান্তর মুখের দিকে চেয়ে অবাক হয়ে গেল।

বললে—কী হলো তোমার? কাঁদছো?

কান্ত বললে—না—

—তা হলে? দেখি, কাছে এসো—

কান্ত কাছে গেল না। বললে—না থাক্—

মরালীই শেষ পর্যন্ত উঠে কাছে এল। দু'হাত দিয়ে কান্তর দু'টো কাঁধ ধরলে। তারপর চিবুকটা ধরে মুখটা উঁচু করে তুললো।

বললে—সত্যিই কাঁদছো নাকি, না বৃষ্টির ফোঁটা পড়লো—?

তারপর হাত ধরে মরালী কান্তকে নিজের কাছে এনে বসালো। বললে—তুমি দেখছি মেয়েমানুষেরও বেহদ্দ! কোথায় আমি কাঁদবো, তা নয় তো তুমিই কাঁদতে শুরু করলে! কেন, কী হয়েছে তোমার বল তো! কী হয়েছে তোমার?

নৌকোটা তখন ঝম্‌ঝম্ বৃষ্টির মধ্যে তীরের মত গঙ্গার বুকের ওপর দিয়ে ভেসে চলেছে। আর নৌকোর ভেতরে দু'জন মানুষের বুকের মধ্যে তখন বাইরের অশান্ত প্রকৃতির মতই অশান্তির তীব্র যন্ত্রণা নিঃশব্দ আর্তনাদ করে চলেছে।

অনেকক্ষণ পরে মরালী বললে—কী যে তুমি ছেলেমানুষি করো! নিজের কষ্টটাই যেন তোমার কাছে বড় হলো, আর আমার বুঝি কিছু কষ্ট হতে নেই? আমার বুঝি পাথরের বুক, আমার বুঝি কিছু বোঝবার ক্ষমতা নেই?

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে কান্ত বললে—কিন্তু কেন তুমি এমন করে নিজের সর্বনাশ করছো মরালী?

—বা রে—মরালী হেসে উঠলো—বা রে, আমি আমার সর্বনাশ করেছি না তুমি আমার সর্বনাশ করেছো?

কান্ত বললে—সেই তবু তুমি আমাকেই দোষ দেবে? আমি তো তোমাকে অনেকবার বলেছি চলে যেতে! কতবার চেহেল্-সুতুন থেকে পালিয়ে যেতে বলেছি। তুমি রাজি হয়েছো? তুমি আমার কোনো কথা কখনো শুনেছো?

—কিন্তু যখন তুমি আমাকে চেহেল্-সুতুনে নিয়ে এসেছিলে তখন তোমার মনে ছিল না?

—কিন্তু তখন কি আমি জানতুম যে, আমি তোমাকেই চেহেল্-সুতুনে নিয়ে চলেছি!

মরালী বললে—বেশ, তা না-হয় জানতে না, কিন্তু এটা জানতে তো যে একজন মেয়েমানুষকে নিয়ে যাচ্ছ নবাবের চেহেল্-সুতুনে? সে না-ই বা হলুম আমি, কিন্তু সেও তো একজন মেয়েমানুষ? তারও তো সংসার আছে। তখন একবারও ভাবলে না যে, তুমি আর একজনের সুখের সংসার ভেঙে দিচ্ছ?

কান্ত কিছু বলবার আগেই মরালী আবার বলতে লাগলো—অথচ দেখ, যার কপালে সুখ নেই, কোনো সুখই তাকে সুখী করতে পারে না। নইলে আমার বিয়ের রাতের আগের দিন সকালে ওই ছোট বউরানীর শোবার ঘরে গিয়ে দেখেছি সে কী ঐশ্বর্য! শোবার খাট বিছানা। মাথার কাছে ফুলের তোড়া, কেমন সাজানো ঘর। ছোটমশাই-এর ভালোবাসা পেয়ে পেয়ে ছোট বউরানীর তখন ঠ্যাকারের সীমা নেই—অথচ কোথায় গেল সে-সব, কোথায় গেল সেই ঠ্যাকার! আজ আমাকেই আবার সেই ছোট বউরানী চিঠি লিখেছে—কপাল এমনই জিনিস—

কান্ত বললে—ছোট বউরানীর যা হয় হোক, কিন্তু আমি ভাবছি আমার কথা—

—তোমার কথা? তোমার কথা আবার কী?

—আমার জন্যেই তো তোমার এই হাল হলো?

মরালী বললে—সে কথা ভেবে আর কী করবে, এও আমার কপালে ছিল মনে করে নাও—

—কিন্তু ভাবলেই কষ্ট হয় যে! কোথায় ছিলুম বেভারিজ সাহেবের সোরার গদিতে, কোথায় কেমন করে আবার চলে এলুম নবাব-নিজামতে। এই ক'বছরে কত কী হয়ে গেল। যেখানে আমি কাজ করতুম, সেই গদিবাড়িতে গিয়ে দেখেছি, কত বদলে গেছে, গঙ্গার ধারে ধারে কত ঘাট হয়েছে, কত বাজার হয়েছে কলকাতায়; সব কিছু বদলে গেছে, তুমিও বদলে গেছো; আমিই শুধু সেই একই রকম রয়ে গেলুম!

মরালী বললে—বা রে, আমি কোথায় বদলালুম?

—বদলাওনি তুমি? আগে কি তুমি এই রকম ছিলে?

—ওমা, আগে কী রকম ছিলুম?

—এখন তুমি কত সুন্দর হয়েছো, তা জানো?

মরালী হেসে বললে—ওমা, আগে বুঝি খারাপ দেখতে ছিলুম?

—না, খারাপ দেখতে থাকবে কেন? সচ্চরিত্র পুরকায়স্থমশাই যখন বিয়ের সম্বন্ধ করতে এসেছিল, তখন আমাকে বলেছিল তোমার চেহারার কথা।

—কী বলেছিল?

—সে না-ই বা শুনলে। কিন্তু পরে যখন তোমাকে দেখলুম তখন মনে হয়েছিল সে যেমন বলেছিল তার চেয়ে তুমি অনেক সুন্দরী। তারপর যত তোমাকে দেখছি ততই যেন তুমি দিন দিন আরো সুন্দরী হচ্ছো—

মরালী হো হো করে হেসে উঠলো—

বললে—এই বৃষ্টির রাত্তিরে নৌকোর ছই-এর মধ্যে একলা আমার সামনে কি ও-কথা বলতে আছে?

কান্ত বললে—কেন, কেউ তো শুনতে পাচ্ছে না—

—শুনতে পেলে বুঝি দোষের হতো?

কান্ত বললে—দোষের হতো না? এই সব কথা কি সকলের সামনে বলা যায়? অন্য লোকে শুনলে তারা তো অন্য মানে করতো?

—কী মানে? মনে করতো তুমি আমায় ভালোবাসো?

হঠাৎ নৌকোটা দুলে উঠলো। কান্ত আর একটু হলেই ঝাঁকুনি লেগে মরালীর গায়ের ওপর ঢলে পড়ছিল। তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে উঠে বসে বললে—ঝড় উঠলো বোধ হয়, ঢেউ উঠেছে গঙ্গায়—

মরালী বললে—তা হোক না, তুমি চমকে উঠলে কেন?

কান্ত বললে—দাঁড়াও, বাইরে গিয়ে দেখে আসি কী হলো—

মরালী বললে—কেন, ঝড় উঠলে ভয় কী?

কান্ত বললে—আমার জন্যে ভয় নয়, ভয় তোমার জন্যে—

—আমার জন্যে? আমার জন্যে কীসের ভয় তোমার এত? তুমি কি মনে করেছো, আমি সাঁতার জানি না?

কান্ত বললে—সাঁতার তো আমিও জানি। ছোটবেলায় একলা গঙ্গা সাঁতরে পার হয়ে কলকাতায় উঠে বেঁচেছিলুম। সে-জন্য বলছি না—

মরালী বললে—ও, এবার বুঝতে পেরেছি—

—কী?

—ওই যে তোমায় চক্-বাজারের কে এক গণৎকার তোমার হাত দেখে বলেছিল

তুমি জলে ডুবে মারা যাবে, সেই জন্যে!

কান্ত বললে—না না, সত্যি বলছি সে জন্যে নয়! গণৎকারের কথা কি আমি বিশ্বাস করি ভেবেছো? সে তো আরো অনেক কথাই বলেছিল, সব কি ফলেছে না ফলছে?

—কী বলেছিল? আমার সঙ্গে তোমার আবার বিয়ে হবার কথা?

কান্ত হাসলো—বাঃ, তোমার তো দেখছি সব মনে আছে!

মরালী বললে—তা তুমি কি ভাবো আমার মন বলে কিছু নেই?

কান্ত আর থাকতে পারলে না। একেবারে মরালীর কাছাকাছি সরে এল। বললে—আচ্ছা, সত্যিই বলো না, গণৎকার ও-কথা বললে কেন?

—ওমা—মরালী সরে বসলো—তুমি আবার কাছে সরে আসছো কেন? একটু মিষ্টি কথা বললেই একেবারে গলে যাও দেখছি তোমরা। ঠিক নবাব যেমন, তুমিও তেমনি-

কান্ত বললে—নবাবের কথা এখন থাক, তুমি আমার কথা বলো মরালী! সত্যিই কি তুমি আমার কথা ভাবো? সত্যিই কি তুমি আমার দুঃখটা বোঝ? যা হয়ে গেছে তার কি আর কোনো পার নেই?

মরালী বললে—না, তোমাকে নিয়ে দেখছি আর পারা গেল না, ভালো মুশকিল তো করেছি তোমাকে সঙ্গে এনে—

—না, সত্যি বলছি, বলো না? তুমি কি আমার কথা ভাবো?

মরালী বললে—অমন করে পীড়াপীড়ি করো না, ও-কথা জিজ্ঞেস করতে নেই—

কান্ত বললে—কিন্তু তা হলে আমি কী করবো বলো? আমি কী নিয়ে বেঁচে থাকবো, বলো?

—বলেছি তো আমার কথা ভুলে যেতে! বলেছি তো একটা বিয়ে-থা করে ঘর-সংসার করতে!

কান্ত বললে—তা যদি সম্ভব হতো তো বিয়ে করতুম না মনে করো?

—কিন্তু কেন সম্ভব নয়, তা বলবে তো?

—সেও তোমায় খুলে বলতে হবে? তুমি কিছু বোঝ না? তা হলে কেন তুমি আমাকে চেহেল্-সুতুনে ডেকে পাঠিয়েছিলে? কেন তুমি আমার সঙ্গে হেসে কথা বলেছিলে? কেন তুমি আমাকে বিশ্বাস করেছিলে? কেন তুমি আমাকে আশ্বাস দিয়েছিলে?

—ছিঃ—

মরালী হঠাৎ নিজের হাত দিয়ে কান্তর মুখটা চাপা দিয়ে দিলে। বললে—ছিঃ, তোমার মুখে দেখছি কিছুই আটকায় না—

আর সঙ্গে সঙ্গে ঠিক সেই সময়েই কি নৌকোটা অমন করে দুলে উঠতে হয়? দুলে উঠতেই মরালী আর টাল্ সামলাতে পারলে না, একেবারে হুমড়ি খেয়ে পড়লো সামনের দিকে। আর কান্তও তখন কথা বলতে বলতে এত এগিয়ে আসছিল যে মরালীর ভর লেগে গিয়েছিল। কান্তর মুখে হাত চাপা না দিয়ে আর কোনো উপায়ও ছিল না মরালীর পক্ষে।

বাইরে থেকে তখন মাঝিটা হঠাৎ চিৎকার করে উঠেছে—হুঁশিয়ার—তুফান উঠেছে নদীতে—

হ্যাঁ, সত্যি, সেদিন তুফানই উঠেছিল সেই নৌকোর ভেতরের নিস্তব্ধ

নিরিবিলিতে। কান্তর জীবনের তুফান, মরালীর জীবনেরও তুফান। কিন্তু সে কথা এখন থাক্।

সিলেক্ট কমিটির মিটিং থেকেই ক্লাইভ সাহেব সোজা চলে গিয়েছিল উমিচাঁদ সাহেবের বাড়িতে। যে ষড়যন্ত্র একদিন শুরু হয়েছিল মহতাপচাঁদ জগৎশেঠের হাবেলিতে, সেই ষড়যন্ত্রই গড়িয়ে গড়িয়ে এসে পৌঁছেছিল কলকাতার সিলেক্ট কমিটির মিটিং-এ। এমন মিটিং আগেও হয়েছে। সমস্তই ঠিক-ঠিক বন্দোবস্ত হয়ে গিয়েছিল। কাকে কত দিতে হবে, বখ্রা ভাগাভাগির কথাবার্তা সবই পাকা হয়ে গিয়েছিল। এতদিন পরে যখন সোলজার আর্মি আর্মস্-অ্যামিউনিশন্ পাঠানো হয়ে গিয়েছে, তখন আবার নতুন করে কীসের কন্ট্র্যাক্ট?

ক্লাইভ সাহেব বললে—উমিচাঁদ সাহেব আমাদের মুখের কথায় বিশ্বাস করতে চায় না—

—কেন? আমরা ফরেনার বলে কি ভদ্রলোক নই? আমাদের কথার কোনো দাম নেই?

ক্লাইভ বললে—এখন আর সে কথা বলে লাভ নেই। উমিচাঁদ বিজ্‌নেস-ম্যান, মুখের কথা বিশ্বাস করতে চাইছে না। তা ছাড়া...

ওয়াটসন্ বললে—তা ছাড়া?

—তা ছাড়া আমি সব দিক ভেবে আর উমিচাঁদকে চটাতে চাইলুম না। ওয়ারের সময় সকলের সঙ্গে ফ্রেন্ডলি-রিলেশন্ রাখাই ভালো। কারণ এখন যদি নবাবকে গিয়ে মীরজাফরের কথা বলে দেয় তো সর্বনাশ। মীরজাফর সাহেবই তো আমাদের একমাত্র অ্যাসেট্, সে-ই তো আমাদের একমাত্র মূলধন! উমিচাঁদের কথায় যদি নবাব মীরজাফরকে অ্যারেস্ট করে নেয়, তখন?

সেদিন সন্ধ্যে থেকেই আকাশে মেঘ করে ছিল। সিলেক্ট কমিটির মিটিং-এর সময় সেই বৃষ্টি ঝম্‌ঝম্ করে শুরু হয়ে গেল।

তারপর রাত আরো অনেক গভীর হলো।

প্রত্যেকটা আইটেম পড়ে পড়ে শোনানো হলো সকলকে। ক্লাইভের নিজের হাতের তৈরি। ভাগ-বখ্রার বিশদ হিসেব। কে কত পাবে, কার ভাগে কত পড়বে। ইন্ডিয়ার নবাবের সিন্দুক যখন হাতের মুঠোয় আসবে, তখন তার ভেতর থেকে বেরোবে পাঁচ পুরুষের জমানো ট্রেজার, সঞ্চিত সম্পত্তি। মুর্শিদকুলী খাঁ থেকে শুরু করে আলীবর্দী খাঁ পর্যন্ত সবাই মানুষের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে উপায় করা টাকায় ভাগ বসিয়ে বসিয়ে সিন্দুক ভারী করে তুলেছে। এ সেই টাকা। আর শুধু টাকাই নয়, হীরে মুক্তো পান্না চুনি, তাও আছে। সে যে কত আছে তার হিসেব লেখা নেই তারিখ-ই-বাংলার পাতায়। সেই সমস্ত টাকার হিসেব বড় কম হিসেব নয়।

দুখানা কাগজ। একখানা সাদা কাগজ, আর একখানা লাল।

—দু'খানা কাগজ কেন?

ক্লাইভ বললে—একটা জাল, আর একটা আসল—

আসল কাগজটাতে সকলের নাম আছে। শুধু উমিচাঁদের নাম নেই। জাল লাল কাগজটাতে সকলের নামের সঙ্গে মীরজাফরের নাম আছে।

ক্লাইভ বললে—স্কাউন্ড্রেলটাকে এই জাল দলিলটা দেখাবো, এই জাল দলিলেই তার সই থাকবে—

খানিকক্ষণের জন্য বিবেকে বাধলো বোধ হয় সকলের। আমরা কি তা হ
ল্যায়ার? আমরা কি তবে সবাই মিথ্যেবাদী? কিন্তু তা কেন? ইস্ট ইণ্ডিয়া
কোম্পানীর স্বার্থ দেখতে এসেছি আমরা। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর স্বার্থ আমাদের
স্বার্থ। দেয়ার ইজ্ নাথিং রং ইন ওআর অ্যান্ড লাভ। যুদ্ধ করতে বসে ন্যায়-
অন্যায় ভাবলে চলে নাকি।

প্রথমেই সই করলে ক্লাইভ। রবার্ট ক্লাইভ। বড় বড় অক্ষরে নিজের নাম লিখে
ড্রেকের দিকে এগিয়ে দিলে। কলমটা বাগিয়ে ধরে ড্রেক সাহেব সই করে দিলে তার
নিচেয়। তারপর ওয়াটস্, তারপর কিল্প্যাট্রিক, তারপর বীচার। পাশে মীরজাফরের
সই আগে থেকেই ছিল।

—এবার তুমি সই করো?

ওয়াটসন্ এতক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। বললে—না।

—কেন, সই করবে না কেন?

—জাল দলিলে আমি সই করবো না! ওটা পাপ!

ক্লাইভের চোখ দুটো গোল হয়ে উঠলো রাগে, অপমানে, ক্ষোভে, লজ্জায়
ঘৃণায় আর অহঙ্কারে। ক্লাইভ বরাবরই বড় অহঙ্কারী। বরাবর মানুষের তাচ্ছিল্য
পেয়ে পেয়ে বড় স্পর্শকাতর হয়ে উঠেছিল ক্লাইভ। ওয়াটসন্ কি তবে নিজেকে
সকলের চেয়ে বড় মনে করে, সুপিরিয়র মনে করে! জাল দলিলে সই করে
উমিচাঁদকে ঠকাতে যাচ্ছে বলে ক্লাইভ তার চেয়ে ছোট হয়ে গেল? তুমি কি মনে
করো আমি জানি না কাকে বলে ন্যায়, কাকে বলে অন্যায়? ইণ্ডিয়াতে এসে
নবাবের থ্রোন কেড়ে নেওয়া অন্যায় নয়? এখানে এসে ইণ্ডিয়ার মেয়ের সঙ্গে রাতে
এক বিছানায় শোয়া অন্যায় নয়?

যখন কথা বলতে আরম্ভ করে ক্লাইভ, তখন আর তার জ্ঞান থাকে না। যখন
আর্মি নিয়ে আমরা জীবন-মরণের যুদ্ধ করতে যাচ্ছি, যখন জানি না কাল বেঁচে
থাকবো কি মারা যাবো, তখন ভালো-মন্দর বিচার করে কে? সে আর যে-ই হোক
রবার্ট ক্লাইভ নয়। রবার্ট ক্লাইভ জীবনে কাউকে পরোয়া করে চলতে শেখেনি।
সে বাপকে পরোয়া করেনি, মাকে পরোয়া করেনি, পৃথিবীকে পরোয়া করেনি
নিজের জীবনকে পর্যন্ত পরোয়া করেনি সে। তুমি তাকে আজ ন্যায়-অন্যায়
শেখাতে এসেছো? তুমি কি মনে করো আমি এতদূর পর্যন্ত এগিয়ে এসে এখন
থেমে যাবো, পেছিয়ে যাবো? নো, নেভার!

ওয়াটসন্ তখনো বেঁকে আছে। বললে—না, আমি সিগ্নেচার দেবো না।

—তাহলে দরকার নেই তোমার সই-এর। তাহলে তোমার হয়ে অন্য লোক
সই করবে। জাল সই।

—কে সই করবে?

—সে যে-ই হোক, তোমার একলার জন্যে আমি এতদূর এগিয়ে পেছিয়ে
আসবো না। জীবনে হেরে যাওয়া কাকে বলে আমি জানি না, আজও আমি হার
মানবো না—

—তবু শুনি কে সই করবে?

—ল্যাসিংটন! ল্যাসিংটনকে দিয়ে আমি সই করিয়ে নেবো!

আর শেষ পর্যন্ত সত্যিই তাই হলো। সিলেক্ট কমিটির মেম্বাররা হাঁফ ছেড়ে
বাঁচলো যেন। যেমন করে হোক কাজ উদ্ধার হলেই হলো। আমরা লড়াই
জিততে চাই। আমরা ধর্মপ্রচার করতে আসিনি, আমরা এসেছি ইণ্ডিয়ার সিংহাসন

খল করতে। আমাদের আবার অত সততা সত্যবাদিতার কী দরকার?

বৃষ্টি তখন আরো বেড়েছে। সেই রাত্রেই ক্লাইভ রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো।

উমিচাঁদের তখনো ঘুম আসছে না। হাঁ করে বাইরের দিকে কান পেতে আছে। একবার মনে হয় যেন কার ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ হলো। আবার মনে হয়, না—কেউ নয়।

ক্লাইভ যখন এসে পৌঁছলো তখন মাথা থেকে পা পর্যন্ত ভিজে গেছে। সমস্ত গা দিয়ে টপ্ টপ্ করে জল পড়ছে।

বড় হাসি বেরোল উমিচাঁদের মুখ দিয়ে।

বললে—আমি ভাবছিলাম সাহেব, তুমি বোধ হয় আর এলে না—

ক্লাইভ বললে—সে কী? আমি কথা দিয়েছিলাম তোমাকে—

—না, খুব জোরে বৃষ্টি এল কি না। তোমার সমস্ত শরীর ভিজে গেছে—একটু ড্রিঙ্ক করবে?

ক্লাইভ নিজের জামার পকেটের ভেতর থেকে লাল কাগজে লেখা দলিলটা বার করলে।

—লাল কাগজ কেন?

—আর কোনো কাগজ ছিল না দফ্তরে। সিলেক্ট কমিটির মেম্বাররাও প্রায় সবাই চলে যাচ্ছিল। লাস্ট্ মোমেণ্টে গিয়ে হাজির হয়েছিলাম। আর একটু দেরি হলে আর কাউকেই পেতাম না।

উমিচাঁদের সামনে কাগজটা বার করে ভাঁজ খুলে চিত করে রাখলে।

—সবাই সই করেছে দেখছি।

ক্লাইভ বললে—হ্যাঁ ভালো করে দেখে নাও, সকলের সই রয়েছে। এই দেখ সকলের মাথায় আমার সই, তারপর ড্রেকের, তারপর ওয়াটস্, তারপর এইটে মেজর কিল্প্যাট্রিক, এর পর বীচার। আর এই সকলের শেষে ওয়াটসন্—

আরো খুশি হলো উমিচাঁদ। মুখটা হাসিতে ভরে উঠলো। কুড়ি লাখ টাকা! কোনো পরিশ্রম নয়, কোনো মাথা ঘামানো নয়, কোনো মূলধন খাটানো নয়। শুধু একটু কূট বুদ্ধি। সেই কূট বুদ্ধির চালের সঙ্গে কুড়ি লাখ টাকা এসে গেল।

—এবারে সই করো!

উমিচাঁদ সাহেব মাথার ওপর দেওয়ালে টাঙানো গুরু নানকের ছবিটার উদ্দেশে নমস্কার করে নিচেয় সই করে দিলে।

—ঠিক আছে?

ক্লাইভ বললে—হ্যাঁ, ঠিক আছে—

তারপর কাগজটা নিয়ে পকেটে রাখতে রাখতে বললে—তা হলে আমি আসি?

একটু ড্রিঙ্ক করবে না?

ক্লাইভ বললে—এখন আর ড্রিঙ্ক করবার সময় নেই। ওদিক থেকে মীরজাফর সাহেবের চিঠি পেয়েছি। লিখেছে, নবাব তাকে আর্মি দিয়ে কলকাতার দিকে পাঠিয়েছে। এদিকে আমাদের আর্মিও কাল বিকেলবেলা চলে গিয়েছে—এতক্ষণ বোধ হয় তারা কালনায় পৌঁছে গিয়েছে—

তারপর আর দাঁড়ালো না ক্লাইভ। এবার আর দাঁড়ালে চলেও না। কত বছর আগে থেকে ক্লাইভ যেন এই দিনটারই প্রতীক্ষা করছিল। মীরজাফর আসবে! মীরজাফর আসবে! মীরজাফর নিশ্চয়ই আসবে!

পেছন থেকে উমিচাঁদ একবার ডাকলে—বৃষ্টি থামলে তারপর যেও সাহেব—

কিন্তু সাহেব তখন খোলা আকাশের ঝম্‌ঝম্‌ বৃষ্টির মধ্যেই ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে—

উমিচাঁদ দরজাটা বন্ধ করে দিলে। অনেক দিন পরে আজ আবার ভালো করে ঘুম হবে! কুড়ি লাখ। কুড়ি লাখ টাকা। উমিচাঁদ সাহেব কোটি-কোটি টাকার মালিক। কিন্তু তার সঙ্গে আরো কুড়ি লাখ টাকা যোগ হয়ে গেল। কোম্পানীর এক কোটি টাকা। ফিরিঙ্গীদের পঞ্চাশ লাখ টাকা। আর তার বেলাতেই যত আপত্তি। তিরিশ লাখ থেকে কমিয়ে কুড়ি লাখ হলো। তা হোক, কুড়ি লাখই বা কে দেয়?

উমিচাঁদ গুরু নানকের ছবির নিচেয় দাঁড়িয়ে আর একবার প্রণাম করলে। চোখ বুজে অনেকক্ষণ ধরে প্রণাম করলে। কিন্তু সেদিন চোখ খোলা থাকলে উমিচাঁদ দেখতে পেত, গুরু নানক ভক্তের ভক্তিতে নিঃশব্দে শুধু হেসে উঠলেন একবার।

আর কুড়ি লাখ টাকাতে সেদিন ইণ্ডিয়া দুশো বছরের মত বিক্রি হয়ে গেল।

পেরিন সাহেবের বাগানের ভেতরে দুর্গা, ছোট বউরানী দুজনেই চুপ করে বসে আছে। বৃষ্টি পড়ছিল বাইরে। এই এখানেই কতদিন দুজনে বাস করে গেছে। প্রায় ঘর-বাড়ি হয়ে গিয়েছিল তাদের। এইখানেই হরিচরণ তাদের দেখাশোনা করতো। এই এখান থেকেই সাহেবের ওপর রাগ করে তারা চলে গিয়েছিল। কিন্তু কী যে কপালে ছিল। কোথা থেকে কী হয়ে গেল। গোরা-সেপাইরা এসে তাদের নৌকোর ভেতর ঢুকে সব ওলোট-পালোট করে দিয়ে গেল।

দুর্গা বলেছিল—তা তুমি কেন তোমার নাম বলতে গেলে ছোট বউরানী?

ছোট বউরানী বললে—আমি আবার কখন আমার নাম বলতে গেলাম—ওরাই তো বললে আমি মরিয়ম বেগম—

সন্ধ্যে থেকে খাওয়া-দাওয়া হয়নি।

দুর্গা বললে—সে মুখপুড়ীরই বা আক্কেলখানা কেমন, একখানা চিঠি পাঠালাম, তার জবাব পর্যন্ত পাঠাবার ব্যবস্থা করলে না। নবাবের হারেমে ঢুকে সাপের পাঁচ-পা দেখেছে ছুঁড়ী!

—তা সে চিঠি পেলে কি না তারই তো ঠিক নেই! তুমি কার হাতে দিলে চিঠি, সে কি আর তার হাতে পৌঁছেছে! যার-তার চিঠি কি আর হারেমের ভেতরে পৌঁছোয় রে!

সন্ধ্যে থেকে একজন কেবল খাওয়াবার জন্যে পীড়াপীড়ি করছিল। তখন খাবে না বলে তেজ দেখিয়েছিল। এখন ক্ষিধের চোটে পেট চোঁচোঁ করছে। আর সাড়াশব্দ নেই কোথাও। বাইরে থেকে দরজায় শেকল তুলে দিয়ে চলে গেছে। সেই মুখপোড়া সাহেবই বা গেল কোথায়?

তারপর সেই যে ঝম্‌ঝম্‌ করে বৃষ্টি পড়া শুরু হয়েছে, তার আর থামবার নাম নেই।

হঠাৎ বাইরে যেন কার দরজার কড়া নাড়বার শব্দ হলো। ছোট বউরানী ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে দুর্গার গা ঘেঁষে বসলো। কিন্তু দুর্গার সাহস আছে খুব।

বললে—কে?

এক-এক সময় এমন হয়। যখন মাথার ওপর বিপদ ঘনিয়ে আসে, পার পাবার আর কোনো রাস্তা থাকে না তখন। এক-এক সময় মনে হয়, কে যেন ডাকলে, কে যেন এল বাঁচাতে। বিশেষ করে সেই সেদিনকার জুন মাসের ঝড়-বৃষ্টির রাত্রে।

শেষকালে বোধ হয় ছোট বউরানীর আর ধৈর্য থাকলো না। বললে—তোর জন্যেই তো এই রকম হলো, তুই যদি এখান থেকে না বেরোতিস তো এমন হয়?

দুর্গার আর কথা বলবার মুখই নেই তখন। শুধু বললে—আমি তো তোমার ভালোর জন্যেই গিয়েছিলাম ছোট বউরানী। কিন্তু কপালে গেরো থাকলে আমি কী করবো?

—তা তুই এত মন্তর জানিস আর একটা কিছু বিহিত করতে পারছিসনে? বাণ মারতে পারিসনে হারামজাদাদের? আমরা কী করেছি ওদের যে, আমাদের এমন করে হেনস্থা করবে?

কিন্তু কতক্ষণ ধরে আর এমনি করে ঝগড়া করা চলে? ঝগড়া করতে করতে ছোট বউরানীও কেমন এক সময়ে নেতিয়ে পড়ে। বিছানাটার ওপর উপুড় হয়ে মুখ গুঁজে হাউ-হাউ করে কাঁদতে থাকে। তারপর দুর্গার কোনো কথাই আর শুনতে চায় না। বলে—বেরো তুই, বেরো এখান থেকে, তোর কোনো কথা শুনতে চাইনে, তুই বেরো এখান থেকে—যা—চলে যা—

দুর্গার যেন সত্যিই পরাজয় হয়ে গিয়েছে। বহুদিন আগে দুর্গা একদিন বিধবা হয়েছিল। সে তখন ছোট। এখন তার বিয়ের কথাও মনে নেই, তার স্বামীর কথাও মনে নেই। শুধু এইটুকু মনে আছে, বর এসেছিল, উলুর শব্দ হয়েছিল চারদিক থেকে। ওই পর্যন্তই। তারপর যখন থেকে জ্ঞান এসেছে, তখন থেকে বড় বউরানীর সঙ্গেই আছে। প্রথমে বড় বউরানীর বাপের বাড়িতে। এমন কিছু বড় সংসার নয় সে বাড়ি। কিন্তু যেদিন বড় বউরানীর বিয়ে হলো হাতিয়াগড়ের ছোটমশাই-এর সঙ্গে, সেইদিন থেকেই তার কপালটা খুলে গেল। হাতিয়াগড়ে আসার পর থেকেই দুর্গার ক্ষমতা বেড়েছিল, প্রতিপত্তি বেড়েছিল, তেজও বেড়েছিল। লোকের বিপদ-আপদে মন্তর পড়ে, টোট্‌কা ওষুধ-বিষুধ দিয়ে হাতিয়াগড়ের মেয়ে-মহলে বেশ নাম-ডাক করে ফেলেছিল। তবে একদিন ছোটবেলায় দু-একটা তুক-তাক্ শিখেছিল এক বুড়ির কাছে, তাই ভাঙিয়েই চলছিল। বুড়ি বলে দিয়েছিল—লোকের ভালো করবি, লোকের ভালো দেখবি, তা হলে তোরও ভালো হবে—

তাই এতদিন দুর্গা ভালোই করে এসেছে সকলের। কিন্তু যেদিন থেকে মরি-মুখপুড়ীকে লুকিয়ে রেখে দিয়েছিল হাতিয়াগড়ের রাজবাড়িতে, যেদিন থেকে মরালীকে মুর্শিদাবাদের চেহেল্-সুতুনে পাঠিয়ে দিয়েছে, সেই দিন থেকেই আর তুক-তাক্ কিছুই ফলছে না। কোনো মন্তর-তন্তরই আর কাজ করছে না। দুর্গা যেন তাই কেমন অসহায় হয়ে গিয়েছে আজকাল।

ছোট বউরানী যখন রেগে যায়, তখন বলে—তোর কথা আমি আর শুনছিনে, তোর কথা শুনেই আমার এই কাল হলো—

দুর্গার চোখ দুটো ছলছল করে ওঠে। বলে—তুমি তোমার কথাটাই ভাবছো ছোট বউরানী, আর আমার বুঝি কিছু কষ্ট হচ্ছে না?

ছোট বউরানী বলে—তা তোর সেই মন্তর-তন্তর কোথায় গেল? তুই বাণ মারতে পারছিস না হারামজাদাদের?

দুর্গা বলে—বাণ আর খাটবে না ছোট বউরানী, আমার মন্তর আর খাটবে না—

—কেন, খাটবে না কেন? কী হলো মন্তরের?

দুর্গা বললে—আমি বাণ মেরেছিলুম ছোট বউরানী, কিন্তু খাটলো না। আমার দাই-বুড়ি, যে আমাকে মন্তর-টন্তর শিখিয়েছিল, সে বলেছিল, কারোর যেন ক্ষেতি করিসনে দুগ্যা, এ-মন্তর তা হলে আর ফলবে না—

—তা কার ক্ষেতি করেছিস তুই?

—ওমা, কী বলছো ছোট বউরানী, ক্ষেতি করিনি! মরি-মুখপুড়ীর ক্ষেতি করিনি? তাকে মোছলমানের হারেমে পাঠিয়েছি, সে কি তার কম ক্ষেতি ভেবেছো ছোট বউরানী? আমাদের কি ভালো হবে বলতে চাও তাতে? তুমি আজ এইটুকুতেই ছটফট করছো, আমাকে গালাগাল দিচ্ছ, আমাকে দূর-দূর করছো, কিন্তু তার কথা তো ভাবছো না? সেই মুখপুড়ীর কষ্টটার কথা তো ভাবছো না তুমি একবারও ছোট বউরানী?

ছোট বউরানী রেগে গেল। বললে—তার কথা ভাবতে যাবো কেন শুনি? সে মুখপুড়ী কি আমাদের কথা ভাবছে? এই যে তাকে তুই চিঠি দিলি, সে-চিঠির কি কোনো জবাব দিলে সে-মুখপুড়ী?

দুর্গা বলে—ছি, তাকে তুমি অত গালাগাল দিও না ছোট বউরানী, সে বেচারা হয়তো এখন চেহেল্-সুতুনে বসে কাঁদছে—

এমনি করেই সমস্ত রাতটা কেটে গেল। প্রথমে বৃষ্টিটা একটু আস্তে আস্তে পড়ছিল। তারপর জোরে জোরে নামলো। তারপর আরো জোরে। এতদিন গরমে মাটি ফুটি-ফাটা হয়েছিল। এই-ই প্রথম বৃষ্টি। বৃষ্টির তোড়ে যেন সব ঠান্ডা হয়ে এল আবার। ঠান্ডা হয়ে গেল ঘরটা। ছোট বউরানী সেই অবস্থাতেই কখন ঘুমিয়ে পড়লো একবার। দুর্গা পাশে বসে ছিল। আস্তে আস্তে আর একখান শাড়ি নিয়ে ছোট বউরানীর গায়ের ওপর চাপা দিলে। বড় মশা হয়েছে।

তারপর সব ঠান্ডা। বাগানের গাছে বুঝি কয়েকটা বাদুড় উড়ছিল। তাদের পাখা-ঝাপটানির শব্দ কানে এল। দুর্গা আর বসে থাকতে পারলে না। ছোট বউরানীর পায়ের কাছে গুটি মেরে শুয়ে পড়লো। আর কখন ঘুমিয়ে পড়েছে সেই ভাবে, তার খেয়ালও ছিল না।

যখন ঘুম ভাঙলো, তখন বেশ অল্প-অল্প ভোর। বাইরে অন্ধকার বটে, কিন্তু ভালো করে তাকালে বোঝা যায়, কেমন যেন নীল-নীল আবহাওয়া। একটু নীলচে হয়ে এসেছে অন্ধকারটা, একটু পাতলা-পাতলা অন্ধকার। তখনো ছোট বউরানী ঘুমোচ্ছে। দুর্গা একবার সেই দিকে চেয়ে দেখলে। ছোট বউরানীর ঠোঁট দুটো যেন একটু নড়ছে। বোধ হয় ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে স্বপ্নের মধ্যে ছোটমশাই-এর সঙ্গে কথা বলছে।

আস্তে আস্তে দরজাটা খুললে দুর্গা। দরজাটা খুলে বাইরের দিকে উঁকি মেরে দেখলে। কোনো কিছু দেখা যায় না। এ-দরজাটা কি বন্ধ করতে ভুলে গেছে বেটারা! সামনের উঠোনের দিকে একেবারে শেকল দিয়ে গেছে। এ-দিকটা আর দেখেনি। হরিচরণ বহুদিন ছিল তাদের সঙ্গে। হরিচরণ জানতো সব। এ বেটা নতুন। জানে না যে, এ-দিকটাতেও একটা দরজা আছে।

দরজাটা খোলবার সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গার দিক থেকে হুহু করে হাওয়া এসে ঢুকলো ঘরের মধ্যে। বৃষ্টি তখন থেমে গেছে। কেমন সোঁদা সোঁদা গন্ধ। হাতিয়াগড়ে প্রথম বৃষ্টি নামলে মাটি থেকে এই রকম গন্ধ বেরোত।

দুর্গা আবার বাইরের দিকে চেয়ে দেখলে। এখন যদি এখান থেকে ছোট বউরানীকে নিয়ে পালিয়ে যায় তো কে দেখতে পাবে? কিন্তু এখান থেকে পালিয়ে যাবে কোথায়? কেমন করে যাবে? রাস্তায় দুজন মেয়েমানুষ দেখলেই তো লোকে সন্দেহ করবে? কার মনে কী আছে, কে বলতে পারে? দিন-কাল খারাপ। চারদিকে সেপাই-শান্ত্রী ঘোরাফেরা করছে। যদি আবার ধরে নিয়ে এসে গারদে পুরে দেয়!

হঠাৎ ঘুমের ঘোরে ছোট বউরানী যেন একবার একটা শব্দ করে উঠলো!

দুর্গা তাড়াতাড়ি ছোট বউরানীর কাছে এসে ডাকলে—কী হলো ছোট বউরানী, কী হলো? স্বপ্ন দেখছিলে নাকি?

ছোট বউরানী হয়তো স্বপ্নই দেখছিল। দুর্গার কথায় শুধু পাশ ফিরে শুয়ে আবার ঘুমোতে লাগলো। সমস্ত নিস্তব্ধ। বৃষ্টি থেমে যাবার পর চারদিকে ঝিঁঝি পোকার শব্দটা আরো জোরে কানে আসছে। তার সঙ্গে আছে ব্যাঙের ডাক। হয়তো আবার বৃষ্টি আসবে। দুর্গা কী করবে, বুঝতে পারলে না।

—বউঠান!

হঠাৎ একটা চাপা গলার আওয়াজ পেয়েই দুর্গা চমকে উঠেছে। পেছন ফিরে চাইতেই অবাক হয়ে গেল। দরজার বাইরে একটা বেটাছেলের মূর্তি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। দুর্গা চিৎকার করে উঠতে যাচ্ছিল। কিন্তু বেটাছেলেটার চোখের চাউনি দেখে থমকে দাঁড়ালো।

—আমাকে চিনতে পারবেন না আপনারা। আমি মরালীর কাছ থেকে এসেছি।

মরালী! নামটা শুনে একটু ভরসা হলো দুর্গার। বললে—তুমি কে?

—চুপি চুপি এসেছি আমি, আপনাদের বাঁচাবার জন্যে। বউঠানকে ডেকে তুলুন, এখান থেকে আপনাদের নিয়ে যাবো—

বেটাছেলেটার জামা-কাপড় সমস্ত তখন জলে ভিজে জবজব করছে। মাথা থেকে পা পর্যন্ত টপটপ করে জল পড়ছে। একটু থেমে বললে—সন্ধ্যে থেকে এখানে এসে দাঁড়িয়ে আছি, ভরসা পাচ্ছিলাম না ভেতরে আসতে—

দুর্গা তখনো ভালো করে অবস্থাটা বুঝতে পারেনি। বলে কী লোকটা! আবার কোনো বিপদের মধ্যে পড়বে নাকি?

—আমাদের খবর পেলে কী করে?

—কেন, আপনারা যে মরিয়ম বেগমের নামে চিঠি দিয়েছিলেন!

—তা হলে মুখপুড়ী সে-চিঠি পেয়েছে?

—সেই চিঠি পেয়েই তো আমাকে পাঠিয়ে দিলে এখানে!

—তা সে মুখপুড়ী তোমার কে? তুমি কেন এলে? তুমি তার কে?

লোকটা বললে—কেউ না—

—কেউ না! শেষকালে তোমার কথায় বিশ্বাস করে যাই, আবার তখন কোন্ চুলোয় কার হাতে গিয়ে পড়ি আর কি!

লোকটা বললে—আমাকে আপনারা বিশ্বাস করতে পারেন, আমি আপনাদের কোনো ক্ষতি করবো না—

কিন্তু তবু যেন দুর্গার বিশ্বাস হলো না।

—কী করে নিয়ে যাবে আমাদের? নৌকো আছে?

—হ্যাঁ, সঙ্গে নৌকো রয়েছে গঙ্গায়—

—কোথায় নিয়ে যাবে?

—যেখানে বলবেন। যদি হাতিয়াগড়ে যেতে চান, সেখানেও নিয়ে যেতে পারি,

যদি কেষ্টনগরে যেতে চান, তাও নিয়ে যেতে পারি।

কী করবে দুর্গা কিছু বুঝতে পারলে না। তারপর বললে—একটু দাঁড়াও, ছোট বউরানীকে ডাকি, ছোট বউরানী কী বলে দেখি—

ছোট বউরানী তখনো ঘুমোচ্ছিল। এত যে কথা চলছে, তাতেও ঘুম ভাঙেনি ছোট বউরানীর। অঘোরে ঘুমোচ্ছে একেবারে। দুর্গা গিয়ে ছোট বউরানীর গা ঠেলে জাগাতে চেষ্টা করলে—ও ছোট বউরানী, ছোট বউরানী—ওঠো, ওঠো, দ্যাখো, সেই মুখপুড়ী লোক পাঠিয়েছে আমাদের নিয়ে যেতে—ও ছোট বউরানী—

ঠেলতে গিয়ে নিজেই যেন ঠেলা খেলে দুর্গা।

—ও দুগ্যা, ওঠ্ ওঠ্—

আর সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ভেঙে গেছে দুর্গার। দুর্গা চোখ দুটো খুলে দেখলে, ছোট বউরানী। ছোট বউরানী দুর্গাকে ঠেলা দিচ্ছে। বলছে—কী রে, কী ঘুম তোর, দেখেছিস কত বেলা হয়ে গেছে!

ধড়মড় করে উঠে বসলো দুর্গা। একেবারে অঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছিল দু'জনে।

চারদিকে চেয়ে দেখলে বেশ ফরসা হয়ে গেছে বাগানের বাইরেটা। অল্প অল্প রোদ এসে গেছে ঘরের ভেতর। কোথায় সেই লোকটা, কোথায় কে, কারো দেখা নেই! যেমনভাবে ছোট বউরানী আর সে এই ঘরের মধ্যে ছিল, তেমনিই সব রয়েছে। কেউই তো আসেনি মরালীর কাছ থেকে? কেউই তো তাদের পালিয়ে যাবার সাহায্য করবার জন্যে নৌকো নিয়ে হাজির হয়নি! ছোট বউরানী বললে—তুই বেশ নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছিস তো—আর আমার এদিকে ঘুম নেই—

দুর্গা বললে—সে কি, তুমি ঘুমোচ্ছ দেখেই তো আমি নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়লাম—

—আমি আবার কখন ঘুমোলাম রে? তুই বলছিস কী?

দুর্গা বললে—সত্যি বউরানী, আমি কি মিথ্যে কথা বলছি? তুমি ঘুমিয়েছ, আমি দেখেছি—

—তা ঘুমিয়েছি বেশ করেছি। কিন্তু আর যে থাকতে পারছিনে। একটা কিছু ব্যবস্থা কর তুই!

দুর্গা বললে—খাবার দিতে বলবো এদের? খাবে তুমি এদের হাতে?

ছোট বউরানী বললে—তা খাবো না কি উপোস করে মরবো?

—তা হলে ওদের ডাকি?

ছোট বউরানী বললে—ডাক্—

দুর্গা কিছু বুঝতে পারলে না। কী করবে, কাকে ডাকবে, কোথায় যাবে, তাও বুঝতে পারলে না। আশেপাশে কেউ কোথাও নেই। জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। দেখলে দূরে যেন কে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে। গোরা নয়, বাঙালী!

হাত দিয়ে তাকে ডাকলে।

বললে—ওগো, কে তুমি? একবার এদিকে শোনো তো বাছা—

লোকটা যেন ভয় পেয়ে চারদিকে চেয়ে দেখলে। লোকটা কে তার ঠিক নেই। কেমন যেন ভয়ে-ভয়ে তার দিকে এগিয়ে আসতে লাগলো।

ফিরিঙ্গী সেপাইরা তখন পাটুলিতে পৌঁছেছে। নবদ্বীপ থেকে ছ' ক্রোশ দূরে পাটুলী। সেখান থেকে কাটোয়া। কাটোয়ার উত্তরে অজয় নদের ওপারে সাঁকাইতে মস্ত বড় একটা কেল্লা। আগে থেকেই সব ব্যবস্থা হয়েছিল। ইংরেজরা গোলা-গুলী ছুঁড়লেই কেল্লার সৈন্য-সামন্তরা পালিয়ে যাবে।

কিন্তু মেজর সাহেবকে এত সহজে কেল্লা দখল করতে হয়নি।

একবার মনে হলো, কেল্লার ভেতর থেকে নবাবের সৈন্যরা গোলা ছোঁড়বার ব্যবস্থা করছে। সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ সেপাই ঝাঁপিয়ে পড়লো। আর দেখা গেল, কেল্লার চালে তারা নিজেরাই আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। তারপর দেখা গেল, সৈন্য-সামন্তরা পেছনের দরজা দিয়ে পালাচ্ছে।

ক্লাইভ আর দেরি করলে না। সদলবলে ভেতরে ঢুকে পড়ে দেখলে, কেল্লার ভেতরের সবকিছু তারা ফেলে গেছে। জামা-কাপড়, বালিশ-বিছানা আর চাল। এত চাল! হিসেব করে দেখলে, যত চাল আছে, তাতে দশ হাজার লোক এক বছর ধরে খেয়েও ফুরিয়ে উঠতে পারবে না।

ক্লাইভ সেখানেই থামতে বললে সকলকে। প্রথমে মাঠে তাঁবু পড়েছিল। ঝম্-ঝম্ করে বৃষ্টি আসতে সবাই কাটোয়ার বাড়িগুলো দখল করে রাত কাটালো।

পরদিন ভোর বেলা। তখনো ভালো করে ফরসা হয়নি। মীরজাফর সাহেবের চিঠি এসে পড়লো। তাতে মীরজাফর সাহেব লিখেছে—'নবাব মনকরায় এসে পৌঁছেছেন, ওইখানেই গড়খাত্ করে যুদ্ধের জন্যে অপেক্ষা করবেন। আপনারা ঘুরে এসে যেন হঠাৎ হামলা করেন—'

সঙ্গে সঙ্গে ক্লাইভ চিঠির উত্তরে লিখলেন—'আমি সৈন্য-সামন্ত নিয়ে পলাশী পর্যন্ত এগিয়ে যাচ্ছি, এর পর মীরজাফর সাহেব যদি দাদপুরে এসেও আমাদের সঙ্গে যোগ না দেন তো আমি সরাসরি নবাবের সঙ্গে সন্ধি করবো—'

চিঠিটা পাঠিয়ে দিয়ে ক্লাইভ চুপ করে খানিকক্ষণ বসে রইলেন। হঠাৎ ল্যাসিংটন সামনে এসে দাঁড়ালো। অবাক হয়ে গেছে ক্লাইভ ল্যাসিংটনকে দেখে। পেরিন সাহেবের ছাউনি ছেড়ে হঠাৎ এসেছে কেন? জিজ্ঞেস করলে—কী হলো, মরিয়ম বেগমদের কোথায় রেখে এলে? কার কাছে?

ল্যাসিংটন তখনো হাঁফাচ্ছে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর গোড়া থেকেই সে আছে বেঙ্গলে। একদিন অনেক কষ্ট করেছে। যখন কোম্পানীর ফৌজ কলকাতা থেকে পালিয়ে ফলতায় গিয়ে নোঙর করেছিল, তখন অনেক দিন আধপেটা খেয়ে নবাবের বিরুদ্ধে যুঝেছে। ফ্লেচারের সঙ্গেই এসেছিল সে ইণ্ডিয়ায়। কিন্তু তারপর কত লোক এল-গেল তবু এখনো তার প্রমোশন হয়নি।

একবার কর্নেল ক্লাইভকে নিজের দুঃখের কথা বলেছিল ল্যাসিংটন।

সব শুনে ক্লাইভ বলেছিল—তুমি আমার সঙ্গে থাকো, আমি তোমাকে হেল্প্ করবো—

ইংলণ্ডের মায়ে-তাড়ানো বাপে-খেদানো ছেলে সবাই। যাদের কোথাও কেউ নেই তখন তারাই ইণ্ডিয়ায় এসেছিল ভাগ্য ফেরাতে। কিন্তু এখানে এসেও যাদের ভাগ্য ফেরেনি, ল্যাসিংটন তাদেরই একজন। দরকার হলে সিপাই-এর কাজও করতে

হতো, মেসেঞ্জারের কাজও করতে হতো। কোম্পানীর জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ সবকিছুই করতে হতো ল্যাসিংটনকে।

সেবার হঠাৎ মাসের পয়লা তারিখে ক্লাইভ ল্যাসিংটনের হাতে দুটো টাকা দিয়ে বললে—এটা নাও—

ল্যাসিংটন টাকা দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল। টাকা! কীসের টাকা?

—এটা তোমাকে আমি নিজের পকেট থেকে দিলাম। ইউ টেক্ ইট্। কোম্পানী যতদিন তোমার কিছু না করে ততদিন আমি মাসে-মাসে এই টাকা দিয়ে যাবো—

ল্যাসিংটনের চোখে সেদিন কর্নেলের ব্যবহারে জল এসেছিল। টাকাটা নিতে গিয়েও সেদিন তার হাতটা পেছিয়ে এসেছিল।

—নাও, নাও, আমি বলছি তুমি টাকাটা নাও। আমিও একদিন তোমার মতই কোম্পানীর কাছে মাইনে বাড়াবার দরবার করেছি, কেউ আমার কথায় কান দেয়নি। শেষকালে সকলের সঙ্গে ঝগড়া করে মারামারি করে আমি নিজের পাওনা আদায় করেছি—

সেই থেকে বরাবর ল্যাসিংটন ক্লাইভের কাছ থেকে প্রত্যেক মাসের পয়লা তারিখে দুটো করে টাকা পেয়ে এসেছে। আর ক্লাইভ যখন যা বলেছে তখন তা-ই করেছে। কর্নেলের জন্য ল্যাসিংটন সবকিছুই করতে পারতো।

ক্লাইভ বোঝাতো—দেখো, আমাদের কোম্পানীও যা, এই ইণ্ডিয়ার নবাব-বাদশাও তাই। ঠিক নবাব-নিজামতেও তোমার মত হাজার-হাজার ল্যাসিংটন আছে। আমি এতদিন ধরে তাদেরই খুঁজছি, যদি আজ নবাবকে লড়াইতে হারাতে পারি তো সেই সব ল্যাসিংটনদের সাহায্য নিয়ে হারাবো—নিজামতে তারা তাদের ন্যায্য পাওনা পায় না বলেই আজ তারা আমাদের সাহায্য করছে।

ল্যাসিংটন চুপ করে শুনতো শুধু কর্নেলের কথাগুলো।

ক্লাইভ আরো বলতো—শুধু উমিচাঁদ, শুধু মীরজাফর, শুধু জগৎশেঠদের দলে টানলে যুদ্ধ জেতা যায় না। তাদের পেছনে ল্যাসিংটনরাও থাকা চাই—তোমার মত লোকের সাহায্য নিয়েই আমি ফোর্ট সেণ্ট্ ডেভিড্ জয় করেছিলুম। তোমরাই আসলে লাইফ দিয়েছো, আর সমস্ত ক্রেডিট পেয়েছি আমি। আমি কর্নেল হয়েছি, আর তোমাদের মাইনে সেই এখনো ছ'টাকা রয়ে গিয়েছে। এই-ই হয়, সংসারের এই-ই নিয়ম। আগেও এই হয়েছে, এখনো হচ্ছে, পরেও এই-ই হবে। তবু দুঃখ করো না। যদি এই যুদ্ধে জিতি তো আমি তোমার জন্যে নিশ্চয় কিছু করবো—

ল্যাসিংটন হাসিমুখে শুধু কর্নেলের কথাগুলো শুনে গিয়েছিল, কিছু উত্তর দেয়নি।

তারপর যখন কর্নেল মীরজাফরের দলিলে অ্যাডমিরাল ওয়াটসনের সই জাল করতে বললে তখন একবার একটু দ্বিধা করেছিল।

বলেছিল—সই করবো?

—হ্যাঁ করো—

—কিন্তু জাল সই করলে অন্যায় হবে না?

কর্নেল ক্লাইভ আর কিছু বলেনি তখন। অপেক্ষা করবার মত সময়ও তখন তার আর নেই। শুধু চোখ দুটো দেখে ল্যাসিংটন বুঝেছিল, কর্নেল রেগে গেছে খুব। তাড়াতাড়ি কর্নেল সাহেবের কাছ থেকে কাগজখানা নিয়ে বিনা-দ্বিধায় ওয়াটসনের নামটা সই করে দিয়েছিল সেদিন।

কর্নেল ক্লাইভ জিজ্ঞেস করেছিল—সই করে দিলে যে?

ল্যাসিংটন বলেছিল—আপনি রাগ করছেন, তাই—

ক্লাইভ বলেছিল—রাগ করার কথা নয়। তুমি একদিন তোমার মাইনে বাড়ছে না বলে দুঃখ করেছিলে। কিন্তু কেন মাইনে বাড়ছে না আজ তো বুঝতে পারলে? আজ তো বুঝতে পারলে ছ'টাকা মাইনেতে রাইটার-ক্লার্ক হয়ে ঢুকে কেমন করে আমি কর্নেল হলুম? একটা কথা তোমাকে বলে রাখি ল্যাসিংটন, ভবিষ্যৎ-জীবনে তোমার কাজে লাগবে—ন্যায় কাকে বলে তা আমি জানি, অন্যায় কাকে বলে তাও আমি জানি। কিন্তু অন্যায়ের সঙ্গে যখন লড়াই করতে হবে, তখন ন্যায়-অন্যায়ের বাছ-বিচার যে করে তার অন্তত মিলিটারি লাইনে আসা উচিত নয়। এইটে মনে রাখলে একদিন তুমিও আমার মত কর্নেল হয়ে উঠবে—

কথাটা অনেকবার ভেবেছে ল্যাসিংটন। লন্ডনের সুবার্বের একটা ছেলে ক্লাইভের মতই একদিন পালিয়ে এসেছিল ইন্ডিয়ায়। প্রথমে উদ্দেশ্য ছিল অ্যাডভেঞ্চার। তারপর এলো অ্যামবিশন্। কিন্তু সকলের সব অ্যামবিশন্ কি পূর্ণ হয়?

আশ্চর্য! ছ'টাকা মাইনের সেই ল্যাসিংটন ক্লাইভের কাছে দীক্ষা পেয়ে হয়তো একদিন ইস্ট-ইন্ডিয়া-কোম্পানীর অধীনে কর্নেলই হয়ে উঠতো। কিন্তু লক্কাবাগের যুদ্ধের সময় নবাবের ফৌজের হাতে আচমকা গুলি খেয়ে যে সে একদিন প্রমোশনের আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে শুধু কোম্পানী নয়, কোম্পানীর মালিকদেরও ছেড়ে যাবে তা কেউ কল্পনাও করতে পারেনি।

সেদিন ল্যাসিংটন জানতে পারেনি, কেউই জানতে পারেনি। কিন্তু ক্লাইভ সেদিন কেঁদেছিল। তা সে তো পরের কথা। তার আগে আরো অন্য ঘটনা আছে।

ল্যাসিংটন প্রথমটায় বুঝতে পারেনি। প্রথম দিন পেরিন সাহেবের বাগানে যখন ভেতরের ঘরে নবাবের এক বেগমসাহেবাকে রাখা হয়েছিল তখন নিজের দায়িত্ব সম্বন্ধে ল্যাসিংটন সচেতনই ছিল। ক্লাইভ সাহেবের হুকুম ছিল—যেন মরিয়ম বেগমসাহেবা ঘর থেকে বেরোতে না পারে। কড়া নজর রাখবে।

সেদিন ভেতর থেকে বাঁদীটা জানালা দিয়ে ডাকলে—ওগো, শোন বাছা, তোমরা কি আমাদের মেরে ফেলতে চাও নাকি? আমাদের ক্ষিধে পায় না?

ল্যাসিংটন কিছুই বুঝতে পারেনি তার কথা।

দুর্গা আবার বলেছিল—তোমাদের সাহেব কোথায়? তোমাদের সাহেবকে ডেকে আনো আমার কাছে, তার মুখে আমি খ্যাংরা মারবো—যত বলছি আমরা মরিয়ম বেগম নই, তবু আমাদের কথা তোমরা শুনবে না গা?

ল্যাসিংটন মনে মনে শুধু বলেছিল—খুব হয়েছে, বেশ হয়েছে। তখন খাবার জন্যে অত সাধাসাধি, তখন খেলে না। আর এখন খেতে চাইলে কী হবে। যেদিন তোমাদের নবাব আমাদের কলকাতার ফোর্ট পুড়িয়ে দিয়েছিল সেদিন তোমাদের খেয়াল ছিল না। মরিয়ম বেগমসাহেবার বাঁদীটা আরো যেন কী সব চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে বলছিল। ল্যাসিংটন সে-সব কথায় আর কান দেয়নি। এবার এমন এক জায়গায় চলে গিয়েছিল, যেখানে গেলে কারোর চেঁচামেচি আর কানে যায় না। তারপর আর কি হয়েছে মনে নেই। কোম্পানীর ফৌজ ফোর্ট ঋেঁটিয়ে চলে গেছে কর্নেলের সঙ্গে। কেউ কোথাও নেই। শুধু ল্যাসিংটন আর মরিয়ম বেগম আর বাঁদীটা।

রাত্রে অনেক বৃষ্টি হয়েছিল। জুন মাসের প্রথম বৃষ্টি। ঠাণ্ডার দেশের লোক,

ইণ্ডিয়ার গরমের পর প্রথম বৃষ্টি পেয়ে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিল নাক ডাকিয়ে। তারপর কোথায় লড়াই, কোথায় প্রমোশন, কোথায় ডিউটি, আর কোথায় মরিয়ম বেগম! ঘুমের সময়ে আর অন্য কিছু কি মনে থাকে। বাগানের পেছন দিকের আউট-হাউসে কর্নেলের সিভিল-স্টাফ থাকতো। কুক্, সুইপার, হরকরা, এইসব। তারাও তখন অঘোর-অচৈতন্য অবস্থায় রয়েছে। কেমন যেন মনে হয়েছিল কী একটা শব্দ হলো। ঝন্-ঝনাৎ। তারপর সব চুপ। বোধ হয় বাদুড়ের কিচ্-কিচি, কিংবা আউট-হাউসের কেউ দরজার হুড়কো খুললো। কিংবা হয়তো কিছুই নয়, মনের ভুল। মনের ভুলে কানের ভুলে ভুল শব্দ শুনছে। তারপর আবার পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়েছিল।

তারপর যখন ভোরবেলা ঘুম ভেঙেছে তখন উঠে একবার ওদিকে গিয়েছিল।

প্রথমে মনে হয়েছিল বুঝি সবাই ঘুমোচ্ছে। কিন্তু কাছে যেতেই দেখলে জানালা-দরজা খোলা রয়েছে। এ কেমন হলো! দরজায় তালা-চাবি দেওয়া ছিল, কোথায় গেল? তাড়াতাড়ি ভেতরে ঢুকেই অবাক হয়ে গেল। কেউ নেই। তারপরে পাশের ঘরে ঢুকলো। সেখানেও কেউ নেই। তারপরে উঠোন, কেউ কোথাও নেই। কোথায় গেল মরিয়ম বেগম? কোথায় গেল মরিয়ম বেগমের সেই বাঁদীটা? ল্যাসিংটনের মাথা থেকে পা পর্যন্ত থর-থর করে কেঁপে উঠলো। এখন কী হবে!

তারপর যখন খুঁজে খুঁজে কোথাও পাওয়া গেল না, তখন দৌড়ে আউট-হাউসের দিকে গেল। বাবুর্চি, খানসামা, কুক, সুইপার অনেকেই চলে গেছে আর্মির সঙ্গে। দু'একজন রয়েছে শুধু। তাদেরই ডাকলে। তারা প্রাণভরে ঘুমোচ্ছিল। অনেক দিন পরে একটু ছুটি পেয়েছে। একটু হালকা হয়েছে।

ডাকাডাকিতে তারা উঠে পড়লো।

বললে—না হুজুর, আমরা তো কিছু জানি না—

—তাহলে মরিয়ম বেগম আর তার বাঁদী উড়ে গেল—? ঘরে তালা বন্ধ ছিল, সে তালা কে ভাঙলে? কোথায় গেল তারা? কখন গেল?

সমস্ত বাগানটা নিস্তব্ধ। সেই নিস্তব্ধতা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল ল্যাসিংটনের চিৎকারে। কর্নেল সাহেবের কড়া হুকুম ছিল নজর রাখবার জন্যে। নিশ্চয়ই স্টাফের মধ্যে কেউ ঠকিয়েছে তাকে। নইলে কেমন করে তারা পালাবে? হঠাৎ পালালেই হলো?

—আমি এখ্খুনি যাচ্ছি কর্নেল ক্লাইভের কাছে, সকলের এগেন্স্টে আমি রিপোর্ট করবো। আই শ্যাল স্যাক্ ইউ অল—

কিন্তু সকলের চাকরি খতম্ করে দিলেই তো আর মরিয়ম বেগমসাহেবাকে পাওয়া যাবে না। কোনো সমস্যার সমাধানও হবে না। একটা কিছু করতে হবে। ল্যাসিংটন সঙ্গে সঙ্গে তৈরি হয়ে নিলে। কর্নেল সাহেবকে খবরটা অন্তত তাড়াতাড়ি দেওয়া উচিত।

তারপর ঘণ্টা খানেকের মধ্যে সব ব্যবস্থা করে একেবারে সোজা হাঁটা পথে রওনা হয়ে গেল।

কর্নেল ক্লাইভের তখন মাথা ভারী হয়ে গেছে ভাবনায়। সেবারে ছিল কলকাতায় যুদ্ধ। কলকাতায় যুদ্ধ হলে অনেক লোকসান হবার ভয় থাকে। কিন্তু এবারকার যুদ্ধ কলকাতার বাইরে। কিন্তু বাইরেই হোক আ
যুদ্ধটা হলো যুদ্ধ। যুদ্ধ মানেই জীবন, যুদ্ধ মানেই মৃত্যু।
সারাজী ...তো যুদ্ধই করে এসেছে কর্নেল ক্লাইভ। এবার না

ঝড় আসে আসুক, বৃষ্টি আসে আসুক। মৃত্যু এলেই বা ক্ষতি কী? একদিন তো মৃত্যুই চেয়েছিল ক্লাইভ। মৃত্যুর জন্যে তৈরি হয়েই তো এই চাকরিতে ঢুকেছে। ছ'টাকা মাইনের রাইটার থেকে আজ এত উঁচুতে উঠেছে। খবর এসেছিল নবাব মনকরা থেকে আর্মি নিয়ে আরো এগিয়ে আসছে। দাদপুর ছাড়িয়ে একেবারে সামনাসামনি এসে গেছে।

ল্যাসিংটনের কথাটা শুনে প্রথমে চমকে উঠেছিল।

—কী বললে?

ল্যাসিংটন বললে—দেখলাম তালাটা ভাঙা, আমি আউট-হাউসের সবাইকে ডেকেছিলাম, তারাও কেউ কিছু জানে না—

—কিন্তু তাহলে মরিয়ম বেগম গেল কোথায়? কে তাকে ছাড়িয়ে নিয়ে গেছে? আমাদের স্টাফের কেউ ব্রাইব্ নেয়নি তো? আমি কিন্তু ফিরে গিয়ে সবাইকে স্যাক্ করবো। যদি এর পর মরিয়ম বেগমকে না পাওয়া যায় তো তোমাকেও স্যাক্ করবো ল্যাসিংটন। আই শ্যাল্ স্পেয়ার নো-বডি।

ক্লাইভের এ-চেহারা কখনো আগে দেখেনি ল্যাসিংটন। ওয়ার-ফিল্ডের ক্লাইভ যেন আলাদা মানুষ। কথা বলতে বলতে চোখ দুটো এক জায়গায় স্থির থাকে না। কথা বলছে ল্যাসিংটনের সঙ্গে কিন্তু চোখ রয়েছে অনেক দিকে। ওদিকে হাজার-হাজার ক্যাভালরি, তার ওপাশে ইন্‌ফ্যান্ট্রি। লক্ষাবাগ পর্যন্ত ল্যাসিংটনকে টেনে নিয়ে এসেছে। সেখানে এসেই থমকে দাঁড়িয়ে গেছে ক্লাইভের আর্মি।

হঠাৎ খবর এসে গেল, নবাব এসে পৌঁছেছে। ক্লাইভ যেন এক মুহূর্তের জন্যে অন্যমনস্ক হয়ে গেল। চোখের সামনে অন্ধকার হয়ে গেল সব। তখন আর কিছুই মনে নেই। ল্যাসিংটনের দিকে চেয়ে বললে—তুমি? তুমি এখানে কেন? কে তোমাকে আসতে বলেছে? হু টোলড্ ইউ টু কাম?

ল্যাসিংটন বুঝলো ক্লাইভ সাহেবের তখন আর মাথার ঠিক নেই।

—ও, বুঝতে পেরেছি, মরিয়ম বেগমের খবর নিয়ে এসেছো তুমি? কিন্তু কেমন করে পালালো সে? কে তাকে পালাতে হেল্‌প করলে?

রাত একটার সময় এই লক্ষাবাগের এক লাখ আমবাগানের মধ্যে এসে পৌঁছেছিল ক্লাইভ। চারদিকে তখন শুধু জোনাকি পোকার ঝাঁক। বর্ষাকালের রাত। পায়ের তলায় কাদা। কাদায়-কাদায় প্যাচপেচে হয়ে গেছে জায়গাটা। একেবারে ফাঁকা জায়গা।

ক্লাইভ চিৎকার করে উঠলো—ব্যাটালিয়ন, হল্ট!

সঙ্গে সঙ্গে থেমে গিয়েছিল আর্মি। কিন্তু সকলের কাছে গিয়ে গিয়ে ক্লাইভ দেখতে লাগলো। কারো কোনো অসুবিধে হয়েছে কি না। আর ইউ টায়ার্ড? আর ইউ হাংরি? তোমরা কি ক্লান্ত? তোমাদের কি ঘুম পাচ্ছে? কিন্তু আজ তোমাদের ক্লান্ত হলেও তো চলবে না, আজ তোমাদের ঘুম পেলেও তো চলবে না। আমরা আজ এক শো আটান্ন বছর ধরে ঘুমোইনি। সেই ১৫৯৯ সালে আমাদের কোম্পানীর পত্তন হয়েছিল ইংলণ্ডে, আর আজ ১৭৫৭ সাল। এই একশো আটান্ন বছর ধরে আমরা জেগে আছি। আমরা এই দিনটার জন্যে অপেক্ষা করে আছি। আর শুধু কি আমরা? আমাদের আগেও কত লোক এসেছে এখানে। তারাও ঘুমোয়নি, তারাও খায়নি, তারাও টায়ার্ড হয়নি।

ল্যাসিংটন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথাগুলো শুনছিল।

হঠাৎ ক্লাইভ বললে—এসো, আমার সঙ্গে এসো—

একটা উঁচু জায়গায় এসে দাঁড়ালো ক্লাইভ। লক্ষাবাগের চারদিকে উঁচু মাটির বাঁধ, পাশে শুধু একটা সরু খাল।

ক্লাইভ দূরের দিকে চেয়ে বললে—ওই দেখ—

ল্যাসিংটনও দেখলে। ভোর তখন হয়েছে কি হয়নি। সার সার হাতী দাঁড়িয়ে আছে সামনে। তাদের পিঠের ওপর লাল পোশাক। তার পাশে ক্যাভালরি। সেপাইদের হাতের খাপ-খোলা সোর্ড আর হাজার হাজার নবাবী নিশান উড়ছে তাদের সকলের মাথার ওপর। অত বড় আর্মি, অত সোলজার, অত এলিফ্যাণ্ট, অত হর্স! ল্যাসিংটনের বুকটা দুর-দুর করে উঠলো। নবাবের আর্মির কাছে আমাদের আর্মি কতটুকু! এই তো আমাদের আটটা কামান শুধু, আর সোলজারই বা ক'জন।

ক্লাইভ তখনো সেইদিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে আছে।

হঠাৎ বলা-নেই-কওয়া-নেই ওদিক থেকে একটা বিকট শব্দ কানে এল। আর সঙ্গে সঙ্গে কী ঘটলো বোঝা গেল না, ল্যাসিংটন ছিট্‌কে পড়লো নিচেয়।

ক্লাইভ প্রাণপণে চিৎকার করে উঠেছে—ব্যাটালিয়ন, ফায়ার—

কেমন করে যে সেদিন কী হলো তা আজও মনে আছে মরালীর। সারাফত আলির খুশ্‌বু তেলের দোকান থেকে বেরিয়ে ছোটমশাই কী করবে বুঝতে পারেনি। সেই রাত্রেই মুর্শিদাবাদের চক্‌-বাজারের রাস্তা যেন অন্যদিনের চেয়ে বেশি থম্‌থমে হয়ে গিয়েছিল। তাড়াতাড়ি জগৎশেঠজীর বাড়িতে যেতেই জগৎশেঠজী বললেন—কী হলো? কিছু টের পেলেন?

ছোটমশাই বললে—না, ও-নামে ওখানে কেউ থাকে না, ওরা বললে। এখন কী করবো আপনি বলুন!

জগৎশেঠজী অনেকক্ষণ ভাবলেন। তারপর বললেন—তাহলে আমি যে-খবর শুনেছি সেইটেই ঠিক! হয়তো আপনার সহধর্মিণী ক্লাইভের হাতেই ধরা পড়েছে—

—তাহলে আমি কি কলকাতায় যাবো, আপনি বলছেন? ক্লাইভ সাহেব আমাকে খুব ভালো করে চেনেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে গিয়ে আমি একবার তাঁর সঙ্গে আমার সব কথা বলে এসেছি—

জগৎশেঠজী বললেন—তাহলে তো ভালোই হয়েছে। আপনি গেলেই সাহেব আপনার হাতেই আপনার সহধর্মিণীকে দিয়ে দেবেন! এ ভালোই হয়েছে, আপনি এখনি চলে যান—

—এই রাত্রেই?

জগৎশেঠজী বললেন—হ্যাঁ, এই রাত্রেই। নইলে হয়তো আপনার দেরি হয়ে যাবে। আমি শুনলাম নবাব কাল সকালেই ফিরিঙ্গীদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাচ্ছে—

—আবার?

জগৎশেঠজী বললেন—হ্যাঁ আবার। নইলে ক্লাইভ সাহেবই মুর্শিদাবাদে হামলা করতে আসতো। এবার আর কলকাতায় যুদ্ধটা করতে দিতে চায় না ফিরিঙ্গীরা। সেবারে বড় লোকসান হয়েছিল ওদের—

তা সেই কথার ওপরই নির্ভর করে ছোটমশাই নৌকো চালিয়ে চলে এসেছিল

কলকাতায়। নিষুতি রাত। ছোটমশাই-এর মাঝি-মাল্লাদেরও হয়েছে জ্বালা। এতদিন ধরে তারা বজরা চালাচ্ছে। পুরুষানুক্রমে হাতিয়াগড়ের এই মাঝি-মাল্লার বংশধরেরা এই কাজই করে আসছে। কিন্তু এই ক'মাস ধরে যে ঝামেলা চলছে তার যেন আর শেষ নেই। একবার হাতিয়াগড়, একবার মুর্শিদাবাদ, একবার কৃষ্ণনগর, আর একবার কলকাতা। এই-ই করতে হচ্ছে কয়েক মাস ধরে। পরের দিন মাঝরাত্রে এসে ছোটমশাই-এর নৌকো পৌঁছলো ত্রিবেণীর ঘাটে।

এই ঘাট দিয়েই একটু আগে দলে দলে কোম্পানীর ফৌজ গেছে। তখনো মানুষের পায়ের চাপে ঘাটের পথ কাদায়-কাদায় নোংরা হয়ে আছে।

ছোটমশাই-এর নৌকোটা ঘাটে লাগতেই ছোটমশাই বললে—এখানেই রাখ বিন্দাবন, একটু ফরসা হোক তখন নামবো—

ঘাটের আর একদিকে আর একটা বজরার ভেতরে তখন ফিস্ ফিস্ করে যেন কাদের কথা হচ্ছে।

—ওরা আবার কারা এল?

ছোট বউরানী আর দুর্গা তখন একপাশে চুপ করে শুয়ে ছিল। এ ক'দিন দুজনেরই ঘুম নেই খাওয়া নেই শান্তি নেই। এতদিন পরে যেন একটু নিশ্চিন্ত আশ্রয় পেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। কিন্তু মরালী তখনো জেগে। দাঁড়ের শব্দ পেয়ে সে চম্‌কে উঠেছিল। বললে—ওরা আবার কারা এল?

কান্ত বললে—অত জোরে কথা বোল না তুমি, শুনতে পাবে ওরা—

মরালী বললে—তার চেয়ে বজরা ছেড়ে দিতে বলো—

কান্ত বললে—মনে হচ্ছে ব্যাপারীদের নৌকো—আমি দেখে আসছি—

বলে কান্ত বাইরের দিকে মুখ বাড়িয়ে দেখলে।

বাইরে এসে অন্ধকারে ভালো দেখা যাবে না জেনেও কান্ত ভালো করে দেখবার চেষ্টা করলে। সময় খারাপ। এ সময়ে সকলকেই সন্দেহ হয়। ভাগ্যিস পেরিন সাহেবের বাগান ছেড়ে ফিরিঙ্গীরা যুদ্ধ করতে গেছে, নইলে ছোট বউরানীকে কি আর বের করে নিয়ে আসা যেত।

একবার ইচ্ছে হলো মাঝিদের সঙ্গে ভাব করে জেনে নেয় বজরার ভেতরে কে আছে, কিংবা কার বজরা। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আবার ভয় হলো। ব্যাপারটা যদি জানাজানি হয়ে যায়। যদি ক্লাইভ সাহেবের কানে কেউ খবরটা দিয়ে দেয়।

ভেতরে ঢুকতেই মরালী বললে—কী হলো? কে?

কান্ত বললে—জিজ্ঞেস করতে ভয় করতে লাগলো। ভেবেছিলাম ব্যাপারীদের নৌকো, তা নয়, এ একটা বজরা—

—কার বজরা?

—তা জিজ্ঞেস করিনি।

মরালী একবার চেয়ে দেখলে কোণের দিকে দুর্গা আর ছোট বউরানী দুজনেই ঘুমোচ্ছে।

কান্ত জিজ্ঞেস করলে—এখন ওদের নিয়ে কোথায় যাবে বলো তো? ওদের জন্যে দেখছি শেষকালে তুমি না ধরা পড়ে যাও—

—কেন? আমাকে কে ধরবে?

কান্ত বললে—বাঃ, চেহেল্-সুতুনে যদি তোমার খোঁজ পড়ে? যদি নানীবেগম-সাহেবা জানতে পারে তুমি পালিয়ে গেছো, যদি নবাবের কানে কেউ তুলে দেয় খবরটা? তখন?

মরালী হেসে বললে—আমার জন্যে আমি ভাবি না। আমাকে এখন খুন করে মেরে ফেললেও আমার কিছু বলবার নেই। ছোট বউরানীর জন্যেই তো আমি এত কাণ্ড করতে গিয়েছিলুম। ছোট বউরানীর জন্যেই তো আমি চেহেল্-সুতুনে এসেছিলুম—

কান্ত বললে—তা তো জানি, কিন্তু তুমিই কি ফ্যাল্না? তোমার নিজের সুখ-দুঃখ বলতে কিছু নেই? তুমি তোমার নিজের দিকটা একবারও ভাববে না?

মরালী বললে—ও-সব কথা অনেক শুনেছি, আর শুনতে ভালো লাগে না। এখন ওদের নিয়ে কোথায় যাবো তাই ভাবছি। এমন অঘোরে ঘুমোচ্ছে দু'জনে...

কান্ত বললে—ওদের ডাকো-না, ওদের জিজ্ঞেস করো-না, কোথায় ওরা যেতে চায়!

সত্যিই তখন ঘুমিয়ে পড়েছিল দু'জনে। দুর্গার মত দজ্জাল মেয়েমানুষও ক'দিনের মধ্যে কাবু হয়ে পড়েছিল। মরালী যদি আর একদিন দেরি করতো তা হলে হয়তো গলায় দড়ি দিয়ে মরতে হতো তাদের। বড় ভয় পেয়ে গিয়েছিল ছোট বউরানী। প্রথম যখন দুর্গা কান্তকে দেখলে তখন ভয়ে আঁত্কে উঠতে যাচ্ছিল। কিন্তু কান্ত বলেছিল—চুপ করো, চেঁচিও না, আমি মরালীর কাছ থেকে আসছি—

দুর্গা বলেছিল—কোথায় সে মুখপুড়ী?

—তোমরা রাগ ক'রো না, চেঁচিও না, চেঁচালে জানাজানি হয়ে যাবে। তোমাদের চিঠি মরালী পেয়েছে, পেয়ে নিজে তোমাদের নিতে এসেছে, এই গঙ্গার ঘাটে বজরাতে রয়েছে—

—তা ডাকো তাকে। সে আসছে না কেন?

কান্ত বলেছিল—মরালী এলে ধরা পড়তে পারে। মরালীই আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছে।

—তুমি কে?

কান্ত বললে—আমি কান্ত!

দুর্গা বললে—কান্ত বললেই হলো? কান্ত কী? মরির সঙ্গে তোমার কীসের সম্পর্ক? সে তোমাকে পাঠিয়েছে কেন? তুমি কি নবাব-নিজামতে চাকরি করো? তোমাদের কাউকে আমার বিশ্বাস নেই। এই বেটা সাহেব, যে আমাদের আটকে রেখেছে এখানে, ভেবেছিলাম সে মানুষটা বুঝি ভালো। এখন দেখছি সে মানুষটাও হারামজাদা! আমরা বাপু যাকে-তাকে আর বিশ্বেস করছিনে। তুমি মুখপুড়ীকে গিয়ে ডেকে নিয়ে এসো, সে এসে না ডাকলে আমরা যাচ্ছিনে—

শেষ পর্যন্ত সেই অন্ধকার রাত্রে মরালীকেই আসতে হয়েছিল। মরালীকে দুর্গা প্রথমটা যা-নয় তাই বলে গালাগালি দিতে আরম্ভ করেছিল—মুখপুড়ী, মড়াপুড়ুনী, তোর নরকেও ঠাঁই হবে না। তোকে মুর্দোফরাসেও ছোঁবে না হারামজাদী! যার খাস্ তারই সর্বনাশ করিস তুই, তোর এত বড় আস্পর্ধা?

সামনে পেয়ে দুর্গা হয়তো আরো অনেক গালাগালি দিয়ে মনের ঝাল মেটাতো, কিন্তু তার আগেই মরালী একেবারে দুর্গার পা দুটো জড়িয়ে ধরেছে—দোহাই তোমার দুগ্যাদি, এখন গালাগালি দেবার সময় নয়, পরে যত ইচ্ছে গালাগালি দিও—

—বেরো, বেরো এখান থেকে, বেরো—আমাকে ছুঁসনে—

বলে দুর্গা পা দিয়ে লাথি মেরে মরালীকে দূরে সরিয়ে দিলে। মরালী গিয়ে পড়লো ঘরের কোণের দিকে।

চেঁচামেচিতে ছোট বউরানীর ঘুম ভেঙে গিয়েছে। ঘুম ভেঙে উঠেই কাণ্ড দেখে অবাক।

বললে—ও কে দুগ্যা? আমাদের মরালী?

বলে মরালীর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু দুর্গাই বাধা দিলে। বললে—ছুঁও না, ছোট বউরানী, মুখপুড়ীকে ছুঁও না, ও গরু খেয়েছে, মোছলমান হয়েছে—

পাশে দাঁড়িয়ে কান্তর কানে সব কথাগুলো যাচ্ছিল। তার ভীষণ রাগ হলো। যাদের জন্যে মরালী এত করলে তারাই কিনা এমন করে তার হেনস্থা করছে!

কিন্তু ছোট বউরানী ততক্ষণে ব্যাপারটা বুঝে নিয়েছে। দুর্গাকে বললে—তুই সর—তুই কেন ওকে বকছিস অত?

তারপর মরালীর কাছে গিয়ে বললে—আমাদের চিঠি পেয়েছিলি তুই?

মরালী তাড়াতাড়ি টিপ্ করে একটা প্রণাম করে বললে—আমি তোমাদের নিতেই তো এইছি ছোট বউরানী। সত্যি বলছি, তুমি বিশ্বাস করো, আমি গরু খাইনি—

দুর্গা বললে—গরু খেলে তুই-ই নরকে যাবি, আমাদের কী!

ছোট বউরানী সে কথায় কান না দিয়ে বললে—আমাদের এখ্খুনি নিয়ে চলো ভাই, তুমি না এলে আমি গলায় দাঁড় দিয়ে মরতুম—

কিন্তু তখন আর কথা কাটাকাটির সময় নেই। ওদিকে মনে হলো কাদের যেন পায়ের শব্দ হলো। যদি কেউ এসে পড়ে তো সকলেরই সর্বনাশ। দরজার তালা ভাঙার সময়েই যে কেউ টের পায়নি সেই-ই যথেষ্ট। তারপর আর দেরি করলেই হয়তো কারো ঘুম ভেঙে যাবে। যে যেমন অবস্থায় ছিল তেমনি অবস্থায়ই ঘর থেকে বেরিয়ে এসে নৌকোয় উঠলো।

নৌকোয় উঠেও যেন ভয় যাচ্ছিল না ছোট বউরানীর। ভেতরে বিছানার ব্যবস্থা ছিল, খাবার-দাবার ছিল। সব বন্দোবস্তই করে এসেছিল মরালী।

কিন্তু ছোট বউরানী খেতে চাইলে না। বললে—না রে, আমাকে খেতে বলিসনে। তুই যে আমাকে মনে রেখেছিস, মনে রেখে আমাকে ছাড়িয়ে নিয়ে এলি এই-ই আমার যথেষ্ট।

দুর্গাও মুখে কুটোটি পর্যন্ত দিলে না।

মরালী বললে—তুমি খাও ছোট বউরানী, ও খাবার আমি নিজে ছুঁইনি—

দুর্গা বললে—না বাছা, তুমি নিজে জাত দিয়েছো, আমাদের আর জাত নিও না—এখনো দু' বেলা কাচা-কাপড়ে সন্ধ্যে-আহ্নিক করি—

—কিন্তু জল? জলটুকুও খাবে না?

—আমাদের এই গঙ্গার জলই যথেষ্ট—বলে গঙ্গা থেকে আঁজলা ভর্তি করে জল নিয়ে ঢোক ঢোক করে খেলে।

দুর্গা বললে—এ ক'দিন দিনে-রাতে এক ফোঁটা ঘুমোতে পর্যন্ত পারিনি, একটু ঘুমোব—

বলে বিছানায় গড়িয়ে পড়লো।

মরালী বললে—তোমরা কোথায় যাবে তাই আগে বলো দুগ্যাদি, তোমাদের আমি পৌঁছে দিই—

—তা তুই কোথায় যাবি এখন?

—যেদিকে তুমি বলবে সেই দিকেই তোমাদের নিয়ে যাবো।

—কিন্তু তুই নিজে? তুই নবাবের হারেমে ফিরে যাবি?

মরালী বললে—আমার কথা ছেড়ে দাও দুগ্যাদি! একদিন তোমাদের জন্যেই আমি নবাবের হারেমে গিয়েছিলাম, তোমাদের জন্যেই নিজের জাত খুইয়েছিলাম। আজকে যদি তোমাদের আবার কোথাও নিরাপদ জায়গায় পৌঁছিয়ে দিতে পারি তো আমার কাজ ফুরিয়ে যাবে, তারপরে আমি বাঁচি আর মরি তা নিয়ে ভাবনা করবো না—

তারপর হঠাৎ যেন একটা কথা মনে পড়ে গেল মরালীর।

বললে—আমার বাবা কেমন আছে দুগ্যাদি—? বাবা কি আমাকে একেবারে ভুলে গেছে?

দুর্গারও যেন এতক্ষণে মনে পড়লো। বললে—তবু যা হোক তোর বাপের কথা মনে আছে দেখছি—

—মনে থাকবে না দুগ্যাদি? বাবার কথা কি ভুলতে পারি? জাত দিয়েছি বলে কি বাপের কথাও ভুলে যাবো? মেয়ে হয়ে কি বাপের কথা কেউ ভুলতে পারে?

তারপর বাবার কথার সঙ্গে সঙ্গে যেন চোখের সামনে সব ভেসে উঠলো। বললে—সেই ছাতিম-তলার ঢিবিটা এখনো আছে দুগ্যাদি? আহা, সেই বাবুদের বাড়ির দেউড়ির সেই আতাগাছটা? আর আমার নয়ানপিসি? তার খবর কী দুগ্যাদি? নন্দরানীদিদি এখন কী করছে? আমার সেই বিয়ের বাসরে যার বরের মরার খবর এসেছিল? নন্দরানীদির মায়ের কান্নার কথা আমার এখনো মনে আছে, জানো দুগ্যাদি! আমি কিছুছু ভুলতে পারি না। তোমরা ভাবো আমি খুব আরামে আছি। কিন্তু কী আরামে যে আছি তা যদি তুমি দেখতে পেতে?

এক মনে মরালী তার কথা বলে যেতে লাগলো। হঠাৎ এক নিমেষের মধ্যে যেন আবার সে সেই হাতিয়াগড়ে গিয়ে পৌঁছেছে।

কথা শুনতে শুনতে দুর্গা বললে—অত কাছে সরে আসিসনে বাছা, ছুঁয়ে দিবি শেষকালে!

মরালী বললে—কিন্তু দুগ্যাদি, এতদিন তো তুমি ক্লাইভ সাহেবের ছোঁয়া খেয়েছো?—

—কে বললে সাহেবের ছোঁয়া খেয়েছি? আমাদের রান্না তো সব হরিচরণ করতো। তাকে তো মেরে ফেলেছে ওরা। সে থাকলে কি আর তোকে চিঠি লিখতুম? কী গো ছোট বউরানী, তুমি বলো না— হরিচরণ থাকলে কি অমন করে মরি-কে চিঠি লিখতুম?

ছোট বউরানী বললে—তুই থাম্ তো দুগ্যা, বক্‌বক্ করিসনি, আমার ঘুম পাচ্ছে, আমি ঘুমোই—

মরালী বললে—তুমিও ঘুমোও দুগ্যাদি, আমি আর তোমাকে বিরক্ত করবো না। তুমি সেই আমার বিয়ের দিন যে উপকার করেছো তা আমি জীবনে ভুলবো না—

দুর্গার মনে পড়ে গেল। বললে—হ্যাঁ রে, সে ভাতার তোর আর খোঁজ করেনি?

মরালী বললে—খোঁজ করেছিল দুগ্যাদি, পালকী করে মুর্শিদাবাদ যাবার সময় একটা সরাই-এর সামনে তার গান শুনেছিলাম। খুব খেদের গান—'আমি রবো না ভব-ভবনে—'

—তা তুই কী বললি?

—আমি আর কী বলবো দুগ্যাদি! তখন যদি কথা বললে ধরা পড়ে যাই, তাই আর কিছু বলিনি!

—বলিসনি, বেশ করেছিস—ও একটা বাউণ্ডুলে মানুষ, তুই ওর সঙ্গে ঘ

করতে পারবি কেন? তা হ্যাঁ রে, নবাবের হারেমের ভেতরটা কেমন রে? খুব কষ্ট? না, খুব আরাম? শুনেছি নাকি বেগমরা সব গোলাপ-জল দিয়ে চান করে, সোনার থালায় ভাত খায়? বাঁদীরা খাইয়ে দেয়, কাপড় পরিয়ে দেয়, ঘুম পাড়িয়ে দেয় গান গেয়ে গেয়ে? সত্যি?

মরালী বললে—না দুগ্যাদি, সব মিথ্যে কথা, সবাই কাঁদে, কাঁদে আর কষ্ট ভোলবার জন্যে আরক খায়—

—আরক খায়? আরক কী রে? সে খেলে কী হয়?

মরালী বললে—সে এক রকম বিষ দুগ্যাদি।

—বিষ?

—হ্যাঁ দুগ্যাদি, সেঁকো বিষ। সেই বিষ বাজার থেকে কিনে এনে নবাবের বেগমরা সব খায়।

—কেন, বিষ কিনে খায় কেন? মরতে?

মরালী বললে—না দুগ্যাদি, সে বিষ খেলে মানুষ সব ভুলে যায়। দুঃখু ভুলে যায়, সুখ ভুলে যায়, আত্মীয়-স্বজন-বাপ-মা সকলের কথা ভুলে যায়। সে খেলে মনে হয় যেন কোন কষ্ট নেই আমার। গায়ে লোহা পুড়িয়ে ছ্যাঁকা দিলেও ব্যথা লাগে না, আর সারা অঙ্গ যখন জ্বলে যায় তখন সেই আরকের নেশায় বেগমরা খিলখিল করে হাসে!

—ওমা, বলছিস কী তুই? তুই তাই খেতিস্?

মরালী বললে—তা খেলেও যদি ছোট বউরানীর কিছু উপকার হতো তো তা-ও খেতাম দুগ্যাদি—বিশ্বাস করো দুগ্যাদি, আমি তোমাদের জন্যে সব করতে পারতুম! কিন্তু তার দরকার হয়নি। তোমাদের যে আমি শেষ পর্যন্ত ডাকাতের হাত থেকে বাঁচাতে পেরেছি তাই-ই আমার যথেষ্ট—

দুর্গা বললে—এ ক'মাস যে কী কষ্টে আছি তা তোকে কী বলবো মরি—

—তা এখন তো তুমি মুক্তি পেলে দুগ্যাদি, এখন আর তোমার ভয় নেই!

দুর্গা বললে—ছোটমশাই-এর পায়ের কাছে যেদিন এই ছোট বউরানীকে তুলে দিতে পারবো সেইদিন বুঝবো আমার মুক্তি হয়েছে! তার আগে নয়। কী কুক্ষণেই যে কার মুখ দেখে বেরিয়েছিলাম হাতিয়াগড় থেকে!

মরালী বললে—তা হাতিয়াগড় থেকে তোমরা বেরোতে গেলে কেন দুগ্যাদি? আমিই তো ছোট বউরানী সেজে চেহেল্-সুতুনে গিয়ে উঠেছিলাম? ছোট বউরানীকে তুমি আড়াল করে রাখতে পারোনি? যাতে কেউ জানতে না পারে?

দুর্গা বললে—সব কপাল রে মরি, সবই কপাল!

—তা যা বলেছো দুগ্যাদি! আমি চেহেল্-সুতুনে গিয়ে ভেবেছিলাম ছোট বউরানীর বুঝি খুব উপকার করলাম! কিন্তু এমন করে যে তোমাদের ভুগতে হবে তা কি জানতাম!

তারপর বাইরের দিকে চেয়ে ডাকলে—কান্ত!

কান্ত বাইরে গিয়েছিল, ভেতরে এল। মরালী বললে—মাঝিদের বলে দাও ত্রিবেণীর ঘাটে যেন বজরা বাঁধে—

কান্ত বাইরে চলে গেল।

দুর্গা জিজ্ঞেস করলে—ও কে রে মরি? ছেলেটা কে? তোর চাকর বুঝি?

—হ্যাঁ দুগ্যাদি, আমার চাকরই বটে!

—চাকরই বটে মানে? তা হলে তোর চাকর নয় সত্যি-সত্যি? তখন থেকে

তো দেখছি তোর কথায় উঠছে-বসছে, আমাদের হরিচরণও ঠিক অমনি ছিল—

মরালী বললে—নিজের বলতে তো আমার কেউ নেই দুগ্যাদি। তবু ওর মত নিজের লোক আমার আর কেউ নেই—আমার জন্যে ও প্রাণও দিতে পারে—

—তা বেশ পেয়েছিস তো চাকরটাকে! কত করে মাইনে দিতে হয়?

মরালী বললে—সবাই কি মাইনে চায় দুগ্যাদি, না মাইনে নেয়! মাইনে না পেলেও ও কাজ করবে, ও এমন মানুষ। আর তা ছাড়া আমি খুশী হলেই ওর সব পাওয়া হয়—

দুর্গা বললে—তোর হেঁয়ালি কথা আমি বুঝতে পারছিনে বাপু, পষ্ট করে বল্—

মরালী বললে—তোমার বুঝেও দরকার নেই দুগ্যাদি, ও তুমি বুঝতেও পারবে না—তুমি বরং ঘুমোও, ক'দিন ধরে তোমার ঘুম হয়নি—আমি তোমায় ডেকে দেবো'খন—

বলে দুর্গার বিছানাটা পেতে দিলে মরালী। অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল। দুর্গা ছোট বউরানীর পায়ের কাছে শুয়ে পড়লো। বাইরে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। মরালী বাইরে চোখ মেলে তাকালো। ছই-এর বাইরে কান্ত তখন ফাঁকা আকাশের দিকে চেয়ে চুপ করে বসেছিল।

মরালী ডাকলে—কান্ত, শোনো—

কান্ত ছায়ার মত কাছে এল। মরালী বললে—কী ভাবছো?

কান্ত বললে—কই, কিছু ভাবছি না তো!

—ভাবছো, কেন আমি তোমায় ডেকে নিয়ে এলাম, কোথায় এদের নিয়ে যাচ্ছি! ভাবছো যদি তোমাকে নিয়ে এলুম তো তোমার সঙ্গে কথা বলছি না কেন! এইসব ভাবছো তো?

কান্ত বললে—না, আমি ও-সব কিছুই ভাবছি না—

মরালী সে কথায় কান না দিয়ে বললে—যাদের জন্যে আমি নিজের সব সুখে জলাঞ্জলি দিয়েছি এরা তারা, তা তো তুমি জানো?

কান্ত বললে—জানি—

—এখন এদের তো উদ্ধার করা হলো। এখন এদের হাতিয়াগড়ে পৌঁছে দিয়ে তুমি আমাকে যেখানে খুশি নিয়ে যেতে চাও, চলো।

কান্ত বললে—বলছো কী তুমি?

মরালী বললে—হ্যাঁ, ঠিকই বলছি, একদিন তুমিই আমাকে চেহেল্-সুতুন থেকে পালিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিলে। সেদিন এই ছোট বউরানীর মুখ চেয়েই যেতে পারিনি। আজ আর আমার কারোর ওপর কোনো দায়-দায়িত্ব নেই, আজ আমি স্বাধীন!

কান্ত তখনো কথাটা বুঝতে পারেনি।

মরালী বলেছিল—হাঁ করে দেখছো কী? আমি যা বলছি তাই করো—

কান্ত তখনো যেন বিশ্বাস করতে পারছে না। বললে—তুমি আমার সঙ্গে পালিয়ে যাবে?

—কেন, পালাতে দোষ কী? এতদিন ওদের কথা ভেবেই আমি চেহেল্-সুতুন ছেড়ে যেতে চাইনি। এবার তো আর সে বাধা নেই!

কান্ত বললে—তা হলে নবাব? তুমি যে নবাবকে অত ভালোবাসতে?

মরালী হাসলো। বললে—নবাবের কি ভালোবাসার লোকের অভাব আছে?

নবাবকে ভালোবাসতে লোকের অভাব হয় না।

—কিন্তু তুমিই যে এতদিন পরে নবাবকে ঘুম পাড়ালে মরালী! তুমিই যে নবাবকে কোরাণ পড়াতে শেখালে! নবাব যে তোমাকে না পেলে পাগল হয়ে যাবে!

মরালী আবার হেসে উঠলো।

বললে—তুমি তা হলে নবাবকে ছাই চিনেছো! যেদিন নবাব মুর্শিদাবাদের মসনদ ছাড়তে পারবে সেইদিনই নবাব মানুষ হয়ে উঠবে। তার আগে নয়। তুমি তো জানো না, নবাবদের কাছে আগে মসনদ, তারপরে বেগম। বেগমরা তো নবাবের সম্পত্তি! নবাব কখনো বেগমদের ভালোবাসতে পারে? না বেগমরাই কখনো ভালোবাসতে পারে নবাবকে!

কান্ত সব শুনে খানিকক্ষণ চুপ করে রইলো। তারপর বললে—তা হলে?

—তা হলে যা বললুম তাই করো!

কান্ত বললে—তুমি কি পাগল হয়েছো? তোমাকে নিয়ে আমি কোথায় পালাবো? যদি কেউ জানতে পারে তো তখন কী বিপদ হবে বলো তো?

মরালী বললে—তুমি তোমার বিপদের কথাটাই ভাবছো আর আমার কথাটা একবারও ভাবছো না? এর পর পালিয়ে না গিয়ে কি আমার উপায় আছে মনে করো? আমি কোথায় যাবো? আমি কি আমার বাবার কাছে গিয়ে এর পরও মুখ দেখাতে পারবো? এর পর কে আমাকে আশ্রয় দেবে বলতে পারো?

—কেন, তুমি ছোট বউরানীর সঙ্গে ছোটমশাই-এর বাড়িতেই থাকবে!

—তবেই হয়েছে! পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে গিয়েছিলাম, তাতেই বলে পা সরিয়ে নিলে, এর পর বাড়িতে থাকতে দেবে, খেতে দেবে!

—কিন্তু তুমি তো ওদের জন্যে অনেক করলে মরালী? কারোর জন্যে কেউ যা করে না তুমি তাই-ই করেছো, তবু বলছো তোমাকে থাকতে দেবে না ওদের বাড়িতে?

মরালী বললে—ও কথা থাক্—এখন কী করবে বলো? এবার যখন বেরিয়েছিলুম তোমাকে নিয়ে তখনই ভেবে ঠিক করে নিয়েছিলুম যে, আর চেহেল্-সুতুনে ফিরবো না।

—ওদের হাতিয়াগড়ে পৌঁছিয়ে দিলে যদি আবার কোনো বিপদ হয়, তখন?

—আবার কী বিপদ হবে?

—যদি মেহেদী নেসার সাহেব আবার জানতে পারে যে, তুমি হাতিয়াগড়ের আসল ছোট বউরানী নও, তখন? যদি জানতে পারে যে, ছোট বউরানী হাতিয়াগড়ের বাড়িতেই আছে, তখন?

মরালীও কথাটা ভাবলে খানিকক্ষণ। তারপর বললে—তা হলে কোথায় ওদের নিয়ে যাই বলো তো? কোথায় নিয়ে গিয়ে ওদের লুকিয়ে রাখি?

কান্তও ভাবছিল। বললে—মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে ছোটমশাই-এর তো খুব জানাশোনা আছে শুনেছি, তাদের কাছে সেই কেষ্টনগরেই না-হয় রেখে আসি—

হঠাৎ বজরাটা থেমে গেল। বাইরে থেকে মাঝি বললে—ত্রিবেণীর ঘাটে এসে গেছি হুজুর—

কান্ত বললে—এই ত্রিবেণীর ঘাটেই বজরা বাঁধো—

তারপর মরালীর দিকে চেয়ে বললে—ওদের জিজ্ঞেস করো ওরা কেষ্টনগরে যাবে কিনা—

মরালী বললে—আহা, ওরা ঘুমোচ্ছে ঘুমোক, জাগলে তখন জিজ্ঞেস করবো—

তার আগে বলো আমি কোথায় যাবো?

কান্ত বললে—দাসমশাই? দাস-মশাই-এর কাছে যেতে তোমার আপত্তি কীসের?

ঠিক এই সময়েই আর একটা নৌকো এসে ঘাটে লাগবার শব্দ হলো।

মরালী বললে—কারা এলো ঘাটে?

কান্ত দেখে এসে ভেতরে ঢুকে বললে—না, ব্যাপারীদের নৌকো নয়, মনে হলো কোনো জমিদার-টমিদার হবেন; অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম, কেউ নামলো না। বোধ হয় ভেতরে ঘুমোচ্ছে—

—তা যদি চিনে ফেলে আমাদের? মাঝিদের জিজ্ঞেস করলে না কেন, ভেতরে কে আছে?

কান্ত বললে—না, তাতে হয়তো আরো সন্দেহ হবে! ভাববে আমরাই বা অত খোঁজ নিচ্ছি কেন। তার চেয়ে চলো এখান থেকে চলে যাই—

হঠাৎ বাইরে থেকে মাঝিটা ডাকলে—হুজুর—

কান্ত বেরিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলে—কী?

—এই দেখুন হুজুর, ওই বজরার মাঝি একবার আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাইছে—

—কী, বলো?

লোকটা বিনীত হয়ে নমস্কার করে বললে—আজ্ঞে, আপনারা বলতে পারেন, ফিরিঙ্গী ক্লাইভ সাহেব কলকাতায় আছে কিনা!

কান্ত বললে—ক্লাইভ সাহেব কলকাতায় আছে কিনা তা আমরা বলবো কী করে? আমরা কি ক্লাইভ সাহেবের দফ্‌তরে চাকরি করি!

—আজ্ঞে তা নয়, রাস্তায় একজন বললে কিনা সাহেব ফৌজ-সেপাই নিয়ে কলকাতা ছেড়ে কাটোয়ার দিকে গেছে। তাই বাবুমশাই আপনাকে জিজ্ঞেস করতে বললেন! আপনারা কিছু জানেন কিনা তাই জানতে চাইছেন—

—না বাপু, আমরা ও-সব কিছু জানি না।

বৃন্দাবন আর একবার নমস্কার করে আবার নিজের বজরায় গিয়ে উঠলো। ছোটমশাই তখন বিছানায় গা এলিয়ে শুয়েছিল।

বৃন্দাবন আসতেই ছোটমশাই জিজ্ঞেস করলে—কী রে বৃন্দাবন, কী বললে ওরা?

বৃন্দাবন বললে—না হুজুর, ওঁয়ারা কিছু জানেন না—

ছোটমশাই আবার জিজ্ঞেস করলে—ক্লাইভ সাহেব এ রাস্তা দিয়ে ফৌজ নিয়ে যায়নি?

—আজ্ঞে, ওঁয়ারা কিছুই জানেন না!

ছোটমশাই ভাবলে, তা হবে, হয়তো ছোটোলোক। কোনো খবরই রাখে না। কিংবা হয়তো বিদেশী লোক, সবে এইমাত্র ঘাটে এসে লেগেছে। মাথাটা তুলে ছোট ঘুলঘুলিটা দিয়ে বাইরের আকাশের দিকে চেয়ে রাতটা আন্দাজ করবার চেষ্টা করলে ছোটমশাই। পূর্বদিকটায় একটু যেন লালচে আভা দিয়েছে। আর খানিক পরেই ভোর হবে। তারপর মাথাটা আবার বালিশের ওপর রেখে বললে—ঠিক আছে, তুই এখন একটু ঘুমিয়ে নে, আমি তোকে ডাকবো'খন—

আর সত্যিই তখন কেউ-ই জানতে পারলে না যে, পূর্বদিকের আকাশটা অন্য দিনের চেয়ে যেন একটু বেশি লালই হয়ে উঠেছে। জানতে পারলে না যে অষ্টাদশ শতাব্দীর অন্ধকার কেটে গিয়ে ভোর হতে বেশি দেরি নেই!

লক্কাবাগের ছাউনির ভেতরে নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলা তখন পর্দার ফাঁক দিয়ে একবার বাইরের দিকে চাইলে। সত্যিই আকাশটা যেন অন্য দিনের ভোরের চেয়ে একটু বেশি লাল। কিংবা হয়তো কুয়াশার জালে আটকে গেছে সূর্যের আলোটা। তাই অত লাল দেখাচ্ছে।

ভোর রাত পর্যন্ত মেহেদী নেসার নবাবের সঙ্গে ছিল। তারপর নবাবের ঘুম পাচ্ছে দেখে বাইরে বেরিয়ে এল। ওদিকটা চুপচাপ। লাল-লাল টুপি মাথায় ফিরিঙ্গীদের দূর থেকে দেখা যায় ছোট ছোট পিঁপড়ের সারির মত।

মেহেদী নেসার সাহেব একটা তুড়ি মারলে নিজের মনেই! টাকা নিয়েই যত গোলমাল। মীর্জা মহম্মদ প্রথমে যখন ভয় পেয়েছিল তখন মেহেদী নেসার সাহেবই তো সাহস দিয়েছে তাকে।

মীর্জা বলেছিল—এত টাকা এখন কোথায় পাবো?

ফৌজী-সেপাইরা সবাই একজোটে বেঁকে বসেছিল মুর্শিদাবাদে। অনেক দিন মাইনে পায়নি তারা!

মেহেদী নেসার বলেছিল—শালাদের সব গুলি করে মারবো, শালারা হারামজাদা—

মীর্জা থামিয়ে দিয়ে বলেছিল—না থাক, এখন বিপদ আমার, এ সময় ওরাও যদি বেঁকে বসে তো কাদের ভরসায় লড়াই করতে যাবো—

ইয়ারজান সাহেবও সেই কথায় সায় দিলে। মীরমদন, মোহনলাল, মীরজাফর সাহেবও সেই কথায় সায় দিলে।

মীরজাফর সাহেব বললে—টাকা সব মিটিয়ে দিলেই হয়—

মীর্জা মহম্মদ বললে—বিশ্বাস করুন, টাকা নেই আমার। অত টাকা দিতে গেলে সব খালি হয়ে যাবে—

আশ্চর্য, সেই টাকা সমস্ত শোধ করার পর তবে সেপাইরা রাজী হয়েছে লড়াইতে আসতে। দুর্লভরাম, ইয়ার লুৎফ খাঁ সবাই এসেছে। এই লক্কাবাগের তিন দিক ঘিরে ফৌজ সাজিয়েছে মীর-বক্সী সাহেব।

পঁয়ত্রিশ হাজার পায়দল ফৌজ, পনেরো হাজার ঘোড়সওয়ার, আর চল্লিশটা কামান। আর ওদিকে দাঁড়িয়ে আছে ফরাসীরা। তাদের রাগ তখন সাঁ মেতৌঁন। তারা কথা দিয়েছে, ইংরেজদের তারা গুঁড়িয়ে পিষে মেরে ফেলবে তবে ঠাণ্ডা হবে। ইউনিয়ন জ্যাকের ওপরই তাদের বেশি রাগ, যে ইউনিয়ন জ্যাক তাদের চন্দননগরের কেল্লার ওপর উড়ছে।

মেহেদী নেসার সাহেব আর একবার তুড়ি দিলে নিজের মনেই।

তুড়ি দিতেই হঠাৎ যেন শিউরে উঠেছে।—কে?

বশীর মিঞা কখন ছায়ার মতন পেছনে এসেছিল জানতে দেয়নি।

—আমি বশীর মিঞা খোদাবন্দ!

—বশীর মিঞা তো কী! কী দরকার তোর? দেখছিস এখনই লড়াই শুরু হয়ে যাবে, এখন কিছু বলবার সময় নেই, তুই যা—ভাগ—

—খোদাবন্দ্‌, মরিয়ম বেগমসাহেবার তালাস করতে হুকুম দিয়েছিলেন, সেই তালাস পেয়েছি।

মরিয়ম বেগমসাহেবা! মেহেদী নেসার সাহেবের এত আনন্দের মধ্যেও হঠাৎ একটা পরাজয়ের কাঁটা খচ করে বুকে বিঁধে গেল। মুর্শিদাবাদ থেকেই মেহেদী নেসার সাহেবের টনক নড়েছে। চেহেল্‌-সুতুন থেকে নিঃশব্দে মরিয়ম বেগমের পালিয়ে যাওয়াটা যেন মেহেদী নেসার সাহেবের নিজের অপমান। ওটাকে জব্দ করতে না পারলে কীসের নবাবের পেয়ারের ইয়ার! সেই লস্করপুরের তালুকদার কাশিম আলির যে অবস্থা করেছিল, মরিয়ম বেগমেরও সেই অবস্থা না করতে পারলে যেন আর কল্‌জেটা ঠাণ্ডা হচ্ছে না। চেহেল্‌-সুতুনের খোজ সর্দার পীরালি খাঁ, নজর মহম্মদ, কেউই মরিয়ম বেগমসাহেবার হদিস দিতে পারেনি। আর তখন মীর্জা লড়াই করতে বেরোচ্ছে, টাকার জন্যে হিমসিম খাচ্ছে, সে সময়ে অত ভাববার সময়ও ছিল না। শুধু মোহরার মনসুর আলি মেহের সাহেবকে খবরটা দিয়েই এই লক্ষাবাগে চলে এসেছিল নবাবের ফৌজের সঙ্গে

তারপর এই হঠাৎ আবার মরিয়ম বেগমসাহেবার খবর পাওয়া গেল।

বশীর মিঞার দিকে চেয়ে বললে—কোথায় মরিয়ম বেগমসাহেবা?

—খোদাবন্দ্‌, ত্রিবেণীর ঘাটে!

—ত্রিবেণীর ঘাটে!

—জী হাঁ! আমি কলকাতায় গিয়েছিলুম, সেখান থেকে ঢুঁড়তে ঢুঁড়তে শেষকালে ত্রিবেণীর ঘাটে এসে পাত্তা পেলুম!

কিন্তু কথাটা শেষ হবার আগেই একটা বিকট শব্দে কানে তালা লেগে যাবার অবস্থা হলো। ফরাসীরা আচমকা একটা কামানের গোলা ছুঁড়েছে। গোলাটা গিয়ে পড়লো একেবারে ফিরিঙ্গীদের ছাউনির ওপর। আর ঠিক তার সঙ্গে সঙ্গে যেন ক'জন লোকের চিৎকার কানে এল!

—ইয়া আল্লা!

মেহেদী নেসার খুশির চোটে আর একবার তুড়ি মারলে। তারপর বশীর মিঞার দিকে চেয়ে বললে—চল, আমি ত্রিবেণীর ঘাটে যাবো—চল্‌ শালা, চল্‌—

তারপর ফিরিঙ্গীদের কামানগুলো ফেটে চৌচির হয়ে উঠলো। আর সঙ্গে সঙ্গে আওয়াজ হতে লাগলো—দুম্‌—দুম্‌—দুম্‌—

মেহেদী নেসার একবার মীরজাফর সাহেবের ফৌজের দিকে চেয়ে দেখলে কোথায়? মীরবক্সী সাহেবের মতিগতি তো বোঝা যাচ্ছে না কিছু। তবে কি সব বানচাল হয়ে যাবে? সব বন্দোবস্তই তো ঠিক হয়ে আছে। হঠাৎ নবাবের ফৌজের ডান দিক থেকে দুম-দুম করে আবার শব্দ হলো।

মেহেদী নেসার নিচু হয়ে সরে এল পাশের দিকে। বললে—সরে আয় উল্লুক মরে যাবি—

বশীর মিঞাও সরে এল প্রাণের দায়ে। সূর্যটা ততক্ষণে অনেকটা স্পষ্ট হয়েছে। মেহেদী নেসার সাহেব তখনো লড়াইটা দেখবার লোভ ছাড়তে পারছে না যা-কিছু একটা ফয়সালা যেন এবার হয়ে গেলেই হয়। নবাবের ফৌজের কামান থেকে গোলাগুলো যাচ্ছে ঠিকই, কিন্তু সবগুলোই আমগাছের ডালে গিয়ে লাগছে সারা রাস্তা নবাবের সঙ্গে এসেছে মেহেদী নেসার সাহেব। এ আসা মেহেদী

নেসারের প্রথম নয়। মীর্জা যতবার যেখানে গেছে, সেখানেই সঙ্গে গেছে। লড়াইতে গেলে ফুর্তিটা জমে ভালো। লড়াই তো করবে মীরবক্সীর ফৌজ। মরতে হলে মরবে সেপাইরা। এদিক ওদিক থেকে গুলীগোলা ছোঁড়া হবে, সেই সময়ে দূর থেকে দাঁড়িয়ে দেখতে ভালো লাগে। তারপর আছে ফুর্তি, হর্‌রা, মহ্‌ফিল। আগে আগে মীর্জার ফুর্তির ওপর লোভ ছিল। নিজেও ফুর্তি করতো, সকলকে ফুর্তি করতে বলতো। ক'মাস ধরে যেন অন্যরকম হয়ে গিয়েছিল। মতিঝিলের আম-দরবারে যখনই গেছে, সেখানকার খিদ্‌মদ্‌গার বলেছে, সদর দরওয়াজা বন্ধ। ভেতরে গিয়ে যে মীর্জার সঙ্গে একটু কথা বলবে, তার ফুরসুত মেলেনি। সব সময়েই নাকি মরিয়ম বেগম ভেতরে থাকে। যে-সময়ে মরিয়ম বেগমসাহেবা কাছে থাকে না, সে-সময়ে মীর্জা মৌলভীর কাছে কোরাণ পড়ে।

প্রথমে অবাকই হয়ে গিয়েছিল মেহেদী নেসার। তারপর হয়েছিল বিরক্ত। এ তো বড় মজা হলো। কোথা থেকে মেহেদী নেসারই নিয়ে এসেছিল এই মরিয়ম বেগমকে! হাতিয়াগড়ের রানীসাহেবা। তখন ভেবেছিল মেয়েমানুষ দিয়ে ভুলিয়ে রাখবে নবাব মীর্জা মহম্মদকে। এখন সেই মরিয়ম বেগমই আবার নবাবকে হাত করে ফেললে!

রাগটা তখন থেকেই ছিল মেহেদী নেসারের।

মনসুর আলী মেহের মোহরারকে তখন থেকেই হুকুম দিয়ে রেখেছিল, যেমন করে হোক ওই বেগমটাকে সরাতে হবে। সরাতে হবে মানে খতম করতে হবে।

মনসুর আলী মেহের সাহেব আবার যথারীতি হুকুম দিয়ে দিয়েছিল বশীর মিঞাকে।

বশীর মিঞা সেই সময় থেকে পেছনে লেগে আছে। বলেছিল—আমিই ওকে খতম করে দেবো ফুপা সাহেব!

মনসুর আলী সাহেব সাবধান করে দিয়েছিল—দূর বেল্লিক, খতম করবি না তুই, খতম করতে হলে মেহেদী নেসার সাহেব নিজেই করবে! তুই যেন বেল্লিকের মত কাম করিসনি!

কিন্তু খতম করা কি অত সোজা! বড় চালাক মেয়ে মরিয়ম বেগমসাহেবা। তাঞ্জাম তাক্ করে কতদিন চক্-বাজারের রাস্তায় ওৎ পেতে থেকেছে। ভেবেছে, যখন অনেক রাত্রে বেগমসাহেবা মতিঝিল থেকে তাঞ্জাম করে ফেরে, তখন গুম্ করে ফেলবে। খোজা নজর মহম্মদকে কতদিন পান খাইয়েছে, পীরালী খাঁকেও কতদিন তোয়াজ করবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয়নি। রাতকে-রাত কাবার হয়ে গেছে চক্-বাজারের রাস্তার অলি-গলিতে, তবু ধরতে পারেনি বেগমসাহেবাকে। কত বকুনি গালাগালি খেয়েছে মনসুর আলী মেহের মোহরার সাহেবের কাছ থেকে। আর বশীর মিঞা শুধু নিজের নসিবকে গালাগালি দিয়েছে। নিজের ওপরেই তার রাগ হয়েছে।

একদিন প্রায় সবই ঠিক বন্দোবস্ত করে ফেলেছিল। গলির মোড়ে মোড়ে লোক বসিয়ে দিয়েছিল। বেগমসাহেবা আসবে আর তার পাল্কিকে বেপাত্তা করে দেবে। কিন্তু রাত যত বাড়তে লাগলো, ততই উদ্বেগ বাড়তে লাগলো। বেগম-সাহেবার পালকির পাত্তা নেই। একবার মতিঝিল আর একবার চক্-বাজার করেছে। শেষকালে মতিঝিলে গিয়ে দেখেছে পালকি নেই। তখন এখানে-ওখানে খুঁজতে খুঁজতে একেবারে জগৎশেঠজীর হাবেলিতে গিয়ে হাজির।

জগৎশেঠজীর হাবেলির সামনে তখন বেগমসাহেবার পালকি মওজুদ।

কিন্তু ওই হারামির বাচ্ছা ভিখু শেখ! পাঠানের বাচ্ছাটা বশীর মিঞার সঙ্গে জানোয়ারের মতো ব্যবহার করে!

তারপর যখন ভোর হয়-হয়, তখন বেগমসাহেবার পালকি চলতে লাগলো আবার।

পেছন-পেছন বশীর মিঞাও চললো।

কিন্তু সে-পালকি চেহেল্-সতুনের দিকে না গিয়ে একেবারে সোজা চলতে লাগলো গঙ্গার ঘাটের দিকে।

বশীর মিঞা ভাবলে বেগমসাহেবা বুঝি বজরা করে কোথাও চললো।

পালকি-বেহারারা যখন পালকি নিয়ে চলেছে, বশীর গিয়ে জিজ্ঞেস করলে—পালকিতে কে যায়?

বেহারারা বললে—কেউ যায় না—

—বেগমসাহেবা কোথায় গেল?

—বজরায় করে চলে গেলেন।

—কোথায় গেল?

—তা জানি না হুজুর!

তারপর সেই রাত্রেই বশীর মিঞা দলবল নিয়ে আবার একটা বজরা জোগাড় করে গঙ্গা পাড়ি দিলে। আগের বজরাটা যত জোরে যায়, পেছনের বজরাটাও তত জোরে চলে। শেষে যখন সামনের বজরার পাত্তা পাওয়া গেল, তখন মুর্শিদাবাদ থেকে অনেক ক্রোশ দূরে চলে এসেছে।

কিন্তু কোথায় কী! সব ভোঁ ভাঁ!

বশীর জিজ্ঞেস করলে—বেগমসাহেবা কোথায়?

মাঝি বললে—বেগমসাহেবা? কোন্ বেগমসাহেবা? কার কথা বলছেন হুজুর?

—কেন, মরিয়ম বেগমসাহেবা? এই বজরাতেই তো ছিল। কোথায় গেল? কোথায় লুকোলো?

মাঝি বললে—কোথায় আবার লুকোবে হুজুর, এ তো খালি বজরা, এ বজরাতে সারাফত আলী সাহেবের সওদা এসেছিল হুগলী থেকে, মাল খালাস করে আবার হুগলী ফিরে যাচ্ছি—

সেবারে খুব বোকা বানিয়েছিল বেগমসাহেবা। ঝুটমুট্ হয়রানি আর ঝামেলা পোয়াতে হয়েছিল বশীর মিঞাকে। কিন্তু কোথায় যে বেগমসাহেবা গিয়েছিল, তারও ঠিকানা পাওয়া যায়নি। না ছিল পালকিতে, না ছিল বজরাতে।

মনসুর আলী মেহের সাহেব খুব ধমক দিয়েছিল—তা হলে যাবে কোথায়? পালকিতে থাকবে না, বজরাতেও না, তাহলে কোথায় যাবে? আসমানে উড়ে পালিয়ে গেল বলতে চাস?

আর শুধু একবারই নয়। আগেও অনেকবার এমনি হয়েছে। সেই সফিউল্লা সাহেবের খুন হওয়ার পর থেকেই রেগে আছে মেহেদী নেসার সাহেব। মওকা খুঁজছিল শুধু। একবার যদি ধরে ফেলতে পারা যায় তো আর রক্ষে থাকবে না।

তারপর থেকেই বশীর মিঞা আতিপাতি করে খুঁজছিল বেগমসাহেবাকে। হঠাৎ কানে এল মরিয়ম বেগমসাহেবা ধরা পড়েছে কলকাতায়। ওয়াট সাহেব আর উমিচাঁদ সাহেব বেগমসাহেবাকে ধরে ক্লাইভ সাহেবের জিম্মায় পেরিন সাহেবের বাগানে রেখে দিয়েছে। খবরটা বশীর মিঞার কানে আসতে একটু দেরি হয়েছিল। কবে গেল, কখন গেল, কিছুই টের পাওয়া যায়নি। সঙ্গে নাকি আবার একটা

বাঁদীও আছে। বাঁদী কোত্থেকে এল কে জানে! চেহেল্-সতুনের খোজারা পর্যন্ত কেউ জানলো না, কেমন করে গেল সেখানে! অথচ গেল কেন? কী মতলব আছে তার?

মনসুর আলী সাহেব বলেছিল—নিশ্চয়ই আমাদেব সব খবর ফাঁস করে দেবে—

—কোন্ খবর?

মেহেদী নেসারের মত লোকও ভয় পেয়ে গিয়েছিল। এই মীরজাফর-উমিচাঁদ-জগৎশেঠজী সকলের সব খবর জানিয়ে দেবে নাকি? সে-সব খবর জানবে কী করে মরিয়ম বেগম?

—আজ্ঞে, মীরজাফর সাহেবের দলিলটা যখন জগৎশেঠজীর বাড়িতে পড়া হচ্ছিল, তখন যে মরিয়ম বেগমসাহেবা পাশের ঘর থেকে সব শুনতে পেয়েছে।

—তা নবাবকে না-জানিয়ে ক্লাইভ সাহেবকে জানাতে যাবে কেন?

মনসুর আলী সাহেব বলেছিল—নবাবকে জানাবার সে ফুরসত পায়নি জনাব। আমার চর বশীর মিঞা যে রাস্তা আগলে দাঁড়িয়ে ছিল। তাই মতিঝিলের ভেতরে না গিয়ে বেগমসাহেবা একেবারে সোজা কলকাতায় চলে গিয়েছে। ক্লাইভ সাহেব যদি জানতে পারে নবাবের কানে সব পৌঁছেছে, তাহলে আর লড়াই করতে আসবে না—

ব্যাপারটা তখন খুব ভাবিয়ে তুলেছিল মেহেদী নেসারকে। কিন্তু তারপরেই খবর এল ক্লাইভ সাহেব ফৌজ নিয়ে মুর্শিদাবাদের দিকে আসছে। যেমন-যেমন কথা ছিল তেমনি-তেমনি কাজ হচ্ছে বোঝা গেল। কিন্তু তবু ভয়টা গেল না।

নবাবের দলবলের সঙ্গে যখন মেহেদী নেসার সাহেব মুর্শিদাবাদ থেকে বেরোল তখনো মনে ভয় ছিল, হয়তো সব গোলমাল হয়ে যাবে। হয়তো নবাব মরিয়ম বেগমসাহেবার খবরটা জানতে পারবে।

মেহেদী নেসার জিজ্ঞেস করেছিল মীর্জাকে—এবার তয়ফাওয়ালীরা সঙ্গে যাবে না?

লড়াইতে যাবার সময় নবাবের দলের সঙ্গে বেগমরা যায়, তরফাওয়ালীরাও যায়। পূর্ণিয়ায় শওকত জঙ্-এর সঙ্গে লড়াই করতে যাবার সময় তারা ছিল।

মীর্জা বলেছিল—না—

মেহেদী নেসার সাহেব আবার জিজ্ঞেস করেছিল—তা বেগমসাহেবাদের কাউকে সঙ্গে নিয়ে চললেন না কেন আলি জাঁহা?

মীর্জার মুখখানা খুব গম্ভীর ছিল। বললে—না, কাউকেই সঙ্গে নেবো না এবার ইয়ার। আর কোন্ বেগমকেই বা সঙ্গে নেবো? কাউকেই যে সঙ্গে নিতে ভালো লাগছে না—

—কিন্তু বেগমসাহেবারা সঙ্গে থাকলে মেজাজটা ভালো থাকতো আলি জাঁহা!

—কেউ তো আমাকে ভালোবাসে না মেহেদী নেসার! সবাইকে যাচাই করে দেখেছি, তারা কেবল আমার খোশামোদ করে, তারা কেবল আমার তারিফ চায়, আমার বাহবা চায়। আমাকে কিন্তু তারা কিছুই দিতে চায় না। আমাকে দেবার মত তাদের কিছুই নেই—

মেহেদী নেসার বলেছিল—কিন্তু মরিয়ম বেগমসাহেবা?

—তাকে আমি কিছু বলতে চাই না ইয়ার, সে বড় ভালো মেয়ে। তাকে তুমি জোর করে তার স্বামীর কাছ থেকে নিয়ে এসেছো। সে ওদের মত নয়।

—কিন্তু সে তো আলি জাঁহাকে ভালোবাসে।

মীর্জা বলেছিল—সে ভালোবাসলেও আমি তো তার ভালোবাসা নিতে পারি না ইয়ার। সে আমাকে রামপ্রসাদের গান শুনিয়েছে, সে আমাকে কোরাণ পড়তে শিখিয়েছে। তার জন্যে আমি আজ ঘুমোতে পারছি—তা জানো? তাকে আমি কেমন করে কষ্ট দিই!

—কষ্ট?

—কষ্ট নয়? যুদ্ধে যাওয়া কি সুখ? তাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি ইয়ার। আমার ঘুম আসতো না বলে সেও আমার সঙ্গে মাসের পর মাস রাত জেগেছে। আমার কীসে ভালো হবে, দিনরাত সেই কথাই কেবল ভেবেছে—

—আর কোনো বেগমরা তা ভাবে না ভেবেছেন?

মীর্জা মহম্মদ কথাটা শুনে ম্লান হাসি হেসেছিল শুধু। বলেছিল—আমার নিজের মা'ই কি আমার ভালোর কথা কখনো ভেবেছে?

তারপর হঠাৎ থেমে গিয়ে বলেছিল—থাক্‌গে ও-সব কথা ইয়ার, ও-সব কথা ভাবলে এখন চলবে না আমার। আমাকে এখন অন্য কথা ভাবতে হবে—।...আচ্ছা তোমার কী মনে হয় ইয়ার, মীরজাফর সাহেব আমার কোনো ক্ষতি করবে না, তুমি কী বলো?

—কেন, ও কথা বলছেন কেন আলি জাঁহা?

—অনেক রকম কথা কানে আসে কিনা...

—কী কথা?

—অনেকে বলছে মীরজাফর সাহেব নাকি ফিরিঙ্গীদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে, আমাকে তাড়িয়ে দিয়ে নাকি নিজে নবাব হবার চেষ্টা করছে...

—কী বলছেন আলি জাঁহা? মীরজাফর সাহেব কখনো এমন কাজ করতে পারে? মীরজাফর সাহেবকে আপনি চেনেন না?

—কিন্তু জগৎশেঠজী কেন আমার সঙ্গে ও-ভাবে কথা বলে আজকাল? আমি কি কারো সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছি? অবশ্য বলতে পারো আমি যখন হুকুম দিয়েছিলাম যে মীরজাফর সাহেব দরবারে এলে খাজা হাদীকে সেলাম করতে হবে এতে বোধ হয় অপমান মনে করেছে—

মেহেদী নেসার বলেছিল—না না, তাতে কী! আপনাকে নবাবী করতে হলে সকলকে খুশী করা তো চলে না!

—সত্যি ইয়ার, তুমি আমার কথাটা ঠিক বুঝেছো। ক'টা লোককে আমি খুশী করতে পারবো? আগে অবশ্য ভেবেছিলাম, নবাব হলে আমার যত জানা শোনা বন্ধু-বান্ধব তাদের সকলকে বড় বড় চাকরিতে বসিয়ে দেবো। কিন্তু তা কি পেরেছি? তুমিই বলো না, পেরেছি? এই যে তুমি, তুমি আমাকে এত ভালোবাসো, তোমারও মাইনে তো আমি বাড়িয়ে দিতে পারিনি—

মেহেদী নেসার বললে—আমার কথা ছেড়ে দিন আলি জাঁহা, আমি আপনার মুহব্বত পেয়েছি তাই-ই যথেষ্ট, আমি টাকা চাই না—

—সে তুমি ভালো লোক বলে তাই বলছো। কিন্তু আমার তো ইচ্ছে করে তোমাদের খুশী করতে—কিন্তু কোথায় পাবো টাকা? নবাব আলীবর্দী খাঁ কি একটা টাকা রেখে গেছে? বর্গীদের সঙ্গে লড়াই করতে করতে সব টাকা ফুরিয়ে গিয়েছিল তাঁর। আমি তখন বুঝিনি, তাই তাঁর সঙ্গে কত ঝগড়া করেছি। কিন্তু নিজে নবাব হয়ে এখন সব বুঝতে পারছি। এখন বুঝতে পারছি নবাবের নিন্দে করা সোজা, নবাবের মসনদ কেড়ে নেওয়াও সোজা, কিন্তু নবাব যে হয়, সে-ই

বুঝতে পারে নবাবী চালানো কত শক্ত!

তারপর একটু থেমে মীর্জা মহম্মদ বলেছিল—আমি বলছি না যে আমার দোষ-ত্রুটি কিছু নেই। বলছি না যে আমি একেবারে নিষ্পাপ, কিন্তু নবাব হবার পর তো আমি কারো কোনো ক্ষতি করিনি! যা কিছু করেছি সব তো এই মসনদের জন্যেই! শওকত জঙ্‌কে খুন করেছি, কিন্তু নিজামত চালাতে গেলে সে তো করতেই হবে। ঘসেটি বেগমকে বন্দী করেছি, কিন্তু সেটুকুও যদি না করি তো এ মসনদ থাকবে? যারা আমার ক্ষতি করতে চাইবে তাদের আমি শায়েস্তা করবো না?

—নিশ্চয় আলি জাঁহা, নিশ্চয় শায়েস্তা করবেন।

—যাক গে, এত কথা বলবার সময় নেই এখন, ফিরিঙ্গীদের শায়েস্তা করে ফিরে এসে তখন এর সব ফয়সালা করবো ইয়ার। আমি নানীবেগমকেও বলে রেখেছি, ফিরিঙ্গীদের আগে জব্দ করতে দাও, তখন আমি তোমাদের সকলকে ডেকে যার যা বলবার আছে সব শুনেবো! ঘসেটি বেগম গেছে, শওকত জঙ্‌ গেছে, এবার ফিরিঙ্গীদের খতম করে নিজের ঘরের লড়াই মেটাবো। শুধু ভয় হচ্ছে মীরজাফর সাহেবকে নিয়ে—

—না আলি জাঁহা, মীরজাফর সাহেবকে আপনি মিছিমিছি ভয় করছেন! উনি তো আপনার সামনে কোরাণ ছুঁয়ে কথা দিয়েছেন!

মীর্জা মহম্মদ বলেছিল—তা জানি ইয়ার, কিন্তু কোরাণ বড় না টাকা বড়?

রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে হাতীর হাওদার মধ্যে বসে এইসব কথা হয়েছিল। পেছনে সামনে নবাবের ফৌজ। সার বেঁধে চলেছে সবাই। এক-একটা গ্রাম পার হয়েই ফাঁকা মাঠ। কয়েক ক্রোশ মাঠ পেরিয়ে আবার হয়তো একটা গ্রাম পড়ে। মেহেদী নেসারের মনে আছে, কথাগুলো বলতে বলতে মীর্জা মহম্মদের চোখ দুটো এক-একবার বুজে আসছিল। এই এতগুলো সেপাই, এই হাজার-হাজার গ্রাম, এই সারা বাঙলা বিহার আর উড়িষ্যার নবাবের বন্ধু মেহেদী নেসার সাহেব। মেহেদী নেসারেরও ক্ষমতার শেষ নেই। তবু কেবল মনে হয়েছিল, আজ বিপদে পড়েই মীর্জা নরম সুরে কথা বলছে। আবার যখন ফিরিঙ্গীদের লড়াই ফতে করে ফিরবে তখন এই মীর্জাই আবার সকলকে একধার থেকে অপমান করবে। এই নবাবদের চিনতে বাকি নেই মেহেদী নেসারের।

মেহেদী নেসার বললে—আপনি মিছিমিছি সন্দেহ করছেন আলি জাঁহা, কোরাণের কাছে কি টাকা বড় হতে পারে কখনো?

—আরে ইয়ার, পারে। মহারাজ নন্দকুমার, মীরজাফর আলি, রাজা দুর্লভরাম, জগৎশেঠজী—এদের সকলের কাছে আল্লার চেয়ে টাকা বড়। শুধু উমিচাঁদ লোকটা ভালো। ও গুরু নানককে বড় ভক্তি করে—

—উমিচাঁদ সাহেব ভালো?

—হ্যাঁ, তোমরা যতই ওর নামে নিন্দে করো ইয়ার, আমি বলি সাচ্চা লোক।

—কী করে বুঝলেন আলি জাঁহা?

—কেন? উমিচাঁদ কি খারাপ লোক? তোমার কী মনে হয়?

মেহেদী নেসার বললে—আমি আপনার সঙ্গে একমত আলি জাঁহা। যদি খাঁটি লোক কেউ থাকে তো সে উমিচাঁদ সাহেব।

মীর্জা বলতে লাগলো—তুমি ঠিক ধরেছো ইয়ার। মরিয়ম বেগমসাহেবা উমিচাঁদ সাহেবের নামে আমাকে অনেকবার বলেছে, আমি বিশ্বাস করিনি। আমি

ভাবছি মুর্শিদাবাদে ফিরে এসে দিল্লীর বাদশার দফ্‌তর থেকে উমিচাঁদের নামে সনদ এনে দেবো—

—হ্যাঁ আলি জাঁহা, খুব ভালো কাজ হবে—

—আর দেখ, আমি মীরজাফরকে তাড়িয়ে দেবো, একেবারে বাঙলা মুলুক থেকে বার করে দেবো। ওটা আসল হারামী। আর কী করবো জানো? আমি সব ভেবে ঠিক করে রেখে দিয়েছি। মরিয়ম বেগমসাহেবাকেও আমি বলেছি। মুর্শিদাবাদ ছেড়ে আমি কলকাতায় গিয়ে রাজধানী বসাবো, ওখানে ফিরিঙ্গীদের কেল্লাটা ঠিকঠাক মেরামত করে নিয়ে আমার হারেম তৈরি করবো—

আহা, কত স্বপ্ন ছিল মীর্জার! নিজের মনেই সব ভবিষ্যতের নক্‌শা এঁকে নিয়েছিল। আগে তাড়াবে মীরজাফর আলিকে, তারপর রাজা দুর্লভরামকে, তারপর ইয়ার লুৎফ খাঁকে। আর জগৎশেঠ? জগৎশেঠজীর সম্বন্ধেও একটা বন্দোবস্ত করে রেখেছিল মীর্জা।

বলেছিল—তুমি যেন কাউকে বলো না ইয়ার—

—না না, আমি কেন বলতে যাবো আলি জাঁহা? আমি আপনার নিমক-হারামী কখনো করতে পারি?

—সে আমি জানি। তবু সাবধান করে দিচ্ছি। সাবধানের মার নেই। জগৎ-শেঠজীর টাকা আমি ফৌজ দিয়ে লুঠ করাবো। যদি দিল্লীর বাদশা কিছু বলে তো আমি বাদশাকেও সে-টাকার ভাগ দেবো, তখন বাদশার মুখ বন্ধ হয়ে যাবে—কিন্তু এ-কথা যেন কেউ টের না পায়, খুব হুঁশিয়ার—

ফরাসীদের কামানের গোলাটা যখন গিয়ে ফিরিঙ্গীদের ছাউনির ওপর পড়লো, তখন নবাবের ওই কথাগুলো মনে পড়তে লাগলো।

বশীর মিঞার কথায় যেন হঠাৎ চমক ভাঙলো। বশীর বললে—চলুন জনাব, একটু জলদি করুন, নইলে মরিয়ম বেগমসাহেবার বজরা ছেড়ে দেবে—

মেহেদী নেসার সাহেব রেগে গেল।

বললে—দাঁড়া বেল্লিক-বেটা, লড়াইটা দেখি ঠিক-ঠিক হচ্ছে কি না—

সত্যিই সব মতলবই তো আগে থেকে ঠিক হয়েই ছিল। তারপর নবাবের কামানের গোলাগুলো যখন আমগাছের ডালে এসে পড়লো তখন মেহেদী নেসার সাহেব আবার তুড়ি দিয়ে উঠলো। সাবাস মিঞাসায়েব, সাবাস!

কোথায় কোথাকার কোন মিঞাসাহেব, কোন্ মিঞাসায়েবকে যে সাবাস দিয়ে উঠলো মেহেদী নেসার সাহেব তা বুঝতে পারলে না বশীর মিঞা। ফিরিঙ্গীদের দিকটা আমগাছের আড়াল পড়েছে। আর নবাবের ফৌজের দিকটা একটু ফাঁকা ফাঁকা।

বশীর মিঞার ভয় লেগে গেল। হঠাৎ জিজ্ঞেস করে ফেললে—ফিরিঙ্গী-সাহেবরা জিততে পারবে জনাব?

—তুই থাম্ বেটা বেল্লিক, তুই লড়াই-এর কী জানিস?

বহুদিন বোধ হয় জায়গাটায় মানুষ-জন পা দেয়নি। বিরাট বিরাট আম গাছ। সেপাইদের কামানের পেতলগুলো কাঁচা রোদ লেগে ঝক্‌ঝক্ করতে লাগলো। মেহেদী নেসার চলে যেতে যেতেও পেছন ফিরে ফিরে দেখতে লাগলো। নবাব তখনো ছাউনির ভেতর ঘুমোচ্ছে। তুমি ঘুমোও নবাব মীর্জা মহম্মদ সিরাজ-উ-দ্দৌলা আলমগীর। ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই তুমি স্বপ্ন দেখ ভবিষ্যতের। জেগে উঠে তুমি মীরজাফর আলি সাহেবকে বাঙলা-বিহার-উড়িষ্যা থেকে তাড়িয়ে দিও।

রাজা দুর্লভরাম, ইয়ার লুৎফ খাঁ সাহেব, তাদেরও কোতল করো। তুমি মহতাপ জগৎশেঠজীর টাকাও ফৌজ দিয়ে লুঠ করে দিল্লীর বাদশার সঙ্গে সে-টাকা ভাগাভাগি করে নিও। আজ যদি তোমার ঘুম ভাঙে তো জেগে উঠে যা তোমার খুশী তাই কোর আলি জাঁহা। আর তারপর যখন মীরজাফর আলি সাহেব নবাব হবে, তখন আমাকে আর ইয়ার বলে ডাকতেও সাহস হবে না তোমার। তখন আমি মীরজাফর সাহেবের সনদ পেয়ে দেওয়ান-খালসা-শরিফা মহম্মদ মেহেদী নেসার খাঁ সাহেব হয়ে গেছি। আমার সঙ্গে মোলাকত করতে হলে তোমাকে তিনবার কুর্নিশ ঠুকতে হবে!

—কী বললি?

বশীর মিঞা বললে—কই, আমি তো কিছু বলিনি মেহেরবান—

—তুই কিছু বলিসনি? তাহলে কে যেন কী বললে মনে হলো!

কিছুই কেউ বলেনি। কিন্তু তবু মেহেদী নেসারের সন্দেহ হলো কেউ যেন কিছু বললে। হাজার-হাজার সেপাই-এর প্রাণ নিয়ে টানাটানি। পঁয়ত্রিশ হাজার পায়দল-ফৌজ একদিকে তলোয়ার উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, পনের হাজার ঘোড়-সওয়ার আর চল্লিশটা কামানের ধোঁয়ার ভিড়ে এমন সকলেরই হয়। নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলারও হয়, মীরজাফর আলি সাহেবেরও হয়। যারা এই অদৃশ্য ইঙ্গিত উপেক্ষা করে, তারাই শুধু অবাক হয়ে যায়, তারাই শুধু ভাবে—কে যেন ডাকলে? কে যেন কী বললে মনে হলো?

তখনো পূর্বদিকের সূর্যটা লাল হয়ে রয়েছে। মেহেদী নেসার সাহেব আবার আকাশের দিকে চাইলে। তারপর বললে—চল্, বেশি সময় নেই, যাবো আর আসবো—

বশীর মিঞা আগে আগে চলছিল। মেহেদী নেসারও চলতে লাগলো। বেশি দূর নয়। নবাবের ছাউনিটা পেছনে ফেলে রেখে একটু এগিয়ে গেলেই দাদপুর। দাদপুরেই নৌকো তৈরি রেখেছিল বশীর মিঞা। সেই নৌকোতে উঠেই বশীর মিঞা জোর তাগিদ দিলে—একটু জলদি বেয়ে চল্ ভাই, বড় জরুরী কাম—

মেহেদী নেসারের চোখে তখনো আকাশের লাল সূর্যটা ভাসছে।

দূর থেকে বশীর মিঞা আঙুল দিয়ে দেখালে—ওই, ওই যে—

—ওরই ভেতরে মরিয়ম বেগমসাহেবা আছে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, জনাব। আমি তো পেরিন সাহেবের বাগানে গিয়েছিলাম। সেখানে গিয়েই শুনলাম, মরিয়ম বেগমসাহেবাকে ওরা ধরে রেখে দিয়েছিল ঘরে তালাচাবি বন্ধ করে। কিন্তু সেই তালা ভেঙে বেগমসাহেবা নাকি মাঝ-রাত্তিরে পালিয়ে গেছে।

—তারপর?

—তারপর ঢুঁড়তে ঢুঁড়তে কাঁহা কাঁহা গেলাম। ত্রিবেণীর ঘাটে দেখলাম ওই বজরাটা রয়েছে। তারপর ভালো করে নজর করে দেখি, আমাদের কান্তবাবু বাইরে বসে আছে। অন্ধকারে আমাকে ঠাহর করে দেখতে পায়নি। আমি...

—কান্তবাবু কে?

—জনাব, যাকে আমি নিজামতের দফ্তরে নোকরি করে দিয়েছিলাম। সেই হারামীর বাচ্ছা! সে তো এখন মরিয়ম বেগমসাহেবার খপ্পরে। মরিয়ম বেগম-সাহেবা তাকে নবাবের জলুসখানায় কাম করে দিয়েছে। এখন তো আর চরের

কাম করে না।

—তা গরহাজির বলে তার নোকরি খতম হয় না কেন?

—জনাব, মরিয়ম বেগমসাহেবার পেয়ারের আদমির নোকরি কে খাবে? কার এত কলিজার পাটা?

—এই কথা?

মেহেদী নেসার যেন কান্তর চরম সর্বনাশ করবার আগে একবার দম নিয়ে নিলে। তারপর বললে—নবাব লড়াই থেকে ফিরে গেলে ওকে বরখাস্ত করে দিতে হবে!

—জনাব, মরিয়ম বেগমসাহেবার লোক বলে এতদিন ওকে কিছু বলতে পারিনি!

—এবার আর ওকে ছাড়বো না। কই, বাইরে কারা বসে আছে যেন মালুম হচ্ছে?

—আজ্ঞে, ও বজরার মাঝি-মাল্লা। কান্তবাবু এখন ভেতরে মরিয়ম বেগম-সাহেবার সঙ্গে মেহ্‌ফিল করছে।

বলতে বলতে নৌকোটা একেবারে বজরার গায়ে এসে ভিড়লো। ভিড়তেই বশীর মিঞা লাফিয়ে বজরার ওপর উঠেছে—কান্ত, এই কান্ত—

মেহেদী নেসার সাহেবও একেবারে পেছন-পেছন এসেছে।

বশীর মিঞা বললে—একটু হুঁশিয়ার থাকবেন জনাব, বেগমসাহেবার পেট-কাপড়ে ছোরা থাকে—

—দুত্তোর ছোরার নিকুচি করেছে—বলে মেহেদী নেসার আরো এগিয়ে গেছে।

মাঝি-মাল্লারা প্রথমে হাঁ-হাঁ করে উঠেছিল। তারপর নবাবী-নিজামতের কোনো আমীর-ওমরাহ্‌ ভেবে পেছিয়ে এল।

বশীর ভেতরে উঁকি মেরে দেখলে কেউ নেই কোথাও। মাঝিদের জিজ্ঞেস করলে—বেগমসাহেবা কোথায় লুকোল? আর সেই কান্তবাবু তোদের কোথায় গেল?

বৃন্দাবন অবাক।

—আজ্ঞে, বেগমসাহেবা তো কেউ নেই কর্তা। কান্তবাবু বলেও কেউ নেই। এ তো ছোটমশাই-এর বজরা।

—ছোটমশাই? ছোটমশাই কে? কোথাকার ছোটমশাই?

—আজ্ঞে কর্তা, হাতিয়াগড়ের জমিদার ছোটমশাই—

কেমন যেন শুকিয়ে গেল বশীর মিঞার মুখটা। মেহেদী নেসার সাহেবকে এত দূর টেনে এনে এমন বোকা বনতে হবে বুঝতে পারেনি।

—তা ছোটমশাই কোথায় গেল?

—আজ্ঞে, ডাঙায় নেমেছেন। আমাদের বজরা বাঁধতে বলে নিজে ডাঙায় নেমে চলে গেছেন। আসতে দেরি হবে তাঁর।

বশীর মিঞা কী করবে বুঝতে পারলে না। তারপর বললে—তোমরা কোথা থেকে আসছো?

বৃন্দাবন বললে—আজ্ঞে, হাতিয়াগড় থেকে বেরিয়ে মুর্শিদাবাদ গিয়েছিলেন ছোটমশাই. সেখান থেকে এখানে এইচি—

মেহেদী নেসার সাহেব এতক্ষণে কথা বললে। জিজ্ঞেস করলে—ছোটমশাই কে?

বশীর মিঞা বললে—জনাব, ছোটমশাই হলো হাতিয়াগড়ের জমিদার-সাহেব। ডিহিদার রেজা আলির এলাকায়। এই ছোটমশাই-এর রানীসাহেবাই হলো আমাদের মরিয়ম বেগমসাহেবা!

কথাটা পরিষ্কার হয়ে গেল মেহেদী নেসারের কাছে। বললে—আচ্ছা, আমরা এখানে বসি, তোমাদের ছোটমশাই আসুক। ছোটমশাই বোধ হয় বিবির খবর পেয়েই এখানে এসেছে। ওকে পাকড়ালেই মরিয়ম বেগমকে পাকড়ানো যাবে।

—তাই বসা ভালো জনাব। যাবে কোথায় ছোটমশাই? বজরাতে তো আসতেই হবে!

মেহেদী নেসার বললে—তা তুই তো এখানেই দেখেছিলি মরিয়ম বেগমসাহেবাকে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ জনাব। আল্লার কিরে বলছি আমি, এই বজরায় কান্তবাবুকে দেখেছি আর মরিয়ম বেগমসাহেবাকে দেখেছি—আমি ঝুট্‌ বলে জনাবকে মিছিমিছি তকলিফ দেবো কেন?

মেহেদী নেসার বললে—ঠিক আছে, তুই ঝুট্‌ বলেছিস কি সাচ্চা বলেছিস, এখনই পরখ হয়ে যাবে, ওই ছোটমশাই হাজির হলেই পরখ হয়ে যাবে—

বলে ছোটমশাই-এর ঘরে ঢুকে তার বিছানায় বসে পড়লো। জানালার ফাঁক দিয়ে দেখলে সূর্যটা এবার যেন আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মেহেদী নেসার সাহেবের একবার মনে পড়লো লক্কাবাগের কথা। গুলী মারো লক্কাবাগের বুকে। মিছিমিছি ভেবে ফয়দা নেই। মীরজাফর সাহেব নিজেই আছে। ভেবে কী হবে? লক্কাবাগের পরের কথা ভাবাই ভালো। দেওয়ান-খালসা-শরিফা হয়ে তখন মরিয়ম বেগমসাহেবার ইজ্জত কেমন করে নেবে, সেই কথা ভাবাই ভালো।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র সেদিন সন্ধ্যেবেলাই বিষ্ণুমঙ্গলের আসর বন্ধ করে দিয়েছিলেন। খবরটা কানে গিয়েছিল সকলেরই। তখন থেকেই মনটা বিগড়ে গিয়েছিল। তবু গোপালবাবু ছাড়েনি। একবার পর একটা কেচ্ছা শুনিয়েছে।

কৃষ্ণচন্দ্র বলেছিলেন—আর থাক গোপালবাবু, আজকে আর ভালো লাগছে না—এবার ঘুমোতে যাই—

গোপালবাবু বলেছিল—মহারাজের না-হয় দুটো পাখা, কিন্তু আমাদের যে একটা পাখা, আমাদের কি এত সকালে ঘুমোতে যাওয়া পোষায়?

—পাখা মানে?

—আজ্ঞে, পাখা মানে পক্ষ!

এতক্ষণে হাসি বেরোল মহারাজের মুখ দিয়ে। বললেন—দ্বিতীয় পক্ষের মজাটাই বুঝেছো গোপালবাবু, জ্বালাটা তো আর বুঝলে না—বুঝেছে মুর্শিদাবাদের নবাব, তার আবার হাজারটা পাখা! আর বুঝেছে হাতিয়াগড়ের ছোটমশাই। দুটো পাখার মধ্যে তার আবার একটা পাখা অকেজো।

কথা হতে হতে হঠাৎ কালীকৃষ্ণ সিংহ মশাই ঘরে ঢুকলেন।

—কী খবর সিংহী মশাই, লক্কাবাগের খবর কিছু পেলে?

—আজ্ঞে না, অন্য একটা খবর আছে—

—কী খবর?

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। দেওয়ানজীর মুখ দেখেই বুঝেছিলেন, একটা কিছু গুরুতর খবর আছে। তাড়াতাড়ি বাইরে এসে দাঁড়ালেন।

কালীকৃষ্ণ সিংহ মশাই মুখ নিচু করে বললে—হাতিয়াগড়ের দ্বিতীয় পক্ষের সহধর্মিণী এসেছেন—

—সে কী?

একেবারে চমকে উঠেছেন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র। বললেন—কোথায়? কোথায় এসেছেন? কার সঙ্গে এসেছেন?

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের অনেক দিন থেকে সন্দেহ হচ্ছিল। মুর্শিদাবাদ থেকে যেসব খবর পাচ্ছিলেন তিনি, তাতে তাঁরও কেমন ভয় লেগে গিয়েছিল। নবাবের সঙ্গে ফিরিঙ্গীদের ঝগড়া দিন-দিন যে-ভাবে বেড়ে চলেছে তাতে একটা বিপর্যয় ঘটবে তা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। কিন্তু তা যে এত তাড়াতাড়ি ঘটবে তা বুঝতে পারেননি। নবাবের ফৌজের মধ্যেও তাঁর লোক ছিল। তিনি নিজের জমিদারি থেকে তাকে মাইনে দিতেন। সেই শশীর কাছ থেকেও খবর আসতো ফৌজের লোকেরা টাকা না পেলে লড়াইতে যাবে না বলে দিয়েছে। এক-একটা খবর আসতো আর মহারাজা দেওয়ানমশাইকে ডাকতেন। যখন সবাই আসর ছেড়ে চলে যেত তখন চুপি-চুপি দুজনে পরামর্শ করতেন।

এমন করে মরিয়ম বেগমের চেহেল্-সুতুন ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার খবরটাও কানে এসেছিল।

একজন সামান্য মেয়ে সবাইকে কী-রকম নাস্তানাবুদ করে দিচ্ছে তা ভেবেও অবাক হয়ে যেতেন।

একদিন ছোটমশাইকে বলেছিলেন সে-কথা। বলেছিলেন—আপনার সহধর্মিণীর বাহাদুরি আছে ছোটমশাই। কোন্ বংশের মেয়ে তিনি?

ছোটমশাই বলেছিল—বংশ খুব বড়, কিন্তু বংশ দেখে তো বিয়ে হয়নি আমার মহারাজ। বড়গিন্নী নিজে পছন্দ করে আমার সঙ্গে সম্বন্ধ করেছিলেন। বড়গিন্নী রূপ দেখে এঁকে ঘরে এনেছিলেন। তবে বুদ্ধিমতী খুব—

—বুদ্ধিমতী সে তো বুঝতেই পারছি—তা না হলে বেগম তো আরো আছে নবাবের, কিন্তু এমন করে আগে কারো হাতের মুঠোর মধ্যে তো যায়নি নবাব—

ছোটমশাই বলেছিল—কী জানি মহারাজ, আমি কিন্তু কিছু বুঝতে পারছি না। আমার সহধর্মিণী নবাবকে কেমন করে হাতের মুঠোর মধ্যে আনবে? বড় ধীর-স্থির স্বভাব যে!

মহারাজ কথাটা শুনে হেসেছিলেন।

বলেছিলেন—স্ত্রী-চরিত্র বড় রহস্যময় ছোটমশাই। আমারও তো দুটি স্ত্রী। আমি এদিকে এত বুঝি কিন্তু স্ত্রীদের আজও বুঝতে পারলাম না—অথচ এত বছর ধরে একসঙ্গে সংসার করছি—

ছোটমশাই বলেছিল—তা হবে, আমি অত-শত নিয়ে মাথা ঘামাইনি মহারাজ। যতদিন বাবা-মশাই ছিলেন ততদিন তো কিছু নিয়েই মাথা ঘামাইনি। এখন তবু খাজনা-আব্ওয়াব্ নিয়ে মাথা ঘামাতে হয়, নইলে বাকি-বকেয়ার দায়ে কোন্‌দিন জমিদারি নিয়ে টান পড়বে। সাংসারিক জীবনে এতদিন আমার কোনো অশান্তিই ছিল না। তবে একটা জিনিস নজরে পড়েছে, আমার গৃহিণীর রূপ ছিল অপূর্ব—

মহারাজ বলেছিলেন—তা স্ত্রীর রূপ থাকবে সে তো স্বামীর অপরাধ নয়—

—কিন্তু ওই রূপই যে কাল হলো মহারাজ!

মহারাজ বলেছিলেন—নিয়ম যে তাই! অর্থ থাকলে চোরের উপদ্রব হবেই।

আপনার রূপসী স্ত্রী হবে, আর অন্যলোকে নজর দেবে না, তা কি কখনো সম্ভব ছোটমশাই? নজর যদি কেউ না দেয় তো বুঝতে হবে আপনার স্ত্রী রূপসীই নন। সেটাই কি আপনার মনঃপূত হবে?

এ-সব আলোচনা অনেকদিন আগেকার। তারপর হঠাৎ একদিন মুর্শিদাবাদ থেকে খবর এল মরিয়ম বেগমকে ক্লাইভ সাহেব আটক করেছে। আগে একদিন এই মরিয়ম বেগম ক্লাইভ সাহেবের দফ্‌তরে ঢুকে জরুরী চিঠি চুরি করেছিল, এবার তার শাস্তি দেবে হয়তো।

খবরটা পাওয়ার পর ছোটমশাইকে খবরটা দেবেন ভেবেছিলেন। সরখেল মশাইকে একবার পাঠিয়েও ছিলেন হাতিয়াগড়ে। কিন্তু সরখেল একদিন ফিরে এল খালি হাতে।

দেওয়ানমশাই জিজ্ঞেস করেছিল—চিঠিটা কী করলি রে সরখেল?

সরখেল বলেছিল—চিঠি ফেরত নিয়ে এসেছি। ছোটমশাই তো নেই হাতিয়া-গড়ে, চিঠি কার হাতে দেবো?

—তা ঠিক করেছিস্।

বলে চিঠিটা ফেরত নিয়ে নিয়েছিল দেওয়ানমশাই। নিয়ে ছিঁড়ে টুকরো-টুকরো করে ফেলেছিল। এ-সব চিঠি রেখে দেওয়াও নিরাপদ নয়।

তারপর আর কোনো খবরাখবর নেই। মরিয়ম বেগম কোথায় রইলো, কী হলো তার, তারও কিছু হদিস নেই তখন। হঠাৎ একদিন খবর এল নবাব ফৌজ নিয়ে রওনা দিয়েছে মনকরার দিকে। তখন আর অন্য কোনো দিকে মন দেওয়ার মত মনের অবস্থাও নেই। শুধু নবাবের যুদ্ধে যাওয়া তো নয়, সমস্ত বাঙলাদেশটাই যুদ্ধে যাবে তার সঙ্গে। আর সমস্ত বাঙলা দেশের প্রজারাই যে চেয়ে আছে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের দিকে। লড়াইটা সেবার বেধেছিল কলকাতাতে। সেখানে লড়াই বাধলে কারো কোনো ক্ষতি-বৃদ্ধি নেই। কিন্তু কলকাতা ছাড়া আর সব জায়গাতেই তো মহারাজের অনুগৃহীত প্রজারা আছে। কেউ বা প্রজা, কেউ বা বৃত্তিভোগী পণ্ডিত। পাঠশালার খড়ের চালে যদি গুলি লেগে আগুন ধরে যায় তো মহারাজকেই তো তার গুণোগার দিতে হবে। নবদ্বীপেই যদি যুদ্ধ বাধে তো যা-কিছু লোকসান-ক্ষতি হবে তার খরচ দিতে হবে তো মহারাজকেই। নবাবও দেবে না, ফিরিঙ্গীরাও দেবে না!

আগের দিন খবর পেয়েছিলেন মহারাজ যে, নবাবের ফৌজ মনকরার দিকে গিয়ে মাঠের মধ্যে ছাউনি ফেলবে! মনে এমনিতেই একটা দুশ্চিন্তা ছিল। কিন্তু অনেক রাত্রে দেওয়ানমশাই-এর কাছে মরিয়ম বেগমের খবরটা পেয়ে আর এক দুশ্চিন্তায় পড়লেন। নবাব যদি জানতে পারে যে, তার বেগমকে তিনি লুকিয়ে রেখেছেন নিজের বাড়িতে, তাহলে?

কিন্তু তখন কি আর অত ভাববার সময় আছে?

বললেন—তাড়াতাড়ি আপনি নিজে পালকি নিয়ে ঘাটে যান, সঙ্গে অন্দরের দু'-চার জন ঝিউড়িদের সঙ্গে নিয়ে যাবেন। কেউ যেন জানতে না পারে। জানলে মহা মুশকিল হবে—

—তাঁদের কোথায় তুলবো?

—কোথায় আবার তুলবেন? অন্দরমহলে।

—না, তা বলছি না। মুসলমান তো, ওঁদের জন্যে আলাদা ব্যবস্থা করতে হবে! বাবুর্চি খানসামা...

বলতে গিয়েও সঙ্কোচ করতে লাগলো দেওয়ানমশাই। কিন্তু মহারাজ বললেন—তা করতে হয় করতে হবে। কিন্তু তা বলে তো ওঁদের ফিরিয়ে দিতে পারি না। আমার এখানে যখন এসেছেন তখন ওঁদের আশ্রয় দিতেই হবে। আর আমার এখানে যে ওঁরা আছেন তাও যেন নবাবের কি ফিরিঙ্গীদের কানে না ওঠে। আর কালকেই সরখেলকে পাঠাতে হবে হাতিয়াগড়ে। চিঠি লিখে ওর হাতে দিয়ে পাঠাবেন। চিঠিতে কিছু লেখার দরকার নেই। শুধু লিখবেন তিনি যেমন অবস্থায়ই থাকুন যেন চিঠি পাওয়া মাত্র রওনা দেন—

দেওয়ানমশাই চলে গেল।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র আর দাঁড়ালেন না। ভেতরের দিকে চলতে লাগলেন। আজ একটু সকাল-সকালই আসর ছেড়ে উঠেছেন। অন্ধকার রাত। তবু বর্ষার রাতে অল্প রাতেই বেশি অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। সারা জীবনই মহারাজ এই অন্ধকারের সঙ্গে সংগ্রাম করে আসছেন। ভেবেছিলেন সব দায়িত্বটা পরের ঘাড়ের ওপর দিয়েই যাক্। প্রত্যক্ষভাবে যেন আর তাঁকে জড়িয়ে পড়তে না হয়। নবাবের ভালবাসাও যেমন বিপজ্জনক, নবাবের রাগও তাই। জগৎশেঠজী, উমিচাঁদ, মেহেদি নেসার সবাই তাঁকে তাদের দলে থাকতে বলেছিল। হাতিয়াগড়ের ছোটমশাইও বার বার অনুরোধ করেছিল। কিন্তু এবার? ফিরিঙ্গীদের হারিয়ে দিয়ে নবাব যখন আবার মুর্শিদাবাদে ফিরে গিয়ে শুনবে, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র বেগমসাহেবাকে তাঁর নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছে, তখন কী ভাববে?

ছোট গৃহিণী সামনে এসে অবাক হয়ে গেছে।

—এ কি, তুমি? তুমি এই সন্ধ্যেবেলা অন্দর-মহলে? এত তাড়াতাড়ি তোমাদের আসর ভাঙলো আজ?

মহারাজ গম্ভীরভাবে বললেন—আজ ঘুম পেয়ে গেল।

—সে কি? আমি যে পাশার ছক্ নিয়ে যাচ্ছি বড়দির কাছে, খেলতে ডাকছিল বড়দি!

মহারাজ বললেন—তা যাও-না। তুমি পাশা খেললে আমার ঘুমের ব্যাঘাত হবে না।

—কী হলো বল তো? এমন তো হয় না! তোমার নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে। তোমার হাত দেখে কেউ গুণে কিছু বলেছে নাকি? যাকে-তাকে এমন হাত দেখাও কেন? তোমার গণৎকাররা যা বলে তা তো ফলে না—

মহারাজ বললেন—গণৎকারের কথা ফলে না কে বললে? আমি যে কুলীন কন্যাকে বিয়ে করবো এ-কথা তো বিদ্যানিধি-মশাই আগেই বলে দিয়েছিলেন—

হাসি বেরোল গৃহিণীর মুখ দিয়ে। বললেন—কিন্তু কুলীন-কন্যা যে কিশোর কুণীকে বিয়ে করবে এ-কথা তো আমার হাত দেখে কেউই আগে বলতে পারেনি—

—দেখো—

মহারাজ যেন কেমন অন্যমনস্ক ছিলেন। বললেন—দেখো, মোগলের রাজত্বে বাস করি, জাত নিয়ে এত বড়াই ভালো নয়। হাতিয়াগড়ের ছোটরানীর কথা শুনেছো তো?

গৃহিণী বললেন—কিন্তু আমি হাতিয়াগড়ের রানী নই, নবদ্বীপের মহারানী, আমার সঙ্গে তুমি হাতিয়াগড়ের ছোটরানীর তুলনা করলে?

—তুলনা করিনি, কিন্তু ভবিতব্যের কথা কেউ কিছু বলতে পারে না। তাঁর

শেষ পর্যন্ত মোগলের চেহেল্-সতুনে গিয়ে গরুর মাংস খেতে হয়েছে—তা তো জানো?

—তার কথা ছেড়ে দাও—

মহারাজ বললেন—তার কথা ছেড়ে দিতে পারবো না। আর আমি ছাড়লেও তিনি ছাড়বেন না। তিনি এখানে এসেছেন, এই রাজবাড়িতে!

—তার মানে? তুমি বলছো কী?

মহারাজ বললেন—হ্যাঁ, মরিয়ম বেগমসাহেবা এখন এই রাজবাড়িতেই এসে উঠছেন—

গৃহিণী বললেন—ওমা, তুমি সেই মোছলমান মাগীকে এখানে এনে তুলবে নাকি? তুমি কি জাত-জন্ম কিছু রাখবে না আমাদের? আমি যাচ্ছি বড়দিকে গিয়ে...

—না না, শোন শোন—

মহারাজ থামিয়ে দিলেন গৃহিণীকে। বললেন—কিছু বোল না কাউকে, তোমাকে বলাই দেখছি ভুল হয়েছে, তোমরা মেয়েমানুষ, পেটে তোমাদের কিছুছু কথা থাকে না—। বোঝ না কেন, এ-সব কথা কাউকে বলতে নেই। মরিয়ম বেগমসাহেবাও আসছেন, আর ওদিকে হাতিয়াগড়ের ছোটমশাইকেও আসতে চিঠি লিখছি—

—তা ওই মোছলমান বউকে নিয়ে আবার ছোটমশাই ঘর করবে নাকি?

মহারাজ দেখলেন মহা বিপদ। বললেন—শোনো, কাছে এসো, আর যাই করো, এ নিয়ে বাড়াবাড়ি কোর না। দিনকাল এখন ভালো নয়। যদি কেউ কথাটা নবাবের কানে তুলে দেয় তখন তোমার অবস্থাও খারাপ হবে। তখন তোমার নামও হয়তো নশিরণ বেগম হয়ে যাবে।

—ইঃ, তার আগে আমি বিষ খেয়ে মরবো না?

মহারাজ বললেন—থাক, অত বড়াই কোর না। ছাতার আড়ালে আছ তাই বুঝতে পারছো না কত কায়দা করে রাজত্ব চালাতে হচ্ছে আমাকে। সত্যিই দিনকাল খুব খারাপ। এখন যে-কোনো দিন যে-কোনো জমিদারের ওই হাতিয়াগড়ের অবস্থা হতে পারে—তুমি কাউকে বোল না এ-সব কথা। তখন তোমারও বিপদ আমারও বিপদ—

ওদিকে গঙ্গার ঘাটে বজরা থেকে তখন দুটো ঘোমটা দেওয়া মূর্তি অন্ধকারের আড়ালে চুপি চুপি নেমে এল। মহারাজের চারজন দাসী তৈরিই ছিল সেখানে পালকি নিয়ে। সোজা গিয়ে তারা পালকির মধ্যে উঠলো।

পালকিটা চলতেই কালীকৃষ্ণ সিংহ-মশাই এগিয়ে এলেন। বললেন—তাহলে আসি আমি।

কান্তও নমস্কার করলে। বললে—আসুন, দেখবেন দেওয়ানমশাই, যেন এ-খবর কেউ টের না পায়। ছোটমশাইকে ডেকে এনে যেন তাঁর হাতেই ওঁদের তুলে দেওয়া হয়—

তারপর আবার বজরায় এসে উঠলো কান্ত। মাঝিরা তৈরিই ছিল। কান্ত বললে—চলো, বজরা ছেড়ে দাও—

বজরার নোঙর তুলতেই সেটা তর তর করে এগিয়ে চললো—

লঙ্কাবাগের আমবাগানে তখন আরো আলো ফুটেছে। কিন্তু বড় মেঘলা আবহাওয়া। এক লাখ আমগাছের বাগান। বড় বড় সমস্ত গাছ। সার-সার দাঁড়িয়ে আছে গাছগুলো। যে আমগাছ পুঁতেছিল সে বড় সৌখীন লোক ছিল বোধহয়। এখন আর আম নেই, সবই পেকে ঝরে গেছে। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে এই আমবাগানের তলায় এসে পলাশী গাঁয়ের লোক কত আম কুড়িয়ে নিয়ে গেছে। এটাও জ্যৈষ্ঠ মাস। কিন্তু যে-ক'টা আম এই সেদিন পর্যন্ত ছিল তাও আর নেই এখন। ভাগীরথীর তীরে এসে ব্যাপারীরা এই বাগান থেকেই নৌকোয় আম বোঝাই করে সহরে-সদরে জেলায়-জেলায় নিয়ে গেছে। এখন আর বাগানে আমের বাহার নেই। শুধু পাতা, কচি কচি পাতাগুলো কালচে-সবুজ হয়ে মোটা হয়ে গেছে।

এই বাগানের ধারেই নবাব কতবার এসেছে শিকার করতে। নবাব মীর্জা মহম্মদও কতবার ইয়ার-বন্ধুদের নিয়ে এখানে এসে ওই বাড়িটাতে ফূর্তি করে রাত কাটিয়েছে। নবাবের ছাউনি থেকে ওটা দেখা যায়। ওই বাড়িটাতেই ফিরিঙ্গীরা এসে উঠেছে।

নবাব মীর্জা মহম্মদ ছাউনির ঘুলঘুলি দিয়ে সেই দিকে চেয়ে দেখলেন।

রাত্রেই নজরে পড়েছিল জায়গাটা। খবর দিয়েছিল মেহেদী।

মেহেদী বলেছিল—আমরা আর একটু আগে এলে আর ওরা ওই বাড়িটা দখল করতে পারতো না আলি জাঁহা—

আলি জাঁহা, আলি জাঁহা, আলি জাঁহা! এই আলি জাঁহা ডাকটা বড় ভালো লাগতো মীর্জার। ছোটবেলা থেকে শুনে আসছে দাদুকে সবাই ওই নামে ডাকতো। তখন মনে হতো কবে আমাকে ওই নামে ডাকবে সবাই।

কতদিনকার সব সাধ। সব সাধ মিটে গেল এই পনেরো মাসের মধ্যে। রাতের পর রাত জাগা, দিনের পর দিন ফূর্তি করা। সব হিসেব সব নিকেশ ঠিক ঠিক মিলে গেল। মানুষের জীবনে কত আর সাধ থাকে? আর ক'টা সাধই বা কার মেটে। কোরাণ পড়ার পর থেকেই যেন এইসব ভাবনাগুলো মাথার মধ্যে ঢুকে সমস্ত গোলমাল করে দিচ্ছে। আগে ঘুম আসতো না। তখন হকিম ডেকেছে ইলাজের জন্যে। কিন্তু মরিয়ম বেগমই প্রথম বলেছিল—এই মুর্শিদাবাদের মসনদের চেয়ে আরো বড় মসনদ নাকি আছে। তারপর সেই রামপ্রসাদ। রামপ্রসাদের গান—মা গো আমার এই ভাবনা। রামপ্রসাদের যা ভাবনা, নবাব মীর্জা মহম্মদেরও যেন সেই একই ভাবনা। রামপ্রসাদ নবাবের ভাবনাটা জানতে পারলে কী করে? নবাব তো কাউকে নিজের মনের কথা বলেনি! নানীবেগমও জানতো না, মা'ও জানতো না। কেউ-ই তো নবাবের মনের কথা জানতে চায়নি। সবাই কেবল বলেছে—আরো দাও, আরো দাও। একজন মানুষ ক'জনকে দিয়ে খুশি করতে পারে?

তোমার কথা আজ মনে পড়ছে নবাব! তোমার সঙ্গে এমনি করে কতবার লড়াই করতে গিয়েছি। তোমার সঙ্গে কাটোয়ায় গিয়েছি, আজিমাবাদে গিয়েছি, উড়িষ্যায় গিয়েছি। সেদিন তোমার মীর বক্সীরা লড়াই করেছে আর তুমি তাঁবুর ভেতরে বসে তাদের তালিম দিয়েছো, মদৎ দিয়েছো। কখনো ধমক দিয়েছো। কখনো আবার গালাগালিও দিয়েছো। আজ সব মনে পড়ছে। আবার কখনো তুমি তাদের

খোসামোদও করেছো। তোমার কাছেই তো আমি শিখেছিলুম নবাব যে, লড়াই করতে গিয়ে কোনো নীতি মানতে নেই। তুমিই তো আমায় শিখিয়েছিলে নবাব, লড়াই-এর নীতির সঙ্গে জিন্দ্‌গীর নীতির কোনো মিল নেই। তুমিই বলেছিলে—ইনসান যখন জবাব দেবে তখন খোদাতালাহ্‌ও তোমাকে বাঁচাতে পারবে না। আমার যা কিছু শিক্ষা সে তো তোমার কাছ থেকেই শেখা। কিন্তু তুমিও যা শেখাওনি তা শিখিয়েছে আমাকে মরিয়ম বেগমসাহেবা। হোক সে কাফের মেয়ে, কিন্তু ইনসানের বয়েৎ কাফেররাও জানে। তাদের কাছ থেকেও আমি অনেক শিখেছি নবাব। এখন যদি তুমি একবার কবর থেকে উঠে এসে আমাকে দেখো তো তোমারও চিনতে কষ্ট হবে। আমি অনেক বদলে গিয়েছি। তুমি জানো না তো আমি কোরাণ পাড় আজকাল। তোমাকে বলে রাখি নবাব, এবার আমি ফিরিঙ্গীদের চিরকালের মত হটিয়ে দেবো। যদি এবার ফল্‌তায় গিয়ে জাহাজ নোঙর করে তো সেখানে গিয়েও হামলা করবো। এবার আর আমি ওদের বিশ্বাস করবো না নবাব। ওদেরও বিশ্বাস করবো না, আমার ওমরাওদেরও আর বিশ্বাস করবো না। আমি এবার বুঝেছি, কাফের হলেই কেউ খারাপ হয় না, মুসলমান হলেই কেউ আবার ভালো হয় না। আমি বুঝেছি কোরাণের জন্যে ইনসান নয়, ইনসানের জন্যেই কোরাণ।

—খোদাবন্দ্‌!

—কে? নেয়ামত?

একটু অন্যমনস্ক হয়েছিলুম বোধহয়। নেয়ামত ভেবেছে আমি ঘুমিয়ে পড়েছি। ভেবেছে আমি ভয় পেয়েছি। কিন্তু ভয় যদি সত্যিই পেতুম তো তুমি কি আজ বেঁচে থাকতে মীরজাফর সাহেব? আর জগৎশেঠজী, তোমাকেও আমি এবার চিনে নিলাম। আমার বিপদের দিনে যদি তুমি আমাকে মদৎ না দেবে তো তোমাকেই বা আমি মদৎ দেবো কেন? আজ যখন সব সেপাইরা বাকি তলব্‌ না পেলে লড়াইতে আসবে না বললে, তখন তুমি মনে মনে হেসেছিলে, তা আমি বুঝতে পেরেছি। তোমাকে আমি দেখে নেবো। শুধু তোমাকে নয়, সবাইকে দেখে নেবো। এবার বাঙলা মুলুক থেকে ফিরিঙ্গীদের তাড়িয়ে দিয়ে ফিরে এসে তোমাদের সকলকে দেখিয়ে দেবো কার নাম মীর্জা মহম্মদ আলি।

মীরমদন এসে কুর্নিশ করে দাঁড়ালো।

—ওদের কত ফৌজ, গুণে দেখেছো মীরমদন?

মীরমদন বললে—দেখেছি আলি জাঁহা। ও-নিয়ে খোদাবন্দ্‌ কিছু ভাববেন না, আমাদের ফৌজ ওদের ফতে করে দেবে—

তারপর হাত বাড়িয়ে একটা চিঠি দিলে।

—কার চিঠি? ল' সাহেবের?

তাড়াতাড়ি লেফাফাখানা খুলে পড়তে লাগলেন নবাব। ফরাসী জেনারেল ল' সাহেব চিঠি লিখেছে। একবার দু'বার তিনবার চিঠিটা পড়লেন। আর পাঁচ দিন! পাঁচ দিনের মধ্যেই এসে পড়ছে ল' সাহেব।

লিখেছে—'আমরা নবাবের অনুগত, নবাবের বিপদের দিনে আমরা সফৌজ নবাবের সাহায্যার্থে যাইতেছি। দুশ্চিন্তা করিবেন না। ইংরাজ আমাদের চিরকালের শত্রু। ইংরাজদের আমরা কুকুরের অপেক্ষাও ঘৃণা করি। আমরা গিয়া ইংরাজদের সমূলে নিধন-সাধন করিব। রওয়ানা দিলাম। ইতি—'

চিঠি থেকে মুখ তুলতেই দেখলেন মীরমদন চলে গেছে। ভালোই করেছে। অথচ মীরমদন, মোহনলাল এরা তো কাফের।

কাল রাত্রে সবাই মিলে এই তাঁবুর মধ্যে পরামর্শ করতে এসেছিল। কোথায় কোন্ দিকে কার ফৌজ কেমন করে সাজানো হবে তারই পরামর্শ। মীরমদন শেষ পর্যন্ত ছিল। আর ছিল মেহেদী।

মীরমদন চলে যাচ্ছিল, হঠাৎ পেছন থেকে নবাব ডেকেছিলেন—মীরমদন, শোনো।

মীরমদন ফিরে দাঁড়িয়ে আবার কুর্নিশ করেছিল।

—আচ্ছা মীরমদন, তুমি তো কাফের?

—জী খোদাবন্দ্!

—তুমি গীতা পড়েছো? তোমাদের কাফেরদের গীতা আছে, তুমি তা পড়েছো?

লড়াই করতে এসে এ কী অদ্ভুত প্রশ্ন! মীরমদন খানিকটা অবাক হয়ে গিয়েছিল প্রশ্নটা শুনে। এমন কথা নবাবের মুখ থেকে শুনবে আশা করেনি মীরমদন।

বললে—না খোদাবন্দ্, আমি গীতা পড়িনি—

—আচ্ছা, তুমি যাও—আর আজিমাবাদের দিকে ঘোড়সওয়ার পাঠাও, ল' সাহেব আসছে কি না তাড়াতাড়ি খবর এনে দেবে—

মীরমদন হুকুম শুনে চলে গেল কুর্নিশ করে।

মেহেদী অবাক হয়ে গিয়েছিল নবাবের প্রশ্ন শুনে।

মীর্জা জিজ্ঞেস করেছিল—দেখছো তো মেহেদী, মীরমদন গীতাও পড়েনি—

—কেন আলি জাঁহা, ও-কথা জিজ্ঞেস করলেন কেন ওকে?

—জানো মেহেদী, আমি মরিয়ম বেগমসাহেবার কাছে শুনেছিলুম কাফেরদের গীতাতে নাকি আছে, আত্মীয়-স্বজনদের খুন করলে কোনো গুণাহ্ হয় না। তুমি আমি দরকার হলে মুলুকের ভালোর জন্যে নিজের ভাইকেও খুন করতে পারি—একথা লেখা আছে নাকি কাফেরদের গীতাতে—

মেহেদী নেসার এ কথাগুলো ঠিক বুঝতে পারেনি। খানিক পরে মেহেদীও চলে গিয়েছিল তাঁবু ছেড়ে। তারপর সমস্ত রাতটাই একা কেটেছে। শুধু নেয়ামত এক-একবার উঁকি মেরে দেখে গেছে নবাব ঘুমিয়েছে না ঘুমোয়নি। তারপর ওই আমগাছগুলোর পাতায় পাতায় যেন একটা অদ্ভুত শব্দ শুরু হয়েছে। সে এক অদ্ভুত শব্দ। সমস্ত রাত নবাব সেই এক শব্দ শুনেছে কান পেতে। আর নেয়ামত বার বার কেবল তামাক সেজে দিয়ে চলে গেছে। ওদিকে ভাগীরথী দাদপুর থেকে এঁকেবেঁকে রামনগর হয়ে একেবারে পলাশীর গা বেয়ে লম্বা চলে গেছে। রামনগরের কাছে ইংরেজরা ছাউনি গেড়েছে। আর তাদের সামনেই কয়েক-শো সেপাই নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সিন্‌ফ্রে সাহেব। লোকটা ভালো। যতদিন না ল' সাহেব আসে ততদিন সিন্‌ফ্রে ঠেকিয়ে রাখবে ইংরেজদের। তার বাঁ-হাতি জায়গাটায় আধা-গোল হয়ে চাঁদের রেখার মত দাঁড়িয়ে আছে সেপাইদের দল। রাজা দুর্লভরাম, ইয়ার লুৎফ আর মীরজাফর আলি খাঁ—আর দু'দলের মাঝামাঝি মোহনলাল আর মীরমদন।

তামাক টেনে টেনে গলাটা শুকিয়ে এসেছিল নবাবের।

ডাকলে—নেয়ামত!

এই নেয়ামতই বরাবর আমার সঙ্গে সব জায়গাতে গেছে। সেবার গিয়েছিল পুর্ণিয়াতে, তার আগের বারে কলকাতার হালসীবাগানে। সেবার হঠাৎ হালসী-বাগানে নানীবেগম আর মরিয়ম বেগমসাহেবা এসে পড়েছিল। এবারও যদি আসে?

নেয়ামত এসে কুর্নিশ করলে। করে সামনে দাঁড়ালো।

কী জন্যে নেয়ামতকে ডেকেছিলেন তা আর তখন মনে নেই।

হঠাৎ নবাব বললেন—তামাক দে—

ওদিক থেকে আর একটা কামানের আওয়াজ এল কানে। সিন্‌ফ্রে কাজের লোক। হুঁশিয়ার লোক। কিন্তু মীরজাফর আলির দিক থেকেও আর কোনো সাড়া শব্দ নেই। ইয়ার লুৎফ খাঁর দিক থেকেও নয়। রাজা দুর্লভরামও কি চুপ করে আছে?

নেয়ামত তামাক দিয়ে গেল কলকেতে।

নবাব বললে—মেহেদী সাহেবকে এত্তেলা দে তো নেয়ামত—

ওদিকে লড়াই চলেছে আর এদিকে খালের অনেক এপাশে তাঁবু পড়েছে নবাবের। তার পেছনে খানসামা, বাবুর্চি, মশালচি, জমাদার, পেয়াদা, নফর—সকলের তাঁবু। ফিরিঙ্গীদের দিক থেকে কামান ছুঁড়লেও এখানে এত দূরে এসে পড়বার ভয় নেই।

—মেহেদী নেসার সাহেব এখানে নেই খোদাবন্দ্।

—কোথায় গেল সে? ডেকে আন্!

আবার যেন কয়েকবার কামান ডেকে উঠলো। এ মোহনলাল আর মীরমদনের কামান। সাবাস মোহনলাল, সাবাস মীরমদন। আকাশের খোদাতালাহ্ আজ সাক্ষী রইলো ইয়ার, আমি তোমাদের কথা ভুলবো না। তোমাদের আমি আরো বড় ওমরাহ্ করে দেবো।

চারদিকে শব্দ। লড়াই-এর মধ্যে এই শব্দটাই প্রথম মনে পড়ে। আর সব শব্দ ডুবে যায় এই কামানের শব্দের মধ্যে। এ শব্দ না-থাকলেও খারাপ লাগে। আবার থামলেও কষ্ট হয়। অথচ শব্দই যদি না হলো তো বেঁচে আছি বুঝবো কী করে? আমার ইন্দ্রিয় আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কাজ করছে কিনা অনুভব করবো কী করে? যারা সাধারণ, যারা বাঙলা-মুলুকের প্রজা, তারাই কেবল শান্তি চায়। তারা এত শান্তির ভক্ত বলেই তাদের নবাবকে এত অশান্তির সঙ্গে লড়াই করে বাঁচতে হয়। দশজনের শান্তির জন্যে একজনকে সংসারের সব অশান্তির মুখো-মুখি দাঁড়াতে হয়। সব অশান্তিকে নির্বিবাদে গ্রাস করতে হয়। আর তা ছাড়া এ-সব না থাকলে কী নিয়েই বা থাকতো মুর্শিদাবাদের নবাব?

হঠাৎ একটা শব্দে পাশ ফিরলো নবাব।

—কে? নেয়ামত?

কে যেন তাঁবুর মধ্যে নিঃশব্দে ঢুকে আবার বেরিয়ে গেল।

—কে? কে? কৌন?

কেউ সাড়া দিলে না। যে ঢুকেছিল সে আর সাড়া দিলে না। হয়তো কেউই ঢোকেনি। হয়তো মীর্জা মহম্মদের মনের ভুল। চারদিকের শব্দের মধ্যে হয়তো একটা শব্দকে পায়ের শব্দ বলে ভুল করেছিল।

বাইরের দিকে দেখতে দেখতে মীর্জা মহম্মদ আবার গড়গড়ার নলটা টানতে লাগলো। কিন্তু হঠাৎ মনে হলো কলকের আগুন যেন নিভে গেছে। নেয়ামত তো একটু আগেই কলকের আগুন বদলে দিয়ে গেছে। তবে হঠাৎ নিভে গেল কেন? মীর্জা মহম্মদ আরো জোরে জোরে নলটা টানতে লাগলো।

—কৌন্ হ্যায়?

চারদিক থেকে চার-পাঁচ জন খিদ্‌মদ্‌গার ছুটে এসেছে। নবাবের মেজাজ বিগড়ে গেলে যেন তাদের গর্দানের ওপর আর মাথা থাকবে না।

—আমার গড়গড়ার কলকে কোথায় নিয়ে গেলি তোরা?

আশ্চর্য! সবাই অবাক হয়ে দেখলে কলকে নেই। নবাবের খাঁটি-সোনার কলকেতে একটু আগেই নেয়ামত আগুন ধরিয়ে দিয়ে গিয়েছিল। সেটা নেই। কোথায় গেল? কে নিয়ে গেল? নবাবের চোখের সামনে থেকে কে চুরি করে নিয়ে গেল সোনার কলকেটা! ওই কলকেতেই একদিন তামাক খেয়েছেন নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ, নবাব সুজাউদ্দীন, নবাব সরফরাজ খাঁ, আর নবাব আলীবর্দী খাঁ। অত যুগের উত্তরাধিকার নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলার কাছে এসে অদৃশ্য হয়ে গেল! ভয়ে আতঙ্কে বিস্ময়ে সকলের যেন বাক্‌রোধ হয়ে গেছে।

মীর্জা মহম্মদ হাতের যত জোর ছিল সব দিয়ে রুপো জড়ানো নলটা দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন।

—তোরা বেরো এখান থেকে, বেরো, নিকাল যা—নিকলো ইঁহাসে—

সবাই ভয় পেয়ে সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল। নবাব শূন্য তাঁবুর মধ্যে আবার বিছানার ওপর হেলান দিয়ে শুয়ে পড়লেন।

—তোরা কি সবাই মিলে আমাকে মেরে ফেলতে চাস? আমি কি মরে গিয়েছি? মরে যাবার আগেই কি তোরা আমাকে কবর দিতে চাস?

কথাগুলো স্বগতোক্তি! কিন্তু সামনে তখন কেউ থাকলেও যেন ও-কথা তাদের বলতে নবাবের বাধতো না। সেইখানে সেই ফাঁকা ছাউনির ভেতরে শুয়ে শুয়েই নবাবের মনে হতে লাগলো, এরই নাম হয়তো মসনদ! এই মসনদের জন্যেই হয়তো তার এত দুর্গতি। এই মসনদের জন্যেই হয়তো আজ সবাই তার ওপর বিরূপ!

কিন্তু বাঙলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব তখনো জানতো না, ইতিহাস তখন আর-একবার পাশ ফেরবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছে। মানুষের বিধাতা যদি ইতিহাস হয় তো সেই ইতিহাস-বিধাতাও মানুষের মতই একবার উঠে দাঁড়ায়, একবার চলে, আবার একবার ঘুমিয়ে পড়ে। মানুষের মতই জাগবার আগে একবার পাশ ফিরে শোয়। তখন দেশ-কাল-রাজ্য-রাজা-নবাব-বাদ্‌শা সব একাকার হয়ে যায় ইতিহাসের চোখে। নবাব তখন জানতো না সেই ইতিহাসের পাশ ফেরার সময় আবার এতকাল পরে ফিরে এসেছে। এতকাল পরে আবার জবাবদিহি দিতে হবে নবাবকে। নবাবকে সকলের সামনে হাত-জোড় করে বলতে হবে—আমাকে তোমরা মেরো না। আমাকে আর কিছুদিন বাঁচিয়ে রাখো। আমি মসনদ চাই না, আমি মুর্শিদাবাদ চাই না, আমি চেহেল্‌-সুতুন চাই না, আমি সম্মান শ্রদ্ধা ভালবাসা স্নেহ প্রীতি মুহব্বত কিছুই চাই না, আমি শুধু বাঁচতে চাই। খোদাতালা আল্লাতালাহ্‌র দুনিয়ায় আমি শুধু একজন সাধারণ মানুষ হয়ে পৃথিবীর এককোণে থেকে দুদণ্ডের শান্তি পেয়ে বাঁচতে চাই।

ওদিকে ফিরিঙ্গীদের ফৌজের দিক থেকে আর একটা কামানের গোলা এসে হঠাৎ মীরমদনের সেপাইদের ওপর পড়লো। আর বিকট একটা কান-ফাটানো শব্দে নবাবের নিঃশব্দ কান্না ভেঙেচুরে ছারখার হয়ে গেল।
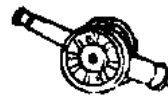
মোল্লাহাটির কাছে বজরাটা আসতেই মরালী বললে—থামাও, থামাও, এইখানে বজরা থামাতে বলো ওদের—

কান্ত বললে—সে কি? এই এত রাত্তিরে এখানে কোথায় নামবে? এ যে মোল্লাহাটি।

মরালী বললে—তা হোক, এ মোল্লাহাটিই হোক আর যে-জায়গাই হোক, আমি এখানেই নামবো। তুমি আমাকে এখানেই নামিয়ে দাও—

—কিন্তু তোমাকে আমি একলা ছেড়ে দেবো কোন্ সাহসে? কার কাছে থাকবে? কে দেখবে তোমাকে? কোথায় যাবে তুমি?

মরালী বললে—যেখানেই যাই, তোমার ভাববার দরকার নেই। আমি বাঁচি মরি তার জন্যে তোমায় ভাবতে হবে না। ছোট বউরানীকে যখন নিরাপদ জায়গায় একবার পৌঁছিয়ে দিয়েছি তখন আমি নিজের কথা আর ভাববো না।

কান্ত বললে—তুমি না-হয় আমায় ভাবতে বারণ করছো, কিন্তু আমি না-ভেবে কী করে থাকি তাই বলো?

মরালী বললে—তুমি পুরুষমানুষ, তোমার আবার কীসের ভাবনা? তুমি যেমন করে যেখানে আছ, সেখানেই থাকোগে—

তারপর নিজেই মাঝিদের দিকে চেয়ে বললে—ওগো, তোমরা বাঁধো এখেনে বজরা, বাঁধো। আমি নামবো—

হঠাৎ সবাই দেখলে অনেক দূরে যেন আর-একটা বজরা সাঁ-সাঁ করে এইদিকেই আসছে।

কান্ত বললে—মরালী, আমার কথা শোনো, তুমি অবুঝ হোয়ো না, শেষে কী হতে কী হবে তখন তোমাকে আর বাঁচাতে পারবো না—

তবু মরালী কথা শুনলে না। বজরাটা ঘাটে লাগতেই কান্ত মরালীর হাতটা জোরে চেপে ধরলে।

মরালী এক ঝটকায় কান্তর হাতটা ছাড়িয়ে দিয়ে বললে—ছাড়ো, তোমার এত-টুকু সাহস নেই, তুমি কি একটা পুরুষমানুষ? তুমি জানোয়ারেরও অধম। এতই যদি আমাকে ভয় তো তখন বললেই পারতে? কেন লুকিয়ে লুকিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে ছেহেল্-সুতুনে আসতে?

—মরালী—মরালী—

কিন্তু মরালী তখন এক লাফে বজরা থেকে ঘাটে নেমে পড়েছে—

ওদিকে অন্ধকারের বুকে চিরে দূরের বজরাটা তখন একেবারে পেছন বরাবর এসে পড়েছে।

কান্ত আবার ডাকলে—মরালী—মরালী!

এক-একটা যুগে এক-একটা দেশে একই ঐতিহাসিক কারণে জাতি-ক্ষয়ের লক্ষণ প্রকাশ পায়। যে জাতি চিরকালের মত বিলুপ্ত হয়ে যায়, সে-জাতিও একদিনে নিঃশেষ হয় না। নিঃশেষ হবার আগে তার সমাজে, তার রাজনীতিতে, তার অর্থনীতিতে পচন ধরে। তখন দেশের মানুষের ধর্মবিশ্বাস শিথিল হয়ে যায়, তখন দেশের মানুষ আত্মকেন্দ্রিক হয়ে স্বার্থ-সিদ্ধির নেশায় ডুবে থাকে। সততা, ভক্তি, ভালবাসা, স্নেহ তখন তাদের কাছে ঘৃণ্য। মানুষের মনুষ্যত্ব কথাটা তখন তাদের কাছে হাসির উদ্রেক করে। তখন তাদের কাছে সততার চেয়ে সার্থকতা বড় হয়। তুমি হিন্দু না মুসলমান, তুমি দয়ালু না নিষ্ঠুর, তুমি স্বার্থপর না ত্যাগী সন্ন্যাসী তা আমি দেখবো না। তোমার পদমর্যাদার জন্যেই আমি তোমাকে শ্রদ্ধা করবো। তুমি ওমরাহ, তুমি নবাবের প্রিয়পাত্র সেই-ই তোমার বড় সার্টিফিকেট।

যখন রাষ্ট্র-বিপ্লব হয় তখন কি শুধু রাজারই উত্থান-পতন হয়? রাজ্যের ছোট বড় প্রত্যেকটি মানুষেরই উত্থান-পতন ঘটে। ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গে তখন ভূগোলেরও উত্থান-পতন ঘটে। একজন ওঠে আর একজন পড়ে—তারই নাম রাষ্ট্র-বিপ্লব। নতুন করে তখন আবার ম্যাপের রং বদলায়। পুরোন জনপদ ধ্বংস হয়ে আবার সেখানেই নতুন জনপদ নতুন হয়ে গজিয়ে ওঠে। পুরোনর শ্মশানের ওপর আবার নতুন করে ভবিষ্যৎ-ধ্বংসের চিতা সাজানো হয়।

উদ্ধব দাস বলতো—তোমরা জানো না গো তোমরা কী ভুল করছো—

লোকে জিজ্ঞেস করতো—কী ভুল করছি?

উদ্ধব দাস বলতো—তোমরা টাকার জন্য হরির নাম ভুলছো—

লোকেরা বলতো—হরির নাম করে কি আর পেট ভরবে গো? তার চেয়ে নবাবের নাম করা ভালো—নবাব তবু খেতাব দেবে—

—না গো না, খেতাবে কিস্যু হয় না—। হরির নামে কী হয় শুনবে? হরির নামের তুল্য আর কিছু নেই—শোন হরির তুল্য কি-রকম—

পরমাণু তুল্য সূক্ষ্ম, হিংস্রক তুল্য মূর্খ,
ভিক্ষা তুল্য দুঃখ।
সাধন তুল্য কর্ম, দয়া তুল্য ধর্ম,
মানব তুল্য জন্ম॥
মাহেন্দ্র তুল্য যোগ, স্বর্গ তুল্য ভোগ,
কুষ্ঠ তুল্য রোগ॥
বট তুল্য ছায়া, সন্তান তুল্য মায়া,
কার্তিক তুল্য কায়া॥
দৈব তুল্য বল, আম্র তুল্য ফল,
গঙ্গা তুল্য জল॥
পূর্ণিমা তুল্য রাতি, ব্রাহ্মণ তুল্য জাতি।
মৃদঙ্গ তুল্য বাদ্য, ঘৃত তুল্য খাদ্য॥
দূর্বা তুল্য ঘাস, অগ্রহায়ণ তুল্য মাস।
সর্বস্ব তুল্য পণ, বিদ্যা তুল্য ধন॥
দাতা তুল্য যশ, গান তুল্য রস।
উদ্ধার তুল্য জয়, মরণ তুল্য ভয়॥
গোলক তুল্য ধাম, তেমনি হরির তুল্য নাম॥

চারিদিকের সেই জাতি-ক্ষয়ের যুগে একমাত্র উদ্ধব দাসই বোধ হয় অতগুলো লোকের মধ্যে নিজের বিবেকটাকে সজাগ রাখতে পেরেছিল। অন্তত তাঁর "বেগম মেরী বিশ্বাস" কাব্য পড়ে সেইটুকুই বোঝা যাচ্ছে। যখন নবকৃষ্ণ মুন্সী, মহারাজ নন্দকুমার, উমিচাঁদ, জগৎশেঠ, এমন কি গ্রামের সাধারণ লোক পর্যন্ত লোভ-হিংসা পাপের মধ্য দিয়ে স্বার্থচিন্তাতে ব্যস্ত, তখন ওই একটা লোকই শুধু কিছুই চায় না। উদ্ধব দাস বাড়ি চায় না, পালকি চায় না, খ্যাতি চায় না, খেতাব চায় না, ভালো-মন্দ খেতে চায় না, এমনকি নিজের বউ-এর ওপরেও তার কোনো অনুরাগ নেই। এ অষ্টাদশ শতাব্দীর সেই অস্থির যুগের পক্ষে একটা বিরাট ব্যতিক্রম।

কিন্তু মেহেদী নেসার এ-সব তত্ত্ব জানতো না। আর এ-সব যদি জানবেই

তো সেই সেদিন ১৭৫৭ সালের জন্ন মাসের ২৩শে তারিখে সেই রাষ্ট্রবিপ্লব হবে কেন? নইলে ইতিহাস ঘ্নমোতে ঘ্নমোতে পাশ ফিরবে কী করে? জেগে উঠবে কী করে?

প্রথম যখন ত্রিবেণীর ঘাটে এসে মরিয়ম বেগমের পাত্তা পাওয়া গেল না তখন রেগে আগ্নন হয়ে উঠেছিল মেহেদী নেসার স্যাহেব। কিন্তু, রাগলে আখেরে কোনো ... হয় না সেটা মেহেদী নেসার জানে। তাই চুপ করে ছোটমশাই-এর বজরার ভেতরে গিয়ে শ্নয়ে ছিল। বশীর মিঞা বাইরে বসে বসে মাঝিদের সঙ্গে তখন বিড়ি টানছে।

ছোটমশাই ঘাটে এসে অবাক।

জিজ্ঞেস করলে—কে? কে তুমি?

পাছে কেউ টের পায় তাই ত্রিবেণীতে বজরা বে'ধে ছোটমশাই হাঁটা পথেই কলকাতায় গিয়েছিল। এই নিয়ে এখানে আসা-যাওয়া অনেকবারই করতে হয়েছে ছোটমশাইকে। কিন্তু দ্নর্ভোগ যার কপালে লেখা থাকে, তার এ নিয়ে অভিযোগ করা চলে না। আর অভিযোগ করলেও যখন তার প্রতিকার নেই তখন অভিযোগ করেই বা কী হবে! ছোটমশাই জানতো বড়মশাই-এর য্নগ চলে গেছে। সে-য্নগ আর আসবে না। নবাবের সামান্য একজন ডিহিদার, সেও আজকাল জমিদারদের চোখ রাঙিয়ে কথা বলে। যখন-তখন যা-তা দাবি করে। বাবা বে'চে থাকলে এ-সব তিনি সহ্য করতেন না। কিন্তু এখন ন্যায়-অন্যায় বলে কোনো কথা নেই, আইন-কান্নন বলেও কোনো কথা নেই। বিচার বলতে আছে কাজীর বিচার। সেই সব কথা ভাবতে ভাবতেই কলকাতার পেরিন সাহেবের বাগান পর্যন্ত গিয়েছিল ছোট-মশাই। অথচ পরিশ্রমই সার। যার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে এত দ্নর থেকে আসা সেই ক্লাইভ সাহেবই নেই।

বশীর মিঞা দাঁড়িয়ে উঠলো। ভেতরে মেহেদী নেসার সাহেবকে উদ্দেশ করে বললে—জনাব, ছোটমশাই এসেছেন—

জীবনে অনেকবার অনেক রকম অন্যায় অপমান সহ্য করতে হয়েছে হাতিয়াগড়ের ছোটমশাই হিরণ্যনারায়ণকে। ম্নর্শিদাবাদে নত্নন নবাব হওয়ার পর থেকেই সেটা বেড়ে গিয়েছিল। কিন্তু সেদিন যে-ঘটনা ঘটলো তার যেন আর তুলনা নেই।

ভেতর থেকে বাইরে বেরিয়ে এল যে-লোকটা সে যে মেহেদী নেসার তা প্রথমে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয়নি।

কিন্তু ছোটমশাই-এর কপালে ব্নঝি তখন আরো অনেক দ্নঃখ আছে।

—কই? কোথায়? কে? কার কথা বলছিলে?

ছোটমশাই বললে—ব্নন্দাবন, আমার বজরাতে এরা ঢ্নকেছে কেন? কারা এরা?

ব্নন্দাবন আগে থেকেই ভয়ে ভয়ে কাঁপছিল। তার ম্নখ দিয়ে আর কোনো উত্তর বেরোল না। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্য-পাদে ইতিহাস যখন সন্ধিস্থলে এসে থেমে গেছে, যখন পতন-অভ্যুদয়ের চিরন্তন বন্ধ্নর পথের মাঝখানে এসে ইতিহাস আর একবার থমকে দাঁড়িয়েছে, ঠিক সেই সময়েই ছোটমশাই হঠাৎ মেহেদী নেসার সাহেবকে চিনতে পারলে। আর সঙ্গে সঙ্গে মেহেদী নেসারের চোখের চাউনিতে ব্নঝতে পারলে, এবার আর একবার ন্যায়-অন্যায়ের ম্নখোম্নখি তাকে দাঁড়াতে হবে।

তুমি অত্যাচারী হতে পারো, তুমি ন্যায়-অন্যায়ের আইন-কান্ননের বহির্ভূত হতে পারো, কিন্তু আমি আমার সামর্থ্য দিয়ে শক্তি দিয়ে মনোবল দিয়ে তোমাকে

পরাজিত করবো। আজকের আমার এই দুর্দশার কারণ তুমিই, আর কেউ নয়। পশুশক্তিতে তুমি আমার চেয়ে প্রবল হতে পারো, কিন্তু আমিও হীনবীর্য নই। তুমি যদি আমাকে আঘাত করো সে-আঘাত দ্বিগুণ হয়ে তোমার বুকে গিয়েই বাজবে। মৃত্যুই যদি আমার অনিবার্য পরিণতি ধার্য হয়ে থাকে তো সে-মৃত্যুর আগে তোমার সঙ্গে আমি শক্তি পরীক্ষা করে নেবো!

—বৃন্দাবন, এদের বার করে দে বজরা থেকে; এ আমার বজরা! না বলে ওরা আমার বজরায় ওঠে কেন?

বৃন্দাবনকে লক্ষ্য করে কথাগুলো বলার অর্থ বোঝবার মত বুদ্ধি আর কারো না থাক, মেহেদী নেসার সাহেবের আছে।

—আপনি অত গোসা করছেন কেন জনাব, আমরা আপনার মেহ্মান্!

ছোটমশাই কেমন নরম হয়ে এল। মেহেদী নেসার যা লোক তার পক্ষে তে এত নরম হওয়া স্বাভাবিক নয়।

—এদিকে নিজামতের কাজ নিয়ে এসেছিলুম, ঘাটে বজরা না পেয়ে আপনা বজরায় উঠেছি। মেহ্মানদের সঙ্গে কী করে কথা বলতে হয় তা হাতিয়াগড়ে জমিন্দার ছোটমশাইকে তো আর শিখিয়ে দিতে হবে না। আপনি হয়তো আমাকে চিনতে পারছেন না জনাব—আমার নাম মেহেদী নেসার।

মেহেদী নেসারের নাম শুনেও ছোটমশাই-এর কোনো ভাবান্তর হলো না

মেহেদী নেসার আবার বললে—আসুন, জনাব, ভেতরে আসুন, এ তে আপনারই বজরা, আমরা শুধু সওয়ার, শুধু আপনার বজরায় আমরা ওপা পর্যন্ত যাবো, তারপরে আপনার বজরা আপনারই থাকবে—

ছোটমশাই আস্তে আস্তে বজরায় উঠলো। তারপর নিজের ঘরের ভেতা ঢুকলো। বিছানায় বসে হুকুম দিলে—বৃন্দাবন, বজরা ছেড়ে দে—

মেহেদী নেসারও সামনে এসে বসলো। বসে হাসতে লাগলো দাঁত বার করে বললে—মরিয়ম বেগমসাহেবাকে কোথায় রেখে এলেন জনাব?

—মরিয়ম বেগমসাহেবা? কে মরিয়ম বেগমসাহেবা?

হঠাৎ যেন বিছেয় কামড়ানোর মত আঘাত পেয়ে চিৎকার করে উঠে ছোটমশাই।

হা হা করে হেসে উঠেছে মেহেদী নেসার সাহেব।

—আপনি গোসা করছেন জনাব! কিন্তু গোসা করবেন না মেহেরবানি করে আমার নাম মেহেদী নেসার। আমি মুর্শিদাবাদের নবাব মীর্জা মহম্মদ সিরাজ-উ দ্দৌলার ইয়ার। আমার কাছে লুকোতে কোশিস্ করবেন না, তাতে আপনার খারাপ হবে মরিয়ম বেগমসাহেবারও খারাপ হবে—

ছোটমশাই বললে—কিন্তু মরিয়ম বেগমসাহেবা যে আমার স্ত্রী! কোথায় তা দেখেছেন বলুন। বলুন শিগ্‌গির—

—বাঃ বাঃ, জনাব মরিয়ম বেগমসাহেবাকে লুকিয়ে রেখে আমাকে জিজ্ঞে করছেন আমি কোথায় দেখেছি তাকে? বলুন, তাকে কোথায় রেখে এলেন?

ছোটমশাই চিৎকার করে উঠলো—শয়তান—

মেহেদী নেসার কিন্তু রাগতে জানে না! ডাকলে—বশীর মিঞা—

বশীর মিঞা ভেতরে এলো।

—জনাব তো বড় বে-শরম জাঁহাবাজ! তুই বজরার ভেতরে মরিয়ম বেগ সাহেবাকে দেখেছিলি?

—জ্বী হ্যাঁ জনাব, আমি দেখেছি বেগমসাহেবা বজরার ভেতরে ছিল, আর বাইরে বসেছিল কান্তবাবু!

—সে কে?

—আমাদের নিজামতের জাসুস্!

ছোটমশাই আর থাকতে পারলে না। চিৎকার করে উঠলো—বৃন্দাবন, বজরা থামা, বজরা ডাঙায় ভেড়া—

—চোপরাও!

বজ্রপাতের মত গম্ভীর গলায় শব্দ করে উঠলো মেহেদী নেসার। আর সঙ্গে সঙ্গে ছোটমশাই দেখলে, মেহেদী নেসারের মুখের চেহারাটা বাঘের মুখে রূপান্তরিত হয়ে গেছে।

ছোটমশাই-এর সমস্ত অন্তরাত্মা রেগে আগুন হয়ে উঠলো। আমার স্ত্রীর সম্বন্ধে আমারই মুখের ওপর এমন করে বলবে, আর আমি কিছু বলতে পারবো না! আমরা অনেক সহ্য করেছি, তাই সাহস ওদের এত বেড়ে গেছে। হঠাৎ সোজা হয়ে উঠে বসলো ছোটমশাই।

বললে—বলুন, কোথায় আমার স্ত্রীকে রেখেছেন আপনারা, বলুন?

—জনাব, আমরা আপনার বিবিকে আবার কোথায় রাখবো, আপনিই কোথায় তাকে লুকিয়ে রেখে এলেন তাই বলুন! আমরা এই বজরাতে আপনার বিবিকে থাকতে দেখেছি।

তারপর বশীর মিঞার দিকে চেয়ে বললে—কী রে, দেখিস্নি?

বশীর মিঞা বললে—হ্যাঁ জনাব, আমি দেখেছি মরিয়ম বেগমসাহেবাকে—

—তাহলে? কোথায় তাকে রেখে এলেন বলুন?

ছোটমশাই গলা চড়িয়ে বললে—আমি যদি আমার স্ত্রীকে লুকিয়েই রেখে থাকি তো বেশ করেছি, আমার নিজের স্ত্রীকে আমি যেখানে খুশি লুকিয়ে রাখবো, আমার স্ত্রীকে নিয়ে আমি যা-খুশি তাই করবো—

—কে বললে মরিয়ম বেগম আপনার আওরত্? মরিয়ম বেগম নবাবের জেনানা, চেহেল্-সুতুনের সম্পত্তি, নিজামতি মাল—

সঙ্গে সঙ্গে একটা চড় গিয়ে পড়লো মেহেদী নেসারের গালে। ছোটমশাই গায়ের যত জোর ছিল সমস্ত জোর দিয়ে চড়টা মেরেছিল। মেহেদী নেসার চড়টা সামলে নিতে একটুখানি সময় নিলে বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বশীর মিঞাকে বললে—বশীর, কাছি আন—শিগ্গির বজরার কাছিটা আন। বেত্তমিজকে বাঁধ, বেঁধে ফেল শিগ্গির। আমি বেওকুফকে দেখাচ্ছি মজা—

বশীর আর দেরি করেনি, লম্বা কাছিটা আনতেই ছোটমশাই দাঁড়িয়ে উঠে বাধা দিতে গিয়েছিল, কিন্তু তার আগেই দুজনে মিলে আচ্ছা করে কষে বেঁধে ফেলেছে ছোটমশাইকে।

—আরো জোরে বাঁধ, শালা জমিন্দার বাচ্ছাকে আমি কুত্তা দিয়ে খাওয়াবো—বাঁধ বাঁধ—আরো জোরে বাঁধ—

বৃন্দাবন তখন সবই দেখেছে। মাঝি-মাল্লারা সবাই এতক্ষণ সব দেখছিল। এবার তাদের দিকে নজর পড়লো মেহেদী নেসারের।

বললে—মুর্শিদাবাদে গিয়ে ওদেরও বেঁধে কুত্তা দিয়ে খাওয়াতে হবে—জোরসে চালাও, জোরসে—

গঙ্গার স্রোতের ওপর বৃন্দাবনরাও ভয়ে ভয়ে আরো জোরে দাঁড় বাইতে

লাগলো। ছোটমশাই তখন নিজের বিছানার ওপর হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে। কথা বলবারও ক্ষমতা নেই। মুখের ভেতরে কাপড় গুঁজে দিয়ে বশীর মিঞা তার বাক্‌রোধ করে দিয়েছে।

লক্ষাবাগের ভেতরে পাঁচিলটার ওপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তখন চারদিকে দেখছিল কর্নেল ক্লাইভ। এক কালে এখানেই শিকার করতে আসতো নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলা। এইখানে এসেই কত রাত কাটিয়ে গেছে দল-বল নিয়ে। সেদিন নবাব কল্পনাও করতে পারেনি, একদিন এখানে এসে টেন্ট খাটিয়ে ফিরিঙ্গীদের সঙ্গে লড়াই করতে হবে!

হঠাৎ ফ্লেচার এসে হাজির।

—কী খবর ফ্লেচার?

—খবর ভালো কর্নেল।

—মীরজাফর সাহেবের সঙ্গে দেখা হয়েছে? কোন নিউজ আছে নতুন?

ফ্লেচার বললে—না কর্নেল, ওদিকে যাইনি, পাছে কেউ ডাউট করে। এখন নবাবের টেন্টের নিউজ আনতে গিয়েছিলাম। সেখানে খুব কমোশন্ চলেছে—

—কেন? হোয়াই?

—নবাবের পার্সোন্যাল স্টাফ যারা তারাও নবাবের এগেন্‌স্টে!

—কী করে জানলে?

ফ্লেচার বললে—নবাবের সোনার একটা কল্‌কে ছিল, ভেরি ভ্যালুয়েবল্ থিঙ কস্ট্‌লি প্রপার্টি, সেটা কে নাকি চুরি করে নিয়েছে। নবাব অর্ডার দিয়েছে সবাইকে বেত মারতে—

—তারপর?

—তারপর সমস্ত স্টাফ রিভোল্ট করবে বলছে।

—কখন রিভোল্ট করবে? আজকে?

—তা জানি না কর্নেল, কিন্তু তারা বলছে নবাবের চাকরি তারা করবে না দে আর অল এগেনস্ট্ নবাব—

—আচ্ছা তুমি যাও, আর যদি কোনো নিউজ পাও, আমাকে ইমিডিয়েট্‌লি জানিয়ে যাবে, আই অ্যাম হিয়ার—

ফ্লেচার চলে গেল। হঠাৎ ফ্রেঞ্চ-আর্মির দিক থেকে একটা কামানের গোলা এসে পড়লো কাছাকাছি। ল্যাসিংটন পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। শব্দটার সঙ্গে সঙ্গে দু কানে হাত চাপা দেওয়ার চেষ্টা করতে গেল। কিন্তু তার আগেই গোলার একটা টুকরো এসে তার গায়ে লাগতেই সে নিচেয় পড়ে গেছে।

ক্লাইভ চিৎকার করে উঠলো—ব্যাটালিয়ন—

তারপরে চারদিকের শব্দে আর কান পাতা গেল না। শব্দটা ক্রমেই চারদিকে ছোটাছুটি শুরু হয়ে গেল। ফ্রেঞ্চ-আর্মি কামান ছোঁড়া থামিয়েছে কিছুক্ষণের জন্যে। মেজর আয়ার কুট দৌড়ে এসেছে কর্নেলের কাছে।

—কর্নেল কোথায়? হোয়ার ইজ কর্নেল?

কেউ বলতে পারে না কোথায় গেল কর্নেল! আয়ার কুট ছট্‌ফট্ করতে

ল্যাগলো। হোয়ার ইজ কর্নেল? হোয়ার ইজ কর্নেল? এখানে দাঁড়িয়ে নবাবের হিউজ আর্মির সামনে আর ফাইট করা উচিত নয়। আমরা স্ম্যাশ্‌ড হয়ে যাবো। আমাদের আর্মির একজন সোলজারও আর বাঁচবে না। মেজর আয়ার কুট এখানে-ওখানে সবাইকে গিয়ে জিজ্ঞেস করতে লাগলো—হোয়ার ইজ কর্নেল? হোয়ার?

কর্নেল তখন ল্যাসিংটনের ডেড-বডিটার সামনে দাঁড়িয়ে। নবাবের শিকার করবার ঘরের ভেতরে গিয়ে স্ট্রেচারে করে ল্যাসিংটনকে মাটিতে শুইয়ে দিয়েছে।

—সবাই বেরিয়ে যাও, বি অফ্‌—বি অফ্‌ ইউ অল—

সবাই ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল তখন। ক্লাইভ একলা দাঁড়িয়ে তার দিকে চেয়ে রইলো একদৃষ্টে! তুমিও ছ' টাকার রাইটার ল্যাসিংটন। আমি তোমাকে ওয়ার্ড দিয়েছিলাম তোমার প্রমোশনের ব্যবস্থা করবো আমি। তুমি অ্যাড্‌মিরাল ওয়াটসনের সই জাল করেছো, আমার জন্যে তুমি সব করেছো। কিন্তু তুমি আমার কণ্ট্রোলের বাইরে চলে গেলে। তবু আমি আমার কথা রাখবো ল্যাসিংটন। আমি তোমাকে প্রমোশন দেবো। পস্থ্যুমাস প্রমোশন। সে প্রমোশনের ফল ভোগ করবে তোমার ওয়াইফ, তোমার সান্‌, তোমার ডটার—

—কর্নেল!

মেজর আয়ার কুট ঘরের ভেতর ঢুকেই অবাক হয়ে গেছে। কর্নেল ক্লাইভের চোখ দিয়ে জল পড়ছে! ভেরি স্ট্রেঞ্জ, ভেরি স্ট্রেঞ্জ ইনডীড্‌—

আয়ার কুট আর দাঁড়ালো না সেখানে। নিঃশব্দে আবার ঘরের বাইরে চলে গেল। ফ্রেঞ্চ জেনারেল ল' পলাশীতে আসছে আর্মি নিয়ে, সেই খবরটা দিতে এসেছিল। কিন্তু ক্লাইভের চোখের জলের সামনে তার সমস্ত মিলিটারি-জ্ঞান মিলিটারি-ম্যানোভার ধুয়ে ভেসে চলে গেল!

ক্লাইভ তখন ল্যাসিংটনের ডেড্‌-বডির সামনে দাঁড়িয়ে দু'হাত বুকের ওপর ক্রস্‌ করে বলছে—অ্যামেন্‌...

মেহেদী নেসার আর বশীর মিঞা তখন বজরার বাইরে বসে আছে। বৃন্দাবনরা জোরে জোরে দাঁড় বাইছে। ভেতরের ঘরে ছোটমশাই দড়িবাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে চিৎপাত হয়ে।

হঠাৎ বশীর মিঞা চেঁচিয়ে উঠেছে—ওই দেখুন জনাব, ওই দেখুন—

অন্ধকার রাত। অন্ধকারের মধ্যে ভালো করে দেখা যায় না কিছু। কিন্তু বশীর মিঞার দৃষ্টি এড়ানো শক্ত।

বললে—ওই দেখুন জনাব—দেখেছেন?

মেহেদী নেসার জিজ্ঞেস করলে—এ কোথায় এলুম আমরা? এ কোন্‌ গাঁও?

—জনাব, এই-ই তো মোল্লাহাটি! হাঁটাপথে এই মোল্লাহাটি দিয়েই তো হাতিয়া-গড়ে যেতে হয়!

হঠাৎ যেন বশীর মিঞা একেবারে লাফিয়ে উঠেছে।

—জনাব, ওই দেখুন একটা আওরত্‌ বজরা থেকে ডাঙার ওপর ঝাঁপ দিলে!

মেহেদী নেসারও দেখছিল। অন্ধকার হলেও চোখ দুটোকে তীক্ষ্ণ তীব্র করে দিয়ে দেখলে বশীর মিঞা ঠিকই বলেছে। একটা বজরা মোল্লাহাটির ঘাটের ওপর

বাঁধা রয়েছে। একজন মেয়ে লাফিয়ে পড়লো ডাঙার ওপর।

—ওই দেখুন জনাব, আর একজন আদমিও পেছন-পেছন লাফিয়ে পড়লো।

মাঝিদের ডেকে বশীর মিঞা তাগাদা দিতে লাগলো—চলো চলো ভাইয়া, জোরে জোরে বাও, সামনে বজরার পাশে গিয়ে ভেড়াও—জলদি—

সামনের বজরাটার কাছে আসতেই বশীর মিঞা চিনতে পারলে—জনাব, এই তো আমাদের মরিয়ম বেগমসাহেবা—আমাদের কান্তবাবু...

নামটা শুনেই মেহেদী নেসারও লাফিয়ে উঠলো—মরিয়ম বেগমসাহেবা! তোবা তোবা! পাকড়ো উস্‌কো, পাকড়ো—

এ ঘটনা যখন ঘটছে তখন মোল্লাহাটিতে রাত। রাতের অন্ধকারেই নিজামতের কানুন কায়েম হওয়া নিয়ম। কোন্‌টা কানুন আর কোন্‌টা বেকানুন তার কোনো সীমা নির্দেশ করা নেই আইন-ই-আকবরীতে। বাদশা আকবরের সঙ্গে সঙ্গেই আইন-ই-আকবরী বাতিল হয়ে গিয়েছিল। আসলে তখন বে-কানুনের রাজত্ব। আর কোন্ কানুনই বা মানবো? রাজা কি একটা, না বাদশা একজন? হিন্দুস্থানের সব জায়গায় তখন এক-একজন বাদশা বাদশাগিরি করতে শুরু করে দিয়েছে। বাঙলা মুলুকের নবাবের কাছে তখন বাঙলা-মুলুকটাই হিন্দুস্থান।

মেহেদী নেসার সাহেব সেই বাঙলা মুলুকের নবাবের ইয়ার। সুতরাং তামাম হিন্দুস্থানের বাদশার ইয়ার। মেহেদী নেসারের হুকুমই তখন মুর্শিদাবাদের নবাবের হুকুম।

বশীর মিঞা মেহেদী নেসার সাহেবের হুকুম পেয়েছে, সুতরাং মুর্শিদাবাদের নবাবের ফার্মান পেয়ে গেছে।

সেই মোল্লাহাটির ঘাটের ওপরেই মরিয়ম বেগমসাহেবার হাতটা ধরে ফেললে বশীর মিঞা।

মেহেদী নেসার বললে—ওকে এখানে আন্—

আর আশ্চর্য, মরালীও কোনো প্রতিবাদ করলে না। কোনো আপত্তি করলে না।

কান্ত কিন্তু রেগে গেল।

বললে—ছাড় ওকে—ছেড়ে দে—ও মরিয়ম বেগমসাহেবা!

বলে বশীরকে ধরতে গেল। কিন্তু মরালী বললে—না, আমাকে ধরুক ও—

মেহেদী নেসার সাহেব এতক্ষণ বজরার বাইরে দাঁড়িয়ে সব দেখছিল সব শুনছিল।

চেঁচিয়ে বললে—ওটাকেও ধর বশীর—ও কে?

—জনাব, এরই নাম তো কান্তবাবু।

—ওকেও ধরে নিয়ে আয়।

পাশাপাশি দুটো বজরা। বাইরে নিঃসীম অন্ধকার। সেই অন্ধকারের মধ্যে যে বশীর মিঞা কেমন করে দূর থেকে চিনতে পেরেছিল সেইটেই আশ্চর্য। হয়তো অন্ধকারের মধ্যে চরের কাজ করে করে চোখ দুটো তার প্রখর হয়ে উঠেছিল। নইলে মেহেদী নেসার একলা থাকলে এ-কাজ এত সহজে সিদ্ধ হতো না। নিজামতি কাজে বশীর মিঞার মত লোকের এই জন্যেই এত খাতির। বাইরে কোতোয়াল আছে, কাজীসাহেব আছে, সেপাই, মীর বক্সী সবই আছে। কিন্তু নিজামতি আসলে চালায় বশীর মিঞারা।

অন্য বজরার ভেতরে ছোটমশাই কিছুই জানতে পারলে না। শুধু হাত-প

বাঁধা অবস্থাতেই মনে হলো বাইরে যেন কী সব গোলমাল চলছে। কাদের যেন চেঁচামেচি হচ্ছে, আরো মনে হলো যেন কারা মেহেদী নেসারের ষড়যন্ত্রের জালে জড়িয়ে পড়লো। আর তাদেরই ধরে নিয়ে যেন তাদের দু'টো বজরা পাশাপাশি চলেছে।

একবার মনে হলো প্রাণপণ শক্তিতে ডাকে—বৃন্দাবন—বৃন্দাবন—

মেহেদী নেসার একবার পেছন ফিরে দেখলে শুধু, মুখে কিছু বললে না। এ-বজরাতে তদারকি করছে মেহেদী নেসার আর ও-বজরাতে বশীর মিঞা। দু'টো বজরা জোড়া লাগিয়ে পাশাপাশি চলেছে।

ভেতরে মরালীকে হাত-পা বেঁধে রেখে দিয়েছিল বশীর মিঞা। আর বাইরে পড়ে ছিল কান্ত। কান্তও নড়তে-চড়তে পারছে না।

কান্ত এক ফাঁকে বললে—আমাকে তুই না-ছাড়িস বশীর, মরিয়ম বেগমসাহেবাকে ছেড়ে দে ভাই। তোর ভালো হবে, দেখবি—

বশীর মিঞা বললে—চুপ কর, মেহেদী নেসার সাহেব পাশের বজরায় রয়েছে। শুনতে পাবে।

কান্ত বললে—আমি চুপি চুপি বলছি, কেউ শুনতে পাবে না—তুই একটু দয়া কর ভাই! আমাকে তুই যা-খুশি শাস্তি দে, আমায় তুই ইচ্ছে হলে খুন করে ফ্যাল্; কিন্তু মরিয়ম বেগমসাহেবাকে ছেড়ে দে তুই, আমি তোর পায়ে পড়ছি—

বশীর মিঞা জিজ্ঞেস করলে—মরিয়ম বেগমসাহেবার জন্যে তোর এত টান কেন বল্‌তো ইয়ার? ও কি তোর পেয়ারের আওরত্?

কান্ত বললে—না, তা কেন? কিন্তু তুই তো জানিস ওর কোনো দোষ নেই, আমিই হাতিয়াগড় থেকে রাণীবিবিকে একদিন সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলুম!

—তুই নিয়ে এসেছিস তাতে কী? তা বলে নিজামতের কানুন খেলাপ্ করবি? চেহেল্-সুতুনের কানুন খেলাপ করবি? তুই আগে বল্ মরিয়ম বেগমসাহেবা আর তুই দু'জনে মিলে কোথায় যাচ্ছিলি? কী মতলব ছিল তোদের?

কান্ত বললে—তোকে সত্যি বলছি আমাদের কোনো মতলব ছিল না—

—তাহলে কেন চেহেল্-সুতুন থেকে মরিয়ম বেগমসাহেবাকে বের করে নিয়ে এলি?

—আমি বের করে নিয়ে এলুম, কে বললে?

—এখনো তবু মিথ্যে কথা বলছিস? তুই যদি বের করে না নিয়ে আসিস কে বের করে নিয়ে এসেছে? মরিয়ম বেগমসাহেবা কি হাওয়া হয়ে উড়ে এল এখানে? কে তোকে চেহেল্-সুতুনে ঢুকতে পাঞ্জা দিলে? আমি তো ক'দিন ধরে বেগমসাহেবার তাঞ্জামের পেছন-পেছন ঘুরছি, তবু আমার চোখে তুই ধুলো দিলি কী করে? সত্যি কথা বল্, আমি তোকে ছেড়ে দেবো—

কান্ত বললে—আমি ছাড়া পেয়ে দরকার নেই, তুই দয়া করে মরিয়ম বেগমসাহেবাকে ছেড়ে দে, তাহলেই আমি আর কিছু চাই না—

—না বললে আমি বেগমসাহেবাকে ছাড়বো না।

কান্ত বললে—তুই যা চাইবি আমি তাই-ই দেবো; তুই যদি মোহর চাস তো তাই-ই দেবো, আশরফি চাইলে তাও দেবো।

মোহরের কথা শুনে বশীর মিঞা যেন কেমন নরম হয়ে এল।

বললে—আশরফি কোথায় পাবি তুই?

—সে যেখানে পাই যেমন করে পাই, তুই যত আশরফি চাস্ আমি দেবো।

—কোথা থেকে আশরফি পাবি তুই?

—তোর আশরফি পেলেই তো হলো। সে যেখান থেকে পারি আমি জোগাড় করবো।

তারপর বশীর মিঞার বোধ হয় লোভ হতে লাগলো। মাঝি-মাল্লারা তখন প্রাণপণে দাঁড় টানছে। তাদের দিকে একবার চেয়ে দেখলে। তারপর হাত-পা-বাঁধা কান্তর কাছে এসে সরে বসলো।

বললে—সত্যি বলছিস তুই আশরফি দিবি আমাকে?

কান্ত বললে—সত্যি দেবো, তুই আমার পুরোন বন্ধু, তোর কথায় আমি বেভারিজ সাহেবের নোকরি ছেড়ে দিয়ে চলে এসেছি। তুই সেদিন আমার উপকার না-করলে আমি উপোস করতুম। তোকে কি মিথ্যে কথা বলতে পারি?

—কত দিবি?

—তুই যত চাইবি। মুর্শিদাবাদে আমার একজন লোক আছে, আমার উপকারের জন্যে সে যত আশরফি চাইবো তত দেবে। সে আমায় খুব ভালবাসে—

—দ্যাখ—বশীর মিঞা আরো কাছে সরে এসে বসলো। বললে—দ্যাখ, তুই আমার প্রাণের দোস্ত, কিন্তু ভাই, আমার টাকার বড় টানাটানি চলছে, আমার দুটো বিবি, আমি তাদের ভালো তরিবত করতে পারি না টাকার অভাবে। তার জন্যেই তোর কাছ থেকে টাকা নিচ্ছি। শালা নিজামতে নোকরি করে যা পাই তাতে চলছে না। অথচ নিজামতের কাজে আমি কত খাটি তা তো দেখছিস—নিজের ফুপা সে-ও আমাকে গালাগালি দিয়ে ভূত ভাগিয়ে দেয়, আর ওই যে মেহেদী শালা হারামজাদ বসে আছে, ও কি কম শয়তান ভেবেছিস? নবাবের সঙ্গে দোস্তি করে নবাবের কম নেমকহারামী করেছে! সব শালা চোর জুটেছে নিজামতে! তাই তো বলছি এ নিজামত আর বেশিদিন চলবে না!

—চলবে না? চলবে না মানে?

কান্তর কেমন আশা হলো যেন। যদি না চলে তো মরালী তো ছাড়া পাবে

বশীর মিঞা বললে—চুপ, অত জোরে কথা বলিসনি। শালা শুনতে পাবে তুই তো জানিস লক্কাবাগের মাঠে লড়াই শুরু হয়ে গেছে!

—লড়াই? কীসের লড়াই?

—ফিরিঙ্গীদের সঙ্গে নবাব তো লড়াই করছে এখন। সেখান থেকেই তো আসছি আমরা। মুর্শিদাবাদে তোদের সবাইকে রেখে মেহেদী শালা আবার সেখানে যাবে! জবর লড়াই শুরু হয়ে গেছে সেখানে রে। সেই লড়াইতেই তো সব ফয়সালা হয়ে যাবে!

—কী ফয়সালা হবে?

—সে-সব তোকে বলবো না। সব বানচাল হয়ে যাবে। দেখছিস না মেহেদী শালা বসে বসে কেবলই তাই ভাবছে, ওর এদিকে তেমন মন নেই। ও-বজরায় রয়েছে হাতিয়াগড়ের রাজা, আর এ-বজরায় রাজার আওরত। ছোটমশাই জানে না তার রাণীবিবিকে আমরা ধরে নিয়ে চলেছি!

—ছোটমশাই? ছোটমশাই রয়েছে ওই বজরাতে?

বশীর মিঞা কান্তর মুখ চাপা দিয়ে দিলে। বললে—আবার চিল্লাচ্ছিস বলছি না শালা মেহেদী নেসার সাহেব রয়েছে ওখানে, শুনতে পাবে যে!

সারা রাস্তাটাই বশীর মেহেদী নেসারকে গালাগালি দিতে দিতে চলতে লাগলো। সেই হাত-পা বাঁধা অবস্থায় কান্ত শুধু শুনতে লাগলো বশীরের

লাগলো। শুনতে শুনতে বড় অবাক লাগলো। এই নিজামত, এর পেছনে এত ষড়যন্ত্র! তাহলে কোথাও সুখ নেই। সবাই নবাবের বিপক্ষে! তাহলে এই যে মেহেদী নেসার সাহেব ছোটমশাইকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে, মরালীকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে, এদের কী করবে? কে এদের বিচার করবে? কে শাস্তি দেবে? কি শাস্তি দেবে? নবাবই যদি না থাকে তো তাদের ধরে নিয়ে যাচ্ছে কেন?

বশীর মিঞা বললে—একটু কষ্ট করে থাক এখন, মেহেদী নেসার সাহেব চলে গেলেই তোর রশি আলগা করে দেবো—

কান্ত বললে—আমার জন্যে আমি ভাবছি না, ভাবছি মরিয়ম বেগমসাহেবার জন্যে—

—বেগমসাহেবার রশি আমি খুলতে পারবো না।

ভোর বেলার দিকে বজরা দুটো মুর্শিদাবাদের ঘাটে এসে লাগতেই ডাঙায় নামতে হলো। ঘাটে তখন লোক-জন কেউ নেই। চেহেল্-সুতুনের নহবতখানা থেকে তখন ইনসাফ মিঞা টোড়ি-রাগ ধরেছে। ওদিকে লড়াই বেঁধেছে কোথাকার লঙ্কা-বাগে, আর এদিকে ইনসাফ মিঞা তার নিত্য-নৈমিত্তিক কাজ করে যাচ্ছে। কান্ত সেই অবস্থাতেই চুপ করে সেখানে পড়ে রইলো। বশীর মিঞা গিয়ে দুখানা পালকি নিয়ে এল। আর একখানা পালকিতে উঠবে মেহেদী নেসার সাহেব।

ভোরের ঝাপসা আলোয় বোরখা-পরা মরিয়ম বেগমসাহেবাকে নিয়ে গিয়ে পালকিতে তুললো। তুলে দরজা বন্ধ করে দেওয়া হলো। তারপর ছোটমশাই। কান্ত ভালো করে দেখলে ছোটমশাই-এর দিকে। কখনো আগে দেখেনি ছোটমশাইকে। কিন্তু এইটুকু দেখা গেল তাতে মনে হলো বেশ সুন্দর দেখতে। গম্ভীর মানুষটি। বাদ নেই প্রতিবাদ নেই, মেহেদী নেসারের পেছন-পেছন সোজা গিয়ে উঠলো আর একটা পালকিতে। তারপর তিনটে পালকিই চলতে লাগলো সার বেঁধে!

—আমি?

বশীর বললে—তুই আমার সঙ্গে যাবি। কিন্তু তার আগে মাঝি-মাল্লাদেরও পাকড়াবার হুকুম দিয়ে গেছে মেহেদী নেসার সাহেব। ওদের না-পাকড়ালে ওরা সব বলে দেবে।

তারপর মাঝি-মাল্লাদের সকলকে ডেকে বললে—চল, চল সব—সঙ্গে চল—

একটা পেয়াদা নেই, পাহারা নেই। সবাই বিনা বাক্যব্যয়ে বশীর মিঞার সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগলো। ভয়ে সবাই থর থর করে কাঁপছে। বজরা দুটো সেখানেই পড়ে রইলো। সেদিকে আর দেখবার সাহস নেই কারো। জানে যদি বেঁচে থাকে তো বজরার কেরায়ার কথা পরে ভাববে!

চক-বাজারের কাছে আসতেই কান্ত বশীরকে জিজ্ঞেস করলে—মরিয়ম বেগম-সাহেবাকে কোথায় রাখা হবে রে?

—কেন, তোর জেনে কী ফয়দা?

—বল-না। আমার জানতে বড় ইচ্ছে করছে।

—তুই আশরফি কখন দিবি বল?

—আমাকে ছেড়ে না দিলে দেবো কী করে? আমার কাছে তো আশরফি নেই, আমাকে তো জোগাড় করে আনতে হবে?

—কখন জোগাড় করে আনবি?

—তুই যখন ছেড়ে দিবি তখনই এনে দেবো। এখন যদি ছেড়ে দিস আমাকে তো দু-প্রহর পরেই এনে দেবো!

বশীর মিঞা চলতে চলতে কী যেন ভাবতে লাগলো। তারপর বললে—তোকে ছাড়তে পারবো না, মেহেদী নেসার সাহেব জানতে পারলে আমার নিয়ে নেবে। আমাকে হুকুম দিয়ে দিয়েছে তোদের সকলকে নিয়ে ফাটকে পুরতে কোতোয়ালীর ফাটকে—

—তাহলে কী হবে?

বশীর মিঞা বললে—তুই এখনি নিয়ে আয়, কিন্তু কোথা থেকে আনবি?

কান্ত বললে—আমি যে দোকানে থাকি, সেইখান থেকে। সারাফত আলির খুশ্‌বু তেলের দোকান থেকে। কিন্তু তুই মরিয়ম বেগমসাহেবাকে ছেড়ে তো ঠিক? মেহেদী নেসার সাহেব কিছু বলবে না তো? কথা দিচ্ছিস তো?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, কথা দিচ্ছি! আশরফি পেলে আমি সব করতে পারি। বেশি আশরফি দিলে আমি তোকেও ছেড়ে দিতে পারি। দে না তুই? এক হা আশরফি দে তুই আমাকে, তোকেও ছেড়ে দিচ্ছি!

কান্ত বললে—আমার দরকার নেই। আমি ছাড়া পেতে চাই না। আমার মরে যাওয়াই ভালো—

ততক্ষণে সারাফত আলির খুশ্‌বু তেলের দোকানটার কাছে আসতে মিঞা বললে—আমি এখানে দাঁড়াচ্ছি, তুই গিয়ে নিয়ে আয়—

কান্তর হাতের কাছি খুলে দিলে বশীর। তারপর বললে—বেশি দেরি করিসনি যা, আমি দাঁড়িয়ে আছি এদের নিয়ে—

কান্ত ছাড়া পেয়ে দোকানটার পেছন দিকের দরজায় গিয়ে আস্তে আস্তে টোকা দিলে—বাদ্‌শা, ও বাদ্‌শা—

অনেক ডাকাডাকির পর বাদ্‌শা উঠলো। ভেতর থেকে দরজা খুলে কান্ত বাবুকে দেখেই অবাক হয়ে গেছে।

—কান্তবাবু আপনি? কোথায় ছিলেন অ্যাদ্দিন?

কান্ত তখন হাঁফাচ্ছে। কী বলবে বুঝতে পারছে না। আশরফির কথাটা করে পাড়বে তাই-ই ঠিক করতে পারছে না। সারাফত আলি সাহেব যদি টাকা না দেয়? বাদ্‌শার নিজের তো টাকা নেই, সারাফত আলি সাহেবের কাছে টাকা চাইতে হবে। বুড়ো যদি না দিতে চায়! যদি জিজ্ঞেস করে কীসের টাকা? কীসের জন্যে এত টাকা দরকার? তাহলে কী উত্তর দেবে কান্ত? কান্ত তো সারাফত আলির কোনো সাধ মেটায়নি। হাজি আহম্মদের বংশ তো এখনো নষ্ট হয়নি। এখনো তো চেহেল্‌-সুতুনের মধ্যে পাপের আর দাসত্বের আর কলঙ্কের লীলা চলেছে। সারাফত আলির আরকে তো কোনো কাজ হয়নি। নবাব সুজাউদ্দীনের আমলে যা চলছিল, আলীবর্দীর আমলেও যা চলছিল, যেমন করে চলছিল, তেমন করেই তো সব এখনো চলছে! তাহলে কেন বুড়ো টাকা দেবে তাকে?

—কী হলো আপনার কান্তবাবু? শির গোলমাল হলো নাকি?

কান্ত বললে—সারাফত আলি সাহেব কোথায়?

—সাহেব তো ঘুমোচ্ছে। সাহেবকে ডাকবো? কিছু দরকার আছে?

—না, আমিই সাহেবের কাছে যাচ্ছি—

কান্ত আস্তে আস্তে সারাফত আলির শোবার ঘরের দিকে গেল। কী বলবে সে? কী বলে টাকা চাইবে আলি সাহেবের কাছ থেকে? মরিয়ম বেগমসাহেবার জন্যে টাকার দরকার বললেই বুড়ো জিজ্ঞেস করবে, মরিয়ম বেগমসাহেবার জন্যে টাকা কী হবে! জিজ্ঞেস করবে মরিয়ম বেগমসাহেবা কান্তর কে? আরো জিজ্ঞেস

...মরিয়ম বেগমসাহেবা আরক খায় কি না। সব কথার ঠিক-ঠিক উত্তর না ...তে পারলে কেন তাকে অত টাকা দেবে? টাকা দিলে কি হাজি আহম্মদের ...শের সর্বনাশ হবে?

—মিঞা সাহেব!

কোনো উত্তর নেই। পেছনে বাদ্‌শা দাঁড়িয়ে ছিল। সে বললে—আরো জোরে ...ন—

রাত্রে নেশা করে শুয়েছে, সামান্য ডাকাডাকিতে ঘুম ভাঙবার কথা নয়। তাই ...ও আবার ডাকলে—মিঞা সাহেব, মিঞা সাহেব—

এতক্ষণে সারাফত আলি চোখ মেলে চাইলে। লাল-লাল একজোড়া চোখ। ...ই চোখের দিকে চেয়ে কান্তর ভয় লেগে গেল। আলি সাহেব যেন সেই চোখ ...রেই বলতে চাইলে—কৌন্‌ বেত্তমিজ আমার ঘুম ভাঙিয়ে দেবার সাহস করলে? ...ন্?

কিন্তু কিছু বলবার আগেই আর একটা কাণ্ড হলো। বাইরে যেন হল্লার মত ...দ হতে লাগলো। এত ভোরে হল্লা কীসের? যেন অনেক লোক রাস্তায় ...রিয়ে পড়েছে। এমন তো হয় না এই সময়ে। সবাই মিলে দোকানের বাইরে ...ড়ো হচ্ছে আর গোলমাল করছে। ওদিকে চেহেল্‌-সুতুনের মাথায় ইনসাফ ...ঞার নহবত হঠাৎ থেমে গেল। কী হলো? এমন তো হয় না। সারাফত আলি, ...দ্‌শা, কান্ত, সবাই সেই ঘরের মধ্যেই থম্‌কে দাঁড়িয়ে রইলো। কার সঙ্গে কে ...কথা বলতে এসেছিল সবাই তা ভুলে গেল। বাদ্‌শা হঠাৎ ঘর থেকে বেরিয়ে ...তায় এসে দাঁড়ালো। সারাফত আলি অন্যমনস্ক হয়ে বললে—বাহার মে হল্লা ...ও হো রহা হ্যায়?

ততক্ষণে গোলমাল আরো বেড়ে উঠেছে। কান্তও ভাবনায় পড়লো। বশীর ...ঞা কি মাঝি-মাল্লাদের সঙ্গে ঝগড়া আরম্ভ করে দিলে!

কিন্তু রাস্তায় বেরিয়ে আসতেই অবাক হয়ে গেল। দলে দলে সব লোক ...রিয়ে পড়েছে। এলোমেলো আবহাওয়া। বশীর মিঞাও নেই। সঙ্গের মাঝি-...ল্লারাও সব কোথায় চলে গিয়েছে। কিন্তু কান্ত কিছু বুঝতে পারলে না। ...সব কী করছে এত লোক? শহরে যেন অরাজক অবস্থা। এরা সব কোথায় ...লেছে? বশীর মিঞা গেল কোথায়? লোকগুলো যেন খুব ভয় পেয়ে গেছে ...হচ্ছে। কী বলছে ওরা? গুজ্‌ গুজ্‌ ফিস্‌ ফিস্‌ করে সব কথা। যেন ...া বিপর্যয় ঘটে গেছে কোথাও।

একজনকে পাশে দেখে কান্ত জিজ্ঞেস করলে—ক্যা হুয়া হ্যায় ভাইয়া?

লোকটা কান্তর দিকে চাইলে একবার ভালো করে। তারপর হয়তো কান্তকে ...ন্দেহ হলো, কিন্তু কিছু না বলে অন্য দিকে চলে গেল।

কান্ত চক্‌ বাজারের রাস্তা দিয়ে আরো এগিয়ে চললো। এ-সময়ে অন্যদিন ...রাস্তার এ-চেহারা থাকে না। সব যেন ছন্নছাড়া। যাকেই জিজ্ঞেস করে কী ...য়েছে, সে-ই সন্দেহ করে! কোতোয়ালীর সামনেও অন্যদিনকার মত পাহারাদার ...ই। ইনসাফ মিঞার নহবত থেমে গেছে। আরো ওদিকে মেহেদী নেসার সাহেবের ...। ছোটমশাই আর মরালীকে নিয়ে গিয়ে কোথায় তুললো মেহেদী নেসার ...হেব? আরো ওদিকে মহিমাপুর। কান্ত সেইখানে গিয়ে দাঁড়ালো। সূর্যের আলো ...কটু একটু করে ফরসা হচ্ছে। সমস্ত মুর্শিদাবাদটা যেন হঠাৎ বড় ফাঁকা হয়ে ...ছে।

কিন্তু বশীর মিঞাই বা কোথায় গেল? টাকার লোভ ছাড়বার পাত্র তো বশ মিঞা নয়। তাহলে হঠাৎ কী এমন হলো যার জন্যে তাকে না নিয়ে বশীর মি চলে গেল? আর চলেই যদি গেল তো কোথায় গেল?

শহরের মধ্যে তখন আরো জোরে গুঞ্জন শুরু হয়েছে। সবাই সবাইকে জিজ্ঞে করছে—ক্যা হুয়া হ্যায় ভাইয়া?

ভিখু শেখ যে ভিখু শেখ, সারা রাত পাহারা দেয় মহিমাপুরের মহতাপজী ফটকে, সে-ও কেমন যেন চনমন্ করে উঠলো। বললে—ক্যা হুয়া?

শুধু মুর্শিদাবাদে নয়, শুধু বাঙলা দেশে নয়, সারা হিন্দুস্থানেই এখন এ প্রশ্ন উঠেছে—ক্যা হুয়া? শিখ, মারাঠা, ফরাসী, ডাচ, সবাই ১৭৫৭ সালে ২৪শে জুন ভোর বেলা ঘুম থেকে উঠেই বাইরের হল্লা শুনে কৌতূহলী হ প্রশ্ন করেছে—ক্যা হুয়া! হোয়াট্‌স্ আপ্?

খবরটা ক্লাইভ সাহেবের কাছে আগেই এসেছিল। কিন্তু তখনো বিশ্বাস হয়নি নবাব কি এত বোকা হবে?

তখন ল্যাসিংটনকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কর্নেল নিজে দাঁড়িয়ে থে তাকে কবর দিয়ে এসেছে। কিন্তু কাঁদার সময় পরেও আসবে। ওয়ার আগে, পরে ইমোশন। বাইরে এসে দাঁড়াতেই আকাশের সূর্য নজরে পড়লো। প মনসুন।

যে-যুদ্ধ ঘটাবার জন্যে বহুদিন ধরে ইতিহাস ষড়যন্ত্র করে আসছে, করে যে তার শুরু হবে সে-কথা কে ভেবেছিল। কে ভেবেছিল সাত-সাগর তের-ন পেরিয়ে এসে কোথাকার কোন্ একত্রিশ বছর বয়েসের একটা ছেলেকে লক্ষাবাগের আম-বাগানে এসে নিজের সমস্ত ইমোশনের গলা টিপে এমন সূর্যের দিকে চেয়ে হত্যা করতে হবে।

সামনে আয়ার কুট দাঁড়িয়ে ছিল।

কর্নেল হঠাৎ যেন তখন তাকে এই প্রথম দেখতে পেলে।

বললে—চুপ করে দাঁড়িয়ে আছ কেন? কী চাও?

আয়ার কুট বললে—আমার সেপাইরা বলছে, তারা এবার রেস্ট্ নেবে—বি করবে—

—হোয়াই? কেন?

—নবাবের অতবড় আর্মির সঙ্গে লড়াই করতে তাদের ভয় লাগছে। বলে ওরা এখানে মরতে আসেনি, যুদ্ধ করতে এসেছে!

কর্নেল ক্লাইভ চিৎকার করে উঠলো—যুদ্ধ করা আর মরা কি আলাদা জিনিস তুমি নিজেও কি মরতে ভয় পাও?

আয়ার কুট বললে—আমি আমার কথা বলছি না কর্নেল, আর্মি-সেপাইদে কথা বলছি—তারা নাম্বারে কম!

—তুমি যখন মিলিটারিতে ঢুকেছিলে তখন কি জানতে না যে যুদ্ধ মানেই মরা?

—আমি বলছি কর্নেল, ওটা আমার কথা নয়, আমার সোলজারদের কথা

ক্লাইভ বললে—চলো, আমি নিজে শুনতে চাই কে ও কথা বলছে। যারা মরতে ভয় পাচ্ছে আমি তাদের শুট করবো, আমি তাদের গুলি করে মারবো—চলো—

আয়ার কুট তখনো দাঁড়িয়ে ছিল।

ক্লাইভ বললে—চলো—

ক্লাইভের গলার আওয়াজে থর থর করে কেঁপে উঠলো আয়ার কুট। তারপর চলতে লাগলো। কর্নেল তখন হাতের রিভলবারটা আরো বাগিয়ে ধরেছে।

বললে—চলো, কুইক, তাড়াতাড়ি চলো—

আর লক্কাবাগের আর-একদিকে নবাবের ছাউনির ভেতর মীর্জা মহম্মদ তখন চিৎকার করে ডাকলে—নেয়ামত!

বাইরে যেন কোথায় গোলমাল হচ্ছে। এ গোলমাল যুদ্ধের গোলমাল নয়। ওদিকে মীরমদন আর মোহনলালের সেপাইরা কামান ছুঁড়ে চলেছে একটার পর একটা। গোলমাল পেছন দিক থেকে আসছে।

আবার ডাকলে—নেয়ামত!

—খোদাবন্দ্!

—অত গোলমাল হচ্ছে কীসের? ওরা কারা?

নেয়ামত কী বলতে গিয়েও যেন থেমে গেল।

—বল্, কী বলছিলি, বল?

—খোদাবন্দ্, খিদ্মদ্গারদের বেত মারা হচ্ছে!

—বেত মারা হচ্ছে? কেন?

—ওরা খোদাবন্দের সোনার কলকে চুরি করেছিল!

—সোনার কলকে চুরি করেছিল বলে বেত মারতে কে বলেছে?

—ইয়ারজাঁ সাহেব!

নবাব মীর্জা মহম্মদ খানিকক্ষণ চুপ করে রইলো। বাইরে থেকে খিদ্মদ্গারদের আর্তনাদ কানে আসছে। সপাং সপাং শব্দগুলো বাতাসের বুক চিরে এসে লাগছে তাঁবুর দেয়ালে। মীর্জা মহম্মদের মনে হলো ও যেন বেত মারার শব্দ নয়, ও যেন বাঙলা মুলুকের আত্মার আর্তনাদ। বহু দূর শতাব্দী থেকে যত আত্মা বেহেস্তে গেছে, যত লোক নবাবদের হাতে জান্ দিয়েছে, চেহেল্-সুতুনে যত বেগম যত খোজা আত্মহত্যা করেছে, সবাই যেন একযোগে আজ লক্কাবাগের লড়াই-এর মাঠে এসে তার জবাবদিহি চাইছে! আমি জবাবদিহি দেবো কী করে? আমি কেন অন্যের পাপের উত্তরাধিকারী হবো? মীর্জা মহম্মদ নিজের মনেই যেন নিজের প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেয়ে শান্ত হলো। তা তো বটেই! আমি যেমন উত্তরাধিকারসূত্রে তোমাদের সোনার কলকের উত্তরাধিকারী হয়েছি, তেমনি উত্তরাধিকারী হয়েছি তোমাদের পাপেরও। পাপ সম্বন্ধে তো আমার কোনো জ্ঞান ছিল না আগে। তুমিই তো আমাকে শেখালে মরিয়ম বেগমসাহেবা! কেন শেখাতে গেলে? তুমি না শেখানো পর্যন্ত আমি তো বেশ ছিলাম। আমার রাতে ঘুম আসতো না, তা না আসুক। কিন্তু এ যে আরো মর্মান্তিক। এ যে আরো কষ্টের। এতদিন তো জানতে পারিনি আমার এই অন্তরাত্মার মধ্যেই তুমি আছো। তোমাকে এতদিন অস্বীকার করেছি বলেই তো আজ আমাকে এই এদের কলকে নিয়ে লক্কাবাগে আসতে হয়েছে। আমি এদের ভাগ্যবিধাতা আর নই, এ কথা তুমিই তো জানিয়ে দিলে মরিয়ম বেগমসাহেবা। তুমিই জানিয়ে দিলে দেশের ভাগ্যবিধাতার ওপরেও আর একজন ভাগ্যবিধাতা আছে—সে দুনিয়ার মানুষের ভাগ্যবিধাতা!

—মেহেদী নেসার সাহেব কোথায়?

—তিনি তো এখানে নেই খোদাবন্দ্! তাঁকে খুঁজেছিলুম—

—তা হলে ইয়ারজান সাহেবকে ডাক্! বল্, ওদের বেত মারতে হবে না। লড়াই খতম্ হয়ে গেলে আমিই সকলকে বেত মারবো।

নেয়ামত কুর্নিশ করে চলে যাচ্ছিল।

মীর্জা মহম্মদ হঠাৎ ডাকলে—শোন্—

নেয়ামত ফিরে দাঁড়ালো। নবাব মীর্জা মহম্মদ গদি ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। এমন কখনো হয়নি আগে। নবাব যাকে যা হুকুম দিয়েছে, বরাবর তখনই সে তা তামিল করেছে। আজ কিন্তু নবাবের মনে হলো নবাব আজকে নিজেই যাবে।

মীর্জা মহম্মদ উঠে বাইরের দিকে বেরিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু আবার মনে পড়লো। জড়োয়ার তলোয়ারখানা কোমরে ঝুলিয়ে নিয়ে বললে—চল্, আমি নিজেই যাচ্ছি—

বলে তাঁবু থেকে বেরোল। পেছন-পেছন নেয়ামত চলতে লাগলো।

সেদিন কেষ্টনগরের রাজবাড়ির অতিথিশালার ভেতর থেকেই উদ্ধব দাসের গান শোনা গেল—

আমি রবো না ভব-ভবনে।
শুন হে শিব শ্রবণে॥
যে-নারী করে নাথ,
পতিবক্ষে পদাঘাত...

রান্নাবাড়ির লোকজন যে-যার কাজ নিয়ে ব্যস্ত।

বললে—ওই গো, দাসমশাই এয়েচে—

রসুই-বামুন হাতা-খুন্তি ফেলে এল। উদ্ধব দাস তখন পুঁটুলিটা নামিয়ে রেখে হাত-পা ধুচ্ছে আর গুণ-গুণ করে গান গাইছে।

রসুই-বামুন বললে—কী গো দাসমশাই, অ্যাদ্দিন কোথা ছিলে?

উদ্ধব দাস সে-কথায় কান না দিয়ে বললে—মুগের ডাল রেঁধেছো?

রসুই-বামুন বললে—কোন্ মুগের ডাল খাবে তুমি বলো না, ঘোড়া-মুগ না সোনা-মুগ?

উদ্ধব দাস বললে—আমার কাছে সবই সমান, আমার ঘোড়ারও দরকার হয় না, সোনারও না। ও-সব নিয়ে রাজা-মহারাজা-নবাবদের কারবার।

—পথে যুদ্ধ দেখে এলে নাকি দাসমশাই?

উদ্ধব দাস বললে—পথে একটা ধাঁধা বানিয়েছি গো, ওই যুদ্ধ নিয়ে, শুনবে? বলেই আরম্ভ করলো—বলো তো এর কী উত্তর হবে?

উভয় পক্ষের রাজা হয়ে ক্রোধমন।
সম্মুখ সংগ্রামে দোঁহে দিল দরশন॥
উভয় পক্ষের সৈন্য সংহার হইল।
এক বিন্দু রক্ত কিন্তু ভূমে না পড়িল॥
এ হেন অদ্ভুত যুদ্ধ কেবা দেখিয়াছে।
পদাতিক জয়ী হলে সেনাপতি বাঁচে॥

হঠাৎ সরখেল মশাই ঢুকে পড়লো। উদ্ধব দাস জিজ্ঞেস করলে—কি গো প্রভু, মুখটা অত উদ্বিগ্ন কেন?

সরখেল মশাই রেগে গেল। বললে—তুমি থামো, ঘর-সংসার তো করলে না! মার ধাঁধা শুনলে আমার পেট ভরবে?

—আজ্ঞে প্রভু, সংসারটাই তো ধাঁধা!

—দূর আহাম্মক, সংসারটা করলি কবে যে বলছিস সংসার ধাঁধা। সংসার করলে বুঝতিস এ ধাঁধা নয়, গোলক-ধাঁধা!

বলে রসুই-বামুনের দিকে চেয়ে বললে—কী রে, দেওয়ানমশাই ইদিকে এয়েচে? দেওয়ানমশাই গেলেন কোথায়?

বলতে বলতে আর সেখানে দাঁড়ালো না সরখেলমশাই। সোজা আবার বাইরের দিকে চলে গেল।

উদ্ধব দাস হা হা করে হেসে উঠলো। বললে—গোলক-ধাঁধা আমাকে চেনাতে এসেছে, দেখলে তো?

বলে আবার গান আরম্ভ করে দিলে :

হরি হে, গোলকধাঁধায় ঘুরে ঘুরে মরি!
এবার তরী ভিড়াও ঘাটে ভব-সাগর তরি॥

ওদিকে দেওয়ানমশাই তখন বলছেন—দেখাই পেলিনে? তা সবাইকে জিজ্ঞেস করলিনে কেন ছোটমশাই কোথায় গেছেন?

—আজ্ঞে, আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, কেউ বলতে পারলে না।

—তাহলে দাঁড়া, আমি মহারাজকে বলে আসছি।

সরখেলমশাই বললে—আজ্ঞে, ছোটমশাই সেই এক মাস আগে হাতিয়াগড় থেকে মুর্শিদাবাদে যাবার নাম করে বেরিয়েছেন, তারপর আর তাঁর পাত্তা নেই—জগা খাজাঞ্চিবাবু খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছেন—

কালীকৃষ্ণ সিংহমশাই বললেন—আচ্ছা তুই যা, আমি মহারাজকে গিয়ে বলছি—

বলে দেওয়ানখানা থেকে বেরিয়ে রাজবাড়ির দিকে চলতে লাগলেন।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তখন গৃহিণীর সঙ্গে কথা বলছিলেন অন্দর-মহলে।

গৃহিণী বলছিলেন—তোমার হাতিয়াগড়ের রাণীবিবিকে দেখলাম। মেয়েটা ভালো, একেবারে গোবেচারা মানুষ, কিন্তু ওর সঙ্গের ঝিটা জাঁহাবাজ মাগী। আমাকে বলে কি না বশীকরণ জানে উচাটন জানে, বাটি-চালা নল-চালা সব জানে। আরে, অতই যদি জানবি তুই তো ওই ফিরিঙ্গী সাহেবব্যেটাকে উচাটন করলেই পারতিস্!

মহারাজ হেসে বললেন—তা ঝিরা একটু জাঁহাবাজই হয়।

—ঝিরা জাঁহাবাজ হলেই হলো? কই, আমার তো পদ্মকে দেখেছো তুমি, সে অমন করে জাঁহাবাজি করুক দিকি আমার কাছে। আমি ঝামা দিয়ে তার নাক ঘষে দেবো না! কিন্তু যাই বলো, রাণীবিবি কিন্তু সোয়ামী বলতে অজ্ঞান!

মহারাজ বললেন—ওই হাতিয়াগড়ের ছোটমশাইও তাই। যেদিন থেকে স্ত্রী

নিরুদ্দেশ সেই দিন থেকেই একেবারে দিশেহারা হয়ে গেছেন। একবার হাতিয়া-গড়, একবার মুর্শিদাবাদ, কেষ্টনগর, আর একবার সুতোনুটি করছেন। ওঁদের খাওয়া-দাওয়ার কোনো অসুবিধে হচ্ছে না তো?

গৃহিণী বললেন—আমি তো ওদের ছুঁই না—

—কেন? ছোঁও না কেন?

—ফিরিঙ্গী সাহেবের খানা খেয়েছে, জাত-জন্ম আছে নাকি ওদের যে ছোঁবো?

—তা হলে ওঁরা কার রান্না খাচ্ছেন? বাবুর্চি খানসামার রান্না?

—না, তা কেন, ওই যে ঝিটা আছে, ওই-ই নিজে রান্না করে নেয়। ওরা তো মুখে বলে ফিরিঙ্গীর ছোঁওয়া খায়নি। কিন্তু মুখের কথায় বিশ্বাস করে তো আর ওদের রান্নাবাড়িতে ঢুকতে দিতে পারা যায় না। তাই তো আর বেশিদিন থাকতে চাইছে না এখানে। তা হ্যাঁ গো, ওদের কবে পাঠাবে হাতিয়াগড়ে?

মহারাজ বললেন—হাতিয়াগড়ে তো পাঠালেই হলো না। অনেক ভেবে-চিন্তে তবে পাঠাতে হবে। সেই জন্যেই তো ছোটমশাইকে কেষ্টনগরে ডেকে পাঠিয়েছি। সরখেল গেছে আমার চিঠি নিয়ে। ওদিকে নবাবও আবার ফিরিঙ্গীদের সঙ্গে লড়াই করতে গেছে।

গৃহিণীর যেন এতক্ষণে একটা জরুরী কথা মনে পড়লো।

বললেন—হ্যাঁ গো, আমিও শুনেছিলুম পদ্মর কাছে, কোথায় নাকি যুদ্ধ হচ্ছে ফিরিঙ্গীদের সঙ্গে? কীসের যুদ্ধ? এত যুদ্ধ করে কেন তোমাদের নবাব? খেয়ে-দেয়ে আর কাজ নেই নাকি নবাবের?

মহারাজ বললেন—পদ্ম যুদ্ধের কথা জানলে কী করে?

—ওমা, পদ্ম জানবে না তো কে জানবে? পদ্মর যে মেসোর বাড়ি ওখানে

—কোথায় মেসোর বাড়ি?

—ওই পলাশী গাঁয়ে। যুদ্ধ লাগবার সঙ্গে সঙ্গে পদ্মর মেসোরা যে সংসার তুলে সব ওর কাছে এখেনে এসে উঠেছে।

—এখেনে উঠেছে মানে?

—এখেনে মানে আমাদের অতিথশালায়। তা আমার ঝি, আমাদের এখানে উঠবে না তো বড়দির বাপের বাড়িতে গিয়ে উঠবে? তুমি যে কী বলো? তাই ওর কাছেই শুনেছিলুম, ভোর বেলা ফিরিঙ্গী-পল্টনদের দেখেই ঘর-দোর ছেড়ে সবাই পালিয়ে এসেছে। মাচার কুমড়ো, মাঠের ধান কিছু সঙ্গে আনতে পারেনি-

মহারাজের মুখটা খানিকক্ষণের জন্যে গম্ভীর হয়ে গেল।

গৃহিণী বললেন—কী হলো? পদ্মর মেসো এখেনে এসেছে বলে তোমার আবার রাগ হলো নাকি?

মহারাজ হাসলেন। বললেন—তুমি বুঝবে না ছোটগিন্নী, আমি যে গম্ভীর হয়েছি কেন তা দু'দিন বাদে বুঝতে পারবে!

—তার মানে? স্পষ্ট করে খুলে বলো, আমি এত হেঁয়ালি বুঝিনে—

মহারাজ বললেন—শুধু পলাশী গাঁ নয়, আমাকেও বোধ হয় একদিন কেষ্টনগর ছেড়ে অন্য লোকের আশ্রয়ে গিয়ে উঠতে হবে। দিনকাল এমনই আসছে আমি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি তার আভাস। তুমি ভাবো আমি দিনরাত কাব্যচর্চা করি আর ভাঁড়ামি শুনি গোপালভাঁড়ের কাছ থেকে। কিন্তু মাথার মধ্যে সব সময় আমার ওই কথা ঘুরছে। আমি ঘুমিয়ে পর্যন্ত শান্তি পাই না, খেয়ে পর্যন্ত তৃপ্তি পাই না।

—তা অত কথা ভাবো কেন তুমি?

—ভাববো না? আমি না ভাবলে কে ভাববে? কাল রাত্রে তুমিও তো ঘুমিয়েছ। কিন্তু যদি জেগে থাকতে তো দেখতে পেতে আমি ওই সামনের ছাদে পায়চারি করেছি।

—কেন গো? শরীর ভালো আছে তো তোমার?

—শরীরের কিছু হয়নি। কিন্তু কেবল ভেবেছি, এ ভালো করলুম না খারাপ করলুম!

—কী ভালো করলে? খারাপই বা কী করলে তুমি?

মহারাজ বললেন—এই যে তোমার কি পদ্মর মেসোরা গ্রাম ছেড়ে অতিথি-শালায় এসে উঠলো, এই যে হাতিয়াগড়ের রাণীবিবি আমার অন্দর-মহলে এসে উঠলেন, এই যে লক্কাবাগের মাঠে ফিরিঙ্গী-পল্টনরা এসে কামান দাগতে শুরু করেছে, এর পেছনে তো সেই আমিই!

—তুমি! তুমি মানে?

মহারাজ বললেন—হ্যাঁ, আমি, আমি! ছেলেদের কাউকে বলিনি সেকথা। বলবার মত মতি-গতিও নেই এখন! কেবল ভাবছি কেন আমি করতে গেলুম এ সব!

গৃহিণী বললেন—তা কবিরাজমশাইকে না-হয় ডাকো—চ্যবনপ্রাশ খেলে তো প্যারো—

মহারাজ বললেন—তোমাকে এত কথা বলতে যাওয়াই দেখছি আমার ঘাট হয়েছে। তুমিই যদি এত কথা বুঝবে তা হলে...

বলতে গিয়েও থেমে গেলেন মহারাজ। বললেন—যাই, নিচেয় যাই—

—তা তো যাবেই, আমার কাছে থাকতে তো তোমার ভালো লাগে না!

মহারাজ বললেন—দেখো, এখন রাগ-অভিমান-অনুরাগের সময় নয়। একদিন এই আমিই ফিরিঙ্গী ক্লাইভ সাহেবকে নবাবের বিরুদ্ধে তাতিয়ে দিয়ে এসেছি। একদিন এই আমিই ভেবেছি, ক্লাইভ সাহেব এসে নবাবকে যুদ্ধ করে হারিয়ে দিলে আমার ভালো হবে—

গৃহিণী বললেন—ক্লাইভ সাহেব! যে সাহেবের কাছে এই এরা এতদিন আটক হয়ে ছিল? সে তো খুব ভালো লোক!

—ভালো লোক? কে বললে ভালো লোক? কে বলেছে তোমায় ক্লাইভ সাহেব ভালো লোক?

গৃহিণী বললেন—ওই তো ওরাই বলছিল। ওই হাতিয়াগড়ের ছোটমশাই-এর বউ। ওরা বলছিল এতদিন ছিল ওরা পেরিন সাহেবের বাগানে, একদিনও ওদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেনি। ওদের জন্যে সাহেবও নাকি মদ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছিল, গরুর মাংস মুরগীর মাংস পর্যন্ত খাওয়া ছেড়ে দিয়েছিল—ওদের ঝিটাকে 'দিদি' 'দিদি' বলে ডাকতো—

মহারাজ হাসলেন—তাই দিয়ে মানুষকে বিচার করতে নেই।

—ওমা, মানুষকে আবার তবে কী দিয়ে বিচার করবো?

—তুমি ওদের কী জানো শুনি? কতটুকু জানো? ওরা এ-দেশে এসেছে ব্যবসা করতে, ব্যবসা করে টাকা উপায় করতে, ওরা তো ভালো ব্যবহার করবেই। ব্যবসাদার মানুষরা কড়া করে কথা বললে তাদের ব্যবসা চলে? ওরা হাসলেই তো ভয় হবার কথা। ওই হাসি দেখিয়েই তো আমাদের সকলের মন ভুলিয়েছে,

ওই সাহেবরা। আমরা কৃতার্থ হয়ে গিয়েছি—

—তুমি কী বলছো আমি বুঝতে পারছি না।

মহারাজ বললেন—তোমার বুঝেও দরকার নেই। বুঝলে আর তুমি মেয়েমানুষ হয়ে জন্মাতে না—। আমি যাই, নিচেয় যাই—

গৃহিণী বললেন—তা সারা দিন-রাত নিচেয় তোমার বিষ্ণুমহলেই থাকলে পারো? ওপরে আমার ঘরে কী করতে আসো? এর পর থেকে পদ্মকে বলো আমার একলার বিছানা করতে—

বলে রাগ করে গৃহিণীই চলে যাচ্ছিলেন। মহারাজ হাতটা ধরে ফেললেন।

বললেন—রাগ করো না। রাগ করতে নেই আমার ওপর। যেদিন সমস্ত কেষ্টনগর জ্বলে-পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে সেদিন রাগ করো আমার ওপর। মনে করো না আমি পাগল হয়ে গিয়েছি। নবাবের ওপর রাগ করে আমরাও তোমার মতন নবাবের পাশ থেকে সরে এসেছি। জানো, নবাবের আজকে কেউ নেই!

—নবাবের কথা ভাববার সময় নেই আমার, আমার কথা কে ভাবে তার ঠিক নেই, আমার ভাবতে বয়ে গেছে নবাবের কথা!

মহারাজ বললেন—তুমি না-ভাবলেও আমাকে ভাবতেই হবে!

—কেন, নবাব কি তোমাকে খাওয়ায় না পরায়? আমাদের জমিদারি আছে, জমিদারির আয় থেকে আমরা খাচ্ছি। নবাব মরলো কি বাঁচলো তা নিয়ে ভারি তো আমাদের মাথা-ব্যথা—

মহারাজ বললেন—তুমি জানো না বলেই ও-কথা বলছো! দেশের নবাবের সঙ্গে আমরা যে সবাই জড়িয়ে গিয়েছি—

—তা নবাব মারা গেলে আবার একজন নবাব হবে। নবাবের মসনদ তো খালি থাকবে না—

মহারাজ বললেন—এবার তো আর তা নয়। আলীবর্দী খাঁ মারা গেলে সিরাজ-উ-দ্দৌলা নবাব হয়েছিল। এবার সিরাজ-উ-দ্দৌলা মারা গেলে আর তা হবে না। এবার ফিরিঙ্গীরা নবাব হবে।

—বলো কী?

—তুমি যাও, কিছু মনে করো না, আমি নিচেয় যাচ্ছি। এতদিন আমিও সকলের মত ভাবতুম, সিরাজ-উ-দ্দৌলা মারা গেলেই বা ক্ষতি কী! মারা তো একদিন সবাই-ই যাবে। মসনদে তার বদলে আর একজন না-হয় বসবে, হয় মেহেদী নেসার, নয়তো মীরজাফর সাহেব, নয়তো তার ছেলে মীরণ, কিন্তু রকম-সকম দেখে আমি ভয় পেয়ে গিয়েছি—

—কেন?

—সে তুমি বুঝবে না—বলে নিচেয় চলে গেলেন মহারাজ। সিঁড়ি দিয়ে যাবার পথে সদর-মহলের মুখেই দাঁড়িয়ে ছিল কালীকৃষ্ণ সিংহ মশাই।

—কী খবর দেওয়ান মশাই? শশী আর কিছু খবর দিয়েছে?

দেওয়ান মশাই সেই খবর দিতেই আসছিল। আজকাল ঘন-ঘন দেওয়ানমশাইকে দেখা করতে হয় মহারাজের সঙ্গে। কখন কোন খবরটা আসে, কখন কে কী খবর পাঠায়, তার সবটা জানাতে হয় মহারাজাকে। সেই অনুযায়ী নির্দেশ পাঠাতে হয় মুর্শিদাবাদে। মুর্শিদাবাদের নিজামতে কে কী ভাবছে, কে কী করছে, তার ওপর নির্ভর করে কেষ্টনগরের রাজত্ব।

—মীরমদন সাহেব মারা গেছে হুজুর! এইমাত্র খবর এল।

কথাটা শুনে মহারাজের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হলো। মীরমদন! মীরমদন মারা গেছে!

—তুমি ঠিক শুনেছো?

—হ্যাঁ, ঠিক শুনেছি।

—তাহলে নবাবের এখন কী-রকম অবস্থা? মীরজাফর সাহেব কী করছে?

—অত খুঁটিনাটি কিছু জানাতে পারেনি।

—ওদের—ফিরিঙ্গীদের কী মতলব? লড়াইতে জিততে পারলে কি মুর্শিদাবাদের মসনদ নিয়ে টানাটানি করবে নাকি?

—সেই রকমই তো হালচাল মনে হচ্ছে। মীরজাফর সাহেব সেই জন্যেই হাত গুটিয়ে বসে আছে। উচ্চবাচ্য করছে না। ফিরিঙ্গীদের বিশ্বাস করতে পারছে না—

মহারাজের হঠাৎ যেন কথাটা মনে পড়ে গেল। বললেন—হ্যাঁ, ভালো কথা, সরখেল এসেছে?

—হ্যাঁ, ছোটমশাই-এর কোনো পাত্তা নেই হাতিয়াগড়ে। কেউ জানে না তিনি কোথায় আছেন।

—তাহলে জগৎশেঠজীকে একবার চিঠি লিখে পাঠাও, যদি জগৎশেঠজীর বাড়িতে লুকিয়ে উঠে থাকেন—

ওদিকে মহারানী অন্দর-মহলের সিঁড়ি পেরিয়ে নিচেয় আসতেই পদ্ম বললে—রানীমা, তোমাকে ওরা ডাকছে—

—কারা রে?

—ওই হাতিয়াগড়ের রাণীবিবি!

—কেন, আমাকে আবার কী জন্যে ডাকে? চল, দেখে আসি—

অতিথিশালায় তখন বেশ গুলজার চলেছে। অনেক দিন পরে উদ্ধব দাস এসেছে। শুধু উদ্ধব দাসই নয়। লক্কাবাগের আশেপাশের গাঁয়ের কিছু-কিছু লোকও পালিয়ে এসে জুটেছে। উদ্ধব দাস সকলকেই চেনে। সবাই মিলে তাকে গান গাইতে ধরেছে।

উদ্ধব দাস বললে—রসের গান গাইবো?

সবাই বললে—না না, তোমার একটা খেদের গান আছে, সেইটে গাও—

—কোনটা খেদের গান?

—সেই যে তোমার বউ পালিয়ে যাবার পর যে-গানটা বেঁধেছিলে?

আর বলতে হয় না। উদ্ধব দাস ডান হাতটা কানে লাগিয়ে সুর করে আরম্ভ করে—

আমি রবো না ভব-ভবনে
  শুন হে শিব শ্রবণে।
যে-নারী করে নাথ
হৃদি-বক্ষে পদাঘাত
তুমি তারি বশীভূত
  আমি তা সবো কেমনে।
পতিবক্ষে পদ হানি
সে হলো না কলঙ্কিনী
মন্দ হলো মন্দাকিনী।

ভক্ত হরিদাস ভনে—
আমি রব না ভব-ভবনে।

কোথা থেকে সব লোক-জন ঘর-বাড়ি ছেড়ে এসেছে, কিন্তু উদ্ধব দাসের গান শুনে আর দুঃখ-কষ্ট কারো মনে থাকে না। সবাই বাহবা দেয়। বলে—বেশ বেশ দাসমশাই—বেশ—

কিন্তু ছোট বউরানীর কানেও গেছে গানের সুরটা।

বললে—ওরে দুগ্যা, ওই—

দুর্গার কানেও গেছে। আবার সেই বাউণ্ডুলেটা এখানেও এসেছে নাকি? পদ্মকে ডেকে বললে—তোমার রানীমাকে ডাকো তো—

—কেন? রানীমা কী করবে?

দুর্গা বললে—তুমি ডাকো না—

রানীমা আসতেই দুর্গা বললে—দেখুন রানীমা, ছোট বউরানী বড্ড ভয় পেয়ে গেছেন—

—কেন, কী হলো?

দুর্গা বললে—ওই যে বাইরে গান গাইছে, ও কোথায় গাইছে? এদিকে আসবে নাকি ও?

মহারানী বললেন—কেন বলো তো?

—আজ্ঞে, ও লোকটা খারাপ।

—খারাপ? তা ও কে? কী করে চিনলে ওকে তোমরা?

দুর্গা বললে—পেরিন সাহেবের বাগানে যখন আমরা ছিলাম তখন ও আমাদের বড় জ্বালাতো—ক্লাইভ ওকে খুব ভালবাসতো।

—কেন?

—ওই ছড়া কাটতো কেবল, আর ছোট বউরানীর সঙ্গে দেখা করতে চাইতো।

মহারানী অবাক হয়ে গেলেন। বললেন—তা তোমার ছোট বউরানীর সঙ্গে দেখা করতে চাইতো কেন?

—ও বলতো ছোট বউরানী নাকি ওর বউ।

—ওমা, সে কী কথা? ছোট বউরানী ওর বউ হতে যাবে কী করতে! ওর কি মাথা-খারাপ?

দুর্গা বললে—না রানীমা, ছোট বউরানী তো মরালী নাম নিয়ে ক্লাইভ সাহেবের ছাউনিতে ছিল, সেই জন্যে। ওর বউ-এর নামও তো মরালী কি না—ওর বউ যে বিয়ের রাত্রেই পালিয়ে গিয়েছিল—

এতক্ষণে মহারানী ব্যাপারটা সব বুঝলেন।

দুর্গা বললে—ও এদিকে আসবে নাকি?

মহারানী বললেন—না না, ও লোকটা তো এখানে আমাদের অতিথিশালায় প্রায়ই আসে আর গান গায়। কিছুদিন থাকে আবার চলে যায়—এদিকে ও আসবে কী করতে?

ওদিক থেকে তখনো উদ্ধব দাসের গানের আওয়াজ আসছে—

আমি রবো না ভব-ভবনে।
শুন হে শিব শ্রবণে।

পদ্ম মহারানীর কাছে এল। বললে—রানীমা, মহারাজা এসেছেন, আপনাকে ডাকছেন—

লক্কাবাগের লক্ষ আমগাছের বাগানে তখন ভারত-ভাগ্যবিধাতার এক কঠিন সংগ্রাম চলেছে। একদিকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নিবীর্য মোগল-আধিপত্যের ধ্বংসস্তূপ, আর একদিকে ভাবীকালের বণিক-সভ্যতার প্রতীক কর্নেল রবার্ট ক্লাইভ। পৃথিবীর ইতিহাসে যতবার অতীতকালের সঙ্গে ভাবীকালের লড়াই বেধেছে, ততবারই রাষ্ট্রবিপ্লব হয়েছে রক্তক্ষরণের পথে। ততবারই শান্তিপ্রিয় মানুষ বার বার বলেছে—না না, এ রাষ্ট্রবিপ্লব হয় হোক, কিন্তু সে যেন হিংসার পথ ধরে না আসে। সকলের অগোচরে হিংসা তখন আপন মনেই কেবল হেসেছে। রক্তপাত যা হবার হয়েছে, ধ্বংস যা হবার হয়েছে, রাষ্ট্রবিপ্লব যতটুকু হবার তাই-ই হয়েছে। কিন্তু হিংসা তা বলে থেমে থাকেনি। মানুষের বাইরের সভ্যতার মুখোশ খুলে দিয়ে হিংসা বার বার মুখব্যাদান করে অট্টহাসি হেসেছে। বলেছে—আমি আছি। কখনো যিশু খ্রীষ্টের বাণী, চৈতন্যদেবের বাণী, মহম্মদের বাণী মানুষকে হতাশায় সান্ত্বনা দিয়েছে, শোকার্তকে আশ্বাস দিয়েছে। কিন্তু তারই পাশাপাশি আবার চেঙ্গিস খাঁ, তৈমুর লঙ, আলেকজান্ডারের আর্মি স্রোতের মতন জনপদের পর জনপদ আক্রমণ করে মুহূর্তের মধ্যে সবকিছু শ্মশানভূমিতে রূপান্তরিত করে ছেড়েছে। একদিকে অত্যাচার, আর একদিকে বরাভয়—এ-ই হলো মানব-সভ্যতার ইতিহাস। যখন কোনো দিক থেকে মানুষ সত্যের সন্ধান পায়নি তখন আকাশের তারায়, গ্রহ-নক্ষত্রে এই অনন্ত রহস্যের সন্ধান করেছে। বলেছে—হে অদৃশ্য দেবতা, উত্তর দাও, আমার চিরন্তন প্রশ্নের সমাধান করো। কিন্তু কেউ-ই তার সেই চরম আর পরম প্রশ্নের উত্তর দেয়নি। মাঝখান থেকে ইতিহাস তার নিজের খেয়ালে এগিয়ে গিয়েছে—সত্য-অসত্য, সৎ-অসৎ, অত্যাচার-সান্ত্বনা সবকিছু একাকার করে দিয়ে অনাদি অনন্ত মহাকালের লক্ষ্যে পৌঁছোবার সাধনায় নির্বিকার চিত্তে সব-কিছু ওলোট-পালোট করে দিয়ে সামনে এগিয়ে গেছে। আর মানুষও তেমনি করে অনন্তকাল ধরে আকাশের দিকে চেয়ে প্রার্থনা করে গেছে—বলো কোনটা সত্য,—সূর্য, না রাত্রি? বলো কোনটা ধ্রুব,—শিব না অশিব? বলো কোনটা শাশ্বত,—হিংসা না অহিংসা?

নবাব সেই কথাই একদিন জিজ্ঞেস করেছিল মৌলভী সাহেবকে।

নিজামতের মৌলভী সাহেব। বরাবর নিজামত থেকে মাসোহারা পেয়ে নিজের নোকরি বজায় রেখেছে পুরুষানুক্রমে। কখনো কল্পনাও করেনি যে, একদিন আবার মুর্শিদাবাদের নবাবের কাছে তার বিদ্যে-বুদ্ধির পরীক্ষা দিতে হবে। উত্তর দিতে গিয়ে ঘন দাড়ির ভেতর বুঝি কথাটা আটকে গিয়েছিল। কিন্তু নবাবের বুঝতে ভুল হয়নি। হিসেবনবীসকে তখনই বরখাস্ত করবার হুকুম দিয়ে অব্যাহতি দিয়েছিল সেই মৌলভী সাহেবকে।

হয়তো সেই মৌলভী সাহেব সেদিন আর সকলের মতই অভিশাপ দিয়েছিল নবাবকে। হয়তো কেন, নিশ্চয়ই অভিশাপ দিয়েছিল। তা দিক। অভিশাপের ফল যদি ফলেই তো সে মৌলভীর বরখাস্তের জন্যে নয়। সে ফলবে ইতিহাসের অভিশাপের ফলে। ইতিহাস যাকে অভিশাপ দেয়, তাকে সে বড় নিষ্ঠুরভাবে অভিশাপ দেয়। তাকে শুধু সে ধ্বংস করে না, নিশ্চিহ্ন করে তবে স্বস্তির নিশ্বাস

ফেলে। যেমন করেছে সফররাজ খাঁকে।

তাঁবুর বাইরের দিকে যেতে যেতে এই কথাগুলিই মনে হচ্ছিল নবাবের। হঠাৎ ইয়ারজান সাহেব সামনে কুর্নিশ করে দাঁড়ালো।

—আমাকে ডেকেছিলেন আলি জাঁহা?

—কোথায় থাকো তোমরা? কাউকে ডেকে পাওয়া যায় না। মেহেদী কোথায়?

ইয়ারজান বললে—সে তো আলি জাঁহার দুষমনের সঙ্গে মোকাবিলা করতে গেছে—

নব্যব রেগে গেল।

—আমার দুষমন? আমার দুষমনের কি কম্‌তি আছে যে, মোকাবিলা করতে দূরে যেতে হবে? এখানে-সেখানে আশেপাশে যত লোক আছে, সব তো আমার দুষমন! নবাবের দুষমনের অভাব কে বললে? নবাবের দোস্তের মোকাবিলা করতে দূরে গেলে তবু তার একটা মানে থাকতো। ওই যে মীরজাফর, ইয়ার লুৎফ, দুর্লভরাম দাঁড়িয়ে রয়েছে ওখানে, ওরাই কি আমার দুষমন নয়?

ইয়ারজান বললে—সেই জন্যেই তো আলি জাঁহা, আমি দুষমনির প্রতিশোধ নিচ্ছিলাম এতক্ষণ—

—কী করে প্রতিশোধ নিচ্ছিলে শুনি? চাবুক মেরে? যারা আমার সোনার কল্‌কে চুরি করেছে তাদের চাবুক মেরে তুমি আমার দুষমনি দূর করবে?

—হ্যাঁ, আলি জাঁহা, শালারা বড় বেইমান।

—কিন্তু আর একটু দেরি করে প্রতিশোধ নিতে পারলে না? আর একটু দেরি করে প্রতিশোধ নিলে কী ক্ষতিটা হতো?

—প্রতিশোধ নিতে কি দেরি করা উচিত আলি জাঁহা? বেইমানরা যে আস্কারা পেয়ে যাবে তা হলে। ভাববে, নবাবের ক্ষমতা নেই; ভাববে, নবাব ভীরু, নবাব কম-জোর—

হঠাৎ দূরে নজর পড়লো, সার সার তাঁবুর সামনে সবাইকে দাঁড় করানো হয়েছে। নবাবেরই খানসামা বাবুর্চি খিদ্‌মদ্‌গার সব। সবাইকে মাইনে দিতে পারেনি নিজামত। তবু সবাই শাস্তির ভয়ে এখানে নবাবের সঙ্গে এসেছে। সঙ্গে এসে নব্যবের খেদমৎ করছে। তারাই সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। পেছন দিকে সকলের হাত বাঁধা। একজন সেপাই তাদের পিঠে সপাং সপাং করে বেত মারছে—

মীর্জা মহম্মদ আর থাকতে পারলে না। চিৎকার করে উঠলো—থামো—থামো—

পাশে দাঁড়িয়ে ছিল ইয়ারজান সাহেব আর নেয়ামত। নবাবের গলার শব্দে তারাও চমকে উঠেছে।

—থামো, থামো—

মীর্জা মহম্মদ আবার চিৎকার করে উঠলো। তারপর আর দাঁড়ালো না সেখানে যেন চাবুকগুলো তার নিজের পিঠের ওপরেই পড়ছিল এতক্ষণ।

ইয়ারজান সাহেব পেছন পেছন আবার তাঁবুর ভেতরে এল।

—আলি জাঁহা, আমি যদি কসুর করে থাকি তো আমাকে মাফ করুন—

মীর্জা গর্জে উঠলো—তুমি কী-রকম মানুষ ইয়ার, এই সময়েই ওদের চাবুক মারতে হয়? ঠিক এই সময়েই আমাকে এমন করে বিপদে ফেলতে হয়? তোমার একটা আক্কেল নেই?

মীর্জা মহম্মদ তাকিয়ার ওপর নিজের মাথাটা গুঁজে দিলে।

—আমার কসুর হলে আমাকে মাফ করুন আলি জাঁহা।

—আবার মাফ চাইছো তুমি? জানো, এখন আমার চারদিকে দুষমন, তার ওপর তুমি আরো দুষমন বাড়াচ্ছো। আর একদিন পরে চাবুক মারতে পারতে না? র একদিন আমাকে রেহাই দিতে পারতে না!

—আলি জাঁহা, আপনার ভালোর জন্যেই ওদের শায়েস্তা করছিলাম!

—আর ভালো করতে হবে না আমার। মেহেরবানি করে ওদের ছেড়ে দাও, মেহেরবানি করে আমাকে একটু শান্তি দাও ইয়ারজান,—আর একটা দিন সবুর করো। আর একদিন পরেই জেনারেল ল' আসছে—তারপর আমি আর কিছু বলবো না—

ইয়ারজান এবার চুপ করে রইলো। কোনো কথা বললে না।

—তুমি যাও, আমার সামনে থেকে চলে যাও ইয়ারজান, আমি আর কাউকে এখানে চাই না—

—খোদাবন্দ্!

নবাব এতক্ষণে আবার মুখ তুললো।

—কে?

—মীরমদন মারা গেছে।

নবাব মীর্জা মহম্মদ সোজা হয়ে উঠে বসেছে। মোহনলাল এসেছে। কথাটা যেন তবু বিশ্বাস হলো না। ঘোলাটে চোখ দিয়ে মোহনলালের দিকে চেয়ে দেখতে লাগলো।

মোহনলাল আবার বললে—আমার পাশে দাঁড়িয়ে লড়াই করছিল মীরমদন, সে মারা গেছে খোদাবন্দ্!

তবু নবাবের মুখে কোনো কথা নেই। নবাবের যেন বাক্‌রোধ হয়ে গেছে।

—মীরজাফর, ইয়ার লুৎফ খাঁ, রাজা দুর্লভরাম কেউ কামান ছুঁড়ছে না।

তবু নবাব নির্বাক।

—খোদাবন্দ্, আপনি কিছু হুকুম দিন। আপনি হুকুম দিলে আমি ফৌজ নিয়ে এগিয়ে যাই, আমি আর সিন্‌ফ্রে দুজনে ওদের হটিয়ে দেবো, আপনি শুধু হুকুম দিন খোদাবন্দ্!

এতক্ষণে নবাবের মুখে যেন কথা ফুটলো।

বললে—জেনারেল ল'র কোনো খবর আছে মোহনলাল?

—তা জানি না জাঁহাপনা, জেনারেল ল'র আসতে দেরি হবে, তার আগেই আমরা লড়াই ফতেহ্ করে দেবো। আপনি একবার শুধু হুকুম দিন খোদাবন্দ্!

হঠাৎ ঝমঝম করে বৃষ্টি এল আকাশ ভেঙে। সকলেই বাইরের দিকে চেয়ে দেখলে। বর্ষাকালের বৃষ্টি। বৃষ্টির জল লক্কাবাগের গাছপালা তাঁবু সবকিছু যেন ভাসিয়ে নিয়ে যাবে—

—গোলা-বারুদ সব বাইরে আছে খোদাবন্দ্, সব ভিজে যাবে, আমি গিয়ে দেখে আসি।

—কিন্তু মীরজাফর সাহেব? মীরজাফর সাহেব কোথায়? কামান ছুঁড়ছে না কেন? আমাকে যে কোরাণ ছুঁয়ে কসম খেয়েছিল। তা হলে তার কথা রাখছে না কেন?

ঝমঝম করে চারদিকে বৃষ্টি পড়ছে। কারো মুখে কোনো কথা নেই। ও কথার কে উত্তর দেবে? কে বলবে এত ফৌজ, এত হাতী, এত সেপাই, এত কামান থাকতে মীর বক্সী মীরমদন কেন হঠাৎ মারা যায়! ওই মীরমদনকেই তো কিছু আগে

মীর্জা মহম্মদ জিজ্ঞেস করেছিল, সে গীতা পড়েছে কিনা। গীতা পড়েনি কাফের মীরমদন। কাফেররা গীতা পড়বে না, মুসলমানরাও কোরাণ পড়বে না, অথচ লড়াই করতে এলে কামানের গোলা লেগে মারা যাবে! মারা যাবার আগে বেচারা মীরমদন জানতেও পারলে না, কেন তার পয়দা হয়েছিল এই দুনিয়ায়, কেনই বা মারা গেল আর মারা যাওয়ার পর কোথায় যাবে সে! তাজ্জব!

হঠাৎ সিন্‌ফ্রে ঘরে ঢুকেছে—ইওর এক্‌সেলেন্সি, ইংরেজদের সব গোলা-বারুদ বৃষ্টির জলে ভিজে গেছে, তারা সেগুলো সরিয়ে ফেলছে—

—তা ফেলুক, কিন্তু জেনারেল ল' আসতে এত দেরি করছে কেন সিন্‌ফ্রে?

—আপনি কিছু ভয় করবেন না ইওর এক্‌সেলেন্সি, আমি তো আছি। আই মাস্ট ফাইট দেম আউট। ইংরেজরা বিস্ট, ইংরেজরা সব ব্যাস্টার্ড—

—একবার মীরজাফর সাহেবকে আমার কাছে ডাকো তো মোহনলাল। মীরজাফর আসুক। তাকে আমি জিজ্ঞেস করবো—আপনি আপনার কথার খেলাপ করছেন কেন মীরজাফর সাহেব? আপনি না কোরাণ ছুঁয়ে আমার কাছে কসম খেয়েছিলেন, আপনি আমাকে মদত দেবেন? আপনি না আমার রিস্তাদার? আপনি না আমার আত্মীয়? আপনি যদি এই বিপদের সময়ে আমাকে না দেখেন তো কে দেখবে মীরজাফর সাহেব?

মোহনলাল সেই বৃষ্টির মধ্যেই বাইরে ছুটে বেরিয়ে গেল।

তখন লক্ষাবাগের মাঠে নতুন বর্ষার ঝম্‌ঝম্‌-করা বৃষ্টি একভাবে পড়ে চলেছে।

তাঞ্জামটা সেদিন যখন মতিঝিলে প্রথম এসে পৌঁছেছিল তখন ঝাপসা ভোর। সচ্চরিত্র পুরকায়স্থ মশাই চিরকাল ভোর বেলাই ঘুম থেকে ওঠে। সেদিনও ঘুম থেকে উঠেছিল। খুব ভোরে। মতিঝিলে সবাই দেরি করে ওঠে। কিন্তু চিরকালের অভ্যেস সচ্চরিত্রের এক দিনে বদলানো যায় না।

হঠাৎ সদর ফটক দিয়ে তিনটে পালকি ঢুকতে দেখে কেমন অবাক হয়ে গিয়েছিল। এত ভোরে তো পালকি আসে না কারো। নবাব যখন ছিল তখন মরিয়ম বেগমসাহেবার পালকি যখন-তখন আসতো, যখন-তখন যেত। কিন্তু এখন তো নবাব নেই। এখন তো নবাব লড়াইতে।

পালকি তিনটে চবুতরায় এসে থামলো।

একটা থেকে নামলো মেহেদী নেসার। আর একটা থেকে হাতিয়াগড়ের ছোট-মশাই। আর একটা থেকে বোরখা-পরা একজন মেয়েমানুষ।

মেয়েমানুষ দেখে আরো অবাক হয়ে গেল সচ্চরিত্র পুরকায়স্থ। মেয়েমানুষটার হাত দুটো নৌকোর কাছি দিয়ে বাঁধা। তাকে টানতে টানতে মেহেদী নেসার মতিঝিলের ভেতরে নিয়ে গেল। তারপর ফিরে এসে ছোটমশাইকেও ভেতরে নিয়ে গেল। তারও হাত দুটো রশি দিয়ে বাঁধা।

সচ্চরিত্র পুরকায়স্থ অনেক তাজ্জব ব্যাপার দেখেছে মতিঝিলে। এতদিন চাকরি করছে এখানে, কিছু দেখতে আর বাকি নেই। কিন্তু এমন ঘটনা কখনো দেখেনি।

আর তার খানিকক্ষণ পরেই মেহেদী নেসার সাহেব যেমন এসেছিল তেমনি

...র পালকিতে চড়ে মতিঝিলের সদর ফটক দিয়ে বাইরে চলে গেল।

আর ঠিক তার পরেই চেহেল্-সতুনের মাথা থেকে ইনসাফ মিঞার নহবতটা ...তে বাজতে হঠাৎ মাঝপথে থেমে গেল। কী হলো হঠাৎ? এমন তো হয় না।

তারপর চক্‌বাজারের রাস্তায় যেন লোকের আনাগোনা বাড়তে লাগলো।

সকালে কী হলো? কেয়া হুয়া? কেন অত লোকের জটলা? কী হয়েছে ...খানে?

সচ্চরিত্র পুরকায়স্থ হতবাক্ হয়ে সেখানে দাঁড়িয়েই ভাবতে লাগলো—কী ...লো হঠাৎ?

হঠাৎ পাশের দিকে চেয়ে দেখলে, কান্তবাবু।—এ কি বাবাজী, তুমি?

—আপনি মরিয়ম বেগমসাহেবাকে এখানে আসতে দেখেছেন পুরকায়স্থমশাই?

সচ্চরিত্রর চোখ দুটো ছল্‌ছল্ করে উঠলো।

বললে—তুমি আবার আমাকে পুরকায়স্থ মশাই বলে ডাকছো কেন বাবাজী? ...নামে তো আমাকে কেউ আর ডাকে না। তুমি আমাকে ইব্রাহিম বলে ডাকবে ...খন থেকে—

কান্ত বললে—তা হোক, আমার কাছে আপনি সেই আগেকার পুরকায়স্থ ...াই—

—না বাবাজী, ও নামে ডাকলে আমার যে সব আগেকার কথা মনে পড়ে যায়। ...নে পড়ে যায় আমি ঈশ্বর ইন্দীবর ঘটকের পুত্র, ঈশ্বর কালীবর ঘটকের পৌত্র। ...মার পরিবার ছেলেমেয়ে সকলের কথা যে মনে পড়ে যায় বাবাজী—আমার যে ...ন্না পায়—

কান্ত এবার সোজাসুজি চাইলে পুরকায়স্থ মশাই-এর দিকে। লোকটা যেন ...রো বুড়ো হয়ে গেছে এই ক'দিনেই।

বললে—আপনাকে আমি ওই মুসলমানী নামে ডাকতে পারবো না পুরকায়স্থ ...শাই, আপনি আমার কাছে এখনো হিন্দুই আছেন—আমি জাত মানি না—

পুরকায়স্থ মশাই বললে—না বাবাজী, জাতটা মেনো, আমার নিজের জাত ...লে গেলেও তোমাকে আমি বলছি বাবাজী, ওটা মেনো—ওতে তোমার পূর্ব-পুরুষের আত্মা পরকালে তবু এক ফোঁটা জল পাবে। আমি ঈশ্বর ইন্দীবর ঘটকের ...ধম ছেলে, আমার পিতা পরকালে জল না পেয়ে হা হা করে বেড়াচ্ছেন, আমি ...ঝতে পারছি বাবাজী—

—ও-সব কথা থাক পুরকায়স্থ মশাই, আমি অন্য কাজে এসেছি। শোভারাম বিশ্বাস মশাই-এর মেয়ে মরালীবালার সর্বনাশ হয়ে গেছে, আপনি তা জানেন?

সচ্চরিত্র বললে—শোভারাম বিশ্বাস মশাই-এর মেয়ে? কী সর্বনাশ?

কান্ত সচ্চরিত্রর হাত দুটো ধরে ফেললে। বললে—পুরকায়স্থ মশাই, আমার একটা উপকার করতে হবে আপনাকে। বলুন করবেন?

সচ্চরিত্র বললে—তোমার আমি যে সর্বনাশ করেছি বাবাজী, তার আর শেষ ...ই। আমার জন্যেই তোমার বিবাহে বাধা পড়লো, তোমার জীবনটা নষ্ট হয়ে ...গল। তা কি আমি ভুলে গেছি ভেবেছো?

—সে যা হবার হয়েছে, তার জন্যে আমার আর দুঃখ নেই। সেই মরালীবালাকে মেহেদী নেসার এখানে ধরে এনে রেখেছে শুনলাম। এখন আপনি তাকে বাঁচান।

—সে কী বাবাজী? সে যে নষ্টা মেয়ে। সে যে এখন মরিয়ম বেগমসাহেবা হয়ে গেছে। সে যে নবাবের সঙ্গে রোজ শোয়। তাকে কেন ধরতে গেল?

—খবরদার!

হঠাৎ কান্ত চিৎকার করে উঠলো।

—খবরদার বলছি, মরালীর নামে অমন কথা বলবেন না! আপনি নিজের চোখে শুতে দেখেছেন যে বলছেন?

সচ্চরিত্র বললে—না না, এখনকার কথা বলছিনে। এখন তো নবাব ফিরিঙ্গীদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গেছে। কিন্তু এককালে তো শুতো। যখন নবাব এখানে ছিল তখন তো শুয়েছে।

কান্ত বললে—আপনি নিজের চোখে শুতে দেখেছেন? আপনি বুকে হাত দিয়ে বলুন তো?

—না না, তা কী করে দেখবো? আমি আমার কাজ-কর্ম ছেড়ে কি তাই দেখতে গেছি, না কেউ তা আমাকে দেখতে দেবে? নেয়ামত কি তেমনি লোক? নেয়ামতকে দেখেছো তো তুমি? সে এখানকার খোদ-খিদ্‌মদ্‌গার। সে গেছে নবাবের সঙ্গে লড়াইতে। সে এখানে থাকলে দেখাতাম তোমাকে।

কান্ত বললে—না দেখে অমন কথা বলবেন না আপনি মরালীর সম্বন্ধে!

সচ্চরিত্র বললে—তা না-হয় বলবো না বাবাজী, ভালো হলেই তো ভালো। আমি কি চাই না যে মেয়েটার চরিত্র ভালো থাকুক? এই আমারই দেখ-না, আমার বাবা আমার নাম রাখলে সচ্চরিত্র, আমি নিজেও কত চেষ্টা করলুম, কিন্তু চরিত্র কি ঠিক রাখতে পারলুম? নিজের অনিচ্ছেয় তো আমাকে ম্লেচ্ছ-মাংস খেতে হলো? জাত তো আমি খোয়ালুম! আর এই বুড়ো বয়েসে এখন তো এই মদের গন্ধের মধ্যে দিন কাটাতে হচ্ছে। এতে আর চরিত্রের কি কিছু থাকে?

হঠাৎ সচ্চরিত্র বললে—ও গোলমালটা কীসের বাবাজী? এমন তো হয় না! কী হয়েছে, তুমি কিছু জানো?

কান্ত বললে—ওসব কথা থাক, আপনি বলুন আমার একটা উপকার করবেন?

—কী উপকার, বলো বাবাজী?

কান্ত বললে—শোভারাম বিশ্বাস মশাই-এর মেয়েকে ওরা এখানে যে আটকে রেখেছে, আমার মনে হয় ওকে ওরা কোতল করবে—

—কেন বলো তো? কোতল করবে কেন? কী করেছে ও?

—তা জানি না, মেহেদী নেসার সাহেব ভেবেছে, ও মেয়েটাই সব সর্বনাশের গোড়া। জানেন তো একবার মরালী সফিউল্লা সাহেবকে খুন করেছিল? সেই থেকেই রাগ আছে ওর ওপর। এখন নবাব গেছে লড়াই করতে, এই সুযোগে ওকে কোতল করতে চায়।

—মেহেদী নেসার লোকটা বড় খারাপ বলে মনে হয় বাবাজী!

—খারাপ তো বটেই, নইলে মরালীকে ওইরকম গ্রেফ্‌তার করে রাখে? আপনাকে ওকে ছাড়িয়ে দিতেই হবে।

পুরকায়স্থ মশাই কী যেন ভাবলে একটু। তারপর বললে—তুমি ওধারে একটু দাঁড়াও বাবাজী, আমি দেখে আসছি মেয়েটাকে কোথায় রেখেছে।

কান্ত চুপ করে সেখানে দাঁড়িয়ে রইলো। পুরকায়স্থ মশাই সোজা সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেল। বুড়ো মানুষ। বিশেষ করে চকবাজারের রাস্তায় হাতীর ধাক্কা খেয়ে পড়ে যাবার পর থেকেই শরীর আর বইছে না। কিন্তু মেয়েটার কথা শোনা পর্যন্ত মনটা কেমন ছট্‌ফট্‌ করছিল। সচ্চরিত্র পুরকায়স্থর নিজেরও তো মেয়ে ছিল। তাদের কথা মনে পড়ে গেল। তাদের সেখানে কী হচ্ছে কে জানে!

সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে সামনের ঘরটাই নবাবের আম-দরবার। আশেপাশে জেনানা-মহল। এক পাশে আমীর-ওমরাওদের বিশ্রাম করবার মহল।

সচ্চরিত্র আরো এগিয়ে গেল। ছোটমশাইকেও এখানে কোথাও রেখেছে। জেনানা-মহলের দিকে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ালো সচ্চরিত্র।

—কে? কে ওখানে? কে তুমি?

কোথা থেকে শব্দটা আসছে বোঝা গেল না। নেয়ামত খাঁ নেই তাই রক্ষে। অন্য খিদ্‌মদ্‌গাররাও নবাবের তদ্বিবত করতে নবাবের সঙ্গে লড়াইতে গেছে।

এতক্ষণে দেখতে পেলে সচ্চরিত্র। একটা মহলের ফটকে বাইরে থেকে তালা-চাবি দেওয়া। ফটকের ওপরে চৌকোনো জায়গাটুকু কাটা। তার ফাঁক দিয়ে একখানা মুখ তার দিকে চেয়ে আছে।

- কৌন্ হ্যায় তুম্?

—আজ্ঞে, বেগমসাহেবা, আমি ইব্রাহিম খাঁ।

আশ্চর্য, শোভারাম বিশ্বাসের মেয়ে আজ **সচ্চরিত্র** পুরকায়স্থকেও **প্রথমে** চিনতে পারেনি। তারপরই গলার সুর একেবারে বদলে গেল।

—তুমি সচ্চরিত্র মশাই?

পুরকায়স্থ মশাই বললে—মা, তুমি শান্ত হও মা, আমি তোমাকে দেখতে পেয়েই এসেছি।

—আমাকে এরা হাত-পা বেঁধে এখানে ধরে নিয়ে এসেছে পুরকায়স্থ মশাই, এখনই একবার নানীবেগমসাহেবাকে খবর দিতে পারো? বলবে, মরিয়ম বেগম-সাহেবাকে মতিঝিলের ভেতরে জেনানা-মহলে গ্রেফতার করে রেখেছে—

—কিন্তু তোমাকে ওরা ধরলে কেমন করে মা?

—সে কথা পরে শুনো তুমি, আগে নানীবেগমসাহেবাকে খবরটা দিয়ে এসো, তারপরে আমি দেখবো মেহেদী নেসারের কী করতে পারি। নবাবকে বলে আমি মেহেদী নেসারকে চাবুক খাওয়াবো। তুমি এখ্খুনি খবরটা দাও গিয়ে।

সচ্চরিত্র নিচেয় চলে আসছিল। কিন্তু মরালী আবার ডাকলে—ছোটমশাইকে এখানে কোথায় রেখেছে তুমি জানো?

—না মা, আমি তো জানি না তা!

—আর ওই অত হল্লা-চিৎকার হচ্ছে কেন, জানো? ও কিসের চেঁচামেচি?

—তাও জানি না মা। আমিও তো শুনছি কেবল। আমি যাচ্ছি, চেহেল্-সুতুনে গিয়ে পীরালি খাঁকে খবর দিয়ে আসছি।

কান্ত নিচেয় তখনো দাঁড়িয়ে ছিল একটা থামের আড়ালে। আস্তে আস্তে ভোর হচ্ছে ঝিলের ওপর। কিন্তু যত আলো হচ্ছে আকাশে, ততই কান্তর ভয় পাচ্ছে। যদি কেউ এখনি এসে পড়ে এখানে! যদি কেউ দেখতে পায়। যদি কেউ সমস্ত বানচাল করে দেয়।

পেছন দিকে হঠাৎ যেন তাঞ্জামে হুম্-হাম্ শব্দ হলো। পেছন ফিরতেই কান্ত দেখলে—সর্বনাশ! নানীবেগমসাহেবার তাঞ্জাম আসছে। সামনে দুটো হাতী, পেছনেও দুটো।

কান্ত থামটার আড়ালে গিয়ে লুকিয়ে রইলো।

নানীবেগমসাহেবা তাঞ্জাম থেকে নামবার সঙ্গে সঙ্গে, ওদিক থেকে আবার আর একটা পালকী এসে হাজির। নানীবেগমসাহেবা বোরখার ভেতর থেকে পেছন ফিরে দেখলে।

—কে?

পেছনের পালকী থেকে নেমে মেহেদী নেসার সাহেব নানীবেগমসাহেবাকে নিচু হয়ে লম্বা কুর্নিশ করলে—বন্দেগী নানীবেগমসাহেবা!

—মেহেদী, মরিয়ম বেগমসাহেবাকে তুমি মতিঝিলে গ্রেফ্‌তার করে রেখেছো, শুনলাম?

—আমি গ্রেফ্‌তার করে রেখেছি? কে বললে সে-কথা নানীবেগমসাহেবাকে? আমি গ্রেফ্‌তার করবার কে নানীবেগমসাহেবা? আমি তো কেউ নই, আমি তো আলি জাঁহার খিদ্‌মদ্‌গার স্রেফ্‌—

—তাহলে কে গ্রেফ্‌তার করলে?

মেহেদী নেসার বললে—মুর্শিদাবাদের নবাব শা কুলি খান মীর্জা মহম্মদ সিরাজ-উ-দ্দৌলার হুকুমে গ্রেফতার করেছি নানীবেগমসাহেবা!

নানীবেগমসাহেবা গম্ভীর গলায় বললে—আমি হুকুম দিচ্ছি ওকে ছেড়ে দাও তুমি মেহেদী—

—লেকন্‌ নানীবেগমসাহেবা, আলি জাঁহার হুকুম আমি কেমন করে খিলাপ করবো?

—আমি আলি জাঁহার নানী, আমার হুকুম কি মীর্জা মহম্মদের হুকুমের চেয়ে বড় নয়? চেহেল্‌-সুতুনের বেগমদের ওপর আমার হুকুমই তো সকলের ওপরে।

—আপনি যখন বলছেন নানীবেগমসাহেবা, তখন আমার বলবার কিছু নেই।

হঠাৎ সচ্চরিত্র পুরকায়স্থ ঠিক এই সময়ে চবুতরায় এসে হাজির হতেই নানীবেগমসাহেবা দেখতে পেয়েছে।

—এ কৌন?

মেহেদী নেসার বললে—এ ইব্রাহিম খাঁ—সরাবখানার খিদ্‌মদ্‌গার!

সচ্চরিত্র তাড়াতাড়ি নিচু হয়ে কুর্নিশ করে পাশে সরে দাঁড়ালো।

নানীবেগমসাহেবা তার দিকে না চেয়ে মেহেদী নেসারের দিকে চেয়ে বললে—আমাকে তুমি মরিয়ম বেগমসাহেবার কাছে নিয়ে চল মেহেদী, ওকে আমি চেহেল্‌-সুতুনে নিয়ে যাবো।

—কিন্তু নবাব মীর্জা মহম্মদ যদি গোসা করে নানীবেগমসাহেবা, তো আমার যে কোতল হয়ে যাবে!

—তখন আমি আছি মেহেদী। আমার বাত মীর্জা ঠেলতে পারবে না। চলো।

মেহেদী নেসার তবু বোধহয় একটু দ্বিধা করতে লাগলো।

—চলো—

—একটু ভালো করে সোচ্‌-বুঝ করে দেখুন নানীবেগমসাহেবা।

—সোচ্‌-বুঝ করবার কিছু নেই মেহেদী। আমি খবর পেয়েই দৌড়ে এসেছি। হাতিয়াগড়ের জমিনদারকেও তুমি গ্রেফ্‌তার করে এনেছো তাও শুনেছি, তা তার ব্যাপার মীর্জা নিজে এসে ফয়সালা করবে। এখন তুমি মরিয়ম বেগমকে ছেড়ে দাও, আমি সঙ্গে করে চেহেল্‌-সুতুনে নিয়ে যাই।

—কিন্তু তাহলে সব দায়িত্ব নানীবেগমসাহেবাই নিলেন তো?

—হ্যাঁ, নিলাম নিলাম, তোমার ভয় নেই মেহেদী। আমার মরিয়ম মেয়ে এমন কিছু করতে পারে না যাতে মীর্জা তাকে গ্রেফ্‌তার করবার হুকুম দেবে। কী এমন করেছে ও শুনি?

—নানীবেগমসাহেবা, ফিরিঙ্গী-সাহেব ক্লাইভের কাছে গিয়ে মরিয়ম বেগম-সাহেবা নিজামতের ফৌজী-খবর ফাঁস করে দিয়েছে। চেহেল্-সুতুন থেকে পালিয়ে গিয়ে বেগমসাহেবা এতদিন সেই ফিরিঙ্গী-সাহেবের কাছেই ছিল।

—মরিয়ম বেগম যে ফিরিঙ্গীদের কাছে ছিল তার প্রমাণ আছে? কেউ দেখেছে?

—হ্যাঁ নানীবেগমসাহেবা। সবাই জানে মরিয়ম বেগমসাহেবা সেখানে ছিল। বশীর মিঞা নিজে দেখেছে, দেখে এসে নবাবকে খবর দিয়েছে।

—কে বশীর মিঞা?

—বশীর মিঞা নিজামতের জাসুস্, অনেক দিনের পুরোন জাসুস্। সে মিথ্যে কথা বলতে যাবে না।

নানীবেগমসাহেবা যেন রেগে গেল।

বললে—মিথ্যে কথা বলবে না নিজামতের জাসুস্? তুমি আমাকে শেখাচ্ছ মেহেদী? ভেবেছো আমি নিজামতের কিছুই জানি না? মিথ্যে কথা দিয়েই তো নিজামত চলছে। মিথ্যে কথার জন্যেই তো আজ নিজামত ভেঙে পড়তে চলেছে! মিথ্যে কথা কে না বলে এখানে মেহেদী? তুমি মিথ্যে কথা বলো না? তোমরা যদি সবাই সত্যি কথা বলতে তো আজ আমার মীর্জার এই দুর্দশা হয়? তোমরা যদি সত্যি কথা বলতে তো আজ এমন করে চেহেল্-সুতুন ছেড়ে আমাকে এখানে আসতে হয়? তোমরা যদি সবাই সত্যি কথা বলতে তো আজ কলকাতার ফিরিঙ্গীরা নিজামতের সঙ্গে লড়াই করতে ভরসা পায়?

বলতে বলতে নানীবেগমসাহেবা যেন হাঁফাতে লাগলো।

তারপর একটু দম নিয়ে বললে—চলো, কোথায় আমার মেয়েকে রেখেছো, চলো, আমি তাকে চেহেল্-সুতুনে নিয়ে যাবো—চলো—

মেহেদী নেসার বলতে গেল—কিন্তু আলি জাঁহা...

নানীবেগম বোমার মত ফেটে উঠলো—আলি জাঁহা আমার নাতি, তার সম্বন্ধে তোমায় কিছু ভাবতে হবে না। সে আমি বুঝবো। মীর্জা যখন লঙ্কাবাগ থেকে ফিরবে তখন এ-সম্বন্ধে আমি তার সঙ্গে বোঝা-পড়া করবো। তুমি কে? তুমি তো মীর্জার নোকর—তুমি বার করে দাও মরিয়ম বেগমকে, চলো—

সমস্ত মতিঝিলটা সেদিন নানীবেগমসাহেবার গলার শব্দে গম্‌গম্ করে উঠেছিল—

মেহেদী নেসার সাহেবের মুখে তখন আর কথা নেই। আস্তে আস্তে নানীবেগমসাহেবার সঙ্গে ওপরে উঠতে যাচ্ছিল, হঠাৎ এক কাণ্ড ঘটলো।

—নানীবেগমসাহেবা!!!

খোজা বরকত আলি দৌড়তে-দৌড়তে এসে তখনো হাঁফাচ্ছে। একটু সামলে নিয়ে বললে—নবাব চেহেল্-সুতুনে ফিরে এসেছেন নানীবেগমসাহেবা—

—নবাব? আমার মীর্জা? ফিরে এসেছে?

মেহেদী নেসারও যেন আকাশ থেকে পড়েছে—নবাব? আলি জাঁহা? ফিরে এসেছে? কখন?

—জী হাঁ, আব্‌ভি!

এক মুহূর্তে যেন ওলোট-পালোট হয়ে গেল সমস্ত পৃথিবীটার। এক মুহূর্তে যেন পৃথিবীর মুখখানাই আমূল বদলে গেল। পৃথিবীর মুখখানা এক মুহূর্তে সাদা ফ্যাকাশে বিবর্ণ হয়ে এল। দীনদুনিয়ার নবাব শা কুলি খান

বাহাদুর মীর্জা মহম্মদ আলমগীর লড়াই করতে করতে ফিরে এসেছে, এ যেন সকলের কাছে বিস্ময়। নানীবেগমসাহেবা সেই অবস্থাতেই আবার তাঞ্জামে গিয়ে উঠলো। আবার সামনে পেছনে জোড়া হাতী উল্টো দিকে চেহেল্-সতুনের পথে চলতে শুরু করলো। শোহনাল্লা রসুল আল্লা! খোদাতালাহ্, তোমার দোয়া বান্দা চিরকাল স্মরণ করবে। তুমি শুধু আমারই আল্লাতালাহ্ খোদাতালাহ্ নও। তুমি মুর্শিদাবাদের নবাব মীর্জা মহম্মদ সিরাজ-উ-দ্দৌলারও খোদাতাল্লাহ্। তোমার বহুত বহুত মেহেরবানি। তুমি আমাকে দেওয়ান-ই-খালশা করে দিলে, এ দয়া আমি আমার জিন্দগীতে কখনো ভুলবো না।

মেহেদী নেসারও খানিক অন্যমনস্ক থেকে পালকিতে চড়ে বসলো। আর তারপর মতিঝিলের সদর ফটকের বাইরে বেরিয়ে সে-পালকি চক্‌বাজারের রাস্তায় অদৃশ্য হয়ে গেল।

এতক্ষণে সচ্চরিত্রর যেন সংবিৎ ফিরেছে। কান্তও থামের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল।

—কী হলো পুরকায়স্থমশাই? নবাব ফিরে এল কেন?

কিন্তু সে-প্রশ্নের উত্তর তখন কে দেবে? মানুষের জয়যাত্রার সামনে তখন নবাবের মসনদ টলমল করতে শুরু করেছে। মুর্শিদাবাদের চক্-বাজারের রাস্তায় অলিতে-গলিতে তখন ভীত-জাগ্রত মানুষ প্রথম প্রশ্ন করতে শুরু করেছে—নবাব ফিরে এল কেন? কী হয়েছে? ক্যা হুয়া হায়? হোয়াটস্ আপ?

এ তো ১৭৫৭ সালের ২৪শে জুন-এর সকালের ঘটনা। কিন্তু ২৩শে জুন তারিখে লক্ষাবাগের যুদ্ধ-প্রান্তরে এর শুরুটাও এই সঙ্গে বলা উচিত। একদিকে সংহত-শক্তির উদগ্র মনোবল, আর একদিকে চুরি, বিশ্বাসঘাতকতা, ষড়যন্ত্র আর বিলাসিতা। যুদ্ধের সময় কি বিলাস পোশায়? কিন্তু তখনো সোনার কল্‌কে চাই, জড়োয়ার তলোয়ার চাই। তখনো চাবুকের অত্যাচার, তখনো আমীর-ওমরাহ-মীর বক্সীর বিশ্বাসঘাতকতা!

মীরমদন গীতা পড়েনি, কিন্তু লড়াই করতে করতে জান দিয়েছে। সে জান দিয়ে তার জবান রেখেছে। সামনে যখন দুষমন সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে তখন তো এদের চাবুক মারা উচিত হয়নি। এ-কথা বোঝবার মত বুদ্ধি তোমার নেই ইয়ারজান। তোমরা আমাকে না জিজ্ঞেস করে কেন এমন করতে গেলে? এরা যদি সবাই এখন আমার দুষমন হয়ে যায়? হয়তো দুষমন হয়েই গেছে। এরা দুষমনি করলে এ-সময়ে কী করবো আমি?

—মীরজাফর আলি সাহেব!

বড় আদরের সুর মীর্জা মহম্মদের গলায়। এ আদর তো তখন ছিল না আলি জাঁহা! তখন তো তুমি তোমার মীর বক্সী মোহনলালকে সেলাম করতে হুকুম দিয়েছিলে। সেদিন তো তুমি ভাবোনি একদিন তোমারও বিপদ আসতে পারে, একদিন তোমারও দুর্দিন আসতে পারে!

সকাল পর্যন্ত বেশ ছিল। কাল রাত থেকেই নবাবের সব কথা মনে পড়ছিল। সেই আলীবর্দী খাঁর কথাগুলো। সেই হোসেন কুলি খাঁর কথা, ঘসেটি বেগম-

সাহেবার কথা! রাত্রেও ভালো ঘুম হয়নি। তারপর সকাল বেলা সোনার কল্‌কেটা চুরি হয়ে গেল। তারপর মীরমদনের অপঘাত-মৃত্যু!

মীরমদনের মৃতদেহটা নিজের তাঁবুর মধ্যে আনতে হুকুম দিয়েছিল নবাব।

মীরমদনের মরা মুখখানার দিকে চেয়ে দেখলে নবাব। সত্যিই নবাবের জন্যে জান দিয়ে মীরমদন বুঝিয়ে দিয়ে গেল যে, সে নবাবকে ভালবাসে। কেন আমাকে তুমি ভালবাসতে মীর ? আমার তো কোনো গুণ নেই। আমি তো তোমাদের কাউকে উপযুক্ত সম্মান দিতে পারিনি। আমার যে টাকা ছিল না মীরমদন। বিশ্বাস করো এখনো আমার টাকা নেই। আমি মহতাপচাঁদ জগৎশেঠজীর কাছ থেকে টাকা ধার নিয়ে সকলের মাইনে মিটিয়ে দিয়েছি। আমি চরিত্রহীন, লম্পট নবাব তোমাদের। আমার জন্যে তোমার জান দেওয়া ঠিক হয়নি মীরমদন। তুমি ভুল করেছো মীরমদন, আমি বলছি তুমি ভুল করেছো।

হঠাৎ বোধহয় খেয়াল হলো সবাই চারপাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এ চেহেল্‌-সুতুনও নয়, মতিঝিলও নয়। এমনকি এ মুর্শিদাবাদও নয়। এ লক্কাবাগ।

—মীরজাফর আলি সাহেব কোথায়?

নেয়ামত বললে—আমি গিয়ে ডেকে এসেছি জাঁহাপনা—

—তা আসতে এত দেরি হচ্ছে কেন? আমার হুকুম কি মানতে চায় না মীরজাফর আলি? আমি কি মুর্শিদাবাদের নবাব নই? কী মনে করেছে মীরজাফর আলি? আবার এত্তেলা দে—যা—

হঠাৎ চারদিক থেকে ঝম ঝম করে বৃষ্টি নামলো। বর্ষাকালে বৃষ্টি নামা নতুন নয়। কিন্তু এমন সময় কেন বৃষ্টি এল? নবাব মীর্জা মহম্মদ বাইরে আকাশের দিকে চাইলে।

ইয়ারজান বললে—বৃষ্টি এল আলি জাঁহা—

নবাব বললে—জেনারেল ল' কবে এসে পোঁছোবে ইয়ারজান?

—রওনা দিয়েছে, কাল এসে পোঁছবে নিশ্চয়। জেনারেল ল' এলে আর কোনো ভাবনা নেই আলি জাঁহা, সঙ্গে হাজার হাজার সেপাই আছে তার—

পাশেই মীরমদনের মৃতদেহটা পড়ে রয়েছে। মীর্জা মহম্মদ সেই দিকে একবার চাইলে। তারপর বললে—দেখলে তো ইয়ারজান, এত বার ডেকে পাঠালাম মীরজাফর আলিকে, তবু একবারও এল না। আমি কি তার পায়ে ধরে সেধে আনতে যাবো সে মনে করেছে? সে নবাব না আমি নবাব, ইয়ারজান?

—আপনিই নবাব আলি জাঁহা!

মীর্জা মহম্মদ বললে—না, আমি রাগবো না ইয়ারজান। এই সময়ে রাগারাগি করা ঠিক নয়। এই সময়ে সবাই-এর সঙ্গে মিষ্টি কথা বলতে হয়। এখন দেখাতে হয় যেন সবাই-ই আমার প্রিয়জন। কিন্তু ইয়ারজান, আমি তোমাকে বলে রাখছি, এই লড়াই-এর পর আমি কাউকে রেহাই দেবো না। এখন আমি সবাইকে চিনে নিয়েছি, কে দোস্ত আর কে দুষমন সব চিনে নিয়েছি—আমি কাউকে রেহাই দেবো না—

—অত জোরে জোরে কথা বলবেন না আলি জাঁহা, কেউ শুনতে পাবে।

—কে শুনতে পাবে? মীরমদন? মীরমদন তো মারা গেছে। জানো ইয়ারজান, খোদাতালার এক তাজ্জব কানুন। মরে গেলে কেউ আর কিছুছু জানতে পারে না। একদিন আলীবর্দী খাঁ মারা গেছে, একদিন সুজাউদ্দীন খাঁ মারা গেছে, আর একদিন আমিও মারা যাবো। এখন আমি এখানে এই যে লক্কাবাগে বসে

ফিরিঙ্গীদের সঙ্গে লড়াই করছি, আলীবর্দী খাঁ এ-সব জানতেও পারছে না। আবার একদিন আমি মরে গেলেও জানতে পারবো না আমার মসনদে কে বসলো। জিন্দ্‌গীটা বড় তাজ্জব চিজ ইয়ারজান—

—আলি জাঁহা, এখন আপনি ও-সব কথা না-ই বা ভাবলেন!

—আচ্ছা ইয়ারজান, এত কথা থাকতে মরে যাওয়ার কথাই বা আমার মনে আসছে কেন বলো তো? আমি কি ভয় পেয়েছি?

ইয়ারজান বললে—আপনি ভয় পাবেন এ-কথা কে বিশ্বাস করবে আলি জাঁহা!

—আচ্ছা, ফিরিঙ্গী কর্নেল ক্লাইভ আমাকে ভয় করে?

—নিশ্চয় ভয় করে আলি জাঁহা।

—কিন্তু তাহলে কোন্ সাহসে আমার সঙ্গে লড়াই করতে এসেছে সে? আমার মীর বক্সী তো ইচ্ছে করলেই ওদের গুঁড়ো করে দিতে পারে।

ইয়ারজান বললে—বোধহয় ওর মরবার সাধ হয়েছে আলি জাঁহা।

মীর্জা মহম্মদ হা হা করে হেসে উঠলো। কথাটা খুব ভালো লেগেছে নবাবের। বললে—খুব ভালো কথা বলেছো ইয়ার, খুব ভালো কথা বলেছো!

তারপর একটু থেমে বললে—কিন্তু কেউ কি সাধ করে মরতে চায় দুনিয়ায়? এমন কেউ আছে যার সাধ হয় মরতে?

—কেন হবে না আলি জাঁহা। ফিরিঙ্গী কর্নেলটা দুবার মরতে গিয়েছিল পিস্তল দিয়ে, আমি শুনেছি।

—সে কী?

মীর্জা মহম্মদের মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল। মরতে গিয়েছিল? আত্মঘাতী হতে গিয়েছিল? কেন?

—তা জানি না আলি জাঁহা।

কথাটা শুনে পর্যন্ত মীর্জা মহম্মদের মুখটা যেন গম্ভীর হয়ে গেছে। যে-লোক নিজের হাতে নিজে মরতে যায়, সে তো সোজা লোক নয়। সে তো সব পারে।

—আচ্ছা ইয়ারজান, আগে তুমি ও-কথাটা বলোনি কেন?

—কোন্ কথাটা আলি জাঁহা?

—ওই যে ফিরিঙ্গী কর্নেল বাচ্ছা তিনবার গুলী করে আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল? আগে জানলে আমি অন্য ব্যবস্থা করতাম। ওরা খুব খারাপ লোক হয় জানো ইয়ারজান, যারা আত্মহত্যা করতে যায়—

—জানি আলি জাঁহা!

—আমি কিন্তু কখনো আত্মহত্যা করবো না ইয়ারজান। যারা আত্মহত্যা করে তারা হেরে যায়, তা জানো তুমি? আমি আলীবর্দী খাঁর মত জিন্দ্‌গীর লড়াই করে তবে মরবো, তার আগে মরবো না আমি। আমি যখন বুড়ো হবো, যখন আলীবর্দী খাঁর মত বুড়ো হবো, তখনো লড়াই করবো। লড়াই করতে করতে আমি মরবো—

হঠাৎ আবার মীরজাফরের কথাটা মনে পড়ে গেল।

—আচ্ছা, ইয়ারজান, তুমি একবার যাও তো, তুমি নিজে একবার মীরজাফর আলির কাছে যাও তো। আমি যে তাকে গালাগালি দিয়েছি তা যেন বোল না। গিয়ে বোল—মীরমদন মারা গেছে, তাই নবাব একবার আপনাকে ডাকছে—যাও,

নেয়ামতকে দিয়ে ডেকেছি কিনা, তাই হয়তো আসছে না—আর খবর নিয়ে এসো তো জেনারেল ল' কখন আসছে সে-খবর এসেছে কি না—

সেই বৃষ্টির মধ্যেই ইয়ারজান বাইরে বেরিয়ে গেল। ঝম্ ঝম্ বৃষ্টি পড়ছে। সামনেই মোহনলালের ফৌজ, তার সামনে সিন্‌ফ্রে। আর আরো খানিক এগিয়ে, রাজা দুর্লভরাম, ইয়ার লুৎফ খাঁ, আর তারও ওদিকে একেবারে শেষ প্রান্তে মীরজাফর আলির ফৌজ। বৃষ্টিতে সমস্ত ছত্রখান হয়ে গেছে। ফিরিঙ্গীদের দিক থেকে কামান ছোঁড়া খানিকক্ষণের জন্যে বন্ধ আছে। হাতীর পিঠের ওপর বসে আছে মীরজাফর।

ইয়ারজানকে দেখে মীরজাফর সাহেব হাতীর পিঠ থেকে নেমে এল।

—আলি সাহেব, আমাকে আবার নবাব পাঠালে আপনার কাছে!

মীরজাফর আলি সাহেব বললে—সে তো বুঝতে পাচ্ছি। মীরমদনটা তো খতম্ হয়েছে। আমাকে আবার ডাকছে কেন?

—নবাব খুব ভয় পেয়ে গেছে আলি সাহেব, তাই আপনার সঙ্গে একটু কথা বলে সাহস পেতে চায়।

—কী কথা হচ্ছিল এতক্ষণ?

ইয়ারজান বললে—কেবল মরার কথা—

মীরজাফর সাহেব শুনে অবাক হয়ে গেল।

—মরার কথা মানে?

—ওই মীরমদন সাহেবের মুর্দাটা সামনেই পড়ে রয়েছে তো, সেই জন্যে সেইসব কথাই হচ্ছিল এতক্ষণ। মারা যাবার পর মানুষ কোথায় যায়, এই সব। মানে খুব ভয় পেয়ে গেছে নবাব—

মীরজাফর বললে—পাক্ পাক্, একটু ভয় পাওয়া ভালো। ভয়ের এখন হয়েছে কী? আমি আরো ভয় পাইয়ে দেবো। এবার মোহনলালটা মরলে আর একটু সুবিধে হয়। বেত্তমিজটা অনেক কামান ছুঁড়েছে, ফিরিঙ্গীদের অনেকগুলো সেপাই মারা গেছে। ক্লাইভ সাহেব খুব গোসা করেছে আমার ওপর বুঝতে পারছি—

—জেনারেল ল' সাহেব কবে আসবে জিজ্ঞেস করছিল নবাব।

—বলে দাও কালই আসবে, তাহলে সেই আশায় বসে থাকবে মীর্জা।

—আর বলছিল লড়াই থেকে ফিরে গিয়ে কাউকে রেহাই দেবে না। সব দুষমনদের খতম করে ছাড়বে!

মীরজাফরের মুখ দিয়ে একটা গালাগালি বেরোল—আমি খতম করতে দিচ্ছি! ওই দেখ না, বৃষ্টিতে বারুদ-টারুদ সব ভিজে গেছে, ওরা ঢাকা দিচ্ছিল, আমি বারণ করেছি। ভিজুক, সব বারুদ ভিজে যাক্—

ইয়ারজান বললে—আপনি একবার চলুন আলি সাহেব, নেয়ামতকে আগে পাঠিয়েছিল, এবার আমাকে পাঠালে। আপনি না-গেলে আমাকে মাঝখান থেকে সন্দেহ করবে নবাব—

—না না, সন্দেহ করলে আমাদের সব মতলব ফাঁস হয়ে যাবে, চলো যাই—

বৃষ্টিটা যেন আরো জোরে নামলো। মীরজাফর আলি ইয়ারজানকে সঙ্গে নিয়ে মীর্জা মহম্মদের তাঁবুর দিকে চলতে লাগলো।

কিন্তু ওদিকে তখন কর্নেল ক্লাইভের ক্যাম্পে দুর্ভাবনায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে সবাই। এই বৃষ্টির সময়ে যদি হঠাৎ হামলা করে বসে নেটিভরা। যদি এই গোলা-বারুদ সরাবার সময় হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ে আমাদের লাইনের ভেতরে। ভাবতেই হৃদ্‌কম্প হলো মেজর আয়ার কুটের। ল্যাসিংটন মারা গেছে। আর ল্যাসিংটনের মত আরো কত সেপাই সার-সার মরে পড়ে আছে এপাশে-ওপাশে। সবাই হাল ছেড়ে দিয়েছে। সেপাইরা যেন আর চাইছে না যে যুদ্ধ হোক। কেউ-ই চাইছে না। মনে মনে গজরাচ্ছে সবাই।

—আমরা কি টাকার জন্যে প্রাণ দিতে এসেছি নাকি এখানে?

কোথায় যেন একটা চাপা আক্রোশ গর্জন করে উঠছে সকলের মনে। কেউ লড়াই করবে না। সকলেরই জীবনের দাম আছে। টাকার জন্যে কেউ প্রাণ দিতে পারবে না।

ততক্ষণে জামা-প্যাণ্ট সব ভিজে জ্যাবজেবে হয়ে গেছে ক্লাইভের। ছাদের ওপর থেকে নিচে নেমে এল কর্নেল।

—কে যুদ্ধ করবে না? কে? কারা?

হাতের পিস্তলটা বাগিয়ে নিয়ে সামনের দিকে উঁচু করে বললে—কে? কারা?

আশেপাশে, সামনে যারা ছিল তারা সবাই স্থাণুর মত চুপ হয়ে গেল। আর কারো মুখে কথা নেই।

—বৃষ্টি হয়েছে তাতে কী হয়েছে? বৃষ্টিতে ভিজলে মানুষ মরে যায়? আর মরতেই তো সবাই ফাইট করতে এসেছো তোমরা। কেউ বাঁচবার জন্যে যুদ্ধ করতে আসে? একদিন তো মরতেই হবে! কে চিরকাল বেঁচে থাকতে এসেছে পৃথিবীতে? কে? নাম বলো! আমি তাদের গুলী করে মারবো। নাম বলো? তুমি? তুমি? ইউ?

কেউ উত্তর দেয় না।

ক্লাইভ আবার বলতে লাগলো—সবাই লেকের ধারে যাও, ইন এ বডি—গিয়ে ট্রেঞ্চ খোঁড়, ওখান থেকে এনিমি-লাইনের দিকে ফায়ার করো। যাও—কুইক্—

আর অর্ডারের সঙ্গে সঙ্গে সেপাইগুলো যেন মেশিনের মত খালের ধারে চলে গেল। সেখান থেকে সবাই নবাবী-ফৌজের দিকে ফায়ার করতে লাগলো।

—ফায়ার, ফায়ার—

ক্লাইভের শরীরের ভেতরে তখন যেন দশটা ক্লাইভ ঢুকে পড়েছে। একটা মানুষের বুকে এত সাহসও থাকে! একটু ভয়-ডরও নেই মানুষটার। একলা এতগুলো সেপাই-এর সমানে মওড়া নিয়েছে। সকাল থেকে খাওয়ার সময় পায়নি। বৃষ্টিতে ভিজেছে। সর্দি-কাশির ভয়ও কি নেই?

পাশেই আয়ার কুট দাঁড়িয়ে ছিল।

ক্লাইভ জিজ্ঞেস করলে—ল' কখন আসছে? কিছু খবর পেয়েছো?

—না কর্নেল!

—যদি জেনারেল ল' এসে পড়ে তো তুমি মরবার জন্যে তৈরি থাকবে। এখান

থেকে এক পা কেউ পেছুতে পারবে না। নবাবের হাতে বন্দী হওয়ার চেয়ে আমরা বরং সবাই মরবো, সেও ভালো। কিন্তু কোম্পানীর নামে ডিস্‌গ্রেস্‌ দিতে দেবো না—ফায়ার—ফায়ার—

হঠাৎ নজরে পড়লো দূরে নবাবের আর্মি ডান দিকে সরে যাচ্ছে। কম্যান্ডার মীরজাফরের ফৌজ ওটা।

—কুট, ওরা ওদিকে যাচ্ছে কেন? কী মতলব?

আয়ার কুটও বুঝতে পারছে না। হতবাক্‌ হয়ে দেখতে লাগলো সেই দিকে।

—ওরা কি আমাদের এন্‌সার্কেল করতে আসছে নাকি?

কুট বললে—না কর্নেল, তা কী করে হয়? মীরজাফর যে আমাদের ওয়ার্ড দিয়েছে। ও তো আমাদের বিট্রে করবে না—

ক্লাইভ বললে—কিছু বলা যায় না, নবাবের ওমরাহ্‌দের বিশ্বাস নেই। ওরা সব করতে পারে। ওরা ওদের গড্‌কে পর্যন্ত বিট্রে করতে পারে, বি কেয়ারফুল!

কিন্তু না, মীরজাফরের আর্মি এক ফারলং সরে গিয়ে আবার হল্ট্‌ করলো। কী মতলব কে জানে! গোড়া থেকেই ক্লাইভ ওদের সন্দেহ করে এসেছিল। ওদের কথার ওপর নির্ভর করে এত দূরে এসে এত ঝুঁকি নেবার মানুষ নয় ক্লাইভ।

ক্লাইভ বললে—আই অ্যাম্‌ রেডি—ওরা যদি আমাদের ঘিরে ফেলে তো আমরা ঝাঁপিয়ে পড়বো ওদের ওপর।

কুট বললে—কিন্তু ওদের সঙ্গে আমরা পারবো কেন কর্নেল? ওদের আর্মি আর আমাদের আর্মি? আমাদের তো গুঁড়িয়ে পিষে ফেলবে!

—যুদ্ধ কি নাম্বার দিয়ে হয় কুট?

আয়ার কুট ক্লাইভের কথাটা বুঝতে পারলে না। ক্লাইভ আবার বললে—নাম্বারই যদি আসল হতো তো আমি সেণ্ট্‌ ফোর্ট ডেভিড জয় করতে পারতুম না। যুদ্ধ জেতে কূটনীতি দিয়ে, ডিপ্লোমেসি দিয়ে। আমি যদি এ যুদ্ধ না জিততে পারি তো এতদিন মিছিমিছি বেঙ্গলে এসেছি, এতদিন মিছিমিছি বেঙ্গলীদের সঙ্গে মিশেছি—

—কিন্তু কর্নেল, বাঙালীদের বিশ্বাস করা উচিত নয়, তারা লায়ার!

ক্লাইভ বললে—হোক লায়ার, ইউরোপীয়ানরা লায়ার নয়? সবাই ভাল? ক্লাইমেটের জন্যে দেশে দেশে মানুষ বদলায়। সে বাইরের বদলানো, ভেতরটা সবার এক। গুলী করলে ওদের গা দিয়েও রক্ত পড়ে, আমাদেরও রক্ত পড়ে। ওদের মায়েরা ছেলেদের আমাদের মায়ের মতই ভালবাসে। ওরাও কূটনীতি জানে, আমরাও জানি। নবাব কি ডিপ্লোমেসি জানে না বলতে চাও? ওই যে, ওরা ফায়ার করছে না, কেন করছে না?

কুট বললে—কারণ জেনারেলরা নবাবের এগেন্‌স্টে—

—ভুল, ভুল। সব তোমার ভুল। নবাব চায় ওয়ারটা প্রোলং করতে। যুদ্ধটা যাতে আরো বেশি দিন টেনে নিয়ে যেতে পারে সেই চেষ্টা করছে। ওদের আর্মি আছে, ওদের মেটিরিয়্যালস্‌ আছে, ওদের ফুড আছে, আর ওদেরই কাণ্ট্রি এটা। বেশি দিন যুদ্ধ চললেই তো নবাবের লাভ। ততদিনে জেনারেল ল' এসে যাচ্ছে—

—কিন্তু কর্নেল, মীরজাফর আলির কী মতলব তা তো বুঝতে পারছি না। ও কি এমন করে আমাদের কথা দিয়ে এখন কথার খিলাফ্‌ করবে?

কর্নেল বললে—কূটনীতিতে কথার খিলাফ বলে কোনো কথা নেই। যখন যেমন সিচুয়েশান্‌, যখন যেমন অবস্থা, সেইভাবে কাজ করাই ডিপ্লোমেসি।

কিন্তু এখন দেখতে হবে, ও বড় ডিপ্লোম্যাট্ না আমি বড় ডিপ্লোম্যাট্! মীরজাফরও নিজের স্বার্থ দেখছে, আমিও আমার স্বার্থ দেখছি, এখন কে কূটনীতিতে জেতে তাই দেখতে হবে—

হঠাৎ ফ্লেচার এসে হাজির হয়েছে।

—কী খবর, ফ্লেচার?

ফ্লেচার বললে—মীরমদন মারা যাবার পর থেকে নবাব খুব নার্ভাস হয়ে পড়েছে—

—ভেরি গুড্। জেনারেলেরা কী বলছে?

—মোহনলাল বলছে এখনই সকলকে একসঙ্গে ফাইট্ করতে। রাজা দুর্লভরাম, ইয়ার লুৎফ খাঁ আর মীরজাফর আলি ফায়ার করছে না বলে নবাবের কাছে কম্‌প্লেন করেছে।

—তারপর? সেই সোনার কলকেটা পাওয়া গেল?

—না কর্নেল। নবাবের ফ্রেন্ড খিদ্‌মদ্‌গারদের সবাইকে বেত মারবার অর্ডার দিয়েছিল, নবাব গিয়ে সে অর্ডার বাতিল করে দিয়েছে।

—কেন?

—নবাব ভয় পেয়ে গেছে। বলছে এ সময়ে বেত মারলে ওরা রিভোল্ট করতে পারে। আমাদের আর্মিকে হারিয়ে তারপরে সবাইকে বেত মারা হবে!

—এ কথা তুমি জানলে কী করে?

—নবাবের ফ্রেন্ড ইয়ারজান সব কথা মীরজাফর আলিকে বলে দিয়েছে। মীরজাফর আলি সাহেবই আমাকে এসব কথা জানালে।

—মীরজাফর আলি সাহেবের খবর কী? তার সঙ্গে দেখা হয়েছে?

—হ্যাঁ কর্নেল। এই লেটারটা দিয়েছে আপনাকে—বলে একটা চিঠি এগিয়ে দিলে ক্লাইভের দিকে। দিয়ে বললে—মীরজাফর আলি এখনই নবাবের সঙ্গে দেখা করতে গেল—

ক্লাইভ তাড়াতাড়ি এন্‌ভেলাপটা খুলে চিঠিটা পড়তে লাগলো।

—ডিয়ার কর্নেল, তুমি শুনে খুশী হবে, বৃষ্টিতে আমাদের গোলা-বারুদ সব ভিজে জব্‌জবে হয়ে গেছে। এখন ওগুলো না-শুকোলে আর গুলী ছোঁড়া যাবে না। সব অকেজো হয়ে পড়ে রয়েছে। তোমাকে আমি যে কথা দিয়েছিলাম সে কথা বর্ণে বর্ণে রাখছি। আমি, ইয়ার লুৎফ খাঁ, কিংবা রাজা দুর্লভরাম কেউই তোমাদের ফৌজের ওপর ফায়ার করিনি, নবাব পাছে সন্দেহ করে তাই আমগাছগুলোর ডালের দিকে লক্ষ্য করে কয়েকটা গুলি ছুঁড়েছি। তোমাদের কুড়িজন সেপাই মারা গেছে শুনে খুব দুঃখিত। ল্যাসিংটনও মারা গেছে শুনলাম। কিন্তু আমাদের আরো অনেক বেশি লোক মারা গেছে। জখমও হয়েছে অনেক। তুমি শুনে খুশী হবে আমাদের মীরমদন মারা গেছে তোমাদের গুলিতে। খুব সুখবর। আমি আমার ফৌজী সেপাইদের এদিক-ওদিক নড়িয়েছি, নইলে নবাবের সন্দেহ হতো। চারদিকের এই অবস্থার মধ্যে নবাব খুব ভয় পেয়ে আমাকে ডেকে পাঠিয়েছে। মীরমদন মারা যাবার পর এখন নবাবের আমি ছাড়া আর কোনো গতিই নেই। দেখি আমি কী করতে পারি। ইতি—

ক্লাইভ চিঠিটা ভাঁজ করে বললে—লোকটা দেখছি রিয়্যাল স্কাউণ্ড্রেল, কথা রাখছে—

পাশে আয়ার কুট দাঁড়িয়ে ছিল। সে অবাক হয়ে গেছে।

বললে—রিয়্যাল স্কাউন্ড্রেল বলছো কেন কর্নেল?

—রিয়্যাল স্কাউন্ড্রেল নয়? নবাব যতগুলো লোকের ওপর নির্ভর করছে সবগুলো স্কাউন্ড্রেল! নবাবের ভাগ্যটাই খারাপ দেখছি। সবাই, সবাই নবাবের এগেন্স্টে! ওই জগৎশেঠ থেকে শুরু করে উমিচাঁদ, মীরজাফর, সবাই। ইণ্ডিয়ার সত্যিই ব্যাড লাক্।

কুট তবু বুঝতে পারলে না। বললে—কিন্তু তাতে তো আমাদেরই ভালো কর্নেল। তা হলে তো আমরাই জিতবো—

ক্লাইভ হাসলো শুধু কথাটা শুনে। কিছু বললে না মুখে। নিশ্চয়ই আমাদের ভালো। তা হলে তো আমরাই জিতবো! তুমি, আমি, আমরা সবাই যা আছি তাই-ই থাকবো কুট্। কেউই জিতবে না। জিতবে শুধু কোম্পানী। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শেয়ার-হোল্ডাররাই শুধু জিতবে। তারা মোটা ডিভিডেন্ড্ পাবে। তারা বাড়ি করবে, গাড়ি চড়বে, মেয়েমানুষ নিয়ে ফুর্তি করবে। আর আমরা বউ-ছেলেমেয়ে ফ্যামিলি সব দূরে রেখে এখানে এই মশা-মাছি-জঙ্গল-সাপ সব নিয়ে কেমন করে আরো ভালো করে মানুষ খুন করা যায় তারই মহড়া দেবো। আর দরকার হলে ল্যাসিংটনের মত বেঘোরে মরবো।

ক্লাইভ সেখান থেকেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে উঠলো—ফায়ার—ফায়ার—

এ ঘটনার বহু দিন পরে কর্নেল ক্লাইভ বিলেতে ফিরে গিয়ে এই সব কথাই ভুলতে চেষ্টা করতো। সবাই জানতো লর্ড ক্লাইভ শুধু লর্ডই নয়, ইংলণ্ডের সব চেয়ে বড়লোক। বিরাট টাকার মালিক, বিরাট খেতাব, বিরাট সম্পত্তি, প্রতিপত্তি, প্রতিষ্ঠা।

স্ত্রী এসে জিজ্ঞেস করতো—কী ভাবছো? হঠাৎ যেন চমক্ ভেঙে যেত লর্ড ক্লাইভের। বেঙ্গলের সেই ব্যাটল্-ফিল্ডের কথা মনে পড়তো। মনে পড়তো নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলার কথা। মীরজাফর, উমিচাঁদ, জগৎশেঠ, নবকৃষ্ণের কথা। আর মনে পড়তো বেগম মেরী বিশ্বাসের কথা।

—তাস খেলবে?

—তাস?

এক একদিন দমদমার বাগানবাড়িতে বারান্দায় বসে তাসও খেলেছে লর্ড। সামান্য একটা মেয়ে। বেগম মেরী বিশ্বাস তার সব লাইফ-হিস্ট্রিটা বলেছিল লর্ড ক্লাইভকে। চারদিকে ঝিঁঝি পোকার ডাক। দূরে মিলিটারির আর্মি-ব্যারাক। হাতি-ঘোড়া-উট। তার ওপাশে আর্মির লোকরা মদ খেয়ে হই-হই করছে।

হাতি-উটের পিলখানা পেরিয়ে কেবল বড় বড় গাছ। তাস খেলতে খেলতে একবার ওই দিকে চোখ পড়লে দেখতে পেত একটা কৃষ্ণচূড়া গাছে অসংখ্য লাল ফুল ধরেছে। বেঙ্গলীরা বলতো কৃষ্ণচূড়া—ইংরেজরা বলতো—ফ্লেম্ অব দ্য ফরেস্ট। বনের আগুন। বনের আগুনের শিখা। ক্লাইভের নিজের জীবনের আগুনই যেন সহস্র-শিখা হয়ে ওই গাছটার মাথায় ডালে ডালে জ্বলে উঠতো। আর ইণ্ডিয়া? ইণ্ডিয়াও তখন আগুন। সমস্ত ইণ্ডিয়াটাই তখন ফ্লেম্ অব দ্য ফরেস্ট! নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলা, তারপর মীরজাফর আলি, তারপর মীরকাশিম...

—তাস খেলবে?

ক্লাইভ বললে—না, এখন আর ভালো লাগছে না তাস খেলতে—

বেগম মেরী বিশ্বাসও বলতো—না, এখন আর ভালো লাগছে না তাস খেলতে—

তারপর সোজা সেই কৃষ্ণচূড়া গাছটার দিকে চেয়ে থাকতো বেগম মেরী বিশ্বাস। এখন তো আর কোনো ভয় নেই। তখন কোনো ভয়ই আর ছিল না মরালীর। এক দিন কোন্ এক দুর্যোগের লগ্নে ইণ্ডিয়ায় গিয়ে হাজির হয়েছিল রবার্ট ক্লাইভ, আর সমস্ত দেশটা লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে তবে যেন তার নিবৃত্তি হয়েছিল।

বেগম মেরী বিশ্বাস এক-একদিন লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদতো।

—কী হলো? কাঁদছো কেন?

—না, কিছু না—বলে বেগম মেরী বিশ্বাস চোখ দুটো মুছে ফেলতো নিজের শাড়ি দিয়ে।

কিন্তু ক্লাইভ জানতো সব। এক-একটা করে প্রত্যেকটা কাহিনী যেমন উদ্ধব দাস শুনতো, তেমনি ক্লাইভও শুনতো। উদ্ধব দাস কাব্য লিখবে রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের মত। আর ক্লাইভ? রবার্ট ক্লাইভ তখন বলতে গেলে একাই বাঙলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব-সুবাদার-ফৌজদার সব কিছু। রবার্ট ক্লাইভের এক হুকুমে তখন রাজ্য ওঠে আর রাজ্য পড়ে। কিন্তু সেই ক্লাইভ সাহেবের বিধাতা-পুরুষেরও তখন এমন ক্ষমতা নেই যে বেগম মেরী বিশ্বাসের দুঃখ ঘোচায়।

—আমি জন্মেছিলাম এক মফঃস্বলের জমিদারের চাকরের ঘরে। কিন্তু ভাগ্যের কোন্ বিধানে আমি আজকে আবার রাজরানী হয়েছি। আমারই সঙ্গে কত বেগম ছিল চেহেল্-সুতুনে। গুলসন বেগম, পেশমন বেগম, তক্কি বেগম, বব্বু বেগম, নানীবেগম, লুৎফুন্নিসা বেগম। তারা সব কোথায় গেল, আর আমিই বা কোথায়? তখন টাকা ছিল না, এখন টাকা হয়েছে...

কথা বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গিয়ে মেরী বেগম চিৎকার করে উঠতো। বলতো —কেন তুমি খুন করতে গেলে নবাবকে? নবাব তোমার কী ক্ষতিটা করেছিল? তাকে পৃথিবীর এককোণে একটু বাঁচতে দিলে তোমাদের কোম্পানীর এমন কী সর্বনাশটা হতো?

এ-কথার তো কোনো উত্তর নেই, তাই রবার্ট ক্লাইভ চুপ করে থাকতো। কোনো জবাব দিত না। আর জবাবই বা দেবে কী? ক্লাইভ নিজেই কি জানতো অমন হবে? নিজেই কি জানতো মানুষের হিংসা অমন করে তার প্রতিশোধের পিপাসা পরিতৃপ্ত করবে!

আর অমন করে প্রতিশোধের পিপাসা পরিতৃপ্ত না হলে মরালীকেই কি এখানে এসে এই ক্লাইভের বাগান-বাড়িতে বেগম মেরী বিশ্বাস নাম নিতে হতো! না কান্তকেই অমন করে...

কিন্তু কান্তর কথা ভুলে যাওয়াই ভালো। তার কথা এখন থাক।

আর শুধু কান্তই নয়, কান্ত, ঘসেটি বেগম, আমিনা বেগম, নানীবেগম—সবাই—ওরা, সকলের কথাই এখন থাক। ইতিহাসের যখন বিপ্লব ঘটে, তখন কে আপন কে পর, কে দূর কে নিকট, কে আত্মীয় কে শত্রু, সে-বিচার থাকে না। নির্বিচারে মানুষের প্রতিশোধের স্পৃহাকে চরিতার্থ করেই যে সে কৃতার্থ হয়। কান্না পরের কথা, অনুতাপ পরের কথা, সকলের আগে ইচ্ছার পরিপূরণ। ইচ্ছা পরিপূরণ করেই ইতিহাস তার গতিপথ সুগম করে তোলে।

নইলে ঠিক সেই ভোরবেলাই বা হাতিয়াগড়ের ডিহিদার রেজা আলি মুর্শিদাবাদে আসবে কেন?

সেই ২৪শে জুন ভোরবেলা। সারা শহরে যখন হইচই হট্টগোল চলেছে, যখন রাস্তায়-রাস্তায় লোকজন বেরিয়ে পড়েছে, যখন সবাই সবাইকে জিজ্ঞেস করছে—

ক্যা হুয়া, ঠিক সেই সময়েই কি আসতে হয় ডিহিদার রেজা আলিকে?

রেজা আলি এলেমদার লোক। সোজা আঙুলে যে ঘি বেরোয় না, এটা রেজা আলির মত সে-যুগে আর কেউ অমন করে জানতো না। নোকরিতে সবাই-ই উন্নতি চায়। খোশামোদ করে হোক, কাজ দেখিয়ে হোক, পায়ে ধরে ভিক্ষে করে হোক, চাকরিতে উন্নতি হয়ই। কিন্তু যে-উপায়টা অত্যন্ত অব্যর্থ সেই উপায়টাই রেজা আলি সাহেব চিরকাল অবলম্বন করে এসেছে। সেটা হচ্ছে ওপরওয়ালাকে খুশী করা। ওপরওয়ালাকে খুশী করতে হলে জানা চাই ওপরওয়ালার দুর্বলতাটা কী। সেই দুর্বলতার জায়গাটার সন্ধান জানতে পারলে আর চাই কী? সেইখানটায় সুড়সুড়ি দিলেই তোমার কার্য সিদ্ধি!

মেহেদী নেসারই হলো রেজা আলি সাহেবের ওপরওয়ালা। আর সেই মেহেদী নেসারের দুর্বলতার জায়গাটা হলো মেয়েমানুষপ্রীতি।

হাতিয়াগড়ের ছোটমশাই-এর দ্বিতীয় পক্ষের রাণীবিবিকে চেহেল্-সুতুনে পাঠিয়ে দিয়ে রেজা আলি ভেবেছিল এবার উন্নতি একটা অবধারিত।

কিন্তু দিন যায় মাস যায় বছর যায়, উন্নতির কোনো সাড়া-শব্দ নেই।

শেষকালে টনক নড়লো। নিজামতের এত বড় একটা উপকার করলো রেজা আলি, অথচ উন্নতি হলো না তার। তখন মনে হলো নিশ্চয়ই কোথাও কিছু গোলমাল আছে। তখন থেকেই লেগে-পড়ে ছিল রেজা আলি। হাতিয়াগড়ের রাজ-বাড়ির আশেপাশে চর লাগলো। চর কিছু করতে পারলে না। অনেক ভেবে ভেবে অনেক খোঁজ করে ব্যাপারটা একদিন জলের মতন পরিষ্কার হয়ে গেল। রাজ-বাড়িতে রাণীবিবি নেই। তাহলে শোভারামের মেয়েটা কোথায় গেল? শোভারামের মেয়েটাকেই যদি বদল করে দিয়ে থাকে তো রাণীবিবি কোথায় গেল? কোথায় তাকে লুকিয়ে রাখা হলো!

এই ভাবনাই দিনরাত পাগল করে তুললো রেজা আলিকে।

তারপর একদিন পাগলাটার সঙ্গে দেখা।

পাগলা উদ্ধব দাস। পাগলা মানুষ, গান গায় আর দুটি খায়। সেই উদ্ধব দাসই খবরটা দিলে।

রেজা আলি এমনিতে কারো খাতির করে না। কিন্তু উদ্ধব দাসকে খুব খাতির করলে সেদিন। পান জর্দা কিমাম দিলে।

জিজ্ঞেস করলে—তুমি ঠিক জানো?

উদ্ধব দাস বললে—আমি ঠিক জানবো না তো কে জানবে প্রভু?

রেজা আলি জিজ্ঞেস করলে—তারপর?

উদ্ধব দাস বললে—তারপর প্রভু, আমার বউ আমাকে তাড়িয়ে দিলে—

—তোমার নিজের বউ তোমাকে তাড়িয়ে দিলে?

—আজ্ঞে, আমার নিজের বউ আমাকে তাড়াবে কেন? আমার বউ-এর সঙ্গে তো আমাকে দেখাই করতে দিলে না মাগীটা। সাহেব কত করে বললে মাগীটাকে। ক্লাইভ সাহেব যে লোকটা খুব ভালো প্রভু!

—সাহেব দেখা করতে দিতে চেয়েছিল?

—হ্যাঁ প্রভু, মাগীটাই যে সব্বনাশী—

—সে মাগীটা কে?

—আজ্ঞে প্রভু, সে আমার বউ-এর ঝিউড়ি। আমার বউকে দেখা-শোনা করে। মাগীটা খান্ডারনী মেয়েমানুষ! আমাকে দেখলে মারতে আসে তেড়ে!

—কী রকম চেহারা বল দিকিনি?

উদ্ধব দাস যে-চেহারার বর্ণনা দিলে তার সঙ্গে হাতিয়াগড়ের রাজবাড়ির ঝি দুর্গার চেহারা অবিকল মিলে গেল।

রেজা আলির চোখ খুলে গেল সেই দিনই। এতদিন ডিহিদারি করছে রেজা আলি, অথচ এমন বোকা কখনো বনেনি। সোজা চর পাঠালে কলকাতার বাগবাজারে পেরিন সাহেবের বাগানে। সেখান থেকে চর সন্ধান নিয়ে এসে জানালো যে কেউ নেই সেখানে। সবাই চলে গেছে। ক্লাইভ সাহেবও ফৌজ-টৌজ নিয়ে যুদ্ধ করতে গেছে নবদ্বীপের দিকে।

তারপর অনেক হয়রানি গেল কয়েকদিন। শেষকালে খবর পাওয়া গেল কৃষ্ণনগর থেকে।

অতিথিশালার ভিড়ের মধ্যে রেজা আলির চর হিন্দু সেজে উঠেছিল। সেখানে দেখলো, উদ্ধব দাস রয়েছে। আর একদিন থাকতে থাকতেই খবর পেয়ে গেল, রাজবাড়ির অন্দরেও কোথা থেকে দুজন কোথাকার জেনানা এসেছে। তাদের জন্যে আলাদা খাবার-থাকবার বন্দোবস্ত হয়েছে। ক্লাইভ সাহেব যেদিন যুদ্ধ করতে নবদ্বীপের দিকে গেছে সেইদিনই জেনানা দুজন এসে রাজবাড়িতে উঠেছে। রাজবাড়ির রসুইখানা থেকেই সব খবর আদায় করে চর খবরটা দিলে রেজা আলি সাহেবকে।

রেজা আলি মুখে কিছু বললে না। শুধু ছুঁচলো গোঁফের দুটো দিক আরো ছুঁচলো করতে করতে বললে—তওবা—তওবা—

তারপর যা করণীয় তা করলে পরদিনই। এবার আর লোক মারফত নয়। নোকরিতে উন্নতি করতে হলে খবরটা মেহেদী নেসার সাহেবকে নিজে গিয়ে দিতে হবে। রাত থাকতেই বেরিয়ে পড়লো রেজা আলি 'ফিরিঙ্গি'র পিঠে। নবাব যেখানেই থাকুক, তাতে কিছু হরজা নেই। মেহেদী নেসার সাহেব থাকতে পারে। তার চেলা মনসুর আলি মেহের মোহরার থাকতে পারে। দফ্‌তর ফেলে আর কোথায় যাবে সবাই মিলে।

ভোর রাত থাকতে থাকতে মুর্শিদাবাদে পৌঁছে অবাক! এত হল্লা কেন? এত গোলমাল কিসের? চক্‌-বাজারের রাস্তায় এত ভোরে তো এত লোক বেরোয় না!

বশীর মিঞাও তখন সারাফত আলির খুশ্‌বু তেলের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে গিয়েছিল। এত হল্লা কীসের? ক্যা হুয়া?

মাঝি-মাল্লারা পাশেই দাঁড়িয়ে ভয়ে কাঁপছিল। একবার যখন মেহেদী নেসারের চরের কবলে পড়েছে তখন আর তাদের রেহাই নেই—জেনেই নিয়েছে।

ওদিকে কান্ত সারাফত আলির কাছ থেকে মোহর আনতে গিয়েছে।

কিন্তু বশীর মিঞা আর দাঁড়াতে পারলে না। আস্তে আস্তে একটু একটু করে পায়ে পায়ে এগোতে লাগলো। তবে কি নিজামত বরবাদ হয়ে গেল? ফিরিঙ্গী-ফৌজ কি মুর্শিদাবাদের চকবাজারে এসে হাজির হবে নাকি?

—ক্যা হুয়া হ্যায় ভেইয়া?

একজন বললে—শুনা হ্যায় নিজামত পালট গয়া—

—দূর বেওকুফ!

বেওকুফ না বেওকুফ! নিজামত পালটে যাবে মানে? নবাব কি মারা গেছে? মেহেদী নেসার সাহেব কি পটল তুলেছে? বলছিস কী তুই বেল্লিকের মত? নাকে ঘুষি মেরে মুখ চ্যাপ্টা করে দেবো তোর!

কথাটা মনে মনে বললে বটে বশীর মিঞা, কিন্তু অবস্থাটা দেখে ভালো মনে হলো না। পায়ে পায়ে আরো এগিয়ে গেল। দুঃসংবাদ বোধ হয় বাতাসের চেয়েও জোরে ছোটে। তবে কি সত্যি-সত্যিই দুঃসংবাদ এসে গেছে!

রাস্তায় চলতে চলতে হঠাৎ পেছনে কার গলা শুনে বশীর মিঞা মুখ ফিরিয়ে দেখলে—ডিহিদার রেজা আলি সাহেব—

—আরে বশীর মিঞা, তুই?

বশীর মিঞা সেলাম করলে—সেলাম আলেকুম জনাব—রাজধানীতে কী মনে করে?

হাতিয়াগড়ে হলে বশীর মিঞাকে আমলই দিত না রেজা আলি সাহেব। কিন্তু মুর্শিদাবাদে অন্যরকম। রাজধানীর লোক, তার ওপর মনসুর আলি মেহের মোহরার সাহেব বশীর মিঞার ফুপা।

'ফিরিঙ্গি'র পিঠে বসে বসে বললে—মেহেদী নেসার সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি, সাহেব আছে তো শহরে?

বশীর মিঞা বললে,—হ্যাঁ জনাব, সাহেব তো আছে শহরে, লেকিন্ বড়ি মুশকিল্‌মে আছে!

—কেন? কী হলো?

বশীর মিঞা বললে—সে অনেক বাত্ জনাব। মেহেদী সাহেব এখন আপনার সাথে মুলাকাত করতে পারবে না। অনেক কাম সাহেবের।

রেজা আলি সাহেব বললে—অনেক কাম হলে কী হবে, আমার ভি অনেক কামের কথা আছে সাহেবের সঙ্গে—

তারপর চারদিকে চেয়ে বললে—এত হল্লা হচ্ছে কীসের রে?

—কে জানে জনাব! বলছে, নিজামত পালট্ গয়া।

—সে কী রে? পালটে গেছে মানে? লোকগুলো বেল্লিক নাকি? তা সে যা বলুক, আমার কামটা যে খুব জরুরী।

—কী রকম?

—তুই বলবি না তো কাউকে? বড় বেওকুফি করে ফেলেছি রে বশীর। আস্‌লি রাণীবিবি বলে যাকে চেহেল্-সুতুনে সেবার পাঠিয়েছিলুম, সে সাঁচ্চা রাণীবিবি নয় রে!

বশীর মিঞা অবাক হয়ে গেল। বললে—সে কি, জনাব?

—হ্যাঁ রে বশীর, বড় বেওকুফি করে ফেলেছি। চেহেল্-সুতুনে যাকে পাঠিয়েছি সে হলো আসলে হাতিয়াগড়ের নওকরের লেড়কী। আর আস্‌লি রাণীবিবি কেষ্ট-নগরের রাজা কৃষ্ণচন্দরের হাবেলিতে লুকিয়ে আছে—

বশীর মিঞার মাথার উপর যেন সত্যিই বাজ পড়লো।

রেজা আলি বললে—হ্যাঁ রে, আমার চর নিজের চোখে দেখে এসেছে রাণী-বিবিকে।

তাহলে মরিয়ম বেগম বলে কাকে মেহেদী নেসার সাহেব গ্রেফতার করলে? সে কে? সে কি রাণীবিবি নয়?

—আপনি বলছেন কী জনাব, রাণীবিবিকে যে আজ মেহেদী নেসার সাহেব গ্রেফতার করে মতিঝিলে বন্দী করে রেখেছে। এই একটু আগে!

রেজা আলি অবজ্ঞার হাসি হাসলো—আরে দূর, সে রাণীবিবি নয়, সে হাতিয়াগড়ের রাজবাড়ির নওকর শোভারামের লেড়কী মরালী? আস্‌লি রাণী-

বিবিকে তো মহারাজার কেষ্টনগরের হাবেলিতে লুকিয়ে রেখেছে—

—লেকিন্, হাতিয়াগড়ের রাজা ছোটমশাইকেও তো গ্রেফতার করেছে মেহেদী নেসার সাহেব!

তাজ্জব বাত্ তো!

বশীর মিঞা বললে—চলুন জনাব, মতিঝিলের দিকে যাই, সাহেবকে পাত্তা করি, চলুন—

তারপর সেই ভিড়ের মধ্যে দিয়েই চলতে লাগলো দুজনে। রেজা আলি ঘোড়ার পিঠে, আর বশীর মিঞা।

কিন্তু হঠাৎ ওদিক থেকে দুটো তাঞ্জাম আসতে দেখা গেল। চেহারা দেখে বোঝা গেল সামনেরটা নানীবেগমসাহেবার আর পেছনেরটা মেহেদী নেসার সাহেবের। সামনে দিয়ে তাঞ্জাম দুটো চলে গেল। বশীর মিঞা কিছু বুঝতে পারলে না। এত ভোরে নানীবেগমসাহেবা কী করতে এসেছিল মতিঝিলে? আবার চলেই যা যাচ্ছে কেন?

কিন্তু পেছনেই দৌড়তে দৌড়তে পীরালি খাঁ চলেছে।

বশীর তাকে ডাকলে—পীরালি খাঁ, কী হয়েছে? নানীবেগমসাহেবা কোথায় যাচ্ছে?

—চেহেল্-সুতুনে!

—কেন? রাত্রে মতিঝিলে এসেছিল কেন?

—তা মালুম নেই।

—চেহেল্-সুতুনে কী হয়েছে? এত হল্লা হচ্ছে কেন চারদিকে?

পীরালি খাঁ বললে—নবাব লড়াই থেকে ওয়াপোস এসেছে—

বলে আর সেখানে দাঁড়ালো না। তাঞ্জাম দুটোর পেছন পেছন চেহেল্-সুতুনের দিকে দৌড়তে লাগলো।

আমি জানি, তোমরা সকলে আমার সামনে মুখোশ পরে আছ। আমি মুখে কিছু বলছি না, কিন্তু মীরজাফর আলি সাহেব, তুমি আর আমাকে প্রবঞ্চনা করতে পারবে না। আমাকে তুমি অর্বাচীন ভেবে এতদিন অবজ্ঞা করেছো। আর আমিও তোমাকে যখন-তখন অপমান করে বুঝতে দিয়েছি যে আমি অর্বাচীন নই। কিন্তু এখন তোমার বুদ্ধির সঙ্গে আমার বিপদের মোকাবিলা হোক!

—আচ্ছা মীরজাফর আলি সাহেব, আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে আপনি এখানে আসবার আগে আমার সামনে কোরাণ ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে আপনি আমার বিরুদ্ধাচরণ করবেন না?

মীরজাফর আলি এতক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নবাবের সব কথা শুনছিল। এতক্ষণে উত্তর দিলে। বললে—সে কথা তো আমি এখনো বলছি আলি জাঁহা!

—আপনি সত্যিই আমার বিরুদ্ধাচরণ করবেন না? আপনি সত্যি বলছেন?

—হ্যাঁ, আলি জাঁহা। সত্যি বলছি!

নবাব মীর্জা মহম্মদ আর নিজেকে সংবরণ করতে পারলে না। উঠে দাঁড়িয়ে

মীরজাফর আলিকে জড়িয়ে ধরলে।

বললে—কিন্তু তাহলে আমার বড় ভয় করে কেন আলি সাহেব!

—কীসের ভয় আলি জাঁহা?

—কেন মনে হয় আপনি আমার দলে নন, আপনি ওদের দলে আলি সাহেব? মনে হয় আমার কেউ নেই, আমি একলা আর আমার চারপাশে কেবল সব দুষমন! আমি কাউকে বিশ্বাস করতে পারছি না কেন আলি সাহেব? আপনি থাকতে আমি কেন এত অসহায় মনে করছি নিজেকে?

মীরজাফর মীর্জার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বললে—আপনি স্থির হোন আলি জাঁহা!

—আপনারা সবাই বিরুদ্ধে গেলে আমি কেমন করে স্থির হয়ে থাকি আলি সাহেব? আমার মাথার ওপরে এত দায়িত্ব নিয়ে আমি কি করে স্থির হতে পারি? আপনারা যখন কাল রাত্রে সবাই চলে গেলেন, তারপর থেকে কি আমি ঘুমিয়েছি? জানেন আলি সাহেব, আমার সোনার কলকেটা পর্যন্ত কে চুরি করে নিয়ে গেছে, তাঁবুর কাপড়টা কে খানিকটা ছুরি দিয়ে কেটে নিয়ে গেছে! এরা কি মনে করেছে আমি মারা গিয়েছি? আমার মরা পর্যন্তও কি এরা অপেক্ষা করতে চায় না? নিজামত কি নেই? খোদাতালাহ্‌ও কি মারা গেছে বেহেস্তে? দুনিয়ার ইনসান কি সবাই জানোয়ার হয়ে গেছে?

মীরজাফর সাহেব বললে—আপনি চুপ করুন আলি জাঁহা, আমি তো আছি—

—কিন্তু কোথায় আছেন আপনি? সকাল থেকে দুশো তিনশো সেপাই আমার মারা গেল, আপনারা তো কিছুই করলেন না। ওই দেখুন, আমার মীরমদন এখনো আমার সামনে পড়ে রয়েছে, ও কিছু শুনতে পাচ্ছে না, কিন্তু আপনারা তো কর্নেল ক্লাইভকে মেরে ওর বদ্‌লা নিতে পারলেন না?

—আপনাকে কিছু ভাবতে হবে না আলি জাঁহা, আমি তো বলছি আমি আছি—

মীর্জা মহম্মদ বললে—আপনি আছেন তো বলছেন, কিন্তু আমি কেমন করে বিশ্বাস করবো যে আপনি আছেন? আপনি কখন কাজ করে দেখাবেন যে আপনি আছেন? আপনার ফৌজরা যে গুলি ছুঁড়েছে তার কি একটাও ফিরিঙ্গীদের ফৌজের ওপর গিয়ে পড়েছে? শুধু আপনি কেন, রাজা দুর্লভরাম, ইয়ার লুৎফ খাঁ তারাই কি একটা ফিরিঙ্গী-ফৌজের গায়ে আঁচড় কাটতে পেরেছে? তাহলে আমি কেমন করে বুঝবো যে আপনারা আমার পেছনে আছেন? একবার আমি হাল্‌সিবাগান থেকে ইজ্জত হারিয়ে পালিয়ে এসেছি, এবারও কি আমি আমার, আপনার, হিন্দুস্থানের সকলের ইজ্জত নিয়ে পালিয়ে যাবো বলতে চান? বলুন, আপনার কী মতলব আলি সাহেব, চুপ করে থাকবেন না, কথা বলুন!

হঠাৎ ওদিক থেকে একটা কামানের বিকট শব্দ কানে এল।

—ওই দেখুন আলি সাহেব, ওদের কামানের কেমন শব্দ হয়, আমাদের কামানের শব্দ নেই কেন? আমাদের কামানগুলো কি খারাপ? আমাদের কামানগুলো কি ভোঁতা?

মীরজাফর আলি তাড়াতাড়ি বাইরে চলে যাচ্ছিল।

বললে—আমি যাই, দেখে আসি আলি জাঁহা—

—না, যাবেন না, আপনি দাঁড়ান আলি সাহেব, আপনার সঙ্গে কথা আছে। আজ আমি সব কথার ফয়সালা করে ফেলতে চাই। আমার মীরমদন বেঁচে থাকলে

আজ আমি আপনাকে এমন করে বলতাম না, সে চলে গিয়ে আমাকে খোঁড়া করে দিয়ে গিয়েছে—

মীরজাফর আলি কথার মধ্যেই হঠাৎ বললে—কেন আলি জাঁহা, আপনার মীরমদন নেই বটে, কিন্তু আপনার মোহনলাল তো আছে—

—আপনি দেখছি এখনো সেই কথা ভুলতে পারেননি আলি সাহেব! আমি জানি আপনি এখনো এই বিপদের সময়েও আমার ওপর রাগ করে আছেন। কিন্তু সত্যি বলুন তো, আপনার সঙ্গে কি মোহনলালের তুলনা?

মীরজাফর আলি সাহেব চুপ করে রইলো।

—আপনার কাছে শুধু একটা অনুরোধ, আর একটা দিন আমার যুদ্ধটা চালিয়ে দিন আপনি আলি সাহেব, যেমন করে হোক চালিয়ে দিন, তারপরে আর আমার ভাবনা নেই। জেনারেল ল' কাল কিংবা পরশুই এসে পড়বে, তখন আর আপনাকে আমি বিরক্ত করবো না—বলুন আপনি চালিয়ে যাবেন?

ইয়ারজান পাশেই দাঁড়িয়ে সব শুনছিল।

এতক্ষণে বললে—হ্যাঁ, আলি সাহেব, এমন সময় আপনি আর 'না' বলবেন না—আপনি বলুন 'হ্যাঁ', আপনার ওপর বাঙলা মুলুকের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে—

ওদিকে তখন কর্নেল ক্লাইভ চিৎকার করে উঠেছে—কিল্‌প্যাট্রিক—

কিল্‌প্যাট্রিকের সোলজাররা তখন দেখা গেল পেছন দিকে হটে আসছে। মেজর কিল্‌প্যাট্রিক তার সৈন্যদের সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে খালের দিকে।

—স্টপ্, স্টপ্ দেয়ার—

দৌড়তে দৌড়তে ক্লাইভ সোজা মেজর কিল্‌প্যাট্রিকের সামনে গিয়ে হাজির।

—কী করছো? ওদের হটাচ্ছ কেন?

মেজর কিল্‌প্যাট্রিক বললে—ওপাশ থেকে এনিমি এবার ফায়ারিং বন্ধ করেছে, সেই জন্যেই হাইড্-আউটের মধ্যে ওদের সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি—

—কিন্তু আমি তো চাই এনিমি সামনে এগিয়ে আসুক!

—সামনে এগিয়ে এলে আমরা ওদের আর্মির কাছে যে পিষে মারা যাবো।

ক্লাইভ রেগে গেল আরো। বললে—কিন্তু আমরা পেছিয়ে এলে যে ওরাও পেছিয়ে যাবে—

মেজর কিল্‌প্যাট্রিক বললে—কিন্তু তাতে ক্ষতি কী? আমাদের আর্মি একটু রেস্ট পাবে—

—কিন্তু রেস্ট আগে না ভিক্টরি আগে?

—আমার সোলজাররা মারা গেলে কারা ভিক্টরি আনবে?

—তুমি তর্ক কোর না। ডোণ্ট আর্গু। লেট দ্য সোলজার্স গো অ্যাহেড, কামান-বন্দুক নিয়ে সবাই এগিয়ে যাক্ সামনের দিকে, তাহলেই এনিমি-লাইনস্ এগিয়ে আসবে! আমি তো তাই-ই চাই—আমি এ-যুদ্ধ প্রোলং করতে চাই না। জেনারেল ল' আসবার আগেই আমি ওয়ার খতম করে দিতে চাই—গো অন, ফায়ার, ব্যাটালিয়ান, ফরওয়ার্ড, কুইক, ফায়ার...

হঠাৎ ফিরিঙ্গী-আর্মির সেপাইদের মধ্যে যেন বিদ্যুৎ-প্রবাহ খেলে গেল। ফরওয়ার্ড, কুইক, ফায়ার। কুড়িজন ইংলিশ আর্মির লোক মারা গেছে, যাক! কিন্তু কোম্পানীর জন্যে আমাদের সব কিছু স্যাক্রিফাইস করতে হবে। দরকার হলে মরতে হবে। উই মাস্ট ডু অর ডাই...ফায়ার...ফায়ার...

খবরটা ঘসেটি বেগমের কানেও গেছে। আমিনা বেগমসাহেবার কানেও গেছে। এক-একজন নিজের মহলে বসে খবরটা শুনেছে আর বাঁদীদের ডেকে জিজ্ঞেস করেছে—কী হয়েছে রে বাঁদী? ক্যা হুয়া?

একদিন নবাব আলীবর্দী খাঁর আমলে মেয়েরা সব পরামর্শ করতো বাপজানের সঙ্গে। কেমন করে মসনদ চালাতে হয় তারই পরামর্শ। দরকার হলে যে তোমার উপকার করবে তাকেও খুন করতে পেছোলে চলবে না। এ দুনিয়াটা শুধু সততা দিয়ে চলে না বেটি, চলে ষড়যন্ত্র করে, খুন-খারাবি করে আর মোহরের জোরে। আমি তো সোজা-সরল পথে মসনদ পাইনি। নবাবী-নীতিতে একে অসৎ পথ বলে না। যতক্ষণ মসনদ আমার, ততক্ষণ আমিই নবাব। তুমি যদি তা কেড়ে নিতে পারো তো তখন তুমিই নবাব। এই-ই দুনিয়া। সুতরাং যে-কোনো রকমে মসনদ আঁকড়ে ধরে রাখতে হবে। মসনদে যতক্ষণ তুমি বসে আছ ততক্ষণ সবাই তোমাকে কুর্নিশ করবে। তুমি যেই সরে যাবে, তখন সবাই কুর্নিশ করবে অন্য লোককে। এ-কানুন চিরকালের কানুন, এ কানুন খোদাতালাহ্ আল্লাতালাহ্‌র কানুন। এ-কানুন বদলায় না, বদলায়নি, বদলাবে না কখনো!

তখন আমিনা বেগম, ঘসেটি বেগম, ময়মানা বেগম সবাই ছোট। সেই ছোট বয়েস থেকেই বাপজানের কাছে শুনে এসেছে এ-সব কথা। শিখে এসেছে কাকে বলে নবাবী, কাকে বলে ষড়যন্ত্র, কাকে বলে খুন--খারাবি!

তারপর একে একে সবাই বড় হয়েছে, সকলের বিয়ে হয়েছে। সবাই দেখেছে মানুষের জীবনের একমাত্র সাধ হওয়া উচিত বাঙলা-মুলুকের মসনদ পাওয়া। তার জন্যে যদি পরপুরুষের সঙ্গে এক-বিছানায় শুতে হয় তাতেও আপত্তি করতে নেই। তাতে তোমার জাত যাবে না, বরং ইজ্জত বাড়বে। ইজ্জত শুধু থাকে টাকায়, থাকে প্রতিষ্ঠায় প্রতিপত্তিতে আর খেতাবে। মেয়েরা বরাবর জেনে এসেছে টাকা থাকলেই তোমার সব রইলো। চরিত্র-স্বভাব ও-গুলো গ্রামের সাধারণ মানুষদের জন্যে। আমীর-ওমরাহ্-বেগমদের ও-সব থাকতে নেই। ও-গুলো উন্নতির পথে বাধা কেবল।

সুতরাং ওড়াও ফুর্তি, টাকা কামাও আর কীসে আরো প্রভাব-প্রতিপত্তি বাড়ে তার জন্যে ষড়যন্ত্র করো!

কিন্তু মুশকিল শুরু হলো মীর্জা মহম্মদ নবাবী পাবার সঙ্গে সঙ্গেই।

ষড়যন্ত্রের যেন জাল গড়ে উঠলো নিজামতে। প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল আমীরে-আমীরে ওমরাহে-ওমরাহে আর বেগমে-বেগমে।

আমিনা বেগমের সঙ্গে ঝগড়া শুরু হলো মীর্জা মহম্মদের। মীর্জা মহম্মদের সঙ্গে ঝগড়া শুরু হলো ঘসেটি বেগমের। ঘসেটি বেগমের সঙ্গে ঝগড়া শুরু হলো আমিনা বেগমের। কার সঙ্গে কার ঝগড়া বাধলো না সেইটেই বড় শক্ত হয়ে দাঁড়ালো।

সকলেই ভাবলে কবে মীর্জা মহম্মদ মরে। মীর্জা মহম্মদ মারা গেলেই যেন মসনদটা তারই ভাগে আসবে!

যে-বাঁদীটা খবর এনেছিল সে বকশিশ পেয়ে গেল একটা মোহর।

—তুই ঠিক শুনেছিস তো?
—হ্যাঁ ছোটি-বেগম, আমি ঠিক শুনেছি।
—কার কাছে শুনলি?
—খোজা সর্দার পীরালি খাঁও বলছিল, বরকত আলিও বলছিল।
—নানীবেগমসাহেবা কোথায়?
—মতিঝিলে, ওরা দুজনেই তো নানীবেগমসাহেবাকে ডেকে আনতে গেছে ছোটি বেগম।

ছোটি বেগম আর দেরি করলে না। অনেক দিন ধরে নজর-বন্দী হয়ে ছিল চেহেল্-সুতুনে। সেই মতিঝিল! কত সাধের মতিঝিল তার। মতিঝিলের এক-একটা পাথরের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল ঘসেটি বেগমের জীবন। জাহাঙ্গীরাবাদে স্বামীকে রেখে মতিঝিলের মধ্যেই তো কাটাতো তার দিন। আলীবর্দী খাঁ আদর করে বড় মেয়ের নাম দিয়েছিল—মেহেরুন্নিসা। তাই থেকে শেষকালে মেহের। রাজা রাজবল্লভও তাকে আদর করে মেহের বলেই ডাকতো। হোসেন কুলী খাঁ অনেক রাত্রে লুকিয়ে লুকিয়ে আসতো তার শোবার ঘরে। এসে ডাকতো—'মেহের'। আর শেষ পর্যন্ত ছিল নজর কুলী খাঁ। আঃ, কী খুবসরতই না চেহারা ছিল নজর কুলীর। মার্বেল পাথরের মত তেলা-তেলা হাত-পা-মুখ-চোখের গড়ন। ছোটি বেগম পাগল হয়ে গিয়েছিল সেই নজর কুলীকে দেখে।

আজ সব কোথায় গেল তারা!

ঘসেটি বেগম বললে—দ্যাখ তো, বাইরের ফটকে পাহারাদার আছে কে?

বাঁদীটা বললে—কেউ নেই ছোটি-বেগম, আজ সব বিলকুল বে-সামাল হয়ে গেছে চেহেল্-সুতুন—

—আর নবাব? নবাবের সঙ্গে কেউ আসেনি?

—নবাব একলা লড়াই থেকে ওয়াপোস এসেছে ছোটি বেগম। এসেই চেহেল্-সুতুনে লুৎফুন্নিসা বেগমসাহেবার মহলে গিয়েছিল, সেখান থেকে আমীর-ওমরাহ্‌দের তলব দিয়েছে মোলাকাত করবার জন্যে—

—কেন?

—নবাব আবার ফৌজ বানাবে শুনেছি, নয়া ফৌজ। সেই নয়া ফৌজ নিয়ে ফিরিঙ্গীদের সঙ্গে লড়াই করবে!

ঘসেটি বেগম সব শুনলে। তারপর বললে—তুই একটা কাজ করতে পারবি রাবেয়া, আমাকে তোর পেশোয়াজ দিতে পারবি? তুই আমার সাজ-পোশাক পরে আমার ঘরে বসে থাক, আমি তোর পোশাক পরে একবার চেহেল্-সুতুনের বাইরে যাবো—

—কেন ছোটি বেগম, বাইরে যাবেন কেন?

ঘসেটি বেগম বললে—শিগ্‌গির দে, আর বখ্‌ত্ নেই, এই-ই আমার সুযোগ। এ-সুযোগ ছাড়লে আর সুযোগ আসবে না জীবনে—

—কিন্তু, যদি কেউ দেখতে পায় আপনাকে ছোটি বেগম? যদি কেউ ধরে ফেলে?

—কে আর ধরবে রে? সবাই তো এই সুযোগই খুঁজছিল। এতদিন পরে যদি সুযোগ এসেছে তো একে আমি ছাড়বো না, দে তোর পোশাকটা দে—

রাবেয়া নিজের পোশাকটা খুলে দিলে ছোটি-বেগমকে।

বহুদিন আগে একদিন ঘসেটি বেগম মনে মনে একটা ক্ষীণ আশা পোষণ

করেছিল যে, একদিন বড় হয়ে তারই ছেলে মুর্শিদাবাদের মসনদে বসবে। ঘসেটি বেগম সেই ছেলের আড়ালে বসে এই বাঙলা-বিহার-উড়িষ্যা মুলুকের মালকিন্ হবে। কিন্তু সে ছেলে চলে গিয়েছিল। তারপর কোলে টেনে নিয়েছিল আমিনার ছেলেকে। সে এক্রামুদ্দৌলা। সেও একদিন মারা গেল। তার এগার বছর বয়েসেই ঘসেটি বেগমের সব আশা চুরমার করে দিয়ে চলে গিয়েছিল। কিন্তু এবার? এবার কেমন করে আমাকে ঠেকাবে তুমি মীর্জা মহম্মদ?

—আপনি এখন কোথায় যাবেন ছোটি-বেগম?

—তোর কোনো ভয় নেই রাবেয়া। আমি ফিরে আসবো। মুর্শিদাবাদের মসনদ এই আমিই নেবো।

—কিন্তু যাবেন কোথায়?

—তুই কাউকে বলবি না বল্?

—না, কাউকে বলবো না ছোটি-বেগম। আমি শুধু জেনে রাখবো—

ঘসেটি বেগমের তখন সাজ-পোশাক বদলানো হয়ে গেছে। বললে—যাবো নজর কুলী খাঁর কাছে—

—নজর কুলী খাঁ?

রাবেয়া জানতো নজর কুলী খাঁর কথা। একদিন সেই নজর কুলী খাঁ-ই কত টাকা কত মোহর ঠকিয়ে নিয়েছে ছোটি বেগমের কাছ থেকে। যেদিন নবাব মতিঝিলে হামলা করে ঘসেটি বেগমকে বন্দী করে নিয়ে চেহেল্-সুতুনে পোরে, সেদিন সেই নজর কুলী খাঁ-ই ঘসেটি বেগমের মোহর-হীরে-জহরৎ-সোনা-চাঁদি ফৌজের সেপাইদের হাত করবে বলে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল, আর আসেনি। আজ এতদিন পরে সেই নজর কুলী খাঁর কাছেই যাবে ছোটি-বেগম?

—তুই একবার বাইরে গিয়ে দেখে আয় তো রাবেয়া, সামনে কেউ আছে কি না—

রাবেয়া মহলটার ফটকে গিয়ে উঁকি মেরে চারদিকে দেখলে। চেহেল্-সুতুনের ভেতরে কারা যেন কথা বলছে। কারা যেন ত্রস্ত পায়ে এদিক থেকে ওদিকে যাচ্ছে। সব ওলোট-পালোট, সব বিশৃঙ্খল হয়ে গেছে চারদিকে। ইনসাফ মিঞা নহবত বাজাতে বাজাতে হঠাৎ থামিয়ে দিয়েছে টোড়ি রাগের আলাপ। আব্ছা-আব্ছা আলো-অন্ধকারের মধ্যে চেহেল্-সুতুনের চেহারাটা যেন আমূল বদলে গেছে। ভোর বেলায় চেহেল্-সুতুনের কোনো স্পন্দন এমনিতেই থাকে না। এমনিতেই সবাই ঘুম থেকে দেরি করে ওঠে। তারই মধ্যে আজ প্রথম ব্যতিক্রম হয়েছে।

ঘসেটি বেগম নিঃশব্দে পা বাড়ালো।

অন্যদিন পাহারাদার মোতায়েন থাকে মহলের ফটকে। কড়া নজর রাখে ঘসেটি বেগমের মহলের ওপর। আজ ফাঁকা রয়েছে সব। কেউ নেই কোথাও। দূরে কোথাও কারো পায়ের শব্দ হলো যেন। ঘসেটি বেগম বাঁদীর বোরখা পরেছে, কারো চিনতে পারার কথা নয়। তবু ভয়ে ভয়ে এগোতে হয়। অথচ আলীবর্দী খাঁর সময়ে এই চেহেল্-সুতুনের মধ্যেই কত প্রতাপ ছিল তার, কত দাপট। নবাবের বড় মেয়ে, কোনোদিন কোনো জিনিস মুখ ফুটে চাইতে হয়নি। না-চাইতে পাওয়াটাই সেই বড় মেয়ের নিয়ম। শুধু যে-একটা জিনিস মন-প্রাণ দিয়ে চেয়েছিল সেইটেই এখনো পাওয়া বাকি রয়েছে। সে এই মসনদ।

—কে? কৌন্?

আগে হলে এক ধমক দিত চেহেল্-সুতুনের ছোটি-বেগম। কিন্তু আজ তার অন্য পরিচয়। আজকের পরিচয় নিয়ে মাথা উঁচু করে কথা বলা বে-মানান। আজকে

শুধু কুর্নিশ করার পরিচয়, আজকে শুধু হুকুম তামিল করার পরিচয় তার।

যে-শব্দটা একবার দূর থেকে আঘাত করেছিল, সে তার সাড়া না পেয়ে আবার আরো জোরে তাগিদ দিলে—কৌন্ হ্যায়?

একবার মনে হলো ধমক দেয় উল্লুকটাকে—দূর বেল্লিক—

কিন্তু তখনই নিজেকে সামলে নিয়ে জবাব দিলে—ম্যায় রাবেয়া হুঁ—

—কৌন্ রাবেয়া?

—ঘসেটি বেগম কি বাঁদী!

আর কোনো বাধা নেই। আর একটা ফটক পেরোতে পারলেই একেবারে বাইরের দুনিয়া। তখন নজর কুলী খাঁ আছে, নিজে আছে, আর আছে মোহর, আর সোনার গয়না। বহু উপহার জীবনে পেয়েছে। বাপজানের কাছ থেকে, রাজা রাজবল্লভের কাছ থেকে, নজর কুলীর কাছ থেকে। বেগমের কাছ থেকে তারা নিয়েছে অনেক, কিন্তু তারই মধ্যে কিছু কিছু উপহার হয়েও ফিরে এসেছে। এতদিন গায়ের গয়না হয়ে সেগুলো তার শুধু রূপের বাহার বাড়িয়েছে, জওয়ানির বাহার বাড়িয়েছে। এবার সেগুলো ইজ্জতের বাহার বাড়াক।

তুমি আমাকে ভয় পেয়ে ছেড়ে চলে গিয়েছিলে নজর কুলী খাঁ। তুমি আমাকে মদৎ দেবে বলে আমার হীরে-জহরৎ-মোহর-সোনা-চাঁদি সবকিছু নিয়ে আর ফিরে আসোনি। কিন্তু তোমার সেই শ্বেত-পাথরের মত হাত-পা-বুক-চোখের কথা আমি ভুলতে পারিনি। আমি শুনেছি তুমি জুয়ায় সব টাকা নষ্ট করেছো, কিন্তু তবু আমি তোমাকে ভুলতে পারিনি নজর কুলী। তুমি কাশী থেকে ফিরে এসে আবার চক্-বাজারের খুলিতে এসে উঠেছো। আমার সঙ্গে কতদিন মোলাকাত করবার জন্যে কোসিস্ করেছো। তখন তোমার সঙ্গে দেখা করবার এক্তিয়ার ছিল না আমার, কিন্তু এবার এক্তিয়ার মিলেছে। এবার তুমি আমাকে মদৎ দাও নজর কুলী খাঁ। এবার আমার দুষমন খতম হয়েছে। নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলা বরবাদ হয়েছে। এই-ই সুযোগ নজর কুলী খাঁ, এই-ই সুযোগ! এবার তুমি আমাকে মদৎ দাও—

চক্-বাজারের রাস্তায় তখন বেশ ভিড়। সবাই কি জানতে পেরেছে নবাব লড়াইতে হেরে ফৌজ ছেড়ে পালিয়ে এসেছে? রাস্তার এক পাশ দিয়ে চলতে চলতে কেমন ভয়-ভয় করতে লাগলো ঘসেটি বেগমের। সবাই জিজ্ঞেস করছে সবাইকে—ক্যা হুয়া হ্যায় ভাইয়া?

তবে কি কেউ জানে না এখনো?

অল্প-অল্প আলো ফুটতে আরম্ভ করেছে পুব দিকের মঞ্জিলের মাথায়। জুম্মা মসজিদের মিনার চারটে ছায়ার মত দাঁড়িয়ে আছে আসমানের গায়ে হেলান দিয়ে। ঘসেটি বেগম আরো জোরে পা চালিয়ে দিলে।

কিন্তু জীবনে কখনো পায়ে হেঁটে যে বাইরে বেরোয়নি, তার কি অত জোরে পা চালানো পোষায়!

পেছন থেকে কারা যেন শিস দিয়ে উঠলো।

ঘসেটি বেগম আরো ভয় পেয়ে গেছে।

—ওরে ইয়ার, চেহেল্-সুতুনের বেগম রে, পায়দলে চলেছে!

—দূর ইয়ার, বেগম নয় রে, বাঁদী ও—

কোনো রকমে তাদের এড়ানো গেল, কোনো রকমে আর কিছু দূর গেলেই নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। তোমার সব পাত্তা আমাকে আমার বাঁদী দিয়েছে, নজর কুলী খাঁ। আমি শুনেছি তুমি খুব কষ্টে আছ। তুমি খুব তক্‌লিফে আছ।

কিন্তু আমি কী করবো বলো? আমাকে যে এতদিন নজর-বন্দী করে রেখেছিল ওই শয়তানটা। আমি কেমন করে তোমার সঙ্গে দেখা করবো বলো?

আজ আমি স্বাধীন, নজর কুলী খাঁ। আমি আমার যা-কিছু আছে সব এনেছি সঙ্গে করে। আমার যে গয়না আছে সঙ্গে, তারই দাম তিন লাখ টাকা। এই তিন লাখ টাকা দিয়ে তুমি ফৌজ বানাও নজর কুলী খাঁ। নবাব এখন ফতুর হয়ে গেছে। নবাবের এখন ফৌজ নেই, টাকা নেই, মোহর নেই, আমীর নেই। এই সময়েই তুমি চেহেল্-সুতুনে হামলা করো। তারপর যেমন করে মীর্জা মহম্মদ হোসেন কুলী খাঁকে খুন করেছে, তেমনি করে তুমি সেই খুনের বদ্‌লা নাও নজর কুলী খাঁ—

ঘসেটি বেগম বোরখার ভেতরে জেবরের পুঁটলিটা ভালো করে আঁকড়ে ধরলো।

—কৌন্ হো তুম?

ঘসেটি বেগম একেবারে সামনা-সামনি পড়ে গেছে একজনের। তাড়াতাড়ি অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে চলে যাচ্ছিল, কিন্তু লোকটা সামনে পথ আটকে দাঁড়ালো।

বললে—কোনো ডর নেই, বলো তুমি কে?

ঘসেটি বেগম বললে—আমি ঘসেটি বেগমের বাঁদী—

—নাম কী?

—রাবেয়া।

বোরখার ভেতর মুখের চেহারা দেখা যায় না। তবু যেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে ভেতরটা দেখবার চেষ্টা করলে লোকটা।

তারপর বললে—কোথায় যাচ্ছো তুমি এখন?

ঘসেটি বেগম কী বলবে বুঝতে পারলে না। অথচ জবাব না দিলেও রেহাই নেই লোকটার হাত থেকে।

—বলো, কোথায় যাচ্ছো তুমি এখন?

—নজর কুলী খাঁর হাবেলিতে!

—নজর কুলী খাঁর হাবেলি কোথায়? সে তো ঝুপড়ি! সে তোমার কে হয়?

—আমার ভাই!

—সেখানে এখন যাচ্ছো কেন?

ঘসেটি বেগমের ইচ্ছে হলো লোকটার গালে এক চড় কষিয়ে দেয়। কিন্তু ধরা পড়ে যাবার ভয়ে চুপ করে রইলো।

—বলো, এখন সেখানে যাচ্ছো কেন?

ঘসেটি বেগম বললে—চেহেল্-সুতুন থেকে পালিয়ে এসেছি, সেখানে গোলমাল বেধেছে।

লোকটা যেন একটু চুপ করে রইলো।

তারপর বললে—নজর কুলী খাঁর বাড়ির রাস্তা তুমি চিনতে পারোনি, রাস্তা ভুল করেছো, তুমি আমার সঙ্গে এসো—

ঘসেটি বেগম তখনো নড়ে না দেখে লোকটা ধমক দিয়ে উঠলো। বললে—এসো—

ঘসেটি বেগম কোনো উপায় না দেখে লোকটার সঙ্গে চলতে লাগলো। আশে-পাশে সবাই তাদের দিকে চেয়ে দেখছে। ভালোই হলো, এবার আর কেউ তাকে বিরক্ত করবে না। লোকটা তাকে ঠিক রাস্তায় পৌঁছে দেবে।

—তুমি আগে কখনো নজর কুলী খাঁর বাড়িতে গিয়েছিলে?

ঘসেটি বেগম বললে—না—

—তবে? তুমি তো মহিমাপুরের দিকে যাচ্ছিলে। ওটা তো মতিঝিলের রাস্তা। আর নজর কুলী খাঁ তো থাকে চক্-বাজারের রাস্তায়—এসো আমি তোমাকে ঠিক জায়গায় পৌঁছিয়ে দিচ্ছি—

ঘসেটি বেগম আর কোনো কথা না বলে লোকটার সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগলো।

কিন্তু নজর কুলী খাঁর বাড়ির সামনে অনেক ডাকাডাকি করেও তাকে পাওয়া গেল না। একটা চাকর বাইরে বেরিয়ে এসে বললে—খাঁ সাহেব কাল রাতে বেরিয়েছে, এখনো বাড়ি ফেরেনি!

—কখন ফিরবে?

—তার কোনো ঠিক নেই বাবুজী! না-ও ফিরতে পারে।

ঘসেটি বেগম কেমন হতাশ হয়ে গেল। এত দূর এসে এত কাণ্ড করেও দেখা হলো না। কিন্তু সময়ও যে আর হাতে নেই। যা কিছু করতে হবে সব যে এখনই করতে হবে। আর দেরি করা চলবে না যে! নবাবী ফৌজ ফিরে আসবার আগেই যে সব খতম করে ফেলতে হবে।

—এখন কোথায় যাবে? চেহেল্-সুতুনে ফিরে যাবে?

ঘসেটি বেগম বললে—না—নজর কুলী খাঁ ফিরে এলে আমি আবার তার সঙ্গে দেখা করতে যাবো—

—কিন্তু ততক্ষণ কোথায় থাকবে? আমার খুলিতে চলো—

বলে আর সম্মতির অপেক্ষা না করে সোজা সারাফত আলির খুশবু তেলের দোকানের পেছন দিকে গিয়ে ডাকলে—বাদ্‌শা—

বাদ্‌শা দরজা খুলে অবাক হয়ে গেছে কান্তবাবুকে দেখে। বললে—কান্তবাবুজী, আপনি? সঙ্গে কে?

—এ চেহেল্-সুতুনের এক বাঁদী, ভাই-এর কোঠিতে যাচ্ছিল, রাস্তা ভুল হয়ে গেছে তাই সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি—এখানে থাকবে।

বাদ্‌শা সামনে গিয়ে কান্তর ঘরের দরজাটা খুলে দিলে। দিয়ে বাইরে চলে গেল। ঘসেটি বেগম তখন ভেতরে ভেতরে থর থর করে ভয়ে কাঁপছে।

কান্ত চারদিকে চেয়ে দেখলে। কেউ কোথাও নেই।

বললে—এবার বলো তুমি কে?

—আমি তো বলেছি আমি রাবেয়া।

কান্ত বললে—সে তো বুঝলাম, এখন সত্যি কথাটা বলো তো—

বলে আর দেরি না করে খপ্ করে বোরখার মুখটা খুলে দিয়েছে। দিতেই দুই হাতে মুখ ঢাকা দিয়েছে ঘসেটি বেগমসাহেবা।

কিন্তু তার আগেই কান্ত স্পষ্ট দেখতে পেয়েছে মুখখানা!

—তুমি তো রাবেয়া নও, বলো তুমি কে?

ঘসেটি বেগম তখন আর্তনাদ করে উঠতে যাচ্ছিল—না—না—না—

—চেঁচিও না, সব জানাজানি হয়ে যাবে। বলো কে তুমি?

ঘসেটি বেগম তখনো মুখ ঢেকে আছে। বললে—কাউকে বলো না তুমি, আমি ঘসেটি বেগম!

ঘসেটি বেগম! এতদিন যার নাম শুনে এসেছে!

তারপর আস্তে আস্তে নিজের মাথায় হাত ঠেকিয়ে বললে—কিছু ভাববেন না, আমি কাউকে বলবো না। আমি নিজেও চেহেল্-সুতুন থেকে পালিয়ে এসেছি—

ঘসেটি বেগম হঠাৎ এতক্ষণে মুখটা তুলে সোজা লোকটার মুখের দিকে তাকালো। দেখতে দেখতে কেমন সন্দেহ হলো। বললে—চেহেল্-সুতুন থেকে পালিয়ে এসেছো? কে তুমি?

—আমার কথাও আপনি কাউকে বলবেন না। আমার নাম মরিয়ম বেগম।

বলে গায়ের জড়ানো উড়ুনিটা খুলে ফেললে। তারপর আবার সেটা গায়ে জড়িয়ে নিয়ে বললে—আমাকে এরা এখানে কান্ত বলে সবাই ডাকবে, আপনি যেন কাউকে বলে দেবেন না।

২৪শে জুন ১৭৫৭ সালের সে ইতিহাস বাঙলা-মুলুকের এক চূড়ান্ত সন্ধিক্ষণের ইতিহাস। ইতিহাস বটে, কিন্তু লজ্জার অগৌরবের আর পরাজয়ের ইতিহাস। সেই দিনটার জন্যে সেদিন বাঙলার মসনদে কোনো নবাব ছিল না। নবাব থাকলেও সে নবাবের কোনো মর্যাদা ছিল না, সে নবাবের কোনো অস্তিত্ব ছিল না, সে নবাবের কোনো অধিকারও ছিল না। ঠিক সেই দিনই মেহেদী নেসার সাহেব এসে পৌঁছেছিল তার নিজামতি অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে। হাতিয়াগড়ের ছোটমশাই হিরণ্যনারায়ণেরও চূড়ান্ত অসম্মান ঘটেছিল সেই দিনটিতেই। মরিয়ম বেগমসাহেবা ঠিক সেই দিনই মতিঝিলের কারা-কক্ষের ভেতরে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। আর ঘসেটি বেগম সেই দিনই চেহেল্-সুতুনের হারেম থেকে বাঁদীর পোশাক পরে চক্‌বাজারের রাস্তায় পায়ে হেঁটে বেরিয়েছিল।

আর ঠিক সেই দিনই বাঙলা বিহার উড়িষ্যার নবাব মীর্জা মহম্মদ সিরাজ-উ-দ্দৌল্লা হেবাৎ জঙ্ শা কুলি খান আলমগীরও হঠাৎ একলা একটা উটের পিঠে এসে দাঁড়িয়েছিল চেহেল্-সুতুনের ফটকে।

এই ফটক দিয়েই মুর্শিদকুলি খাঁ থেকে শুরু করে সুজাউদ্দীন, সরফরাজ খাঁ, আলীবর্দী খাঁ সবাই একদিন ভেতরে ঢুকেছে কিংবা হয়তো বাইরে বেরিয়ে এসেছে, কিন্তু তার আগে আগে চলেছে হাতি, উট, তাঞ্জাম, পালকি, ঘোড়া। নবাবী কেতাদুরস্তে বরাবর নবাবের আগে পিছে ওদের আগমন-নির্গমন অপরিহার্য ছিল। কানুনের এতটুকু হের-ফের হলে পাহারাদার কি খিদ্‌মদ্‌গারের কোতল হয়েছে। কিন্তু সেদিন কিছুই হলো না।

—কৌন্ হো তুম্?

পাহারাদারই বা যাকে-তাকে চেহেল্-সুতুনের ভেতরে ঢুকতে দেবে কেন? তুমি কে? তোমার পাঞ্জা আছে কিনা দেখাও, আগে নিজের নাম-ধাম-কুলুজি পেশ করো, তবে তো ভাববো ভেতরে যাবার এক্তিয়ার তোমার আছে কি না—

সে বেচারিরও দোষ নেই সত্যি! তখন সারা মুর্শিদাবাদ ঝিম্ হয়ে ঘুমোচ্ছে নেশার ঘোরে। সারাফত আলির আরকের নেশা। সে নেশা বড় সাংঘাতিক। একবার সে নেশা করলে রাজ্য-রাজা-বিষয়-ক্ষোভ-কামনা সব কিছু একাকার হয়ে যায়। ঠিক সেই সময় যেন ছায়ার মত কে এল ফটকের সামনে। একটা উটের পিঠের ওপর কে যেন বসে ছিল, সেটাও নজরে পড়েছিল। কিন্তু সে মানুষটা যে

কে তা সেই আব্ছা অন্ধকারে আর ভালো করে দেখতে পায়নি। শুধু অভ্যেসের তাগিদে হাঁক দিয়েছিল—

—কৌন্ হো তুম্?

আর সঙ্গে সঙ্গে খাড়া মাথাটা গলা থেকে খসে যাবার মত হয়েছিল তার। মনে সে যেন সামনে দেখলো।

কিন্তু সামলে নেবার আগেই লম্বা উঁচু উটটা একেবারে সড় সড় করে ভেতরে ঢুকে গেছে। তখন খেয়াল হয়েছে এ তো জাঁহাপনা!

আর দৌড়ে গিয়ে খবরটা দিয়েছে পরের ফটকের চৌকিদারকে। সেও তাজ্জব হয়ে গেছে। তারপর এক কান থেকে আর এক কানে যেতে যেতে নহবত-মঞ্জিলের ইনসাফ মিঞার কানে গিয়েও উঠলো। তখন ইনসাফ মিঞা টোড়ির কোমল রেখাবটা নিয়ে কায়দা করতে গিয়ে হয়রান হয়ে যাচ্ছে, এমন সময় ছোটে সাগ্রেদ বললে—উস্তাদজী, নবাব ফিরে এসেছে—

—নবাব?

ইনসাফ মিঞা দিনরাত সুর নিয়ে মেতে থাকলে কী হয়, নবাবের খবর তাকেও রাখতে হয়। নবাব কোথায় আছে, কী করছে সব খবর আর-সকলের মত ইনসাফ মিঞাও রাখে। সবাই জানতো নবাব লক্কাবাগে ফিরিঙ্গীদের সঙ্গে লড়াই করতে গেছে। কিন্তু ফিরে এল কেন? লড়াই ফতেহ্ হয়ে গেছে?

—না চাচা, নবাব একলা ফিরে এসেছে—

—সঙ্গে ফৌজ নেই?

তাই তো বটে! তখন ইনসাফ মিঞার খেয়াল হলো। এমন তো কানুন নয়। নবাব আলীবর্দী খাঁ যখন উড়িষ্যা থেকে পূর্ণিয়া থেকে নানা দিক থেকে লড়াই ফতেহ্ করে ফিরে আসতো তখনকার কথা তো ইনসাফ মিঞার মনে আছে। ছোটে সাগ্রেদেরও ইয়াদ আছে। এই নবাবও যখন পূর্ণিয়া থেকে নিজের ভাই শওকত জঙ্কে হারিয়ে রাজধানীতে ফিরে এসেছিল তখন অন্য রকম। তবে কি টোড়ি রাগ বন্ধ করবে?

—জয়-জয়ন্তী বাজাবো?

—না উস্তাদজী, ব্যাপার গড়বড় মালুম হচ্ছে—

—কীসের গড়বড়? নবাব হেরে পালিয়ে এসেছে?

—দাঁড়াও উস্তাদজী, আস্লি খবর মালুম করে আসছি—

ইনসাফ মিঞা নবহত বাজানো বন্ধ করে দিলে। ছোটো সাগ্রেদ নহবত-মঞ্জিলের পাথরের সিঁড়ি দিয়ে তর তর করে নীচেয় নেমে এল। নীচেয় নেমে দেখলে চেহেল্-সুতুনের ছোট ফটক ফাঁকা। তারপর বড় ফটকে এল। সেখানেও পাহারাদার নেই। এদিক-ওদিক চারদিক দেখতে লাগলো। মশাল্চিরা ঘুমোয় পাশেই. সেখানে গেল। সেখানেও কেউ নেই। বড় তাজ্জব ব্যাপার তো! সবাই কি রাতারাতি নিজামতের চাকরি ছেড়ে দিলে! তারপর বাইরে থেকে হল্লা কানে এল। রাস্তায় যেন ভিড় জমছে মানুষের। কীসের ভিড়? কেন এত ভিড়?

তারপর দেখা হয়ে গেল খোজা সর্দার পীরালি খাঁর সঙ্গে। পীরালি খাঁ হন্তদন্ত হয়ে দৌড়চ্ছে বাইরের ফটকের দিকে।

ছোটে সাগ্রেদ পেছন পেছন দৌড়ে গেল। কী হয়েছে পীরালি খাঁ সাহেব? নবাব ফিরে এসেছে?

তখন আর পীরালির কথা বলবার সময় নেই। বললে—হ্যাঁ—

—কোথায় যাচ্ছ তুমি খাঁ সাহেব?

—মতিঝিলে। নানীবেগমসাহেবাকে ডাকতে।

—নবাব কি লড়াইতে হেরে ফিরে এসেছে খাঁ সাহেব?

কিন্তু সে কথার উত্তর আর দিলে না পীরালি খাঁ। না দিয়ে অন্ধকারের মধ্যেই অদৃশ্য হয়ে গেল। সেই আবছা অন্ধকারের মধ্যেই ছোটে সাগ্‌রেদ হতভম্বের মত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর আস্তে আস্তে আবার নহবত-মঞ্জিলের সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগলো।

নবাব মীর্জা মহম্মদ তখন চেহেল্‌-সুতুনের ভেতরে ঢুকেছে। চেনা জায়গা। ছোটবেলা থেকে এই চেহেল্‌-সুতুনেই বড় হয়েছে মীর্জা মহম্মদ। সবাই সেখানে তখন অসাড় হয়ে ঘুমোচ্ছে। হাতের কাছে হুকুম করবার মত কেউ নেই। নেয়ামত রয়ে গেছে সেই লক্কাবাগে। নবাবের জীবনের শেষ মর্যাদাটুকু সেই লক্কাবাগেই ফেলে রেখে আসতে হয়েছে হঠাৎ।

আর নেয়ামতকে কিছু বলবার সময়ও তখন ছিল না। যে লোক জীবনে দু'বার আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল তার সঙ্গে লড়াই করবার আগে দু'বার ভাবা উচিত ছিল। ইয়ারজান বলেছিল—ক্লাইভ দু'-দু'বার নিজের হাতে নিজের জান্‌ নিতে গিয়েছিল।

উটটার পিঠ থেকে নবাব নেমে পড়লো। উটটারও কি কম হয়রানি হয়েছে। সেই লক্কাবাগ থেকে ছুটতে ছুটতে এসে শুধু একবার দম নিয়েছিল দাউদপুরে।

ভয় ছিল হয়তো ফিরিঙ্গী-ফৌজ নবাবের পেছু নেবে।

—মরিয়ম বেগমসাহেবা!

সেদিন নবাবের, কেন কে জানে, যেন মনে হয়েছিল সেই বিপদের দিনে এক মরিয়ম বেগম ছাড়া আর তার কেউ নেই। কিন্তু হঠাৎ মনে পড়ে গেল, মরিয়ম বেগমসাহেবা তো চেহেল্‌-সুতুনে নেই। ফিরিঙ্গীদের সঙ্গে লড়াই করতে যাবার সময়ই কানে এসেছিল কথাটা। কেউ বলেছিল মরিয়ম বেগমসাহেবা পালিয়েছে, কেউ বলেছিল ফিরিঙ্গীদের সঙ্গে হাত মিলোতে গেছে কলকাতায়। সেদিন বিশ্বাস হয়নি নবাবের।

তবু একটা দরজার সামনে ঘা দিতে দিতে নবাব ডাকতে লাগলো—মরিয়ম বেগমসাহেবা! মরিয়ম বেগমসাহেবা!

নজর মহম্মদ নবাবকে সামনে দেখে অবাক হয়ে গেছে।

—খোদাবন্দ্‌!

—মরিয়ম বেগমসাহেবার মহল কোথায় রে? কোন্‌ দিকে?

—মরিয়ম বেগমসাহেবা তো মহলে নেই জাঁহাপনা।

—নেই? এখনো ফিরে আসেনি? এত দেরি করছে কেন ফিরতে? কোথায় গেল তোরা খবর রাখিস্‌ না কেন?

কিন্তু কথা বলতে বলতে হঠাৎ যেন খেয়াল হলো নবাবের। খেয়াল হলো যে আজ আর তার কেউ নেই। এতদিন চেহেল্‌-সুতুনের ভেতরে প্রত্যেকটি বেগম ছিল নবাবের নিজের সম্পত্তি। পুরুষানুক্রমে যে সম্পত্তি জমে হয়ে হয়ে চেহেল্‌-সুতুনের পাথরগুলো পর্যন্ত ভারি হয়ে উঠেছিল, আজ সব ফাঁকা। কেউ নেই তার।

—নজর মহম্মদ!

কোনো উত্তর নেই।

আবার ডাকলে নবাব—পীরালি খাঁ, বরকত আলি, নজর মহম্মদ—

সমস্ত চেহেল্-সতুন যেন সেই চিৎকারে গমগম থমথম করে উঠলো। যেন হঠাৎ মুর্শিদাবাদ মসনদের সমস্ত বেহেস্তে-যাওয়া নবাবের প্রেতাত্মা একসঙ্গে সাড়া দিয়ে উঠলো—খোদাবন্দ্!

সাতাশ বছর বয়েসের নবাব চারদিকে চাইতে লাগলো হতবাক্ হয়ে। কে সাড়া দিলে? কে জবাব দিলে? কে? কারা ওরা? কোথায় ওরা?

তারপর মনে পড়লো নানীবেগমসাহেবার কথা। দৌড়ে গেল নানীবেগমসাহেবার মহলের দিকে। এ-সময়ে নানীবেগমসাহেবা জুম্মা মসজিদে নমাজ পড়তে যায়। তবু নানীবেগমসাহেবার মহলের সামনে গিয়ে দরজায় ধাক্কা দিয়ে ডাকতে লাগলো—নানীবেগমসাহেবা, নানীবেগমসাহেবা...

ঘুঙুরের শব্দ করতে করতে কে যেন সামনে এসে দাঁড়ালো। এসে নবাবকে দেখেই ভয়ে চমকে উঠেছে। তারপর কাঁপতে কাঁপতে বললে—নানীবেগমসাহেবা মতিঝিলে গেছে আলি জাঁহা—

—মতিঝিলে? কেন?

—তা মালুম নেই আলি জাঁহা।

সত্যিই নবাবের যেন বিশ্বাস পাকা হলো যে, তার কেউ নেই। আমি অত্যাচার করেছি নানীবেগমসাহেবা, আমি পাপ করেছি। মরিয়ম বেগমসাহেবা, তোমাকেও জানিয়ে রাখি, আমি অন্যায় করেছি। এ-খবর তোমাদের কাছে নতুন নয়, কিন্তু আজ নতুন করে আবার তোমাদের জানিয়ে রাখলুম। আমি চলে যাবার পর তোমরা দুনিয়াকে জানিয়ে দিও, আমি লম্পট, জানিয়ে দিও, আমি পাপী, প্রচার করে দিও আমি স্বার্থপর নীচ চরিত্রহীন! কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তোমরা এ-কথাও প্রচার করে দিও যে, আমি অনুতাপ করেছি। আমি বিশ্বাস করেও অনুতাপ করেছি, অবিশ্বাস করেও অনুতাপ করেছি। ভালবেসেও অনুতাপ করেছি, ঘৃণা করেও অনুতাপ করেছি। অনুতাপের যদি কিছু সুফল থাকে, সেটুকু যেন আমার প্রাপ্য থাকে। তার বেশি কিছু আমি চাই না।

হঠাৎ সামনে যেন কার তাঞ্জাম এসে থামলো।

—নানীজী!

—মীর্জা!

মীর্জা মহম্মদ দুই হাতে নানীবেগমসাহেবাকে একেবারে জড়িয়ে ধরেছে। নানীবেগমসাহেবার দুই চোখ জলে ভরে এল।

বললে—কী হলো রে মীর্জা? এমন করছিস কেন?

—নানীজী, আমি লড়াইতে হেরে গিয়ে ফিরে এসেছি।

নানীবেগম বললে—তাতে কী হয়েছে মীর্জা, তোর নানা অনেকবার এমন করে হেরে গেছে, তুই অত কাঁপছিস কেন?

মীর্জা বললে—আমি যদি সহজে হেরে যেতুম, তা হলে তো আমার দুঃখ থাকতো না নানীজী, আমাকে যে আমার মীর বক্সীরা হারিয়ে দিলে। আমি যে তাদের বিশ্বাস করেছিলুম খুব। এখন কী হবে নানীজী!

নানীবেগম বললে—কোন্ মীর বক্সী? কোন্ মীর বক্সী তোকে হারালে?

মীর্জা বললে—মীর জাফর আলি!

—কিন্তু কোথায় হারালে? কী করে হারালে?

—সব কথা বুঝিয়ে বলবার এখন সময় নেই নানীজী। এরই মধ্যে আমাকে

যা-হোক কিছু ব্যবস্থা করতেই হবে। নইলে তোমার চেহেল্-সুতুন বাঁচবে না, আমি বাঁচবো না, তুমি বাঁচবে না। আমরা কেউ বাঁচবো না নানীজী! মুর্শিদাবাদের মসনদ পর্যন্ত চলে যাবে!

—কে বললে মসনদ চলে যাবে?

বলে নানীবেগমসাহেবা নিজেকে মীর্জার হাত থেকে ছাড়িয়ে নিলে। তারপর বললে—পীরালি—

পীরালি আর বরকত আলি পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। সামনে এসে দাঁড়ালো। বললে—নহবত-মঞ্জিলে নহবত থামালে কেন ইনসাফ মিঞা?

এতক্ষণে যেন সকলের খেয়াল হলো। সত্যিই তো নহবত তো বাজছে না আর!

—নবাব লড়াই থেকে ফিরে এলে কি নহবত থেমে যায়? যা, বাজাতে বল গে যা—যা—

ছোটে সাগ্রেদ তখন ইনসাফ মিঞার সামনে বসে নিচের রাস্তার দিকে চেয়ে দেখছে। এ কি তাজ্জব ব্যাপার ঘটছে তার চোখের সামনে! মুর্শিদাবাদে তো এমন ঘটনা ঘটেনি কখনো আগে। সমস্ত কিছু ওলোট-পালোট হয়ে যাবে নাকি। একটু আগেই নানীবেগমসাহেবার তাঞ্জাম বেরোল চেহেল্-সুতুনের ফটক থেকে, আবার খানিক পরেই চেহেল্-সুতুনে ফিরে এল।

—কী হবে চাচা?

বুড়ো ইনসাফ মিঞাও হতবাক্ হয়ে গেছে। এমন করে কখনো তাকে সুরের মুখ চাপা দিতে হয়নি।

হঠাৎ বরকত আলি সিঁড়ি দিয়ে তর-তর করে ওপরে উঠে এসেছে।

—কী হলো মিঞা সাহেব, নহবত থামলো কেন? বাজাও—বাজাও—

দুজনেই অবাক হয়ে গেছে বরকত আলিকে দেখে। বরকত আগে কখনো নহবত-মঞ্জিলে এসে এমন করে হুকুম করেনি তাদের।

—কী হলো বরকত?

—নানীবেগমসাহেবা জিজ্ঞেস করছে, নহবত থামলো কেন? বাজাতে বলছে!

—তা শুনলাম নাকি নবাব লড়াইতে হেরে ফিরে এসেছে?

বরকত আলি রেগে গেল।

—দূর মিঞাসাহেব, নবাব কখনো লড়াইতে হারতে পারে? লড়াই চলছে লক্কাবাগে, ফিরিঙ্গী হারামদের সাধ্যি কি নবাবকে হারায়? বাজাও, তোমরা বাজাও—

—বাজাবো?

—হ্যাঁ, বাজাবে না তো কি চুপ করে বসে থাকবে? দেখছো না নহবত বন্ধ হয়েছে, রাস্তায় ভিড় জমছে, হল্লা হচ্ছে?

তাই তো বটে! ইনসাফ মিঞা বুড়ো হয়ে গিয়েছিল। হয়তো নতুন জমানার কানুন বুঝতে পারেনি। জমানা বদলে যাচ্ছে। নবাব আলীবর্দী খাঁর জমানার কানুন নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলার জমানায় চলবে কেন? তাই তো বটে।

বরকত আলি আবার তর-তর করে সিঁড়ি বেয়ে নিচেয় নেমে গেল।

এবার ইনসাফ মিঞা ধরলে—জয়-জয়ন্তী—

ছোটে সাগ্রেদ সুরটা শুনেই তবলায় জোরসে চাঁটি মারলে—কেয়াবাৎ—কেয়াবাৎ—

এমন যে হবে মরিয়ম বেগমও তা বুঝতে পারেনি। কোথায় ত্রিবেণীর ঘাট, সেখান থেকে মোল্লাহাটি। মোল্লাহাটিতেই যদি পালাতে পারতো তা হলে আর ধরা পড়তো না মেহেদী নেসারের হাতে। সেখান থেকে সোজা আবার এই মতিঝিলে।

তারপর?

তারপরের কথা ভাবতে গিয়ে ঘরখানার চারদিকে একবার চেয়ে দেখছিল। এ-ঘরটায় কখনো আগে ঢোকেনি মরালী। চারদিকে ইট দিয়ে, পাথর দিয়ে শক্ত করে গাঁথা। তখন বুঝতেই পারেনি যে, এখান থেকে আবার বেরোতে পারবে কোনো দিন।

বাইরে সচ্চরিত্র পুরকায়স্থ মশাইকে দেখে শুধু চিৎকার করে উঠেছিল। বলেছিল—নানীবেগমসাহেবাকে একবার খবরটা দিন ঘটক মশাই—

কিন্তু তারপর অনেকক্ষণ কেটে গিয়েছিল। কেউ-ই আসে না।

হঠাৎ যখন দরজা খুললে, তখন দেখে অবাক হয়ে গেল। নানীবেগম নয়—কান্ত। আর তার পাশেই দাঁড়িয়ে সচ্চরিত্র পুরকায়স্থ মশাই।

—এ কি, তুমি?

কান্ত চাপা গলায় বললে—মরালী শিগ্‌গির করো, আর সময় নেই, কেউ এসে পড়বে, তুমি এখান থেকে পালাও—

—পালাবো?

মরালীর যেন তখনো বিশ্বাস হচ্ছিল না।

—কী করে দরজা খুললে?

সচ্চরিত্র বললে—আমি খুলেছি মা, আমার কাছে নেয়ামত সব ঘরের চাবি দিয়ে গিয়েছিল।

কান্ত বললে—তুমি আর আপত্তি করো না মরালী—

—কিন্তু মেহেদী নেসার কোথায়? বশীর মিঞা কোথায়?

—তারা এখন অন্য দিকে চলে গেছে। নানীবেগম এসেছিল এখানে, মেহেদী নেসারও এসেছিল, তোমাকে ছেড়ে দেবার জন্য নানীবেগমসাহেবা মেহেদী নেসারকে হুকুম করেছিল। কিন্তু হঠাৎ নবাব এসে পড়ার খবর পেয়ে দুজনেই চলে গেছে—

—নবাব? নবাব কোথা থেকে এল?

—হ্যাঁ, শুনছি তো নবাব এসেছে। তাই বাইরের রাস্তায় অত হই-চই হল্লা হচ্ছে! এখনি হয়তো নবাব মতিঝিলে এসে পড়বে, তার আগেই তুমি চলে যাও।

—আর তুমি? তোমাকে ছেড়ে দিলে কেন ওরা?

—আমাকে ছাড়েনি মরালী, আমি টাকা দিয়ে তোমাকে ছাড়াবার জন্য সারাফত আলির দোকানে গিয়েছিলাম, এদিকে রাস্তার হল্লা শুনে বশীর মিঞা অন্য ধান্ধায় চলে গেছে। বোধ হয় নিজামত এবার উলটে যাবে।

—তার মানে?

—তার মানে আমি জানি না। চারদিকে ব্যাপার দেখে খুব ভয় হচ্ছে। কিন্তু ও-সব কথা ভাববার আর সময় নেই এখন। এমন সুযোগ আর আসবে না। শুনছো নহবত-মঞ্জিলে বাজনা থেমে গেছে?

—কিন্তু আমি পালাবো কী করে? কেউ পাহারাদার নেই এখানে?

—পাহারাদাররা আছে, কিন্তু এই সচ্চরিত্র পুরকায়স্থ মশাইকে ওরা সবাই খুব বিশ্বাস করে। উনি এখন ইব্রাহিম খাঁ। তোমাকে ওর হেপাজতে রেখেই ওরা চলে গেছে—

—কিন্তু ছোটমশাই-এর খবর কী?

—ছোটমশাইও এখানেই আছেন।

—তা হলে তাকে আগে ছেড়ে দাও—

—তাকেও ছেড়ে দেবো, কিন্তু তুমি আগে এসো।

—তা হতে পারে না। তিনি এখানে থাকলে আমি ছাড়া পেয়ে কোনো লাভ নেই। আর তা হলে ছোট বউরানীর জন্যে আমি কেন এত কিছু করতে গেলুম?

কান্ত সচ্চরিত্র পুরকায়স্থর মুখের দিকে চাইলে।

—আপনি ছোটমশাইকে ছাড়তে পারবেন পুরকায়স্থ মশাই?

কিছুক্ষণ ভাবতে লাগলো পুরকায়স্থ মশাই। এই চাকরি, এই ধর্মান্তর, এই অবমাননা, এই দুর্যোগ, সমস্ত কিছু মাথার ওপর চেপে বসলো। থরথর করে কাঁপতে লাগলো বুড়ো মানুষটা। সবই তো ছাড়তে হয়েছে জীবনে। যারা তার আপন জন ছিল, তারাও পর হয়ে গেছে। শেষে যেটা আছে, সেটা তার পেট। সেই পোড়া পেটটা নিয়েই এতদিন এখানে সরাবখানার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে! সেটাও যদি খোয়াতে হয়, তা হলে কোথায় মাথা গোঁজবার একটা ছাদ আর দুমুঠো অন্ন সে পাবে?

কিন্তু হঠাৎ যেন সচ্চরিত্র পুরকায়স্থর শরীরে যৌবনের শক্তি ফিরে এল। এতদিনের সব অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্তের কথাটাও মনে এল।

বললে—ঠিক আছে বাবাজী, তাই-ই ঠিক রইলো, আমি ছোটমশাই-এর ঘরের তালাটাও খুলে দিচ্ছি—

—তা হলে আপনার কী হবে? আপনাকে যদি...

সচ্চরিত্র বললে—সে যা-হয় হবে বাবাজী! আমি ঈশ্বর ইন্দীবর ঘটকের পুত্র, ঈশ্বর কালীবর ঘটকের পৌত্র, এমনিতেই তো আমার পিতৃপুরুষ আমার হাতে জল পাচ্ছেন না, আমার আর কী ক্ষতি করবে ওরা? আমি যাচ্ছি—

বলে সচ্চরিত্র অন্য দিকে চলে গেল।

কান্ত বললে—এবার তো আর তোমার কোনো আপত্তি নেই?

—কিন্তু তুমি?

কান্ত বললে—আর তুমি আমার কথা ভেবো না। আমি পুরুষমানুষ, আমি যেমন করে হোক, এখান থেকে পালিয়ে যাবোই। এখন যা অবস্থা, তাতে তোমাকে এ-অবস্থায় রেখে আমি কোথাও যেতে পারবো না—

—কিন্তু আমিই বা কোথায় যাবো?

কান্ত বললে—কেন, আজকের জন্যে তুমি তো সারাফত আলির দোকানে গিয়ে থাকতে পারো। সেখানে বাদ্‌শা আছে, সে তোমাকে আমার ঘরে থাকতে দেবে। তুমি তো সে-দোকান চেনো, তুমি তো একদিন আমার খোঁজে সেখানে গিয়েছিলে। দোকানের পেছন দিকে গিয়ে 'বাদশা' বলে ডাকলেই সে দরজা খুলে দেবে। তারপর যখন অবস্থা শান্ত হয়ে আসবে তখন আমিও এখান থেকে চলে গিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করবো। ওই সচ্চরিত্র পুরকায়স্থ আছে, ও থাকতে কোনো ভয় নেই।

মরালী জিজ্ঞেস করলে—কিন্তু কতদিন পরে তুমি আসবে?

—বেশি দিন নয়। মেহেদী নেসার সাহেব বাইরে কোথাও চলে গেলেই আমি সেই সুযোগে এখান থেকে পালিয়ে যাবো।

—কিন্তু এখন চলে গেলে ক্ষতিটা কী? দুজনে এক সঙ্গে গেলেই বা কে দেখছে?

—না, তাহলে মেহেদী নেসার সাহেব যদি এখনি ফিরে এসে মরিয়ম বেগম-সাহেবাকে না দেখতে পায় তো সচ্চরিত্র পুরকায়স্থ মশাইকে কোতল করবে। ও বেচারি না থাকলে তোমাকে আজ এমন করে বাঁচাতে পারতাম না, ছোটমশাইকেও ছাড়াতে পারা যেত না।

মরালী বললে—কিন্তু ছোটমশাইকে দেখতে না পেলে যদি পুরকায়স্থ মশাইকে হেনস্থা করে?

—না, অতটা করবে না, যতটা করবে মরিয়ম বেগমকে না দেখতে পেলে! আমি তো রইলুমই!

—কিন্তু আমার যে বড় ভয় করছে! এতে তোমার কোনো ক্ষতি হবে না তো?

কান্ত বললে—কিন্তু আমার তো মনে তৃপ্তি হবে মরালী যে, তুমি নিরাপদে আছ। একবার এখান থেকে বেরিয়ে গেলে আর কখনো যেন মুর্শিদাবাদে এসো না। এ বড় খারাপ জায়গা। আমিও আর কখনো এখানে আসবো না। তুমিও এসো না।

—তারপর?

ঘসেটি বেগম সমস্ত কাহিনীটা এতক্ষণ শুনছিল। বললে—তারপর কী হলো?

মরালী বললে—তারপর তাকে সেই মতিঝিলের ঘরের মধ্যে রেখে আমি তার জামা-কাপড় পরে চলে এলাম। আমাকে এখন এখানেই থাকতে হবে যতদিন না ও আসে। রাস্তায় আসতে আসতে খুব ভয় করছিল। ভাবছিলাম কেউ ধরতে পারবে কি না। কিন্তু কান্ত আমাকে সব বলে স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিয়েছিল। আমার বুঝতে কোনো কষ্ট হয়নি। দেখলাম সবাই নিজামত নিয়ে ব্যস্ত, সবাই নবাব নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে। আমি বেটাছেলে বলে আমার দিকে কেউ বিশেষ নজর দিলে না। কিন্তু আপনাকে দেখে আমার কেমন সন্দেহ হলো বেগমসাহেবা। আমি এতদিন চেহেল্-সুতুনে ছিলাম, আমি হাঁটা-চলা দেখে বুঝতে পারি কে বাঁদী কে বেগম। আপনি আমার চোখকে ঠকাতে পারেননি বেগমসাহেবা!

—তাহলে এখন কী করবে?'

মরালী বললে—আপনি এখানে থাকুন, আমি দেখে আসছি আপনার নজর কুলী খাঁ বাড়িতে এসেছে কি না—আপনি কারো সঙ্গে কিছু কথা বলবেন না। বোরখা পরে বসে থাকুন। বাদ্‌শা আমাকেও চিনতে পারেনি, আপনাকেও চিনতে পারবে না—

বলে আবার বাইরে এল। বুড়ো সারাফত আলি সাহেবের কাশির শব্দ পাওয়া গেল পাশের ঘরে। হয়তো ঘুম থেকে উঠেছে। ও নিশ্চয় সারাফত আলির গলা।

—আবার কোথায় চললে কান্তবাবু?

বাদ্‌শা উনুনে কাঠ দিয়েছে। আগুন ধরাবে।

—আমি এখ্খুনি আসছি বাদ্‌শা। বাঁদীটা রইলো, ওকে যেন বিরক্ত কোর না তুমি, দেখো। আমি যাবো আর আসবো—দরজাটা ভেজিয়ে দাও—

বলে মরালী গায়ের চাদরটা ভালো করে জড়িয়ে নিয়ে চক-বাজারের রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো। নহবত-মঞ্জিল থেকে হঠাৎ আবার নহবতের সুর বেজে উঠতে সেই দিকেই চলতে লাগলো। নহবত আবার বাজতে শুরু করলো কেন?

মহিমাপুরে জগৎশেঠজীর বাড়ির সমনে সেদিনও ভিখু শেখ পাহারা দিচ্ছিল। হঠাৎ একটা চেনা-চেনা মুখ দেখে অবাক হয়ে গেল।

—কে? কৌন্?

পালকি নেই, তাঞ্জাম নেই, পোশাক-পরিচ্ছদের বাহারও নেই। কিন্তু তবু দেখে মনে হলো রেইস্ আদমি। রেইস্ আদমিদের ওপর ভিখু শেখের টানটা বেশি!

লোকটা জিজ্ঞেস করলে—শেঠজী হাবেলিমে হ্যায়?

—জী হাঁ!

তারপর তড়ি-ঘড়ি ভেতরে নিয়ে গেল। দেওয়ানজীর সঙ্গে দেখা হলো। দেওয়ানজী কিন্তু দেখেই চিনতে পারলে।

অবাক হয়ে বললে—ছোটমশাই আপনি?

ছোটমশাই বললে—আমি এখ্খুনি মতিঝিল থেকে ছাড়া পেয়ে আসছি, শেঠজীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। কিন্তু আমার স্ত্রীকে ওখানে এখনো আটক করে রেখেছে।

—কে?

—ওই, যাকে ওরা মরিয়ম বেগম বলে! আমাদের দুজনকেই এক সঙ্গে মেহেদী নেসার ধরেছিল, কিন্তু আমি ছাড়া পেয়ে চলে এসেছি। এখন জগৎশেঠজীর সঙ্গে দেখা করে এর বিহিত করতে চাই।

দেওয়ানজী বললে—আপনি বসুন, আমি জগৎশেঠজীকে খবর পাঠাচ্ছি। বলে বাইরে চলে গেল।

রণজিৎ রায় মশাই জগৎশেঠজীর ডান হাত। নবাবের সঙ্গে যখনই তাঁর বিরোধ বেধেছে তখনই পরামর্শ দিয়েছে রণজিৎ রায়। কলকাতায় যখন প্রথমবার যুদ্ধ বেধেছিল তখনো দেওয়ান রণজিৎ রায় মশাই গিয়েই সব মিটমাট করে দিয়েছিল।

ছোটমশাই তা জানতো। কিন্তু ভেতরের খবর কিছুই জানতো না। ভেতরে ভেতরে যে এত কাণ্ড হয়ে গেছে, হাতিয়াগড়ের ডিহিদার রেজা আলি সাহেব যে একদিন আগে মুর্শিদাবাদে এসে সব ফাঁস করে দিয়েছে তাও জানতো না।

জগৎশেঠজী যখন ঘরে এলেন তখনো ছোটমশাই কিছু খবর পায়নি।

ছোটমশাই বললে—আমার সহধর্মিণীকে মেহেদী নেসার ওই মতিঝিলেই আটক করে রেখেছে যে—

জগৎশেঠজী বললেন—কে বললে আপনাকে?

—আমি নিজের চোখে দেখেছি! সে-সব কথা তো আপনাকে সবই বললুম। মেহেদী নেসার আমাকে আগে ধরেছিল, তারপর মোল্লাহাটির কাছে গিয়ে আমার

সহধর্মিণীকেও ধরে। তখন আমার স্ত্রী ওদের নৌকোটা দেখতে পেয়ে ডাঙায় ঝাঁপ দিয়ে পালাতে যাচ্ছিল—

—আপনার স্ত্রী একলা ছিলেন?

—না, সংগে আর একজন কে ছিল। তাকে চিনতে পারিনি।

—তারপর?

—তারপর সেখান থেকে আমাদের ধরে নিয়ে মতিঝিলে এনে রাখে। কয়েক ঘণ্টা আমি ওখানেই ছিলাম, ভাবলাম মেহেদী নেসারের হাতে যখন পড়েছি তখন আর আমার রেহাই নেই। কিন্তু কে একজন হঠাৎ এসে আমার দরজার চাবি-তালা খুলে দিলে—

—কে সে?

—তা জানি না। মুখময় দাড়ি, খুব বুড়ো একজন মুসলমান-খিদ্‌মদ্‌গার।

—নেয়ামত, সেও কি এর মধ্যে ফিরে এল নাকি? কী বললে সে?

ছোটমশাই বললে—কিছু বললে না। আমার ঘরের ফটকটা খুলে দিয়ে চলে গেল। তাকে আর দেখতে পেলুম না। ভাবলাম আমার সহধর্মিণীকে কোথায় আটকে রেখেছে সেটা একবার দেখে আসি। কিন্তু আর সাহস হলো না ওখানে থাকতে। তাই ছাড়া পেয়েই বাইরের রাস্তায় বেরিয়ে পড়লুম। দেখলুম চারদিকে লোক-জন গম্‌গম্‌ করছে। লোকেরা বলাবলি করছে নবাব নাকি লক্ষাবাগের যুদ্ধে হেরে চলে এসেছে রাতারাতি। সকলের ভয় হয়ে গেছে, হয়তো নিজামতি চলে যাবে—কেউ-কেউ বলছে কর্নেল ক্লাইভ নাকি ফৌজ নিয়ে মুর্শিদাবাদের দিকে রওনা দিয়েছে—

জগৎশেঠজী চুপ করে শুনছিলেন। কিন্তু উত্তর দিলেন না।

ছোটমশাই জিজ্ঞেস করলে—আপনি কিছু শোনেননি?

জগৎশেঠজী বললেন—সবই শুনেছি, শুধু শুনেছি নয়, নবাবের কাছ থেকে ডাকও এসেছে আমার...

ছোটমশাই চমকে উঠলো।

—তাই নাকি? নবাব আপনাকে ডাকলেন কেন?

—আমার কাছে তো সবাই টাকার জন্যেই আসে। আমার সব চেয়ে বড় খাতির আমার টাকার জন্যে। তাই এখন বিপদে পড়ে আমাকেই স্মরণ করতে হয়েছে।

ছোটমশাই বললে—আপনি টাকা দিচ্ছেন নাকি?

—সেই কথাই ভাবছিলাম। ভাবছিলাম নবাবের সামনে গিয়ে কী বলবো। একবার সকলের সামনে আমার মুখে চড় মেরেছিল নবাব। আমাকে ফাটকের মধ্যে আটকে রেখেছিল, সে কথা আমি ভুলিনি।

—এখন নবাবের কী-রকম অবস্থা?

জগৎশেঠজী বললেন—তা জানি না, এখন সকলকে ডেকে পাঠাচ্ছেন। রাত চার প্রহরের সময় নাকি হঠাৎ চেহেল্-সুতুনে এসে পোঁছেছেন। কেউ তাঁকে চিনতে পারেনি শুনছি। কী করেই বা চিনতে পারবে? কী করে কল্পনা করবে যে, নবাব ওই শেষ রাত্রের দিকে একলা উটের পিঠে চড়ে চেহেল্-সুতুনে ঢুকবেন! সবাই তখন যে-যার জায়গায় মড়ার মত ঘুমুচ্ছে। নহবত-মঞ্জিলে ইনসাফ মিঞা নহবত্ বাজাচ্ছিল, সে-ও গোলমাল শুনে বাজনা থামিয়ে দিয়েছিল। নানীবেগমসাহেবাও নাকি শুনছি চেহেল্-সুতুনে ছিল না—

—কিন্তু আপনি না-হয় সব খোঁজ-খবর পান, কিন্তু লোকে এ-সব খবর কী

করে পেলে? আমি যখন গঙ্গার ঘাট থেকে আসছিলাম তখনই সেই শেষ-রাত্তিরের দিকেই মনে হয়েছিল চক-বাজারের রাস্তায় হই-হল্লা করছিল—

—আর একটা কথা—

ছোটমশাই বললে—কী?

—আপনি জানেন কি না জানি না। এদিকে তো এই গন্ডগোল, ওদিকে আবার শুনলাম আপনার হাতিয়াগড়ের ডিহিদার রেজা আলিটা হঠাৎ এই হট্টগোলের মধ্যে এসে পৌঁছেছে—

—সে কী? তার আবার কী মতলব? সে কি খবর পেয়েছে নাকি নবাবের ব্যাপার?

জগৎশেঠজী বললেন—সে কী করে খবর পাবে? সে নিশ্চয় এসেছিল নিজের কোনো মতলব হাসিল করতে! এসে দেখে এই কাণ্ড!

ছোটমশাই বললে—আমার তো শুনে ভয় করছে জগৎশেঠজী! আমি তো হাতিয়াগড় একলা ছেড়ে এসেছি। সেখানে খাজাঞ্চীবাবুর হাতে সব ভার দিয়ে এখানে এসে ঘুরছি। আমার এত ঘোরাঘুরি দেখছি সব পন্ডশ্রম হলো। আপনিই আমাকে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের কাছে পাঠিয়েছিলেন, আপনিই আমাকে ক্লাইভ সাহেবের কাছে পাঠিয়েছিলেন। কোথায় সেই হাতিয়াগড় আর কোথায় সেই কলকাতা, আর কোথায় সেই কেষ্টনগর, আর কোথায়ই বা এই মুর্শিদাবাদ! এবার দেখছি আর বোধ হয় কোনো আশা নেই। আপনি ঠিক ভালো-রকম জানেন রেজা আলি এসেছে?

জগৎশেঠজী বললেন—শুধু এসেছে নয়, মেহেদী নেসারের সঙ্গে দেখাও করেছে—

ছোটমশাই বড় ভাবনায় পড়লো।

বললে—আমি তাহলে এখন কী করবো পরামর্শ দিতে পারেন? হাতিয়াগড়ে চলে যাবো?

জগৎশেঠজী বললেন—আপনার স্ত্রীকে যখন ওরা মতিঝিলে আটকে রেখেছে দেখে এলেন তখন সেখানে গিয়েই বা কী করবেন? বরং তাকে ছাড়িয়ে নেবার কোনো ব্যবস্থা করা যায় কি না সেই চেষ্টাই দেখুন না—

—সে কী করে হবে?

জগৎশেঠজী বললেন—দেশে এখন যা অবস্থা তাতে সব কিছু টল্‌মল্‌ করছে, এখন তো মুর্শিদাবাদের মসনদই থাকে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। এই অবস্থাতে চেষ্টা করলে হয়তো কিছু সুরাহা হলেও হতে পারে—

—কী করবো তাই বলুন?

জগৎশেঠজী বললেন—বহুদিন আগে আপনার সহধর্মিণী একবার আমার এখানে এসেছিলেন, সে তো আপনি জানেন—আমাকে বলে গিয়েছিলেন যে, চক্‌-বাজারের খুশ্‌বু তেলের দোকানের মালিক সারাফত আলির বাড়িতে একটা লোক থাকে, তার নাম কান্ত, তার কাছে খবর দিলেই আপনার সহধর্মিণীর কাছে তা পৌঁছোবে—

ছোটমশাই বললে—বহুদিন আগে তো একবার গিয়েছিলাম সেখানে, সেদিন ছিল না সে-লোক—

—এখনি আর একবার যান না,—দেখুন না পান কিনা তাকে। সে হয়তো কিছু খবর দিতে পারে। যদি না পান তো আবার ফিরে আসবেন। ততক্ষণ আমি

একবার নবাবের সঙ্গে দেখা করে আসি—জরুরী তলব দিয়েছে আমাকে নবাব—

—ঠিক আছে—বলে ছোটমশাই আবার বেরোল। তখন বেশ ফর্সা হয়ে গেছে চারদিক। রাস্তায় আরো লোক নেমেছে।

ছোটমশাই চলে যাবার পর জগৎশেঠজীর তাঞ্জামও বেরোল। ক'দিন থেকেই ঘুম হচ্ছিল না জগৎশেঠজীর। দেওয়ানজী, খাজাঞ্চী, মোহরার, সবাই ক'দিন ধরে বড় ব্যস্ত। একটা কিছু যুদ্ধ-বিগ্রহ হলেই টাকা দিয়ে নবাবকে মদত্ দিতে হয়। সেইটেই নিয়ম। লক্কাবাগে ফিরিঙ্গীদের সঙ্গে লড়াই করতে যাবার আগে দিতে হয়েছে টাকা। ফৌজের লোকেরা টাকা না নিয়ে লড়াই করতে যাবে না বলে বেঁকে বসেছিল। মীরজাফর আলি খাঁ আড়ালে টাকা দিতে বারণ করেছিল। কিন্তু টাকা না দিলে কি আর তখন পার পাওয়া যেত?

শুধু মীরজাফর আলি সাহেব নয়। ইয়ার লুৎফ খাঁ, রাজা দুর্লভরাম, সবাই-ই বলেছিল—আপনি যদি এখন টাকা দেন তো লড়াই থেকে ফিরে এসে আমাদের সকলকে কোতলী করবে নবাব—

সত্যিই তখন সবাই ভয় দেখিয়েছিল, এতদিনের সব ষড়যন্ত্র সব আয়োজন নষ্ট হবে। তাই নবাব ফৌজ নিয়ে চলে যাবার পর থেকেই উদ্বেগে আর অশান্তিতে দিন কেটেছে। কাল সকালেও খবর এসেছে, নবাবের মন-মেজাজ খারাপ। মেহেদী নেসার সাহেব নবাবের সঙ্গেই সারা রাস্তা গিয়েছিল। তাকেও নাকি নবাব বলেছে—ফিরে এসে সকলকে শায়েস্তা করবে। সেখানে গিয়ে কে যেন নবাবের সোনার কলকেটা চুরি করে নিয়েছিল, সে-খবরও এসেছিল। তারপর বৃষ্টিতে গোলা-বারুদ ভিজে গিয়েছিল, তাও কানে এসেছিল। তারপরে সারা রাত আর কোনো খবর আসেনি। দেওয়ানজী দফ্তরে বসেছিল সারা রাত। খবর এলেই যাতে বাড়ির ভেতরে শেঠজীর কাছে পোঁছে দেওয়া যায়। কিন্তু, না, আর কোনো খবরই আসেনি।

শুধু ভোর রাত্রে খবর এল নবাব রাজধানীতে ফিরে এসেছে। সঙ্গে কেউ ছিল না। একটা উটের পিঠে চড়ে একলা চেহেল্-সুতুনে ঢোকবার সময় কেউ নাকি চিনতেও পারেনি নবাবকে।

তারপরেই খবর এল জগৎশেঠজীর ডাক পড়েছে নবাবের আম-দরবারে—

আর তারপরেই হাতিয়াগড়ের হিরণ্যনারায়ণ রায় এসে হাজির।

রাস্তায় সত্যিই লোক-জনের বড় ভিড়। জগৎশেঠজীর তাঞ্জাম মুর্শিদাবাদের মানুষরা চেনে। সামনে চলেছে জগৎশেঠজীর নিশানা লাগানো পাইক। ভিড় হটাতে হটাতে তারা আগে আগে চলেছে। চেহেল্-সুতুনের আম-দরবারের ফটকে এসে তাঞ্জাম থামতেই জগৎশেঠজী নামলো। তারপর খিলেন-দেওয়া ইটের থামের মধ্যে দিয়ে চলতে লাগলো দরবার-ঘরের দিকে। সব যেন চারদিকে ছন্নছাড়া ভাব। চারদিকে ফিস-ফিস গুজ-গুজ শব্দ। মনসুর আলি মেহের, নিজামতের মোহরার জগৎশেঠজীকে দেখেই মাথা নিচু করে কুর্নিশ করলে।

—বন্দেগী শেঠজী—

—নবাব ডেকেছে কেন মোহরার?

মনসুর আলি মেহের সাহেব বললে—শুধু আপনাকে নয় শেঠজী, নবাব আমাদেরও ডেকেছেন, সবাইকে ডেকেছেন। মেহেদী নেসার সাহেবকেও ডেকেছেন। মুর্শিদাবাদে যত আমীর-ওমরাও আছে সকলকে ডেকেছেন!

—কিন্তু কী দরকার নবাবের? লক্কাবাগের লড়াইতে কী হলো? মীরজাফর

আলি সাহেব কোথায়? তারা কেউ আসেনি?

মনসুর আলি মেহের আরো কাছে সরে এল। মুখের কাছে মুখ নিচু করে বললে—ফিরিঙ্গী ক্লাইভ সাহেব মুর্শিদাবাদের দিকে এগিয়ে আসছে শেঠজী, আর কিছু ভয় নেই আমাদের—

—কিন্তু জেনারেল ল' সাহেবের যে ফৌজ নিয়ে আসবার কথা ছিল?

—সে আর আসছে না শেঠজী! আপনার কাছে টাকা চাইলে আপনি যেন আবার সেবারের মত টাকা দিয়ে দেবেন না?

জগৎশেঠজী সে-কথার উত্তর না দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—তুমি ঠিক জানো জেনারেল ল' সাহেব আসছে না?

—হ্যাঁ শেঠজী, বিলকুল ঠিক। কিন্তু আপনাকে বলে রাখছি শেঠজী, আলি জাঁহা আপনাকে ডেকেছে টাকার জন্যে। আপনি যেন এবার আর টাকা দেবেন না সেবারের মত—

—কিন্তু টাকা নিয়ে আলি জাঁহা কী করবে?

—ফৌজ বানাবে! নতুন ফৌজ নিয়ে ফিরিঙ্গীদের সঙ্গে ফিন্ লড়াই করবে।

—ফৌজ বানাবে? নতুন ফৌজ?

—হ্যাঁ শেঠজী, আমাকে মেহেদী নেসার সাহেব আপনার সঙ্গে দেখা করে বলতে বলেছে সব।

জগৎশেঠজী খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন।

তারপর বললেন—মীরজাফর আলি সাহেব এখন কোথায়?

—দাউদপুরে। দাউদপুরে ক্লাইভ সাহেব মীরজাফর আলি সাহেবকে ডেকে পাঠিয়েছে। সেখানে মীরজাফর আলি সাহেব আছে, তাঁর ছেলে মীরন সাহেব আছে, মীর্জা ওমর বেগ আছে, আর স্ক্র্যাফ্টন সাহেব আছে। ক্লাইভ সাহেব মীরজাফর আলি সাহেবকে বাঙলা-বিহার-উড়িষ্যার সুবাদার বলে স্বীকার করে নিয়েছে—

জগৎশেঠজী চম্‌কে উঠলেন।

বললেন—তাই নাকি? তারপর?

—তারপর মীরজাফর আলি সাহেব আর মীরন সাহেব রওয়ানা দিয়েছে দাউদপুর থেকে। মুর্শিদাবাদের দিকে আসছে খবর এসে গেছে। তাদের পথ আটকাবার জন্যেই আলি জাঁহা ফৌজ বানাতে চাইছেন রাতারাতি—

হঠাৎ নেয়ামত দৌড়তে দৌড়তে আসছিল, জগৎশেঠজীকে দেখে কুর্নিশ করে বললে—নবাব শেঠজীকে এত্তেলা দিয়েছেন, আপনাকে ডাকতেই আমি যাচ্ছিলুম—

—চলো—

জগৎশেঠজী আর দাঁড়ালেন না। আগে আগে চলতে লাগলেন। আমি-দরবার ঘরে তখন অনেক আমীর-ওমরাহ্‌র ভিড়। দূরে নবাব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সকলের সঙ্গে কথা বলছেন। জগৎশেঠজীর মনে হলো নবাবের যেন অন্য রকম চেহারা হয়ে গিয়েছে। যেন ভেঙে পড়েছে, নুয়ে পড়েছে চেহারাটা এই দু'দিনের মধ্যেই। যেন নবাবের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। যেন নবাব বলছে—আমার মসনদ আজ আর আমার নয়, এ তোমাদের সকলের মসনদ। আমি যদি এ-মসনদ হারাই তো তোমরাও এ হারাবে। তোমরাও আমার মত নিঃস্ব হয়ে যাবে। তোমাদের জন্যেই আমি নবাবী পেয়েছিলাম, আমার নবাবী চলে গেলে তোমরাও তোমাদের অধিকার হারাবে। আমিই কি শুধু তোমাদের ছিলাম? তোমরাও তো আমারই

ছিলে। তোমাদের ওপর একদিন যে অন্যায় করেছিলাম, তা আজ হাজার গুণ হয়ে আমার ওপরেই ফিরে এসেছে। তেমনি আমার ওপরেও যদি তোমরা কোনো অন্যায় করো, সে-অন্যায় হাজার গুণ হয়ে আবার তোমাদের ওপরেও ফিরে আসবে। অন্যায় দিয়ে অন্যায়ের প্রতিকার যদি হতো তা হলে কি আজকে আমাকে লঙ্কাবাগ ছেড়ে চলে আসতে হয়? চলে এসে তোমাদের কাছে মার্জনা ভিক্ষে চাইতে হয়?

নবাব কথাগুলো বলছে আর সমস্ত দরবার-ঘরটা গম্‌গম্‌ করে উঠছে।

দূর থেকে জগৎশেঠজী সব শুনছিলেন। নবাবের সামনে অনেক ভিড়। মুর্শিদাবাদের কেউ আর আসতে বাকি নেই। এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে মেহেদী নেসার আর একপাশে হাতিয়াগড়ের ডিহিদার রেজা আলি। তার পাশে ইরাজ খাঁ, তার পাশে গোলাম হোসেন, তার পাশে...

—আমি তাই আজ তোমাদের সকলকে আমার সামনে ডেকে পাঠিয়েছি। বিপদ যে সামনে এগিয়ে আসছে তা তোমরা বুঝতে পারছো। আর বিপদের দিনে যে আপন-পর ভাবলে চলে না তাও তোমরা জানো। এ বিপদ যেমন আলীবর্দী খাঁর আমলে এসেছিল সে-বিপদ নয়। এরা পশ্চিম থেকে এসে দেশ লুঠ-পাট করে আবার নিজের দেশে ফিরে যাবে না। এরা মসনদ নিয়ে নেবে। হিন্দুস্থান নিয়ে নেবে। এরা দিল্লীর বাদশার মসনদ কেড়ে নিয়ে তামাম হিন্দুস্থানে কায়েম হয়ে বসবে। আমি এই দুই হাত জোড় করে তোমাদের বলছি, তোমরা আমাকে ফৌজ দাও, টাকা দাও, সোনা দাও, তোমাদের যা-কিছু আছে সব দিয়ে আমার মুর্শিদাবাদের মসনদ বাঁচাও। আমাকে বাঁচালে তোমরাও বাঁচবে, আমার মসনদ থাকলে তোমাদের মুর্শিদাবাদও থাকবে! আমি আল্লার নামে শপথ করে বলছি, মসনদ যদি এবার বাঁচে তো এ তোমাদের কাউকে দিয়ে আমি চলে যাবো। দূরে কোথাও চলে গিয়ে আল্লার নাম করবো—বলো তোমরা আমায় মদত্‌ দেবে? বলো তোমরা আমার পাশে থাকবে?

নবাব তখনো জগৎশেঠজীকে দেখতে পাননি, তখনো একমনে কথা বলে চলেছেন—

হঠাৎ চেহেল্‌-সুতুনের ভেতর থেকে যেন কী-এক চিৎকার গোলমাল কানে এল।

নবাব অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন—কে? কার গোলমাল? কীসের আওয়াজ?

শুধু নবাব নয়, মেহেদী নেসারও যেন কান পেতে রইলো সেইদিকে। ডিহিদার রেজা আলিও অন্যমনস্ক হয়ে গেল। আম-দরবারে যত আমীর-ওমরাও ছিল সবাই-ই যেন একটু চঞ্চল হয়ে উঠলো। এমন তো হয় না? তবে কি চক-বাজারের রাস্তার লোকজন সবাই চেহেল্‌-সুতুনের ভেতরে ঢুকে পড়েছে?

জগৎশেঠজীও কেমন অবাক হয়ে গেলেন।

পাশে তখনো দাঁড়িয়ে আছে মনসুর আলি মেহের সাহেব। জিজ্ঞেস করলেন—ও কিসের আওয়াজ?

মোহরার সাহেবও বুঝতে পারছিল না। কান পেতে রইলো। চেহেল্‌-সুতুনের হারেম থেকে এমন শব্দ তো কখনো আসে না।

জগৎশেঠজীর কী যেন সন্দেহ হলো।

জিজ্ঞেস করলেন—ফিরিঙ্গীরা এসে পড়লো নাকি?

কথাটা মনে লাগলো মোহরার সাহেবের। বললে—দাঁড়ান, দেখে আসি—

বলে মনসুর আলি মেহের সাহেব কোথায় চলে গেল।

নবাব বোধহয় আবার কথা বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু আওয়াজটা আরো বাড়লো যেন। এবার মেয়েলী গলার শব্দ স্পষ্ট শোনা গেল। চেহেল্-স্তুনের হারেমে এত বড় বে-আদপি তো কখনো আগে আর ঘটেনি। তবে?

ইরাজ খাঁ আর থাকতে পারলে না। বলে উঠলো—নেয়ামত্ কোথায়? নেয়ামত্?

নেয়ামত নেই। নেয়ামত তার আগেই হারেমের ভেতরে ঢুকে পড়েছে। সেখানে তখন গোলমাল চলেছে চারদিকে।

পীরালি খাঁ দৌড়চ্ছিল ভুল-ভুলাইয়ার দিকে। নেয়ামত ডাকলে—খাঁ সাহেব, কী হলো? গোলমাল কীসের?

কিন্তু খাঁ সাহেবের কানে বোধহয় সে-শব্দ গেল না। কিন্তু নেয়ামতও ছাড়লে না। পেছনে আসছিল নজর মহম্মদ।

—কী রে নজর? নানীবেগমসাহেবা অত চেঁচাচ্ছে কেন?

নজর মহম্মদ চলতে চলতেই বললে—চোর ধরা পড়েছে চেহেল্-স্তুনে!

চেহেল্-স্তুনের হারেমের ভেতর চোর? কথাটা যেন বিশ্বাস হলো না নেয়ামতের।

বললে—কে চুরি করেছে?

—আমিনা বেগমসাহেবা!

আমিনা বেগমসাহেবা? নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলার মা? কী চুরি করতে গেল?

তবু নজর মহম্মদ সবটা খুলেও বললে না। সোজা চলে গেল ভেতরের দিকে। আজ চেহেল্-স্তুনের ভেতরে যেন সব অরাজক অবস্থা। নেয়ামতকে দেখে চেহেল্-স্তুনের বেগমরা আর আড়ালে চলে গেল না। সেই তক্তি বেগম আলুথালু অবস্থাতেই একেবারে সামনে এসে হাজির হয়েছে।

জিজ্ঞেস করলে—নেয়ামত, কী চুরি হয়েছে রে?

সে-কথার উত্তর না দিয়ে নেয়ামত ভেতরের দিকে ছুটে গেল। সেখানে সব বেগমসাহেবারা এসে জুটেছে। জোরে জোরে কথা বলছে। বব্বু বেগম, গুলসন বেগম, পেশমন বেগম। সবাই।

হঠাৎ নবাবের গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। আম-দরবার ছেড়ে নবাব হারেমের ভেতরে এসে ঢুকেছেন।

—পীরালি খাঁ?

সেই দাউদপুর থেকে সমস্ত রাস্তাটা উটের পিঠে দৌড়তে দৌড়তে এসে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল নবাব। তারপর ঘুম নেই, বিশ্রাম নেই, আম-দরবারে আমীর-ওমরাদের ডেকে তোয়াজ তদ্বির খোসামোদ করতে হয়েছে। ওদিকে মুর্শিদাবাদের মসনদ যখন বিপন্ন তখন হারেমের ভেতরে এ কী গোলমাল!

—খোদাবন্দ্!

পীরালি খাঁ খোজা সর্দার কুর্নিশ করে সামনে এসে দাঁড়ালো।

—এত গোলমাল কীসের?

—হারেমের ভেতরে চোর ধরা পড়েছে।

—কে চুরি করেছে? কী চুরি করেছে?

পীরালি খাঁ বললে—জী খোদাবন্দ্, মাল্খানার হীরে, জহরৎ, মুক্তো, আশ্রফি—

—কে? কে?

—আমিনা বেগমসাহেবা!

নবাবের মাথার ওপর যেন বাজ ভেঙে পড়লো। মা! মাথা থেকে পা পর্যন্ত যেন টলতে লাগলো!

নানীবেগমসাহেবা খবর পেয়েই দৌড়ে কাছে এসেছে। বললে—শুনেছো মীর্জা, মেহের পালিয়েছে—

—ঘসেটি বেগম?

—অনেক খুঁজলাম, কোথাও পাওয়া গেল না তাকে। সমস্ত হারেম খুঁজে পীরালি সর্দার—

নবাব মীর্জা মহম্মদ মুখে কিছু বললে না। নানীবেগমসাহেবার দিকে শুধু চেয়ে রইলো। বললে—আর একটা কথা তো বললে না নানীজী? আমার মা'র কথা তো বললে না। মাল্‌খানা থেকে কী কী চুরি করেছে মা?

নানীবেগমসাহেবা বললে—ও-কথা থাক্, তুই মাথা ঠাণ্ডা কর, আয়, আমার সঙ্গে আয়—

মীর্জা বললে—না, নানীজী, আম-দরবারে আমি সকলকে বসিয়ে রেখে এসেছি, তারা সবাই অপেক্ষা করছে, আমি আসি। জানি কিছু হবে না। যার মা নিজের ছেলের জিনিস চুরি করে, যার মাসী শত্রু, তার কোনো আশা নেই। তবু একবার শেষ চেষ্টা করে দেখি। জগৎশেঠজী অনেক ডাকাডাকির পর শেষ পর্যন্ত এসেছে—

বলে আর দাঁড়ালো না সেখানে। আবার ফিরে গেল আম-দরবারে।

বুড়ো সারাফত আলির তখনই সন্দেহ হয়েছিল। ভোর বেলা যখন চক-বাজারের রাস্তায় প্রথম হল্লা শুরু হয় তখন নেশার ঘোরে আচ্ছন্ন হয়েছিল। তারপর যত বেলা বাড়তে লাগলো ততই বাড়তে লাগলো গোলমাল। একবার যেন আশা হলো! হাজি আহম্মদের বংশটা তবে কি বরবাদ হলো নাকি।

—বাদ্‌শা!

বাদ্‌শা কাছে আসতেই মিঞাসাহেব বললে—এ কীসের গোলমাল রে?

—হুজুর, নবাব লড়াই থেকে ফিরে এসেছে—

—হ্যাঁ?

আনন্দে খুশীতে যেন ডগমগ করে উঠলো। নবাব হেরে গেছে! আল্লাতালাহ্ তার আর্জি শুনেছে?

ওপাশে দোকানের সামনে কে একজন এসে দাঁড়ালো। সারাফত আলি লোকটার দিকে চেয়ে দেখলে। শরীফ খান্‌দানি আদমি বলে মনে হলো যেন। আরক কিনতে এসেছে নাকি?

—কী চাই? আগরবাতি? তাম্বাকু? খুশবু তেল?

ছোটমশাই-এর এখানে আসতে একটু কষ্টই হয়েছিল। প্রথমত তাঞ্জাম নেই, হাতি নেই, হেঁটে আসা। তারপর সেই মহিমাপুর থেকে চক-বাজার পর্যন্ত সমস্ত রাস্তাটায় কেবল মানুষের ভিড়। কত রকম লোক কত রকম কথা বলছে।

বলছে নবাব লড়াইতে হেরে ফিরে এসেছে, কেউ বলছে নবাব বন্দুকের চোট . .। কেউ আবার বলছে নবাব মারা গেছে। কেউ কারো কথা বিশ্বাস করছে কেউ বলছে ফিরিঙ্গী-ফৌজ এখনি মুর্শিদাবাদে এসে পড়লো বলে।

—না, ধূপ চাই না।

—তাহলে খুশ্‌বু তেল? ভরি দু' মোহর—

ছোটমশাই বললে—না, এখানে কান্তবাবু বলে কেউ থাকে? কান্ত সরকার? তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি—

বাদ্‌শা বললে—না বাবুজী, কান্তবাবু এখনি এসেছিল, একটু আগেই বেরিয়ে । আপনি কোত্থেকে আসছেন? আপনার নাম কী?

ছোটমশাই কী বলবে বুঝতে পারলে না। তারপর বললে—আমার নাম বললে পারবে না। কখন আসবে কান্তবাবু?

—আপনি একটু বসবেন?

বুড়ো সারাফত আলির ভালো লাগলো না কথাটা। বললে—কেন বসবে? াহে বৈঠেগা? তুমি কে? তুম্ কৌন্ হো? কাঁহাসে আয়া হো? বাবুজী মহারা কৌন্ লগতা হ্যায়?

এতগুলো কথা বুড়োটার মুখ থেকে শুনতে হবে ভাবতে পারেনি ছোট-শাই। অথচ রাগারাগি করাও যায় না। মুখ বুজে সহ্য করাই ভালো।

বললে—আমার সঙ্গে তার নিজের একটা দরকার ছিল।

সারাফত আলি তখন বাদ্‌শাকে বলছে—যাকে-তাকে দোকানে বসতে বলছিস কন? তোর দোকান? এ আমার দোকান, আমি এর মালিক, আমি যাকে এখানে ত দেবো সে এখানে বসবে। আপনি এখন যান, এখানে কারো সঙ্গে দেখা না।

ভেতর থেকে সমস্ত কথাগুলো শুনছিল ঘসেটি বেগম। একবার মনে হলো কুলী খাঁ নাকি? নজর কুলী খাঁর খবর পেয়েছে নাকি যে তার মেহেরুন্নিসা খানে এসে উঠেছে?

একবার মনে হলো চিৎকার করে বলে—নজর, এই যে আমি এখানে—

কিন্তু আবার মনে হলো, সে কী করেই বা জানবে যে তার মেহের এখানে এসে উঠেছে।

যে-লোকটা এতক্ষণ কথা বলছিল সে বোধহয় এখন চলে গেছে। আর কারো কথা শোনা গেল না। কিন্তু এমন করে এখানে চুপ করে বসে বসে সময় নষ্ট করেই বা কী হবে?

দরজার ফাঁক দিয়ে দেখলে, সেই বাদ্‌শা রান্না করবার জোগাড় করছে। দরজার কাছে এসে ডাকলে—বাদ্‌শা,—

বাদ্‌শা ডাক শুনে কাছে এল।

—তোমার নাম বাদ্‌শা তো? ও কে এসেছিল বলতে পারো? এতক্ষণ কার গলা শুনছিলাম?

—নাম জানি না বাঁদীজী, ও শায়েদ্ এমনি রাস্তার লোক। ওকে ডাকবো?

ঘসেটি বেগম বললে—না, ডাকতে হবে না, তুমি গিয়ে ওকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারো? জিজ্ঞেস করে এসো গিয়ে ওর নাম কী।

বাদ্‌শা বললে—যাচ্ছি বাঁদীজী, আমি এখনি জিজ্ঞেস করে আসছি—

ছোটমশাই তখনো বেশি দূরে যায়নি। রাস্তায় তখনো ভিড় হচ্ছে। সবার

মুখেই আতঙ্কের ছায়া। সবাই কৌতূহলী হয়ে উঠেছে নিজামতের ভবিষ্যতে ভাবনায়।

ছোটমশাই কোন্ দিকে যাবে বুঝতে পারলে না। যখন চারদিকে গোলমা এই সময়ে মতিঝিলে গিয়ে দেখা করলে ক্ষতি কী? এখন কি আর পাহারাদা কেউ আছে সেখানে? নবাব তো লক্ষাবাগ থেকে পালিয়ে এসেছে একলা। এখ তো ফৌজের সেপাই-শান্ত্রী সবাই সেখানে। এখন যদি কেউ চেহেল্-সতুন থে পালিয়ে বাইরে চলে আসে কে দেখতে পাবে? এই সময়টাই তো ভয়ের। এ সময়েই তো বেগমরা বাঁদীরা নবাবের সম্পত্তি লুট-পাট করে নিয়ে পালায়। ক বার এই রকম হয়েছে আগে। এক-একজন নবাব মসনদ ছেড়েছে আর সে সুযোগে কত চুরি কত রাহাজানি হয়ে গেছে নবাবের হারেমে।

মতিঝিলে যাবে নাকি একবার?

কিন্তু সেই দাড়িওয়ালা বুড়ো খিদ্‌মদ্‌গারটা! বুড়োটা কিছু কথা বলেনি কোনো কথার জবাব দেয়নি, শুধু দরজাটা খুলে দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল কেন যে সে ছোটমশাইকে ছাড়িয়ে দিয়েছিল তারও কোনো উত্তর দেয়নি। ছোট মশাইকে মতিঝিল থেকে ছাড়িয়ে দিয়ে তার কী লাভ? কে তাকে পায়ে ধরেছি ছোটমশাইকে ছেড়ে দিতে!

ছোটমশাই তবু জিজ্ঞেস করেছিল তাকে—মরিয়ম বেগমসাহেবা কোথায় কোন্ ঘরে?

বুড়োটা জবাব দেয়নি।

—তার সঙ্গে একবার আমার দেখা করিয়ে দিতে পারো তুমি?

তবু বুড়োটা কিছু বলেনি।

তারপর আর কোনো উপায় না দেখে ছোটমশাই একেবারে সোজা জগৎশেঠজী বাড়ির দিকে চলে গিয়েছিল।

কিন্তু এখন কোথায় যাওয়া যায়? জগৎশেঠজী তো নবাবের আম-দরবা গেছে। সেখানে নবাব হয়তো আবার শেষ চেষ্টা করে দেখবে। আবার ফিরিঙ্গীদে সঙ্গে লড়াই করে সব অপমানের প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করবে! কিন্তু তারই মধ্যে যদি বউকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসা যায়! দরকার হলে ঘুষ দেবে। জগৎশেঠজী কাছ থেকে, নয়তো ধার করে টাকা নেবে।

মতিঝিলের কাছাকাছি এসে দাঁড়ালো ছোটমশাই।

ফটকে অন্য দিনের মত কোনো পাহারাদার নেই। নহবত-মঞ্জিলে নহবত থে গিয়েছিল, কিন্তু আবার বাজতে আরম্ভ করেছে। কিন্তু লোকজন নেই কেন?

একবার মনে হলো এই সুযোগে ঢুকে পড়বে নাকি ভেতরে? কিন্তু যা ধরা পড়ে যায়, তখন? তখন তো জবাবদিহি দেবার আর কেউ থাকবে না। ভেত মতিঝিলটার দিকে চেয়ে দেখলে। ঝিল পেরিয়ে বিরাট প্রাসাদ। এই বাড়ি তৈ হবার সময় থেকেই দেখে আসছে ছোটমশাই।

—বাবুজী!

চম্‌কে উঠেছে ছোটমশাই। পেছন ফিরে দেখলে কে একজন তাকে ডাকছে অচেনা মুখ।

—তুমি কে?

লোকটা বললে—আমি বাদ্‌শা হুজুর। বাঁদীজী আমাকে পাঠিয়েছে—

—বাঁদীজী? কোন্ বাঁদীজী? কোথাকার বাঁদীজী?

লোকটা যেন খুলে বলতে চাইছে না সব। কিংবা বলতে ভয় পাচ্ছে।

শেষকালে বললে—আপনি আমাকে চিনতে পারছেন তো?

ছোটমশাই বললে—না—

—আমি সেই সারাফত আলি সাহেবের খুশবু তেলের দোকানের নোকর বাবুজী! আপনি একটু আগে সেখানে কান্তবাবুকে খুঁজতে গিয়েছিলেন। আমি সেখান থেকেই আসছি—

ছোটমশাই বললে—তা কান্তবাবু কি ফিরে এসেছে?

—না, লেকিন্ বাঁদীজী আছে।

—কে বাঁদীজী?

—কান্তবাবুর সঙ্গে এক বাঁদীজী এসেছিল, চেহেল্-সুতুনের বাঁদীজী, সেই বাঁদীজী আপনার নাম জিজ্ঞেস করতে পাঠিয়েছে।

ছোটমশাই অবাক হয়ে গেল।

বললে—কিন্তু চেহেল্-সুতুনের বাঁদীজী তোমাদের দোকানে এল কেন?

—তা জানি না বাবুজী। কান্তবাবু বলেছে চেহেল্-সুতুনের বাঁদীজী, তাই বলছি। আমি তার মুখ ভি দেখিনি, বোরখায় ঢাকা আছে—

ছোটমশাই-এর মনটায় কেমন দোলা লাগলো। বোরখা পরে আছে! চেহেল্-সুতুনের বাঁদীজী! এমন তো হয় না। এমন তো হবার কথা নয়। নিশ্চয় কোনো রহস্য আছে এর পেছনে। তবে কি কান্তবাবু তার স্ত্রীকে মতিঝিল থেকে বোরখা পরিয়ে ছাড়িয়ে নিয়ে এসে লুকিয়ে রেখেছে ওখানে?

—এ বাঁদীজী কি তোমাদের দোকানে আগে কখনো এসেছে?

—না হুজুর, বাঁদীজীরা দোকানে আসবে কেন? চেহেল্-সুতুনের খোজারা আসে মাল গস্ত করতে!

—তুমি জানো কিছু, বাঁদীজী কেন এসেছে?

—না হুজুর, তা মালুম নেই, বাঁদীজী আজ সকালেই কান্তবাবুর সঙ্গে এসেছে। আপনাকে জিজ্ঞেস করতে বলেছে আপনার নাম কী—

—তোমার বাঁদীজী কি আমাকে চেনে? আমাকে দেখেছে?

—তাও মালুম নেই হুজুর।

ছোটমশাই কী যেন ভাবলে। হয়তো চেহেল্-সুতুনের বাঁদীকে জিজ্ঞেস করলে মরিয়ম বেগমের সম্বন্ধে কিছু জানা যাবে। চেহেল্-সুতুনের বাঁদী যখন, তখন নিশ্চয়ই মরিয়ম বেগমকে চেনে।

—তুমি বাঁদীজীর কাছে আমাকে একবার নিয়ে যেতে পারবে?

বাদ্শা বললে—হুকুম না পেলে কী করে নিয়ে যাবো হুজুর? বেগমের অনুমতিতে আমি কী করে আপনার সঙ্গে দেখা করিয়ে দেবো? আপনার কী দরকার বলুন?

—কী দরকার, সেটা বাঁদীজীকে বলবো, তোমাকে বলা যায় না।

—তাহলে আমি বাঁদীজীকে পুছিয়ে বলবো।

ছোটমশাই বললে—তার চেয়ে এক কাজ করো, আমি তোমার সঙ্গে দোকান পর্যন্ত যাই, তুমি ভেতর থেকে বাঁদীজীকে জিজ্ঞেস করে আমাকে এসে ডেকে নিয়ে যেও—

বাদ্শা বললে—তা চলুন, তবে বেশি গোলমাল করবেন না হুজুর, সারাফত আলি সাহেব বড় গোসা করবে, বড় বদরাগী মানুষ—

—চলো—

বলে ছোটমশাই আবার চক্-বাজারের দিকে চলতে লাগলো বাদ্শার সঙ্গে সঙ্গে। আগের দিন সারা রাত ঘুম হয়নি, সমস্ত দিনটাও বিশ্রাম হয়নি। তার ওপর মানসিক যন্ত্রণারও শেষ নেই। তারপর আজ ভোর থেকেই ঝঞ্ঝাট চলেছে। মুর্শিদাবাদের ভিত্ পর্যন্ত নড়ে গেছে যেন। হাতিয়াগড়ের মত মুর্শিদাবাদেরও যেন সর্বনাশ ঘনিয়ে এসেছে।

হঠাৎ রাস্তার লোকগুলো যেন একটু বেশি চঞ্চল হয়ে উঠলো। ফিরিঙ্গী-ফৌজ আসছে। ফিরিঙ্গী-ফৌজ আসছে। হুঁশিয়ার, হুঁশিয়ার!

যে যেদিকে পারছে দৌড়তে লাগলো।

বাদশা থম্কে দাঁড়ালো। ছোটমশাইও খানিক থমকে দাঁড়ালো। ফিরিঙ্গী-ফৌজ আসছে। তাহলে তো ক্লাইভ সাহেবও আসছে।

সেই ১৭৫৭ সালের ২৪শে জুন সমস্ত বাঙলা-মুলুক যেন আশায় আনন্দে উৎসাহে আত্মহারা হয়ে উঠলো। আসছে, আসছে, ফিরিঙ্গী-ফৌজ আসছে। ফিরিঙ্গী-ফৌজ আসছে।

বাদ্শাও দৌড়তে লাগলো সকলের দেখাদেখি। ছোটমশাইও বাদ্শার পেছন পেছন জোর-কদমে পা বাড়িয়ে দিলে। ক্লাইভ সাহেব আসছে। আর কিছু ভয় নেই, আর কিছু দুঃখ নেই। এবার আর সুন্দরী মেয়ে-বউদের লুকিয়ে রাখতে হবে না। টাকা-কড়ি-গয়না-মোহর আর মাটিতে পুঁতে রাখতে হবে না।

বাদ্শা পেছন ফিরে চিৎকার করে ডাকলে—জল্দি আসুন হুজুর, জল্দি—

ছোটমশাই তখন ক্লান্তিতে অবসন্ন হয়ে পড়েছে। তবু কোনো রকমে শরীরটাকে টেনে নিয়ে তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে চলতে লাগলো।

সারাফত আলি সাহেব সকাল বেলার দিকে একটু তাজা থাকে। আগের রাত্রের নেশা তখন সবটাই কেটে যায়। সকাল বেলার দিকে খুশ্বু তেলের দোকানে তেমন খদ্দের আসে না। কিন্তু তাতে কিছু ক্ষতি হয় না সারাফত আলি সাহেবের। খদ্দের না থাকাই ভালো। আর নেশার জিনিসের কারবার আলি সাহেবের, নেশার জিনিস সকাল বেলা কে কিনবে? তখন মালের হিসেব রাখবার সময়। লাভ-লোকসানের কথা বড় একটা ভাবে না সারাফত আলি সাহেব। লাভ-লোকসানের কথাই যদি ভাববে তো দিল্লী ছেড়ে এখানে এই বাঙলা মুলুকে—এই মুর্শিদাবাদে দোকান করতে আসবে কেন সে?

কিন্তু বয়েসও তো হচ্ছে! যত বয়েস হচ্ছে ততই কুঁজো হয়ে পড়ছে। মনে হয় আর বোধহয় কিছু দেখে যেতে পারবে না। এই চেহেল্-সুতুন, এই নিজামতের বরবাদি এ-জিন্দ্গীতে বোধহয় আর দেখা হলো না।

সকাল বেলাই একটা বেত্তমিজ এসে মেজাজটা বিগড়ে দিয়ে গিয়েছিল সারাফত আলি সাহেব ভেবেছিল সকাল বেলাই বুঝি খুশ্বু তেলের খদ্দের এসেছে। কিন্তু না, খদ্দের নয়, কান্তবাবুকে খুঁজতে এসেছে—

হিসেব করতে করতে হঠাৎ মনে হলো চক্-বাজারের রাস্তার গোলমালটা যেন আবার বেড়ে উঠলো।

—ক্যা হুয়া?

রাস্তার দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলে লোকজন দৌড়চ্ছে আর বলছে—ফিরিঙ্গী-ফৌজ আসছে—ফিরিঙ্গী-ফৌজ আসছে—

ফিরিঙ্গী-ফৌজ আতা হ্যায়!

বুড়ো লাফিয়ে উঠলো। লাফিয়ে উঠতে গিয়ে হিসেবের খাতাটা কোল থেকে ছিটকে পড়লো মাটিতে। তা পড়ুক।

—বাদ্‌শা, বাদ্‌শা—

বাদ্‌শার সাড়া-শব্দ নেই। এক ডাকে বেল্লিকটা জবাব দেবে না কখনো। সোজা ভেতরের দিকে গিয়ে ডাকলে—বাদ্‌শা, বাদ্‌শা, এ বাদ্‌শা—

কোথাও নেই বাদ্‌শা। কোথায় গেল বেত্তমিজটা! লোকগুলো কী বলছে সেইটে জানতে হবে। ফিরিঙ্গী-ফৌজ কি সত্যিই আতা হ্যায়? কখন আসবে? কখন এসে নিজামতে চড়াও হবে, জানা দরকার।

হঠাৎ বুড়োর মনে হলো কান্তবাবুর ঘরের ভেতরে কে যেন বসে আছে। মানুষের মত মালুম হচ্ছে।

—কৌন্? কৌন্ ইঁহা? কৌন্ তুম্? কান্তবাবু?

কিছু জবাব নেই কারো। সারাফত আলি সাহেব আস্তে আস্তে ঘরের দরজাটা হাট করে খুলে ভেতরে ঢুকলো।

ঘসেটি বেগম তখন ভয়ে কাঁপছে।

—কৌন তুম্? তুম্ কৌন হো?

তবু জবাব নেই। সারাফত আলি সাহেব একেবারে মুখের কাছে ঝুঁকে পড়লো।

বললে—কৌন তুম্?

সেই ছোট ঘুপচি ঘরের মধ্যে ঘসেটি বেগম তখন ঘামছে। বোরখার ভেতরে তার হাতের পুঁটলিটা বার বার হাত থেকে খসে যাবার জোগাড় হচ্ছিল।

সারাফত আলি সাহেবের দৃষ্টি ক্ষীণ হতে পারে, কিন্তু নেশার ঘোর তখন কেটে গেছে।

বললে—জবাব দেও, কৌন তুম্? ইঁহা ক্যায়সে আয়ি—

তবু জবাব দিতে ঘসেটি বেগমের ভয় হলো। যদি জানাজানি হয়ে যায় শহরে যে, ঘসেটি বেগম এই খুশ্‌বু তেলের দোকানে লুকিয়ে আছে, তা হলে তো সর্বনাশ হয়ে যাবে। নজর কুলী খাঁ যদি এর মধ্যে এসে পড়ে, তা হলেই সে যেন বেঁচে যায়। কিন্তু এত দেরিই বা করছে কেন সে এখানে আসতে! তবে কি মরিয়ম কোন খবর দেয়নি তাকে? না, নজর কুলী এখনো বাড়ি ফেরেনি। রাত্রে কোথায় যায় সে? যদি কোথাও গিয়েই থাকে তো এত দেরি করে কেন বাড়ি ফেরে?

সারাফত আলি আর দেরি সহ্য করতে পারলে না।

জীবনে অনেক প্রতিহিংসা আর প্রতিশোধ-স্পৃহা বুকের মধ্যে পুষে রেখে রেখে বুড়ো হয়ে গেছে সে। অনেক আরক, অনেক তামাক, অনেক আগরবাতি হজম করে ফেলেছে মিছিমিছি। পাঠান-দেশ থেকে পায়ে হেঁটে হেঁটে বাঙলা-মুলুকে এসেছে শুধু কি এই আরক আর তামাকের আর ধূপের কারবার করবার জন্যে? এতদিন যে রাগ পুষে রেখেছে বুকের মধ্যে সে কি শুধু নিজের মনে মনে পুড়ে ছাই হবার জন্যে?

—জবাব দেও—দেও জবাব!

আর দেরি করলে না সারাফত আলি। এক টানে ঘসেটি বেগমের বোরখাটায় টান দিলে, আর ঘসেটির মুখখানা স্পষ্ট বেরিয়ে পড়লো সারাফত আলির ঝাপসা দৃষ্টির সামনে।

মুখখানা দেখে চিনতে পারলে না বুড়ো। একেবারে মুখখানার কাছে নিজের গোঁফ-দাড়িওয়ালা মুখখানা নিচু করে নামিয়ে নিয়ে এল।

বললে—কৌন্ হ্যায় তুম্?

—আমি বাঁদী হুজুর, চেহেল্-সুতুনের বাঁদী!

—চেহেল্-সুতুনের বাঁদী তো এখানে কেন? ই'হা কে'ও?

ঘসেটি বেগম ভয়ে ভয়ে বললে—হুজুর, চেহেল্-সুতুনে ইন্‌কিলাব শুরু হয়েছে—

—ইন্‌কিলাব?

—হ্যাঁ হুজুর, ইন্‌কিলাব শুরু হয়েছে। লুঠ-পাট-খুন-জখম চলছে, আমি ঘসেটি বেগমসাহেবার বাঁদী রাবেয়া। মেরা নাম রাবেয়া খাতুন, তাই পালিয়ে এসেছি—

—ঘসেটি বেগম?

ঘসেটি বেগমের নামটা শুনেই সারাফত আলির পাঠানী রক্ত টগ্‌বগ্ করে ফুটে উঠলো। কী করবে বুঝতে পারলে না হঠাৎ। তার পরে একটু সংবিৎ ফিরতেই ঘসেটি বেগমের চুলের মুঠি ধরলে। বললে—চল্, আমার সঙ্গে চল্, ইন্‌কিলাবের সময় তুই কেন বাঁচবি? তোকেও মরতে হবে। চল, আমার সঙ্গে—ঘসেটি বেগমের সঙ্গে তোরও কবর দেবো—

ঘসেটি বেগমের বাঁদী যে কী অপরাধ করেছে, তার কোনো প্রমাণ নেই। হোক বাঁদী, কিন্তু এই বাঁদীরাই তো বেগমসাহেবাদের খেদ্‌মত করে। এই বাঁদীরাই হাজী আহম্মদের ছেলের বউদের তদ্বির-তদারক-খোসামোদ করে। সেই বউরাই তো মুর্শিদাবাদের নবাবকে পয়দা করেছে। হাতের কাছে বেগমদের না পেয়ে যেন বাঁদীদের ওপর অত্যাচার করেই সারাফত আলি তার নিজের অপমানের প্রতিশোধ নিতে চাইছে।

ডাকলে—বাদ্‌শা—বাদ্‌শা—

ডেকেই কিন্তু মনে পড়লো, বাদ্‌শা বাড়িতে নেই। কোথাও গেছে। তা হলে নিজেকেই যেতে হয়।

হঠাৎ ঘসেটি বেগমের চুলের মুঠি ধরে টানতে টানতে তাকে বাইরে নিয়ে এল সারাফত আলি। বেশ দিন হয়ে গেছে তখন। রাস্তায় লোকজন জমে গেছে। চেহেল্-সুতুনের বোরখাপরা মেয়েমানুষকে রাস্তায় হিড় হিড় করে টানাটানি করতে দেখে ভিড় জমে গেল চারপাশে।

—কেয়া হুয়া আলি সাহেব?

সারাফত আলি বুড়ো মানুষ। আগেকার মত শরীরে তাকত নেই। কিন্তু রাগ আছে। রাগের তেজও আছে। চিৎকার করে উঠলো—চল্, উল্লু-কা-পাট্‌ঠা—

চারপাশের মানুষ আবার জিজ্ঞেস করলে—কী হয়েছে আলিসাহেব?

—আরে জনাব, এ-হারামজাদী বাঁদী চেহেল্-সুতুনের বেগমসাহেবাদের খেদ্‌মত করেছে, বেগমসাহেবাদের হুকুম তামিল করেছে, বেগমসাহেবাদের তদ্বির-তদারক-খোসামোদ করেছে—এ-বাঁদী হারামজাদী আছে—

লোকগুলো হো-হো করে হেসে উঠলো। বেগমসাহেবাদের খেদ্‌মত করেছে,

খোসামোদ করেছে তা কী হয়েছে? বেগমসাহেবাদের খেদ্‌মত করা কি গুণাহ্‌?

—আলবাত্‌ গুণাহ্‌! হাজারবার গুণাহ্‌! বেগমসাহেবারা তো হাজী আহম্মদের বংশের নবাবের মা, নবাবের মাসি, নবাবের আওরত!

লোকগুলো আরো জোরে হেসে উঠলো। নবাব নিয়ে এত জোরে হাসি-ঠাট্টা-তামাসা করবার সাহস কালকেও ছিল না কারো। অথচ এক রাত্রের মধ্যে কী আমূল পরিবর্তন হয়ে গেল। শুধু নবাব নয়। নবাবের মা, নবাবের বেগম নিয়েও হাসি-ঠাট্টা-তামাসা। এ যেন কাল কেউ কল্পনাও করতে পারতো না।

—থুঃ থুঃ থুঃ—

সেই প্রকাশ্য দিনের আলোয় সারাফত আলি সাহেব হঠাৎ এক কাণ্ড করে বসলো। আর কিছু করতে না পেরে ঘসেটি বেগমের মাথার ওপর থুঃ-থুঃ করে থুতু ফেলতে লাগলো। যেন ঘসেটি বেগমের মাথার ওপর থুতু ফেললেই হাজী আহম্মদের বংশের ওপর চূড়ান্ত প্রতিশোধ নেওয়া যাবে।

সারাফত আলি সাহেবের কাণ্ড দেখে চক-বাজারের রাস্তার মানুষ যেন এক বিনা-পয়সার মজা পেয়েছে। তারা হেসে গড়িয়ে পড়লো। সারাফত আলি সাহেবের দেখাদেখি তারাও থুতু ফেলতে লাগলো ঘসেটি বেগমের মাথার ওপর।

সারাফত আলি সাহেবের আনন্দ আর ধরে না। বললে—ফেকো থুক, থুক ফেকো—

অর্থাৎ—আরো থুতু ফেলো। আরো প্রতিশোধ নাও। আমার বিবির ওপর হাজী আহম্মদ যে অত্যাচার করেছে, তোমরা সকলে মিলে দল বেঁধে তার প্রতিশোধ নাও। এই নিজামত, এই নবাব, এই মুঘল-শক্তির মাথার ওপর তোমরা থুতু ফেলো। আবার পাঠান রাজত্ব আসুক। আবার ফিরিঙ্গী-রাজত্ব আসুক, আবার মারাঠী রাজত্ব আসুক। আমি সব সহ্য করবো মুখ বুঁজে। কিন্তু হাজী আহম্মদের বংশকে মুর্শিদাবাদের মসনদে বসতে দেবো না। আমি অনেক আরক খাইয়েছি ওই বেগম-বাঁদীদের, অনেক আশ্‌রফি খরচ করেছি এদের মারতে। এতদিন এদের কাউকে হাতের কাছে পাইনি, আজ পেয়েছি। আজকে একেই, এই বাঁদীকেই খতম করি—

—থুঃ থুঃ থুঃ—

হঠাৎ ঘসেটি বেগম কাকে দেখে চিৎকার করে উঠলো—নজর—নজর—আমার নজর—

নজর কুলী খাঁ রাজনীতিও বোঝে না, রানীনীতিও বোঝে না। একটা নীতিই শুধু সে বোঝে, সে হলো নারী-নীতি। জীবনে কোনো সুখকেই সে সুখ বলে মনে করে না, একমাত্র নারীসুখ ছাড়া। আল্লাহ্‌ তাকে মেয়েমানুষ-ভোলানো রূপ দিয়েছিল। সেইটেই ছিল তার মূলধন। সেই মূলধন ভাঙিয়েই সে একদিন সুখের সিংহাসনে বাদশা হয়ে বসেছিল। এই ঘসেটি বেগমসাহেবাই একদিন তার রূপ-যৌবন দেখে তাকে মতিঝিলের বিছানার পাশে নিয়ে শুয়েছিল। কিন্তু যেদিন নবাব মীর্জা মহম্মদ মতিঝিলে হামলা করে ঘসেটি বেগমকে পাকড়াও করে নিয়ে আসতে গিয়েছিল, সেদিন থেকেই নজর কুলী খাঁর জীবনের সব সুখ চলে গিয়েছে। ঘসেটি বেগমের দেওয়া সোনা-চাঁদি-মোহর নিয়ে চলে গিয়েছিল কাশী। কিন্তু জুয়াতে আর ভাঙ-এ সব খুইয়ে আবার মুর্শিদাবাদে ফিরে এসেছিল। সেই মোহর নেই, সেই রূপ নেই, সেই আগেকার যৌবন নেই তখন। কিন্তু যৌবনের নেশা তখনো যায়নি। সেই রাত হলেই মেহেরউন্নিসার কথা মনে পড়তো আর চক-বাজারে বস্তির মধ্যে গিয়ে বাজারের ভাড়া-করা

মেহেরউন্নিসাদের সঙ্গে শুয়ে পুরোন আস্বাদ বাজিয়ে নিত।

সেদিনও নজর কুলী বস্তিতে রাত কাটিয়ে ফিরছিল অন্য দিনের মত। কিন্তু রাস্তার মধ্যে গোলমাল, হল্লা আর ভিড় দেখে থমকে দাঁড়ালো। কে? সারাফত আলি সাহেব কার মাথায় থুতু ফেলছে অমন করে! ভেতরে কে?

উঁকি মেরে দেখতে গিয়েই মেহেরউন্নিসার গলার আওয়াজ এল—নজর—নজর—মেরা নজর—

এতক্ষণে সারাফত আলি সাহেব নজর দিয়ে দেখলে নজর কুলীর দিকে।

—মেহের, মেহের, মেরা মেহের—

মেহেরউন্নিসার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছিল নজর কুলী খাঁ। কিন্তু বুড়ো সারাফত আলি সাহেব তার চুলের মুঠিটা ধরে ফেলেছে।

—দুষমন, বেত্তমিজ কাঁহিকা—

কিন্তু নজর কুলীই বা কম যায় কিসে। একদিন তার স্বাস্থ্য ছিল, একদিন শ্বেতপাথরের মতন চকচকে ছিল তার পেশীগুলো। তখন মুর্শিদাবাদের মেয়েরা তার দিকে লোভাতুর দৃষ্টি দিয়ে চেয়ে থাকতো। তারপর জুয়া, রাত-জাগা আর অত্যাচারের ফলে সে চেহারার বাহার আর নেই। কিন্তু তবু যা আছে, তাতে তখনো বুড়ো সারাফত আলিকে কাবু করা যায়।

নজর কুলী খাঁও সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠেছে—তারে রে বুড়ো মিঞা—

আর তারপর সেই সকাল বেলা চকবাজারের রাস্তার ওপরেই দুজনের মল্লযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। এতদিন শুধু নিষ্ফল রাগেই সারাফত আলি সাহেব মনে মনে পুড়েছে, এতদিন শুধু দূরে থেকেই সারাফত আলি অভিশাপ দিয়েছে নিজামতকে। আর আজ যেন লড়াই করবার মত একটা লোক পেলো প্রথম। বুড়ো হাড়ে যতটা শক্তি ছিল, সব দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো নজর কুলীর ওপর—

আর চারপাশে যারা মজা দেখছিল, তারা তখন তামাসা পেয়ে লাফিয়ে উঠেছে—লে ঝটাপট্—লে ঝটাপট্—লে—

যখন নজর কুলী খাঁ আর সারাফত আলি জড়াজড়ি করে রাস্তার ওপর গড়াগড়ি খাচ্ছে, আর লোকগুলো সবাই সেই দিকে দেখতে ব্যস্ত, তখন ঘসেটি বেগম এক ফাঁকে লুকিয়ে পড়লো। তারপর ভিড়ের মধ্যে দিয়ে একেবারে বাইরে বেরিয়ে এল সকলের চোখের আড়ালে। আর তারপর যেদিকে পারলে ছুটে চলতে লাগলো।

দু'-একজন বুঝি দেখতে পেয়েছিল।

—ওরে, বাঁদীজী ভাগ্ রহি হ্যায়—

—ছুট্ ছুট্—পাকড়ো, পাকড়ো—

কিছু লোক বাঁদীর পেছন-পেছন ছুটতে লাগলো। কিন্তু ঘসেটি বেগম-সাহেবার তখন চরম বিপদ। তীরের মত ছুটতে ছুটতে চলেছে সে। আর কোনো দিকে তার যাবার নিশানা নেই—সামনেই চেহেল্-সুতুনের ফটক খোলা পড়ে রয়েছে। পাহারাদার নেই। তার ভেতরেই সোঁ সোঁ করে ঢুকে পড়লো।

ইনসাফ মিঞা তখন জয়-জয়ন্তীর কোমল নিখাদে সবে নেমেছে। সেই নিখাদটা নিয়ে সে কায়দা করে আবার গান্ধারে যাবে, হঠাৎ ছোটে সাগ্‌রেদ বললে—উস্তাদজী, উ কৌন্ ভাগ আতি হ্যায়?

ওপর থেকে নিচের সব দেখা যায়। নিচু হয়ে দেখলে।

কিন্তু ইনসাফ মিঞা বাধা পেয়ে ক্ষেপে গেছে। একেই মেজাজ বিগড়ে আছে

নবাবের ব্যাপার নিয়ে। টৌড়ি থেকে জয়জয়ন্তী বাজাতে হয়েছে, তার ওপর ছোটে সাগ্‌রেদের এই বখেড়া। বাজনা থামিয়ে একটা ধমক দিয়ে উঠলো—চোপ রাও বেল্লিক—

রসের বাধা পড়লে গুণীর মুখ দিয়ে তো গালাগালি বেরোবেই।

কিন্তু ওদিকে তখন সারাফত আলি সাহেবের খুশ্‌বু তেলের দোকানের সামনে ভিড় আরো বেড়ে গেছে। দু'টো ষাঁড়ে লড়াই লাগলেও চক-বাজারের রাস্তাতে এমনি মানুষের ভিড় জমে। আর এ তো মোগলে-পাঠানে লড়াই। বুড়ো আর জোয়ানে। বুড়ো সারাফত আলির মেহেদী রং-লাগানো দাড়িটা ধরে নজর কুলী তখন প্রাণপণে টানছে। আর সারাফত আলিও জোরে জাপটে ধরে আছে নজর কুলী খাঁকি—

যত জড়াজড়ি চলেছে, তত ভিড় বাড়ছে মানুষের।

বাদ্‌শা ছোটমশাই-এর সঙ্গে আসছিল। দূর থেকে তার নজরে পড়েছে। ফিরিঙ্গী-ফৌজের কথাটা কানে আসতেই যে-যেদিকে পারে দৌড়চ্ছিল। বাদ্‌শাও দৌড়চ্ছিল খুশ্‌বু তেলের দোকান লক্ষ্য করে।

ছোটমশাই সেই বয়েসে বাদ্‌শার সঙ্গে দৌড়িয়ে পারবে কেন?

বাদ্‌শা একবার পেছন ফিরে ডাকলে—জলদি আইয়ে বাবুজী—জলদি—

ছোটমশাই বললে—একটু আস্তে, একটু আস্তে চলো—

—ফিরিঙ্গী-ফৌজ আসছে, তুরন্ত্ চলে আসুন—

কিন্তু অত তাড়াহুড়ো সহ্য হবে কেন ছোটমশাই-এর। একদিন হলেও না-হয় সহ্য হতো, কিন্তু এ যে ক' মাস ধরেই এই রকম চলছে। তবু যদি লোকটার সঙ্গে গেলে একটা কিছু হদিস পাওয়া যায়, তা-ই প্রাণ বার করে বাদ্‌শার সঙ্গে সঙ্গে আসছিল।

হঠাৎ বাদ্‌শা দোকানের কাছাকাছি এসে অত মানুষের ভিড় দেখে অবাক হয়ে গেছে। এই একটু আগেই যখন সে দোকান থেকে চলে গিয়েছিল বাবুজীকে ডাকতে, তখনো তো এত হল্লা ছিল না। কী হলো আবার? ফিরিঙ্গী-ফৌজ আসবার খবর পেয়ে সবাই বুড়ো সারাফত আলির দোকানের সামনে এসে জুটেছে নাকি?

ছোটমশাইও দেখেছে। এত ভিড় হলো কেন? তবে কি মরিয়ম বেগমসাহেবা ধরা পড়লো?

—ও বাদ্‌শা, ওখানে তোমাদের দোকানের সামনে অতো হল্লা কেন?

বাদ্‌শা সে-কথার উত্তর না দিয়ে একেবারে জটলার পেছনে এসে দাঁড়ালো। তারপরে ভেতরে উঁকি দিয়ে দেখবার চেষ্টা করলে—

—কেয়া হুয়্যা ভাইয়া? ইঁহা কেয়া হোতা হ্যায়?

কিন্তু কে আর তখন বাদ্‌শার কথার উত্তর দেবে। তারা সবাই হুমড়ি খেয়ে তামাসা দেখছে। মজাটার কিছু অংশও যেন ফসকে না যায়।

কিন্তু বাদ্‌শা ভালো করে কিছু দেখতে পাবার আগেই ফয়সালা হয়ে গেছে। চরম ফয়সালা। সারাফত আলি নজর কুলী খাঁর ধাক্কা খেয়ে তখন সেই যে মাটিতে মুখ গুঁজে পড়লো আর উঠতে পারলে না। শুধু শেষ নিঃশ্বাস ফেলবার আগে একবার বলতে চেষ্টা করলে—ইয়া আল্লা—

কিন্তু বোধ হয় তখন তার অন্তিম অবস্থা। সেই শব্দটুকু উচ্চারণ করবার শক্তিটুকুও তার নেই। সেই যে বুড়ো মুখ গুঁজড়ে পড়ে রইলো আর উঠলো না।

নজর কুলী তখন বিজয়ীর মতন তার গায়ের ওপর দু-চারটে লাথি মারলে। তাতেও সাড়া নেই সারাফত আলির। সারাফত আলি যেন তখন নিজের আরক খেয়ে অজ্ঞান--অচৈতন্য হয়ে সেখানে আচ্ছন্ন হয়ে আছে।

বাদ্‌শা এতক্ষণে বুঝতে পারলে। কোনো রকমে ভিড় ঠেলে যখন ভেতরে যেতে পারলে, ততক্ষণে সব শেষ, সব খতম—

নজর কুলী খাঁ এদিক-ওদিক চাইতে লাগলো।—মেহের? মেহের কোথায় গেল?

কে একজন বদ্‌ ছোকরা বুঝি রসিকতা করে বললে—পঞ্ছী ভাগ্‌ গয়ি—

আর ছোটমশাই! ছোটমশাই যখন দেখলে বুড়ো সারাফত আলি, খুশ্‌বু তেলের দোকানের মালিক, খুন হয়ে গেছে, তখন ভয়ে আঁতকে উঠলো! ঝগড়াটা কাকে নিয়ে? মরিয়ম বেগমসাহেবাকে নিয়ে নাকি?

সামনের একজনকে ছোটমশাই জিজ্ঞেস করলে—মেয়েটা কে?

—জনাব, সে চেহেল্‌-সুতুনের এক বাঁদী—

—কোথায় গেল সে?

—জনাব, সে ভাগ গয়ি।

—ভাগ্‌ গয়ি মানে? কোথায় ভাগ্‌ গয়ি? কোন্‌ দিকে?

—ওই দিকে। ওই চেহেল্‌-সুতুনের দিকে। ছুটতে ছুটতে আবার চেহেল্‌-সুতুনের ভেতরেই ঢুকে পড়েছে!

যেন বাজ ভেঙে পড়লো ছোটমশাই-এর মাথায়। মতিঝিল থেকে বেরিয়ে আর কোনো উপায় না দেখে ছোটবউ হয়তো কান্তবাবুর সঙ্গে এখানেই এসেছিল। ভেবেছিল এখানে এসে তারপর কোনো রকমে খবরটা পাঠাবে হাতিয়াগড়ে। তা আর হলো না। তার আগেই খুশ্‌বু তেলের দোকানের মালিক টের পেয়ে গেছে। তারপর মারামারি হাতাহাতি খুনোখুনি শুরু হয়ে গেছে। সেই ফাঁকে আর কোনো উপায় না পেয়ে আবার চেহেল্‌-সুতুনের ভেতরে গিয়ে ঢুকেছে—

তাড়াতাড়ি সেখান থেকে বেরোল ছোটমশাই!

আর দেরি করা চলে না। খবরটা গিয়ে দিতে হবে জগৎশেঠজীকে। আবার মহিমাপুরের দিকে চলতে লাগলো ছোটমশাই—

মরালী খুশ্‌বু তেলের দোকান থেকে বেরিয়ে নজর কুলী খাঁর বাড়ির দিকেই যাচ্ছিল। কিন্তু নহবত-মঞ্জিলে আবার বাজনার শব্দ শুনে কেমন যেন সন্দেহ হলো। আবার নহবত বেজে উঠলো কেন? নবাব কি তবে লড়াইতে জিতেছে। নবাবের ফৌজ লড়াই জিতে ফিরে আসবার খবর পৌঁছে গেছে?

সারা মুর্শিদাবাদ যেন পাগল হয়ে উঠেছে খুশীতে।

একজন বুড়ো মতন লোক দেখে মরালী জিজ্ঞেস করলে—কী হয়েছে শহরে? আপনি জানেন কিছু?

লোকটা মাথা থেকে পা পর্যন্ত দেখলে ভালো করে। তারপর নিঃসন্দেহ হয়ে বললে—জনাব কোন্‌ মুলুকের লোক?

মরালী আড়ষ্ট হয়ে গেল কথাটা শুনে। সন্দেহ করছে নাকি?

—জনাব কি নয়া এসেছেন মুর্শিদাবাদে?

মরালী আর দাঁড়ালো না সেখানে। একবার পেছন ফিরে দেখে নিলে লোকটা তাকে দেখছে কি না। তারপর আবার সামনের দিকে চলতে লাগলো। চড়া রোদ উঠেছে আকাশে।

কিন্তু খবরটা তখন মুখে মুখে ফিরছে।

—কী বললেন জনাব?

—হাঁ জী, নবাব খতম, নিজামত ভি খতম—

—তার মানে?

তারপর সব খবরটা বেরিয়ে এল। নবাব লড়াইতে হেরে গেছে। যা শুনেছিল, সব তা হলে সত্যি। ফিরিঙ্গী-ফৌজ মুর্শিদাবাদে আসছে। তা হলে কী হবে? সেই ক্লাইভ সাহেব এসে নবাব হবে মুর্শিদাবাদের? এই মুর্শিদাবাদের মসনদে বসবে?

সঙ্গে সঙ্গে আবার ফিরলো। সারাফত আলির খুশবু তেলের দিকে আবার চলতে লাগলো। ফিরিঙ্গী-ফৌজ আসবার আগেই যা-কিছু সব শেষ করে ফেলতে হবে। ঘসেটি বেগমসাহেবাও হয়তো সেই ঘুপচি ঘরের ভেতরে বসে বসে ভাবছে। নজর কুলী খাঁকে ডেকে দেবার কথা ছিল, তার জন্যে অপেক্ষা করছে।

কিন্তু কাছাকাছি আসতেই নজরে পড়লো খুশবু তেলের দোকানের সামনে অনেক মানুষের ভিড়। ওখানে কী হচ্ছে! তবে কি জানাজানি হয়ে গেছে যে, ঘসেটি বেগমসাহেবা বাঁদীর পোশাক পরে ওখানে লুকিয়ে আছে?

কী ভেবে মরালী সেখানেই খানিক দাঁড়িয়ে পড়লো। ওখানে আর যাওয়া চলে না। তা হলে কোথায় যাবে?

আবার চলতে লাগলো উল্টো দিকে। উল্টো দিকের পথও তো মহিমাপুরে যাবার পথ। জগৎশেঠজীর বাড়ির পথ। জগৎশেঠজীর কাছে যাবে? জগৎশেঠজীকে গিয়ে সব বলবে? এখন সত্যি কথাটা বলতে আর দোষ কী? এখন তো জানাজানি হলে আর কিছু ভয় নেই। এখন যদি জগৎশেঠজীকে গিয়ে একবার ছোটমশাইকে খবর দিতে বলে, তা কি আর তিনি দেবেন না?

জগৎশেঠজীকে গিয়ে স্পষ্টই বলে দেবে—আমি আসল মরিয়ম বেগম নই, আসল মরিয়ম বেগম মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের বাড়িতে আছে—আপনি হাতিয়াগড়ের ছোট-মশাইকে একবার খবরটা পাঠান—

আর তা ছাড়া এখন যদি মেহেদী নেসার সাহেব জানতেও পারে যে, রাণীবিবি সেজে শোভারাম বিশ্বাসের মেয়ে চেহেল্-সুতুনে এসেছিল, তাতেও কোনো ক্ষতি নেই। এখন তো সব ফিরিঙ্গী-রাজত্ব হয়ে যাচ্ছে। এখন তো নবাব হবে ক্লাইভ সাহেব!

মুখটা ফেরাতেই হঠাৎ দেখলে সচ্চরিত্র পুরকায়স্থ মশাই—

—একি, আপনি?

—হ্যাঁ মা, আমি—

—কোথায় যাচ্ছেন?

সচ্চরিত্র বললে—আমি মা চলে যাচ্ছি মতিঝিল ছেড়ে, শুনলাম নাকি ফিরিঙ্গী-ফৌজ মুর্শিদাবাদে আসছে?

—তা আর সবাই কোথায়?

—কেউ নেই মা, সবাই চাকরি ছেড়ে পালিয়েছে। আমিই বা আর থাকি কেন? একবার মোছলমান হয়েছি, এবার হয়তো আবার খিরিস্টান হতে বলবে—

বলে ইব্রাহিম খাঁ হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলো।

—আর কান্ত? সে কোথায় রইলো?

সচ্চরিত্র বললে—আমি বাবাজীকে অনেক করে বললাম আমার সঙ্গে আসতে। কিন্তু এল না—

—কেন?

—বাবাজী বললে—না, মেহেদী নেসার সাহেব যদি জানতে পারে, মরিয়ম বেগম সাহেবা পালিয়ে গেছে তো মরালীর ওপর অত্যাচার করবে! তার চেয়ে আমি এখানেই থাকি!

মরালী বললে—তা এখন তো আর কেউ নেই সেখানে, তবু কেন রইলো?

—ও মা, শুধু তোমার জন্যে! শুধু তোমার বিপদের কথা ভেবেই বাবাজী একলা পড়ে রইলো। আমি কত করে পালিয়ে যেতে বললাম, তবু শুনলে না। তোমার কথা ভেবে ভেবেই বাবাজী অস্থির। কেবল বলছে, মরালীর যেন কোনো ক্ষতি না হয়, আমার যা হয় হোক—একেবারে আস্ত পাগল!

মরালী বললে—চলুন, আপনিও আমার সঙ্গে চলুন, আমি নিজে গিয়ে তাকে বার করে আনছি।

সচ্চরিত্র বললে—তাই চলো মা, তাই চলো। আমার কথা তো বাবাজী শুনবে না, এখন তোমার কথা যদি শোনে—

মরালী তাড়াতাড়ি মতিঝিলের দিকে চলতে লাগলো। পেছন-পেছন সচ্চরিত্র পুরকায়স্থও চললো।

মতিঝিলের সামনে-পিছনে তখন মানুষের মিছিল, কিন্তু ভেতরটা ফাঁকা, আগে অন্যদিন যেখানে খিদ্‌মদ্‌গারদের জটলা চলতো, চবুতরার আশেপাশে যেখানে নবাব-বেগমদের তাঞ্জাম, পালকী-হাতী-ঘোড়ার জটলা হতো, সেখানেও কেউ নেই।

মরালীর মনটা তখনো পড়ে ছিল সেই সারাফত আলির দোকানে। মাত্র কিছুক্ষণের জন্য ছিল সেখানে। কিন্তু তারই মধ্যে দেখে এসেছিল কোথায় কোন্ ঘরে কেমন করে কান্ত থাকে। অন্ধকার ঘুপসি ঘরখানা। বাইরের আলো-বাতাস ঢোকে না সেখানে। তবু ওইখানেই দিনের পর দিন কাটিয়েছে।

—আচ্ছা, ঘটক মশাই, ওখানে অত ভিড় ছিল কেন বলুন তো?

—কোথায় মা?

—ওই যে সারাফত আলি সাহেবের খুশ্‌বু তেলের দোকানের সামনে?

সচ্চরিত্র বললে—কী করে বলবো মা, আজকে তো সব জায়গাতেই ভিড়। সবাই-ই তো মুর্শিদাবাদ ছেড়ে পালাচ্ছে। ফিরিঙ্গী-ফৌজের ভয়ে কেউ আর এখানে থাকতে চাইছে না।

—ফিরিঙ্গীরা এসে অত্যাচার করবে নাকি?

—না, তার জন্যে নয় মা। সবাই কাজকর্ম বন্ধ করে দিয়েছে যে। ভিস্তিরা আজ সকাল থেকে জল দেয়নি, যে-হাতিগুলো আছে পিলখানায় তারা খেতে পর্যন্ত পায়নি কাল থেকে। মুর্শিদাবাদের ঘাটে মদের জালার চালান এসেছে, কিন্তু আনতে যেতে পারিনি—

—কেন, আনতে যেতে পারেননি কেন?

—মতিঝিলের সরাবখানা কার ওপর ছেড়ে দিয়ে যাবো? দেখছো না মা, সকাল

বেলা নহবত-মঞ্জিল থেকে বাজনা শুরু হয়েছিল, তারপর হঠাৎ বলা-নেই কওয়া-নেই থেমে গেল! এমন কখনো আগে হয়েছে? এমন কখনো আগে হতে শুনেছো?

আশেপাশের লোকগুলো যে-সব আলোচনা করছে তাও কানে এল। কেউ বলছে ফিরিঙ্গী-ফৌজ আসছে, কেউ বলছে নবাব জগৎশেঠজীকে ডেকে পাঠিয়েছে আবার ফৌজ তৈরি করবার জন্যে! ফৌজ তৈরি করে কি নবাব আবার নতুন করে লড়াই করতে যাবে?

জগৎশেঠজীর তাঞ্জাম আসছিল মতিঝিলের সামনে দিয়ে। মরালী আর সচ্চরিত্র সরে দাঁড়ালো।

ঘটক মশাই বললে—শুনেছো মা, নবাব নাকি জগৎশেঠজীকে ডেকে পাঠিয়েছিল টাকার জন্যে।

—আপনাকে কে বললে? কার কাছ থেকে শুনলেন?

—নেয়ামত। ওই তো আমার মালিক। নবাব লস্কাবাগ থেকে একলা ফিরে আসার পর নেয়ামতও সেখান থেকে একটা ঘোড়া নিয়ে নবাবের পেছন-পেছন চলে এসেছে। সে যে একটু আগে মতিঝিলে এসেছিল—

—কী বললে সে?

—সে-ই তো আমাকে চলে যেতে বললে। বললে—ফিরিঙ্গী-ফৌজ নবাবের পেছনে পেছনে মুর্শিদাবাদে এসে পৌঁছচ্ছে। বললে—মুর্শিদাবাদ ছেড়ে পালিয়ে যেতে! এখন এই বুড়ো বয়েসে কোথায় যাই বলো তো মা? আমার আছে কে যে তার কাছে যাবো? তাই তো সেই কথা ভাবতে ভাবতেই যাচ্ছিলুম, এমন সময় তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল—

ততক্ষণে মতিঝিলের ভেতরে এসে গিয়েছিল দুজনে।

ফাঁকা মতিঝিল, ফাঁকা চবুতরা, ফাঁকা দালান। সমস্ত হাবেলিটা যেন খাঁ খাঁ করছে।

মরালীই আগে আগে উঠতে লাগলো সিঁড়ি দিয়ে।

ওপরের অলিন্দ পেরিয়ে একেবারে শেষ ঘরখানার সামনে গিয়ে দেখলে দরজা বন্ধ।

সচ্চরিত্র বললে—দরজা খোলাই আছে মা, ধাক্কা দাও, দরজা খুলে যাবে—

কিন্তু দরজাটা খুলতেই অবাক হয়ে গেল মরালী! কোথায়? কান্ত কোথায়?

সচ্চরিত্র পুরকায়স্থ মশাইও অবাক হয়ে গেছে, কোথায় গেল? কান্তবাবাজী কোথায় গেল?

সচ্চরিত্র বললে—এই তো আমি এখনই দেখে গেলাম বাবাজীকে। এই তো আমার সঙ্গে কথা হলো—

—কী কথা হলো?

—আমি বাবাজীকে বললাম—বাবাজী, এখন কেউ নেই, আমি পালিয়ে যাচ্ছি, তুমিও যেদিক পানে দু'চোখ যায় পালিয়ে চলো। তা আমার কথা শুনলে না। বললে—আপনি একলা চলে যান ঘটক মশাই, আমি যাবো না। আমি চলে গেলে মরালীকে ওরা ধরে ফেলবে—। তা তবু কত করে বললাম, কিছুতেই শুনলে না। তখন দরজার চাবিটা খুলে দিয়ে আমি বাবাজীকে রেখে চলে গেলাম—

মরালী জিজ্ঞেস করলে—আপনি এখান থেকে চলে যাবার পর আর কেউ এসেছিল?

সচ্চরিত্র বললে—কে আর আসতে যাবে মা এখানে। কারো তো এদিকে নজর দেবার সময় নেই। এখন যে সবাই চেহেল্-সুতুনের দিকে নজর দিচ্ছে। সেখানে যে যা পারে হাতাচ্ছে। শুনলাম নাকি ঘসেটি বেগমসাহেবা, যা'কে নবাব নজরবন্দী করে রেখেছিলেন, তিনি এই ফাঁকে গয়না-গাঁটি নিয়ে পালিয়েছেন।

মরালী চম্‌কে উঠলো। জিজ্ঞেস করলে—ঘসেটি বেগমসাহেবার কথা আপনাকে কে বললে?

—কে আবার বলবে মা। সকলের মুখে মুখে তো ওই এক কথা! আরো শুনছি নবাবের মা আমিনা বেগমসাহেবাকে নাকি নবাব নিজে হাতে-নাতে ধরে ফেলেছে—

—কেন?

—তিনি নাকি চেহেল্-সুতুনের মালখানা থেকে সোনা-জহরত গয়না-গাঁটি সরাচ্ছিলেন। তাঁকে নাকি কোতল্ করা হয়ে গেছে!

—আপনি ঠিক শুনেছেন?

সচ্চরিত্র বললে—তা কী করে বলবো মা। লোকের মুখে যা যা শুনলাম তাই তোমাকে বলছি। ওই সব শুনেই তো প্রাণটা ভয়ে কাঁপতে লাগলো। অবাক কাণ্ড মা, একদিন জাত গিয়েছিল বলে নিজেই ইছামতীতে ডুবে মরতে গিয়েছিলাম, এখন আবার সেই পোড়া প্রাণটার জন্যে পালিয়ে বাঁচবার চেষ্টা করছি—

—তাহলে এখন কী করবো? কী করা যায় বলুন তো?

সচ্চরিত্র বললে—আমিও তো তাই ভাবছি মা, কান্তবাবাজীকে আমি পই পই করে পালিয়ে যেতে বললাম, তখন গেল না। এখন কী যে হলো কে জানে!

মরালী বললে—শেষ পর্যন্ত আপনি চলে যাবার পর হয়তো চলেই গেছে—

—না, তা তো যাবার মত ছেলে নয় আমার বাবাজী।

মরালী জিজ্ঞেস করলে—কী করে বুঝলেন?

সচ্চরিত্র বললে—আমাকে যে বাবাজী সব বলেছে মা। তোমার সঙ্গে বিয়ে হয়নি বলে বাবাজীর মনে বড় কষ্ট ছিল যে! আমি বলতাম বাবাজীকে, সব কিছুর জন্যে আমিই দায়ী বাবাজী, তোমাদেরও বিয়েটা হলো না, আমারও সর্বনাশ হয়ে গেল।

তারপর একটু থেমে সচ্চরিত্র বলতে লাগলো—আর একটা কী কথা জানো মা, বাবাজী আমাকে বরাবর বলতো—আমিই মরালীর জাত খেয়েছি পুরকায়স্থ মশাই, আমিই চেহেল্-সুতুনে মরালীকে এনে পুরেছি—

মরালী বললে—কিন্তু যা হয়ে গেছে তা নিয়ে কেন ভাবতো ও?

সচ্চরিত্র বললে—সেই কথা কে বলে বাবাজীকে! বাবাজী কেবল সেই কথা ভেবে ভেবে মন-মরা হয়ে থাকতো। আমি কতবার বলতাম—তোমার কী ভাবনা বাবাজী, তোমার বয়েস আছে, তুমি আর একটা বিয়ে করে নিয়ে আবার ঘর-সংসার করো গে, কিন্তু কার কথা কে শোনে!

—চলুন, ঘটক মশাই, এখানে দাঁড়িয়ে কোনো লাভ নেই।

সচ্চরিত্র বললে—কিন্তু তুমি কোথায় যাবে মা এখন?

—আপনি? আপনি কোথায় যাবেন?

—আমার কথা ছেড়ে দাও মা, আমি আবার একটা মানুষ! আমার প্রাণটার ভারি তো দাম। তুমি কোথায় যাবে বলো?

মরালী বললে—আমার কথা আপনাকে আর ভাবতে হবে না ঘটক মশাই,

আপনি আপনার কথা ভাবুন—

সচ্চরিত্র বললে—তা কি কখনো হয় মা? তোমাকে এ-সময়ে কি একলা ছেড়ে দিতে পারি? মুসলমান হয়ে গিয়েছি বলে কি আমি মানুষ নই মা? আমারও তো হিন্দু মেয়ে আছে—

—তাহলে আপনি কোথায় যাবেন?

সচ্চরিত্র বললে—তুমি যেখানে যাবে মা, আমি সেখানেই যাবো—

মরালী বললে—আমার তো কোনো যাবার জায়গাও নেই ঘটক মশাই, আমি হাতিয়াগড় থেকে এসেছিলুম, চেহেল্‌-সুতুনে ঢুকে আপনার মতই একদিন জাত খুইয়েছিলুম, এখন আবার সেই চেহেল্‌-সুতুনও যে গেল। আমি এখন কোথায় যাই?

সচ্চরিত্র বললে—আমার কথা যদি শোনো মা, এখন তোমার এই মুর্শিদাবাদে থাকা উচিত নয়, শুনেছি ফিরিঙ্গী-ফৌজ আসছে। এ-সময়ে তারা এসে যদি নবাবের নিজামত কেড়ে নেয় তো মহামারী কাণ্ড হবে মা—তার চেয়ে মা তুমি হাতিয়াগড়ে চলো, আমি তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছি—

—কিন্তু ওদের কী হবে ঘটক মশাই? ওই ছোট বউরানীর? আমি হাতিয়া-গড়ে গেলে যদি কারো নজরে পড়ে যাই?

সচ্চরিত্র বললে—তোমার বাপের কাছে তুমি থাকবে, কে তোমায় দেখবে? আর এদিকে নিজামতের তো এই অবস্থা, নবাবী থাকে কিনা তাই দেখো আগে—

—তাহলে তাই-ই চলুন—

সচ্চরিত্র বললে—তাহলে আমার সঙ্গে এসো, সোজা মুর্শিদাবাদের ঘাটে গিয়ে নৌকো ধরবো। জলপথে যাওয়াই ভালো, ওখানে মাঝি-টাঝিদের সঙ্গেও আমার ভাব আছে, আমি সরাবখানার ভাঁড়ারি বলে—চলো—

মরালী সচ্চরিত্র পুরকায়স্থর সঙ্গে মতিঝিলের বাইরে এল। তখন রাস্তায় আরো ভিড়। মুর্শিদাবাদের মানুষ তখন দিশেহারা হয়ে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে।

লক্কাবাগের প্রান্তরে তখন বাঙলা-মুলুকের ভাগ্য নির্ণয় শেষ হয়ে গেছে। তখনো রক্তের দাগ লেগে আছে জল-কাদার মাটিতে। যে আমগাছগুলো কত বছর ধরে কত পাখিকে আশ্রয় দিয়েছে, কত ফল ফলিয়েছে, কত বর্ষা শীত বসন্তের নীরব সাক্ষী হয়ে মানুষের উত্থান-পতনের ইতিহাস লক্ষ্য করেছে তারাও সেদিন রেহাই পায়নি। কোনোটার গায়ে বুলেটের গর্ত, কোনোটার ডালপালা আগুনে পুড়ে গেছে। কোনোটা দিশি কামারের তৈরি কামানের ঘায়ে উপড়ে গেছে।

ময়দাপুরের ছাউনিতে যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে, তখন এক মনে ক্লাইভ হাতে কাগজ-কলম নিয়ে ভাবছিল। সেই লক্কাবাগের কথাগুলোই বার বার মনে পড়ছিল তার।

সব জিনিসের যেমন একটা শেষ আছে, দুর্ভাগ্যেরও যে একটা শেষ থাকবে তাতে আর আশ্চর্য হবার কী আছে? ময়দাপুরের আকাশটার দিকে চেয়ে দেখতে দেখতে রবার্ট ক্লাইভ কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেল।

খবরটা প্রথম দেয় মেজর কিল্‌প্যাট্রিক।

—স্যার, নবাব পালিয়ে গেছে!

তখন মাথার ওপর আকাশটা ভেঙে পড়লেও বোধ হয় অমন করে চমকে উঠতো না সেণ্ট ফোর্ট ডেভিডের কম্যান্ডার।

বললে—হোয়াট?

চম্‌কে উঠেছিল কিল্‌প্যাট্রিক। ক্লাইভকে এত উত্তেজিত হতে দেখেনি কখনো আগে। তখন চারদিকে সোলজারদের চিৎকার আর কাত্‌রানি। খালের জল লাল হয়ে গেছে নিরীহ সেপাইদের রক্তে। চারদিকের গাছের ডাল থেকে ধোঁয়া উঠছে। সেই আগুন, হত্যা আর মৃত্যুর মধ্যে হঠাৎ জীবনের সংবাদ এলে চম্‌কে ওঠারই তো কথা।

—আর ইউ শিওর? তুমি ঠিক শুনেছো?

আশ্চর্য! আশ্চর্যই বটে! এই ময়দাপুরের ছাউনিতে সবাই যখন প্রাণ ভরে ঘুমোচ্ছে তখন সেই কথাগুলো ভাবতে ভালো লাগে বই কি। ক্লাইভ আবার গিয়ে উঠলো সেই বাড়িটার ছাদে। নবাবের সেই শিকার করবার বাড়িটার ছাদে। সত্যিই, নবাবের ছাউনিটা দূর থেকে দেখা যাচ্ছে। সেখানে যেন অনেক হট্টগোল। এলো-পাতাড়িভাবে নবাবের জেনারেলরা গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বেড়াচ্ছে।

কিল্‌প্যাট্রিক পেছনে দাঁড়িয়ে ছিল। বললে—মীরজাফর তার কথা রেখেছে কর্নেল—

কিন্তু ওদিক থেকে ফরাসী জেনারেল সিন্‌ফ্রে তখনো পুরো দমে লড়াই করে চলেছে। তাদের এক-একটা গোলা এসে সামনের সেপাইদের সামনে ফেটে পড়ছে।

ক্লাইভ বললে—কুইক কিল্‌প্যাট্রিক—এবার আমাদের আর্মি নিয়ে ওদের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে—চলো—

কিল্‌প্যাট্রিক মেজর হলে কী হবে, আসলে ছেলেমানুষ। শুধু ছেলেমানুষই নয়, সংসারী মানুষ। সংসারী মানুষরা লাভ-লোকসান খতিয়ে বিচার-বিবেচনা করে কাজ করে। কিন্তু অত বিচার-বিবেচনা করতে গেলে কি যুদ্ধ করা চলে? তুমি যদি অত বিচার-বিবেচনা করে চলো তো সংসারী মানুষ হিসেবে তোমার উন্নতি হবে। কিন্তু জীবনটা তো সংসার নয় মেজর। তোমরা সুখী হবে, তোমরা হয়তো চাকরিতেও উন্নতি করবে। আজ মেজর আছ, কাল হয়তো কর্নেলও হবে। কিন্তু এম্পায়ার? এম্পায়ার তৈরি করতে হলে সেই আমাকেই দরকার হবে যে!

কাল তোমরা সবাই অবাক হয়ে গিয়েছিলে। আমি যখন নবাবের আর্মিকে অ্যাটাক করবার জন্যে তোমাদের অর্ডার দিলুম, তোমরা ভয় পেয়ে গিয়েছিলে কিল্‌প্যাট্রিক। আমাদের আর্মি ছোট, আমাদের সেপাই কম, আমাদের গুলি-গোলা-বারুদ কম। তোমরা ভেবেছিলে আমরা ওদের আর্মির চাপে পিষে গুঁড়িয়ে যাবো! কিন্তু এখন?

আজ এই ময়দাপুরে এসে সবাই তোমরা ঘুমোচ্ছো কিন্তু আমার চোখে ঘুম নেই কেন বলতে পারো?

না, তোমাদের এ-প্রশ্নের জবাব দেবার দরকার নেই। এর জবাব দেবে হিস্ট্রি। হিস্ট্রিই একদিন উত্তর দেবে আমি কাল ভালো করেছিলাম না খারাপ করেছিলাম। আর তা ছাড়া এ তো যুদ্ধ নয় মেজর। ইণ্ডিয়ানরা যদি যুদ্ধই করতো তো

কোথায় থাকতে তুমি, কোথায় থাকতো কোম্পানী, আর কোথায় থাকতাম আমি। এতক্ষণ আমার ডেড্-বডি ভাসতো লক্কাবাগের খালে।

—কে?

ক্লাইভের মনে হলো কে যেন সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। কে তুমি? হু আর ইউ?

বাইরে অর্ডার্লিটা পর্যন্ত এমন অঘোরে ঘুমোচ্ছে যে ঘরে কে ঢুকলো তা টের পায়নি!

সেণ্ট ফোর্ট ডেভিড জয় করার পরও একবার এমনি হয়েছিল। যখন মনটা একলা থাকে, তখনই কে যেন এসে সামনে দাঁড়ায়।

—কে তুমি? হু আর ইউ?

বেশ লম্বা-চওড়া ম্যান্‌লি চেহারা। দেখে মনে হয় ইউরোপীয়ান। কেন এমন হয়? কেন এরা আসে? কেন এসে বার বার তাকে বিরক্ত করে?

—আমাকে চিনতে পারছো না কম্যাণ্ডার? আমি আগে অনেকবার এসেছি যে তোমার কাছে?

ক্লাইভ কোমরের পিস্তলটায় হাত দিলে।

—ওখানে হাত দিও না কম্যাণ্ডার। ওতে আমার কিছুই হবে না। আমি মরি না।

—কিন্তু হু আর ইউ? কেন তুমি আমার কাছে আসো বার বার?

লোকটা বললে—আমি সাক্‌সেস!

—সাক্‌সেস্?

—হ্যাঁ, যে-লোক ভাগ্যের সঙ্গে লড়াই করে বড় হয়, আমি তাদের সঙ্গেই দেখা করি। দেখা করে সাবধান করে দিই। সাবধান করে দেওয়াই যে আমার কাজ কর্নেল। তুমি এবার বড় হয়েছো। তুমি ম্যাড্রাসের সেণ্ট ফোর্ট ডেভিড্ জয় করেছো, চন্দননগরের ফোর্ট জয় করেছো, এবার বেঙ্গলও নিয়ে নিলে!

ক্লাইভ হুঙ্কার দিয়ে উঠলো—কী বলতে এসেছো, বল শিগ্‌গির,—আমার সময় নেই—

লোকটা হেসে উঠলো—মানুষ যখন সাক্‌সেসফুল হয়, তখন তার সময় থাকেই না কর্নেল। তবু সময় করে নিতে হয়। সেই কথাটা বলতেই আমি এসেছি। একদিন তোমার কিছু ছিল না। একদিন তোমার টাকা ছিল না, বন্ধু ছিল না, সংস্থান ছিল না। সেদিনের কথা কি তোমার মনে পড়ে?

—কিন্তু মনে পড়ে লাভ কী? সে-কথা কেন মনে করতে যাবো এখন?

—আমি যে সেই কথা মনে পড়িয়ে দিতে এসেছি কর্নেল। মনে পড়া যে ভালো।

—কেন মনে পড়া ভালো? আমি নিজের ক্ষমতায় ভাগ্যের মাথায় উঠেছি। কেন আমি সে কথা মনে রাখবো? কেন মনে রেখে মন খারাপ করবো?

লোকটা বললে—আমি জানি, তুমি ওই কথাই বলবে। কিন্তু এটা চিনতে পারো?

রবার্ট ক্লাইভ দেখেই চিৎকার করে উঠলো—না—না—না—

আর সেই চিৎকার শুনে অর্ডার্লিটা দৌড়ে ঘরে এসেছে—হুজুর—

ওদিক থেকে কিল্‌প্যাট্রিক, আয়ার কুট সবাই ঘুম ভেঙে দৌড়ে এসেছে।

—হোয়াটস্ আপ্ কর্নেল? কী হয়েছে? কী হয়েছে কর্নেল?

ক্লাইভ লজ্জায় পড়ে গেল। এমন করে ভয় পাওয়া উচিত হয়নি ক্লাইভের। পলাশীর ব্যাট্‌ল্‌ জয় করে ভীরুর মত চেঁচিয়ে উঠেছে সে! ও লোকটা কেন আসে? কেন ওটা দেখায় তাকে? ওটা তো শুধু একটা তাস!

আবার সবাই যে-যার ঘরে ফিরে গেছে। আগের দিন যুদ্ধ করে সবাই ক্লান্ত হয়ে আছে। মিছিমিছি আবার সকলের ঘুমের ব্যাঘাত হলো। আবার লিখতে চেষ্টা করলে ক্লাইভ। ডেস্‌প্যাচটা লিখতে বসেও নানা রকম বাধা আসে।

জোর করে কলম চালিয়ে যেতে লাগলো—'প্লাসীর ব্যাট্‌ল্‌-এ আমরা জিতেছি। নবাব প্যালিয়ে গেছে মুর্শিদাবাদে। আমি আর্মি নিয়ে তার পেছন-পেছন চলেছি। আমাদের পক্ষে মারা গেছে সাত জন হোয়াইট ইংরেজ, আর ষোলজন সেপাই। আর ইন্‌জিওরড্‌ হয়েছে তেরোজন গোরা আর ছত্রিশজন সেপাই। নবাবের জেনারেল মীরজাফর আলি আমার সঙ্গে দাউদপুরে দেখা করেছিল। পাছে সে আমাকে সন্দেহ করে তাই আমি তাকে আলিঙ্গন করে পাশে বসিয়েছি। বলেছি—'তোমাকেই আমি মুর্শিদাবাদের নবাব করবো জেনারেল।' আমার কথা শুনে মীরজাফর আলি খুব খুশী। আমি তাকে মুর্শিদাবাদে গিয়ে নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলার কী মতলব তা জানিয়ে আমাকে খবর দিতে বলেছি। আমি এখন আর্মি নিয়ে ময়দাপুরে ক্যাম্প করে আছি। মীরজাফরের লেটার এলে তবে আমি বেঙ্গলের ক্যাপিটেলে নিজে যাবো।'

চিঠিটা খামের মধ্যে পুরে মুখটা বন্ধ করে দিলে। সকাল হলেই চিঠিটা পাঠিয়ে দিতে হবে হোমে। আর একটা চিঠি পেগীকে লিখলে হতো। কিন্তু সে পরে দিলেও চলবে।

তারপর ক্লাইভ বিছানার ওপর গা এলিয়ে দিলে। আলোটা জ্বলুক। ওটা জ্বললে তবু মনে হয় যেন সে বেঁচে আছে। অন্ধকার হলে যেন বড় ভয় করে ক্লাইভের।

কিন্তু কোথা দিয়ে যে কখন তন্দ্রা এসেছিল তার খেয়ালই নেই। হঠাৎ চোখ চাইতেই নজরে পড়লো বাইরের সেই অন্ধকার আকাশটা কখন আলোয় আলো হয়ে গেছে।

—অর্ডার্লি!

অর্ডার্লি দৌড়তে দৌড়তে ঘরে এসেছে। হরিচরণটা নেই। সেটা সেই বেঙ্গলী লেডীজদের নিয়ে চলে গেছে। তার জায়গায় এই নতুন অর্ডার্লিটা এসেছে।

—হুজুর, কলকাতা থেকে মুন্‌শী এসেছে!

—মুন্‌শী? নিয়ে এস ভেতরে।

কলকাতার কেল্লা থেকে সারা পথ নৌকোয় এসে ঠিক সময়েই মুন্‌শী দাউদপুরে এসেছিল। সেখানে এসে শুনেছিল সাহেব মনিব ময়দাপুরের দিকে গেছে। রাত্রেই এসে পৌঁছেছিল এখানে। কিন্তু রাত্রে আর কাউকে বিরক্ত করেনি। ছাউনির বাইরেই চাদর মুড়ি দিয়ে পড়েছিল।

সাহেবের ঘরের ভেতরে ঢুকে সাহেবের পায়ের ধুলো নিয়ে টিপ্‌ করে একটা প্রণাম করলে। তারপর পায়ের ধুলোটা মাথার টিকিতে ছোঁয়ালে!

ক্লাইভ বললে—কী মুন্‌শী, কী খবর?

নবকৃষ্ণ মুনশী বললে—হুজুর, আজ পনেরো দিন আমি মা-সিংহবাহিনীর পুজো করেছি। কাল হঠাৎ মায়ের মাথা থেকে পুজোর ফুল পড়লো—

—ফুল পড়লো মানে?

—হুজুর, আমার মানত্ ছিল কি না। মাথার ফুল পড়লে তবে বুঝবো যে হুজুর লড়াইতে জিতেছেন। আমার মা-সিংহবাহিনী জাগ্রত মা কি না।

ক্লাইভ হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে গেল। রাত্রের স্বপ্নের কথাটা মনে পড়লো। মুন্শীকে স্বপ্নের কথাটা বলবে নাকি!

বললে—আচ্ছা, মুন্শী তুমি স্বপ্ন দেখো?

—আজ্ঞে, স্বপ্ন? রোজ দেখি!

—কী স্বপ্ন দেখো?

নবকৃষ্ণ বললে—আজ্ঞে, স্বপ্ন দেখি যেন হুজুর রাজ-রাজ্যেশ্বর হয়েছেন, আর আমি পদতলে বসে হুজুরের সেবা করছি—

—না না, ও স্বপ্ন নয়। অন্য কোনো স্বপ্ন দেখো না?

—না হুজুর, রোজ ওই একই রকম স্বপ্ন দেখি!

ক্লাইভ বার বার দ্বিধা করতে লাগলো। তারপর বলে ফেললে—আচ্ছা, রাত্রে কোনো দিন স্বপ্নে তোমার ঘরে কেউ ঢোকে না?

—রাত্রে কেন কেউ ঘরে ঢুকবে হুজুর। আমি তো ঘরের দরজা বন্ধ করে শুই।

ক্লাইভ বললে—কিন্তু স্বপ্নে দরজা বন্ধ থাকলেও কেউ ঘরে ঢুকতে পারে তো?

—তা তো পারে।

—তা সেই রকম ভাবে ঢুকে তোমাকে কেউ কিছু দেখায় না?

—কী দেখাবে হুজুর?

—ধরো তাস!

—তাস?

মুন্শী নবকৃষ্ণ অবাক হয়ে গেল। সাহেবের কি মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, তাস। শুধু একটা তাস। কুইন অব্ স্পেড্স। ইস্কাবনের বিবি!

নবকৃষ্ণ আরো অবাক হয়ে গেল সাহেবের কথা শুনে।

—যাক্ গে, ওসব তুমি বুঝবে না মুন্শী! সত্যিই তো। সবাই কি সব বোঝে! ওই সাক্সেস। কেন যে সাক্সেস বার বার মানুষের মূর্তি ধরে ক্লাইভের সামনে এসে ওই তাস দেখায়! কে জানে, হয়তো সাক্সেস মানেই ইস্কাবনের বিবি। সাক্সেস মানেই কুইন অব স্পেড্স। সাক্সেস মানেই কি তবে মায়া। সাক্সেস হওয়া কি তবে ভালো নয়! সাক্সেস মানেই কি তার ডেথ্! সাক্সেস মানেই কি তবে মৃত্যু!

ম্যাড্রাসে ওই লোকটা বলেছিল—তুমি বড় হতে চেও না ক্লাইভ। বড় হওয়া মানেই সাক্সেসফুল হওয়া। সাক্সেসফুল হওয়া মানেই যন্ত্রণা পাওয়া। তুমি সাধারণ হতে চেষ্টা করো, স্বাভাবিক হতে চেষ্টা করো, সহজ হতে চেষ্টা করো। তবেই শান্তি পাবে—

হঠাৎ বাইরে বিগল্ বেজে উঠলো।

—কেউ এল নাকি মুন্শী?—অর্ডার্লি!

অর্ডার্লি ঘরে এসে স্যালিউট করলে।

—হুজুর, মীরজাফর আলি সাহেব তার ছেলে মীরন আলিকে হুজুরের সঙ্গে দেখা করতে পাঠিয়েছেন।

ক্লাইভ বললে—ভেতরে নিয়ে এস—

মীরন ভেতরে এসে কুর্নিশ করে দাঁড়ালো।

—কী খবর মীরন আলি?

—হুজুর, নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলা মুর্শিদাবাদ ছেড়ে পালিয়ে গেছে। আমার বাপজান মীরজাফর আলি সাহেব সেই খবর দিতে পাঠিয়েছেন আপনার কাছে।

—নবাব! নবাব পালিয়েছে? কোথায়?

—তা জানি না। চর গেছে চারদিকে তালাস করতে।

ক্লাইভ উঠলো। কোথায় গেল তার ক্লান্তি, কোথায় গেল তার স্বপ্ন। অর্ডার্লিকে ডেকে বললে—মেজর কিল্‌প্যাট্রিক সাহেবকে সেলাম দেও—

অর্ডার্লি কুর্নিশ করে বাইরে হুকুম তামিল করতে চলে গেল।

ডিহিদার রেজা আলি এমন সময় মুর্শিদাবাদে এসেছিল, যখন তার না এলেও চলতো। কিন্তু না এলে বোধ হয় আর উদ্ধব দাসের 'বেগম মেরী বিশ্বাস' কাব্য লেখাও হতো না।

মতিঝিল থেকে যখন সবাই চলে গেছে, একটা খিদ্‌মদ্‌গারও নেই, ইব্রাহিম খাঁও চলে গেছে চাবির গোছা রেখে, তখন কান্ত ঘরের মধ্যে একলা চুপ করে বসে ছিল।

না, সে কিছুতেই এখান থেকে যাবে না। তার জন্যে যদি মরালী নিঃশব্দে মুক্তি পায় তো পাক। মরালীর জন্যে সব শাস্তিই সে মাথা পেতে নেবে। নিয়ে তার সব অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করবে! কেন সে পালাবে? প্রাণের ভয়ে? নিজের প্রাণটাই তার কাছে বড় হলো?

বহুদিন আগের একটা কথা হঠাৎ মনে পড়লো। চক্‌-বাজারের রাস্তায় একদিন সেই গণৎকারটা তার হাত দেখে বলেছিল—যার সঙ্গে আপনার বিয়ে হবার কথা ছিল, তার সঙ্গে আবার বিয়ে হবে বাবুজী!

আরো একটা কথা বলেছিল সে। বলেছিল—জল থেকে একটু সাবধান থাকবেন বাবুজী, জলেই আপনার ভয়—

তা হোক, নিজের জন্যে আর তার ভয় নেই। ভয় মরালীর জন্যে। মরালী সুখী হোক, মরালী বিপদ-মুক্ত হোক। তা হলেই সে হাসিমুখে মৃত্যু বরণ করবে! সে জলই হোক আর আগুনই হোক।

হঠাৎ দরজা খোলার শব্দ হলো। কান্ত তাড়াতাড়ি বোরখায় মুখ ঢেকে ফেললে।

দরজা খুলতেই কান্ত দেখতে পেলে, ভেতরে ঢুকছে মেহেদী নেসার সাহেব, ডিহিদার রেজা আলি আর বশীর মিঞা।

বোরখার আড়াল থেকে তিনজনকে দেখে কান্তর বুকটা প্রথমে আঁতকে উঠেছিল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই মনে হলো কীসের ভয় তার! সে তো মরতেই এসেছে। মৃত্যুর ভয় থাকলে সে তো আগেই পালিয়ে যেত মতিঝিল থেকে। সে

তো মরালীর জন্যেই মরছে। মরালী যদি বাঁচে, মরালী যদি রক্ষে পায়, তাহলে তো তার মরেও সুখ!

মেহেদী নেসার সাহেব বোধ হয় খুব ব্যস্ত ছিল। কিন্তু ডিহিদার রেজা আলি সাহেবই তাকে জোর করে ধরে এনেছে।

মেহেদী নেসার বললে—ঐ মরিয়ম বেগমসাহেবা?

বশীর মিঞা বললে—হ্যাঁ, খোদাবন্দ্ তো নিজেই মরিয়ম বেগমসাহেবাকে এখানে রেখে দিয়ে গিয়েছিলেন!

ডিহিদার রেজা আলি বললে—লেকিন জনাব, হাতিয়াগড়ের আসলি রাণীবিবি এ নয়—

—কেন?

ডিহিদার বললে—হাতিয়াগড়ের রাজাসাহেব খাত্-খেলাপি করেছে নিজামতের সঙ্গে। আসলি রাণীবিবি বলে নকলি রাণীবিবি চালিয়ে দিয়েছে।

মেহেদী নেসার বললে—সবুত্ কোথায়? প্রমাণ তো চাই, শুধু বললে তো চলবে না।

ডিহিদার বললে—সবুত্ আমার কাছে আছে জনাব। দফ্তরে মনসুর আলি মেহের সাহেবের কাছে সে-সবুত্ রেখে দিয়েছি। আমি জনাবকে দেখাতে পারি। আসলি বলে ঝুটা চালিয়ে দিয়েছে রাজাসাহেব।

বশীর মিঞা বললে—খোদাবন্দ্ হুকুম দেন তো এই একে পুছতে পারি।

—দূর বেত্তমিজ, ওকে জিজ্ঞেস করলে তো ও ঝুট্ বলবে।

ডিহিদার বললে—তাহলে জনাব, ওকে চেহেল্-সুতুনে বন্ধ্ করে রেখে দিন—

—কেন? এখানে মতিঝিলে কীসের ক্ষতি?

ডিহিদার রেজা আলি বললে—না জনাব, মতিঝিলে এখন কোনো খিদ্মদ্গার নেই, ফটকের পাহারাদার ভি নেই, সবাই ভেগে গেছে। যদি এখান থেকে ভেগে যায়?

মেহেদী নেসার বললে—বহোত্ আচ্ছা, মরিয়ম বিবিকে চেহেল্-সুতুনের পীরালি খাঁ কি নজর মহম্মদের হাতে জিম্মা দিয়ে আয়—তারপর আমার হাত খালি হলে আমি দেখবো। জনাব এখন খিঁচ্ড়ে আছে, জগৎশেঠজী ভি খিঁচ্ড়ে আছে, আমার এখন অনেক কাজ—

বলে পেছন ফিরলো। ডিহিদার বশীর মিঞাকে ইঙ্গিত করতেই সে মরিয়ম বেগমের দিকে চেয়ে বললে—আইয়ে বেগমসাহেবা, মেরা সাথ আইয়ে—

কান্ত ভালো করে নিজেকে বোরখার আড়ালে ঢেকে নিয়ে উঠলো। তারপর তিনজনের পেছন পেছন চলতে লাগলো।

চবুতরায় নেমে একটা পালকি দাঁড়িয়ে ছিল। তাতেই উঠতে বললে। কান্ত পালকির ভেতর উঠে বসতেই পালকির পাল্লা দুটো বশীর মিঞা বন্ধ করে দিয়েছে। তারপর আর কিছু দেখা যায় না। পালকিটা দুলতে দুলতে চলতে লাগলো।

তারপর একটা সময়ে নহবতের সুরটা আরো স্পষ্ট হয়ে উঠলো। বোঝা গেল চেহেল্-সুতুনের দিকেই নিয়ে যাচ্ছে তাকে। আস্তে আস্তে বাইরের লোকজনের হল্লা-চিৎকার কমে এল।

কোথায় কোন্ জায়গায় তাকে রাখবে কে জানে। জানাজানি হয়ে গেলে তাকে

বন্দী করেও রাখতে পারে, কোতল করেও ফেলতে পারে!

পাল্কির ভেতরে বসে বসেই কান্ত বোরখার মধ্যে ঘেমে নেয়ে উঠলো। তবু তুমি কিছু ভেবো না মরালী। আমার জন্যে তুমি কিছু ভেবো না। আমি যেখানে যেমন ভাবেই থাকি, তোমার মঙ্গল-কামনা করবো। আমি মনে অন্তত এই ভেবে শান্তি পাবো যে, তুমি সুখী হয়েছো। যদি পারো, তুমি এই মুর্শিদাবাদ থেকে চলে যেয়ো। আর যদি সেই উদ্ধব দাসকে খুঁজে পাও তো তাকে নিয়েই সংসার করে সুখী হবার চেষ্টা করো।

হঠাৎ পাল্কিটা যেন একটু দুলে উঠলো!

কোথায় এলো সে? নহবতটা যেন ঠিক মাথার ওপরেই বাজছে। তবে বোধ হয় চেহেল্-সুতুনের ভেতরে ঢুকলো এতক্ষণে পাল্কিটা।

বশীর মিঞার গলা শোনা গেল।

—নজর মহম্মদ!

ওদিক থেকে নজর মহম্মদের জবাব এল।

—কেয়া বাত্?

—মতিঝিল থেকে মরিয়ম বেগমসাহেবাকে এনেছি পাল্কি করে, মেহেদী নেসার সাহেবের হুকুম। একে তালা বন্ধ করে এর মহল্লে রেখে দিবি।

—কেন, কী কসুর করেছে মরিয়ম বেগমসাহেবা?

বশীর বুঝি রেগে গেল। বললে—সে খবরে তোর কাম কী? মেহেদী নেসার সাহেব হুকুম দিয়েছে, তুই বিলকুল তামিল করবি—যা—

নজর মহম্মদের মেজাজটা বোধ হয় তখন চড়া ছিল। বললে—লেক্ন বেগমসাহেবা ভেগে গেলে আমার কিছু কসুর নেই!

—কেন, ভাগবে কেন? ঘরে তালা বন্ধ্ করে রাখলে ভাগবে কী করে?

—আরে জনাব, চেহেল্-সুতুনের ভেতরে ইন্কিলাব শুরু হয়ে গেছে। ঘসেটি বেগমসাহেবা ভি ভেগে গিয়েছিল।

—কে বললে? বশীর মিঞা শুধু একলাই চম্কায়নি, বোরখার ভেতরে কান্তও চম্কে গিয়েছিল খবরটা শুনে।

বশীর মিঞা বললে—তারপর? তারপর কী হলো?

—হুজুর, নবাব তো চেহেল্-সুতুনে এসেছে। খাস-দরবারে জলুস হচ্ছে। সবাই চুরি ভি করছে!

বশীর মিঞা বোধ হয় আরো অবাক হয়ে গেল। চুরি? কে চুরি করছে? কী চুরি করছে?

—হুজুর, আমিনা বেগমসাহেবা বমাল গ্রেফ্তার হো গিয়া!

বশীর মিঞা বললে—সে কী রে? বলছিস কী তুই নজর?

—হাঁ জী, আমিনা বেগমসাহেবা মালখানার সিন্দুক খুলে জেবর-এবর সব কিছু চুরি করছিল, অচানক্ ধরা পড়ে গেছে। ইন্কিলাব্ শুরু হয়ে গেছে চেহেল্-সুতুনে, সেই জন্যেই তো বলছিলাম।

—তা নবাব কোথায়? নবাব কিছু বললে না?

নজর মহম্মদ বললে—নবাব তো খাস-দরবার থেকে বেরিয়ে এখন বেগম-মহলে এসেছে, নানীবেগমসাহেবার মহলে ঢুকেছে—

বশীর মিঞারও বোধ হয় তখন আর সময় ছিল না। বললে—আমি চললুম, তুই মরিয়ম বেগমসাহেবাকে সামলে রাখিস, যেন খোয়া যায় না—

বশীর চলে গেল। পালকিটা তারপর আরো এগিয়ে গিয়ে থামলো এক-জায়গায়। সেখানে পালকিটা থামতেই দুটো দরজা খুলে গেল।

নজর মহম্মদ বললে—আইয়ে বেগমসাহেবা—

কান্ত বোরখাটা ঢেকে নিয়ে নজর মহম্মদের পেছন-পেছন একটা ঘরে গিয়ে পৌঁছুলো। সেই মরালীর ঘরখানা। এই ঘরটাতেই কতদিন লুকিয়ে লুকিয়ে এসেছে সে। এই নজর মহম্মদই কতদিন তাকে ঘুষ পেয়ে এখানে নিয়ে এসে তুলেছে। তারপর অনেক রাত পর্যন্ত মরালীর সঙ্গে কাটিয়ে দেবার পর আবার সুড়ঙ্গের পথে বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছে।

নজর ঘরের ভেতরে পৌঁছে দিয়েই বাইরে চলে গেল। যাবার আগে বললে—আপনার যদি কিছু জরুরৎ থাকে তো হুকুম করবেন আমাকে, আমি তামিল করবো। কিছু দরকার আছে?

কান্ত বললে—না—

নজর মহম্মদ বললে—বাইরে থেকে আমি তালা-চাবি বন্ধ করে যাচ্ছি—

বলে বাইরের দরজায় চাবি বন্ধ করে চলে গেল।

কান্ত বোরখাটা খুলে আয়নার সামনে নিজের চেহারাটা দেখলে। ঠিক যেমন করে মরালী মরিয়ম বেগম সাজতো তেমনি করেই সাজিয়ে দিয়েছে তাকে। যদি কেউ দেখতেও পায় হঠাৎ চট্ করে চিনতে পারবে না।

কান্ত খাটের ওপর গিয়ে শুয়ে পড়লো। খানিকক্ষণের জন্যে সে নিশ্চিন্ত। খানিকক্ষণের জন্যে অন্তত কেউ তাকে আর বিরক্ত করবে না। আর কোনো রকমে যদি দুটো দিন এমনি করে এখানে কাটিয়ে দিতে পারে তো ততক্ষণে মরালী মুর্শিদাবাদ ছাড়িয়ে অনেক দূর চলে যেতে পারবে। অনেক দূর। এমন জায়গায় চলে যাবে যেখানে নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলা নেই, মেহেদী নেসার নেই। সফিউল্লা, ইয়ারজান, কেউ নেই। জগৎশেঠ, উমিচাঁদ, নন্দকুমার কেউ নেই যেখানে, সেখানে গিয়েই মরালী তার সংসার পাতবে। সুখে শান্তিতে দিন কাটাবে সে। আর কেউ তাকে বিরক্ত করবে না তার রূপের জন্যে, তার যৌবনের জন্যে, তার বয়েসের জন্যে। তার অসহায়তার সুযোগ নিয়ে যেখানে কেউ তাকে অত্যাচার করবে না।

তুমি চলে যাও মরালী। যত তাড়াতাড়ি পারো চলে যাও। আমার কথা ভেবো না। আমি তোমার জন্যে সব কষ্ট হাসিমুখে সহ্য করবো। আমার কোনো কষ্ট হবে না। আমাকে যদি এরা কোতল করে তবু আমি এই ভাবতে ভাবতে বিদায় নেবো যে তুমি সুখে আছ, তুমি শান্তিতে আছ।

হঠাৎ কান্তর মনে হলো চেহেল্-সুতুনের মধ্যেও যেন গোলমাল শুরু হয়েছে। অনেক মানুষের গলার আওয়াজ কানে এল। অনেক বেগম, অনেক খোজার গলা। কিন্তু কারো গলাই চিনতে পারলে না।

তবু কান্ত সেই দিকে কান পেতে রইলো।

নানীবেগমসাহেবার শরীরে বিশ্রাম নেই, চোখে ঘুম নেই। সেই যে শেষ রাত্রের দিকে মতিঝিলে গিয়েছিল মরিয়ম বেগমকে দেখতে, তারপর মীর্জা এসেছে। কিন্তু মীর্জার সঙ্গে ভালো করে কথা বলবার আগেই সে চলে গিয়েছিল খাস্-দরবারে।

তারপর হঠাৎ পীরালি খাঁর কাছ থেকে খবর পেয়েই দৌড়ে এসেছিল মালখানার ঘরে। সত্যিই, পীরালি খাঁ যা বলেছে তাই।

—তুই? তুই এখানে?

নিজের পেটের মেয়ে আমিনা। মীর্জারই মা। সেই আমিনারই কি না এই কাণ্ড?

আমিনা বেগম প্রথমটায় হকচকিয়ে গিয়েছিল। মালখানার চাবি কোথা থেকে জোগাড় করে একেবারে সিন্দুকটা খুলে ফেলেছিল। এ টাকা কি শুধু তার ছেলের? শুধু মুর্শিদাবাদের নবাবের? নবাবের নিজামতেরই টাকা এগুলো? এর ভেতরে যা কিছু সম্পত্তি আছে সব তো বেগমদেরই। বেগম, চেহেল্-সুতুন, সব কিছুর জন্যেই মুর্শিদাবাদের নবাবরা জমিয়ে রেখে গেছে এই মালখানায়।

অনেকগুলো জিনিসই আস্তে আস্তে সরিয়ে ফেলেছিল আমিনা। কেউ জানতে পারেনি।

হঠাৎ পেছন থেকে নানীবেগমসাহেবার গলা পেয়ে চম্‌কে উঠে চুপ করে দাঁড়ালো।

—এ কী, তুই? তুই এখানে? মালখানার চাবি পেলি কোত্থেকে?

নানীবেগমসাহেবা নিজের চোখ দু'টোকেও যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না।

—এ তুই কী করেছিস—আমিনা? মীর্জার জিনিস তুই চুরি করেছিস? তোর পেটের ছেলের জিনিসে হাত দিচ্ছিস?

কিন্তু আমিনাও চিৎকার করতে জানে!

—ছেলে? আমার পেটের ছেলে? আমার ছেলে তার মা'র দিকে কখনো ফিরে দেখেছে?

—বলছিস কী তুই? তুই যে আমাকে অবাক করলি আমিনা? তুই বলছিস কী? মীর্জা তোর পেটের ছেলে নয়?

আমিনাও গর্জে উঠলো—মীর্জা যদি আমার পেটের ছেলে হবে তো সে তার মা'র দিকটা দেখেছে কখনো? মা'র সুবিধে-অসুবিধের কথা কখনো ভেবেছে?

—সে কী রে? সে তোরও সুবিধে-অসুবিধে দেখেনি কখনো? তুই মীর্জার মা হয়ে এই কথা বলতে পারলি?

আমিনা বললে—বলবো না? জানো, তোমার মীর্জা আমার কত টাকার লোকসান করিয়েছে? আমার আশী হাজার টাকার সোরা সমস্ত আট্‌কে গেল মীর্জার জন্যে! এখন ঐ সোরা আমি কার কাছে বেচবো?

নানীবেগমসাহেবা গালে হাত দিলে—তা হ্যাঁ রে, মীর্জার এই বিপদের দিনে তোর আশী হাজার টাকার সোরাটাই বড় হলো? মীর্জা কিছু নয়? মীর্জা কেউ নয়?

দেখতে দেখতে বুঝি আরো কয়েকজন বেগম ধারে-কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল। তারাও মা-মেয়ের ঝগড়া শুনতে লাগলো। চেহেল্-সুতুনের বাঁদী খোজারাও এসে হাজির হলো। মা আর মেয়ে যত গলা চড়ায়, ততই ভিড় জমে যায় মালখানার সামনে।

হঠাৎ ঠিক সেই সময়েই গোলমাল শুনে খাস-দরবার থেকে মীর্জা মহম্মদ সেখানে এসে হাজির হয়েছিল।

নানীবেগমসাহেবা প্রথমে বুঝতে পারেনি কেমন করেই বা বুঝবে। নিজের মায়ের কাণ্ড দেখে হয়তো হতবাক্ হয়ে গিয়েছিল কিছুক্ষণের জন্যে। নবাবী যার

মাথার ওপর তার বুঝি মুখে কিছু বলতে নেই। মুখে কিছু বললেই সব অপরাধ তারই ঘাড়ে পড়ে।

শুধু বলেছিল—নানীজী, আমার বুকের ওপর আজ ছুরি বসিয়ে দিতে পারো তুমি?

নানীবেগম আঁত্‌কে উঠেছিল কথাটা শুনে।

—আহা, তুই কী বলছিস মীর্জা? তোর মুখে কি কিছু আটকায় না?

মীর্জা বলেছিল—আমি ঠিক কথাই বলছি নানীজী! জগৎশেঠজীর কী দোষ, মীরজাফর সাহেবের বা উমিচাঁদজীর কী দোষ, ফিরিঙ্গীর বাচ্ছা ক্লাইভেরই বা কী দোষ! সব দোষ আমার নানীজী, সব দোষ আমারই। আমার বুকে ছুরি বসিয়ে দিলেই এখন আমি শান্তি পাই—

নানীজী মীর্জাকে দুই হাতে ধরে ঠেলে দিয়ে বলেছিল—তুই তোর মহলে যা মীর্জা। তোর মাথায় এখন সব গোলমাল হয়ে গেছে, তোর মতির ঠিক নেই এখন—

মীর্জা বলেছিল—ঘরে-বাইরে কোথাও আমার জন্যে এতটুকু শান্তি নেই নানীজী! কোথাও গিয়ে আমি শান্তি পাবো না—এতক্ষণ বোধ হয় ক্লাইভ মুর্শিদাবাদে আসবার জন্যে রওয়ানা দিয়েছে। আমি কী করি নানীজী? আমি কী করি?

—কেন, জগৎশেঠজী তোকে টাকা দিলে না?

মীর্জা বললে—না। বললে অত টাকা এখন দিতে পারবে না।

তারপর হঠাৎ নিজেকে নানীজীর হাত থেকে ছাড়িয়ে নিলে। বললে—ঠিক আছে, নানীজী, আমি কারোর দয়া-মায়া চাই না। কারো কাছে জীবনে কখনো ভিক্ষে চাইনি। কেউ আমাকে ভালোবাসেনি, আমি কারো কাছ থেকে ভালবাসা চাইও নি। কেউ যখন আমার নয় আমিও কারোর নই। কারোর জন্যে আমি ভাববো না। আমার যা খুশী তাই করবো—

বলে তাড়াতাড়ি বাইরের দিকে চলে গেল।

নানীজী পেছন থেকে ডাকলে—মীর্জা, মীর্জা, ওরে শোন্, শোন্ মীর্জা—

কিন্তু মীর্জা তখন চেহেল্-সুতুন পেরিয়ে বাইরে চলে গেছে।

নানীবেগম হঠাৎ চারদিকে চেয়ে চিৎকার করে উঠলো—তোরা এখানে কী দেখছিস দাঁড়িয়ে? তোরা কী দেখছিস? যা এখান থেকে সবাই, বেরিয়ে যা সামনে থেকে—যা, বেরিয়ে যা—

পেশমন বেগম, তক্কি বেগম, বব্বু বেগম, শিরিনা, সাকিনা, মামুদা, জবীন্, সবাই সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

তারপর আমিনার দিকে চেয়ে নানীবেগম বললে—পোড়ারমুখী, তুই ডাইনী, আমার পেটে তুই ডাইনী জন্মেছিলি। কেন তুই মরলি না? কেন তুই মরতে পারলি না মেঘনার দরিয়াতে? তোর মুখ দেখলেও পাপ হয়। মা হয়ে তুই ছেলের মরা-মুখ দেখতে চাস্, তোর মরণ হয় না? তুই কী? তুই মানুষ না জানোয়ার?

আমিনাও কম নয়। আমিনাও কিছু একটা জবাব দিতে যাচ্ছিল। হঠাৎ পীরালি খাঁ দৌড়তে দৌড়তে এল।

—নানীবেগমসাহেবা, নবাব খাজাঞ্চীখানায় গেল।

—কেন রে, সেখানে কী করছে?

—নবাব মোহরার সাহেবকে হুকুম দিয়ে দিয়েছে নিজামতে যার যত টাকা বকেয়া

পাওনা আছে, সব দিয়ে দিতে। চক্-বাজারের রাস্তায় পেয়াদারা ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে দিতে গেছে!

কথাটা শুনে নানীজীর যেন বাক্‌রোধ হয়ে গেল। আর কোনো কথা বেরোল না মুখ দিয়ে। সত্যিই তখন চক্-বাজারের রাস্তার মানুষরাও অবাক হয়ে গেছে ঢ্যাঁড়া পেটানোর শব্দ শুনে।

—কী গো? কী বলছে পেয়াদারা?

যে-যেখানে ছিল, সবাই দৌড়ে কাছে এল।

—নবাব মীর্জা মহম্মদ হেবাৎ জঙ্ সিরাজ-উ-দ্দৌলা আলম্‌গীরের হুকুম-নামা—

—কী হুকুমনামা হে—কী হুকুমনামা?

—যার যা বকেয়া পাওনা আছে, নিজামতের খাজাঞ্চীখানায় গেলেই আজ সব পাওনা শোধ হবার হুকুমনামা বেরিয়েছে। খাজাঞ্চীখানা খোলা আছে, মুর্শিদাবাদের মানুষ-জন সেখানে হাজির হয়ে পাওনা-গণ্ডা বুঝিয়া লইবা...

আধা-বাঙলা আধা-উর্দুতে সকলের বোধগম্য করে পেয়াদারা চিৎকার করছে আর ডিম্ ডিম্ করে ঢোল-সহরৎ দিচ্ছে।

ঢোল-সহরৎ শুনে মানুষ-জন আর বাগ মানে না। সবাই ছুটলো খাজাঞ্চীখানার দিকে। নিজামতের খাজাঞ্চীখানার ক'জনই বা লোক। হাজার হাজার লোক গিয়ে হাজির হয়েছে সেখানে। যে যা পারছে টাকা বুঝে নিচ্ছে। না থাক পাওনা, মুফত্ টাকা যখন পাওয়া যাচ্ছে তখন নিয়ে নাও। ফিরিঙ্গী-ফৌজ তো আসবেই। তার আগে কিছু টাকা নিয়ে যেদিকে দুচোখ যায় সেই দিকেই পালাবো।

যারা মুর্শিদাবাদ ছেড়ে দূরে পালিয়ে যাচ্ছিল, পালিয়ে যাবার জন্যে নৌকোয় উঠেছিল, তারাও নেমে পড়লো। টাকা দিচ্ছে, নিতে হবে না? টাকা যে জীবনের চেয়েও দামী গো!

মানুষের লোভ, মানুষের পাপ, মানুষের প্রবৃত্তি সব যেন সেদিন সহস্রবাহু হয়েই গ্রাস করেছিল মুর্শিদাবাদকে। একদিন যারা বর্গীর অত্যাচার থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যে নিজামতের মুখের দিকে চেয়ে আশায় বুক বেঁধেছিল, সেদিন তারাই আবার নিজামতের মুখে পদাঘাত করতে দ্বিধা করলে না। তাদের কাছে নিজামতও যা, ফিরিঙ্গী-কোম্পানীও তাই। কেউ আমাদের আপন নয়। রাজার যেদিন সুদিন ছিল তখন আমাদের কথা ভাবেনি, এখন রাজার দুর্দিনে আমরাই বা তার কথা ভাববো কেন? আমরা সাধারণ প্রজা, আমাদের নিজের সুখ-সাচ্ছন্দ্য আমাদের নিজেদেরই দেখে নিতে হবে। আর নবাবের সুখ-সুবিধে? সেটা নবাব নিজেই বুঝুক! তুমি কি আমাদের কথা কখনো ভেবেছো? আমাদের দুঃখ-কষ্ট কখনো দূর করবার চেষ্টা করেছো?

রাত যখন চার প্রহর তখনো খাজাঞ্চীখানায় মানুষের ভিড় কমে না। দাও, আমাকে আগে দাও। পেছন থেকে আর একজন বলে—আমাকে আগে! তারপর সবাই একসঙ্গে বলে ওঠে—আমাকে আগে! এমন দিন হয়তো আর আসবে না। এমন রাতও হয়তো ইতিহাসে কখনো পুনরাবৃত্তি হবে না। খাজাঞ্চীখানার টাকা, ও প্রজাদেরই টাকা। ওতে আমার আর এতটুকু অধিকার নেই। আমি তোমাদের নবাব। তোমাদের দুঃখের দিনে আমি তোমাদের দোখীন। আমি অন্যায় করেছি। কিন্তু এখন আমাকে একটু ন্যায় করতে দাও। তোমাদের দান করে একটুখানি পুণ্যসঞ্চয় করতে দাও। তারপর আমার যা-কিছু আছে, সব তোমাদের দেওয়া

শেষ হয়ে গেলে আমি এই মসনদ ছেড়ে চলে যাবো। তোমাদের আশীর্বাদ চাই না, তোমাদের করুণাও চাই না, তোমাদের স্নেহ-ভালবাসা-মমতা, কিছুই আমি চাই না। হালিসহরের সেই এক কবি ছিল, সে আমাকে যে-গান শুনিয়েছে, সেই গান শোনার পর থেকেই আমি সব ছেড়ে চলে যেতে চেয়েছিলাম। আজকে আমার সেই যাবার দিন এসেছে। তোমরা যত খুশী নিয়ে নাও, যার যত খুশী। খাজাঞ্চীখানার দরওয়াজা তোমাদের জন্যেই আমি খুলে রেখেছি। কেউ বলো না যে, আমি পাইনি, আমার কিছু পাওয়া হয়নি, নবাব আমাকে কিছুই দেয়নি।

হঠাৎ চেহেল্-সুতুনের ভেতরে সে-রাত্রে একটা পেঁচা ডেকে উঠলো।

নবাব চারদিকে চাইলে। লুৎফার বোধ হয় একটু তন্দ্রা এসেছিল। গায়ে হাত লাগতেই জেগে উঠেছে।

—এ কী, তুমি?

—আমি চললুম।

—একলা কোথায় যাবে?

—যেদিকে পথ খোলা পাবো।

—কিন্তু তোমাকে আমি একলা ছেড়ে দিতে পারবো না। আমি তোমার সঙ্গে যাবো।

—কেন তুমি আমার সঙ্গে যাবে? আমি তো তোমাকে কোনো দিন ভালোবাসিনি। আমি তো রাত্রে কোনো দিন তোমার ঘরেও শুতে আসিনি। আমি তোমার কাছ থেকে বরাবর মুখ ফিরিয়ে রেখেছি। তোমাকে স্ত্রীর মর্যাদাটুকু পর্যন্ত আমি দিইনি!

লুৎফা বললে—তা হোক, আমি যাই তোমার সঙ্গে। তুমি মানা করো না—

—তা হলে চলো!

টিম্ টিম্ করে একটা তেলের আলো জ্বলছিল চেহেল্-সুতুনের একটা ছোট্ট কুলুঙ্গিতে। তার সামনে একটা ছায়া নড়ে উঠতেই পীরালি খাঁ চমকে উঠেছে—কৌন্ হ্যায়?

—আমি।

পীরালি গলা শুনেই কুর্নিশ করলে। নবাব।

—মরিয়ম বেগম কোন্ মহলে?

পীরালি বললে—মরিয়ম বেগমকে আজ সকাল বেলা মেহেদী নেসার সাহেব মতিঝিল থেকে ধরে এনে এখানে নজরবন্দী করে রেখেছে জাঁহাপনা!

—একবার আমাকে নিয়ে চল তো মরিয়ম বেগমসাহেবার কাছে?

পীরালি বললে—দরজায় তালা দেওয়া আছে। নজর মহম্মদের কাছ থেকে চাবি এনে খুলে দিচ্ছি জাঁহাপনা—

বলে দৌড়ে অন্ধকারের মধ্যে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। কিন্তু তখনই আবার মনে হলো, কেন আবার তাকে কষ্ট দেওয়া। হিন্দুর বউ সে, হিন্দুর মেয়ে। নিজের জীবনের দুর্ভাগ্যের সঙ্গে কেন আবার তাকে জড়াবে! আমি চলে গেলেই যদি মুর্শিদাবাদে শান্তি আসে তো আসুক। আমিই তো আসল পাপী, তাই আমিই চলে যাচ্ছি। তোমরা ওদের কষ্ট দিও না মীরজাফর আলি সাহেব। ওদের কোনো দোষ নেই। ওরা আমার বেগম ছিল। আমার অপরাধের জন্যে ওদের তোমরা শাস্তি দিও না। আল্লার নাম করে বলছি আমি চিরকালের মত দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছি, আর কখনো ফিরে আসবো না, ফিরে আসতে চেষ্টাও করবো না।

কান্ত ঘরের ভেতরে চুপ করে শুয়ে ছিল। ঘুম আসছিল না। হঠাৎ দরজার তালা খোলার শব্দে উঠে বসেছে। কে?

কোনো উত্তর নেই।

কান্ত আবার বললে—কে?

আর কোনো সাড়া-শব্দ নেই।

শুধু অন্ধকার ঘরের ভেতর থেকে মনে হলো যেন কয়েকটা ফিসফিস শব্দ, কতকগুলো খসখস পায়ের আওয়াজ ঘরের পাশ দিয়ে কোথায় দূরে গিয়ে মিলিয়ে গেল। আর খানিক পরেই আবার একটা পেঁচার ডাক। চেহেল্‌-সুতুনের ভেতরেও পেঁচা আছে নাকি?

মুর্শিদাবাদ ঘাট থেকেই নৌকো নিয়েছিল সচ্চরিত্র পুরকায়স্থ। কিন্তু সহজে কি নৌকো পাওয়া যায়। মাঝিরা বলে—দিনমানে নৌকো ছাড়লে কেউ সন্দেহ করবে, রাতের বেলায় ছাড়বো—

সচ্চরিত্র বলেছিল—কেন, সন্দেহ করবে কেন?

মাঝিরা বলেছিল—আজ্ঞে মিঞা সাহেব, নিজামতের চরেরা সন্দেহ করবে, ভাববে সোনা-দানা নিয়ে পালাচ্ছে। চারদিকে বড় চর লেগেছে—

তা তাই-ই সই। সেই রাত্রের দিকেই নৌকোটা ছেড়েছিল। হাতিয়াগড়ের দিকে যেতে হবে। একটু তাড়া আছে। তার বেশি কিছু খুলে বলেনি সচ্চরিত্র। নৌকোটা ছপাৎ ছপাৎ করে দাঁড় বেয়ে বেয়ে চলেছে। মরালীর মুখে কথা নেই। একটার পর একটা গ্রাম ছেড়ে চলেছে আর কেবল মনে পড়েছে কান্তর কথা। কোথায় রইলো সে। কোথায় কে তাকে ধরে রাখলে? এতদিনের সম্পর্কটা দিনে দিনে বড় জটিল হয়ে উঠেছিল। কিন্তু আজ চলে যাবার মুখে যে এতটা টান পড়বে তা বুঝতে পারেনি আগে!

সচ্চরিত্র একবার শুধু বললে—তুমি একটু ঘুমোতে চেষ্টা করো না মা—

মরালী বললে—ঘুম যে আসছে না—

সচ্চরিত্র বললে—চেষ্টা করলেই ঘুম আসবে। আর বাবাজীর জন্যে ভেবেই বা কী করবে, ভগবানের যদি ইচ্ছে থাকে তো বাবাজীর মঙ্গলই হবে। বাবাজী তো কোনো দিন কারো ক্ষতি করেনি।

হঠাৎ একটা জায়গায় আসতেই মনে হলো কে যেন চিৎকার করে উঠলো।

—হল্ট্‌—হল্ট্‌—

মরালী ভয়ে চমকে উঠেছে।

—ও কী বলছে ঘটক মশাই? ও কারা?

নৌকোটার মাঝিরা অতটা খেয়াল করেনি। তারা চালিয়েই যাচ্ছিল।

আবার পাড়ের ওপর থেকে চিৎকার এল—হল্ট্‌—হল্ট্‌—

চারদিকে অন্ধকার হয়ে এসেছে। দুর্যোগের সময় নৌকোতে আলো জ্বালতে বারণ করেছিল সচ্চরিত্র। আগেই বলে দিয়েছিল—একটু সাবধানে নিয়ে যাবে বাবা আমাদের—দিন-কাল ভালো নয়—

দিন-কাল যে ভালো নয় তা মুর্শিদাবাদের মাঝিরাও জানতো। ক'দিন থেকেই কোনো সোয়ারি নেই। আর মাল আসা-যাওয়া তো বন্ধই হয়েছে আগে থেকে। ফিরিঙ্গীদের সঙ্গে লড়াই বাধবার সময় থেকে। যারা কারবার করে, তাদের মাল কেনবার খদ্দের নেই। যারা খদ্দের, তারাও মাল কিনে ঘরে তুলতে ভরসা পায় না। মাল শুধু তো কিনলেই চলবে না, তাকে আবার বেচতেও হবে। কিন্তু কাকে বেচবে? যারা বেশি মুনাফা করবে বলে মাল লুকিয়ে রেখেছে, তারাও ভরসা পাচ্ছে না বেচতে। যদি দাম পড়ে যায়! আরো কিছু দাম বাড়ুক, তখন বেচবো। আবার তা ছাড়াও, আজ না-হয় নবাব সরকার আছে, কিন্তু ফিরিঙ্গীরা যদি হঠাৎ এসে পড়ে এখানে, তখন টের পেলে মাল কেড়ে নিতেও পারে। তখন দামও পেলাম না, মুনাফাও পেলাম না, অথচ মালও খোয়া গেল।

তাই মাঝিরা রাত্রে যাতায়াতের সময় আলো নিবিয়ে দিয়ে অন্ধকারে চলাফেরা করছিল।

কিন্তু এমন যে হবে, তা আগে কল্পনা করা যায়নি।

ওপর থেকে তখনো শব্দ আসছে—হল্ট্—

এ তো ফিরিঙ্গীদের গলা। এ ভাষাও তো ফিরিঙ্গীদের।

সচ্চরিত্র ভয় পেয়ে গিয়েছিল। মাঝিদের দিকে চেয়ে বললে—নৌকো ঘোরাও গো তোমরা, নৌকোর মুখ ঘোরাও—

মাঝিরা কথার মানে বুঝতে পারেনি।—কী বলছে ওরা খাঁ সাহেব? কে ওরা?

সচ্চরিত্র বললে—মানে কি আমিই বুঝেছি? নৌকো ঘোরাও—ফিরিঙ্গী-ঘাঁটি ওটা—

মাঝিরা বললে—নৌকো ঘুরিয়ে কোন্ দিকে যাবো? আবার সেই মুর্শিদাবাদ?

—তা, কী আর করা যাবে? মরলে নবাবের হাতেই মরা ভালো। ফিরিঙ্গীদের হাতে মরতে যাই কেন বুড়ো বয়সে—

মরালী এতক্ষণে ব্যাপারটা বুঝে নিয়েছিল। বললে—না, নৌকো ঘোরাতে হবে না, পাড়ে ভেড়াও—

সচ্চরিত্র বললে—কেন মা, নৌকো পাড়ে ভেড়াতে বলছো কেন? শেষকালে যে ফিরিঙ্গী-বোম্বেটেদের হাতে পড়বো?

মরালী বললে—তা হোক ঘটক মশাই, এখন পালাতে গেলে বিপদ হবে। আমার মনে হচ্ছে আমরা ফিরিঙ্গী-সেপাইদের হাতে পড়েছি।

ফিরিঙ্গী সেপাই! কথাটা শুনেই সচ্চরিত্র পুরকায়স্থ মশাই ভয়ে শিউরে উঠলো।

মরালী মাঝিদের জিজ্ঞেস করলে—এটা কোন্ জায়গা, তোমরা জানো?

মাঝিরা বললে—বাবু, এ তো ময়দাপুর।

তা হলে মরালী যা ভেবেছিল তাই-ই ঠিক হয়েছে। ক্লাইভ সাহেব ফৌজ নিয়ে তো এখানেই ঘাঁটি করে রয়েছে। কথাটা চক-বাজারের রাস্তার লোকের মুখেই তো শুনে এসেছে সে।

সচ্চরিত্র পুরকায়স্থ মশাই তখন থরথর করে কাঁপছে। মরালী বুড়ো মানুষকে এক হাত দিয়ে ধরলে।

বললে—আপনি কিছু ভাববেন না ঘটক মশাই, আমি তো আছি। ভয় কি?

সচ্চরিত্র বললে—আমি তো তোমার জন্যেই ভাবছি মা। যদি ওরা জানতে পারে, তুমি মেয়েমানুষ, তা হলে কি আর বেটারা ছেড়ে কথা বলবে?

মরালী বললে—সে জানতে পারবে না ঘটক মশাই।

মাঝিরা তখন নৌকো পাড়ে ভেড়াচ্ছিল। পাড়ের ওপর অনেকগুলো লোক অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে। তারাও আস্তে আস্তে নদীর কিনারায় নেমে আসছে।

সচ্চরিত্র বললে—ওরা যদি তোমার গায়ে হাত দেয়, তা হলে কিন্তু আমি সহ্য করবো না, তা বলে রাখছি মা—

মরালী বললে—আপনি উত্তেজিত হবেন না। আপনি বেশি কথাও বলবেন না। ঠাণ্ডা হয়ে থাকবেন, যা বলবার আমিই বলবো।

সচ্চরিত্র বললে—তুমি ওদের চেনো না মা, তাই অমন কথা বলছো। ওদের বিশ্বাস নেই, ওরা গরু-শোর খায়, তা জানো?

মরালী বললে—হ্যাঁ তা জানি, ক্লাইভ সাহেবের সঙ্গে আমার জানা-শোনা আছে—

—জানা-শোনা আছে মানে?

মরালী বললে—একবার আমি বরানগরে ক্লাইভ সাহেবের ছাউনিতে গিয়েছিলাম। লোকটা ভালো।

—ভালো মানে? তুমি বলছো কী?

মরালী বললে—ভালো মানে ভালো। বাইরে থেকে যা শোনা যায়, তার সবটুকু সত্যি নয়। হাজার হোক ফিরিঙ্গী হলেও লোকটা মানুষ তো বটে!

—তুমি ওকে মানুষ বলো? ফিরিঙ্গীরা দেশের কত ক্ষেতি করেছে, তা জানো?

—সব জানি বলেই ওই কথা বলছি ঘটক মশাই। বুদ্ধিতে আমার সঙ্গে পারবে না। একবার ওর দফতর থেকেই ওরই সামনে থেকে একটা জরুরী চিঠি চুরি করে এনেছিলাম। দেখুন না, আমাকে দেখলে কী বলে?

সচ্চরিত্র বললে—কিন্তু মা, তোমাকে চিনতে পারবে কী করে? তুমি তো এখন বেটাছেলে সেজে আছ?

মরালী বললে—না চিনতে পারলে তো ভালোই, কিন্তু চিনতে পারলেও ক্ষতি নেই—

—কেন?

—ওই ক্লাইভ সাহেবের ছাউনিতেই হাতিয়াগড়ের ছোটরানী অনেক দিন ছিল, ওদের খুব যত্নে রেখেছিল সাহেব। ওদের মুখেই আমি সাহেবের প্রশংসা শুনেছি—

ততক্ষণে কতকগুলো ফিরিঙ্গী নৌকো ঘাটে ভিড়তেই সামনে এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

—হ্যাণ্ডস্ আপ্! হ্যাণ্ডস্ আপ্—

সচ্চরিত্র মানে বুঝতে পারলে না।

—হাত উঠাও, হাত উঠাও,—হাত উপর উঠাও—

মরালী নিজের দুটো হাত ওপরে উঁচু করে তুললো। সচ্চরিত্র পুরকায়স্থ তার দেখাদেখি হাত ওঠালো। মাঝিরাও উঠে হাত তুলে দাঁড়ালো।

তারপর সেপাইরা সামনে বন্দুক উঁচু করে ধরে বললে—ওঠো, ওপরে চলো—

আগে মরালী—

তার পেছনে সচ্চরিত্র পুরকায়স্থ।

আর তার পেছন-পেছন মাঝিরা।

সবাই সেই অন্ধকারের মধ্যে পা ফেলে ফেলে উঁচু পাড় ভেঙে ডাঙার ওপরে উঠতে লাগলো।

জগৎশেঠজীর হাবেলির ভিখু শেখ সেদিন একটু বেশি গরম হয়ে গিয়েছিল। ক'দিন ধরেই যেন সব নিয়ম-মাফিক চলছে না। যে-সময়ে হাবেলিতে লোক আসা নিয়ম, সে সময়ে আসছে না। যে-হাবেলিতে ভিখু শেখ পাহারাদার, সে যে-সে হাবেলি নয়, এইটেই ছিল তার বড় ইজ্জত। সেই ইজ্জতেই যেন ক'দিন থেকে আঘাত লেগেছে।

—কৌন্ হ্যায়? কৌন?

তারপর যখন দেখেছে মীরজাফর সাহেব, তখন মাথা নিচু করে কুর্নিশ করেছে।

আবার খানিক পরেই আর একজন।

—কৌন হ্যায়? কৌন্?

তারপর যখন দেখেছে রাজা দুর্লভরাম, তখন মাথা নিচু করে কুর্নিশ করেছে।

এমনি করে লোক আসার যেন আর বিরাম নেই। এক-এক করে সারা মুর্শিদাবাদের তামাম রেইস আদমী এসে হাজির হয়েছে মহিমাপুরে। কেউ আর পাঞ্জা দেখায় না। পাঞ্জা দেখাবার কিংবা পাঞ্জা দেখবার দরকারই হয় না। আর শহর মুর্শিদাবাদও হয়েছে তেমনি। শহরের যত বেকার আদমী সব বিলকুল রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে। ক্যা হুয়া? হুয়্যা হ্যায় ক্যা?

ভিখু শেখ নিজের মনে নিজেকেই প্রশ্ন করে। সবাই কি পাগল হয়ে গেল? সবাই দিমাগ হারিয়ে ফেললে?

—কৌন্ হ্যায়?

চারদিকে যেন সবাই দিওয়ানা হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। লোক দেখেই নেশার ঘোরে ভিখু শেখ চিৎকার করে ওঠে—কৌন্ হ্যায়?

ওটা যেন ওর বুলি। বলতে বলতে মুদ্রাদোষে দাঁড়িয়ে গেছে। মানুষের ছায়া দেখলেও বলে, মানুষের গন্ধ পেলেও বলে। কোথা থেকে হঠাৎ এত মানুষের আমদানি হলো শহরে, তা সে বুঝতে পারে না। ভোর রাত থেকে আসা-যাওয়া শুরু হয়েছে, তা তখনো থামেনি।

এই মহিমাপুর-মহারাজার হাবেলির সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই ভিখু শেখ তার জীবনটা কাটিয়ে দিয়েছে। কিন্তু বুঝতে পারেনি যে, তার চোখের আড়ালে এই দুনিয়াটা কত তাড়াতাড়ি আসমান-জমিন বদলে যাচ্ছে। বুঝতে পারেনি যে, শুধু বন্দুক দিয়ে পাহারা দিলেই সবকিছু নিরাপদ থাকে না। বুঝতে পারেনি যে, তার দৃষ্টি আর তার বন্দুকের আড়ালে আর-একটা দুনিয়া আছে, যেখানে আর-একজন অদৃশ্য ভিখু শেখ আরো কঠোর আরো তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে মানুষের মনের হাবেলির সব ফটকগুলো পাহারা দিচ্ছে। ভিখু শেখ সেই ভিখু শেখকে চেনে না বলে জগৎশেঠজীর হাবেলির ফটক পাহারা দেয়, আর চিৎকার করে বলে—কৌন্ হ্যায়?

কিন্তু না-জানাই বোধ হয় ভিখু শেখদের পক্ষে মঙ্গল। জানলে অমন বিশ্বস্ত

হয়ে আর পাহারাও দিত না। অমন কথায়-কথায় চেঁচাতোও না। জগৎশেঠজীর বাস্তব-সংসারটাও ভিখু শেখদের অভাবে অচল হয়ে যেত। ভিখু শেখরাও চাকরি ছেড়ে দিয়ে মুলুকে ফিরে গিয়ে উপোস করে মরতো।

কিন্তু এ-সব কথা ভিখুদের শেখানোও হয় না; ভিখু শেখরাও এ-সব কথা শিখতে চায় না। ভিখু শেখরা বলে—তুমি আমার মালিক, আমি তোমার সেবা করেই জীবন সার্থক করবো। আমার চোখের সামনে আমার গাফিলতিতে হাবেলির মালিক বদলিয়ে যাবে, তা আমি সহ্য করবো না।

তবু ইতিহাসের অমোঘ পরিহাসে এক-একবার ভিখু শেখদের চোখ খুলে যায়। তারা দেখে, তাদের পাহারা দেওয়া সত্ত্বেও হঠাৎ কখন রাজ্যপাট বদলে গেছে, হঠাৎ কখন মসনদ জগৎশেঠজীদের হাতছাড়া হয়ে গেছে।

১৭৫৭ সালের ২৫শে জুন সেই ঘটনাই ঘটলো।

সকাল বেলা মীরজাফর আলি শহরে ফিরে এসেই খবর পেলে, জগৎশেঠজীকে ডেকে পাঠিয়েছে নবাব। রাজা দুর্লভরামও আর দেরি করেনি। সবাই জগৎশেঠজীর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।

চেহেল্-সুতুনের আম-দরবার থেকে ফিরতেই ভিখু শেখ এক লাফে সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে কুর্নিশ ঠুকেছে।

—কে কে আছে ভেতরে?

দেওয়ান রণজিৎ রায় বললে—রাজা দুর্লভরাম, মীরজাফর আলি সাহেব আর হাতিয়াগড়ের ছোটমশাই—

সেই যে দরবার বসেছিল তাদের, সে আর খতম হয় না। ভিখু শেখ সেই তখন থেকেই ফটকে পাহারা দিচ্ছে। তারপর দুপুর হলো, বিকেল হলো, এক সময়ে সন্ধ্যেও হলো। পুব দিকে সূর্যটা উঠে আবার পশ্চিম দিকে ডুবেও গেল। কিন্তু দরবার শেষ হলো না।

সন্ধ্যের অন্ধকারে এল মীরণ। আর তারপরে এসে হাজির হলো ফিরিঙ্গী-ফৌজের ওয়াটস্ আর তার সঙ্গে আর-একজন।

জগৎশেঠজী চিনতে পারলেন না তাকে। জিজ্ঞেস করলেন—ইনি কে?

ওয়াটস্ বললে—ইনি মিস্টার ওয়ালস্, কম্যাণ্ডার, ক্লাইভের সেক্রেটারি—

—ক্লাইভ কখন আসবেন?

—আমাদের কাছ থেকে সিটির হালচাল কী-রকম শুনে তবে আসবেন, তিনি এখনো ময়দাপুরে ক্যাম্প করে আছেন। আমরা গিয়ে সব রিপোর্ট দেবো। রাজধানীর কী অবস্থা এখন? রাস্তায় রাস্তায় তো গোলমাল দেখলাম। একটা দোকানের সামনে একটা বুড়ো লোকের ডেড-বডি পড়ে থাকতে দেখলাম—কে ও?

কোথায় কে মরে পড়ে আছে, তার খবর রাখবার তখন সময় নেই কারো।

—আর নবাব? নবাব কী করছে? কী মতলব নবাবের?

জগৎশেঠজী বললেন—আমাকে নবাব ডেকে পাঠিয়েছিল, ফৌজ তৈরি করবার জন্যে। আমার কাছে টাকা চাইছিল, আমি বলেছি, আমার কাছে টাকা নেই এখন!

ওয়াটস্ সাহেব বললে—কর্নেল সাহেব আমাকে দিয়ে খবর পাঠিয়েছে তার কিছু টাকা দরকার—হাতে কিছু টাকা নেই, লড়াইতে সব টাকা ফুরিয়ে গেছে—

মীরজাফর সাহেব জিজ্ঞেস করলে—কত টাকা দরকার?

—দু' কোটি কুড়ি লক্ষ টাকা।

জগৎশেঠজীর মুখখানা গম্ভীর হয়ে গেল কথাটা শুনে।

—ওটা নবাবের কাছ থেকে দিলেই চলবে। ওই টাকাটা পেলে তবে কর্নেল সিটির দিকে আসবেন।

মীরজাফর আলি বললে—কিন্তু টাকাটা পরে দিলে চলবে না?—নবাবকে গ্রেপ্তার করার পর আমি আদায় করে দেবো।

রাজা দুর্লভরাম এতক্ষণে কথা কইলে। বললে—এত টাকা নবাবের সিন্দুকে নেই—

—সে কী? মুর্শিদাবাদের নবাবের কাছে দু' কোটি কুড়ি লাখ টাকা নেই?

—থাকলে তো নবাব এখনি ফৌজ বানিয়ে আবার লড়াই শুরু করে দিত!

—কিন্তু টাকাটা যে চাই-ই কর্নেলের। একটু তাড়াতাড়িই চাই। নইলে আপনাদেরই ডেঞ্জার। মঁসিয়ে ল' হয়তো দু'-একদিনের মধ্যেই এসে যাবে এখানে।

মীরজাফর আলির ভয় হয়ে গেল কথাটা শুনে। ল' সাহেব আসছে?

তাড়াতাড়ি জগৎশেঠজীর দিকে চেয়ে বললে—আপনি টাকাটা দিয়ে দিন জগৎশেঠজী, আমি নবাব হলে সব টাকা আপনার শোধ করে দেবো, আপনাকে কথা দিচ্ছি—

রাজা দুর্লভরাম বললে—আর যদি টাকা না দিতে পারি আমরা তো কর্নেল মুর্শিদাবাদে আসবেন না?

ওয়ালস্ বললে—না—

ছোটমশাই এতক্ষণ একপাশে বসে ছিল। বললে—জগৎশেঠজী, টাকাটা আপনি দিয়েই দিন, আমার নিজের টাকা থাকলে আমি দিয়ে দিতাম—

জগৎশেঠজী তখনো চুপ করে আছেন। মনে মনে ভাবছিলেন, একজন নবাব লড়াইতে হেরে টাকা চাইছে তার কাছে, আর-একজন লড়াইতে জিতে টাকা চাইছে। এই এরই কাছে একদিন সবাই দরবার করেছে নবাবকে জব্দ করবার জন্য! এই একেই তারা সবাই মিলে বাঙলা মুলুকে ডেকে এনেছে। এরও চাই টাকা!

ওয়াটস্ আর ওয়ালস্ উঠলো।

বললে—তা হলে স্যার আমরা উঠি—

জগৎশেঠজী রূঢ় গলায় বললে—হ্যাঁ, উঠুন আপনারা—

মীরজাফর আলি জগৎশেঠজীর কাছে সরে এসে বললে—জগৎশেঠজী, আমি কথা দিচ্ছি, আমি নবাব হয়ে আপনাকে সব টাকা শোধ করে দেবো, আপনি টাকাটা দিয়ে দিন—

ছোটমশাইও বললে—হ্যাঁ জগৎশেঠজী, আপনি টাকাটা দিন—নইলে ল' সাহেব এসে পড়লে আবার যে-কে-সেই অবস্থা হবে—

জগৎশেঠজী পাথরের মত নির্বিকার হয়ে তখনো চেয়ে আছেন। চেয়ে আছেন না ভাগ্যের পরিহাসের কথা ভাবছেন, কে জানে! এই এ'দেরই তিনি বাঙলা-মুলুকের ভাগ্যনিয়ন্তা করে ডেকে এনেছেন এত আদর করে। মীরজাফর সাহেব এই এ'দেরই পরাজয়ের হাত থেকে বাঁচিয়েছে।

বাইরে ভিখু শেখ হঠাৎ চিৎকার করে উঠেছে—কৌন্ হ্যায়?

রাত নয়, অন্ধকার নয়, কিছু নয়। তবু এত হুঁশিয়ারি ভালো লাগে না বশীর মিঞার।

বশীর মিঞা রেগে বললে—আমি রে বাবা, আমি। বাঘ নই, ভাল্লুক নই, আমি বশীর মিঞা—

—পাঞ্জা হ্যায়?

অর্থাৎ ভেতরে ঢোকবার মঞ্জুরি আছে কিনা!

বশীর মিঞা বললে—এই দ্যাখ বাবা, এই দ্যাখ, পাঞ্জা দ্যাখ—খাস নিজামতের মোহরার মনসুর আলি মেহের সাহেবের মঞ্জুরি—

ভিখু শেখ আর কিছু বললে না। কুত্তিকা বাচ্ছারাও আজকাল পাঞ্জা আনছে সঙ্গে করে। দুনিয়া বেহোঁশ হয়ে গেছে। যা, অন্দর যা—ভাগ—

তারপর সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই ভিখু শেখ দুনিয়াদারির বেহোঁশি দেখে তাজ্জব হয়ে আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগলো।

আর ভেতরে তখন সবাই মনসুর আলি মেহের সাহেবের চিঠি পড়ে আরো তাজ্জব হয়ে গেছে।

মোহরার সাহেব লিখছে—'নবাব খাজাঞ্চিখানার তহবিল থেকে সব টাকা দান-খয়রাত করবার হুকুম-জারি করেছে। যে এসে চাইছে, তাকেই টাকা দেওয়া হচ্ছে। তহবিলের টাকা দেওয়া আরম্ভ হয়েছিল বিকেলবেলা, এখনো দেওয়া শেষ হয়নি। আর ঘড়ি দুই পরে তহবিলে কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। আপনাকে সংবাদটা জানালাম, কিংকর্তব্য জানাবেন—'

ওয়াটস্ আর ওয়ালস্ কিছুই বুঝতে পারেনি এতক্ষণ।

জিজ্ঞেস করলে—কী হয়েছে?

মীরজাফর তখনো চিঠিটা বার বার পড়ছে।

হঠাৎ কী করবে যেন মাথায় কিছু এল না। সব টাকা উড়িয়ে দিয়ে তবে কি পালিয়ে যেতে চায় নবাব?

ওয়াটস্ আবার জিজ্ঞেস করলে—কী হয়েছে জেনারেল?

মীরজাফর বললে—নবাব সব টাকা বিলিয়ে দিচ্ছে সকলকে, যত টাকা আছে নিজামতে সব দান-খয়রাত করে দিচ্ছে—

এতক্ষণে যেন বুঝতে পারলে তারা। তা হলে মুর্শিদাবাদ ক্যাপচার করে তাদের বেনিফিট কী হবে?

—কিছুই না। একেবারে ফাঁকা সিন্দুক পড়ে থাকবে। যদি পারো এখনি হামলা করতে বলো কর্নেল সাহেবকে। আর যেন দেরি না করেন।

সত্যিই দু'জন ফিরিঙ্গী তখন ভাবনায় পড়েছে।

বশীর মিঞা বললে—সবাই টাকা-মোহর নিয়ে নৌকো করে মুর্শিদাবাদ ছেড়ে পালাচ্ছে হুজুর, আমি দেখে এসেছি—

তখন আর কোনো বুদ্ধি মাথায় আসছে না কারো। সমস্ত পরিকল্পনা যেন গোলমাল হয়ে গেছে। যাও, এখনি চলে যাও সাহেব। এখনি কর্নেলকে গিয়ে বলো যেন আর দেরি না করে। রাস্তায় যাকে পাবে, তাকেই যেন গ্রেফতার করে। নদীতে নৌকো দেখলেই ধরতে হুকুম দাও। সবাই নিজামতের টাকা নিয়ে পালাচ্ছে। আর দেরি করো না, যাও—যাও—

ওয়াটস্ আর দেরি করেনি। সঙ্গে ওয়ালস্ও তাড়াতাড়ি ঘোড়ায় উঠে সোজা দৌড় দিয়েছে কাশিমবাজারের দিকে। কাশিমবাজার পেরিয়েই মনসুরপুর।

কিন্তু সমস্ত রাস্তাটাই লোকে-লোকারণ্য। দলে দলে সমস্ত লোক মুর্শিদাবাদ ছেড়ে হাঁটা-পথে রওনা দিয়েছে। সঙ্গে যে-যা পেরেছে নিয়ে চলেছে। ছোট ছেলেমেয়ে পোঁটলা-পুঁটলি কাঁধে। হরিনামের মালা জপছে। আর বুকের মধ্যে নিয়েছে নারায়ণ-শিলা। ম্লেচ্ছরা আসছে আবার। দেশ-ভুঁই উচ্ছন্নে যাবে। সেই ভোরবেলা থেকেই তাদের যাত্রা শুরু হয়েছে। এত রাত হয়েছে, তখনো

রাস্তার লোকের বিরাম নেই। সবাই চলেছে পূর্বপুরুষের বাস্তুভিটে ছেড়ে।

ক্লাইভ তখনো অপেক্ষা করছিল।

ওয়াটস্ যেতেই ক্লাইভ বললে—কী খবর?

ওয়ালস্ বললে—টাকা দেবে না জগৎশেঠ।

—দেবে না?

ওয়াটস্ বললে—না, জগৎশেঠজী বললে অত টাকা তার কাছে নেই—

ক্লাইভ বললে—তা হলে কোম্পানীর যে এত টাকা খরচ হলো, এ কীসের জন্যে? কাদের জন্যে? এ-টাকার দায় নেবে কে? কোম্পানী না বাঙলার নবাব?

ওয়াটস্ বললে—সে-কথা আমরা বলেছি, কিন্তু টাকা ওদের নেই—

ক্লাইভ বললে—ওদের না থাকতে পারে, কিন্তু লোন দিক, নবাবের ক্যাশ পেলে তখন আমি সব লোন মিটিয়ে দেবো—

ওয়াটস্ বললে—কিন্তু নবাবের কাছেও আর কিছু নেই। নবাবের যা-কিছু টাকা ছিল, সমস্ত চ্যারিটি করে দিয়েছে—

—সে কী?

ওয়াটস্ বললে—হ্যাঁ, মীরজাফর আলি বলে দিয়েছে, টাকা-কড়ি নিয়ে যারা পালাচ্ছে, তাদের যেন আমরা আটকাই—প্রত্যেকটা নৌকো যেন আমরা সার্চ করি, প্রত্যেককে যেন আমরা গ্রেফতার করি—তাদের ধরলে আমরা অনেক টাকা পাবো--

পরের দিন থেকে সেই হুকুমই হলো। হাঁটা-পথে, নদী-পথে নৌকোয় যারাই যাবে, তাদেরই চ্যালেঞ্জ করা হবে। কাউকে ছাড়া হবে না। নবাবের টাকা দেবার তো রাইট নেই। নবাবের টাকা তো কাণ্ট্রির টাকা—

তখন থেকেই সকাল-সন্ধ্যে-রাত নৌকো গেলেই নদীর ওপর থেকে সেপাইরা চ্যালেঞ্জ করতে লাগলো—হল্ট্—হল্ট্—

রাস্তার লোকদেরও থামিয়ে দিয়ে গ্রেফতার করা হতে লাগলো। বডি সার্চ করে টাকা-কড়ি যা-কিছু পাওয়া গেল কেড়ে নেওয়া হলো। তারপর সব কেড়ে নিয়ে ছেড়ে দিতে লাগলো। যাও, এবার খালি হাতে যেদিকে দুচোখ যায়, চলে যাও—

সমস্ত রাত ধরে পাহারা বসলো গঙ্গার ধারে। অন্ধকারে নৌকো আসতে দেখলেই সেপাইরা চিৎকার করে উঠতে লাগলো—হল্ট্—হল্ট্—

কিন্তু সেদিন ভোরবেলা যখন মীরন এসে খবরটা দিয়ে গেল যে, নবাব মুর্শিদাবাদ ছেড়ে পালিয়ে গেছে, তখন কর্নেল ক্লাইভ পরামর্শ করবার জন্যেই মেজর কিল্প্যাট্রিককে ডেকে পাঠিয়েছিল।

কিল্প্যাট্রিক আসতেই ক্লাইভ বললে—শুনেছো মেজর, নবাব মুর্শিদাবাদ ছেড়ে পালিয়ে গেছে?

ঠিক সেই সময়েই হঠাৎ সেণ্ট্রি-গার্ড এসে খবর দিলে—কর্নেল, রাত্রে একটা নৌকো ধরা পড়েছে—

ক্লাইভ বললে—কত টাকা পাওয়া গেছে তাদের কাছ থেকে?

গার্ড বললে—টাকা পাওয়া যায়নি, কিন্তু মনে হচ্ছে তারা স্পাই, নবাবের স্পাই—

—স্পাই?

গার্ড বললে—হ্যাঁ কর্নেল, ফিমেল স্পাই—পুরুষের পোশাক পরে ছদ্মবেশে পালাচ্ছিল—

—ফিমেল স্পাই?

মুন্সী নবকৃষ্ণও কথাটা শুনে অবাক হয়ে গেল। মেয়েমানুষ-চর! পুরুষ-মানুষের পোশাকে?

ক্লাইভ বললে—নিয়ে এসো আমার কাছে—

খানিক পরেই যে সামনে এসে দাঁড়ালো, তাকে দেখে অবাক হয়ে গেল কর্নেল ক্লাইভ। একটু তীক্ষ্ন নজর দিয়ে দেখলে। এমনিতে তো বোঝা যায় না যে ফিমেল। ঠিক বাঙালী পুরুষদের মতই পোশাক পরেছে। গায়ে আবার চাদর ঢাকা!

গার্ড বললে—এ পুরুষ নয় কর্নেল, ফিমেল। মেয়েমানুষ। এর বডি সার্চ করতে গিয়ে টের পেয়েছি—

ক্লাইভ উঠে দাঁড়িয়ে সামনে গেল। তারপর চাদরটা মাথা থেকে খুলে দিলে। যেন চেনা-চেনা মুখটা মনে হলো।

ক্লাইভ বললে—তোমাকে কোথায় দেখেছি বলো তো? হোয়্যার? হু আর ইউ? তুমি কে?

মরালী বললে—সকলের সামনে বলতে পারবো না সাহেব। আড়ালে বলবো—

—আড়ালে? বেশ আড়ালেই চলো—

গার্ড বললে—ওর সঙ্গে আর একটা বুড়ো মানুষ আছে কর্নেল—

ক্লাইভ বললে—তা থাক, পরে দেখবো—

বলে পাশের ঘরের দিকে গেল। মরালীও সঙ্গে সঙ্গে ঘরের ভেতর ঢুকলো। দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে ক্লাইভ বললে—এখন বলো কে তুমি?

মরালী বললে—সত্যিই আমাকে চিনতে পারছেন না?

—না।

মরালী বললে—আমিই পেরিন সাহেবের বাগানে আপনার দফতর থেকে একদিন আপনার চিঠি চুরি করেছিলাম—

—সে কী? তুমি...তুমি মরিয়ম বেগম?

মরালী বললে—হ্যাঁ।

কৃষ্ণনগরে অনেক রাত্রে মহারাজ তখন অঘোরে ঘুমোচ্ছেন। হঠাৎ গৃহিণী ডাকলেন। সামান্য ডাকেই উঠে পড়েছেন মহারাজ।

বললেন—কী? কী হলো?

গৃহিণী বললেন—এই দ্যাখো, হাতিয়াগড়ের বড়রানীর কাছ থেকে চিঠি নিয়ে লোক এসেছে, ঝি দিয়ে গেল এখনি, বললে জরুরী চিঠি। লোকটা বলছে নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলা নাকি মুর্শিদাবাদ থেকে পালিয়েছে—রাস্তায় শুনে এসেছে—

মহারাজের তন্দ্রাটা ভেঙে গেল।

বললেন—দেখি, চিঠিটা—

গৃহিণী বললেন—চিঠি তোমার নামে নয়, লিখেছেন আমাকে—

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র সন্ধ্যেবেলাই মুর্শিদাবাদের খবর পেয়েছিলেন। দেওয়ান কালীকৃষ্ণ সিংহ মশাই-এর সঙ্গে অনেকক্ষণ আলোচনাও করেছিলেন।

বলেছিলেন—আমি তখনই বলেছিলাম দেওয়ানমশাই, মতলব ভালো নয় ক্লাইভ সাহেবের। ওদের লড়াই-এর খরচ আমরা কেন দিতে যাবো?

দেওয়ানমশাই বলেছিলেন—ক্লাইভ সাহেবের লোক সেখানে ছিল, সে বললে দু' কোটি কুড়ি লাখ টাকা তাদের দিতেই হবে। আসলে লড়াইটা করেছে তো আমাদেরই জন্যে। আমরাই তো তাকে ডেকে এনেছি—

—তা তো ডেকেছি। কিন্তু এর জন্যে এত টাকা? তা ছাড়া, কাজটা তো এখনো শেষই হলো না। এরা তো দেখছি পাকা কারবারী জাত। কাজ ফতে হবার আগেই টাকা চায়। তা খবর পেয়েছো আর কে-কে ছিল?

কালীকৃষ্ণ সিংহ বললে—সব খবর পাওয়া যায়নি। আমাদের উকিল তো আর সেখানে ছিলেন না। খবরটা যা লোকমুখে শুনেছেন, তাই জানিয়েছেন।

—আর ক্লাইভ সাহেব?

—সে তো সেই ময়দাপুরেই ছাউনি করে আছে।

—তা শহরের ভেতরে ঢুকছে না কেন?

—ভয়ও তো আছে। মীরজাফর সাহেবকে তো এখনো পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছে না।

—আর নবাব? নবাবের শেষ খবরটা কী?

দেওয়ানমশাই বললে—নবাব আর একবার চেষ্টা করছে যদি সৈন্য-সামন্ত জোগাড় করে ফৌজ তৈরি করতে পারে। তা তত টাকাও আর নেই, আর জগৎ-শেঠজীও সোজা বলে দিয়েছেন, তাঁর অত টাকা দেবার ক্ষমতাই নেই—

এই পর্যন্তই কথা হয়েছিল রাত্রে। তারপর খাওয়া-দাওয়া করে শুতে গেছেন অন্দরমহলে। মাথার মধ্যে ক'দিন ধরেই দুশ্চিন্তা ছিল। দুশ্চিন্তা ছিল রাজধানী নিয়ে, লড়াই নিয়ে। লড়াই-এর ফলাফল নিয়ে। ভেবেছিলেন লড়াইটা মিটে গেলে দুশ্চিন্তাটা কাটবে। কিন্তু আরো যেন জটিল হয়ে গেল জিনিসটা। মসনদের ব্যাপারটা মিটলো না, তবু আগে থেকেই টাকা দিতে হবে! এ তো বেশ আবদার!

দেওয়ানমশাইকে বলে রেখেছিলেন—রাত্রে যদি কিছু খবর-টবর পান আমাকে ডাকবেন। আমি ঘুমিয়ে থাকলেও আমাকে জানাবার ব্যবস্থা করবেন। আমি খুব উদ্বিগ্ন হয়ে রইলাম।

শোবার আগে গৃহিণীকেও বলে রেখেছিলেন—রাত্রে যদি কেউ এসে ডাকে তো আমাকে জাগিয়ে দিও—

গৃহিণী বলেছিলেন—তোমার অত কষ্টের ঘুম, না-হয় ভোরে ঘুম থেকে উঠেই শুনো—

মহারাজ বলেছিলেন—না, হাজার-হাজার লোক আমার মুখের দিকে চেয়ে আছে, আমি যদি ঘুমোই তো তাদের কথা কে ভাববে?

এর পর আর বেশি কথা হয়নি। নিঃশব্দে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু গৃহিণীর ডাকে উঠে পড়েই সব ব্যাপারটা শুনলেন। হাতিয়াগড়ের বড়রানীর পাঠানো চিঠিটাও পড়লেন। বহু দিন ধরে ছোটমশাই-এর কোনো খবর পাননি। মহারানীর কাছে লিখেছেন, তিনি যদি কিছু সংবাদাদি দিতে পারেন।

সেই রাত্রেই আবার শোবার ঘর ছেড়ে নিচে এলেন। দেওয়ানমশাই আগেই এসে বসেছিল। হাতিয়াগড় থেকে আসা লোকটাও এসেছিল।

—তা তুমি কী করে জানলে যে নবাব রাজধানী ছেড়ে চলে গেছে?

—আজ্ঞে, মহারাজ, আমি নৌকোর মাঝিদের কাছে শুনলাম।

—কখন পালিয়েছে নবাব?

—তা ঠিক বলতে পারিনে হুজুর। নৌকোর মাঝিরা বলছিল মুর্শিদাবাদের ঘাটে অনেক নৌকো যেতে দেখেছে, তাতে নাকি মেয়েছেলে ছিল, বোধ হয় বেগম-সাহেবা-টাহেবা কেউ হবেন। সঙ্গে লোক-লস্কর, পেয়াদা ছিল দেখে নবাব বলেই মনে হয়েছে তাদের।

—আর কী বললে তারা?

—আর বলছিল ময়দাপুরে আসবার পথে ফিরিঙ্গী-সাহেবরা হাঁটা-পথে নৌকো-পথে যাকে দেখছে তাকেই ধরছে, ধরে ধরে সবাইকে তল্লাসী করছে। যার কাছে যা টাকা-কড়ি আছে সব কেড়ে নিচ্ছে। একজন বেগমসাহেবাকেও নাকি ধরেছে।

—চেহেল্-সুতুনের বেগমসাহেবা?

—আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর। বেটাছেলের সাজ-পোশাক পরে যাচ্ছিল, তাকেও নাকি ধরে তল্লাসী করতে গিয়ে জানা গেছে তিনি চেহেল্-সুতুনের বেগমসাহেবা।

এর পর সব শুনে মহারাজ বললেন—তুমি অতিথিশালায় গিয়ে থাকো আজকে, তোমার চিঠির জবাব নিয়ে যাবে রানীমা'র কাছ থেকে।

লোকটা চলে যাবার পর মহারাজ দেওয়ানমশাইকে বললেন—তোমার কী মনে হচ্ছে দেওয়ানমশাই, কথাগুলো সত্যি?

—আমার তো সত্যি বলেই মনে হচ্ছে।

মহারাজ বললেন—দেখো, সত্যি হলে সত্যিই হবে। কিন্তু সত্যি না-হলেই মঙ্গল।

—কেন?

—মনে হচ্ছে শেষ পর্যন্ত এত টাকা উসুল হবে কার কাছ থেকে! কোটি কোটি টাকার ব্যাপার তো সহজে মিটবে না। হয়তো আমার ঘাড়েই এই সমস্ত দেনাটা বরাত দেবে।

তারপর উঠে দাঁড়ালেন। বললেন—তুমি শোওগে যাও দেওয়ানমশাই, আমার আর আজ ঘুম আসবে না। আমি চললুম—

হয়তো রাত শেষ হতে আর বাকি ছিল না। দুর্গা ভোর বেলাই উঠেছে। ছোট বউরানী তখনো ঘুমোচ্ছিল। হঠাৎ দুর্গার ডাকাডাকিতে ঘুম ভেঙে গেল।

—ও বউরানী ওঠো, ওঠো—বড় বউরানীর চিঠি এসেছে গো।

তাড়াতাড়ি ধড়মড় করে উঠেছে বউরানী। বললে—কোথায়? কার কাছে চিঠি এসেছে—

দুর্গা বললে—শয়তান নবাবটা মরেছে গো, এখনি রানীমা বললে—

—কোন্ শয়তান? কার কথা বলছিস? নবাব? মুর্শিদাবাদের নবাব?

দুর্গা বললে—হাতিয়াগড়ের লোক এসেছে চিঠি নিয়ে। জগা খাজাঞ্চীবাবু পাঠিয়েছে—

—কে লোক? কে?

দুর্গা বললে—তা জানিনে বউরানী, শুনছি হাতিয়াগড় থেকে বউরানীর চিঠি নিয়ে এসেছে—সেই কথাটা আমি তোমাকে বলতে এলুম—আমি এখনি আবার যাচ্ছি দেখা করতে—

রাজবাড়ির অতিথিশালায় তখন বেশ ভিড়। হাতিয়াগড়ের লোকটা রাত্রের অন্ধকারের মধ্যেই এসে ঢুকেছিল সেখানে। তখন কাউকেই দেখতে পায়নি। কিন্তু

ভোরবেলাই দেখে, উদ্ধব দাস এক কোণে চুপ করে বসে আছে।

কাছে গিয়ে বললে—কী গো, দাসমশাই, তুমি? তুমি এখেনে কী করতে?

উদ্ধব দাসও চিনতে পেরেছে। বললে—গোকুল যে? তুমি কী করতে?

গোকুল বললে—আমি এসেছি রাজ-কার্যে। আর তুমি? তোমার শ্বশুর, সেই শোভারাম, পাগল হয়ে গেছে শুনেছো তো? মেয়ের শোকে একেবারে মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে। তা তোমার বউ-এর আর কোনো খবর পাওনি?

উদ্ধব দাস বললে—পেয়েছি। এখানেই আছে—

—এখানে?

—হ্যাঁ গো, অ্যাদ্দিন কলকাতায় সাহেবের বাগান-বাড়িতে ছিল, সাহেব লড়াই করতে চলে যাবার পর এখানে এসে উঠেছে।

গোকুল অবাক হয়ে গেছে। বললে—এখানে? এই রাজবাড়িতে?

—হ্যাঁ গো, হ্যাঁ, কতবার বলবো তোমাকে? তুমি আজকাল কালা হয়েছো না কি? কানেও শুনতে পাও না? তা ছোটমশাই-এর হুকুম তামিল করো কী করে?

গোকুল সে-কথায় কান না দিয়ে বললে—তা বউ তোমার কী বলছে? সেদিন পালিয়ে গিয়েছিল কেন?

—আরে, কথাই বলে না আমার সঙ্গে।

—কথা বলে না? আচ্ছা, আমি তোমার সঙ্গে কথা বলিয়ে দেবো। শোভারামের মেয়ে তো, ওকে আমি ছোট্টবেলা থেকে দেখে আসছি। তোমার সঙ্গে কথা বলবে না কেন সে? তুমি কী অপরাধ করেছো?

উদ্ধব দাস বললে—আমি যে বাউণ্ডুলে মানুষ, আমাকে কি পছন্দ হয় কারো?

—তা না-হয় না হলো, কিন্তু তোমার সঙ্গে তো তার বিয়ে হয়েছে, তুমি তো তার সোয়ামী হলে?

উদ্ধব দাস বললে—না না, জোর করে কি পীরিত্ হয়? না জোর করে হরি-ভক্তি হয়? এ তো জোর-জবরদস্তির ব্যাপার নয় গো। তার চেয়ে আমি গান বেঁধে ঘুরে বেড়াই, সে ঢের ভালো। সে সুখী হলে আমি আর কিছু চাইনে! সুখ বড় দুর্লভ বস্তু গো! ওই সুখ নিয়েই আমি একটা ছড়া বেঁধেছি, শুনবে নাকি?

গোকুল হেসে ফেললে। বললে—তোমার আর পাগলামি গেল না দেখছি। এখনো তুমি সেই রকম আছ দাসমশাই। পৃথিবীতে কত কী কাণ্ড হলো, সব অদল-বদল হয়ে গেল, তোমার কিন্তু বদল নেই—

হঠাৎ সেরেস্তার একজন লোক এসে গোকুলকে ডেকে নিয়ে গেল ভেতরে। বললে—তোমাকে একবার দেওয়ানমশাই ডাকছেন—এসো—

উদ্ধব দাসকে বসতে বলে গোকুল লোকটার সঙ্গে একেবারে দেওয়ানজীর কাছারির ঘরে গিয়ে হাজির।

গোকুল যেতেই কাছারি-ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করে দিলেন কালীকৃষ্ণ সিংহ মশাই।

বললেন—রাত্রে কোনো অসুবিধে হয়নি তো? ঘুম হয়েছিল বেশ?

গোকুল বললে—হ্যাঁ হুজুর, কোনো কষ্ট হয়নি। অতিথিশালায় আমার চেনা লোক বেরিয়ে পড়লো, তার সঙ্গেই এতক্ষণ গল্প করছিলাম। সে বলছিল তার বউ নাকি রাজবাড়িতে লুকিয়ে আছে—

—কে? কার কথা বলছো?

—আজ্ঞে ওই যে দাস মশাই। ও তো আমাদের চেনা লোক, আমাদের হাতিয়াগড়ের অতিথিশালাতেও গিয়ে ওঠে কিনা—

—ওকে তুমি তোমার কাজের কথা বলেছো নাকি? কী জন্যে তুমি এসেছো টেসেছো, এই সব?

—আজ্ঞে না হুজুর, কিছুছু বলিনি!

—আর ওর সঙ্গে দেখা করো না। তোমায় একটা কাজ করতে হবে। সেই জন্যেই ডেকেছি। কাউকে কিছু বলবে না, কারোর সঙ্গে আর দেখা করবে না। তোমার থাকার জন্যে আমি আলাদা বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি। তোমার বড় বউরানীর হয়তো জানা নেই, তোমাদের ছোট বউরানী আমাদের এই রাজবাড়িতেই আছেন।

—আমাদের ছোট বউরানী?

—হ্যাঁ, তোমাদের ছোট বউরানী, যাকে খোঁজবার জন্যে তোমার ছোটমশাই এখানে-ওখানে ঘোরাঘুরি করছেন।

—তাহলে তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করে পেন্নাম করে আসি।

দেওয়ানমশাই বললেন—না, এখন থাক, চারদিকে এখনো নবাবের চর ঘোরাঘুরি করছে। তুমি বলছো বটে যে নবাব পালিয়ে গেছে, কিন্তু আমাদের কাছে এখনো পাকাপাকি খবর কিছু আসেনি। ছোট বউরানী হাতিয়াগড়ে ফিরে যাবার জন্যে বড় ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। আমি লস্কর-পেয়াদা-সেপাই সঙ্গে দেবো, তুমি তাকে নিয়ে বড় বউরানীর কাছে গিয়ে পৌঁছে দেবে—পারবে তো?

—কেন পারবো না আজ্ঞে?

—তাহলে সেই কথাই রইলো। নবাব যখন নেই তখন আর কোনো বিপদ-আপদ কিছু নেই। তবু সাবধানের মার নেই। তুমি এখন আমার লোকের সঙ্গে অন্দরে যাও। আর অতিথিশালায় যেতে হবে না। সেখানেই তোমার যা খবর পাঠাবার তা পাঠাবো। যাও—

দেওয়ানজীরও বোধ হয় তখন অনেক কাজ ছিল। গোকুল সেরেস্তার লোকের সঙ্গে ভেতর-বাড়িতে চলে গেল। ভেতরে যেতে যেতে গোকুলের মনে হলো এ কত বড় রাজবাড়ি! কোথায় যে কে থাকে, কোথায় সদর কোথায় অন্দর, কোথায় সেরেস্তা কোথায় অতিথিশালা, বাইরে থেকে কিছুই বোঝা যায় না।

তারপর আরো বেলা হলো। সেরেস্তার কাছারিতে আরো লোকের ভিড় বাড়লো। অতিথিশালায় আরো কিছু নতুন লোক এসে ঢুকলো। মুর্শিদাবাদে অত বড় কাণ্ড ঘটে গেছে, তার ঢেউ এসে লাগলো কৃষ্ণনগরে, বর্ধমানে, নাটোরে হুগলীর ফৌজদারের দফতরে। সর্বত্র। সেই শেষরাত থেকেই মহারাজ আর ঘুমোতে পারেননি। মহারাজার লোক গেল মুর্শিদাবাদের উকীলের কাছে, বর্ধমানের মহারাজার কাছে, নাটোরের মহারানীর কাছে, নবদ্বীপের বাচস্পতি মশাই-এর কাছে।

শুধু উদ্ধব দাস বার কয়েক খোঁজ করলে গোকুলের। যাকেই দেখে তাকে জিজ্ঞেস করলে—হ্যাঁ গো প্রভু, গোকুল কোথায় গেল?

—কে গোকুল?

—ওই যে হাতিয়াগড়ের ছোটমশাই-এর নফর!

কিন্তু কে কার খবর রাখে অতিথিশালাতে!

বেলা যখন পড়ো-পড়ো তখন একটা ঝালর-ঢাকা পালকি রাজবাড়ির দরজা দিয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল উত্তর দিকপানে। পালকিটা হাটা-পথে গি

পৌঁছোবে শিবনিবাসের ঘাটের কাছে। সেখানে মহারাজার নিজের বজরা তৈরি থাকবে। তাতেই গিয়ে উঠবেন হাতিয়াগড়ের ছোট বউরানী আর দুর্গা। ওখান থেকে নৌকোয় উঠলে বিশেষ জানাজানি হবে না।

গোকুল আগে থেকেই সেই ঘাটে আর একটা নৌকোয় তৈরি হয়ে বসে ছিল। সঙ্গে পাইক-বরকন্দাজ। তারা একেবারে হাতিয়াগড়ে বউরানীকে পৌঁছে দিয়ে ফিরে আসবে।

গোকুলের হাতে একটা চিঠিও দিয়ে দিলেন দেওয়ানমশাই। চিঠিটা সিল্‌মোহর করা। মহারাজার গৃহিণীর জবানীতে লেখা ছিল—"আপনার সতীন শ্রীমতী রাসমণিকে আজ লোকজন-পাইক-পেয়াদা-বরকন্দাজ সহ হাতিয়াগড়ে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলাম। পৌঁছ-সংবাদ দিবেন। কিন্তু আপনার স্বামীর কোনও সন্ধান পাই নাই বলিয়া সে-সম্বন্ধে কিছুই জানাইতে পারিলাম না। সন্ধানের ব্যবস্থা মহারাজ করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। সন্ধান পাইলে যথাসত্বর জানাইব। ইতি—"

ছোট বউরানী আর দুর্গা অন্য বজরার ভেতর উঠতেই দুটো নৌকোই পাশাপাশি চলতে লাগলো।

শুধু রাজবাড়িতে উদ্ধব দাস তখনো দু'-একজনকে জিজ্ঞেস করছে—ওগো, ও প্রভু, আমাদের গোকুল কোথায় গেল গো?

—কে গোকুল?

গোকুলকেই চিনতে পারে না তারা কেউ। তবু উদ্ধব দাসের মনে হতে লাগলো—গোকুল তো লোক ভালো। সে তো কথা দিয়ে কথা খেলাফ করবার লোক নয়। কিন্তু গেল কোথায়?

গোকুল যে কোথায় উধাও হয়ে গেল, শেষ পর্যন্ত তা আর জানা হলো না উদ্ধব দাসের।

হাতিয়াগড়ের ছোট বউরানীকে পাঠাবার সমস্ত বন্দোবস্ত করার পরেও কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্র নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না। দেওয়ানমশাইকে পাঠিয়ে দিলেন মুর্শিদাবাদে। বললেন—আপনি একবার নিজে যান মুর্শিদাবাদে। খবরাখবর সব জেনে আসুন—

কিন্তু দেওয়ানমশাই বেরিয়ে গিয়েও মাঝপথ থেকে ফিরে এলেন।

মহারাজ দেওয়ানমশাই-এর ফিরে আসার খবর পেয়ে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। বললেন—কী হলো, ফিরে এলেন যে?

দেওয়ানমশাই বললেন—উকীলবাবুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল রাস্তায়, তিনি নিজেই আসছিলেন আপনাকে খবরাখবর দিতে—তাই তাঁর সঙ্গেই ফিরে এলাম। তিনি বললেন, মুর্শিদাবাদে হুলস্থুল কাণ্ড বেধে গেছে—

—কি রকম?

খানিক পরে সারদাবাবু নিজেই এলেন। সবিস্তারে সব বর্ণনা করলেন।

বললেন—ক্লাইভ সাহেবকে খুন করবার জন্য ষড়যন্ত্র করেছে রাজা দুর্লভরাম।

—সে কী? খুন করবে? কেন?

—দু' কোটি কুড়ি লক্ষ টাকা ক্লাইভ সাহেব চেয়েছে বলে। টাকার কথায় জগৎশেঠজী পর্যন্ত চটে গেছেন। সব চেয়ে চটেছে দুর্লভরাম, মীরন আর খাদেম হোসেন। মীরজাফর সাহেবের ইচ্ছে ছিল টাকাটা দিয়ে দিতে। কিন্তু আর সবাই অরাজি।

—আর নবাব পালিয়ে গেছে সে-খবর সত্যি?

—সত্যি বলেই তো আমি শুনেছি। তবে কোনো প্রমাণ পাইনি। রাস্তায় লোকজনের ভিড়, চক-বাজারে সব দোকান-পাট বন্ধ। সারাফত আলি বলে একজন গন্ধ-তেলের দোকানদার ছিল, তাকে দেখলাম কে খুন করে রাস্তার ওপর ফেলে রেখে গেছে। তারপর আরো সব খবর শুনলাম, সত্যি-মিথ্যে বিশ্বাস হয় না। নবাব নাকি নিজের মাকে টাকা চুরি করেছিল বলে গালে চড় মেরেছে। তার পর থেকে সমস্ত রাত খাজাঞ্চীখানার টাকা সকলকে বিলিয়ে দেওয়া হয়েছে, যাতে ফিরিঙ্গীদের হাতে না পড়ে। ওদিকে ময়দাপুরে ক্লাইভ সাহেব যাকে রাস্তায়-ঘাটে পাচ্ছে তাকেই ধরছে। তাদের কাছ থেকে টাকা কড়ি কেড়ে নিচ্ছে—

কৃষ্ণচন্দ্র বললেন—আমি জানতুম এরকম হবে।

তারপর জিজ্ঞেস করলেন—কিন্তু নবাব যদি পালিয়েই থাকে তো কোথায় :? কোথায় পালাতে পারে?

সারদাবাবু বললেন—তা কেউ বলতে পারছে না। কখন পালালো তা-ও কেউ জানে না। আসলে পালিয়েছে কিনা তারও তো ঠিক নেই। সবটাই তো আমার শোনা কথা। সমস্ত মুর্শিদাবাদ এখন নানা রকম গুজবে ছেয়ে গেছে। আপনি এখনি একবার চলুন, আপনাকে নিয়ে যাবার জন্যেই এসেছি—

কৃষ্ণচন্দ্রও বুঝলেন এ-সময়ে মুর্শিদাবাদে তাঁর নিজের একবার যাওয়া উচিত। এ-সময়ে যদি কিছু ভুল পদক্ষেপ হয়ে যায় তো সে-ভুলের খেসারত তাকেও দিতে হবে।

তিনি উঠলেন। বললেন—আমি এখনই রওনা হচ্ছি—

আর সত্যিই সেদিন মুর্শিদাবাদে আইন-শৃঙ্খলা বলে বুঝি কিছুই ছিল না। মসনদ একদিনের জন্যে শূন্য হয়ে গেছে। নিজামত বন্ধ। কাছারি বন্ধ, খাজাঞ্চী-খানা বন্ধ। কে হুকুম দেবে, কে হুকুম মানবে, তারও কিছু হদিস নেই। যারা ফিরিঙ্গী-ফৌজের ভয়ে শহর ছেড়ে চলে গিয়েছে, তারা অনেকে রাস্তাতে ফিরিঙ্গী-ফৌজের হাতে ধরা পড়েছে। তাদের যথা-সর্বস্ব কেড়ে নিয়েছে তারা। সেই ওয়াটস্ আর ওয়ালস্ চলে যাবার পর থেকেই যেন গণ্ডগোলটা বাড়লো। জগৎশেঠজীর বাড়ি থেকে মীরজাফর সাহেব চলে গেল। মীরন চলে গেল, দুর্লভ-রাম চলে গেল। একে একে সবাই চলে যাবার পর ছোটমশাই একলা বসে ছিল। শেষকালে এক সময়ে জগৎশেঠজীও চলে গেলেন। রণজিৎ রায় মশাইও ছোট-মশাই-এর বন্দোবস্ত করে দিয়ে নিজের কাজে চলে গিয়েছিল। তারপর ভোর রাত্রের দিকে খবর এসেছিল যে, নবাব নাকি চেহেল্-সুতুন ছেড়ে কোথায় চলে গিয়েছে।

আর বাড়ির ভেতরে থাকতে পারলে না ছোটমশাই। একবার গেল মতিঝিলের দিকে। রাস্তায় গিজগিজ করছে লোক। তারই সামনে মনসুরগঞ্জ হাবেলি। সেখানে মীরজাফর সাহেব উঠেছে। তার বাড়ির সামনে তখন পাহারা বসে গেছে।

আবার ফিরে এল ছোটমশাই। কী যে করবে বুঝতে পারলে না। চক্‌বাজারে সেই খুশ্‌বু তেলের দোকানের সামনেও একবার গেল। সেই বুড়ো লোকটা

তখনো সেই রাস্তার ওপরেই মরে পড়ে আছে।

ফিরে আসতেই জগৎশেঠজীর সঙ্গে দেখা হলো। বড় উত্তেজিত ভাব জগৎ-শেঠজীর।

ছোটমশাই জিজ্ঞেস করলে—কিছু খবর পেয়েছেন?

জগৎশেঠজী বললেন—পেয়েছি। কিন্তু বড় খারাপ খবর। মীরন, দুর্লভরাম, খাদেম হোসেন সবাই ঝগড়া বাধিয়ে বসেছে। নবাব কে হবে তাই নিয়ে ঝগড়া। এখন যদি ফৌজের লোকেরা ক্ষেপে গিয়ে এ-ওর বিরুদ্ধে লাগে তা হলেই সব গোলমাল হয়ে যাবে—ওদিকে মীরজাফরের জামাই আছে মীরকাশিম, সেও এর মধ্যে জুটেছে—

—তাহলে আপনি কী করবেন ঠিক করেছেন?

—কিছুই এখনো ঠিক করিনি। ভাবছি ক্লাইভকে একটা চিঠি লিখে দিই যে, তিনি যেন এখন এখানে না আসেন। কেউ-না-কেউ খুন করতে পারে তাঁকে।

—কিন্তু খুন করতে যাবে কেন ক্লাইভকে?

—ক্ষমতার লড়াই-এর জন্যে। ক্লাইভের হাতে নবাব করবার ক্ষমতা রয়েছে যে। ক্লাইভ যাকে মসনদে বসাবে সে-ই তো নবাব হবে কি না।

ছোটমশাই বললে—কিন্তু যে-ই নবাব হোক, তার আগে আমার একটা ব্যবস্থা করে দিন, আমি আর এই গন্ডগোলের মধ্যে মুর্শিদাবাদে থাকতে চাই না—

—আপনার কীসের ব্যবস্থা?

ছোটমশাই বললে—আপনাকে যে সেই বলেছিলাম আমার সহধর্মিণীর কথা। আমি গিয়েছিলাম সেই চক্-বাজারের সারাফত আলির দোকানে। সেখানে খুনো-খুনি কান্ড দেখে ফিরে এসেছি। দেখলাম সারাফত আলিকে কে খুন করে রাস্তায় ফেলে রেখে দিয়ে গেছে—

—তারপর?

—তারপর শুনলাম মরিয়ম বেগম নাকি ওই সব গন্ডগোল দেখে সোজা গিয়ে ঢুকেছে চেহেল্-সুতুনের ভেতরে। আমি একবার চেহেল্-সুতুনে গিয়ে মরিয়ম বেগমের সঙ্গে দেখা করতে চাই—

—চেহেল্-সুতুনে আপনি কী করে যাবেন? সেখানে কি বাইরের কাউকে ঢুকতে দেয়? তার ওপর আপনি পুরুষমানুষ।

ছোটমশাই বললে—এখন না হোক, রাত্তিরের দিকে—

—রাত্রের দিকেই বা আপনি যাবেন কী করে?

ছোটমশাই বললে—শুনেছি তো ঘুষ দিলে নাকি সবই সম্ভব হয় চেহেল্-সুতুনের ভেতরে। সবাই তো তাই-ই বলে! আর তা ছাড়া এখন তো নবাবই নেই। এখন কি আর অত কড়াকড়ি চলছে? ওই তো মতিঝিল থেকে সব বিদ্দিগার পালিয়েছে, একটা জনপ্রাণীও নেই মতিঝিলে।

জগৎশেঠজী খানিকক্ষণ কী যেন ভাবলেন। বললেন—আপনি ঠিক জানেন মরিয়ম বেগমই আপনার সহধর্মিণী?

ছোটমশাই বললে—আমার দৃঢ় ধারণা তাই।

জগৎশেঠজী বললেন—তাহলে দেওয়ান মশাইকে বলুন, উনি একটা কিছু ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন কি না আপনার জন্যে।

সত্যিই তখন জগৎশেঠজীর মাথায় রাজ্যের ভাবনা। তিনি যে ওইটুকুই করেছেন তাই-ই যথেষ্ট। কিন্তু রণজিৎ রায় দেওয়ানজী সব ব্যবস্থা করে দিলেন।

সন্ধ্যে হবার পরই লোক দিয়ে ছোটমশাইকে পাঠিয়ে দিলেন চেহেল্-সুতুনের ফটকে। সমস্ত অগোছালো ব্যবস্থা। রাস্তার টিম্‌টিমে আলোগুলোও আজ জ্বলছে না। জ্বালাবার লোকেই গরহাজির। ফটকের আলোগুলোও জ্বলেনি। খুব সাবধানে কাজ শেষ করতে হবে। কেউ যেন দেখতে না পায়। ঘুষ পেয়ে খোজাটার চোখ দুটো অন্ধকারের মধ্যেও জ্বলজ্বল করে উঠলো।

—তোমার নাম কী?

—খোজা নজর মহম্মদ, হুজুর।

—এই বাবুজীকে একবার মরিয়ম বেগমসাহেবার সঙ্গে দেখা করিয়ে দিতে পারো?

মরিয়ম বেগমসাহেবার নাম শুনে কেমন যেন থতমত খেয়ে গেল নজর মহম্মদ। বশীর মিঞা খুব সাবধানে রাখতে বলে দিয়েছে মরিয়ম বেগমসাহেবকে। যদি শেষকালে কিছু গড়বড় হয়?

কিন্তু হাতের মুঠোর মধ্যে তখনো আশ্‌রফিটা ফুটছে তার। একবার একটু দ্বিধা করেই নজর মহম্মদ তখুনি বললে—আচ্ছা, আইয়ে হুজুর—

তারপর বললে—জরা সাম্‌হাল্‌কে—

সত্যিই ভেতরটা অন্ধকার। সুড়ঙ্গের মত রাস্তা। ছোট-ছোট ইঁটের গাঁথনি। এই পথ দিয়েই একদিন কান্ত ভয়ে ভয়ে মরালীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। আবার এই পথ দিয়েই আজ ছোটমশাই চোরের মত পা টিপে টিপে চলেছে। হয়তো এইটেই নিয়ম। ইতিহাসের পথ হয়তো চেহেল্-সুতুনের মতই এমনি অন্ধকার, এমনি রহস্যময়। ইতিহাসও বোধ হয় এমনি করে নিঃশব্দে পা টিপে-টিপে অস্পষ্ট পথে পা বাড়িয়ে দেয়। তারপর যখন কেউ টের পায় না, কেউ জানতেও পারে না, তখন গন্তব্যস্থানে পৌঁছে একদিন হঠাৎ আত্মপ্রকাশ করে। তখন সবাই অবাক হয়ে যায়, সবাই চম্‌কে ওঠে।

কান্তও চম্‌কে উঠেছিল।

—কে? কৌন?

খিড়কী-বন্ধ ঘরের মধ্যেও নজর মহম্মদের গলাটা চিনতে পেরেছে কান্ত।

—মরিয়ম বেগমসাহেবা, মরিয়ম বেগমসাহেবা!

কান্ত বুঝতে পারলে না জবাব দেওয়া ঠিক হবে কি না। এই সময়ে কেনই বা নজর মহম্মদ ডাকছে তাকে তাও বুঝতে পারলে না।

—আমি নজর মহম্মদ, বেগমসাহেবা।

কান্ত খিড়কীর ভেতর থেকেই বললে—কী দরকার?

নজর তেমনিই বাইরে থেকে বললে—একঠো বাত্ আছে বেগমসাহেবা, একবার খিড়কীটা খুলুন!

—কী কথা আছে তোমার?

নজর মহম্মদ বললে—একবার মেহেরবানি করে খিড়কীটা খুলুন না—

কান্ত ভালো করে বোরখা দিয়ে নিজের সর্বাঙ্গ ঢেকে নিয়ে দরজাটা খুলে দিলে।

হঠাৎ সেই অন্ধকার আবহাওয়া যেন অনেক মানুষের পায়ের শব্দে বিচলিত হয়ে উঠলো। কয়েকদিন ধরেই চেহেল্-সুতুনের ভেতরে সমস্ত নিয়ম-কানুন-কায়দা বেসামাল হয়ে পড়েছিল। নবাব যেদিন হঠাৎ এখানে এসে পড়েছিল, সেই দিন থেকেই। তারপর নজর মহম্মদের দল আর কোনো দিক সামলাতে পারছে না। যে-সে এসে ঢুকে পড়ছে চেহেল্-সুতুনের ভেতরে। নবাব যে চেহেল্-সুতুন ছেড়ে চলে গেছে, সে-খবরটাও আর চাপা থাকেনি।

পায়ের আওয়াজ পেতেই নজর মহম্মদ চম্‌কে উঠেছে। আবার এখন কে এল?

খোজা-সর্দার পীরালি খাঁ সাহেব কাল থেকেই হুঁশিয়ার করে দিয়েছে। আসলে পীরালি খাঁ নয়, নানীবেগম সাহেবারই হুকুম। যে-সে এসে ঢুকে পড়বে ভেতরে—খুব হুঁশিয়ার সে রহ্‌না পীরালি। কত মোহর, কত টাকা, কত জড়োয়া ছড়ানো আছে চারদিকে। এই সময়েই তো চুরি হয়ে যায় সব।

—বাবুজী, আপনি একটু তফাত যান।

—কেন? কী হলো?

নজর মহম্মদ বললে—কার যেন পায়ের আওয়াজ শুনছি, হাল-চাল ভালো মালুম হচ্ছে না—

ছোটমশাই বললে—কোথায় তফাত যাবো?

—আপনি আসুন, আমার সঙ্গে আসুন।

বলে ছোটমশাইকে নজর মহম্মদ একটু আড়ালে নিয়ে গিয়ে বললে—এইখানে থাকুন আপনি, আমি আপনাকে পরে ডেকে নিয়ে যাবো—

তখন আর সময় নেই। নজর মহম্মদ এক নিমেষের মধ্যে সোজা এসে আবার নিজের জায়গায় দাঁড়িয়েছে। তার আগে মরিয়ম বেগমসাহেবার ঘরের দরজাটা বন্ধ করতে বলে দিয়ে সাবধান হয়ে নিলে। আবার কি তবে নবাব ফিরে এল নাকি?

সামনে সামনে আসছিল পীরালি খাঁ। আর পেছনে আরো কয়েকজন। ভারি ভারি পায়ের আওয়াজ। সর্দার আবার কাদের নিয়ে এল এখন।

কিন্তু গলার শব্দেই চেনা গেল মেহেদী নেসার সাহেব। আরো একটু কাছে আসতেই অন্য লোকদেরও চেনা গেল। মেহেদী নেসারের সঙ্গে আছে ডিহিদার রেজা আলি সাহেব। তার সঙ্গে বশীর মিঞা। নজর মহম্মদ মাথা হেলিয়ে সেলাম করলে সকলকে।

মেহেদী নেসার জিজ্ঞেস করলে—এ কে?

—হুজুর, এ আমার সাগ্‌রেদ, খোজা নজর মহম্মদ!

মেহেদী নেসার সাহেব তীক্ষ্ম নজর দিয়ে দেখলে নজর মহম্মদকে। ভালো করে দেখা গেল না অন্ধকারে। কিন্তু তা হোক, তবু হুঁশিয়ার করে দিলে।

বললে—তোমার সাগ্‌রেদকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছো তো পীরালি। খুব হুঁশিয়ার থাকে যেন।

তারপর আরো অনেক কথা বললে। সব কথাগুলোর সার মর্ম এই যে, এখন চারদিকে অরাজক শুরু হয়ে গেছে। এই সময়ে যেন ভালো করে চেহেল্-সুতুনে পাহারা দেয় তারা। বাইরের কোনো আদ্‌মি যেন ভেতরে না ঢোকে। নবাব বেপাত্তা,

সুতরাং নবাবের দুষমনরা নানান ছুতোয় ভেতরে এসে ঢুকবে। কেউ আসবে চেহেল্-সুতুনের বেগমদের লোভে, কেউ আসবে টাকা-কড়ি-দৌলতের লোভে। দুনিয়ার যত মতলববাজ মানুষের এই হচ্ছে ফুরসত। এই সময়ে চুরি-রাহাজানি-বাটপাড়ি চলছে শহরে। শহরময় খুন-খারাবি হচ্ছে। সেই জের চেহেল্-সুতুনের অন্দরেও আসতে পারে!

বলতে বলতে মেহেদী নেসার সাহেব এগিয়ে যেতে লাগলো আরো ভেতরের দিকে।

ডিহিদার রেজা আলি সাহেব বললে—জনাব, আর সেই মরিয়ম বেগমসাহেবা, যার কথা আমি বলেছিলাম জনাবকে?

মেহেদী নেসার সাহেব বললে—তাকে আমি নজরবন্দী করে রেখেছি। পীরালি, বেগমসাহেবারা যেন কেউ না পালায়!

—না হুজুর, আমার খোজারা নজর রাখছে—

—আর ঘসেটি বেগমসাহেবার দিকেও নজর রাখবে। পেশমন বেগম, তক্কি বেগম, বব্বু বেগম, গুলসন্ বেগম, যত বেগম আছে, সকলের দিকে নজর রাখবে। আমিনা বেগমসাহেবা কোথায়? মালখানার চাবি খুলতে গিয়েছিল আমিনা বেগম-সাহেবা, সেই আমিনা বেগমসাহেবাকে দেখেছো তো?

—জী হুজুর। নানীবেগমসাহেবা তাকে খুব কড়া হুকুম দিয়েছে। নিজের কাছে মালখানার চাবি রেখে দিয়েছে।

—খুব হুঁশিয়ার, আমি আজকে মালখানায় তালার ওপর তালা লাগিয়ে যাবো। চলো—

বলে আরো সামনে এগিয়ে যেতে লাগলো। পীরালি খাঁ শশব্যস্ত হয়ে চলতে লাগলো। পেছনে ডিহিদার রেজা আলি, বশীর মিঞা, তারাও চলেছে। নজর মহম্মদের ভয় করতে লাগলো। মালখানার তালার ওপর তালা লাগিয়ে দেবে মেহেদী নেসার সাহেব। কিন্তু নানীবেগমসাহেবা যদি বাধা দেয়।

ভেতরে পেশমন বেগমসাহেবার ঘরের অন্দরে তখন আলো জ্বলছিল। মেহেদী নেসার সাহেব এমন করে বুক ফুলিয়ে কখনো চেহেল্-সুতুনের ভেতরে চলে না। যখন আসে তখন নানীবেগমসাহেবার ভয়ে নরম হয়ে মাথা নিচু করে আসে। কিন্তু আজ নবাব নেই, তাই বেপরোয়া হয়ে গেছে নেসার সাহেব।

পীরালি খাঁ মালখানার বাইরের তালা খুলে দিতেই মেহেদী নেসার, ডিহিদার রেজা আলি, বশীর মিঞা সবাই ভেতরে ঢুকলো।

হঠাৎ নানীবেগমসাহেবার গলা শোনা গেল। সর্বনাশ, কেউ হয়তো নানী-বেগমসাহেবাকে খবর দিয়ে দিয়েছে। দৌড়তে দৌড়তে একেবারে সামনে এসে হাজির হয়েছে নানীবেগমসাহেবা।

—কৌন্? মেহেদী নেসার? তুমি? ক্যা কর্ রাহা হ্যায়?

মেহেদী নেসার কিন্তু অন্যবারের মত দম্‌লো না নানীবেগমসাহেবাকে দেখে। বললে—মালখানায় তালা লাগিয়ে দিচ্ছি নানীবেগমসাহেবা।

আশ্চর্য, নজর মহম্মদ আজ নানীবেগমসাহেবাকে কুর্নিশ পর্যন্ত করলে না।

—লেকিন্, চেহেল্-সুতুনের মালখানায় তালা লাগাবার তুমি কে?

মেহেদী নেসার তেমনি গম্ভীর গলাতেই জবাব দিলে—শুধু চেহেল্-সুতুন নয় নানীবেগমসাহেবা, তামাম নিজামতের মালিক এখন আমরা।

—মালিক তোমরা? তোমরা?

—নবাব চেহেল্-সতুন ছেড়ে চলে গেছে, এখন তার সব-কিছুর জিম্মাদার আমরা।

—আমরা মানে কারা?

মেহেদী নেসার বললে—আমরা মানে নবাবের যত আমীর-ওম্‌রা, তারা।

নানীবেগমসাহেবা গলা চড়িয়ে দিলে—খবরদার, যতক্ষণ আমি জিন্দা আছি ততক্ষণ আমীর-ওম্‌রা কেউ কিছু নয়, মনে রেখো নেসার, আমি এখনো বেঁচে আছি। আমি যতক্ষণ আছি এখানে, ততক্ষণ কেউ মালখানায় হাত দিতে পারবে না। চেহেল্-সতুনের দৌলত আমার দৌলত, আমিই সবকিছুর জিম্মাদার—

নজর মহম্মদ দেখলে ব্যাপার অনেক দূর গড়াবে। এ সহজে মেটবার নয়। তাড়াতাড়ি আবার ছোটমশাইএর কাছে ফিরে এল—বাবুজী, বাবুজী—

ছোটমশাই এতক্ষণ অন্ধকারের মত চুপ করে বসেছিল। শেষকালে কি এমনি করে নিজেরও বিপদ ঘটাবে, ছোট বউরানীরও বিপদ ঘটিয়ে দেবে!

—বাবুজী, আপনি বেরিয়ে যান, সব গড়বড় হয়ে গেছে।

—কিন্তু মরিয়ম বেগম? মরিয়ম বেগমসাহেবার কী হবে?

—কিছু হবে না বাবুজী। বেগমসাহেবাদের কারোর সঙ্গে আর মুলাকাত্ করা যাবে না। মেহেদী নেসার সাহেব কড়া হুকুম জারি করে দিয়েছে।

—মেহেদী নেসার সাহেব? মেহেদী নেসার সাহেব অন্দরে এসেছে নাকি?

—জী, বড় জবরদস্ত্ ওম্‌রাহ্ মেহেদী নেসার সাহেব!

ছোটমশাই-এর যেন একটু আশা হলো। মেহেদী নেসার তো জগৎশেঠজীর দলে। জগৎশেঠজী একটু চেষ্টা করলেই তো তাহলে ছোট বউরানীকে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়!

—বাবুজী, আপনাকে আমি বাইরে নিয়ে যাচ্ছি, চলুন—আর দেরি করবেন না, চলুন—চলুন—

ছোটমশাইকে কোনো রকমে তাড়াতাড়ি বাইরে বার করে দিয়ে এসেই আবার নজর মহম্মদ মালখানার সামনে হাজির হলো। মালখানার সামনে তখন নানীবেগমসাহেবার সঙ্গে নেসার সাহেবের তুমুল তক্‌রার চলেছে। মেহেদী নেসারের গলা যেন অন্য দিনের চেয়ে আরো বেশি চড়েছে। নবাব নেই বলে তার যেন ভয়ও নেই আগেকার মত।

নানীবেগম বলছে—কে বললে এ-সব টাকা-কড়ি মীর্জার? এ সব আমার! আমিই চেহেল্-সতুনের নানীবেগম। দেখি কী করে তুমি আমার মালখানায় তালা দাও—

—আমি তালা দেবোই, আপনি সরুন নানীবেগমসাহেবা, আমি মীরজাফর সাহেবের মঞ্জুরী নিয়ে এসেছি।

—রেখে দাও তোমার মীরজাফর সাহেব! ঢের ঢের অমন মীরজাফর সাহেব দেখেছি। তাকে ডেকে নিয়ে এস দিকি আমার কাছে! দেখি তার কেমন মুরোদ!

মেহেদী নেসার সাহেব একটু যেন দ্বিধা করতে লাগলো। তারপর বললে—তাহলে আপনি তালা লাগাতে দেবেন না?

নানীবেগম বললে—না।

—এই আপনার শেষ কথা?

—হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি তো বলে দিয়েছি এই আমার শেষ কথা।

—কিন্তু এর ফল ভালো হবে না নানীবেগমসাহেবা।

—তার মানে?

—মানে কালকেই বুঝতে পারবেন!

সমস্ত চেহেল্-সতুনটা যেন গম্-গম্ করে উঠলো মেহেদী নেসার সাহেবের গলার আওয়াজে। চেহেল্-সতুনের আনাচে-কানাচে যে-যেখানে ছিল সবাই ততক্ষণে এসে হাজির হয়েছে কাছাকাছি। সবাই এমনি একটা ঘটনার ভয়ই করছিল কাল থেকে। সবাই ভাবছিল একটা কিছু ঘটবে! এ যেন তারই পূর্বাভাস। নজর মহম্মদ কাঠ হয়ে শুনছিল সমস্ত, দেখছিল সমস্ত—

হঠাৎ নানীবেগমসাহেবা ফেটে চৌচির হয়ে গেল—বেরিয়ে যাও তুমি এখান থেকে, বেরিয়ে যাও—

মেহেদী নেসারও হটবার পাত্র নয়। বললে—কে বেরিয়ে যায় সেইটেই দেখতে হবে। আমি না আপনি?

—কেন আমি বেরিয়ে যাবো? আমার চেহেল্-সতুন, আমি এখানে থাকবো। কে আমাকে এখান থেকে তাড়াতে পারে দেখি? কার এত হিম্মত!

মেহেদী নেসার বললে—ঠিক আছে, কালই এর প্রমাণ হবে, এ চেহেল্-সতুন কার। কালই আপনাকে মীরজাফর আলি সাহেবের হাতে-পায়ে ধরতে হবে। তখন বোঝা যাবে!

বলে মেহেদী নেসার সাহেব চলে গেল বাইরের দিকে। পেছন-পেছন ডিহিদার রেজা আলি আর বশীর মিঞা, তারাও চলে গেল।

পাওয়া আর না-পাওয়ার মধ্যে যতখানি ব্যবধান, সুখ আর দুঃখের মধ্যে ততখানি ব্যবধান কি আছে? পাওয়ায় যদি সুখ কিছু থাকে, তার অনেকখানি অংশ না-পাওয়ার মধ্যে ছড়িয়ে থাকে। আমি তোমাকে পেলাম, কিন্তু তোমাকে পাওয়া আমার ফুরিয়ে গেল না, তবেই তো আসল পাওয়া। নদী যেমন সমুদ্রকে পায়, সে পাওয়া তার ফুরিয়ে যায় না বলেই তার পাওয়া শেষ হয় না। সে কেবল সমুদ্রকে পেতেই থাকে। প্রতি দিন প্রতি রাত্রি প্রতি মুহূর্তে পেতে থাকে। সে-পাওয়াই তো সার্থক পাওয়া।

কান্ত সেই অন্ধকার চেহেল্-সতুনের বন্ধ মহলের মধ্যে কেবল নিজের মনেই বলতে লাগলো—তোমাকে না-ই বা পেলাম মরালী, কিন্তু তোমাকে পাইনি বলেই তো এমন করে প্রতি মুহূর্তে তোমাকে পাচ্ছি। এই পাওয়াই তো আমার না-পাওয়ার চেয়ে বড় পাওয়া। তুমি যত দূরেই থাকো, যেখানে যেমন ভাবেই থাকো, আসলে তুমি আমার কাছে রয়েছো। যখন আমি থাকবো না, তখনো তুমি আমার কাছে কাছে থাকবে। তখন আমি তোমাকে পেয়েও পাবো, হারিয়েও পাবো। আমার জীবনে তুমি সব পাওয়া-না-পাওয়ার ঊর্ধ্বে সব চাওয়া-না-চাওয়ার বাইরে এক পরম পাওয়া হয়ে রইলে। আমার এই দেহ একদিন ধ্বংস হবে, আমার এই অস্থি-মাংস-মজ্জা একদিন নিশ্চিহ্ন হবে, কিন্তু সেদিনও তুমি আমার নিজের হয়েই থাকবে। তুমি আমার হতে চাও আর না-চাও, আমি তা নিয়ে মাথা ঘামাবো না, তুমি আমার আর আমি তোমার, এই স্বপ্ন নিয়েই তোমার সঙ্গে আমি একাকার হবো। এই-ই তো ভালো মরালী!

ওধারে চেহেল্-সুতুনের ভেতরে হঠাৎ যেন কীসের একটা গোলমাল উঠলো।

চেহেল্-সুতুনের মধ্যে অমন গোলমাল হয়ই। কান্ত এই চেহেল্-সুতুনে অনেকবার এসেছে, এমন গোলমাল অনেকবার শুনেছে। কে যে তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল তা ভাবার আর দরকার নেই। খাটের ওপর শুয়ে-শুয়ে চোখ বুজে শুধু মরালীর কথাই ভাবতে ভালো লাগলো কান্তর। বাইরে যখন ইতিহাসের মোড় ফিরছে, তখন একজন পুরুষের এ-চিন্তার কোনো দাম নেই তাও কান্ত জানে। সে জানে নবাব হয়তো এতক্ষণ মসনদ ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে গেছে, হয়তো ফিরিঙ্গী-ফৌজ এসে যাবে এখনই। সে জানে তার আগেই হয়তো কেউ এসে তাকে কোতল করবে। শুধু তাকে একলা নয়, এই সমস্ত বেগমকেই হয়তো কোতল করবে। কিন্তু এও তো এক সান্ত্বনা যে তারা মরিয়ম বেগমকে কেউ খুঁজে পাবে না, মরালীকে কেউ খুঁজে পাবে না। মরালী যদি নিরাপদে থাকে তো আর যেখানে যা-কিছু হয় হোক। তুমি আরো দূরে চলে যাও মরালী, আরো অনেক দূরে। তুমি যত দূরে চলে যাবে, তত আমি তোমাকে কাছে পাবো।

গোলমালটা যেন হঠাৎ সামনে এল। তারপর মনে হলো যেন মেহেদী নেসার সাহেবের গলা, ডিহিদার রেজা আলির গলা। এখন বশীর মিঞার গলাও কানে এল। হয়তো মুর্শিদাবাদের শহরের ভেতরে বিদ্রোহ শুরু হয়ে গেছে। হয়তো লুঠপাট আরম্ভ হয়েছে চেহেল্-সুতুনে।

তা হোক, তা নিয়ে কান্তর কিছু ভাবনা করবার দরকার নেই। কান্ত চোখ বুজে স্বপ্ন দেখতে লাগলো। স্বপ্ন দেখতে লাগলো, মালদা থেকে রাজমহল; রাজমহল পেরিয়ে পদ্মা; পদ্মা পেরিয়ে সমুদ্র। যেদিকে চোখ যায় সেদিকেই শুধু জল আর জল। আরো এগিয়ে যাও মরালী, আরো দূরে চলে যাও। তুমি দূরে চলে গেলে তবে আমি তোমাকে কাছাকাছি পাবো। আরো দূরে চলে যাও, নৌকো থামিও না—

কিন্তু কান্ত সেদিন জানতো না রাজমহলের দিকেই ঠিক আর একটা বজরা যাচ্ছিল। বজরার ভেতর আর একটা মানুষ ঠিক কান্তর মতই অমনি করে ভাবছিল ওই কথাগুলোই। আরো দূরে চলো, আরো দূরে। যেখানে কেউ আমাকে চিনতে পারবে না, সেই দিকে চলো।

যে-মানুষটা একদিন ঘুমের জন্যে মাথা খুঁড়ে মরেছে, সেই মানুষটাই আবার সেদিন চোখ দুটো খুলে সামনের অন্ধকার জলের দিকে চেয়ে ঠায় বসে ছিল এক ভাবে। কোথায় রইলো মতিঝিল, কোথায় রইলো মনসুরগঞ্জ, আর কোথায়ই বা রইলো তার চেহেল্-সুতুন। এমনি করেই একদিন সবাইকে সব ছেড়ে চলে যেতে হয়। তেমন যাওয়া তো একদিন যেতেই হবে, তবে দুঃখ কেন? মসনদের জন্যে? লস্কাবাগের সেই খিদ্‌মদ্‌গারটা সেদিন খুব বেত খেয়েছিল নবাবের সোনার কলকে চুরি করার জন্যে। আসবার সময় তাকে সামনে পেলে মসনদও দিয়ে দিত মীর্জা মহম্মদ। বলতো—নে, আমার সোনার কলকেটা তো ছোট জিনিস, আমার মসনদটা পারিস তো নিয়ে নে।

—কী ভাবছো?

লুৎফা এমনিতে কথা বলে না বেশি। ছোট মেয়েটাকে নিয়ে ঘুমোচ্ছে পাশেই। জানে না তো যে নবাবের সঙ্গে বিয়ে না হলে তাকে এমন করে চোরের মত চেহেল্-সুতুন ছেড়ে পালাতে হতো না। নবাবের অসংখ্য প্রজাদের মধ্যেও যদি

কারো বউ হতো লুৎফা তো তাহলেও এত দুর্ভোগ সহ্য করতে হতো না।

—ঘুমোবে না?

তোমাকে আমি আসবার সময় কোনো খবর দিয়ে এলাম না মরিয়ম বেগম-সাহেবা। ইচ্ছে করেই খবর দিলাম না। আমার পরে যারা চেহেল্-সুতুনে আসবে তারা হয়তো দয়া করে তোমার স্বামীর কাছে তোমাকে ফিরিয়ে দিয়ে আসবে। কিংবা হয়তো তোমাকে জ্যারিয়া করে রাখবে। তোমাকে দিয়ে তারা তাদের পা টেপাবে। তোমাকে দিয়ে বাঁদীর কাজ করাবে। তা হোক, তবু এর চেয়ে সে অনেক ভালো বেগমসাহেবা। তোমাদের সেই কাফের সাধুর গানটা আমার মনে পড়ছে কেবল, জানো! আমি কোথায় ছিলাম, কোথায় এলাম, কোথায় যাবো নেই ঠিকানা। সত্যিই, আমার সঙ্গে এলে তুমি অনেক কষ্টে পড়তে। কাল আমরা কোথায় থাকবো, কী খাবো, তারই ঠিক নেই। আমার জন্যে তুমি কেন কষ্ট করবে মরিয়ম বেগমসাহেবা। তুমি আমার কে? আসলে তুমি তো আমার কেউ নও!

—রাত ভোর হয়ে এল, একটু ঘুমিয়ে নাও না।

মীর্জা বললে—তুমি ঘুমোও, আমি জেগে থাকি—

—দুদিন ধরে তো জেগেই আছ, শরীর খারাপ হবে যে না ঘুমোলে—

—শরীরের কথা ভাববার আমার সময় নেই এখন। তুমি ঘুমোচ্ছ, ঘুমোও—

লুৎফা বললে—তুমি না ঘুমোলে আমি কেমন করে ঘুমোই?

—তাহলে ঘুমিও না। কে তোমাকে ঘুমোতে বলছে? আর কে-ই বা তোমাকে এত কষ্ট করে আমার সঙ্গে আসতে বলেছিল? তোমরা সঙ্গে না এলে তো আমি আরো ভালো করে জাগতে পারতুম!

লুৎফা চুপ করে রইলো।

মীর্জা মহম্মদ বললে—কাঁদছো? হ্যাঁ, খুব ভালো করে কাঁদো, খুব ভালো করে আমাকে জ্বালাও। এমন করে আমাকে না জ্বালালে আমার বউ হয়েছিলে কেন? খুব কাঁদো, খুব জোরে গলা ছেড়ে কাঁদো। লোকে যাতে জানতে পারে যে নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলা মুর্শিদাবাদ ছেড়ে পালাচ্ছে, জানতে পেরে যাতে সবাই চারদিক থেকে এসে গ্রেফ্‌তার করে, সেই ব্যবস্থা করো—

তারপর একটু থেমে নিজের মনেই বলতে লাগলো—মানুষের কাছে আমি অপরাধ করেছি, আল্লার কাছেও আমি অপরাধ করেছি, আমার শাস্তি হবে না তো কার হবে? পৃথিবীতে জন্মানোই আমার অপরাধ হয়েছে। কিন্তু আমি কী করবো বলো? আমি কি এমন করে পালিয়ে আসতুম? জেনারেল ল' সাহেবকে দশ হাজার টাকা পাঠালুম, এখনো পর্যন্ত এসে হাজির হলো না। ল' সাহেব এলে কি এমন করে চোরের মত পালাতে হতো আমায়? মীরজাফর, দুর্লভরাম, ইয়ার লুৎফ খাঁ যতই নিমকহারামি করুক, আমার একদিকে মোহনলাল আর একদিকে ল' সাহেব থাকলেই আমি ফিরিঙ্গী বাচ্ছাদের দেখিয়ে দিতুম!

তারপর হঠাৎ লুৎফার দিকে চেয়ে বললে—তুমি কিছু বলছিলে?

লুৎফা কোনো উত্তর দিলে না।

—কই, তুমি কিছু কথা বলছো না যে?

তবু লুৎফা কিছু জবাব দিলে না।

—কিছু কথা বলো! কিছু কথা বলেও তো উপকার করতে পারো আমার? সেটুকুও তোমার দ্বারা হবে না? তাহলে কেন আসতে গেলে আমার সঙ্গে? শুধু ঘাড়ের ওপরে বোঝা হবার জন্যে?

লুৎফার রাগ-অভিমান-অনুরাগ কিছুই যেন থাকতে নেই।

—ঠিক আছে, কথা বলো না। আমি একলাই কথা বলবো। আমার আমীর নেই ওমরাহ্ নেই, আমার মসনদ নেই, সনদ নেই, আমার উজীর, খিদ্‌মদ্‌গার, বাঁদী বেগম, বন্ধু কেউই নেই। আমি দুনিয়ায় একলা এসেছি, একলাই থাকবো। কারোর ভালোবাসারও দরকার নেই আমার। এর পর যদি আমি মারা যাই তো কেউ যেন না কাঁদে। কারোর কাঁদবার অধিকার নেই আমার মরার পর, এই আমি বলে রাখলুম।

হঠাৎ লুৎফা নবাবের মুখে হাত চাপা দিলে।

—তুমি যে কী! তোমার মুখে কি কিছুই আটকায় না?

পেছন থেকে হঠাৎ বাধা পড়লো। বুড়ো মাঝি বললে—হুজুর, রাজমহলে এসে গিয়েছি—

রাজমহল। ভালোই হয়েছে। এখান থেকে সোজা আজিমাবাদে যাওয়ার রাস্তা। জেনারেল ল'র এইদিক দিয়েই আসবার কথা। দশ হাজার টাকা পাঠানো হয়েছে তাকে পূর্ণিয়ায় ফৌজদারের হাত দিয়ে। এলে এই পথেই দেখা হবে।

মীর্জা মহম্মদ বললে—এইখানেই নৌকো বাঁধো বুড়ো মিঞা—

লুৎফাও উঠে পড়েছিল। মীর্জা মহম্মদ বললে—দেখো, হয়তো এখানে তোমার মেয়ের জন্যে দুধ পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু খুব সাবধান। যেন জানতে না পারে কেউ আমাদের। যদি কেউ কিছু জিজ্ঞেস করে তো কী বলবে?

লুৎফা বললে—বলবো আমরা পলাশপুরের লোক, আজিমাবাদে ফকির সাহেবের দরগায় যাচ্ছি দোয়া নিতে!

বাইরে তখন অল্প-অল্প সকাল হয়েছে। ঘাটে তখন আর একটা বজরা বাঁধা রয়েছে। সে-নৌকোর ভেতরে দুর্গা তখন ঘুম থেকে উঠেছে। আর একটা নৌকো এসে লাগতেই দুর্গা ছোট বউরানীকে ডাকলে।

—ও ছোট বউরানী, ওই দেখো, কাদের আবার একটা নৌকো এসে লাগলো।

—কাদের?

দুর্গা বললে—কে জানে কাদের! মনে হচ্ছে মোছলমানদের—

ছোট বউরানীও চেয়ে দেখলে জানলা দিয়ে।

—বউটা খুব সুন্দর, না রে দুর্গা? ওমা, একটা ছোট মেয়েও রয়েছে সঙ্গে। কোথায় যাচ্ছে বল্ তো?

মাঝিকে ডেকে দুর্গা জিজ্ঞেস করলে—হ্যাঁ গো বাছা, ওরা কারা এল গো?

মাঝিটা বললে—ওরা পলাশপুরের লোক, আজিমাবাদে ফকির সাহেবের দরগায় দোয়া নিতে যাচ্ছে। মোছলমান মা ওরা—

—ও, তাই বলো!

তারপর চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলো। বউটা সুন্দরী বটে। পায়ের গোড়ালিটা একেবারে দুধে-আলতায় ধপ্-ধপ্ করছে। সঙ্গের বেটাছেলেটার চেহারাও বেশ। মেয়েটাকে কোলে নিয়ে বউটা স্বামীর সঙ্গে ডাঙায় উঠলো।

ক্লাইভ সাহেব বাইরে আসতেই মুন্সী নবকৃষ্ণ বললে—ও কে, হুজুর?

ক্লাইভ সাহেব বললে—সে তোমার জেনে দরকার নেই মুন্সী, তুমি এখন যাও এখান থেকে—

নবকৃষ্ণ বুঝতে পারলে ব্যাপারটা। আস্তে আস্তে ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে গেল। তারপর সাহেব অর্ডার্লিকে ডাকলে। বললে—ওই যে বুড়ো মতন একটা লোককে ধরা হয়েছে, ওর নাম ইব্রাহিম খাঁ, ওকে ছেড়ে দিতে বল্—

অর্ডার্লি চলে যাচ্ছিল, ক্লাইভ সাহেব আবার ডাকলে—শোন্, আর ময়দাপুরে যদি কোনো তাঁতীর বাড়ি থাকে, সেখান থেকে দু'চারটে শাড়ি কিনে আনতে বলে দে। বেশ ভালো কোয়ালিটির শাড়ি, খুব তাড়াতাড়ি যা—

ক্লাইভ সাহেব ঘরের ভেতরে এল আবার। মরালী তখনো তেমনি করে দাঁড়িয়েই আছে।

সাহেব বললে—তারপর?

মরালী বললে—আমি তো আপনাকে সব কথাই বললুম। এখন আপনার যা ইচ্ছে তাই করুন। ওই ইব্রাহিম খাঁ না থাকলে আমি হয়তো চেহেল্-সুতুন থেকে পালাতেই পারতুম না। কিন্তু মরিয়ম বেগম সেজে সেই কান্ত এখনো সেই চেহেল্-সুতুনেই হয়তো আছে। আমার ইচ্ছে আপনি তাকে উদ্ধার করে আনুন।

—কিন্তু মুর্শিদাবাদে যেতে তো আমার দেরি হবে!

—কেন?

—জগৎশেঠজী আমাকে চিঠি দিয়েছে যে কয়েকজন আমাকে খুন করবার মতলব করেছে। আমি স্পাই লাগিয়েছি, তারা কী খবর দেয় তাই জানবার জন্যে এখানে কিছুদিন থাকবো ঠিক করেছি। আমি তোমার জন্যে এখানকার তাঁতীদের বাড়ি থেকে শাড়ি কিনে আনতে বলেছি, তোমার কিছু ভাবনা নেই!

—কিন্তু কেউ যদি আমাকে চিনতে পারে? চিনতে পারলে যে সবাই ছিঁড়ে খাবে—

ক্লাইভ সাহেব বললে—সে-ভয় তোমার নেই। আমার নাম রবার্ট ক্লাইভ।

মরালী ভালো করে চেয়ে দেখলে। আগের বারে যখন বাগবাজারে পেরিন সাহেবের বাগানে দেখেছিল তখন অন্য চোখ ছিল মরালীর। এখন এতদিন পরে মরালীর চোখও বদলে গেছে, ক্লাইভ সাহেবের চোখও বদলে গেছে। ক্লাইভ সাহেবও আজ যে-মরিয়ম বেগমকে দেখছে এ সে-মরিয়ম বেগম নয়।

ক্লাইভ বললে—লড়াইতে যারা ধরা পড়ে তাদের কী করা হয় তা জানেন তো বেগমসাহেবা?

—আপনারা তো আমাকে বন্দীই করেছেন।

—হ্যাঁ, বন্দীই করেছি। তবু আপনি বেগমসাহেবা বলে আপনার জন্যে আমি শাড়ি-সালোয়ার-কামিজ যা পাওয়া যায় আনতে হুকুম দিয়েছি। আপনার কথায় আমি আপনার সঙ্গের লোকটাকেও ছেড়ে দেবার হুকুম দিয়েছি।

—তার জন্যে আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। কিন্তু আমার জন্যে তো আমি ভাবছি না। আমার যা হয় হোক, আমাকে আপনি খুশী হলে ফাঁসিও দিতে পারেন, আমার

কোনো ক্ষোভ থাকবে না। কিন্তু চেহেল্-স্তুনের মরিয়ম বেগমকে আপনি দয়া করে উদ্ধার করে আনুন—

ক্লাইভ অবাক হয়ে গেল।

—মরিয়ম বেগম? আপনি নিজেই তো মরিয়ম বেগম, চেহেল্-স্তুনে কি আরো একজন মরিয়ম বেগম আছে?

—হ্যাঁ!

—আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। আমার মনে হচ্ছে আপনি আবার সেবারের মত আমাকে ব্ল্যাকমেল করতে চাইছেন। কিন্তু বেগমসাহেবা, আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি, আপনার যদি মনে হয়ে থাকে যে মেয়েদের ওপর আমার উইক্‌নেস্ আছে, তাহলে আপনি ভুল করেছেন। আমি যেমন নরম হতে প্যারি তেমনি আবার পাথরের মত শক্তও হতে পারি। আমি যদি এখনই হুকুম করি তো আমার সোলজাররা এখনই আমার চোখের সামনে আপনার মাংস ছিঁড়ে টুকরো-টুকরো করে খাবে, আমার তাতে কোনো কষ্ট হবে না। তাই চান্ আপনি?

মরালী চুপ করে রইলো।

পেছনে আর্দালিটা বাইরে থেকে ডেকে শাড়িগুলো এনে দিলে। ক্লাইভ শাড়ি নিয়ে বললে—আপনি এটা পরুন, আমি আবার আসবো। কিন্তু খবরদার, পালাবার চেষ্টা করবেন না। তাতে আপনারই ক্ষতি হবে।

বলে বাইরে এসে মেজর কিল্‌প্যাট্রিককে ডেকে পাঠালে। বললে—মুর্শিদাবাদে ওয়ালস্‌কে পাঠাও—সে যেন খবর নিয়ে আসে মুর্শিদাবাদের নবাবের হারেমের ভেতরে মরিয়ম বেগম বলে কোনো বেগম আছে কি না—

শুধু তো বাঙলা মুলুকের মসনদ নয়। একটা দেশের উত্থান-পতনের সঙ্গে সে-দেশের প্রত্যেকটি মানুষের সমস্যাও যে জড়িয়ে থাকে তা ক্লাইভ সাহেবের জানা ছিল। ঐ যারা নদীতে নৌকো চালায়, যারা ক্ষেত-মজুরি করে, যারা তাঁতে কাপড় বোনে, যারা বাড়ি-ঘর বানায়, গরুর গাড়ি চালায়, তাদের সকলের সমস্যার সঙ্গে নবাবের স্বার্থ, কোম্পানীর স্বার্থ, ক্লাইভের স্বার্থ জড়িয়ে আছে।

ওয়ালস্ জিজ্ঞেস করেছিল—কিন্তু সে-বেগম নবাবের কে?

—নবাবের নিজের উওম্যান!

—কিন্তু নবাব তো পালিয়ে গেছে। নবাব যখন পালিয়ে গেছে তখন নবাবের উওম্যানদের নিয়ে আমাদের কী দরকার? তারা তো সবাই নেটিভ মেয়েমানুষ! ইউরোপিয়ান-বেগম কেউ আছে নাকি?

ক্লাইভ বলেছিল—সেসব তোমার জানবার দরকার নেই ওয়ালস্, আমি শুধু একটা খবর জানতে চাই, হারেমের ভেতরে মরিয়ম বেগম বলে কোনো বেগম এখনো আছে কি না—

ওয়ালস্ কথাটা বুঝতে পারলে না। মীরজাফর খাঁ টাকা দিতে রাজি হচ্ছে না, জগৎশেঠ পর্যন্ত তাদের বিশ্বাস করছে না। সেই কথাটাই তো আগে ভাবা দরকার। তা নয়, কোথাকার হারেমের মধ্যে কোন্ মেয়েমানুষ রয়েছে, তার খবর এত কীসের জরুরী হলো কর্নেলের কাছে।

সামনেই মুন্‌শী বসে ছিল। ওয়াল্‌স্‌ সাহেবকে আসতে দেখেই দাঁড়িয়ে উঠলো। বললে—কী হলো সাহেব, মালিক কী বললে?

ওয়াল্‌স্‌ জিজ্ঞেস করলে—তুমি এখনো বসে আছ?

মুন্‌শী বললে—বা রে, মালিক কী আমাকে চলে যেতে বলেছে যে চলে যাবো? টাকা-কড়ির কী ব্যবস্থা হলো? এ-মাসের মাইনেটা যে এখনো পেলুম না।

—মাইনে? ক্ষেপে গেল যেন ওয়ালস্‌ সাহেব! মাইনে বুঝি তুমি একলাই পাওনি, আর আমরাই বুঝি পেয়েছি ভেবেছো?

মুন্‌শী অবাক হয়ে গেল—আপনারাও পাননি হুজুর?

—আরে না, আমরা কেউই পাইনি। পাবো কোত্থেকে? আসছে মাসেও পাও কি না তাই দেখ মুন্‌শী! কোম্পানীর ভাঁড়ারে যা কিছু টাকা-কড়ি ছিল সমস্ত তো লড়াই-এর পেছনে খরচ হয়ে গেছে—

—তা নবাবের টাকা তো আসছে! শুনলাম যে নবাবের টাকা পেলে সকলকে কড়ায়-গণ্ডায় মিটিয়ে দেওয়া হবে?

—সে টাকা কি আছে ভেবেছো? নবাব কি আর তা ফেলে রেখে গেছে? যা-কিছু ছিল তাও তো যাকে পেরেছে তাকে দুহাতে বিলিয়ে দিয়ে গেছে।

—কিছু নেই?

অনেক আশা করেছিল নবকৃষ্ণ। এই মাইনেটার জন্যেই বলতে গেলে অত দূর থেকে এখানে এসেছিল। কিন্তু তাও যদি না পাওয়া যায় তো কী হবে! টাকার জন্যেই সাহেব-কোম্পানীর চাকরিতে ঢোকা। টাকার জন্যেই ম্লেচ্ছদের ছোঁয়া খাওয়া। টাকাই তো সব মা! মা, তুমি তো স্বপ্ন দিয়েছিলে আমি অনেক টাকার মালিক হবো, অনেকে আমায় হাত দেখেও তাই বলেছে। কিন্তু কোথায় টাকা? টাকার নাম-গন্ধও যে দেখতে পাচ্ছি না।

ওদিকে সেপাইদের ছাউনি। ক'দিন ধরে বড় ধকল গেছে সকলের। তাই সবাই গড়িমসি করছে। মুন্‌শী একবার সেদিকে গেল। সেপাইরা সবাই চেনে মুন্‌শীকে। মুন্‌শীর মাথার টিকি ধরে টানে মাঝে মাঝে। বলে—এটা কী গো মুন্‌শী?

মুন্‌শী বলে—ওতে হাত দিও না বাবারা, ওতে হাত দিয়েছো কি তোমাদের পাপ হবে।

—পাপ? পাপ মানে?

—পাপ মানে পাপ! যাকে বলে পাতক। তোমরা তো বাবা অনেক পুণ্য করেছো তাই ফিরিঙ্গী হয়ে জন্মেছো, আর আমরা হিন্দু হয়ে জন্মে ভুগে ভুগে মরছি। এই দেখ না, কোথায় সুতোনুটি, সেখান থেকে হাঁটতে হাঁটতে আসছি দুটো টাকার জন্যে। এটা পাপ নয়? টিকি ছুঁলে তোমাদেরও বাবা আমার মতন টাকার জন্যে হা-হুতোশ করতে হবে!

হঠাৎ ওদিক থেকে একটা পাল্‌কি আসার হুম্‌-হাম্‌ শব্দ হলো। সবাই হাঁ করে চেয়ে রইলো। পালকি করে আবার কে আসে? কে?

বেশ চটক্‌দার পালকি বটে! খান্‌দানি লোক হবে কেউ! আট বেহারার পালকিটা একেবারে সোজা কর্নেল সাহেবের ঘরের দিকে যাচ্ছিল।

মেজর কিল্‌প্যাট্রিক সাহেব দেখতে পেয়েই দৌড়ে এসেছে।

—কে?

পালকিটা থামলো। ভেতর থেকে নামলো উমিচাঁদ সাহেব। মেজর সাহেবকে দেখে জিজ্ঞেস করলে—কর্নেল সাহেব কোথায়?

—ক্যাম্পে আছেন।

—তাহলে একবার যে খবর দিতে হবে আমি এসেছি। ওদিকের সব ব্যবস্থা করে রেখেছি। তোমাদের কোনো ভাবনা নেই। তবু একবার দেখা করতে এসেছি। নইলে তোমাদের কর্নেল ভাববে আমাদের গাছে তুলে দিয়ে গিয়ে শেষকালে মই কেড়ে নিলে উমিচাঁদ সাহেব। আমি সে-রকম লোক নই হে, সে-রকম লোক নই। নইলে আমাকে আর এতদিন কারবার করে খেতে হতো না—

মেজর বললে—ওদিকের খবর কী?

—কোন্‌দিকের? শুনেছো তো নবাব পালিয়ে গেছে?

—সেটা করলে কে? আপনি?

—সে-খবরও এখনো পায়নি কর্নেল? এই উমিচাঁদকে অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হয়েছে! তোমরা তো শুধু লড়াই করেই খালাস। কিন্তু শুধু বন্দুক-কামান দেগেই তো লড়াইতে জেতা যায় না, তার সঙ্গে-সঙ্গে কূটনীতি চালাতে হয়। এ ক'দিন অনেক খাটা-খাটুনি গেছে। এ ক'দিন নাওয়া-খাওয়া বন্ধ ছিল আমার। এখন সব শেষ পর্যন্ত ভালোয় ভালোয় চুকলো, তাই কর্নেল সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে এলাম, নইলে আবার মনে মনে ভাববে—

হঠাৎ মুন্‌শীকে দেখতে পেলে। নবকৃষ্ণ ততক্ষণে একেবারে উমিচাঁদ সাহেবের পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় ঠেকিয়ে ফেলেছে!

—কি গো, নবকেষ্ট কেমন আছ? চাকরি কেমন চলছে?

—আজ্ঞে, আপনার কৃপায় ভালোই আছি। কিন্তু...

—কিন্তু আবার কী?

—আজ্ঞে, এ-মাসের মাইনেটা পাইনি, তাই মালিকের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি, আপনি যদি একটু বলে দেন—

উমিচাঁদ যেন রেগে গেল—আরে, তোমার ভারি ক'টা টাকা মাইনে, তার জন্যে আবার ভাবনা করছো? সাহেব কি পালাচ্ছে? এই সবে লড়াই মিটলো, এর পর নবাবের সম্পত্তির বিলি-ব্যবস্থা হোক, তবে তো! তোমার তো সবে ওই ক'টা টাকা পাওনা, আমার যে লাখ-লাখ টাকা পাওনা পড়ে রয়েছে, আমার কথাটা ভাবো দিকিনি একবার!

মুন্‌শী বললে—আজ্ঞে শুনেছি নাকি, নবাব সব টাকা-কড়ি নিয়ে পালিয়েছে—

উমিচাঁদ হো হো করে হেসে উঠলো—আরে তুমিও যেমন পাগল, নবাবের অত টাকা সব কি সঙ্গে নিয়ে পালানো যায়? অত টাকা বইতে গেলে কুড়িটা হাতী লাগবে, তা জানো?

—তবে যে ওয়ালস্‌ সাহেব ফিরে এসে বললেন টাকা নেই কিছু! মীরজাফর সাহেব বলেছে। সব টাকা-কড়ি যা ছিল সব নাকি যাবার আগে হরির লুঠ করে দিয়ে চলে গেছে নবাব!

মেজর সাহেব পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। উমিচাঁদ তার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলে—তাই নাকি?

মেজর বললে—হ্যাঁ—

—স্রেফ বাজে কথা! আমার কথায় বিশ্বাস করো, সব স্রেফ বাজে কথা। তাহলে আমি আমার এই নাক-কান কেটে ফেলবো, এই বলে রাখলুম। অন্তত নবাবের চেহেল্‌-সুতুনের মালখানা খুললে তার ভেতরে কুড়ি কোটি টাকা পাওয়া যাবে!

—কিন্তু কর্নেল যুদ্ধের খরচা হিসেবে মীরজাফরের কাছে এখনকার মত দু'-

কোটি কুড়ি লক্ষ টাকা চেয়ে পাঠিয়েছিল। মীরজাফর বলে পাঠিয়েছে টাকা নেই। এমন কি লোন্ হিসেবেও টাকাটা যদি জগৎশেঠজীর কাছে পাওয়া যায় তাও বলে দিয়েছিল কর্নেল, তাতেও জগৎশেঠজী দিতে রাজি হয়নি।

—ঠিক আছে; উমিচাঁদ সাহেব বললে—ঠিক আছে, কুছ্ পরোয়া নেই, কর্নেল সাহেব বুঝি সেই ভাবনায় অস্থির হয়েছে? আচ্ছা, আমি নিজে গিয়ে সাহেবকে অভয় দিয়ে আসছি, কুছ্ পরোয়া নেই। আর নবাবের টাকা তো সাহেবের একলার টাকা নয়, আমারও তো ভাগ আছে সে-টাকাতে! সাহেবের সঙ্গে কড়ার আছে তিরিশ লাখ টাকা আমার পাওনা, নইলে আমি যে মারা যাবো রে বাবা—

বলে ক্লাইভ সাহেবের ঘরের দিকে এগিয়ে চললো। মেজর কিল্‌প্যাট্রিক তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে উমিচাঁদের খবরটা দিতে গেল কর্নেলকে।

নবকৃষ্ণ তাড়াতাড়ি গিয়ে ধরলো উমিচাঁদ সাহেবকে।

—হুজুর, একটা কথা ছিল—

উমিচাঁদ চলতে চলতে থেমে গেল। পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে বললে—কী?

—একটা কাণ্ড শুনেছেন? সাহেবের কাণ্ড! সাহেব এখানে এসেও একটা মেয়েমানুষের ফাঁদে পড়েছেন!

—সে কী? সে-রোগ এখনো আছে? মেয়েমানুষটা কে?

—কে জানে হুজুর! পেরিন সাহেবের বাগানে যে ছিল সে নয়। এ আলাদা। আজকে এসেছে। নতুন আমদানি হয়েছে। বেটাছেলের মতন জামা-কাপড় পরা ছিল, আসলে মেয়েমানুষ!

—কিন্তু মেয়েমানুষটা কে? নাম কী? কোথাকার?

—তা জানি না হুজুর। ঘরের মধ্যে রয়েছে। তার জন্যে আবার তাঁতি-পাড়া থেকে শাড়ি কিনিয়ে আনালেন এখন সায়েব!

উমিচাঁদ ভাবনায় পড়লো। এই ফাঁকা মাঠের মধ্যে সেপাইদের ছাউনিতে আবার মেয়েমানুষ কোত্থেকে এল!

ততক্ষণে মেজর কিল্‌প্যাট্রিক ওদিক থেকে ডাকলে—আসুন উমিচাঁদ সাহেব, আসুন—

মূল কথা কিন্তু মেয়েমানুষ নয়। মূল কথা সেই টাকা। দু' কোটি কুড়ি লক্ষ টাকা না পেলে যেন ফিরিঙ্গী-কোম্পানীর সমস্ত পরিশ্রম, সমস্ত ক্ষয়-ক্ষতি উসুল হবে না। ১৭৫৭ সালের সেদিনকার সেই বাঙলা মুলুকেও চরম প্রশ্ন হলো টাকা। নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলাকে টাকার প্রয়োজনেই ফিরিঙ্গীদের সঙ্গে লড়াইতে নামতে হয়েছিল, আবার টাকার প্রয়োজনেই ফিরিঙ্গী কোম্পানীকে সাত-সমুদ্র-তের-নদী পেরিয়ে এসে বাঙলা-মুলুকের মসনদ কেড়ে নিতে হয়েছিল। উমিচাঁদ, নন্দকুমার থেকে শুরু করে বশীর মিঞার মত ক্ষুদে চুনোপুঁটিটাও এই টাকার জন্যেই দল বেঁধে নবাবকে ছেড়ে ফিরিঙ্গীদের দলে ভিড়েছিল।

মনসুরগঞ্জ হাবেলির সামনে নতুন পাহারাদারের আস্তানা বসেছে। তাদের বলে দেওয়া আছে সবাইকে যেন মীরজাফর আলি সাহেবের কাছে না ঢুকতে দেওয়া হয়।

মীরন হুঁশিয়ার ছেলে। আসলে সে-ই ক'দিন ধরে খুব মাতব্বরি করছে। মীরজাফর সাহেব নবাব হলে তারই মাতব্বরি করার কথা! পাহারাদাররাও তাই জেনে নিয়েছে।

কিন্তু পুরোপুরি সাহস তখনো হয়নি। রাজা দুর্লভরাম রয়েছে, ইয়ার লুৎফ খাঁও রয়েছে। তারপর ঢাকায় সরফরাজ খাঁর ছেলে আমানী খাঁ রয়েছে। তারপর নবাব মীর্জা মহম্মদ কোথায় গিয়ে কী ষড়যন্ত্র করছে তারও ঠিক নেই। যদি আজিমাবাদের দিকে গিয়ে থাকে তো বিপদ। সেখানে জেনারেল ল' সাহেবকে নিয়ে আবার যদি হুড়মুড় করে এসে পড়ে তখন কী হবে তা বলা যায় না।

তবু স্বপ্ন দেখতে দোষ কী?

মীরন জিজ্ঞেস করে—টাকার কী হবে বাপজান?

মীরজাফর সাহেব বলে—টাকা দেবো না—

—কিন্তু ক্লাইভ সাহেবকে যে টাকা দেবার চুক্তি হয়েছে?

মীরজাফর সাহেব বলে—একবার নবাবী পেলে তখন দেখা যাবে! এখন টাকা কোথায় পাবো?

তা বটে! কথাটা মনে লাগলো মীরনের। একবার নবাবী পেয়ে গেলে তখন কি কেউ চুক্তির কথা মনে রাখে? তার চেয়ে অন্য কথা ভাবা ভালো। দরজা-জানালা বন্ধ মনসুরগঞ্জ হাবেলির মধ্যে রাত্রে শুয়ে শুয়ে মীরজাফর আলি সাহেব আর মীরন সাবধানে রাত কাটায়। বড় অশান্তিতে কাটছে ক'দিন। ফিরিঙ্গীদের এক কোটি টাকা দিতে হবে। আরমানীদের দিতে হবে সত্তর লক্ষ।

—বাপজান!

রাত্রে বিছানায় শুয়েও ঘুম আসে না মীরনের। হঠাৎ মাথায় একটা ভাবনা আসতেই আবার উঠে আসে বাবার কাছে। মীরজাফর সাহেবও তখন শুয়ে শুয়ে ভাবছে।

—কী?

হঠাৎ যেন মুর্শিদাবাদের রাস্তায় চিৎকার ওঠে—আল্লা-হো-আকবর—

মনে হয় যেন লক্ষ লক্ষ লোক একসঙ্গে চিৎকার করে উঠলো। তবে কি ক্ষেপে উঠলো সবাই? না কি ইংরেজ-ফৌজ এসে হাজির হলো। কখনো চিৎকার ওঠে মতিঝিলের দিক থেকে। কখনো চক্‌বাজারের দিক থেকে, কখনো আবার মহিমাপুরের দিক থেকে।

মীরজাফর বলে—তুই ঘুমো গে যা—

—ঘুম যে আসছে না।

সেই ২৪শে জুন থেকেই ছেলে আর বাপের ঘুম নেই। আর শুধু তাদেরই বা কেন, সারা চেহেল্‌-সুতুনেরই ঘুম নেই। বলতে গেলে সারা মুর্শিদাবাদেরই ঘুম নেই। চারদিকে চর ছুটছে নবাবকে খুঁজতে। ঢাকাতেও লোক পাঠিয়েছে আমানী খাঁর খবর আনতে। আজিমাবাদের দিকেও লোক গেছে। জেনারেল ল' সাহেব আসছে নাকি? জগৎশেঠজীর কাছেও আর্জির সীমা নেই। টাকাটা দিয়ে দিলেই হয়। কেউ এসে পড়বার আগেই একটা ব্যবস্থা হয়ে গেলে হয়।

—সুজা উল্‌ মুলক্‌ হিসাম-উ-দ্দৌলা মীরজাফর আলি খাঁ বাহাদুর মহবত্‌জঙ্গ!

খেতাবটা শুনতে ভালো। মীরজাফর আলি খেতাব নিয়েছে মহবত্‌জঙ্গ, আর মীরন খেতাব নিয়েছে শাহামত্‌জঙ্গ!

ফটকের পাহারাদাররা দেখা হলেই সেলাম করে। আগেও সেলাম করতো, কিন্তু এখন মনে হয় ভিখু শেখ যেমন করে জগৎশেঠজীকে সেলাম করে তেমনি করে এরাও সেলাম করছে মীরনকে।

সেদিন হঠাৎ খবর এল, ক্লাইভ সাহেব আসছে।

—তুই কী করে জানলি?

—আমি যে দেখলুম ঘোড়ায় চড়ে একটা ফিরিঙ্গী সাহেব আসছে!

—দূর বেল্লিক, ক্লাইভ সাহেব কি আর এলে একলা আসবে? তার সঙ্গে ফৌজ আসবে। সেপাই লস্কর সবাই আসবে।

সেদিন মেহেদী নেসার, ডিহিদার রেজা আলি সবাই এসে হাজির। মীরজাফর সাহেবের সঙ্গে সবাই পরামর্শ করতে এসেছে। শহরে কাজ-কর্ম সব বন্ধ, রাস্তাঘাট পরিষ্কার হয় না। মেথররা কেউ খানাখন্দ পরিষ্কার করে না। দুর্গন্ধ জমছে নর্দমায়। শেষকালে মড়ক শুরু হবে।

—নবাবের কিছু খবর পাওয়া গিয়েছে?

মেহেদী বললে—আমি চর পাঠিয়েছি সব জায়গায়—

—চেহেল্-সুতুনের খবর কী?

—মালখানায় তালা-চাবি দিতে গিয়েছিলাম, তাতে নানীবেগমসাহেবা আমাকে অপমান করে তাড়িয়ে দিলে। বললে—চেহেল্-সুতুনের মালখানার টাকাও আমার—

—তুমি কী বললে?

মেহেদী বললে—আমি শাসিয়ে এলাম। বললাম—মীরজাফর সাহেবকে গিয়ে আমি সব বলছি। কিন্তু নানীবেগমসাহেবাকে তো কিছু বলতে পারি না। শেষে হয়তো মালখানা লুঠপাট করে সব টাকাকড়ি সকলকে বিলিয়ে দেবে—

মীরন বললে—আগে মালখানাটা আমাদের নিতে হবে! ওতে অনেক টাকা আছে—

মীরজাফর বললে—আগে ক্লাইভ সাহেব আসুক, এখন কিছু ক'রো না—

ফটকের বাইরে তখন ওয়ালস্ সাহেব এসেছে! খবর পেয়েই মীরন দৌড়ে নিচেয় গেছে।

—আসুন হুজুর, আসুন।

মীরজাফর সাহেবও দাঁড়িয়ে উঠলো। চার দিন পরে একটা খবর অন্তত পাওয়া যাবে। সাহেব সামনে আসতেই হাসিমুখে জিজ্ঞেস করলে—কী খবর? কর্নেল সাহেব কেমন আছে? খয়রিয়ত্ তো সব?

ওয়ালস্ বললে—আমি একটা খবর নিতে এসেছি। কর্নেল সাহেব জানতে পাঠিয়েছে।

মীরন বললে—আমরাও তো বসে আছি ক্লাইভ সাহেবের জন্যে। তিনি আসতে এত দেরি করছেন কেন? টাকা পাঠানো হয়নি বলে গোসা করেছেন নাকি?

মীরজাফর বললে—আমরা তো বলেছি টাকা দেবো। তিনি নিজে এলে সব ব্যবস্থাই হবে।

ওয়ালস্ বললে—না, সে জন্যে নয়, কর্নেল আমাকে জানতে পাঠিয়েছে চেহেল্-সুতুনে মরিয়ম বেগম বলে কোনো বেগম-সাহেবা আছে কি না—

—মরিয়ম বেগম? আগে ছিল, এখন তো নেই!

—নেই?

মেহেদী নেসার এতক্ষণে কথা বললে। বললে—মরিয়ম বেগম? মরিয়ম বেগম-

সাহেবার খবর চেয়েছেন ক্লাইভ সাহেব? কেন?

ওয়ালস্ বললে—তা জানি না। জরুরী খবর চেয়েছে কর্নেল।

মীরজাফর সাহেব মেহেদী নেসারের দিকে চাইলে। বললে—তুমি তো চেহেল্-সুতুনের ভেতরের খবর রাখো? মরিয়ম বেগম বলে কেউ আছে?

ডিহিদার রেজা আলি বললে—আছে, আমি জানি—

ওয়ালস্ বললে—আছে? তাহলে আমি সেই কথা কর্নেলকে গিয়ে বলি?

ওয়ালস্ আর দাঁড়ালো না। কিন্তু সে চলে যাবার পরেই মীরজাফর আলি সাহেবের মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল। কর্নেল সাহেব এই সেদিন টাকা চেয়ে পাঠিয়েছিল, এখন আবার মরিয়ম বেগম সাহেবার খবর চেয়ে পাঠালো কেন? নিশ্চয় কোনো মতলব আছে। মরিয়ম বেগমসাহেবা কে?

মেহেদী নেসার বললে—আমি বুঝেছি।

—কী বুঝেছো?

—মরিয়ম বেগম হচ্ছে হাতিয়াগড়ের জমিদারের বউ। নবাব তাকে হাতিয়াগড় থেকে চেহেল্-সুতুনে এনেছিল। আমার মনে হয় হাতিয়াগড়ের জমিদার এর মধ্যে আছে।

মীরন বললে—ঠিক আছে, আমি তার ব্যবস্থা করছি—

—কী ব্যবস্থা করবে?

মেহেদী নেসার বললে—আমি তার ব্যবস্থা আগেই করে রেখেছি, আমি তাকে চেহেল্-সুতুনে নজরবন্দী করে রেখেছি—

মীরজাফর সাহেব বললে—তা যদি কর্নেল সাহেব মরিয়ম বেগমসাহেবাকে পেলে খুশী হয় তো শুধু মরিয়ম বেগমসাহেবা কেন, চেহেল্-সুতুনে মীর্জা মহম্মদের যত বেগম আছে সকলকে দিয়েই কর্নেলকে খুশী করবো—

রাজমহলের ঘাটে দুর্গা তখন মুখ হাত-পা ধুয়ে নিয়ে খাবার বন্দোবস্ত করেছে। রাজমহল থেকে নৌকো ছেড়ে আবার যাত্রা করতে হবে। এখান থেকে ছেড়ে হাতিয়াগড়ে পৌঁছতে আর বেশি সময় লাগবে না।

তবু ছোট বউরানী তাগাদা দিয়েছে দুর্গাকে। বলেছে—ওরে দুর্গা, ওরা দেরি করছে কেন? কখন নৌকো ছাড়বে?

দুর্গা বললে—দাঁড়াও গো ছোট বউরানী, একটু জিরোতে দাও, সারা রাত নৌকো বেয়েছে, একটু জল-টল খেয়ে নেবে না ওরা? ওরাও তো মানুষ, না কি!

আর যেন তর সইছে না ছোট বউরানীর। সেই কবে বেরিয়েছে হাতিয়াগড় থেকে, মনে হয় যেন কত বচ্ছর। এমন করে যে বিপদ কাটবে, কে জানতো!

হঠাৎ পাশের নৌকোর ঝি'টা দুর্গার কাছে এল। বোরখা-পরা মূর্তি মুখের ঢাকনাটা তুলে বললে—মা, তোমাদের কাছে একটু দুধ হবে?

—দুধ? দুধ কী হবে বাছা?

ঝি'টা বললে—আমার বিবির ছোট মেয়েটার ক্ষিধে পেয়েছে, একটু দুধ পেলে ভালো হতো তাই জিজ্ঞেস করছি—

—তোমার মালিক কে? কোথায় যাচ্ছে?

আমার মালিক পলাশপুরের তালুকদার।

—তা রাজমহলেই নামবে নাকি?

—না মা, এখান থেকে যাবে আজিমাবাদে। সেখানে ফকিরের দরগায় দোয়া মানতে যাচ্ছে।

—তা সঙ্গে ছোট মেয়ে রয়েছে, দুধ আনতে হয় তো। দুধ আমরা কোথায় পাবো?

ঝি'টা আর দাঁড়ালো না। ডাঙার ওপর পলাশপুরের তালুকদার আর তার বিবি ছোট মেয়েটাকে কোলে করে দাঁড়িয়েছিল, সেই দিকেই চলে গেল।

আসলে জায়গাটা রাজমহল নয়। নৌকো দুটো ভিড়েছিল রাজমহলের উল্টোদিকের ঘাটে। বড় নিরিবিলি জায়গাটা। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র উপযুক্ত লোকের হাতেই ছোট বউরানীদের পাঠিয়েছিলেন। কথা ছিল হাতিয়াগড়ে পৌঁছিয়ে দিয়েই তারা আবার যথাসময়ে ফিরে আসবে। তবু দিনকাল বড় খারাপ। চারদিকে অরাজক অবস্থা। তাই মহারাজ যাত্রার আগেই সাবধান করে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন—চারদিক বুঝে-সুঝে তবে যাবে, অনেক দূরের রাস্তা, কাউকে বিশ্বাস করবে না—

কিন্তু একটা আশা ছিল এই যে, লড়াই থেমে গিয়েছে। নবাব মুর্শিদাবাদ শহর ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছে। নিজামতের বিষদাঁত ভেঙে গিয়েছে। এখন আর অত্যাচারের প্রকোপটা সাময়িকভাবে বাইরের প্রজাদের ওপর গিয়ে পড়বে না। সেই সুযোগে ছোট বউরানীরা নির্বিবাদে নিজের দেশে গিয়ে হয়তো পৌঁছোতে পারবে।

মহারাজা সকলকে পাঠাতে পেরে নিজের মনে কিন্তু নিশ্চিন্ত হতে পারেননি। মানুষের সমাজে বা রাষ্ট্রে যখন দুর্যোগ আসে তখন ব্যক্তির সমস্যা দেশের কর্ণধারের কাছে ছোট হয়ে আসে। তখন মনে হয় বৃহত্তর মানুষের সমাজের মঙ্গল হবে কেমন করে! নবাব যে পালিয়ে গেল, এত অত্যাচারের স্রোতে বাঙলা দেশের মানুষকে ভাসিয়ে দিয়ে গেল, তার শাস্তি তো হলো না!

শাস্তি! শাস্তি কথাটা মনে পড়তেই মহারাজের মনে হলো—কীসের শাস্তি? পাপের শাস্তি? ইতিহাসে আগে কি আর কোনো নবাব অত্যাচার করেনি? তাদের পাপের শাস্তি কে দিয়েছে? নবাব মুর্শিদকুলির পাপের শাস্তি কি হয়েছে? বাদশা আওরঙজেবের পাপের শাস্তি কে ভোগ করেছে? কিংবা হয়তো পাপ পুণ্য বলে কিছুই নেই। ইতিহাসের চাকার তলায় পড়ে একজন গুঁড়িয়ে যায়, আবার কেউ একজন উঠে দাঁড়ায়! তাই-ই যদি হবে, তাহলে এ পৃথিবী কোন্ আইনের সূত্র ধরে চলবে?

বাচস্পতি মশাইকে কথাটা একদিন জিজ্ঞেস করেছিলেন মহারাজ।

বাচস্পতি মশাই বলেছিলেন—পাপের শাস্তি তো সব-সময় নগদ পাওয়া যায় না মহারাজ।

—কিন্তু নগদ না-পাওয়া গেলে আমার প্রজাদের আমি কী বলে প্রবোধ দেবো? তারা চাইবে ফলাফল। পুণ্যের ফলাফলও যেমন দেখতে চাইবে, পাপের ফলাফলও তেমনি দেখতে চাইবে। না দেখাতে পারলে সবাই যে শেষকালে অধার্মিক হয়ে উঠবে। রসাতলে যাবে সংসার। রাজ্য অরাজক হয়ে উঠবে!

বাচস্পতি মশাই বলেছিলেন—সেই জন্যেই তো মহারাজ ঈশ্বরকে অদৃষ্ট বলা হয়েছে—আমরা সেই ঈশ্বরকেই ডাকবো। ডেকে বলবো—হে ঈশ্বর, তুমি

আমাদের পাপ ক্ষমা করো—

—না বাচস্পতি মশাই, যে ক্ষমা চায় সে দুর্বল, সে ভীরু! ক্ষমা চাইলে সে-প্রার্থনা ঈশ্বরের কানে গিয়ে পৌঁছোবে না। বলতে হবে, আমাদের পাপ মার্জনা করো।

সত্যিই সেদিন যখন মহারাজ কৃষ্ণনগর ছেড়ে মুর্শিদাবাদের দিকে যাচ্ছিলেন তখন চারদিকের অবস্থা দেখে সেই কথাগুলোই মনে হচ্ছিল। সবে মাত্র তিন দিন আগে লড়াই শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু নদীর দু'পাশের ধানক্ষেতগুলো খাঁ-খাঁ করছে, লাঙল পড়েনি। দু'পাশের গাঁয়ের কুঁড়েঘরগুলো ফাঁকা। এই পথ দিয়েই নবাবের ফৌজ একদিন লক্কাবাগে গিয়েছিল, আবার এই পথ দিয়েই ফিরিঙ্গীদের সেপাইরা পেছনে-পেছনে এসেছে।

তা একেই হয়তো বলে প্রায়শ্চিত্ত। পৃথিবীর পাপ যখন স্তূপাকার হয়ে ওঠে তখন তার প্রায়শ্চিত্তের বিধান হয়তো এই রকমই! যেখানে যত কিছু পাপ আছে, অত্যাচার আছে, অশান্তি আছে, অকল্যাণ আছে, এই রকম করেই হয়তো ঈশ্বর তা মার্জনা করেন। কিন্তু পৃথিবীর সমস্ত মানুষই যে এক। তাই একজনের পাপ অন্য জনের প্রায়শ্চিত্ততে তার প্রতিবিধান হয়। পিতার পাপ পুত্রকে বহন করতে হয়। প্রবলের পাপ দুর্বলকে সহ্য করতে হয়। মানুষের একজনের পাপ সকলকেই ভাগ করে নিতে হয়।

জগৎশেঠজীর বাড়িতে বসে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র সেই কথাই বলছিলেন।

জগৎশেঠজীরও দুশ্চিন্তা ক'দিন ধরে কম ছিল না। এক-একদিন এক-এক রকম খবর এসে সমস্ত ওলট-পালট করে দিচ্ছিল। যার টাকা আছে তারই চুরির ভয় থাকে, যার রাজ্য আছে তারই অরাজকতার ভয় থাকে। অথচ সমস্ত মুর্শিদাবাদের লোকরা কেন শহরময় অত ভিড় করছে? তাদের ভাবনা কিসের? জগৎশেঠজী একবার দিল্লীতে লোক পাঠিয়েছেন, আবার কাছারিতে গিয়ে বসেছেন। কিছুতেই শান্তি পাননি মনে। খবরটা তিনিও পেয়েছিলেন যে, ক্লাইভ এক-একটা কাজের জন্যে এক-একবার লোক পাঠাচ্ছে মুর্শিদাবাদে। ওটা ছুতো। ওটা অজুহাত। মরিয়ম বেগম নামে কোনো বেগমসাহেবা চেহেল্-সুতুনে আছে কি না তা জানবার জন্য এত কৌতূহল সাহেবের নেই। আসলে জানতে চায় মুর্শিদাবাদের হাঁড়ির খবর। জানতে চায় ক্ষমতা নিয়ে ঝগড়া বেধে গেছে কিনা ভেতরে ভেতরে। ইয়ার লুৎফ খাঁ, মীরজাফর আলি, রাজা দুর্লভরাম—এদের মধ্যে ঝগড়া বাধার গুজবটা সত্যি কি না।

মহারাজ বললেন—আমি ভুল করেছিলাম জগৎশেঠজী, আমার মনে হচ্ছে ক্লাইভ সাহেবের মতলব খারাপ। বোধ হয় নিজেই মসনদে বসতে চায় এখন—

জগৎশেঠ বললেন—আশ্চর্য নয়, কিন্তু আমি ভেবেছিলাম লোকটা চালাক—

—তা চালাক তো বটেই। নইলে কাজ শেষ হবার আগেই টাকা চেয়ে বসে! ভাবছে এখানে এলে যদি সবাই মিলে আমরা রুখে দাঁড়াই।

জগৎশেঠজী বললেন—সেই জন্যেই আমি খবর পাঠিয়েছি যেন এখুনি মুর্শিদাবাদে না এসে পড়েন, তাতে খুন হয়ে যাবার ভয় আছে। লিখে দিয়েছি ক্লাইভকে খুন করবার জন্যে শহরে ষড়যন্ত্র চলছে বলে খবর পেয়েছি।

—কিন্তু এমন করে ক'দিন আর অপেক্ষা করে থাকবে সাহেব?

জগৎশেঠজি বললেন—তা জানি না। তবে আমি দিল্লীতে লোক পাঠিয়েছি,

তার কাছ থেকে খবর পাবার আশায় বসে আছি—

—কিন্তু সে তো তিন মাস লাগবে সেখান থেকে খবর আসতে।

হঠাৎ বাইরে ভিখু শেখের গলার আওয়াজ পেয়ে দু'জনেই অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন। কেউ এল নাকি? আজকাল যে-কোনো মুহূর্তে যে-কোনো ঘটনা ঘটতে পারে। কখন যে ফৌজের লোকরা বিদ্রোহ করে ওঠে বলা যায় না। নবাব নেই, সব লুঠপাট করে ফেলতে পারে। খবর রটে গেছে যে, মেহেদী নেসার চেহেল্-সুতুনের মালখানা লুঠ করতে গিয়েছিল। নানীবেগমসাহেবা বাধা দিয়ে তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে। মালখানার ভেতরে এখনো অনেক সোনা হীরে মুক্তো আছে। একবার মালখানা লুঠ করতে পারলে আর কোনো ভাবনা নেই।

আর তা ছাড়া এই-ই তো সুযোগ। এই সময়ে নবাব নেই, পাহারাদার নেই। কিছুই নেই বলতে গেলে। নিয়ম করে আর ইনসাফ মিঞা নহবতও বাজায় না। তারাও ভয় পেয়ে গেছে। মাইনে পাবে কি না তারই তো কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই।

নানীবেগমসাহেবা সারা রাত পাহারা দেয়। পীরালী খাঁকে হুঁশিয়ার করে দেয়। বলে— খুব হুঁশিয়ার পীরালি। আমার মালখানার দিকে যেন কেউ না আসে। কেউ এলে তার গর্দান নিয়ে নেবে, তার পরে কথা।

পীরালি খাঁ, নজর মহম্মদ, বরকত আলি, তারা সবাই প্রহরে প্রহরে টহল দেয়। বেগমমহলের ফটকে ফটকে গিয়ে চিৎকার করে—হুঁশিয়ার, হুঁশিয়ার হো—

যারা ঘুমোয় তারা হুড়মুড় করে জেগে ওঠে ভয় পেয়ে। কী হলো? আবার কী হলো? আবার মালখানা লুঠ করতে এল নাকি?

তারপর যখন বুঝতে পারে তখন গালাগালি দেয় মনে মনে। বলে—মরণ-দশা আর কি! একটু ঘুমোতেও দেবে না ছাই—

সমস্ত চেহেল্-সুতুনটাই এমনি ভয়ে ভয়ে শিউরে ওঠে সারা রাত। দিনের বেলাটা তবু কোনো রকমে কাটে। কিন্তু রাত হলেই সকলের ভয় করে। কখন কী হয় কেউ বলতে পারে না।

কিন্তু সেদিন সত্যি-সত্যিই আর কারো ঘুম এলো না। বাইরে যেন খুব গোলমাল হতে শুরু করেছে। আবার কি মালখানা লুঠ করতে এসেছে মেহেদী নেসার সাহেব? আবার বুঝি নানীবেগমসাহেবার সঙ্গে ঝগড়া বাধবে!

পেশমন বেগম নিজের মহলের ফটকের সামনে এসে উঁকি মারলো। লোকজন ছুটোছুটি করছে।

সাহস করে পেশমন বেগম একজনকে জিজ্ঞেস করলে—কী হলো রে বরকত?

বরকত আলির তখন বোধ হয় আর সময় নেই কথা বলবার। দৌড়তে দৌড়তে ছুটলো নানীবেগমসাহেবার মহলের দিকে।

গুলসন কথাটা শুনতে পেয়েছিল। একটু ফুরসুত পেতেই জিজ্ঞেস করলে—কী হয়েছে রে ভাই? এত হল্লা আবার কীসের?

পেশমন বললে—কী জানি, মুখপোড়ারা আবার কী করেছে—

—আর কাউকে জিজ্ঞেস করো না!

—তুই জিজ্ঞেস কর ভাই! আমার ভয় করছে।

—হয়তো ফিরিঙ্গী-ফৌজ আসছে।

পেশমন বললে—ফিরিঙ্গী-ফৌজ এলে তো বাঁচি—এ আর ভাল্লাগে না ছাই! রোজই একটা-না-একটা হুজ্জৎ—

পাশের ফটক থেকে তক্কি বেগমসাহেবা জিজ্ঞেস করলে—কী হয়েছে রে ভাই? হল্লা হচ্ছে কেন?

—ওই দ্যাখ্, সব্বাই জেগে উঠেছে।

—জেগে তো উঠবেই। কেউ কি আর ঘুমোতে পারছে এ ক'দিন? খাওয়া নেই, ঘুম নেই, শান্তি নেই মনে!

তক্কি বেগম বললে—ফিরিঙ্গী-ফৌজ আসছে নাকি রে?

পেশমন বললে—হ্যাঁ, তোর তো আরাম, নতুন নতুন নাগর পাবি। একটু তবু মুখ বদলাতে পারবি—

—আহা মুখ বদলিয়ে আর কাজ নেই লো। সে বয়েস গেছে।

—তাহলে মক্কায় গিয়ে হজ্ করে আয়। ফিরিঙ্গীরা তোকে হজ্ করিয়ে নিয়ে আসবে।

তক্কি বেগম রেগে গেল। বললে—তা তোদের তো বয়েস আছে, তাহলেই হলো।

পেশমন খোঁটা দিয়ে উঠলো—মর তুই, আমরা মরছি প্রাণের ভয়ে, তোর এখন নাগরের শখ! এত নাগর পেয়েও তোর রস ঝরে না লো?

কথাটা বোধ হয় আরো বাড়তো। কিন্তু বাধা পড়লো। পীরালি খাঁ ওদিক থেকে আসছিল। সামনে আসতেই যে-যার মহলের ফটক বন্ধ করে আড়ালে মুখ লুকিয়েছে।

পীরালি খাঁ যেতে যেতে বলতে লাগলো—হুঁশিয়ার হো—হুঁশিয়ার—

তারপর একেবারে সোজা নানীবেগমসাহেবার মহলের সামনে গিয়ে হাজির বরকত আলি।

নানীবেগমসাহেবা বলতে গেলে জেগেই ছিল। ডাক শুনে উঠে পড়লো—কৌন? পীরালি?

—আমি বরকত, নানীবেগমসাহেবা!

—ক্যা খবর?

ততক্ষণে পীরালি খাঁও দৌড়তে দৌড়তে এসে পড়েছে। নানীবেগমসাহেবা সজাগই থাকে সব সময়ে। কিন্তু সেদিন বুঝি একটু তন্দ্রা এসেছিল। তন্দ্রার মধ্যেই যেন স্বপ্ন দেখছিল। স্বপ্ন দেখছিল, নবাব আলীবর্দী খাঁ এসে দাঁড়িয়েছে সামনে।

—এ কি, তুমি আলি জাঁহা!

—হ্যাঁ, আমি এলাম। মীর্জার বিপদের দিনে আমি না এসে পারি?

—তা, ভালোই করেছো, তুমি এসেছো। জানো, সবাই মিলে মীর্জাকে আমার হয়রান করে দিচ্ছে। সে বেপাত্তা হয়েছে। যাবার সময় আমাকে একবার বলেও যায়নি। আমি আর একলা সামলাতে পারছি না চেহেল্-সুতুন।

—আর একলা সামলাতে হবে না, আমি তো এসেছি।

—কিন্তু আমার মীর্জার কী হবে?

—হবে আবার কী? কিছুই হবে না।

—জানো, মীর্জার ইয়ার-বক্সীরা আমার মালখানা লুঠ করতে এসেছিল, আমি তাদের গালাগালি দিয়ে ভাগিয়ে দিয়েছি—এখন কী হবে? তারা যদি ফিরিঙ্গীদের ফৌজ নিয়ে এসে চেহেল্-সুতুনে হামলা করে? তারা যদি আমাদের কোতল করে?

—কেঁদো না। কান্না তোমায় মানায় না। তুমি না নানীবেগম! তোমার মুখ চেয়ে না চেহেল্-সুতুনের বেগমরা বসে আছে? তোমায় কাঁদতে দেখলে তারা কী ভাববে তা একবার ভাবো তো? আর মীর্জার কথা বলছো? মীর্জা কি পালাবার মত নাতি তোমার? মীর্জা ফিরিঙ্গীদের ভয়ে পালাবে, তোমার নাতি কি সেই রকম?

—ওগো, তুমি জানো কোথায় গেছে সে? সত্যি জানো?

—জানি জানি। জানি বলেই তো তোমাকে বলতে এসেছি—

—বলো না সে কেমন আছে? কোথায় আছে? কখন আসবে?

—আসবে আসবে, দু'দিন সবুর করো। সে হাতীর পিঠে চড়ে মুর্শিদাবাদে আসবে।

—সত্যি বলছো আসবে?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, সে আসবে! দু'দিন পরেই আসবে।

—কিন্তু তাহলে সে পালালো কেন? অমন করে চোরের মত রাজধানী ছেড়ে পালালো কেন?

নবাব আলীবর্দী খাঁ হা-হা করে হাসলেন সেই আগের দিনের মত বললেন—নবাবী রাখতে গেলে যেমন লড়াই করতে হয়, তেমনি আবার লড়াই থেকে পালাতেও হয়। আমি পালাইনি? ভাস্কর পণ্ডিতের ভয়ে আমি পালিয়ে আসিনি? তোমার মনে নেই সে-সব দিনের কথা?

—কিন্তু লড়াই থেকে পালানো আর চেহেল্-সুতুন থেকে পালানো কি এক কথা?

—একই কথা। দরকার হলে তোমার মীর্জা আজিমাবাদ থেকে লড়াই করবে কিংবা জাহাঙ্গীরাবাদ থেকে—

—তুমি তাহলে বলছো ওই কথা? তুমি তাহলে অভয় দিচ্ছ?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, অভয় দিচ্ছি। তোমার কোনো ভয় নেই, সে মুর্শিদাবাদেই আসছে। একেবারে হাতীর পিঠে চড়ে আসছে...

বলতে বলতে কী যেন একটা শব্দ হলো আর সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ভেঙে গেল চোখের সামনে সব অন্ধকার হয়ে গেল।

—কৌন্?

—আমি পিরালি খাঁ, নানীবেগমসাহেবা!

নানীবেগমসাহেবা ধড়-মড় করে উঠে ফটক খুলে দিয়েছে।

—কী হয়েছে পীরালি খাঁ? কেউ মালখানা লুঠ করতে এসেছে?

—না নানীবেগমসাহেবা। নবাব মীর্জা মহম্মদ সিরাজ-উ-দৌলা মুর্শিদাবাদে আসছেন।

—মীর্জা আসছে? তোকে কে বললে?

আনন্দে উৎকণ্ঠায় নানীবেগমসাহেবার গলা যেন বুজে এল।

—বল্ শিগ্গির, কে তোকে বললে? বল্—

—শহরে খবর এসেছে। আজিমাবাদ থেকে ফরাসী মীর-বক্সী ল' সাহেবের সঙ্গে ফৌজ নিয়ে মুর্শিদাবাদের দিকে আসছে।

নানীবেগমসাহেবা কী করবে বুঝতে পারলো না। হাতের কাছে কাউকে যেন ডাকতে ইচ্ছে হলো, কারো কাছে যেন কথাটা বলে তৃপ্তি পেতে ইচ্ছে হলো

ওরে, তোরা কোথায় গেলি? ওরে পেশমন, ওরে গুলসন, বব্বু, তক্কি, আমিনা, ময়মানা—

তারপর হঠাৎ যেন মনে পড়ে গেছে। পীরালিকে বললে—ওরে, তাহলে, নহবতখানায় খবর দে পীরালি, ন'বত বাজাতে বল্—মীর্জা আসছে, বল্ যেন ভালো করে ন'বত বাজায়—ওরা ন'বত বাজাচ্ছে না কেন? ওরে যা, শিগ্‌গির কর্—

সেদিন মনসুরগঞ্জের হাবেলিতেও খবর পৌঁছে গেল। মীরন ক'দিন থেকেই রাত্রে ঘুমোচ্ছে না। মীরজাফর আলি হবে সুজা উল্ মুল্‌ক্ হিসাম-উ-দ্দৌলা বাহাদুর মহবত্-জঙ্গ। আর মীরন নিজে হবে সুজা উল্ মুল্‌ক্ শহবত্‌জঙ্গ।

হঠাৎ মনসুরগঞ্জের ভেতরেও গোলমাল শুরু হলো!

শেষ রাত্রের দিকে আবার কী হলো? কীসের গোলমাল? মীরন বাইরের দিকে চেয়ে দেখলে। ভোর হয়ে আসছে।

—বাপজান?

তাড়াতাড়ি মীরজাফরের ঘরের সামনে গিয়ে ডাকাডাকি শুরু করে দিলে মীরন। নিচেয় সদর ফটকে কারা এসেছে! আবার ফিরিঙ্গী সাহেব এল নাকি? বার বার একটা-না-একটা ফরমাশ! মরিয়ম বেগম তো আছে চেহেল্-সুতুনে। আবার কীসের খবরদারি।

—কী হলো? ডাকছিস কেন?

মীরজাফর সাহেবের কানেও আওয়াজটা গেছে।

—নিচেয় বোধ হয় আবার সেই ওয়ালস্ সাহেব এসেছে।

মীরজাফর সাহেব বিরক্ত হলো। একটু ভেবে নিয়ে বললে—আসলে এটা হলো ফিকির। কেবল এসে এখানকার হাল-চাল জেনে যাচ্ছে—

কিন্তু না। এসেছে মেহেদী নেসার। আর সঙ্গে আছে রেজা আলি।

—শুনলাম নবাব ফিরে আসছে মুর্শিদাবাদে?

—ক্যা?

—নবাব ফিরে আসছে শহরে। জোর গুজব। আজিমাবাদ থেকে জেনারেল ল'সাহেব ফৌজ নিয়ে নবাবের সঙ্গে আছে!

হঠাৎ সমস্ত মুর্শিদাবাদের মুখখানার ওপর কে যেন কালি লেপে দিলে। একদিন যে মুর্শিদাবাদ ফিরিঙ্গী-ফৌজের ভয়ে থরথর করে কাঁপছিল, এই নতুন খবরটা পেয়ে তার যেন বাক্‌রোধ হয়ে এল। অষ্টাদশ শতাব্দীর সেই অরাজক রাজধানী আগেও অনেকবার অরাজকতা দেখেছে, কিন্তু এমন করে কখনো আতঙ্কে শিউরে উঠে নিশ্চল হয়ে যায়নি। প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে যেন রোমাঞ্চের খোরাক জুগিয়ে গেছে ইতিহাস। যারা সেদিন শহর ছেড়ে দূরে চলে গিয়েছিল তারাও খবর শুনে জেগে উঠে বসলো। এদের এতদিনের সমস্ত ভবিষ্যৎ-বাণী মিথ্যে হয়ে গেল রাতারাতি; আবার তাহলে নবাব আসবে? আবার তাহলে যে-যার নিজের নিজের ভিটেয় গিয়ে গৃহদেবতা-শালগ্রাম-শিলার প্রতিষ্ঠা করতে পারবে?

ক্লাইভ সাহেবের সঙ্গে কথাবার্তা সেরে শেষ রাত্রের দিকে রওনা দিয়েছিল উমিচাঁদ সাহেব। রাত্রের অন্ধকারে রাজধানীতে পৌঁছুনোই ভালো। কিন্তু পথেই খবরটা পেয়ে পালকি থামাতে বললে।

—কী বললে রে লোকটা?

একটা পালকি-বেহারা বললে—হুজুর, বললে নবাব নাকি আবার আসছে—

—আবার আসছে মানে?

—আজিমাবাদ থেকে ফৌজ সেপাই নিয়ে মুর্শিদাবাদে লড়াই করতে আসছে!

কথাটা শুনে কিছুক্ষণ থম্‌কে চুপ করে রইলো উমিচাঁদ সাহেব। একবার দাড়িতে হাত বুলালো। পালকিটা আবার চলতে আরম্ভ করেছিল। দু' কোটি কুড়ি লাখ টাকা চেয়ে পাঠিয়েছিল সাহেব, তাও জগৎশেঠজী দিলে না? আরে, টাকাটা তো তোমার জলে যাচ্ছে না। তুমি টাকাটা দিয়ে দেবে এখন, তরপর যখন নবাবের মালখানার ভেতরে ঢুকে হিসেব-নিকেশ হবে তখন তো তোমার আসল টাকা পেয়ে যেতে। শুধু আসল টাকাটাই পেতে না, সঙ্গে সঙ্গে সুদও পেয়ে যেতে! সুদখোর মানুষ তো, তাই দিতে ভরসা হলো না।

—এই, রোখ্‌কে রোখ্‌কে—

পালকিটা চলতে চলতে হঠাৎ সাহেবের হুকুম পেয়ে থেমে গেল মাঝ-পথে।

—পালকি ঘোরা। যেদিক থেকে এসেছিলি, সেই দিকেই ফিরে চল—

—আজ্ঞে, আবার ময়দাপুরে যাবো?

—হ্যাঁ!

পালকিটার মুখটা আবার ঘুরলো। আবার উল্টোদিকে চলতে লাগলো পালকি। হুজুরের যেমন মর্জি, তেমনি করতে হবে। সেই কবে কলকাতা থেকে বেরিয়েছে। বেরিয়ে পথে কাজ সেরেছে, কোথাও দু'দিন থেমেছে, আবার চলতে আরম্ভ করেছে। সাহেবের মতি-গতি বোঝবার উপায় নেই কারো। কখন কোথায় যাবে, কোথায় থামবে তারও আগে থেকে কেনো হদিস দেবে না।

তা হোক, তারা তো জানে না যে, উমিচাঁদ সাহেব নিজেই জানে না কখন কোথায় থামতে হবে। সারা জীবন ধরে একদিকে স্থির লক্ষ্যে চলা হয়নি উমিচাঁদের। শুধু টাকাটার দিকেই নজর ছিল। সেই টাকার জন্যে কখনো বাঁয়ে হেলেছে, কখনো ডাইনে। কখনো এ-দলে, কখনো ও-দলে। যতদিন নবাব আলীবর্দী বেঁচে ছিল ততদিন তাঁকে ভুলিয়ে খুশী রেখেছে। নবাবকে খুশী রেখে কাজ হাসিল করেছে নিজের। কিন্তু তার পরে যে-নবাব এল তার হাত উপুড় হতে চায় না। কথায় কথায় বলে, টাকা নেই। আরে টাকা যখন তোমার নেই তখন আমিও নেই। যাদের টাকা আছে আমি তাদের দলেই থাকবো!

পালকিটা চলতে চলতে প্রায় কাশিমবাজারের কাছে চলে গিয়েছিল। সেখান থেকে আবার ময়দাপুর ফিরতে প্রায় ভোর হয়ে গেল। ল' সাহেব যদি আবার ফিরে আসে তো তারও কিছু বন্দোবস্ত করতে হবে।

নবাব মীর্জা মহম্মদ ফিরেই আসুক আর ক্লাইভ সাহেবই জিতুক, তাতে উমিচাঁদ সাহেবের কিছু এসে যায় না। তোমাদের দুজনের মধ্যে যে জিতবে আমি তার দলে। তোমার টাকা যদি থাকে তো থাকুক, আমি সেদিকে নজর দেবো না। কিন্তু আমার হাত-যশ যদি থাকে তো সে-টাকা আমার হাতে চলে আসবেই! আমি উমিচাঁদ। একদিন নিঃসম্বল হয়ে এই বাঙলা-মুলুকে এসেছিলাম পাঞ্জাব থেকে। সেদিন পথে পথে দুটো ভাতের জন্যে ঘুরে বেড়িয়েছি, কেউ ভিক্ষে দেয়নি। আজ আমার টাকা হয়েছে, কিন্তু প্রতিজ্ঞা করেছি, চুরি করবো, ডাকাতি করবো, ঠকবো, কিন্তু ভিক্ষে আর করবো না। জীবনে সার বুঝে নিয়েছি, ভিক্ষের চেয়ে চুরি ভালো!

হঠাৎ যেন কিছু শব্দ কানে এল! এত সকালে কীসের শব্দ? ময়দাপুর এসে গেল নাকি?

কাছে যেতেই ছাউনির সেপাইরা ঘিরে ধরেছে।

—হুজুর আপনি?

সেপাইরা এত ভোরেই উঠে পড়েছে। এত কীসের কাজ?

—হ্যাঁ, জরুরী খবর আছে. সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে হবে!

—কিন্তু পথে ওদিকে কোনো মেয়েছেলেকে দেখলেন?

—মেয়েছেলে?

সেপাইটা বললে—হ্যাঁ, কর্নেল সাহেব একজন মেয়েছেলে স্পাইকে ধরে রেখে দিয়েছিলেন, তাকে আবার শাড়িও কিনে দিয়েছিলেন, সে হঠাৎ পালিয়েছে—

—পালিয়েছে?

সর্বনাশ হয়েছে। এই খবর এসেছে নবাব আসছে আর এই সময়েই কিনা নবাবের চর পালিয়ে গেল।

—কী করে পালালো?

ওদিক থেকে নবকৃষ্ণ এসে হাজির হলো। —এই যে, আবার ফিরে এলেন হুজুর? এদিকে সর্বনাশ কাণ্ড বেধে গেছে। একজন মেয়েমানুষ চর পালিয়ে গেছে সাহেবের ঘর থেকে।

উমিচাঁদ বললে—চলো, কর্নেল সাহেবের কাছে চলো। চর পালাক, ওদিকে আরো জবর খবর দিতে হবে সাহেবকে—

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ভালো লোকই দিয়েছিলেন সঙ্গে। নৌকো ঘাটে লাগতেই তারা গাছতলায় রান্না-বান্না অরম্ভ করে দিয়েছিল। সঙ্গে কাঠও ছিল, হাঁড়ি-কুঁড়ি-বাসন তৈজস সবই এনেছিল সঙ্গে।

এতক্ষণ দেখতে পায়নি ওরা। বোরখা-পরা বউটা আর তার ঝি আবার কাছে এল।

বউটা বললে—আপনারা কি রান্না-বান্না করছেন?

দুর্গা বললে—তা তোমরাও রান্না-বান্না করো না—

বউটা বললে—আমাদের সঙ্গে যে বাসন-টাসন কিছু নেই—

—তা এত দূরের রাস্তায় যাচ্ছ, সঙ্গে বাসন-কোসন নেই, এ কী-রকম রীতি তোমাদের বাছা? সঙ্গে কে তোমার? ভাতার?

বউটা বুঝলে। বললে—হ্যাঁ—

—তা তোমার ভাতারেরই বা কী রকম আক্কেল বাছা যে সঙ্গে বাসন-কোসন আনে না।

বউটার স্বামী তখন একটা গাছতলায় চুপ করে হেলান দিয়ে বসে আছে।

—তাহলে খাবে কী?

বউটা বললে—সেই কথাই তো বলতে এসেছি। সঙ্গে আমাদের কিছু নেই।

—তা আমরা যে হিন্দু, তোমাদের ছোঁয়া তো আমরা খাইনে। আমাদের

ছোঁয়া কি তোমরা খাবে?

—তা খেতে পারি? আমার জন্যে আমি ভাবি না। আমার এই ছোট মেয়েটা আর ও'র জন্যে ভাবছি।

দুর্গা বললে—তা এখানে যদি তোমাদের কোনো স্বজাতি থাকে তাদের বাড়ি যাও না, সেখানে গেলে তোমাদের ভাত রান্না করে দিতে পারে—

অনেকক্ষণ ধরে দু'জন লোক এদিকে চেয়ে দেখছিল। তারা আড়ালে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে কী যেন বলছিল।

একজন বললে—আমার মালুম হচ্ছে লোকটা নবাবজাদা-টাদা কেউ হবে।

—কি করে বুঝলেন?

—দুধের জন্যে একটা মোহর দিয়ে দিলে, এ তো যে-সে কেউ নয়, আর পায়ের জরিদার চটি দেখছিস, নবাবজাদা ছাড়া ও-রকম চটি কে পরবে?

যে লোকটার চটির কথা হচ্ছিল তার তখন কোনো দিকে খেয়াল নেই। খোলা আকাশের দিকেই তখন সে উদাস দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। আল্লাতালাহ্ খোদাতালা, তোমার কাছে আমি আজ ক্ষমাও চাইবো না। ক্ষমা চাইবার হিম্মৎ আজ আর আমার নেইও। কিন্তু ওদের তুমি দেখো। ওরা কোনো পাপ করেনি, আমার পাপের ফল ওরা কেন ভোগ করবে! ওদের তুমি দেখো আল্লাহ্—

খানিকক্ষণের মধ্যেই বেশ ঘনিষ্ঠতা জন্মে গেল দুটো দলে। ভোর রাত্রে দুটো পরিবার দুটো নৌকোয় এসে একই ঘাটে জুটেছিল। তারপর আস্তে আস্তে সূর্যের আলো ফুটলো। কৌতূহল অদম্য হয়ে উঠলো দু'দলের মনে। এরা ভাবলে—ওরা কারা। ওরাও ভাবলে—এরা কারা। বিপদের সময় মানুষ আশেপাশের কারো সহানুভূতি চায়, কাউকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চায়।

—তা মুর্শিদাবাদের নবাব পালিয়ে গেছে, তা শুনেছো তো বাছা?

কথাটা শুনেই বউটা যেন চমকে উঠলো। সেই জুন মাসের ভোরবেলায় হঠাৎ বজ্রাঘাত হলে যেমন হয়, ঠিক তেমনি হয়ে উঠলো বউটার মুখের ভাব। তাড়াতাড়ি ছোট মেয়েটাকে কোলে টেনে নিলে। যেন অভিশাপ লাগবে কারো!

বউটি বললে—আমি উঠি ভাই—

দুর্গা বললে—ওমা, উঠবে কেন, বোস না—

দুর্গা ছাড়লে না কিছুতেই। জোর জবরদস্তি করে বসিয়ে দিলে। দূরে মানুষটা তখনো গাছে হেলান দিয়ে বসে আছে। তার যেন কোনো দিকেই খেয়াল নেই। আল্লার বিচিত্র খেয়াল কারো বুঝবার উপায় নেই। একদিন এই রাজমহল, এই মুর্শিদাবাদ, এই বাঙলা মুলুক, এখানকার সবাই নবাবকে দেখতে পেলে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে কুর্নিশ করতো। হিন্দু মুসলমান ফিরিঙ্গী সবাই নবাবের সামনে আসতে ভয় পেয়েছে। আজ তাদের সেই নবাব গাছতলায় চুপ করে বসে আছে, কেউ তার দিকে চেয়েও দেখছে না, কেউ কুর্নিশও করছে না। কেউ বুঝতেই পারছে না, তাদেরই নবাব আজ এখানে তাদের মর্জির ওপর নির্ভর করে রাস্তার ধুলোয় তার মসনদ পেতেছে।

ছোট বউরানী বললে—অমন নবাবের মুখে আগুন, অমন নবাব থাকলেই বা কী, আর গেলেই বা কী!

দুর্গা বললে—তা তোমরাও তো পলাশপুরের তালুকদার, তোমাদের কিছু হেনস্থা করেনি নবাব?

এ-সব কথার জবাব দিতে ইচ্ছে হচ্ছিল না লুৎফার। সেই ভোর বেলা থেকে পাশাপাশি একসঙ্গে কাটিয়ে একটু ঘনিষ্ঠতা হয়ে গিয়েছিল। একসঙ্গে খানিকক্ষণ থাকলেই তো পরস্পরের খবর দেওয়া-নেওয়া চলে। তোমরা মুসলমান, তা হোক। কিন্তু এক দেশেরই তো মানুষ। আমাদের হাতিয়াগড়েও অনেক মুসলমান প্রজা আছে।

দুর্গা বললে—আমাদের ছোটমশাইকে সবাই রাজার মত ছেদ্ধা-ভক্তি করে। ছোটমশাই হাতিয়াগড়ের রাজা—তা ওই যে এক হতচ্ছাড়া নবাব হয়েছে, তার জ্বালায় কি আর শান্তিতে থাকতে পারে কেউ? নবাবী গেছে বেশ হয়েছে—

কথা শুনতে শুনতে লুৎফার যেন কেমন ভয় করতে লাগলো। এরা যদি জেনে ফেলে? এরা যদি চিনতে পারে? চিনতে পারলে যে জানাজানি হয়ে যাবে?

—তা তোমার কর্তা অমন চুপচাপ বসে আছে কেন গো? কি হয়েছে?

লুৎফা বললে—মন ভালো নেই—

—তা মন তো আমাদেরও ভালো ছিল না এতদিন। এতদিন যে কী কষ্টে দিন গেছে! কোথায়-কোথায় দিন কাটিয়েছি, রাস্তায়-ঘাটে যেখানে পেরেছি থেকেছি। তেমন কষ্ট শত্তুরেও যেন না পায়।

—কেন? কী হয়েছিল আপনাদের?

—ওই যে বললুম, হতচ্ছাড়া নবাব। হতচ্ছাড়া নবাবের জন্যে কি দেশে বউ-ঝি নিয়ে কেউ শান্তিতে থাকতে পারতো। আমার এই ছোট বউরানীর ওপরে যে নবাবের বিষ-নজর পড়েছিল বাছা! মুখপোড়া নবাব এখন গেছে, এখন বেঁচেছি—

লুৎফা বললে—এই ছোট বউরানীর ওপর নজর পড়েছিল?

—তা শুধু কি বাছা এই ছোট বউরানীর ওপর? কত মেয়ের সব্বনাশ করেছে তার কি ঠিক আছে? তুমি কি মনে করেছো তাদের শাপ লাগেনি? নবাবের এখন হয়েছে কি? এখন তো সবে কলির সন্ধ্যে। মাথার ওপর ভগবান বলে তো একজন আছে, তার নজর তো এড়াবে না বাছা!

—সত্যি বলুন-না, কী হয়েছিল? কেন এত গালাগালি দিচ্ছেন?

ছোট বউরানী বললে—তুই থাম না দুগ্যা, যা হয়ে গেছে তা নিয়ে এখন আর কেন বলছিস?

—বলবো না? এখন কাকে ভয় করবো শুনি?

লুৎফা বললে—না না, বলুন-না কী হয়েছিল?

যে-লোকটা এতক্ষণ গাছতলায় হেলান দিয়ে বসেছিল, সে-লোকটা তখন উঠে দাঁড়িয়েছে।

দুর্গা দেখতে পেয়েছে। বললে—ওই যে তোমার কর্তা কোথায় যাচ্ছে গো, খুব ক্ষিধে পেয়েছে বোধহয় মানুষটার, আহা, সকাল থেকে তোমাদের কিছু খাওয়া হয়নি।

লুৎফা ফিরে তাকালো।

দুর্গা বললে—কী রকম আক্কেল বাছা তোমাদের, তোমরা যাচ্ছ পীরের দরগায়, আর সঙ্গে চাল-ডাল কিছু নাওনি—

প্রথমে রান্না হয়েছিল দুর্গাদের। কৃষ্ণনগর থেকে সবই সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল। রান্না-খাওয়া হবার পর তখন আলাদা করে রান্না চড়েছিল লুৎফাদের।

শিরিনা রান্না করছিল খিচুড়ি। জীবনে কখনো এমন করে এমন অবস্থায় পড়তে হয়নি লুৎফাকে। ক্ষিধে যে এমন জিনিস, তাও কখনো এমন করে বুঝতে হয়নি। খোলা আকাশের তলায় এমন করে বসে খাওয়ার কথা কল্পনাও করতে পারেনি। টা-টা করছে রোদ। তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে ডাকলে—ওগো—

মীর্জা মহম্মদ মুখ ফেরালো।

—কোথায় যাচ্ছো? খিচুড়ি বানিয়েছে যে শিরিনা—

—অ্যাঁ? এতক্ষণে বাস্তব জগৎটা যেন মীর্জা মহম্মদের চোখের সামনে ধরা পড়লো।

—কোথায় যাচ্ছিলে? তুমি যে বললে খুব ক্ষিধে পেয়েছে তোমার?

—আমার কিছু ভালো লাগছে না আর। খুকু কোথায়?

—ঘুমোচ্ছে! চল, খাবে চলো।

—ওরা কারা? কাদের সঙ্গে কথা বলছিলে এতক্ষণ?

—হাতিয়াগড়ের

হাতিয়াগড়! নামটা শুনেই মরিয়ম বেগমসাহেবার কথা মনে পড়লো। মরিয়ম বেগমসাহেবা এখানে এসেছে নাকি! মীর্জা মহম্মদ নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলা খানিকক্ষণের জন্যে অন্যমনস্ক হয়ে গেল। চেহেল্-সুতুনের কথা মনে পড়লো। আবার একবার দেখতে ইচ্ছে করলো মরিয়ম বেগমসাহেবাকে। চেহেল্-সুতুন ছেড়ে আসবার সময় একবার শেষবারের মত দেখা করবার ইচ্ছে হয়েছিল।

—ওরা এখানে কী করতে এসেছে?

—ওরা হাতিয়াগড়ে ফিরে যাচ্ছে।

তাহলে স্বামীর কাছেই শেষ পর্যন্ত ফিরে যাচ্ছে বেগমসাহেবা! ভালোই হয়েছে। একদিন যখন অশান্তির যন্ত্রণায় ছটফট করেছে, যখন অনিদ্রায় ক্লান্তিতে শরীর-মন অবশ হয়ে এসেছে, তখন ওই মরিয়ম বেমগসাহেবাই দিন-রাত পাশে বসে সান্ত্বনা দিয়েছে নবাবকে।

বললে—ওরা জানে আমি এখানে এসেছি?

—না, আমি কখনো তাই বলি? আমি বলেছি আমি পলাশপুরের তালুকদার সাহেবের বউ, আজিমাবাদের ফকিরের দরগায় দোয়া চাইতে যাচ্ছি—

মীর্জা মহম্মদ বললে—খিচুড়ি তৈরি হয়েছে?

—আর একটু সবুর করো, এখনি হবে। আমি দেখে আসছি—

—দাঁড়াও, আমিও যাবো।

—কোথায়?

—ওদের সঙ্গে দেখা করবো!

লুৎফা ভয় পেয়ে গেল। বললে—না না, তুমি যেও না, ওরা চিনে ফেলবে—

মীর্জা মহম্মদ বললে—না না, মরিয়ম বেগমসাহেবা চিনতে পারলে কিছু ক্ষতি নেই—

—ওগো না, ও মরিয়ম বেগম নয়, ও অন্য, ওরা নবাবকে গালাগালি দিচ্ছে, ওরা তোমার ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। নবাব পালিয়ে গেছে শুনে ওরা এতদিন পরে হাতিয়াগড়ে ফিরে যাচ্ছে। ওখানে তুমি যেও না—

বলতে বলতে লুৎফার চোখে জল এসে গেল। বললে—সবাই তোমার শত্রু তা জানো, কেউ তোমার ভালো দেখতে পারে না।

মীর্জা মহম্মদ থমকে দাঁড়ালো খানিকক্ষণ! সবাই তার শত্রু! সবাই তার খারাপ চায়। সবাই তার অমংগল কামনা করে! এই মুর্শিদাবাদ থেকে এত দূরে এসেও মানুষের শত্রুতার হাত থেকে মুক্তি পাওয়া গেল না!

—কেঁদো না তুমি!

মীর্জা মহম্মদ লুৎফার চোখের জল দেখে সান্ত্বনা দিতে এগিয়ে গেল!

—কিন্তু কেন তোমাকে কেউ দেখতে পারে না? হাতিয়াগড়ের ছোটরানীরও তুমি ক্ষতি করতে চেয়েছিলে? কেউ তোমার হয়ে একটা ভালো কথা বলে না কেন?

—ও আমার নসীব লুৎফা। ও নিয়ে তুমি আর এখন দুঃখ করো না। তুমি যদি এমন করে এখন কাঁদো তো আমাদের সকলের বিপদ ডেকে আনবে। আমার বিপদ ডেকে আনবে, তোমার নিজের বিপদ ডেকে আনবে, তোমার মেয়েরও বিপদ ডেকে আনবে—চুপ করো, চোখের জল মোছ—

লুৎফা বলতে লাগলো—দেখ, আমি এ নিয়ে তোমাকে কখনো কোনোদিন কিছু বলিনি, আজও বলতাম না, কিন্তু তোমার নিন্দে শুনলে আমার যে বড় কষ্ট হয়।

—সেও তোমার নসীব!

ততক্ষণে শিরিনার রান্না হয়ে গেছে। খিচুড়ির হাঁড়িটা নিয়ে সে গাছতলায় এনে রাখলে। ধুধু করছে বালি চারদিকে। একটা আব্রু নেই, একটা আড়াল নেই। একটা খিদ্‌মদ্‌গার নেই, একটা পেয়াদা-বরকন্দাজ কিছু নেই। মাথার ওপর কেউ পাখার বাতাস করতে এল না। পাশে কেউ খাবার জলের গাগরি নিয়ে হুকুমে হাজির রইলো না। মোরগ-মশল্লামের গন্ধে বাতাস ভুর-ভুর করে উঠলো না। শুধু চালে-ডালে মেশানো খিচুড়ি। তারই সামনে বসলো নবাব। আর পাশে লুৎফা।

—তুমিও সংগে খেতে বসলে না কেন?

—তুমি আগে খাও, তারপর আমি খাবো—

কিন্তু হঠাৎ দূর থেকে যেন একটা শব্দ কানে এল। অনেক দূর থেকে। মীর্জা মহম্মদ চেয়ে দেখলে। লুৎফাও চেয়ে দেখলে। অনেক দূরে যেন ধুলো উড়ছে। ঘোড়া ছুটিয়ে কারা যেন আসছে।

তখনো খিচুড়িতে হাত দেওয়া হয়নি।

—কারা আসছে এদিকে? ফৌজের লোক নাকি?

লুৎফা মুখখানা বোরখায় ঢেকে ফেললে। মীর্জা মহম্মদ খানিকক্ষণ চেয়ে রইলো সেই দিকে। তবে কি জেনারেল ল'সাহেব আসছে? টাকা পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল আজিমাবাদের খাজাঞ্চিখানা থেকে। এতদিনে বোধ হয় টাকা পোঁছেছে সাহেবের হাতে। তাই ফৌজ নিয়ে মুর্শিদাবাদের দিকে যাচ্ছে! তুমি তো খুব লোক হে, এত দেরি করে আসতে হয়? আমি তো তোমাদের ভরসাতেই ঢাকার জাহাঙ্গীরাবাদে না গিয়ে আজিমাবাদের দিকে যাচ্ছি। আমি জানি তোমরা এই পথ দিয়েই আসবে! তা এত দেরি করে এলে কেন? তোমরা তো জানো ইংরেজদের। তোমাদের চিরকালের শত্রু! তোমরাই আমাকে কথা দিয়েছিলে তোমরা ইংরেজদের সঙ্গে লড়বে! তা এখন এত দেরি করে আসতে হয়?

—কী হলো, উঠলে যে?

মীর্জা মহম্মদ বললে—জেনারেল ল' আসছে, এখন কি আমার খাবার সময়

আছে লুৎফা! এখন একেবারে মুর্শিদাবাদে গিয়ে খাবো। আর একদিন না খেলে কীই বা ক্ষতি!

ঘোড়ার ক্ষুরের আওয়াজে তখন দুর্গা, ছোট বউরানী তারাও ভয় পেয়ে গেছে! আবার কাদের ফৌজ আসছে এখানে! নৌকোর মাঝি-মাল্লা তারাও তখন খেতে বসেছিল। ফৌজের আসার শব্দ শুনে তারাও সেই দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইলো।

ময়দাপুরে একটা রাত কেটেছিল মরালীর। ছাউনির সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়েছে তখনো মরালী জেগে জেগে ভাবছিল। বাইরে নিঝুম রাত। হাতিয়াগড়ে এমনি নিঝুম রাতে সেই ছোটমশাইএর রাজবাড়িতেও মরালী এমনি করে জেগে কাটিয়েছিল। সেই সিঁড়ির তলার ঘরখানাতে বসে বসে অন্ধকারে কত রাত আকাশ-পাতাল করেছে। মাঝরাত্রে শুধু এক-একবার দুর্গা এসে দরজা খুলে খবর নিত লুকিয়ে লুকিয়ে।

তারপর কত দিন কেটে গেল, আরো কত বিচিত্র মানুষদের মধ্যে জীবন কাটাতে হলো। কত বিভিন্ন সমাজ, কত বিচিত্র পরিবেশ। কোথায় হাতিয়াগড়, সেখান থেকে রাণীবিবি সেজে চেহেল্-সুতুন, চেহেল্-সুতুন থেকে পেরিন সাহেবের বাগান, সেখান থেকে হালসিবাগান, তারপর সেখান থেকে মতিঝিল। তারপর মতিঝিল থেকে এই ময়দাপুরের ফিরিঙ্গীদের ছাউনি।

সন্ধ্যেবেলা ক্লাইভ সাহেব হঠাৎ ঘরে এসেছিল।

—কিছু খবর পেলেন?

ক্লাইভ সাহেব বলেছিল—হ্যাঁ, তোমার কথাই ঠিক, চেহেল্-সুতুনেও আর-একজন মরিয়ম বেগমসাহেবা আছে।

—তা আপনি কি ভেবেছিলেন আমি মিথ্যে কথা বলেছিলাম?

—কিন্তু দু'জন মরিয়ম বেগমসাহেবা কী করে হলো? সে-ই বা কে, আর তুমিই বা কে?

মরালী বলেছিল—আমিই আসল মরিয়ম বেগম—

—আর সে?

—সে আমার চেনা লোক।

—চেনা লোক মানে?

—সে আমার নিজের কেউ নয়। কিন্তু আমার নিজের লোকের চেয়েও আপন।

—স্পষ্ট করে বলো! তোমাদের দু'জনের নাম এক হলো কী করে?

—তার নাম মরিয়ম বেগম নয়, আমার নামও আসল মরিয়ম বেগম নয়!

—তুমি দেখছি এখনো আমার সঙ্গে চালাকি করতে শুরু করেছো। বলো, তুমি কে? তোমার আসল নাম কী?

—আমার আসল নাম বলতে গেলে অনেক কথা বলতে হবে সাহেব। অত কথা শোনবার সময় হবে না আপনার। আমি কেন যে নবাবের চেহেল্-সুতুনে

এসেছি, কেন আবার সেখান থেকে পালিয়েছি, কেন আমার বদলে আর একজন মরিয়ম বেগম সেজে চেহেল্‌-স্তুনে রয়ে গেল, সব বলতে গেলে রাত কাবার হয়ে যাবে। আপনারও সে-সব শুনতে হয়তো ভালো লাগবে না। তাই, আপনি শুধু আমার একটা উপকার করুন, মুর্শিদাবাদে গেলে মরিয়ম বেগমসাহেবাকে সেখান থেকে উদ্ধার করে আনবেন—

সাহেব বলেছিল—কিন্তু আমি যে মুর্শিদাবাদে যাবো তা তোমায় কে বললে?

—আপনি মুর্শিদাবাদে যদি না যাবেন তো এত কান্ড করতে গেলেন কেন?

—তুমি তাহলে টের পেয়েছো যে নবাব পালিয়েছে?

—শেষ পর্যন্ত নবাব যে পালাবেন তা আমি জানতুম। নবাবের ভালো কেউ চাইতো না, নবাবকে কেউ ভালবাসতো না। নবাবের নিজের মা-মাসি তারাও নবাবের সর্বনাশ চাইতো!

—আর তুমি?

—আমি তো বলেছি, আমার কথা আলাদা!

—কেন, তোমার কথা আলাদা কেন?

—চেহেল্‌-স্তুনে না এসে আমার কোনো উপায় ছিল না। চেহেল্‌-স্তুন ছাড়া আমার কোনো গতিও ছিল না।

—তাহলে কেন সেদিন তুমি আমার দফতর থেকে আমার চিঠি চুরি করেছিলে?

—চুরি করেছিলাম, কারণ আমি বাঁচতে চেয়েছিলাম। আমি দেখতে পেয়েছিলাম নবাবের অনেক শত্রু। ভেবে দেখেছিলাম নবাবের যদি ক্ষতি হয় তো চেহেল্‌-স্তুনেরও ক্ষতি হবে। আর চেহেল্‌-স্তুনের যদি ক্ষতি হয় তো আমি কোথায় থাকবো? কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমি তা পারিনি, আমি চেহেল্‌-স্তুনকে বাঁচাতে পারিনি!

—তাহলে এখন কোথায় যাবে বলে বেরিয়েছিলে?

—হাতিয়াগড়ে!

—হাতিয়াগড়? হাতিয়াগড়ে তোমার কে আছে?

মরালী বললে—আমার বাবা। জানি না এতদিন আমার বাবা বেঁচে আছে কি না। কিন্তু বাবা ছাড়া আমার আর কেউ নেই পৃথিবীতে, যার কাছে গিয়ে দাঁড়াতে পারি আমি—

ক্লাইভ যেন কী ভাবলে। তারপর বললে—তুমি হিন্দু?

—আগে হিন্দু ছিলাম, এখন মুসলমান হয়েছি।

—তোমার হিন্দু বাবা তোমাকে ঘরে নেবে?

—নিলে নেবে, না নিলে আবার রাস্তায় বেরিয়ে পড়বো?

ক্লাইভ বললে—সত্যি কথা বলছো তো? তোমাকে বিশ্বাস করতেও ভয় হয়।

—কিন্তু আজকেই তো আমার কথা যাচাই করে দেখলেন, এখনো বিশ্বাস হয়নি?

—তাহলে তোমার বাবার নাম বলো, আমি লোক পাঠিয়ে খবর নিয়ে আসছি।

মরালী বললে—আমার বাবার নাম শোভারাম বিশ্বাস।

—আর তোমার নাম?

—মরালী বালা দাসী!

নামটা বলবার সঙ্গে সঙ্গে ক্লাইভ সাহেব লাফিয়ে উঠেছে।

—মিথ্যে কথা! মরালী বালা দাসী কখ্খনো তোমার নাম নয়। মরালী বালা দাসীকে আমি চিনি। আমার পেরিন সাহেবের বাগানের ছাউনিতে তারা ছিল। আমার দিদি ছিল তার সঙ্গে। তারা খুব ভালো লোক। তাদেরও বাড়ি হাতিয়াগড়ে। তার বিয়ে হয়েছিল একজন পোয়েটের সঙ্গে। সে-পোয়েটটা খুব ভালো গান গায়। সে ওয়ার্লড্-সিটিজেন—। তুমি আমার সঙ্গে মিথ্যে কথা বলছো—তুমি লায়ার, মিথ্যেবাদী।

মরালী বললে—না সাহেব, আমি মিথ্যেবাদী নই, তারাই মিথ্যেবাদী!

—কী? তারা মিথ্যেবাদী? তারা নিজেরা আমাকে বলেছে আর তুমি বলছো তারা মিথ্যেবাদী?

—হ্যাঁ সাহেব, আমিও তাদের চিনি! তারা প্রাণের দায়ে মিথ্যে কথা বলেছে।

—তাহলে অ্যাডমিরাল ওয়াটসন্ যা বলে তাই-ই ঠিক? ইণ্ডিয়ানরা সবাই মিথ্যেবাদী?

মরালীর মুখ দিয়ে হাসি বেরোল এবার। বললে—সাহেব, তুমি জানো না কিছু, আমি সব কথা খুলে বললে তখন সব বুঝতে পারবে। আমরা কেউই মিথ্যে কথা বলিনি। কিন্তু মিথ্যে কথা না বললে আমাদের সর্বনাশ হতো, তাই প্রাণের দায়ে আমরা মিথ্যে কথা বলতে বাধ্য হয়েছি—

—কিন্তু সেই পোয়েট? তার সঙ্গে কার বিয়ে হয়েছিল? তোমার না তার?

—আমার।

—তোমার? তোমার বিয়ে হয়েছিল পোয়েটের সঙ্গে?

মরালী বললে—সাহেব, তুমি নতুন এ দেশে এসেছো, তাই তুমি কিছু জানো না। আর কিছুদিন থাকলে সব জানতে পারবে। এদেশে মেয়েমানুষ হয়ে জন্মানো এক পাপ। সুন্দরী হয়ে জন্মানো আরো বড় পাপ।

সাহেব বললে—আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

—তুমি কিছু বুঝতে পারবেও না। আমাদের দেশে মেয়ে হয়ে জন্মালে তুমি বুঝতে পারতে।

—নিশ্চয় বুঝতে পারবো। আমি এতগুলো কেল্লা জয় করলাম। ফ্রেঞ্চদের হারালাম, নবাবকে হারালাম, আর তোমার সামান্য কথা বুঝতে পারবো না?

এই পর্যন্ত কথা হয়েছিল, তারপরেই বুঝি বাইরে কে ডেকেছিল সাহেবকে। সাহেব বাইরে চলে গিয়েছিল। তার সঙ্গে কথা বলে ফিরে এসেছিল যখন তখন অন্য চেহারা। এতক্ষণ যে-লোকটা তার সঙ্গে সহজভাবে কথা বলেছিল, তখন যেন আর সে-মানুষ নয়। মরালীর মনে হয়েছিল বাইরে যেন ফৌজের লোকেরা সবাই দলে দলে জড়ো হয়েছে। তখুনি যেন তারা লড়াই করতে যাবে কোথাও।

সাহেব বলেছিল—তোমাকে আমি এখন ছাড়বো না, নবাব আবার মুর্শিদাবাদে আসছে আর্মি নিয়ে, এখনি খবর পেলাম—

—তাহলে আমি কী করবো?

সাহেব বলেছিল—এখানকার কাউকে জানতে দিতে চাই না যে, তুমি এখানে আছ। তোমাকে আমি এখান থেকে অনেক দূরে পাঠিয়ে দেবো—

—কোথায়?

—কলকাতায়। দম্‌দম্‌-হাউসে। তোমার কোন ভয় নেই। আমার লোকের সঙ্গে তুমি চলে যাও। আমি এখন মুর্শিদাবাদ অ্যাটাক করবো। তারপর কলকাতায় ফিরে গিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করবো। ততদিন তুমি সেখানে একলা থাকবে!

—এখানে কেউ যদি আমার কথা জিজ্ঞেস করে আপনি কী বলবেন?

—বলবো তুমি নবাবের চর, আমার হেফাজত থেকে প্যালিয়ে গিয়েছো! তুমি তৈরি হয়ে থাকো। আমরা শেষ রাত্রের দিকে রওনা দেবো। তার আগেই তোমাকে আমি লোক দিয়ে এখান থেকে পাঠিয়ে দেবো!

তারপর রাত যখন অনেক হয়েছিল ঠিক সেই সময়ে ক্লাইভ সাহেব মরালীকে ডেকে দিয়েছিল। সাহেবের সঙ্গে কেউ ছিল না। রাত তখন ক'প্রহর কেউ জানে না। ময়দাপুরের আকাশে কয়েকটা তারা শুধু সাক্ষী ছিল সেই যাত্রার। একটা নৌকো হাজির ছিল সাহেবের ছাউনির নিচেই। আর দু'জন মাঝি। ছাউনির অন্য সব লোক যখন অন্যদিকে লড়াইতে যাবার তোড়জোড় করছে তখন মরালী ঘোমটা ঢাকা দিয়ে গিয়ে উঠেছিল নৌকোর ভেতরে।

দমদমার যে বিরাট বাড়িটা ক্লাইভ সাহেব বানিয়েছিল, সেটা তখনো পুরো হয়নি। তার জায়গায় ছিল একটা ছোট বাড়ি। বেগম মেরী বিশ্বাসকে যারা জানতো তারা দেখেছে সেই বাড়িটা। একদিন শেষ রাত্রির দিকে সেখানেই মরালীকে নিয়ে এসে থেমেছিল একটা পালকি। কেউ টের পায়নি, কেউ জানতেও পারেনি কে সে, কোথা থেকে এসেছে, কেন এসেছে।

কিন্তু সে অনেক পরের কথা।

মরালীর শুধু একটা কথা মনে আছে, আসবার সময় ক্লাইভ সাহেব বলেছিল—চেহেল্‌-সুতুন থেকে তোমার মরিয়ম বেগমকে আমি উদ্ধার করবো। তুমি কিছু ভেবো না।

তারপরেই নৌকোটা ছেড়ে দিয়েছিল।

মুর্শিদাবাদের সেদিনকার কথাও উদ্ধব দাস সবিস্তারে লিখে গেছে। সমস্ত শহরময় সবাই সেদিন খবর পেয়ে লাফিয়ে উঠেছিল—নবাব এসে গেছে, নবাব এসে গেছে—

কিন্তু নবাবের সেই আসা যে এমন মর্মান্তিক আসা হবে, তাই-ই বা কে জানতো? জেনেছিল শুধু রাজমহলের ফৌজদার মীর দাউদ খাঁ।

ঘোড়সওয়ারের দল কাছে আসতেই নবাব চমকে উঠেছিল—ফৌজদার মীর দাউদ!

—হ্যাঁ, আমি।

কিন্তু মীর দাউদের চোখের দৃষ্টি দেখে প্রথমে তেমন বুঝতে পারেনি। পেছনে আর একজনকে দেখে আরো চমকে উঠেছিল—মীর কাশেম আলি, তুমিও!

—হ্যাঁ, আমি।

আশেপাশে সকলের দিকে চেয়ে তখন আর ভুল হবার কথা নয়। লুৎফা তখন বোরখার ভেতরে গয়নার বাক্সটা আঁকড়ে ধরে আছে। যে-লোকটা ফৌজদার সাহেবকে খবরটা দিয়েছিল সে তখন পেছনে আড়ালে দাঁড়িয়েছিল। সে জরিদার চটি দেখেছে, দুধ কেনবার জন্যে মোহর দেওয়া দেখেছে। এখন তার সন্দেহ ঠিক হওয়াতে তারই আনন্দটা বেশি। লোকটার একমুখ দাড়ির ভেতর থেকে দাঁতগুলো বেরিয়ে এল। হাসি আর ধরে না।

হঠাৎ সামনের দিকে নজর পড়তেই চেঁচিয়ে উঠলো—ভাগ ভাগ হিঁয়াসে—

একটা কুকুর এই সুযোগে খিচুড়িটা চেটে চেটে খেতে লেগেছে—

—ভাগ্ ভাগ্ ভাগ্—

মীরকাশেম সাহেবের নজর সব দিকে। লোকজন নিয়ে ততক্ষণ নবাবের দলের সবাইকে ঘেরাও করে ফেলেছে।

দুর্গা বললে—ওগো, আমরা কী দোষ করলুম—আমাদের ধরছো কেন?

ছোট বউরানীও তখন ভয়ে থর-থর করে কাঁপছে—

আর শুধু কি তাই, কেউই সেদিন জানতে পারলো না যে সেদিন সেই নির্জন রাজমহলের বালির চরের ওপর যে-নবাবকে মীরকাশিম সাহেব গ্রেফ্তার করলে, সে শুধু তুচ্ছ নবাবই নয়, তুচ্ছ হেবাৎ জঙ্ মীর্জা মহম্মদ সিরাজ-উ-দ্দৌলা আলমগীর বাহাদুরই নয়। সে-নবাব বাঙলা দেশ। সেদিনকার সেই বাঙলা দেশের অনেক উত্থান-পতনের প্রতিভূ সেই নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলা। বাঙলা মুলুকের ঘৃণার মানুষ সিরাজ-উ-দ্দৌলা, আবার বাঙলা মুলুকের গৌরবের মানুষও সেই সিরাজ-উ-দ্দৌলা। মানুষের ভালো-মন্দ বিচার করবার সময় নেই ইতিহাসের। আজ যা ভালো কাল তা খারাপ। আজকের ভালো-খারাপের সঙ্গে কালকের ভালো-খারাপের মেলে না। আজ তুমি দল বেঁধে রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করো, বিদ্রোহ করে সিংহাসন অধিকার করো, তখন তোমাকে আমরা ফুলের মালা গলায় দিয়ে তোমাকে দেবতা করে তোমার পুজো করবো। মানুষের লেখা ইতিহাসের পাতায় তোমাকে প্রাতঃস্মরণীয় বীর বলে অভিহিত করবো। কিন্তু যদি হেরে যাও? যদি তুমি ধরা পড়ো? তখন আবার তোমাকেই গ্রেফ্তার করে তোমার ফাঁসি দেবো। তোমার মুখে থুতু দেবো। তোমার মুখে চুন-কালি মাখিয়ে তোমার নাম কেটে দেবো ইতিহাস থেকে।

এ-সব জানতো রবার্ট ক্লাইভ। রবার্ট ক্লাইভ জানতো—আসলে চাই সাকসেস্। সাকসেস্ চাইলেই সব পাওয়া যায়। সাকসেসের সঙ্গে বন্ধু আসে, অর্থ আসে, প্রতিষ্ঠা আসে, খ্যাতি আসে। আমি হারবো না। আমি হারলে আমার সব গুণ ধুয়ে মুছে নিঃশেষ হয়ে যাবে।

রাত্রেই টের পেয়েছিল মরালী। সেই রাত্রের অন্ধকারে যখন ঘুম আসছে না তার তখন হঠাৎ একটা শব্দ এসেছিল। কে? কীসের শব্দ পাশের ঘরে? ক্লাইভ সাহেব যেন পাশের ঘরে কথা বলছে! কিন্তু এত রাত্রে কার সঙ্গেই বা কথা বলছে?

—আবার এসেছো? বি অফ্, বেরিয়ে যাও!

চমকে উঠে বিছানায় খানিকক্ষণ চুপ করে বসে ছিল মরালী। ময়দাপুরের সেই ফিরিঙ্গী-ফৌজের ছাউনির ভেতরে শুয়ে সেদিন প্রথম-প্রথম একটু ভয় পেয়েছিল। কিন্তু তখন তো মরালী জানতো না যে রাত্রের অন্ধকারে স্বপ্ন

দেখে সাহেব চেঁচিয়ে ওঠে? তখন তো জানতো না, স্বপ্নে কে একজন সাহেবের ঘরের মধ্যে ঢোকে আর সাবধান করে দেয়।

সেদিন শুধু মনে হয়েছিল, সাহেবের বোধহয় কোনো রোগ আছে।

মনে আছে, মরালী খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিল প্রথম। তারপর দরজা খুলে পাশের ঘরে গিয়ে দেখেছিল বিছানার ওপর ছট্‌ফট্‌ করছে সাহেব। আর মুখ দিয়ে কী যেন বিড়-বিড় করে বলছে। প্রথমে মনে হয়েছিল অসুখ হয়েছে কিছু। কাছে গিয়ে ডেকেছিল—সাহেব, সাহেব—

একটু ডাকতেই ঘুম ভেঙে গিয়েছিল সাহেবের। তারপর সামনে মরালীকে দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল।

—আপনার কী হয়েছিল? আপনি চিৎকার করে উঠলেন কেন?

সেদিন ক্লাইভ সাহেব লজ্জায় একটু জড়োসড়ো হয়ে পড়েছিল। তাড়াতাড়ি উঠে বসেছিল। সারা ম্যাড্রাস, সারা চন্দননগর, সারা বেঙ্গল কন্‌কার করার পর তার দুর্বলতা ধরা পড়ে যাওয়ার লজ্জা! বলেছিল—ও কিছু না—

বলে ক্লাইভ সাহেব বিছানার ওপর উঠে বসতে যাচ্ছিল।

মরালী বললে—না না, উঠতে হবে না, শুয়ে থাকো—আমি যাচ্ছি—

কিন্তু ঘর থেকে চলে যেতে গিয়েও চলে যেতে পারেনি। সাহেবের যদি সত্যি-সত্যিই অসুখ হয়ে থাকে তো তাকে একলা ছেড়ে চলে যাওয়াটা কি উচিত?

—তোমার ওই চাকরটাকে ডেকে দিয়ে যাবো?

ক্লাইভ বলেছিল—না, ও ঘুমোচ্ছে এখন, ঘুমোক—

—কিন্তু তোমার কি শরীর খারাপ?

ক্লাইভ বলেছিল—না—তুমি যাও, আমার কিছু হয়নি।

—হয়নি মানে? মুখ দেখে বুঝতে পারছি শরীরটা খারাপ তোমার! দেখি, জ্বর হয়েছে নাকি?

বলে ক্লাইভের কপালটা হাতের পাতা দিয়ে ছুঁলে।

ক্লাইভ বললে—না, জ্বর নেই, তুমি বরং ওই ওষুধটা দাও আমাকে, ঘুমের ওষুধ, ওর থেকে এক দাগ ঢেলে দাও—

ঘরের কোণের দিকে ওষুধের শিশি ছিল একটা। তার পাশেই একটা পাত্র। মরালী এমন ওষুধ আগে কখনো দেখেনি। বিলিতী ওষুধ। ওষুধটা নিতে গিয়ে ভাবছিল, আশ্চর্য, এই ফিরিঙ্গী মানুষটারও ঘুম হয় না? বাইরে থেকে মনে হয় কত বড় নিষ্ঠুর লোক। নাম শুনেই ভয় পায় কত লোক। এমনি করে মুর্শিদাবাদের নবাবেরও বদনাম আছে কত। অথচ সেই নবাবকেও তো মরালী কতবার ঘুম পাড়িয়েছে।

—বেশি ঢেলো না যেন, বিষ ওটা।

—বিষ?

বিষ কথাটা শুনেই চমকে উঠেছিল মরালী। বিষ খাওয়াবে নাকি সে সাহেবকে?

—এক দাগ খেলে বিষ নয়, কিন্তু একটু বেশি খেলে সে-ঘুম আর ভাঙবে না। আমাদের ডাক্তার সাবধান করে দিয়েছে।

মরালী ওষুধের শিশিটা নামিয়ে রেখে দিলে। বললে—তাহলে থাক্‌—

—কী হলো? ওষুধ দিলে না?

মরালী বললে—কিন্তু আমার হাতে তুমি খাবে এ-ওষুধ?

—কেন? খাবো না কেন?

—যদি আমি বেশি দিয়ে ফেলি?

ক্লাইভ হো-হো করে হেসে উঠলো। বললে—ভাবছো তোমার হাতে বিষ খেতে ভয় হচ্ছে কি না? না, সে ভয় নেই। তা হলে তোমাকে আমি ওষুধ দিতে বলতুম না—

—কিন্তু আমি তো তোমাকে বিষ খাওয়াতেও পারি! আমি নবাবের বেগম, নবাব তোমার শত্রু, আমাকে এত বিশ্বাস করা কি ভালো?

ক্লাইভ বললে—না, সে-ভয় আমার নেই—দাও, ওষুধটা ঢালো—

—না-হয় আর একবার ভালো করে ভেবে দেখ, তোমার চাকরটাকেই ডাকো!

—না না, তাকে ডাকলে আগেই ডাকতুম, তোমাকে বলতুম না। আর তা ছাড়া আমি এতগুলো দেশ জয় করলুম, এর পরেও মানুষ চিনতে পারবো না—?

তখনো মরালী চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল, কী করবে বুঝতে পারছিল না। একদিন মুর্শিদাবাদের নবাবও তাকে এমনি করে বিশ্বাস করেছিল। আবার এই সাহেবটাও তাকে তেমনি করে বিশ্বাস করছে! তাহলে কি দু'জনেই এক রকম! কোনো তফাত নেই এদের মধ্যে!

বললে—তোমার ঘুম হয় না কেন?

ক্লাইভ বললে—ঘুম হয় আমার, কিন্তু স্বপ্ন দেখি আমি—

—স্বপ্ন তো সবাই দেখে!

—সে-রকম স্বপ্ন নয়, আমার ঘরে কে যেন ঢোকে ঘুমের ঘোরে, ঢুকে আমাকে একটা তাস দেখায়, কুইন অব্ স্পেড্স্, ইস্কাবনের বিবি! তাসটা দেখিয়ে সাবধান করে দেয়—আজকেও সে এসেছিল—

—কে সে? কে এসেছিল?

—কী জানি। সে বলে তার নাম সাকসেস্—

মরালী সেই-ই প্রথম জেনেছিল সাহেবের রোগের কথা। এ এক অদ্ভুত রোগ। এত প্রভাব, এত প্রতিপত্তি, এত প্রতিষ্ঠা, এত ক্ষমতা নাকি ভালো নয়। দূর দেশ থেকে আট টাকা মাইনের চাকরি করতে এসে একেবারে ফিরিঙ্গী-কোম্পানীর মাথায় উঠে বসা, এটা আবার নাকি একটা রোগ।

ক্লাইভ সাহেব সেই রাত্রে গড়-গড় করে সব কথা বলে গিয়েছিল মরালীকে। লোকে জানে ক্লাইভ সেণ্ট ফোর্ট ডেভিডের কম্যাণ্ডার, লোকে জানে ক্লাইভ চন্দননগরের কন্‌কারার, কিন্তু আমি আসলে এখানে এসেছিলাম মরতে। আমি দু'বার মরতেই চেয়েছিলাম, কিন্তু দেখেছি মরাই সব চেয়ে শক্ত। আমার স্ত্রী আছে, ছেলে-মেয়ে আছে, বাবা আছে মা আছে, তবু পৃথিবী আমার কাছে পর। আমার আপন বলতে কেউ নেই—

কথাগুলো শুনতে শুনতে সেদিন অবাক হয়ে গিয়েছিল মরালী। ময়দাপুরের সেই ফিরিঙ্গী-ছাউনিতে ক্লাইভ সাহেবের আর-এক রূপ দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল। কত রকম মানুষই যে আছে পৃথিবীতে, কত রকম মানুষই যে দেখলে মরালী! সেই হাতিয়াগড় থেকে শুরু করে চেহেল্-সুতুন হয়ে এই ময়দাপুর পর্যন্ত সারি সারি যেন মানুষের মিছিল চলেছে। কেউ নবাব, কেউ আমীর, কেউ মীর-বক্সী, কেউ খিদ্‌মদ্‌গার, কেউ বেগম, কেউ বাঁদী! তাদের

বাইরেটাই শুধু আলাদা, ভেতরে সবাই যেন এক। সবাই একাকার হয়ে যেন অখন্ড রূপ নিয়ে মরালীর জীবনে আবির্ভূত হয়েছিল।

সে-রাত্রের মত সেই-ই শেষ। খানিক পরে মরালী নিজের ঘরে ঘুমোতে চলে এসেছিল। কিন্তু ঘুম কি অত সহজে আসে। আর আশ্চর্য, খানিক পরে সাহেবও তার ঘরে এসে তাকে ডেকেছিল। বলেছিল—তোমাকে কলকাতায় যেতে হবে—

তা সেই থেকেই বলতে গেলে মরালীর মেরী হওয়া শুরু। কেমন করে যেন ফিরিঙ্গী-মানুষটার আসল পরিচয় পেয়েছিল সে সেইদিনই রাত্রে।

সাহেব বলেছিল—আমি এখানকার সকলকে বলবো তুমি পালিয়ে গেছ—

মরালী বলেছিল—আমি পালিয়ে গিয়েছি বললে কি তোমার সুবিধে হবে?

—হ্যাঁ, সুবিধে হবে। তোমাকে আমি আমার ক্যাম্পে রেখেছি এটা এখানকার কেউ পছন্দ করছে না। অথচ তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে, তোমাকে দূরে পাঠাতেও ইচ্ছে করছে না—

মরালী জিজ্ঞেস করেছিল—কী কথা?

—সে-কথা কলকাতাতে গিয়েই বলবো।

—তবু শুনি কী কথা?

—জিজ্ঞেস করতে চাই, দু'জনের নাম এক হলো কী করে? তা ছাড়া পোয়েটের সঙ্গে বিয়ে হবার পর তুমি কেমন করে চেহেল্-সুতুনে গেলে। আবার তোমার নাম যদি মরালী বালা দাসী হয় তো সেই মরালী বালা দাসী কে? আমি ইন্ডিয়াতে এসে পর্যন্ত তোমাদের দেখে কেবল অবাক হয়ে যাচ্ছি। এ এক বিচিত্র দেশ তোমাদের—

তখন আর বেশি কথা বলার সময় ছিল না। একটু থেমে সাহেব বলেছিল—তারপর মুর্শিদাবাদ থেকে ফিরে তোমাকে তোমার বাবার কাছে আমি ফিরিয়ে দিয়ে আসবো—

অন্ধকার চারদিক। নদীর জল চিক্-চিক্ করছে। নৌকোর ভেতরে মরালী চুপ করে বসে ছিল। সব ব্যবস্থা করে দিয়েছে সাহেব। কোনো অসুবিধে হবার কথা নয়। আসবার সময় সাহেব ঘাটে নেমে বলেছিল—চেহেল্-সুতুনের কথা আমার মনে আছে, তুমি কিছু ভেবো না—

একজন মাঝি বললে—বেগমসাহেবা, আপনি শুয়ে পড়ুন, আমরা সময় মত আপনাকে ডেকে দেবো—

মরালী মনে মনে হাসলো। এই মাঝিরা পর্যন্ত তাকে মরিয়ম বেগম বলেই জানে! সাহেব হয়তো তাদের কাছে সেই পরিচয়ই দিয়েছে। তা দিক, এক-একটা করে নতুন নতুন পরিচয়েই তাকে চিনুক সবাই। কেউ জানুক সে মরিয়ম বেগম। বেঁচে থাকলে আরো কত নতুন নাম তার হবে, কে জানে!

মীর দাউদ রাজমহলের ফৌজদার। মীরজাফর আলির ভাইও বটে। তারই হুকুম তামিল করতো মীরকাশিম সাহেব। ফৌজদারের ফৌজের কর্তা। মীর দাউদের দাদার জামাই। নিকট সম্পর্ক।

কিন্তু শুধু ফৌজদার হয়ে সুখ নেই। মীরজাফর সাহেব নবাবের বিষ-নজরে পড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে মীরজাফরের যারা রিস্তাদার তাদের ওপরেও নবাবের বিষ-নজর।

রাজমহলের ফৌজদারের হাবেলিতে বসে আফশোষ করতো মীর দাউদ। আর শুনতো মীরকাশিম।

মীর দাউদ সাহেব বলতো—খোদাতালার দুনিয়ায় আস্‌লি চিজের কোনো কদর নেই ভাই—

মীরকাশিম বলতো—খাঁটি বাত্‌ বলেছেন জনাব—

শ্বশুর-জামাই-এর খেদ খোদাতালার কানে পেঁাছুতো কি না কে জানে। দুনিয়ার মানুষের সব খেদ যদি খোদাতালার কানেই পেঁাছোবে তো খোদাতালা মিছিমিছিই খোদাতালা হয়েছে। হাজার মানুষের হাজার আর্জি, হাজার ফরিয়াদ। সব খেদ শুনতে গেলে কি খোদাতালাগিরি চলে?

কিন্তু দেখা গেছে দৈবাৎ এক-একটা আর্জি খোদাতালার কানে পেঁাছেও যায়।

যখন চারদিকে লোক ছুটেছে নবাবকে খোঁজবার জন্যে তখন মীর দাউদ সাহেবের কাছেও খবরটা গেছে। কিন্তু তখন কে জানবে কোন সড়ক দিয়ে নবাব পালিয়েছে? সড়ক তো আর একটা নয়। মুর্শিদাবাদ থেকে সোজা হাঁটাপথে ভগবানগোলার দিকে যাওয়া যায়। সেখান থেকে পদ্মা নদী ধরে একেবারে জাহাঙ্গীরাবাদে। যদি পালিয়েই গিয়ে থাকে নবাব তো এদিকে আসবে কেন? এই রাজমহলের দিকে, যেখানকার ফৌজদার মীরজাফর সাহেবের ভাই, যেখানকার মীর-বক্‌সী মীরজাফর সাহেবের জামাই? অত দোয়া কি খোদাতালা করবে? তবু চেষ্টা করতে কসুর করলে চলবে না। চেষ্টা চললো খুব। কিন্তু নবাবের পাত্তা নেই।

শেষকালে একদিন দুপুর বেলা খবর এল। জোর খবর। মানুষটা ফকির। রাজমহলের ঘাটের কাছে একটা মসজিদ বানিয়ে থাকে।

বললে—আমার হুজুর সন্দেহ হচ্ছে লোকটা নবাব—

মীর দাউদ খাঁ জিজ্ঞেস করলে—কীসে সন্দেহ হচ্ছে?

—হুজুর লোকটার পায়ে সোনার জরিদার চটি—

—জরিদার চটি তো খান্‌দানি সওদাগররাও পরতে পারে।

—হুজুর দুধ কিনতে একটা মোহর দিলে মালিক—

—তাও রেইস্‌ আদ্‌মিরা দিতে পারে। সঙ্গে কে কে আছে?

ফকিরটা বললে—আজ্ঞে বিবি আছে, লেড়কী আছে, বহিন্‌ আছে, বাঁদী আছে দু'জন, মাঝি-মাল্লা আছে দুটো নৌকোয়। দু'টো নৌকোই ঘাটে বাঁধা আছে

লাগোয়া। সবাই খিচুড়ি বানিয়ে খাচ্ছে—আমি দেখে এসেছি—

মীরকাশিম সাহেবও শুনছিল। বললে—চলুন না জনাব, দেখে আসি—খোদাতালার মর্জি থাকলে মাল মিলতেও পারে—

তা এই-ই হলো সূত্রপাত। সামান্য সন্দেহ, সন্দেহ থেকে একেবারে গ্রেফ্‌তার। আর তারপর থেকেই হুলস্থূল কান্ড বেঁধে গেল মুর্শিদাবাদে। খবরটা যখন মনসুরগঞ্জ হাবেলিতে গিয়ে পৌঁছলো তখন সবাই চমকে গিয়েছে। এই খবর এল নবাব আসছে ল' সাহেবকে নিয়ে, আবার এই উল্টো খবর এল।

কেমন উল্টো-পাল্টা সব খবর। চেহেল্‌-সুতুনে যখন খবর এল ফৌজ নিয়ে নবাব মুর্শিদাবাদের দিকে আসছে, তখন ধরপাকড়ের পালা শুরু হয়ে গেছে। সারা মুর্শিদাবাদে তখন সোর-গোল চলেছে। নবাবের সেরা ভক্ত মোহনলাল। মোহনলাল লক্কাবাগ থেকে এসে নিজের বাড়িতেই ছিল। কোথাও বেরোচ্ছিল না, কারো সঙ্গে দেখা করছিল না। কথাটা তার কানেও গিয়েছিল যে নবাব আসছে।

সেখানেও মীরজাফরের লোক গিয়ে হাজির।

—মহারাজ কোথায়?

বাড়ির লোক বেরিয়ে এসে বললে— মহারাজ বাড়িতে নেই—

—আলবাত্‌ বাড়িতে আছে।

বলে সেপাইরা জোর করে বাড়িতে ঢুকে পড়লো। তন্ন তন্ন করে দেখলে সব ঘর, সব গলি-ঘুঁজি। কিন্তু কোথাও পাওয়া গেল না মোহনলালকে। তাহলে মোহনলালও কি নবাবের মত পালিয়েছে?

মীরজাফরের লোক তাকেও খুঁজতে বেরোল মুর্শিদাবাদের বাইরে। যাবে কোথায়? বাঙলা মুলুক ছেড়ে যেখানে যাবে সেখানেই বিশ্বাসঘাতকরা ওৎ পেতে আছে। দুনিয়ায় বিশ্বাসঘাতকের কখনো অভাব হয়েছে, ইতিহাসে এমন নজির কোথাও পাওয়া যায়নি।

ততক্ষণে মীরনের লোক চেহেল্‌-সুতুনেও ঢুকে পড়েছে। পীরালি খাঁর ওপর হুকুম হয়ে গেল। নজর মহম্মদ, বরকত আলির ওপরেও হুকুম হয়ে গেল। সব বেগমসাহেবাদের নজর-বন্দী করে রাখতে হবে।

—মরিয়ম বেগমসাহেবা! মরিয়ম বেগমসাহেবা!

কান্তর তন্দ্রা এসেছিল একটু। ক'দিন থেকে নিজের মহল থেকে বেরোয়নি একবার। মেহেদী নেসার সাহেব সেই যে তাকে মতিঝিল থেকে এনে এখানে পুরে রেখেছে সেই থেকে নিজের ঘরের মধ্যে বসে বসেই দিন কাটিয়েছে, রাত কাটিয়েছে। বাইরে যাবার ক্ষমতাও নেই, অন্ধকার ঘরের ভেতরে বসে একমনে শুধু প্রার্থনা করেছে, যেন মরালী আরো দূরে চলে যেতে পারে। বার বার ভগবানকে ডেকেছে। বিশ্বভুবনের সমস্ত দেবতাকে উদ্দেশ করে তার অন্তরের আকুতি জানিয়ে বলেছে—মরালীকে তুমি দেখো ভগবান, সে যেন নিরাপদে থাকে, সে যেন এই পাপের ছোঁয়াচ থেকে অনেক দূরে থাকে, সে যেন সুখী হয়, সে যেন শান্তি পায়...

—মরিয়ম বেগমসাহেবা, মরিয়ম বেগমসাহেবা!

ঝন্‌ ঝন্‌ করে দরজায় শেকল খোলার শব্দ হলো।

কান্ত বললে—কে?

—আমি নজর মহম্মদ, বেগমসাহেবা। আমার সঙ্গে চলুন। মীরন

সাহেবের হুকুম!

—কোথায়?

নজর মহম্মদ বললে—মীরন সাহেব হুকুম দিয়েছে, সব বেগমসাহেবাদের গ্রেফ্তার করে মতিঝিলে নজর-বন্দী রাখতে হবে। নানীবেগমসাহেবা, ঘসেটি বেগমসাহেবা, আমিনা বেগমসাহেবা, ময়মানা বেগমসাহেবা, সবাইকে নজর-বন্দী করে রাখবে।

—কেন?

নজর মহম্মদ বললে—মোহনলালজী মুর্শিদাবাদ ছেড়ে পালিয়েছে। ওদিকে নবাব ফৌজ নিয়ে মুর্শিদাবাদ হামলা করতে আসছে...

আর কোনো কথা নয়। বোরখা পরাই ছিল। সেই অবস্থাতেই মহল থেকে বেরিয়ে আসতে হলো কান্তকে। অন্ধকারের মধ্যে পালকি দাঁড়িয়ে ছিল। একটা পালকি নয়। সার সার অনেকগুলো পালকি। দুপাশে কোতোয়ালের লোক। কান্ত একটাতে উঠতেই দু'পাশের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। তারপর দুলতে দুলতে চলতে লাগলো বাইরের দিকে। নানীবেগমসাহেবার পালকি, ঘসেটি বেগমসাহেবার পালকি, তক্কি বেগম, বব্বু বেগম, পেশমন বেগম, গুলসন বেগম, আর মরিয়ম বেগমের পালকি। পালকিগুলো চেহেল্-সুতুনের ফটক পেরিয়ে সোজা রাস্তায় গিয়ে পড়লো। তারপর সোজা চলতে লাগলো মতিঝিলের দিকে।

উমিচাঁদ সাহেবকে দেখে ক্লাইভের মুখখানা লাল হয়ে উঠলো। কিন্তু সেটা সামলে নিয়ে বললে—কী, তুমি?

—আজ্ঞে, সাহেব, জবর খবর শুনেছো?

—শুনেছি। নবাব আর্মি নিয়ে মুর্শিদাবাদ অ্যাটাক করতে আসছে—

—আর শুনেছি নাকি মহারাজ মোহনলালও পালিয়ে গিয়েছিল, সেও নবাবের সঙ্গে আছে। ল' সাহেবের ফৌজ আছে সঙ্গে!

ক্লাইভ বললে—তা তুমি কি আমাকে সে-জন্যে ভয় পাওয়াতে চাও?

উমিচাঁদ বললে—সে কি কথা সাহেব! ভয় পাবে তুমি? তুমি কি ভয় পাবার ছেলে? তা নয়, তুমি জিতলে তো আমারই লাভ সাহেব। আমার তিরিশ লাখ টাকা পাওনার কথা আমি ভুলে যেতে পারি কখনো?

—আর কিছু কথা আছে? আমি এখনি আর্মি নিয়ে মুর্শিদাবাদে যাচ্ছি, আমার এখন সময় নেই—

উমিচাঁদ বললে—তা তো যাওয়াই উচিত। কিন্তু ওদিকে শুনলাম নাকি একটা মেয়েমানুষ চরকে তুমি ধরে রেখেছিলে, সে হঠাৎ পালিয়ে গেছে?

ক্লাইভ বললে—হ্যাঁ—

—সর্বনাশ! তাহলে তো মহা মুশকিল হলো? কিছু কাগজ-পত্র চুরি করে নিয়ে গেছে নাকি আবার? তোমার যেমন মেয়েমানুষের ওপর লোভ?

ওদিকে তখন সোলজাররা মাঠে বেরিয়ে পড়েছে। তারা তৈরি। বিউগল

বেজে উঠলো। নবকৃষ্ণ মুন্সী দাঁড়িয়ে ছিল পেছনে। সে বললে—আমার মাইনের কথাটা মনে করিয়ে দিন-না উমিচাঁদ সাহেব—

ক্লাইভ সাহেব চলে যাচ্ছিল ভেতরে। তার তখন দাঁড়াবার সময় নেই।

উমিচাঁদ বললে—তাহলে আমিও তোমার সঙ্গে যাবো নাকি সাহেব?

—তুমি আর কী করতে যাবে?

—বাঃ বাঃ, কী যে বলেন, যখন মালখানার টাকার হিসেব হবে তখন আমাকে থাকতে হবে না? টাকা-কড়ি ভাগাভাগির সময় আমি না-থাকলে চলবে কেন?

—তা চলো!

নবকৃষ্ণ এই সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিল। সে বললে—আমিও যাবো হুজুর?

উমিচাঁদ সাহেব খেঁকিয়ে উঠলো—তুমি আবার কী করতে যাবে শুনি? তোমার তো ভারি ছ'টা টাকা, আর আমার যে লাখ-লাখ টাকার ব্যাপার—

ক্লাইভ বললে—না, মুন্সীও যাবে আমার সঙ্গে—

কিন্তু আর কিছু কথা হবার আগেই একজন ঘোড়সওয়ার দৌড়তে দৌড়তে এসে হাজির। ঘোড়া থেকে নেমেই কর্নেলকে কুর্নিশ করলে। তারপর একটা চিঠি এগিয়ে দিলে ক্লাইভের দিকে। চিঠিটা ফার্সিতে লেখা। চিঠিখানা মুন্সীর দিকে বাড়িয়ে দিলে ক্লাইভ।

নবকৃষ্ণ চিঠিখানা নিয়ে পড়তে লাগলো। চিঠি লিখেছে মীরজাফর সাহেব।

পড়তে পড়তে নবকৃষ্ণর মুখখানা হাসিতে ভরে গেল।

বললে—হুজুর নবাব ধরা পড়েছে—

—কোথায়? হোয়্যার?

—রাজমহলে। নবাবের সঙ্গে আরো তিনচারজন জেনানা ছিল চেহেল্-সুতুনের, তাদেরও ধরেছে রাজমহলের ফৌজদার সাহেব। আর এদিকে ভগবানগোলার কাছে মহারাজ মোহনলালও পালাচ্ছিল, তাকেও বন্দী করে রাখা হয়েছে রায় দুর্লভজীর বাড়িতে।

—আর কী লিখেছে?

—আর লিখেছে চেহেল্-সুতুনের যত বেগম আছে সকলকে ধরে পুরে রেখেছে মতিঝিলে।

—সকলকে?

—হ্যাঁ হুজুর, সকলকে।

—মরিয়ম বেগমকেও ধরেছে?

নবকৃষ্ণ বললে—হ্যাঁ হুজুর, সব, সবাইকে ধরে মতিঝিলে পুরে রেখেছে, আপনাকে উপহার দেবার জন্যে!

রবার্ট ক্লাইভ নিজের মনেই একবার নিজের দায়িত্বের কথাটা ভেবে নিলে। শুধু নিজের দায়িত্ব নয়, সকলের দায়িত্ব। আর্মির দায়িত্ব, কোম্পানীর দায়িত্ব। একদিন নিজের মাইনে এক টাকা বাড়লেই নিজেকে ভাগ্যবান মনে করতো যে-লোক, প্রতিষ্ঠা আর প্রতিপত্তি বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে সকলের সব দায়িত্ব তার মাথাতেই এসে পড়লো। এখন শুধু আর নিজের দায়িত্বের কথা ভাবলেই চলে না। কোম্পানীর প্রফিট আর লস্-এর কথাও ভাবতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে ভাবতে হয় আর্মির এতগুলো লোকের সেফ্টির কথা। এমনকি ওই নবকৃষ্ণ মুন্সীর কথাও

ভাবতে হয়। আর উমিচাঁদ?

উমিচাঁদের দিকে চেয়ে ঘৃণায় কুঁচকে এল চোখ দুটো।

—অলরাইট, চলো মুর্শিদাবাদ!

আর বিশেষ করে যখন মীরজাফর আলি আছে। সব ব্যবস্থাই করে রেখেছে তারা, বলেছে—কোনো ভয় নেই, আপনি এখানে এলে সবাই আপনাকে শাঁখ বাজিয়ে ওয়েলকাম করবে। দেখবেন, নবাব ধরা পড়েছে শুনে সবাই কত খুশী হয়েছে। আর শুধু নবাব নয়, নবাবের গ্রেটেস্ট ফ্রেন্ড মহারাজ মোহনলালও ধরা পড়েছে।

মেজর কিল্‌প্যাট্রিকও সামনে এসেছিল। সেও সব শুনলো।

উমিচাঁদ খবরটা পেয়েই লাফিয়ে উঠেছে। আমি বলেছিলুম সাহেব, আমি বলেছিলুম তোমাদের হেলপ্ করবো। আমি কথা রেখেছি—

কিল্‌প্যাট্রিক বললে—যদি আমরা নবাবের মালখানা খুলে টাকা পাই তখন সকলের সব শেয়ার আমরা দিয়ে দেবো—

উমিচাঁদ বললে—দেখবে সাহেব, কোটি কোটি টাকা তোমরা পাবে—

—কোটি টাকা পাই আর লাখ টাকাই পাই, তোমার যা শেয়ার তোমাকে তাই দেবো।

—আমার শেয়ার তো তিরিশ লাখ টাকা।

ক্লাইভের মুখ-চোখ দিয়ে আগুন বেরিয়ে আসছিল তখন! স্কাউন্ড্রেলটা জানে না যে আমরা এখানে এসেছি পাউন্ড-শিলিং-পেন্স উপায় করতে, চ্যারিটি করতে আসিনি। আমরা দোকানদার, দরকার হলে ইনভেস্ট করবো, দরকার হলে লোকসান দেবো। যখন আবার দরকার পড়বে তখন প্রফিট করবো। দরকার হলে আমরা শত্রুর সঙ্গে ফ্রেন্ডশিপ করবো! এ কি ভেবেছে আমরা এই মশা আর জলা-জমির দেশে এসেছি মরে যেতে? এই বদমাসদের হাতে প্রফিটের শেয়ার দিতে?

—আচ্ছা, ঠিক আছে, তোমার সঙ্গে তো আমার কনট্র্যাক্ট হয়ে গেছে!

উমিচাঁদ বললে—না, তা তো আছে, তবু একবার তোমায় মনে করিয়ে দিচ্ছি সাহেব, শেষকালে যেন ভুলে যেও না—

যখন আর্মি মুর্শিদাবাদের দিকে যাচ্ছিল তখন উমিচাঁদের কথাগুলো মনে পড়ছিল ক্লাইভের। ময়দাপুরের ছাউনি তুলে দিয়ে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ফৌজ চলেছে। দূর থেকে গাঁয়ের লোক রাস্তার দু'পাশে দাঁড়িয়ে দেখছে। ভয়ে আনন্দে বিস্ময়ে তারা হতবাক্ হয়ে দেখছে ফিরিঙ্গীদের দিকে চেয়ে। তাদের যেন বিশ্বাস হচ্ছে না। এরাই কি সেই ফিরিঙ্গী? এরাই কি সেই সাহেব, যারা সাত-সাগর-তের-নদী পেরিয়ে এই বাঙলা দেশে ব্যবসা করতে এসেছে? কী সব অদ্ভুত চেহারা এদের। লাল লাল মুখ। কাশিমবাজার কুঠিবাড়ির কাছে যারা থাকে তারা দেখেছে আগেই। মোমের মতন নরম আর আলতার মত লাল চেহারা। মেমসাহেবদের দেখতে আরো ভালো। কটা কটা চোখ। চোখের মণি আর চোখের পাতা ভাসা-ভাসা। আগে সবাই ফিরিঙ্গীদের দিকে ভয়ে ভয়ে তাকাতো। যদি ধরে নিয়ে যায়? যদি ছুঁয়ে দেয়!

হাতির ওপর থেকে বসে বসে ক্লাইভ সব দেখছিল। পাশেই কিল্‌প্যাট্রিক চলছে। পেছনে পেছনে হাঁটতে হাঁটতে আসছে মুন্সী নবকৃষ্ণ। কিন্তু সামনে

চলেছে কয়েকটা কামান। লক্ষ্মাবাগের লড়াইতে কামান ক'টা ফেলে পালিয়েছিল নবাবের সেপাইরা।

কাশিমবাজার কুঠির কাছে আসতেই দেখা গেল ভাঙা বাড়িটা হাঁ হয়ে পড়ে আছে। ক্লাইভ সেইদিকে চেয়ে দেখলে। এই কাশিমবাজার কুঠি। এখান থেকেই নবাবের সঙ্গে যত কিছু ঝগড়া শুরু হয়েছিল।

হঠাৎ বড় গর্ব হলো মনের ভেতর। এই সমস্ত লোক যারা দাঁড়িয়ে আছে, তারা সবাই তাকে দেখছে। ক্লাইভ আজ তাদের সকলের কাছে তাদের ভাগ্যবিধাতা।

কিন্তু মুর্শিদাবাদের কাছে আসতেই মনে হলো যেন সামনে মানুষের সমুদ্র। উলু দিচ্ছে, শাঁখ বাজাচ্ছে সবাই।

মেজর কিল্‌প্যাট্রিকের দিকে চেয়ে দেখলে ক্লাইভ। কিল্‌প্যাট্রিকও চাইলে ক্লাইভের দিকে।

দেখা গেল দূর থেকে মীরজাফর আলি আসছে। পেছনে তার ছেলে মীরন। তার পেছনে আরো অনেক ঘোড়সওয়ার।

—মুন্সী!

মুন্সী নবকৃষ্ণ সাহেবের ডাক শুনেই কাছে এল—হুজুর!

—ওরা ও-রকম করছে কেন মুন্সী?

মুন্সী কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু সামনে মীরজাফর সাহেব এসে পড়ায় যেন একটু স্বস্তি পেলে সাহেব মনে মনে। এই এরাই এদের নবাবকে তাড়িয়েছে। অথচ শেষ পর্যন্ত ক্লাইভের সঙ্গে স্পষ্ট কথা বলেনি। কিন্তু মনে মনে ক্লাইভ নিজেকেই তারিফ করতে লাগলো। মানুষ চিনতে ভুল করেনি ক্লাইভ। ইয়ার লুৎফ খাঁ, দুর্লভরাম আর মীরজাফরের মধ্যে মীরজাফরকে চিনে নিতে ভুল করেনি। আমার চোখের সামনেই দাঁত বার করে হাসছে। এত বড় ট্রেটর, এত বড় নিমকহারাম। এত বড় স্কাউণ্ড্রেল কি ভেবেছে আমি তাকে বিশ্বাস করবো? যে লোক নিজের রিলেটিভদের সঙ্গে নিমকহারামি করেছে, সে যে আমার সঙ্গেও নিমকহারামি করবে তা কি আমি বুঝতে পারি না মনে করেছে ও?

—সেলাম আলেকুম কর্নেল!

—গুড মর্নিং জেনারেল!

মুন্সী দাঁড়িয়ে ছিল পাশে। এ-সুযোগ সে ছাড়লে না। বললে—আলেকুম সেলাম মীরজাফর সাহেব—

মীরজাফর চোখ ফিরিয়ে দেখলে নবকৃষ্ণের দিকে।

—আমাকে চিনতে পারছেন না মীর-বক্সী সাহেব, আমি কর্নেল সাহেবের মুন্সী। আপনার যত চিঠি সব তো আমিই তর্জমা করে বুঝিয়ে দিই সাহেবকে। কেমন আছেন?

ক্লাইভ জিজ্ঞেস করলে—কী খবর মীরজাফর?

মীরজাফর বললে—সব ঠিক আছে কর্নেল।

—নবাব কোথায়? তোমার প্রিজনার?

—তাকে আনা হচ্ছে মুর্শিদাবাদে। সঙ্গে তার বেগম আছে, বাঁদীরা আছে, সবাই আসছে। রাজমহলের ফৌজদার মীর দাউদ আর আমার জামাই তাদের ধরে আনছে, আমিও এখান থেকে ফৌজ পাঠিয়েছি।

—আর, দ্যাট জেনারেল মোহনলাল?

—তাকেও গ্রেফ্‌তার করেছি। রায় দুর্লভের হাবেলিতে তাকে আটক করে রাখা হয়েছে। বেগমদেরও সবাইকে গ্রেফ্‌তার করে রেখেছি মতিঝিলে। আর কোনো ভয় নেই।

মেজর কিল্‌প্যাট্রিক বললে—আর মুর্শিদাবাদ সিটি? সিটিতে কোথাও গোলমাল নেই তো?

—না মেজর। কোনো গোলমাল নেই। সবাই খুব খুশী। দেখছেন না চারদিকে কত লোকের ভিড়!

—ওরা ও-রকম শব্দ করছে কেন? হোয়াট ডু দে মীন?

—আজ্ঞে, কাফেররা ওই রকম করে। ওদের যখন খুব আনন্দ হয় তখন ওই রকম শব্দ করে। উলু দেয়, শাঁখ বাজায়। আপনি এসেছেন তাই ওদের খুব আনন্দ হয়েছে—

ক্লাইভ মুন্সীর দিকে চাইলে। মুন্সী মাথা নাড়তে লাগলো। বললে—হ্যাঁ হুজুর, মীর-বক্সী সাহেব ঠিক বলেছে। আমিও তো কাফের, আমরাও ওই রকম করি—

আর তারপর? তারপর যখন প্রথম মুর্শিদাবাদে ঢুকলো সে এক দৃশ্য! ফিরিঙ্গীরা এসেছে, ফিরিঙ্গীরা এসেছে! চকবাজার থেকে মহিমাপুর পর্যন্ত রাস্তার দুপাশে লোকে লোকারণ্য! ক্লাইভ চারদিকে চেয়ে দেখতে লাগলো। লন্ডনের মতই যেন মুর্শিদাবাদ শহরটা চারদিকে ছড়িয়ে আছে। লন্ডনের মতই বড় বড় বাড়ি। বড় বড় রাস্তা। লন্ডনের মতই শহরের কাছ দিয়ে নদী চলে গেছে একটা।

যেন নিজের কাছেও নিজের কীর্তিটা বিশ্বাস হচ্ছিল না ক্লাইভের। সত্যিই কি ক্লাইভ নিজের ফৌজ নিয়ে আজ মুর্শিদাবাদে হাজির হয়েছে? চারদিকের এই এত লোক কি সবাই তাকে দেখতেই এসেছে। তার জন্যেই এত শাঁখ বাজানো? এত উলু দেওয়া!

কিন্তু সবাই যদি একটা করেও ঢিল ছোঁড়ে তাদের দিকে! সঙ্গে তো মাত্র তিনশো দিশি সেপাই, আর দুশো ইংরেজ। মোটমাট পাঁচ শো জন সোলজার তার দলে।

চেহেল্‌-সুতুনের সামনে আসতেই তার কানে ভেসে এল একটা বাজনা।

—ওটা কী মুন্সী?

—আজ্ঞে হুজুর, আপনি এসেছেন বলে নহবত বাজছে নহবত-মঞ্জিলে! আপনাকে ওয়েলকাম করছে।

ইনসাফ মিঞা তখন নহবত-মঞ্জিলে জয়-জয়ন্তী ধরেছে নিজের মনে। হুকুম পাঠিয়েছিল মীরজাফর সাহেব। বলে দিয়েছিল—ফিরিঙ্গী-সাহেব আসবার সঙ্গে সঙ্গে যেন নহবত বাজে—

ছোটে সাগ্‌রেদের ইচ্ছে ছিল না। বলেছিল—না ওস্তাদজী, মাত বাজাইয়ে, ও কৌন্‌ হ্যায়? মীরজাফর সাহেব হামারা কৌন্‌ হ্যায়? নবাব না নৌকর?

ইনসাফ মিঞার কথাটা ভালো লাগেনি। অনেক দিন ধরে দুনিয়াদারি দেখে আসছে ইনসাফ মিঞা। নবাবের নানা বুড়ো-নবাবকেও দেখেছে ইনসাফ মিঞা। তারও আগে সরফরাজ খাঁ, আর তারও আগে নবাব সুজাউদ্দীন খাঁকেও দেখেছে। ইনসাফ মিঞা বুঝে নিয়েছে এরই নাম দুনিয়াদারি। এমনি করেই

দুনিয়া চলে। এমনি করেই দুনিয়া চলবে। একজন ওঠে, আর একজন পড়ে। এ নিয়ে গোসা করতে নেই, এ নিয়ে মান-অভিমান করতে নেই। আজ যে নবাব কাল সে খিদ্‌মদ্‌গার।

ইনসাফ মিঞা বললে—দূর, যে মসনদে বসবে সেই নবাব। আমরা তো নৌকর, হুকুমের তামিলদার। নে, তবলা ধর—

তারপর জয়-জয়ন্তী রাগ ধরেছে ইনসাফ মিঞা অন্যবারের মত। নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলা যেবার আজিমাবাদ থেকে শওকতজঙকে খুন করে শহরে ফিরে এসেছিল, সেবারও সে জয়-জয়ন্তী বাজিয়েছিল। যখন আলীবর্দী খাঁ সাহেব সরফরাজ খাঁকে খুন করে প্রথম মুর্শিদাবাদের মসনদে বসতে এসেছিল তখনো ইনসাফ মিঞা এই রকম করে জয়-জয়ন্তী রাগ বাজিয়েছিল। ছোটে-সাগ্‌রেদ ছেলেমানুষ, এখনো দুনিয়াদারি শেখেনি, দুনিয়াদারি জানে না।—নে, তবলা ধর—

ফিরিঙ্গী-ফৌজ তখন আরো এগিয়ে গেছে। চক-বাজারের সারাফত আলির খুশ্‌বু-তেলের দোকানের সামনে আসতেই হঠাৎ ক্লাইভের নজরে পড়লো।

—মুন্সী!

—হুজুর—

—ওই যে পোয়েট যাচ্ছে—পোয়েট! পোয়েটকে একবার ডাকো তো!

—পোয়েট?

মুন্সী নবকৃষ্ণ বুঝতে পারলে না। বললে—কার কথা বলছেন হুজুর? পোয়েট? কবি? কবিয়াল?

—হ্যাঁ, ওই যে একমাথা ঝাঁকড়া চুল, ওই তো পোয়েট।

উদ্ধব দাস ওই ভিড়ের মধ্যেই আপন মনে গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে যাচ্ছিল। সাহেব ঠিক দেখতে পেয়েছে। কিন্তু তার কোনো দিকে খেয়াল নেই। একবার হাতিয়াগড়, একবার কেষ্টনগর, একবার মুর্শিদাবাদ। এমনি করেই তার দিন কাটে। এবার মোল্লাহাটি থেকে বেরোবার পথে হঠাৎ কী খেয়াল হলো চলে এল মুর্শিদাবাদের দিকে। কিন্তু এখানে যে এমন কাণ্ড চলেছে তা কী করে জানবে!

হঠাৎ পেছনে কার হাতের ছোঁয়া লাগতেই পেছন ফিরেছে। কে?

—তুমি কবি নাকি গো?

উদ্ধব দাস অবাক হয়ে গেল। বললে—তুমি কে প্রভু? তোমায় তো চিনতে পারছিনে?

—সাহেব তোমায় ডাকছে।

—কোন্‌ সাহেব?

মুন্সী নবকৃষ্ণ তাজ্জব হয়ে গেল। সাহেবকে চেনে না লোকটা! এত লোক যাকে দেখবার জন্যে রাস্তায় ভিড় করেছে, সেই ক্লাইভ সাহেবকেই চেনে না?

হঠাৎ ক্লাইভ সাহেবের দিকে নজর পড়তেই উদ্ধব দাস অবাক হয়ে গেল। আরে, ক্লাইভ সাহেব এখানে কী করতে? সেই বাগবাজারের পেরিন সাহেবের বাগান ছেড়ে এখানে এসেছে তোমার সাহেব? তুমি সাহেবের কে প্রভু? মাথায় মস্ত বড় টিকি রেখেছো কেন?

—আরে, আমি তো ক্লাইভ সাহেবের মুন্সী—

—আমিও তো হরির মুন্সী, আমি তো টিকি রাখিনি।

মুন্সী নবকৃষ্ণ উদ্ধব দাসের কথায় আরো অবাক হয়ে গেল। কিন্তু সে-কথার উত্তর না দিয়ে বললে—চলো, সাহেব তোমার সঙ্গে কথা বলতে চায়, চলো—

উদ্ধব দাস ভিড় ঠেলে এগিয়ে চলতে লাগলো। নহবত-মঞ্জিলে তখন জয়-জয়ন্তীর রাগ উদারা ছাড়িয়ে মুদারা অতিক্রম করে তারায় গিয়ে ঠেকেছে—

যে-মেয়ে একদিন অষ্টাদশ শতাব্দীর কাব্যের নায়িকা হবে, যাকে নিয়ে উদ্ধব দাস তার মহাকাব্য লিখবে, সে তখন নৌকোর ভেতর অঘোরে ঘুমোচ্ছে। ময়দাপুরের ফিরিঙ্গী-ছাউনি থেকে নৌকোয় উঠে খানিকক্ষণ বাইরের অন্ধকারের দিকে হাঁ করে চেয়ে দেখেছিল। তারপর মাঝিরা যখন তাকে নিশ্চিন্তে ঘুমোতে বলেছিল তখন ঘুমিয়েছে।

বুড়ো মাঝি নয়, জোয়ান মাঝি। বলেছিল—বেগমসাহেবা, আপনি শুয়ে পড়ুন, আমরা সময়মত আপনাকে ডেকে দেবো—

কোথায় কলকাতা। অথচ এককালে যখন হাতিয়াগড়ে থাকতো তখন কলকাতার নাম শুনেছিল। তখন কলকাতা দেখবার আগ্রহ হয়েছিল। তার পরে এমন করে শুধু কলকাতা নয়, সমস্ত বাঙলা মুলুক দেখা হবে তা কল্পনাও করতে পারেনি তখন।

ঘুমোতে যাবার আগে মরালী মনে মনে হেসেছিল। এই মাঝিরা পর্যন্ত তাকে মরিয়ম বেগম বলে জানে। ক্লাইভ সাহেব হয়তো তাদের কাছে তার সেই পরিচয়ই দিয়েছে। তা দিক, এক-একটা করে নতুন-নতুন পরিচয়েই চিনুক তাকে সবাই। কেউ জানুক সে রাণীবিবি, কেউ জানুক সে নবাবের চর, কেউ জানুক সে মরালী, আবার কেউ জানুক সে মরিয়ম বেগম। বেঁচে থাকলে আরো কত নতুন নাম তার হবে, কে জানে।

হঠাৎ হাঁকাহাঁকিতে ঘুম ভেঙেছে মরালীর।

—কে?

—আমি, বেগমসাহেবা, আমি!

—আমি কে?

—আমি গোলাম মোল্লা। সাহেবের নায়ের মাঝি।

নৌকোটা যেন ভীষণ দুলে উঠলো বার দুই। তারপর অনেক লোকের হল্লা শোনা গেল।

মরালী দরজার পাল্লাটা খুলতেই গঙ্গার হাওয়ার ঝাপটা এসে লাগলো তার গায়ে। একেবারে হু-হু হাওয়া, ঝড়ের মত সব ওলট-পালট করে দিলে।

—সব্বোনাশ হয়েছে বেগমসাহেবা, মীর দাউদ সাহেব হামলা করেছে আমাদের নৌকোর ওপর।

—মীর দাউদ সাহেব কে?

—আজ্ঞে রাজমহলের ফৌজদার। নবাব, বেগম, বাঁদী সবাইকে পাকড়েছে রাজমহলে। সঙ্গে মীরকাশেম সাহেব ভি আছে—মুর্শিদাবাদ যাচ্ছে ওরা—

—তা আমাদের কাছে কী চায়?

গোলাম মোল্লা বললে—আমাকে জিজ্ঞেস করলে নায়ে কে আছে, আমি বলেছি মরিয়ম বেগমসাহেবা, তখন আপনাকে ডেকে দিতে বললে—

—তা তুমি বললে না কেন যে, আমরা ক্লাইভ সাহেবের লোক।

—বলেছি আজ্ঞে, কিন্তু শুনলে না কিছুতেই, ওই দেখুন না ফৌজের সেপাইরা দু'খানা নৌকো ভর্তি হয়ে ঘাটে লাগিয়েছে—

অল্প-অল্প ঝাপ্‌সা অন্ধকারে মরালী চেয়ে দেখলে সেইদিকে। দুটো নৌকো পাশাপাশি লাগানো। আর তার চারপাশে ফৌজের লোক দাঁড়িয়ে আছে।

মরালী জিজ্ঞেস করলে—সামনে ও কে?

—ওই তো রাজমহলের ফৌজদার সাহেব।

—আর পাশে বুঝি মীরকাশিম সাহেব?

গোলাম মোল্লা বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ—

মরালী বললে—ঠিক আছে, তুমি বলে দাও, আমি তৈরি হয়ে নিচ্ছি—

মানুষের জীবনে এক-একটা সময় আসে যখন তাকে সন্ধিক্ষণ বলা চলে। সেই সন্ধিক্ষণে তার জীবন-মৃত্যু-উন্নতি-অবনতি-অভ্যুদয়-পরাভব সব কিছু ওলট-পালট হয়ে গিয়ে জীবনের অন্য একটা ভিন্ন অর্থ দাঁড়ায়। যে-অর্থ কোনো দিন কল্পনাও করেনি সে, তখন সেই অর্থই তার শেষ অর্থ হয়ে পড়ে। মরালীরও সেদিন সেই গভীর রাত্রে বোধ হয় তাই-ই হলো। মরালীর জীবনের সেইটেই হলো মহা সন্ধিক্ষণ। ভালো করে তাকে ভাবতে সময়ও দিলে না কেউ। একটা মুহূর্ত মাত্র। সেই মুহূর্তের মধ্যেই ভেবে নিতে হবে তুমি কী করবে। তুমি গঙ্গার স্রোতে ঝাঁপ দিয়ে অতলে তলিয়ে যেতে পারো। আর না-হয় মীর দাউদের আর মীরকাশিমের হাতে ধরা দিতে পারো। দুটো পথ খোলা আছে তোমার সামনে।

কিন্তু সেদিন মরালীর মরতে ইচ্ছে হলো না। মরতে ইচ্ছে করলে সে-পথও তার খোলা ছিল। কিন্তু মরবেই যদি তবে সে আগে মরেনি কেন? যেদিন হাতিয়াগড়ের বাড়িতে তার সঙ্গে উদ্ধব দাসের বিয়ে হলো সেই দিনই তো মরতে পারতো। তার পরে চেহেল্‌-সুতুনে এসে সারাফত আলির তৈরি আরক খেয়েও তো সে মরতে পারতো। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে মরালী ঠিক করে নিলে সে বাঁচবে।

আর সেদিন সে বাঁচার পথ বেছে নিয়েছিল বলেই তো উদ্ধব দাস এমন করে 'বেগম মেরী বিশ্বাস' কাব্য লিখতে পারলে।

উদ্ধব দাস জিজ্ঞেস করলে—তারপর?

তারপর আমি এক মুহূর্তেই ঠিক করে নিলুম যে আমাকে বাঁচতে হবে। আমাকে জীবন দেখতে হবে। যে-জীবন চেহেল্‌-সুতুনে ঢুকেও শেষ হলো না, সেই জীবনেরও শেষটা দেখতে হবে।

একদিন বাঙলা-মুলুকের একটা কোণে এক মেয়ের জন্ম হয়েছিল ঘর-সংসার-রান্নাঘর দেখতে আর সন্তানের জন্ম দিতে। কিন্তু সে-মেয়ে নিজের চেষ্টাতেই একটা সাম্রাজ্যের পতন নিজের চোখে দেখে নিলে। দেখে নিলে আর একটা সাম্রাজ্যের উত্থান। উত্থান-পতনের সাক্ষী হয়ে, দর্শক হয়ে, একেবারে সেই উত্থান-পতনের কেন্দ্রস্থলে গিয়ে হাজির হলো।

মীর দাউদ খাঁ জানতো সফিউল্লা সাহেবের খুন হওয়ার কথা। জানতো মরিয়ম

বেগমসাহেবার ওপর নবাবের দুর্বলতার কথা। মেহেদী নেসার সাহেবের কাছ থেকে অনেকবার সে-কথা শুনেছে খাঁ সাহেব। তাই যখন মাঝিদের কাছে নৌকোর ভেতর মরিয়ম বেগম রয়েছে শুনলে, তখন হাজার উপরোধ-অনুরোধেও কান দিলে না।

মীরকাশিম বললে—ওকে ভি নিয়ে চলুন জনাব—

সত্যিই বড় জ্বালিয়েছে মেয়েটা। মেয়েটা জেনেছে যে নবাব পালিয়েছে, তাই সঙ্গে সঙ্গে নিজেও চেহেল্-সুতুন থেকে পালাবার চেষ্টা করেছে।

গোলাম মোল্লা বলেছিল—না হুজুর, আমরা ক্লাইভ সাহেবের লোক, ক্লাইভ সাহেব বেগমসাহেবাকে নিয়ে কলকাতার দমদমের বাগান-বাড়িতে পৌঁছিয়ে দিতে হুকুম দিয়েছে আমাদের।

মীরকাশিম সাহেব ধমক দিয়ে উঠলো—ফিন্ ঝুট্ বাত্?

ভেতরে একটা নৌকোতে তখন নবাব মীর্জা মহম্মদ নীরব নিথর হয়ে ভাগ্যের পরিহাসের কথা ভাবছিল। এই মসনদ। এই মসনদের জন্যেই তাকে এতদিন এত লোক কুর্নিশ করেছে, আর আজ এই মসনদের জন্যেই এতগুলো মানুষের এই দুর্দশা। হায় আল্লাতালাহ্, তুমি আমাকে অনেক দিয়েছো, আবার অনেক দিয়েও অনেক কেড়ে নিয়েছো। তোমার দেওয়ারও যেমন কোনো মর্যাদা আমি দিইনি, তোমার কেড়ে নেওয়ার জন্যেও তোমাকে আজ আমি দোষ দেবো না। আমাকে সুখ দাওনি বলে আমি অনেক অভিযোগ করেছি, আজ চরম দুর্দশা দিয়েছো বলে যদি অভিযোগ করি তাহলে কি তুমি শুনবে? একদিন তোমাকে আমি অস্বীকার করেছি, সে-অপরাধ আমার ক্ষমা করো। তারপর যখন কোরাণ পড়েছি তখন আমি সুখ না পাই শান্তি পেয়েছি। আমি মসনদ পেয়ে যা না পেয়েছি, কোরাণ পড়ে তাই পেয়েছিলাম। কিন্তু যদি শান্তিই দিলে তো মসনদ কেড়ে নিলে কেন? আর মসনদ যদি কেড়েই নিলে তো এমন করে মসনদের নিচে মাটির ধুলোয় নামিয়ে দিলে কেন? কোন্ পাপের প্রায়শ্চিত্তের এমন বিধান যে মসনদ পেলেই তাকে অপমানের নরকে নেমে যেতে হবে? যদি সে আমার অপরাধ হয় তো আমি তার শাস্তি মাথা পেতেই নেবো। কিন্তু যদি আমার মসনদের অপরাধ হয় তো আর কোন্ নবাব ইতিহাসে এমন করে প্রায়শ্চিত্ত করেছে?

রাজমহল থেকে নৌকো দুটো ছেড়েছিল। দিন পেরিয়েছে, রাতও পেরোচ্ছে, হঠাৎ এক জায়গায় এসে নৌকোটা যেন ঠোক্কর খেল।

মীর দাউদ একটা সেলাম পর্যন্ত করেনি। না করুক। মসনদের সঙ্গে সঙ্গে কুর্নিশ পাওয়ার অধিকারটুকুও যে হারিয়েছি তা জানি। তবু তো একদিন আগেও আমি বাঙলা মুলুকের নবাব ছিলাম। এমন করে রাতারাতি সব গৌরব মুছে যায় নাকি?

—তোমরা আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ মীর দাউদ?

মীর দাউদ গম্ভীর গলায় বলেছিল—মুর্শিদাবাদে।

—মুর্শিদাবাদে নিয়ে গিয়ে কী করবে? আমাকে বন্দী করে রাখবে? ফাটকে পুরে রাখবে? কোতল করবে?

কোনো উত্তর দেয়নি মীর দাউদ একবার। মীরকাশিমের দিকেও চেয়েছিল নবাব।

—আচ্ছা মীরকাশিম, আমি যদি তোমাদের টাকা দিই তোমরা আমাকে ছেড়ে দেবে?

এর পরে মীর দাউদ আর মীরকাশিম ভেতরে আসেনি। দরজায় তালা লাগিয়ে দিয়ে বাইরে চলে গিয়েছিল। যেন নবাব পালিয়ে না যেতে পারে। যেন নৌকো থেকে গঙ্গায় ঝাঁপিয়ে পড়ে নিরুদ্দেশ না হতে পারে। তা তোমরা কি চাও আমি তোমাদের পায়ে ধরে তোমাদের কাছে ক্ষমা চাইবো? এই যে তুমি রাজমহলের ফৌজদার হয়েছো, এ তো আমিই তোমাকে এ-চাকরি করে দিয়েছি। আমি সীলমোহর না করলে তো তুমি এ চাকরি পেতে না। তোমাদের পায়ে ধরে আমি কী করে ক্ষমা চাই মীর দাউদ! আমারও তো একটা মান-মর্যাদা, মান-অভিমান আছে। তোমরা না-হয় বিশ্বসঘাতকতা করে আমাকে লড়াইতে হারিয়ে দিয়েছো, কিন্তু আসলে তো বাঙলার নবাব এখনো আমিই। এখনো তো মুর্শিদাবাদে আমার মসনদ আমারই রয়েছে।

পাশে এক কোণে লুৎফা চুপ করে বসে ছিল। শুরু থেকে একটা কথাও বলেনি সে। মীরকাশিম যখন তার হাত থেকে গয়নার বাক্সটা কেড়ে নিয়েছিল তখনো একবার চিৎকার করেনি।

—জানো, ওরা কেউ আমার কথা শুনলে না।

মীর্জা মহম্মদ আবার বললে—তুমি কথা বলছো না যে?

যেন লুৎফা কথা বললে সমস্ত দুঃখ ঘুচে যাবে নবাবের। তবে আজকেই না-হয় কথা বলছে না লুৎফা, কিন্তু কবেই বা সে কথা বলেছে? কবে কথা বলবার জন্যে এমন করে পীড়াপীড়ি করেছো তুমি? সেদিন তো তোমার মনে ছিল না? সেদিন তো তুমি ডেকে খবর নাওনি লুৎফার?

মীর্জা মহম্মদ আবার জিজ্ঞেস করলে—হাতিয়াগড়ের রাণীবিবিরা কি আমাদের সঙ্গেই আছে বেগমসাহেবা?

লুৎফা ছোট করে জবাব দিলে—হ্যাঁ—

—কোথায়? পাশের নৌকোয়?

লুৎফা আবার তেমনি করে বললে—হ্যাঁ।

—তা তুমি কি আমার সঙ্গে কথা বলবে না ঠিক করেছো?

লুৎফা বললে—কী কথা বলবো?

—কোনো কথাই কি তোমার বলতে ইচ্ছে করছে না? কথা বলবার জন্যে যে আমার প্রাণটা ছট্‌ফট্‌ করছে। একটা কিছু কথা বলো, নইলে মনে হচ্ছে আমার যেন কেউ নেই—

তবু লুৎফা কিছু কথা বললে না। তেমনি চুপ করেই রইলো।

মীর্জা বলতে লাগলো—জানো লুৎফা, সত্যিই এখন দেখছি আমার কেউ নেই। এতদিন যারা আমায় কুর্নিশ করেছে, যারা আমার কাছ থেকে মাইনে নিয়েছে, তারা দেখলাম সবাই পর। এখন গলা ছেড়ে ডাকলেও কেউ আর সাড়া দেবে না। এমন হবে আমি ভাবিনি লুৎফা—

হঠাৎ বাইরে যেন মীর দাউদের গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। মীরকাশিমও যেন কার সঙ্গে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কথা বলছে।

ওদিকে মরালীও তখন তৈরি হয়ে নিয়েছে। মীর দাউদ খাঁ সামনে দাঁড়িয়ে '। তার পাশেই মীরকাশিম সাহেব। মীরকাশিম সাহেব একটু সামনের

দিকে এগিয়ে এল। বোধ হয় দেখতে চাইছিল বেগমসাহেবার কাছে কোনো গয়নার বাক্স আছে কি না।

—আপনিই মরিয়ম বেগমসাহেবা?

মরালী বললে—হ্যাঁ—

—আপনি কোথায় চলেছেন চেহেল্-সুতুন ছেড়ে?

মরালী বললে—চেহেল্-সুতুন নয়, ক্লাইভ সাহেবের ময়দাপুরের ছাউনি থেকে আসছি।

মীর দাউদ খাঁ চাইলে মীরকাশিমের দিকে। অর্থাৎ বেগমসাহেবা মিথ্যে কথা বলছে। ক্লাইভ সাহেবের আর খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই, মরিয়ম বেগমসাহেবাকে প্যাঠিয়ে দিচ্ছে নৌকো করে!

—আপনার সঙ্গে কী কী আছে?

—কিছুই নেই।

—লোকের সন্দেহ হবে বলে কিছুই আনেননি সঙ্গে করে?

মরালী বললে—আমার কিছুই নেই তাই সঙ্গে কিছু আনিনি।

—কিন্তু বেগমসাহেবা, ভেবেছিলেন পোশাক বদলালে কেউ আপনাকে চিনতে পারবে না, সহজেই লোকের চোখ এড়িয়ে যাবেন, না?

মরালী সে-কথার উত্তর না দিয়ে বললে—আপনারা কি আমাকে ধরে নিয়ে যেতে চান?

মীরকাশিম সাহেব বললে—নবাবকে যখন ধরেছি, তখন তার বেগমসাহেবাকে তো ছেড়ে দিতে পারি না। আমাদের সঙ্গে যেতে হবে আপনাকে!

—কোথায় নিয়ে যাবেন আমাকে?

—মুর্শিদাবাদে।

—কিন্তু এর জন্যে ক্লাইভ সাহেবের কাছে আপনাদের জবাবদিহি করতে হবে, তা বলে রাখছি—

—সে-কথা মীরজাফর আলি সাহেবকে বলবেন, তিনিই তার জবাব দেবেন।

—কিন্তু যদি আমি না যাই?

মীর দাউদ খাঁর হাতের তরোয়ালটা জলের ছায়া লেগে চক্ চক্ করে উঠলো।

—চলুন, কোথায় নিয়ে যাবেন চলুন, আমি যাচ্ছি।

পাশের নৌকোর ভেতরে তখন দুর্গা আর ছোট বউরানী চুপ করে সব শুনছিল। তাদেরও ঘুম নেই সারা রাত। সেই পলাশীর দিন দুপুরবেলা তাদের নৌকোর ভেতর ঠেসে পুরে দিয়েছে। এক ফোঁটা জল পর্যন্ত কারো মুখে পড়েনি। ছোট বউরানী কেবল কেঁদেছে আর দুর্গা সাহস দিয়েছে। আর সাহস দিয়েই বা কী করবে। আর স্তোক দিয়ে কতক্ষণই বা বোঝাবে তাকে। একদিন দু'দিন তো নয়, মাসের পর মাস চলে গেছে। এক ঘাট থেকে আর-এক ঘাটে ঘুরে কেবল। হাতিয়াগড়ের মানুষ বোধ হয় ধরে নিয়েছে তারা মরে গেছে।

হয়তো ছোটমশাই আবার ফিরে গেছে হাতিয়াগড়ে। সেখানে ফিরে গিয়ে হয়তো আবার নতুন করে একটা বিয়ে করেছে।

দুর্গা বলেছে—তুমি থামো তো, ছোটমশাই তেমন বেটাছেলে নয়—

কিন্তু ছোট বউরানীর সে-কথায় বিশ্বাস হয় না। পুরুষমানুষ যে কী জিনিস, তা জানতে ছোট বউরানীর বাকি নেই। যখন যেখানে তখন সেখানে।

আর ছোট বউরানীরই বা দোষ কী? দুর্গাও তো সে-কথা জানে। দুর্গা যেমন জানে, তেমনি দুর্গার মা, মাসি, ঠাকুমা, দিদিমা সবাই জানতো। পুরুষমানুষকে বিশ্বাস নেই। তারা মেয়ে পেলেই বিয়ে করে বসে। আর বাঙলা দেশও যে মেয়ের দেশ। বাড়িতে বাড়িতে পাল পাল মেয়ে। আর যারা ইরান-তুরান থেকে এসেছিল এই হিন্দুস্থানে, তারাও তো কিছুটা এসেছিল এখানকার মেয়েমানুষের লোভেই। পৃথ্বীরাজকে হারিয়ে যে-মহম্মদ ঘোরী দিল্লী দখল করেছিল, সে তো আর দেশে ফিরে গেল না। হিন্দুস্থানের মত এমন মজার দেশ কোথায় পাবে? এখানকার গাছের ফল, মাঠের ধান, গোয়ালের গরু, আর পুকুরের মাছ, এ যে স্বর্গ! তার ওপর আছে এখানকার মেয়েরা! এত মিষ্টি, এত নরম, এত বাধ্য, এত সুন্দর বেগম আর কোথায় পাবো? সুতরাং থাকো এখানে। এই দেশটাকেই নিজের দেশ বানিয়ে নাও। এমনি করেই চলছিল বাদশা আওরংজেব পর্যন্ত। তোমরা যে-যার এলাকায় স্বাধীন হয়ে রাজ্য চালাও, গ্রাম-পঞ্চায়েত গড়ো, লাঠি-সড়কি-বন্দুক-গোলা-বারুদ নিয়ে চোর-ডাকাত-মারামারি ঠেকাও, আমাকে বিরক্ত করো না। আমি দিল্লীর তকত্-তাউসে বসে আয়েস করে বেগম-বাঁদী নিয়ে ফুর্তি করি। কিন্তু সাম্রাজ্য অত সহজ জিনিস নয় জাঁহাপনা। সম্পত্তিও অত সহজ জিনিস নয়। সম্পত্তি থাকলেই তোমার রাতের ঘুম আর দিনের বিশ্রাম গেল। তাই ওদিক থেকে উঠলো মারাঠী আর শিখ। তারা বাদশা আওরংজেবের ঘুম কেড়ে নিলে, বিশ্রাম কেড়ে নিলে। আর বাদশা যখন মারা গেল, তারপর থেকে আগুন জ্বলে উঠলো চারদিকে। সবাই স্বাধীন তখন। তুমি দিল্লীর নবাব, কিন্তু আমিও হায়দরাবাদের নিজাম, আমিও হায়দার আলি; আর এই বাঙলা-মুলুকের নবাব আমিই। আমার নাম মুর্শিদকুলী খাঁ। পাঁচ-পাঁচবার মুর্শিদাবাদের নবাবী মসনদ হাত বদলালো, তবু হিন্দুস্থানের মানুষের দুঃখ ঘুচলো না। তারা বললে—ফিরিঙ্গী, ফিরিঙ্গীই সই, ফিরিঙ্গীরাই যদি নবাবের হাত থেকে আমাদের বাঁচায় তো আমরা না-হয় ফিরিঙ্গীই হবো, আমরা জাত দেবো, জাত গেলেও জান তো তবু বাঁচবে—

হঠাৎ সামনে কাকে দেখে থমকে গেল দুর্গা। অন্ধকারে ভালো করে চেনাও যায় না। ওমা, কে তুমি? কাদের মেয়ে?

মূর্তিটা ততক্ষণে টিপ্ করে দুর্গার পায়ে একটা পেন্নাম ঠুকে দিয়েছে। [illegible]রানীর পা ছুঁয়েও মাথায় ঠেকিয়েছে। বললে—আমি মরালী দুগ্যাদিদি—

—ওমা, মুখপুড়ি তুই? তুই কোত্থেকে এখেনে এলি? তুই তো মোছলমান [illegible]? মরিয়ম বেগম নাম হয়েছে তো তোর?

মরালী বললে—কেমন আছ ছোট বউরানী?

দুর্গা বললে—মরতে এখন ছুঁয়ে দিলি তো! রাত-বিরেতে এখন কাপড় কাচতে হবে আবার—

ছোট বউরানী বললে—এখন কী হবে আমাদের রে, আমরা যাচ্ছিলুম

হাতিয়াগড়ে—কেষ্টনগরের মহারাজা আমাদের লোকজন সঙ্গে দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিল, হঠাৎ এ কী বিপদ হলো বল দিকিনি—

দুর্গা বললে—নবাবকেও ধরে রেখেছে পাশের কোঠাতে—হারামজাদাকে ধরেছে বেশ করেছে, কিন্তু আমরা কী দোষ করলুম মা?

—কিন্তু দুগ্যাদি, তোমাদের বাঁচাবার জন্যেই আমি এত কাণ্ড করলুম, এবার দেখি তোমাদের জন্যে আর কী করতে পারি?

—তুই আর কী করবি এখন? তোর নবাবকে তো এখন ধরে রেখেছে।

—না দুগ্যাদি, তুমি আমাকে যে-করে বাঁচিয়েছ, তোমাদের জন্যে আমি সব করতে পারি, তুমি কিছছু ভেবো না। আমি নবাবের সঙ্গে দেখা করে আসছি—

বলে বাইরে যেতেই ফৌজদারের সেপাইরা আটকালো।

মরালী বললে—আমি নবাবের নৌকোতে যাবো, আমি নবাবের বেগম—

মীর দাউদ সাহেবের কানে কথাটা গেল। মীরকাশিম সাহেবও পাশে ছিল। বললে—যানে দেও—

নবাবের নৌকোটা পাশে আসতেই মরালী লাফিয়ে সেই নৌকোতে গিয়ে উঠলো।

সেদিন মুর্শিদাবাদ শহরে কৌতূহলের শেষ নেই একদিন এই মুর্শিদাবাদেই নবাব ়ত ফিরিঙ্গীদের হারিয়ে বুক ফুলিয়ে তাও বেশীদিন আগের কথা নয়। আর আজ সেই ফিরিঙ্গীরাই আবার মুর্শিদাবাদ শহরের রাস্তা দিয়ে বুক ফুলিয়ে হাঁটছে। সঙ্গে দিশী সেপাই আর ফিরিঙ্গী ফৌজের লোক। শহরের লোকেরা উলু দিয়েছে, শাঁখ বাজিয়েছে। তবু যেন তাদের আশ মেটেনি। বার বার দেখতে চায় ক্লাইভ সাহেবকে। মনসুরগঞ্জের হাবেলির সামনে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

পাহারাদাররা এক-একবার তাড়া দেয় আর তারা দৌড়ে দূরে পালায়। কিন্তু আবার আস্তে আস্তে সামনে সরে আসে। আবার হাঁ করে উঁচু অলিন্দটার দিকে চেয়ে থাকে। যদি এক পলক দেখা যায় সাহেবকে।

কিন্তু হঠাৎ কোথা থেকে উড়ো খবর এসে পৌঁছলো—নবাব এসেছে রে, নবাব এসেছে—

কেউ বিশ্বাস করে না। বিশ্বাস করতে যেন ভরসা হয় না কারো। দূর, নবাব কেন আসতে যাবে? নবাব কেমন করে আসবে?

—আরে, দেখে আয় গিয়ে গঙ্গার ঘাটে, মীর দাউদ সাহেব নবাবকে হাত-কড়া পরিয়ে নৌকো থেকে নামাচ্ছে!

কথাটা যেন চাবুকের মত বিঁধলো সকলের মনে।

একজন বললে—তামাশা করার আর জায়গা পাওনি দাদা—

যে-লোকটা কথাগুলো বললে, সে ততক্ষণ এগিয়ে গিয়েছে। তার আর তখন উত্তর দেবার সময় নেই। ক'দিন ধরে শহরে ঝাড়ু পড়ছে না, রাস্তায় আলো জ্বলছে না। ক'দিন ধরে চেহেল্-সুতুনের নহবত-মঞ্জিলে নহবত বাজছে না।

ক'দিন ধরে বাজারে কেনা-বেচা হচ্ছে না। সকালবেলা এক রকম খবর আসে, আবার বিকেল বেলা সে-খবর উলটে যায়।

হঠাৎ যেন তুমুল ঝড় উঠলো। মানুষের ভিড় চক্-বাজারের রাস্তা পেরিয়ে স্রোতের মত এগিয়ে চললো গঙ্গার ঘাটের দিকে।

—ও দাদা, কী হলো? কোথায় যাচ্ছ?

সামনে যাকে পায়, তাকেই জিজ্ঞেস করে সবাই।

—শোনোনি, নবাবকে গ্রেফ্তার করেছে যে!

—ঠিক বলছো?

—শুনছি তো, তাই দেখতে যাচ্ছি—

ঊর্ধ্বশ্বাসে সবাই ছুটছে সেই দিকে। কথা বলবার সময় নেই কারো। মনসুরগঞ্জের ফটকের সামনে লোকগুলোও তখন দৌড়তে আরম্ভ করেছে। নবাবকে গ্রেফ্তার করেছে। নবাবের হাতে হাত-কড়া দিয়েছে। এমন তাজ্জব কাণ্ড আর কখনো দেখেনি কেউ। বাপ-খুড়োর চোদ্দপুরুষও এমন ঘটনার কথা কানে শোনেনি! চলো ইয়ার, জল্দি চলো—

বাঙলা-মুলুকের একদিন যারা মালিক হবে, আর শুধু বাঙলা-মুলুকই বা কেন, সারা হিন্দুস্থানের মাথায় উঠে বসবে, তারা সেদিন মুর্শিদাবাদের মনসুরগঞ্জ-গদির ভেতরে চুপ করে বসে ছিল। এক-এক করে সব খবরই কানে এসেছে। সবাই এসে দেখা করে গেছে। জগৎশেঠজী এসে ক্লাইভ সাহেবের সঙ্গে কথা বলে গেছে। পাশে বসে ছিল উমিচাঁদ সাহেব, আর নবকৃষ্ণ মুন্সী।

খানিক পরে উমিচাঁদকেও উঠে যেতে বললে ক্লাইভ। বললে—তুমি এখন যাও উমিচাঁদ—

উমিচাঁদ বললে—আমার কী হবে তাহলে সাহেব?

ক্লাইভ বললে—যা হবে, তা দেখতে পাবে। টাকা তো এখনো পাইনি।

—শেষকালে কলা দেখাবে না তো সাহেব?

—কলা? হোয়াট ইজ কলা?

বলে মুন্সীর দিকে চাইলে ক্লাইভ। নবকৃষ্ণ বুঝিয়ে দিলে। বললে—হুজুর, কলা মানে প্ল্যানটেন—

—ও, ব্যানানা? তা ব্যানানা আমি কোথায় পাবো?

নবকৃষ্ণ বললে—না, হুজুর, উমিচাঁদ সাহেব তা বলছেন না। বলছেন ওকে ফাঁকি দেবেন না তো আপনি?

ক্লাইভ বললে—ফাঁকি দেবো কেন আমি? দলিলে যদি লেখা থাকে তো নিশ্চয়ই টাকা পাবে তুমি!

—লেখা নেই মানে?

ক্লাইভ বললে—ঠিক আছে, আমি যখন চেহেল্-সুতুনে যাবো তখন দেখা যাবে; এখন তুমি যাও এখান থেকে, আমার মুন্সীর সঙ্গে অন্য কথা আছে!

—ঠিক আছে। আমি তোমার মুন্সীকে জোগাড় করে দিলুম, আর এখন আমি কেউ নই, মুন্সী নবকৃষ্ণই হলো তোমার সব! ঠিক আছে। আমার টাকা নিয়ে সম্পর্ক! ফেলো কড়ি মাখো তেল, তুমি কি আমার পর?

রাগে গজরাতে গজরাতে উমিচাঁদ ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে গেল। বাইরে বেরিয়েই লম্বা বারান্দা। বাইরে ফিরিঙ্গীদের ফৌজের লোকজন ঘোরাফেরা

করছে। বিরাট হাবেলি। ফৌজের লোকের মধ্যে দিশী-বিলিতী সবাইকে মীরজাফর এই বাড়িতে থাকতে দিয়েছে।

উমিচাঁদ মীরজাফর সাহেবের মহলের দিকে গেল। মহলের বাইরে পাহারা দিচ্ছিল সেপাই।

—কোথায়, মীরজাফর সাহেব কোথায়?

—বাইরে গেছে হুজুর!

—ও, তা তাঁর ছেলে মীরন সাহেব? মীরন সাহেব কোথায় গেল?

—আজ্ঞে, কেউ নেই হাবেলিতে!

দূর ছাই, সবাই যে-যার কাজে বেরিয়ে গেছে। সবাই টাকার ধান্ধায় বেরিয়েছে হয়তো।

নন্দকুমারকে সেইজন্যেই একদিন উমিচাঁদ বলেছিল—যা পারো টাকা কামিয়ে নাও নন্দকুমার, লড়াইতে কে জেতে কে হারে ঠিক নেই, দু' দলের কাছেই টাকা খাও। শেষে যার জিত হবে, তার দলেই ভিড়ে যাবে—

বারান্দা দিয়ে চলতে চলতে গুরু নানকের উদ্দেশে একটা নমস্কার করে নিলে উমিচাঁদ সাহেব। জয় গুরুজী, গুরুজী কি ফতে!

বলে আর দাঁড়ালো না সেখানে। সামনের দিকে এগোতেই বাইরের ফটকের দিক থেকে একটা আওয়াজ এলো। সকাল থেকেই সেখানে ভিড় জমেছিল মানুষের। ক্লাইভ সাহেব এখানে আসবার সঙ্গে সঙ্গেই। এখন আবার নতুন করে কিসের আওয়াজ এলো!

—কিসের আওয়াজ? কে?

কে একজন যাচ্ছিল, তাকে ডেকে উমিচাঁদ সাহেব জিজ্ঞেস করলে।

লোকটা ফৌজের দলের। বললে—নবাবকে ধরে এনেছে গ্রেফ্‌তার করে—

—তাই নাকি?

হঠাৎ যেন উমিচাঁদ সাহেবের রক্ত চন্‌মন্‌ করে উঠলো। জয় গুরুজী, তাহলে গুরুজীকে নমস্কার করার ফল হাতে-হাতেই ফললো সত্যি-সত্যি! এই মসনদ তো নবাবেরই তৈরি। বাঙলা-মুলুকের মানুষের কাছ থেকে আব্‌ওয়াব্‌ আদায় করে এই গদি নবাব আলীবর্দি খাঁ সাহেব মীর্জা মহম্মদের জন্যে বানিয়ে দিয়েছিলেন। আর তারই ভেতরে আজ বসে আছে ফিরিঙ্গী সাহেব রবার্ট ক্লাইভ! জয় গুরুজী, এ সবই তোমার মেহেরবানি, এ সবই তোমার মর্জি।

ক্লাইভ সাহেব বললে—এবার দরজাটা বন্ধ করে দাও মুন্সী, নইলে উমিচাঁদ আবার ঢুকে পড়বে কোন্‌ সময়—

মুন্সী নবকৃষ্ণ উঠে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে এল। তারপর সাহেবের পায়ের কাছে এসে বসলো। বললে—হুজুর, আমার একটা আর্জি আছে হুজুরের শ্রীচরণে!

ক্লাইভ বললে—বলো—

—নির্ভয়েই বলি হুজুর, আমি গত মাসের মাইনে পাইনি!

—কেন? মাইনে পাওনি কেন? কত টাকা মাইনে তোমার?

নবকৃষ্ণ বললে—হুজুর, মাত্তোর ছ' টাকা—

ক্লাইভ হাসলো। বললে—মুন্সী, একদিন আমারও মাইনে ছিল তোমার মত ছ' টাকা। কিন্তু আজ আমি ইস্ট-ইন্ডিয়া-কোম্পানীতে সবচেয়ে বেশি

মাইনে পাই। কী করে এমন হলো জানো?

মুন্সী বললে—হুজুরের গুণপনার জন্যে! হুজুরের গুণের কি সীমা আছে?

ক্লাইভ বললে—না, তা নয় মুন্সী। এই সবকিছু হয়েছে তোমাদের জন্যে! তোমরাই আমার মাইনে বাড়িয়ে দিয়েছো মুন্সী। তোমাদের জন্যেই আমি আজ কর্নেল!

মুন্সী কৃতার্থ হয়ে সাহেবের পা ছুঁয়ে মাথায় ঠেকালো। বললে— কী যে বলেন হুজুর—

—না, আমি ঠিক বলছি মুন্সী! তোমরা যদি বিশ্বাসঘাতকতা না করতে তো আমি কোথায় থাকতুম? তোমাদের ছ' টাকা কেন, ছ' হাজার টাকা করে দিলেও কোম্পানী তোমাদের বিশ্বাসঘাতকতার দেনা শোধ করতে পারবে না। টাকার জন্যে তুমি ভেবো না মুন্সী, তুমি কত টাকা পেলে খুশী হবে?

বড় মুশকিলে পড়লো নবকৃষ্ণ। কী বলবে বুঝতে পারলে না।

ক্লাইভ আবার বললে—তুমি কত টাকা পেলে খুশী হবে বলো?

নবকৃষ্ণ বললে—টাকার লোভ আমাকে দেখাবেন না হুজুর, আমি আপনার শ্রীচরণের সেবা করতে পারলেই খুশী হবো, আর কিছু চাই না—

ক্লাইভ সাহেব বললে— ঠিক আছে, টাকার কথা আমি বুঝবো; এখন একটা অন্য কথা বলি, যে-খবরটা আনতে বলেছিলুম, সে-খবর কিছু পেলে?

—হ্যাঁ হুজুর। চেহেল্-সুতুনে কোনো বেগমসাহেবা নেই। সকলকে ধরে মতিঝিলের মধ্যে গ্রেফ্তার করে রেখেছে মীরন সাহেব।

ক্লাইভ বললে—সে আমি জানি। কিন্তু 'মরিয়ম বেগমসাহেবা' বলে কোনো বেগমসাহেবা তার মধ্যে আছে কি না, তা খোঁজ নিয়েছো?

—নিয়েছি হুজুর, আছে।

—দেখা হয়েছিল তাঁর সঙ্গে?

—না হুজুর, দেখা করিনি। আপনি যদি মঞ্জুরী দেন তো দেখা করতে দেবে। তাঁকে গিয়ে কী বলতে হবে হুকুম করুন।

দরজার বাইরে কড়া নাড়ার শব্দ হলো। ক্লাইভ সাহেব বললে—ওই বোধ হয় আবার উমিচাঁদটা এসেছে, বলো এখন দেখা হবে না—

নবকৃষ্ণ উঠে গিয়ে দরজা খুলে দেখলে উমিচাঁদ সাহেব নয়। দু'জন অন্য লোক।

চিনতে পারলে ক্লাইভ। সেই গোলাম মোল্লা আর তার সঙ্গী!

—হুজুর, সব্বোনাশ হয়েছে। ভয়ে ভয়ে লোক দু'জন কাঁপতে লাগলো ক্লাইভ সাহেবের সামনে দাঁড়িয়ে। তারপর অচেনা মুখ দেখে কথা বলতে গিয়েও থেমে গেল।

ক্লাইভ সাহেব আড়ালে ডেকে নিয়ে জিজ্ঞেস করলে—কী হয়েছে বলো? বেগমসাহেবাকে কলকাতায় পৌঁছে দিয়ে এসেছো?

—না হুজুর।

—কেন?

—নফরগঞ্জের কাছে মীর দাউদ সাহেব বেগমসাহেবাকে গ্রেফ্তার করে নিয়ে গেছে!

—হোয়াই? কেন?

—আমরা কবুল করলুম হুজুর, ইনি কর্নেল সাহেবের লোক, তবু কথা শুনলে না। সঙ্গে মীরকাশিম সাহেবও ছিল, ওনাকে ধরে নিয়ে গেল।

—আচ্ছা তোমরা যাও—

ক্লাইভ নিজের জায়গায় ফিরে এসে গম্ভীর মুখে কিছুক্ষণ বসে রইলো। মুন্সী সাহেবের মুখের দিকে চেয়ে বললে—কিছু বিপদ-আপদ হয়েছে নাকি হুজুর?

ক্লাইভ বললে—আচ্ছা মুন্সী, তোমাকে সেই যে পোয়েটকে ডাকতে বলেছিলাম, সে তো কই এল না। কখন আসবে সে?

মুন্সী বললে—হুজুর, সে একটা বদ্ধ পাগল মানুষ, আমাকে বলে কি না আমার মাথায় টিকি কেন? দেখুন তো তাজ্জব কথা! হিন্দুর ছেলে টিকি রাখবো না? আমি কি মোছলমান?

—তা হোক পাগল, তুমি এখ্খুনি একবার তাকে ডেকে নিয়ে এসো, আমার জরুরী দরকার, এখন রাস্তায় কিংবা ঘাটে কোথাও নিশ্চয়ই আছে, যাও। আমি ততক্ষণ একটু রেস্ট নিই—

জগৎশেঠজীর বাড়ির ভেতর দেওয়ানজী রণজিৎ রায় তখন খবরটা দিলে গিয়ে। জগৎশেঠজীরও ক'দিন ধরে ঘুম হচ্ছে না। আসলে জগৎশেঠজী জানতেন, এ সমস্তকিছুর দায় এসে পড়বে তাঁরই মাথায়। টাকার দরকার হলেই তাঁর কাছে হাত পাততে হবে সবাইকে। সাত লাখ টাকা ফরাসীদের কাছে লগ্নী করা ছিল, সে-টাকাটার আর কোনো আশা নেই। সেটা বেবাক জলে গেছে।

খবরটা শুনে জগৎশেঠজী বললেন—নবাবকে রাস্তা দিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে আসছে?

রণজিৎ রায় মশাই বললে—হ্যাঁ—

খানিকক্ষণ গম্ভীর হয়ে রইলেন জগৎশেঠজী।

দেওয়ানজী বললে—আমার একটু মায়া হলো দেখে, হাজার হোক নবাব তো? অনেকে দেখলাম কাঁদছে। সঙ্গে আরো ক'জন বেগমসাহেবাও রয়েছেন। তাঁরাও হেঁটে আসছেন পেছন-পেছন—

—আর নবাব?

দেওয়ানজী বললেন—নবাব মুখ নিচু করে হেঁটে হেঁটে আসছেন, কোনো দিকে দৃষ্টি নেই, হাত-কড়া বাঁধা—

জগৎশেঠজী উত্তেজিতভাবে বলে উঠলেন—তা নবাবের জন্যে পাল্কির ব্যবস্থা করলে কী এমন লোকসানটা হতো? এ কি মীরজাফরের হুকুম, না মীর দাউদের বদমায়েসি?

কথাটা বলে জগৎশেঠজী কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তাঁর চোখের সামনে দিয়ে পুরোন দিনগুলোর ছবি ভেসে যেতে লাগলো। সেই ছোট বয়েসের নবাবজাদার দুষ্টুমিটাও মনে পড়লো! আস্তে আস্তে সে বড় হলো। নবাব আলীবর্দী কতদিন দরবারে বসে বলতেন—জগৎশেঠ, আমার নাতিটাকে নিয়েই ভাবনা, ওর কথা ভেবে মরে গিয়েও আমি সুখ পাবো না—

সেদিন জগৎশেঠজী নবাবকে আশা দিয়েছিলেন, সান্ত্বনা দিয়েছিলেন—কিছু ভাববেন না নবাব, আমি তো আছি—

বুড়ো নবাব আলীবর্দী জগৎশেঠজীর কথা শুনে বোধ হয় শেষ জীবনে ভরসা পেয়েছিলেন। কিন্তু সে-কথা জগৎশেঠজী রাখেননি। রাখতে পারেননি।

হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন— লোকে কাঁদছিল?

দেওয়ানজী বললেন—হ্যাঁ, সবাই নয়, অনেকেই কাঁদছিল।

জগৎশেঠজী বললেন—দেখুন দেওয়ানজী, এই এরাই সকালবেলা ক্লাইভ সাহেবকে দেখে শাঁখ বাজিয়েছে, উলু দিয়েছে, আবার এরাই এখন নবাবকে দেখে কাঁদছে—আশ্চর্য! অথচ আমি কী করতে পারি। আমি আলীবর্দী খাঁকে কথা দিয়েছিলাম তাঁর মীর্জা মহম্মদকে আমি দেখবো। আমি কথা রাখতে পারলাম না। আমার কী দোষ!

—না না মহারাজ, আপনিই বা কী করবেন?

—সত্যিই হাত-কড়া লাগিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে আসছে নবাবকে?

—শুধু নবাব নয়, মহারাজ, সকলকে। সঙ্গে বেগমদেরও হাঁটিয়ে নিয়ে আসছে মীর দাউদ সাহেব। চারপাশে সেপাইরা ঘিরে রয়েছে।

জগৎশেঠজী বললেন—কোথায় রাখবে নবাবকে? মতিঝিলে, না মনসুরগদীতে?

রণজিৎ রায় বললেন—মতিঝিলে তো বেগমদের সবাইকে নজরবন্দী করে রেখেছে, সেখানে কী আর রাখবে? মীরন সাহেব যেখানে বলবে সেখানেই রাখবে।

—এখন বুঝি মীরনই সর্বেসর্বা?

—দেখছি তো তাই। লক্ষাবাগের লড়াইএর পর থেকে তো দেখছি সব ব্যাপারে হুকুম চালাচ্ছে। মীরজাফর সাহেব তো এখন কেবল নিজের টাকা-কড়ি-লাভ-লোকসান নিয়ে পাগল, চেহেল্-সুতুনের মালখানাতে কত টাকা আছে, তাই নিয়েই ব্যস্ত—

—কত টাকা পেয়েছে?

—সে জানবার উপায় নেই। ক্লাইভ সাহেব হুকুম দিয়ে সেখানকার ফটকে শীলমোহর করে দিয়েছে।

জগৎশেঠজী খানিকক্ষণ ভেবে বললেন—আপনি একবার যান সেখানে, গিয়ে আমার নাম করে বলুন, নবাবকে যেন রাস্তা দিয়ে সকলের চোখের সামনে দিয়ে হাঁটিয়ে না নিয়ে আসে—

—কিন্তু মীরন কি আমার কথা শুনবে মহারাজ?

—আপনার কথা না শুনুক, আমার কথা তো শুনবে, আমার নাম করে গিয়ে বলুন।

দেওয়ানজী বললেন—আপনি যখন বলছেন আমি নিশ্চয়ই যাবো, তাতে আমাদের লাভটা কী হবে?

—দেখুন দেওয়ানজী, সূর্য চব্বিশ ঘণ্টা আকাশে থাকে না, এক সময় তাকে অস্ত যেতেই হয়, কিন্তু পরদিন ভোরবেলা আবার সে ওঠে, তখন নতুন করে নতুন তেজ নিয়ে সে উদয় হয়!

—কিন্তু, নবাব কি বলতে চান আবার উঠতে পারবে? এর পরেও নতুন করে চেহেল্-সুতুনের মসনদে বসতে পারবে?

জগৎশেঠজী বললেন—এ নবাব না বসুক, অন্য কেউ বসবে। সিংহাসন কখনো খালি পড়ে থাকে না—তা জানি, কিন্তু নবাবকে অপমান করলে যে

সিংহাসনকেই অপমান করা হয়। মীর্জা মহম্মদকে ওরা যত খুশী অপমান করুক, নবাবকে অপমান করতে নেই, তাতে মসনদের গৌরবকে খর্ব করা হয়। আপনি গিয়ে বলুন মীরনকে—

দেওয়ানজীকে চলে যেতেই হলো। জগৎশেঠজীর হুকুম। বৃদ্ধ মানুষ, মুর্শিদাবাদের অনেক নবাব দেখেছেন, অনেক নবাবকে কুর্নিশ করেছেন। অনেক নবাবের নিমক খেয়েছেন। সেই নবাবের এমন অপমান সহ্য করতে পারছেন না। রণজিৎ রায় মশাই বেরোলেন। মহিমাপুরের রাস্তায় মানুষের সমুদ্র বয়ে চলেছে। নবাবকে হাত-কড়া পরিয়ে রাস্তা দিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে আসছে, এমন ঘটনা রোজ-রোজ ঘটে না। এ-দৃশ্য না দেখলে জীবনই ব্যর্থ। বাড়ির ছাদের ওপর দাঁড়িয়ে ঘোমটার আড়াল দিয়ে উঁকি মারছে বুড়ি-মেয়েমানুষরা। ঘুলঘুলি দিয়ে উঁকি দিচ্ছে কমবয়েসী মেয়েরা। ওই যে! ওই যে আসছে। ওই যে রে সামনের লোকটার খালি মাথা, ওই-তো নবাব! পেছনে পেছনে বেগম-বাঁদীর দল!

নবাবকে আগে অনেকবার দেখেছে সবাই। সে এ নবাব নয়। তার মাথায় তাজ ছিল, গায়ে জরির সাজ-পোশাক ছিল। হাতীর পিঠে চড়ে আসতো। সামনে কাড়া-নাকাড়া বাজাতে বাজাতে যেত বাজন্‌দাররা, তারপরে নবাবের সেপাইদের সর্দার, তারপর নবাব। সামনে-পেছনে সে-জাঁকজমক দেখে বোঝা যেত মুর্শিদাবাদের নবাব চলেছে। কিন্তু এ নবাব তো সাধারণ মানুষ। তার মাথায় তাজ নেই, গায়ে জরির সাজ-পোশাক নেই। এর দু'হাত লোহার হাত-কড়া দিয়ে বাঁধা। রোদের মধ্যে মাথা নিচু করে হাঁটছে।

—ওরে, দেখছিস নবাব কাঁদছে?

—না না, কাঁদছে না—

—ওই তো কাঁদছে, দেখছিস না টপ্ টপ্ করে জল পড়ছে বুকের ওপর—

—না না, ও তো ঘাম—রোদ লেগে ঘামছে—

তা সত্যিই তখন মাথার ওপর রোদ ঝাঁ-ঝাঁ করছে। ঘেমে নেয়ে উঠেছে সবাই। রাস্তার দুপাশে সারবন্দী হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। দাঁড়িয়ে ঝুঁকে দেখছে। মীর দাউদ সাহেব সামনে আসছে বুক ফুলিয়ে। তার পাশে মীরকাশিম সাহেব। কড়া নজর তাঁর চারদিকে। আর সেপাইরা ঘিরে রেখে দিয়েছে সকলকে। আসামী না পালিয়ে যায়।

মীরন সাহেবেরই সর্দারিটা বেশি। একবার পেছনে যাচ্ছে, একবার সামনে। খুব হুঁশিয়ার। খবরটা পেয়েই সেপাই তৈরি রেখেছিল মুর্শিদাবাদের ঘাটে। তারপর নিজেই সব তদারক করছে। নিজেই ভিড় সরাচ্ছে, নিজেই হুঁশিয়ার করে দিচ্ছে সকলকে। একদিন এই মীরন নবাবের সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে সাহস পায়নি। একদিন এই মীরনকেই অপমান করে তাড়িয়ে দিত দরবারের খিদ্‌মদ্‌গার। ভাগিয়ে দিত মতিঝিলের ফটকের পাহারাদার। আর আজ সেই মীরন সকলের ওপর হুকুম চালাচ্ছে। আর দু'দিন বাদে আবার এই মীরন সাহেবকে কুর্নিশ করে তবে দরবারে মীরজাফর সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে যেতে হবে। এই হচ্ছে নসীবের খেল্। এই হচ্ছে তক্‌দির।

আর এসেছে বশীর। বশীর মিঞা। বশীর মিঞার হাঁক-ডাক দেখে কে! কোথা থেকে একটা লাঠি জোগাড় করেছে। বলে—হটো হটো ইহাঁসে—

যারা বশীর মিঞার ইয়ার তারা ভেবেছিল এই সময়ে বশীরের কাছ থেকে

কটু খাতির পাবে। কিন্তু কোথায় কী। তাদের চিনতেই পারে না বশীর মিঞা। বলে, সরকারী কাজে খাতির-টাতির নেই ইয়ার—যাও যাও, হটো—

কিন্তু ওদিক থেকে জগৎশেঠজীর দেওয়ান আসতেই ভিড় একটু রাস্তা করে দিলে।

—কে?

—হুজুর, জগৎশেঠজীর দেওয়ানজী আপনার সঙ্গে বাত্ করতে এসেছেন—

মীরনের যেন তবু গ্রাহ্যই নেই। বললে—বলো, এখন ফুরসত নেই আমার—

—আজ্ঞে, জরুরী কাম।

মীরন বললে—বলো, এটা আরো জরুরী কাম—এখন ফুরসত হবে না—

কিন্তু রণজিৎ রায় মশাই এ-রকম উত্থান-পতন অনেক দেখেছেন। বললেন—আমি দেখা করবোই—

বলে একেবারে সোজা এগিয়ে গেলেন সামনের দিকে।

অন্য সময় দেওয়ানজী কথা বললে মীরন কৃতার্থ হয়ে যায়। কিন্তু আজ যেন অন্য রকম। বললে—তা আমি কী করতে পারি?

দেওয়ানজী বললেন—জগৎশেঠজী বলছেন সকলের চোখের সামনে এভাবে নবাবের লাঞ্ছনা করা কি ভালো?

—নবাব? নবাব কাকে বলছেন জনাব? মীর্জা মহম্মদ কি এখনো মুর্শিদাবাদের নবাব আছে?

—তবু বুঝলে না, একদিন তো নবাব ছিলেন উনি। নবাবকে অপমান করলে মুর্শিদাবাদের মসনদকে যে অপমান করা হয়।

হা হা করে হাসিতে ফেটে পড়লো মীরন সাহেব।

বশীর মিঞা হাসি শুনে কাছে সরে এল। বললে—কী হয়েছে হুজুর?

—এই দ্যাখ না বশীর, দেওয়ানজী কী বলছেন!

দেওয়ানজী বললেন—আমি বলিনি মীরন, জগৎশেঠজী যা বলে পাঠিয়েছেন তাই আমি তোমাকে বলছি—

মীরন হাসি থামিয়ে গম্ভীর হয়ে গেল। বললে—তা আমি জগৎশেঠজীর হুকুম মানবো, না আমার বাবার হুকুম মানবো? কোনটা মানবো আপনিই বলুন?

বশীর মিঞা বললে—না না হুজুর, আপনি মীরজাফর সাহেবের হুকুম মানুন। মীরজাফর সাহেবই তো নবাব হচ্ছেন হুজুর!

—তুমি থামো! তুমি কে?

বশীর মিঞা একটু থিতিয়ে গেল বকুনি খেয়ে। কিন্তু জবাবটা দিলে মীরন সাহেব। বললে—ওকে অমন করে বলবেন না দেওয়ানজী, ও আমার লোক—

কথাটায় অপমান বোধ হলো দেওয়ানজীর। ও-সম্বন্ধে আর কিছু কথা বললেন না। আসল প্রসঙ্গ টেনে এনে বললেন—যা ভালো বোঝ করো মীরন, কিন্তু কাজটা ভালো হলো না—

—ভালো হলো কি খারাপ হলো সে আপনি বাবাকে গিয়ে বলুন।

এর পর আর কোনো কথা বলা চলে না। দেওয়ানজীর মুখটা কেমন যেন গম্ভীর হয়ে গেল। এমন করে দেওয়ানজীকে কেউ আগে অপমান করতে সাহস

পায়নি। দেওয়ানজীকে অপমান করা মানেই জগৎশেঠজীকে অপমান করা। দেওয়ানজী আর সেখানে দাঁড়ালেন না। পালকিতে উঠে আবার চলতে লাগলেন।

মিছিল তখন এগিয়ে চলেছে। একেবারে চকব্যজারের রাস্তায় সারাফত আলির দোকানের সামনে এসে পড়েছে। মীর দাউদ সাহেব এদিক-ওদিক চেয়ে দেখছে। দেখুক সবাই, ভালো করে চেয়ে দেখুক।

কিন্তু হঠাৎ কে যেন মীরন সাহেবকে ডাকলে। বশীর মিঞাই প্রথমে শুনতে পেয়েছে। কে? কে ডাকে?

যে ডাকতে এসেছে সে একেবারে দৌড়তে দৌড়তে এসেছে। হাঁফাচ্ছে তখনো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। অত ভিড়ের মধ্যে একেবারে মীরন সাহেবের সামনে মুখোমুখি গিয়ে কথা বলতে পারেনি।

কাছে আসতেই বশীর মিঞা চিনতে পেরেছে। আস্‌গর আলি! আস্‌গর আলি মীরজাফর খাঁ সাহেবের খাস খানসামা।

—আস্‌গর, তুমি?

—মীরন সাহেবকে ডাকতে এসেছি। সাহেব এত্তেলা দিয়েছে।

—তোমার সাহেব? মীরজাফর খাঁ সাহেব?

বশীর মিঞা আর দাঁড়ালো না। মীরন সাহেবকে গিয়ে খবরটা দিলে। মীরন সাহেব তখন ব্যস্ত। ভিড় সামনে এগিয়ে আসছে। তাদের সামলাতে সামলাতে তখন গলদ্‌ঘর্ম। ঠিক সেই মুহূর্তে খবরটা পেতেই চম্‌কে উঠলো। আবার বাধা? ভালো কাজ একটা করতে গেলেই কোনো-না-কোনো বাধা এসে পড়ে।

ঠিক আছে! মীরন মাথার পাগাড়িটা খুলে ফেলে ঘামটা মুছে ফেললে। তারপর মীর দাউদ সাহেবকে ডাকলে।

বললে—ফৌজদার সাহেব, কর্তার তলব এসেছে, আমি যাচ্ছি—

—কর্তা ডেকেছে? কোনো গলত্‌ নাকি?

—কী জানি! একটু আগে জগৎশেঠজীর দেওয়ান এসেছিল, বলছিল নবাব সাহেবকে রাস্তা দিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছি কেন! আরে বেত্তমিজ্‌, নবাব যখন মসনদের ওপর বসতো তখন আমাদের তকলিফ্‌ দেয়নি? কী বলো মীর দাউদ সাহেব, তকলিফ্‌ দেয়নি?

—আলবাত্‌ দিয়েছে। একশো বার হাজার বার তকলিফ্‌ দিয়েছে। বেশ করেছি হাঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছি।

—তবে? সে-সব কথা কি আমি ভুলে গেছি?

তারপর চারদিকে দেখে নিয়ে বললে—আমি চললাম, দেখি কর্তার কী হুকুম হয়!

মীর দাউদ বললে—যদি কর্তা বলেন নবাবকে পালকিতে উঠিয়ে আনতে, তাহলে যেন রাজি হবেন না মীরন সাহেব!

—না না, বাবার ভয়-ডর আছে বলে আমি তো ডরপোক আদ্‌মি নই, আমি বাঘের বাচ্ছা, আমি কাউকে পরোয়া করি না ফৌজদার সাহেব!

বলে মীরন চলে গেল। যাবার আগে বলে গেল—একটু ভালো করে নজর রাখতে বলবে ফৌজদার সাহেব, যেন আসামীরা না ভাগে—

তখন জলুস আরো এগিয়ে চলেছে। আরো ভালো করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে

দেখছে সবাই আসামীদের। ইতিহাসের পরিহাসে একদিনের নবাব আজ নেসানের দরবারে আসামী হয়ে দাঁড়িয়েছে হাতে হাত-কড়া পরে। তোমরা সবাই আমার প্রজা ছিলে এতদিন, আজ আর-এক নবাবের প্রজা হতে চলেছো। তোমরাই ফিরিঙ্গীদের শাঁখ বাজিয়ে উলু দিয়ে এই শহরে অভ্যর্থনা করেছিলে, আর এখন আমাকে অভ্যর্থনা করছো চোখের জল দিয়ে। ভাই সব, তোমরা এক বিচিত্র জীব। আজ আমাকে হাত-কড়া দিয়ে গ্রেফ্‌তার করে নিয়ে যাচ্ছে দেখেও তোমরা একবার মুখের কথাতেও প্রতিবাদ জানাচ্ছো না। তোমরা যদি একটু প্রতিবাদ করতে, একটু বিদ্রোহ করতে, তাহলে আর আমাকে এমন রাস্তার ওপর দিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে যেত না ওরা। পালকিতে করে তুলে নিয়ে গিয়ে কোথাও বন্দী করে রাখতো। কিন্তু কেনই বা তোমরা প্রতিবাদ করবে? আমি তো কোনদিন তোমাদের কোনো উপকার করিনি। উপকার করবার সুযোগ পেলে তোমাদের উপকার করতাম কি না তাও তোমরা ভেবে দেখনি। আমি হেরে গেছি, সেইটেই আমার বড় অপরাধ। সেই অপরাধেই তোমরা আমাকে অপরাধী করেছো। যে হেরে যায়, তার দলে কে থাকে বলো? কে এমন নির্বোধ আছে দুনিয়ায়? যে জেতে তারই তো জয়-জয়কার। এ সংসারে বিজয়ীর গলাতেই তো সবাই জয়মাল্য দেয়। সেই জয়মাল্য দেবার সময় তো ন্যায়-অন্যায় বিচার করতে নেই। তাই ভাই সব, ন্যায়-অন্যায়ের কথা আজ আমি তুলছি না। আমি একটা কথা শুধু বলি, তোমরা চোখের জল ফেলে আমাকে আর হাসিও না। আমি তোমাদের চিনে নিয়েছি। তোমরা চোখ মুছে ফেল। যদি পারো আর একটু এগিয়ে গিয়ে আমার মনসুরগদীর সামনে গিয়ে আরো জোরে উলু দাও, আরো জোরে শাঁখ বাজাও—

ওদিকে মনসুরগদীর ভেতরে তখন মীরন সাহেবের মাথা গরম হয়ে গেছে। হাবেলির ভেতরে ফিরিঙ্গী-ফৌজের দলের পাঁচশো সেপাই হই-হল্লা করছে। তাদের সকলকে খাওয়ানো, তাদের তদারক করা সোজা কথা নয়। একটা কোনো ত্রুটি হলে ক্লাইভ সাহেব রেগে যাবে। তাদের জামাই-আদরে রাখতে হয়েছে। হাঁড়া হাঁড়া পোলাউ রান্না হচ্ছে, হাঁড়া হাঁড়া গোস রান্না হচ্ছে।

মীরজাফর সাহেব বললে—না, এটা তোমাকে করতেই হবে। ক্লাইভ সাহেব কড়া হুকুম দিয়েছে আমাকে—

—কিন্তু মীর দাউদ শুনবে কেন? সে বেগমসাহেবাকে পাক্‌ড়ে নিয়ে এসেছে! ছেড়ে দিতে হয় আপনি ছাড়বেন। ক্লাইভ সাহেব কে? এখন নবাব তো আপনি!

—চুপ কর, বেল্লিকের মত কথা বলিসনি। যা বলছি তাই কর তুই।

—কিন্তু নবাব এখন আপনি না ফিরিঙ্গী-বাচ্ছা ক্লাইভ?

—চোপরাও!

মীরন খানিকক্ষণের জন্যে চুপ করে রইলো। তারপর একটু পরে মাথা উঁচু করে বললে—মরিয়ম বেগমসাহেবার ওপর কি ক্লাইভ সাহেবের নজর পড়েছে?

—নজর পড়লে তোর কী? তুই কেন গোসা করছিস? তোর বিবির ওপরে কি সাহেব নজর দিয়েছে?

তাও তো বটে! ফিরিঙ্গী-বাচ্ছা! যদি নবাবের বেগমের খুবসুরত জওয়ানির দিকে চেয়ে সাহেবের নজর বিগড়ে গিয়ে থাকে তো মীরনের কী আর

নুকসান। নুকসান বেগমসাহেবাদের আর ক্লাইভ সাহেবের। সব তো ঝুটো মাল। ওদের আর কিম্মত্ কী?

—আর শোন্, আজ দরবারে ক্লাইভ সাহেবের কাছে ইনাম দিতে হবে। সোনা চাঁদি হীরে মতি পান্না চেহেল্-সুতুনের যা-কিছু আছে মালখানায় সব সাহেবের সামনে বার করতে হবে। বেগমসাহেবাদের ভি নজরানা দিতে হবে—

—বেগমসাহেবাদের?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, উজবুগ্! ফিরিঙ্গীসাহেব লক্কাবাগের লড়াই ফতে করে এসেছে। এখানে আমার মেহ্মান্, নজরানা দিতে হবে না? ক'টা বেগম আছে?

মীরন বললে—গুনে দেখিনি। অনেক আছে—সবাইকে মতিঝিলে কয়েদ করে রেখেছি—

—সবগুলোকে সাহেবের সামনে নজরানা দিতে হবে!

—নানীবেগমকে ভি নজরানা দেবো?

—দূর বেল্লিক, বুড়ি নিয়ে কী করবে সাহেব? মীর্জার মা, বহিন্, মাসী যারা আছে তাদের বাদ দিবি। ওদের নিয়ে ফিরিঙ্গী সাহেব কি ঘাস কাটবে? ওদের নজরানা দিলে যে সাহেব আমার মুখে থুতু দেবে রে!

ঠিক আছে। যেমন হুকুম হবে, তেমনিই করতে হবে। নবাব যখন বাবা, তখন তার কথা শুনতেই হবে। ঘরের বাইরে আসতে আসতে মীরন-সাহেব সেই কথাই ভাবছিল। নবাব হয়েও বাবার বড় ভয়। অত ডর-পোক আদ্মি হলে কি নবাবী করা চলে!

সামনেই মেহেদী নেসার আর রেজা আলির সঙ্গে দেখা। মেহেদী নেসার আর ডিহিদার রেজা আলি সাহেব দু'জনেই আজ খুব ব্যস্ত। দু'শো ফিরিঙ্গী আর তিনশো দিশি সেপাইদের খাওয়া-থাকার তদারকি করতে হচ্ছে সব কাজ ছেড়ে। সামনে মীরন-সাহেবকে দেখে এগিয়ে এল।

—কী সাহেব? নবাবকে তাহলে মীর দাউদ সাহেব কয়েদ করেছে?

মীরন সাহেবের মুখের চেহারা দেখে ডিহিদার রেজা আলি সাহেব অবাক হয়ে গেল—কী জনাব, মুখ গোম্ড়া করে আছ কেন? আজ তো তোমার ফুর্তির দিন, নবাব মীর্জা মহম্মদ হেবাৎ জঙ্ আলম্গীর কয়েদ হয়েছে, আজ কি অমন মুখ করতে আছে?

মীরন বললে—আরে ভাই সাহেব, নবাব যে কে তারই এখনো ফয়সালা হয়নি, ফরমাশ দিচ্ছে সব ফিরিঙ্গী-বাচ্ছা ক্লাইভ!

—ক্লাইভ সাহেব? কেন?

—আরে ভাইসাহেব, ক্লাইভ সাহেব ফরমাশ দিয়েছে মরিয়ম বেগমসাহেবাকে খালাস করে দিতে হবে!

—মরিয়ম বেগমসাহেবা? তার ওপর নেক-নজর পড়লো কী করে ফিরিঙ্গী-বাচ্ছার?

—কী জানি ভাইসাহেব, মরিয়ম বেগমসাহেবাকে নিয়ে নবাব মীর্জা মহম্মদ পালাচ্ছিল, রাজমহলে সবাইকে পাকড়েছে, বাঁদী বেগম সবাইকে। আভি হুকুম হয়েছে ফিরিঙ্গী-বাচ্ছার, ওই মরিয়ম বেগমসাহেবাকে ছেড়ে দিতে হবে—

মেহেদী নেসার তাজ্জব হয়ে গেল। চোখ বড় বড় করে বললে—মরিয়ম বেগমসাহেবা? তুমি ঠিক শুনেছো জনাব?

—আরে, তাই শুনেই তো মেজাজ বিগড়ে গেছে আমার।

—তা মরিয়ম বেগমসাহেবাকে মীর দাউদ পাকড়েছে কে বললে তোমাকে?

—আরে, এই তো বাবার কাছে শুনে আসছি। ক্লাইভ সাহেব খবর পেয়েছে যে মীর্জা মহম্মদের দলে মরিয়ম বেগমসাহেবাও আছে—

—গলত্, গলত্! গলত্ বাত। সব ভুল।

মীরন অবাক হয়ে গেল—ভুল?

—আরে হ্যাঁ জনাব, মরিয়ম বেগমসাহেবা তো মতিঝিলে! সব বেগমদের তো মতিঝিলে কয়েদ করে রাখা আছে। মরিয়ম বেগমসাহেবা ভি ওখানে আছে। কিন্তু ক্লাইভ সাহেবের নেক-নজর ওই বেগমসাহেবার ওপর পড়লো কী করে?

—তা তো আন্দাজ করতে পারছি না ভাইসাহেব!

—তাহলে এক কাজ করো জনাব, সবাইকে মতিঝিল থেকে হটিয়ে দাও।

মীরন বললে—হটিয়ে দেবো কী করে? নবাবের যত বেগমসাহেবা আছে সকলকে যে ফিরিঙ্গী-বাচ্ছার কাছে নজরানা দিতে হবে। আবার জওয়ানি-বেগম ছাড়া যে ক্লাইভ সাহেব ছোঁবে না। আর হটাবোই বা কোথায়?

—কেন? জাহাঙ্গীরাবাদে! ঢাকায়!

মীরনের যেন কথাটা বড় পছন্দ হলো। হাঁ করে চেয়ে রইলো মেহেদী নেসার সাহেবের দিকে। বুদ্ধিটা তারিফ করবার মত!

—হাঁ করে দেখছো কী জনাব, সব হটিয়ে দাও। নানীবেগম, ঘসেটি বেগম, আমিনা বেগম, ময়মানা বেগম সবাইকে। ওই মরিয়ম বেগমসাহেবাকে ভি দূরে হটিয়ে দাও, ফিরিঙ্গী-বাচ্ছার এক্তিয়ারের বাইরে।

—মরিয়ম বেগমসাহেবাকেও?

মেহেদী নেসার বললে—হ্যাঁ জনাব, হ্যাঁ, মরিয়ম বেগমসাহেবা কি সোজা চিজ নাকি? ওই-ই তো সফিউল্লা সাহেবকে খুন করেছিল, ইয়াদ নেই?

মনে পড়লো মীরন সাহেবের।

—ওই মরিয়ম বেগমসাহেবাই তো কলকাতার পেরিন সাহেবের বাগানে গিয়ে ক্লাইভ সাহেবের দফ্তর থেকে উমিচাঁদ সাহেবের চিঠি চুরি করে নবাব মীর্জা মহম্মদকে দেখিয়েছিল—ওকে আগে হটাও—

মীরনের কানে সব কথা যাচ্ছিল এতক্ষণ, কিন্তু তবু যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না। বললে—তুমি ঠিক জানো ভাইসাহেব, মরিয়ম বেগমসাহেবা মতিঝিলে আছে?

আরে হ্যাঁ জনাব, হ্যাঁ, আমি জানি না? আমি নিজে মরিয়ম বেগমসাহেবাকে কয়েদ করে রেখেছি। আমি জানবো না তো কে জানবে!

—কী জানি, এত বেগম এত বাঁদী, কে হিসেব রাখে ভাইসাহেব, কার ঘাড়ে ক'টা মাথা আছে বলো?

তারপর একটু থেমে বললে—চলো না, মতিঝিলে যাই, বেগমসাহেবাদের নিয়ে সবাইকে জাহাঙ্গীরাবাদে পাঠিয়ে দিই। লেকেন্, যা করতে হবে, আভি করতে হবে—

মেহেদী নেসার কী যেন ভাবলে। ডিহিদার রেজা আলিরও খুব আগ্রহ। দুজনেই দুজনের দিকে চাইলে। মীরন সাহেবেরও অনেক কাজ। ওদিকে নবাব আসছে চক্-বাজারের রাস্তা দিয়ে জলুস্ করে। তারও একটা হিল্লে করতে হবে! কিন্তু তার আগে বেগমসাহেবাদেরও একটা কিছু ব্যবস্থা করতেই হবে।

শুধু তাদের কয়েদ করলেই হবে না। একেবারে পদ্মা পার করে জাহাঙ্গীরাবাদে পাঠিয়ে দিলেই নিশ্চিন্ত। নানীবেগমসাহেবা, ঘসেটি বেগমসাহেবা, সকলের সব আশা নির্মূল করে দিতে হবে। যাতে আর কখনো কেউ মুর্শিদাবাদের মসনদের ওপর হাত বাড়াতে না পারে।

তারপর তিনজনেই মনসুরগঞ্জ থেকে বেরোল। বড় শক্ত কাজ। শুধু জাহাঙ্গীরাবাদে পাঠালেই হলো না। নৌকোর ব্যবস্থা করতে হবে, বজরার ব্যবস্থা করতে হবে। সব বেগমসাহেবাদের ভুলিয়ে-ভালিয়ে পটিয়ে-পাটিয়ে পাঠাতে হবে।

—চলো, জনাব, তাই চলো। ও রোগের জড় না রাখাই ভালো।

মুর্শিদাবাদের ইতিহাসে সে একদিন গেছে বটে। সে এক মহা দুর্দিন। হাটে দোকানীরা আসেনি। দোকান-পাট বন্ধ করে রাস্তায় তামাশা দেখতে বেরিয়েছে। তামাশাই বটে। রাষ্ট্র নিয়ে তামাশা, জীবন-মৃত্যু নিয়ে তামাশা। একদিন সামান্য একটা ছোট্ট স্ফুলিঙ্গ কেমন করে কোন্ ফাঁকে উড়ে এসে পড়েছিল মুর্শিদাবাদের নবাবী মসনদে, আর সেইটুকুই সেদিন সকলের অজ্ঞাতে হঠাৎ দাউ দাউ করে সারা শহরে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল।

মীরন সাহেব সব ব্যবস্থাই করে রেখেছিল। কোথায় নবাব মীর্জা মহম্মদকে এনে রাখা হবে, কোথায় তার বেগম-বাঁদীদের রাখা হবে তারও ব্যবস্থা আগে থেকে করে রেখেছিল মীরন সাহেব। ভারি পাকা লোক মীরজাফর আলি সাহেবের ছেলে। অনেকদিন পরে সুযোগ এসেছে এমন। এমন সুযোগ দৈবাৎ কখনো আসে আল্লার দোয়ায়। আল্লা সুযোগ দেয়, কিন্তু বুদ্ধিমানেরা সে-সুযোগের সদ্ব্যবহার করে। যে সদ্ব্যবহার করে সেই-ই পুরুষ-সিংহ। চুপ করে ঘরে বসে থাকলে কেউ তোমার মুখে ভাত তুলে দেবে না।

এতদিন পরে সেই সুযোগই এসেছে।

বিকেল বেলা দরবার বসবে চেহেল্-সুতুনে। সেখানে মুর্শিদাবাদের আমীর-ওমরাওরা সব আসবে। লোক পাঠিয়ে সব খবর দেওয়া হয়ে গেছে। ক্লাইভ সাহেব তৈরি হয়েই ছিল। অনেকবার মীরজাফর সাহেবের কাছে লোক গেছে খবরটা আনতে। শেষকালে আর থাকতে পারলে না। আবার লোক পাঠালে। সেবার মীরজাফর সাহেব নিজে এসে হাজির।

—আমি ছেলেকে পাঠিয়েছি হুজুর, ছেলে ফিরে আসেনি!

ক্লাইভ বললে—সেই মরিয়ম বেগমসাহেবার কী হলো?

মীরজাফর বললে—তার ব্যবস্থা করতে বলেছি—

—কী ব্যবস্থা?

—বলেছি তাকে ছাড়িয়ে এনে আপনার কাছে হাজির করতে।

ক্লাইভ বললে—হ্যাঁ, তাকে আমার কাছে এনে হাজির করা চাই—

শেষকালে অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করে-করেও যখন মরিয়ম বেগমসাহেবার কোনো খবর এল না তখন আর অপেক্ষা করা চললো না। ক্লাইভের মনে হলো নিশ্চয় এদের কোনো মতলব আছে। শুধু মতলবও নয়, একটা কিছু ষড়যন্ত্রও হয়তো চলছে তার বিরুদ্ধে। মেজর কিল্‌প্যাট্রিক এসেছিল একবার। তাকেও জিজ্ঞেস করলে— কী রকম হাল-চাল বুঝছো কিল্‌প্যাট্রিক?

কিল্‌প্যাট্রিক বললে—আমি কিছু বুঝতে পারছি না—

—তাহলে যদি তেমন বোঝ তুমি তৈরি হয়ে থাকো। দরকার হলে আমাদের আর্মিকেও রেডি রাখতে হবে। মীরজাফরকে বিশ্বাস নেই। ওর ছেলেটা আরো শয়তান, সে মনে করে আমরা বুঝি ওদের কাণ্ট্রিতে ট্রেসপাস করেছি, ওদের থ্রোন্ কেড়ে নিতে এসেছি—

—কিন্তু অতটা সাহস কী হবে ওদের?

ক্লাইভ জিজ্ঞেস করলে—চেহেল্-সুতুনের হারেমের মালখানার চাবিটা কোথায়? মীরন তোমায় দিয়েছে?

কিল্‌প্যাট্রিক বললে—হ্যাঁ, এই যে—

চাবিটা নিজের কাছে রেখে দিলে ক্লাইভ। তারপর বললে—দেখ, এখন কাউকেই বিশ্বাস নেই। সবাই জেনে গেছে যে, মঁসিয়ে ল' আর্মি নিয়ে রাজমহল পর্যন্ত এসেছিল, তারপর যখন শুনলে যে, নবাব অ্যারেস্টেড্ হয়ে গেছে, তখন আবার ফিরে গেছে। উমিচাঁদ কোথায়?

কিল্‌প্যাট্রিক বললে—আমার কাছে এসেছিল, টাকা চাইছিল—

—বেশি আমল দিও না ওকে। লোকটা স্কাউণ্ড্রেল। আমি ঘর থেকে বার করে দিয়েছি। তোমার স্পাইদের বলে দাও যেন জগৎশেঠ, ইয়ার লুৎফ খাঁ, আর দুর্লভরামের বাড়ির সামনে নজর রাখে—

কিল্‌প্যাট্রিক চলে যাচ্ছিল। ক্লাইভ আবার ডাকলে। বললে—মুন্সী আসছে না কেন? মুন্সী কোথায় গেল একবার টাউনে খোঁজ নিতে লোক পাঠাও তো? তাকে একটা কাজে পাঠিয়েছি—

হঠাৎ বাইরে মুন্সীর গলা শোনা গেল। মুন্সী এসেছে। একগাল হাসিমুখে।

—কী হলো? তোমার কথাই এই মাত্র বলছিলাম।

মুন্সী বললে—আমার কথা ভাবছিলেন? তাহলে অনেক দিন বাঁচবো হুজুর। পাগলটাকে অনেক কষ্টে খুঁজে বার করেছি—

বলে বাইরের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললে—এসো হে—

উদ্ধব দাস ঢুকলো। ক্লাইভ বললে—কী হলো পোয়েট, তোমাকে খবর পাঠালাম, তুমি আসবে বললে, তবু যে এলে না?

উদ্ধব দাস বললে—আজ্ঞে আপনার বাড়ির প্রহরীরা যে ঢুকতে দেয় না—। আপনাদের কাছে আসা বড় ল্যাঠা হুজুর, আমার হরির সঙ্গে দেখা করতে গেলে এত ঝামেলা নেই, হরির দেউড়িতে দারোয়ান থাকে না—

ক্লাইভ সে-কথায় কান না দিয়ে নবকৃষ্ণের দিকে চেয়ে বললে—তুমি এখন একটু বাইরে যাও তো, পোয়েটের সঙ্গে আমার একটা প্রাইভেট কথা আছে—

মুন্সী বাইরে যেতেই ক্লাইভ হেসে বললে—আচ্ছা পোয়েট, তুমি তোমার ওয়াইফের সঙ্গে দেখা করবে? তোমার বউ?

—আমার বউ?

—হ্যাঁ, মরালীবালা দাসী! সে এখন এখানে আছে—

উদ্ধব দাস হাসলো। বললে—এখানেই থাকুক আর যেখানেই থাকুক, সে কি আমার সঙ্গে দেখা করবে হুজুর? আমাকে তো সে দেখতে পারে না প্রভু।

—সে দেখতে পারুক আর না-পারুক, আমি তার সঙ্গে তোমার দেখা করিয়ে দেবো পোয়েট।

উদ্ধব দাস বললে—তাতে আপনার কী লাভ প্রভু?

—লাভ? পোয়েট, লাভ-লোকসান জানি না, কিন্তু তোমাকে আমার এত ভালো লাগে কেন জানো? তোমাতে-আমাতে একটা মিল আছে!

—সে কী বলছেন প্রভু? আমি তো একজন বাউন্ডুলে মানুষ।

ক্লাইভ বললে—তা হোক, এই তুমি যেমন ভালোবাসা না পেয়ে পোয়েট হয়েছো, আমি তেমনি সকলের ঘৃণা পেয়ে পেয়ে সোল্‌জার হয়েছি। আসলে তুমি আমি এক। আমার ইচ্ছে তুমি এবার একটু ভালবাসা পাও—

—তাতেই বা আপনার কী লাভ?

—লাভ আছে বই কি পোয়েট। তোমার ওয়াইফের সঙ্গে যেমন তোমার দেখা হয় না, আমার ওয়াইফের সঙ্গেও আমার অনেকদিন দেখা হয় না। তুমি যদি তোমার ওয়াইফের ভালোবাসা পাও তাহলে আমি আমার ওয়াইফকে চিঠি লিখবো। লিখবো, ইণ্ডিয়াতে এসেও আমি আমার ওয়াইফকে কাছে পেয়েছি—

উদ্ধব দাস বললে—কিন্তু তাহলে ছড়া লিখবো কী করে? কাব্য লিখবো কী করে?

—তা তোমার পোয়েট্রিই তোমার কাছে বড় হলো?

—তা আপনার কাছে এই যুদ্ধও কি বড় হয়নি? কেন এ-দেশে লড়াই করতে এসেছেন প্রভু?

হঠাৎ অর্ডার্লি এসে খবর দিলে, একজন জমিদার দেখা করতে চান সাহেবের সঙ্গে।

—কে? তার নাম কী?

অর্ডার্লি বললে—হাতিয়াগড়ের রাজা, হিরণ্যনারায়ণ রায়।

—আচ্ছা, ভেতরে নিয়ে এস।

ছোটমশাই ঘরে ঢুকলো। দেখলে সেই পাগলটা বসে আছে। প্রথমে তার সামনে কথা বলতে একটু দ্বিধা হলো। কিন্তু ক্লাইভ সাহেব অভয় দিলে। বললে—আপনাকে আমি আগে একবার দেখেছি—

ছোটমশাই বললে—একবার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে আপনার কাছে গিয়েছিলাম। তখন আপনাকে আমার স্ত্রীর কথা একবার বলেছিলাম মনে আছে নিশ্চয়ই—

—আছে, বলুন?

—এখন জগৎশেঠজীর কাছে গিয়েছিলাম, তিনি আপনার কাছে আমাকে পাঠালেন। শুনছি, আজকের দরবারে যত বেগম আছে সকলকে আপনার কাছে নজরানা দেওয়া হবে।

—কিন্তু আমি তো কিছু শুনিনি। কেন, নজরানা দেওয়া হবে কেন?

ছোটমশাই বললে—সেইটেই নবাবী কানুন, কিন্তু মতিঝিলে যে-সব বেগমসাহেবারা আছেন তার মধ্যে আমার সহধর্মিণীও আছেন, তার নাম এখানে মরিয়ম বেগম, আপনি তাকে উদ্ধার করে দিন—

—কিন্তু আপনি ঠিক জানেন যে, মরিয়ম বেগম আপনার ওয়াইফ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ সাহেব, আমি খুব ভালো রকম জানি!

—আপনি আপনার ওয়াইফকে চিনতে পারবেন তো?

—নিশ্চয় চিনতে পারবো। আমি নিজের সহধর্মিণীকে চিনতে পারবো

না? আজ এত মাস ধরে আমি তার জন্যে ঘুরে বেড়াচ্ছি চারদিকে—

ক্লাইভ কিল্‌প্যাট্রিককে ডাকলে। ডেকে বললে—এ'কে মীরজাফর সাহেবের কাছে নিয়ে যাও, নিয়ে গিয়ে বলো মতিঝিলে এর ওয়াইফ আছে, তার নাম মরিয়ম বেগম, এর হাতে যেন তাকে তুলে দেয়, বলো এটা আমার হুকুম—

ছোটমশাইকে নিয়ে মেজর কিল্‌প্যাট্রিক বাইরে চলে গেল।

চেহেল্‌-সুতুন আবার বহুদিন পরে সাজানো-গোছানো হচ্ছে। সন্ধ্যে বেলা দরবার বসবে। মুর্শিদাবাদের তাবৎ আমীর-ওমরাও আসবে দরবারে। ফিরিঙ্গী-কোম্পানীর ক্লাইভ সাহেব এসে ওই মসনদে বসবে। জগৎশেঠজী আসবে, ইয়ার লুৎফ খাঁ আসবে, রাজা দুর্লভরাম আসবে, মীরজাফর সাহেব আসবে, মীরন সাহেব আসবে, মেহেদী নেসার, মনসুর আলি মোহরার আসবে, মীর দাউদ, রেজা আলি ডিহিদার, মীরকাশিম সাহেব আসবে।

ইন্‌সাফ মিঞা আবার নহবত নিয়ে বসেছে।

ছোটে সাগ্‌রেদ বললে—ওস্তাদজী, কোন্ রাগ বাজাবে?

ইন্‌সাফ মিঞার যেন আর নহবত বাজাবার মেজাজ নেই। আর যেন নহবতে ফুঁ দিতে ইচ্ছে করছে না। বললে—কী বাজাবো?

ছোটে সাগ্‌রেদ বললে—আলীবর্দী সাহেব যেবার মসনদে বসেছিল, সেবার যেটা বাজিয়েছিলে, সেই রাগটা বাজাও—

ওদিকে মতিঝিলের পেছন দিকে গঙ্গা যেখানে বেঁকে গেছে সেইখানে ছ'টা বজরা সার সার দাঁড়িয়েছিল। মতিঝিলের খিড়কীর ফটক দিয়ে বোরখা-পরা এক-একটা মূর্তি বেরিয়ে এল খোলা আকাশের নিচে। তর তর করে বয়ে চলেছে গঙ্গার স্রোত। স্রোতের টানে ছলাৎ-ছলাৎ করে জল চল্‌কে উঠছে বজরাগুলোর গায়ে লেগে। এক-একজন বেগম এক-একটা বজরায় গিয়ে উঠলো।

পাশে দাঁড়িয়ে ছিল মীরন সাহেবের লোক। আর খানিক দূরে তদারক করছিল মীরন সাহেব নিজে। মনে মনে হিসেব ঠিক রাখছিল।

—নানীবেগম!

—ঘসেটি বেগম!

—আমিনা বেগম!

—ময়মানা বেগম!

—লুৎফুন্নিসা বেগম!

সকলের শেষে আর এক জোড়া আড়ষ্ট পা দেখা গেল। মীরন ভালো করে লক্ষ্য করে দেখলে—হ্যাঁ, যার ওপর ফিরিঙ্গী-বাচ্চা ক্লাইভের এত নেক-নজর, সেই মরিয়ম বেগম। সেই মরিয়ম বেগমও জাহাঙ্গীরাবাদে চলে গেল।

মুর্শিদাবাদের সেই দিনটা, সেই তারিখটা, সেই তিথিটা, সে বড় ভয়ঙ্কর। যারা একদিন সূর্যের মুখ দেখলে আইন-ভঙ্গ হতো, যারা চেহেল্‌-সুতুনের অন্ধকার ভুল-ভুলাইয়ার ধাঁধায় নবাবের সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে গিয়ে ইচ্ছে করে

হারিয়ে যেত, তারাই আবার সেদিন প্রখর সূর্যের আলোর তলায় চিরকালের মত আইন ভাঙলো, চিরকালের মত উদ্ধব দাসের তুলোট কাগজের পুঁথির পাতায় হারিয়ে গেল।

তাই মনে হয় উদ্ধব দাস বুঝি সবই দেখেছে। যা নিজের চোখে দেখেনি তাও দেখেছে, যা মেরী বিশ্বাসের কাছ থেকে শুনেছে তাও দেখেছে। তার দেখা আর শোনার ব্যবধান ঘুচিয়ে সে এক মহাকাব্য লিখে গিয়েছে।

সত্যিই হারিয়ে গেল তারা—সেই সেদিনকার মুর্শিদাবাদের মানুষগুলো। হারিয়ে গিয়ে 'বেগম মেরী বিশ্বাসে'র পাতায় পুঁথি হয়ে রইলো। কোথায়ই বা রইলো সেই চেহেল্-সুতুন, যেখানে কর্ণেল ক্লাইভ মীরজাফরের হাত থেকে এক-একটা করে এগারোটা বেগম নজরানা নিলে। কোথায় রইলো সেই মনসুর-গঞ্জ, সেই নিমক-হারামের দেউড়ি, যেখানে ক্লাইভ সাহেব তার সেপাই-ব নিয়ে সেদিন এসে উঠেছিল!

ক্লাইভ সাহেব বলেছিল—চলো, তোমার বউ-এর সঙ্গে তোমার দেখা করিয়ে দিই পোয়েট!

উদ্ধব দাস ব কিন্তু প্রভু, বউ যদি আমার সঙ্গে সেবারের মত দেখা না করে?

—কিন্তু তুমি কী দোষ করেছো বলো তো পোয়েট?

উদ্ধব দাস বলেছিল—দোষগুণ তো মনের ভুল প্রভু, আমার কাছে যা গুণ আপনার কাছে তো তা দোষ হতে পারে। রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের নাম শুনেছেন প্রভু?

—সে কে?

—সেও একজন কবি প্রভু, সে লিখেছে—দোষ হৈয়া গুণ হইল বিদ্যার বিদ্যায়। তাই তো বলি, দোষও কখনো কখনো গুণ হয় প্রভু, আবার গুণও কখনো কখনো দোষ হয়। মানুষের আদালত বড় বিচিত্র স্থান, কোনো নিয়মের ঠিক-ঠিকানা নেই সেখানে।

ক্লাইভ অবাক হয়ে গেল—তুমি এত কথা জানলে কী করে পোয়েট?

—হরির কাছে প্রভু, হরিই আমায় সব জানিয়ে দেয়।

—হরি? হরি কে? তোমার গড্?

—আমি যে ভক্ত হরিদাস প্রভু!

—তার মানে?

—আমি মানুষের মধ্যেই হরিকে দেখি, তাই তো আমার কোটি কোটি হরি প্রভু। আপনার মধ্যেও আমি হরিকে দেখি, আমার বউ-এর মধ্যেও আমি হরিকে দেখি। হরিকে খুঁজতে আমাকে তাই অরণ্যে যেতে হয় না প্রভু! আমার হরি লোকালয়েই থাকে—

—তা তোমার বউ যে তোমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে তাতে তোমার দুঃখ হয় না? আমার বউ যদি অমনি করে আমাকে তাড়িয়ে দিত তো আমি তো তাকে ডিভোর্স করতাম—

উদ্ধব দাস বললে—হরি যদি আমাকে ত্যাগ করে তো আমি কি হরিকে ত্যাগ করতে পারি প্রভু? আমাকে তো লোকালয়ের সবাই ত্যাগ করেছে, কিন্তু আমি কি লোকালয় ত্যাগ করতে পেরেছি? আমি তো এই লোকালয়েই ঘুরে

বেড়াই। কখনো আসি মুর্শিদাবাদে, কখনো মোল্লাহাটিতে, কখনো যাই কেষ্টনগরে, আবার কখনো হাতিয়াগড়ে—

—আচ্ছা, একটা কথা সত্যি বলবে?

—সত্য বই মিথ্যা তো বলি না কখনো প্রভু।

—তা হলে বলো তো, তোমার বউ-এর নাম কি মরালী বালা দাসী?

—হ্যাঁ প্রভু, আপনি সঠিক বলেছেন।

—কিন্তু তুমি কি জানো তোমার বউ এখন কোথায়?

—না প্রভু, আমার জানবার আগ্রহ নেই।

—তুমি কি তোমার বউকে দেখতে চাও?

—প্রভু, আমি তো কাউকে ত্যাগ করিনি, বউই আমাকে ত্যাগ করেছে।

—তা হলে তোমাকে বলি পোয়েট, তোমার বউ এখানেই আছে!

—এই মুর্শিদাবাদে?

—হ্যাঁ পোয়েট, আমার নিজের এখন সময় নেই। আমার অনেক ভাবনা মাথার ওপর, আমার নিজের শরীরও খারাপ পোয়েট। লোকে জানে আমি মস্ত বড় বীর, লোকে জানে আমি কোম্পানীর কর্নেল, কিন্তু তারা জানে না আমার মত কাওয়ার্ড আর দুটি নেই, তারা জানে না আমি ঘুমোতে ঘুমোতে ভয় পেয়ে জেগে উঠি—

উদ্ধব দাস বললে— কেন প্রভু, আপনার ভয় কীসের?

—সাক্‌সেসের ভয়, পোয়েট। এই অল্প ক'মাসের মধ্যে তিনটে দেশ জয় করেছি, এ কি সামান্য কথা পোয়েট? ক'জন কর্নেল এ করতে পেরেছে? আজ মীরজাফর সাহেব, মীরন সাহেব, জগৎশেঠজী, সবাই আমাকে এসে ফ্ল্যাটারি করছে, যেন ওদের চেয়ে আমি অনেক বড়। অথচ পোয়েট, আমি নিজে জানি আমি তোমার মত গরীব, তোমার মত সাধারণ; ওরা জানে না, যে এতগুলো দেশ জয় করলে, সে আমি নই, সে আমার ভূত।

—বলছেন কী প্রভু? ভূত?

—হ্যাঁ পোয়েট, সেই ভূতটা মাঝে মাঝে আমার ঘরে ঢোকে, আমি যখন রাত্রে ঘুমোই তখন আমার ঘরে ঢোকে, আমাকে ভয় দেখায়, একটা তাস নিয়ে আমাকে দেখায়, কুইন অব স্পেড্‌স, যাকে তোমরা বলো ইস্কাবনের বিবি—

—ইস্কাবনের বিবি? কেন প্রভু?

—হ্যাঁ, তোমার যদি সাক্‌সেস হতো পোয়েট তো তোমাকেও সেই ভূতটা ভয় দেখাতো, তোমারও অসুখ করতো। আমার মত তোমাকেও ওষুধ খেতে হতো—

—কেন প্রভু?

—সে তুমি বুঝবে না পোয়েট! যার সাক্‌সেস হয় তার ঘুম হয় না, তাকে ওষুধ খেতে হয়। তোমার বউ একদিন দেখেছে, একদিন আমাকে ওষুধ খাইয়েছে নিজের হাতে। সেই ওষুধ একটু বেশি মাত্রায় দিয়ে আমাকে সে মেরে ফেলতে পারতো, কিন্তু তা সে করেনি! সেই জন্যেই তাকে আমি আমার কাছে রেখেছি, আর সেই জন্যেই আমি তোমাকে আমার কাছে ডেকে পাঠিয়েছি—

উদ্ধব দাস চুপ করে বসে সব শুনছিল। বললে—তা আমাকে কী করতে হবে প্রভু?

—তুমি আমার সঙ্গে চলো। আমি তোমাকে তোমার বউ-এর কাছে নিয়ে যাবো। আজকেই এখানে সব ফয়সালা হয়ে যাক। মুর্শিদাবাদের মসনদেরও ফয়সালা হবে—

উদ্ধব দাস বললে—আমার কী ফয়সালা প্রভু করবেন?

—তোমার বউ-এর সঙ্গে তোমার মিল করিয়ে দেবো!

উদ্ধব দাস হেসে উঠলো—আপনি পারবেন?

—আমি কী না পেরেছি পোয়েট? আমি যেমন ভাঙতে পারি, তেমনি আবার যে জোড়া লাগাতেও পারি। এইটেই ইতিহাসে লেখা থাকুক। বহুদিন পরে যখন এই মুর্শিদাবাদ নিয়ে ইতিহাস লেখা হবে, তখন অন্তত লোকে জানবে, আমি শুধু ভিলেন ছিলাম না, জানবে আমি একজন মানুষও ছিলাম। আমারও দুঃখ-কষ্ট, ব্যথা, ভয় সবই ছিল—আমিও আর সকলের মত হেসেছি, কেঁদেছি, ভালবেসেছি, ঘৃণা করেছি, ভয় পেয়েছি, ভয় পেয়েও বুক উঁচু করে আবার সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছি—

হঠাৎ দরজায় আওয়াজ হতেই ক্লাইভ চিৎকার করে উঠলো—কে?

—আমি হুজুর, আমি, হুজুরের শ্রীচরণের দাস, মুন্সী নবকৃষ্ণ—

—এখন নয় মুন্সী, তুমি পরে দেখা ক'রো।

উদ্ধব দাস বললে—ও লোকটা কে প্রভু? মাথায় মস্ত বড় টিকি রেখেছে—

ক্লাইভ বললে—ও আর ওই উমিচাঁদ, ওরা সবাই টাকার দাস পোয়েট। ওরা আলাদা জাত, ওদের কাছে টাকাটাই সব, টাকার জন্যে ওরা আমার পেছনে পেছনে ঘোরে। সব সময় ওদের কাছে থাকতে ভালো লাগে না, সেই জন্যেই তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছি, তুমি চলো—তোমার বউ-এর সঙ্গে তোমার দেখা করিয়ে দিয়ে আসি—

বলে ক্লাইভ উঠলো। পোয়েটও উঠলো সঙ্গে সঙ্গে।

মরালী যেদিন ময়দাপুর থেকে নৌকোয় করে বেরিয়েছিল সেদিন স্বপ্নেও ভাবেনি যে, আবার তাকে সেই দুর্দিনের লগ্নে মুর্শিদাবাদেই ফিরে আসতে হবে; স্বপ্নেও ভাবেনি যে, আবার ছোট বউরানীর সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে, কিংবা নবাব মীর্জা মহম্মদের সঙ্গে অমন করে দেখা হয়ে যাবে।

নবাব মীর্জা মহম্মদ শুধু একবার চাইলে মরালীর দিকে। কিন্তু মুখ দিয়ে কিছু কথা বেরোল না।

মরালী নবাবকে দেখেই বললে—এ কী আলি জাঁহা, এ কী হলো?

লুৎফুন্নিসা বেগম নবাবের পায়ের ওপর মাথা দিয়ে শুয়ে পড়েছিল। বাঁদীটা একটু দূরে বসে আছে, তার কোলে লুৎফা বেগমের মেয়েটা ঘুমোচ্ছে।

মরালীকে দেখেই লুৎফা একটু নড়ে উঠলো।

মরালী আবার বললে—এমন করে আপনার সঙ্গে দেখা হবে তা তো ভাবিনি আলি জাঁহা, আর এই অবস্থায়!

মীর্জা মহম্মদ সে কথার উত্তর না দিয়ে শুধু বললে—তোমাকেও এরা

ধরেছে মরিয়ম বেগমসাহেবা? তুমি কী দোষ করেছিলে?

—আমার কথা ছেড়ে দিন আলি জাঁহা, কিন্তু আপনিই বা কী দোষ করেছিলেন?

মীর্জা মহম্মদ বললে—আমার কথা বলছো? আমি কী দোষ করিনি তাই বলো আগে!

মরালী বললে—আমি কিন্তু কিছুই বুঝতে পারছি না আলি জাঁহা, আমি নিজে সাক্ষী আছি, আপনি কারোর কোনো ক্ষতি করেননি তো—

—না মরিয়ম বেগমসাহেবা, আমি অনেক অপরাধ করেছি। সব তো তুমি জানো না!

—কিন্তু এমন কী অপরাধ করেছেন যার জন্যে আপনার এই শাস্তি?

মীর্জা মহম্মদ বললে—আমি যে সংসারে জন্মিয়েই মহা অপরাধ করেছি বেগমসাহেবা। নবাব যেদিন ফৌজদার হয়েছে সেদিন জন্মিয়েই যে আমি অপরাধ করেছি। নবাব যে মুর্শিদাবাদের মসনদ্ দিয়েই আমাকে অপরাধী করে গেছে—

—কিন্তু এখন কী করবেন আলি জাঁহা?

মীর্জা মহম্মদ বললে—তুমি নিজের কথা ভাবো মরিয়ম বেগমসাহেবা। আমি শুধু ভিলেন ছিলাম না, জানবে, আমি একজন মানুষও ছিলাম। আমারও যাবো। ভেবেছিলাম তো অনেক কিছুই বেগমসাহেবা। ভেবেছিলাম, ল' সাহেব আজিমাবাদ থেকে ফৌজ নিয়ে এসে আমার সঙ্গে যোগ দেবে, তারপর নতুন করে একবার শেষ চেষ্টা করে দেখবো, কিন্তু সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল আমার বেগমসাহেবা, এখন দেখছো তো আমার এই দুটো হাত বাঁধা -

মরালী বললে—কিন্তু আপনাকে ওরা চিনতে পারলে কী করে?

—সে কথা আর এখন ভেবে কী হবে বলো?

—কিন্তু এখন কি আর ছাড়া পাবার কোনো উপায় নেই?

মীর্জা মহম্মদ বললে—আমার জন্যে তোমাদের সকলের দুর্ভোগ, আমি কেবল সেই কথা ভাবছি বেগমসাহেবা!

—শুধু আমি একলা নই আলি জাঁহা, আমার সঙ্গে হাতিয়াগড়ের আসল ছোট বউরানীও ধরা পড়েছে—

—তার মানে?

মীর্জা মহম্মদ যেন চমকে উঠলো—তার মানে? তুমি তা হলে হাতিয়াগড়ের আসল ছোট রানীবিবি নও?

—না।

—তা হলে তুমি কে?

—আমি তার বদ্‌লা! আমি হাতিয়াগড়ের রাজবাড়ির নফরের মেয়ে। তাকে বাঁচাবার জন্যেই আমি তার বদ্‌লা হয়ে এসেছিলাম চেহেল্-সুতুনে। আমার আসল রূপটা কেউ জানতো না চেহেল্-সুতুনে। ভেবেছিলাম, তাকে আমি নবাবের ইয়ার-বক্সীদের অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচাতে পেরেছি, কিন্তু আজ দেখলুম তা পারিনি। আজ দেখলুম, আমার বদ্‌লা হওয়া মিথ্যে হয়ে গেছে—

মীর্জা মহম্মদ খানিকক্ষণ চুপ করে রইলো। ইতিহাসের এক মহা-সন্ধিক্ষণে সে যেন মহা-সমস্যায় পড়েছে। এতগুলো মানুষ, এত বড় মুলুক, সকলের যেন সর্বনাশ ঘনিয়ে এসেছে তার নিজের সর্বনাশের সঙ্গে সঙ্গে।

একটু পরে বললে—কিন্তু কেন যে আমি মসনদ মসনদ ক'রে এত পাগল হয়েছিলুম কে জানে; কিন্তু তখন কি জানতুম, এই মসনদে এত জ্বালা?

তারপর হঠাৎ মরিয়ম বেগমসাহেবার দিকে চেয়ে বললে—তুমি আমার একটা অনুরোধ রাখবে বেগমসাহেবা? তোমার ওই দুটো হাত দিয়ে আমার এই গলাটা টিপে ধরতে পারবে? এমনভাবে টিপে ধরবে যাতে আমার দম্ আটকে আসে, যাতে আমি আর নিঃশ্বাস ফেলতে না পারি?

—মরালী বললে—ছি আলি জাঁহা, আপনি না মুর্শিদাবাদের নবাব?

মীর্জা মহম্মদ বললে—তুমি আর আমাকে লজ্জা দিও না বেগমসাহেবা, আমি আজ আমার ফৌজদারের কয়েদী, এতেও আমাকে লজ্জা দিতে তোমার লজ্জা হচ্ছে না?

—কিন্তু তা হলে আপনার জন্যে কী করতে পারি বলুন আলি জাঁহা?

—একদিন তুমি আমাকে একজনের গান শুনিয়েছিলে, মনে আছে? সেই কবি?

—কবি? ছড়া লেখে?

মীর্জা মহম্মদ বললে—না না, ছড়া লেখে না, সেই যে গান গেয়েছিল—'মা গো আমার এই ভাবনা, আমি কোথায় ছিলাম কোথায় এলাম, কোথায় যাবো নাই ঠিকানা'—

মরালী বললে—রামপ্রসাদ সেন!

মীর্জা মহম্মদ বললে—হ্যাঁ বেগমসাহেবা, সেই তার কথাই আমার বার বার মনে পড়ছে কাল থেকে, ভাবছিলাম তার মসনদ তো কেউ কেড়ে নেয় না, তার মসনদ নিয়ে তো কই এত লড়াই মারামারি হয় না, তার মসনদের জন্যে তো তাকে হাত-কড়া বেঁধে কেউ ধরে নিয়ে যায় না—তাই তাকে একবার দেখতে ইচ্ছে হচ্ছিল, তার গান একবার শুনতে ইচ্ছে করছিল—

মরালী বললে—কিন্তু তার আর সময় নেই আলি জাঁহা, এখন অন্য কথা ভাবতে হবে। এখন কী করে আপনাকে ছাড়াতে পারি তাই ভাবছি—

—আমাকে ছাড়াতে পারবে, বেগমসাহেবা?

মরালী বললে—শুধু আপনাকে নয় আলি জাঁহা, হাতিয়াগড়ের রাণীবিবিকেও কী করে মুক্তি দেওয়া যায় তাই ভাবছি—

—কী করে ছাড়াবে? যদি ছাড়াতে পারো তো আমার এই লুৎফা আর আমার এই ছোট মেয়েটাকেও ছাড়িয়ে দাও তুমি! আমার যা হয় হোক, ওদের জন্যে আমি ভাবছি—

মরালী বললে—আমি সকলের কথাই ভাবছি আলি জাঁহা—

লুৎফা নবাবের পায়ের কাছে এতক্ষণ চুপ করে শুয়ে ছিল, এবার মুখ তুলে বললে—না আলি জাঁহা, আপনি যেখানে থাকবেন আমি সেখানেই থাকবো—

মীর্জা মহম্মদ রেগে গেল। বললে—তা আমি যদি জাহান্নমে যাই তো তুমিও জাহান্নমে যাবে?

লুৎফা উত্তর দিলে না সে কথার। নবাবের পায়ের ওপর মাথা গুঁজে আবার নিঃশব্দে কাঁদতে লাগলো।

মরালী বললে—তুমি কেঁদো না বহেন, আমি যতক্ষণ আছি, ততক্ষণ কোনো ভয় নেই—

মীর্জা মহম্মদ হাসলে। বললে—বেগমসাহেবা, তুমি ওই মীর দাউদকে চেনো না, আর ওই মীরকাশিমকেও চেনো না, তাই ওই কথা বলছো—

মরালী বললে—শয়তানকে কী করে বশে আনতে হয় তা আমি জানি আলি জাঁহা, নইলে শয়তান সফিউল্লাকে আমি খুন করতে পারি? আর যদি একটু সময় পেতাম তো ওই উমিচাঁদ আর মেহেদী নেসারকেও খুন করতুম, ওরা খুন হলে আর আজকে আপনার এই দুর্ভোগ হতো না—

তারপর একটু থেমে বললে—তা হলে আমি এখন আসি আলি জাঁহা, দেখি কী করে হারামজাদাদের খুন করতে পারি—

—সত্যিই তুমি ওদের খুন করতে পারবে বেগমসাহেবা? সত্যিই তুমি পারবে? আর যদি তা না পারো তো ওদের গিয়ে একটু বুঝিয়ে ব'লো, জীবনে কখনো আমি কারো পথে আর বাধা হয়ে দাঁড়াবো না। যদি পারে আমাকে যেন এক ফালি জমি দেয়, আমি সেখানেই শেষ জীবনটা শান্তিতে কাটাবো, আর কখনো কারো শান্তিতে ব্যাঘাত ঘটাতে আসবো না। শুধু এক ফালি জমি—

মনে আছে, কথা বলতে বলতে সেদিন নবাব মীর্জা মহম্মদের গলাটা বুজে এসেছিল। শুধু তো নবাব নয়, রাণীবিবির কথাও তো মনে ছিল মরালীর। যদি মুর্শিদাবাদে আসতেই হয় তো সকলের কথা ভেবেই আসতে হবে। একসঙ্গে সকলের ভালো করতেই চেয়েছিল মরালী। বাঙলা মুলুকের স্বার্থে না হোক, অন্তত চরম সর্বনাশে ঘটবার আগে কয়েকজনকে বাঁচাতে চেয়েছিল সে। সেদিন শুধু মনে হয়েছিল, এমন করে শেষ মুহূর্তে এমন সুযোগ তার হাতে আসবে কে জানতো!

মনে মনে একবার বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের দেবতাকে উদ্দেশ করে বলেছিল—আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ ক'রো ঠাকুর। একদিন সংসারের সব সাধ, সব ঐশ্বর্যের লোভ ছিল আমার। তুমি আমার সেই সব সাধে ছাই দিয়েছো। চিরকালের মত তুমি আমার মুখ পুড়িয়ে দিয়েছো ঠাকুর। সবই যখন গেছে ঠাকুর, তখন অন্তত একটা সাধ আমার মেটাও, একটা সাধ মিটিয়ে আমার মেয়েমানুষ-জন্ম সার্থক করো!

ততক্ষণে বুঝি বাইরের আকাশে চাঁদ উঠেছে। বড় নিরিবিলি রাত। এইসব রাতেই বুঝি মানুষের পাপের সাপ ফণা উঁচু করে ফোঁস ফোঁস করে। এসব রাত বড় ভয়ঙ্কর। এইসব রাত্রেই অষ্টাদশ শতাব্দীর আমীর-ওমরাওরা ষড়যন্ত্রের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে উত্থানের স্বপ্ন দেখতো। আঙুরের মদে চুমুক দিয়ে বেহেস্তের বাস্তব ছবি কল্পনা করে নিত। এইসব রাত্রেই সুন্দরী মেয়েমানুষের দরকার হতো। মেয়েমানুষের শরীরের খাঁজে খাঁজে রোমাঞ্চের খোরাক খুঁজতো।

মীর দাউদ আর মীরকাশিম। ফৌজদার আর মীর-বক্সী! বড় ক্ষোভ ছিল দু'জনের বরাবর। অবহেলার ক্ষোভ, অশ্রদ্ধার ক্ষোভ, নেক-নজরের ক্ষোভ। কাল সকাল থেকে রাজমহল থেকে বেরিয়েছে। তারপর মুর্শিদাবাদ যাবে। সেখানে নতুন নবাব মীরজাফর সাহেবের পায়ে মীর্জা মহম্মদকে ইনাম দিয়ে তারিফ পাবে। আর সেই তারিফের স্বপ্নেই সন্ধ্যে থেকে দু'জনে মদ খেতে শুরু করে দিয়েছিল।

সেপাইরা বজরার পেছন দিকে রয়েছে। আর সামনের দিকে দু'জন। মাথার ওপর চাঁদ। ভিজে ভিজে হাওয়া। মদের গরমে নদীর ভিজে হাওয়া শরীর জুড়িয়ে দিচ্ছিল। মরিয়ম বেগমসাহেবা নবাবের বজরার ভেতরে ঢোকার

সময়েই দু'জনে লক্ষ্য করে দেখেছিল। বড় তাজা, বড় খুবসুরত মনে হয়েছিল বেগমসাহেবাকে। যাক, ভেতরে যাক, নবাবের হাতে হাত-কড়া বেঁধে দেওয়া আছে। বড় মুষড়ে পড়েছে নবাব। বড় কান্নাকাটি করছে। মদের নেশায় বড় ভালো লেগেছিল নবাবের আর্জি'। হা-হা করে হেসে উঠেছিল দু'জনেই। আরে, আমরা কী করবো, আমরা তো নবাবের নৌকর, যে যখন নবাব হবে আমরা তখন তারই হুকুম তামিল করবো।

মীরকাশিম বললে—জনাব, নবাবের কী হবে?

মীর দাউদ বললে—কী আর হবে, ফাঁসি হবে—

—ফাঁসি? ফাঁসি হলে কিন্তু খুব তামাশা হবে জনাব।

বলে আবার চুমুক দিলে মদের পেয়ালায়। ফাঁসি হলে কী রকম তামাশা হবে সেইটে যেন নেশার ঘোরে কল্পনা করতে ইচ্ছে হলো মীরকাশিম সাহেবের।

হঠাৎ যেন সামনে ভূত দেখলে মীরকাশিম সাহেব। আরে, মরিয়ম সাহেবা যে সামনে এগিয়ে আসছে জনাব! বড়ি খুবসুরত আওরত্ তো—

—আইয়ে, আইয়ে বেগমসাহেবা!

মরালী দাঁতে দাঁত চেপে সামনে এগিয়ে আসতে লাগলো। হে ঈশ্বর, একদিন অনেক দুঃখে, অনেক আঘাতে এই জগৎজোড়া শ্মশানের মধ্যে আমি পাপের পঙ্‌ক্তি-ভোজে বসেছিলাম। সেদিন থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত আমি অনেক দেখলুম। অনেক ভুগলুম, অনেক সইলুম। হয়তো আরো অনেক দেখতে হবে, ভুগতে হবে, সহ্য করতে হবে। কিন্তু আজকের মত এমন সুযোগ হয়তো আর কখনো আসবে না। আজ তুমি আমার সমস্ত পাপ পবিত্র করে দাও ঠাকুর, আজ তুমি আমার সমস্ত কলঙ্ক নিশ্চিহ্ন করে দাও। আজ আমি তোমার নাম করেই শয়তানদের কাছে নিজেকে আহুতি দিই—

—আরে, বড়ি খুবসুরত মাল জনাব!

নেশার ঘোরে ফৌজদার আর মীরবক্সী তখন একাকার হয়ে গেছে। মেয়েমানুষের নাম-গন্ধই বুঝি এইরকম। সব একাকার করে দেয়।

মরালী শাড়ীটাকে আলগা করে দিয়ে শরীর থেকে আঁচলটা খসিয়ে দিলে। বললে—অনেকক্ষণ সরাব খাইনি মেহেরবান, বড় তেষ্টা পেয়েছে—একটু দেবেন বাঁদীকে?

বলে মীর দাউদ সাহেবের গা ঘেঁষে বসলো।

মীরকাশিম সাহেব সরে গিয়ে মরালীর কাছে এগিয়ে গেল। বললে—আমার দিকেও একটু নেক্-নজর দাও বিবিসাহেবা, আমি কী কসুর করেছি!

মরালী দুজনের দিকেই দুটো হাত বাড়িয়ে দিলে। বললে—তোমরা দু'জনে মদের পেয়ালা তুলে দাও জনাব, আমি দু'জনের হাত থেকেই চুমুক দেবো—

দু' দিক থেকে দু'জনে দুটো পেয়ালা নিয়ে মরালীর ঠোঁটের সামনে এগিয়ে দিয়ে খাওয়াতে চাইলে। কিন্তু দু'জনেরই তখন নেশার ঘোর। হাত কেঁপে ঠোঁটে ঠেকাতেই চল্‌কে পড়ে গেল মরালীর মুখে বুকে সারা শরীরে।

মরালী খিলখিল করে হেসে গড়িয়ে পড়লো।

—তোমরা কী যে করো জনাব, মুখ তো আমার একটা, কাকে খুশী করি?

মীরকাশিমের বয়েস কম। সে একেবারে মরালীর গায়ের ওপর এসে বসলো। বললে—আমাকে আগে আশ্‌রোফ-জাদী!

মীর দাউদই বা পেছিয়ে যাবে কেন। সেও গায়ে ঢলে পড়ে বললে—আমাকে আগে মেহ্‌বুবা—

মজা দেখে মরালী হা হা করে হাসতে লাগলো। হাসতে হাসতে গায়ের কাপড় খসে যেতে লাগলো। মরালী যত আঁচল তুলে গায়ে ঢাকা দিতে চায় তত মীর দাউদ আর মীরকাশিম সাহেব তা টেনে নামিয়ে দেয়।

—বড় আরাম হচ্ছে জনাব, বড় আরাম—

মীরকাশিম সাহেবের রক্ত তখন মাথায় চড়ে গেছে। বললে—তোমার আরাম আমি আশমানে উঠিয়ে দেবো আশ্‌রাফ-জাদী—

—তাহলে এক কাজ করো জনাব, এখানে আমার বড় লজ্জা করছে। বজরার ভেতরে নবাব রয়েছে। নবাবের জেনানা রয়েছে, ওদের হটিয়ে দাও—

নেশার যেমন মজাও আছে, তেমনি আবার একটা যন্ত্রণাও আছে। নেশার সময় সামনে সুন্দরী মেয়েমানুষ দেখতে পেলে মজার সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রণাটাও একটু যেন কমে যায়। যখন চোখে চাকরির উন্নতি জ্বলজ্বল্ করছে, তখন ফুর্তির নৌকো বাতাসে পাল তুলে দেয়। তখন মন বলে—কুছ পরোয়া নেই, সিরাজি পিলাও—

মীর দাউদ সাহেবেরও তাই হয়েছিল। পেছনে যে সেপাই-এর দল বন্দুক নিয়ে বজরা তিনটে পাহারা দিচ্ছে তাদের কথা আর মনে পড়লো না। বজরার ভেতরে যে কয়েদী নবাব রয়েছে, তার বেগম, বাঁদী, লেড়কী রয়েছে, তাদের কথাও আর মনে পড়লো না।

বললে—নবাবকে হটাও—

মীরকাশিম সাহেবও নেশার ঘোরে চেঁচিয়ে উঠলো—নবাব কো নিকালো—নিকাল দো—

মীর দাউদ বললে—এসো আশ্‌রাফ-জাদী, সিরাজী পিও—

মরালী দাঁতে দাঁত চেপে ঠোঁটে মদের পেয়ালাটা ঠেকালো। তার মনে হলো যেন একটা আগুনের ডেলা গলা দিয়ে নামতে নামতে একেবারে তলপেটে গিয়ে থামলো।

তারপর শুরু হলো লড়াই। শয়তানে-মানুষে নখে-দাঁতে সেদিন সেই রাত্রির নিস্তব্ধতার আড়াল ছিঁড়েখুঁড়ে ছত্রখান হয়ে গেল। এতক্ষণ যারা আমীরের মুখোশ পরে আদব-কায়দার ওড়নায় মুখ ঢেকে কথা বলছিল, এবার তাদের ভেতরকার আসল রূপ বেরিয়ে পড়লো। নখের আঁচড়ে আর দাঁতের কামড়ে মরালীর শরীরের নরম মাংসগুলো চিরকালের মত দাগী হয়ে গেল।

মরালী একবার মুখ তুলে বলতে চেষ্টা করলে—জনাব, তা হলে আমার নবাবকে তোমরা ছেড়ে দাও—আমাদের রাণীবিবিকে ছেড়ে দাও—

মীর দাউদ সাহেব তখন জানোয়ারের মত কামড়ে ধরেছে মরালীকে। কথা বলবার আর উপায় নেই তার।

মরালী মীরকাশিম সাহেবের দিকে চেয়ে বলতে লাগলো—তোমরা যে বললে আমি তোমাদের সঙ্গে শুলে নবাবকে ছেড়ে দেবে, আমার রাণীবিবিকে ছেড়ে দেবে?

মীরকাশিম সাহেব তখন লড়াই-এর জন্যে তৈরি করছে নিজেকে। আরো এক ঢোঁক মদ খেয়ে বললে—হ্যাঁ হ্যাঁ মেহ্‌বুবা, ছেড়ে দেবো, কিন্তু তার আগে...

মরালী এবার কাঁদতে লাগলো। বললে—কিন্তু কখন ছাড়বে? এখনি যে

মুর্শিদাবাদ এসে যাবে—আর যে সময় নেই!

—চিল্লাও মাত্ আশ্‌রাফ-জাদী!

মানুষের ঈশ্বর বুঝি মানুষের দুর্যোগের দিনে মাঝে মাঝে এমনি করেই মুখ ফিরিয়ে থাকে। একদিন তাঞ্জামের মধ্যে চড়ে যখন রাণীবিবি সেজে চেহেল্‌-সুতুনে এসেছিল মরালী, সেদিনও বুঝি এমন কাতর হয়ে ডাকেনি সেই মানুষের ঈশ্বরকে। সেই অভিমানে, সেই রাগেই বুঝি মুখ ফিরিয়ে রইলো মানুষের ঈশ্বর! সেদিন তোমাকে ডাকিনি বলেই কি তুমি আজ এমন বিরূপ হলে ঠাকুর! হে ভয়ঙ্কর, হে প্রলয়ঙ্কর, আমার অন্তঃকরণের সমস্ত জাগ্রত শক্তির উদ্যত চেষ্টায় আমি যে আজ পাপ ধ্বংস করবো বলে আত্মবলি দিচ্ছি। একে যদি পাপ বলো তো আমি পাপী, একে যদি কলঙ্ক বলো তো আমি কলঙ্কিনী। তোমার উদ্যত কৃপাণের আঘাতে তুমি আমাকে টুকরো টুকরো করে দাও ঠাকুর, তবু আজ আমি এতটুকু প্রতিবাদ করবো না। শুধু নবাবকে ছেড়ে দাও, আমার রাণীবিবিকে ছেড়ে দাও। আমাকে নিয়ে তুমি ওদের মুক্তি দাও। ওদের মুক্তি হলেই যে আমি পরিত্রাণ পাবো। ওদের শান্তি হলেই যে আমি মুক্তি পাবো।

—কই, ওগো আমার কথা রাখলে না তোমরা? আমাকে তোমরা ঠকালে?

দাঁত আর নখ তখন বোধ হয় কামনায় উত্তাল উদ্দাম হয়ে উঠেছে। সুখে আর তখন তাদের সুখ নেই, টাকায় আর তখন তাদের আকাঙ্ক্ষা নেই। আলস্যে আর তখন তাদের বিশ্রাম নেই। তখন শুধু ভোগ। চূড়ান্ত ভোগের উপচার নিয়ে ভূরিভোজ তখন তাদের উত্তুঙ্গ হয়ে উঠেছে। ঈশ্বর সে তো ভাঁওতা, মোল্লাদের তৈরী ধোঁকা বেহেস্ত, সে তো বে-বুদ, কোরাণের তৈরী ইন্দ্রজাল। মেয়েমানুষই তখন একমাত্র সদাকত্, মেয়েমানুষই তখন একমাত্র সাঁচাই, মেয়েমানুষই তখন তাদের একমাত্র হক্। আর সব কুছ্ ঝুটা হ্যায়।

ও নৌকোর আড়াল থেকে দুর্গা বুঝি তখন হঠাৎ অন্ধকারের মধ্যেও সব দেখতে পেলে।

বললে—ও ছোট বউরানী, দেখো দেখো, মরুনীর কাণ্ডটা একবার দেখো—

ছোট বউরানী দুর্গার কথায় রেগে গেল। বললে—কী দেখবো আবার—

দুর্গা বললে—কী ইল্লুতে কাণ্ড দেখো মুরনীর, চরিত্তিরটা একেবারে নষ্ট করে ফেলেছে গো—ছি ছি ছি—

—কী, করেছে কী?

দুর্গা বললে—আর করবে কী, বলে গেল আমাদের জন্যে বলতে যাচ্ছে, আর ওখানে গিয়ে মদ গিলে কিনা বেলেল্লাগিরি করছে মরদগুলোর সঙ্গে—

—কই, কোথায়?

দুর্গা বললে—ওই দেখো না—ওই যে—পাটাতনের ওপর ন্যাংটো হয়ে রয়েছে—

ছোট বউরানী দেখলে, দুর্গা দেখলে। দেখলে আকাশ বাতাস অন্তরীক্ষ, আর দেখলে অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ, আরো দেখলে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের সেই সন্ধিক্ষণের ইতিহাস। দেখলে আর ঘেন্নায় মুখ ফিরিয়ে নিলে। বজরার উন্মুক্ত পাটাতনের ওপর তখন অসাড় অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছে এক প্রাণলক্ষ্মী। বাঙলা বিহার উড়িষ্যার সেই প্রাণলক্ষ্মীর হাড় মাস মজ্জা সব শুষে খেয়ে নিয়েছে তখন মোগল সাম্রাজ্যের কাক-চিল আর শকুনের দল।

চি'চি' করে মরালী তখনো অস্ফুট গলায় শুধু বলতে চেষ্টা করছে—হ্যাঁ গো, তোমরা আমাকে এমন করে ঠকালে...

বজরা তিনটে তখন মুর্শিদাবাদের ঘাটের কাছে এসে পড়েছে—

মতিঝিলের ফটকের সামনে আর পাহারা দেবার লোক কেউ নেই তখন। যারা ছিল তারা আগেই পালিয়েছে। এক-এক করে সব বেগমসাহেবাদের খিড়কীর ঘাটে গিয়ে তুলে দিয়েছে বজরায়। গুনে গুনে তুলেছে সবাইকে। কেউ বাদ না যায়। যারা নবাব মীর্জা মহম্মদের আপনজন তাদের কাউকে আর রাখা হবে না মুর্শিদাবাদে। মুর্শিদাবাদের মসনদ মীরজাফর আলি সাহেবের জন্যে নিষ্কণ্টক করে রাখতে হবে। মীরন নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তার জড় তুলে ফেলেছে।

মেহেদী নেসার দাঁড়িয়ে ছিল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তার চারদিকে। রেজা আলি সাহেবও দাঁড়িয়ে দেখছে। এক-এক করে গুনে গুনে তাদের বজরায় তুলেছে।

—নানীবেগম!

—ঘসেটি বেগম!

—আমিনা বেগম!

—ময়মানা বেগম!

—লুৎফুন্নিসা বেগম!

হঠাৎ মেহেদী নেসারের খেয়াল হলো—আর, নবাবের মেয়েটা কোথায় গেল?

মীরন বললে—থাক্ থাক্, সেটা তো বাচ্চা, তাকে জাহাঙ্গীরাবাদে পাঠিয়ে ফয়দা নেই—

তারপরে সকলের শেষে আর এক জোড়া আড়ষ্ট পা দেখা গেল।

মীরন ভালো করে লক্ষ করে দেখলে। ফিরিঙ্গী-বাচ্চা ক্লাইভের এত নেক্‌নজর যার ওপর, সেই মরিয়ম বেগমসাহেবা! সফিউল্লা সাহেবকে খুন করেছিল। এ মুর্শিদাবাদে থাকলে আবার আগুন জ্বালাবে।

মীরন হুকুম দিলে—জল্‌দি কর, জল্‌দি—

বজরাগুলো তৈরী হয়েই ছিল। তারা কাছি খুলে দিলে। দাঁড়ের ঘায়ে জলের স্রোতে ছপাৎ করে শব্দ হলো। বদর-বদর—

মীরন মাঝিকে ডেকে বলে দিলে—ভগবানগোলার দিকে ধীরে ধীরে নাও বেয়ে চলো, আমি পেছনে পেছনে যাচ্ছি—

ওদিক থেকে জলুসের ভিড়ের শব্দ কানে এল। মীর দাউদ আর মীরকাশিম সাহেব নবাব মীর্জা মহম্মদকে ধরে রাস্তা দিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে আসছে। আর দেরি করা চলে না। যে বেগমরা মতিঝিলে পড়ে রইলো তাদের সকলকে নজরানা দিতে হবে ক্লাইভ সাহেবকে। তখন তারা ক্লাইভ সাহেবের সম্পত্তি!

ফটকের কাছে আসতেই সোজাসুজি মেজর কিল্‌প্যাট্রিক সাহেবের সঙ্গে দেখা।

—কী সাহেব, কী খবর?

মেজর কিল্‌প্যাট্রিক ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললে—এরই নাম হিরণ্যনারায়ণ

রায়। হাতিয়াগড়ের জমিদার। কর্নেল হুকুম দিয়েছে মরিয়ম বেগমসাহেবাকে এর হাতে তুলে দিতে হবে।

ডিহিদার রেজা আলি একবার চেয়ে দেখলে ছোটমশাই-এর দিকে। কিন্তু যেন চিনতে পারলে না।

—ক্লাইভ সাহেবের হুকুম?

—ইয়েস!

—কিন্তু ক্লাইভ সাহেব বললে তো আমি শুনবো না। মীরজাফর সাহেবের হুকুমনামা আছে?

কিল্‌প্যাট্রিক বললে—মীরজাফরই তোমার কাছে পাঠালে।

মীরন একটু মিইয়ে গেল মীরজাফর আলি সাহেবের নাম শুনে।

—কিন্তু সব বেগমদের যে আজকের দরবারে ক্লাইভ সাহেবের সামনে হাজির করা হবে। তখন ক্লাইভ সাহেব বেগমদের যার হাতে খুশি দান-খয়রাত করতে পারে—

কিল্‌প্যাট্রিক বললে—না, তার আগে মরিয়ম বেগমসাহেবাকে এই জেণ্টলম্যানের হাতে তুলে দিতে হবে, কর্নেলের অর্ডার।

অর্ডার! তবে অর্ডারই তামিল করো তুমি! যদি পারো মরিয়ম বেগমসাহেবাকে খুঁজে বার করে নাও। খুঁজে বার করে নিতে পারলে আমার আর আপত্তি নেই।

জলুসটা আরো এগিয়ে আসছে। আরো হাজার হাজার লোক জলুসের পেছন পেছন আসছে। ওদিক থেকে সোরগোল আসছে মানুষের। মুর্শিদাবাদের মানুষের আজ এক স্মরণীয় দিন। মুর্শিদাবাদের হর্তা-কর্তা-বিধাতাকে আজ হাত-কড়া বাঁধা অবস্থায় রাস্তা দিয়ে হাঁটিয়ে আনা হচ্ছে।

মতিঝিলের ভেতরে তখন এক-একটা বেগমসাহেবাকে পরীক্ষা করে দেখছে ছোটমশাই। মীরন সঙ্গে সঙ্গে চলেছে। ঘরের পর ঘর, বেগমের পর বেগম। চেহেল্‌-সুতুনের কতদিনকার পোষা বেগম সব। কেউ কম বয়েসী, কেউ মাঝ বয়েসী, কেউ বা যৌবন পেরিয়ে বুড়ী হতে চলেছে। তবু চোখে সুর্মা দিয়েছে, হাতের আঙুলের নখে মেহেদী পাতার রঙ লাগিয়েছে। বাঁকা বাঁকা চাউনি, ওড়নির ফাঁকে ফাঁকে মুচকি হাসি—

—এ কে?

—এর নাম পেশমন বেগম।

—আর এ?

—বব্বু বেগম!

—আর এ?

—গুলসন্‌ বেগম!

—আর এ?

—তক্কি বেগম!

একটার পর একটা বেগমকে মীরন দেখাচ্ছে আর ছোটমশাই বলছে—না. এ তো নয়, এ তো ছোট বউরানী নয়। তার যে অন্য রকম চেহারা। সে যে আরো অনেক সুন্দরী, আরো অনেক ভালো দেখতে। মতিঝিলে যদি না থাকে সে তো কোথায় গেল! কোথায় গেলে তাকে পাওয়া যাবে! ছোট বউরানীকে

না পাওয়া গেলে বড় বউরানীর কাছে মুখ দেখাবে কী করে!

কিল্‌প্যাট্রিক সাহেব এতক্ষণ ধরে সব বেগমদের দেখছিল। এত বেগম, এত জেনানা থাকে নবাবের! আর কী সব রূপ! এত বেগম নিয়ে নবাবরা কী করে? কার সঙ্গে কখন রাত কাটায়! বছরে তো তিন শো পঁয়ষট্টি রাত, তার মধ্যে ক'জন ক'রাত দেখতে পায় নবাবকে, ক'জন শুতে পায় নবাবের সঙ্গে।

মীরন বললে—আমার অনেক কাজ আছে সাহেব, আমি চলি; জলুস এসে গেছে। আপনাকে সব বেগমদের দেখালাম, আর বেগম নেই—

কিল্‌প্যাট্রিকের তখনো যেন বিস্ময়ের ঘোর কাটেনি। বললে—আর ওরা কারা! ওদিকে?

—ওরা সব বাঁদী, বেগমদের সঙ্গে রও নজরানা দেবো।

কিল্‌প্যাট্রিক বললে—এদের সকলকে দেবে? সব কর্নেল পাবে?

—ওই বাঁদীরা?

—বেগম দিলে বেগমদের নইলে বেগমদের তরিবত করবে কে?

তারপর মীরন আর দাঁড়ালো না। বললে—এবার আপনারা যা খুশি করুন সাহেব, আমার আর সময় নেই। আমি চলি, জলুস এসে গেছে, আমার এখন অনেক কাজ—

ডিহিদার রেজা আলি, মেহেদী নেসার, তারাও মীরন সাহেবের পেছন পেছন চলে গেল।

ওদিকে মনসুরগদির মধ্যে তখন বাঙলা মুলুকের ভাগ্যলিপি তৈরি হতে চলেছে। শুধু বাঙলা মুলুকই বা কেন, সমস্ত হিন্দুস্থানের ভাগ্যলিপি। মুর্শিদাবাদের গঙ্গার ঘাটে যখন বজরাগুলো এসে লাগলো তখনো মরালী নির্বাক নিশ্চল! তার খেয়ালই নেই কখন নৌকো এসে ঘাটে ভিড়েছে, কখন হাজার হাজার লোক তাদের নবাবকে দেখতে এসে ভিড় করেছে।

তখনো চিঁচিঁ করে সে কোনো রকমে বলতে চেষ্টা করছে—হ্যাঁ গো, তোমরা আমাকে ঠকালে?

কিন্তু মাঝি-মাল্লা-সেপাই-বরকন্দাজ সকলের হট্টগোলে তখন সে আর্জি কার কানেই বা পৌঁছোবে? ইতিহাসের বইতে তো মরিয়ম বেগমসাহেবার নামই নেই। উদ্ধব দাস এই 'বেগম মেরী বিশ্বাস' কাব্য না লিখলে আমিও তো তার নাম জানতে পারতাম না। গাঁয়ের একটা নগণ্য মেয়ে, দিল্লী থেকে নাচতে আসেনি, নেচে গেয়ে চৌষট্টি কলার আকর্ষণ দেখিয়ে কাউকে হাতের মুঠোয় পুরে নবাবের পেয়ারের বেগমসাহেবা হয়নি। মরিয়ম বেগমসাহেবার উৎপত্তি বড় মামুলি। তাই হয়তো রিয়াজ-উস্‌-সালাতিন-এর মুতাক্ষরীণে তার উল্লেখ নেই, গোলাম হোসেনের রোজ-নামচাতেও তার কোনো হদিস নেই। তারিখ-ই-বাঙলার পুঁথি খুঁজেও মরিয়ম বেগমসাহেবার কোনো নামোল্লেখ পাইনি।

এমন কি জর্জ ফরেস্ট, সি-আই-ই, যিনি ক্লাইভ সাহেবের অত বড় দু

ভল্ট্যেমের জীবনী লিখে গেছেন, তারও পাতাগুলো তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি। তারপর এই সেদিন, ১৯৬৩ সালে ছাপা মাইকেল এড্ওয়ার্ডস্-এর লেখা বই—'ব্যাটল্ অব্ প্ল্যাসী', তার মধ্যেও মরিয়ম বেগমসাহেবার নাম-গন্ধ খুঁজে পেলুম না। তার কারণ মরালী হারিয়ে গিয়েছিল ইতিহাস থেকে। ইতিহাসে এমন অনেক হারিয়ে যাওয়ার ইতিহাস আছে। তারা আড়ালে থাকে, আড়ালে থেকে তারা ইতিহাস তৈরি করে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারাই আড়ালে পড়ে যায়, তারাই অদৃশ্য হয়ে যায় চিরকালের মত।

সেদিন মরিয়ম বেগমসাহেবারও তাই হয়েছিল।

মুর্শিদাবাদের গঙ্গার ঘাটে যখন সবাই নবাবের চরম দুর্দশা দেখতে ব্যস্ত, তখন অন্য বেগম-বাঁদীদের মধ্যে মরালীর ঘোমটা-ঢাকা মুখটা কেউই দেখতে পায়নি। দেখতে চায়ও নি। ময়দাপুরের ক্লাইভ সাহেবের কিনে দেওয়া সেই আড়ঙ্-ধোয়া তাঁতের শাড়িটা পরে সেও দলের সঙ্গে ঘাটে নেমেছিল। সমস্ত শরীর তার তখন টলছে। ব্যথা হয়ে গেছে কোমরে, গায়ে, মাথায়। নখের আর দাঁতের লজ্জা শাড়ির ভেতরে লুকিয়ে রেখে মাথা নিচু করে হেঁটে হেঁটে চলেছে। শুধু মনে মনে বলেছে, পৃথিবীর সবাই তাকে কেবল প্রবঞ্চনাই করে গেল। কারো কোনো উপকারে লাগলো না সে। সামনেই চলেছে নবাব মীর্জা মহম্মদ। তার পেছনে লুৎফুন্নিসা বেগম। তার পেছনে শিরিনা। নবাবের মেয়েকে কোলে নিয়ে চলেছে। তার পেছনে দুর্গা আর ছোট বউরানী আর তার পেছনে মরালী!

মীরন সাহেব একবার সামনে দেখে, আর একবার পেছনে। আসামীরা না ভাগে।

—পেছনে ওটা কে রে?

চারদিকের ভিড় থেকে মানুষেরা কৌতূহলী প্রশ্নগুলো ছুঁড়ে মারে! কেউ চেনে না কাউকে। নবাবকেই তারা চেনে কেবল। আর সব অচেনা। চেহেল্-সুতুনের হারেমের ভেতরের মানুষদের চিনবেই বা কী করে! বাইরের কেউ তো কখনো দেখেনি তাদের। তাদের কথা দূরে থাক, আকাশের চন্দ্র-সূর্যও কখনো তাদের সাক্ষাৎ পায়নি। কত বাঁদী কত বেগম চেহেল্-সুতুনের ভেতরে থাকে, কে তার খবর রেখেছে!

মীর দাউদ আর মীরকাশিম সাহেব সবার আগে আগে বিজয়ীর মত বুক ফুলিয়ে এগিয়ে চলেছে। যেন তারাই এ-উৎসবের লক্ষ্য, আর সবাই গৌণ! অথচ কাল রাত্রের কথা কেউ জানে না। তাদের ফৌজি-পোশাকের আড়ালের মানুষটাকে দেখতে পাচ্ছে না কেউ। তাদের নখে আর দাঁতে যে এত ধার আছে তাও কেউ জানতে পারলে না। তবু তারাই আজ চেহেল্-সুতুনের দরবারে খেলাত পাবে, ইনাম পাবে।

মরালী একবার থম্‌কে দাঁড়ালো।

একটা চেনা গলার আওয়াজ কানে এল যেন। সেই বশীর মিঞা! সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল তার কথা—সেই আর-একজন। হয়তো এখনো সে চেহেল্-সুতুনের অন্ধকারের মধ্যে বোরখা পরে চরম হুকুমের প্রতীক্ষায় মুহূর্ত গুনছে। তুমি আমার জন্য নিজেকে বলি দিতে চেয়েছিলে, কিন্তু তুমি জানতেও পারলে না যে, আমাকে তুমি বাঁচাতে পারলে না। তুমি চেয়েছিলে আমি এই নবাব-মসনদ-আমীর, এই বিলাস ঐশ্বর্য বৈভব সমস্ত কিছু থেকে দূরে পালিয়ে

গিয়ে শান্তির সংসার গড়ি স্বামীকে নিয়ে। যাতে আমি নিরাপদে থাকি তাই সমস্ত বিপদের বোঝা তুমি নিজের মাথায় তুলে নিয়েছিলে। কিন্তু তুমি জানতেও পারলে না যে আমি বাঁচিনি। ওদের নখের আর দাঁতের হিংস্রতায় আমি আজ নিঃশেষ হয়ে গেছি।

কোথায় কোন্ একটা জায়গায় এসে জলুসটা যেন হঠাৎ থামলো। মীরন সাহেবের গলা। যেন সবাই উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে। আসামীরা না পালায়। আমরা পালাবো কী করে? তোমরা কি আমাদের আস্ত রেখেছো? মানুষের ধর্ম-বিশ্বাস-অস্তিত্ব সমস্ত কিছু ধ্বংস করে তবে যে আমাদের পরিত্রাণ দেবে!

যে-ঘরটার মধ্যে মরালীকে ওরা পুরে দিয়েছিল সেটা বড় অন্ধকার ঘর। তার ওপর অন্ধকারের যন্ত্রণা। যন্ত্রণা শুধু অস্তিত্বের নয়, লজ্জার ধিক্কারের আর প্রবঞ্চনার যন্ত্রণা। তখনো যেন মরালীর ভালো করে বিশ্বাস হচ্ছিল না। আমি যা কখনো করিনি, তোমাদের জন্যে আমি তাই-ই করলুম, লজ্জা-শরম সবকিছু জলাঞ্জলি দিয়ে, হেসে হেসে তোমাদের ঠোঁটে মদ তুলে দিলুম আর তোমরা আমাকে ঠকালে? হ্যাঁ গা, ঠকালেই যদি তো এমন করেই ঠকাতে হয়?

পাশাপাশি সার সার ঘর। মীরন সাহেবের নিজের বাড়িতে তুলেছে সবাইকে। তার মধ্যে থেকে কখন যে লুৎফুন্নিসা বেগমসাহেবাকে নিয়ে গিয়ে মতিঝিলে তুলেছিল তা কেউ জানে না। মীরন সাহেবের কাজ অঙ্ক-কষা নিখুঁত কাজ। বাঁদীদের রেখে দিয়েছিল, তাদের দিয়ে কোনো ভয় নেই। তারা কোনোদিন ছাড়া পেয়ে মসনদ চেয়ে বসবে না। তাঁরা বাদীর দল, যে মসনদে বসবে তার বেগমদের বাঁদীগিরি আবার তারাই করবে।

মীর দাউদ সাহেব মীরন সাহেবকে পেয়েই বলে দিয়েছিল—খুব হুঁশিয়ার মীরন সাহেব, নবাবের পালিয়ে যাবার মতলব আছে—

মীরন সাহেব বকের মতন ঘাড় বেঁকিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল—কেন? নবাব কি কিছু বলছিল?

—না, বলেনি, শুধু বলেছিল ছেড়ে দিতে, বলছিল আর কখনো মসনদের জন্যে লড়াই করবে না। বলছিল, যদি ছেড়ে দিই তাহলে জাহাঙ্গীরাবাদে গিয়ে বাকি জিন্দ্‌গীটা কাটিয়ে দেবে—

মীরন কথাটা শুনে বলেছিল—আচ্ছা, ঠিক আছে, বাকি জিন্দ্‌গীটা কাটাতে দিচ্ছি আমি—

—নবাবের বিচার হবে তো?

মীরন বললে—আলবাৎ হবে।

—কে বিচার করবে?

—নবাব মীরজাফর আলি মহবৎ জঙ্ করবে। মুর্শিদাবাদের আলমগীর করবে। নবাবের বিচার নবাবই করবে। ইনসানের বিচার ইনসান ছাড়া আর কে করবে?

তারপর একটু থেমে বললে—তাহলে সন্ধ্যে বেলার দরবারে আসছেন তো ফৌজদার সাহেব?

—আসছি। মীরকাশিম সাহেবও আসবে তো?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, হরগিজ্ আসবে। আমি এখন চলি, লুৎফুন্নিসা বেগমসাহেবাকে আমি মতিঝিলে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছি, কেউ যেন না জানতে পারে। লুৎফুন্নিসা

বেগমসাহেবার কাছে কিছু গয়না-টয়না ছিল না?

মীর দাউদ সাহেব একটু ঘাবড়ে গেল প্রশ্নটা শুনে। মীরকাশিম সাহেব সংগে সংগে বলে উঠলো—না জনাব, কিছ্ছু ছিল না—

—তাহলে শুনেছিলাম যে নবাব অনেক মোহর-গয়না-জহরৎ সংগে নিয়ে গেছে, সেগুলো সব কোথায় সরালো?

—কে জানে কোথায় সরালো! হয়তো ধরা পড়বার ভয়ে গংগার জলে ফেলে দিয়েছে। তাও হতে পারে।

—আর এ-ঘরে দু'জন কারা?

মীর দাউদ বললে—ওরা নবাবের বাঁদী।

—আর এ ঘরে?

মীর দাউদ বললে—এ-ঘরে মরিয়ম বেগমসাহেবা।

মরিয়ম বেগমসাহেবা! মীরন সাহেব অবাক হয়ে চেয়ে রইলো ফৌজদার সাহেবের দিকে। মরিয়ম সাহেবাকে যে এই মাত্র বজরায় করে জাহাংগীরাবাদে পাঠিয়ে দিয়ে এল নিজে হাতে। মরিয়ম বেগমসাহেবা আবার এখানে আসবে কী করে?

—হ্যাঁ জনাব, আমি বলছি মরিয়ম বেগমসাহেবা, আমি আর মীরকাশিম সাহেব দু'জনে মিলে যে তার সংগে নৌকোর ওপর মেহ্ফিল্ করলুম—

—তার মানে?

—মানে ফুর্তি করলুম, সরাব খেলুম। খাসা মাল জনাব। সফিউল্লা সাহেবকে খুন করেছিল, মনে নেই? তাই তার একটু বদ্‌লা নিলুম—

—বদলা নিলুম মানে?

মীরকাশিম সাহেব হেসে উঠলো হো হো করে। বললে—আরে জনাব, একটু আয়েস করলুম দু'জনে মিলে; আপনি দেখছি সাটের কথা বোঝেন না—! কিন্তু মাল খুব খুবসুরত জনাব, দেমাগ্ তর্ হয়ে গেছে কাল, একেবারে তর্...

মীরন সাহেব তখন উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। বললে—আরে, একদম গলত্ করেছেন জনাব, বিলকুল গলত্! মরিয়ম বেগমসাহেবাকে মেহেদী নেসার সাহেব চেহেল্-সুতুনে গ্রেফ্তার করে রেখেছিল, সেখান থেকে আমি তাকে মতিঝিলে নিয়ে গিয়েছিলুম, এখন তো একেবারে জাহাংগীরাবাদে—

—তাই নাকি জনাব? তোবা! তোবা!

মীর দাউদ আর মীরকাশিম সাহেব ঘেন্নায় 'তোবা' 'তোবা' করে উঠলো। ছি ছি, কাল সারা রাত তাহলে দু'জনে মরিয়ম বেগমসাহেবা ভেবে বাঁদীর সংগে মেহ্ফিল করেছে। বাঁদীর ছোঁয়া মদের পেয়ালায় ঠোঁট ছুঁইয়েছে!

রাত্রের কথাগুলো ভেবে মীর দাউদ আর মীরকাশিম সাহেবের মনটা ঘেন্নায় রি রি করে উঠলো! যাক্, মনে মনে কান মললে দু'জনেই। এমন বেওকুফি আর কখনো করবে না ফৌজদার সাহেব। রাত্রের অন্ধকারে চেনা যায়নি, তাই অমন ভুল হয়ে গেছে। কিন্তু বাঁদী হোক আর যাই-ই হোক মাল খুব্সুরত্ না?

—কী বলো মীরকাশিম সাহেব, মাল খুব্সুরত্ না?

—বড় খুব্সুরত্ জনাব, বড় আরাম দিয়েছে বাঁদীটা!

কিন্তু মীরন সাহেব তখন সেখান থেকে চলে গেছে। তার অনেক কাজ। বাঁদীর সোহাগের কেচ্ছা শুনলে তো আর তার চলবে না। ফিরিংগী-বাচ্চার

খেয়াল-খুশীর একটা ফয়সালাও করতে হবে! তারও নজর পড়েছে মরিয়ম বেগমসাহেবার ওপর। তাকেও একটা বাঁদী দিয়ে বলতে হবে—এর নামই মরিয়ম বেগম।

সেখান থেকে সোজা চলে গেল মীরজাফর সাহেবের মহলে। সকাল থেকে অনেক ঝক্কি গেছে মীরনসাহেবের মাথার ওপর দিয়ে। কাজ-কারবার বন্ধ হয়ে রয়েছে শহরের। চেহেল্-সুতুনের মালখানার চাবি পর্যন্ত নিজের কাছে নিয়ে রেখেছে ক্লাইভ সাহেব। চাবি আর হাত-ছাড়া করছে না কিছুতেই—

মীরন সাহেব রেগে গিয়েছিল। বলেছিল—তা চাবি তুমি হাত-ছাড়া করলে কেন?

মীরজাফর সাহেব বললে—চাবি হাত-ছাড়া করবো না তো কী করবো?

—তাহলে এখন যদি সব টাকা-কড়ি নিয়ে নেয়?

—তা নিলে আমি কী করবো?

—তাহলে সেপাইদের মাইনে কোত্থেকে দেবে? তারা যে ক্ষেপে যাবে এবার। আমি যে তাদের অনেক কোশিস্ করে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রেখে দিয়েছি এতদিন!

মীরজাফর সাহেব রেগে গেল। বললে—তোর বুদ্ধিতে চললেই হয়েছে! তোকে যা বলেছি তুই তাই কর—

—আমি তো দরবারের সব ইন্তেজাম করেছি। সব আমীর-ওমরাওদের নেমন্তন্নের খত্ পাঠিয়েছি—

—জগৎশেঠজীকে বলেছিস তো?

—বলেছি।

—উমিচাঁদকে?

—ওকে আর বলতে হয়নি। ও নিজেই তাগিদ দিয়ে দিয়ে আমার কাছ থেকে খত্ আদায় করে নিয়েছে।

—আর ফিরিঙ্গী সাহেবদের?

—ফিরিঙ্গী সাহেবদের কাউকে বাদ দিইনি। কিল্প্যাট্রিক, ড্রেক, ওয়াটসন্, ওয়াট্স, সেপাইদের ভি বসবার ইন্তেজাম করেছি দরবারে।

মীরজাফর সাহেব তাতেও যেন খুশী হ'লো না। জিজ্ঞেস করলে—ওদের খাওয়া-দাওয়ার বন্দোবস্ত ঠিক হচ্ছে? কোনো তক্লিফ নেই তো?

মীরন বললে—সে তো সব মেহেদী নেসার আর রেজা আলীর ওপর ভার দিয়ে দিয়েছি—

—ও শালারা সব চোর! ওই মেহেদী নেসারটাকে বিশ্বাস করিসনি। ওটা একবার এর দলে, আবার একবার ওর দলে থাকে, টাকা চুরি করতে পারে, নজর রাখবি চারদিকে—

মীরন সাহেব চলে আসছিল, হঠাৎ মুখ ফিরিয়েই সামনে দেখে ক্লাইভ সাহেব। সঙ্গে উদ্ধব দাস!

মীরন ফিরিঙ্গী বাচ্চাকে দেখেই কুর্নিশ করলে—আদাবরজ সাহেব, কিছু তক্লিফ নেই তো হুজুরের?

মীরন দেখলে সাহেবের মুখটা গম্ভীর-গম্ভীর। মুর্শিদাবাদে আসার পর থেকে এমন গম্ভীর মুখের ভাব আর কখনো হয়নি সাহেবের।

ক্লাইভ জিজ্ঞেস করলে—মীরজাফর কোথায়? হোয়ার ইজ্ মীরজাফর আলি?

—ওই যে স্যার, ওই যে—

থর থর করে কাঁপতে লাগলো মীরন সাহেবের কলিজার ভেতরটা। ফিরিঙ্গী-সাহেব বেজার হলেই তো সব গোলমাল হয়ে যাবে। মীরন সাহেবের নিজের ভবিষ্যৎ, মীরজাফর সাহেবের ভবিষ্যৎ নিয়ে তখন টানাটানি পড়বে।

সাহেবের গলা শুনেই মীরজাফর সাহেব তাকিয়া ছেড়ে উঠে এসেছেন। —কী হুজুর, কী হুকুম!

হঠাৎ যেন সাহেব ফেটে পড়লো। এমন করে রাগতে কখনো কেউ দেখেনি সাহেবকে!

—কী হয়েছে বলুন না হুজুর! কী কসুর হয়েছে?

—আমি কখন থেকে মরিয়ম বেগমসাহেবার খবর আনতে পাঠিয়েছি, এখনো কোনো ট্রেস্ নেই কেন? হোয়ার ইজ শি?

মীরজাফর সাহেব কথাটা শুনে লজ্জায় পড়লো। তাজ্জব ব্যাপার। যে-দিকে নিজে দেখবে না সেই দিকেই গলত্! সাহেবকে এত খাতির করে ডেকে নিয়ে এসে শেষকালে একটা সামান্য মেয়েমানুষ ভেট দিতে পারছে না! চেহেল্-সুতুনে এত মেয়েমানুষ থাকতে কিনা আজ মেয়েমানুষের জন্যে সাহেব চটে গেল!

মীরজাফর সাহেব ক্লাইভের সামনেই তেড়ে গালাগালি দিয়ে উঠলো, উল্লুক, বেল্লিক, বেওকুফ, জাহান্নাম-কা-কুত্তা। আরো সব উর্দু ফার্সি ভাষায় কী গালাগালি দিলে সব বোঝা গেল না। উর্দু ফার্সী ভাষায় যে এত রকম চোস্ত গালাগালি আছে, আর বাপ হয়ে যে ছেলেকে এত গালাগালি দেওয়া যায় তাও বুঝি এর আগে কেউ জানতো না।

মীরন কিন্তু একটা কথারও জবাব দিলে না। সব গালাগালি মাথা নিচু করে নিঃশব্দে হজম করে নিলে।

তারপর মীরজাফর সাহেব বললে—আপনি নিজের মহলে যান হুজুর, আমি মরিয়ম বেগমসাহেবাকে হুজুরের কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি—

সেদিন সেই মনসুরগদির মীরজাফরের মহলের খিলেনের তলায় দাঁড়িয়ে আর-এক জালিয়াতির শরণ নিল মীরন সাহেব! শুধু মীরন সাহেব নয়, ইতিহাসও বুঝি মাঝে মাঝে এমনি জালিয়াতির আশ্রয় নেয়। যে মরিয়ম বেগম মুর্শিদাবাদে নেই, যে মরিয়ম বেগমসাহেবাকে বজরায় তুলে দিয়ে জাহাঙ্গীরাবাদের দিকে পাঠিয়ে দিয়েছে, যে মরিয়ম বেগমসাহেবা তখন বজরায় ছই-এর তলায় বসে আকাশের দিকে চেয়ে আছে এক দৃষ্টে, সেই মরিয়ম স্যাহেবার নাম করে আর-এক জালিয়াতির জাল বোনা হলো সেদিন মনসুরগদির বারান্দায় দাঁড়িয়ে।

ক্লাইভ সাহেব আর কিছু কথা বললে না। উদ্ধব দাস পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। তাকে বললে—চলো পোয়েট, চলো—

এ সেই যুগ যখন সারা হিন্দুস্থানে মানুষের বুদ্ধি-বিদ্যে-ক্ষমতার অবক্ষয়ের চিহ্ন পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। দিল্লীর বাদশার ক্ষমতা আর নেই,

রাজস্থানের রাজপুতদের ঘর ভেঙে গেছে। দক্ষিণের সুবাদাররা স্বয়ম্ভু হয়ে ওঠবার চেষ্টা করছে, মারাঠারা লুঠপাট করে ক্লান্ত, আর পূর্বপ্রান্তের এই জনপদে এখন নখ আর দাঁতের অস্ত্রে শান দেওয়া হচ্ছে সকলের চোখের আড়ালে।

ইতিহাসের সেই সন্ধিক্ষণে একটা মেয়ে হাতিয়াগড়ের মত অখ্যাত এক জনপদ থেকে বেরিয়েছিল ঘটনাচক্রের অমোঘ বিধানে। তার বিদ্যে ছিল না, বুদ্ধি ছিল না, সহায়-সম্বল কিছুই ছিল না সেদিন। তারপর কেমন করে হিন্দুস্থানের রাষ্ট্রবিপ্লবের সঙ্গে একাত্মভাবে জড়িয়ে গিয়েছিল তার ভাগ্য। চোখের সামনে ভাগ্য-বিধাতার পরিহাস দেখলে, ধর্ম-অধর্মের কলহ দেখলে। অর্থগৃধ্নুতার চরম বিকাশ দেখলে, লালসার অনির্বাণ জ্বালানল দেখলে, তারপর একদিন সেই আগুনে আত্মাহুতি দিলে। এ-সমস্তই মাত্র একটা জীবনের মধ্যে ঘটে গেল। এ বড় অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। আর উদ্ধব দাস তার দেখাকে নিজের দেখায় পরিণত করলে। মরিয়ম বেগমকে অমর করে রেখে গেল।

উদ্ধব দাস লিখে গেছে—এ কলি যুগ। কিন্তু সত্যযুগের মানুষ ছিল অন্য রকম। তখন মানুষের সাধনা ছিল মুক্তির সাধনা। অধ্যাত্মবাদের মধ্য দিয়ে মুক্তির সাধনাই ছিল তখন প্রধান কাজ। তারপর এল ত্রেতা যুগ। তখন এল ধর্ম। এল ক্ষত্রিয়। দুর্জনের হাত থেকে সত্যনিষ্ঠকে রক্ষার ধর্ম, পাপের হাত থেকে পুণ্যকে। তারপর এল দ্বাপর। দ্বাপরে ন্যায়ের মর্যাদা বাড়লো। সৎপথে অর্থ উপার্জন শুরু হলো। এল বৈশ্য। অর্থের সদ্ব্যবহারে মানুষের সমৃদ্ধি-সাধন হলো। তারপর সকলের শেষে এল কলি। ক্রোধের ঔরসে আর হিংসার গর্ভে জন্ম হলো কলির। ধর্ম-অর্থ-মোক্ষ-কাম সব ভেসে গেল। এল ম্লেচ্ছ। স্বার্থের সঙ্গে স্বার্থের বিরোধ বাঁধলো, দেশের সঙ্গে বিদেশের, মানুষের সঙ্গে মানুষের। যৌন-ক্ষমতা দিয়ে বিচার হলো মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের। জয় হলো দুর্জনের। প্রতিষ্ঠা হলো পাপের।

পাণ্ডুলিপিটা পড়তে পড়তে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। সামান্য বাউণ্ডুলে মানুষ উদ্ধব দাস। কেউই তাকে সেদিন চিনতে পারেনি। হয়তো মরালীও তাকে চিনতে পারেনি। হাতিয়াগড়ের ছোটমশাই, কৃষ্ণনগরের মহারাজাও তাকে চিনতে পারেনি শেষ পর্যন্ত। কিন্তু চিনেছিল বুঝি শেষ পর্যন্ত শুধু বিদেশ থেকে আসা একজন বিধর্মী মানুষ!

বারান্দা দিয়ে ফিরে আসতে আসতে উদ্ধব দাস জিজ্ঞেস করেছিল—আপনি আমার জন্যে এত কষ্ট করছেন কেন প্রভু?

ক্লাইভ বলেছিল—তোমাকে তো আমি বলেছি পোয়েট, আমি তোমাকে ভালবাসি—

—কিন্তু প্রভু, আমি তো আপনাকে ভালবাসিনে!

—তা না বাসো, আমার কিছু আসে-যায় না। লোকে তো আমার কত নিন্দে করে! কেউ বলে, আমি অত্যাচারী, লোভী। আবার কেউ বলে, মেয়েমানুষের ওপর আমার নাকি দুর্দম লোভ। ফ্রেঞ্চরা আমাকে পেলে খুন করে ফেলে। ডাচ্‌রা আমার ওপর হাড়ে হাড়ে চটা, আমি সকলের শত্রু। এই যে নবাবকে আজকে এখানে এনে হাত-কড়া দিয়ে ধরে এনে বন্দী করে রেখেছে, তুমি কি ভাবো, মীরজাফর আলি তার চেয়ে ভালো লোক?

উদ্ধব দাস বললে—আমি ওসব নিয়ে কিছু ভাবিই না প্রভু—

—তুমি না ভাবো, কিন্তু আমাকে তো ভাবতে হয় পোয়েট! আমি যে কাউকে ক্ষমা করি না। ভালোর কাছে আমি ভালো, কিন্তু খারাপের কাছে ডেথ্। নবাবকে আজকের দরবারে আমার সামনে হাত-কড়া বেঁধে হাজির করবে আমি তাকে যে শাস্তি দেবো তেমন শাস্তি কেউ কখনো কাউকে দেয়নি পোয়েট—

—ভগবান শাস্তি না দিলে আপনি শাস্তি দেবার কে প্রভু?

ক্লাইভ বললে—ঠিক বলেছো পোয়েট, আমি নিজে ভগবানের কাছ থেকে যে শাস্তি পাই তার প্রতিকার করবে কে? জানো পোয়েট, রাত্তিরে আমার ঘুম হয় না—

উদ্ধব দাস বললে—আমি কিন্তু খুব পেট ভরে ঘুমোই প্রভু—

—স্বপ্ন দেখো না?

—স্বপ্ন? হ্যাঁ, স্বপ্ন দেখি প্রভু!

—স্বপ্ন দেখো? তুমিও স্বপ্ন দেখো?

—কেন প্রভু? স্বপ্ন তো সবাই দেখে!

ক্লাইভ এবার উত্তেজিত হয়ে উঠলো যেন বললে—তাসের স্বপ্ন দেখো হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, তাস!

—কেন, আপনি তাসের স্বপ্ন দেখেন নাকি প্রভু?

ক্লাইভ বললে—হ্যাঁ পোয়েট, রাত্রে যখন দুটো চোখ সবে বুজে আসছে, ঠি তখন একজন আমার ঘরে ঢোকে। ঢুকে আমাকে তাস দেখায়, কুইন অব স্পেড্স্—ইস্কাবনের বিবি। আমার ঘুম ভেঙে যায়, আমি চিৎকার করে উঠি একদিন তোমার বউ আমার পাশের ঘরে শুয়ে ছিল। আমার চিৎকারে তার ঘু ভেঙে গেছে, সে দৌড়ে এসেছে আমার ঘরে, সে কিছু বুঝতে পারলে না, আমি তাকে এক দাগ ওষুধ দিতে বললুম। সে আমায় ওষুধ দিলে তবে আমি আবা ঘুমোলুম!

—কিন্তু সে কে প্রভু?

—সাক্সেস্!

—সাক্সেস্ মানে কী প্রভু?

—সাক্সেস্ মানে এই যশ-খ্যাতি-জয়-ঐশ্বর্য-বীর্য-টাকা-চাকরি-উন্নতি এই সবকিছু মানুষের মূর্তি ধরে রাত্রে আমার কাছে আসে। কেন যে এত লো থাকতে বার বার আমার কাছেই আসে তা জানি না পোয়েট! আমার মুন্সীকে জিজ্ঞেস করেছি, তার কাছে আসে না, তোমার কাছেও আসে না। আমার দলে কাউকে আমি জিজ্ঞেস করিনি, কাউকে আমি কথাটা বলিনি। ইংলন্ডে আমা বাবাকে চিঠি লিখি, আমার বউ পেগিকে চিঠি লিখি। ইন্ডিয়ার সব কথা লি জানাই, তোমার কথাও তাদের লিখেছি, কিন্তু এ কথাটা জানাতে ভয় করে, তা হ তারা আমাকে দেশে ফিরে যেতে বলবে—

চলতে চলতে নিজের মহলের কাছে এসে গিয়েছিল ক্লাইভ সাহেব। উদ্ধ দাসও পেছন পেছন আসছিল। বিরাট হাবেলি মনসুরগঞ্জ। মতিঝিলে দেখাদেখি তারই অনুকরণে নবাব আলীবর্দী খাঁ মীর্জা মহম্মদের জন্যে তৈরি ক দিয়েছিলেন। বারান্দার পর বারান্দা, অলিন্দের পর অলিন্দ, খিলেনের পর খিলে চবুতরার পর চবুতরা।

সাহেব বারান্দা পেরিয়ে নিজের মহলের মধ্যে ঢুকলো।

সামনে অর্ডার্লি মিলিটারী কায়দায় সেলাম করলে। মহলে ঢুকে প্রথমে বসবার ঘর। মাথার চারদিকে মখমলের চাঁদোয়া। তার চারপাশ থেকে পাতলা ঝালর ঝুলছে। তার চার কোণে আবার চারটে ঘর। সেই মহলেই আজ সকাল থেকে এত বেলা পর্যন্ত কেটেছে। এই বসবার ঘরে বসেই ক্লাইভ জগৎশেঠজীর সঙ্গে কথা বলেছে, উমিচাঁদের সঙ্গে কথা বলেছে, মুন্সী নবকৃষ্ণর সঙ্গে কথা বলেছে। মীরজাফর আলির সঙ্গে কথা বলেছে, মীরনের সঙ্গে কথা বলেছে, কিল্‌প্যাট্রিকের সঙ্গে কথা বলেছে।

—কে?

উদ্ধব দাসকে বসবার ঘরে বসিয়ে রেখে ক্লাইভ নিজের শোবার ঘরে ঢুকেছিল। হঠাৎ মনে হলো দেয়ালের ঝালরের আড়ালে কে যেন নড়ে উঠলো। হাতের পিস্তলটা বাগিয়ে ধরলে সাহেব। স্পাই নয় তো! চারদিকে এত নজর রাখা হয়েছে, তবু কে ভেতরে এসে ঢুকলো!

—কে তুমি?

ঝালরটা একটু দুলে উঠলো।

—হু আর ইউ?

আস্তে আস্তে পিস্তলটা সামনে তাগ্‌ করে আরো এগিয়ে গেল সাহেব। যে ভেতরে ঢুকেছিল তার যেন গলা শোনা গেল এবার।

—ওরা আমাকে ঠকিয়েছে! ওরা আমাকে...

ক্লাইভ ঝালরটা সরিয়ে ভালো করে তাকিয়ে দেখে অবাক হয়ে গেল।

—তুমি? তুমি এখানে? আমি তো সব খবর শুনেছি, মাঝিরা আমায় সব খবর দিয়ে গেছে। তোমাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবার জন্যে এতক্ষণ তো আমি ওদের বলেছি, তুমি এখানে কী করে এলে?

মরালী কোনো রকমে বললে—পালিয়ে—

—কিন্তু কী করে পালিয়ে এলে? কেউ তোমাকে দেখতে পেলে না?

—নেয়ামত আমার দরজার চাবি খুলে দিয়েছে, আমি সকলকে লুকিয়ে তোমার কাছে চলে এসেছি, ওরা দেখতে পেলে আমাকে খুন করে ফেলবে!

—আর নবাব?

—কী জানি, সেই কথা বলতেই আমি এসেছি তোমার কাছে। আমি জানি এ সময়ে তুমিই একলা নবাবকে বাঁচাতে পারো। শুধু নবাব নয়, নবাবের পাশের ঘরে আমাদের হাতিয়াগড়ের ছোট রাণীবিবি আছে, আর তার ঝি আছে, তাদেরও তুমি ছেড়ে দাও দয়া করে, ওদেরও ধরে নিয়ে এসেছে ওরা—

—ওদের কেন ধরেছে?

—ভেবেছে ওরাও বুঝি নবাবের বেগম। ওদের জন্যে আমি অনেক করেছি, কিন্তু তবু ওদের শয়তানদের হাত থেকে বাঁচাতে পারলুম না। এই দেখো, ওরা আমার কী করেছে—

মরালী তার শাড়ির আঁচলটা আল্‌গা করে নিজের শরীরটা দেখালে।

ক্লাইভ জিজ্ঞেস করলে—এসব কী?

মরালী বললে—ওরা আমাকে আঁচড়ে দিয়েছে, কামড়ে দিয়েছে—এগুলো তোমাকে দেখাতে এসেছি, ওরা মানুষ নয়, জানোয়ার—

—কে করেছে? কারা?

—ওই মীর দাউদ আর মীরকাশিম। সমস্ত শরীরে আমার ব্যথা হয়ে গেছে, আমি আর দাঁড়াতে পারছি না। ওরা আমাকে ঠকিয়েছে, ওরা বলেছিল নবাবকে আর রাণীবিবিকে ওরা ছেড়ে দেবে, তাই ওদের হাতে আমি মদ খেয়েছিলুম, ওদের হাতে আমি...

মনে আছে, মরালীর কথা শুনে ক্লাইভের মুখটা লাল হয়ে উঠেছিল খানিকক্ষণের জন্যে। এক দিকে মুর্শিদাবাদের নবাব, আর এক দিকে মরালী। দু'এর মধ্যে পড়ে সেদিন সাহেব কী করবে বুঝে উঠতে পারেনি। রাগে শুধু থরথর করে কেঁপে উঠেছিল।

তারপর বলেছিল—তুমি চাও আমি নবাবকে ছেড়ে দেবো? সত্যি তুমি তাই চাও?

—শুধু নবাবকে নয়, আমাদের হাতিয়াগড়ের রাণীবিবিকেও ছাড়িয়ে দাও। আর মতিঝিলে সেই যে তোমাকে বলেছিলুম আর-একজন মরিয়ম বেগম আছে, তাকেও তুমি ছাড়িয়ে দিয়ে এসো—

—আর তুমি?

মরালী বলেছিল—আমাকে তুমি আমার বাবার কাছে পাঠিয়ে দিও, হাতিয়াগড়ে। আমি যেখান থেকে এসেছিলুম, সেখানেই আমি ফিরে যাবো—

—আর তোমার হাজব্যান্ড্? তোমার স্বামী?

মরালী বলেছিল—আমার স্বামীর কাছে যাওয়ার মুখ আমি খুইয়েছি—

—কেন? কী হলো তোমার?

মরালী সে কথার উত্তর দেয়নি তখন। কী উত্তরই বা সে দেবে? আর ক্লাইভেরই বা সে উত্তর শোনবার মত সময় কোথায়? তখন সাহেবের মাথায় অনেক কাজের চাপ। উমিচাঁদের সঙ্গে হিসেবনিকেশের একটা ব্যাপার আছে। চেহেল্-সুতুনে দরবার করা আছে, জগৎশেঠের সঙ্গে ফয়সালা করতে হবে। অনেক অনেক কাজ। ইয়ার লুৎফ খাঁ, রাজা দুর্লভরাম আর জগৎশেঠের বাড়ির সামনে স্পাই রাখা আছে! যে-কোনো মোমেণ্টে সমস্ত মুর্শিদাবাদ করতে পারে।

—আচ্ছা ঠিক আছে, আমি তোমার স্বামীকে এখানে আনছি।

—আমার স্বামী?

—হ্যাঁ, সেই পোয়েট্—

বলেই ক্লাইভ বসবার ঘরে চলে আসছিল উদ্ধব দাসের কাছে। কিন্তু মরালী বাধা দিলে। বললে—না, না, তাকে ডেকো না, আমি নষ্ট, আমি নষ্ট—

তবু ক্লাইভ কথা শুনলে না দেখে মরালী আরো জোরে কেঁদে উঠলো—ওগো, তোমার পায়ে পড়ছি, তাকে ডেকো না, আমি নষ্ট, আমি নষ্ট...

ক্লাইভ সে কথায় কান না দিয়ে বাইরের ঘরে আসতেই দেখলে, মেজর কিল্‌প্যাট্রিক আর সেই হাতিয়াগড়ের রাজা দাঁড়িয়ে আছে।

—কর্নেল, মতিঝিলে গিয়েছিলাম। সেখানে মরিয়ম বেগম নেই।

—হোয়াট?

ছোটমশাই-এর মুখটা তখন কাঁদো-কাঁদো হয়ে গেছে। বললে—না হুজুর, আমার স্ত্রীকে দেখতে পেলাম না সেখানে!

—কোনো বেগম নেই?

কিল্‌প্যাট্রিক বললে—আছে, যেসব বেগম সেখানে আছে, মীরন সবাইকে ডেকে ডেকে দেখালে। আমি সকলের নাম জিজ্ঞেস করলুম। পেশমন বেগম, গুলসন্‌ বেগম, বব্বু বেগম, তক্কি বেগম, আরো সব কত আছে, তা ছাড়া অনেক বাঁদীও আছে, কিন্তু মরিয়ম বেগম বলে কেউ নেই সেখানে—

—কিন্তু তা কী করে হয়?

ছোটমশাইও বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ, আমিও তো তাই ভাবছি, তা কী করে হয়?

উদ্ধব দাস হাঁ করে দাঁড়িয়ে এদের কথা শুনছিল। কিছু বুঝছিল, কিছু বুঝছিল না।

ক্লাইভ হঠাৎ বললে—আচ্ছা দাঁড়াও, আমি এখনি আসছি—

বলে ভেতরের ঘরে চলে গেল। মরালী তখনো সেখানে ঠিক সেই রকম করেই দাঁড়িয়ে আছে।

ক্লাইভ গিয়ে বললে—শোনো, মতিঝিলে মরিয়ম বেগম বলে কেউ নেই—

—কেউ নেই?

—অন্য সব বেগম আছে, পেশমন বেগম, গুলসন বেগম, তক্কি বেগম, বব্বু বেগম—সবাই আছে, কিন্তু মরিয়ম বেগম বলে কেউ নেই—

মরালী বললে—কিন্তু নানীবেগম সাহেবা? ঘসেটি বেগমসাহেবা, আমিনা, ময়মানা, লুৎফুন্নিসা, তারা কোথায় গেল?

—তা জানি না, আমি আমার মেজরকে পাঠিয়েছিলাম, সে নিজে গিয়ে সকলকে দেখে এসেছে—

মরালী বললে—কিন্তু চেহেল্‌-সুতুন? চেহেল্‌-সুতুনটা দেখেছে?

—না। চেহেল্‌-সুতুনের মালখানার চাবি আমার কাছে আছে। আমি নিজে সেখানে যাবো পরে।

—তুমি এখনি কাউকে পাঠাও চেহেল্‌-সুতুনে, নইলে সবাইকে ওরা খুন করে ফেলবে। কিংবা কোথাও সরিয়ে ফেলবে। তুমি ওদের চেনো না, ওরা জানোয়ার, ওরা শয়তান, ওরা সব পারে—

ক্লাইভ বললে—তুমি থাকো, আমি আসছি—

বলে বাইরের ঘরে গিয়ে কিল্‌প্যাট্রিককে বললে—তুমি এখনি চেহেল্‌-সুতুনে যাও। শিগ্‌গির, মরিয়ম বেগমকে নিশ্চয় চেহেল্‌-সুতুনে রেখেছে ওরা—

কিল্‌প্যাট্রিকের সঙ্গে ছোটমশাইও চলে গেল।

উদ্ধব দাসের দিকে চেয়ে ক্লাইভ বললে—পোয়েট, এসো, আমার সঙ্গে ভেতরের ঘরে এসো, তোমার সঙ্গে তোমার ওয়াইফের দেখা করিয়ে দেবো—

মীরনের জীবনেও সে এক ভারি দুর্যোগের দিন গেছে। প্রথমে বুঝতে পারেনি যে ফিরিঙ্গী-বাচ্চা ক্লাইভ তার চেয়েও শয়তান। মীরজাফর সাহেবের কাছে ধমক খেয়ে মেজাজটা বিগড়ে গিয়েছিল। কী করবে বুঝতে পারছিল না। মরিয়ম বেগমসাহেবা তো এতক্ষণে ভগবানগোলার দিকে পৌঁছে গেছে। এখন তাকে কী করে ফিরিয়ে আনবে আর ফিরিয়ে আনবেই বা কেন? কার খেদমত্‌

করবে সে? কে ক্লাইভ? কোথাকার ফিরিঙ্গী-বাচ্চা, তাকে কীসের এত খাতির। নবাব তো মীরজাফর সাহেব। মীরজাফর সাহেব তো মুর্শিদাবাদের মসনদে বসেই গেছে বলতে গেলে। তাহলে ক্লাইভের কীসের এত হক্!

সামনেই মুখোমুখি দেখা মেহেদী নেসারের সঙ্গে। পাশে ডিহিদার রেজা আলি।

বললে—কী খবর জনাব, মুখ এত গম্ভীর কেন?

মীরন বললে—আর ভাইসাহেব, ফিরিঙ্গী-বাচ্চা বড় মুশকিলে ফেলেছে, বলে মরিয়ম বেগমসাহেবাকে হুজুরে হাজির করতে! এখন মরিয়ম বেগমসাহেবাকে পাবো কোথায়? বানাবো? সে তো জাহাঙ্গীরাবাদের পথে।

সত্যিই ভাবনার কথা। মেহেদী নেসার সাহেবও মাথা ঘামাতে বসলো। এতক্ষণ ধরে ফিরিঙ্গী-বাচ্চা আবদার ধরেছে, ও কি সহজে ছাড়বে।

মীরন বললে—এখন কী করা যায় বলো তো ভাইসাহেব, কর্তা খুব নারাজ হয়েছে আমার ওপর, খুব গালাগালি দিলে আমাকে—

ডিহিদার রেজা আলিও কিছু রাস্তা বাত্‌লাতে পারলে না। বললে—বড়ি মুসিবত হলো তো—

মেহেদী নেসার বললে—সাহেব যখন একবার আবদার ধরেছে, তখন তো আর সহজে রেহাই দেবে না। ও মরিয়ম বেগমকে আদায় করে ছাড়বেই—

ওদিকে মীর দাউদ সাহেব আসছিল। সঙ্গে মীরকাশিম সাহেব। তারাও সব শুনলে। সত্যিই বড় মুসিবত কি বাত্! ফিরিঙ্গী-বাচ্চা তো একলা নয়, তার সঙ্গে তার আমীর-ওমরা এসেছে। সঙ্গে সেপাই-বরকন্দাজ এসেছে।

হঠাৎ মীর দাউদের মাথায় একটা বুদ্ধি এল।

বললে—জনাব, আমার মাথায় একটা মতলব এসেছে—

সবাই আশান্বিত হয়ে উঠলো—ক্যা মতলব, ক্যা মতলব?

মীর দাউদ বললে—এক কাজ করো জনাব, নফরগঞ্জ থেকে যে আওরত্‌কে ধরে এনেছি, তাকে ফিরিঙ্গী-বাচ্চার কাছে হাজির করে দাও, বলো গিয়ে—এরই নাম মরিয়ম বেগমসাহেবা—সাহেব ঠাহর করতে পারবে না—

বুদ্ধিটা সকলের বড় পছন্দ হলো।

মেহেদী নেসার সাহেব বললে—খুব আচ্ছা মতলব!

ডিহিদার রেজা আলিও বললে—বহোত্ আচ্ছা মতলব—

সেদিন সবাই একবাক্যে স্বীকার করলে এমন নিখুঁত মতলব আর হয় না। ক্লাইভ সাহেব নিজের মহলে গিয়ে তখন অপেক্ষা করছে। দেরি করলে আবার সাহেব গোসা করবে। আবার মীরজাফর সাহেবের কাছে গিয়ে তাগিদ দেবে। তখন আবার গালাগালি খেতে হবে মীরজাফর সাহেবের কাছ থেকে। আর দেরি করে ফয়দা নেই—

কিন্তু মীরন সাহেবের বাড়িতে গিয়ে বজ্রাঘাত হলো সকলের মাথায়। বাড়ির পেছন দিকে সার-সার ঘর। সেখানে নেয়ামতকে ভার দিয়ে রেখেছিল মীরন। মতিঝিলের খিদ্‌মদ্‌গার নেয়ামতই বলতে গেলে তদারক করছিল সকলের। তার কাছেই ছিল ঘরগুলোর চাবি। নেয়ামত ছাড়া যে-সব সেপাই ছিল, তারাও তখন সেখানে কেউ নেই। মহলটা খাঁ খাঁ করছে। ঘরগুলোর চাবি খোলা।

বাঁদীরা কোথায় গেল?

মীরন ঘরটার ভেতরে উঁকি দিয়ে ভালো করে দেখলে—কোথায় গেল বাঁদীরা

পাশের ঘরেও তাই। ঘরটা খাঁ খাঁ করছে। মীরন ... পাশের ভতরে ঢুকলো। নবাব মীর্জা মহম্মদও এই ঘরেই ছিল।

—ইয়া আল্লাহ্—

অন্ধকারের মধ্যে হাত-কড়া বাঁধা অবস্থায় নবাব তখন চুপ করে বসে আছে। হয়তো পালিয়েই যেত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঠিক সময়ে মীরন এসে পড়াতে পালাতে পারেনি।

সামনে মীরনকে দেখেই মুখ তুলেছে নবাব। চোখে-মুখে

—কে? কে তোমরা?

মীরন আর কথার উত্তর দিলে না। তাড়াতাড়ি দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল।

মীর দাউদ জিজ্ঞেস করলে—নবাব আছে অন্দরে?

মীরন বললে—হ্যাঁ জনাব, খোদা বাঁচিয়ে দিয়েছে, নেয়ামতকে ভার দিয়ে গিয়েছিলুম, সে বেটা বেইমানি করে পালিয়েছে। এবার বেটাকে আস্ত কোতল্ করবো—

—ভাগ্যিস্ লুৎফুন্নিসা বেগমসাহেবাকে আগে থেকে সরিয়ে ফেলেছিলুম জনাব, নইলে সে-ও ভেগে যেত—

মীরনের সত্যিই তখন আর সময় নেই। এখনি ক্লাইভ সাহেবের ডাক পড়তে পারে। ভেতর থেকে বাড়ির ফটকের পাহারাদারকে ডাকলে।

বললে—মহম্মদী বেগ, নেয়ামত কোথায়?

বেগ বললে—নেয়ামত তো আমাকে কিছু বলে যায়নি হুজুর?

—ঘরের চাবি তোর কাছে দিয়ে গেছে?

—নেহি হুজুর!

—তাহলে নতুন একটা তালাচাবি জোগাড় করে আন্।

তারপর সেই তালা-চাবি এল। নতুন করে আবার মীর্জা মহম্মদের দরজায় তালা-চাবি পড়লো। যারা ভেগেছে, তারা ভাগুক, কিন্তু নবাব যেন না-পালায়, দেখিস। খুব হুঁশিয়ার। নবাব ভাগলে সব উল্টে যাবে। মীরজাফর সাহেবের নবাব হওয়া ঘুচে যাবে।

তারপর আর সেখানে দাঁড়ালো না মীরন। মীর দাউদ, মীরকাশিম, মেহেদী নেসার, রেজা আলি সবাই পড়ে রইলো সেখানে। তাড়াতাড়ি মতিঝিলের ঘাট থেকে আর-একটা বজরা নিলে। খুব দেরি হয়ে গেছে।

ও দিকে অনেক দূরে ছ'টা বজরা তখন ভগবানগোলার দিকে ভেসে ভেসে চলেছে। সবচেয়ে পেছনের বজরায় একজন বেগম বোরখা পরে আছে। তার জীবনের চারপাশেও তখন বুঝি বোরখার আড়াল নেমেছে। কোনো দিকেই খেয়াল নেই তার। শুধু একমনে অদৃশ্য দেবতার কাছে সে প্রার্থনা করে চলেছে, তুমি তাকে সুখী করো ঈশ্বর। সে যেন মুর্শিদাবাদের পাপ আর পঙ্কিলতা থেকে অনেক দূরে চলে যেতে পারে। অনেক দূরে গিয়ে সে যেন শান্তি পায়। যেন সুখ পায়, সংসার পায়, স্বামী পায়, সন্তান পায়।

বজরাগুলো সার সার ভেসে চলেছে জোয়ারের স্রোতে। ভাঁটার পর

জোয়ার এসেছে। আবার ভাঁটা আসবে, আবার জোয়ার। জোয়ার-ভাঁটার টানাপোড়েনে বাঁধা আমাদের জীবন। ইতিহাসেরও বুঝি জোয়ার-ভাঁটা আছে। সেই জোয়ার-ভাঁটার টানাপোড়েনে রাজ্য ওঠে, রাজ্য পড়ে, মসনদ একবার খালি হয়, আবার ভরে। শতাব্দীর পর শতাব্দী কেটে যায় এমনি করে। জন্ম থেকে যে-জীবন শুরু হয়, মৃত্যুতেই তার পূর্ণচ্ছেদ পড়ে। কিন্তু মানুষের পৃথিবীর বুঝি মৃত্যু নেই। তাই আবার জন্ম হয়, তারপর আবার মৃত্যু আসে। জন্ম-জন্মান্তরের জীবন তাই অশেষ। শেষের দিকেই তার গতি, কিন্তু সে অশেষযাত্রা। সেই অশেষ-যাত্রার যে পথিক, তার মনে শঙ্কা নেই, তার মনে বিকার নেই, তার মনে অনুতাপ নেই।

সে শুধু বলে চলেছে—তুমি তাকে সুখী করো ঈশ্বর। সে যেন মুর্শিদাবাদের পাপ আর পঙ্কিলতা থেকে অনেক দূরে চলে যেতে পারে। অনেক দূরে গিয়ে সে যেন শান্তি পায়। যেন সুখ পায়, সংসার পায়, স্বামী পায়, সন্তান পায়।

আর-একটা বজরা তখন পেছন থেকে আরো জোরে ছুটে চলেছে। আরো জোরে, আরো বেগে সে ছুটছে। মীরন বজরার পাটাতনের ওপর দাঁড়িয়ে দূরে দেখবার চেষ্টা করে। আরো জোরে চালাও, আরো জোরে। দেরি হলে সর্বনাশ হয়ে যাবে, মুর্শিদাবাদের মসনদ হাত-ছাড়া হয়ে যাবে—

আর ওদিকে চেহেল্-সুতুনের ভেতরে তখন দরবার বসেছে। ফুল দিয়ে সাজিয়ে দেবার ব্যবস্থা করে গেছে মীরন সাহেব।

উমিচাঁদ জগৎশেঠজীর পাশেই এসে বসেছে। শুধু উমিচাঁদ নয়, সবাই এসেছে। এসেছে মনসুর আলি মেহের মোহরার, এসেছে মেহেদী নেসার, এসেছে মীর দাউদ, মীরকাশিম, ইয়ার লুৎফ খাঁ, দুর্লভরাম, রেজা আলি, নন্দকুমার। ফিরিঙ্গীদের দলে এসেছে ওয়াটসন্, ড্রেক, কিল্‌প্যাট্রিক, ওয়াটস্, মুন্সী নবকৃষ্ণ। কে আসেনি?

বিকেল বেলা যখন উমিচাঁদ টাকার জন্যে ছট্‌ফট্ করেছিল, তখন জগৎশেঠজী সান্ত্বনা দিয়েছিলেন—আপনি অত ভাবছেন কেন, আপনার সঙ্গে যখন চুক্তি হয়েছে, তখন তা ফিরিঙ্গীরা মানবেই—

উমিচাঁদের তবু ভয় যায়নি। বলেছিল—আমার আর কাউকেই বিশ্বাস নেই জগৎশেঠজী—

জগৎশেঠজী বলেছিলেন—কিন্তু আপনিই কি নবাবের বিশ্বাস রেখেছেন উমিচাঁদ সাহেব?

এ-কথার কোনো উত্তর দেয়নি উমিচাঁদ।

জগৎশেঠজী জিজ্ঞেস করেছিলেন—ক্লাইভ সাহেব কোথায়?

—চেহেল্-সুতুনের মালখানায় গেছে—

—তা আপনি সঙ্গে গেলেন না কেন?

—আমাকে সঙ্গে নিলে না। সঙ্গে গেল মুন্সী নবকৃষ্ণ।

—তারপর?

—তারপর আর কী! তারপর থেকে তো আর আমার সঙ্গে দেখাই করছে না সাহেব। আর তারপর তো আপনার সঙ্গে এখানে এলুম। এখানে এসেও তো সাহেব ব্যস্ত—

মনসুর আলি কাগজে লেখা নামগুলো একে একে পড়ছে; আর মীরজাফর সাহেব এক-একজনকে নজরানা দিচ্ছে।

—গুলসন্ বেগম!

বশীর মিঞা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল একপাশে। মনসুর আলি মেহেরও দাঁড়িয়ে ছিল। মীরজাফর আলি মসনদের ওপর বসে আছে। নিজামত সরকারের আমলা-ওমরাও সবাই হাজির। সারা মুর্শিদাবাদের লোক আজ শহর-গ্রাম-জনপদ ঝেঁটিয়ে এসে চেহেল্-সুতুনের আম-দরবারে হাজির হয়েছে। সবাই ভেতরে ঢুকতে পায়নি, সবাইকে ঢুকতে দেওয়াও হয়নি। সকাল থেকেই করোরিয়ান, চৌধুরীয়ান, জমীদারানরা হাজির ছিল। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রও সামনে বসে ছিলেন।

গুলসন বেগমের নাম উঠতেই পেছনের খিড়কি দরজা খুলে এসে হাজির হলো একজন। সঙ্গে বাঁদী।

মীরজাফর খাঁ বললেন—এ সব আপনার হুজুর, আপনি নিন—

সমস্ত বন্দোবস্ত আগে থেকেই ঠিক করা ছিল। হারেমের খোজা-সর্দার পীরালিকে আগে থেকেই হুকুম দেওয়া ছিল। মতিঝিল থেকে আনিয়ে নিয়ে এসে গুণে গুণে রেখে দিয়েছিল চেহেল্-সুতুনে। সমস্ত বেগমরা সকাল থেকে সাজতে-গুজতে, শুরু করেছিল। চোখে সুর্মা দিয়েছিল। বুকে বুটিদার কাঁচুলি পরেছিল। নখে মেহেদী রং লাগিয়েছিল। ঘাগরা, চোলি, ওড়নী, কিছুই বাদ যায়নি।

—পেশমন বেগম!

আজ আর কারো কোনো অভিযোগ নেই। অবশ্য অভিযোগ ছিলও না কোনোদিন। নবাব-হারেমে অভিযোগ থাকতে নেইও কারো। তারপর আর একজন। নহবত-মঞ্জিলে এতক্ষণ মিঞা-কি-মল্লার বাজাচ্ছিল ইন্সাফ্ মিঞা। ছোটে স্যাগ্রেদ প্রাণপণে তব্লায় চাঁটি দিয়ে চলেছে।

—তক্কি বেগম!

সত্যিই ভাঁটার পর জোয়ার এসেছে। আবার ভাঁটা আসবে। তারপর আবার জোয়ার। শতাব্দীর পর শতাব্দী এমনি করেই কেটে যাবে। জন্ম থেকে যে-জীবন শুরু হয়, মৃত্যুতেই তার পূর্ণচ্ছেদ পড়বে। কিন্তু মানুষের পৃথিবীর বুঝি মৃত্যু নেই। তাই আবার জন্ম হয়, আবার মৃত্যু আসে। জন্ম-জন্মান্তরের জীবন তাই অশেষ। শেষের দিকেই তার গতি, কিন্তু সে অশেষ-যাত্রা! সেই অশেষ-যাত্রার যে পথিক তার মনে শঙ্কা নেই, তার মনে বিকার নেই, তার মনে অনুতাপ নেই। সে শুধু বলে চলেছে—তুমি তাকে সুখী করো ঈশ্বর। সে যেন মুর্শিদাবাদের পাপ আর পঙ্কিলতা থেকে অনেক দূরে চলে যেতে পারে। অনেক দূরে গিয়ে সে যেন শান্তি পায়। সে যেন সুখ পায়, সংসার পায়, স্বামী পায়, সন্তান পায়।

—মরিয়ম বেগম!

হঠাৎ সব ওলোট-পালোট হয়ে গেল। মনসুর আলি মেহের সাহেব নাম ধরে ডাকলে। মীরজাফর আলি সাহেব চুপ করে অপেক্ষা করতে লাগলো। কেউ এল না।

এ ওর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলো। এগারজন বেগম এসে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে গেছে। মীরজাফর সাহেব অস্থির হয়ে পেছন দিকে চাইতে

লাগলো। মীরন কোথায়? মীরন?

মীর দাউদ সাহেব চাইলে একবার মীরকাশিম সাহেবের দিকে। মেহেদী নেসার সাহেব চাইলে রেজা আলির দিকে। কিন্তু সবাই বোবা।

—মরিয়ম বেগম?

নহবত-মঞ্জিলে ছোটে সাগ্‌রেদ হঠাৎ বলে উঠলো—চাচা!

ইন্‌সাফ মিঞা তখন মিঞা-কি-মল্লারের নিখাদে গিয়ে সবে ঠেকেছে। সুরটা থামিয়ে চাইলে ছোটে সাগ্‌রেদের দিকে।

ছোটে সাগ্‌রেদ বললে—চাচা, মরিয়ম বেগম সাহেবার পাত্তা মিলছে না—

মীরজাফর আলির মাথায় যেন তখন বজ্রাঘাত হয়েছে। খোজা সর্দার পীরালির দিকে একবার চাইলে। বরকত আলি, নজর মহম্মদ তারাও কিছু হদিস দিতে পারলে না।

ক্লাইভ সাহেব চুপ করে বসে ছিল। মীরজাফর আলি কথা দিয়েছিল, আম-দরবারে মরিয়ম বেগমসাহেবাকে হাজির করা হবে। কিন্তু কোথায় কী! নবাব মীর্জা মহম্মদের বারোজন বেগমের মধ্যে এগারজনকে পাওয়া গেল। আর একজনকে পাওয়া গেল না। কোথায় গেল সে?

—মরিয়ম বেগম! মরিয়ম বেগম!

মুর্শিদাবাদ থেকে অনেক দূরে মীরনের বজরাটা তখন আরো জোরে ছুটে চলেছে। আরো বেগে। এতক্ষণ ছ'টা বজরা বেগমদের নিয়ে বোধ হয় ভগবানগোলার দিকে পেঁছে গেছে। জোরসে চালাও মাঝি, জোরসে চালাও—

কিন্তু অশেষ-যাত্রার পথিক তখন একমনে প্রার্থনা করে চলেছে—তুমি তাকে সুখী করো ঈশ্বর। সে যেন মুর্শিদাবাদের পাপ আর পঙ্কিলতা থেকে অনেক দূরে চলে যেতে পারে। অনেক দূরে গিয়ে সে যেন শান্তি পায়। সে যেন সুখ পায়, সংসার পায়, স্বামী পায়, সন্তান পায়।

চেহেল্‌-সুতুনের আম-দরবারে মীরজাফর সাহেব তখন শেষবারের মত ডাকলে—মরিয়ম বেগম্‌!

শান্তি পর্ব

এই শেষ। শেষ, কিন্তু শুরুও বটে। ইতিহাসের এক অধ্যায়ের শেষ, আর-এক অধ্যায়ের শুরু। মানুষের জন্ম আছে, আবার মৃত্যুও আছে। জন্ম-মৃত্যুর টানাপোড়েনে যেমন এক অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়েছে, তেমনি শুরু আর শেষের সমন্বয়ে সৃষ্টি হয়েছে এক অশেষ ইতিহাস। সেই অশেষ ইতিহাসের একটা ভগ্নাংশ নিয়ে উদ্ধব দাস লিখে গিয়েছেন এই 'বেগম মেরী বিশ্বাস।' শেষ-জীবনে উদ্ধব দাস আর ঘর থেকে বেরোতেন না। চব্বিশ পরগণার কান্তনগরের একটা কুঠি-বাড়িতে বসে বসে নিজের মনে এই কাব্য লিখতেন। বেগম মেরী বিশ্বাস ক্লাইভ সাহেবকে বলে এই জমিটার ইজারা দিয়েছিলেন তাঁকে। হিন্দুস্থানে তখন ফিরিঙ্গী রাজত্ব কায়েম হয়ে গিয়েছে। মীরজাফর সাহেব তখন শুধু আর শুকনো মীরজাফর নয়, সুজা-উল-মুলক্ হিসাম্-উ-দ্দৌলা আলি মহব্বৎ জঙ্গ খাঁ বাহাদুর। মীরনও তখন সাহাবত্ জঙ্গ। এমন কি মীরজাফরের ভাই কাজেম খাঁ পর্যন্ত হেবাৎ জঙ্গ বাহাদুর।

আর ক্লাইভ?

কর্নেল রবার্ট ক্লাইভ যতদিন ইণ্ডিয়ায় ছিল, ততদিন শুধু লড়াই-ই করেছে। লড়াই করেছে বাইরের সঙ্গে আর ভেতরের সঙ্গে। লড়াই করেছে মুর্শিদাবাদের নবাবদের সঙ্গে আর নিজের অন্তরাত্মার সঙ্গে। নিজের অন্তরাত্মার সঙ্গে লড়াইটাই ছিল তার বড় কঠোর। সেখানে কারো সাহায্য সে পায়নি। রাত্রে যখন ঘুম হতো না তখন শুধু এক দাগ ওষুধ খাইয়ে দিতে হতো তাকে। সেই বিষের ওষুধ একটু বেশি খেলেই হয়তো চিরকালের মত সব যন্ত্রণার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে যেত। কিন্তু দুর্ভোগের যে-মেয়াদ তাকে সারাজীবন সহ্য করতে হবে, তার আগে নিষ্কৃতি হবে কী করে?

মনে আছে সেদিনকার সেই দুর্যোগের কথা। দুর্যোগই বৈ কি। দরবার হবে চেহেল্-সুতুনের ভেতরে। তার আগেই সব বন্দোবস্ত ঠিক করে নিতে হবে। যে-নবাব কয়েদী হয়ে আছে সেই নবাবের চেয়ে যারা নবাবকে কয়েদ করেছে, তারা আরো শয়তান।

রবার্ট ক্লাইভ বলেছিল—এই মীরজাফর, এই মীরন এদেরও বিশ্বাস নেই—

মেজর কিল্প্যাট্রিক বলেছিল—ওরা বলছিল নাকি ওদের সোল্জারদের মাইনে দেওয়া হয়নি টাকার অভাবে।

—তার মানে, যে-টাকা আমাদের দেবে বলে কনট্র্যাক্ট হয়েছে, তা দেবে না?

—হয়তো ওই বলে এড়াতে চাইছে নিজেদের কথা।

ক্লাইভ বললে—তাহলে তার আগেই চেহেল্-সুতুনের মালখানায় ঢুকতে হবে, আর দেরি করা চলে না—

মীরজাফর আলি সাহেব তখন এমনিতেই খুশী, শুধু খুশী নয়, মহাখুশী। সুজা-উল-মুলক্ হিসাম-উ-দ্দৌলা আলি মহব্বৎ জঙ্গ খাঁ বাহাদুর। বললে—আমিও সঙ্গে যাবো কর্নেল—

ক্লাইভ বললে—না—

—কিন্তু কোথায় মালখানা তা আপনি চিনবেন কী করে কর্নেল? আমি চিনি কোথায় আছে মালখানা।

ক্লাইভ তবু অচল-অটল। বললে—না, আমি নিজেই চিনে নিতে পারবো—

মীরজাফর বললে—কিন্তু যদি একবার ভুল-ভুলাইয়ার মধ্যে ঢুকে পড়েন?

—ভুল-ভুলাইয়া? হোআট ইজ ভুল-ভুলাইয়া, মুন্সী?

মুন্সী নবকৃষ্ণ বললে—হুজুর, গোলক-ধাঁধা।

তাতেও বুঝতে পারলে না ক্লাইভ সাহেব। গোলক-ধাঁধা মানে কী?

মুন্সী বুঝিয়ে দিলে। নবাব সুজাউদ্দীন এই ভুল-ভুলাইয়া তৈরি করিয়েছিল বেগমদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলবে বলে। ওখানে একবার ঢুকলে আর বেরোন মুশকিল। এককালে ওই ভুল-ভুলাইয়াতে নবাবেরা খেলতো।

—তাহলে আপনার সর্দার-খোজাকে সঙ্গে দিন, সে আমাদের রাস্তা দেখাবে!

তা তাই-ই ঠিক হলো। আর সবাই বাইরে রইলো। ভেতরে ঢুকলো কর্নেল রবার্ট ক্লাইভ, নবকৃষ্ণ মুন্সী, খোজা-সর্দার পীরালি খাঁ, ওয়াটস্ আর তার একজন মুন্সী। মুন্সী রামচাঁদ।

যে চেহেল্-সুতুনে একদিন হাসি আর কান্না, রূপ আর রুপো, যৌবন আর জঙ্ঘা উলঙ্গ হয়ে লীলারঙ্গ চালিয়েছে, সে চেহেল্-সুতুন তখন স্তব্ধ। সেদিন তার কোটরে কোটরে যেন শতাব্দীর পার থেকে আবার মৃত আত্মারা ফিরে এসে উঁকি দিয়ে দেখছে। এ কে এলো? এরা কারা? আমরা বাঙলা-মুলুকের মাজ্‌মুনদের রক্ত তিল-তিল করে আহরণ করে এখানে জমা করে রেখেছি। এ আমাদের আজম-ই-খাস। এর শরিকানা আমাদের। এর দাখিল আমরা বাইরের কাউকে দেবো না। তোমরা কোন্? কেন এখানে এলে? দূর হটো, দূর হটো!

ক্লাইভ সাহেব চারদিকে চেয়ে দেখলে। দেখতে দেখতে তাজ্জব হয়ে গেল। এত বিলাস, এত প্রপার্টি, এত ঐশ্বর্য!

সেদিন ক্লাইভ সাহেব সেই চেহেল্-সুতুনের ভেতরে ঢুকে যেন মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মনে হয়েছিল, এ জীবন নয়, এই-ই মৃত্যু। এরই নাম মূর্তিমান মৃত্যু। এই মূর্তিমান মৃত্যুর গহ্বরে দাঁড়িয়েই ক্লাইভ সাহেবের হৃদয়ঙ্গম হয়েছিল যে, এ থাকতে পারে না। মানুষের দেনা-পাওনার হিসেব নেবার দিন যখন এসে গেছে তখন এই চেহেল্-সুতুনের অস্তিত্ব থাকা অন্যায়। বহুদিন আগে চক্-বাজারের খুশবু তেলের দোকানের মালিক সারাফত আলি যা বলেছিল, সেদিন ক্লাইভ সাহেবও সেই কথাই বললে।

চারদিকে অলিন্দের ফোকরে ফোকরে কয়েকটা পায়রা তখন বক্-বকুম শব্দ করে ডেকে উঠছিল। ক'দিন কেউ নেই চেহেল্-সুতুনে, ক'দিন ধরে রান্না হয়নি বাবুর্চিখানায়, ঝাঁট পড়েনি দৌলত্‌খানায়, বারবাগে। ক'দিন ধরে ভিস্তিখানায় জল তোলা হয়নি, ধোবিখানায় কাপড় কাচা হয়নি। সমস্ত চেহেল্-সুতুনটা যেন হাহাকারে খাঁ খাঁ করছে। বুড়ো সারাফত আলি বেগমদের আরক খাইয়েও যা করতে পারেনি, ক্লাইভ সাহেব সাত-সমুদ্র তের-নদী পেরিয়ে এসে বিশ্বাসঘাতকতার রসদ জুগিয়ে যেন ন' ঘণ্টার লড়াইতেই তাই-ই করে ফেলেছে।

একে একে সব দেখা হলো। খোজা-সর্দার পীরালি খাঁ পাকা খিদ্‌মদ্‌গার। বেগমদের মহলগুলো দেখালে, ভুল-ভুলাইয়া দেখালে। কোথায় কোন্ মসজিদে বেগমরা নমাজ পড়তো তাও দেখালে, কোথায় নবাব সুজা-উ-দ্দীন বেগমদের নিয়ে

দাবা খেলতেন তাও দেখালে। এক-একটা করে জায়গা দেখায় আর তাজ্জব হয়ে যায় মুন্সী রামচাঁদ, মুন্সী নবকৃষ্ণ, ওয়াটস্ আর কর্নেল ক্লাইভ।

সেদিন নবাবের খাজাঞ্চিখানায় পাওয়া গিয়েছিল এক কোটি ছিয়াত্তর লাখ রুপোর টাকা, বত্রিশ লাখ সোনার টাকা, দুই সিন্দুক ভর্তি সোনার পাত, চার সিন্দুক ভর্তি হীরে পান্না মুক্তো এইসব। আর দুটো ছোট সিন্দুক ভর্তি শুধু জেবর—শুধু গয়না। বাঙলা-মুলুকের মাজ্‌মুনদের রক্ত নিংড়ে নিংড়ে নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর আমল থেকে নবাব-নিজামতে যা-কিছু জমেছিল সব-কিছুর হিসেব হলো সেদিন।

কিন্তু যেটা হিসেব হলো না সেটা ছিল নানীবেগমের মালখানায়। সেখানে কেউ ঢুকতে পেলে না। বড় দুর্গম সে-জায়গাটা। সেখানে বাতাস বন্ধ, আকাশ সঙ্কীর্ণ, আর অন্ধকার সেখানে বড় সজীব। এখানে কেউ এসো না। যে আসবে সে প্রাণ নিয়ে ফিরবে, কিন্তু পরমায়ু নিয়ে ফিরতে পারবে না।

মুন্সী রামচাঁদ ক্লাইভের এক নম্বর মুন্সী। কিন্তু মুন্সী নবকৃষ্ণ উমিচাঁদ সাহেবের দেওয়া লোক। ক্লাইভ সাহেবের আরো বেশি পেয়ারের লোক।

মুন্সীর চোখ দুটো প্রথমে সে-অন্ধকার সহ্য করতে পারেনি। মালখানার সিন্দুকগুলো খুলতেই চোখে ধাঁধা লেগে গেল।

খোজা-সর্দার পীরালি খাঁ ধরে ফেললে তাই রক্ষে। নইলে পড়েই যাচ্ছিল।

ক্লাইভও উঁকি মেরে দেখলে—হোয়াট্ ইজ দিস? এগুলো কী?

মুন্সী বললে—সোনা হুজুর, গোল্ড! পিওর গোল্ড—

ক্লাইভ বললে—এত?

মুন্সী নবকৃষ্ণ বললে—এত কোথায় হুজুর, এ তো সামান্য—

—এ সব কী করে নেবো?

মুন্সী রামচাঁদকে সঙ্গে করে আনা উচিত হয়নি। তার চোখ দুটোও যেন গোল হয়ে গেছে। এখানে এত সম্পত্তি আছে, তা আগে জানলে মুন্সী নবকৃষ্ণ এক-নম্বর মুন্সীকে আর সঙ্গে করে আনতো না। তাকেও ভাগ দিতে হবে।

পীরালি খাঁ হাত দিয়ে সোনার পাতগুলো তুলতে যাচ্ছিল। ভারী জিনিস সব। পীরালি খাঁ নিজেও কখনো এ-সব দেখেনি। এ-সবের কল্পনা করতেও শেখেনি। শুধু জেনে এসেছে নবাব মানেই খোদাতালাহ্। শুধু জেনে এসেছে নবাব-বাদশা-বেগমদের কোনো দিন কেউ প্রশ্ন করতে পারবে না, কেউ তাদের কাছে কোনো জবাবদিহি চাইতে পারবে না। তারা অবাঙ্‌মানসোগোচর আল্লা, আমাদের নাগালের বাইরে।

ক্লাইভ বললে—এসব কী করে নেবো মুন্সী?

রামচাঁদ বললে—ওদের বললেই ওরা সব তোরঙ্গ ভর্তি করে পাঠিয়ে দেবে কলকাতায়—

—না না না, হুজুর!

মুন্সী নবকৃষ্ণর মাথায় কূটবুদ্ধিটা খুব খেলে। টপ্ করে বললে—না না না হুজুর, এসব ওদের দেখালে ওরাও ভাগ চাইবে হুজুর, তার চেয়ে আমরা তিনজনে ভাগ করে নিই—

তা সেই ব্যবস্থাই হলো। কেউ জানলো না নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলার চেহেল্-সুতুনের গোপন মালখানায় কত সম্পত্তি ছিল, কেউ দেখতেও পেলে না।

যখন বেরিয়ে এল তিনজন তখন বাইরে ওয়াট্‌স্‌ দাঁড়িয়ে ছিল।

ওয়াট্‌স্‌ জিজ্ঞেস করলে—মালখানার কী ছিল?

মুন্সী নবকৃষ্ণ বললে—কিছু ছিল না সাহেব, নবাব-বেটা সব সরিয়ে ফেলেছে রাতারাতি—

কিন্তু বহু দিন পরে এই উদ্ধব দাসই লিখেছে মুন্সী নবকৃষ্ণ আর মুন্সী রামচাঁদের কথা। মুন্সী রামচাঁদ পরে যখন আন্দুল রাজবাড়ির প্রতিষ্ঠা করে, তখন তার মৃত্যুর সময়ে যে সম্পত্তি রেখে গিয়েছিল তার মধ্যে ছিল নগদে আর কাগজে বাহাত্তর লক্ষ টাকা, হীরে-জহরতে বিশ লাখ, আঠারো লাখ টাকার জমিদারি আর চারশো কলসী, তার মধ্যে আশিটা সোনার আর বাকি সব রুপোর। মোট সওয়া কোটি টাকার সম্পত্তি।

আর মুন্সী নবকৃষ্ণ?

মাতৃশ্রাদ্ধে যিনি বারো লাখ টাকা খরচ করেছেন, তার খ্যাতি আজকালকার আমরাও জানি। উদ্ধব দাসের 'বেগম মেরী বিশ্বাস' কাব্য পড়তে পড়তেও তার প্রমাণ পেলাম।

কিন্তু ক্লাইভ সাহেব, যে ছ' টাকা মাইনের রাইটারের চাকরি নিয়ে ইণ্ডিয়ায় এসে দেশে ফিরে গেল ইংলণ্ডের সব চেয়ে বড়লোক হয়ে, তার কথাও লিখতে বাকি রাখেনি উদ্ধব দাস। দেশে ফিরে গিয়েও পোয়েটকে চিঠি লিখেছে কর্নেল সাহেব। ছ'মাসে একটা চিঠি আসতো। বড়লোক সাহেব, কিন্তু ইণ্ডিয়ার গরীব পোয়েটকে হয়তো ভুলতে পারেনি। বউ পেগীর কথা লিখতো, ছেলে-মেয়েদের কথা লিখতো। আর লিখতো নিজের কথা। দুঃখ করে অনেক কথা লিখতো সাহেব। লিখতো, ইণ্ডিয়ায় যে-ক'বছর কাটিয়েছে সেই ক'বছরই বড় সুখের সময় গেছে। তার জীবনে কোনো সুখ নেই আর। দেশের লোক তার নামে মামলা করেছে। তার নামে কলঙ্ক রটিয়েছে, তাকে চোর বলে রাজার দরবারে নালিশ করেছে।

একটা চিঠিতে লিখেছিল—তোমার মত যদি গরীব হতাম পোয়েট, তোমার মত যদি আন্‌সাক্‌সেসফুল হতাম, তাহলেই হয়তো ভাল হতো। কেন আমি বেঙ্গল কন্‌কার করতে গেলাম, কেন আমি সাক্‌সেসফুল হলাম!

আর একটা চিঠিতে লিখেছিল—আবার আমার সেই অসুখটা হয়েছে পোয়েট, আবার বিছানায় গিয়ে ঘুমোলেই সেই লোকটা আসে। সেই সাক্‌সেস। এসে আমাকে তাস দেখায়। সেই কুইন অব স্পেড্‌স্‌। সেই ইস্কাবনের বিবি। আবার সেই বিষ খেতে হয়। আমি বোধ হয় আর বেশি দিন বাঁচবো না পোয়েট...

সত্যিই আর বেশি দিন বাঁচেনি সাহেব। পরে তার বউ-এর চিঠিতে সে-কাহিনী জানতে পেরেছিল উদ্ধব দাস। একদিন তাস খেলতে বসেছিল সাহেব। অনেক দিন ধরেই ঘুম হচ্ছিল না রাত্রে। ইণ্ডিয়াতে যে-লোক ব্রিটিশ এম্পায়ার প্রতিষ্ঠা করলে তারও কিনা ঘুম হতো না অশান্তিতে। অর্থের অশান্তি, খ্যাতির অশান্তি, সাক্‌সেসের অশান্তি। সেই অশান্তিই যেন রাত্রে ঘরে ঢুকতো।

—কে? কে? কে তুমি? সাহেব গলা ছেড়ে চিৎকার করে উঠতো ঘুমের মধ্যেই।

লোকটা বলতো—আমি সাক্‌সেস—

—কিন্তু কী চাই তোমার? কেন আসো আমার কাছে?

—এটা চিনতে পারো?

সেই তাস! সেই ইস্কাবনের বিবি। সেই কুইন অব স্পেড্‌স্!

আর সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে উঠতো সাহেব! তখন পেগী পাশের ঘর থেকে দৌড়ে আসতো। এসে সেই ঘুমের ওষুধটা এক দাগ খাইয়ে দিত। সেই বিষ!

একবার ক্লাইভ সাহেবের বউ লিখেছিল—এই মেরী বেগম কে? রবার্ট মেরী বেগমের কথা প্রায়ই বলে। রবার্ট ইণ্ডিয়ার যত লোকের সঙ্গে মিশেছে তাদের কারো নাম বিশেষ বলে না, কেবল মেরী বেগমের নাম করে, তোমার নাম করে, আর কেবল আর-একজনের নাম করে। তার নাম কান্ত সরকার। কান্ত সরকার কে? হু ইজ হি?

এই রকম কত চিঠি লিখেছে ক্লাইভ সাহেবের বউ। একবার লিখেছিল—রবার্ট বলে, আমি গিয়েছিলাম ইণ্ডিয়া কন্‌কার করতে, মেরী বেগম আমাকেই কন্‌কার করে নিয়েছে। নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলাকে আমি হারিয়েছি, কিন্তু মেরী বেগম আমাকেই হারিয়ে দিয়েছে।

সত্যিই, মেরী বেগম যে এমন করে সবাইকে হারিয়ে দেবে তা কেউ কল্পনা করতে পারেনি। হাতিয়াগড়ের রাজবাড়ির নগণ্য নফর শোভারাম বিশ্বাসের নগণ্যতর একটা মেয়ে যে এমন করে হিন্দু-মুসলমান-খৃষ্টান সব সম্প্রদায়ের লোককে হারিয়ে দেবে তা শেষ পর্যন্ত কেউ স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেনি সেদিন। ক্লাইভ সাহেব মাদ্রাজে কাটিয়েছে, বেঙ্গলে কাটিয়েছে, আরো কত জায়গায় কত দেশে কত লোকের সঙ্গে প্রাণ খুলে মিশেছে, কিন্তু এমন করে কখনো হেরে যায়নি। ক্লাইভ সাহেব নিজে দু'বার আত্মহত্যা করতে গেছে, দু'বারই পারেনি। কিন্তু তা বলে এমন করে মৃত্যু?

মেরী বেগম বলেছিল—মরতে আমি ভয় পাই না সাহেব—

ক্লাইভ সাহেব বলেছিল—মরতে আমিও ভয় পাই না। কিন্তু মরতে পারি কই?

মেরী বেগম বলেছিল—মরবার সাহস চাই, সকলের তো সে-সাহস থাকে না—

ক্লাইভ বলেছিল—আমার সাহস নেই বলতে চাও?

—খুন করার সাহস তোমার আছে, মরবার সাহস নেই।

ক্লাইভ বলেছিল—আমিই কি তোমার নবাবকে খুন করেছি বলতে চাও?

—তুমি খুন করেছো না তো কে খুন করেছে?

—সে কী? আমি কখন খুন করতে গেলাম! সে তো মীরন করেছে। আমি তো তোমাকে কথা দিয়েছিলুম তোমার নবাবকে আমি বাঁচিয়ে দেবো। শুধু নবাবকে একলা কেন, তোমার রাণীবিবিকেও বাঁচিয়ে দেবো, তোমার কান্তকেও বাঁচিয়ে দেবো।

সত্যিই কথা দিয়েছিল ক্লাইভ! কিন্তু সে-কথা শেষ পর্যন্ত রাখতে পারেনি। রাখতে না-পারার জন্যে দুঃখও ছিল প্রচণ্ড। বলতে গেলে কাউকেই বাঁচাতে পারেনি সাহেব। শেষকালে একদিন ইণ্ডিয়া ছেড়ে চিরকালের মত চলে গিয়েছিল। বহুদিন পরে দেশে ফিরে গিয়েও হয়তো শান্তি পায়নি। তারপর একদিন তাস খেলতে বসেছিল নিজের বাড়িতে। খেলতে খেলতে হঠাৎ একটা তাস পেয়েই সাহেব উঠে দাঁড়ালো।

ক্লাইভের স্ত্রী জিজ্ঞেস করলে—কী হলো, উঠলে যে?

ক্লাইভ সে-কথার উত্তর না দিয়ে ঘর ছেড়ে পাশের ঘরে চলে গেল।

—কী হলো? কোথায় যাচ্ছো?

অনেক জন্ম দেখেছে ক্লাইভ, অনেক মৃত্যুও দেখেছে। অনেক উত্থান দেখেছে, অনেক পতন। অনেক শুরু দেখেছে, অনেক শেষ। কাজ করেছে সারা জীবন, কাজ করতে করতে গ্রন্থি পড়েছে। আবার সেই গ্রন্থি নিয়ে অনেক কাজ বেড়েছে। সেটা খুলতে ছিঁড়তে অনেক টানাটানি করেছে। তাতে সম্মানের চেয়ে বদনামই হয়েছে বেশি। দেশের লোকই বদনাম দিয়েছে। তাকে জাতিচ্যুত করেছে, চোর বলেছে, গালাগালি দিয়েছে, একঘরে করেছে...

—কী হলো? কোথায় যাচ্ছো তুমি?

পাশের ঘরে গিয়ে সেদিন বৃদ্ধ ক্লাইভ সে-ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। পেগী ক্লাইভের কান্ড দেখে অবাক হয়ে গিয়েছে! কী হলো? দরজা বন্ধ করলে কেন?

হঠাৎ...

কিন্তু সে-কথা এখন থাক। যে-মানুষ একদিন পৃথিবীর কোনো মানুষের প্রীতি পায়নি, কোনো মানুষের সম্মান পায়নি, কোনো দেশের সুবিচার পায়নি, তার জীবনটা ব্যর্থ হয় হোক, তার জীবনের ব্যর্থতাটাও মিথ্যে হয় হোক, কিন্তু তার জীবনের ব্যর্থতার বেদনাটা অন্তত সত্য হয়ে উঠুক, সেই বেদনার বহ্নিশিখায় 'বেগম মেরী বিশ্বাস' কাব্যও পবিত্র হয়ে উঠুক। উদ্ধব দাসের লেখার প্রতি ছত্রে সেই বেদনা প্রমূর্ত হয়ে উঠেছে দেখলাম।

কিন্তু না, সে-কথা সত্যিই এখন থাক। কারণ তার আগে বেগম মেরী বিশ্বাসের কথা বলতে হবে, মরিয়ম বেগমের কথা বলতে হবে। মেরী বেগমের কথা বলতে হবে। মরালীর কথা বলতে হবে। মরালীর ব্যর্থতার বেদনার কথা না বললে যে ক্লাইভের ব্যর্থতার বেদনা নিরর্থক হয়ে যাবে!

মেরী বেগম!

সেদিন দমদমের সবাই জানতো তাকে মেরী বেগম বলে। কত দূর দূর থেকে লোক আসতো মেরী বেগমের কাছে সাহায্য চাইতে। যেদিন মুর্শিদাবাদ থেকে প্রথম ওখানে এসে উঠেছিল সেদিন তারা দেখেছিল পালকি থেকে নামলো একটি বউ। তখনো তারা জানতো না সে কে। কতদিনই বা ছিল। সামনেই ফিরিঙ্গীদের ফৌজের আস্তানা। ক্যান্টনমেণ্ট। হাতী থাকতো অনেকগুলো। কামান টানবার হাতী। আর ঘোড়া—হাজার হাজার ঘোড়া। আর ফৌজের সেপাই। সেপাইরা সামনের মাঠে কুচ্-কাওয়াজ করতো। সন্ধ্যের পর তারা কাঠ জ্বালিয়ে আগুন পোয়াতো।

আর ওই ওপাশে ছিল একটা গীর্জা। যেদিন মরালী এখানে এল সেদিনই চলে গিয়েছিল গির্জায়।

প্রথমে ক্লাইভ আপত্তি করেছিল। বলেছিল—তুমি কেন খৃষ্টান হতে যাবে?

মরালী বলেছিল—একবার যখন মুসলমান হয়েছি, তখন আর খ্রীষ্টান হতেই বা আপত্তি কী?

—যদি কেউ তোমার আপনার লোক আপত্তি করে?

—আপনার লোক আমার আর কে আছে?

—এই পোয়েট?

উদ্ধব দাস পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। উদ্ধব দাস সেই মুর্শিদাবাদ থেকেই সাহেবের সঙ্গে আছে। সেই মনসুরগদিতে যখন তাকে নিয়ে গিয়েছিল, তখন থেকে। কত কাণ্ডই ঘটলো তারপর। কত দুর্ঘটনা আর কত দুর্যোগই মাথার ওপর দিয়ে গেল মরালীর! হাতিয়াগড় থেকে খবর এল নফর শোভারাম বিশ্বাস মারা গেছে। মরালী খবরটা শুনলো। কিন্তু কাঁদলো না।

শুধু বললে—এবার আমি কোথায় যাবো?

—তোমার হাজব্যাণ্ড এই পোয়েট, তারই সঙ্গে যাও—

তারপর উদ্ধব দাসের দিকে চেয়ে সাহেব বললে—পোয়েট, তুমি তোমার ওয়াইফকে নেবে? তোমার ওয়াইফ মুসলমান হয়েছে বলে তাকে নিতে তোমার আপত্তি আছে?

উদ্ধব দাস বললে—আমার কোনো বিকার নেই প্রভু, আমার কাছে সবই সমান। হিন্দু খ্রীষ্টান মোছলমান ভেদাভেদ নাই—

হঠাৎ মরালী বললে—না, আমার আপত্তি আছে—

ক্লাইভ জিজ্ঞেস করলে—তোমার আপত্তি কীসে?

মরালী বললে—আমি নষ্ট—

উদ্ধব দাস বললে—মানুষের দেহ নষ্ট হলে মানুষ নষ্ট হয় না গো—দেহটা তো খোলস্, আত্মায় তো দাগ লাগে না। কী বলেন প্রভু? আত্মার তো লিঙ্গ নাই, মন নাই, অহঙ্কারও নাই, আত্মা তো তোমার নষ্ট হয় নাই!

মরালীর তবু সেই এক কথা। বললে—না, আমি নষ্ট—

তখন আর কোনো উপায়ই ছিল না। সাহেব বললে—তাহলে তুমি দমদমেতেই থাকো—

তা তাই-ই ঠিক রইলো। মরালী বললে—কিন্তু তুমি যে কথা দিয়েছিলে, সকলকে ছাড়িয়ে দেবে! রাণীবিবিকে ছাড়িয়ে দেবে, নবাবকে ছাড়িয়ে দেবে, মতিঝিলের সেই মরিয়ম বেগমকেও ছাড়িয়ে এনে দেবে!

ক্লাইভ বললে—আজই চেহেল্-সুতুনে দরবার আছে, আজই দরবারে আমি মীরজাফর আলিকে মসনদে বসিয়ে দেবো, তারপর নবাবকে ছেড়ে দিতে হুকুম দিয়ে দেবো।

—আর হাতিয়াগড়ের ছোট রাণীবিবি?

—তাদেরও খোঁজ নিয়েছি। মীরন সাহেবের বাড়িতে তাদের রাখা হয়েছিল, কিন্তু সেখান থেকে তারা নিরুদ্দেশ। নেয়ামত বলে একজন নবাবের খিদ্‌মদ্‌গার ছিল, সে তোমার ঘরের দরজা যেমন খুলে দিয়েছিল, হাতিয়াগড়ের রাণীবিবির দরজাও তেমনি খুলে দিয়েছিল, নবাবের ঘরের দরজাও তেমনি খুলে দিয়েছিল। এখন সেখানে মহম্মদী বেগ বলে একজন পাহারা দিচ্ছে। কিন্তু তারপর রাণীবিবিদের আর কোনো খবর পাওয়া যাচ্ছে না—

—তুমি তাহলে নবাবকে ছাড়বার হুকুম দিয়ে দাও—

—দেবো, দরবারের পর আমি চেহেল্-সুতুনে ঢুকবো। সেখানকার মালখানায় কী আছে দেখি, তারপর নবাবের সম্বন্ধে হুকুম দেবো। আমি মীরজাফরকে বলে দিয়েছি যেন আমার পারমিশন না নিয়ে নবাবের সম্বন্ধে কিছু না করা হয়।

মরালী বললে—কিন্তু আমি কলকাতায় চলে গেলে কি সব কথা মনে থাকবে?

ক্লাইভ সাহেব বলেছিল—নিশ্চয় মনে থাকবে, আমার সব কথা মনে থাকে। সব কথা মনে থাকাটাই তো আমার রোগ। আমি কিছু ভুলতে পারি না।

—আর সেই, তার কী হবে?

—তুমি সেই মতিঝিলের মরিয়ম বেগমের কথা বলছো তো? হাতিয়াগড়ের সেই ছোটমশাই আমার কাছে এসেছিল। তার এখনো ধারণা যে মতিঝিলে যে মরিয়ম বেগম কয়েদ হয়ে আছে সে তারই ওয়াইফ। আমি তার সঙ্গে আমার মেজর কিল্প্যাট্রিককে পাঠিয়েছিলাম মতিঝিলে। কিন্তু মরিয়ম বেগম সেখানে নেই—

মরালী চম্‌কে উঠলো। বললে—সে কী? কী বলছো তুমি? কোথায় গেল সে?

ক্লাইভ সাহেব বললে—বুঝতে পারছি না। শুনলাম, নানীবেগম, আমিনা বেগম, ময়মানা বেগম, ঘসেটি বেগম, লুৎফুন্নিসা বেগম, তাদের সকলের সঙ্গে মরিয়ম বেগমকেও কোথায় সরিয়ে নিয়ে গিয়েছে—

—কে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছে?

—বোধ হয় মীরন। মীরজাফরের ছেলে।

মরালী বললে—তা মীরনকে তুমি গ্রেফতার করতে পারছো না? তোমার সেপাই রয়েছে, ফৌজ রয়েছে, তোমার কামান রয়েছে, বন্দুক রয়েছে, তাকে তুমি জব্দ করতে পারছো না? তাহলে তুমি কীসের কর্নেল, কীসের ফিরিঙ্গী?

ক্লাইভ হাসলো। বললে—আমি খোঁজ নিয়েছি তার, কিন্তু সে পালিয়েছে—

—পালিয়েছে মানে? মুর্শিদাবাদ থেকে পালিয়েছে?

—হ্যাঁ।

—মুর্শিদাবাদ থেকে পালিয়েছে বলে তাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না? তাহলে নবাব মীর্জা মহম্মদকে খুঁজে পাওয়া গেল কী করে? সে কি আকাশে উড়ে গেল? তোমরা খোঁজ নেবে না সে বেগমদের কোথায় সরিয়ে নিয়ে গেল? তাকে যে আমার খুঁজে পেতেই হবে!

ক্লাইভ বললে—আমি তো তোমাকে কথা দিয়েছি তাকে খুঁজে বার করবো—

—কবে? কবে খুঁজে বার করবে?

ক্লাইভ বললে—এখনই। এখনই আমি মেজরকে ডেকে পাঠাচ্ছি। তাকে তোমার সামনেই বলবো সেই বেগমদের খুঁজে বার করতে। তাকেই বলবো তোমাকে নিরাপদে কলকাতায় পাঠিয়ে দিতে—

—তাকে খুঁজে না পেলে আমি যাবো না। আমি কিছুতেই যাবো না এখান থেকে।

ক্লাইভ বুঝিয়ে বললে—তুমি যাও, তোমার ভালোর জন্যেই বলছি তুমি যাও এখান থেকে, তুমি এখানে থাকলে বরং তাকে খুঁজে বার করতে অসুবিধে হবে।

—কিন্তু তাকে না খুঁজে পেলে আমি যাবো না।

ক্লাইভ অবাক হয়ে গেল। বললে—কিন্তু সে তোমার কে?

মরালী বললে—সে?

বলে হাসলো খানিক। পাগলের হাসির মত সে-হাসিটা শোনালো ক্লাইভের কানে। বললে—সে যে কে তা তোমরা বুঝবে কী করে? তোমার জন্যে কেউ কখনো নিজের প্রাণ দিতে গিয়েছে? কেউ কখনো তোমার জন্যে নিজের ক্ষতি হাসিমুখে সহ্য করেছে?

ক্লাইভ বললে—বলছো কী তুমি?

মরালী বললে—কতটুকু আর বলেছি তার সম্বন্ধে! কতটুকু আর জানো তোমরা! কতটুকুই বা তোমরা বুঝতে পারবে! তোমরা তো কেবল যুদ্ধ করতেই শিখেছো, ভালোবাসতে তো শেখোনি।

বলতে বলতে মরালী যেন ভেঙে পড়লো। তারপর সামলে নিয়ে বলতে লাগলো—ওগো, তোমরা ফিরিঙ্গী, তোমরা বুঝতে পারবে না তাকে। তোমাদের বোঝাই এমন ক্ষমতাও আমার নেই—তুমি তাকে যেমন করে পারো আমার কাছে এনে দাও—

—কিন্তু তাকে এনে দিলে তুমি কী করবে?

—কী করবো জানি না। তাকে তুমি যেমন করে পারো নিয়ে এসো।

ক্লাইভ বললে—কিন্তু তাকে তো আর তুমি বিয়ে করতে পারবে না। তুমি তো মুসলমান, আর সে তো হিন্দু—তোমাকে কি আর হিন্দুরা ঘরে নেবে?

মরালী বললে—আমার কোনো জাতই নেই আর। আমি হিন্দু ছিলাম, তারপর মুসলমান হলাম, এবার না-হয় খ্রীষ্টানই হবো—

উদ্ধব দাসের লেখায় পাচ্ছি, এর পর মেজর কিল্‌প্যাট্রিক মরালীকে সেদিন সেই দুর্যোগের মধ্যে লুকিয়ে কলকাতায় পাঠিয়ে দিয়েছিল। কেউ জানতে পারেনি, কেউ সন্দেহও করেনি, কেউ প্রশ্নও করেনি। সবাই জেনেছিল ক্লাইভ সাহেব নবাবের হারেম থেকে নবাবের মালখানা থেকে কিছু দামী জিনিস পেয়েছে, সিন্দুকে ভর্তি করে তাই কলকাতায় পাঠাচ্ছে।

সিন্দুকটা গিয়ে উঠলো বজরায়।

আর সেই বজরায় গিয়ে উঠলো উদ্ধব দাস।

এরপর দমদম্! দমদম্-হাউস্। মরালী আর উদ্ধব দাস চলে যাবার ক'দিন পরেই ফিরিঙ্গী-ফৌজ মুর্শিদাবাদ ছেড়ে চলে এসেছিল। কিন্তু যখন চেহেল্-সুতুনে দরবার চলেছে, মীরজাফর আলি সাহেব ক্লাইভকে ভেট দিয়ে খোসামোদ করছে, তখন ওদিকে আর-এক কাণ্ড!

নেয়ামত মতিঝিলের পুরোন খিদ্‌মদ্‌গার। সে একদিন নবাব মীর্জা মহম্মদের খেদ্‌মৎ করেছে। তার এ দৃশ্য দেখে মনে বোধ হয় খুব কষ্ট হলো। এই নবাবেরই নিমক খেয়েছে এতদিন, আবার এই নবাবকেই কয়েদ থাকতে হচ্ছে, এটা তার সহ্য হলো না। মীরন সাহেব খুব হুঁশিয়ার করে দিয়ে গিয়েছিল তাকে।

ঠিক মত যেন পাহারা দেয় আসামীদের। পর পর তিনটে কামরা। একটা কামরায় নবাব, আর পাশের কামরা দুটোতে বাঁদীরা। আরো কষ্ট হয়েছিল তার নবাবের বেগম লুৎফুন্নিসা বিবির দশা দেখে। তাকে জলুসের মাঝপথ থেকেই মীরন সাহেব পাকড়ে নিয়ে গিয়ে মতিঝিলে তুলেছিল। তারপর তাকে কোথায় পাঠিয়ে দিয়েছিল, তার হদিস নেই।

কাছাকাছি যখন কেউ কোথাও নেই, তখন নেয়ামত একটা কামরার চাবি খুললে। ডাকলে—বিবিজী—

মরালী ভেতরে বসে ভাবছিল কী করবে। হঠাৎ দরজা খুলতে দেখে দরজার কাছে এল।

—কে?

নেয়ামত বললে—বিবিজী, আমি নেয়ামত, আপনি বাইরে বেরিয়ে যান, কেউ কোথাও নেই, খিড়কির ফটক খুলে দিয়েছি, পালিয়ে যান—

মরালী এর পর আর দ্বিরুক্তি করেনি। সোজা খিড়কী দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গিয়েছিল।

এর পর পাশের কামরা। সে-কামরার সামনে গিয়েও ওই রকম।

—বিবিজি, আমি নেয়ামত, আপনারা বেরিয়ে যান, কেউ কোথাও নেই, খিড়কির ফটক খুলে দিয়েছি, আপনারা পালিয়ে যান—শিগ্‌গির—

দুর্গা নেয়ামতকে দরজা খুলতে দেখে চমকে গিয়েছিল। কিন্তু কথা শুনে অবাক হয়ে গেল। এ আবার কে?

কিন্তু নেয়ামত তখন নিজের কাজ সেরে দিয়ে পাশের কামরায় চলে গেছে।

ছোট বউরানী বললে—ও কে রে দুগ্যা? কী বলে গেল?

দুর্গা বললে—আর দেরি নয় ছোট বউরানী, চলো খিড়কি দিয়ে পালাই—

—কোথায় পালাবো রে?

—চলো চলো ছোট বউরানী, আগে এখেন থেকে তো পালাই, তারপরে যে চুলোয় যাই, তখন দেখা যাবে।

বলে আর দাঁড়ায়নি সেখানে। অন্ধকার ঘর থেকে বেরিয়ে একেবারে সোজা খিড়কির দিকে চলে গিয়েছিল। খিড়কির দিক থেকে একেবারে রাস্তা। রাস্তায় তখন লোকে লোকারণ্য। অনেক মানুষের ভিড়। তখন সারা শহরে গোলমাল। সব লোক দরবার দেখবার জন্যে রাস্তায় জড়ো হয়েছিল। অনেকেই দরবারে ঢুকেছে। কিন্তু ঢুকতেও পারেনি অনেকে। ফিরিঙ্গী ফৌজের লোকরা রাস্তায় রাস্তায় ঘোরাঘুরি করছে। তারা নতুন শহরে এসেছে। এ শহর এখন তাদের। তাদের শরিকানা আছে এ-শহরের সম্পত্তির ওপর।

চেহেল্-সুতুনের দরবারে তখন মীরজাফর ডাকছে—মরিয়ম বেগম—

মরিয়ম বেগম হাজির হচ্ছে না।

মীরজাফর আলি সাহেব আবার একবার চিৎকার করে উঠলো—মরিয়ম বেগম!

চুক্তি অনুসারে ক্লাইভ সাহেব পেয়েছে কুড়ি লক্ষ আশি হাজার টাকা। দশ লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা ওয়াটস্। পাঁচ লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা মেজর কিল্‌প্যাট্রিক। পাঁচ লক্ষ টাকা ওয়ালস্। ম্যানিংহাম আর বীচার প্রত্যেকে দু লক্ষ আশি হাজার টাকা। কৌন্সিলের ছ'জন মেম্বর প্রত্যেকে এক লক্ষ টাকা।

টাকার ছড়াছড়ি।

হঠাৎ উমিচাঁদ দাঁড়িয়ে উঠলো—আমি? আমার টাকা কই? আমার ভাগ?

ক্লাইভ সাহেব এতক্ষণ চুপ করে বসে ছিল। বললে—তোমার কীসের ভাগ উমিচাঁদ?

—সে কি সাহেব, আমি যে চুক্তিতে সই করলুম। আমার কুড়ি লাখ টাকা পাবার কথা! তোমাদের সঙ্গে যে আমার রফা হলো?

—এই তো কন্‌ট্রাক্ট, এতে তো তোমার নাম নেই।

উমিচাঁদ কাগজখানার দিকে ভালো করে চেয়ে দেখে চেঁচিয়ে উঠলো—কিন্তু সে লাল কাগজখানা কোথায়? আমি তো লাল কাগজে সই করেছি—এটা তো সাদা—এটা জাল—জাল—

ক্লাইভের মুখখানা গম্ভীর হয়ে উঠলো।

—এটা যদি জাল তো আসল কোন্‌টা?

—আসলটা তোমরা লুকিয়ে ফেলেছো, ছিঁড়ে ফেলেছো, আমায় তোমরা ফাঁকি দিচ্ছ, আমায় ঠকাচ্ছো—

কিন্তু উমিচাঁদ জানতো না যে, সেদিন সাত-সমুদ্র তের-নদীর পার থেকে যারা এতদূরে এসে এ দেশের সিংহাসন দখল করতে পারে তারা জাত-ব্যবসাদার। উমিচাঁদের চেয়েও বড় ব্যবসাদার তারা। ব্যবসায় সততা বলে কিছু থাকতে নেই, থাকলে তা আর ব্যবসা নয়। উমিচাঁদ নিজেও তা ভালো করে জানতো। কিন্তু কুড়ি লাখ টাকার লোভে তখন বোধ হয় সে-কথা ভুলে গিয়েছিল।

মীরজাফর সাহেব থামিয়ে দিলে। বললে—তুমি থামো উমিচাঁদ—

—সে কি, আমি থামবো কেন?

জগৎশেঠ, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র সবাই থামতে বললে উমিচাঁদকে। মুন্সী নবকৃষ্ণও উমিচাঁদকে চুপ করতে বললে। কিন্তু উমিচাঁদের তখন শুধু পাগল হতে বাকি। বললে—তুমি বলছো কি ছোকরা, আমি থামবো? আমার কুড়ি লাখ টাকা খোয়া গেল, আর আমি চুপ করে থাকবো?

দুর্গা আর ছোট বউরানী তখন পায়ে পায়ে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। নতুন জায়গা, জীবনে কখনো মুর্শিদাবাদে আসেনি। রাস্তার মানুষের সামনে কথা বলতেও ভয় হয়। হঠাৎ একটা বাড়ি দেখে মনে হলো সেটা যেন হিন্দুর বাড়ি।

সামনের ফটকে ভিখু শেখ দাঁড়িয়ে ছিল। জেনানা দেখে একটু নরম সুরে বললে—কৌন্‌?

দুর্গা জিজ্ঞেস করলে—এটা কার বাড়ি গো পাহারাদার? হিন্দুর বাড়ি?

ভিখু শেখ বললে—হ্যাঁ, মহারাজ জগৎশেঠ বাহাদুরকা হাবেলি—

—একটু অন্দরে যেতে পারবো বাবা? আমরাও হিন্দু—

আর ওদিকে নেয়ামত তখন পাশের কামরার চাবিটা খুলে ডাকলে—জাঁহাপনা—

—কে?

মীর্জা মহম্মদ বুঝি সেই অন্ধকারের মধ্যেই মুখ তুলে চাইলে।

—আমি নেয়ামত জাঁহাপনা।

—তুমি কেন নেয়ামত? ওরা কোথায় গেল?

মাঝে মাঝে অন্ধকারও বুঝি কথা কয়। অন্ধকার যদি কথা কইতে পারে তো বুঝতে হবে খোদাতালাহ্ বলে সত্যিই কেউ আছে। যদি খোদাতালাহ্ বলে কেউ থাকে তো আমি তার কাছেই আমার আর্জি পেশ করছি আজ। আমি তো কারোর কাছ থেকে আর কিছুই চাই না। আমার যা-কিছু ছিল সব তো ওরা কেড়ে নিয়েছে। তবু আমাকে কেন ওরা কয়েদ করে রেখেছে! আমার লুৎফাকে ওরা নিয়েছে, আমার মেয়েকে ওরা নিয়েছে, আমার মসনদও ওরা নিয়ে নিয়েছে। ওরা আমার চেহেল্-সুতুনে ঢুকে যা-কিছু আমার বলতে ছিল সব কেড়ে নিয়েছে। এবার আমাকে ওরা ছেড়ে দিক-না। আমি আমার জীবনটাকে নিয়ে যে এলোমেলো করে ব্যবহার করেছি তা আমি জানি। আমি যে কারো উপকার করিনি তাও আমি জানি। কিন্তু...

—জাঁহাপনা, আমি নেয়ামত, জাঁহাপনার খিদ্মদ্গার—

না না নেয়ামত, আমি জানি তুমি নেয়ামত নও। আমি জানি আমি স্বপ্ন দেখছি। আমি জানি অন্ধকার কথা বলে। আমি জানি, আমি আমার মতিঝিলে শুয়ে নেই। আমি জানি, মীর দাউদ, মীরকাশিম আর মীরন আমায় কয়েদ করে রেখেছে। আমি জানি আমি জেগে আছি। আমি জানি আমার কেউ নেই। স্বপ্নে তুমি আমায় দেখা দিও না নেয়ামত। আমাকে আশা দিও না, আনন্দ দিও না, আলো দেখিও না।

—এখানে কেউ নেই জাঁহাপনা. আপনি পালিয়ে যান, খিড়কির ফটক খুলে রেখেছি—

আবার? আবার তুমি আমাকে অভয় দিচ্ছ? আমি তো বলেছি আমি হেরে গেছি, আমি লক্কাবাগ থেকে পালিয়েছি। আমি তো স্বীকার করে নিয়েছি যে জীবন সত্য নয়, মৃত্যুই একমাত্র খাঁটি সত্য এই পৃথিবীতে। মৃত্যু যখন সত্য, মৃত্যুর আদেশ যখন সত্য, তখন পরাজয়কেই আমি চরম পরাভব বলে মেনে নিয়েছি। আর আমি কখনো বলবো না যে, আমি বাঁচতে চাই, বলবো না যে আমি মসনদ চাই। আমি তোমাদের সকলের সামনে প্রতিজ্ঞা করছি যে, আমি কখনো বলবো না যে তোমাদের পৃথিবী আমাকে ধারণ করেছে, তোমাদের সূর্য আমাকে জ্যোতি দিয়েছে, তোমাদের বাতাস আমার নিঃশ্বাস যুগিয়েছে। এ-কথাও আমি কখনো বলবো না যে এই মহামনুষ্যলোকে আমি অক্ষয় অধিকার লাভ করে জন্মগ্রহণ করেছি। বলবো না যে এই পৃথিবী আমাকে শান্তি দিয়েছে, আরাম দিয়েছে, গৌরব দিয়েছে; শুধু বলবো, আমাকে এই বিরাট বিশাল পৃথিবীর এক কোণে শুধু একটুকরো জমি দাও, আমি সেখানে সকলের অগোচরে শুধু একটু মাথা গুঁজে থাকবো।

—কর্নেল, কর্নেল!

অনেক রাত্রে ডাকাডাকিতে ঘুম ভেঙে গেল কর্নেল ক্লাইভের।

—কে?

—কর্নেল, আমি কিল্প্যাট্রিক! নবাব খুন হয়ে গেছে।

—খুন! মার্ডার! নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলা?

ক্লাইভ তড়াক করে বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠেছে।

—কিন্তু আমি তো অর্ডার দিয়েছিলাম যে নবাবকে যেন কোনো পানিশমেণ্ট এখন না দেওয়া হয়। আমি তার বিচার করবো। কে মার্ডার করলে?

—মহম্মদী বেগ্।

—সে কে?

কিল্‌প্যাট্রিক বললে—মীরনের লোক।

—মীরন কোথায় এখন?

কিল্‌প্যাট্রিক বললে—এখনো তার কোনো ট্রেস নেই—

—চলো, আমি যাচ্ছি। বলে ক্লাইভ উঠলো। তারপর পোশাক পরে নিয়ে ঘরের বাইরে এল।

ওদিকে অশেষ-যাত্রার পথিক তখন নিঃসীম আকাশের দিকে চেয়ে শুধু একমনে প্রার্থনা করে চলেছে—মরালী যেন মুর্শিদাবাদ থেকে দূরে চলে যেতে পারে ঠাকুর। দূরে চলে গিয়ে সে যেন শান্তি পায়। সে যেন সুখ পায়, সংসার পায়, স্বামী পায়, সন্তান পায়।

পূব থেকে পশ্চিমে, পশ্চিম থেকে উত্তরে, আবার উত্তর থেকে দক্ষিণে। এমনি মাসের পর মাস চলে গেছে। ছ'টা বজরা একবার জাহাঙ্গীরাবাদে গিয়ে কিছুদিন থামে, তারপর সেখানেই থাকে কিছুদিন। তারপর আবার নিরুদ্দেশ-যাত্রা। সার সার বজরাগুলো চলে নদীর ওপর দিয়ে।

মীরন যেন কিছুতেই আর ভরসা পায় না। মেজর কিল্‌প্যাট্রিকের দল তার পেছনে পেছনে ঘোরে। কলকাতা থেকে কর্নেল ক্লাইভ হুকুম দিয়েছে, যেমন করে হোক মীরনকে ধরে আনা চাই। শুধু মীরন নয়। মীরনের সঙ্গে যে-বেগমরা আছে তাদেরও।

সেদিন হঠাৎ ঝম্ ঝম্ করে বৃষ্টি এল। বৃষ্টি এলে কান্তর বড় ভালো লাগে। তখন বড় নিবিড় করে নিজেকে নিজের মধ্যে পায়। তখন একমনে বলে—মরালী যেন মুর্শিদাবাদ থেকে অনেক দূরে চলে যেতে পারে ঠাকুর। দূরে চলে গিয়ে সে যেন শান্তি পায়। সে যেন সুখ পায়, সংসার পায়, স্বামী পায়, সন্তান পায়—

হঠাৎ বজরাটায় যেন একটা দোলা লাগলো। পেছন থেকে চিৎকার উঠলো—ফিরিঙ্গীরা এসেছে, ফিরিঙ্গীরা এসেছে, জোরসে চালাও—জোরসে

কিন্তু জোরে চালাতে বললেই নৌকা জোরে চলে না। ভেতরে জোর না থাকলে বাইরে সে দুর্বল হয়ে পড়বেই। নবাব আলিবর্দীর সময় থেকেই নবাব-নিজামত ফতুর হয়ে গিয়েছে। যেটুকু জোর তখনো ছিল তাও নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলার সময়ে। জোর পাবে কোথা থেকে যে, নৌকো চলবে!

কেউ উৎসব করে ফতুর হয়ে যায়, কেউ ফতুর হয়ে যায় অভাবের চাপে। ১৭৫৭ সালের ২৬শে জুলাই নবাব-নিজামত সত্যিই ফতুর হয়ে গিয়েছিল। টাকা নেই কোথাও। ফিরিঙ্গী কোম্পানীর রসদ যোগাবার জন্যে আরো টাকা চাই। কিস্তিবন্দী হিসেবে লক্ষ লক্ষ টাকা শোধ করতে হবে কোম্পানীর। পরের কিস্তিতে উনিশ লক্ষ টাকা চাই, কোত্থেকে আসবে! হুগলী, কৃষ্ণনগর, বর্ধমান সব জায়গায় চিঠি গেল টাকার জন্যে। রাজকর দাও।

আর এখান থেকে ক্লাইভ কেবল চিঠি লেখে—মরিয়ম বেগমকে আমার চাই—

মীরজাফর সাহেব মসনদে পাকা হয়ে বসে দেখলে, মালখানা নিঃশেষ। তার ওপর ক্লাইভ সাহেবের তাগাদা। জগৎশেঠজীও হাত উপুড় করে না।

মরালী তাগাদা দেয়—কই, খবর পেলে কিছু?

ক্লাইভ বলে—মেজর কিল্‌প্যাট্রিককে পাঠিয়েছি—আর একটু সবুর করো—

খবর যায় মীরনের কাছে। ইতিহাসের তাগিদে যে লোক ইন্ডিয়ায় এসেছিল সাত-সাগর তের-নদী অতিক্রম করে, সে অমনি অমনি আসেনি। অমনি অমনি রাজ্যের উত্থানও হয় না, পতনও হয় না। যখন উত্থানের দরকার হয় তখনই একজন আকবর বাদশার আবির্ভাবের প্রয়োজন হয়, কিংবা একজন শিবাজীর। আবার যখন পতনের দরকার হয় তখনই একজন রবার্ট ক্লাইভের প্রয়োজন অনিবার্য হয়ে ওঠে। একজন গড়বার জন্যে উদয় হয়, আর একজন ভাঙবার জন্যে। প্রতিদিনের ইতিহাসেও একবার আলো, একবার অন্ধকার। প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে জেগে ওঠা, আর রাত্রে ঘুমিয়ে পড়া। জোয়ার-ভাঁটার টানা-পোড়েনে ইতিহাস তার নিজের রাস্তা নিজেই করে চলেছে। ইতিহাস বলছে, আমি উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ করি না, ধনী-নির্ধন বিচার করি না, জ্ঞানী-মূর্খ তারতম্য করি না। অনাদিকাল থেকে শুরু হয়েছে আমার যাত্রা। আমার কাছে মহারাজ অশোকও যা, তার রাজ্যের নির্জন কুটীরের নিঃস্ব প্রজাটিও তাই। প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলেই তোমায় যেতে হবে, জায়গা করে দিতে হবে নতুনকে। সে অনেক দূর থেকে আসছে। তোমার গরুর গাড়ি, তোমার নৌকোর যুগ শেষ হয়ে এসেছে। এবার তাদের দেশ থেকে আসছে স্টীম ইঞ্জিন, কলের জাহাজ, ছাপাখানা। আসছে ধান-ভানার কল, কাপড়-বোনার মিল। আসছে নোট ছাপানোর মেশিন, আসছে গান শোনানোর গ্রামোফোন, আসছে ছবি তোলার ক্যামেরা। এবার ওদের জোয়ার এসেছে, আর তোমাদের ভাঁটা। ওদের সঙ্গে তোমরা পারবে কেন?

তুমি কাঁদছো? তোমার বাঙলা মুলুকের নবাব খুন হলো বলে তুমি কাঁদছো? কিন্তু নবাবকে যদি আজ বাঁচিয়ে রাখি তো তোমাদের ভাঁটার কাল যে কাটবে না। তোমাদের গরুর গাড়ি আর নৌকোর যুগ যে শেষ হবে না!

—কে?

ভাঁটার দেশের নবাব মুখ তুলে চাইলে।

—আমি মহম্মদী বেগ!

—আমাকে তুমি খুন করতে এসেছো তো? কিন্তু আমি তো তেমন কোনো অন্যায় করিনি মহম্মদী বেগ। আমি যা কিছু অন্যায় করেছি, অত্যাচার করেছি, তার চেয়ে যে অনেক বেশি অন্যায় করেছে আমার পূর্বপুরুষরা, তারা গ্রামের পর গ্রাম পুড়িয়ে দিয়েছে, বাকি খাজনার দায়ে তাদের নরক-যন্ত্রণা দিয়েছে, তাদের তো কেউ খুন করোনি তোমরা?

মহম্মদী বেগ-এর হাতের ধারালো ছোরাটা ঝক্‌ঝক্‌ চক্‌চক্‌ করে উঠলো।

—আর আমাকে খুন করেই কি তুমি দুনিয়ার অন্যায় বন্ধ করতে পারবে মহম্মদী বেগ! আমাকে খুন করে যাকে আনছো সে কি তোমাদের ওপর অত্যাচার করবে না ভেবেছো? সে যদি আবার আমার মত বাঙলা মুলুকের প্রজাদের শোষণ করে, তাদের ঘরের বউদের ধরে নিয়ে হারেমে পোরে, যদি ধরে বেঁধে খ্রীষ্টান করে, যদি তাদের আঙুল কেটে দেয়, তখন কি তাকেও খুন করতে পারবে তুমি মহম্মদী বেগ?

মহম্মদী বেগরা তো ইতিহাসের খিদ্‌মদ্‌গার মাত্র। এমনি করেই মহম্মদী বেগদের হাতে বারবার একজন খুন হয়েছে, শুধু আর-একজনের আবির্ভাব সহজ হবে বলে। ভাঁটার পর জোয়ারের টান তীব্র হবে বলে।

ক্লাইভ সাহেব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই দিকে চেয়ে দেখছিল। মীরনের জাফরগঞ্জের হাবেলিতে একটা অন্ধকার ঘরের ভেতরে তখন যেন একটা পরিচ্ছেদ সমাপ্ত হলো। সমাপ্ত হলো একটা পতনের অধ্যায়। পূর্ণচ্ছেদ পড়লো একটা জীবনের ওপর।

ক্লাইভ বললে—কিন্তু আমি তো হুকুম দিয়েছিলাম নবাবকে বাঁচিয়ে রাখতে—

মীরজাফর সাহেব বললে—আমি কিছু জানতাম না কর্নেল, মীরন এই কান্ড করেছে—মহম্মদী বেগকে হুকুম দিয়েছিল নবাবকে খতম করে দিতে!

নবাব মীর্জা মহম্মদ সিরাজ-উ-দ্দৌলার গলার কণ্ঠার ওপর একটা গর্ত দিয়ে তখনো গলগল করে রক্ত বেরোচ্ছে। রক্তের ধারা গড়াতে গড়াতে চলেছে ঘরের কোণের একটা নর্দমার দিকে। মুখটা হাঁ হয়ে রয়েছে। চোখ দুটো স্থির হয়ে চেয়ে রয়েছে ক্লাইভের দিকে। একটু কাত হয়ে রয়েছে বাঁ দিকে। নবাবকে কুর্নিশ করবার সময় আমীর-ওমরাহ যেমন মাথা কাত করতো তেমনি ভঙ্গি। যেন ক্লাইভকে কুর্নিশ করছে নবাব। যেন নিঃশব্দে বলছে—সালাম্‌ আলেইকুম্‌ জনাব! সালাম তোমাকে—

অন্ধকার ঘরখানার ভেতরে যেন দম আটকে আসছিল ক্লাইভের। পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল নতুন নবাব সুজা-উল-মুলক্‌ মীরজাফর আলি খাঁ মহবৎ-জঙ্গ আলমগীর। তার পাশে জগৎশেঠজীর দেওয়ানজী রণজিৎ রায়, তার পাশে নবাবের শ্বশুর ইরেজ খাঁ, তার পাশে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র, তার পাশে মেহেদী নেসার। মীর দাউদ, মীরকাশিম, ডিহিদার রেজা আলি, আর তার পাশে হাতিয়াগড়ের রাজা ছোটমশাই, মেজর কিল্‌প্যাট্রিক, বীচার, ওয়াট্‌স, সবাই। সকলের মুখ যেন মূক হয়ে গেছে ইতিহাসের বিচার দেখে। আর তার পাশে বশীর মিঞা।

কোথা থেকে একটা কানা মাছি ভোঁ ভোঁ করতে করতে একেবারে নবাব মীর্জা মহম্মদের ঘাড়ের ওপর এসে বসলো। বসে পাখা নাড়তে লাগলো। আর তারপর বলা নেই কওয়া নেই একেবারে ঠোঁটের ওপর। সেই ঠোঁটের ওপর বসেই মাছিটা হাত-পা ছুঁড়তে লাগলো এক মনে। কারোর দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। চারদিকে যে এত বড় বড় আমীর-ওমরাহ দাঁড়িয়ে আছে, সেদিকেও খেয়াল নেই।

ক্লাইভের আর সহ্য হলো না। তাড়াতাড়ি পকেট থেকে রুমালটা বার করে সেই দিকে দোলাতে লাগলো—ভাগো, বী অফ, বী অফ—অফ—

সবাই মাছিটাকে লক্ষ করেছিল। কারোর এমন করে মনে লাগেনি। কারোর এমন করে মনে হয়নি যে, বীরের অপমান সমস্ত মানুষের অপমান।

বীরকে এমন করে অপমানিত হতে দিলে মানুষকেই অপমান করা হয়।

মাছিটা উড়ে এসে ক্লাইভের মুখের কাছে বার দুই ভোঁ ভোঁ করলে। সেটাকে এক ধাক্কায় সরিয়ে দিয়ে ক্লাইভ বললে—একটা কাপড় দিয়ে ঢেকে দাও বডিটা—

বলে মুখ ফিরিয়ে ঘরের বাইরে চলে এল। নতুন নবাব মীরজাফর সাহেবও পেছনে পেছনে এসেছে।

—কর্নেল!

মুখ ফেরালো ক্লাইভ।

—কসুর মাফ করবেন কর্নেল!

—কেন? হোয়াই? কী হয়েছে?

—আমি জবান দিয়েছিলুম যে, মরিয়ম বেগমসাহেবাকে দরবারে আপনার হাতে নজরানা দেবো। কিন্তু আমি কথা রাখতে পারিনি।

ক্লাইভ সে কথায় কোনো কান দিলে না। যেমন চলছিল, তেমনি চলতে ল্যাগলো।

মীরজাফর সাহেব তখনো পেছন পেছন আসছে!

—নবাব মীর্জা মহম্মদকেও আমি খুন করতে হুকুম করিনি কর্নেল। আমার হুকুম ছাড়াই মহম্মদী বেগ খুন করেছে।

—তা হলে কার হুকুমে নবাব খুন হলো?

—ও বলছে, মীরন হুকুম দিয়েছিল!

—কোথায় গেল মীরন?

—তাকে খুঁজে পাচ্ছি না। সে জাহাঙ্গীরাবাদের দিকে গেছে মনে হচ্ছে বেগমদের নিয়ে। আমি তালাশ করতে লোক পাঠিয়েছি।

—আর নবাবের সঙ্গে যে-সব বাঁদী বেগম কয়েদ ছিল, তারা কোথায় গেল?

—নেয়ামত চাবি খুলে দিয়েছিল কামরার, তারা কোথায় পালিয়েছে কেউ জানে না—

—আচ্ছা, আপনি যান।

মীরজাফর চলে যেতেই মেজর কিল্‌প্যাট্রিক কাছে এল। ক্লাইভ বললে—তুমি এখনই আর্মি নিয়ে চলে যাও কিল্‌প্যাট্রিক, আমি মীরনকে চাই। আই মাস্ট হ্যাভ হিম। তার সঙ্গে যে-সব বেগম আছে, তাদের সকলকে চাই—মরিয়ম বেগমকেও যেমন করে হোক আমার চাই—হারি আপ—

কিন্তু ইতিহাসের যিনি দেবতা তিনি আপন খেয়ালেই আপন সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কাজ চালিয়ে যান। তাই মানুষের ইতিহাস কেবল এই সৃষ্টি স্থিতি আর প্রলয়েরই ইতিহাস। যে হাতিয়াগড় নবাব-নিজামতের খেয়াল-খুশির হাতিয়ার হয়ে একদিন তছনছ হয়ে গিয়েছিল, আবার সেই হাতিয়াগড়ে ছোটমশাই ফিরে এসেছে।

খবরটা আগেই পৌঁছিয়ে গিয়েছিল বড় বউরানীর মহলে। ছোটমশাই আবার সেই ঘাটে এসে নামলো। নায়েব-গোমস্তা-প্রজা-পাইক সবাই হাজির ছিল

সেখানে। ছোটমশাই বজরা থেকে নামতেই গোকুল গিয়ে সামনে দাঁড়ালো।

ছোটমশাই বললে—পালকি কই, পালকি আনিসনি?

দুর্গা ছোট বউরানীকে বললে—নামো গো, এবার নামতে হবে আমাদের—

ছোট বউরানীর যেন তখনো বিশ্বাস হচ্ছিল না। এতদিন পরে আবার হাতিয়াগড়ে ফিরতে পেরেছে তা যেন তখনো বিশ্বাস হচ্ছিল না। তবু যে ভালোয় ভালোয় আসা গেল তাও বুড়োশিবের কল্যাণে। হাতিয়াগড়ে পৌঁছিয়েই বুড়োশিবের মন্দিরে গিয়ে পুজো দিতে হবে। অনেক দিনের মানত।

আস্তে আস্তে আলতা পরা একটা পা বাড়িয়ে দিয়ে ঘাটে নামলো ছোট বউরানী। দুর্গা পেছনে পেছনে নামলো। ছোট বউরানীর ঘোমটাটা ভালো করে কপালের ওপর টেনে নামিয়ে দিলে। যেন বিয়ের পর নতুন বউ আসছে হাতিয়াগড়ের রাজবাড়িতে। আগে আগে চলতে লাগলো ছোটমশাই। গোকুল মাথায় ছাতা ধরে চলেছে পেছনে পেছনে। জগা খাজাঞ্চিমশাই ঠিক তার পাশে।

ছোট বউরানী পালকির ভেতর উঠতেই দরজা দুটো বন্ধ হয়ে গেল। তারপর চলতে লাগলো ছাতিমতলার ঢিবির দিকে। ছাতিমতলার ঢিবি পেরিয়ে রাজবাড়ির অতিথিশালার বড় ফটক।

অতিথিশালার বড় ফটকে মাধব ঢালী পাহারা দিচ্ছিল লাঠি হাতে করে। ছোটমশাই কাছে যেতেই দুই হাত জোড় করে মাথা নিচু করে পেন্নাম করলে।

ছোটমশাই বললে—কী রে, ভালো আছিস?

জগা খাজাঞ্চিমশাই বললে—আজ্ঞে, আপনি ছিলেন না, এতদিন সব খাঁ খাঁ করছিল—

ছোটমশাই সে কথায় কান না দিয়ে যেমন চলছিল তেমনি চলতে লাগলো। অতিথিশালাটা বাঁয়ে রেখে ডাইনের রাস্তা দিয়ে ভেতর-বাড়ি যেতে হয়। ভেতর-বাড়ির মুখেই পুকুর। শান-বাঁধানো ঘাট। ঘাটের বাঁ দিকেই বুড়োশিবের মন্দির। ছোট বউরানীকে বিয়ে করে আসার পর প্রথমে বুড়োশিবের মন্দিরে প্রণাম করতে হয়েছিল।

ছোটমশাই সেই দিকেই যাচ্ছিল। পালকি থেকে নেমে ছোট বউরানীও সেই দিকে যাচ্ছিল।

হঠাৎ ওপর থেকে বড় বউরানীর গলা শোনা গেল—দুগ্গা—

দুর্গা পেছন থেকে তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে বললে—এই যে যাই বড় বউরানী—

গলার আওয়াজ শুনেই ছোটমশাই অবাক হয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু বড় বউরানীর গলা আবার শোনা গেল—ছোটমশাইকে বল্‌, বাড়ির অন্দরে যেন ছোট বউরানীকে নিয়ে না ঢোকে।

সবাই স্তম্ভিত হয়ে গেছে বড় বউরানীর হুকুম শুনে।

ছোটমশাই এগিয়ে যাচ্ছিল। একেবারে সিঁড়ির মুখে ওপর-নীচে মুখোমুখি দেখা। ছোটমশাই বললে—কী বলছো তুমি?

ওপর থেকে তেমনি গম্ভীর গলাতেই বড় বউরানী বললে—হ্যাঁ, ঠিকই বলছি—ছোট বউরানীকে এ বাড়িতে আর ঢুকিও না।

—কিন্তু এ বাড়িতে ঢুকবে না তো কোথায় যাবে ও?

বড় বউরানী বললে—তা এ বাড়ির বাইরে কি আর মাথা গোঁজবার জায়গা

নেই কোনো চুলোয়?

—মাথা গোঁজবার জায়গা? বড় বউ, তুমি কী বলছো আমি বুঝতে পারছি না—কোথায় থাকবে ছোট বউ? ওর কি বাপের বাড়ি আছে যে, সেখানে যাবে?

—বাপের বাড়ি না থাকে তো হাতিয়াগড়ের রাজবাড়িতে বার-বাড়িও তো আছে, সেখানে থাকবে!

পালকি থেকে নেমে বড় বউরানীর কথাগুলো কানে যেতেই মাথাটা যেন ঘুরতে লাগলো। দুর্গা ছোট বউরানীকে ধরে ফেললে, নইলে হয়তো পড়েই যেতো।

বড় বউরানী তখন ওপর থেকে বলছে—ছোটর বালিশ-বিছানা অন্দর-মহল থেকে বার-বাড়িতে পাঠিয়ে দিচ্ছি, আজ থেকে সেখানে শোবে ছোট।

ছোটমশাই ওপর দিকে তেমনি করে মুখ তুলে জিজ্ঞেস করলে—আর আমি?

বড় বউরানী বললে—তোমার যেখানে খুশি সেখানে শোবে! তোমাকে ভেতর-বাড়িতে শুতে তো কেউ মাথার দিব্যি দেয়নি?

বলে আর কথা বাড়ালো না বড় বউরানী। পা বাড়িয়ে ভেতরের দিকে চলে গেল। ছোটমশাই আর কিছু উত্তর দিতে পারলে না। সেখানেই পাথরের মত ঠায় দাঁড়িয়ে রইলো খানিকক্ষণ!

কিন্তু মরালীকে বেশিদিন থাকতে হয়নি দমদম্-হাউসে। তবু যে ক'দিন ছিল রোজ একবার করে গির্জায় যেত। বিশেষ করে যেত রবিবার দিনটায়। দমদমায় ফিরিঙ্গী পাদরী সাহেব মরালীর নাম দিয়েছিল মেরী। লোকে বলতো—মেরী বেগম।

গির্জা থেকে মাথায় ঘোমটা দিয়ে বেরিয়ে যখন হেঁটে আসতো তখন চব্বিশ পরগণার লোকেরা রাস্তার দু' পাশে মেরী বেগমকে দেখবার জন্যে দাঁড়িয়ে থাকতো হাঁ করে। কারো কোলে ছেলে থাকলে তার গালে হাত দিয়ে আদর করতো। কারো পরনে ছেঁড়া কাপড় দেখলে তাকে কাপড় কেনবার পয়সা দিত। কারো অসুখ করেছে শুনলে কবিরাজ দেখাবার খরচ দিত। দমদমা থেকে কাছাকাছি একটা পুকুর কাটিয়ে দিয়েছিল মেরী বেগম। ঠিক পুকুর কাটিয়ে দেয়নি। পুকুরটা শুকিয়ে হেজে গিয়েছিল। গাঁয়ের লোকেরা জল সরতে পেত না, জলের অভাবে কষ্ট পেত। জায়গাটা সাহেবকে বলে উদ্ধব দাসের নামে ইজারা দিয়ে দিয়েছিল। নাম দিয়েছিল 'কান্ত-সাগর'।

আর সারাদিন পর নিজের হাতে দুটো ভাত ফুটিয়ে নিয়ে তাই খেত। লোকে বড় ভক্তি করতো মেরী বেগমকে। সাহেব একবার থাকতো কলকাতায়, আবার কখনো আসতো একদিনের জন্যে দমদম্-হাউসে।

বিরাট ক্যানটনমেণ্ট। তখনো ক্যানটনমেণ্ট পুরো হয়নি। কিন্তু সাহেবের ফৌজের লোকেরা থাকতো কাছেই। বিরাট বিরাট হাতী আর ঘোড়ার আস্তাবল। তারপর রাস্তার মোড় ঘুরলেই সাহেবের বাগানবাড়ি। বাগানবাড়িটাও বিরাট। সামনের ফটকে পাহারা দিত ফৌজের লোক। বিনা মঞ্জুরিতে কাউকে ভেতরে ঢুকতে দিত না।

কিন্তু মেরী বেগমের নাম করলে তার সাত খুন মাপ! মেরী বেগম ডেকেছে। মেরী বেগমের কাছে একবার গিয়ে কেঁদে পড়লে আর খালি হাতে ফিরে আসতে হবে না কাউকে—তখন মন দিয়ে শুনতে হবে সকলের দুঃখের কথা। কার হালের বলদ মারা গিয়েছে, কার মেয়ের বিয়ের পণ দরকার, কার ঘরের চাল উড়ে গিয়েছে।

আর ক্লাইভ? ক্লাইভ সাহেবের তখন অনেক কাজ। অষ্টাদশ শতকের রাজনীতি তখন আরো জটিল হয়ে উঠেছে। মীরজাফর সাহেবের সঙ্গে তখন ঝগড়া বেধে গেছে কোম্পানীর। এক-একদিন হঠাৎ ঝড়ের মত এসে হাজির হয় সাহেব।

তখন ঘরের মেঝের ওপর উদ্ধব দাস বসে বসে লিখছে, আর মরালী যা-কিছু দেখেছে যা-কিছু শুনেছে সব লিখছে।

এক-একবার শুধু উদ্ধব দাস মুখ তুলে জিজ্ঞেস করে—তারপর?

সাহেব ঘরে ঢুকেই যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ে।

মরালী বলে—কী হলো তোমার?

—আবার সেই ব্যথাটা বেড়েছে! কাল রাত্তিরে ঘুমোতে পারিনি। আবার সে এসেছিল—

—কে?

—সেই সাকসেস্। ঠিক সেইরকম ভাবে ঘরে ঢুকেছিল।

—তারপর? সেই ঘুমের ওষুধটা খেলে না কেন?

—কে ওষুধ দেবে? কেউ তো কাছে ছিল না।

শেষকালে দেশে চলে গিয়েও রোগটা যায়নি সাহেবের। ইণ্ডিয়া জয় করতে এসে ইণ্ডিয়াই শেষকালে ক্লাইভ সাহেবকে জয় করে ফেলেছিল। সাহেব শেষ-জীবনে আফিম্ খাওয়া শুরু করেছিল। আফিমই তাকে শেষ পর্যন্ত গ্রাস করেছিল। চিঠিতে পোয়েটকে লিখেছে, সেই আগেকার মতই রাত্রিবেলা ঘুমের ঘোরে সেই লোকটা আসে। সেই সাকসেস। কেবল বলে—সাকসেস মানেই সাফারিং। সেখান থেকেও মরালীর কথা লিখতো সাহেব। দি গ্রেট লেডী। দি গ্রেট লেডী অব বেঙ্গল। সেখানে গিয়েও মরালীকে ভুলতে পারেনি সাহেব। মরালী মারা যাবার অনেক দিন পরেও চিঠি লিখতো, কিন্তু একদিন আর চিঠি এল না। চিঠি এল মেমসাহেবের।

মনে আছে তখন ক'দিন খুব ভাবনায় পড়েছিল মরালী। সাহেব একবার আসে, আবার চলে যায়।

—বলে পূর্ণিয়ায় যাচ্ছি—

কিন্তু সেদিন আর ছাড়লে না মরালী। বললে—বলো, কিছু খবর পেলে কিনা—

সাহেব বললে—বলেছি তো কিল্‌প্যাট্রিককে পাঠিয়েছি খুঁজতে—

—কিন্তু একটা মানুষকে খুঁজতে ক'দিন লাগে?

সাহেব বললে—মীরন যে বড় শয়তান, সে যে সব বেগমদের নিয়ে লুকিয়ে রেখেছে, কেউ জানে না কোথায় রেখেছে তাদের—

—তা হলে তোমরা আছ কী করতে? অতগুলো মেয়েমানুষকে নিয়ে সে তো উড়ে যেতে পারে না, নিশ্চয় কোথাও আছে!

ক্লাইভ বললে—জাহাঙ্গীরাবাদে নেই, আজিমাবাদে নেই, পূর্ণিয়ায় নেই, হুগলীতে নেই—সব জায়গায় দেখা হয়েছে—

—তা হলে আর কোথায় যেতে পারে সে?

—আমিও তো তাই ভাবছি।

কিন্তু সেদিন হঠাৎ এসে হাজির হলো কান্ত। বাগানবাড়িটার এক কোণে তখন ঘুমিয়ে পড়েছে মেরী বেগম। দূরে, অনেক দূরে বিরাট বটগাছটার ডগায় কয়েকটা বাদুড় কিচকিচ করে চিৎকার করছে। ঘণ্টা বাজিয়ে প্রহর গুনছে ক্যানটনমেণ্টের ফৌজী সেপাই। এক—দুই—তিন। রাত গভীর। বটগাছটার পাতা থেকে ফোঁটা ফোঁটা শিশির পড়ছে টপ টপ করে। আর কান্ত-সাগরের একটা কুঁড়েঘরের ভেতর বসে বসে খাগের কলমে ভুষো কালি দিয়ে উদ্ধব দাস একমনে লিখে চলেছে 'বেগম মেরী বিশ্বাস'। আমি তোমাদের জন্যে রাত জেগে জেগে এই মহাকাব্য লিখে চলেছি। এমনি এক রাতে একদিন হাতিয়াগড়ের অতিথি-শালায় গিয়ে আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। ঠিক এমনি রাত সেদিন। তখন জীবনকে তাচ্ছিল্য করেছিলাম, মৃত্যুকে অগ্রাহ্য করেছিলাম, বিবাহকেও অস্বীকার করেছিলাম। কিন্তু তারপর অনেক জীবন, অনেক মৃত্যু, অনেক বিবাহ দেখেছি। অনেক উত্থান, অনেক পতন, অনেক চক্রান্ত অতিক্রম করেছি। আজ বুঝেছি, মৃত্যু যাঁর ছায়া, অমৃতও তাঁরই ছায়া। তাই মৃত্যু আর অমৃত তাঁর কাছে দুই-ই সমান। বুঝেছি যাঁর কাছে সব দ্বন্দ্বের পরিসমাপ্তি তিনিই চরম সত্য। পাপ আর পুণ্য, অর্থ আর পরমার্থ, সম্মান আর অপযশ সমস্তই সেই চরম সত্যের কাছে গিয়ে একাকার হয়ে যায়। তাঁর কাছে গিয়ে সব খণ্ড সত্তার বিচ্ছিন্নতা সম্মিলিত হয়ে ওঠে।

—ও মা, তুমি!

হঠাৎ যেন বটগাছটার ডালে বাদুড়দের কিচ কিচ শব্দ বন্ধ হয়ে গেল।

—তুমি কোত্থেকে এলে? কোথায় ছিলে তুমি এতদিন? ওরা তোমায় কোথায় লুকিয়ে রেখেছিল?

ওদিকে নিজের কুঁড়ে ঘরটার ভেতরে প্রদীপের শিখাটা আর একটু বাড়িয়ে দিলে উদ্ধব দাস। এবার 'শান্তি পর্ব' লিখতে বসেছে। 'বেগম মেরী বিশ্বাস' কাব্যের শেষ পর্ব। একটা যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে একটা জীবনের শেষ পর্ব, একটা যুগের অন্তিম পর্ব!

—কিন্তু সাহেব যে বললে মীরন নাকি তোমায় কোথায় লুকিয়ে রেখেছিল? সেখান থেকে পালিয়ে এলে কী করে?

যদি বলো তিনি প্রেমস্বরূপ, তাহলে মানুষের পৃথিবীতে এত দুঃখ কেন, এত বিচ্ছেদ কেন? কেন বিরোধ এত আঘাত করে? কেন মৃত্যু এত হরণ করে? যদি বলো তিনি মঙ্গলময়, তা হলে মানুষের পৃথিবীতে এত অমঙ্গল কেন? তবে কি এই মন, এই বুদ্ধি, এই অহঙ্কার, এরই জন্যে এত বিরোধ, এত মৃত্যু, এত অমঙ্গল! আমি তো সব ছেড়েছিলুম। সংসারের বন্ধনের মধ্যে আমি তো আবদ্ধ হইনি, স্বার্থের বন্ধনেও তো আমি বাঁধা পড়িনি। কামনা-বাসনা-স্বার্থ সব কিছু ত্যাগ করেই তো আমি হরির দাস হয়েছিলুম। কিন্তু কই, মন বুদ্ধি আর অহঙ্কার তো আমি ত্যাগ করতে পারিনি!

—দেখ, তুমি এসেছো ভালোই হয়েছে, এবার চলো আমরা দু'জনে কোথাও

চলে যাই, আজ তুমি যেখানে যেতে বলবে, সেখানেই যাবো। আজ আমি তোমার কথা রাখবো, আজকে আর আমি তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাবো না—

লিখতে লিখতে দাঁড়ি বসালো উদ্ধব দাস। অনেক রাত হলো। ক্যানটনমেণ্টের ঘণ্টা-ঘড়িতে ঢং ঢং করে চারবার বাজলো।

বিছানার এক পাশে উদ্ধব দাসের স্ত্রী শুয়ে ছিল। আলোটা নেবাতেই ঘুম ভেঙে গেছে। বললে—লেখা শেষ হলো?

কিন্তু উত্তর দেবার আগেই বাইরে থেকে ডাক এল—দাস মশাই, ও দাস মশাই—

এত রাত্রে ফৌজী সেপাই-এর ডাক কেন হঠাৎ?

উদ্ধব দাস বাইরে এল। সেপাইটা মশাল জেবলে নিয়ে এসেছে। ভালো করে ভোর হয়নি তখনো।

—কী হলো? ডাকো কেন?

—আজ্ঞে, মেরী বেগমসাহেবা ডেকেছে আপনাকে।

—কেন? এত ভোরে আমাকে কেন? সাহেব এসেছে?

সেপাইটা বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ, কর্নেল সাহেব এসেছে, কিল্‌প্যাট্রিক সাহেব এসেছে। মরিয়ম বেগমসাহেবা ধরা পড়েছে জাহাঙ্গীরাবাদে, তাকেও এনেছে—

—আচ্ছা চলো—বলে উদ্ধব দাস গায়ে চাদর জড়িয়ে নিলে।

সেদিন কোথা থেকে যে কী হয়ে গেল! বেশ ছিল সবাই। মুর্শিদাবাদের মসনদে বসে মীরজাফর সাহেব তখন আগ্নেয়গিরির উত্তাপে ছটফট করছে। খাজাঞ্চিখানায় টাকা নেই। মুর্শিদকুলী খাঁ যা কিছু সম্পত্তি জমিয়ে রেখে গিয়েছিল, নবাব সুজাউদ্দীন খাঁ তা সবই উড়িয়ে দিয়ে গিয়েছিল। তারপর নবাব আলীবর্দী খাঁ সারা জীবন বাদশাহী পেষকস দিতে দিতে আর বর্গীদের হাঙ্গামা মেটাতেই সব খরচ করে ফেলেছিল। শেষ তিন বছর অবশ্য কিছু জমেছিল! নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলা সেই জমানো টাকা মৃত্যুর দিন পর্যন্ত সব খরচ করে গেছে। তারপর এসেছে কর্নেল ক্লাইভ। ক্লাইভ টাকার তাগাদায় অস্থির করে মারে। কেবল বলে—টাকা দাও, আরো টাকা দাও—

তারপর মীরজাফর সাহেব দেখলে মসনদ পেয়েছে বটে, কিন্তু মুর্শিদাবাদের মসনদ চালাতে চায় ক্লাইভ। তারপর আছে ঘরের শত্রু বিভীষণ! রাজা দুর্লভরাম লুকিয়ে লুকিয়ে দল পাকায়।

আর মীরন?

তারও দেখা নেই। ক্লাইভ তাকে খুঁজে বার করবার জন্যে হুকুম পাঠায় সেখান থেকে। বেগমদের নিয়ে সে একবার যায় জাহাঙ্গীরাবাদে। সেখানে কিছুদিন লুকিয়ে থাকার পর হঠাৎ খবর আসে ক্লাইভের লোক তার পিছু নিয়েছে। তখন দুটো বজরা আবার আশ্রয় খোঁজে আর একটা ঘাটে। এক ঘাট থেকে আর-এক ঘাটে লুকোচুরি খেলে বেড়ায় নবাব-নিজামত!

সেদিন আর ঠেকানো গেল না। পদ্মার মাঝখান দিয়ে চলেছে ছ'খানা

বজরা। হঠাৎ মনে হলো যেন পেছনে পেছনে ফিরিঙ্গী ফৌজ আসছে!

মীরন চিৎকার করে উঠলো—চালাও, জোরসে চালাও—

দু'টো বজরা তীরের বেগে ছুটে চলতে লাগলো জলের স্রোতে। সামনে অন্ধকার, পেছনে অন্ধকার। অন্ধকারের সমুদ্রে জোয়ারের টান পড়লো হঠাৎ। আকাশ-বাতাস উন্মাদ হয়ে উঠলো। পেছনে বজরার দাঁড়ের শব্দ কানে আসছে।

—চালাও, চালাও, জোরসে চালাও—

ফিরিঙ্গী ফৌজ ভেবেছে কী? লক্ষাবাগের লড়াইতে জিতেছে বলে কি মুর্শিদাবাদের মসনদ তার দখলে চলে গিয়েছে? মসনদ তো মীরজাফর আলি মহবৎ জঙ্গ আলমগীরের। তাতে তুমি শরিকানা ফলাতে আসো কেন? আমি বেগমদের নিয়ে যেখানে খুশি রাখবো, যা খুশি করবো, আমার ইচ্ছে হলে আমি তাদের খুন করে ফেলবো।

দূর থেকে কিল্‌প্যাট্রিক সাহেবের গলার আওয়াজ এল—হল্ট—হল্ট—

মীরন আবার চিৎকার করে উঠলো— জোরসে চালাও—জোরসে—

কিন্তু জোরে চালাতে বললেই নৌকো জোরে চলে না। ভেতরের জোর না থাকলে বাইরে সে দুর্বল হয়ে পড়বেই। নবাব আলীবর্দীর সময় থেকেই নবাব-নিজামত ফতুর হয়ে গিয়েছিল। যেটুকু জোর তার তখনো ছিল তাও নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলার সময়ে। আজ সে নবাব নেই, আজ সেই নবাব-নিজামত আরো দুর্বল। আজ প্রাণপণে বৈঠা ঠেললেও নৌকো চলবে না। আজ সমুদ্রের ওপার থেকে আর এক ফৌজ এসেছে। তাদের তেজ আরো বেশী, তাদের জোর আরো তীব্র, তাদের বিক্রম আরো ভয়ঙ্কর। তারা অনেক দূর থেকে আসছে। তোমার গরুর গাড়ি, তোমার নৌকোর যুগ শেষ হয়ে এসেছে। এবার তাদের দেশ থেকে আসছে স্টীম ইঞ্জিন, কলের জাহাজ, ছাপাখানা। আসছে ধান-ভানার কল, কাপড় বোনার মিল। আসছে নোট ছাপানোর মেশিন, আসছে গান শোনানোর গ্রামোফোন, আসছে ছবি তোলার ক্যামেরা। এবার ওদের জোয়ার এসেছে, আর তোমাদের ভাঁটা। ওদের সঙ্গে তোমরা পারবে কেন?

তুমি কাঁদছো নাকি? তোমার বাঙলা মুলুকের নবাব খুন হলো বলে তুমি কাঁদছো? কিন্তু নবাবকে যদি আজ বাঁচিয়ে রাখি তো তোমাদের ভাঁটার কাল যে আর কাটবে না। তোমাদের গরুর গাড়ি আর নৌকোর যুগ যে শেষ হবে না কোনোকালে।

কিন্তু তখন আর কাঁদলে কী হবে। যা-হবার তা তো হয়ে গেছে। তখন সেই সিরাজ-উ-দ্দৌলার মৃতদেহটাই একটা হাতীর পিঠে চড়িয়ে সারা শহর ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে দেখানো হচ্ছে! একবার মহিমাপুর, একবার চক-বাজার, একবার মনসুরগঞ্জ, একবার জাফরগঞ্জ, আর সকলের শেষে এসে থেমে গেল চেহেল্-সুতুনের সামনে।

তোমরা দেখ তোমাদের মরা নবাবকে, আর কাঁদো। চোখ মুছতে মুছতে তোমরা ভাবো যে মুর্শিদাবাদের নবাবের এই শাস্তি কেন হলো। যে-নবাবকে কুর্নিশ না করলে একদিন তোমাদের গর্দান যেত, আজ ইচ্ছে করলে তার মুখে থুতুও ফেলতে পারো। কেউ গর্দান নেবে না, কেউ বাধা দেবে না, কেউ বারণও করবে না। খোদা হাফিজ!

শেষ সময়ে বেগমদের বড় কষ্ট হয়েছিল। নানীবেগম জীবনে কখনো এমন করে টানাপোড়েনের হাতিয়ার হননি। আমিনা বেগম, ঘসেটি বেগম, ময়মানা বেগম, সবাই নবাব আলীবর্দীর আদরে মানুষ হয়েছে। তুমি কোথায় নজর আলি! তোমাকে খুঁজতে আমি চেহেল্-সুতুন থেকে বেরিয়ে একদিন চকবাজারের রাস্তায় নেমেছিলাম। রাস্তায় নেমে সারাফত আলির খুশ্‌বু তেলের দোকানে গিয়ে উঠেছিলাম। তুমি এখন কোথায় নজর আলি?

নানীবেগমই বোধ হয় একমাত্র বেগম যার মুখে সেদিন কোরাণের বাণী উচ্চারিত হয়েছিল। খোদাতালাহ্, তোমাকে বরাবর আমি ভয় থেকে রক্ষে করতে বলেছি, বিপদ থেকে রক্ষে করতে বলেছি, মৃত্যু থেকে রক্ষে করতে বলেছি। কিন্তু কখনো তো ব্যর্থতা থেকে রক্ষে করতে বলিনি, জড়তা থেকে রক্ষে করতে বলিনি, তোমার অপ্রকাশ থেকে রক্ষে করতে বলিনি। আজ তার জন্যে তুমি আমায় শাস্তি দাও খোদাতালাহ্!

উদ্ধব দাস লিখে গেছে—ছ'টা বেগমকে যখন একসঙ্গে মীরন সেই গভীর রাত্রে পদ্মার জলে ডুবিয়ে দিয়েছিল তখন কারো মাথায় বজ্রাঘাত হয়নি, কোথাও উল্কাপাত হয়নি, একটা তারাও খসে পড়েনি মাটিতে।

কিন্তু একজনের আর্তি বুঝি কেউই শুনতে পায়নি। সে কান্ত। কান্তর আর্জি মীরন শোনেনি, মেজর কিল্‌প্যাট্রিক শোনেনি, আকাশ-বাতাস-অন্তরীক্ষ-ঈশ্বর-খোদা-গড কেউই শুনতে পায়নি। শুধু বোধ হয় শুনতে পেয়েছিল মরালী। দমদম ক্যানটনমেণ্টে ক্লাইভ সাহেবের বাগানবাড়িটার একটা ছোট ঘরে শুয়ে ছিল সে। সারাদিন পরে নিজের হাতে এক মুঠো ভাত সেদ্ধ করে কোনো রকমে পেটে দিয়েছে। দূরে, অনেক দূরে বিরাট বটগাছটার ডগায় তখন কয়েকটা বাদুড় কিচকিচ করে চিৎকার করছে। ঘণ্টা বাজিয়ে প্রহর গুণছে ক্যানটনমেণ্টের ফৌজী সেপাই। এক—দুই—তিন। রাত গভীর। বটগাছটার পাতা থেকে শিশির পড়ছে টপটপ করে। আর কান্ত-সাগরের একটা কুঁড়ে ঘরের ভেতরে বসে বসে তখন খাগের কলমে ভুষো কালি দিয়ে উদ্ধব দাস এক মনে লিখে চলেছে 'বেগম মেরী বিশ্বাস'। আমি তোমাদের জন্যে রাত জেগে জেগে এই মহাকাব্য লিখে চলেছি। এমনি এক রাতে একদিন হাতিয়াগড়ের অতিথিশালার মধ্যে ঘুমিয়ে ছিলাম। সেও ঠিক এমনি রাত। তখন জীবনকে তাচ্ছিল্য করেছিলাম, মৃত্যুকে অগ্রাহ্য করেছিলাম, বিবাহকেও অস্বীকার করেছিলাম। কিন্তু তারপরে অনেক জন্ম, অনেক মৃত্যু, অনেক বিবাহ দেখেছি। অনেক উত্থান, অনেক পতন, অনেক চক্রান্ত অতিক্রম করেছি। কিন্তু আজ বুঝেছি মৃত্যু যাঁর ছায়া, অমৃতও তাঁরই ছায়া। তাই মৃত্যু আর অমৃত তাঁর কাছে দুই-ই সমান। বুঝেছি যাঁর কাছে সব দ্বন্দ্বের পরিসমাপ্তি তিনিই চরম সত্য। পাপ আর পুণ্য, অর্থ আর পরমার্থ, সম্মান আর অপযশ, সমস্তই সেই চরম সত্যের কাছে গিয়ে একাকার হয়ে যায়। তাঁর কাছে সব খণ্ড সত্তার বিচ্ছিন্নতা সম্মিলিত হয়ে ওঠে!

—ও মা, তুমি?

কান্তর মুখখানা যেন সাদা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে।

মরালী ধড়মড় করে উঠে বসলো। বললে—তোমার এ-রকম চেহারা হয়েছে কেন? আমি যে তোমাকে কতদিন থেকে খুঁজছি! সব জায়গায় তোমার খোঁজ করতে সাহেবের লোক গেছে। কোথায় ছিলে তুমি?

মরালীর মনে হলো কান্তর চোখ দিয়ে যেন জল গড়িয়ে পড়ছে।

—এ কি, তুমি কাঁদছো?

মরালী আঁচল দিয়ে কান্তর চোখ দুটো মুছিয়ে দিলে। বললে—এবার আমি তোমার কথা শুনবো! জানো, একদিন তুমি আমাকে মুর্শিদাবাদ ছেড়ে পালিয়ে যেতে বলেছিলে, সেদিন যাইনি। কিন্তু আজ আমি তোমার সঙ্গে চলে যাবো। তোমার দেশ বড়চাতরা, সেখানেই চলে যাবো দু'জনে। লোকে যা-ই বলুক, আমি তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাবো না।

কান্তর মুখ দিয়ে এতক্ষণে যেন কথা বেরোল। বললে—জানো, আমার বড় কষ্ট হচ্ছে—

—কষ্ট? কীসের কষ্ট? এবার তুমি আমার কাছে এসে গেছ, এবার আর তোমার কোনো কষ্ট থাকবে না। এবার আমি তোমার কাছে কাছে থাকবো! ওই মীরনটা বড় বদমাইশ লোক, ওরা সবাই বদমাইশ। মেহেদী নেসার, মীরন, মীর দাউদ, মীরকাশিম, রেজা আলি, মীরজাফর, সবাই বদমাইশ। আমি সাহেবকে বলে এবার সবাইকে জব্দ করবো। সবাইকে মসনদ থেকে হটাবো। ওরা থাকতে কারোর শান্তি নেই।

কান্ত চুপ করে শুনছিল। বললে—ওদের কথা থাক এখন, শুধু তোমার কথা বলো, তুমি সুখী হয়েছো তো?

মরালী বললে—না না, ওদের কথা থাকবে কেন? ওরা বেঁচে থাকতে কি আমাদের সুখ হবে?

তারপর একটু থেমে বললে—তুমি দাঁড়িয়ে রইলে কেন, ব'সো। তোমাকে খোঁজবার জন্যে আমি সাহেবকে বলে সব জায়গায় লোক পাঠিয়েছিলাম, জাহাংগীরাবাদে, পূর্ণিয়ায়, আজিমাবাদে, হুগলীতে, কোনো জায়গায় খুঁজতে আর বাকি রাখেনি তারা। ভালোই হলো, তুমি ফিরে এসেছো। এবার চলো, আমার সঙ্গে এবার চলো—

কান্ত বললে—কোথায়?

—যেখানে তোমার খুশী, কিন্তু এখানে আর নয়। এ দেশে আর নয়। যেখানে নবাব-আমীর-ডিহিদার-মীরবক্সী কেউ নেই, এইবার সেই দেশে চলে যাবো!

—যদি কেউ তোমার নিন্দে করে? যদি কেউ তোমাকে একঘরে করে?

মরালী বললে—এখন আমি কাকে আর পরোয়া করবো বলো? আমি যাদের যাদের বাঁচাতে চেয়েছিলাম, তাদের কেউই রক্ষে পায়নি। নবাবকে খুন করে মেরেছে মীরন, হাতিয়াগড়ের ছোট বউরানীকেও তারপর আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। কী যে সব হয়ে গেল! যাক, তবু তুমি যে শয়তানদের হাত থেকে বেঁচে ফিরে এসেছো, এই-ই আমার ভাগ্য! এখন আমার নিন্দে রটলেই বা কী? আর তা ছাড়া, আমি তো আর এখন হিন্দু নই, এমন কি মুসলমানও নই, এখন আমি এখানকার গির্জায় গিয়ে খ্রীস্টান হয়ে গেছি, এখন কে আমাকে কী বলবে? কার অত সাহস হবে!

কান্ত বললে—তা হলে চলো—

মরালী বললে—চলো—

—কোথায় যাবে?

মরালী বললে—যেখানে তোমার খুশি সেখানেই চলো—

বলে উঠে দাঁড়াতেই হঠাৎ বাইরে থেকে ডাক এল—বেগমসাহেবা, বেগমসাহেবা—

আর সঙ্গে সঙ্গে মরালীর ঘুম ভেঙে গেছে। কোথায়? কোথায় গেলে তুমি? অন্ধকারের মধ্যে চারদিকে চেয়ে মরালীর চোখ দুটো অস্থির হয়ে উঠলো। নেই, কোথাও নেই সে! এতক্ষণ তা হলে স্বপ্ন দেখছিল নাকি?

বাইরে থেকে আবার ডাক এল—বেগমসাহেবা—বেগমসাহেবা—

তাড়াতাড়ি দরজা খুলে বাইরে আসতেই মরালী দেখলে সামনের উঠোনে অনেক মানুষের ভিড়। দূরে মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে আছে ক্লাইভ সাহেব। তার পাশে মেজর কিল্‌প্যাট্রিক। আর তার পাশে ওয়াটস্‌, তার পাশে ম্যানিংহাম। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর হোমরা-চোমরা সাহেবরা সবাই এসেছে। আর সকলের পেছনে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে উদ্ধব দাস। কারো মুখে টুঁ শব্দটি নেই।

মরালী সকলের মুখের দিকে চেয়ে অবাক হয়ে রইলো। তোমরা আমাকে ডেকেছ কেন? কী হয়েছে তোমাদের? তোমরা কথা বলছো না কেন? বলো, কথা বলো!

সামনের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ নজরে পড়লো, কে যেন মাটির ওপর শুয়ে পড়ে আছে! সঙ্গে সঙ্গে মাথায় যেন বজ্রাঘাত হলো মরালীর। এক নিমেষে সামনে এগিয়ে গেল। কে তুমি? তুমি কে? কে? কে?

বলতে বলতে মরালী সামনে ঝাঁপিয়ে পড়লো। আর তার মনে হতে লাগলো যেন দূর থেকে একটা অস্ফুট প্রার্থনার বাণী ভেসে আসছে। তুমি তাকে সুখী করো ঈশ্বর। সে যেন মুর্শিদাবাদের পাপ আর পঙ্কিলতা থেকে অনেক দূরে চলে যেতে পারে। অনেক দূরে গিয়ে সে যেন শান্তি পায়। সে যেন সুখ পায়, সংসার পায়, স্বামী পায়, সন্তান পায়—

দূরে বিরাট বটগাছটার ডালে বাদুড়গুলো কিচকিচ শব্দ করতে লাগলো। ক্যানটনমেণ্টের ফৌজী সেপাই ঘণ্টা-ঘড়ি পিটিয়ে প্রহর গুনতে লাগলো—ঢং ঢং ঢং ঢং...

এর অনেক পরের কথা। আমি তখন ইউনিভার্সিটির ছাত্র।

রাস্তায় জসিম উদ্‌দীন সাহেবের সঙ্গে একদিন দেখা। তখনো বিশ্ববিখ্যাত কবি হননি জসিম সাহেব। এম-এ ক্লাসে বাঙলা পড়ি। আর জসিম সাহেব ইউনিভার্সিটির বাঙলা ডিপার্টমেণ্টের রিসার্চ স্কলার। কবি হিসেবে সেই সময়েই তিনি বাঙলা দেশে সুবিখ্যাত হয়ে উঠেছেন। রায় বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেনকে বাঙলা পুঁথির সন্ধান দেন। কোথাও নকশা-কাটা মাটির হাঁড়ি, পুতুল, কাঁথা পেলে এনে দেন দীনেশ সেন মশাই-এর কাছে। ইউনিভার্সিটি সে পুঁথি

ভাল দাম দিয়ে কিনে নেয়।

জসিম সাহেবকে একদিন বললাম—একটা ভাল পুঁথির সন্ধান পেয়েছি জসিম সাহেব, আপনি দেখবেন?

—কীসের পুঁথি? কী পুঁথি? নাম কী?

—আমি বললাম—নাম 'বেগম মেরী বিশ্বাস।'

জসিম সাহেব কৌতূহলী হলেন। অদ্ভুত নাম তো! মুসলমান বটে, খ্রীষ্টানও বটে, আবার হিন্দুও বটে! কত বছরের পুরোনো?

বললাম—মনে হচ্ছে, শ' দুয়েক বছর আগেকার। পলাশীর যুদ্ধের ব্যাপার নিয়ে লেখা। কবির নাম উদ্ধব দাস। প্রায় হাজার খানেক পাতার পুঁথি!

জসিম সাহেব বললেন—জাল নয় তো? আজকাল আবার কাঠ-কয়লার ধোঁয়া লাগিয়ে পাতাগুলোকে পুরোনো করবার কায়দা শিখেছে লোকরা।

বললাম—মনে তো হয়, তা নয়। আপনি পুঁথি এক্স্‌পার্ট, আপনি একবার দেখলেই বুঝতে পারবেন।

—কত চাইছে?

বললাম—চাইছে না কিছুই। বেচা-কেনার কথাই ওঠেনি। শুধু একবার আপনাকে দেখতে বলছি, কবে যাবেন বলুন। বেশী দূরে নয়, বাগবাজারের খালের ধারে—

জসিম সাহেব সব শুনে বলেছিলেন—ঠিক আছে, যাবো একদিন—

সে-সব কতদিনের কথা। তারপরে কত কাণ্ড হলো। যুদ্ধ বাধলো। বোমা পড়লো। দুর্ভিক্ষ হলো। হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা বাধলো। দেশ ভাগাভাগি হলো। বলতে গেলে ওলোট-পালোট হয়ে গেল সব। জসিম উদ্‌দীন সাহেবও পাকিস্তানে চলে গেলেন। এখন হয়তো আর সে-সব কথা মনেও নেই তাঁর।

মনে না থাকবারই কথা। কিন্তু আমি ভুলতে পারিনি। 'বেগম মেরী বিশ্বাসে'র একেবারে শেষ পর্বে অর্থাৎ 'শান্তি পর্বে' যে কাহিনী লিখে গেছেন উদ্ধব দাস, তার বুঝি তুলনা নেই প্রাচীন সাহিত্যের ইতিহাসে।

দিন পনেরো পরেই জসিম উদ্‌দীন সাহেবকে নিয়ে গেলাম পশুপতিবাবুর বাড়িতে।

পথে সমস্ত গল্পটা বলতে বলতে চললাম। জসিম সাহেব খুব আগ্রহ ভরে শুনছিলেন। থামতেই বললেন——তারপর?

আমি তখন 'বেগম মেরী বিশ্বাসে'র পাতার মধ্যে যেন অবগাহন করে আছি।

বললাম—কোন্ পর্যন্ত বলেছি?

জসিম সাহেব বললেন—সেই যে মরিয়ম বেগমকে ধরে আনা হলো পদ্মার ওপরে বজরা থেকে—মরালী ঝাঁপিয়ে পড়লো...

বললাম—উদ্ধব দাস এই 'শান্তি পর্বে'র মধ্যেই সমস্ত 'বেগম মেরী বিশ্বাস' কাব্যের নির্যাসটুকু দিয়ে গেছেন। পুঁথিটা যদি হারিয়ে যায় কিংবা নষ্ট হয়ে যায় তো বাঙলা দেশের একটা দিক লুপ্ত হয়ে যাবে চিরকালের মত। কারণ, পুঁথির পাতা ছাড়া তার কোনো চিহ্ন আর কোথাও নেই। সেই সেদিনকার মুর্শিদাবাদও আর নেই এখন। সেই চকবাজারের সেই রাস্তাটাও নেই। সেই চেহেল্-সুতুন নেই। সেই জাফরগঞ্জ নেই, মনসুরগঞ্জ নেই। মীরজাফর, মীরন,

মীরকাশিম, মীর দাউদ, মেহেদী নেসার, রেজা আলি কেউ নেই। এমন কি, সেদিনকার সেই ক্লাইভ সাহেবও নেই। দিল্লীর বাদশার কাছ থেকে পাওয়া সেই উপাধি জবরদস্ত-উল-মুলক্ নাসেরুদ্দৌলা সবত জঙ বাহাদুর কর্নেল ক্লাইভও ইতিহাস থেকে উবে গেছে। কোথায় যে তাকে সমাধি দেওয়া হয়েছিল তার চিহ্নমাত্রও নেই। ১৭৭৪ সালের ২২শে নভেম্বর তারিখে তাস খেলতে বসে ক্লাইভ সাহেব কী তাস হাতে পেয়েছিল কে জানে। হয়তো কুইন অব স্পেডস্। ইস্কাবনের বিবি। সেই ইস্কাবনের বিবিটা হাতে নিয়ে পাশের ঘরে উঠে গিয়েছিল।

পেগী ডাকলে—কী হলো রবার্ট? উঠে গেলে কেন? কী হলো?

রবার্ট তখন পাশের ঘরে ঢুকেই দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। আজ তোমরা কেউ আমার নও। আমি তোমাদের জন্যে ইণ্ডিয়াতে এম্পায়ার তৈরি করে দিয়েছি। তবু তোমরা আমাকে চোর বলে ডাকাত বলে গুণ্ডা বলে অভিহিত করেছ। তোমাদের আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছ আমাকে। আমাকে গালাগালি দিয়েছ, আমাকে শাস্তি দিয়েছ, আমাকে অসম্মান করেছ...

—রবার্ট! রবার্ট!

হঠাৎ ভেতর থেকে একটা পিস্তলের আওয়াজ হলো আর সঙ্গে সঙ্গে অষ্টাদশ শতাব্দীর ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের ভিত্ মজবুত হয়ে গড়ে উঠলো দু'শো বছরের মত।

এখন যেখানে ওয়েস্ট ক্যানেল রোড আর ইস্ট ক্যানেল রোড দু'ফাঁক হয়ে দু'দিকে চলে গেছে, তারই মাঝখানকার ভূখণ্ডটুকুর ওপর ছিল সেদিনকার ক্লাইভ সাহেবের জমিদারি। দম্‌দম্ ক্যানটন্‌মেণ্ট, আর সেই বিরাট 'দমদম্-হাউসে'র বড় বড় গোল গোল থামগুলো আজও ছাদটা মাথায় নিয়ে দু'শো বছর ধরে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। পাশ দিয়ে গেছে জোড়া জোড়া লম্বা রেল-লাইন। রেলে চড়ে যারা যায় তারা কেউ জানে না কেউ চেনে না ও-বাড়িটাকে। তারা জানেও না যে একদিন এখানেই এসে হাজির হয়েছিল মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র, নবাব মীরজাফর আলি, হাতিয়াগড়ের ছোটমশাই, জগৎশেঠজী। ওর সামনে ছিল জলা-জমি। এখনকার সল্ট্ লেক্ ওই দম্‌দমার বাড়ির বারান্দা থেকে দেখা যেত দিগন্ত জুড়ে বিরাজ করছে। এখনো ওখানে সেই বিরাট বটগাছটার পাতা থেকে শিশির পড়ে টপ্ টপ্ করে। কান্ত-সাগর বুঝি এখন আর নেই। তার জায়গায় রেফুইজীদের বাড়ি উঠেছে সার সার। রাত্রে সেখানে এখনো জোনাকি জ্বলে, গাছের ডালে বাদুড়গুলো কিচ্ কিচ্ করে, মাথার ওপর দিয়ে একটা এরোপ্লেন ঘুরে ঘুরে উড়ে যাবার সময় একটু ধোঁয়া ছেড়ে মেঘের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায়।

উদ্ধব দাসের 'শান্তি পর্ব' থেকেই জানা যায়, সেদিন যখন ভোর রাত্রে উদ্ধব দাসকে কান্ত-সাগরের বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে আসে ক্লাইভ, তখন মনসুর-গঞ্জের একটা কামরার মধ্যেও ডাক এসেছিল নতুন নবাব মীরজাফর সাহেবের, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের ডাক এসেছিল কৃষ্ণনগরে আর হাতিয়াগড়েও ডাক এসেছিল ছোটমশাই-এর। জগৎশেঠজীকে ঘুম ভাঙিয়ে ডেকেছিল দেওয়ানজী রণজিৎ রায় মশাই।

—কে?

জগৎশেঠজী ঘুম থেকে উঠে পড়লেন—কী খবর?

দেওয়ানজী বললে—কর্নেল ক্লাইভ খুব রেগে গেছে। আবার বোধহয়

লড়াই করতে আসবে মুর্শিদাবাদে।

—সে কী? কেন, আবার কী হলো হঠাৎ? সব তো মিটমাট্ হয়ে গিয়েছিল।

দেওয়ানজী বললে—না, সেজন্যে নয়, গোলমাল বাধিয়েছে মীরন, সে ধরা পড়েছে—

—মীরন ধরা পড়েছে?

—ধরা পড়েনি ঠিক, কিন্তু বেগমদের নিয়ে যখন পালাচ্ছিল তখন কিল্‌প্যাট্রিক সাহেব তাদের তাড়া করে। মীরন তাড়াতাড়ি সবগুলো বেগমকে পদ্মায় ডুবিয়ে দিয়ে পালিয়ে গেছে।

—তারপর?

—তারপর আর কী? আমাকে এখন মনসুরগঞ্জিতে ডেকে পাঠিয়েছিল মীরজাফর সাহেব। নবাব বড় ভাবনায় পড়েছে। একে চুক্তির পুরো টাকাটা দিতে পারেনি, তার ওপর এইবারের কিস্তির উনিশ লক্ষ টাকা দিতে হবে, এখন যদি আবার রেগে গিয়ে ক্লাইভ সাহেব বেশী টাকা চায়—

জগৎশেঠজী বললেন—তা আমাকে কী করতে হবে?

—নবাব বলছিল, আপনি যদি একবার ক্লাইভ সাহেবের দমদমার বাগান-বাড়িতে যান—

—আমি?

কথাটা ভেবে দেখেছিলেন জগৎশেঠজী। ফরাসীদের কাছে সাত লক্ষ টাকা হাওলাত্ দেওয়া আছে জগৎশেঠজীর। সে টাকাটা ফিরিঙ্গীদের খুশী রেখে আদায় করতে হবে। তাদের এখন চটানো ভালো নয়। বললেন—ঠিক আছে, তা হলে নবাবকে খবর দাও, আমি যাবো—

এমনি করে মীরজাফর সাহেব কৃষ্ণনগরেও খবর পাঠিয়েছিল। মহারাজের ঘুম ভাঙিয়ে খবর দিলেন কালীকৃষ্ণ সিংহ মশাই। তিনিও তৈরী হয়ে নিলেন ক্লাইভ সাহেবের দমদমার বাগান-বাড়িতে আসবার জন্যে।

হাতিয়াগড়ে জগা খাজাঞ্চিমশাইও ঘুম থেকে ডেকে তুললে ছোটমশাইকে। ছোটমশাইও তৈরী হলেন। তাঁর বজরা তৈরী হলো নদীর ঘাটে।

সবাই ভেবেছিলেন দমদমাতে গিয়ে কর্নেল সাহেবের রাগ ভাঙাতে হবে। হয়তো আরো টাকা কবুল করতে হবে। ফিরিঙ্গী মানুষ। চশমখোরের মত। প্রায় দুশো নৌকো ভর্তি টাকা-পয়সা-গয়না নিয়ে গিয়েছে সিন্দুক বোঝাই করে। তাতেও পেট ভরেনি। চব্বিশ পরগণার জমিদারি পেয়েও খুশী হয়নি। হয়তো আরো কিছু চায় বেটা।

কিন্তু দমদম্-হাউসের সামনে মাঠে গিয়ে অবাক। সেখানে অনেক ভিড় জমেছে মানুষের। আশেপাশের গাঁ থেকে পিল্ পিল্ করে দলে দলে ছেলে-বুড়ো-মেয়েরা আসছে ক্যান্টনমেণ্টের মাঠে। ফৌজের লোকেরা দাঁড়িয়ে আছে চারদিক ঘিরে। মেজর কিল্‌প্যাট্রিক আছে, ওয়াট্স্ আছে, বীচার, ম্যানিংহাম আছে, আর আছে ক্লাইভ সাহেব! আর তার পাশেই দাঁড়িয়ে মুন্সী নবকৃষ্ণ আর রামচাঁদ।

পালকিগুলো কাছে যেতেই জিনিসটা পরিষ্কার হয়ে গেল। কাকে যেন ঘিরে সবাই বিস্ময়ে শ্রদ্ধায় আতঙ্কে নিঝুম হয়ে আছে।

ক্লাইভ সাহেব জগৎশেঠজীকে দেখেই এগিয়ে এল—গ্ড্ মর্নিং—
জগৎশেঠজী জিজ্ঞেস করলেন—কী হচ্ছে এখানে? এত ভিড় কীসের?
ততক্ষণে মীরজাফর, কৃষ্ণচন্দ্র, ছোটমশাই সবাই এসে পড়েছেন।
তাঁরাও অবাক হয়ে গেছেন। বললেন—ও কে? ওখানে শুয়ে কে?

জসিম উদ্দীন সাহেবকে নিয়ে পশুপতিবাবুর বাড়িতে যখন পেঁছিলাম তখন বেশ সন্ধ্যে হয়ে গেছে। পশুপতিবাবু তখন বাড়িতে নেই। একজন ছেলে দরজা খুলে দিলে। বললে—আপনারা বসুন, বাবা এখনো আপিস থেকে ফেরেননি, তিনি এখুনি এসে পড়বেন।

আমি জসিম সাহেবকে বললাম—এই হচ্ছে পশুপতিবাবুর ছেলে। এ'রা খাস-বিশ্বাস। ক্লাইভ সাহেব দিল্লীর বাদশার কাছ থেকে উদ্ধব দাসের জন্যে খাস-বিশ্বাস উপাধি এনে দিয়েছিল। নিজেরও নতুন উপাধি আনিয়েছিল।

—কিন্তু তারপর কী হলো?

বললাম—তারপর সে এক অদ্ভুত কান্ড। সেই ভোর রাত্রে যখন উদ্ধব দাস কান্ত-সাগর থেকে এসে হাজির হলো তখনো বিশ্বাস করেনি যে, এমন কান্ড ঘটবে। মেজর কিল্প্যাট্রিক সেদিন যখন পদ্মার ওপর ছ'খানা বজরা আক্রমণ করলে তখন মীরন আর কোনো উপায় না পেয়ে সবগুলো বেগমকে ডুবিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু কিল্প্যাট্রিকের ফৌজের দলের লোকেরা অত সহজে ছাড়েনি তাদের। তারাও সঙ্গে সঙ্গে জলে ঝাঁপ দিয়েছিল। যাদের যাদের খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল তারা কেউই বেঁচে ছিল না। শুধু কান্তর চোখের পাতা দুটো বোধহয় একটু নড়ছিল। আর সবাইকে রেখে তারা তাকেই নিয়ে এসেছিল দমদম্-হাউসে। কিন্তু তারও পরমায়ু তখন বুঝি ফুরিয়ে এসেছে। যেটুকু বাকি ছিল তাও রাস্তাতেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। মেজর কিল্প্যাট্রিক সেই প্রাণহীন শরীরটাকেই বয়ে নিয়ে এসেছিল দমদম্-হাউসের উঠোনে।

ক্লাইভ প্রথমে বলেছিল কবর দিতে।

কিন্তু মরালী বললে—না, শবদাহের ব্যবস্থা করতে হবে—

তা সেই ব্যবস্থাই হলো শেষ পর্যন্ত। কাঠ এলো, পুরুতমশাইও এল। চিতা সাজানো হলো। একদিন যে-মানুষ চক্‌বাজারের রাস্তায় গণৎকারের কাছে হাত দেখিয়ে ভবিষ্যৎ জানতে চেয়েছিল, তার ভবিষ্যৎ দমদম হাউসের উঠোনের ওপর আগুনে পুড়িয়ে ছাই করবার সব ব্যবস্থাই পাকা করা হলো। চিতার ওপর শোয়ানো হলো কান্তকে। জ্বলন্ত আগুনের শিখায় শব ভস্ম করার হিন্দু রীতি যথাযথ পালন করা হলো। ক্লাইভ সাহেব কোনো কিছুর ত্রুটি রাখতে দিলে না। মরালী নিজে দাঁড়িয়ে থেকে প্রত্যেকটা জিনিসের ব্যবস্থা করে দিলে। ঘি চাই, চাল চাই, ফুল, চন্দন, যা কিছু প্রয়োজন সব সাহেবকে বলে জোগাড় করালে। তারপর চিতায় আগুন লাগাবার পালা।

হঠাৎ মেরী বেগম বললে—থামুন পুরুত মশাই, আমি আসছি—

বলে বাড়ির ভেতর চলে গেল। খানিক পরে যখন ফিরে এল তখন একটা

নতুন লালপাড় শাড়ি পরেছে। সিঁথিতে সিঁদুর দিয়েছে। পায়ে আলতা পরেছে। কপালে টিপ্! আস্তে আস্তে সাজানো চিতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে দেখে ক্লাইভ সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। বললে—কোথায় যাচ্ছো?

মরালী বললে—আমাকে বাধা দিও না—

ক্লাইভ সাহেব চমকে উঠেছে। বললে—সে কি, তুমিও চিতায় উঠবে নাকি?

মরালী বললে—হ্যাঁ, আমাকে এবার আর তুমি বাধা দিও না।

—বলছো কী তুমি? তুমি কি হিন্দু? তুমি যে এখন খ্রীস্টান হয়েছো?

মরালী বললে—না, এবার তুমি আর আমাকে বাধা দিও না। একবার অনেকদিন আগে ও দেরি করে এসেছিল, এবার ও আগে এসেছে, এবার আমাকে আর তুমি দেরি করিয়ে দিও না, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমাকে যেতে দাও, পথ ছাড়ো—

সেই অস্পষ্ট ভোরবেলায় নির্জন দমদম্-হাউসের উঠোনে দাঁড়িয়ে ক্লাইভ সাহেবের বড় ভয় করতে লাগলো। মেজর কিল্প্যাট্রিকও তখন হতবাক্ হয়ে গেছে। মেরী বেগম সতী হবে নাকি? হিন্দু মেয়েরা যেমন মৃত স্বামীর চিতায় উঠে পুড়ে মরে, তেমনি করবে নাকি! সঙ্গের ফৌজী সেপাইরাও তখন তাজ্জব হয়ে মেরী বেগমের কাণ্ড-কারখানা দেখছে!

—সরো তুমি!

ক্লাইভ বললে—না, তোমাকে আমি কিছুতেই পুড়ে মরতে দেবো না—

মরালী এবার খানিকক্ষণ সাহেবের মুখের দিকে চেয়ে চুপ করে রইলো। তারপর বললে—তুমি আমায় বাধা দেবার কে?

—কিন্তু তোমার নিজের স্বামী তো বেঁচে রয়েছে।

কিল্প্যাট্রিক সাহেব তাড়াতাড়ি একজন সেপাইকে পাঠিয়ে দিলে কান্ত-সাগরে উদ্ধব দাসকে ডেকে পাঠাতে। উদ্ধব দাস এসে সব শুনে চুপ করে রইলো।

ক্লাইভ বললে—পোয়েট, তুমি তোমার ওয়াইফকে পুড়ে মরতে বারণ করো। তুমি বারণ করলে শুনতে পারে, আমার কথা শুনছে না—বারণ করো, বারণ করো—

উদ্ধব দাস সাহেবের মুখের দিকে চেয়ে হাসতে লাগলো।

—কী পোয়েট, তুমি বারণ করবে না? তুমি তোমার ওয়াইফকে চোখের সামনে পুড়ে মরতে দেখবে?

মরালী বললে—আমি এখন কারো বারণ শুনবো না, আমাকে ছেড়ে দাও—

—কিন্তু পুড়লে তোমার জ্বালা করবে, তোমার যন্ত্রণা হবে, তখন তুমি বাঁচবার জন্যে ছট্ফট্ করবে।

মরালী হাসলো—না সাহেব, জ্বালা করবে না—

—আগুনে পুড়লে জ্বালা করবে না? বলছো কী তুমি?

—সাহেব, তুমি তা হলে আমাকে চিনতে পারোনি। তোমার সঙ্গে যে এগারজন বেগম মুর্শিদাবাদ থেকে এসেছে, আমি তাদের মত বেগম নই, আমি তাদের থেকে আলাদা—

—আলাদা তা জানি, কিন্তু তা হলেও তোমারও তো প্রাণ আছে, অন্য সকলের মত তোমারও তো ফীলিং আছে, তোমারও তো হাঙ্গার আছে, কেটে

গেলে তোমার বডি দিয়েও তো রক্ত পড়ে!

মরালী বললে—না, নেই!

—তার মানে? আগুনে পুড়লে তোমার জ্বালা করবে না?

—না! তুমি পরীক্ষা করে দেখ।

হঠাৎ পশুপতিবাবু ঘরে ঢুকলেন। আমাকে দেখে অবাক হয়ে গেছেন। ভদ্রলোক ছা-পোষা মানুষ। অফিস থেকে ফেরবার পথে একেবারে বাজার করে আনছেন। হাতে বাজারের থলি। তাতে কপি, মুলো, পালংশাক, বেগুন উঁকি মারছে।

বললাম—এঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই, ইনি হচ্ছেন কবি জসিম উদ্‌দীন, ইউনিভার্সিটির রিসার্চ স্কলার। ওই 'বেগম মেরী বিশ্বাসে'র ব্যাপারে কথা বলতে এসেছেন—

পশুপতিবাবু বললেন—সে এক মজার ব্যাপার হয়ে গেছে মশাই, আমি বলছি, জামা-কাপড় বদ্‌লে আমি আসছি। আর আপনাদের চা-ও করতে বলি—

বলে ভদ্রলোক ভেতরে চলে গেলেন। আর বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের বিরাট পরিবেশে কোথায় বুঝি এক অস্থির উন্মাদনা শুরু হলো। মৃত্যুর তীর্থে তর্পণ করতে এসে বুঝি সকলেরই এমনি হয়। মনে হলো, জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে যেন সেদিনকার সেই অমৃতবাণী শুনতে পেলাম। মনে হলো, জীবন নেই, মৃত্যুও নেই। জীবন-মৃত্যু অতিক্রম করে এক অনাদি অনন্ত লোকের অমর অস্তিত্বের সাক্ষাৎ পেলাম। যথার্থ ত্যাগের বেদনাও বুঝি সত্যিকারের মুক্তির আনন্দ। মনে হলো, আর একবার আসুক সেই অসহ্য বেদনা, যে বেদনায় কান্নার অবসান ঘটে। আমরা সহজে সুখী হতে চাই, সহজে ঐশ্বর্যের মালিকানা পেতে চাই, তাই যন্ত্রণায় আমরা ছট্‌ফট্‌ করি; কিন্তু তেমন করে মন বুদ্ধি অহঙ্কার সব কিছু থেকে মুক্তি না পেলে কেমন করে বলবো তোমাকে পেলাম! তোমাকে পাওয়ার দাম না দিলে তোমাকে পাওয়া যে আমার ব্যর্থ হয়। তাই সব কিছু থেকে মুক্ত হয়েই আজ তোমার সঙ্গে আমি যুক্ত হবো। দয়া করে তুমি আমাকে মুক্ত হবার শক্তি দাও!

ততক্ষণে জগৎশেঠজী, মীরজাফর সাহেব, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র, ছোটমশাই সবাই এসে গেছেন। আশেপাশের গ্রামের লোকরাও খবর পেয়ে গেছে। তারাও দলে দলে ভিড় করতে আরম্ভ করেছে।

—সত্যিই, পুড়লে তোমার জ্বালা করবে না?

—করবে কি করবে না, পরীক্ষা করেই না-হয় দেখ—

কিল্‌প্যাট্রিক একটা জ্বলন্ত মশাল নিয়ে এল। দাউদাউ করে জ্বলছে মশালের শিখা। মরালী আগুনের শিখার ওপর হাত বাড়িয়ে দিলে। হাতের পাঁচটা আঙুল পড়-পড় করে পুড়তে লাগলো। ঝলসে কালো হয়ে গেল। দুর্গন্ধ বেরোতে লাগলো।

তারপর বেঁকে তেবড়ে ত্রিভঙ্গ হয়ে গেল। তবু মরালীর মুখে চোখে এতটুকু বিকার নেই।

—এবার তুমি খুশী তো?

ক্লাইভের তখন আর উত্তর দেবার ক্ষমতা নেই। নির্বাক হয়ে চেয়ে আছে মরালীর মুখের দিকে। মরালীর মুখে চোখে তখন যেন অদ্ভুত এক হাসি ফুটে বেরোচ্ছে।

মরালী গিয়ে উঠলো চিতার ওপর। কান্তর নিষ্প্রাণ দেহটা কোলের ওপর তুলে নিয়ে বসলো। বললে—এবার আগুন জ্বালো—

সঙ্গে সঙ্গে আগুন জ্বলে উঠলো দাউদাউ করে। আগুন জ্বলে উঠলো দমদম্-হাউসের উঠোনে, আর সমস্ত হিন্দুস্থানে। সে আগুনের শিখায় দিল্লীর বাদশা পুড়ে মরলো, মারাঠা, শিখ, দাক্ষিণাত্য সব পুড়ে ছারখার হয়ে গেল। তা যাক, কিন্তু তার বদলে এল স্টীম ইঞ্জিন, কলের জাহাজ, ধান-ভানার কল, কাপড় বোনার মেশিন, গান শোনানোর গ্রামোফোন, ছবি তোলার ক্যামেরা।

জগৎশেঠজী, মীরজাফর, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র, নবকৃষ্ণ, ছোটমশাই, মুন্সী রামচাঁদ, ম্যানিংহাম, ওয়াট্‌স, বীচার, সবাই সেই আগুনে পুড়ে নিঃশেষ হয়ে গেল। মীরজাফরের শেষের দিকে কুষ্ঠব্যাধি হয়েছিল, নন্দকুমারের হাতে গঙ্গাজল খেয়েও রোগ ভোগ থেকে মুক্তি পায়নি। আর মীরন! মীরনের মৃত্যুও বড় মর্মান্তিক। বজ্রাঘাত ঠিক খুঁজে খুঁজে বেছে বেছে তার মাথা লক্ষ্য করেই পড়বে এ-কথা কে ভাবতে পেরেছিল? আর উমিচাঁদকে অনেকে দেখেছে রাস্তায়। রাস্তায় প্রলাপ বকতে বকতে ঘুরতো কেবল। শেষের দিকে কুড়ি লাখ টাকার শোক তার মত কোটিপতিকেও একেবারে বিকল করে দিয়েছিল। তারপর আর তাকে দেখতে পাওয়া যায়নি।

আর এই যে আজ লালবাজারের চারদিকে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান আর আরমানিদের ভিড়, এরা সেই ক্লাইভ সাহেবের নজরানা পাওয়া এগারোজন বেগমেরই উত্তরপুরুষ। বংশানুক্রমিকভাবে এরা এখানেই বাস করছে।

আর হাতিয়াগড়ের ছোট বউরানী? বার-মহলেই কেটে গিয়েছিল তার শেষ জীবনটা। বড় বউরানী শেষ বয়সে পোষ্যপুত্র নিয়েছিল। তারাই হাতিয়াগড়ের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়েছিল। হাতিয়াগড়ের বড়-তরফ। ছোট বউরানীর নিজের কোনো সন্তান হয়নি। তিনি পোষ্য নিয়েছিলেন। কিন্তু মুসলমানের ছোঁয়া খাওয়ার অপরাধে সে তরফ আজও অন্ত্যজ। হাতিয়াগড়ের রাজবংশের কোনো মর্যাদার অংশীদার তারা হতে পারেননি।

হঠাৎ পশুপতিবাবু ঘরে ঢুকলেন। চা-ও এল।

আমি জসিম সাহেবকে বললাম—ইনিই সেই উদ্ধব দাসের বংশধর। মেরী বেগম খৃষ্টান হবার পর নিজের পছন্দ করা পাত্রীর সঙ্গে উদ্ধব দাসের বিয়ে দিয়েছিল। আমি পুঁথি পড়ে সব জানতে পারলাম—উনি কিছুই জানতেন না এ-সব—

জসিম উদ্‌দীন সাহেব বললেন—একবার সেখানা আনুন না, দেখি একটু—

পশুপতিবাবু বললেন—সে এক মজার ব্যাপার হয়ে গেছে মশাই, আপনাকে

দেখাবার পর আমি দু-একজনকে কথাটা বলি, তারপর একজন আমেরিকান সাহেব সেদিন এসে হঠাৎ সেটা নিয়ে গেল—

—নিয়ে গেল মানে? আর দেবে না?

পশুপতিবাবু বললেন—না, তিনি যে দেড় শো টাকা দিয়ে কিনে নিয়ে গেলেন!

—সে কী? একেবারে বিক্রী করে দিলেন? সে সাহেবের ঠিকানাটা কী?

পশুপতিবাবু বললেন—তাও তো জানি না মশাই, ছা-পোষা গেরস্থ মানুষ। নগদ দেড় শো টাকা পেয়ে গেলুম, আমি আর ঠিকানাটা চাইনি—

কী আর করবো। সেদিন আর কিছু করবারও ছিল না আমাদের। আমরা খালি হাতেই ব্যর্থ হয়ে চলে এসেছিলাম। কিন্তু যতবার কাহিনীটার কথা মনে পড়ে ততবার দু'শো বছর আগেকার সেই কোন্ এক আশ্চর্য মেরী বেগমের কথা মনে পড়ে অসাড় হয়ে যাই। মনে হয়, এমন একদিন হয়তো আসবে যেদিন আমাদের আজকের এই কুটিল আর জটিল পৃথিবীর মানুষের ভিড়ের মধ্যে একজন মানুষের আবির্ভাব হবে, যে বলতে পারবে—আমার মন বুদ্ধি আর অহঙ্কার সব কিছু থেকে মুক্তি না পেলে কেমন করে বলবো তোমাকে পেলাম! তোমাকে পাওয়ার দাম না দিলে যে তোমাকে পাওয়া আমার ব্যর্থ হয়। তাই সব কিছু থেকে মুক্ত হয়েই তোমার সঙ্গে আমি যুক্ত হবো। দয়া করে তুমি আমাকে মুক্ত হবার শক্তি দাও!

শেষকালে উদ্ধব দাস শেষ শ্লোকে লিখে গেছে—

কোম্পানীর রাজ্য হৈল, মোগল হৈল শেষ।
'দমদম্-হাউসে' আইল ইংরেজ নরেশ॥
কৃষ্ণভজা বৈষ্ণবেরা আতঙ্কেতে মরে।
ব্রাহ্মণ হৈয়া হিন্দু যত পৈতা ফেলে ডরে॥
হিন্দু ছিল মুসলিম হৈল পরেতে খৃষ্টান।
এমন দেশেতে বল থাকে কার বা মান॥
কোন দেশেতে ঘর বা তোমার কোন্ দেশে বা বাড়ি।
মরিয়ম বেগম বলে আমি অভাগিনী নারী॥
পতি থাকতে পতি নাই মোর অনাথিনী অতি।
মনের মানুষ যেখানে থাক আমি তারি সতী॥
তার যদি বা মৃত্যু ঘটে আমি কিসে বাঁচি।
তারে কাছে লৈয়া আইস থাকি কাছাকাছি॥
এতেক কহিয়া সতী উঠিল চিতায়।
পতিপাশে হাস্যমুখে সুখে নিদ্রা যায়॥
চিতা জ্বলে দাউ দাউ জ্বলুক দহন জ্বলা।
তার চিতাতে আমি জ্বলি, অভাগী অবলা॥
বসুন্ধরায় কহি মাগো তুমি সর্বসার।
নিবেদন করি তোমায় সতীর হাহাকার॥
যত ব্যথা পেলাম মাগো বর্ণিবারে নারি।
আমার মরণ দিয়া সবার বেদনা নিবারি॥

বেগম মেরী বিশ্বাস

নারী হৈয়া জন্ম হৈল তোমার বুকের পর ॥
ঘর হৈনু বাহির এবে বাহির হৈনু ঘর।
বেগম মেরী বিশ্বাসের অমৃত কথন।
উদ্ধবচন্দ্র দাস কহে, শোনে সর্বজন॥

॥ সমাপ্ত ॥